আহমদ শরীফ রচনাবলী

সপ্তম খণ্ড

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আহমদ শরীফ রচনাবলী

সপ্তম খণ্ড

ড. পৃথ্বিলা নাজনীন নীলিমা
সম্পাদিত

AMARBOI.COM

আগামী প্রকাশনী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৪২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

প্রকাশক ওসমান গনি আগামী প্রকাশনী ৩৬ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০ ফোন ৭১১ ১৩৩২, ৭১১ ০০২১
প্রচ্ছেদ কাইয়ুম চৌধুরী
বর্ণ বিন্যাস কম্পিউটার মুদ্রণ শিল্প, ঢাকা
মুদ্রণ স্বরবর্ণ প্রিন্টার্স ১৮/২৬/৪ শুকলাল দাস লেন, ঢাকা
মূল্য : ১০০০.০০ টাকা

Ahmed Sharif Rachanavali–7 : (Collected Works of Ahmed Sharif)
Published by Osman Gani of Agamee Prakashani
36 Bangla Bazar, Dhaka-1100 Bangladesh.
e-mail : info@agameeprakashani-bd.com
First Edition : February 2014

Price : Tk 1000.00 only

ISBN: 978 984 04 1644 8

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রসঙ্গ কথা

বাংলাদেশের অন্যতম মুক্ত চিন্তার অনন্য ব্যক্তিত্ব এবং মধ্যযুগের সাহিত্য ও ইতিহাসের বিদগ্ধ পণ্ডিত ড. আহমদ শরীফ পঞ্চাশ দশক থেকে নিয়মিতভাবে প্রবন্ধ লেখা শুরু করেছিলেন এবং তা তাঁর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত চলমান ছিল। তাঁর রচিত সহস্রের অধিক প্রবন্ধ থেকে বিষয়-ভিত্তিক বিন্যাস করা খুবই শ্রমসাধ্য ব্যাপার। তবুও বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করে গ্রন্থিত ও অগ্রন্থিত প্রবন্ধগুলো থেকে বিষয়-ভিত্তিক প্রবন্ধগুলো সংকলন করে তা গ্রন্থিত করা হল। এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগ থেকে মৃত্যুর পরবর্তী বছর অবধি প্রতি বছর গড়ে দুটো করে ড. আহমদ শরীফ-এর মৌলিক রচনা সংকলিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, ড. আহমদ শরীফ একজন প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব যাকে উপেক্ষা করা যায় তবে কোন অবস্থাতেই তাঁর বিশাল কীর্তি অস্বীকার করা যায় না। নিজস্ব দর্শন চিন্তা ও বৈশিষ্ট্যের কারণে বোদ্ধা সমাজের কাছে তিনি ছিলেন বহুল আলোচিত, সমালোচিত ও বিতর্কিত এবং তাঁর মৃত্যুর পরেও এ ধারা বহমান।

বাংলাদেশের মতন একটি অনুন্নত দেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে এখানে লেখাপড়া জানা মানুষের মাঝে না-পড়া এবং না- জানার প্রবণতা গড়ে উঠেছে। তাই কেউ নিজে থেকে কোন বইয়ের বা পত্রিকার পাতা উল্টিয়ে দেখার গরজ অনুভব করে না। আবার যে কোন ব্যক্তিকে বা বিষয়কে সমাজে পরিচিত করতে প্রচার হচ্ছে সবচেয়ে বড় মাধ্যম। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় পর্যায়ের সাহিত্য-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদিতে বা বিভিন্ন জাতীয় পর্ষদগুলোতে কিংবা জাতীয় বা স্থানীয় প্রচার মাধ্যমে আয়োজিত অনুষ্ঠানগুলোতে যারা ঘুরে-ফিরে সব সময় অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেয়ে থাকেন তারাই কেবল দেশে শীর্ষস্থানীয় সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিতি লাভ করে থাকেন। সরকারি বা রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের রচনা-শৈলী যাই হোক না কেন, তার গুণগত মান প্রশ্নসাপেক্ষ। তবে সঠিক মূল্যায়ন শুধুমাত্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ-এর গবেষকগণই করতে পারবেন।

বাংলাদেশে ড. আহমদ শরীফ-এর মতন হাতে-গোনা চার থেকে পাঁচজন লিখিয়ে পাওয়া যাবে যাঁরা কোন অবস্থাতেই সরকারি বা রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার বেড়াজালে নিজেদেরকে জড়াননি, তাই তারা মননশীল লেখক হিসেবে বা তাঁদের চিন্তাসমৃদ্ধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রন্থগুলো লেখা-পড়া জানা মানুষের কাছে অদ্যাবধি অজ্ঞাত ও অপঠিত থেকে গেছে। একই ভাবে ড. আহমদ শরীফ রচিত সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতি-রাজনীতি-দর্শন এবং ইতিহাসের উপর শতের অধিক মননশীল গ্রন্থগুলো শুধু অপঠিতই নয় অগোচরেও থেকে গেছে।

ভাববাদ মানবতাবাদ ও মার্কসবাদের যৌগিক সমন্বয় প্রতিফলিত হয়েছিল তাঁর চিন্তা-চেতনা-ধ্যান-ধারণা আচার-আচরণে বক্তব্য ও লেখনীতে। তাঁর রচিত শতেরও অধিক গ্রন্থের প্রবন্ধে তিনি অত্যন্ত জোরালো যুক্তি দিয়ে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা, বিশ্বাস সংস্কার পরিত্যাগ করেছিলেন এবং আন্তরিকভাবে আশা পোষণ করেছিলেন সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার জন্য। পঞ্চাশ দশক থেকে নব্বই দশকের শেষ-অবধি সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি, দর্শন, ইতিহাসসহ প্রায় সব বিষয়ে অজস্র লিখেছেন। দ্রোহী সমাজ-পরিবর্তনকামীদের কাছে তাঁর পুস্তকরাশির জনপ্রিয়তা ঈর্ষণীয়। তাঁর রচিত পুস্তকরাশির মধ্যে 'বিচিত চিন্তা', 'স্বদেশ অন্বেষা', 'মধ্যযুগের সাহিত্য সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ', 'বাঙলার সুফি সাহিত্য', 'বাঙালির চিন্তা-চেতনার বিবর্তন ধারা', 'বাঙলার বিপ্লবী পটভূমি', 'এ শতকে আমাদের জীবনধারার রূপরেখা', 'প্রত্যয় ও প্রত্যাশা' এবং বিশেষ করে দুখণ্ডে রচিত 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য' তাঁর অসামান্য কীর্তি। তবে এ-কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে প্রখ্যাত গবেষক আবদুল করিম সহিত্যবিশারদ-এর মানসপুত্র হিসেবে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ও সমাজ সম্পর্কে পাহাড়সম গবেষণাকর্ম তাঁকে কিংবদন্তী পণ্ডিত হিসেবে উভয়বঙ্গে ব্যাপকভাবে পরিচিতি দিয়েছে। সমগ্র বঙ্গে এ-বিষয়ে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়, এবং অদ্যাবধি স্থানটি শূন্য রয়ে গেছে। জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় ব্যয় করে তিনি মধ্যযুগের সাহিত্য ও সামাজিক ইতিহাস রচনা করে গেছেন। বিশ্লেষণাত্মক তথ্য, তত্ত্ব ও যুক্তিসমৃদ্ধ দীর্ঘ-ভূমিকার মাধ্যমে তিনি মধ্যযুগের সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাস বাংলা ভাষা-ভাষী মানুষকে দিয়ে গেছেন, যা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক অমর পাঁথা হয়ে থাকবে।

বর্তমান খণ্ডটি সপ্তমখণ্ড যা ড. আহমদ শরীফ-এর প্রকাশিত মোট ৭টি গ্রন্থের সমন্বয়ে সংকলিত করা হয়েছে এবং প্রকাশকাল অনুসারে গ্রন্থিত হয়েছে :

১. জাগতিক চেতনার বিচিত্র প্রসূন (১৯৯২)
২. সংস্কৃতি (১৯৯২)
৩. সংকট জীবনে ও মননে (১৯৯৩)
৪. শাস্ত্র সমাজ ও নারী মুক্তি (১৯৯৩)
৫. এ শতকে আমাদের জীবন ধারার রূপরেখা (১৯৯৪)
৬. প্রগতির বাধা ও পন্থা (১৯৯৪)
৭. সময় সমাজ মানুষ (১৯৯৫)।

প্রথম গ্রন্থ 'জাগতিক চেতনার বিচিত্র প্রসূন'-এ ৪৫টি কলাম সংকলিত হয়েছে যা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থটি ব্যক্তি, সমাজ, সংস্কার, জীবন ও দর্শন নিয়ে বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা আছে। দ্বিতীয় গ্রন্থ 'সংস্কৃতি'-তে তিনটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে এবং তিনটিই সংস্কৃতির উপর বিশ্লেষণধর্মী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলোচনা। উল্লেখ্য যে, প্রবন্ধ তিনটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কবি মতিউর রহমান পঞ্চম স্মারক বক্তৃতামালা ১৯৯২-তে পঠিত।

তৃতীয় গ্রন্থ 'সংকট জীবনে ও মননে'। গ্রন্থটিতে ৩৯টি কলাম সংকলিত হয়েছে এবং কলামগুলো বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। মূলত কলামগুলো মানুষ, সমাজ, সংস্কার ও মূল্যবোধের উপর বিশ্লেষণধর্মী রচনা।

চতুর্থ গ্রন্থ 'শাস্ত্র সমাজ ও নারী মুক্তি'। গ্রন্থটিতে মোট ৩৬টি কলাম সংকলিত হয়েছে এবং কলামগুলো বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। সংকলিত কলামগুলো দেশ, কাল, সমাজ, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে রচিত এবং প্রতিটি লেখাতে লেখকের নিজস্ব চিন্তা, দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটেছে।

পঞ্চম গ্রন্থ 'এ শতকে আমাদের জীবন ধারার রূপরেখা'। গ্রন্থটিতে ২২টি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। সংকলিত প্রবন্ধগুলো সংস্কৃতি সমাজ, রাজনৈতিক ও দর্শনের উপর বিশ্লেষণাত্মক রচনা।

ষষ্ঠ গ্রন্থ, 'প্রগতির বাধা ও পন্থা'য় ১৯টি প্রবন্ধ গ্রন্থিত হয়েছে। সংকলিত প্রবন্ধগুলো মূলত সাম্প্রদায়িকতা, সংস্কৃতি, সমাজ-সংস্কার ও ইতিহাসের উপর নিরীক্ষাধর্মী রচনা।

সপ্তম গ্রন্থ 'সময় সমাজ মানুষ'। গ্রন্থটিতে সংকলিত প্রবন্ধগুলো তিনভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে 'সময়', দ্বিতীয়ভাগে 'সমাজ' এবং তৃতীয় ভাগে 'মানুষ' —এইভাবে বিভক্ত। এই গ্রন্থে সমাজ, রাষ্ট্র, সংস্কৃতি এবং বাংলা সাহিত্যের অনন্য ব্যক্তিদের উপর লেখকের নিজস্ব বিচার দর্শন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে বিশ্লেষণধর্মী রচনার সম্ভার ঘটেছে।

উল্লেখ্য যে, বর্তমান সপ্তম খণ্ডটি প্রকাশ করার ক্ষেত্রে জনাব মাহমুদ করিম-এর উৎসাহ, এ্যাডভোকেট যাহেদ করিম-এর সহযোগিতা ও সৃজনশীল প্রকাশনা সংস্থা আগামী প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী জনাব ওসমান গনিকে বিশেষ ধন্যবাদ।

ড. পৃথ্বিলা নাজনীন নীলিমা
অধ্যাপক, বাংলাবিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সাভার, ঢাকা

ফেব্রুয়ারি ২০১৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচিপত্র

জাগতিক চেতনার বিচিত্র প্রসূন

সাম্প্রদায়িকতা ও দাঙ্গাবাজি একার্থক ও একাত্মক নয় ১৫ ইতিহাসের বিকৃতিই সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ডের উৎস ১৭ রাষ্ট্রের সঙ্কট ঃ সমস্যা - সাম্প্রদায়িকতা ও আন্তর্জাতিকতা ২৪ স্বাতন্ত্র্য, সম্প্রদায় চেতনা ও রাজনীতিক দাঙ্গা-হাঙ্গামা তত্ত্ব ২৬ স্বাতন্ত্র্যে নয়, বৈশ্বিক সহযোগিতায় নিহিত মানবকল্যাণ ২৮ আজ বৈশ্বিক মানবচেতনা জরুরী ৩০ মনের এক অদ্ভুত আধি ৩১ জাতীয় সংস্কৃতি কি চিজ? ৩২ উপযোগরিক্ত গতানুগতিক জীবনাচারের নামই জাতীয় সংস্কৃতি ৩৪ বিশ্বাস-সংস্কার বনাম সত্য ও তথ্য ৩৫ বিশ্বাস-সংস্কারের আধুনিক নাম মগজধোলাই ৩৬ আমাদের জীবনে সর্বপ্রকার অসঙ্গতির কারণ ৩৮ পশুহত্যায় ত্যাগ-মহিমা ৩৯ প্রকৃত জ্ঞান অতীতে নেই, আছে ভবিষ্যতের গর্ভে ৪১ বাঁচার জন্যেই স্বাধীন চিন্তা : নতুন মত ও পথ প্রয়োজন ৪৩ সঙ্কট সমস্যা মোচনের জন্যে চাই নতুন মত ও পথ ৪৫ উপযোগ সচেতন হয়ে স্বকালে বাঁচাই প্রগতিশীলতা ৪৭ সুখ-দুঃখের তরঙ্গ তাড়িত জীবন ৪৯ ব্যক্তির জীবনচরিত ৫০ বীরত্বের পরীক্ষা বিপদেই ৫১ লড়াইপ্রিয় মানুষ ৫৩ জোর যার মুলুক তার ৫৪ প্রাণী মাত্রেই লক্ষ্য ভোগ-উপভোগ ৫৫ দরিদ্র ধনলিপ্সু হয়, শরম-সততা হারায় ৫৭ ক্ষমতা বনাম চাটুকারিতা ৫৯ সারমেয় ও ফেরু ৬০ মনীষার ও মনীষীর সীমাবদ্ধতা ৬১ সমাজে ও রাষ্ট্রে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব চাই ৬২ আমাদের প্রেরণা-প্রণোদনার উৎস ও আদর্শ নেই : আমরা সংসর্গদুষ্ট ৬৪ বাঁচব কি খেয়ে, কি নিয়ে, কি করে? ৬৭ শাসনতন্ত্রের উৎকর্ষই কি ভাত-কাপড় যোগায়? ৬৯ এগিয়ে চলাই জীবন ৭১ মানব ও মানবতা বিপন্ন : লড়াকু চাই ৭৪ মেধাই বিদ্যাবত্তার উৎস ৭৬ পৃথিবী সুন্দর, জীবন মধুর ৭৭ দুই কবি : রবীন্দ্র-নজরুল ৭৮ মেঘ-বৃষ্টি-মন ৮১ দুটো সরলতত্ত্ব : সমাজ ও রাষ্ট্র ৮৪ বিশ্বে রাষ্ট্রিক যুগান্তর সংকেত! ৮৬ ভাঙা-গড়ার আবর্তে আজকের বিশ্ব ঃ যুগান্ত লক্ষণ ৮৮ যুক্তিবাদী আরজ আলি মাতুব্বর ৯০ নারী মুক্তি সংগ্রামী ঃ বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ৯২ মুক্তচেতনার জীবনরসতাত্ত্বিক বঙ্কিমচন্দ্র ১০০ বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে আরো কিছু কথা ১১০ হিন্দু পুনর্জাগরণবাদী বঙ্কিমচন্দ্র ১১৯

সংস্কৃতি

প্রথম বক্তৃতা : সংস্কৃতি ১২৫ দ্বিতীয় বক্তৃতা : সাংস্কৃতিক তথা আচারিক স্বাতন্ত্র্যচেতনা রক্ষণশীলতা ও অপসংস্কৃতি ১৪৭ তৃতীয় বক্তৃতা : বিকাশের পথে অভিন্ন বৈশ্বিক সংস্কৃতি ১৬৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংকট : জীবনে ও মননে

সংযম, মনুষ্যত্ব ও সংস্কৃতি ১৮৭ ঐতিহ্য ও আস্তিকের মনুষ্যত্ব ১৮৮ প্রাণিত্ব ও মনুষ্যত্ব ১৯০ মানবতার সঙ্কট ও সমস্যা ১৯২ ক্ষয়িষ্ণু মানবিকতা ১৯৪ ব্যক্তিজীবনে মনুষ্যত্বের অনুশীলন জরুরী ১৯৬ নৈতিকতা ও শিক্ষা সম্বন্ধে ধারণা বদলাতে হবে ১৯৭ উন্নয়নের জন্যে মানসমুক্তি আবশ্যিক ২০০ বিশ্বাসের নয়, এ কাল যুক্তিবাদিতার ২০২ মনুষ্যজীবনের সাধারণ রূপ ২০৩ বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা ও জ্ঞান ২০৪ মুক্তবুদ্ধি ও মানবতা ২০৭ জীবনবোধে হেরফের ২১১ শিল্পসাহিত্যাদি কলার চর্চার গুরুত্ব ২১২ রক্ষণশীলতা, গ্রহণবিমুখতা একটি আধিমাত্র ২১৪ সঙ্কট : জীবনে ও মননে ২১৬ সবচেয়ে বড় অভাব আদর্শনিষ্ঠ চরিত্রবান লোকের ২১৯ গণহিতৈষণার তিন পন্থা ২২১ জনগণকে সেবার পন্থা ২২২ প্রাণে বাঁচা ও বাঁচানোর পন্থা ২২৪ একালে বাঁচার উপায় ২২৫ পুঁজিবাদের ছোবল ও মৌলবাদের বিস্তার ২২৭ ধূর্তের পুঁজি ধর্ম ২২৮ গণতান্ত্রিক মন-মেজাজ গড়ার জন্যেও প্রশিক্ষণ প্রয়োজন ২৩০ ঘরে বাইরে শান্তির ও সহাবস্থানের পন্থা ২৩২ সমাজ পরিবর্তনেই মানবমুক্তি সম্ভব ২৩৫ 'জন্ম যদি তব বঙ্গে' ২৩৭ মুক্তিযুদ্ধচেতনা : আমাদের শক্তির ও সংগ্রামের উৎস ২৩৯ দৈশিক ও বৈশ্বিক মিলন-ময়দান সন্ধানে ২৪০ গণমুক্তিসংগ্রাম চলবেই ২৪২ প্রগতির প্রতিপক্ষ ২৪৪ হামলা কবলিত সংস্কৃতি ২৪৬ একটা দিশা খুঁজতেই হবে ২৪৮ ধারণাবাদী ও জ্ঞানবাদী ২৫০ আজকের বাংলাদেশ : চোরাবালিতে স্থিতি ২৫১ পাকা কাণ্ডারী চাই ২৫৩ হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী ২৫৬ ভবিষ্যতের মানুষ ২৫৮ বিবিধ প্রবন্ধে ও অনুশীলনে-ধর্মতত্ত্বে বঙ্কিমচন্দ্রের জগৎচেতনা ও জীবনভাবনা ২৫৯ সাহিত্য শিল্প ও সৌন্দর্য চেতনা ২৬০

AMARBOI.COM

শাস্ত্র সমাজ ও নারীমুক্তি

বিচ্ছিন্নতা ২৮১ বিতর্কিত জাতীয়তা : বিকৃত ইতিহাস ২৯১ প্রসঙ্গ অনিরুদ্ধের উপসম্পাদকীয়– ১৪ই এপ্রিল ১৯৯১ সন ২৯৫ তথ্যঋদ্ধ ইতিহাসই মুক্তিসনদ ২৯৬ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সমদর্শিতা ৩০১ রূপে-স্বরূপে রাষ্ট্রিক বাঙলাদেশ ৩০২ শাস্ত্র, সমাজ ও নারীমুক্তি ৩১০ প্রগতিপন্থী চিন্তা-চেতনার অনুশীলন ৩২০ মার্কসীয়তত্ত্বের নির্যাস ৩২৩ পুঁজিবাদ বনাম মার্কসবাদ ৩২৫ মার্কসবাদের বিনাশ-বিলুপ্তি নেই ৩২৭ নাস্তিকের ধর্মচিন্তা ৩২৮ অতীতমুখিতা ও পারত্রিক মুক্তিকাঙ্ক্ষা প্রসঙ্গে ৩৩০ আজকের বৈশ্বিক জীবনে অতীতমুখিতা অচল ৩৩৩ পিছুটানে কল্যাণ নেই, কল্যাণ সম্মুখে ৩৩৫ আর্থ-সামাজিক সুখের মরীচিকা ৩৩৮ কালে দাবিচেতনা ও প্রগতি ৩৪০ 'প্রিয়েরে দেবতা'–নয় ৩৪২ নতুন চিন্তাচেতনাজাত মত-পথ ও সিদ্ধান্ত জরুরী ৩৪৩ অনুমান তত্ত্ব ৩৪৫ ভাববাদীর ও জ্ঞানবাদীর ভাষার ও জীবনানুভূতির পার্থক্য ৩৪৬ ভালো থাকার পন্থা ও বাধা ৩৪৮ আমাদের গতি লাটিমের গতি ৩৫০ কূর্ম ও কূপমাণ্ডুক্য নীতি পরিহার আবশ্যিক ৩৫২ মৌলিক মগজী ফসল চাই ৩৫৩ মানবিক গুণের অনুশীলন জরুরী ৩৫৫ ব্যায়াম : দৈহিক ও মানসিক ৩৫৭ মানবমুক্তি ৩৬০ অন্নের অনিশ্চয়তা মনুষ্যত্বের বিনাশক ৩৬১ মুক্তিবুদ্ধি ও মুক্তচিন্তা আবশ্যিক ৩৬৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যন্ত্রনির্ভর কালের দাবি : বাঁচার উপায় ৩৬৬ পরম্পরাপ্রীতি, দ্রোহ ও চেতনার বিকৃতি ৩৬৮ ভদ্রলোক ও ভালো মানুষ ৩৭১ শ্রেয়সের সন্ধানে ৩৭২ ঈর্ষা ৩৭৪ নববর্ষে ৩৭৫ পয়লা বৈশাখ : বাঙালী সত্তার প্রতীক, প্রতিম ও প্রতিভূ ৩৭৬

এ শতকে আমাদের জীবনধারার রূপরেখা

এ শতকে আমাদের জীবনধারার রূপরেখা ৩৮১ সমস্যা-সঙ্কটের মূলে ৪১১ সাম্প্রদায়িক দ্বেষণার উৎস ব্রিটিশরচিত বিকৃত ভারত-ইতিহাস ৪১৭ রেনেসাঁস চাই ৪২৮ সংজ্ঞায় ও সংজ্ঞার্থে সেক্যুলারিজম ৪৩১ মনুষ্যত্ব ও সংস্কৃতি ৪৩৬ শুভবুদ্ধির মানুষের প্রাধান্যের ও প্রাবল্যের প্রতীক্ষায় ৪৩৮ 'আত্মসম্বিৎ' প্রয়োজন ৪৪০ কালান্তরে আত্মকল্যাণের কুঞ্জি ৪৪২ স্বকাল চেতনাই বাঁচার চাবিকাঠি ৪৪৪ কালের চাহিদা সচেতন হতে হবে ৪৪৫ বন্ধন মুক্তিই কাম্য ৪৪৬ 'দরদী মানুষ' মেলা ভার ৪৪৮ জাতিক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি ৪৪৯ মানুষের ভবিষ্যৎ কি? ৪৫২ ন্যায্য অধিকার আদায়েও সংগ্রামের বিকল্প নেই ৪৫৩ ব্যক্তি স্বাধীনতা : এক অলীক ধারণা ৪৫৬ সহিষ্ণুতার সংস্কৃতি ৪৫৭ নতুন ধরনের রাজনীতিক দল চাই ৪৫৯ দেশ দুষ্টক্ষতে আক্রান্ত ৪৬২ বিপন্মুক্তির জন্যে শক্তি সাহস চাই ৪৬৫ বৈশ্বিক স্তরে শোষিতমানব মুক্তি আসন্ন ৪৬৭ রাজনীতি ও এ কালের গণদাবি ৪৬৯

প্রগতির বাধা ও পন্থা

সাম্প্রদায়িকতা ও জাতি বৈর ৪৭৫ সাম্প্রদায়িকতার শেকড় ও শাখা-পলব ৪৮০ ভারতে-বাঙলাদেশে মৌলবাদ ও এর রূপ-স্বরূপ ৪৯৫ সাম্প্রদায়িকতার সংজ্ঞার্থ ৫০৩ বিকৃত ইতিহাস প্ররোচিত সাম্প্রদায়িকতা ৫০৬ তুর্কী-মুঘল শাসন সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্যের কয়েকটি ৫১১ সাম্প্রদায়িকতা বিমুক্তির উপায় কি? ৫১৫ মৌলবাদ সমর্থনযোগ্য নয় কেন ৫১৮ রাজনীতির বলি-নিরীহ জনগণই ৫২১ বাঙালীর জ্ঞাতিত্ব বন্ধন ৫২২ বৈশ্বিক ঐক্যচেতনার অনুশীলনকাল সমাগত ৫২৮ মানসিক বৃত্তাবদ্ধতাই প্রগতির অন্তরায় ৫৩০ ঔদ্ধত্যের উৎস অস্ত্র ৫৩১ সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যচেতনা একটি আধিমাত্র ৫৩৩ সংস্কৃতি সম্বন্ধে একটি তাত্ত্বিক পুনর্বিবেচনা ৫৩৪ সংকটের শেকড় সন্ধানে ৫৩৬ বিজ্ঞানবিমুখতা আত্মপ্রতারণার নামান্তর ৫৩৮ আধুনিকতার অপর নাম বিজ্ঞানমনস্কতা ৫৪১ বিজ্ঞানের প্রয়োগে আস্থা, তথ্যে অনাস্থা ৫৪২ তিন 'R' -এর আধি আক্রান্ত পৃথিবী ৫৪৩ মৌলবাদ ও সেক্যুলার সংস্কৃতি ৫৪৬ সংযম-সহিষ্ণুতা-সৌজন্য ও সাম্প্রদায়িকতা ৫৫০ এ কালের দাবি ঃ বৌদ্ধিক ও যৌক্তিক জীবন ৫৫৩ মডার্নিজম, র‍্যাশানালিজম, লিবারেলিজম ও সোসিয়ালিজম ৫৫৬ মানসমুক্তি নিহিত বিজ্ঞানের তথ্যে আস্থায় আর যুক্তিনিষ্ঠায় ৫৫৭ 'একুশে' সঞ্জাত ভাবনা ৫৬০ চরৈবেতি ৫৬২ মেঘ উবে যাবে, অন্ধকার হবে বিলুপ্ত ৫৬৪ পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়ম্ ৫৬৬ শহুরে শিক্ষিত বাঙালীর সংস্কৃতি কিরূপ? ৫৬৯ মিলে অমিলে ও অমিলে মিল ৫৭০ গতিই জীবন ঃ স্থিতিই জরা-জড়তা ও জীর্ণতা ৫৭২ বঞ্চনায় নয়, বন্টনে বাঁচার দিন সমাগত ৫৭৫ 'এমন মানব জমিন রইল পতিত' ৫৭৮ সেক্যুলার রাজনৈতিক দলই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অকৃত্রিম একক রাষ্ট্রিক জাতি প্রতীক ৫৭৯ প্রতিক্রিয়াশীলতা প্রতিরোধের একটি বিবেচ্য প্রস্তাব ৫৮১ 'রাজনীতিক সংস্কৃতি' ও 'রাজনীতিক ব্যক্তিত্ব' চাই ৫৮৩ বাকস্বাধীনতা-যুক্তিবাদিতা-বিজ্ঞানমনস্কতা ৫৮৫ সংখ্যালঘুর নিরাপত্তা-সমস্যা ৫৮৭ একটি রাষ্ট্রনীতিক চিন্তা ৫৮৯ কালের দাবি, জীবনের চাহিদা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ৫৯০ সেক্যুলারিজমের বিকল্প নেই ৫৯২ শাস্ত্র-স্বাতন্ত্র্য ও সমকালীন জীবনের দাবি ৫৯৩ শিষ্টাচার ৫৯৬ নতুন কালের নয়া দুনিয়া ৫৯৮ কলা ও কলাকার ৬০০ বিপন্ন আঞ্চলিক সংস্কৃতি ৬০২ সম্প্রীতি নয়, সেক্যুলারিজমই সমাধান ৬০৪

সময়-সমাজ-মানুষ

বাঙলাদেশের শতবর্ষের ইতিবৃত্তান্ত ৬০৯ জীবন ৬৩৪ মানস-অরণ্যে যুক্তিবাদই সূর্যালোক ৬৩৫ দ্বান্দ্বিক অবস্থানে বিজ্ঞান ও বিশ্বাস : যুক্তি ও ভক্তি ৬৩৭ আমাদের আধুনিক হতে হবে সর্বপ্রকারে ৬৩৯ পরমত, পরকর্ম ও পরআচরণ সহিষ্ণুতা ৬৪১ সে-ই ধন্য নরকুলে ৬৪৩ অবক্ষয়-সচেতন হোন ৬৪৬ গণসাক্ষরতার বিকল্প উপায় ৬৪৯ সংখ্যালঘুকে নাগরিক অধিকারে নিশ্চিতি দানের দায়িত্ব রাষ্ট্রের ৬৫১ আইন প্রয়োগে হেরফের : অর্পিত সম্পত্তি ৬৫৩ সেক্যুলার সংবিধানই সাম্প্রদায়িকতার প্রতিষেধক ৬৫৫ মানব-উত্তরাধিকার ৬৫৬ বাঁচার উপায় : বিজ্ঞান ও বাণিজ্য ৬৫৮ অযৌক্তিক আকর্ষণের নাম মোহ ৬৫৯ ভদ্রলোক বাড়ছে, ভালোমানুষ কমছে ৬৬১ ভাষা সংস্কারের নামে বাঙালীসত্তায় চিড় ধরানোর প্রয়াস ৬৬৫ বিশ্বজুড়ে চলবে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ৬৬৮ কাজী আবদুল ওদুদ ৬৭৩ ভিন্ন দৃষ্টিতে কাজী আবদুল ওদুদ ৬৭৯ আমার চোখে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৮৩ আমাদের মানস-মুক্তির দিশারী যুক্তিবাদী আরজ আলী মাতুব্বর ৬৮৬ বাঙলায় স্বাধীনতার পতাকা উড্ডয়নে পথিকৃৎ সূর্যসেন ৬৮৮ বাঙলা সাহিত্যে চৈতন্যদেবের অবদান ৬৯১ বাঙলা সাহিত্য চর্চায় সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্য ও বিচ্ছিন্নতা ৬৯২ একজন অকংগ্রেসীর চোখে মহাত্মা গান্ধী ৭০২ মনুষ্যত্বের উন্মেষে-বিকাশে রবীন্দ্রসাহিত্যের বিকল্প নেই ৭০৫ মানুষ বঙ্কিমচন্দ্র ও লেখক বঙ্কিমচন্দ্র ৭১২ মানববাদী শোষণমুক্তির সংগ্রামী লেখক আসহাবউদ্দীন আহমদ ৭১৮

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাগতিক
চেতনার বিচিত্র প্রসূন

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাম্প্রদায়িকতা ও দাঙ্গাবাজি একার্থক ও একাত্মক নয়

কৌম, গোত্র, গোষ্ঠী, জ্ঞাতি, জাত, জাতি, সম্প্রদায় প্রভৃতি একালে লঘু-গুরুভাবে গুণে-মানে-মাপে-মাত্রায় আক্ষরিকভাবে কিংবা তাৎপর্যে অর্থান্তর লাভ করেছে। স্থানিক, কালিক, শাস্ত্রিক, রাষ্ট্রিক বৃত্তিক প্রয়োজনে সভ্যতা-সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের ধারায় এবং অজ্ঞ লোকের অস্পষ্ট ধারণার প্রভাবে অর্থের, অভিধার, পরিভাষার, প্রতিশব্দের ও তাৎপর্যের পরিবর্তন ভাষায় ঘটেই থাকে। এ এক প্রকার অপ্রতিরোধ্য বিবর্তন বা পরিবর্তন। প্রায় প্রবহমান জগতের সঙ্গেই প্রচল ভাষার শব্দের অভিধা ও তাৎপর্য লঘু-গুরু মাত্রায় পরিবর্তিত হয়। সাধারণভাবে একে বিকৃতিই বলা উচিত, কারণ এ পরিবর্তন যতটা ভাব প্রকাশের প্রয়োজনে ঘটে, তার চেয়ে বেশি ঘটে বক্তা-শ্রোতার অজ্ঞতার দরুনই।

আমাদের এখানে আলোচ্য তিনটে শব্দ : জাত, জাতি ও সম্প্রদায়। এগুলো বহুকাল ধরে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সে-কারণে জনমনে অজ্ঞ বিজ্ঞ নির্বিশেষে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে, করছে। যেমন জাত মানে বর্ণ, শ্রেণী, জাতি, জন্মগত বা বংশগত বা বৃত্তিগত পরিচয়, ধর্মবিশ্বাসগত দল। জাতি-প্রকার, শ্রেণী, প্রজাতি, ধর্মমতাবলম্বী, প্রকৃতি বা প্রবৃত্তিগত স্বাতন্ত্র্য বা প্রকার ভেদ, বর্ণ, race, প্রজাতি, বর্ণগত স্বাতন্ত্র্য নির্দেশক, লিঙ্গ নির্দেশক পুরুষজাতি-নারী জাতি, এবং একালে দৈশিক-রাষ্ট্রিক জাতি সর্বপ্রকার পার্থক্য সত্ত্বেও অভিন্ন রাষ্ট্রবাসী নাগরিক অর্থে প্রযুক্ত। আর সম্প্রদায় হচ্ছে দল, সমাজ, সহমতবাদী দল, গোষ্ঠী, সঙ্ঘ, ভাষিক সম্পদায় [উর্দুওলা], দৈশিক সম্প্রদায় [ইরানি], ব্যবসায়িক সম্প্রদায় [মারোয়াড়ী, খোজা] বৃত্তিজীবী সম্প্রদায় [জেলে সম্প্রদায়]।

অতএব, উক্ত তিনটে শব্দ কখনো একক সুনির্দিষ্ট অভিধায় প্রযুক্ত হয় না, তবু এতোকাল এসব কৌম, গোত্র, গোষ্ঠী, দল, সমাজ, সঙ্ঘ, সম্প্রদায়, জাত, বর্ণ, ধর্ম, জাতি প্রভৃতির অভিধাগত বিভিন্ন প্রয়োগ, তাৎপর্যগত পার্থক্য তেমন কারো মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়নি।

বিশ শতকের প্রথম দুই দশকেও আমাদের দেশে হিন্দু জাতি, মুসলিম জাতি ও খ্রীস্টান জাতি, এমনকি ব্রিটিশ, ফরাসী, রুশ–এ দৈশিক–রাষ্ট্রিক–ভাষিক জাতিই চালু ছিল আমাদের চিন্তায়-কথায়-লেখায়। এমনি জাত-বর্ণ-ধর্ম-দেশ-পেশা-ভাষাগত পার্থক্য বা স্বাতন্ত্র্য চেতনা ছিল দৃঢ়মূল। জেলে জাতি, মুচি জাতি বলাও ছিল না অশুদ্ধ প্রয়োগ।

বিশশতকের তৃতীয় দশক থেকে রাজনীতিক ঐক্য লক্ষ্যে দৈশিক বা রাষ্ট্রিক জাতি-চেতনা দানের সচেতন প্রয়াস পায় এ দেশে কংগ্রেস। য়ুরোপে তার অনেক আগে থেকেই ভাষিক ও রাষ্ট্রিক জাতি চেতনা দৃঢ়মূল হয়ে ভাষিক জাতিচেতনা ভিত্তিক Mono-national State গুলো গড়ে উঠেছিল-উঠছিল। ফলে রাজনীতিক অভিধায় ও তাৎপর্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পূর্বে 'জাতি' নামে জাত-জন্ম-ধর্ম-ভাষা-নিবাস-পেশার স্বাতন্ত্র্য বা পার্থক্য নির্দেশক শব্দ প্রচলিত ছিল, তার স্থলে সম্প্রদায়, গোত্র, গোষ্ঠী, সমাজ, দল প্রভৃতি ব্যবহৃত হতে থাকে। ফলে তৃতীয়-চতুর্থ দশক থেকে হিন্দু, খ্রীস্টান, মুসলিমরা আর কংগ্রেসী রাজনীতিকদের চোখে জাতি রইল না, হয়ে গেল হিন্দু, মুসলিম ও খ্রীস্টান সম্প্রদায়।

তখন থেকেই জাত-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-নিবাস-পেশা প্রভৃতির পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্য নির্দেশক জাতি অভিধাচ্যুত হয়ে জাত, বর্ণ, বর্গ, সমাজ এমনকি সম্প্রদায় বা গোত্র-গোষ্ঠী-কওম-শ্রেণী কিংবা বিভিন্ন নামের বৃত্তিজীবী রূপে নিদেশিত হতে থাকে। রাজনীতিক চেতনার প্রসারে ও প্রভাবে এখন সম্প্রদায় ও সাম্প্রদায়িকতা অর্থান্তর লাভ করে নতুন অভিধা পেয়েছে। আগে যা ছিল জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-নিবাস-পেশার পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্য নির্দেশক নিত্য উচ্চারিত নির্দোষ শব্দ বা পরিভাষা, তা-ই এখন দৈশিক-রাষ্ট্রিক ঐক্য-সংহতির প্রয়োজনে জাতি অভিধাপ্রসূত 'জাতীয়তাবোধ' অঙ্গীকৃত হওয়ায় জাত-পাত-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-নিবাস-বৃত্তির স্বাতন্ত্র্য নির্দেশক শ্রেণী,সমজ, সঙ্ঘ, দল, বৃত্তিজী অপ্রচল হয়নি। তবু সাম্প্রদায়িকতা এখন নতুন অভিধায় স্বধর্মের, স্ব-ভাষার, স্ব-অঞ্চলের, স্ববৃত্তি-বেসাতের ভিন্ন অন্য ধর্মের, ভাষার, অঞ্চলের, বৃত্তির লোকের প্রতি দ্বেষণার অভিধা লাভ করছে। এবং একে আর স্বাতন্ত্র্য বা পার্থক্য চেতনা বলে গ্রাহ্য করা হয় না, দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-সংঘাতপ্রসূ বলেই অভিহিত করা হয়। সাম্প্রদায়িকতা এখন দাঙ্গাবাজ ও দাঙ্গাপ্রসূ কাড়া-মাড়া-হানার প্ররোচক, উত্তেজক ও প্রণোদক, বিভেদ-বিদ্বেষ-বিবাদ স্রষ্টা মাত্র। দেশ-কাল-জাত-জন্ম-বর্ণ-ভাষা-নিবাস-পেশা-আঁধা-কানা-খোঁড়া-পণ্ডিত-মূর্খ নির্বিশেষে মানুষকে কেবল মানুষ হিসেবে গ্রহণ-বরণ করতে হলে ব্যক্তিকে নিরীশ্বর-নাস্তিক-সামাজিক সাম্য ও আর্থিক সাম্যবাদী হতে হবে। হতে হয় মানবপ্রেমী মানবসেবী প্রমূর্ত মানবতা ও মানববাদী। আস্তিক মানুষে জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-নিবাস-পেশার শ্রেষ্ঠত্ব কিংবা হীনতাবোধ থাকেই, থাকবেই। তেমন মানুষ কখনো পার্থক্যবোধ, স্বাতন্ত্র্যচেতনা, অতীতের ও ঐতিহ্যের গৌরব গর্ববোধ কিংবা হীনম্মন্যতা মুক্ত হতেই পারে না। কারণ ওই পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্য চেতনাই তার জগৎ-জিজ্ঞাসার ও জীবন-ভাবনার উৎস ও ভিত্তি। তাই সেশ্বর-আস্তিক যতো বড়ো জ্ঞানী-গুণী-মনীষী-মনস্বী হোন না কেন, ওই স্বাতন্ত্র্যচেতনাই, ওই উত্তম্মন্যতাই কিংবা হীনম্মন্যতাই তাঁকে অন্তরে সাম্প্রদায়িক রাখবেই।

কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা মানে দাঙ্গাবাজি নয়— এ কথাটি জানতে, বুঝতে ও মানতে হবে। দাঙ্গা নিতান্ত সাম্প্রদায়িকতা প্রসূত নয়। দাঙ্গা বাধায় রজানীতিকরা, সরকার, বেণেরা স্ব-স্ব প্রয়োজনে ও শ্রেণীস্বার্থে প্রতিযোগী-প্রতিদ্বন্দ্বীদের কাবু বা বিনাশ করতে।

ওরা দাঙ্গায় অংশ নেয় না, মিথ্যা ঘটনার ও রটনার আশ্রয় নিয়ে উত্তেজনা ও প্ররোচনা দিয়ে স্বদলের, স্বধর্মের, স্ববর্ণের, স্ব-শ্রেণীর সম ও সহস্বার্থের লোকদের প্রণোদনা-প্রবর্তনা দিয়ে লেলিয়ে দিয়ে উনজন সম্প্রদায়ের লোকদের হত্যা করিয়ে, তাদের ঘরের জিনিসপত্র লুট করিয়ে পরে নিজেরা উনজনদের অর্থ-সম্পদ, আড়ত, দোকান, কারখানা, বাড়িঘর দখল করে। দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধায় ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে এক বিশেষ চরিত্রের হিংস্রপশুপ্রায় মানব প্রজাতির, মনুষ্য অবয়বের কিছু প্রাণী, তাদের মধ্যে রয়েছে রাজনীতিক নেতা, বড় বেণে, কারখানাদার, আড়তদার প্রভৃতি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইতিহাসের বিকৃতিই সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ডের উৎস

ব্রিটিশ শাসকের ভারত ছাড়ার পরে, উনজন মুসলিমরা অধিজন হিন্দুর শাসন-শোষণ-পীড়ন-পোষণ-বঞ্চনার আশঙ্কায় মুসলিমদের জন্যে পৃথক সার্বভৌম রাষ্ট্রে দাবি করল। ব্রিটিশ ভারত বিভক্ত হল স্বাধীনতা প্রাপ্তির মুহূর্তে। কিন্তু দাঙ্গা-হাঙ্গামা-হত্যা লুট সত্ত্বেও বিভক্ত ভারতের বা রাষ্ট্রের সিন্ধুতে ও পূর্ববঙ্গে হিন্দু এবং ভারতে মুসলিম রয়ে গেল অধিজনের শাসনে, কর্তৃত্বে ও নেতৃত্বে। কাজেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল না মুসলিম লীগের, মুসলমানের। বৃথা ও ব্যর্থ হল সব প্রচেষ্টা। গোটা ভারত একক রাষ্ট্র থাকলে হয়তো দ্বেষ-দ্বন্দ্ব তথা রেষারেষি বা বিবাদ কিংবা ক্ষোভ চলতে থাকত। কিন্তু এখন ভারতে যেমন অধিজনেরা কথায় কথায় উনজন [মুসলিম ও অচ্ছ্যুত] হত্যায় মেতে ওঠে, তা হত না। কারণ একস্থানে মুসলিম উনজন হলেও পাশে কোথাও থাকত অধিজন। এক গাঁয়ে হিন্দু বেশি হলে তার পাশের গাঁয়ে হয়তো মুসলিম বেশি থাকত। এভাবে ভারসাম্য রক্ষিত হত। যা এখন অধিজনের সরকারের শাসনে অকেজো।

বাঙলাদেশে ১৯৬৪ সনের পরে দাঙ্গা তথা হিন্দুহত্যা ঘটেনি একটিও। তবে উনজনের অসহায়তাজাত মানসিক অস্বস্তি, হীনম্মন্যতা, জান-মাল-গর্দান সম্বন্ধে অনিরাপত্তা অনিশ্চয়তা জেগেই থাকে দুনিয়ার সর্বত্র। সরকার গণতান্ত্রিক হলেই এ আশঙ্কা ও হীনম্মন্যতা ঘোচে না কারণ সংখ্যাগুরু জনগণের আচরণে থাকে বিচিত্র মনের, মতলবের ও চরিত্রের এবং শিক্ষা-বুদ্ধি-যুক্তি-বিবেক-বিবেচনার তারতম্যপ্রসূত পার্থক্য। তবু এখানে সাম্প্রদায়িকতাও রয়েছে মনের কোণে, আচরণে বীভৎসভাবে প্রকট নয়। আভাস আছে, অভিব্যক্তি নেই। হিন্দুরাও তেমন ভয়ে ভয়ে থাকে না, কারণ পশ্চিমবঙ্গে, ত্রিপুরায় ও আসমে একটা বিকল্প ব্যবস্থা এদের অনেকেরই রয়েছে, আত্মীয়-স্বজনতো আছেই, আসন্ন ও আপন্ন বিপদে মালের ক্ষতি এড়ানো না গেলেও জানের ক্ষতি এড়ানো কিংবা সামান্যতে সীমিত রাখা যাবে—এমন একটা বৌদ্ধিক ও যৌক্তিক বিশ্বাস-ভরসা তাদের রয়েছে।

কিন্তু পূর্ব পাঞ্জাব পার হতে হয় বলে ভারতের মুসলিমরা পাকিস্তানে পালাবার সুযোগ পায় না। এবং ১৯৪৭ সনের অনেক পরেও পশ্চিমবঙ্গের নিঃস্ব নিরক্ষর দরিদ্র জমি-নির্ভর মুসলিমরা পূর্ববঙ্গে এসে বাস করার সুযোগ পায়নি শিক্ষিত চাকুরে বিদ্যা ও বিত্তবান হিন্দুর মতো। আজো দাঙ্গাকালে অনাত্মীয়ের অপরিচিত বাঙলাদেশে নির্ধন মুসলিম আশ্রিত হতে পারে না। বরং এখানকার নিঃস্ব বেকার মুসলিম আসামে কোচবিহারে কাজের সন্ধানে অনুপ্রবেশ করে ও নিবাসিত হয় বলে অনেক ভারতীয়ের ধারণা।

বাঙলাদেশে-পাকিস্তানে দাঙ্গা নামে হিন্দুহত্যা ঘটে না। কিন্তু ভারতের কোন না কোন অঞ্চলে, রাজ্যে রোজ দুঃচারটা দাঙ্গা বাধে। অবশ্য সরকার এ ক্ষেত্রে সদা-সচেতন বলে এসব দাঙ্গা বা হননক্রিয়া অচিরে বদ্ধ হয়, বিস্তার লাভ করে না। কিন্তু হিন্দু পুলিশ দাঙ্গাকালে মুসলিম হননে কখনো কখনো উৎসাহী হয়ে ওঠে। প্রমাণ মিরাটের এক গাঁয়ের এবং ভাগলপুরের হত্যাকাণ্ড। ১৯৬৪ সনে উড়িষ্যার রায়েরকেল্লার কলকারখানায় এমনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নৃশংস হত্যাকাণ্ড চলেছিল। আর ১৯৪৭ থেকে ১৯৫০ সনের উনজন হত্যার একটা ভিন্ন ব্যাখ্যা রয়েছে বলে তা এখানে উল্লেখ্য বা আলোচ্য নয়।

আমি সারণি যোগে হত্যার একটি পরিসংখ্যান উদ্ধৃত করছি সরকারের সুদৃঢ় সুব্যবস্থা সত্ত্বেও রাজনীতিকরা উসকানি উত্তেজনা প্ররোচনা দিয়ে দাঙ্গা বাধায়। তারা গুণ্ডা মস্তান খুনী ও ধনলিপ্সু নিঃস্ব দুস্থদের গণহত্যায় ধনলুটে প্রলুব্ধ করে এগিয়ে দিয়ে লেলিয়ে দিয়ে নিরাপদ দূরত্বে থেকে মজা দেখে, পরে নিহতদের জমিজমা-ব্যবসাবাণিজ্য-কলকারখানা স্বল্প মূল্যে নামমাত্র দামে সরকারী অনুমোদন ক্রমে ভোগ দখল করে।

মৌলবাদের উন্মেষ, প্রচার ও প্রসার ঘটিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার চেলা রাষ্ট্রগুলো আর্থিক মদদ, দার্শনিক চেতনা, প্রায়োগিক প্রয়োজন, নগদ লাভ এবং পারত্রিক কল্যাণ প্রভৃতি দিয়ে প্রলুব্ধ করে প্রেরণা বা প্রতর্বনা, প্ররোজনা-প্রণোদনা দিয়ে। মৌলবাদ এখন কোন বিশেষ ধর্ম বা মত সম্প্রদায়ে নিবদ্ধ নেই। মুসলিম মৌলবাদ, খ্রীস্টান মৌলবাদ, বৌদ্ধমৌলবাদ এবং হিন্দু মৌলবাদ দুনিয়ার সবত্র প্রসারমুখী ও প্রবল। কারণ তারা সাম্রাজ্যবাদীদের অর্থে-পরামর্শে, প্রত্যক্ষ প্ররোচনায়, প্রবর্তনায় ও সাহায্যে সহায়তায় পুষ্ট ও ঋদ্ধ।

নেটাল-মরিসাস-নেপাল-ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশেও হিন্দু থাকলেও ভারতই হিন্দুনিবাস। তবু মৌলবাদীরা 'বিশ্ব হিন্দু পরিষদ' গঠন করেছে। এবং তাদেরও স্বপ্ন, সাধ ও দাবি হচ্ছে হিন্দুরাষ্ট্র করা ভারতকে। কার্যত যদিও ভারত হিন্দুরাষ্ট্রই। তবু ভিন্ন এলাকার, গোত্রের, গোষ্ঠীর, ভাষার, ধর্মের ও সংস্কৃতির প্রান্তিক রাজ্যগুলোকে ভারতভুক্ত রাখার জন্যে তথাকথিত সেক্যুলার রাষ্ট্র ঘোষিত হয়েছে। অন্য সব ধর্মগুলো তো 'হিন্দু' নামের আবরণে ও আভরণে সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলরেও ভিন্ন জাতিসত্তা হারিয়েছে। কিন্তু শিখরা হিন্দুর ঘনিষ্ট হয়েও স্বতন্ত্র জাতিসত্তা রক্ষায় সচেতন ও সতর্ক। আর কাশ্মীরের মুসলিম, মিজোরামের, মেঘালয়ের, অরুণাচলের, মণিপুরের আসামের ও ত্রিপুরার নানা গোত্র-গোষ্ঠী রক্তে-বর্ণে-নিবাসে-ভাষায়-ধর্মে-বিশ্বাসে-সংস্কারে-সংস্কৃতিতে-আচারে-আচরণে জীবনযাত্রার প্রথাপদ্ধতিতে কখনো ভারতীয় ছিল না, এখনো নয়, কেবল ব্রিটিশ শাসিত রূপে অর্থাৎ অভিন্ন শাসনে থাকার ফলেই ভারতীয় এ প্রাশাসনিক নামে অভিহিত মাত্র। যেমন এক সময়ে সিঙ্গাপুর মালয় বার্মা শ্রীলঙ্কাও ছিল ব্রিটিশ ভারত নামে পরিচিত।

মৌলবাদীরা 'হিন্দুরাষ্ট্র' গড়তে চায় বটে, কিন্তু এ সোনার পাথরবাটির মতোই অসম্ভব। কেননা, হিন্দুদের কোন একক উপাস্য নেই, নেই একক শাস্ত্র, অর্থাৎ নীতিনিয়মও নয় অভিন্ন। কাজেই হিন্দুরাষ্ট্রে সাম্প্রদায়িকতা বিবিধ ও বিচিত্রভাবে জটিলতর সংকট-সমস্যা সৃষ্টি করবে, যেমন মুসলিম রাষ্ট্রে করেছে।

এক উপাস্যেরই কেবল ধর্মরাষ্ট্র হতে পারে। কিন্তু পৃথিবীতে একক ধর্মমতের মানুষের নিবাস ও রাষ্ট্র থাকা এ যন্ত্রনির্ভর জীবনে ও জগতে সম্ভব নয়। পৃথিবীকে বিজ্ঞান-প্রকৌশল-প্রযুক্তি অভিন্ন জীবনাচারে, জগৎ-চেতনায় ও জীবন-ভাবনায় অভ্যস্ত করছে। ভিন্নতা ও বৈচিত্র্য এবং জাতীয় আঞ্চলিক সংস্কৃতি ক্রমে এবং অচিরে বিলুপ্ত হবেই। এর মধ্যেই পোশাকে, আসবাবে, তৈজসে অস্ত্রে ও খাদ্যে এবং চিকিৎসা বিদ্যায়, যন্ত্রে, প্রকৌশলে-প্রযুক্তিতে অভিন্ন হয়ে উঠেছে শহুরে শিক্ষিত জনেরা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেশদখলের সাম্রাজ্যবাদ অবসিত বটে। কিন্তু একাল হচ্ছে আর্থিক সাম্রাজ্যবাদের। লগ্নিপুঁজি, বাণিজ্যপুঁজি ও শিল্পপুঁজি বিনিয়োগের, গরীব দেশের সম্পদ লুটের এবং গরীব দেশকে ঋণ-দান-ত্রাণ-কৃপা-করুণা-দয়া-দাক্ষিণ্যে তাঁবেদার ও মুৎসুদ্দি করার সাম্রাজ্যবাদ চলছে এখন। রাশিয়া হৃতবল। এখন বাকি রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। উঠতি সাম্রাজ্যবাদী হচ্ছে জাপান-জার্মানী, মওকা পেলে ভারত, চীন, ফ্রান্সও গ্রহণ করবে এ পথ।

যে উদ্দেশ্যে এতো কথা বলছি, এবার সরাসরি সেকথা বলি। ভারতবর্ষের ইংরেজ-লিখিত ইতিহাস divide & rule ভেদনীতি প্রয়োগে সহজ শাসননীতির প্রয়োগের লক্ষ্যে তৈরী। এ বিষবৃক্ষের বীজ এখন ভারতময় গণমনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। কোথাও কোন ব্যক্তিমনে তা সুপ্ত, কোন ব্যক্তিমনে তা গুপ্ত এবং রাজনীতিক মনে তা অঙ্কুরিত। প্রয়োগ-প্রয়োজনে তা বৃক্ষরূপ প্রাপ্ত এবং ফলপ্রসূ হয়।

'বাবরি মসজিদ-রামজন্মভূমি' বিবাদের গোড়ায় রয়েছে ইংরেজের দেয়া হিন্দুমনের বদ্ধমূল ধারণা। তা হচ্ছে তুর্কী-মুঘলরা জোর করে হিন্দুদের মুসলিম করেছে এবং হিন্দুর মন্দির ভেঙে মসজিদ করেছে। এ ক্ষেত্রে হিন্দুরা আজো জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি প্রয়োগে সত্যমিথ্যা যাচাই করে না। তাই হিন্দুমনের ক্ষোভ, ক্রোধ, আবেগ-উত্তেজনা প্রজন্মান্তরেও থামে না বরং রাজনীতিক চেতনা বৃদ্ধির এবং মতলবের প্রসারের ফলে তা প্রতিপ্রজন্মে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এ বিষয়ে এতকাল পরে ঘটনা ও রটনাজাত সত্য, তথ্য, সাক্ষ্য, প্রমাণ দলিল মিলবে না-তাই যৌক্তিক, বৌদ্ধিক ও আনুমানিক তত্ত্ব ও তথ্য বিবেচনার জন্যে পেশ করার চেষ্টা করছি।

১. তুর্কী মুঘল গাঁয়ে গাঁয়ে হিন্দুদের জোর করে দীক্ষিত করতে যায়নি, তাই ষোল সতেরো আঠারো শতক অবধি মুলতানের [মুলতান অবধি ইরান, গ্রীস শাসনে ছিল বলে তাতে ব্রাহ্মণ্য প্রভাব প্রবল ছিল না। তাই ওরা সহজেই ইসলাম বরণ করে] পূর্বে দক্ষিণে কোথাও দেশজ মুসলিম সংখ্যাগুরু ছিল না, আর রাজধানী শহরগুলোতে চিরকালই তথা ছয়শ বছর ধরেই ছিল হিন্দুরাই সংখ্যাগুরু। তুর্কী-মুঘল আমলে আরব-ইরান-মধ্যএশিয়া থেকে লোক এসে [একালের পশ্চিম এশিয়ার মতো] কাজ করত, আবার ফিরেও যেত। এ জন্যেই বৌদ্ধ-হিন্দু থেকে দীক্ষিত নিঃস্ব দুস্থ অজ্ঞ অনক্ষর মুসলিমরা সংখ্যায় যেমন কম ছিল, তেমনি ছিল গাঁয়ের বর্ণহিন্দু জমিদার-মহাজন-দোকানদার-বৈদ্য-কায়স্থ-ধনী-ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণের শাসনের ও শোষণের হুকুম হুমকির ও অবজ্ঞার পাত্র। [বিপ্রদাস প্রমুখের 'জুলহাপাড়া' বর্ণনা দ্রষ্টব্য]

আজো বর্ণহিন্দুরা গাঁয়ের মুসলিমদের নিঃস্ব, অজ্ঞ ও সংস্কৃতিহীন শাসনপাত্র রূপে শূদ্রদের মতোই অজজ্ঞার চোখে দেখে। আর আজো তুর্কী-মুঘল আমলের শাসক-প্রশাসকের পদবী হিন্দুরাই বহন করে, দেশজ মুসরিমরা নয়, কারণ তাঁদের সাক্ষরতা ছিল বিরল।

২. তুর্কী-মুঘলরা শাসন-শোষণ করতে এসেছিল, হিন্দুর ধর্ম নাশ করে তাদের বিরূপ করে ছয়শ বছর রাজত্ব করা সম্ভব হত না তাদের পক্ষে। ইতিহাসে দেখা যাচ্ছে রাজকার্যে হিন্দু নিয়োগে আওরঙজেব আকবরের চেয়েও উদার ছিলেন। তাঁর সময়ে শতে প্রায় তেত্রিশভাগ পদস্থ হিন্দু চাকুরে ছিল। বস্তুত হিন্দুর দেশে বিদেশী বিজাতি বিভাষী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিধর্মী স্বল্পসংখ্যক [ব্রিটিশের মতোই] তুর্কী-মুঘল হিন্দুর সাহায্য সহায়তা সহযোগিতা ছাড়া দেশ শাসন করতেই পারত না। উত্তর ভারতে ও দাক্ষিণাত্যে মুসলিম শাসিত রাজধানীতে এবং গাঁয়ে আজো মুসলিম সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য। আর দীক্ষিত দেশজ নিম্নবর্ণের, বর্গের ও বিত্তের তুচ্ছ পেশাজীবীদের সঙ্গে তুর্কী-মুঘল শাসক গোষ্ঠীর কোন সামাজিক-ধার্মিক-বৈবাহিক-সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ-সম্পর্ক-পরিচয়ই যে ছিল না, তার প্রমাণ গৌড়-মালদাহ-রাজশাহী-দিনাজপুর-রঙপুরের দেশজ মুসলিমরা আজো ইসলামি নাম ও সংস্কৃতি রিক্ত। ওরা এ সেদিনও বাউল ও হিন্দু আচারে প্রভাবিত ছিল। চট্টগ্রাম থেকে বিহার অবধি ওয়াহাবী-ফরায়েজী আন্দোলনে ও প্রচার-প্রচারণায় এদের মুসলমান করতে চেষ্টা হয়েছিল। [খন্দকার নসরুল্লাহর শরীয়তনামা দ্রষ্টব্য] বাউলরা আজো বলতে গেলে বৌদ্ধ মহাযানী বজ্রীকুলেরই ধারা বজায় রেখেছে মুসলিম নামের আড়ালে ও আবরণে।

৩. সব মানুষ কখনো নাস্তিক, কম্যুনিষ্ট, নিরীশ্বর হয়ে আঁধা-খোড়া-কানা মানুষের সাথে ইহজাগতিক জীবনক্ষেত্রে রাষ্ট্রিক জীবনে সম ও সহস্বার্থে সংযমে সহিষ্ণুতায় সহযোগিতায় সহবস্থানে রাজি হবে না। অতএব আস্তিক মানুষ স্ব-স্ব পুরোনো শাস্ত্র, নীতিনিয়ম, আচারিক ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে চাইবে। তা সত্ত্বেও অবশ্য সরকার যদি ধর্মমতকে ও ধর্মাচারকে নিতান্ত ব্যক্তিগত জীবনাচার বলে মেনে নেয়, তার সামাজিক গুরুত্ব অস্বীকার করে, তার পালা পার্বণে উদাসীন থাকে, তাহলে একটা অভিন্ন ঐহিক বা ইহজাগতিক তথা দৈশিক, ভাষিক, দেশাচার ও লোকাচারভিত্তিক রাষ্ট্রিক সংস্কৃতি গড়ে উঠতে পারে এবং তা হবে শাস্ত্রিক, গোত্রিক, গোষ্ঠীক, ঐতিহ্যবিহনীন নির্বর্ণ সংস্কৃতি, যাতে থাকবে সবার সমাধিকার। যেমন চাঁদে মুসলমানের, ত্রিশূলে হিন্দুর, ধর্মচক্রে বৌদ্ধের এবং ক্রুশে খ্রীস্টানের ঐতিহ্য রয়েছে। কাজেই এগুলো রাষ্ট্রে ও সরকারে স্বীকৃতি পাবে না।

মানুষ নাস্তিক হবে না, কম্যুনিষ্ট হবে না, কিন্তু সরকার মাত্রই সেক্যুলার হতে পারে এবং গণতন্ত্র আন্তরিকভাবে অঙ্গীকার করলে সরকারকে সেক্যুলার হতেই হবে। রাষ্ট্রে কেবল পরিচয় ও যোগ্যতা নির্বিশেষে মানুষ থাকবে এবং তারা সমস্বার্থে ও স্বাধিকারে নাগরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবে, যোগ্যতানুসারে হবে পেশাজীবী।

৪. আমরা জানি, সেকালে ঝড়-খরা-বন্যা-ভুচাল-মহামারী হলে লোকে বাড়িঘর ছেড়ে অন্যত্র চলে যেত। রাজস্ব বা সামন্ত পীড়নেও পালাত। এভাবে পাকা মন্দির মসজিদ পরিত্যক্ত হত। তাছাড়া পাথুরে মন্দির-মসজিদ হলে স্থানীয় লোক অর্থাভাবে মেরামত করতে পারত না বলে এক সময়ে সেগুলো জীর্ণ হয়ে ভেঙে পড়ত। হিন্দুদের হাজারো বিভিন্ন প্রকারের গণনায় দিনক্ষণ-তিথি-নক্ষত্র-পবিত্র-অপবিত্র পয়া-অপয়া বিশ্বাসে সংস্কারে নিয়ন্ত্রিত জীবন। কাজেই ভাঙা মসজিদের বা মন্দিরের পাথরের উপযোগ নেই তাদের কাছে। কিন্তু মুসলিমদের সে-সংস্কার ছিল না বলে ওরা পরিত্যক্ত বা জীর্ণ মন্দিরের পাথর উত্তর ভারতের অনেক মসজিদে ব্যবহার করেছে। পূর্বেই বলেছি তুর্কী-মুঘলরা শাসন প্রশাসন চালিয়েছে হিন্দু দিয়েই, তাছাড়া গোটা ভারত কখনো তুর্কী-মুঘল অধিকারেও ছিল না। হিন্দু প্রজা রইল, তার পেশা রইল, তার পারিবারিক জীবন রইল, সামাজিক জীবন রইল, তার শাস্ত্র ও শাস্ত্রাচার রইল, লক্ষ লক্ষ ঘরে গৃহ দেবতা রইল, গাঁয়ে-গঞ্জে-শহুরে-বন্দরে মন্দিরও রইল। কয়েকটি মসজিদে কয়েক টুকরো মূর্তি অঙ্কিত পাথর দেখেই কি বলা যায় যে তুর্কী-মুঘলরা মন্দির ভেঙেছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হ্যাঁ, মন্দিরও ওরা ভেঙেছে, বিদ্রোহী হিন্দু ধনী-মানী-মহাজন-জমিদার-সামন্তকেও হয় এককভাবে অথবা সবংশে হত্যা অবশ্যই করেছে প্রাশাসনিক প্রয়োজনে, আজো করতে হয়। পাকিস্তানে মসজিদে সৈন্যরা সবুট ঢুকে লোক হত্যা করেছিল। ১৯৭১-এ এরাই রমনা কালীমন্দির ভেঙেছিল। এই সেদিন শিখ স্বর্ণমন্দিরে সবুট সৈন্য প্রবেশ করে নরহত্যা করেছে। রাজারা এমন কাজ করেই। এদের কেউ কেউ মুসলিম হয়ে প্রাণে রক্ষা হয়তো পেয়েছে। যেমন গৌড়ের হোসেন শাহ [১৪৯৩-১৫১৯] উড়িষ্যায় অভিযান কালে মন্দির ভেঙেছেন [চৈতন্যরচিত গ্রন্থ সূত্রে আমরা এখবর পাই] কিন্তু তাঁর রাজ্যে মন্দির ভাঙেননি। অতএব, বৌদ্ধিক ও যৌক্তিক সিদ্ধান্ত করতে হয় যে, হয় মন্দিরে শত্রু ধনরত্ন নিয়ে আশ্রিত হয়েছিল অথবা মূর্তির অলংকার লুটের জন্যে তার মুসলিম সৈন্যরা দেউল দেহারা ভেঙেছে। ইতিহাসে দেখা যায় তুর্কী-মুঘল সম্রাট-শাসক বহু বহু রাজ্য-সামন্তের জান-মাল-গর্দান নিয়েছেন। এতে ঢালাওভাবে হিন্দু নিধন, হিন্দুর ভাঙন এবং বল প্রয়োগে হিন্দুকে ইসলামে দীক্ষিতকরণ প্রমাণিত হয় না।

৫. আগেই বলেছি তুর্কী-মুঘল রাজধানীতেও হিন্দুরাই ছিল সংখ্যাগুরু। জোর করে কোন গাঁয়ের, গঞ্জের বা অঞ্চলের সব হিন্দুকে একজন তুর্কী-মুঘল শাসক-প্রশাসক একদিনেই মুসলিম বানিয়েছে এমন কিসসাও কোন ইতিবৃত্ত গ্রন্থে লেখা নেই, এমন গল্পও কেউ কোথাও আজ অবধি শুনেছেন বলে লেখেননি। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে মতিবিবির পিতার এবং দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসে বিদ্যাদিগ্গজের ইসলাম গ্রহণের বয়ান রয়েছে। দুটো কারণই ভিন্ন, জোর জুলুমের নয়। আস্তিক মানুষ স্বধর্ম ও স্বশাস্ত্র ব্যতীত অন্যগুলোকে ভুল বা মিথ্যা বলে জানে। কাজেই অপর ধর্মের মন্দির-মসজিদ-গির্জা-মঠ-বিহার-সিনাগগ ভাঙতে, ধর্মগ্রন্থ পোড়াতে ওদের কোন অপকর্ম বলে মনে হয় না। এজন্যে বিজ্ঞজনের ক্ষুব্ধ-ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত নয়। আজকাল কিছু কিছু সত্য ও তথ্য বের হচ্ছে নিষ্ঠ গবেষণার ফলে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত যদুনাথ সরকার সম্পাদিত History of Bengal-এ ১১৫ বছরের বিধৃত সুলতানী আমলের ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ের মাত্র তিন/চারজন হিন্দুবিদ্বেষী অসহিষ্ণু সুলতানের নাম মেলে। এদের মোট রাজত্বের পরিসর হচ্ছে মাত্র বিশ বছর। [দ্রষ্টব্য, বিচিত চিন্তা]। কাজেই তুর্কী-মুঘল রাজত্ব মানে হিন্দু নিধনের, পীড়নের, শোষণের, জাতিমারার, ধর্মকাড়ার ইতিবৃত্ত নয়। এখনকার জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-প্রজ্ঞা বিবেক-বিবেচনা সম্পন্ন শিক্ষিত হিন্দুর এসব কিসসাকাহিনী রটনায়-ঘটনায় আস্থা রাখা অসঙ্গত। কুতুবউদ্দীন আইবক থেকে আওরঙ্গজেব, পিটু সুলতান, সিরাজুদ্দৌলা অবধি যে-কারো সম্বন্ধে চালু ঘটনা ও রটনা যুক্তি-বুদ্ধি প্রয়োগে বিশ্লেষণ করলে সত্যের ও তথ্যের যুক্তি-বুদ্ধিগ্রাহ্য রূপ অনুভব-উপলব্ধি করা কঠিন হবে না। তুর্কী-মুঘল শাসকরা এদেশে প্রজন্মক্রমে বাস করেছে, একে স্বদেশ বলেই জেনেছে। কাজেই কালের দুবাই-কাতার প্রবাসীদের মতো অর্থোপার্জন, শোষণ, লুণ্ঠন এবং স্বদেশে প্রেরণ লক্ষ্যে যে ব্রিটিশ বেনিয়া শাসক-প্রশাসক এদেশ আসত আর যেত, তুর্কী-মুঘল শাসক-সামন্তরা তেমন ছিল না। তাই এদের শোষক-পীড়ক-লুটের সম্পদ পাচারকারী বলেও অভিহিত করা যাবে না।

৬. ঈশ্বরের বা স্রষ্টার-ব্রাহ্মের-গডের অস্তিত্ব জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তিযোগে প্রমাণসাধ্য নয়। এ বিশ্বাসের আর অনুভব-উপলব্ধির ও কল্পনার বিষয় মাত্র। কাজেই রামচন্দ্রের অস্তিত্ব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেমন প্রেত-পিশাচ-পরী-ড্রাগন-ভূত-ভগবান-ঈশ্বর-স্রষ্টার মতো বিশ্বাসের জগতের সত্য ও তথ্য, সরযু নদীর তীরস্থ তথা অযোধ্যায় আরো বহু মন্দিরমোহান্তই তেমনি বিশ্বাসবশে তাদের মন্দিরকেই রামজন্মস্থল বলে দাবি করে। সরসু নদী কি চিরকালই এখানে আজকের মতো ছিল, কখনো কি গতি পরিবর্তন করেনি স্বাভাবিকভাবে?

৭. বাবর ১৫২৬ সনে দেশ দখল করেই ১৫২৮ সনে প্রথমেই দিল্লীতে মন্দির না ভেঙে অযোধ্যায় মন্দির ভাঙেন বা ভাঙান কেন তারও তো একটা জবাব চাই। বাবরের সময়ে ভারতে শাসক-প্রশাসক শহুরে শাসনকেন্দ্রে মুসলিমের সখ্যা বেশি ছিল না, আর তখনো সব গাঁয়েরও মুসলিম জনসংখ্যা গুরুত্ব দেয়ার মতো ছিল না। নতুন রাজা হিসেবেও বাবরের মতো ধীর বুদ্ধিমান যোদ্ধার ও অভিযাত্রীর কোথাও মন্দির-মূর্তি ভাঙার কোনও বয়ান নেই। তিনি স্বল্প সংখ্যক মুসলিমের জন্যে মন্দির ভাঙার হুকুম দিয়ে কাঁচা রাজনীতিকের কাজ করেছেন বলে মনে হয় না।

৮. রাজনীতির ক্ষেত্রে ফায়দা লুটার জন্যে রক্তক্ষরা-প্রাণহরা এ খেলা থেকে রাজনীতিকদের বিরত থাকা এবং বিরত রাখা আবশ্যিক। রামশিলাওয়ালারা বাবরি মসজিদ ভাঙছে শোনামাত্রই সরকারী ইঙ্গিতে ও সহযোগিতায় বাঙলাদেশের সর্বত্র হিন্দুর বাড়ি লুট আর মন্দির ভাঙার চেষ্টা হয়েছে। হিন্দুর রক্তপাত হয়নি বটে, হিন্দু অর্থ-সম্পদ হারিয়েছে এবং পাকা বা মাটির মন্দির ভূমিস্মাৎ করার ধৈর্য ছিল না বটে, অজ্ঞ-অনক্ষর-নিঃস্ব-নিরন্ন কুলি-মজুর শ্রেণীর লোক মন্দিরে দু'চার ঘা দিয়েই পুণ্যার্জন করেছে আর বাড়ি লুট করে দু'চারদিন সচ্ছল জীবন ভোগ-উপভোগ করেছে।

উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সৃজনশীল রচনায় তথাকথিত ঐতিহাসিক বিষয় কবিতা-নাটক-গল্প-উপন্যাসকে সাধারণ পাঠক সত্যের ও তথ্যের বয়ান রূপে গ্রহণ করে মনে মনে বিধর্মী-বিজাতি-বিভাষী বিদেশীর প্রতি বিদ্বেষ-বিষ পোষণ করে। দ্বেষণার বীজ এতেও হয় উপ্ত। উপমহাদেশের রাজনীতিকে এ দ্বেষণা গভীর ও ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে, এখনো করে। কাশ্মীররাজ শ্রীহর্ষ ছাড়াও আরো অনেক হিন্দুরাজাও যে ধনরত্ন লোভে হিন্দু ও জৈন মন্দির লুণ্ঠন ও ধ্বংস করেছেন, তার অন্য এক প্রমাণ পারমার রাজা প্রভাত বর্মন (১১৯৩-১২১০ খ্রীঃ)। তিনি গুজরাটে দাভয়ে ও ক্যাম্বে বহু জৈন মন্দির ধ্বংস করেছিলেন। দুনিয়ার ইতিহাসে বিধর্মীর সিনাগগ-গির্জা-মসজিদ-মন্দির-মঠ-বিহার ধ্বংস করা কোন বিরল ঘটনা নয়। রাজপুত মায়ের সন্তান শাহজাহান হিন্দু-পীড়ন করেছিলেন, হাতী দিয়ে দলিত করেছিলেন মসজিদের পথে হত্যে দিয়ে পড়ে-থাকা কোন বিষয়ে প্রতিকার প্রার্থী কিছু হিন্দু প্রজাকে। বারাণসীতে একটি মন্দির ভাঙাতে হয়েছিল আওরঙজেবকে; কিন্তু আওরঙজেব বহু মন্দির নির্মাণে ও মেরামতে জমি ও অর্থ দানও করেছিলেন। তাঁর সময়েই শতে তেত্রিশ জন পদস্থ হিন্দু কর্মচারী নিযুক্ত ছিল। আর কোন বাদশাহ হিন্দুদের কখনো দেননি এ সুযোগ ও সুবিধা।

আর অন্যূন পাঁচ বছরের বাদশাহ সেরশাহ ছিলেন লোকবন্দ্য, গণনন্দিত জনসেবক; অনন্য, অসামান্য ও অসাধারণ মনস্বী-মনীষী এবং নিরপেক্ষ ও জাত-ধর্ম-বর্ণ-অঞ্চল-ভাষা-নিবাস-সম্পদ নির্বিশেষে সমদৃষ্টি সম্পন্ন ন্যায়পরায়ণ দূরদর্শী বিজ্ঞ সুশাসক আর রাজ্যের তথা প্রজার কল্যাণকামী, নতুনতর নীতিনিয়ম, উন্নততর প্রথা-পদ্ধতির প্রবর্তক। পৃথিবীর ইতিহাসে তিনিই সম্ভবত প্রথম নরপতি যিনি নিজেকে Servant of the Pepole

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তথা মানুষের বা প্রজার খাদেম বা সেবক বলে ঘোষণা করে মানবিকতার, মনুষ্যত্বের ও মানবতার আদর্শ হয়ে রয়েছেন আজ অবধি।

জিজিয়া সম্বন্ধেও লোকের ভুল ধারণা রয়েছে। নারী, শিশু, বৃদ্ধ, দরিদ্র, সৈনিক, ব্রহ্মণ, পঙ্গু, ভিক্ষাজীবী ও নিঃস্ব মজুরেরা জিজিয়া মুক্ত ছিল। জিজিয়া বহির্ভারতেও মুসলিম রাজ্যে মুসলিম প্রজা থেকেও আদায় করা হত। ভারতেও ধনী মুসলিমদের জাকাত কর দিতে হত। হিন্দুদের মনের ক্ষোভ-ক্রোধ-বিদ্বেষ প্রশমনের জন্যে এ ক্ষেত্রে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে হিন্দু জমিদারও ব্রিটিশ আমলে দাড়ি-কর বসাত। তীতুমীরের দ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণ এ দাড়ি-করই। হিন্দু জমিদারের এলাকায় হিন্দু-প্রজাগুরু অঞ্চলে আজান উচ্চারণ ও গোহত্যা ছিল নিষিদ্ধ আর মসজিদ নির্মাণও ছিল জমিদারের অনুমতি সাপেক্ষ। সে অনুমতি পাওয়াও সহজসাধ্য ছিল না। ঠাকুর স্টেটেও এসব নীতি-নিয়ম বিরল ছিল না বলে শোনা যায়। তুর্কী-মুঘল সাম্রাজ্য বর্হিভূত ভারতে উনজন মুসলিমরাও গো-বধের ও মসজিদ নির্মাণের অধিকার পায়নি হিন্দু রাজ্যে। আর একটি তথ্য এই যে দক্ষিণ ভারতের এক হিন্দু রাজ্যে নাকি ইহুদী প্রজা থেকে জিজিয়া আদায় করা হত। ব্রিটিশ লিখিত ইতিহাস বর্জন করে স্বাধীনভাবে গবেষণা করলে সত্য ও তথ্য নির্ভর ইতিহাস রচনা করা একালে কঠিন হবে না। আর তাতে ভারতবর্ষের ইতিহাস ভিন্নরূপ লাভ করবে। লোকমনের বিভ্রান্তি ঘুচবে।

AMARBOI.COM

তথ্য নির্দেশ

১৪০০ সনে ভারতে মুসলিম জনসংখ্যা ছিল বত্রিশ লক্ষ। ১৬০০ সালে হল দেড় কোটি। ১৮০০ সালে প্রায় আড়াই কোটি। এ তিন শতকে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ১.৮%, ৯.৮৫% এবং ১৪%। ১৮৮১ সনে ভারতে মুসলিম জনসংখ্যা ছিল ১৯.৭৪% এবং ১৯৪১ সনে বেড়ে হল ২৩.৮১%। অতএব জোর করে ইসলামে গণদীক্ষা একটা বানানো কিস্‌সা বা দুষ্ট-দুর্জনের কুমতলবজাত রটনা, ঘটনা নয়। যা আজ অবধি হিন্দু-মুসলিম সমস্যা রক্তক্ষরা ও প্রাণহরা করে রেখেছে।

উল্লেখ্য যে, মুলতান অবধি পশ্চিম ভারত এবং পূর্ববাঙলার বিশেষ অংশে নির্জিত হিন্দু বৌদ্ধদের ইসলামবরণের কারণ ভিন্ন। সাম্প্রদায়িকতা ও সংস্কৃতি, অশোক চট্টোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ৫৭।

২. ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৮-এর মধ্যে সারা ভারতে রক্তক্ষয়ী দাঙ্গায় অজস্র মানুষ নিহত হয়েছেন এবং যাদের মধ্যে অধিক সংখ্যকই হচ্ছেন মুসলমান।

১৯৫৪ থেকে ১৯৬৬ অব্দি এই বারো বছরে ২০০৭টি দাঙ্গার ঘটনা ঘটেছে, যাতে মারা গেছেন ২৩৪২ জন। আহতের সংখ্যা এর ৩.৫ গুণ। ষাটের দশকে (১৯৬১-৭০) দাঙ্গার ঘটনা ঘটে ৭৯৬৮টি, নিহত হন ৩১৯৫। সত্তরের দশকে (১৯৭১-৮০) দাঙ্গার ঘটনা ঘটে ২৫৭৪টি। নিহতের সংখ্যা ১১৭৬ জন।

১৯৮১ থেকে ১৯৮৭-র সময়ের সীমায় দাঙ্গার ঘটনা ঘটে ৩২২৩টি, নিহতের সংখ্যা ২৯১৮। সরকারী হিসেবেই ১৯৮০ থেকে ১৯৮৮-র মধ্যে দাঙ্গায় নিহতের সংখ্যা ৪০০০ ছাড়িয়ে গিয়েছিল। সারণি মাধ্যমে এক সালওয়ারী হিসেব দেওয়া গেল :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাল	দাঙ্গার সংখ্যা	নিহত হিন্দু	নিহত মুসলমান
১৯৬৮	৩৪৬	২৪	৯৯
১৯৬৯	৫১৯	৬৬	৫৫৮
১৯৭০	৫২১	৬৮	১৭৮
১৯৭১	৩২১	৩৮	৬৫
১৯৭২	২৪০	২১	৪৫
১৯৭৩	২৪২	২৬	৪৫
১৯৭৪	২৪৮	২৬	৬১
১৯৭৫	২০৫	১১	২২
১৯৭৬	১৬৯	২০	১৯
১৯৭৭	১৮৮	১২	২৪
১৯৭৮	২৩০	৫২	৫৭
১৯৭৯	৩০৪	৮০	১৫০
১৯৮০	৪২৭	৮৭	২৭৮
মোট তেরো বছরে ৩৯৬০টি দাঙ্গা নিহত		৫৩১	নিহত ১৬০১

গড়ে ফি বছর দাঙ্গায় নিহত মুসলিমদের সংখ্যা হিন্দুর চেয়ে তিনগুণ বেশি।

তদেব, পৃ: ৫৮-৫৯।

AMARBOI.COM

রাষ্ট্রের সঙ্কট ঃ সমস্যা — সাম্প্রদায়িকতা ও আন্তর্জাতিকতা

আগের দিনে রাজার আয়ের মুখ্য উৎস ছিল ভূমিকর ও পণ্যকর অর্থাৎ ভূমিরাজস্ব ও শুল্ক। তা ছাড়াও নানা প্রকার কর ও আবওয়াব থাকত। তা দিয়েই চলত সামরিক-বেসামরিক প্রাশাসনিক খরচ। ভোগ-উপভোগের বিলাস সামগ্রীর ব্যয়। ভৌগোলিক বা আবস্থানিক দূরত্ব সে-যুগে চিরন্তন বিচ্ছিন্নতার, অপরিচয়ের, অনধিগম্যতার ব্যবধান প্রায় অব্যাহত রাখত। তাই ক্ষুদ্র ও খণ্ড রাজ্যই ছিল বেশি। জমিদার-সামন্তই থাকত অনুগত স্থানিক প্রশাসক। তামা-লোহা আবিষ্কারের আগে বৃহৎ রাজ্য সৃষ্টি সম্ভব হয়নি। ঘোড়ার গতি আর লোহার কাঠিন্যই অর্থাৎ তুরঙ্গগতি এবং প্রাণঘাতী লোহার তীর-বর্শা-বন্দুক-কামানই দূর-দূরান্তের বিস্তৃত অঞ্চল নিয়ে সাম্রাজ্য সৃষ্টি সম্ভব করে। সে সব দিন বহু আগেই অপগত।

ষোলশতকে য়ুরোপে জনসংখ্যা বৃদ্ধি আর দারিদ্র্য মানুষকে বাঁচার এবং স্বজনকে বাঁচাবার তাগিদে ঘরছাড়া করে জ্ঞান-বুদ্ধি, শক্তি-সাহস, সংকল্প-উদ্যম ঋদ্ধ ও উদ্যোগী পুরুষদের। তারা দুনিয়ার কিনারা সন্ধানে বের হল, আবিষ্কার ও জয় করল নানা অজ্ঞাত দেশ, পরিচিতি হল বিচিত্র বর্ণের, ধর্মের, সভ্যতার, সংস্কৃতির, ভাষার কিংবা বুনো-বর্বর আরণ্য মানুষের সঙ্গে। দেখা গেল তারা জ্ঞানে-বুদ্ধিতে-যুক্তিতে-কৌশলে-প্রকৌশলে-ধৈর্যে-অধ্যাবসায়ে-শক্তিতে-সাহসে-নৈপুণ্যে ও আত্মপ্রত্যয়ে আর বাঁচার গরজে অঙ্গীকারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উদ্যমে-উদ্যোগেও প্রবলতর। কাজেই আত্মবিস্তারে ও আত্মপ্রতিষ্ঠায়, বাণিজ্যে ও শাসনে-শোষণে তারা দুনিয়ার সর্বত্র ক্রমে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অপ্রতিযোগী হয়ে উঠল।

এভাবে য়ুরোপ হল অপর চার মহাদেশের মালিক। তাদের আভিযাত্রিক প্রয়াস-প্রযত্ন, তাদের এ সম্পদ সংগ্রহ-সঞ্চয়ে আগ্রহ, তাদের বিত্ত-বেসাতের বিশ্বব্যাপী প্রসারে তাদের মনন-চিন্তনকে, তাদের জগৎচেতনা ও জীবনভাবনাকে, তাদের নীতি-নিয়ম-রীতি-রেওয়াজকে এবং প্রথা-পদ্ধতিকেও অনুশীলনে-পরিশীলনে-পরিবর্তনে-পরিবর্ধনে উৎকর্ষ সাধন করে। এমনকি প্রয়াসে তারা যান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক, তাত্ত্বিক ও তাথ্যিক আবিষ্কারে ও উদ্ভাবনে অনন্য, অসামান্য ও অতুল্য এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। ফলে গোটা দুনিয়ার মানুষ পার্থিব জীবনে প্রাত্যহিক বৈষয়িক ও ব্যবহারিক প্রয়োজনে য়ুরোপের অনুকারক, অনুসারক ও য়ুরোপনির্ভর হয়ে পড়ে। যন্ত্রে-বিজ্ঞানে-প্রকৌশলে-প্রযুক্তিতে নয় কেবল, শিল্পে, সাহিত্যে, দর্শনে, ইতিহাসে, সমাজতত্ত্বে, অর্থবিজ্ঞানে, রাজনীতিতত্ত্বে, দর্শনে, মনোবিজ্ঞানে, রোগ নিরূপণে ও প্রতিষেধক আবিষ্কারে এবং চিকিৎসা পদ্ধতিতে, ভাস্কর্যে-স্থাপত্যে, সঙ্গীতে এক কথায় চৌষট্টিকলায়-কৌশলেও আকাশ-মর্ত্য-পাতাল-পর্বত-সমুদ্রের–বিচিত্র-বিবিধ সর্বপ্রকার জ্ঞান-অভিজ্ঞতা আমরা তাদের কাছেই পাচ্ছি। তাদের কাছে আমাদের ঋণের ও কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

এরাই আবার ষোলশতক থেকে পৃথিবী শোষণ করছে, উপনিবেশ, সাম্রাজ্য, বাণিজ্য প্রভৃতি নানা নীতি-নিয়মের স্থূল-সূক্ষ্ম প্রয়োগে, ব্যবস্থায় ও নামে। একালে চার মহাদেশের ভাগ-বাঁটোয়ারা-বখরা নিয়ে তাদের নিজেদের মধ্যেও নানা অজুহাতে, অনুষঙ্গে, প্রসঙ্গে ও স্বার্থে কাড়াকাড়ি, মারামারি ও হানাহানি কম হয়নি। উপনিবেশ বানানোর, বাড়ানোর ও কাড়ার জন্যেই প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধল। পরিণামে ক্ষয়ক্ষতি এতো বেশি হল যে জমি দখলের, সাম্রাজ্য বিস্তারের উপনিবেশবাদ বর্জিত হল। স্বাধীন হয়ে গেল চার মহাদেশ, আফ্রিকার জঙ্গলরাজ্যগুলোও। অর্থাৎ এরা ভূমিরাজস্ব বা ভূমিকর ছাড়ল, কিন্তু নতুন করে উদ্ভাবন করল আর্থিক সাম্রাজ্যবাদ। লগ্নিপুঁজি, শিল্পপুঁজি ও বাণিজ্যপুঁজি বিনিয়োগের নামে এ এক সূক্ষ্ম-সুনিপুণ পদ্ধতির, অর্থ-শোষণের ও লুণ্ঠনের ব্যবসা শুরু হল। এ পদ্ধতির আবরণ ও আভরণ দু-ই রয়েছে। ডালাস-মার্শাল পরিকল্পনা দিয়ে এ দাসত্ব-আনুগত্য-শোষণ-বাণিজ্য-লুণ্ঠন পদ্ধতি শুরু করে যুদ্ধোত্তর কালে মার্কিন সরকার।

এ আর্থিক সাম্রাজ্যবাদীরা এক অর্থে ছয় প্রতারক লুঠেরা। বন্ধুর বেশে ঋণ-দান-ত্রাণের হস্ত প্রসারিত করে দাতা-ত্রাতা-সেবী হিসেবেই অনুন্নত গরীব দেশে ঢোকে– এন-জিওর ছদ্মসেবা কর্মে-উপচিকীর্ষার মহান ব্রত নিয়ে। সঙ্গে IMF, world Bank এবং নানা বিচিত্র Foundation এবং প্রশিক্ষণ সংস্থা প্রভৃতি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আর্থিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়, বলা চলে, ঝড়-বন্যা-খরা-মারীর কালে ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এমন হিতকামী হিতকারী বন্ধু-মুরুব্বীকে কি আদরে কদরে বরণ না করে পারা যায়? এ এক অদৃশ্য কাঁটাতারের তৈরি খাঁচা। দেশের মানুষের দেহ-মন-প্রাণ-কর্মশক্তি, যুক্তি, বুদ্ধি ক্ষতবিক্ষত করে দেয়ে এক প্রকারের অর্থদানের এনস্তেসিয়া প্রয়োগে, তাই টেরও পাওয়া যায় না। সাহায্যের নামে কোটি কোটি টাকা দেয়া হয় বটে, তবে তা পণ্য, পরামর্শদাতা, প্রকৌশলী-প্রযুক্তিবিদ ও যন্ত্রের দাম-মজুরী-কমিশন হিসেবে ৮০/৯০ শতাংশ ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। ঋণটা ঠিক থাকে, সুদটা আদায় করে। এ এক পাকা জুয়াড়ীর খেল। ফলে গরীব দেশে সারাবছর ধরে সর্বপ্রকার ঋণদান, ত্রাণসেবা পেয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দরিদ্রতর, যন্ত্রণাকাতর, দেহে-মনে-প্রাণে-মননে-বুদ্ধিতে-শক্তিতে-সাহসে-উদ্যমে-উদ্যোগে ক্ষীণ, হীন, বিকৃত, বিভ্রান্ত, দুষ্ট, দুর্জন, দুর্বৃত্ত ও দুষ্কৃতি হতে থাকে। এভাবেই য়ুরোপীয় ও আমিরিকানরা প্রীতি-প্রণয়-আলিঙ্গনে আমাদের অজ্ঞাতেই আমাদের হাড়মাংস গুঁড়ো করে দেয়। আমরা আর কিছুতেই স্বনির্ভর হতে ও স্বয়ম্ভর হতে পারিনে– পঙ্গু হয়ে থাকি অর্থে-বিত্তে দেহে, মনে, অঙ্গীকারে-উদ্যমে ও উদ্যোগে।

আফ্রো-এশিয়া-লাতিন আমেরিকার সর্বত্রই এ হাল। রাশিয়া আজ ডানাভাঙা শকুন, পূর্ব য়ুরোপ বিধ্বস্ত। পশ্চিম য়ুরোপ আজো মার্কিন চাতুরী-চালিয়াতির শিকার, ব্রিটিশ য়ুরোপে কমিশনপ্রাপ্ত মার্কিন দালাল ও সহায়। তাই সাম্প্রদায়িকতা যেমন দৈশিক-রাষ্ট্রিক জাতীয়তাবোধ প্রসারের মুখ্যবাধা, তেমনি তথাকথিত আন্তর্জাতিকতাও জাত বা রাষ্ট্রগুলোর স্বনির্ভরতার ও স্বাধীন বিকাশের বাধা।

রবীন্দ্রনাথ উনিশ শতকের ও বিশ শতকের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবধি উপনিবেশবাদী য়ুরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-সংঘাত দেখে জাতীয়চেতনার ও জাতীয়তাবোধের প্রতি বিরূপ হয়ে উঠেন। জাতীয়তার প্রতি ভীতি ও ঘৃণা তাঁকে মানবতার ধারক-বাহক-প্রচারক হিসেবে বিশেষ বিচলিত করেছিল। এ বিষয়ে তিনি লিখেছেনও অনেকবার। 'আজ বরিষার রূপ হেরি মানবের মাঝে' থেকে 'আজ চারিদিকে নাগিনীরা ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস' 'মানুষ জন্তুর হুঙ্কার দিকে দিকে উঠে বাজি' প্রভৃতি ভীতির ও ঘৃণারই অভিব্যক্তি। তাই তিনি ছিলেন আন্তর্জাতিকতার অনুরাগী ও প্রচারক। সে আন্তর্জাতিকতাও যে ছদ্মনাগিনীর ছল-চাতুরী-ধূর্ততার এক প্রতারণামূলক রূপ তা তিনি কল্পনাও করেননি, জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-নিবাসের স্বাতন্ত্র্য ও ভিন্নস্বার্থচেতনা যেমন দৈশিক-রাষ্ট্রিক-সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবোধের উন্মেষের ও বিকাশের বাধা, সাম্প্রদায়িক দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা-সংঘর্ষ-সংঘাতের উৎস, তেমনি এ ছদ্ম আন্তর্জাতিকতাও আবরণে আভরণে কথার যাদুমন্ত্রে জাতি বা রাষ্ট্রসমূহের স্বনির্ভরতায় স্বয়ম্বরতার, আত্মবিকাশ সাধনের, স্বাধীনতার এবং স্বাধীন চিন্তা-কর্ম উদ্যম-উদ্যোগ-আচরণের পথে দুর্লঙ্ঘ্য দুরতিক্রম্য বাধা। মুগ্ধতার পরিবর্ধক হয়ে তা আচ্ছন্ন রাখে মন-মনন-মনীষা। ফলে অনুন্নত তথা উন্নয়নশীলদেশগুলো থাকে পরাশক্তির মুৎসুদ্দী-সেনানী শাসকের নায়কতান্ত্রিক শাসনে দুষ্ট-দুর্জন-দুর্বৃত্ত-দুষ্কৃতী-দুর্নীতি আকীর্ণ।

স্বাতন্ত্র্য, সম্প্রদায় চেতনা ও রাজনীতিক দাঙ্গা-হাঙ্গামা তত্ত্ব

মানুষ নিজেকে, পরিবারকে, স্বজনকে, নিবাসকে, গ্রামকে, অঞ্চলকে, জেলাকে, দেশকে ভালোবাসে, আপনভাবে আত্মীয়কে, কুটুম্বকে, বন্ধুকে, স্বধর্মীকে, স্বদলের লোককে, স্বমতের মানুষকে, আর ভালোবাসে আশৈশব-আবাল্য মগজধোলাইয়ের আকারে শোনা-জানা-মানা শাস্ত্র, আচার, পালাপার্বণ, ভূত-ভগবান-প্রেত-পিশাচ, মন্ত্র-মাদুলী, তুকতাক, ঝাড়ফুঁক, বাণ-উচ্চাটণ, পানিপড়া-তাগাপড়া, মন্ত্রগর্ভ তাবিজ-কবচ প্রভৃতি। এর নাম আস্তিক্য। এ মানব প্রজাতিসুলভ বিস্ময়-কল্পনা, ক্ষতিভয়-প্রাপ্তিলোভ, শক্তির প্রতি ভক্তি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং সহায়তা-আশ্রয়-প্রশ্রয়ের ভরসা প্রভৃতির বাঞ্ছা থেকে উদ্ভূত। এসবই সাধারণ মানুষের সারাজীবনের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচারণ নিয়ন্ত্রণ করে। কেননা, তারা আহার-নিদ্রা-মৈথুন সম্বন্ধেই কেবল স্বনির্ভর, আর সব বিষয়ে পরম্পরাক্রমে পরিবার-প্রতিবেশ তথা শাস্ত্র-সমাজ থেকে শুনে-শুনে পাওয়া মেনে মেনে চলা জীবনাচারই অনুসরণ করে। কাজেই মানুষমাত্রই ব্যক্তিক, গোষ্ঠীক, শাস্ত্রিক, সাংস্কৃতিক, আবস্থানিক, আর্থিক শ্রেণীচেতনার ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক।

কাজেই মানুষ এভাবে গড়ে ওঠে বলেই মানুষের মন-মনন-জীবনাচারণ হাজারো অদৃশ্য বন্ধনে বাঁধা। এক একজন অদৃশ্য কণ্টকময় লৌহ খাঁচায় আবদ্ধ, মানসিক অনুশীলন তার শূন্য তথা জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি তাঁর চিন্তা-চেতনা নিয়ন্ত্রণ করে না,* করে আবাল্যের লালিত বিশ্বাস-সংস্কার। তাই মানুষ অভিন্ন স্বার্থে বা লক্ষ্যে ব্যতীত কেউ কাউকে আপন-স্বজন করে নেয় না, নিতে পারে না। তা সত্ত্বেও প্রলুব্ধ মানুষ, ক্ষতি ভীরু মানুষ, প্রাপ্তিলোভী মানুষ কামে-প্রেমে লাভে-লোভে, চুরিতে, ডাকাতিতে, চোরাচালানে, ঘুষে, লুটে যখন জোটবদ্ধ হয়, হয় সঙ্ঘবদ্ধ, তখন জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-নিবাস মিলনের, মন-মত-সিদ্ধান্তের এবং কর্মপন্থা গ্রহণের বা উপায় উদ্ভাবনের পথে কখনো বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। তখন লাভ-লোভ মানুষকে অভিন্ন সম বা সহস্বার্থে, সহিষ্ণুতায়, সংযমে, সহযোগিতায় ও সহাবস্থানে অনুপ্রাণিত বা প্ররোচিত করে। প্রমাণ আন্তর্জাতিক চোরাচারানীদের সঙ্ঘ ও সঙ্ঘবদ্ধ সুশৃঙ্খল সতর্ক-সুযত্ন কর্মপ্রয়াস। কিংবা এখন যখন চীন অভ্যন্তরীণ সমস্যায় বিব্রত, রাশিয়া যখন পাখা-ভাঙা বাজ, ফ্রান্স যখন ন্যাটো জোট চুক্তির ফলে কিংকর্তব্যবিমূঢ়, ব্রিটিশসরকার যখন যুক্তরাষ্ট্রের মদদপুষ্ট পরামর্শদাতা বা উপদেষ্টা, তখন বিশ্বের অপ্রতিদ্বন্দ্বী পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন বিশ্বনেতা—গোটা বিশ্বের দুর্বল-দরিদ্র রাষ্ট্রগুলো এখন মার্কিন সরকারের হুকুম-হুমকি-হুঙ্কার-হামলার শিকার, মার্কিন সরকার থেকে পাওয়া কিংবা ঋণ-দান-ত্রাণ রূপ অর্থ-সম্পদ-সামগ্রীনির্ভর বিশ্ব মার্কিন দাসত্বে ও আনুগত্যে কৃতার্থ ও কৃতজ্ঞ। তাই কুয়েত দখল মাত্রই ইরাক বিধ্বংসে মার্কিন আহ্বানে সাগ্রহে এগিয়ে এল ক্ষুদ্র বৃহৎ বিভিন্ন রাষ্ট্র। কিন্তু যখন পৃথিবীতে একধিক বৃহৎশক্তির বা পরাশক্তির অস্তিত্ব ছিল, পারস্পরিক দ্বেষা-দ্বন্দ্ব, প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল, তখন কোন বিশ্বসমস্যারই, কারো কোন অন্যায়ের প্রতিকার-প্রতিবাদ-প্রতিরোধ সহজ-সম্ভব ছিল না। প্রমাণ ১৯৪৮ সন থেকে পেলেস্টাইন-ইজরাইল সমস্যা, নামিবিয়া সমস্যা, দক্ষিণ আফ্রিকা সমস্যা, কাশ্মীর সমস্যা, আফগানিস্তান সমস্যা, ইথোপিয়া-ইরিত্রিয়া সমস্যা, তিব্বত-চীন সমস্যা কিংবা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রেরে দৌরাত্ম্য-পীড়িত গ্রানাডা-পানামা, নিকারাগুয়া, কম্বোডিয়া সমস্যা প্রভৃতি।

কুয়েত আক্রমণকালে বুশ বলেছিলেন ইজরাইল সমস্যারও সমাধান করে দেবেন, এবরই। কিন্তু এখন তার আর সে গরজ নেই। বিশ্বও শক্তের ভক্ত, নরমের যম। সেই আরব রাষ্ট্রগুলো যারা মার্কিন দালাল ছিল তারাও এখন নীরব।

অতএব, সর্বপ্রকার স্বাতন্ত্র্যচেতনা সর্বক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক চেতনার উৎস।

কিন্তু চেতনাটা সাধারণভাবে সুপ্ত, গুপ্ত ও লুপ্ত থাকে। তা অভিন্ন স্বার্থে মিলনের, সহযোগিতার, সহাবস্থানের, সঙ্ঘবদ্ধতার, যৌথকর্মের অভিন্নস্বার্থে দৈশিক-রাষ্ট্রিক জাতীয়তাবোধের, সাংস্কৃতিক ঐক্যচেতনার, ভাষিক স্বজন হওয়ার, অভিন্ন ভাব-চিন্তা-কর্ম লক্ষ্যে আত্মীয়তাবোধের পক্ষে কখনো বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। তখন নিজেদের শাস্ত্রিক,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নৈতিক, ভৌতিক, আসমানে-জমিনে প্রসারিত হাজারো অদৃশ্য অরি-মিত্র শক্তির দিন-ক্ষণ-তিথি-নক্ষত্ররাশির প্রভাবে বিশ্বাস ব্যক্তিজীবনের চেতনা ও বিশ্বাস বুকের সত্যরূপে স্বশরীরের মধ্যেই সীমিত থাকে।

কিন্তু তাকেই রাজনীতিক-বৈষয়িক-বাণিজ্যিক-আর্থিক দ্বেষ-দ্বন্দ্বের, প্রতিযোগিতার-প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে রাজনীতিক নেতার, দলের, বেণের, বেণেসঙ্ঘের ও প্রলুব্ধ পরাস্বাপহারীর স্বার্থেই শাস্ত্রিক, নৈতিক, আচারিক, সাংস্কৃতিক পার্থক্যের মর্যাদা বা অধিকার লঙ্ঘনের ছলছুতায় গুণ্ডা-মাস্তান দিয়ে রক্তক্ষরা, প্রাণহরা দাঙ্গায় ও লুঠে প্ররোচিত করে সংখ্যাগুরু মতলববাজ দরের উক্ত রাজনীতিক-বেণে-ব্যবসায়ী-কারখানাদার-আড়তদার ও সম্পদলোভী প্রভাবশালী স্থানীয় নেতা-উপনেতারা। তেমন একটি জীবন্ত সমস্যা হচ্ছে এ মুহূর্তে উপমহাদেশব্যাপী বাবরী মসজিদ, রামমন্দির, রামশীলা সমস্যা। ১৮৫৬-৫৭ সনে ওয়াহাবী আন্দোলন যখন মারাত্মক ও প্রবল হয়ে ওঠে এবং সিপাহী দ্রোহও আসন্ন বলে মনে হচ্ছিল তখনই ব্রিটিশ সরকার এ-তত্ত্ব উদ্ভাবন করে হিন্দু-মুসলিমে দাঙ্গা বাধিয়ে সিপাহী-ওয়াহাবী দ্রোহ বানচাল করায় প্রয়াসী হয়। এর স্থূল ইতিবৃত্ত এ-ই। দেশের মতলববাজদের প্ররোচনায় অনক্ষর-সাক্ষর-স্বল্পবুদ্ধি জনগণ মনে এখন দাবি আদায়ের জন্যে নরহত্যা একটা পূণ্যব্রত বলেই প্রতিভাত হচ্ছে।

কাজেই ব্যক্তিক, পারিবারিক, দৈশিক, শাস্ত্রিক, ভাষিক, গোষ্ঠীক, গৌত্রিক, ভৌগোলিক আবাসিক স্বাতন্ত্র্যচেতনা মানুষে স্বাভাবিক। এর অন্য রূপও রয়েছে, যেমন মতবাদীর দলীয় স্বাতন্ত্র্য, শ্রেণীস্বার্থগত স্বাতন্ত্র্যচেতনা প্রভৃতি। একের অহং বোধের স্বাতন্ত্র্য, অপরের হীনম্মন্যতাজাত স্বাতন্ত্র্যচেতনা প্রভৃতি থাকেই। এর ইংরেজী Community থেকে বাঙলায় সাম্প্রদায় চেতনা বলা চলে। কিন্তু এতে অকারণে-অপ্রয়োজনে-অপ্ররোচনায় কখনো দাঙ্গা-হাঙ্গামার কারণ ঘটেনা। সেকালে কয়েকজনের মধ্যে বিবাদ-বিরোধ, মারা-কাড়া-হানা নিবদ্ধ থাকত। সহজে একদিনের কয়েকঘণ্টার মধ্যেই তা মিটে যেত। এখন তা রাজনীতিক, রাষ্ট্রিক, বাণিজ্যিক-আর্থসামাজিক ও শাস্ত্রিক-সাংস্কৃতিক পার্থক্যের অজুহাতে রক্তক্ষরা প্রাণহরা রূপ নিয়েছে। ব্যক্তিমনে শাস্ত্র-সংস্কৃতি-জাত-বর্ণ-ধর্ম ভাষা-নিবাস সম্পদ-শিক্ষা-স্বাস্থ্য, ক্ষেত্রে অজ্ঞ-বিজ্ঞ নির্বিশেষে দৈশিক-রাষ্ট্রিক জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করানো না গেলে, এর ক্ষতির গভীরতা ও ব্যাপকতা আর অমানবিকতা সম্বন্ধে অধিকাংশ মানুষের আন্তরিক অনুভব-উপলব্ধিগত করা না গেলে এর কবল থেকে মুক্তি অসম্ভব।

স্বাতন্ত্র্যে নয়, বৈশ্বিক সহযোগিতায় নিহিত মানবকল্যাণ

প্রাক্তন ন্যাটো জোটের রাষ্ট্রগুলো দায়ে ঠেকে বাঁচার গরজেই উৎপাদনে, নির্মাণে, বন্টনে, বাজারে সঙ্কটে-সমস্যায় পড়ে নানাভাবে আর্থিক-বাণিজ্যিক জীবনে মরীয়া হয়ে উদ্ধারের উপায় খুঁজে বেড়াচ্ছে। 'সিসিম-ফাঁক' এখনো মেলেনি। পৃতিবীর হালচাল দেখে মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হচ্ছে, দুনিয়ার আর্থ-সামাজিক জীবনে প্রায় আমুল কোন পরিবর্তন আবশ্যিক ও জরুরী। কেবল উৎপাদন, নির্মাণ ও বন্টন আর বাজারজাত করার ক্ষেত্রে নয়, রাষ্ট্রিক বিধি-ব্যবস্থার পরিবর্তনও নয়, নতুন করে ভৌগোলিক সান্নিধ্যের-সংলগ্নতার ভিত্তিতে, লগ্নি-বাণিজ্য-শিল্পপুঁজির বিনিয়োগেও আন্তর্জাতিক বোঝা-পড়ার প্রয়োজন হবে, বৈশ্বিক বাজারের আঞ্চলিক উৎপাদন-নির্মাণ-বন্টন, বাজারের চাহিদা-সরবরাহ প্রভৃতির প্রয়োজন ও পরিমাণ হিসেব করেই নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। অর্থাৎ পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলোর এখন সবপ্রকারে Remodeling and Restructuring প্রয়োজন ও জরুরী। নইলে এ যন্ত্রযুগের ও যন্ত্রজগতের সংহত ও ক্ষুদ্র পরস্পরনির্ভরশীল জীবনে জাগ্রত জনতাকে ফাঁকি দিয়ে, বঞ্চিত করে 'জোর যার মুলুক তার' নীতিনির্ভর রাষ্ট্রিক ও জাতিক জীবন যাপন বৃহৎ শক্তির, প্রতাপে প্রবল সামরিক শক্তির পক্ষেও একালে সম্ভব হবে না। আজ পৃথিবীর শাসন-প্রশাসন, আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও অবস্থান যুগপৎ ও একাধারে রাষ্ট্রিক স্বাতন্ত্র্যচেতনা ও তাঁবেদার রাষ্ট্রের বহুলতা, ঋণ-দান-ত্রাণনির্ভরতা, কেনা অস্ত্রে লড়াইপ্রবণতা প্রভৃতি এক অত্যন্ত অস্বাভাবিক অবস্থা। এভাবে দীর্ঘদিন বিশ্বরাজনীতি চলতে পারে না। আজ আফ্রো-এশিয়া-লাতিন আমেরিকার অজ্ঞ-অনক্ষর নিঃস্ব-নিরন্ন মানুষও রেডিও, টিভি, ক্যাসেট, সিনেমা-প্রচারপত্র, মেঠো বক্তৃতা, মিছিল, সঙ্ঘ-সমিতি প্রভৃতি মাধ্যমে আত্মসচেতন হচ্ছে। তাদেরও মধ্যে জাগছে আত্মপ্রত্যয় ও স্বাধিকার চেতনা, বঞ্চনার ক্ষোভ, প্রতিবাদের ক্রোধ এবং প্রতিরোধের শক্তি তারাও অর্জন করছে। ধনী-মানী শহুরে শিক্ষিত সাফ-কাপুড়ে ভদ্রলোকেরা ওদের আর মিষ্টিকথায় কিংবা পূর্বের মতো হুকুম-হুমকি-হুঙ্কার-হামলা-ধমকি-ধমকি দিয়ে কাবু রাখতে পারবে না। ওদেরও জেগেছে আত্মসম্মানবোধ। ওরা এখন বেয়াদবি করে, রুষ্ট হয়, রুখে দাঁড়ায়। একালে জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-নিবাস-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সবাইকে প্রকৃতির সঙ্গে আপোস করে অর্থাৎ প্রকৃতিকে জীবন যাপনের অনুকূলে এনে এবং রাষ্ট্র নির্বিশেষে স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধি শিথিল করে সহযোগিতায়-সহাবস্থানে সম্মত থাকতে হবে। আমাদের জানা-বোঝা যায় যে পৃথিবীর প্রবল রাষ্ট্রগুলো দাপট আগের মতো থাকবে না, দুর্বল, দুস্থ রাষ্ট্রগুলোকেও হুকুম-হুমকিতে কাবু রাখা যাবে না। যাবে না মুৎসুদ্দী সরকারের ও ছদ্মবেশী চর-দালালের মাধ্যমে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোকেও তাঁবেদার রাষ্ট্র করে রাখা। তৃতীয় বিশ্বের কথা মাও সেতুং সম্ভবত তাদেরসুপ্ত শক্তি, অব্যক্ত বঞ্চা, গুপ্ত ভবিষ্যৎ ভেবেই বলেছিলেন। দেশ-জাত-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-নিবাস নির্বিশেষে মুনষের প্রথম ও শেষ পরিচয় যে সে মানুষ এবঙ স্বাধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠ হওয়া ও থাকা তার জন্মগত অধিকার ও দাবি, তা স্বীকার করতেই হবে নিঃশর্তে। মানুষের লক্ষ্য ইহুদী, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান, মুসলিম থাকা নয়, মানুষ হওয়া এবং কেবল ব্যক্তি মানুষ হিসেবেই পৃথিবীর যে-কোন অঞ্চলে পরিচিত বা অভিহিত থাকা। এজন্যে চীনে, ভারতে, পাকিস্তানে, রাশিয়ায়, দক্ষিণ আফ্রিকায়, আফ্রিকার অন্যান্য অঞ্চলে, আমেরিকায় সর্বত্র ভৌগোলিক রাষ্ট্রিক বিন্যাস প্রয়োজন হবে, জরুরী হয়ে উঠবে সর্বপ্রকার স্বাতন্ত্র্যচেতনা বর্জন। বৈশ্বিক চেতনায় ঋদ্ধ হতে হবে সবাইকে। আগামী দশ/বিশ বছরের মধ্যেই জনবহুল বিশ্বমানবকে নিজেদের মধ্যেই স্থির করতে হবে, তারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কি কাড়কাড়ি, মারামারি, হানাহানি, ঠকাঠকি, ঠোকাঠোকি নীতিনির্ভর হয়ে বাঁচতে চায়, কিংবা সম ও সহ স্বার্থে সহিষ্ণুতায়, সহযোগিতায় সহাবস্থানের অঙ্গীকারে নিরুপদ্রবে নিরাপদে স্বস্তিতে শান্তিতে বাঁচতে আগ্রহী।

আজ বৈশ্বিক মানবচেতনা জরুরী

সব প্রজাতির মধ্যেই একটা দলচেতনা বা সমাজবোধ রয়েছে বিশেষ করে বহু পশু, পাখি, কীট, পতঙ্গ তথা পোকা মাকড় পালে, দলে, ঝাঁকে চলে। কাজেই স্বজাতির বা স্বপ্রজাতির মধ্যে থেকেই, তার সঙ্গে সম্পর্ক সমৃদ্ধ রক্ষা করেই জীবন যাপন করতে হয়। এদের মধ্যেও হয়তো ঝগড়া-বিবাদ-বিরোধ ঘটে। আমরা অবশ্য অজ্ঞতাবশে সব প্রাণীর খবর জানি না। তবে এদের পায়রা, মোরগ, ষাঁড়, মোষ প্রভৃতির মধ্যে প্রাণবিনাশী রক্তক্ষরা যুদ্ধ বাধানো যায়। অন্য অনেক প্রাণীতেও হয়তো স্বদলের মধ্যেই বিরোধ-বিবাদ-লড়াই দুর্লভ নয়। ভিন্ন দলীয় বা গোত্রীয় উই পিঁপড়ের মধ্যেও দ্বেষ-দ্বন্দ্ব নাকি দুর্লক্ষ্য নয়। অতএব মিলনের ও সহাবস্থানের জন্যে কেবল স্বজাতি হলেই চলে না স্বদলেরও হতে হয়। পশু পাখি কীট পতঙ্গের মধ্যে বিবাদটা কেবল খাদ্যসামগ্রী নিয়েই ঘটে না। অন্য কারণেও অরি-মিত্র সম্পর্ক গড়ে ওঠে, যেমন হাতি ও বাঘের মধ্যে অথবা বাঘে-মোষে বৈরীভাব খাদ্যের জন্যে নয়। অন্য কোন অজ্ঞাত ঘটনার জন্যেই ঘটে দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ। খাদ্য নিয়ে প্রতিযোগিতা; প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বিবাদ-বিরোধ, সংঘর্ষ-সংঘাত প্রাচুর্যের অভাবে আবশ্যিক ও অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। কিন্তু অন্য কারণে যে দ্বেষ-দ্বন্দ্বের ঈর্ষা-হিংসা-ঘৃণার কিংবা সখ্য-সঙ্গ-সহাবস্থান-প্রীতির সম্পর্ক [যেমন বানরে হরিণে] সম্বন্ধ গড়ে ওঠে, তা আনাড়ি বলে আমাদের পক্ষে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। মানুষের মধ্যেও আমরা খাদ্য নিয়ে তথা খাদ্যপ্রতীক ও প্রতিম অর্থ-সম্পদ নিয়ে ঈর্ষা-হিংসা-ঘৃণা-অবজ্ঞা-দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-সংঘাত ঝগড়া-বিবাদ-বিরোধ, কাড়াকাড়ি মারামারি হানাহানি পিতা-পুত্রের নিত্য ঘটতে দেখি। এর কারণ গুহায়িত নয়। কিন্তু একজন জাপানী, ইরানী, কানাডী, জার্মান কেন স্বদেশী নয় বলেই ভিন্ন দেশী লোকের পর, গুপ্ত বা সুপ্ত শত্রু বলে মনে করে। একই প্রজাতির বলে প্রথম দর্শনেই প্রীতির চোখে দেখে না, আত্মীয় বা স্বজন বলে মানে না, তার যে মনস্তাত্ত্বিক কারণ, তাও জটিল নয়। যেমন জটিল নয়, শাস্ত্রিক মতভেদে মানুষকে পর ও শত্র ভাবার-কারণ। এতো আধি। মানসিক বা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাধি মাত্র। এর থেকে এ কালেও কি আমরা স্বাধীন জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-বিবেক-বিবেচনা প্রয়োগে মুক্ত হবার চেষ্টা করব না। আমরাও কি প্রজন্মক্রমে লব্ধ ধারণাবশে মানুষে মানুষে দেশে দেশে জাত-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-নিবাসভেদ মেনে ব্যবধানের, অপরিচয়ের, অপ্রেমের অলঙ্ঘ্য প্রাচীর উচ্চতর করতে থাকব। আমরা মানব প্রজাতি, আমাদের প্রথম ও শেষ পরিচয় আমরা মানুষ। আমাদের লক্ষ্য জাপানী, থাই, বাঙালী, মার্কিন থাকা নয়। আমাদের লক্ষ্য বৌদ্ধ-হিন্দু-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইহুদী-খ্রীস্টান-মুসলমান থাকা নয়। মানুষ হওয়া, মানুষকে জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-নিবাস-ভাষা নির্বিশেষে মানুষ বলে জানা, বৈশ্বিক মানব চেতনায় উদ্বুদ্ধ ও প্রবুদ্ধ হওয়া, ব্যক্তিক দোষে গুণে ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা, শাস্ত্র, সমাজ, মত, পথ, বর্ণ, নিবাস, ভাষা দিয়ে যাচাই বাছাই করা নয়।

মনের এক অদ্ভুত আধি

কথায় বলে 'সুখে থাকলে ভূতে কিলায়।' মানুষের মনোজগতে সত্যিই তেমন এক স্বসংগৃহীত, স্বউদ্ভাবিত ও স্বলালিত আধি থাকে। কেবল নিরীহ, নিষ্ক্রিয়, নরাকাঙ্ক্ষা, বিরাগী, বিবাগীরাই সম্ভবত এ আধি থেকে কম-বেশি বা সম্পূর্ণভাবে মুক্ত থাকে। এ আধির নাম ঈর্ষা, হিংসা, ঘৃণা ও অবজ্ঞা। এর উন্মেষ ও বিকাশ ঘটে আত্মীয় কুটুম্ব পরিজন পরিচিত প্রতিবেশীকে ঘিরে। সমশ্রেণীর, সহপেশার-সহযাত্রীর স্বস্থানের, স্বকালের, স্বসমাজের পরিসরেই সাধারণত এ আধি সীমিত থাকে।

যাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্পর্ক থাকে, সেখানে এ-আধিকে স্বাভাবিক প্রাণী প্রবৃত্তি বলেই ধরে নেয়া যায়। কিন্তু স্বপেশার না হলেও এবং সামাজিকভাবে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বা সম্বন্ধের না হলেও, এমনকি প্রয়োজনে উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও যাকে আমরা অযোগ্য মনে করি, তার পদপ্রাপ্তি, পদোন্নতি, ধনবৃদ্ধি, সম্মানপ্রাপ্তি, প্রভাববিস্তার, ক্ষমতালাভ প্রভৃতি আমাদের অকারণ ঈর্ষা-অসুয়ার কারণ হয়। আবার যে প্রতিবেশীকে যোগ্য মনে করি, যার মেধাবী সন্তান বড় চাকুরে হল, যার মেয়ে সুপাত্রস্থ হল, তাকেও আমরা মনে মনে ঈর্ষা করি। অর্থাৎ অবচেতনভাবেই যেন পরিচিত কারো বড় হওয়া, ওপরে ওঠা, ধনী হওয়া, জ্ঞানী-গুণী-মানী-খ্যাতি-ক্ষমতাবান হওয়া আমরা পছন্দ করতে পারি না। ঈর্ষার উত্তাপে, হিংসার জ্বালার-ঘৃণার বিষে, অবজ্ঞার যন্ত্রণায় আমরা ভুগি আর মনের মতো অর্থাৎ স্বমতের বিশ্বস্ত মানুষ পেলে নিন্দায় কিংবা তার বিদ্যাবিত্ত খ্যাতি ক্ষমতা প্রাপ্তির অন্যায্যতা, অযৌক্তিকতা আলোচনায় হই মুখর। তাতে এক প্রকারের আপাতশান্তি, ও স্বস্তি মেলে, ক্ষোভ যায় উবে। আগেই বলেছি, মানুষের ঈর্ষা, অসুয়া, ঘৃণা, অবজ্ঞার পরিচিত প্রতিবেশে-পরিবেশে আত্মীয়-কুটুম্ব-পরিজন-পরিচিতজনের মধ্যে থাকে সীমিত। ছেলে তৃতীয় বিভাগে পাশ করলে আর ভাগনে প্রথম বিভাগে পাশ করলেও জাগে নিজের দুর্ভাগ্যের ক্ষোভ, আর কোন-ভাগনের সৌভাগ্যে ঈর্ষা। আসলে মানুষের এ রোগের প্রতিকার-প্রতিষেধক নেই। পরিচিত লোকের সর্বপ্রকার ক্ষয়-ক্ষতিতে মানুষ অবচেতন মনে বা মগ্নচৈতন্যে এক প্রকার সুখ পায়, নিজের যদি চার সন্তান থাকে, তাহলে প্রতিবেশীর পাঁচ সন্তানের একটা মরলে কিংবা চার সন্তানের একটা পঙ্গু হলেও যেন উন্নতর অবস্থার ও অবস্থানের আনন্দ পায় মানুষ। সর্বক্ষেত্রেই মানুষ জিগীষু। শ্রেষ্ঠত্বের, উৎকর্ষের, আধিক্যের কাঙ্ক্ষী। তুলনায় এ শ্রেষ্ঠত্বের, উৎকর্ষের, আধিক্যের অনুভবে-উপলব্ধিতেই মানুষের সুখ ও আনন্দ। এরই উৎস জিগীষা। অক্ষম, অসমর্থ, নিষ্ক্রিয়, নিরুদ্যম, দুর্বল, ভীরু মানুষ এভাবে জিগীষা বৃত্তি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চরিতার্থ করে। পরাজয়ের, অসামর্থ্যের ও ব্যর্থতার হতাশা-নিরাশার ক্ষোভ-জ্বালা-যন্ত্রণা ও গ্লানি এভাবে উপেক্ষা ভুলে থাকার অবচেতন চেষ্টায় থাকে। এ কারণেই অন্যের ক্ষয়-ক্ষতি-দুর্ভাগ্য-পরাজয়-বিপর্যয় এক প্রকার বিকৃত রুচির সুখ দেয়। কিন্তু অপরিচিতের লাভ-ক্ষতির ক্ষেত্রে মানুষ নির্বিকার। এ জন্যেই ফরাসী ভাষার এক কবি বলেছেন 'নিজের দুঃখ-দুর্ভাগ্য-ক্ষতির কথা কাউকে বলবে না। কেননা সে মুখে সমানুভূতির দরদে বিগলিত হলেও মনে মনে হবে খুশি।' তাকে সে-সুযোগ দিয়ে কি লাভ!

জাতীয় সংস্কৃতি কি চিজ?

৩১-১-৯১ তারিখের সংবাদের প্রথম পৃষ্ঠায় দেখলাম ও পড়লাম যে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট প্রতিনিধি দলের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎ হয়েছে। এবং প্রধানমন্ত্রী ৩০শে মার্চ শনিবারে বলেন, সরকার জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশের জন্যে সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। সংস্কৃতি হচ্ছে সৌন্দর্য, সৌকর্য ও উৎকর্ষ সাধনা। সুন্দর সুন্দরই, হিত হিতই, শ্রেয় শ্রেয়ই। কাজেই সৌন্দর্য, হিত ও শ্রেয় চর্চায়, ও করণে জাতীয় বিজাতীয় থাকতেই পারে না। বিসমিল্লাহপন্থী জাতীয়তাবাদী দলে কি অমুসলিম নাগরিকরাও অন্তর্ভুক্ত? তাছাড়া যে-দল জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে আঁতাত করে অকারণে ও অপ্রয়োজনে, সে-দল কি দৈনিক ও রাষ্ট্রিক, জাতিসত্তায়, জাতীয়তায়, ও নির্বিশেষ সংস্কৃতিতে আস্থা রাখে, নাকি কেবল অধিজন মুসলিম নিয়েই এ দল জাতীয়তাবাদী? অমুসলিমদেরও জাতির অবিচ্ছেদ্য ও অপরিহার্য অংশ বলে মানলে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কোন গণতান্ত্রিক সরকারই সংখ্যাগুরু বা সংখ্যালঘু তত্ত্ব বা পরিসংখ্যান ভিত্তিক কোন নীতি গ্রহণ বরণ করতে পারে না তার সংবিধানে, ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে, নীতিনিয়মে ও রীতিরেওয়াজে। আধা কানা খোঁড়া জাত বর্ণ ধর্ম ভাষা সংস্কৃতি ও ধর্মাচার নির্বিশেষে রাস্টেওর স্থায়ী অধিবাসী মাত্রকেই সমান অধিকার ও দায়িত্ব দিতে হয় আধুনিক গণতন্ত্রিক রাষ্ট্রে এবং সরকারকে হতে হয় সেক্যুলার। সরকারকে হতে হয় মানব-উত্তরাধিকারে আস্থাবান ও আসক্ত। সংস্কৃতিও হয় শাস্ত্রনিরপেক্ষ সেক্যুলার সংস্কৃতি—যা মানসিক ও ব্যবহারিক জীবনাচারকে কেবল উন্নত করে। যা মানুষের ব্যবহারিক, বৈষয়িক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানসিক জীবনের পক্ষে কল্যাণকর, মানুষের দেহ-প্রাণ-মন-মননের পক্ষে স্বাস্থ্যকর ও উৎকর্ষসাধনে সমর্থ, তা-ই গ্রহণ ও বরণ করা, অনুকরণ ও অনুসরণ করাই আবশ্যিক। আজ প্রতীচী সর্বপ্রকার আবিষ্কার-উদ্ভাবন-নির্মাণ-উৎপাদনে তৎপর এবং তার নতুন প্রকৌশল, প্রযুক্তি, জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন-সমাজতত্ত্ব-সাহিত্যচর্চা বন্ধ বা বর্জন করলে আমাদের যা থাকে এবং থাকবে তাকে কি এযুগের সংস্কৃতি বলা যাবে, কিংবা আমাদের প্রাত্যহিক ব্যবহারিক জীবনযাত্রা সম্ভব হবে অথবা আমাদের মানসিক জীবনের খোরাক মিলবে? সংস্কৃতি কি কৈ-মাগুরের মতো জিয়েল মাছ? সংস্কৃতির অপর নাম চিন্তা-চেতনায় যন্ত্রে প্রকৌশলে-প্রযুক্তিতে, আচারে-আচরণে-সৌজন্যে এককথায় জীবনাচারে ক্রমোৎকর্ষ-ক্রমবিকাশ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাতীয় সংস্কৃতি বস্তুটি বা ভাবটি কি জিনিস বা কি তত্ত্ব আজো কেউ ব্যাখ্যা করলেন না, কেবল সরকার ও বুদ্ধিজীবী, আর সংস্কৃতিসেবীরা ঘন ঘন 'হিং টিং ছট'-এর মতো উচ্চারণই করেন। পাকিস্তান আমলে তা ছিল মধ্যএশিয়ার অনুকৃতি। এশাদ আমলেও তা ছিল বাগদাদী ইরানী মধ্যএশীয় মর্কটীয় অনুকৃতি। সংস্কৃতি মনের, মগজের, চিন্তার, চেতনার, ব্যবহারিক বৈষয়িক জীবনের উন্নয়ন ও উৎকর্ষবাচক। যা প্রাণীপ্রজাতি মানুষের মানবতার-মানুষ্যত্বের বিকাশ ঘটায়, তা গ্রহণ করা, যা দেখতে, করতে, শুনতে, বলতে কুৎসিত তা পরিহার করা ও যা নিজের জন্যে কাম্য নয়, তা পরের জন্যেও নিজ স্বার্থে কামনা না করা, আর সংযমে সহিষ্ণুতায় সহযোগিতায় সৌজন্যে সহাবস্থানে অভ্যস্ত হওয়াই সংস্কৃতি।

ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে সৌন্দর্যের আবশ্যিকতা এবং সৌজন্যের, উদারতার, সহিষ্ণুতার, সংযমের, পরার্থপরতার, পরিবারের, সমাজের, প্রতিবেশীর ও মানুষ নির্বিশেষের প্রতি প্রয়োজনে, দায়িত্ব-কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন থাকা, এককথায় মানুষকে ভালোবাসাই সংস্কৃতি। সে-সূত্রে রাষ্ট্রে স্বাধিকার সচেতন থেকে সমস্বার্থে, সংযমে, সহিষ্ণুতায়, সহযোগিতায়, দৈশিক, রাষ্ট্রিক ও মানবিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা, স্বাধিকারে স্ব ও সুপ্রতিষ্ঠ থাকাই এবং অন্যকেও সে-ভাবে থাকার বা রাখার জন্যে সাহায্য-সহায়তা করাই, অর্থাৎ প্রয়োজনমতো মানবপ্রেমী ও মানবসেবী হওয়াই সংস্কৃতিমানতা। ঘন ঘন সংস্কৃতি শব্দটি উচ্চারণ করা সহজ, বোঝা কঠিন, বোঝানো কঠিনতর।

আমাদের শেষ কথা সংস্কৃতিতে স্বাতন্ত্র্য থাকতেই পারে না, থাকা বাঞ্ছিত নয়, কেবল স্থানিক ও দেশাচার লোকাচার থাকতে পারে, তা আসলে আচারই, প্রথা বা রীতি রেওয়াজই—কল্যাণকর কিনা বলা যায় না, কেননা, তা সনাতন নীতিনিয়ম-রীতিরেওয়াজের গতানুগতিক অনুবর্তন বা আবর্তন মাত্র। সংস্কৃতি সৃষ্টিশীল এবং ব্যক্তিক মস্তিষ্কপ্রসূত নতুন আবিষ্কার-উদ্ভাবন-মনন-চিন্তন। নতুন সংস্কৃতি একের সৃষ্টি। অন্যরা গ্রহণ-বরণ অনুসরণ-অনুকরণ করে মাত্র। তাই সংস্কৃতি সৃষ্টি বলেই ব্যক্তিক অবদান, এবং অন্যদের আচার মাত্র।

সবাই আবিষ্কার-উদ্ভাবন করতে পারে না। গ্রহণে-বরণে-অনুকরণে-অনুসরণেই ঘটে সাংস্কৃতিক জীবনের কিশ ও উৎকর্ষ। যারা স্বাতন্ত্র্যাভিমানী কিংবা আরণ্যবাসী বলে ভিন্ন দেশের ও গোত্রের মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন, তারা আজো আদিম ও আদি অবস্থায় পড়ে রয়েছে মানসিক ও ব্যবহারিক জীবনে।

সংস্কৃতি ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্যচেতনা বা রক্ষণশীলতা হচ্ছে নামান্তরে আত্মহনন বা আত্মবিকাশপথ রুদ্ধ রাখা। সংস্কৃতিক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্যচেতনা মাত্রই আত্মোন্নয়নের পথ স্বেচ্ছায় পরিহার করা। তাই জাতীয় সংস্কৃতি বলে কিছু নেই, বিশিষ্ট দেশাচার বা লোকাচার আছে মাত্র, এবং তা রক্ষণশীলতা ও গতানুগতিকতা, প্রগতিশীলতা নয়। কারণ তা সম্মুখগতি দেয় না, লাটিমের মতো প্রজন্মক্রমে একই বিন্দুতে বা বৃত্তে ঘূর্ণায়মান থাকে। তা সচল বটে, কিন্তু গতিমান নয়। অপসংস্কৃতি বলেও কিছু নেই। কালের চাহিদা মতোই নতুন আচার-আচরণ আসে, আসে নতুন চিন্তা-চেতনা। নতুনকে মুনষ অনভ্যস্ত মনে ও চোখে অপসংস্কৃতি, অকল্যাণকর আচার-আচরণ, অশ্লীল অশোভন ব্যবহার বলে ভাবে ও দেখে মাত্র। কোন নতুনই যাবার জন্যে আসে না, প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত হবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্যেই আসে। এ জন্যেই নতুনে তরুণে আর সনাতনী প্রবীণে দ্বন্দ্ব ঘটে, অবশেষে নতুনের তরুণের জয় হয়। লোকে নতুনকে বরণ করে।

আমাদের শেষ প্রশ্ন, আসলে জিজ্ঞাসা, বিএনপি'র জাতীয়তাবাদ কি দৈশিক ও রাষ্ট্রিক কিংবা সংখ্যাগুরু ধর্মসম্প্রদায়ের জাতীয়তাবাদ?

উপযোগরিক্ত গতানুগতিক জীবনাচারের নামই জাতীয় সংস্কৃতি

আমরা অন্য অনেক প্রবন্ধেই বলেছি যে আশৈশব পারিবারিক, সামাজিক, শাস্ত্রিক, নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আচারিক পরিবেশে-প্রতিবেশে লব্ধ ও লালিত বিশ্বাস-সংস্কারই মানুষের ব্যক্তিজীবন নিয়ন্ত্রিত করে, তার মন-মননও চালিত হয় ওই একই বিশ্বাস-সংস্কাররূপ কাঁটাতারে তৈরী বদ্ধ খাঁচার পরিসরেই। সাধারণ মানুষ তাই সারাজীবনেও ওই বিশ্বাস-সংস্কারে গড়ে-ওঠা ধরে-রাখা চেতনা থেকে মুক্তি পায় না। তাই মানুষ মাত্রই রক্ষণশীল অন্তরে, এবং মানসিকভাবে কূর্ম স্বভাবের ও স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় লোকাচারে-দেশাচারে, অলীকে-অলৌকিকে বিশ্বাস-সংস্কারে অদৃশ্য অরি-মিত্র শক্তির ধারণায়। একারণেই মানুষ তথাকথিত সংস্কৃতি ক্ষেত্রেই স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়, তা উঁচু-নিচু-মাঝারি, কিংবা ভালো-মন্দ-মাঝারি, অথবা গুণে মানে মাপে মাত্রায় নিতান্ত আদি ও আদি অবস্থার হলেও।

অথচ মানুষ যদি অন্যদের সংস্কৃতি সম্বন্ধে কৌতূহলী, জিজ্ঞাসু ও ভালা-মন্দ-মাঝারি কিনা যাচাইয়ে বাছাইয়ে আগ্রহশীল হত, তা হলে তেমন মানুষ বা সমাজ হত গ্রহণশীল, অনুশীলনে-পরিশীলনে অনুকরণে অনুসরণে স্বসংস্কৃতির শোধন ও উৎকর্ষ সাধন করতে পারত।

বুনো-বর্বর ভব্য-সভ্য সব মানুষই আজো বিশ্বাস-সংস্কারবদ্ধতাকেই, তার বিশ্বাস-সংস্কারজাত দেশাচার-লোকাচারকে, অদৃশ্য অরি-মিত্র শক্তিকেই তার মানসিক ও আচারিক সংস্কৃতি বলে জানে ও মানে এবং তা প্রচল রাখাই অর্থাৎ স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় সতর্ক প্রয়াস প্রযত্ন করাই পবিত্র শাস্ত্রিক, নৈতিক, সামাজিক, গৌত্রিক, ঐতিহ্যিক, সাংস্কৃতিক ও আচারিক দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে জানে।

এ জন্যেই অর্থাৎ অযৌক্তিক ও অবৌদ্ধিক কূর্মস্বভাবের জানা, মানসিক রক্ষণশীলতার দরুন, চিন্তা-চেতনার, মন-মননের ধরাবাঁধা প্রথাসিদ্ধ ধারার আনুগত্যের কারণে মানুষের সংস্কৃতি বিবিধ-বিচিত্র হলেও ত্রুটিমুক্ত নয়, দেশ-কালের ব্যক্তিজীবনের চাহিদা বা প্রয়োজন অনুগ নয়। উপযোগ নেই, তবু ধরে রাখবে, ফলে মানুষের সংস্কৃতি মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশের আশানুরূপ সহায়ক হয়নি। কেবল আচারিক পার্থক্যে দ্বান্দ্বিক অবস্থার ও অবস্থানের ব্যবস্থা দৃঢ় করেছে, মানুষের মিলন-ময়দান তৈরী করেনি। গতানুগতিক জীবনাচারেরই নাম জাতীয় সংস্কৃতি। এ বদ্ধ, বন্ধ্যা ও প্রথাসিদ্ধ।

অথচ সংস্কৃতি অনুকরণে অনুসরণে ও সৃজনশীলতায় নতুন দেহ-প্রাণ না পেলে তা উপযোগরিক্ত আচারমাত্রে অবসিত হয়। এতে জাতীয় জীবনে অবক্ষয় দেখা দেয়, বিকাশ-বৃদ্ধি-শুদ্ধি বন্ধ থাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যদিও রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে সরকারে-সরকারে, সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠানে-প্রতিষ্ঠানে সর্বক্ষণ সাংস্কৃতিক যোগাযোগ, সম্পর্ক, সম্বন্ধ রাখার কথা উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করে কিন্তু তবু আবার তারাই স্বদেশবাসীর-স্বজাতির কাছে সর্বদা আকুল আবেদন জানায় জাতীয় সংস্কৃতির পবিত্রতা, অবিমিশ্রতা, স্বাতন্ত্র্য, বৈশিষ্ট্য রক্ষার জন্যেই বিদেশী সংস্কৃতি [গুনে-মানে-মাপে মাত্রায় উৎকৃষ্ট বা উন্নত হলেও] বর্জন করতে।

এ যন্ত্রযুগে ও যন্ত্রজগতে বিশ্বমানব ক্রমে আচারে-আচরণে মনে-মননে মনীষায় মনস্বিতায় এক সমাজভুক্ত হতে চলেছে। এমন দিন দূরে নয়, যখন পৃথিবীর সব মহাদেশের শিক্ষিত শহুরে মানুষ অশনে বসনে নিবাসে শিক্ষায় স্বাস্থ্যে, আচারে-আচরণে অভিন্ন হয়ে উঠবে। কাজেই সংস্কৃতিতে স্বাতন্ত্র্য বলে কোন যৌক্তিক বৌদ্ধিক তত্ত্ব, তথ্য ও শ্রেয়স্কর কিছু থাকতে পারে না। নদী যেমন সাগরমুখী এবং সাগরেই তার সার্থক স্থিতি, তেমনি স্থানিক, কালিক, গৌত্রিক, শাস্ত্রিক, নৈতিক সংস্কৃতিও মানসিক উৎকর্ষে-মননে-মনীষায়-সৌন্দর্যে-সূক্ষ্মতায় এবং বস্তুগত রূপে রসে লাবণ্যে মানবতায় বৈশ্বিক ঐক্যে ও মানসিক উৎকর্ষে গুণে-মানে-মাপে-মাত্রায় যথার্থই মনুষ্যোচিত হবে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক স্তরে।

AMARBOI.COM

বিশ্বাস-সংস্কার বনাম সত্য ও তথ্য

আগে হিন্দুরা শুধু মনে করত নয়, বিশ্বাস করত, জানত এবং মানত যে জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে এ তিনটে ঈশ্বরের হাতে এবং এ হচ্ছে জীবনে নিয়তির অন্তর্গত। এর নড়-চড় হবার কোন কারণ কিংবা উপায় ছিল না। এদের মধ্যে তালাক প্রথা ছিল না, তাই বিয়েটাও সারাজীবনের বন্ধনই ছিল। একবার ঠকে গেলে কিংবা জিতে গেলে তার আর পরিবর্তন কিংবা হ্রাস-বৃদ্ধি ছিল না। এখন ভারতে তালাক প্রথা চালু হয়েছে বর্ণহিন্দুর মধ্যে, বিধবা বিয়ে নিম্নবর্ণের মধ্যে আগেই চালু ছিল, উচ্চবর্ণের ও বর্গের মধ্যে তা চালু হয়ে গেছে। কাজেই বিয়ে নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব-কর্তৃত্ব এখন ঈশ্বর বা নিয়তি আর নিজের হাতে রাখেননি। আর জন্মও এখন মানুষ স্বেচ্ছায় নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, সন্তান সৃষ্টি, সন্তানের লিঙ্গ পরিবর্তন কিংবা সন্তান জন্ম নিরোধ, কৃত্রিম উপায়ে টিউবে, শুক্র-ডিম্ব নারীর গর্ভে স্থাপন করে সন্তান উৎপাদন সম্ভব হয়েছে মানুষের পক্ষে। অতএব, এটাও ঈশ্বর বা নিয়তি এমনকি গ্রহ-নক্ষত্র-রাশিচক্রও এসব আর নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেননি, বা স্বেচ্ছায় মানুষের স্বায়ত্তে দিয়ে দিয়েছেন। প্রসূতি ও নবজাতক মৃত্যুও বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে। আর যে মৃত্যু ঈশ্বরের, গ্রহ-রাশিচক্রর ও নিয়তির হাতে ছিল, জন্ম মুহূর্তেই সুনির্দিষ্ট দিন-ক্ষণ-তিথি-লগ্নে মৃত্যুদণ্ডও অবধারিত ছিল, তা এখন একেবারেই ভুল প্রমাণিত হয়ে গেছে। যেমন প্রসূতি ও শিশু মৃত্যু যেমন প্রতিরুদ্ধ হয়েছে, [এখানে ব্যতিক্রম আলোচ্য নয়] তেমনি যক্ষা, কলেরা, বসন্ত, সন্নিপাত এবং মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ কিংবা হৃৎরোগে যে মৃত্যু ছিল প্রায় সুনিশ্চিন্ত ও অবধারিত, তা একালে এড়ানো সম্ভব হচ্ছে। যক্ষা, ম্যালেরিয়া-কালাজ্বর-প্লীহা-কলেরা-বসন্ত, সন্নিপাতজাত মৃত্যু প্রতিরোধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখন সহজ। প্রথম উন্মেষ কালে জানা গেলে ক্যানসারও নিরোধ করা সম্ভব হচ্ছে। তা ছাড়া পেসমেকার, বাইপাস, অস্ত্রোপচার প্রভৃতি নানা কৌশলে ও ঔষধে আজকাল মৃত্যুপ্রতিরোধে আয়ু বৃদ্ধি সম্ভব হচ্ছে। শিশুদের যে পাঁচটা-ছয়টা ইনজেকশান যোগে সারাজীবনের জন্যে কয়েকটা রোগের প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, তাতেও মানুষের আয়ু অচিরেই শতোর্ধ্ব বছরে গিয়ে স্থিতি পাবে। অতএব, যে-সব রোগের কোন চিকিৎসাই ছিল না, মৃত্যু ছিল অমোঘ নিয়তি যে-সব রোগে, সেগুলো এখন আর সহজে মানুষের প্রাণ হরণ করতেই পারে না। কাজই আজ জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে আর জীবন নিয়ন্তা-নিয়তির হাতে নেই।

এভাবেই আমাদের বিস্ময়-কল্পনা-অজ্ঞতা-ভয়-ভক্তি-ভরসাপ্রসূত বিশ্বাস-সংস্কার আস্থা-আশ্বাস সব মিথ্যা বলেই হাওয়া হয়ে উড়ে যাচ্ছে জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তিবাদী মানুষের মানস-জীবন থেকে, মনন-চিন্তন-দর্শন থেকেও। পালাপার্বণিক আচারিক জীবন থেকে মুছে যাচ্ছে, চিরকালের জন্যেই বিলুপ্ত হচ্ছে ভূতে-ভগবানে-প্রেতে-পিশাচে-জ্বীনে-পরীতে-ড্রাগনে, দৃশ্য-অদৃশ্য শক্তিপ্রতীকে, প্রতিমায় ও প্রতিভূতে আস্থা, মানুষের মানসমুক্তি ঘটছে।

দেশে দেশে কালে কালে গোত্রে শাস্ত্রিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক নানা কল্পনা-বিস্ময়-বিশ্বাস-সংস্কারই মানুষে মানুষে মিলনের, আত্মীয়তার, বন্ধুত্বের, সহাবস্থানের পক্ষে বাধার সুউচ্চ, দুলর্জ্য, দুর্ভেদ্য প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অথচ জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি যোগে মানুষ যদি জানতে ও বুঝতে শেখে, তা হলে এমন অদৃশ্য কাঁটাতারে গড়া ভিন্ন ভিন্ন খাঁচাবদ্ধ হয়ে থাকতে না, শিকার হত না অযৌক্তিক অবৌদ্ধিক দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-সংঘাতের। হাজার হাজার বছরের অজ্ঞতার ও দূরত্বের ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়েছে, বিজ্ঞানীর আবিষ্কার ও উদ্ভাবন-প্রকৌশল-প্রযুক্তির বিস্ময়কর সুনিপুণ প্রয়োগে আজকের যন্ত্র নির্ভর জীবনে ও জগতে মানুষের ব্যবহারিক জীবনের বৈষম্য ও ভিন্নতা দূর করছে। ব্যবহারিক বৈষয়িক জীবন বৈচিত্র্যে উৎকর্ষে অসামান্য হওয়া সত্ত্বেও বিশ্বমানবের জীবনে ও আচরণে আচারে ঐক্য ও অভিন্নতা আসছে, প্রয়োজনে ও চাহিদায় গুণ-মান-মাপ-মাত্রার ভেদও ঘুচিয়ে দিচ্ছে।

আজ বিশ্বমানবের স্বস্তি-শান্তির লক্ষ্যেই, বৈশ্বিক চেতনার বিকাশ সাধন করে মানবিক গুণের অনুশীলনে আমাদের র‍্যাশন্যাল (Rational) বা যুক্তিবাদী হতে সযত্ন প্রয়াসী হওয়া আবশ্যিক ও জরুরী। দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞানের ও আবিষ্কার-উদ্ভাবনের এ বিস্ময়কর প্রসার কালে যদি যুক্তিবাদী ও প্রত্যক্ষবাদী হয়, তা হলেই কেবল মানবতার ও মানববাদের বাঞ্ছিত মাত্রার বিকাশ-বিস্তার সম্ভব ও সার্থক হবে।

বিশ্বাস-সংস্কারের আধুনিক নাম মগজধোলাই

'Nipping in the bud'-এর একটি আঞ্চলিক অনুবাদ-অনুকৃতিও রয়েছে 'কলিতে ডলি' দেয়া। প্রাণীদের একটা প্রজাতি হচ্ছে মানব প্রজাতি। তার আঙ্গিক, আবয়বিক ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আত্মশক্তির তথা হাতের ও মগজের দৌলত এ প্রজাতির ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ নিতান্ত সহজাতবৃত্তিতে নিবদ্ধ থাকে না। ফলে তার দৌরাত্ম্য বা পরাক্রমশক্তি অশেষ এবং বহু, বিবিধ ও বিচিত্র।

অন্যপ্রাণীরা সাধারণভাবে খাদ্য সংগ্রহ-সঞ্চয়ের ক্ষমতা রাখে না, পিঁপড়ে-মৌমাছি-উই প্রভৃতি ব্যতিক্রম মাত্র। মানুষ তার দু'হাতের বদৌলত শুধু সংগ্রহ-সঞ্চয় নয়, উৎপাদন-নির্মাণও করতে পারে, পারে অন্য মানুষের সঙ্গে যৌথভাবে সৃষ্টি করতে, কর্ষণ করতে। মানুষ অন্য মানুষের সহযোগিতায় পারে না হেন কর্ম বা চিন্তা নেই। তার হাত, যৌথকর্মে আগ্রহ এবং মগজের উৎকর্ষ তাকে আজ জল-স্থল-আকাশের মালিক ও নিয়ন্ত্রক করে তুলছে। কাজেই দেহে-প্রাণে-মনে-মননে ভোগ-উপভোগলিপ্সায় প্রবল, অনন্য, অসামান্য মানুষকে যৌথজীবনে সম-সহস্বার্থে সংযত, সহিষ্ণু, তুষ্ট, তৃপ্ত হতে, প্রাপ্তিলোভ সীমিত রাখতে, কাঙ্ক্ষা অপূর্তি সহ্য করত, প্রত্যাশার অপূর্ণতা ভুলে থাকতে তাকে বিস্ময়-কল্পনা-ভয়-ভক্তি-ভরসা-আত্মা-অমরতা-পাপ-পুণ্য পুরস্কার-তিরস্কার, শাস্তির যন্ত্রণা, শান্তির সুখ প্রভৃতি রূপ ধারণার আফিম প্রয়োগ করে তাকে যৌথজীবনে সহযোগিতায় সহাবস্থানে সম্মত রাখতে হয়েছে। এ আফিম হচ্ছে ভূত-ভগবান-দৈত্য-দানু, দেবতা, উপ ও অপদেবতা, প্রেত-পিশাচ-জীন-পরী-ড্রাগন-অরাকল (Oracle) কর্মফল নিয়তি প্রভৃতি দৃশ্য-অদৃশ্য অরি-মিত্র শক্তির ও শাস্ত্রের আশৈব-বাল্যে পরিবার-প্রতিবেশ সূত্রে পাওয়া ধারণা যাদের প্রতিরোধ-প্রতিকার-প্রতিষেধকও রয়েছে। তুকতাক, ঝাড়ফুঁক, বাণ-উচ্চাটন, মন্ত্র-মাদুলী, তাবিজ-কবচ-এ সবগুলোর সামাজিক, সামগ্রিক এবং সামুহিক নাম হচ্ছে বিশ্বাস-সংস্কার, যা আসমানে-জমিনে বিস্তৃত, স্রষ্টায়-সৃষ্টিতে সম্পৃক্ত গ্রহ-নক্ষত্র তিথি ক্ষণ-লগ্ন রাশিচক্র বিজড়িত ও নিয়ন্ত্রিত। এর সর্বজনমান্য পবিত্র ও অবিসম্বাদিত নাম হল শাস্ত্র, যার রূপায়ণ হয় পালা-পার্বণে, প্রাত্যহিক চর্যায়, ব্যক্তিক ও পারিবারিক আচারে ও আচরণে, চিন্তায় ও কর্মে।

বাবরী মসজিদ-রামমন্দির লড়াই তেমনি এক মগজধোলাইজাত পবর্তপ্রমাণ ধর্মীয় অধিকারের ও সাম্প্রদায়িক মর্যাদার প্রায় অসমান রক্তক্ষরণ প্রাণহরা সমস্যা-সঙ্কট সৃষ্টি করেছে। এতে কেবল ১৮৫৬-৫৮ সনে বোনা ভেদনীতির বীজই নেই, রয়েছে রামায়ণ-মহাভারতের দূরদর্শনে প্রদর্শিত নাট্যরূপরে প্রেরণা ও গৌরব-গর্ব-ঐতিহ্য চেতনাও। এর আধুনিক বৈজ্ঞানিক, রাজনীতিক, দার্শনিক, মনোবিজ্ঞানসম্মত সামাজিক-সংস্কৃতিক-সাহিত্যিক-শৈল্পিক নাম হচ্ছে মগজধোলাই, ঐহিক বা ইহজাগতিক নানা উদ্দেশ্যে ও প্রয়োজনে মগজ ধোলাইয়ের পাল্টা ব্যবস্থা থাকে, কিন্তু ইহপরলোকে, আসমানে-জমিনে প্রসারিত ভূত-ভগবান-প্রেত-পিশাচ-জীন-পরী-নিয়তি-কর্মফল-আত্মা-অমরতা-পাপ-পুণ্য সম্পৃক্ত আফিমের অবিমোচ্য নেশা, বিশ্বাস-সংস্কার বিমোচন-বিলুপ্তির কোন বিকল্প ব্যবস্থা নেই। ক্ষতিভীরু প্রাপ্তিলিপ্সু মানুষ কখনো নিরীশ্বর নাস্তিক হবে না, হবে না সেকারণেই উদার উদাসীন সহিষ্ণু। কাজেই মানুষের পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক সাংস্কৃতিক জীবন কখনো 'ন্যায্যতা' যথাস্থান পাবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের জীবনে সর্বপ্রকার অসঙ্গতির কারণ

আমাদের মন্‌টা দেশী, বন্দী ও বন্ধ্যা, কিন্তু কালটা প্রতীচী নিয়ন্ত্রিত। আমরা শৈশবে বাল্যে, শাস্ত্রিক পারিবারিক সামাজিক প্রাতিবেশিক বিশ্বাস-সংস্কার আচার-আচরণ পালা-পার্বণ আত্মী করে গড়ে উঠি। আমাদের মন-মনন-জ্ঞান যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেক-বিবেচনা প্রথা নিয়ন্ত্রিত হয়। এ লব্ধ বিশ্বাস-সংস্কারে এসব আমাদের পরম্পরা বা ঐতিহ্যসূত্রে পাওয়া। কাজেই আমাদের মন মত পথ, প্রথাপদ্ধতি, রীতিরেওয়াজ, নীতিনিয়ম স্বঘরে স্বদেশে স্বসমাজে ও স্বশাস্ত্রে পাওয়া। আমাদের দেহ-প্রাণ-মণ-মনন-নিবাস আমাদের নিজেদের বটে, কিন্তু কালটা আমাদের আয়ত্তে নয়, কালটা য়ুরোপ-আমেরিকা সৃষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত। কালের প্রভাবও তাই আমরা এড়িয়ে চলতে পারিনে। কিন্তু আমার-আমাদের মন-মননের ভাব-চিন্তার সঙ্গে তা সমন্বিত করতেও পারিনে, কেননা তা আমাদের আত্মস্থ হয় না, আত্মীকরণের চেষ্টাও নেই আমাদের। এ যেন আমাদের অঙ্গের আবরণ-আভরণ হয়ে থাকে, অন্তরের সম্পদ হয়ে সঞ্চয় হয়ে ওঠে না। তাই আমরা মনের মানুষ হই, ধনের মানুষ হই, এমনকি বিদ্যার মানুষও হই, পদাধিকারে কিংবা ধনবলে খ্যাতি-ক্ষমতার মানুষও হই, হই না কেবল গুণের মানুষ। বাঞ্ছিত গুণের মানের মাপের ও মাত্রার মানুষ হই না মনুষ্যত্বের তথা মানবতার বা মানবিকগুণের অনুশীলনের ঔদাসীন্যে কিংবা অভাবে। আমাদের মনে-মানসিকতায় সমকালীনতা নেই। আমরা কূর্মের মতো স্বদেহে, স্বদেশে স্বশাস্ত্রে বদ্ধ, বন্দী অর্থাৎ আমরা অন্তরে গ্রহণবিমুখ রক্ষণশীল। আমাদের সব আছে, দেশ আছে, রাষ্ট্র আছে, দেশভরা মানুষ নামের মানবপ্রজাতির অবয়বে প্রকৃতি-প্রবৃত্তিচালিত নাগরিকও আছে। নেই কেবল পরার্থে বাঁচার দীক্ষা-পাওয়া জনসেবী দেশপ্রেমী বাঞ্ছিত সংখ্যার লোক। আমাদের দুর্দশা কিছুতেই ঘোচে না, আমাদের প্রত্যাশা কখনো পূর্ণ হবে না।

আবার বলি দেশটা আমাদের, রাষ্ট্র ও সরকার আমাদের কিন্তু বিদ্যা-বিজ্ঞান-কৌশল-প্রকৌশল-প্রযুক্তি প্রয়োজনে প্রতীচ্য থেকে আমদানীকৃত। ব্যবহারিক বৈষয়িক জীবনে আমরা আক্ষরিকভাবে একবিশেষ প্রাণীর মতোই নিষ্ঠ ও সাগ্রহী অনুকারক, অনুসারক কিন্তু মানসিকভাবে যে জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-মন-মত-মনন-জীবনচেতনা ও জগৎভাবনা প্রতীচ্য মানুষকে আবিষ্কারক উদ্ভাবক সৃষ্টিশীল ভাস্কর-স্থপতি-শিল্পী-চিত্রী-সাহিত্যিক, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, প্রাণীজগৎ মনস্ক, বহুজনসুখবাদী ও বহুজনসেবাবাদী, জগতের কল্যাণকামী করেছে, প্রাণী নির্বিশেষের কল্যাণে বিভিন্ন শাখার বিচিত্র বিষয়ে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে উদ্ভাবনে, রোগের প্রতিকার লক্ষ্যে প্রতিষেধক সন্ধানে অনুপ্রাণিত করেছে, সে-কালে বাস করেও আমরা মানসিক জীবনে হাজার হাজার বছরের পুরোনো কল্পনার বিশ্বাসের সংস্কারের নীতিরীতির বন্ধনে ও আনুগত্যে তৃপ্ত, তুষ্ট এবং নিশ্চিত। অথচ এসব শাস্ত্রিক, নৈতিক, পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বিশ্বাস-সংস্কার-ভাবচিন্তা-আচরণ আমাদের সংযম, সহিষ্ণুতা, আদর্শনিষ্ঠা, নীতিপরায়ণতা, মানবতা বা মানবিকগুণের অনুশীলন প্রবণতা, পরার্থপরতা, কৃপা-করুণা-দয়া-দাক্ষিণ্য-ন্যায়নিষ্ঠা-পরপ্রীতি প্রভৃতি কিছুই শেখায় না, প্রভাবিত করে না আমাদের চরিত্র বা জীবনাচার এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হৃদয়ও পরার্থে কুসুমের মতো ফোটে না, প্রীতিও নির্বিশেষ মানবমুখী হয়ে সেবায় সাহায্যে বিস্তৃত হয় না। অতএব, আমাদের প্রাত্যহিক ব্যবহারিক বৈষয়িক বাণিজ্যিক জীবন বাহ্যত নিয়ন্ত্রণ করে প্রতীচ্য প্রভাবিত কাল বা যন্ত্রযুগ ও যন্ত্রজগৎ। আর আমাদের মন-মানস নিয়ন্ত্রণ করে শৈশবে বাল্যে ধোলাই করা বন্দী ও বন্ধ্যা মন-মনন ও মগজ। আমরা তাই অঙ্গে অন্তরে, জীবনযাত্রায় ও জীবনানুভবে কোন সঙ্কট-সমস্যা থেকে মুক্ত হতে পারছিনে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাষ্ট্রিক, প্রাশাসনিক, আর্থিক, নৈতিক ব্যবসায়ীক-বাণিজ্যিক কিংবা উৎপাদন-নির্মাণ ক্ষেত্রে। সর্বত্র ঠকাঠকির, ঠকাঠকির, ছল-চাতুরীর, প্রতারণা-প্রবঞ্চনার, ভেজাল-ভণ্ডামির ও কাড়া-মারা-হানার খেলা। অসদুপায়ে অর্জিত অর্থে ধনীরাই এদেশে মানী মান্য সাংসদ, মন্ত্রী, নেতা, রাজনীতিক। যুগটা ধন বা জন বলে অর্জিত মানের ও ক্ষমতা-খ্যাতির। ক্ষমতা আসে পদাধিকারে, অর্থবলে, মান-মান্যতার ভিত্তিও এ-ই। দুটোই কৃত্রিম, ক্ষণপ্রভ, পদ গেলে মান-মান্যতাও যায়, তখন কুকুরেও গা ঘেঁষে না। ধনেরও উঠতি ঘাটতি পড়তি থাকে, ধন গেলে মানও হাওয়া হয়ে যায়। কিন্তু গুণই হচ্ছে নিখাদ, নিখুঁত, স্থায়ী এবং আবশ্যিক ও জরুরী প্রয়োজনের সম্পদ ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক এবং নৈতক, মানসিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে। কারণ এ-ই একমাত্র মানুষের মনুষ্যত্ব বৃদ্ধির ও প্রয়োগের সহায়ক। গুণ অঙ্গে ও অন্তরে, ব্যবহারিক বৈষয়িক বাণিজ্যিক, আর্থিক নৈতিক মানসিক, বৌদ্ধিক, যৌক্তিক জীবনে এবং জাতীয় ও রাষ্ট্রিয় জীবনে ঋদ্ধি আনে। অতএব কালের সঙ্গে তথা এ যন্ত্র নিয়ন্ত্রিত যুগের ও জগতের মানসিক সম্পদে ঋদ্ধ য়ুরোপীয় মনীষার সঙ্গে আমাদের বাহ্য জীবনের যেমন, তেমনি মানসিক অনুশীলনে সমন্বয় সাধন করা আবশ্যিক ও জরুরী। নইলে আমাদের অনুকৃত রাষ্ট্রিক গণতন্ত্র, জনগণতন্ত্র, শাসন-প্রশাসন, বাণিজ্য, উৎপাদন, নির্মাণ সব কালান্তরেও বিকৃতিতে প্রতারণায় প্রবঞ্চনায় বিড়ম্বিত থাকবে এখন যেমন রয়েছে। প্রত্যাশিত শৃঙ্খলা, প্রশাসন, স্বস্তি, শান্তি, আর্থিক উন্নতি, কেবল স্বপ্ন, সাধ আর অপূর্ত কাঙ্ক্ষা হয়েই থাকে। আমাদের উন্নতির জন্যে চাই সমকাল প্রভাবিত ও কালসমন্বিত মন, মত ও পথ-পদ্ধতি। আমাদের খোলামনে প্রতীচ্যের মানসিক সম্পদ গ্রহণ বরণ করতেই হবে। আমাদের উন্নতির বাধা আবাল্যের শাস্ত্রিক সামাজিক আচারিক মগজধোলাইয়ের প্রভাবে আমাদের আচ্ছন্নতা। এর থেকে মুক্ত হতেই হবে। তা হলেই আমাদের কথায়-কাজে, বুকে-মুখে, অঙ্গে-অন্তরে সঙ্গতি-সমন্বয়, সামঞ্জস্য আসবে। ভেতরে বাহির হবে সহযোগী ও সমমর্মী।

পশুহত্যায় ত্যাগ-মহিমা

প্রাণী মাত্রেরই মধ্যে গুপ্ত বা সুপ্তভাবে হিংস্রতা থাকেই। ক্ষোভ, ক্রোধ, লোভ ও কাম প্রভৃতির বশে প্রাণী আকস্মিকভাবেও হিংস্র ও প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়। আবার হিংস্রতা কোন কোন প্রাণীর জীবন্ত প্রাণী-খাদ্য সংগ্রহের প্রয়োজনে স্বভাব হয়ে দাঁড়ায় প্রায় জন্ম মুহূর্ত থেকেই। সমাজবদ্ধ আপাত পারিবারিক সামাজিক রাষ্ট্রিক নীতিনিয়ম রীতিরেওয়াজ-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানা মানুষের মধ্যেই বলতে গেলে হিংস্রতা মাপে মাত্রায় বেশি। অন্যপ্রাণী থেকে কোন রকমে পালাতে পারলে তার ক্ষোভ ক্রোধ লোভ থেকে মুক্তি মেলে, কিন্তু মানুষ এমন হিংস্র ও প্রতিহিংসা-প্রতিশোধ পরায়ণ যে সে দুশমনি মনে মনে পুষে রাখে, সুযোগ পেলেই [এমনকি সুযোগের জন্যে ধীর স্থিরভাবে প্রতীক্ষা করে] হিংস্র প্রতিশোধলিপ্সু হয়ে ওঠে। অন্যপ্রাণীরা সাধারণভাবে খাদ্য হিসেবেই প্রাণী হত্যা করে। কৃচিৎ বাঘে-মোষে, সাপে-নেউলে দ্বেষ-দ্বন্দ্বের, সংঘর্ষ-সংঘাতেরও সম্পর্ক মেলে পশু-পাখি জগতে। মানুষ কিন্তু স্বভাবেই হিংসা ও হিংস্রতা প্রবণ। এ কারণেই মানুষ ষাঁড়ের, মোষের, বাজের, মোরগের, পায়রার প্রাণ বিধ্বংসী লড়াই বাধিয়ে আমোদ আনন্দ পায়। রোমে স্পেনে বাঘ-সিংহ-ষাঁড়ের সঙ্গে মানুষের লড়াই বাধিয়ে এক কালের লোকে ক্রীড়াপ্রতিযোগিতা দর্শনের নিষ্ঠুর বর্বর হিংস্র আমোদ আনন্দ উল্লাস অনুভব করত। আজো মানুষ পাখি, পশু ও মাছ শিকারকে বিলাস ব্যসন বলে জানে ও মানে সগর্বে ও সোল্লাসে। মাছকে বড়শিতে গেঁথে-সে মাছকে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াইয়ে নিয়োগ করে খেলানোর খেলার আনন্দ পায়। শুনেছি বিড়ালও নাকি এমনি করে গ্রাস করার আগে ইঁদুরকে নিয়ে ছেড়ে-ধরার নিষ্ঠুর খেলায় মাতে। উড়ন্ত, কিংবা বৃক্ষ-শাখায় নিশ্চিন্তে বিশ্রামরত পাখির প্রতি মৃত্যুবাণ হানায় বা গুলি করায় মানুষের সেকি বিজয়ের ও সাফল্যের উল্লাস! এ হনন-উল্লাস যে অমানবিক তা আজো মানুষের বোধগত নয়। যদিও আড়াই হাজার বছর আগে গৌতম-দেবদত্ত কিস্সায় তীরবিদ্ধ হংসের ঘাতক-ত্রাতা তত্ত্বের একটা মহৎ ব্যাখ্যা মেলে। আজো মানুষ অরণ্যে মৃগয়ায় যায় বাঘ সিংহ ও নির্বিরোধ সরলপ্রাণ হরিণ শিকারের জন্যে। মানুষের এ জিঘাংসাবৃত্তির নিবৃত্তি নেই। আজো সৈন্যরা শত্রুরূপে নরহত্যায় কৃতিত্ব গৌরবে গর্বিত, হনন কৌশলে নৈপুণ্য অর্জনে সযত্ন প্রয়াসী এবং নৈপুণ্যের জন্যে পুরস্কৃত ও প্রশংসিত। এ মুহূর্তেও নরহত্যার জন্যে নতুন নতুন বিচিত্র বিস্ময়কর শক্তির, কৌশলের ও প্রয়োগসফল উৎকৃষ্ট অস্ত্র নির্মাণে বহু বহু ব্যক্তি দেহ-প্রাণ-মন-মনন একান্ত অঙ্গীকারে নিযুক্ত রেখেছে। মানুষকে বঞ্চিত করে অর্থ ব্যয় করছে সরকার। আমার সন্তানের বিয়েতে সামাজিকতা রক্ষার দায়ে পড়ে আমার অর্জিত অর্থে বহু বহু মোরগ মুরগী ও খাসী হত্যা করিয়েছি। সে আফসোস আজো মন থেকে মুছতে পারিনি। হত্যাকাণ্ডে আজো আমি অনুপস্থিত থাকি মাত্র। মনকে আজো বুঝিয়ে রাজী করাতে পারিনি।

আজ কোরবানীর দিন। পশু হত্যায় ত্যাগের মহিমা দেখে শাস্ত্রে বিশ্বাসীরা। এ বছর (১৯৯১ সন) অবশ্য [আগেও দু'একবার ভিন্নপন্থায় আবেদন জানিয়েছিলাম] দৈনিক কাগজে বিবৃতি দিয়ে 'ভাষা সমিতি' ও 'স্বদেশ চিন্তা সঙ্ঘের' পক্ষে কোরবানী যে ওয়াজেব, ফরজ নয় এবং ঝড়ে ও জলোচ্ছ্বাসে লক্ষ লক্ষ মানুষ পশু পাখি কীট পতঙ্গ মরার পরে এবছর হজের জন্যে বরাদ্দ অর্থ এবং কোরবানীর পশু বা তার মূল্য ঝড়বিধ্বস্ত এলাকার মানুষকে দান করলে যে হজের ও কোরবানীর সওয়াব মিলবে তা জানাবার বোঝাবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু কেউ কান দেয়নি। তবে আমাদের অন্য এক প্রকারের ফল মিলেছে। সংবাদপত্রে ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় হজের ও কোরবানীর টাকা দুস্থজনদের মধ্যে বিলিয়ে দেয়া যে ধর্মীয় দায়িত্বের ও কর্তব্যের অন্তর্গত, তা কয়েকটি চিঠিতে ও নিবন্ধে সমর্থিত হয়েছে। কোন উত্তেজিত পাঠক প্রতিবাদী হয়নি। কোরবানী ধনীর জন্যে ফরজ। গরীবের জন্যে দুটোই মাফ। ওয়াজেব তরক করা যায় তথা অবশ্য পালনীয় নয়। পাছে লোকে কোরবানীর পশু হত্যা আবশ্যিক ও জরুরী মনে করে এ আশঙ্কায় হযরত আবু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বকর ও হযরত উমর নাকি কোন কোন বছর কোরবানী দানে তথা পশুহত্যায় বিরত থাকেন। কোন ওক্তের নামাজই বাদ দেয়া যায় না কোন অজুহাতেই, চেতনা থাকলেই মুমূর্ষু ব্যক্তিরও মনে মনে নামাজ পড়তে হয়। রোজা-নামাজে সারা বছর উদাসীন ব্যক্তিও কোরবানীতে উৎসাহী। নামাজে রয়েছে দিনে সতেরো ফরজ। আর রোজায় রয়েছে বছরে ত্রিশ ফরজ। আর পশু বলি তো ওয়াজেব মাত্র। যা আল্লাহ প্রাসঙ্গিক তবে একবার বলেছেন মাত্র। আজ কোরবানী কোটি কোটি পশু-গরু-ছাগল-ভেড়া-উট-দুম্বা হত্যা-উৎসব। এ নাকি ত্যাগের প্রদর্শনী, সাক্ষ্য ও প্রমাণ। বাজারে কেনা পশু কারো জ্ঞাতি গোষ্ঠী স্বজন আত্মীয় কুটুম্ব নয় যে, এর প্রাণহরণে হননে কারো ক্ষতিবোধ জাগবে, জাগবে হাহাকার। অর্থ ত্যাগই ইহজাগতিক জীবনে সব চেয়ে বড় ত্যাগ, কেননা ধনসম্পদ নির্ভর জীবনে অর্থই সার্বক্ষণিক সম্বল, বেঁচে থাকার ভিত বা উৎস। অথচ এদেশের জাতীয় কবি বলেন '[কোরবানী] হত্যা নয় আজ, সত্যগ্রহ [সত্যাগ্রহ] শক্তির উদ্বোধন।' ভিন্ন রুচির্হি লোকাঃ। আড়াই হাজার বছর আগে মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধ অহিংসা প্রচারে প্রাণীহত্যা নিবারণে প্রয়াসী ছিলেন, 'পানাতিপাতা বেরমনি শিক্ষাপদম' [বুদ্ধ]।

আবার প্রাণের দাম যে পার্থিব অর্থমূল্যে নির্ধারিত হয়, তা-ও কোরবানীর শর্তে সুপ্রকট। স্বল্পদামের ছাগল ভেড়া দুম্বা কেবল একজনের নামেই হত্যা করা চলে; আর গরু উট বেশি দামের বলে সাতজনের নামে হত্যা করা হয়। অতএব, সহজেই বোঝা যায় ত্যাগের বাস্তব তাৎপর্য হচ্ছে অর্থ ব্যয়ের ইচ্ছা বা সামর্থ। তা হলে একটা ছাগল-ভেড়া-দুম্বা-গরু-উটের অর্থমূল্য বিলিয়ে দিলেই কোরবানীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, সওয়াব মেলে, অথচ কোটি কোটি প্রাণীর প্রাণ বাঁচে। এ বিষয়টি জ্ঞান বুদ্ধি যুক্তি দিয়ে মুমীনেরা ভেবে দেখতে পারেন। কারণ কোরবানীর পশুর রক্ত মাংস আল্লাহর কাছে পৌছে না। তাঁর প্রতি আনুগত্য বশে তাঁর হুকুমে ত্যাগ স্বীকারটাই তিনি দেখেন এবং পুরস্কৃত করেন।

প্রকৃত জ্ঞান অতীতে নেই, আছে ভবিষ্যতের গর্ভে

জ্ঞান যে অতীতের সঞ্চয় নয়, ক্ষণজীবী বর্তমানের ও ভবিষ্যতের গর্ভ থেকে আবিষ্কৃতব্য বিষয়, তা পরিপূর্ণভাবে এবং যথাযথ তাৎপর্যে জানার, বোঝার ও মানার সময় এসেছে।

অতীতে লব্ধ ও সঞ্চিত জ্ঞানমাত্রই যে অপূর্ণ, নিখাদ-নিখুঁত নয়, তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। অভিজ্ঞতালব্ধ পরীক্ষিত জ্ঞানেও যে ত্রুটি ও অপূর্ণতা থেকে যায়, তা নতুন নতুন গবেষণায় প্রমাণিত হচ্ছে। যা সাধ্যাতীত ছিল, তা সহজ ও সরল নয় কেবল, তুচ্ছ বলেও প্রমাণিত হয়েছে। লোকে জানত যক্ষা, সন্নিপাত, কলেরা, বসন্ত প্রভৃতির চিকিৎসা সুকঠিন এবং বৃথা ও ব্যর্থই হত, কৃচিৎ কখনো সাফল্য সম্ভব হয়েছে, রোগী নিরাময় হয়েছে। তা কেন হয়েছে সে বিষয়েও কেই নিশ্চিত ছিল না, একি দাওয়া না দোয়া, তা ছিল বুঝে ওঠা ভার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমনি করে আদিম ও আদি মানুষের, বুনো-বর্বর মানুষের, স্বাতন্ত্র্যে ও বিচ্ছিন্নতার ব্যবধানে নিবসিত গোত্রীয় ও গোষ্ঠী জীবনে জ্ঞান, অভিজ্ঞতা শুধু যে স্বল্প ছিল তা নয়, ভুল-ত্রুটিপূর্ণও ছিল।

কাজেই অতীতকাল মাত্রই মানুষের জ্ঞান-অভিজ্ঞতার, আবিষ্কার-উদ্ভাবনের, চিন্তা-চেতনার, মনন-মনীষার, বুদ্ধি-যুক্তির অসম্পূর্ণতার, বিবেক-বিবেচনার অবিকাশের, বুদ্ধি-প্রবৃত্তির অনুৎকর্ষের কাল।

মানুষও আবর্তন-বিবর্তন ধারায় সুমুখ গতিতেই এগিয়ে চলছে। প্রাণী মাত্রেরই গতি সম্মুখ দিকে। অতীত হচ্ছে ফেলে আসা কাল, জীবন। বিশ্বাস-সংস্কার তাই বয়ে চলা জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তিসঙ্গত নয়। অতীত কখনো ভবিষ্যতের পুঁজি-পাথেয়, সম্পদ-সম্বল হতে পারে না যৌক্তিক বৌদ্ধিক বিচারে। প্রাণী দেহের তুলনা দিয়েও স্থূলভাবে অতীতপ্রীতি বর্জন করার পরামর্শ দেয়া যায়। প্রাণীমাত্রেরই পা, চোখ, হাত কেবল সম্মুখে এগিয়ে যাওয়ার জন্যেই তৈরী; আমাদেরও পায়ের পাতা, চোখ, হাত কেবল সামনে চলার, দেখার ও প্রসারিত করার জন্যেই দেহলগ্ন।

রোজ মানুষের পূর্বলব্ধ কোন কোন জ্ঞান-অভিজ্ঞতা পূর্ণতা পাচ্ছে, আবার কোন কোন জ্ঞান-অভিজ্ঞতা ভুল প্রমাণিত হচ্ছে। বিস্ময়, কল্পনা, অনুমানজাত সংস্কার ও বিশ্বাস, শাস্ত্র, মন্ত্র, তাবিজ, কবচ, তুকতাক, ঝাড়-ফুঁক, বাণ-উচ্চাটান, প্রেত-পিশাচ, রাক্ষস-খোক্ষস, জীন-পরী, ড্রাগন-দৈত্য-দানু যেমন মিথ্যা হয়ে যাচ্ছে, গেছে, যাবে [যেমন ওলা-শীতলা] তেমনি মানুষ নতুন নতুন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করছে, সেগুলোও নিখাদ-নিখুঁত কিনা ভাবী কালের জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধির প্রয়োগে যাচাই বাছাই হতে থাকবে।

এই আদিম ও আদিকালের লব্ধ সাধ্যত বিস্ময়, কল্পনা-অনুমানকে যুক্তিসিদ্ধ সত্য ও তথ্য বলে মেনে নিয়ে মানুষ ভূত-ভগবান প্রভৃতি অসংখ্য অদৃশ্য অনুভূত ও উপলব্ধি অরি-মিত্র শক্তির ভয়-ভক্তি-ভরসার প্রতীক ও প্রতিভূ রূপে পূজা-উপাসনার ব্যবস্থা করেছে। গৌত্রিক, গোষ্ঠীক, আঞ্চলিক, দৈশিক, জাতিক স্বতন্ত্রসমাজ গড়ে উঠেছে এভাবেই। এবং এ মতের বিশ্বাস-সংস্কারের, আচার-আচরণের, পালা-পার্বণের পার্থক্য এদের মধ্যে বিচ্ছেদের, বিচ্ছিন্নতার ব্যবধানে অপ্রীতির, পারস্পরিক দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-ঘৃণা-হিংসা-ঈর্ষা-অবজ্ঞার কারণ হয়ে রয়েছে। সবাই স্বশাস্ত্রকে, স্ববিশ্বাস-সংস্কারকে ও স্বআচার-পার্বণকে সত্য ও ফলপ্রসূ বলে জানে ও মানে। এ ক্ষেত্রে এদের জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেক-বিবেচনা লোপ পায়। আজো এভাবেই চলছে।

এর থেকে মুক্তি পেতে হলে আমাদের বুদ্ধি ও যুক্তি প্রয়োগে জানতে, বুঝতে ও মানতে হবে যে পূর্ণ জ্ঞান অতীতে নেই, রয়েছে ভবিষ্যতে আবিষ্কারের এবং যাচাইয়ের অপেক্ষায়। মানুষের জ্ঞান মনন-মনীষা প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে, উৎকর্ষলাভ করছে। মানুষের অতীত ব্যক্তিজীবনে যেমন, সামাজিক, শাস্ত্রিক, বিশ্বাস-সংস্কারের জীবনেও তেমনি অজ্ঞতার, অভিজ্ঞতার, অপূর্ণতার, স্থূল মনের, অস্পষ্ট অনুভবের, ভুল উপলব্ধির এবং মোটা বুদ্ধির ও ক্ষীণ মননের কাল। তাকে গুরুত্ব দিয়ে ধরে থাকা, তাকে সত্য ও তথ্য বলে মেনে চলা জ্ঞান-মনন-মনীষা বিরুদ্ধ কাজ। সত্য অতীতে নেই, রয়েছে ভবিষ্যতের গর্ভে, মননে-মনীষায় আবিষ্কারে-উপলব্ধিতে তা ক্রমশ প্রকাশ্য থাকবে। এ কখনো শেষ বা সমাপ্ত হবে না– জ্ঞান নদীর মতো প্রবাহমান ও ক্রমপ্রসারমান। এ বোধ জাগলে বোধ হয়, শাস্ত্রিক-সাম্প্রদায়িক-সংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য নিয়ে মানুষে মানুষে বিচ্ছিন্নতার ব্যবধান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘুচবে, কাঁটা তারের খাঁচাবদ্ধ পাখির মতো সম্প্রদায়গত বন্ধন ও ব্যবধান, দ্বেষ ও দ্বন্দ্ব মিথ্যা হয়ে যাবে। মানুষ নির্বিশেষের মিলন-ময়দান অবাধ ও উন্মুক্ত হবে সবার জন্যে, বৈশ্বিক মানববাদে আস্থা হবে দৃঢ়। প্রকৃত জ্ঞান-বিজ্ঞান-যুক্তি মানুষকে প্রতারিত, বিভ্রান্ত, বিকৃতবুদ্ধি করে না। তাই আমাদের আবার প্রত্যক্ষবাদী হতে হবে মনুষ্যত্ব সম্পন্ন মানুষ হবার জন্যেই।

বাঁচার জন্যেই স্বাধীন চিন্তা : নতুন মত ও পথ প্রয়োজন

আমরা সদ দেশের সব খবর রাখি না, জানি না বটে, কিন্তু আজকের পৃথিবীর সব রাষ্ট্রের মানুষই জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে গভীর ও ব্যাপক সঙ্কট-সমস্যার মধ্যে রয়েছে। এসব সঙ্কটের মধ্যে আর্থিক, নৈতিক ও মানসিক সঙ্কট-সমস্যাই মুখ্য। বলা বাহুল্য সবটাই অর্থ-সম্পদের অসমবণ্টন সম্পৃক্ত। একালে মানুষের সম্পদপ্রতীক হয়েছে কাগুজে নোট, ব্যাঙ্কের চেক। এ যার প্রচুর ও পর্যাপ্ত রয়েছে, সে নিশ্চিন্ত জীবন নয় কেবল, আনন্দসুন্দর বিলাস-প্রমোদমধুর জীবন ভোগ-উপভোগ করে। যে নিঃস্ব, যে প্রয়োজনীয় পরিমাণের সম্পদ, চাহিদা পূরণের জন্য জরুরী সংখ্যার অর্থ যোগাড় করতে পারে না, যার খাওয়া-পরা নিয়মিত চলে না, যে নিজের বাঁচার এবং মা-বাবা-ভাই-বোন-স্ত্রী-সন্তানদের বাঁচানোর উপায় খুঁজে পায় না, তার নৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, মানবিক কোন নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ মেনে চলা অসম্ভব হয়ে ওঠে। সে তখন কেবল প্রাণী হয়ে ওঠে, তার ভাব-চিন্তা-কর্ম আচরণে কাড়া-মারা-হানাই মুখ্য হয়ে ওঠে। এই যে সে মনুষ্যত্ব বর্জন করতে বাধ্য হল, তার জন্যে দায়ী কে? একে মানবিক গুণের অনুশীলনে, গ্রহণে মানুষ হয়ে ওঠার জন্যে সাহায্য সহায়তা করার তথা অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করার দায়িত্ব কার– সরকারের না সমাজের?

আঁধা-কানা-খোঁড়া-নির্বোধ-ক্ষীণদেহী-হীনবুদ্ধি মানুষের অনাহারে মৃত্যু রোধ লক্ষ্যে হাজার হাজার বছর ধরে নবী-অবতার, সাধু-সন্ত, গুণী-জ্ঞানী-বুদ্ধি-যুক্তি-বিবেকবান মানুষ দানে-দয়ায় দাক্ষিণ্যে-কৃপায়-করুণায় বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন, একে আবশ্যিক, জরুরী ও বিত্তবানের পক্ষে বাধ্যতামূলক দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে নির্দেশ করেছেন। কিন্তু এতে কাজ হয়নি, কারণ শুনে শুনে এ আবেদন ও নির্দেশ তাৎপর্যরিক্ত পার্বণিক প্রথায় পর্যবসিত হয়েছিল, হৃদয়গত কিংবা বিবেকসম্মত হয়ে ওঠেনি কখনো, তাই ঝড়-ঝঞ্ঝা-খরা-বন্যা-মারীর সময়ে মানুষ দুস্থ মানবের প্রাণ বাঁচানোর জন্যে সামাজিকভাবে এগিয়ে আসেনি, ব্যক্তিগতভাবে কেউ কেউ বিচলিত হয়ে সাহায্যের হাত প্রসারিত করেছে মাত্র। আজো মানুষ তেমনি হৃদয়হীন বিবেকরিক্ত রয়েছে। দুস্থ মানুষের জন্যে তাদের কোন কৃপা করুণা-দয়া-দান-দাক্ষিণ্য মেলে না। এ প্রাণীপ্রায় মানবপ্রজাতিকে নাচ-গান-নাটক-খেলা-যাদু দেখিয়ে তাদের থেকে পয়সা আদায় করতে হয়। অতএব সমাজে আজো দরদী দায়িত্ব ও কর্তব্য সচেতন মানববাদী দুস্থমানবপ্রেমী ও সেবী ব্যক্তির সংখ্যা বলতে গেলে নগণ্যই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইতোমধ্যে জ্ঞান-অভিজ্ঞতার প্রসারে আবিষ্কারে-উদ্ভাবনে মানুষ যন্ত্রে, প্রকৌশলে, প্রযুক্তিতে, হাতিয়ারের বৈচিত্র্যে, সূক্ষ্মতায়, কার্যকারিতায়, গুণ-মান-মাপ-মাত্রার অসামান্যতায় আসমান-জমিন-সাগরের সব রহস্য কৌতূহলী জিজ্ঞাসু মানুষের কানে চোখে ধরিয়ে দিয়েছে। হেন রোগ নেই যা জ্ঞান-অভিজ্ঞতার আয়ত্তে আসেনি। ফলে রোগের প্রতিষেধকও আবিষ্কৃত-উদ্ভাবিত হয়েছে জিজ্ঞাসু ধৈর্যশীল অধ্যবসায়ী মানবদরদী উৎসর্গিতপ্রাণ গবেষকদের সাধনায়। ফলে অকাল মৃত্যুর পথ হয়েছে রুদ্ধ, কিন্তু জন্মহার হয়নি বাঞ্ছিত সংখ্যায় নিয়ন্ত্রিত। তাই জনসংখ্যা আকস্মিকভাবে এ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে গোটা পৃথিবীতে বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যতিক্রম এখানে আলোচ্য নয়। কাজেই অশন-বসন-নিবাস-নিদান-শিক্ষা-স্বাস্থ্য ব্যবস্থা প্রয়োজনীয় পরিমাণে গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া যন্ত্র-প্রকৌশল-প্রযুক্তি যে কেবল বিস্ময়করভাবে অসাধ্য সাধন করছে জীবনের সমাজের ও রাষ্ট্রের তাই নয়, আনুষঙ্গিক নানা অপ্রতিরোধ্য ক্ষতিও করে চলেছে মানুষের দেহ-প্রাণ-মনের ও মননের, জীবনযাত্রার পথ-পদ্ধতি পালটে দিয়ে।

আগে ঝড়-ঝঞ্ঝা-খরা-বন্যা-ভূচাল-ব্যাধি-মারী-খাদ্যাভাব জনসংখ্যা বৃদ্ধির পক্ষে অপ্রতিরোধ্য বাধা ছিল। তাই অকালে-অপমৃত্যু এড়িয়ে যারা বেঁচে থাকত তারা অজ্ঞতার, অনক্ষরতার, অসংস্কৃতির, অসুরুচির প্রভাবে এবং আকাঙ্ক্ষাহীনতার দরুণ নিতান্ত খালি গায়ে খালি পায়ে তুচ্ছ চাল-চুলো নিয়ে পেটের ভাত যোগাড় হলেই তুষ্ট ও তৃপ্ত জীবন যাপন করত এদেশে। লোকাচার-দেশাচারসম্মত পালা পার্বণই ছিল তাদের সাংবৎসরিক পালা-পার্বণিক আনন্দ-উৎসব ও ধর্ম কর্ম। নতুন চিন্তা-চেতনা-মনন-চিন্তন ছিল না, অন্তত তাদের নাচে-গানে গাথায়-যাত্রায়, কিস্স্যায়-কাহিনীতে তার কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই, তবে আড়ম্বরের, জাঁকজমকের, অরণ্য-পর্বত-সমুদ্র সম্বন্ধীয় আর কাম-প্রেম সম্পৃক্ত রোমান্স ও রোমান্টিক কল্পনা প্রশ্রয় পেত তাদের চিন্তা-চেতনায়।

ষোলশতক থেকে পাঁচশ বছর ধরে নিঃস্ব, নিরন্ন, দুস্থ মানুষকে কৃপায়-করুণায় দয়ায়-দাক্ষিণ্যে-দানে-ত্রাণে নয়, তাদের বাঁচার জন্মগত অধিকার স্বীকার করে তাদের এ জমির উপর আসমানের নিচে স্বাধিকারে স্ব ও সুপ্রতিষ্ঠ করার জন্যে টমাস মুর থেকে মার্কস-এঙ্গেলস-পেইন-লেনিন-মাও-সে-তুঙ প্রমুখ অনেক অনেক মনীষী চিন্তা-ভাবনা-প্রয়াস প্রযত্ন করে আসছেন, অবশেষে মার্কসবাদই সব সঙ্কট-সমস্যার সমাধান বলে মনে হয়েছিল দরদী মানববাদীদের কাছে। আজ কারো কারো সে আস্থায় চীর ধরেছে, কারো কারো বিশ্বাস এখনো দৃঢ় রয়েছে, কেননা এর চেয়ে নতুন ও উৎকৃষ্ট পন্থা-পদ্ধতি আজো উদ্ভাবিত হয়নি। দোষ মার্কসবাদের নয়, মার্কসবাদী শাসক-প্রশাসকদের ভুল-ভ্রান্তি-স্বার্থপরতার ও গোঁয়ার্তুমির। পুরোনো শাহ সামন্ত বুর্জোয়া পদ্ধতি মানবিক সমস্যার কোন সমাধান দিতে পারেনি, আজো পারে না। কাজেই মার্কসবাদ ছেড়ে পুরোনো কারায় ও খাঁচায় ফিরে যাওয়ার কোন বৌদ্ধিক-যৌক্তিক কারণ নেই।

এবার স্বদেশের, স্বজনের, স্বরাষ্ট্রের কথা বলি। আমাদের দারিদ্র্য আমাদের ঘরে সংসারে সমাজে-রাষ্ট্রে-কাজে-কর্মে ভাবে-চিন্তায় আচরণে শাসনে-প্রশাসনে ব্যবসায়-বাণিজ্যে, উৎপাদনে-নির্মাণে লগ্নিপুঁজি, বাণিজ্য পুঁজি ও শিল্পপুঁজি প্রয়োগে ভেজালে-চোরাচালানে জালে-জোচ্চুরিতে-প্রতারণায় প্রবঞ্চনায় অসততায়, শঠতায়, দুর্জনতায় দুষ্কৃতীতে সর্বক্ষণ প্ররোচিত প্রণোদিত করছে। আমরা টিকে রয়েছি বিদেশীর ঋণে-দানে-ত্রাণে-মদদে-পরামর্শে এবং অদৃশ্য হুকুম-হুমকি-হুংকার-হামলার আর শোষণের ও লুটের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিকার হয়ে। এ জন্যে আমাদের হ্রাস আছে, অবক্ষয় আছে, ঋদ্ধি নেই, নেই বৃদ্ধি। আমরা ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে একান্তই পরনির্ভরশীল। তাই নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-অভিজ্ঞতা-বিবেক-বিবেচনা, শক্তি-সাহস ও শ্রেয়োবোধ প্রয়োগে স্বাধীনভাবে দেশের আর্থিক ও নৈতিক, বাণিজ্যক ও শৈল্পিক উন্নতি করতে পারছি না, একপ্রকার হুকুম-হুমকিতে, আদেশ-নির্দেশে আমরা এক রকমের দাসত্বে ও আনুগত্যে রাষ্ট্রিক বা জাতীয় জীবন যাপন করি।

আমাদের এখন অনেক বিদ্বান ও বিত্তবান লোক রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা চিন্তায়-চেতনায়, মননে-চিন্তনে সমর্থ, জ্ঞান-অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধি-যুক্তি-বিবেক সম্পন্ন, যারা বুদ্ধিজীবী ও মনীষী তাঁদের উচিত এখন নিজেরা বাঁচার জন্যে, পরিবার-পরিজনদের বাঁচানোর জন্যে স্বাধীনভাবে চিন্তা করে বাঁচার নতুন পথ-পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্যে আন্তরিকভাবে প্রয়াস প্রযত্ন করা। আমাদের স্বনির্ভর ও স্বয়ম্ভর হয়ে বাঁচার জন্যে যে-কোন ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করে বাঁচার নতুন পথ, উপায় বা পদ্ধতি খুঁজে বের করতেই হবে। এ প্রয়াসে প্রাথমিক ব্যর্থতা এলেও পরিণামে অন্য দশ/পাঁচটি দেশের মতো আমরাও স্বয়ম্ভর জীবন যাপনের পথ-পদ্ধতি খুঁজে পাবই।

সঙ্কট সমস্যা মোচনের জন্যে চাই নতুন মত ও পথ

AMARBOI.COM

১. এ যন্ত্র-প্রকৌশল-প্রযুক্তি-টিভি-রেডিও-বিমান-বেতার-ফোনের যুগে ও জগতে আমাদের পূর্বেকার শাস্ত্রিক আচারিক বিশ্বাস-সংস্কার বর্জন করতে হবে। প্রাত্যহিক জীবনে যন্ত্রনির্ভরতার দরুণই আমাদের জীবনের চাহিদানুগ জীবনাচারে হতে হবে অভ্যস্ত।

২. বিজ্ঞান প্রসূত জ্ঞান-অভিজ্ঞতা-হাতিয়ার সুযোগ-সুবিধে-সৌকর্য আমাদের অশনে-বসনে- নিবাসে-নিদানে-শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে-আমোদে-আনন্দে, রোগের চিকিৎসায়, খাদ্যে, জীবনাচারে, আদব-কায়দায়, সৌজন্যে একটা বৈশ্বিক ঐক্য বা অভিন্নতা দ্রুত গড়ে উঠছে। উচ্চবিত্তের, উচ্চবিদ্যার মানুষের মধ্যে বটেই, এ খোলা আকাশের নিচে সর্বপ্রকারে বিচিত্র ব্যবহারযোগ্য যন্ত্রের বদৌলত একটা ব্যবহারিক বৈশ্বিক অভিন্নতা তো সর্বত্র পরিদৃশ্যমান তো হয়েইছে এমনকি মানস সংস্কৃতিও আর সর্বপ্রকার ক্রীড়ায়-আমোদে-সাহিত্যে-শিল্পে-স্থাপত্যে-ভাস্কর্যেও বৈশ্বিক ঐক্য ও অভিন্নতা দ্রুত বিস্তার লাভ করছে।

৩. এমনি অবস্থায় ও অবস্থানে মানুষ আজ দেহে-প্রাণে-মনে-মননে পরস্পর নিকট প্রতিবেশী হয়ে উঠছে যেন এক বাড়িরই ফ্লাটবাসী মাত্র। কিংবা এক বৃহৎ বাজারের চারপাশের গাঁ-বাসীমাত্র হয়ে যাচ্ছে। এ খোলা আকাশ, এ একক বাজার, একক প্রকৌশল-প্রযুক্তি-হাতিয়ার, অভিন্ন জীবনাচার এবং এক মানস ও বৈষয়িক-ব্যবহারিক চাহিদা ও আসবাব-তৈজসের অভিন্নতা মানুষকে এখন কেবল মানুষ হিসেবেই গ্রহণ করার প্রবর্তনা দিচ্ছে। জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-গোত্র-গোষ্ঠীভেদে মানুষকে যাচাই-বাছাই করা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চলবে না, তা বৃথা ও ব্যর্থ হয়ে গেছে বলেই। এক ভাষায়, এক ধর্মের, এক গোত্রের, এক বর্ণের লোক নিয়ে স্বাতন্ত্র্যে ও বিচ্ছিন্নতায় স্বনির্ভর ও স্বয়ম্ভর হয়ে বাঁচার উপায় নেই একালে। আমরা পৃথিবীর মানুষ আজ বাস্তব প্রয়োজনেই পরস্পর আদানে-প্রদানে, লেনে-দেনে লগ্নি-বাণিজ্যে ও শিল্পপুঁজিতে পরস্পর নির্ভরশীল এক বাজারের ক্রেতা-বিক্রেতা, এক বাড়ির বাসিন্দা। এবার ইরাকী যুদ্ধে বুশের তৈল সাম্রাজ্য-লিপ্সা নতুন করে আমাদের স্বাতন্ত্র্যে, বিচ্ছিন্নতায় স্বনির্ভর ও স্বয়ম্ভর বাস যে এযুগে অসম্ভব, তা আমাদের চোখে-কানে-মনে-মননে ধরিয়ে দিয়েছে।

৪. কাজেই আমাদের সর্বপ্রকার অজ্ঞতা, মূর্খতা, রক্ষণশীলতা, স্বাতন্ত্র্যগৌরব, বিচ্ছিন্নতার ব্যবধান, অভিমান, দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-ঘৃণা-হিংসা-ঈর্ষা-অবজ্ঞা পরিহার করে মানুষকে কেবল মানুষ হিসেবেই বরণ করতে হবে। মানতেই হবে যে আমাদের প্রথম পরিচয়– আমরা মানুষ, আমাদের শেষ পরিচয়– আমরা মানুষ। আমাদের আবাল্যের সব প্রয়াস-প্রযত্ন-উদ্যম-অঙ্গীকার-আশা-আকাঙ্ক্ষা-উদ্যোগ-আয়োজনের লক্ষ্য হচ্ছে মানুষ হওয়া, মানবিকতার ও মানবতার অনুশীলন ও সিদ্ধি।

সেশ্বর আস্তিক মানুষের এ সিদ্ধি আসবে বৌদ্ধ নীতিনিয়মে, হিন্দু নীতিনিয়মে, খ্রীস্টান নীতি-নিয়মে কিংবা ইহুদী বা মুসলিম নীতিনিয়ম মেনে। তা হলে, কারো কোন শাস্ত্র বা মত-পথ নির্বিশেষ মানুষ হওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। মন্দির-মসজিদ-গীর্জা-মঠ-বিহার-সিনাগগ মানুষে মানুষে বৈষয়িক ব্যবহারিক, বাণিজ্যিক তথা ইহজাগতিক লেনদেনে, মেলামেশায়, দৈশিক বা রাষ্ট্রিক জাতিগঠনে জাতীয়তাবোধে অভিন্ন স্বার্থচেতনায় কোন বাধা হয়ে দাঁড়াবে না।

৫. এ হচ্ছে যন্ত্রনির্ভর কালের দাবি, প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় প্রয়োজনের দাবি, এ দাবি অস্বীকার করা আত্মোন্নয়নে অনাগ্রহের এমনকি আত্মহননের নামান্তর। এ বৈন্যাশিক আধিমুক্তি আবশ্যিক।

৬. আমাদের দেশের শহুরে শিক্ষিত লোকেরা ধর্মের, বর্ণের, জাতের, জন্মের, ভাষার, আচারের ও সংস্কৃতির ভেদ জিইয়ে রেখে ব্যক্তিস্বার্থ তথা নগণ্যসংখ্যকের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষায় আপাত সফল বলে জানে ও মানে। আসলে কিন্তু অমুসলিম উনজনদের অবিশ্বাস, তাচ্ছিল্য ও বঞ্চনা পেয়ে পেয়ে কোটিখানেক উনজন স্বদেশে স্বভূমে স্বভিটেয় সভয়ে সত্রাসে স্বশঙ্কায় জান-মাল-গর্দান নিয়ে প্রতি মুহূর্তে অনিশ্চিত অস্থির জীবন যাপন করছে আর সুযোগ সুবিধে মতো এখানে অর্জিত অর্থ পাচার করছে ভারতে অভিবাসিত বাপ-ভাই সন্তানের কাছে। এদের জন্যে দোষ দেয়া যায় না বরং এ-ই স্বাভাবিক, যেমন দুবাইওয়ালা অর্জিত অর্থ স্বদেশে স্বজনের কাছে পাঠিয়ে স্বস্তি পায়।

৭. উনজনেরা বাঙলাদেশের পুরো নাগরিক, তারা কেবল ব্যক্তি হিসেবেই নাগরিক রূপে বৃত হলে, দৈশিক-রাষ্ট্রিক জাতির ও জাতীয়তার তারাও সম ও সহঅধিকারী—এ বিশ্বাস, ভরসা ও আস্থা, ও নিরুপদ্রব নিরাপত্তার আশ্বাস তাদের মনে জাগিয়ে তোলা সৌজন্যে-কথায়-কাজে-আচারে-আচরণে-ভাবে-চিন্তায় অধিজনেরই দায়িত্ব ও কর্তব্য। এ দায়িত্ব কর্তব্য অধিজনেরা কার্যত স্বীকার বা প্রয়োগে প্রমাণ করতে না পারলে বাঙলাদেশের আর্থিক, সামাজিক, নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রিক উন্নতি বা বিকাশ সম্ভব হবেই না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৮. জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি প্রয়োগে বিমুখ সাধারণ মানুষ কখনো নিরীশ্বর নাস্তিক হবে না, হবে না ভূতে ভগবানে, প্রেতে-পিশাচে দেও-দানুতে, জীনে-পরীতে অলীক-অলৌকিক শক্তিধর অরি-মিত্র দেবতায় আস্থাহীন। আর সব মানুষ সমাজবাদী, মানববাদী, সাম্যবাদীও হবে না। অতএব বাকি থাকে মাত্র গণতান্ত্রিক সরকারে জাত-ধর্ম-বর্ণ-ভাষা নির্বিশেষে নাগরিক সমানাধিকার। সব মানুষকে শ্রেয়ো বোঝানো যায় না, কেননা মানুষের মন-মেজাজ, মস্তিষ্ক, জ্ঞান, বুদ্ধি, শক্তি, যুক্তি, মনন-চিন্তন, বিবেক-বিবেচনা গুণে, মানে, মাপে, মাত্রায় সমান হয় না। তাই তাদের আইন কানুন প্রয়োগে শাসনে শৃঙ্খলায় রাখতে হয়, জনস্বার্থে মানাতে হয় অনেক বিধি, বিধান ও নিষেধ। এর একমাত্র উপায় হচ্ছে আপাতত সরকার মাত্রেরই সেক্যুলার হওয়া। অমুসলিমদের আস্থা অর্জনের ও দৃঢ় করার আর রাখার জন্যে সৈন্যবাহিনীতে শতে দশজন এবং পুলিশে শতে পনেরোজন নিয়োগ করা এখনই আবশ্যিক ও জরুরী। সেক্যুলার নীতির নিরপেক্ষ ও আন্তরিক প্রয়োগেই মাত্র সরকার দেশের মানুষকে তার মনে-মেজাজে-মননে-চিন্তনে বহুজনহিতের বহুজনসুখের পথে অনুপ্রাণিত ও অভ্যস্ত করতে পারে।

উপযোগ সচেতন হয়ে স্বকালে বাঁচাই প্রগতিশীলতা

AMARBOI.COM

লোকে কথা বলে। প্রসঙ্গবিহীন কথা নেই। প্রসঙ্গও আসে পরিবেশ পরিবেষ্টনী থেকে। ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের, কথার ও ঘটনার উৎস নিত্যকার চলমান ভাব-চিন্তা-কর্মময় জীবনচেতনা থেকেই। ঘুমন্ত মানুষ, স্বপ্নহীন মানুষ মৃতের মতোই, মূর্ছাগত ব্যক্তির মতোই কেজো চৈতন্যহীন। লঘু নিদ্রায় স্বপ্নও সুখের, দুঃখের, ভবের, যন্ত্রণার, আনন্দের ও উল্লাসের হতে পারে। কাজেই স্বপ্নাবস্থায়ও মানুষ জাগ্রত জীবনের সুখ-দুখ অনুভব উপলব্ধি বা ভোগ-উপভোগ করে।

মানুষ দলে চলে, যৌথ জীবন যাপন করে, সে পরিবারবদ্ধ, সমাজসদস্য, দেশবাসী ও রাষ্ট্রশাসিত। সেজন্যেই তাকে কথা বলতে হয়, কথা শুনতেও হয়, সবকথা অবশ্য নিজেকে জড়িয়ে নিজের স্বার্থে বলতে শুনতে হয় না। পরের কথা, রটনায় কথা, ঘটনার কথা, স্মৃতিকথা শ্রুতিকথা, ভবিষ্যতের কথা, আর নিজের সুখ-দুঃখের কথা কাউকে বলে হৃদয়ভার লাঘব তো করতেই হয়। কিন্তু কথার তাৎপর্যচেতনায় বক্তা-শ্রোতার মধ্যে মান-মাপ-মাত্রার পার্থক্য থাকে। আস্তিক-নাস্তিক, সেশ্বর-নিরীশ্বর, শক্র-মিত্র, উদাস-বিবাগী, সরল-কপট, বুদ্ধিমান, ধূর্ত, নির্বোধ-হৃদয়বান, দয়াবান সহানুভূতিশীল প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রোতার উপর এর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন হয়। আর স্থানে-কালে-পাত্রে প্রয়োজনে এবং জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-বিবেক-বিবেচনা-শঙ্কার তারতম্যে তথা মান-মাপ-মাত্রাভেদে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও ভিন্ন ভিন্ন ও নতুন নতুন হয়। প্রতিটি মানুষই সমকালীন প্রতিবেশ পরিবেষ্টনীর মধ্যেই বাস করে, তার মন, মেজাজ, মনন-চিন্তন, রুচি-বুদ্ধি-জ্ঞান, যুক্তি-বিবেক-বিবেচনাও গুণে মানে মাপে মাত্রায় গড়ে ওঠে, নিয়ন্ত্রিত হয় তার শাস্ত্রিক, শৈক্ষিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক, বার্ণিক অবস্থা ও অবস্থান প্রভৃতির প্রভাবে। তাই তার অতীত-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বর্তমান-ভবিষ্যৎ চেতনা তার সমকালীন জীবন-জিজ্ঞাসারই উপজাত। এ জন্যেই কোন দুই দেশের, দুই কালের, দুই জনের কোন এক বিষয়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ টীকা-ভাষ্য অভিন্ন হয় না। সব নবী-অবতার-সংস্কারক-আবিষ্কারক-উদ্ভাবক-ভাবক-চিন্তক স্বকালের পরিবেশ থেকেই, কথা বা ঘটনা থেকেই তার নতুন চিন্তার, চেতনার, মনের, মননের, কৌতূহলের, জিজ্ঞাসার, সন্দেহের, সংশয়ের, অনাস্থার ও অবিশ্বাসের, পুরোনোর প্রতি অবজ্ঞার, পুরোনো নীতিনিয়ম-রীতিরেওয়াজ বর্জনের, পুরোনো সত্য-তথ্য পরিহারের প্রেরণা প্রণোদনা প্ররোচনা প্রবর্তনা পায়। মনুষ্য সভ্যতা-সংস্কৃতি ভাব-চিন্তা-সত্য-তথ্য-দর্শন-বিজ্ঞানের আবিষ্কার-উদ্ভাবন সম্ভব হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে এভাবেই। অবক্ষয়ও ঘটেছে, ঘটে, ঘটবে এমন পন্থায়। কাপার্নিকাস, গেলেলিয়ো, নিউটন, রুশো, ভলট্যের, অ্যাডিসন, ডারুইন, মার্কস, ফ্রয়েড, টলস্টয়, রোঁলা, রাসেল, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, আলেকজান্ডার, সাইরাস, সিজার, চেঙ্গিস-তৈমুর-আকবর-নেপোলিয়ন-হিটলার-মুসেলিনী সবাই এ ভাবেই করেছেন আত্মঅধিকার বিস্তার স্ব স্ব ক্ষেত্রে। যারা জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি চালিত তারা দেখেই শেখে ও বোঝে। যেমন য়ুরোপের মানুষের মন-মননের, চাহিদার ও আন্দোলনের লক্ষণ দেখে বিবেকানন্দ বুঝেছিলেন, যুগান্তর আসন্ন। প্রথমে ছিল বিদ্যা-বুদ্ধির শাসন, তারপর বল-বাহুবলের প্রতাপ, তারপরে বিত্তের বেণের প্রভাব, এখন আসছে কৃষক-মজুরের-শ্রমজীবীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার দিন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য নয় এবার, প্রলিতারিয়েতের শাসন হবে শুরু।

প্রাগ্রসর প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনাই সভ্যতা-সংস্কৃতি-সমাজ-শাস্ত্রের উন্নয়ন ও উৎকর্ষ ঘটায়। বিবর্তন ঘটে জীবনাচারের, চিন্তার-চেতনার, প্রয়োজনবোধের। যারা সমকালীন নতুন চিন্তার তাৎপর্য-সচেতন নয়, নয় সমর্থক ও সহযোগী, তারাই পিছিয়ে পড়া গড্ডল-স্বভাবে অভ্যস্ত ও আশ্বস্ত থাকে। নতুন ভীতি ও পুরানোপ্রীতিই তাদের সম্বল। এ জন্যেই, সাধারণ মানুষের মানসিক উৎকর্ষ দুর্লভ ও দুর্লক্ষ্য। স্বকালের সঙ্কট-সমস্যা, স্বকালের সম্পদ-সম্বল সম্বন্ধে যে ব্যক্তি সচেতন নয়, তাকে জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-বিবেক-বিবেচনারিক্ত কেবল মানবপ্রজাতির প্রাণী রূপেই অবজ্ঞা করতে হবে। কেননা তারা সমাজের দায়, ভার, বোঝা, সহায়ক সম্পদ-সম্বল নয়।

আগেই বলেছি জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তিবাদী মানুষ স্বকালে স্বপরিবেশে বাস করে তাই সঙ্কট-সমস্যা সচেতন থাকে, আর মুক্তির উপায় খোঁজে। এঁরাই মনীষী আবিষ্কারক-উদ্ভাবক-সংস্কারক, নতুন ও স্বাধীন মত, পথ ও উপায় সন্ধানী।

আবার প্রাণীমাত্রেরই যেন ভাষা আছে। লক্ষ লক্ষ বছর আগেকার যেসব জাতির অবয়বের ও স্বভাবের প্রাণী বিবর্তনের ধারায় আজকের মানুষের উদ্ভব ঘটিয়েছে, তাদের মধ্যেও মনে হয় শ্রুতিস্মৃতি পরম্পরায় কিছু কিছু সত্য ও তথ্য তাৎপর্য-চেতনারিক্ত হয়ে রয়ে গেছে। পারম্পর্যহীন, ধারাবাহিকতা বিহীন চেতনার আভাস মেলে আজকের ডারুইনীয় ব্যাখ্যার মতোই কোন কোন মিথে বা পুরাণ কাহিনীতে। যেমন সূর্য থেকে খসে পড়া অগ্নিময়, ধূম্রময়, কুয়াশাময়, জলময়, মাটিময়, বন্ধুর পৃথিবীর একটি অস্পষ্ট 'সৃষ্টিপত্তন'-এর বয়ান প্রায় সব দেশেই মেলে। জলজ উদ্ভিদও জেলিপ্রায় প্রাণীর কথাও যেন ওই শ্রুতিস্মৃতিমূলক তত্ত্ব লক্ষ লক্ষ বছর ধরে চলে আসছে। যেমন হিন্দু পুরাণের অবতারবাদে রয়েছে প্রথমে মৎস্য তথা জলজ প্রাণী, পরে কূর্ম তথা জলচর-স্থলচর প্রাণী তারপর ক্রমবিকাশের ধারায় স্থলচর বরাহ এবং এরই উৎকর্ষে নৃসিংহ অবতার-নরের ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পশুর মিশ্র আকৃতির অবতার। তারপরে এল পুরোমানুষ বিষ্ণু বা রাম, কৃষ্ণ। এর মধ্যে কি বিবর্তনবাদের দূরাগত স্মৃতি বা ধ্বনি বা ইতিবৃত্ত মেলে? এমনি বিবর্তনের তাত্ত্বিক বা রূপক বয়ান মেলে জালালউদ্দীন রুমীর 'মসনবী' নামের অধ্যাত্মতত্ত্বের কাব্যেও।

সুখ-দুঃখের তরঙ্গ তাড়িত জীবন

কথায় বলে বটে, নেড়া বেল তলায় একবারই যায়। হয়তো একথায় সত্য রয়েছে, কেননা দুনিয়ায় নেড়া মাথার লোকও বেশি নয়, আর সফল বেল গাছও দুর্লক্ষ্য। কিন্তু জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে কি তা সত্য ও স্বাভাবিক? বাজারে কেনাকাটায় মানুষ নানাভাবে বারবার ঠকে—মাছে ঠকে, তরকারীতে ঠকে, মাংসে ঠকে, ফলে ঠকে, ভালো করে না জানলে, না চিনলে, না বুঝলেই মানে-মাপে-মাত্রায় আর দরে দামে ঠকেই। ঠকতে থাকেই। এ ক্ষেত্রে হিসেবীরা ধূর্তরা কম ঠকে, সাধারণরা মাঝে মাঝেই ঠকে আবার অবিমৃষ্যকারীরা ঘন ঘন ঠকে। কাজেই গড়ে সবাই ঠকে।

যেহেতু নতুন সূর্যের উদয়ে নতুন দিনে নতুন জীবন, নতুন চাহিদা এবং নতুন কর্মই করতে হয় চলমান জীবনযাত্রায়। গতিমান জীবনের নতুন বাঁকের জ্ঞান-অভিজ্ঞতাও যেহেতু থাকে না, তাই ভেবে-চিন্তে ধীরস্থির ভাবে কিছু করতে গেলেও ভুল থেকেই যায়, হয়েও যায়। এ নিয়েই জীবন। অর্থাৎ জীবনও ভুল-ভ্রান্তির, ঠকে শেখা, ঠেকে শেখা, দেখে শেখা, শুনে শেখা প্রভৃতির সমষ্টি। শুধু লাভের, শুধু সাফল্যের, শুধু জয়ের শুধু সুখ-স্বস্তি-আনন্দের নয়।

কেউ কেউ জ্ঞান-বুদ্ধি-শক্তি সাহস ও ক্ষতি স্বীকারের ঝুঁকি নিয়ে আকস্মিক আসন্ন আপন্ন বিপদ-বিপর্যয়ের মোকাবেলা করে, কেউ কেউ আত্মপ্রত্যয়রিক্ত ভীরু বলে শঙ্কা-ত্রাসে ভেঙে পড়ে। ভীরু বিপন্ন মানুষের মতো অস্থির ও দুঃসহ যন্ত্রণাগ্রস্ত অসহায় ব্যক্তি কেউ নয়। পৃথিবী তার কাছে বিপদসঙ্কুল শাস্তিহর কারাগার মাত্র। সে বাঁচার সুখ-স্বস্তি-আনন্দ-আরামও পায় না, আবার মৃত্যুতেও তার ভয়, কারণ আত্মা সেখানে অজ্ঞাত পাপের জন্যে হবে অগ্নিদগ্ধ।

জীবনে রোগ-শোক, ক্ষয়-ক্ষতি, আপদ-বিপদ, মামলা-মোকদ্দমা, জয়-পরাজয়, সাফল্য-বিফলতা এড়ানো সম্ভব হয় না কারো পক্ষে। ভরসার ও আশ্বাসের কথা এই যে এসব জীবনে রোজ ঘটে না, কখনো ঝড়-ঝঞ্ঝা-খরা-বন্যা-ভূকম্প-মারীর মতো ব্যক্তিক ও পারিবারিক জীবনে আকস্মিকভাবে কিংবা অপ্রত্যাশিতভাবে এসে পড়ে। এড়ানো যায় না। তাই মানুষের মধ্যে রয়েছে বাঁচার আগ্রহ, আনন্দ ও সুখ। তাই পৃথিবী প্রিয়। তাই মর্ত্যভূমি মাতৃকোলের মতো নিশ্চিত নিশ্চিন্ত শরণ।

মানুষের শত্রু মানুষই। আবার মানুষের মিত্রও মানুষই। মানুষই মানুষের শঙ্কা-সন্ত্রাসের কারণ, আবার এ মানুষই মানুষের অভয় আশ্রয়, অসহায়-সম্বল। যে-মানুষ একজনকে ঠকায়-ঠেকায়-ঠেঙায়, জানে-মালে-গর্দানে মারে, মানে কাড়ে-মারে-হানে, সে মানুষই অন্য একজনকে স্নেহে-শ্রদ্ধায়-প্রেমে-প্রীতিতে, মায়ায়-মমতায় পালে-পোষে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রোগে শুশ্রূষা করে, শোকে পাশে দাঁড়ায়, বিপদে সাহায্য-সহায়তা করে। তাই এক মানুষের প্রতি আমাদের ক্ষোভ-ক্রোধ-বিরক্তির সীমা নেই, আবার অন্য এক মানুষের প্রতি স্নেহ-শ্রদ্ধা-ভালোবাসার অবধি নেই। শত্রু-মিত্র নিয়ে যৌথ তথা পারিবারিক-সামাজিক-রাষ্ট্রিক-বৃত্তিক জীবন। শত্রু দূরে ঠেলে, মিত্র কাছে টানে। এভাবেই বাঁচার অনুকূল-প্রতিকূল পরিবেশ ভারসাম্য রক্ষা করে চলে। এ কারণেই জীবন যেমন ফুলশয্যা নয়, তেমনি জীবন কেবল সংগ্রামও নয়, কেবল প্রতিরোধ নয়, আবার কেবল আপোসও নয়। জীবন হচ্ছে সুখ-দুঃখ, আনন্দ-যন্ত্রণা, স্বস্তি-শঙ্কা, সম্পদ-বিপদ সঙ্কুল সর্পিল বন্ধুর উপলাহত সময় স্রোতের সমষ্টি।

ব্যক্তির জীবনচরিত

আত্মচরিত কিংবা ভক্ত বা গবেষক লিখিত কোন বিশ্রুতকীর্তি মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি জীবনকথাসাহিত্য সব ভাষাতেই অল্পবিস্তর মেলে। আত্মকথা ও স্মৃতিকথা নামেও ফেলে আসা জীবনের বা হৃতদিনের স্মৃতিরোমন্থন রীতিও চালু রয়েছে, চিরকাল থাকবেও। কেউ কেউ এ ধরনের চরিতসাহিত্যের অর্থাৎ স্বলিখিত কিংবা এর বর্ণিত বয়ানে শাস্ত্রিক, নৈতিক, আর্থিক, সামাজিক, আচারিক, পার্বণিক, শৈক্ষিক, বাণিজ্যিক, প্রাতিবেশিক, পারিবেশিক, শাসনিক, প্রশাসনিক, ঘর-বাড়ির, আসবাবের, তৈজসপত্রের আকার-প্রকার, জেয়াফত-শ্রাদ্ধ-বিবাহোৎসব প্রভৃতি জীবনাচারের ও সামাজিক আচার-আচরণের নীতি-নিয়মের রীতি-রেওয়াজের বর্ণনা খুঁজে পান। এবং নিকট বা সুদূর অতীতকারের মানুষের জীবন যাপনপদ্ধতির, সভ্যতা-সংস্কৃতির, আচার-আচরণের, পালা-পার্বণের, সমাজনীতির, সংস্কৃতিচর্চার রূপ-স্বরূপ এসব গ্রন্থ থেকে সত্যসন্ধ অভিজ্ঞ বা প্রত্যক্ষদর্শীর সত্য ও বাস্তব বিবরণ যেন পেয়ে যান। তাই এমনি বয়ানকে প্রায় নিঃসংশয়, নির্ভেজাল সত্য বলে গ্রহণ বরণ করে ইতিহাসকার বা জিজ্ঞাসু পাঠক অতীতের একটা বাস্তব চিত্র মনের মধ্যে ধরে রাখেন। এবং সেভাবেই জগৎ, জীবন, দেশ, কাল ও মনুষ্য সমাজ সম্বন্ধে স্ব স্ব মত, মন্তব্য ও সিদ্ধান্ত পরিব্যক্ত করেন। যদিও ঘটনা ঘটে নানা বয়সে আর তা বর্ণিত হয় পরিণত বয়সে পরিণত বুদ্ধি, দৃষ্টি ও টীকা-ভাষ্য যোগে। অতএব আত্মকথা, স্মৃতিকথা কিংবা ভিন্ন ব্যক্তি রচিত প্রখ্যাত ব্যক্তির কৃতি-কীর্তি-বহুল জীবন-চরিতকে ইতিহাসের অতি মূল্যবান গুরুত্বপূর্ণ সত্য অবস্থা, অবস্থান কিংবা ঘটনা হিসেবে লোকে গ্রহণ করেন। অথচ যৌক্তিক-বৌদ্ধিক যাচাইয়ে বাছাইয়ে তা গ্রাহ্য হওয়ার কথা নয়। কিন্তু আত্মকথা, স্মৃতিকথা কিংবা অপর ব্যক্তিলিখিত প্রখ্যাত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির জীবনকথা ইতিহাসের বাস্তব বা খাঁটি-নিখাদ-নিখুঁত উপকরণ-উপাদান হিসেবে কি পুরো নির্ভরযোগ্য? রুশো-রাসেলের আত্মকথায় ও অপকর্ম-অপরাধ স্বীকৃতির মধ্যে একটা গূঢ় অহমিকা আবিষ্কার কঠিন কিছু নয়। তাঁরা জানতেন তাঁরা সমাজে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত ও শ্রদ্ধেয় যে ওইসব স্বীকৃতি তাঁদের মনস্বিতাকে ও সত্যবাদিতাকে আরো উজ্জ্বল ও মহিমান্বিত করে তুলবে, নিন্দিত বা অবজ্ঞেয় হওয়ার ভয় ছিল না তাঁদের। তেমনি লিউ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টলস্টয়ও শিল্পী, মনীষী ও মানবতাবাদী হিসেবে যে বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন, তাতেই তাঁর প্রথম জীবনের লাম্পট্য প্রজাপীড়ন প্রভৃতি দৈত্যের দেবতা হয়ে ওঠার মতোই মহিমাময় রূপ পেয়েছে। কিন্তু এ খ্যাতি-প্রতিপত্তি-শ্রদ্ধা সব শ্রুতকীর্তি মানুষের পক্ষে অর্জন সম্ভব হয় না। তাছাড়া প্রতিষ্ঠিত মানুষই তার জ্ঞাতে অজ্ঞাতে নায়ক বা মুখ্য হয়ে ওঠেন আত্মকথায়। আর ভক্ত ও গুণগ্রাহী মুগ্ধ জীবনীকার মাত্রই অধিকাংশ ক্ষেত্রে চাটুকার মাত্র-স্তুতি-প্রশস্তি রচনাই মুখ্য লক্ষ্য। আরো কথা আছে, নিজের বা ভক্তিভাজনের অপকর্ম অপরাধ ও নিন্দনীয় আচরণ বয়ান না করাই মানুষের স্বভাব কিংবা দুর্বলতা। সব আত্ম বা পর চরিতকারই কি সত্যসন্ধ? তাছাড়া আস্তিক-নাস্তিক-দেশ-কাল-সমাজ-অভিজ্ঞা ভেদে যেমন, তেমনি জ্ঞান, বুদ্ধি, নৈতিক চেতনা, শাস্ত্রিক বিশ্বাস, শৈক্ষিক যোগ্যতা, পছন্দ অপছন্দ প্রভৃতির দরুন, এবং জগৎ চেতনার ও জীবনভাবনার, বিচারশক্তির, ন্যায়বোধের, মন-মনন-মনীষাজাত দৃষ্টির মান-মাপ-মাত্রাভেদে এবং কারণ-কার্যতত্ত্বের চেতনাভেদেও বয়ানে বিবেচনায় পার্থক্য ঘটে। এছাড়াও রয়েছে নিজের অজ্ঞাতেই তত্ত্বের ও খণ্ড জ্ঞানের, অপূর্ণ অভিজ্ঞতার, ভুলশ্রুতি না বোঝার, তাৎপর্য-চেতনার অভাবপ্রসূত অপব্যাখ্যা, ভুলসিদ্ধান্ত প্রভৃতি। তাই স্তুতিও ব্যজস্তুতি হয়ে দাঁড়ায়। প্রশংসাও হয় নিন্দনীয় হবার উৎস। মানুষের আত্মকথায়, স্মৃতিকথায়, জীবনচরিতে এতো অপ্রয়োজনীয় বাজে কথা, সত্য গোপনে মিথ্যা প্রচারে ভেজাল দেয়া কথা থাকে যে, তার থেকে সত্য বেছে নেয়াও কঠিন হয়ে পড়ে। একি দুধ মেশানো জল কিংবা জল মেশানো দুধ, তা সবাই বুঝতে সমর্থ হয় না। তবু এ বিষয়ক বই লোকে পড়ে, কাজেও লাগায়। কিন্তু একই ঘটনার বর্ণনা ভিন্ন ভিন্ন জনের লেখায় বিচিত্র রূপ পায়। সত্য হারিয়ে যায়। বিতর্ক বাড়ে।

AMARBOI.COM

বীরত্বের পরীক্ষা বিপদেই

বিপদ আসন্ন, আপন্ন কিংবা বিপদ বাস্তব হয়ে না উঠলে মানুষের বুদ্ধি, সাহস, নির্যাতন সহ্য করবার শক্তি, ক্ষতি স্বীকার করার মতো স্থৈর্য, ধৈর্য, মনোবল, যন্ত্রণা সইবার অবিচল সিদ্ধান্ত, প্রাণ দানের অঙ্গীকার প্রভৃতির পরীক্ষাও হয় না। তাই ব্যক্তির নৈতিক, আদর্শিক, সাংকল্পিক স্থিরতার ও দৃঢ়তার সাক্ষ্য প্রমাণও মেলে না। এমনি অবস্থা না ঘটলে নিজের সম্বন্ধেও ধারণার সত্য-মিথ্যা যাচাই হয় না। পুত্রাদি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-পরিজন নিহত হওয়ার পরও এবং সিংহাসন হারিয়ে বন্দী হওয়া সত্ত্বেও অশীতিপর বৃদ্ধ বাহাদুর শাহ ব্রিটিশ কোম্পানী সরকারের কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাইলেন। তৈমুর-বাবুরের বংশধর হৃতসন্তান ও হৃতসিংহাসন বাদশাহ বাহাদুর শাহ জাফর ইতিহাসে ভীরুতার এক ঘৃণ্য দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন।

স্বাধিকারে স্থিত থাকার জন্যে, স্বাধিকার আদায় করার জন্যে, আত্মসম্মান রক্ষার জন্যে জীবনের উপর হামলার মোকাবেলা করার জন্যে, ক্রুদ্ধ হয়ে প্রতিশোধ নিতে হলে, প্রতিহিংসা বৃত্তি চরিতার্থ করতে হলে, দেশ-জাতি-ব্যক্তির উপর অন্যায় হামলা প্রতিরোধ করতে হলে, দৈশিক, সামাজিক, নৈতিক বা রাষ্ট্রিক কোন অযৌক্তিক অন্যায্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপ্রয়োজনীয় নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ, প্রথা-পদ্ধতি বিলোপ-উচ্ছেদ-উৎখাত প্রতিরোধ করার জন্যে সংস্কারকের ভূমিকায় নামতে হলে জান-মাল-গর্দান হারানোর ঝুঁকি নিয়ে জ্ঞান-বুদ্ধি, শক্তি-সাহস-অঙ্গীকার-উদ্যম-উদ্যোগ নিয়ে কাজে নামতে হয়। জানতে বুঝতে ও মানতে হয় যে এসব ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ থাকে, তাদের সঙ্গে বাকে-বাক্যে যুক্তি-বুদ্ধি যোগে বুঝতে হয়, অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে লড়তে হয়, লড়তে গেলে, মারতে গেলে আকস্মিকভাবে মরতেও হয়। সেজন্যে প্রয়োজনমতো প্রাণ দেয়ার সংকল্প না নিয়ে লড়তে যেতে নেই। সংগ্রাম মাত্রই সংঘর্ষ-সংঘাতসঙ্কুল। প্রয়োজনে প্রাণ দিতে যে নির্ভীক ব্যক্তি প্রস্তুত, বাঁচবার ও বাঁচাবার অধিকার তারই। শক্তি-সাহস-সংকল্পের সাক্ষ্য-প্রমাণ-লক্ষণই হচ্ছে লড়াইয়ের জন্যে পয়লা কদম বাড়ানো। সাহস করে যে এগুতে রাজি, জয় হয় সাধারণত তারই। এর নামই বীরত্ব। আর আমরা সবাই জানি, বুঝি ও মানি যে বসুন্ধরা নয় কেবল, মর্ত্য জীবনের সব কিছুই বীরলভ্য ও বীরভোগ্য এবং বীর ঘরে ঘরে জন্মায় না। বীর দুর্লভ, বীর ক্ষণজন্মা। তাই দুনিয়া বীর অধিকৃত, শাসিত, শোষিত, নিয়ন্ত্রিত, ভোগ্য-উপভোগ্য। সে-বীরত্ব আপাতদৃষ্টে বিভিন্ন, বিবিধ ও বিচিত্র বটে, কিন্তু মূলে অভিন্ন, রত্নের মতোই অভিন্নমূল। তা হচ্ছে সর্বপ্রকারে ক্ষতি স্বীকারের শক্তি। দেহ প্রাণ ধন জন বিত্ত বেসাত– যে কোন কিছু হারানোর জন্যে সংকল্পবদ্ধ হয়ে বেদেরেগ, বেধড়ক, বেপরওয়া হয়ে প্রতিপক্ষের মোকাবেলা করা– প্রতিকার ও প্রতিরোধ লক্ষ্যে দেহ মন প্রাণ জ্ঞান বুদ্ধি যুক্তি বিবেক বিবেচনা প্রয়োগে জীবন-মরণ পণ করে রুখে দাঁড়ানো। আদর্শবাদী সংকল্পবদ্ধ ও আত্মপ্রত্যয়ে অনুপাণিত যে পয়লা কদম বাড়ায় শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার জন্যে, সাধারণত পরিনামে জয় হয় তারই। আপদ বিপদ কালে দেখা যায় নিরাপদ দূরত্বে থেকে যারা চিরকাল উচ্চকণ্ঠে আস্ফালন করে, তারাই সবার আগে কাবু হয়, খামুস থাকে, এমনকি পালাবার এবং বোল বদলাবার ও ভোল পালটাবার চেষ্টা করে। জর্জ বানার্ড শ' তাঁর আরমস এ্যাণ্ড দ্য ম্যান নাটকে সৈনিকের বীরত্বকে বিদ্রূপ করেছেন। নিঃসঙ্গ জীবনে স্বাধীনতা সংগ্রামী অরবিন্দ ঘোষ জেলে কৃষ্ণ দর্শন করতেন বৃক্ষপত্রে। একালে ভাষা আন্দোলনে ধৃত মুনির চৌধুরী, মুজাফফর আহমদ চৌধুরী, অজিতগুহ প্রমুখ 'বণ্ড' দিয়ে জেলমুক্ত হয়েছিলেন। আলাউদ্দীন আল আজাদ, আল মাহমুদ সরকারী অনুগত চাকুরে হয়েছিলেন। আবার ক্ষুদিরাম, প্রফুল্লচাকী, জুলফিকার আলি ভুট্টো বা কর্ণেল তাহের অকুতোভয়ে ও দৃঢ়চিত্তে ফাঁসির রশি গলায় পরেছেন। এখনো নাকি দেশের বিভিন্ন দলের উচ্চকণ্ঠে আস্ফালনপটু সাহসী সংগ্রামী কোন কোন নেতা বিদেশী শক্তির বেতনভোগী গুপ্তচর। আর চরিত্র কি ও কেন— তা তো এদের অজানা। আজ তারা সুযোগ ও সময়মতো দল বদলায়, নতুন বোল ঝাড়ে, ভোল পালটায়, তারা প্রায় সবাই সুযোগসন্ধানী ও সুবিধেবাদী এবং স্বার্থপর মতবলবাজ-দুষ্ট-দুর্জন-দুর্বৃত্ত-দুষ্কৃতী ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে, কেবল নিজের অঞ্চলে কৃপায়-করুণায়-দয়ায়-দাক্ষিণ্যে পরার্থে কর্মে মেঠোবক্তৃতায় সৎ, সরল, সহানুভূতিশীল উপচিকীর্ষু দরদী মানুষ রূপে আত্মঘোষণায় ও আত্মপ্রতিষ্ঠায় সতর্কভাবে সযত্ন প্রয়াসী থাকে ভোট যোগাড়ের লক্ষ্যে। তাই প্রায় সব ধূর্ত দুর্জনই বারবার ভোট পায়, যেমন এবার হোসেন মুহম্মদ এরশাদ পেলেন, প্রাণদানের শক্তিতেই বীরত্বের চরম ও পরম পরীক্ষা নিহিত বটে, তবে বীরত্ব বিভিন্ন রকমের এবং সেগুলোও সমমূল্যের। যে হুকুম-হুমকি, হামলার-মুখেও কেবলই সত্য বলে, সমূহ ক্ষতির আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও মিথ্যার আশ্রয় নেয় না, লাভে লোভে নৈতিক চেতনা বিসর্জন দেয়না,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্ষতি স্বীকারের জন্যে প্রস্তুত থাকে আদর্শে স্থির ও লক্ষ্যে অটল থাকার জন্যে, সে অন্যের অপকর্মের-অপরাধের জাতীয় বা সামাজিক স্বার্থেই প্রতিবাদী ও প্রতিকারকামী হয়। জানমাল-গর্দান হারানো কবুল করেই চরিত্রবান আদর্শনিষ্ঠ, অঙ্গীকারবদ্ধ ব্যক্তি নির্যাতনেও নতি স্বীকার করে না।

লড়াইপ্রিয় মানুষ

শোনা যায়, প্রাণীজগতে কাক, কুকুর আর মানুষ ঝগড়াটে জাত। এমনি আরো হয়তো বহু বহু পোকা-মাকড়, পশু-পাখি আর জলচর প্রাণীও কোঁদলে। কিন্তু আমরা খোঁজ খবর রাখিনে বলে, তাদের নাম করতে পারছিনে। তবে দ্বেষ-দ্বন্দ্বে, কাড়া-মারা-হানায় অভ্যস্ত হলেও স্বজাতির সঙ্গ ও সঙ্ঘ কেউ ছাড়তে পারে না। তাই মানুষের মতো কাককেও ঘন ঘন সভায় মিলিত হতে দেখা যায়। ভেড়া তো পরস্পরের গা ঘেঁষেই চলে, বিচ্ছিন্ন হয়ই না। তেমনি বুনো শূকর, হাতী, হরিণ, বানর প্রভৃতিও দলে, পালে চলে, ঝাঁকে চলে নানা জাতের পাখিও। শকুন তো ভিন্ন রঙের মোল্লা-পুরোহিতকে গুরু-পীর-সর্দার-রাজার মতোই মান্য করে।

প্রাণী প্রজাতির মধ্যে মানুষ সবচেয়ে সর্বপ্রকারে অর্থাৎ কৌশলে-প্রকৌশলে-প্রযুক্তিতে চিন্তায়-চেতনায়-মনে-মননে উন্নত বলে, তারা নিজেরা যে কেবল লড়াকু তা-ই নয়, অন্যদের মধ্যেও লড়াই বাধিয়ে দিয়ে গভীর ও ব্যাপক আনন্দ উপভোগ করে। সে লড়াই প্রতিযোগিতার, প্রতিদ্বন্দ্বিতার, কাড়ার, মারার ও হানার। প্রাণঘাতী প্রাণপণ যুদ্ধ দেখতেই তারা আগ্রহী ও উৎসাহী। এক পক্ষের হননে-মরণেই তাদের উল্লাস। এ নিষ্ঠুর আনন্দ-উল্লাস ও সুখ অনুভবের আয়োজন মানুষ যেন প্রায় আদিকাল থেকেই করে আসছে। এ সুখ হচ্ছে নিরাপদ দূরত্বে থেকে এগিয়ে দেয়ার, লেলিয়ে দেয়ার সুখ। অবশ্য ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ, উত্তেজিত, উদ্দীপিত, প্ররোচিত, প্রণোদিত, প্রবর্তনাপ্রাপ্ত হুজুগে মানুষ নিজেরাও প্রাণের মায়া ছেড়ে লড়াকু হয়ে অপরের প্রাণ হরণে জিগীষার-জয়ের সুখ, আনন্দ-উল্লাস, গৌরব ও গর্ব অনুভব, উপলব্ধি ও উপভোগ করে। মানুষের লড়াকু বৃত্তির উৎস হচ্ছে প্রাপ্তিলোভ-লিপ্সা-হিংসা-ঈর্ষা-ঘৃণার কিংবা স্বাধিকার বা স্বার্থ রক্ষার গরজজাত। আবার কেউ কেউ শৈশব-বাল্য-কৈশোর-যৌবন থেকেই কোঁদলে হিংস্র লড়াকু হয়। কথায় কথায় মারামারি করতে চায়, করেও। কিন্তু সব কিছু ছাপিয়ে লড়াই দেখার আনন্দ-উল্লাস-সুখই তার আত্মবিনোদন পন্থা হয়ে দাঁড়ায়। তাই তারা বাজের লড়াই, মোরগের লড়াই, ষাঁড়ের লড়াই, মোষের লড়াই, ষাঁড়-মানুষের লড়াই, বাঘ-মানুষের লড়াই, বুনোশূকর-মানুষের লড়াই, বাঘ-হাতীর লড়াই, কুত্তার দৌড়, ঘোড় দৌড়, উট দৌড়, মানুষে-মানুষে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ, কুস্তি, মুষ্টিযুদ্ধ দেখতে আজো আরাম-আনন্দ পায়, যুদ্ধের খবরে এখনো নির্বিশেষ মানুষের আগ্রহ। এজন্যে বিজয়ী মিত্রপক্ষের প্রচারণায় এবং বৈনাশিক পরিণামের বীভৎসতা দর্শনে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কাল থেকে বা পরে থেকে হিটলার-মুসোলিনী যুদ্ধবাজ বলে ঘৃণিত এবং যুদ্ধ ঘৃণ্য ও পরিহার্য বলে বিশ্বমানব মুখে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেনে নিলেও, এবং অন্তরে এ ভয়ঙ্কর বিভীষিকা জাগালেও যুদ্ধ কোথাও বন্ধ হয়নি। যুদ্ধ হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে। আর এখন যুদ্ধ রাজায়-রাজায়, রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে নিবদ্ধ নেই। গুণ্ডা, মাস্তান ও খুনী হিসেবে এক প্রকারের ভাড়াটে কিংবা দলসদস্য, চেলা ছোট-বড়-মাঝারি দাঙ্গা-হাঙ্গামা-কাড়া-মারা-হানা চালু রেখেছেই। আর দুষ্ট দুর্জন-দুর্বৃত্ত দুষ্কৃতীরা তো পেশা হিসেবেই বরণ করেছে যুদ্ধকে নিজে বাঁচার এবং তাঁর স্বজন তথা পরিবারকে বাঁচানোর গরজে, হয়তো তাদের নান্যপন্থা।

আজকাল সরকার ও সৈন্যরা ব্যতীত সবাই যুদ্ধকে উচ্চকণ্ঠে ঘৃণা করে, কিন্তু যুদ্ধ, লড়াই, দ্বন্দ্বযুদ্ধ, গুণ্ডামি-মাস্তানী, খুনখারাবীর প্রতি রয়েছে সব মানুষেরই অপ্রতিরোধ্য-আসক্তি আকর্ষণ দর্শক-শ্রোতা হিসেবে। তার প্রমাণ action film। লড়াইয়ের মারামারির ব্যবস্থা না থাকলে কোন সামাজিক চলচ্চিত্রই চলে না, মানে দেখার-দেখানোর যোগ্য হয় না।

জোর যার মুলুক তার

এ যন্ত্রনির্ভর জগৎ বৃহৎ জনবহুল বাজার মাত্র। যাতায়াতের বাধা ঘুচে গেছে। ব্যবধানের বিচ্ছিন্নতা, অজ্ঞতা, অপরিচয় গেছে ঘুচে। এ বাজারে বেচা-কেনার জন্যে সবাইকে সমবেত হতে হয়। এখন আর স্বাতন্ত্র্যে স্বাধীন স্বনির্ভর স্বয়ম্ভর হয়ে বাঁচার উপায় নেই কারো। অবশ্য ধনী-নির্ধনের বড়-ছোট-মাঝারির, মেধাবী-মেধাহীনের, পণ্ডিত-মূর্খের জ্ঞান-বুদ্ধি-শক্তি-সাহসের তারতম্য-বৈষম্য রয়ে গেছে। রয়ে গেছে সবলের-প্রবলের জুলুম, দুর্বলের ভীরুতা। তবু পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রই আজকাল আর বেপরওয়া গায়ের জোর দেখাতে সহজে সুযোগ পায় না, অন্য রাষ্ট্রের বিরূপতার, অসহযোগের, প্রতিবাদের, প্রতিরোধের, নিন্দার, এমন কি প্রতিকারে এগিয়ে আসার আশঙ্কাও থেকে যায়।

যন্ত্রের দৌলতে আকাশও খোলা এবং বাতাসও সত্যি সত্যি এখন পবনদূতা এখন আলো, ধনি আর বায়ু লোকের ঘরে ঘরে সব খবর, সব ছবি, সব দৃশ্য, সব সু-কু কর্ম ঘরে বসা, শুয়ে থাকা লোকের চোখে ধরিয়ে দেয়, পৌঁছে দেয় কানে। মানুষের মনে-মননে চেতনায়-চিন্তায় তোলে আলোড়ন। মানুষ এখন আর উদাস-বিরাগী-বিবাদী থাকতে পারে না। অন্যায়ে জাগে ক্ষোভ-ক্রোধ-কান্না, ন্যায়ে জাগে আশা-আশ্বাস-আনন্দ। এখন জগতের যে-কোন কোণের মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-যন্ত্রণা অন্য মানুষদেরও বিচলিত করে, ভাবিয়ে তোলে।

আজকাল ধরতে গেলে পৃথিবীর মানুষ এক বড় বাজারের চারপাশের পড়শীমাত্র। সবাই এখন সবার প্রাজন্মক্রমিক ইতিবৃত্ত জানে চিরকালীন পড়শীর মতোই। তবু এ জানা-শোনা বোঝা-পড়ার কাজে আজো সহায়ক হয়নি। সহ ও সম স্বার্থে-সংযমে-সহিষ্ণুতায়-সহযোগিতায়-সহাবস্থানের অঙ্গীকারেই যে নির্বিঘ্ন-নিরুপদ্রব-নিরাপদ জীবনযাত্রা সম্ভব ও সহজ, তা আজো কাউকে জানানো-মানানো-বোঝানো গেল না। ঈর্ষা-অসূয়া-হিংসা-ঘৃণা-অবজ্ঞা, লাভ-লিপ্সা-জিগীষা দুর্বল-নিঃস্ব-নিরন্ন মানুষকে বানায় চোর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিথ্যাচারী প্রবঞ্চক প্রতারক ভিখিরী, আর প্রবল সাহসীকে প্রেরণা-প্রণোদনা-প্রবর্তনা যোগায় জোর-জুলুমে কাড়া-মারা-হানায়।

কথা না বাড়িয়ে এবার রাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত দিয়েই কথা শেষ করছি, যুক্তরাষ্ট্র বিদ্যায়-বিত্তে-বিজ্ঞানে, কৌশলে-প্রকৌশলে-প্রযুক্তিতে, আবিষ্কারে-উদ্ভাবনে, চিন্তায়-চেতনায়, মননে-মনীষায়, যন্ত্রে-অস্ত্রে-অর্থে প্রবলতর। তাই সে বেপরওয়া এবং অর্থ-সম্পদ ঋণে দানে ত্রাণে বিলিয়ে আফ্রো-এশিয়া-লতিন আমেরিকার এবং সম্প্রতি য়ুরোপের বিশেষ করে পূর্বয়ুরোপের রাষ্ট্রগুলোকেও করেছে অনুগত। এ আনুগত্য নির্ভরশীলতার আনুগত্য, এ একপ্রকার দাসত্বেরই নান্তর। তাই যুক্তরাষ্ট্র যখন পানামা, গ্রানাডা, নিকারাগুয়া দখল করে, বড়শিতে ধরা মাছের মতো সানন্দে খেলায় দুস্থ অসহায় মানুষকে ও মানবতাকে নিষ্ঠুরতম বর্বরতম পদ্ধতিতে কিংবা হঠাৎ তেলসাম্রাজ্য বিস্তারে বাধা পড়ায় কুয়েত নিয়ে ন্যায়-নীতির দোহাই পেড়ে মধ্যযুগের নাইটের শিভালরি নিয়ে দিনের যুদ্ধে আর রাতের হামলায় গোটা দুনিয়াকে সন্ত্রস্ত করে তোলে, তখন প্রতিবাদ, প্রতিকার, প্রতিরোধ করার রাষ্ট্র মেলে না। ধৈর্য নেই, মুহূর্তের মধ্যে চাই ইরাকের এ অন্যায়ের, সাদ্দামের এ ঔদ্ধত্যের প্রতিকার। কিন্তু ইজরাইল যে গোলান, গাজা, জর্ডন-সিনাই দখল করে বছরের পর বছর ঔদ্ধত্যে-আস্ফালনে গর্বে-দম্ভে গোটা দুনিয়াকে তাচ্ছিল্য করে চলেছে, তার কোন প্রতিকারের গরজ নেই যেন কারো। অতএব, অর্থে বিত্তে অস্ত্রে তথা সামরিক শক্তিতে যে রাষ্ট্র স্বনির্ভর, স্বয়ম্ভর সে-রাষ্ট্রই কেবল কিছুটা মানে-মাপে-মাত্রায় স্বাধীন। আর সব অনুন্নত দেশ সার্বভৌম তো নয়ই, স্বাধীনও নয়। ঋণে-দানে-ত্রাণে হুকুমে-হুমকিতে-হুঙ্কারে-হামলায় চরা মুৎসুদ্দি সরকার শাসিত, এন.জি.ও আকীর্ণ-অঞ্চল বিশেষ, নামে অবশ্যই স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র।

AMARBOI.COM

প্রাণী মাত্রেই লক্ষ্য ভোগ-উপভোগ

জীব-উদ্ভিদ নির্বিশেষে প্রাণীমাত্রেরই জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে ভোগ-উপভোগ। এ ভোগ-উপভোগ দু'রকম, শারীর ও মানস। দেহ-প্রাণ স্থির ও সুষ্ঠু, হৃষ্ট ও পুষ্ট রাখার জন্যে প্রয়োজন খাদ্য। জীব-উদ্ভিদ কেউ সর্বভুক নয়। প্রত্যেকেরই রয়েছে নির্বাচিত এক বা একাধিক খাদ্য। যেমন সাপের খাদ্য ব্যাঙ, ব্যাঙের খাদ্য পোকা, পোকার খাদ্য ফল, ফুল, পাতা বা অন্য দুর্বলতর ও ক্ষুদ্রতর পোকা। জীব-উদ্ভিদ জগতে সর্বত্রই এমনি নির্বিচার না হলেও রয়েছে নির্বাচিত খাদ্য-খাদক সম্পর্ক। মানুষ ও বাঘ-সিংহ-হাতী প্রভৃতি হিংস্র সবল প্রাণী, কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি বিষাক্ত প্রাণী আম-জাম-কাঁঠাল পাতা খায় না, ছোট ছোট অনেক তরু-লতা খায়। জীব-উদ্ভিদ জগতে যেখানে পরস্পর খাদ্য-খাদক সম্পর্ক নেই, কিংবা একই খাদ্য নিয়ে প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই, সেখানে প্রাণীরা নির্বিবাদে সহাবস্থান করে। সেখানে পারস্পরিক জীবন নিরুপদ্রব, নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন। অতএব, জীবনে রয়েছে অরি থেকে আত্মরক্ষার সদাসতর্ক প্রয়াস-প্রযত্ন, সে সঙ্গে রয়েছে শঙ্কা-ত্রাসের অস্বস্তি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবার প্রজননের প্রাকৃতিক প্রেরণায় স্বপ্রজাতির একটা সামাজিক তথা দলীয় সম্পর্ক-সমৃদ্ধও রয়েছে জীবজগতে। মূলে তা কাম, তা একক প্রাণীতে আসক্তিরূপেই সীমিত থাকলে তাকে মনুষ্য ভাষায় বলা হয় প্রেম। কাজেই প্রেম কামজ। আবার মানুষ বুনো-বর্বর-ভব্য সভ্য সংস্কৃতিমান হওয়ার বিবর্তন ধারায় নানা টোটেম ট্যাবু, যাদুবিশ্বাস ও নানা শাস্ত্র, সমাজ, নীতি-নিয়ম ক্রমান্বয়ে গ্রহণ-বর্জন, বরণ-পরিবর্তন করে অবশেষে অজাচার পরিহার করে বিবাহপ্রথা প্রবর্তনে একটি সুশৃঙ্খল নীতি-নিয়মমানা গৌত্রিক, গৌষ্ঠীক, দলীয় সামাজিক-শাস্ত্রিক জীবন যাপনে উন্নীত ও অভ্যস্ত হয়। ফলে বিবাহ সূত্রে যে আত্মীয় সমাজ গড়ে ওঠে, তাতে চাচা-মামা, ভাই-বোন, খালা-ফুফু, চাচী-মাসী, ভাগনে, ভাইপো, ভাগ্নী ভাইজি, নানা-নানী, দাদা-দাদী সম্পর্কে একটা ট্যাবু-সংস্কার আবার স্থায়ী রূপ নেয়। ফলে যৌন জীবন ও যৌন সম্পর্ক কেবল বিশেষ রীতি-রেওয়াজে সীমিত হয়ে সংযম-সুরুচি-সংস্কৃতির বিকাশ বিস্তার ঘটায়। এর নামই সভ্যতা, সংস্কৃতি, শাস্ত্রাচার, প্রথা-পদ্ধতি, জীবনাচার, দেশাচার ও লোকাচার।

এগুলো পারিবারিক, সামাজিক, নৈতিক, শাস্ত্রিক, সাংস্কৃতিক ও ব্যবহারিক জীবনে স্নেহ, মায়া-মমতা, প্রীতি, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, ভক্তি, অনুরাগ-হৃদ্যতা, পরার্থপরতা, সেবাপরায়ণতা, সহায়তা, সহযোগিতা, কৃপা করুণা, দয়া, দান, দাক্ষিণ্য, মান্যতা, সৌজন্য, আদব-কায়দা, সদাচারণ, বিনয়, তরিবৎ প্রভৃতি নামে পরিচিত। এসব হচ্ছে মানস চাহিদা ও মানস স্বাস্থ্য সুষ্ঠু রাখার জন্যে আবশ্যিক ও জরুরী। আবার যেহেতু 'খাদ্য' নিয়ে এবং মানুষের ক্ষেত্রে খাদ্যপ্রতীক অর্থ-সম্পদ নিয়ে প্রাণিজগতে প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকে, সেজন্যে কাড়াকাড়ি, মারামারি, হানাহানি এড়ানো আজ অবধি প্রাণী প্রজাতি মানুষের পক্ষেও সম্ভব হয়নি। সম্ভোগ্য বস্তু নিয়ে দ্বেষ-দ্বন্দ্ব- সংঘর্ষ-সংঘাত আজো প্রায় অপ্রতিরোধ্যই রয়ে গেছে। যৌনজীবনেও রয়েছে অর্থাৎ কাম-প্রেম ক্ষেত্রে রয়েছে দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-হিংসা-ঘৃণা-ঈর্ষার কারণ, যদিও বিবাহপ্রথা এর সংখ্যা ও মাত্রা সঙ্কট-সমস্যা তেমন গুরুতর করে তোলে না সমাজে। কাজেই মানস ভোগ-উপভোগের ক্ষেত্রেও কাঙ্ক্ষার অপূর্তি, হারানোর বেদনা, প্রত্যাখ্যানের যন্ত্রণা, পরাজয়ের গ্লানি, প্রতিহিংসার আগুন, কাড়া-মারা-হানার ঘটনা প্রভৃতি মানুষের মানস ভোগ-উপভোগও নিরুপদ্রব, নিরাপদ, নির্বিঘ্ন অবাধ করার নিশ্চয়তা দিতে পারে না।

ফলে জীবনের লক্ষ্য ভোগ-উপভোগ হলেও, তার জন্যে প্রকৃতিনিয়ন্ত্রিত অন্য জীবের ও উদ্ভিদের ক্ষেত্রে অনিশ্চিত-অদৃশ্য আকস্মিক নিয়তি বা পরিণাম নির্ভরতা ছাড়া উপায় নেই। জলে-স্থলে আকাশে তারাও মানুষের মতো নিশ্চিত মৃত্যুর অনিশ্চিত অজ্ঞাত স্থান-কাল চিরদূরত্বে রয়েছে মেনে চিরজীবীর মতো সুখে-স্বচ্ছন্দে-আরামে-আনন্দে বিচরণ করে। বিপদ ঘটে আকস্মিকভাবে। তাই ভোগে উপভোগে নিশ্চিন্ততার স্বস্তি-সুখ-আনন্দে ব্যাহত হয় না তাদের। কিন্তু মানবপ্রজাতির জীবনযাপন পদ্ধতি হচ্ছে স্বরচিত। সে প্রকৃতি-পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রকৃতির সঙ্গে তার গতি-প্রকৃতি বা স্বভাব বুঝে আপোস করে তাকে বশে রেখে, তার প্রতিকূল্য এড়িয়ে তাকে জীবনের অনুকূলে কাজে লাগিয়ে বেঁচেবর্তে থাকে। এ অর্থে প্রাণী হলেও মানুষ প্রায় সর্বক্ষেত্রে ব্যবহারিক ও মানসিক জীবনে স্বরচিত কৃত্রিম জীবন যাপন করে। তার জীবন এ তাৎপর্যে প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত, অভিজ্ঞতা-জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি, প্রয়াস-প্রযত্ন, কৌশল-হাতিয়ার বা যন্ত্র ও প্রযুক্তি প্রয়োগে সে স্বেচ্ছাচালিত স্বনির্মিত স্বসৃষ্ট পরিবেশে বাস করে, ভোগ-উপভোগ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে জীবন। এ জন্যেই সদা সচেতন, কৌতূহলী, জিজ্ঞাসু, উদ্ভাবন ও অবিষ্কারপ্রবণ প্রয়াস-প্রযত্ন-ধৈর্য-অধ্যবসায়শীল মানুষ প্রজন্মক্রমিক চিন্তা-ভাবনা-মনন-চিন্তনের ধারাবাহিক বিবর্তন-পরিবর্তনের উপলাহত প্রবাহে শাস্ত্রিক, নৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আর্থিক-পারিবারিক জীবন ব্যবহারিক ও মানসিক ক্ষেত্রে জটা-জটিল করে তুলছে। মনুষ্যজীবনে-জীবিকায়, মননে-চিন্তনে, আচারে-আচরণে ঋজু ও তরল-সরল কিছু নেই। তার মন বোঝা ভার, তার মত জানা শক্ত, তার মন্তব্যের গোড়া জানা অসম্ভব, তার সব আচার-আচরণ, কাজ-কথা দ্ব্যর্থজ্ঞাপক, মতলব বোঝা শক্ত। ছল-চাতুরী-শটতা-কপটতা-প্রবঞ্চনা-প্রতারণা, ঠাট্টা-মস্করা-পরিহাস-উপহাস-বিদ্রুফ-ব্যঙ্গ আর ব্যাঙ্গ-ব্যজস্তুতি প্রভৃতির সঙ্গে তার অকপট উক্তির পার্থক্য বোঝা ক্বচিৎ কারো পক্ষে সম্ভব হয়। এ জন্যেই বলে, মানুষ বুকে-মুখে অভিন্ন নয়। নিন্দা-তারিফেও মনের, মাপের, মাত্রার পার্থক্য থাকে। ভালো-মন্দ-মাঝারিতেও রয়েছে গুণের, মানের, মাপের ও মাত্রার বৈষম্য। কত ভালো, কত মন্দ কিংবা কেমন মাঝারি বোঝা বা বোঝানো কি সহজ। উচ্চারণ সহজ, বোঝা কঠিন, বোঝানো কঠিনতর কিংবা অসম্ভব। এ জন্যেই মানুষমাত্রই সারাজীবনই কোথাও না কোথাও, কখনো না কখনো, কারো না কারো কাছে হেঁয়ালির শিকার ও শিকারী। এজন্যেই ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, আর্থিক জীবন কিংবা রাষ্ট্রিক জীবন সব সময়ে শঙ্কাসঙ্কুল, রহস্যাবৃত, সংগ্রামবহুল। এ কারণেই জীবন মানে কখনো সংগ্রাম, কখনো আপোস, কখনো প্রতিরোধ, কখনো জয়, কখনো পরাজয়। আনন্দের আর গ্লানির, হারের আর জিতের খেলা এ জীবন। সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, আশা-আশ্বাস, সাফল্য-ব্যর্থতা, আকাঙ্ক্ষাপূর্তি-অপূর্তির সমষ্টিই জীবন। আবার ক্বচিৎ কখনো পৌষমাস কিংবা সর্বনাশও ঘটে কারো কারো জীবনে। জীবন বিচিত্র। তাই জীবন সংবেদনশীলদের কাছে চেতনারই বিচিত্র প্রসূন, জ্বালা-যন্ত্রণার ও আনন্দ-আরামের মিশ্র অনুভবই জীবনের সঞ্চয়।

দরিদ্র ধনলিপ্সু হয়, শরম-সততা হারায়

আজন্ম ভোগে বঞ্চিত মানুষ ত্যাগ করতে পারে না কিছুই। ধনে কাঙাল মানুষ অবস্থার চাপে মনেও কাঙাল হয়ে পড়ে। অবশ্য কাম-প্রেম-স্নেহ-মমতা বা অপত্য-আত্মীয় প্রভৃতির প্রতি আবেগ-আসক্তি বশে ত্যাগ করা দরিদ্রের নিঃস্বের দুস্থের পক্ষেও সম্ভব। এ অবশ্যই ব্যতিক্রমা মাত্র, নিয়ম নয়। ভোগে-উপভোগে তৃপ্ত, তুষ্ট, সচ্ছল, স্বচ্ছন্দ, আত্মমর্যাদাবোধ সচেতন মানুষই কেবল বিবেকের প্রেরণায় প্রয়োজন মতো যথাসময়ে যথাস্থানে অর্থলিপ্সা ত্যাগ করতে পারে। কাজেই একটা বিশেষ স্তরের বা মাত্রার অর্থ-সম্পদের মধ্যে আশৈশব লালিত-পালিত না হলে সে মানুষ যে মানবিক বিবেচনায়, বিবেকের তাড়নায় কৃপা-করুণা দয়া-দাক্ষিণ্য বশে শুধু দান করে না তা নয়, অপূর্ণ, বাঞ্ছা, অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা, অতৃপ্ত ক্ষুধা বশে পরস্বাপহরণেও প্রলুব্ধ হয়। অতএব, একটা সাচ্ছল্য-স্বাচ্ছন্দ্য-প্রাচুর্য অনুভবের জন্যে অর্থ-সম্পদের যোগান থাকা চাই। নইলে মানুষের মনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গভীরে একটা চৌর্যবৃত্তি, একটা ভিক্ষা-বাঞ্ছা সুগোপনে উন্মেষিত হতে থাকে, তা পারিবারিক-সামাজিক-প্রাতিবেশিক কারণে সুপ্ত ও গুপ্ত থাকে মাত্র। সুযোগ সুবিধে পেলে এবং নিরাপদ নিরুপদ্রব স্বস্তির পরিবেশে মানুষের সেই সুপ্ত, গুপ্ত, জড় চৈতন্য ও লিপ্সা কেজো পন্থায় প্রকট ও আচরণে পরিব্যক্ত হয়।

আমাদের দেশজ মুসলিমরা অন্তত হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ থেকেই দরিদ্র নিঃস্ব মজুর বা তুচ্ছ পেশাজীবী শ্রেণীর লোক। সেকালে সব পেশাই ছিল প্রজন্মক্রমিক ঘরানা। কামার-কুমার, হাড়ি-ডোম-বাগদী-চামার-চাঁড়াল-চাষী-মজুর-জেলে-তাঁতি প্রভৃতি। এদের ছিল চির দুস্থ জীবন। অর্থ-সম্পদে ঋদ্ধ হওয়ার কোন উপায়ই ছিল না এদের জন্মসূত্রে বর্ণে, বর্গে, পেশায় বিন্যস্ত ভারতবর্ষীয় সমাজে। সে-যুগে শিল্পবিপ্লবের মতো কিংবা হাতিয়ারে কৌশলে-প্রকৌশলে-প্রযুক্তিতে কোন উৎকর্ষ বা বিবর্তন ছিল না বলে এদের আর্থিক জীবনে কোন উন্নতি ছিল না, বরং ঝড়-ঝঞ্ঝা-খরা-বন্যা-মারী-ভূকম্প-জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতির পৌনঃপুনিকতার দরুন এদের অর্থসম্পদে নয় কেবল, জন সংখ্যায়ও ছিল অবক্ষয়। এসব কারণে উজার হত পরিবার-পাড়া-গ্রাম-বংশ, বিরান হয়ে যেত বিশাল অঞ্চল। ১৯৪০ সনের পর থেকে নানা রোগের প্রতিষেধক-প্রতিরোধক ঔষধ আবিষ্কৃত হওয়ায়, যন্ত্রে-প্রকৌশলে-প্রযুক্তিতে বিস্ময়কর উন্নতি হওয়ায়, প্রকৃতিকে বশ ও প্রতিরোধ করার নানা ফন্দি-ফিকির উদ্ভাবিত হওয়ায়, প্রকৃতির সঙ্গে আপোস করে চলারও উপায় আবিষ্কৃত হওয়ায় (এমনকি অ্যাটমিক-ইলেকট্রনিক-প্রোটনিক-নিউট্রোনিক শক্তির সাহায্যে বা প্রয়োগে ঝড়-ঝঞ্ঝাও নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হবে হয়তো) আজ পৃথিবী একটা বিশ্বাজরারকেন্দ্রী চারপাশের পরস্পর প্রতিবেশী অঞ্চল মাত্র। এ যন্ত্রযুগে ও যন্ত্রজগতে ঘরে বসেই গোটা পৃথিবীর ঘটনা, রটনা, চাহিদা-সরবরাহ, দেহ-প্রাণ-মনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী টিভি রেডিয়ো প্রভৃতি নানা বিচিত্র যন্ত্র মাধ্যমে দেখা, শোনা ও জানা সম্ভব। এ দূরত্বের ও অজানার ব্যবধান ঘুচে গেছে বলেই আজ মানুষ মানুষের বিপদ-বিপর্যয়ের কথা মুহূর্তে জানতে পারে, প্রসারিত করতে পারে উদ্ধারের ও সাহায্য-সহায়তার হাত।

আমাদের ঝড়বিধ্বস্ত মানুষের সেবায়-শুশ্রূষায় আর্থিক খাদ্যিক সাহায্যে এগিয়ে এসেছে পৃথিবীর সম্পদশালী রাষ্ট্রগুলো। কিন্তু আমাদের অধিকাংশ মানুষ দু'হাজার বছর ধরে গরীব ঘরে লালিত বলে তাদের সুপ্ত ও গুপ্ত ধনলিপ্সা, ভিক্ষা-বাঞ্ছা আজো সুগোপনে আশ্রিত রয়েছে চিত্তের গভীরে। তাই তারা মুমূর্ষু মানুষের মুখের গ্রাসও কেড়ে নিতে, আত্মসাৎ করতে দ্বিধা করে না। এ ক্ষেত্রে তারা বিবেক-বিবেচনা-কৃপা-করুণা-দয়া-দাক্ষিণ্যরিক্ত মানবপ্রজাতি নামের প্রাণীমাত্র। দরিদ্র দুস্থ-নিরন্নের মধ্যে সহজে মনুষ্যত্বের জাগরণ ঘটে না।

এ দেশে তাই প্রয়োজনীয় সংখ্যার নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত সৎমানুষ মেলে না। আমাদের সরকারেও তাই সাংসদের ও মন্ত্রীদের মধ্যে অপকর্ম-অপরাধ-অর্থআত্মসাৎ প্রবণ নয় শুধু, ঘুষ, লুট, খুন প্রভৃতি অপরাধে অভিযুক্ত, শাস্তিপ্রাপ্ত, দুর্বৃত্ত বলে সমাজে কুখ্যাত, দুষ্কৃতী বলে ঘৃণ্য, দুষ্ট বলে চিহ্নিত, মাস্তান ও গুণ্ডা নামে অভিহিত ব্যক্তিরাও স্থানীয় জনপ্রিয়তার বদৌলত কিংবা অর্থসম্পদ বা মাস্তানী প্রয়োগে সাংসদে-মন্ত্রীত্বে ঠাঁই পায়। শহুরে শিক্ষিত জনগণও নানা স্বার্থে এদের পায়রবী করে, ঘৃণা করে না। এমনি সরকারের পক্ষে সুনীতি-সুশাসন-সুবন্টন কি সম্ভব না প্রত্যাশিত এদের কাছে? দই বানানোর জন্যে পুরোনা দইয়ের কিছুটা দরকার হয়, তেমনি নতুন সরকার দুনীর্তির অন্ধি-সন্ধি জানার বোঝার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্যেই যেন পুরোনো অভিজ্ঞ দুর্নীতিবাজদের সাংসদ ও মন্ত্রী করে নেয়। ফলে দুর্গত এলাকায় বিদেশীরা ত্রাণসামগ্রী নিজেরাই বিলিবন্টন করতে এগিয়ে আসে— মন্ত্রী সাংসদদের সততায় তাদের আস্থা নেই বলেই। এ অনাস্থার কথা আগে বিদেশী ত্রাণ সামগ্রীদাতারা অনেকবারই উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করেছে, কিন্তু তবু লজ্জিত হয়নি আমাদের সাংসদরা বা মন্ত্রীরা। আমাদের মধ্যে হায়া-শরম-সংকোচ-আত্মসম্মানবোধও যেন অনুপস্থিত। লক্ষ লক্ষ মানুষ এবার মরল অন্য কীট-পতঙ্গ-পশু-পখি-তরুলতার মতো তবু ক্ষুধার্ত মুমূর্ষু বাকি মানুষের ত্রাণসামগ্রী চুরি-লুট হচ্ছে রাস্তা-ঘাটে প্রকাশ্যে। প্রতিকার-প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেই। হায়রে দেশ, হায়রে মনুষ্য নামের প্রাণী। ভূত তো রয়েছে সর্ষের মধ্যেই।

ক্ষমতা বনাম চাটুকারিতা

লোক চাটুকারিতায় ক্ষমতাবান হয়ে অপরের প্রভু হয়ে ক্ষমতার স্বাদ পায় ও সাধ মেটায়। ছেলে বেলায় সৈনিকদের সালাম ঠুকবার কায়দা দেখে মনে হত যেন প্রথম পদাঘাত করার জন্যেই হাঁটু উঁচু করে পরে বিপদাশঙ্কায় পা নামিয়ে সেল্যুট করে। নির্বোধ বালক হলেও আমার এ অনুমান দৃশ্যত অসঙ্গ অযৌক্তিক ছিল না। আমরা জানি, মানুষমাত্রই ক্ষমতালিপ্সু। অপরকে দাস ও অনুগত রাখার এক অব্যক্ত বাসনা তার প্রাণে মনে মননে বিরাজ করে এবং দইয়ের সাধ ঘোলে মেটানোর মতোই ঘরে ঘরে বাবা মায়ের উপর, মা-বাবা সন্তানের উপর, এমনকি আত্মীয়-স্বজন বয়োজ্যেষ্ঠ হিতকামী পরিজন পরিচিত সবাই আদেশ উপদেশ নির্দেশ পরামর্শ হুকুম অনুরোধ উপরোধ, জ্ঞান-বুদ্ধি-চৈতন্যদান রূপে এ ক্ষমতালিপ্সারই বহু, বিবিধ ও বিচিত্র অভিব্যক্তি দান করে। নিজের অবচেতন বাঞ্ছা পূরণে প্রয়াসী হয় নিজের অজ্ঞাতেই।

এমনি ক্ষমতা প্রয়োগ স্ত্রী-সন্তানের উপর ভিখিরীর পক্ষেও সম্ভব এবং স্বাভাবিক বলেই ক্ষমতায় অধিকার এবং এর প্রয়োজনমতো শাসনপাত্রে প্রয়োগ ক্ষমতা ভোগ-উপভোগের গৌরব, গর্ব, আনন্দ, সুখ ও সম্মান দেয়। তাই গৃহকর্তা রূপে ঘরের লোকের উপর নয়, মাইনে করা মজুরের উপর নয়, সমাজের উপর, বৃহৎ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর উপর শাহ-সামন্ত, বেণে ও মহাজন, মস্তান, গুণ্ডা, খুনী, ডাকাত এবং পরম ও চরম কাম্য রাজ্য-বাদশাহ-রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী কিংবা মন্ত্রী হিসেবে, নিদেনপক্ষে দারোগা থেকে সচিব অবধি যে-কোন সরকারী দফতরের বা বেসরকারী ব্যবসায়ী বা ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের পরিচালক-কর্মচারী হিসেবে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারলেই মানুষ মনে করে তার ইহজাগতিক জন্ম ও কর্ম সার্থক হল। গ্রাম-পঞ্চায়েত-পর্ষৎ পরিষদ থেকে সাংসদ অবধি, কিংবা যে কোন সমিতি, সংস্থা, কমিটি, কমিশন, প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির কর্মকর্তা হওয়া নিদেনপক্ষে কার্যনির্বাহী পর্ষদের সদস্য হওয়া তাই আত্মতৃপ্তি ও আত্মতুষ্টিকর। অধ্যক্ষ, প্রধান শিক্ষক, প্রধান পরিচালক হলেও ক্ষমতা প্রয়োগ সম্ভব। তাই সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠার বিবিধ প্রয়াস যেমন অফিসে দফতরে প্রতিষ্ঠানে দৃশ্যমান, তেমনি বেকারদের ভোটে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জেতার প্রয়াস-প্রযত্নও বাত্যাতাড়িত তরঙ্গসম আলোড়ন তোলে।

অতএব, মানুষ চায় ক্ষমতা ও খ্যাতি, এ দুটো মেলে অপরকে দাস ও অনুগত করা সম্ভব হলে। দাসের কাজ হুকুমমানা, আর অনুগতের কাজ স্তুতি-প্রশস্তি গাওয়া। বলেছি, মানুষ মাত্রই ক্ষমতালিপ্সু। কিন্তু এ বাঞ্ছা সমাজে ও রাষ্ট্রে পূরণ হয় হাজারে একজনের, লাখে কয়েকজনের, তার জন্যে অর্থ সম্পদ থাকা আবশ্যিক। অর্থ-সম্পদ রূপ লগ্নিপুঁজি থাকলে সামান্য বিদ্যা ও ধূর্ততা সম্বল মানুষই সাধারণভাবে সমাজে, রাষ্ট্রে নেতৃত্ব কর্তৃত্ব, মান-যশ-খ্যাতি-ক্ষমতা পায়। এ ক্ষেত্রে বিদ্যা নয়, অর্থ আবশ্যিক ও জরুরী। কাপট্য, প্রবঞ্চনা-প্রতারণা-আশা-ভরসা-মিথ্যা-প্রবোধ প্রভৃতি সবকিছুই মিথ্যার ও মিষ্টভাষণপটুতার, বাকনৈপুণ্যের, উৎকর্ষের ও স্থানে কালে পাত্রে সুপ্রয়োগের উপর নির্ভর করে। সাধারণ মানুষগুলোতে জয়ের চাবিকাঠি এসব গুণ দুর্লভ। তাই চিরকাল প্রায় সব মানুষই থাকে দাসত্বে ও আনুগত্যে বশ। ফলে সমাজে সুবিধেবাদী, সুযোগ সন্ধানী তোয়াজপটু, চাটুকার ও পদলেহন নিপুণ আত্মমর্যাদাবোধরিক্ত, মিথ্যাচারী, কপটাচারী স্বার্থ সচেতন ব্যক্তিই লাখে নিরেনব্বই হাজার নয়শ'জন। এরাই একের-দাসত্বে, আনুগত্যে ও চাটুকারিতায় ক্ষমতাবান হয়ে অপরের প্রভু হয়ে ক্ষমতার স্বাদ পায় ও সাধ মেটায়।

AMARBOI.COM

সারমেয় ও ফেরু

সারমেয়ের অন্যান্য প্রাণীর মতো বিশেষ ধরনের কোন খাদ্য নেই। আর সারমেয়রা আলস্যপরায়ণ। খাদ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে তারা সাধারণভাবে মনুষ্যপরিবার ও সমাজনির্ভর। অলস ও খাদ্যের জন্যে মনুষ্যনির্ভর বলেই ওরা মানুষের এতো অনুগত। ক্ষুধার অন্ন সহজে মনুষ্য সন্নিধ্যে দাক্ষিণ্যে জোটে বলেই ওরা এতো কৃতজ্ঞ যে নিজেদের অস্তিত্ব-স্বাতন্ত্র্য চেতনাও প্রভুর পায়ে সমর্পণ করে আত্মভোলা থাকে। এ জন্যেই লাথি মারো, আর লাঠি মারো তবু প্রভুপদপ্রান্ত ছেড়ে যাবেই না। এদের বিশ্বস্ততার তারিফ থাকা সত্ত্বেও এরা আত্মসম্মানবোধহীন বেহায়া ও কৃতজ্ঞতায় বা অন্নদাসত্বে সমর্পিত দেহ-প্রাণ-মন বলে এদের প্রতি মানুষ গাঢ়-গভীর ঘৃণা পোষণ করে, শ্রদ্ধা করে না উপকারী ও বিপদের বন্ধু এবং সহায় বলে।

ফেরুরা আহার্য সংগ্রহ করে ব্যক্তিগতভাবে। কিন্তু তাদের ইত্তেহাদ, সংহতি বা উম্মাহ চেতনা প্রায় দলবদ্ধ মানুষের মতোই। বলা চলে তাদের রয়েছে গড্ডল স্বভাব। একটির কণ্ঠধ্বনি শোনামাত্র অন্যরা নীরব থাকতেই পারে না, সমবেত কণ্ঠে সাড়া দিতে কিংবা মানুষের মতো 'নারা' বা স্লোগান দিতে থাকে। এমন ঐক্য একতা সংহতি সহানুভূতি ভ্রাতৃত্ব বা অভিন্ন চেতনা অবশ্যই প্রশংসনীয়। তবু কেন জানি না, লোকে ওদের এ ঐক্য সুনজরে দেখে না। স্বাতন্ত্র্যবোধ, মন, মত, পথ, লক্ষ্য ভিন্ন নয় বলেই অর্থাৎ ব্যক্তিসত্তার ভিন্নতা বা স্বাতন্ত্র্যচেতনা নেই বলেই মানুষ তাদের ঐক্যকে বা গড্ডল স্বভাবকে পরিহাস করে, অবজ্ঞা করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আশ্চর্য সারমেয়ের সান্নিধ্যে থাকে বলে এবং ফেরুও প্রতিবেশী বলে মানুষও এদের চরিত্রের প্রভাবে পড়েছে। মানুষও ক্ষতির আশঙ্কায় এবং প্রাপ্তিলোভে সহজেই শক্তের ভক্ত, নরমের যম হয়ে দাঁড়ায়। মানুষও স্বীকার করে, মেনে চলে 'জোর যার মুলুক তার' বলে। মানুষও নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে দুর্জনেরে রক্ষা করার এবং দুর্বলেরে হানার দৃশ্য দেখে। প্রতিকারের উপায়, প্রতিবাদের সাহস এবং প্রতিরোধের শক্তি অর্জন করে না। ব্যতিক্রম কৃচিৎ কখনো ঘটে বলে, তা এখানে আলোচ্য বা উল্লেখ্য নয়। কেননা উন্নত দেশেও এ শ্রেণীর লোক বেশি দেখা যায় না সহজে।

সারমেয় ও ফেরু চরিত্র বা স্বভাব মনুষ্যাচরণে ও স্বভাবে চরিত্রে, ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে বরিব্যক্ত হয় স্তাবকতায় ও চাটুকারিতায়, স্তরে-স্তুতিতে-প্রশস্তিতে-পদলেহিতায়-তোয়াজে-তোষামোদে। এবং সবটাই শক্তিমানের ক্ষমতাবানের উদ্দেশ্যেই নিবেদিত। এখানে অজ্ঞ অনক্ষর নিঃস্ব-নিরন্ন-কুলি-মজুর কিংবা ক্ষমতাহীন নির্ধনব্যক্তির ঠাঁই হয় না। এমনকি কেবল গুণী জ্ঞানী সজ্জন সুজনও পাত্তা পায় না ক্ষমতা প্রয়োগে কারো ক্ষতি করতে সমর্থ নয় বলে কিংবা লাভ-লিপ্সা পূরণে সহায়ক নয় বলে। তবে, মান-যশ-খ্যাতি-ক্ষমতা অর্জনের জন্যে অযোগ্যের স্বল্পযোগ্যের কিন্তু উচ্চাশী ধূর্ত মতলববাজ বেহায়া-বেশরম-বেলেহাজ-বেল্লিক-বেইমান অসৎ কপট ছদ্মবেশী বহুরূপী অভিনয়-নিপুণ ব্যক্তির সারমেয়ের মতো, ফেরুর মতো, মেষের মতো অনুগত স্তাবক চাটুকার, নিত্যঅনুচর পদসেবী হওয়া আবশ্যিক হয়ে পড়ে। দিতে হয় নজর, ঘুষ, উপহার, উপঢৌকন, কমিশন প্রভৃতি। এজন্যেই মনুষ্য সমাজে অযোগ্য, অসৎ, কপট, কৃতঘ্ন, বেইমান, নীতিআদর্শহীন দলছুট 'ঝোপ বুঝে কোপ মারা' লোকের উন্নতি ও দ্রুত উত্থান ঘটে নেতারূপে, আমলারূপে ক্ষমতাবান আর ধনী মানী বেণে রূপে।

AMARBOI.COM

মনীষার ও মনীষীর সীমাবদ্ধতা

বড়-ছোট-মাঝারি সব মানুষের উপরই কম-বেশি স্বকালের, স্বদেশের, স্বসমাজের, স্বশাস্ত্রের প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ প্রভাব থাকেই। এ জন্যে কাউকে নিন্দা-তিরস্কার না করে একে স্বাভাবিক মনে করে সয়ে যাওয়াই ভালো। মহামনীষীও থাকেন কোন কোন বিষয়ে অজ্ঞতার বা সীমিত সাধারণ ও সামান্য চিন্তার শিকার। এর ঢালাও প্রমাণ পৃথিবীর আস্তিক-দার্শনিকরা প্রমাণে তো নয়, কেবল অনুমানেই ভয়-ভক্তি-বিস্ময়-ভরসা-কল্পনাবশেই তাঁরা আস্তিক এবং নিজেদের মতো করে যুক্তিও তাঁরা খাড়া করেন, যদিও নিরীশ্বরদের কাছে তা অবিশ্বাস্য অযৌক্তিক-অবৌদ্ধিক বলেই অগ্রাহ্য।

আসমান-ছোঁয়া উঁচু চেতনার, বৈশ্বিক বিস্তৃতির মনীষার লোকের মধ্যেও যে ক্ষুদ্রতা থাকে, তার আমাদের দৈশিক প্রমাণ রামমোহন রায়, তিনি সুদখোর ছিলেন, তাঁর সব অর্থ সদুপায়ে অর্জিত ছিল না। পিতা মাতার প্রতি তাঁর ব্যবহার ছিল অমানবিক, তিনি আস্তিক ও হিন্দু ছিলেন, বিলেত যাওয়ার সময়ে লোকদেখানো রক্ষণশীলতার সাড়ম্বর ব্যবস্থা করেছিলেন। রামমোহনের চরিত্রে সংযম সততা তেমন ছিল না। তিনি স্বদেশে ব্রিটিশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্তাবক ও ব্রিটিশ সরকারের সহযোগী ছিলেন, আবার অপ্রাসঙ্গিকভাবেই মুঘল শাসনের নিন্দা করেছেন, তা না দেখে না জেনেই বর্তমান প্রভুকে তোয়াজে তুষ্ট করার জন্যেই। আবার বিলেতে ব্রিটিশের কোন কোন দুঃশাসনের নিন্দা ও প্রতিবাদ করেছেন, চেয়েছেন প্রতিকার। তিনি ব্রাহ্মণ সন্তান হিসেবে বর্ণ হিন্দুর স্বার্থে ভেবেছেন অনেক কিছুই। আবার বিদ্বান মনীষী হিসেবে ছিলেন যুক্তিপ্রবণ বা র‍্যাশনাল। বাঙলার দেশজ মুসলিমের জন্যে কিছুই ভাবেননি। তাঁর চেতনায় ওদের অস্তিত্বই ছিল না। যেমন ছিলনা বিদ্যাসাগরেও। দু'জনই ছিলেন ব্রিটিশ ভক্ত কৃতজ্ঞ-কৃতার্থ প্রজা। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে শাস্ত্র পড়েও ছিলেন নিরীশ্বর। আর য়ুরোপকে জানা-বোঝার সতর্ক সযত্ন প্রয়াসী, সমকাল সচেতন রামমোহন মদ্য-মাংসে আসক্ত থেকেও নাস্তিক হতে পারেননি।

রবীন্দ্রনাথও সাতচল্লিশ বছর বয়স অবধি সামন্ত বুর্জোয়া সন্তান হয়েও, য়ুরোপীয় জীবনচেতনায় সিক্ত থেকেও, মুঘলাচারে অনুরক্ত থেকেও প্রাচীন ভারত, অরণ্য, তপোবন, ব্রাহ্মণ্য মহিমা, হিন্দুত্বগর্ব প্রভৃতিতে ছিলেন অভিভূত। তাঁর আত্মশক্তি (১৯০৪), ভারতবর্ষ (১৯০৬), রাজাপ্রজা (১৯০৮), সমূহ (১৯০৮), স্বদেশ (১৯০৮) প্রভৃতিই তার প্রমাণ।

বরং বঙ্কিমচন্দ্রে ছিল দেশ, জাত, মানুষ, জীবন, সমাজ সম্বন্ধে একটা সামগ্রিক, সামূহিক, সামষ্টিক দৃষ্টি। তাঁর এ চিন্তা-চেতনা প্রসারমান ছিল যতকাল তিনি নাস্তিক ছিলেন অর্থাৎ পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স অবধি। বিজ্ঞান রহস্যে, লোকরহস্যে, প্রবন্ধাবলীতে এবং কমলাকান্তে তা সুপরিব্যক্ত। দেশের সর্বক্ষেত্রে ভাষা-সাহিত্য সেবায় মুসলিম ভূমিকার গুরুত্ব তিনিই প্রথম উপলব্ধি ও ব্যক্ত করেন। ধর্মতত্ত্ব-অনুশীলন-গীতা চর্চার কালেই স্বেশ্বর, ভক্তিবাদী বৈষ্ণব-বঙ্কিমই হলেন নিতান্ত সাধারণ ও সামান্য হিন্দু।

ঊনিশ শতকের আর এক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব হলেন যুক্তিবাদী বিজ্ঞানানুরাগী অক্ষয় কুমার দত্ত। আর প্রত্যক্ষবাদী কিছু বিদ্বানও ঊনিশ শতকের চিন্তার আকাশ প্রসারিত করেছিলেন। এমনকি হিন্দুর বেদান্তচিন্তার গৌরবকারী বিবেকানন্দও রাজনীতির ও আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে দেশ-কালের চাহিদা সচেতন মনীষী ছিলেন। যদিও এঁরা হিন্দুই। এঁদের সঙ্গে প্রতিবেশী মুসলিমের চিন্তা-চেতনার কোন যোগ ছিল না। স্বাতন্ত্র্যকামী ছিল মৌলবীর ও উর্দুভাষীর প্রভাবে ও নেতৃত্বে। উল্লেখ্য যে কংগ্রেস গান্ধী-নেতৃত্বে আসার আগে এখানে ছিল ধর্মীয় জাতীয়তা—হিন্দু, মুসলিম, খ্রীস্টান-ফার্সী জাতীয়তা। কোন দৈশিক জাতীয়তাবোধ জাগেনি এদেশে।

সমাজে ও রাষ্ট্রে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব চাই

অর্থ-সম্পদ-শিক্ষার দিক দিয়ে আমরা গত দুহাজার বছর ধরে পিছিয়ে-পড়া কিংবা বঞ্চিত নিম্নবর্ণের ও নিম্নবর্গের তুচ্ছ পেশাজীবী বৌদ্ধ-হিন্দুজ মুসলিম সমাজভুক্ত বলেই বাঙলাদেশের বিদ্যা ও বিত্তবান শহুরে মানুষগুলোর মধ্যে জীবনের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ-রুচি-মন-মননের কোন ক্ষেত্রেই আমরা জনগণকে আকৃষ্ট ও প্রভাবিত করার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতো ব্যক্তিত্ব পাইনে। অথচ উনিশ শতকেই রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, কেশব সেন, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ প্রমুখ বহু বহু লোক স্ব স্ব ক্ষেত্রে মানুষের ভক্তির-শ্রদ্ধার-আকর্ষণের পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের প্রভাবে দেশের তরুণ শিক্ষিত সমাজ তাঁদেরকে আদর্শ করেই সে আদলে জীবনরচনায় মন-মননের পথ-পদ্ধতি বরণে আগ্রহী হয়ে উঠে।

আমরা ১৯৪৭ সন থেকেই এক প্রকারের বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র-স্বরুচি-বুদ্ধি-যুক্তিগ্রাহ্য জীবন রচনায়, ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে মানবিকগুণের, মনুষ্যত্বের উন্মেষ-বিকাশ সাধনের লঘু গুরু প্রয়াস-প্রযত্ন চালিয়ে যাচ্ছি বটে, কিন্তু আমাদের মধ্যে আজো তেমন মনস্বী-মনীষী দুর্লভ-দুর্লক্ষ্য, যিনি আমাদের মনোজমি কর্ষণে, মনোভূমে জ্ঞান-প্রজ্ঞা শ্রেয়-প্রেয়বোধ তাঁর ব্যক্তিত্ব প্রভাবে জাগাতে সমর্থ হয়েছেন। বরং আমরা উল্টোপথে চলে কেবল যে পিছিয়ে পড়েছি, তা নয়, পথের হদিস হারিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছি– মধ্যযুগের ভূত-প্রেত-পিশাচ-জীন-পরী-নিয়ন্ত্রক তাগা-তাবিজ পানিপড়া-দাতা পীরের খপ্পরে পড়েছি আমরা দেশসুদ্ধ মানুষ। রাষ্ট্রপতি, সাংসদ, আমলা, ব্যবসায়ী সবাই। যদিও আমরা জানি পীরালি-দরগাহ-সুফীমত কুরআন-হাদিসের শিক্ষাবিরোধী। জজিরাতুল আরবে আজো সুফী-দরবেশ-পীর-দরগাহ নেই। আমাদের ফরায়েজী-ওহাবী আহ্‌লে হাদীসপন্থীরাও পীরালিতে দরগাহপূজায় ও মারফতে আস্থা রাখে না। তবু আটরশির, সায়েদাবাদের, চরবরকতের, টাঙ্গাইলের পীরেরা দেশবাসীকে সম্মোহিত করে রেখেছে। তারা জানে ও মানে যে পীরের খানকায় আর মরাপীর-দরবেশের দরগায় ধর্না দিয়ে তদবীর করতে জানলে ও পারলে, খাস্ দিলে, তা হলে তক্‌দীর বদলে যায়, বাঞ্ছাসিদ্ধ হয়, বিপদ কেটে যায়। যদিও কুরআনের এক আয়াতে বলা হয়েছে, "মূর্তি ও মৃত তোমার কি উপকার করতে পারে।" যদিও কোরআনে বলা হয়েছে যে, গণকে, জ্যোতিষে, ভবিষ্যদ্বক্তায় আস্থা রাখতে নেই [এর মধ্যে রাশিচক্রাদিও পড়ে]। মার্কিন ইঙ্গিত কি-না জানি না, আমাদের অনেক সংবাদপত্রেও এ মিথ্যা রাশিফল ছেপে জনগণের মনোবল ভাঙে-গড়ে, কুসংস্কারে আচ্ছন রেখে তাদের মনে ভয়-ভরসা জাগায়। আমাদের তেমন কোন বিদ্বান নেই, যাঁদের বিদ্যাবত্তা দেশে-বিদেশে স্বীকৃত, যাঁরা স্বদেশের লোককে অনুকরণে-অনুসরণে প্রভাবিত বা আগ্রহী করে তোলেন, আমাদের তেমন ঐতহাসিক নেই, যিনি তথ্য-প্রমাণ যোগে অতীতের মিথ্যার কুয়াশাজাল ছিন্ন করে ইতিহাসে সত্য, তথ্য ও তত্ত্ব নতুন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে উপস্থাপিত করে আমাদের ভ্রান্তি নিরসন করে আত্মপ্রত্যয়ী ও আত্মপরিচিতি স্পষ্ট ও নিঃসংশয় করে দেন। এমন ব্যক্তিত্বও আমাদের মধ্যে নেই, যাঁরা সততা, দেশপ্রেম, জনসেবা অকৃত্রিম। যাঁরা বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞান-প্রজ্ঞা-অভিজ্ঞতা-চিন্তা-চেতনা, মনন ও সিদ্ধান্ত প্রভৃতিতে আস্থা রেখে আশ্বস্ত থাকা যায়। আমাদের সমাজে করমচাঁদ গান্ধী, মুহম্মদ আলি জিন্নাহর মতো প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব খুঁজে পাই না। এখন এ.কে. ফজলুল হকের খুব সুনাম। কিন্তু তিনি ১৯৪৩ থেকে ১৯৫৩ অবধি মুসলিম সমাজে অশ্রদ্ধেয় ছিলেন, পরেও আমৃত্যু আর জনগণের বল-ভরসার অবলম্বন ছিলেন না। তাঁর মতে-পথে-সিদ্ধান্তে কোন আদর্শনিষ্ঠা ছিল না বলে আওয়ামী লীগ নেতা হিসেবে স্মরণীয় হলেও শহীদ সোহরওয়ার্দী কখনো ভক্তি শ্রদ্ধার ব্যক্তিত্ব ছিলেন না।

দেশ আছে, রাষ্ট্র আছে, মানুষ আছে, কাজেই সরকার, সাংসদ, শাসন, প্রশাসন, ব্যবসা-বাণিজ্য আছে, আছে কলকারখানা, চাষবাস, অফিস-আদালত, হাট-বাজার, ঘাট-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাট, গাঁ-গঞ্জ, শহর-বন্দর। কাজেই এক হিসেবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের, জাতির ও রাষ্ট্রের মতো কম বেশি সবই রয়েছে, তবে অবশ্য গুণ-মান-মাপ-মাত্রার প্রভেদ থাকেই। এসব সত্ত্বেও জনজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বের, অনন্য বিদ্যার, অসামান্য মনীষার, অসাধারণ সততার, পরার্থপরতার, প্রারচনিক কৃপা-করুণা-দয়া-দাক্ষিণ্য-সেবা-সহায়তা প্রবণ ব্যক্তির, মিথেরি বা কিংবদন্তীর নায়করূপে শ্রোত্ররসায়ন, কারুর মনোলোভা সৎকর্মের, বিপদতাড়নের কিস্‌সা-কাহিনী, ঘটনা, ইতিবিত্ত-বৃত্তান্ত আমাদের মধ্যে চালু নেই। আমাদের প্রেণোর-প্রণোদনার উৎস ও আদর্শরূপে আমাদের মধ্যেও প্রবাদপুরুষের বা নারীর আবির্ভাব আবশ্যিক ও জরুরী।

তাই আমরা সাহিত্যে-শিল্পে-দর্শনে-বিজ্ঞানে-ইতিহাসে-সমাজবিজ্ঞানে-অর্থ বিজ্ঞানে-নীতি শাস্ত্রে এবং সততায় চারিত্রিক দার্ঢ্যের, আদর্শের নৈতিক চেতনার, বিবেক-বিবেচনার ক্ষেত্রে ভক্তি-শ্রদ্ধা করবার মতো, বল-ভরসা পাবার মতো, প্রেরণা-প্রণোদনা-প্রবর্তনা দেবার মতো, অনুকরণ-অনুসরণ করার মতো, দৈশিক-রাষ্ট্রিক ও জাতিক স্তরে গৌরব-গর্ব করার মতো, সর্বোপরি রাজনীতিক-দেশপ্রেমী-জনসেবীর মধ্যে জ্ঞান-প্রজ্ঞা-বুদ্ধি-যুক্তি-মনীষা-মনস্বিতা-সততাসম্পন্ন উঁচু গুণের, মানের, মাপের ও মাত্রার অনন্য, অসামান্য, অসাধারণ কোন এক বা কয়েকজন ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব চাই। নইলে জাতি হিসেবে, দেশ হিসেবে, রাষ্ট্র হিসেবে কিংবা সুরুচি-সৌজন্যে-সংস্কৃতিমান-সামাজিক মানুষ হিসেবে আমরা কখনো সভ্যসমাজে শ্রদ্ধেয় কিংবা গণনীয় হয়ে উঠব না। কাজেই চরিত্র, সততা-সৎবুদ্ধিসম্পন্ন বিদ্বান-বিবেকবান ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব চাই আমাদের সামাজিক, আর্থিক, রাজনীতিক, সাহিত্যিক, দার্শনিক, নৈতিক চেতনা-চিন্তার ক্ষেত্রে। শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তি এবং আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব চাই। এমন ব্যক্তি এবং ব্যক্তিত্বই হয় নেতা, নায়ক, ত্রাতা, রক্ষক, দিশারী, দিকপাল। এ ধারণা কিন্তু গণতন্ত্র বিরোধী নয়। গণতন্ত্র চালু রাখার জন্যেই এমনি ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন দলপতি দরকার। নৌকায় যেমন প্রয়োজন কর্ণধারী কাণ্ডারীর। মাল্লারা নয়, হালধারী পাকা মাঝিই নৌকা ঝড়-ঝঞ্ঝা কবলিত তরঙ্গতাড়িত উর্মিমুখর নদীতে ভাসিয়ে রাখার, চালিয়ে যাওয়ার যোগ্যতা রাখে। দেশ-জাতি-রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এ কাণ্ডারী হচ্ছে মনীষাসম্পন্ন চরিত্রবান ব্যক্তি।

আমাদের প্রেরণা-প্রণোদনার উৎস ও আদর্শ নেই : আমরা সংসর্গদুষ্ট

[১]

গাঁয়ে পাট-খড়ির ঘরে যারা বাস করতে অভ্যস্ত, শহরে যারা রাস্তায় নালার ধারে এঁদো খুপড়ি বা ঝুপড়িতে বাস করে, প্রতিবেশিক ও পারিবেশিক কৌৎসিত্য, দুর্গন্ধ, সেঁতসেঁতে মাটির সোঁদালগন্ধ শ্বাসরুদ্ধকর সংকীর্ণ পরিসর, জোড়াতালি দেয়া চাল-বেড়া-দ্বার, এঁটোভাত, তরকারী, অপরিচ্ছন্ন হাঁড়ি-বাসন-বিছানা, ময়লা শাড়ি-লুঙ্গি-জামা-প্যান্ট প্রভৃতি সবকিছুই তাদের চোখসহা, মনসহা, নাকসহা হয়ে যায় শুধু নয়, সবকিছুর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মালিকানা তাদের বলেই নিজের নিশ্চিত নিবাস বলেই একপ্রকারের স্বস্তি-সুখ-আরাম-আয়েসও অনুভব-উপভোগ করে। দেখে দেখে, অভাবে অসামর্থ্যে ভুগে ভুগে, আশা-আশ্বাসের কোন আলোর রশ্মি না দেখে অনন্যোপায় মানুষ ভাগ্যকে, নিয়তিকে দুর্ভোগ-দুর্দশাকে স্বাভাবিক ও প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার অপরিহার্য অঙ্গ ও নিয়ম বলেই জানে এবং মানে। তারা ভাগ্যের, নিয়তির, কর্মফলের, অদৃষ্টের হাতেই, আল্লাহ-ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে দেহ-প্রাণ-মন-আত্মা সমর্পণ করে নানাপন্থা জেনেই। এদের এক একটা দিন কাটে কখনো অনাহারে, কখনো অর্ধাহারে, কখনো স্বল্পাহারে, কখনো বা ভরপেট আহারে। কিন্তু অর্থাভাবে সবদিন এক প্রকারের আহার্য তাদের জোটে না, আজ আলু, কাল ফুটি, পরশু নুন-পান্তাভাত, কিংবা একদিন কাঁঠাল, অন্যদিন কেবল শাক-সবজি এমনি সব বিচিত্র আহার্যে হয় এরা অভ্যস্ত। এবং এমনি যে-কিছু পেলেই সেদিনকার বা সে-বেলার জন্যে থাকে আশ্বস্ত, তৃপ্ত, তুষ্ট এবং নিশ্চিন্তও। আবার পানি খেয়ে অনাহারে রাত কাটানোতেও এদের সন্তানেরাও হয়ে পড়ে অভ্যস্ত। অথচ, এদের অধিকাংশই বাস করে– বলতে গেলে লক্ষে লক্ষে বাস করে শহরে-বন্দরে– যেখানে ধনী-মানীরা বাস করে দালানে, খায় মানবকাম্য মাছ-মাংস-দই-দুধ-ঘি-মাখন-ডিম-কোর্মা-কোপ্তা-পোলাও, জর্দা-ফিরনী, দামী শাক-সবজি, দেশী-বিদেশী নানা তাজা শুকনো ফল-মূল-মিষ্টি বিবিধ প্রকারের ও বিচিত্র স্বাদের। এ দুপ্রকারের জীবন-যাপন পদ্ধতিতে রয়েছে আসমান-জমিনের ফারাক। স্বর্গ-মর্ত্যের ব্যবধান। এখন যেমন আফ্রো-এশিয়া-লাতিন আমেরিকার ধনী ও উচ্চাভিলাষী মানুষের মর্ত্যজীবনের বাঞ্ছিত ভূস্বর্গ হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র, তেমনি এদেরও মনের সুপ্ত, গুপ্ত এবং অসম্ভব বলে লুপ্ত বাঞ্ছার ভূস্বর্গ হচ্ছে দালান-কোঠাবাসীর জীবনোপকরণ।

[২]

আবার আগের কথায় ফিরে যাই। আমরা এদেশের শহর-বন্দরের তথাকথিত শিক্ষিত কিংবা লেখাপড়াজানা বড়-ছোট-মাঝারি ধরনের, মানের, খ্যাতির, ক্ষমতার ও পদের লোকেরাও মানসিক স্বাস্থ্যের ও মানসিক বিচরণ ক্ষেত্রের দিক দিয়ে নিতান্ত খুপড়ি-ঝুপড়িবাসী বস্তিওয়ালাদের মতোই। আমাদের মধ্যেও প্রতিবেশিক-পারিবেশিক কারণে অর্থাৎ আমরা গাঁয়ের অজ্ঞ-অনক্ষর বা সাক্ষর দরিদ্র ঘরের সন্তান বলেই, এক কথায় অর্থ-বিত্ত-শিক্ষা ও পদাধিকার প্রভৃতি ক্ষেত্রে ভুঁইফোঁড় বলেই তথা এক-দেড় পুরুষের বলেই আমাদের মন-মত-রুচি-সংস্কৃতি পরিশীলিত-পরিমার্জিত হয়নি। আমরা তাই মনে-মননে, রুচি-সংস্কৃতিতে, চিন্তায়-চেতনায়, পরার্থে দানে-দাক্ষিণ্যে, কৃপায়-করুণায়, দেশপ্রেমে, গণসেবায় প্রত্যাশিত গুণে-মানে-মাপে-মাত্রায় পৌঁছতে পারিনি। আমরা এ মুহূর্তেও জ্ঞানের গবেষণায়, গল্প-কবিতা-নাটক-উপন্যাস-প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে কিংবা রুচি-সংস্কৃতির অনুশীলনে, অথবা রাজনীতিক্ষেত্রে একটা বাঞ্ছিত মানের-মাপের ও মাত্রার ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের ও নীতি-নিয়মের, রীতি-রেওয়াজের, জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-বিবেক-বিবেচনার যোগ্য হয়ে উঠিনি। আমাদের আদর্শ হিসেবে আজো সমাজে নির্দোষ কিংবা স্বল্পদোষের কোন আদর্শ দেশপ্রেমী, রাজনীতিক নেতা, কোন কবি-নাট্যকার, গাল্পিক-ঔপন্যাসিক-প্রাবন্ধিক, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, বিশ্বনন্দিত বিদ্বান, বিজ্ঞানী, পরার্থপর সমাজসেবী পাইনে। সংসর্গ দোষে ও গুণে সমাজ-সংস্কৃতি প্রভাবিত করেই আমরা আজো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৈষয়িক, ব্যবহারিক বাণিজ্যিক ও উৎপাদন-নির্মাণ ক্ষেত্রে লুট, ঘুষ, চোরাচালান, ভেজাল প্রভৃতি প্রতারণা-প্রবঞ্চনার উপরে উঠতে পারিনি।

মুসলমান সমাজে মধ্যযুগীয় চিন্তা-চেতনাঋদ্ধ তীতুমীর-শরীয়তুল্লাহর আবির্ভাব ঘটেছিল বটে, তবে প্রতীচ্য জ্ঞানে-প্রজ্ঞায়পুষ্ট রামমোহন-বিদ্যাসাগর-বঙ্কিম-বিবেকানন্দের মতো লোকের আবির্ভাব আজো ঘটেনি। এখানে উল্লেখ্য যে, অধ্যাপক এ. এফ. সালাহ্উদ্দীন আহমদ প্রচারিত দেলওয়ার হোসেন, আবদুর রহিম, আমীর আলী, আবদুল লতিফরা ছিলেন অবাঙালী ও উর্দুভাষী। এদের সঙ্গে হিন্দু-বৌদ্ধজ তথা বাঙালী মুসলিমদের কোন সামাজিক-সাংস্কৃতিক-বৈবাহিক কিংবা চিন্তা-চেতনাগত মানসিক কোন প্রকার যোগ ছিল না। কাজেই এদের উদারতার, যুক্তিবাদিতার, নাস্তিকতার দৃষ্টান্ত বাঙালী মুসলিমের আদর্শ বা প্রেরণার প্রণোদনার উৎস হয়নি কখনো।

আর নিম্নবর্ণের ও নিম্নবর্গের হিন্দু-বৌদ্ধজ নিঃস্ব, নিরন্ন ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ বৃত্তিজীবী বা প্রান্তিকচাষী অজ্ঞ-অনক্ষর মুসলিমসমাজের নেতৃত্বে ১৯৪৭ সন অবধি ছিল বাঙলা দেশবাসী উর্দুভাষী জমিদার পরিবারের শিক্ষিত শহুরে ব্যক্তিরা।

এমনকি উর্দুভাষী জমিদার পরিবারের মহিলা বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের নারীমুক্তি লক্ষ্যে নারীশিক্ষার জন্যে প্রতিষ্ঠিত (প্রথমে ভাগলপুরে ও পরে কোলকাতায়) বিদ্যালয়েও বাঙলাভাষী ছাত্রী ২/৪ জনের বেশি ছিল না কখনো, তবে তার বাঙলা-ইংরেজী লেখা সেকালের কোলকাতার শিক্ষিত বাঙালীকে কিয়ৎ পরিমাণে চিন্তা-চেতনার খোরাক অবশ্যই যুগিয়েছিল। কিন্তু নারীমুক্তি, নারীশিক্ষা চেতনার উন্মেষ ও বিকাশ মুসলিম সমাজে শিক্ষিতের স্বল্পতার দরুন তাঁর রচনার প্রভাবে প্রত্যাশিত মাত্রায় ঘটেনি। এই উদার মহীয়সী মহিলাকে বাদ দিলে, আজ অবধি আমরা কেবল গোড়ায় অশিক্ষিত পরে স্বশিক্ষিত এক অনন্য, অসামান্য ও অনুপম পুরুষকে পাই বরিশালের আরজ আলি মতুব্বরের মধ্যে। তিনি জ্ঞান-প্রজ্ঞা-বুদ্ধি প্রয়োগে স্রষ্টায় ও শাস্ত্রে আস্থা হারান। কিন্তু মানবিক গুণে মনুষ্যত্বে উজ্জ্বল হয়ে চিন্তায় নিরীশ্বর, নির্ভীক, জনসেবী, মানবপ্রেমী সর্বসংস্কারমুক্ত ত্যাগবীর পুরুষ রূপেই কেবল আমাদের প্রেরণার, প্রণোদনার ও আদর্শ মানুষের প্রতিভূ, প্রতীক ও প্রতিম হতে পারেন। কিন্তু প্রচার-প্রচারণার অভাবে তাঁর নাম আজো বাঙলাদেশে গুহায়িত। তাঁর খোঁজ খবর রাখে না কেউ। তাঁর মৃত্যুও হয়েছে কয়েকবছর আগে। বই রেখে গেছেন পাঁচখানা– তাতে তাঁর অধ্যবসায়ের, সন্ধিৎসার, যুক্তিপ্রবণতার, শ্রমশীলতার এবং অনুশীলনে আগ্রহের সাক্ষ্যপ্রমাণ মেলে। তিনি অর্থবিত্ত ব্যয় করেছেন বিদ্যালয়, পাঠাগার ও চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার জন্যে। নিজের 'লাশ' দান করেছেন বরিশাল মেডিক্যাল কলেজে।

আমাদের সম্মুখে, মহান রাজনীতিক, মহান নেতা, বিশ্বনন্দিত বিদ্বান নেই। তাই আমরা প্রেরণা-প্রণোদনার উৎস আদর্শ পাইনে। আমরা ছোট পরিবেশে, নোংরা মনের মানুষের সমাজে কেবল নিজেদেরও ছোট ও সামান্য করে রাখছি। নামের জন্যে অর্থাৎ স্মরণীয় হওয়ার জন্যে অর্থদাতা পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু বরণীয় অনুকরণীয় চরিত্রের মানুষ পাওয়া যাচ্ছে না। এও আমাদের দুর্দশা না ঘোচার কারণ। আজকাল টাকাওয়ালারা Trust Fund করে অমরত্বের প্রতিযোগিতায় নেমেছে। তবু, ভালো, দানের হাত খুলুক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঁচব কি খেয়ে, কি নিয়ে, কি করে?

[১]

আগে লোকসংখ্যা সহজে বাড়ত না। ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, যক্ষা, সন্নিপাত ছাড়াও কলেরা-বসন্ত মহামারীর ছোবলে-কবলে পড়ে এবং প্রসবকালে জাতক-প্রসূতি মরত লাখে লাখে। তাই লোকসংখ্যা সহজে বাড়ত না এ শতকের প্রথমার্ধেও। এর পরে অকাল মৃত্যুর দ্বার প্রায় রুদ্ধ, কিন্তু যথাকালে জন্ম আজো প্রায় অবাধ। ফলে আগে বাঙালী মাত্রই খেত দু'বেলা ভাত কিংবা চাষী মজুর বালকেরা খেত দিনে তিনবার। এখন দু'বেলা খুব কম লোকেরই জোটে, আটার রুটি খেতেই হয়। গমের ময়দা পরোটা-লুচি-নিমকির জন্যে আগেও বাজারে মিলত। কিন্তু গরীবের উদরপূর্তির জন্যে ভাতের বিকল্প হিসেবে দারিদ্র্যপ্রতীক আটা প্রধান খাদ্যের : অনন্যোপায়ের অবলম্বন রূপে চাষী-মজুর ও পেশাজীবী নিম্নবিত্তের, নিম্নবর্গের এবং নিম্নমধ্যবিত্তের ঘরে আবশ্যিক হয়ে উঠল বলতে গেলে ষাটের দশকের গোড়া থেকেই। তাও ভরপেট জোটানো সবপরিবারে সম্ভব হচ্ছে না– না ভাত, না রুটি। মানুষ রাত কাটায় দিনে রোজগারের প্রত্যাশায় আর দিন কাটায় রাতে ক্লান্তি-শ্রান্তি ও গ্লানিহর নিন্দার প্রতীক্ষায় এ করেই কাটছে আমাদের সাড়ে এগারো কোটি মানুষের মধ্যে প্রায় নয় কোটি দুস্থ নিরন্ন, স্বল্পান্ন, দরিদ্র, স্বল্পবিত্ত তুচ্ছ পেশাজীবীর ও বেকার ভিক্ষাজীবীর জীবন। এমন শিক্ষিত বেকার এখন ঢাকা শহরে দুর্লভ নয়, যারা আক্ষরিক অর্থেই প্রায়ই অনিয়মিতভাবে উপোস করে দিনরাত কাটায়। আজকাল অসংখ্য লোক যথার্থ অর্থেই হা-ভাতে, যারা দু'বেলাই অর্ধাভাবে আটার রুটি খেয়ে বাঁচে। চাল-আটা-শাক-তরকারীর দামও ক্রমবর্ধমান। দিনকাল বদলাচ্ছে, কাজেই সনাতন সোনার দিনের জন্যে আফসোস করা চলবে না। তাই খাদ্যাভ্যাস বদলাতেও আপত্তি করা নিরর্থক। আমরা গোল ও রাঙাআলু, গাজর খাওয়াও অভ্যাস করতে পারব। তবে সে-ক্ষেত্রে খাদ্যপ্রাণ এ-বি-সি ট্রাবলেট আকারে বিনামূল্যে কিংবা নামমাত্র মূল্যে সরকার থেকেই সরবরাহ করতে হবে। নইলে মানুষ অপুষ্টিতে মরে যাবে। ইতোমধ্যে রাজনীতিক দল ভাবুক আর সরকার আলু-গাজর চাষ প্রয়োজনীয় পরিমাণে বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা করুক। কেননা, দশ-এগারো কোটির প্রত্যহ দু'তিন বেলার খাদ্য আলু-গাজর উৎপাদন করার মতো জমি ও জন, রাখার মতো সুনির্মিত গুদাম থাকা চাই। লোক ভবিষ্যতে কি খেয়ে বাঁচবে এখন থেকেই তা চিন্তার-চেতনার-মননের এবং পরিকল্পনার ও বাস্তবায়নের উপায় নির্ধারণ সরকারেরই দায়িত্ব।

[২]

বাড়ির চৌহদ্দি তখনো কারো বড় ছিল না। পরিবারে লোকসংখ্যা কম ছিল বলে দু'চারটে বীজ বোনার, চারা লাগানোর, গাছ তোলার জায়গা মিলত ভিটায়। আম, জাম, কাঁঠাল, পেঁপে, পেয়ারা, বরই, নারকেল, সুপারি, খেজুর, তাল, আখ থাকত। সেকালে সব গৃহস্থ, বেশি হলেও ফল-ফলাদি বেচত না, পাড়া-পড়শী ছেলেমেয়েরাও প্রকাশ্যে কিংবা আড়ালে থেকে উড়োভাগ পেত বা নিত। জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় এখন ভিটেতে তিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধারণের ঠাঁই থাকে না, ঘরে ঘরে ভিটে ভরে যাচ্ছে। তৈরি হচ্ছে ছোট ছোট নতুন ভিটে কমছে ধানী জমি, কমছে গাঁয়ে গাঁয়ে গাছ-গাছড়া। সরকারও কাজে অকাজে গাঁয়ে গঞ্জে বন্দরে ও শহরতলীতে চাষের জমি হুকুমদখল করে কৃষিভূমি নষ্ট করছে। গাঁয়ের মানুষ এভাবে হচ্ছে ফল-মূল থেকে বঞ্চিত। গাঁয়ে ফল-মূল এসব কারণে এখন দুর্লভ, গরীবের ও মাঝারি গৃহস্থের ক্রয়-ক্ষমতার বাইরে, যেমন তাদের পক্ষে সাধ্যাতীত মাছ-মাংস কেনা ও খাওয়া। শহরে দেশী-বিদেশী ফল বারোমাসই মেলে। কিন্তু উচ্চমূল্যের কারণে তা কেবল সওদাগর, ঠিকেদার, আড়তদার, চোরাচালানদার, কারখানাদার, ভেজালদার, ঘুষখোর চাকুরে-আমলা-মন্ত্রীর ভোগ্য, অন্যদের পক্ষে মৌসুমে, কমলা, লিচু, আম, কাঁঠাল, নাসপতি, আঙ্গুর কিংবা নানজাতের তৈরি খাবার একবার বা একাধিকবার কেনা আর খাওয়া এ মুদ্রাস্ফীতির কালে অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

গাঁয়ে-গঞ্জে চিরকাল ধান-পাট কাটার পরে দিগন্তবিস্তারী শূন্য প্রান্তর পড়ে থাকত। তখন গাঁয়ের ছেলেরা দেশ-প্রচলিত মেঠো খেলার এমনকি ফুটবল ও ব্যাট-বল নামের ক্রিকেট খেলারও সুযোগ পেত। এখন ইরিচাষের বিস্তৃতির এবং অন্য ধরনের রবিশস্যের প্রসারের ফলে খেলার খালি মাঠ দুর্লভ হয়ে গেছে। ফলে তারা এখন তাস খেলে, গাঁজা-ভাঙ-চরস জাতীয় মদকে আসক্ত হয়ে পড়ছে, আর কামাসক্তিও বাড়ছে বেকার মনে, অলস চেতনায়। ধর্ষণ-অ্যাসিড হচ্ছে সিদ্ধি-অসিদ্ধি প্রসূন। ফল-মূলের, খেলাধুলার মাঠ-ময়দানের-আমোদ-আনন্দের কোন বিকল্প ব্যবস্থার কথা সমাজ-সরকারের মনেই জাগে না। গাঁয়ে গঞ্জে বঞ্চিতের আড্ডা অপবুদ্ধি ও অপকর্মের জনক। রেডিও-টিভি-ভিসিআর জনগণের মানস-স্বাস্থ্য রক্ষার বা অনুশীলনে উন্নয়নের আনুকূল নয়। নৈতিক অবক্ষয়ের ও সাংস্কৃতিক-চারিত্রিক বিকৃতির মূল কারণ এসব আর্থ-সামাজিক ও মানসিক সংকট-সমস্যার মধ্যেই রয়েছে নিহিত। কমুনিজম এখন প্রায় সর্বত্র উপেক্ষা উপহাস পাচ্ছে। আর কি উপায়ে মানবিক সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান মিলবে, মানুষ কি নিয়ে স্বাভাবিক মানব জীবন যাপন করবে, তাও বলে দেয়ার দায়িত্ব মস্তিষ্ক-আজীবের, চিন্তাশীল চিন্তানায়ক মনীষী মনস্বীদের, সর্বোপরি এ দায়িত্ব রাজনীতিকের, সমাজসেবীর ও সরকারের।

[৩]

এমন এককাল ছিল, এক টাকার চাউলে একজনের একমাসের খোরাক হত। টাকা ছিল দুর্লভ, তাই পণ্যসামগ্রী ছিল সস্তা। ফলে বিশ-ত্রিশ টাকার চাকুরেও ছিল সচ্ছল। ছেলেমেয়ের পড়ার খরচ চালিয়ে, মা-বাবা ও বেকার ভাইবোনের আহার যুগিয়ে নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীও সুখে চলত। চাকুরে মাত্রই কৌকিদার, বেয়ারা থেকে ডেপুটি-মুন্সেফ অবধি কেউই স্ব স্ব অবস্থায় ও অবস্থানে খোরপোশের সদস্যা অনুভব করত না। তাদের ঋণ হত কেবল রোগের চিকিৎসার জন্যে, সন্তানের বিয়ের জন্যে কিংবা মামলার ব্যয় বহনের কারণে। সে-যুগ এখন স্বপ্নের, কল্পনার ও আজগৈবিগল্পের, একালের মানুষ তা বিশ্বাসই করতে চায় না। এখন যে-কোন একজন দিন-মজুরের কেবল নুনভাতে খেয়ে বাঁচার জন্যে মাসে অন্তত পাঁচশ' টাকা দরকার। তাই এদিনে ভাইবোনদের, আত্মীয়-কুটুমরূপে একজনকেও পোষা অসাধু ব্যবসায়ী ও দুর্নীতিবাজ চাকুরে ব্যতীত কারো পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। এমনও দেখেছি মিল-ফ্যাক্টরীতে ধর্মঘট দীর্ঘস্থায়ী করা যেত, সামান্য কয়েক শ' বা হাজার টাকায় শ্রমিদের পরিবারে অন্ন যোগানোর ব্যবস্থা করেই। এখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমনি শ্রমিকের বা অন্য দরিদ্র চাকুরীজীবীর দাবি আদায়ের জন্যে দীর্ঘ মেয়াদী ধর্মঘট চালানো কি সম্ভব? কাজেই মুদ্রাস্ফীতি মানুষের আদর্শের রূপায়ণে ত্যাগের পথে, সাহসের ক্ষেত্রে একটা প্রবল বাস্তব বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্যয় বেড়েছে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর সাধ্যাতীতভাবে, আয় করা, আয় বাড়ানো দুঃসাধ্য। জেল-জরিমানা-বেকারত্বের ঝুঁকি নেয়ার সাহস হারিয়েছে মানুষ। তাই আজ প্রয়োজনেও ঝুঁকি নিয়ে মেঠো বক্তৃতায়, কাগুজে বিবৃতিতে এবং মিছিলে অনীহা বাড়ছে। এজন্যেই কেবল নির্ঝঞ্ঝাট হরতালই রাজনীতিক প্রতিবাদ-প্রতিরোধ প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কুশলী ও অকুশলী, আনাড়ি, শিক্ষিত-অশিক্ষিত এবং চিকিৎসক, প্রযুক্তিবিদ বেকার তরুণের সংখ্যা কেবলই বাড়ছে। অথচ সরকার ঋণের-দানের-ত্রাণের অর্থ নানা অপব্যয়ে অপচয়ে নষ্ট করছে, কর্মসংস্থানের জন্যে পণ্য উৎপাদক মিল-ফ্যাক্টরী-কারখান করছে না। আমদানী কেবলই বাড়ছে, যারা দোকানদার, আড়তদার, কারখানাদার, ভেজালদার, চোরাচালানদার ও সাংসদ আর আমলারূপে আমাদের অর্থসম্পদ নিয়ন্ত্রণ ও লুঠ করে, তাদের ভোগ-উপভোগের পণ্য সামগ্রী নানা দেশ থেকে আমদানী করতে, তাদের আমোদ-প্রমোদ-বিনোদন, বিদেশ ভ্রমণ প্রভৃতির যোগান দেয়াই হচ্ছে মুৎসুদ্দী সরকারের মুখ্য কর্ম। দেশের এগারো কোটি গেঁয়ো ও চাষী মজুর মানুষের ক্বচিৎ কোন প্রয়োজন মেটায় বিদেশ থেকে আমদানীকৃত সামগ্রী, অথচ ঋণের ও মুদ্রাস্ফীতির চাপ সইতে হয় তাদেরই। কি বিড়ম্বনা, কি নির্মম বঞ্চনা। কি নিষ্ঠুর এই পরোক্ষ পীড়ন ও শোষণ।

দেশের চিন্তাশীলদের কাছে, বুদ্ধিজীবীদের কাছে, মনীষীদের কাছে, মাটি-মানুষপ্রেমী হিতবাদী চিন্তানায়কদের কাছে এবং বিশেষ করে রাজনীতিক দলগুলোর কাছে আমাদের গণমানবের জিজ্ঞাসা– আমরা কি করে বাঁচব? এ বাঁচানোর দায়িত্ব কার, কাদের, সরকারের না রাজনীতিক দলের? যারা গণদরদী জনসেবক বলে আত্মপরিচয় দেয়, ভোট যোগাড়ের রাজনীতি করে, তারা কি তাদের এ দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন? আমরা কি করে বাঁচব? আমাদের বাঁচার উপায় করে দেয়ায় দায়িত্ব কি সমাজসেবীর ও সরকারের নয়?

শাসনতন্ত্রের উৎকর্ষই কি ভাত-কাপড় যোগায়?

স্বৈর ও স্বেচ্ছা শাহ্-সামন্ত-বুর্জোয়া শাসন কিংবা আধুনিক গণতান্ত্রিক বা জনগণতান্ত্রিক শাসন তথা আঁটসাঁট বাঁধা সাংবিধানিক শাসন-প্রশাসন কি সিঃস্ব-নিরন্নের কিংবা বেকারের অথবা আঁধা-কানা-খোঁড়া-অথর্ব-বৃদ্ধ-বৃদ্ধার এবং অনাথ শিশুর ভাত-কাপড় যোগায়? আমরা জানি মানুষ যদি কর্মকুণ্ঠ কিন্তু ভোগলিপ্সু হয়, তাহলে তার বাঁচার উপায় দুটো : হয় চুরি, নইলে ভিক্ষাবৃত্তি। কিন্তু যে মানুষ বেকার, কাজ পায় না, সে কি করবে? সে যদি হয় অজ্ঞ-অনক্ষর ক্ষেতমজুর, কুলি এবং খাটতে রাজি অথচ কাজ খুঁজে পায় না? চাষাবাদ শেষ হলে প্রান্তিক কিংবা বর্গাচাষী আর কাজ করায় না, কাজ মেলে না গাঁয়ে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরেও কাজের অভাব, লোকে প্রয়োজন থাকলেও অর্থাভাবে, মুদ্রাস্ফীতির ও দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির এবং অর্থের অবমূল্যায়নের দরুন অনটনে মাসিক জীবন কাটায়, তারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাজ বন্ধ রাখে, তখন নিঃস্ব নিরন্ন ক্ষেতমজুর-কুলি, হাভাতে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কি করে বাঁচে-বাঁচবে আমরা কি কখনো ভেবে দেখি।

কাজেই মানতেই হবে গণতান্ত্রিক আদর্শ সংবিধানও বেণে-বুর্জোয়া-সামন্ত সমাজে দরিদ্র মানুষের ভাত-কাপড় যোগায় না। এবং বেণে-বুর্জোয়া সমাজ সবাইকে সবসময়ে কাজও দিতে পারে না। বেকার থাকেই। এবং সে বেকারের দুর্দশা, ভাত-কাপড়ের অনিশ্চিয়তা ঘোচেই না কখনো, এমন নিঃস্ব নিরন্ন গতর-খাটা মানুষ হচ্ছে স্রোতে ভাসমান কিংবা বেনোজলে স্রোত-তাড়িত মানব প্রজাতির প্রাণী, বাঁচা-মরা কোনটাই তার হাতে থাকে না। হয় অনাহারে অর্ধাহারে অসুখে বিসুখে অচিকিৎসায় অকালে অস্থানে মরে পড়ে থাকে, অথবা কাজ পেয়ে ভিক্ষা পেয়ে যে-কয়দিন ক্ষীয়মাণ-ক্ষয়িষ্ণু জরাগ্রস্ত জীর্ণতাপ্রাপ্ত শরীর টিকিয়ে রাখা যায় কিংবা টিকে থাকে, সে কয়দিনই তার জীবন। বাঁচতে চাইলেও তাদের পক্ষে যেমন বিরুদ্ধ প্রতিবেশে-পরিবেশে বেঁচে থাকা অসম্ভব, তেমনি রোগে ধরলেও রোগ ঠেকানো তাদের পক্ষে অসাধ্য বলেই মরণ এড়ানো সম্ভব হয় না। এসব মানুষের সংখ্যা আমাদের রাষ্ট্রে কত? অন্তত ছয়-সাত কোটি। তাহলে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক সরকার এদের কি দেয়, কি দিতে পারে এবং তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোতে কি দিয়েছে?

১. যারা সমর্থ কায়িকশক্তিতে কিংবা কৌশলে-প্রকৌশলে, তাদের জন্যে অন্তত পাঁচসদস্য বিশিষ্ট পরিবারের ভাত-কাপড় যোগাড়-ক্ষমতার মতো বেতনের কাজ চাই।

২. যারা অনাথ বালক-বালিকা-শিশু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যারা অনাথা, রুগ্না কায়িক শ্রমে অসমর্থ তাদেরও বৃত্তিরূপে খোরপোশের ব্যবস্থা করার মানবিক দায়িত্ব মুখ্যত সরকারের, গৌণত সচ্ছল-স্বচ্ছন্দ মানুষ নির্বিশেষের। এ জন্যে আলাদা বাধ্যতামূলক 'কর' আদায়ের সাংসদ অনুমোদিত আইন থাকা আবশ্যিক ও জরুরী।

৩. ভিক্ষাবৃত্তি ও দেহোপজীবিতা বর্বর যুগের টিকে-থাকা চালু-থাকা নিদর্শনমাত্র, দাসপ্রথা যেমন গর্হিত, এ-ও তেমন অমানবিক অবস্থার, অবস্থানের ও ব্যবস্থার সামাজিক ফল। এর থেকে আশুমুক্তি আবশ্যিক ও জরুরী– মানবতার ও মানবিকতার মর্যাদা রক্ষার জন্যেই।

৪. এর জন্যে প্রয়োজন জাতীয় সম্পদের বৃদ্ধি, ঋদ্ধি ও প্রবৃদ্ধি। দেশে মিল-ফ্যাক্টরীতে দেশের জনগণের চাহিদা মেটানোর মতো উৎপাদন-নির্মাণের পরিমাণ বাড়াতে হবে, নতুন চহিদা পূরণের জন্যে উৎপাদন-নির্মাণের ব্যবস্থা করতে হবে। উৎকৃষ্ট বা উঁচুমানের বিদেশী ঔষধ ব্যতীত অন্য যে-কোন পণ্য নিত্যপ্রয়োজনীয় হলেও কিংবা ধনীদের বিলাস-বাসনের অপরিহার্য সামগ্রী হলেও বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বার্থে অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের দেশে উৎপাদিত বা নির্মিত দ্রব্য সামগ্রী ব্যবহারে জনগণকে বাধ্য করতে হবে, প্রকাশ্য আমদানী ও চোরাচালান বন্ধ করে। এ সব করতে হবে এজন্যে যে এখন গোটা পৃথিবীই মার্কিন সাহায্যপ্রার্থী। কাজেই আমাদের আগের মতো অনুগত ও কৃতজ্ঞ রাখার গরজ নেই বলে এ অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিশ্বশক্তি বিশ্ব-দলনের এবং মার্কসবাদ বিলুপ্তির উদ্যোগে আয়োজনে ব্যস্ত। তাই আমাদের স্বনির্ভর হওয়ার জন্যে আন্তরিকভাবে সততার সঙ্গে উদ্যোগী হতে হবে।

৫. আগে ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা না হলে কোন মানুষই অনাহারে-অর্ধাহারে অপুষ্টিতে অচিকিৎসায় স্বাস্থ্যরক্ষা করতে পারে না। কাজেই দু'হাজার সালের মধ্যে 'সবার জন্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বাস্থ্য'– জাতিসঙ্ঘ-শেখানো এ বুলি বা শ্লোগান আওড়ানো নিরর্থকই– ব্যর্থই প্রমাণিত হবে।

৬. গাঁয়ে গঞ্জে শহরে বন্দরে সর্বত্র গুণ্ডা-মাস্তান-খুনীদের অবশ্যই উৎখাত বা দমন করতেই হবে। নইলে উন্নয়নপ্রয়াস সর্বক্ষেত্রেই ব্যর্থ ও বৃথা হবে, অন্তত বাঞ্ছিত ফল, প্রত্যাশিত উন্নয়ন সম্ভব হবে না।

৭. গরীব দেশের অর্থাভাবে উৎপাদন-নির্মাণের মন্দার বা মন্থরতার এবং স্বল্পতার দরুন মানুষের অন্ন-বস্ত্র-নিবাস-স্বাস্থ্য-শিক্ষা যোগানো সাধারণত তৃতীয় বিশ্বের কোথাও সহজে সম্ভব হয় না। আমাদের দেশও দরিদ্রতম দেশ।

এজন্যে আমাদের উচিত অন্তত মার্কসবাদের মূলতত্ত্বের রূপায়ণে প্রয়াসী হওয়া। অর্থাৎ মানুষের বেঁচে থাকার জন্মগত অধিকার স্বীকার করে, ব্যক্তি মানুষ মাত্রকেই বাঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থাস্বরূপ উৎপাদিত ও নির্মিত সামগ্রীর স্বল্পতার দরুন খোলা বাজারের অপচয় রোধ করে সবাইকে বাঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থা করাই সরকারের, রাজনীতিক দলের, সমাজবাদী জাগ্রত জনতার লক্ষ্য হওয়া আবশ্যিক ও জরুরী।

এগিয়ে চলাই জীবন

AMARBOI.COM

দীন যত দারাজ হোক না কেন, কোন নিঃস্ব নিরন্ন লোক আত্মীয়-স্বজনকে আর্থিকভাবে সাহায্য-সহায়তা করতে পারেই না, এমনকি কুটুম্বিতার সৌজন্য রক্ষা করাও সম্ভব হয় না তার পক্ষে। দারিদ্র্যদোষ মানুষের সব সদিচ্ছা, সৌজন্য, সামাজিক দায়িত্ব-কর্তব্যবুদ্ধি বিলোপ করে। তেমনি একটা দরিদ্র গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে একটি সরকার লোকহিতে কিছু করতে চাইলেও অর্থাভাবে বহুজনহিতে বহুজনসুখে কোন কাজ করতে পারে না। যেমন টাকার অভাবে একাধারে ও যুগপৎ গণসাক্ষরতার এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করার কিংবা ঔষধে-পথ্যে-রক্তে রাষ্ট্রবাসী দরিদ্র রোগীর বিনা ব্যয়ে চিকিৎসা করানোও সম্ভব হয় না দরিদ্র জনকল্যাণআদর্শে নিষ্ঠ সরকারের পক্ষেও।

কাজেই অর্থই শক্তি, অর্থই ব্যক্তির, রাষ্ট্রের, সমাজের এবং সরকারের শক্তির, সদিচ্ছার, সৎকর্মের, কৃপা-করুণা দয়া-দান-দাক্ষিণ্যের উৎস ও ভিত্তি। এ জন্যেই জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির চেষ্টাই যে-কোন সরকারের নয় কেবল, ব্যক্তির, পরিবারের, গোষ্ঠীর সম্প্রদায়েরও দায়িত্ব এবং কর্তব্য। অতএব আমাদের সম্পদ বাড়ানোর জন্যে অর্থ নিয়োগে উৎপাদন, নির্মাণ, রফতানীবাণিজ্য বৃদ্ধির লাগাতার প্রয়াসে প্রযত্নে নিষ্ঠ থাকা নাগরিক মাত্রেরই দায়িত্ব ও কর্তব্য। ব্যক্তিজীবনে যেমন, রাষ্ট্রিকজীবনেও তেমনি অর্থ-সম্পদে, সাচ্ছন্দ্য আনয়নের জন্যে রাষ্ট্রবাসীর, সরকারের, উৎপাদকের, নির্মাতার, বেণের ও কারখানাদার-আড়তদারের অবশ্য কর্তব্য।

এ কেবল শাহ-সামন্ত-বেণে-বুর্জোয়া কিংবা সাধারণ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নয়, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও অর্থসম্পদের ঘাটতি বা অভাব থাকলে বন্টনে বাঁচা-বাঁচানো সম্ভব নয়। কাজেই তন্ত্র নির্বিশেষে মত-পথ-পদ্ধতি অবিশেষে অর্থসম্পদই বেঁচে থাকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিবার-পরিজনকে বাঁচিয়ে রাখার, রাষ্ট্রের বা সরকারের পক্ষে নাগরিকের ভাত-কাপড়-নিবাস-নিদান-চিকিৎসা-স্বাস্থ্য-শিক্ষা যোগানোর একমাত্র উৎস।

যারা মনে করে সমাজতন্ত্রই কেবল শোষণমুক্ত মানবসমাজকে স্বাধিকারে স্বাধীন ও স্বয়ম্ভর হয়ে বাঁচার ব্যবস্থা করে দিতে পারে, তারাও ভুলে যায় যে জীবনযাত্রার প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয় চাহিদার আনুপাতিক সরবরাহের জন্যেও অর্থ-সম্পদ আবশ্যিক ও জরুরী। কেননা, সব সামগ্রী স্বরাষ্ট্রে না-ও মিলতে পারে, নগদ পয়সা দিয়ে জীবনে অপরিহার্য অনেক পণ্য বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়, উৎপাদিত ও নির্মিত পণ্যের বিনিময়েও করতে হয় সম্পদ-সামগ্রী বৃদ্ধির ব্যবস্থা। এখানে আমি বিজ্ঞের মতো কারো অজানা কোন নতুন কথা বলছি না। অর্থ-সম্পদ লিপ্সা নিতান্ত বিবাগী-বৈরাগী অরণ্য-পর্বতচারী সাধু-সন্ত-সন্ন্যাসী ব্যতীত কম-বেশী সবারই থাকে। এর উৎস প্রয়োজনচেতনা ও অভাববোধ, ভোগ বাঞ্ছা। সৎ কিংবা অসৎভাবে অর্থ-সম্পদ উপার্জন করা হয়। সৎভাবে করতে হয়, অসৎভাবে করার উপায় না থাকলে কিংবা ভীরুতার, আত্মসম্মানবোধের অথবা অন্যায্য বলে নৈতিক ধারণার বশে। আর অসৎভাবে-ছলচাতুরী-ধূর্ততা-প্রতারণা-প্রবঞ্চনা-মিথ্যাচার, চোরাচালান, ভেজাল, ওজনে গোঁজামিল, ডাকাতি-চুরি-রাহাজানি প্রভৃতি মাধ্যমে অর্থসম্পদ অর্জনই দুনিয়ায় অধিক। তৃতীয় বিশ্বের যে-সব দেশে যত দরিদ্র, নিঃস্ব-নিরন্ন লোক বেশি, সে-সব দেশে অসততা-কাপট্য-প্রতারণাও বেশি। তাই সে-সব দেশে অর্থসম্পদ কেবল অসৎ বেণে-আমলা-কর্মচারী-দোকানী-কারখানী-সাংসদ-মন্ত্রী ও পেশাদার রাজনীতিকদেরই ঘরে জমা হতে থাকে। গোটা দেশ থাকে অর্থসম্পদের থেকে বঞ্চিত। এ হচ্ছে দেহে সোঁত বা গোদের মতো, সর্বাঙ্গে সঙ্গতি থাকে না। গোদা পা স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়, রোগেরই প্রকাশ। তেমনি দুর্নীতি-কুনীতি মাধ্যমে সবাইকে বঞ্চিত করে ও রেখে কিছু বেণে-সর্দার-অতিবর-মেম্বার-আমলা-সাংসদ-মন্ত্রী-মস্তান-গুণ্ডা-খুনী-টাউট দেশের ধন-সম্পদ সুকৌশলে গোপনে-প্রকাশ্যে আত্মসাৎ করে ঘুষ, দালালি, কমিশন, মৌজুতদারি, ঠিকেদারী, ভেজালদারী, কৃত্রিম কারখানাদারী ও সওদাগরি করে কয়েক হাজারের বা কয়েক লক্ষের মধ্যে অর্থ-সম্পদ স্তূপীকৃত করে রাখে, সে-সব অনুন্নত দেশে দারিদ্র্য ঘোচে না বরং বাড়ে।

অতএব, আমাদের অর্থ-সম্পদ বাড়াতে হলে প্রথমে কৃষির উন্নতির জন্যে ভর্তুকি মাধ্যমে খাদ্যে স্বয়ম্ভর নয় কেবল, খাদ্যশস্যের রফতানীও সম্ভব করে তুলতে হবে। পাট চাষ করতে হবে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিকল্পিত এবং গুণে-মানে-মাপে-মাত্রায় করতে হবে এর উৎকর্ষসাধন, আর কাঁচা পাট রফতানীর চেয়ে নির্মিত পণ্য হিসেবে রফতানী বাড়াতে হবে। তেমনি কাঁচা চামড়ারফতানী বন্ধ করে, চামড়ায় নির্মিত পণ্যই রফতানী করে আমাদের চামড়া থেকে জাতীয় আয় বহুগুণ বৃদ্ধি করা সহজেই সম্ভব। এতে হাজার-হাজার লোকের কর্মসংস্থানও হবে।

মাত্র কয়েকজনের নিষ্ঠ আবিষ্কারে-উদ্ভাবনে-গবেষণায়-সৃজনে আজকের এই আশ্চর্য যন্ত্রযুগ ও যন্ত্রজগৎ সৃষ্টি হয়েছে। সেদিন দূরে নয়, যখন পাঁচটি মহাদেশের সব রাষ্ট্রেই সব মানুষই শিক্ষিত হবে। তাদের থেকে হাজারে হাজারে মেধাবী বুদ্ধিমান বিদ্বান জিজ্ঞাসু কৌতূহলী গবেষক, আবিষ্কারক-উদ্ভাবক ও সৃজনশীল মনীষী আবির্ভূত হবে আফ্রিকায়, লাতিন আমেরিকায়, এশিয়ায়, নানা দ্বীপে-দ্বীপপুঞ্জে-অস্ট্রেলিয়ায়-নিউজিল্যাণ্ডে ও পূর্বইয়ুরোপের নানা অঞ্চলে। কল্পনা করতে দোষ কি? তখন বিশ্বজোড়া নতুন জগৎ ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনযাপন পদ্ধতি চালু হবে। প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, লেনদেনে, অনুকরণে অনুসরণে আবিষ্কারে-উদ্ভাবনে-নির্মাণে-পণ্যবিনিময়ে আমদানী-রফতানী মাধ্যমে বাঁচতে হবে, সেদিনও জীবন হবে যন্ত্রনির্ভরতায় সহজ। কিন্তু আর্থিক অসমতায় হবে কঠিনতর। আমরা অনাসক্তভাবে নির্ভাবনায় গতানুগতিক জীবনযাপন করতে চাইলেই তা করতে পারব না– বঞ্চিত হয়ে হয়ে, অবক্ষয়ের শিকার হয়ে হয়ে আরো নিঃস্বতা-নিরন্নতার জীবনের পরিণাম বরণে বাধ্য হব মাত্র।

যন্ত্রযুগ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে প্রতিমুহূর্তে। আমরা স্থির অচল স্তম্ভিত হয়ে থাকলে কেবলই ঠকব আর পরনির্ভরতার লজ্জা-গ্লানিকর জীবনই অভাবের ও যন্ত্রণার মধ্যেই যাপন করতে থাকব।

মানুষ হিসেবে, দেশ-জাত-রাষ্ট্র হিসেবে এখন থেকেই ভবিষ্যৎ ভেবেই, যে-ভবিষ্যৎ আসন্ন ও আপন্ন— আমাদের রাজনীতিক, সরকার, শিক্ষিত শহুরে লোক সেদিকে স্ব স্ব ভাব-চিন্তা-মনন-মনীষা প্রয়োগে যত্নবান হবেন– এটাই স্বকালসচেতন ব্যক্তির কাছে প্রত্যাশিত।

আমাদের জানতে, বুঝতে ও মানতে হবে যে আমাদের অতীতে অর্জিত সর্বশাখার 'জ্ঞান' নামে অভিহিত সাধারণ ধারণা সাদৃশ্য-অনুমান মাত্র, সাক্ষ্য-প্রমাণ নির্ভর নয়। শক্তিমাত্রই [জ্ঞানই শক্তি] পূর্ণ তথ্য, তত্ত্ব ও সত্য নয়, ওর অনেকটাই ভুল, এবং অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানও অসম্পূর্ণ। কাজেই নির্ভুল পূর্ণজ্ঞান, নির্ভরযোগ্য জ্ঞান অতীতে নেই, রয়েছে ভবিষ্যতের গর্ভে, আবিষ্কারের, উদ্ভাবনের, জানার ও সৃজনের, মেলানোর-মেশানো-গবেষণার অপেক্ষায়। আগেই বলেছি শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সব দেশেই গবেষক-আবিষ্কারক-উদ্ভাবক-নির্মাতা-স্রষ্টা-যন্ত্রী হাজারে হাজারে মিলবে– তাদের অবদানে বিশ্বের আজকের চেহারা, মানুষের আজকের যন্ত্রনির্ভর জীবনও বদলাবে বিস্ময়করভাবে, অকল্পনীয়ভাবে।

কাজেই অতীতের জ্ঞান হচ্ছে হয় ভুল, নয়ত অসম্পূর্ণ খণ্ডজ্ঞান। অতএব জ্ঞান রয়েছে ভবিষ্যতের গর্ভে জানার অপেক্ষায়। আজ আমরা কয়েকটি দেশের স্বল্প কয়েকজন লোকের আবিষ্কারে উদ্ভাবনে ধরাকে সরায় পরিণত করে ফেলেছি, দূরকে করেছি নিকট। পরকে করেছি পরিচিত স্বজন। আমরা এতে এতো তৃপ্ত, তুষ্ট ও হৃষ্ট যে আমরা মনে করি আমরা এখন সবজান্তা। আসলে বাস্তবে আমরা অজ্ঞতার ও অজ্ঞানের মহাসমুদ্রে-অকূল অতল সাগরে জ্ঞানের ক্ষুদ্র ভেলায় ভাসছি মাত্র। জ্ঞান অশেষ, জিজ্ঞাসা অসীম। মানুষের শক্তি, কৌতূহল, বেধা ও জিজ্ঞাসাও অনন্ত।

আবার আগের কথায় ফিরে আসি। এখন গাঁয়ে-গঞ্জে শহরে-বন্দরে কোথাও আইন-শৃংখলা নেই। দেশ এখন প্রশাসক, রাজনীতিক ও সরকার পোষ্য মস্তান-গুণ্ডা-খুনীর হাতে। গাঁয়ে-গঞ্জে শহরে-বন্দরে এখন সৎ ও শান্তিকামী জনগণকেই সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে দুষ্ট-দুর্জন-দুর্বৃত্ত-দুষ্কৃতি ও দুর্নীতিবাজ পরিষদসদস্য-মাতব্বর-সর্দার-প্রশাসক-পুলিশকে দমন-দলন মাধ্যমে উৎখাত বা শায়েস্তা রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। জনগণই এখন দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের দায়িত্ব নেবে। যেমন নিয়েছিল ১৯৭১ সনের ফেব্রুয়ারি-মার্চে। তা হলেই জনগণ আত্মোন্নয়নের এবং দেশের কল্যাণকর কাজে মনোযোগ দেবার সুযোগ পাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানব ও মানবতা বিপন্ন : লড়াকু চাই

১. মানুষ নিজেরা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ প্রাণী বলে দাবি করে, যদিও অন্য কোন প্রাণী তাদের থেকে আকারে-অবয়বে বৃহত্তর হলেও মানবপ্রজাতি থেকে নিজেদের উন্নতর বলে দাবি করে না, অন্তত ভাষার অভাবে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করেনি আজ অবধি। অবশ্য কোন কোন প্রাণী দলবদ্ধ মানুষকে বিশেষ করে সশস্ত্র মানুষকে ভয় পেলেও ব্যক্তিমানুষকে ভয় পায় না; বরং শত্রুতার বা ক্ষতির আশঙ্কায় অথবা খাদ্যরূপে মানুষকে আক্রমণ এবং নিহত করে। শুনেছি প্রাণী-খেকো বিশেষ করে কীটপতঙ্গ থেকে বৃক্ষও আছে, এমনকি মানুষ খেকো গাছেরও নাকি সন্ধান মেলে।

তবু মানুষের আবয়বিক শ্রেষ্ঠত্বের ও সৌকর্যের দরুন অর্থাৎ শিড়দাঁড়ার এবং দুটো হাতের বদৌলত মানুষ জানে না, বোঝে না, করে না, করতে পারে না হেন কর্ম এ কালে প্রায় সীমিত হয়ে আসছে। প্রকৃতির জগতের সেরা জীব মানুষ কিন্তু স্বভাবে-চরিত্রে প্রায়ই অন্য প্রাণীদের মতো সহজাত বৃত্তি-প্রবৃত্তি চালিত ও তাড়িতই রয়ে গেছে। দলীয় বা যৌথ জীবনে তথা সামাজিক জীবনে অন্যরা নিজেদের স্বার্থেই বাধা দেবে তথা বিরোধিতা কিংবা প্রতিরোধ করবে। আশঙ্কায় ব্যক্তি-মানুষ দায়ে পড়ে স্ব স্ব ব্যক্তিপ্রবৃত্তিকে বিরুদ্ধ পরিবেশে সংযত রাখে মাত্র লোকভয়ে ও রাজভয়ে। সুযোগ পেলেই নিরালায় নির্জনে প্রবৃত্তিচালিত মানুষ করে না হেন কর্ম খুব কমই আছে।

১. মানুষ লিপ্সু, এজন্যে তার মধ্যে রয়েছে হিংসা-ঘৃণা-অবজ্ঞা-বিদ্বেষ-ঈর্ষা-অসূয়া। তাই সে অন্যের প্রতিযোগী ও প্রতিদ্বন্দ্বী। তার ভোগের উপভোগের সম্ভোগের মানের যশের খ্যাতির ক্ষমতার স্বপ্ন ও সাধ সে পূর্ণ করতে চায় তখনই, যখন তার বুদ্ধির সঙ্গে জ্ঞানের ও যুক্তির, সাহসের ও আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে শক্তির, অভিলাষের সঙ্গে সংকল্পের ও অঙ্গীকারের, এবং উদ্যমের সঙ্গে উদ্যোগের ও আয়োজনের সঙ্গতি সামঞ্জস্য ঘটে।

মানুষের এ লিপ্সা ও জিগীষা মানুষকে সংস্কৃতি-সভ্যতার বিকাশ-বিবর্তন ধারায় তথা উন্নয়নের-উন্নতির-উৎকর্ষের ক্রমবিবর্তন প্রবাহে ধনে-মনে বৈষম্য দান করেছে। এর ফলেই স্তাবকতা-চাটুকারিতাজাত স্তব-স্তুতি-প্রশস্তি-ভক্তি-ভয়-ভরসা করতে যেমন অনুপ্রাণিত হয়েছে, তেমনি প্ররোচিত হয়েছে হিংসা-ঘৃণা-অবজ্ঞা-বিদ্বেষ-তাচ্ছিল্য-অবহেলা-অসম্মান করতে তার চেয়ে ধনে-মনে-গুণে-মানে-মাপে-মাত্রায় হীনজনকে। এ বৃত্তিক-প্রবৃত্তিক আধি মানুষের ভাষিক অভিব্যক্তিতেও ঠাঁই করে নিয়েছে। তাই কেউ ভোজন করে, কেউ আহার করে, কেউ খায়, কেউবা গেলে। তাই কারো দরগাহ, কারো মাজার, কারো কবর, কারো গোর, কাউকে দেয়া হয় মাটিচাপা, কাউকে হয় পোঁতা। কাউকে চন্দন কাঠে করা হয় দাহ, কাউকে হয় পোড়ানো, কাউকে মুখে আগুন ছোঁয়া দিয়ে ভাসানো হয় খালে-হাওরে-নদীতে

২. আমাদের দেশে নয় কেবল, দুনিয়াব্যাপী রয়েছে বর্ণ-ধর্ম-জাত-জন্ম-ভাষা-অঞ্চল-দেশ দ্বেষণা। এ হচ্ছে ধন-মন-বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞান-কৌশল-প্রকৌশল-নৈপুণ্য প্রভৃতির মান-মাপ-মাত্রার উৎকর্ষ-অপকর্ষ চেতনাপ্রসূত আচরণ। এ কেবল ব্যক্তিক,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারিবারিক, সামাজিক, গৌত্রিক, গৌষ্ঠীক, ভাষিক, দৈশিক জীবনে সীমিত নয়। রাষ্ট্রিক জীবনে এবং নীতিতেও তা সংক্রমিত। কেননা ব্যক্তিসত্তা ও চরিত্রও তো সর্বত্র ক্রিয়াশীল থাকে। তাই পাঁচ বিজয়ী প্রবল শক্তি হল ভেটো-শক্তি। দুর্বলরা রইল তাদের অনুগ্রহ-নিগ্রহের পাত্র হয়ে।

তাই প্রবল শক্তিগুলো পারমাণবিক শক্তির অধিকারী থাকবে, অন্যদের তাদের সমকক্ষ হতে দেয়া চলবে না। তারাই কেবল গোটা দুনিয়ার রাষ্ট্রগুলোর শাসক-শোষক-সর্দার-মাতব্বর থাকবে। সারা দুনিয়া চলবে তাদের মর্জি মতো আদেশে-নির্দেশে-পরামর্শে-হুকুমে-হুমকিতে। মনিব-বান্দার যেমন পোশাক একই দামের ও সৌন্দর্যের হতে পারে না, তাতে মনিবের মান ম্লান হয়ে যায়, তেমনি পৃথিবীর সব রাষ্ট্রের যদি সমান মান ও শক্তি থাকে, তা হলে ওদের কেবল শাসন-শোষণের নয়, অন্যায্য হুকুম-হুমকি-হামলা চালানোর সুযোগই থাকে না। লিপ্সা আর জিগীষাও লালনের অবকাশ থাকে না। কাজেই মানে-খ্যাতিতে-ক্ষমতায় অন্যদের উপরে থাকার জন্যেই পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণ তৃতীয় বিশ্বের অর্থে-সম্পদে-অস্ত্রে-জনবলে ও সামরিক-শক্তিতে দীন রাষ্ট্রের পক্ষে অনধিকার চর্চা বলেই মনে করে ভেটো-শক্তি, বিশেষ করে সর্বশক্তিমান বিশ্বশাসক বহার অভিলাষী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তার চেলা বা দলীয় ন্যাটো জোট ও সহযেগী কানাডা-জাপান-অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতিও হাঁ-হুজুরের দলে। আর বিশ্বের মুসলিম রাষ্ট্রের শাসক-প্রশাসক-জঙ্গীনায়ক-রাজা-বাদশাহরা সবাই মার্কিন মুৎসুদ্দী পোষক। তাই বৃহৎ শক্তিগুলো সবাই অস্ত্রবিক্রেতা। জলযান-বায়ুযান-স্থলযান ফ্রিগেট-সাবমেরিন-বিমান-ট্যাংক প্রভৃতির ব্যবসাই তাদের মুখ্য রাষ্ট্রিক বা জাতীয় আয়ের উৎস। ফলে অন্যদের অস্ত্র নির্মাণে, অস্ত্রের উৎকর্ষ সাধনের গবেষণায় ওরা থাকে সদা বিচলিত, উদ্বিগ্ন, সতর্ক ও সযত্ন প্রয়াসে গুপ্তচর মাধ্যমে খোঁজ-খবরও নেয়ার কাজে সদানিরত। এ মনোভাব দাস-মালিক যুগের, শাহ-সামন্ত আমলের, ব্রাহ্মণ্য দৌরাত্ম্যের কালের। এ গণতান্ত্রিক নয়, মানবিক নয়, মানববাদীর নয়, মানবতাবাদীরও নয়, মানবপ্রেমীর নয়, এমনকি যুক্তিবাদী ভদ্রলোকেরও নয়।

৩. আজ ইরাকের উপর ক্রোধ-ক্ষোভ-হামলারও কারণ তার পারমাণবিক অস্ত্র তৈরীর শক্তি, জ্ঞান ও প্রয়াস রয়েছে বলে মার্কিন ধারণা। এ মুহূর্তের অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিশ্বশক্তি, বিশ্বশাসক, বিশ্বনিয়ন্ত্রক মার্কিন সরকার ইরাককে তার দাসের মতো, গৃহপোষ্য দাসের মতো দলনে-দমনে-ধমকে-ধমকিতে আর অস্ত্র প্রয়োগে ইরাকী জান-মাল বিধ্বংসে শায়েস্তা রাখার প্রয়াসী। রোজ হুকুম-হুমকি-হুঙ্কার ছাড়ছে সশস্ত্র হামলা চালাবার। মার্কিনী দাসত্বে ও আনুগত্যে ধন্য মুসলিম উম্মাহওয়ালরা নীরব দর্শক, যদিও সর্বক্ষণ 'হিংটিং ছট'-এর মতো 'উম্মাহ'-ই তাদের সার্বক্ষণিক জিগির আর কাজে তারা পরস্পরের জানি-দুশমন।

৪. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গোটা পৃথিবী অভিযানে-আক্রমণে অভিযাত্রা শুরু করেছে, মঙ্গোলিয়া ভাঙছে, ভাঙছে উত্তর কোরিয়া, ভাঙছে কম্পুচিয়া, ভাঙবে ভিয়েতনাম, ভাঙবে কিউবা, ভাঙছে যুগোশ্লাভিয়া, আলবেনিয়া।

ডেং শিয়াও পিং-ই না-বুঝে না-ভেবে মার্কিন সরকারকে অর্থ-যন্ত্র ও যন্ত্রী পাঠাতে অনুরোধ করে চীন-ভাঙার কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন, এখনো চীন সে-ধকল সামলে উঠতে পারেনি। এখন আবার ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী, মার্কিন বিদেশমন্ত্রী আর কিসিঞ্জার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেখানে নতুন করে ভাঙার প্ররোচনা দেয়ার কাজে নেমেছে– বলছে মানবাধিকার দাও, তিব্বতকে ছেড়ে দাও, সমাজ ও শাসন ব্যবস্থা বদলাও, গণতন্ত্র চালু কর। এ পরামর্শ নয়, কণ্ঠে তাদের হুকুমের সুর, হুমকির ধ্বনি, হুংকারের আভাস আর সবটা মিলে যেন হামলার প্রস্তুতি।

পৃথিবীর সমাজবাদী জনগণের উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদের সময় এসে গেছে, প্রতিরোধের জন্যে ঘরে ঘরে প্রস্তুত হওয়ার, সংগ্রামে দীক্ষা দেয়ার ও নেয়ার এখনি সময়। মার্কিন দৌরাত্ম্যের সীমাহীন ঔদ্ধত্যের অশেষ অহংকারের, বিশ্বসম্রাট হবার এ প্রয়াসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে শোষিত জনগণের ও গণমুক্তিকামীদের জীবন বাজি রেখে।

মেধাই বিদ্যাবত্তার উৎস

আমরা যাঁদের জ্ঞানী, মেধাবী ও বিদ্বান কিংবা পণ্ডিত বলি, তাঁরা কারা? তাঁরাও মর্ত্যমানব। তাঁরা যে বুদ্ধিতে অসামান্য কিংবা অনন্য তা নয়, তাঁদের বোঝার শক্তির চেয়ে ধারণশক্তি বা স্মরণ শক্তিই বেশি, তাঁরা যা দেখেন, যা শোনেন, যা পড়েন, তাই স্মৃতিতে অবিমোচ্য-অম্লানভাবে ধরে রাখতে পারেন। স্মৃতিতে ভরে রাখতে পারেন মন ও মস্তিষ্ক। তাঁদের চোখে দেখা ঘটনা, শোনা বয়ান, পড়া তত্ত্ব, তথ্য, ঘটনা বা রটনা, কিস্‌সা-কাহিনী, রসকথা, রঙ্গকথা, ব্যঙ্গকথা, কোনটাই তাঁরা ভুলে যান না। ফলে তাঁরা যখন যে বিষয়ে কথা বলেন কিংবা লেখেন তা আমাদের কাছে বিস্ময়কর ও চমকপ্রদ হয়ে ওঠে। কারণ তাতে আমাদের অজানা, না-শোনা, ভুলে-যাওয়া অনেক তত্ত্ব, তথ্য, সত্য, ঘটনা ও রটনা, অন্যদের মত, মন্তব্য, সিদ্ধান্ত, উক্তি, বাদ-প্রতিবাদ প্রভৃতি সব অতীত নতুন করে আমাদের চোখে-কানে-মনে-মননে-চিন্তায়-চেতনায় ধরা দেয়। আমরা আন্দোলিত হই। আমাদের বিস্মৃত বিষয় স্মৃতিতে নতুন করে জেগে ওঠে, নতুনভাবে আমরা জ্ঞানী, বিজ্ঞ ও বিদ্বান হয়ে উঠি।

তাই দুনিয়ার জ্ঞানী-পণ্ডিত-বিদ্বান মাত্রই অসামান্য অনন্য স্মৃতিধর ও শ্রুতিধর ধীমান মেধাবী। আমরা পড়ি, ভুলে যাই, আমরা শুনি, ভুলে যাই, আমরা জানি, ভুলে যাই, আমরা মুখস্থ করি, ভুলে যাই। আমরা নির্বোধ নই, কেবল বিস্মৃতির শিকার। তাই আমরা শত শত বই পড়েও বিদ্বান হই না। দর্শনের বই পড়েও মননশীল হই না, বিজ্ঞানের বই পড়েও বাঞ্ছিত মাত্রার জ্ঞান অর্জনে হই ব্যর্থ। আইনের বই পড়েও প্রয়োগ কালে স্মরণ করতে পারি না। তাই আমরা শিক্ষিত হয়েও সাধারণ ও সামান্য থেকে যাই। কোন বিষয়েই আমরা গুছিয়ে আদ্য-মধ্য-অন্ত্য সুসংহত, সুসঙ্গত ও সুসমন্বিত করে বলতে লিখতে পারি না। আমাদের আবেগ-উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা-উল্লাস-আনন্দ-আকুলতা-আকুতি প্রকাশের জন্যেই আমরা প্রয়োজন মতো ব্যঞ্জনাঋদ্ধ, সুষম ধ্বনি, যথাশব্দ জানা থাকা সত্ত্বেও প্রয়োগকালে স্মরণ করতে পারি না। তাই আমাদের হাতে পদ্য নির্মিত হয়, কবিতা রচিত হয় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্মৃতি-শ্রুতিধর হলেও আবাল্যের বিশ্বাস-সংস্কার-দেশ-কাল-সমাজ-শাস্ত্র-শিক্ষা এবং সংস্কৃতি ও আর্থিক অবস্থা ও অবস্থান আর পরিবেশভেদে জীবনদৃষ্টির গুণে-মানে-মাপে-মাত্রায় তারতম্য ঘটে, এর সঙ্গে স্বেশ্বর-নিরীশ্বর নয় কেবল, শাস্ত্রের উৎকর্ষ-অপকর্ষভেদেও জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-বিবেক-বিবেচনার পার্থক্য ঘটে,– কেউ হয় বিশ্বাস-সংস্কার নিয়ন্ত্রিত রক্ষণশীল তথা প্রথাসিদ্ধ চিন্তা-চেতনায় চালিত, কেউ হয় মুক্তবুদ্ধি ও ন্যায়চেতনা প্রাণিত। এ জন্যেই জগতের অতীতের ও বর্তমানের এবং ভবিষ্যতেরও বিশ্বজোড়া খ্যাতিমান কবি-শিল্পী-সাহিত্যিক মনে-মননে-মনীষায়-ন্যায়চেতনায়-শ্রেয়োবোধে মানে-মাপে-মাত্রায় নয় কেবল, মতে পথে সিদ্ধান্তেও বিভিন্ন ও বিচিত্র। এর এক কারণ বোধশক্তি সবার তীক্ষ্ণ তীব্র যুক্তিসঙ্গত নয়, অন্য কারণ মানুষ দেশ-কাল-শাস্ত্র-সমাজ-সংস্কৃতি-অর্থসম্পদ-রাষ্ট্রনীতি প্রভাবিত, স্বশিক্ষিত ও স্বনিয়ন্ত্রিত স্বাধীন জীবন যাপনে নিজের অজান্তেই অভ্যস্ত নয়। এর ফলেই আস্তিক, নাস্তিক, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান, ইহুদী, মুসলমান প্রভৃতি বিভিন্ন শাস্ত্রপন্থীলালিত জ্ঞান-মনীষা-চিন্তা-চেতনা-ন্যায়-অন্যায়-পাপ-পুণ্যবোধ, জীবন সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত কিংবা জগৎ-মীমাংসা ভিন্ন ভিন্ন।

AMARBOI.COM

পৃথিবী সুন্দর, জীবন মধুর

আমি আছি, বিশ্ব আছে,/রক্তে রক্তে জীবন নাচে/দুঃখ কোথায় বল/মৃত্যু কোথায় বল! কবি বে-নজির আহমদের একটি কবিতাংশের একটি সামান্য পরিবর্তিত শাব্দিক ও তাত্ত্বিক রূপ উক্ত কবিতাংশ।

মাঝে মধ্যে শারীরিক, মানসিক, পারিবারিক কিংবা পারিবেষ্টনিক কারণে মন-মেজাজ কেমন যেন বন্ধ্যা হয়ে যায় সাময়িকভাবে। তখন একটা মানসিক উদ্যম-উদ্যোগহীনতা, স্বপ্ন-সাধরিক্ততা, আনন্দশূন্যতা, ঔদাস্য নৈরাশ্য আলস্য দেহ-প্রাণ-মন আচ্ছন্ন করে রাখে। কয়েকদিন এমনকি কারো কয়েকমাস এমনি নিরুদ্দিষ্ট নিরানন্দ নিষ্ক্রিয় জড়তাক্রান্ত যন্ত্রণাময় দিবা-রাত্রি কাটে। ইংরেজিতে এমনি অবস্থাকে মেলানকলিয়া, মরবিডিটি, নিউরোসিস, মেন্টাল ডিপ্রেসান প্রভৃতি বলে থাকে চিকিৎসকরা।

সবটাই দেহ-প্রাণ-মন-মনন এবং ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক, পারিবেশিক এবং আর্থিক কিংবা প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা ভীরুতা, নিজের শক্তি-সাহস-বুদ্ধি সংক্রান্ত হীনম্মন্যতা-প্রেমে ব্যর্থতা, প্রণয়ে প্রত্যাখ্যান প্রভৃতি বিচিত্র কারণে ঘটে থাকে। স্থূল-সূক্ষ্ম তত্ত্ব কেবল মনোবিজ্ঞানী বা মানসিক রোগের চিকিৎসকরাই ঠিকভাবে কিংবা মোটামুটিভাবে নিরূপণে সমর্থ হন।

সবার প্রাণে মনে এমন বন্ধ্যত্ব জাগে, তবে আবেগপ্রবণ মানুষের উপর এর প্রতিক্রিয়া মারাত্মক হয়ে পড়ে। মানুষ পাগল হয়ে যায়। চিকিৎসার ও শুশ্রূষার অভাব ঘটলে নাকি জীবন উন্মাদ হিসেবেই কাটে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-শক্তি-সাহস-সঙ্কল্প-উদ্যম-উদ্যোগ যাদের একটা বাঞ্ছিত মানের মাপের ও মাত্রার থাকে, তারা এ সাময়িক আধি গা-ছাড়া দেয়ার মতো মন থেকেও ঝেড়ে ফেলতে পারে। আবার দৈহিক স্বাস্থ্যে স্থির থেকে ধীরবুদ্ধির অনুশীলনে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অনুভবে, জনজীবনের বৈচিত্রানুধ্যানে অনুভব-উপলব্ধির গভীরতায় ও ব্যাপকতায় মুগ্ধ হয়ে আনন্দ-সুন্দর জীবন ফিরে পায়। আসলে দেহ-প্রাণ-মন সুস্থ ও স্বস্থ, হৃষ্ট-পুষ্ট থাকলে, আর্থিক, পারিবারিক, সামাজিক, নৈতিক উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা-অনিশ্চয়তা না থাকলে, আসন্ন আপন্ন কোন বিদপ-আপদের উদ্রব-উপসর্গের আশঙ্কা বা ত্রাস না থাকলে এ জীবন বড় মধুর, বড় আরামের, আনন্দের, ভোগ-উপভোগের। পৃথিবী ও প্রকৃতি অনন্য অসামান্য সুন্দর, মানুষও তখন মিত্র, জীবনোপভোগের সহায়-সম্বল। তেমন অনুভবেই কেবল কবি বলেন 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে। মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।' এমনি অনুভূতিই স্বপ্নকে ও সাধকে সত্য রূপে প্রতিভাত করে অন্তর্লোকে, এবং তখনই কবির ভাষায় মানুষ আত্মপ্রবোধ পেতে চায় বিশ্বাস করে যে 'কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি। সকল খেলায় খেলব আমার এ আমি' দৈহিক অস্তিত্ব হারিয়েও আস্তিক বাঁচার এ মিথ্যে আশ্বাস ও বিশ্বাসতো এ মর্ত্যের প্রতি অনন্য অসামান্য আকর্ষণ ও প্রীতিরই অভিব্যক্তি। পৃথিবী সুন্দর, জীবন সুন্দর। এখানে দুঃখ-যন্ত্রণার চেয়ে সুখ-আনন্দ-আরামই বেশি।

AMARBOI.COM

দুই কবি : রবীন্দ্র-নজরুল

নজরুল ইসলাম ছিলেন স্বল্পবিদ্যার সরলপ্রাণ আবেগতাড়িত অনন্য শক্তিমান কবি। তাঁর এই অদার্শনিক চেতনাচালিত আবেগই তাঁকে করেছিল প্রায় হরবোলা কবি। বিশেষ করে দারিদ্র্য তাঁকে ধীরবুদ্ধিতে ও স্থিরবিশ্বাসে অটল থাকতে দেয়নি। লিখে রোজগার করতে হলে জেদ-গোঁ-আদর্শ ছাড়তেই হয়, নজরুল ইসলামকে তাই করতে হয়েছিল। তাঁর কোন অনুভবে ও উপলব্ধিতে সামুদ্রিক গভীরতা ও ব্যাপকতা ছিল না। খাল-বিলের মানে মাপে মাত্রায় তাঁর চিন্তা-চেতনা-মনীষা বিস্তার-বিকাশ পেয়েছিল মাত্র। দুটো বিষয়ে তবু তিনি আপোসহীন এবং আদর্শনিষ্ঠ কিংবা অঙ্গীকারবদ্ধ ছিলেন; একটি হচ্ছে অসাম্প্রদায়িক চেতনা, এবং অপরটি ব্রিটিশবিতাড়নবাঞ্ছা। তিনি জানতেন, বুঝতেন এবং মানতেন যে স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব। জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-নিবাস-ভাষা নির্বিশেষে ভারতবাসীর সংহতি ও সমবেত প্রয়াস-প্রযত্ন-আন্দোলন-সংগ্রামই কেবল ব্রিটিশবিতাড়ন সম্ভব করতে পারে। এ স্বাধীনতার স্পৃহাই তাঁকে সারা জীবন সচেতনভাবে অসাম্প্রদায়িক রেখেছিল।

আর এক ক্ষেত্রে তাঁর অসামান্যতা ছিল, সেক্ষেত্রে রবীন্দ্র-প্রয়াসও তাঁর সাফল্যের কাছে ম্লান। নজরুলের রাগ-রাগিনীর, সুর-তাল-লয়ের কান ছিল, আয়ত্তে ছিল তাঁর রাগ-সুর-তাল-লয়ের সুষম সুপ্রয়োগ সামর্থ্য– কিন্তু নজরুলের গানের বাণী প্রায়ই তুচ্ছ এবং মাটিলগ্ন, উঁচুভাবের বাণী ক্বচিৎ লভ্য। উল্লেখ্য যে রবীন্দ্রনাথ শিশুসাহিত্য রচনায়ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুকুমার রায়কে গুণে-মানে-মাত্রায় তথা লঘু-গুরু চালে ব্যঙ্গে-বিদ্রূপে-পরিহাসে কিংবা ব্যঙ্গে আর জনপ্রিয়তাকে অতিক্রম করতে ব্যর্থ হয়েছেন। কেননা রবীন্দ্রনাথ ছিলেন চিন্তায় চেতনায় মনীষায়-অনুভবে-উপলব্ধিতে সামুদ্রিক গভীরতা ও আসমানী ব্যাপকতার কবি। তাই শিশু-বালক-কিশোর প্রিয় লঘুচালের রসপূর্ণ কবিতা রচনা সম্ভব হয়নি। নজরুল ইসলাম সরল ও স্বল্প বিদ্যার আবেগচালিত লোক ছিলেন বলে জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে কম্যুনিজম বা সাম্যবাদ, সমাজসমস্যা, মনস্তত্ত্ব, রাজনীতি প্রভৃতির জটিলতা কুটিলতা বুঝতেন না, তাই মুক্তির আকুলতা থাকলেও মুক্তির পথ-পদ্ধতি তাঁর অধিগত ছিল না। ফলে তিনি কখনো উদার, কখনো বিশ্বাস-সংস্কারবদ্ধ, কখনো মুসলিম ও বৈশ্বিক মুসলিম ভ্রাতৃত্ববাদী, কখনো হিন্দু-মুসলিম মিলনে নয় কেবল, অভিন্ন বাঙালীত্বে আস্থাবান। Out Fitter and general order supplier-এর মতো তিনি অর্থের বিনিময়ে সব রকম ফরমায়েসী লেখাই লিছেন। সবচেয়ে বড় কথা তিনি সাম্যবাদী হিসেবে নাস্তিক নিরীশ্বর ছিলেন না। তাই তিনি নিষ্ঠ মোমেন হিসেবে ইসলামী হামদ, নাত, গান ও কবিতা লিখেছেন, বিশ্ব মুসলিম জাগরণে ছিলেন আগ্রহী, তেমনি নিষ্ঠ কালীসাধক কিংবা শৈব রূপেই যেন কালীকীর্তন, শিব প্রশস্তি, দশমহাবিদ্যা রচনা করেছেন। ফলে তাঁকে নিয়ে বাঙালী হিন্দু-মুসলিম তাদের স্বার্থ, প্রয়োজন ও মতলব অনুগ কথা বলার সুযোগ পান। বদরুদ্দীন উমর তাঁকে বলেছেন দ্বিধর্মী। দ্বিধর্মী কেউ হতেই পারে না, এছিল দরিদ্রের অর্থোপার্জনের প্রয়োজনে দ্বিমুখী ভূমিকা গ্রহণ মাত্র। এতে আদর্শনিষ্ঠা বা সততা নেই। বাস্তব প্রয়োজননিষ্ঠা আছে মাত্র। আজ নজরুল মুসলমানের, পাকিস্তানীর ও বাঙলাদেশীর জাতীয় কবি, হিন্দুর কাছে বাঙলার ও বাঙালীর জাতীয় কবি, কম্যুনিষ্ট বা সমাজবাদীর গণকবি, দরিদ্র মানবতার কবি, ইসলামী কবি, গণজাগরণের কবি, স্বাধীনতাসংগ্রামী কবি। মতলববাজেরা তাঁকে বিভিন্ন সংজ্ঞায় আখ্যাত করায় তিনি দৈশিক সামাজিক সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রিক জীবনে বিভ্রান্তির ও ক্ষতির কারণ হয়ে রইলেন। তাঁকে হরবোলা কবি বানিয়ে সৎ ও অসৎ উদ্দেশ্যে তাঁর নামও সাহিত্য খণ্ডিত ও বিকৃতভাবে ব্যবহার করে আমাদের দৈশিক-রাষ্ট্রিক জীবনে অখণ্ড-অবিচ্ছিন্ন অভিন্ন দৈশিক-রাষ্ট্রিক জাতীয়তাবোধ জাগাতে এবং রাষ্ট্রিক জাতি গঠনে বাধা সৃষ্টি করেছে, করছে। দরিদ্র ঘরের সন্তান নজরুল শোষণমুক্ত সমাজ ও স্বাধীন স্বদেশ প্রতিষ্ঠার জন্যে তাঁর জাগ্রত জীবনে কথায়-বক্তৃতায়-গানে-কবিতায়-গল্পে-উপন্যাসে আবেগ জড়িত ভাষায়, উর্মিমুখর উচ্ছ্বাসে জনগণের কাছে, পাঠকের কাছে আকুল আবেদন জানিয়ে গেছেন। তিনি ছিলেন শক্তির সাধক ও পূজক শারীর কাম-প্রেম তৃষ্ণায় আর্ত আর মাটিলগ্ন বাস্তব জীবনের আশা-ভরসার, অনুভব-উপলব্ধির, আর্থ-সামাজিক জীবনের সমস্যা-সঙ্কট সচেতন ও প্রতিকার-প্রতিবাদ-প্রতিরোধ মুখর কবি। এক কথায় নজরুল গণমানবের স্বার্থ-স্বাধীনতার সংগ্রামী কবি। তাঁর দেহ-প্রাণ-মন-মননের স্থিতি মর্ত্যভূমির উপর।

[২]

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছু বলা বাহুল্যমাত্র। কেননা স্তাবক-প্রশস্তিকার-চাটুকার-ভক্ত অনুরাগীরা তাঁর সম্বন্ধে কোন আলোচনা বাকি রাখেননি, গুণে মানে মাপে মাত্রায় তারিফও করেছেন উচ্চতম কণ্ঠে এবং সুষম ধ্বনি ও ভঙ্গিবদ্ধ শব্দে, বাকে ও বাক্যে। কিন্তু তিনিও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনবার নিন্দা পেয়েছেন, প্রথম যৌবনে অবুঝ অক্ষম হিংসুটে প্রতিযোগী-প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে, ষাটোত্তর জীবনে যুগান্তরকামী নতুন কিছুর সন্ধানী তরুণ লিখিয়েদের কাছে আর সর্বশেষে মৃত্যু-উত্তরকালে কম্যুনিষ্টদের মুখে ও লেখায়। রবীন্দ্রনাথ নিন্দাভীরু ছিলেন বলে নিন্দাহত হয়েছেন বটে, তিনি ছিলেন আত্মপ্রত্যয়ী বুদ্ধিমান এবং দুর্দম-দুর্মদ। মৃত্যু মুহূর্ত অবধি তিনি ছিলেন সমকালীনতাসচেতন, কালিকচাহিদা পূরক লেখক। তাই তিনবারই বিরুদ্ধবাদীরা প্রতিবাদ-প্রতিরোধ না পেয়েও লড়াকু মেজাজ হারিয়ে রবীন্দ্রানুরাগী বা রবীন্দ্রানুগত হয়েছেন। কারণ তাঁকে ঠেকানোর, হারানোর শক্তি-সামর্থ্য ছিল না কারো। তাঁদের কথায় কান দেবার লোক সেদিনও ছিল না। আজো নেই। তাই রবীন্দ্রপ্রভাব অপ্রতিহত। ভবিষ্যৎ অবশ্য অজ্ঞাত।

রবীন্দ্রনাথের অনুভবে উপলব্ধিতে ছিল সামুদ্রিক গভীরতা, চিন্তায়--চেতনায়-মনীষায় ছিল আসমানী ব্যাপকতা, জ্ঞান-বুদ্ধি-চাতুর্যেও ছিল বহুবিধ ও বিচিত্র বিস্তার। গোটা পৃথিবীর অতীতে বর্তমানে এমন বহুমুখী চিন্তা-চেতনায় এমন সর্বতোমুখী অনুভব-উপলব্ধির এমন সর্বতোগামী জিজ্ঞাসা ও কৌতূহল, শিল্প-সাহিত্যের মনন-চিন্তনের সর্বক্ষেত্রে এমন অনন্য অসামান্য ব্যুৎপত্তি ও নৈপুণ্য আর সাফল্য পৃথিবীর আর কোন একক মানুষে দেখা যায়নি। এ অনন্যতাই তাঁকে অতুল্য ও বিস্ময়কর ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব করে রেখেছে। যদিও এখন তাঁর কোন কোন লেখায় অন্যদের লেখার ছাপও আবিষ্কৃত হচ্ছে। কেউ কেউ একে অনুকৃতি বলে অভিহিত করছেন। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ বৈষয়িক সামাজিক রাজনীতিক মানুষ হিসেবেও ছিলেন ধীরবুদ্ধির, স্থিরবিশ্বাসের মানুষ। বৈষয়িক, শৈক্ষিক, সামাজিক কিংবা গণমানবসেবী হিতৈষী ব্যক্তি হিসেবেও তিনি ছিলেন প্রায় বিচক্ষণ ব্যক্তি। বুদ্ধির সঙ্গে জ্ঞানের, শক্তির সঙ্গে সাহসের, সংকল্পের সঙ্গে উদ্যমের, অঙ্গীকারের সঙ্গে উদ্যোগের সুষম-সুসমঞ্জস তথা পরিমিত সংযোগে-মিশ্রণে তাঁর কর্মপ্রয়াস-প্রযত্ন আমৃত্যু তাঁকে ধৈর্যশীল অধ্যবসায়ী কর্মীরূপেও অক্লান্ত অশ্রান্ত রেখেছিল। রবীন্দ্রমনোলোকে সামুদ্রিক গভীরতা, আসমানী বিশালতা থাকলেও তাঁর শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টি বিপুল কলেবর হলেও গুণে মানে মাপে মাত্রায় হিমালয়বৎ সুউচ্চ হলেও, রূপে রসে বৈচিত্র্যে অশেষ হলেও, তাতে গণমানব প্রত্যাশিত, বাস্তবজীবনে কেজো, প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্কট-সমস্যা সামাধানের কিছু মেলে না। এমনকি তাঁর সত্তরোত্তর জীবনেই কেবল কম্যুনিষ্ট প্রভাবে দুস্থ দুঃখী চাষী-মজুরের কথা পরিব্যক্ত হয়েছে মাত্র করগণ্য কয়েকটি কবিতায়। এ যেন দায়সারা কৃত্রিম অনুশীলনেরই ফল। প্রমাণ 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতা দেবতাতুষ্টির লক্ষ্যজাত, গণমানব সেবার প্রেণাপ্রসূত নয়। তাঁর স্বদেশ বিষয়ক উদ্দীপকনামূলক গানের সংখ্যাও কম এবং বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রসূন প্রায় ফরমায়েসী রচনা। তাঁর রচনায়ও নেই ব্রিটিশ শাসকের প্রতি দ্রোহ, ক্ষোভ আছে, আবেদন আছে। ক্রোধ নেই। আজ শিলাইদহ, সাজাদপুর, পতিসর কুঠি ভক্তের তীর্থক্ষেত্র। কিন্তু তিনি কবিতা-গল্প-গান-নাটক-উপন্যাস লিখতে আসেননি এখানে। বজরায় কুঠিতে বাস করেছিলেন প্রজা শাসন-শোষণের জন্যেই। সেকথা ভুললে চলবে না। এ সব তীর্থ আদতে প্রজাশাসনের-শোষণের-পীড়নের ও উৎখাতের কেন্দ্রীয় দফতর মাত্র। রাজশাহী গ্যাজেটিয়ারে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের আমলেও দুস্থ প্রজা দায়ে ঠেকে জমি বিক্রি করলে জমিদারও বিক্রয়লব্ধ অর্থের বখরা নিতেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসব স্থানে তাঁর শিল্পী-সাহিত্যিক-মনীষী হিসেবে স্মারকসৌধ নির্মাণ বা রক্ষণ প্রকারান্তরে তাঁর শোষিত নির্যাতিত প্রজার প্রতি নিষ্ঠুর নির্মম অবমাননা করারই হবে নামান্তর। প্রমাণ, তিনি প্রথম প্রজাশাসনের দায়িত্ব নিয়েই নির্মমভাবে বাকি খাজনা কড়ায় গণ্ডায় আদায় করেছিলেন এবং খাজনাও বৃদ্ধি করেছিলেন। প্রজাদের উৎখাত করায় রুষ্ট প্রজারা আদালতে জমিদারের বিরুদ্ধে মামলা রুজুও করেছিল। ঠাকুরপরিবার জমিদার হিসেবে প্রাথমিক স্কুলও স্থাপন করেননি কোথাও। এঁদের দান-ধর্মের খ্যাতিও নেই। বরং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে পদাঘাতে প্রজা শাসন করতেন এবং দ্রোহী প্রজার ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে শায়েস্তা করতেন, তা কাঙাল হরিনাথের লেখায় মেলে।

তা ছাড়া শিলাইদহে হোক, সাজাদপুরে হোক, পদ্মার বুকে বজরায় হোক, তাঁর চোখের সুমুখে যে প্রতিবছর বর্ষা মৌসুমে প্রমত্তা পদ্মা পাড় ভেঙে মানুষের জানমাল জমাজমি গ্রাস করত, সচ্ছল গেরস্থও যে মুহূর্তে পথের ভিখিরী হত, সে চিত্র কি তাঁর গানে কবিতায় গল্পে উপন্যাসে নাটকে চিত্রে আছে কোথাও? তা হলে রক্ত-মাংসের দেহধারী বৈষয়িক ও জমিদার রবীন্দ্রনাথ এবং শিল্পস্রষ্টা মনীষী আদর্শিক রবীন্দ্রনাথ কি দু'জন ভিন্ন ব্যক্তি নন? একজন অজ্ঞা অনক্ষর দুস্থ প্রজা রবীন্দ্রনাথকে দেখে খাজনাখোর প্রজাপীড়ক শোষক নাছোড়বান্দা নির্দয় ধনীমানী অভিজাত ব্যক্তি রূপে। আর একজন সাহিত্য-শিল্পরসিক শিক্ষিত মানুষ রবীন্দ্রনাথকে দেখে বাঙলার, ভারতের গৌরব, মনুষ্য জাতির গর্ব অনন্য অসামান্য অতুল্য বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব ব্যক্তিত্বরূপে। উভয় বরীন্দ্রনাথই বাস্তব এবং নিখাদ নিখুঁত সত্য। শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন আর তাঁর সৃষ্টি দেখে বলতেই হয় 'নরলোকে তাঁর সম নাহি দেব লোকে কুত্র'। আবার দ্ব্যর্থবোধক এ কথাও সত্য 'এক অঙ্গে' এতো রূপ নয়নে না হেরি।' যারা শোষিত, শোধিত, পীড়িত তারা নালিশ জানাতে পারেনি, পারেনি নিন্দা ছড়াতে। যারা অদূরে শিক্ষিত তারা উপকৃত, গর্বিত ও কৃতজ্ঞ এবং স্তাবক। এক কথায় রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সুউচ্চ নান্দনিক চেতনার, স্বপ্নের, সাধের ও আকাশচারিতার, ভূমি ছেড়ে ভূমার সন্ধানী কবি।

মেঘ-বৃষ্টি-মন

অত্যধিক শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষায় মানুষ মরে। অসহ্য খরায়, দেহ হিম হয়ে যাওয়া রক্ত জমাট বাঁধা শৈত্যে আর বর্ষার ঝড়ে-ঝঞ্ঝায় আর ভূকম্পে মানুষের মাঝে কোথাও না কোথাও অপমৃত্যু ঘটে, যেমন অপমৃত্যু আজো অপ্রতিরোধ্য জলে-স্থলে-আকাশে নানা দুর্ঘটনায়।

কিন্তু এগুলোর সঙ্গে মনের ও মর্মের তেমন কোন নেই। এগুলো রোগ আনে, আনে মৃত্যু, আনে প্রিয়জনদের মনে সাময়িক শোক। এতেই এগুলোর সঙ্গে মন-মনন, অনুভব-উপলব্ধির কিংবা চিত্ত-চেতনার, দেহ-প্রাণ-মন-হৃদয়ের কোন বিষাদবিধুর কিংবা আনন্দঘন যোগ নেই। তবু গ্রীষ্মের রোদ মন আনন্দিত রাখে, শীতের বৈকালিক রোদ মনে ম্লানিমা জাগায়। ভদ্র-আশ্বিনের সকাল দুপুরের কাঁচা হলুদ রোদ পুলকিত করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু সকাল-দুপুর-বিকেলের বাদল আঁধারে, শ্যামল সুন্দর মেঘের আবির্ভাবে, নীলনবঘনছাওয়া আকাশতলে, কিংবা ঝর ঝর বাদল ধ্বনির অভিঘাতে, অথবা বজ্রে-বিদ্যুতে-মেঘমন্দ্রে গুরু গুরু মৃদু মাদলে অথবা আসমান-ফাটা মেঘগর্জনে আমাদের চিত্তলোক আলোড়িত হয় কেন? কেন বহু যুগের ওপার হতে আষাঢ় এলে, শ্যামল শৈল শিরে বর্ষণ হলে, রেবা নদীর তীরে মেঘের ঘটা দেখলে, মালবিকাদের মন আজো উতলা হয়, কেন মালবিকারা আনমনা হয়ে নিজেদের অজ্ঞাতেই খোলা দরজায় এসে দাঁড়ায়? অন্য এক কবির একটা কবিতায় গ্রামীণ বর্ষার দিনমানের একটা চমৎকার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। আরম্ভ এরূপ : 'সারাদিন একখানি কাল মেঘে ঢাকিয়াছে আকাশ'— বর্ষার বর্ণাঢ্য ঘাট-বাট-মাঠের বাহ্য চিত্র। তবু কবির মনেও পড়েছে তার প্রভাব। কিন্তু কবি সংকোচে হয়তো মনে-জাগা গানের কথা আমাদের খুলে বলেননি। কেবল বলেন 'কি গান কাহার গান/কি সুখ কি ভাব তার/ ছিল কভু আজ মনে নাই।' কবি কালিদাস পয়লা আষাঢ়ের মেঘদর্শনে অকারণ বিরহবোধে ব্যাকুল হয়েছিলেন এবং অসংকোচে উচ্চারণ করেছেন– প্রিয়া কণ্ঠলগ্ন থাকলেও এ বিরহ-চেতনা থেকে মুক্তি মেলে না। কবি বিদ্যাপতিও একদিন রাধার বেনামে এমনি ব্যাকুলতা প্রকাশ করে হৃদয়ভার লাঘব করেছিলেন :

এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন মন্দির মোর
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাড়িয়া।
এমনি পরিবেশে কেঁসে গোঞায়বি হরি বিনে
দিন ও রাতিয়া।

রাধাও ঘরে স্থির থাকতে পারেনি, পারেনি কৃষ্ণও। তাই শঙ্কা-সঙ্কুল, বিপদবহুল বর্ষাভিসারের এমন অপ্রতিরোধ্য ঘটা। যখন 'আম্বরে ডম্বর ভরু নব মেহে' যখন 'মেঘ যামিনী', যখন 'গগনে বব ঘন মেহ দারুণ, যখন ঝর ঝর বরিষ সঘন জলধার', যখন 'মেঘ কামিনী অতি ঘন আন্ধিয়ার', যখন 'ঘোর রজনী মেঘের ঘটা', তখন রাধা কুল-মান-নিন্দা-ভয় ত্যাগ করে, ঝড়ো রাতে বিপন্ন অভিসারে ভূজঙ্গভীতি তুচ্ছ করে ঘর ছেড়েছে কোন্ প্রণোদনায়, কি গভীর আকুলতায়, কোন্ আকুতির প্রতিরোধ্য তাড়নায়।

'যেদিন হিমাদ্রি শৃঙ্গে আসন্ন আষাঢ়' বাল্মীকিও আত্মানুভূতির অভিব্যক্তি দানে হয়েছিলেন ব্যাকুল। বিরহ-জাগানো মেঘের প্রভাব যে কত গভীর, ব্যাপক এবং সর্বকালের ও সর্বজনীন তা কালিদাস 'মেঘদূত'-এ চিরমানবের হয়ে বিবৃত ও বিধৃত করেছেন।

'আকাশভরা সূর্যতারা, বিশ্বভরা প্রাণ,' কিন্তু বর্ষা যেমন করে প্রাণ-মন চঞ্চল করে মেঘ-বৃষ্টি যে ব্যাকুলতা জাগায়, তেমনটি আর কিছুই করতে পারে না। আমরা জানি জল বীজ-উদ্ভিদের প্রাণরস। তাই জলের অপর নাম জীবন। কিন্তু পুকুর-দীঘি-হ্রদ-খাল-বিল-হাওর-নদী-সমুদ্র মানুষকে আনন্দ দেয়, দেখতে ভালো লাগে, চোখ জুড়ায়ও বটে, কিন্তু মেঘ-বৃষ্টির মতো বিরহবোধ জাগায় না। এমন মর্মছোঁয়া, মর্মেলাগা, মর্মবিদারী আর কিছুই নেই মেঘ-বৃষ্টির মতো। রবীন্দ্রনাথে মেঘ-বৃষ্টির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ছিল অসামান্য, অনন্য, বিস্ময়কর, পাঠক-শ্রোতাকে গভীর ও ব্যাপকভাবে অভিভূত করার মতো। বর্ষা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিষয়ক মেঘ-বৃষ্টির বয়ান গান-কবিতা কিংবা গদ্য অনুচ্ছেদরূপে পাঠক-শ্রোতার মনে দীর্ঘকালীন অনুভবের লেশ ও রেশ রেখে যায়।

যেমন :

১. এসো শ্যামল সুন্দর
আনো তব তাপহরা তৃষাহরা সঙ্গসুখ
বিরহিনী চাহিয়া আছে আকাশে।

২. ঘন গৌরবে নবযৌবনা বরষা
শ্যামগম্ভীর সরসা। ... ...
কোথা তোরা অয়ি তরুণী পথিক ললনা
জনপদ বধূ তড়িত চকিত নয়না ... ...
কোথাবিরহিনী, কোথা তোরা অভিসারিকা।

৩. হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে
সেই সজল কাজল আঁখি পড়িল মনে

৪. শাওনগগনে ঘোর ঘনঘটা, নিশীথ যামিনী রে।
কুঞ্জপথে, সখি, কৈসে যাওব অবলা কামিনী রে।
উন্মদ পবনে যমুনা তর্জিত, ঘনঘন গর্জিত মেঘ
দমকত বিদ্যুত, পথতরু লুণ্ঠিত, থরহর কম্পিত দেহ।
– তবু আবেগতাড়িত বিরহ কাতর নারীর মিলনবাঞ্ছায় পথে নামতেই হয়।

৫. মেঘের পরে মেঘ জমেছে, আঁধার করে আসে ... ...
কেমন করে কাটে আমার এমন বাদল বেলা।

৬. বাঁধন হারা বৃষ্টিধারা ঝরছে রয়ে রয়ে
একলা বসে ঘরের কোণে কী ভাবি যে আপন-মনে
সজল হাওয়া যূথীর বনে কী কথা যায় কয়ে।

৭. বাদল মেঘের মাদল বাজে ... আমার হৃদয় দোলে,

৮. ঝিল্লি মুখর বাদল সাঁঝে কে দেখা দেয় হৃদয় মাঝে।

৯. আজ কিছুতেই যায় না মনের ভার। দিনের আকাশ মেঘে অন্ধকার ...

১০. মল্লার গান প্লাবন জাগায় মনের মধ্যে শ্রাবণ হানে।

১১. আজ শ্রাবণের আমন্ত্রণে/ দুয়ার কাঁপে ক্ষণে ক্ষণে/ ঘরের বাঁধন যায় বুঝি আজ টুটে

১২. পথিক মেঘের দল জোটে ওই শ্রাবণ গগন অঙ্গনে
শোন শোনরে, মনরে আমার, উধাও হয়ে নিরুদ্দেশের সঙ্গ নে
দিক্ হারানো দুঃসাহসে, সকল বাঁধন পড়ুক খসে
কিসের বাধা ঘরের কোণের শাসন-সীমা লঙ্ঘনে।

১৩. আজ আকাশের মনের কথা ঝরো বাজে
সারাপ্রহর আমার বুকের মাঝে।

১৪. এই সকাল বেলার বাদল আঁধারে... ... ...
মন যে আমার পথ হারানো সুরে/সকল আকাশ বেড়ায় ঘুরে ঘুরে রে।
শোনে যেন কোন্ ব্যাকুলের করুণ কাঁদারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৫. সারা বেলা ধরে ঝরো ঝরো ঝরো ধারা... ... ...
ঘর-ছাড়ানো আকুল সুরে উদাস হয়ে বেড়ায় ঘুরে।
১৬. বৃষ্টি শেষের হাওয়া কিসের খোঁজে বইছে ধীরে ধীরে
গুঞ্জরিয়া কেন বেড়ায় ও যে বুকের শিরে শিরে।
১৭. বাদল হাওয়ার দীর্ঘশ্বাসে যূথীবনের বেদন আসে
১৮. অশ্রুভরা বেদনা দিকে দিকে জাগে
আজি শ্যামল মেঘের মাঝে বাজে কার কামনা!
১৯. আমার প্রিয়ার ছায়া/আকাশে আজ ভাসে, হায় হায়/বৃষ্টি সজল বিষণ্ন নিঃশ্বাসে
২০. আজি ঝরো ঝরো মুখর বাদর দিনে
জানিনে জানিনে কিছুতে কেন যে মন লাগে না।... ... ...
মন হারাবার আজি বেলা, পথ ভুলিবার খেলা– মন চায়
মন চায় হৃদয় জড়াতে কার চিরঋণে।
২১. পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে
পাগল আমার মন জেগে ওঠে।

শুধু কি তাই! এ মেঘ-বৃষ্টিই 'মন হারাবার, পথ ভুলিবার', সমাজ-সংসারের নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ লঙ্ঘন করবার শক্তি যোগায়, ক্ষণিক প্রণোদনা দিয়ে উতলা করে। যখন মনে হয় বাদল আঁধারে কিংবা ঝরো ঝরো বাদলের এমন দিনে আবেগভরে বলা যায়।

সমাজ সংসার মিছে সব
মিছে এ জীবনের কলরব
কেবল আঁখি দিয়ে আঁখির সুধা পিয়ে

হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব-করাতেই জীবনের সার্থকতা, যখন নীলনবঘনে আকাশ ছাওয়া, যখন গাঢ়-ঘন মেঘে সূর্যের আলো ঢাকা, যখন দিকে দিকে সজল হাওয়া, যখন ঘরে বাইরে সব যেন সন্ধ্যের আঁধার কবলিত, যখন ঝরো ঝরো বাদল, যখন ঝড়ো হাওয়াও বহমান, যখন পথে পথেও দুস্তর কাদা, যখন পথ চলতে বিস্তর বাধা, তখন প্রিয়-প্রিয়াহীন মনবলাকাও যেন প্রিয়া খুঁজে বেড়া, ভোগে যেন সদ্যজাগা অনির্দেশ্য বিরহবেদনায়।

দুটো সরলতত্ত্ব : সমাজ ও রাষ্ট্র

মনে করা যাক, একজন ধনকুবের এক জনবসতিবিহীন অঞ্চলে এক অট্টালিকা নির্মাণ করে ভূস্বর্গের প্রতিবেশে পরিবেশে বিলাসব্যসনে-আমোদে-প্রমোদে সুখ-স্বস্তির আনন্দসুন্দর জীবনযাপনে আগ্রহী হয়ে এক পর্বতের সানুদেশে এক প্রাসাদোপম দালান তৈরি করল এবং বাস করতে গেল সপরিবারে কিন্তু সকালেই অনুভব করল, তার একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুদির দোকান দরকার, একটা মিষ্টির দোকান প্রয়োজন, একজন দারোয়ান আবশ্যক, ঘরের কাজ-কর্ম করার জন্যে কয়েকজন নারী-পুরুষ নিয়োগ জরুরী। চুলকাটার জন্যে একজন নাপিত প্রয়োজনের সময়ে কাছে পাওয়া দরকার। আসবাব মেরামতের জন্যে একজন ছুতায়, দেয়ালের ভাঙচুর, ঝাড়মোছ প্রভৃতির জন্যে একজন রাজমিস্ত্রী কাছে রাখা দরকার। তাছাড়া মাছ-মাংস-তরকারী-মদ-মশলা-নুন-তেল-মরিচ-ঘি-দুধ-মাখন-চাল-ময়দা-আটা প্রভৃতি খাদ্য সম্পৃক্ত সামগ্রী সংগ্রহের জন্যে একটা হাট-বাজারও কাছেই থাকা জরুরী। এমনিভাবে ধনী ব্যক্তিটিকে একটি মুদি পরিবার, একটি মোদক পরিবার, একটি নাপিত পরিবার, একটি সূত্রধর পরিবার, একটি রাজমিস্ত্রী পরিবার, একটি জেলে পরিবার, একটি জোলা পরিবার, মাছ-মাংস-তরকারী-মশলা-দুধ-ঘি-মাখন-চাল-ডাল উৎপদনের ও নির্মাণের জন্যেও অনেক পরিবারের তার অট্টালিকার পরিবেশের মধ্যে তার বাসগৃহের আশেপাশে বসবাস করার ব্যবস্থা করতেই হল। কেননা, একজন মানুষের প্রাত্যহিক জীবনযাপনের জন্যে বহুলোকের প্রয়োজন তার সর্বপ্রকার আবশ্যিক চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে সেবা ও সামগ্রী সরবরাহের জন্যে। অতএব মানুষ কোনপ্রকারেই কোথাও একা বাস করতে পারে না। মানুষ পরস্পরের সহযোগিতায়, পরস্পরের উপর নির্ভরশীলতায় শ্রম, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, সেবা, সামগ্রী বিনিময়ের মাধ্যমে বাঁচে। তাই মানুষ দলছুট হয়ে যূথবদ্ধ না হয়ে একদিনও বাঁচতে পারে না। এ দলবদ্ধ অবস্থার নাম সমাজ। কাজেই দলীয় বা যৌথ জীবনই হচ্ছে সামাজিক জীবন। এ সামাজিক জীবন নিরুপদ্রবে নিরাপদে নির্বিঘ্নে নির্বিরোধে স্বস্থ হয়ে সুখ-স্বস্তির মধ্যে নিশ্চিন্তে উপভোগ করার জন্যে সম ও সহ স্বার্থে সংযমে, সহিষ্ণুতায়, সহযোগিতায় পারস্পরিক প্রয়োজনে সেবায়, সরবরাহে, বিনিময়ে তথা আবশ্যিক লেনদেনে নিঃশর্ত অঙ্গীকার আবশ্যিক ও জরুরী। একেই মানুষ সভ্যতার-সংস্কৃতির বিকাশের ও বিস্তারের ফলে শাস্ত্রিক, রাষ্ট্রিক নৈতিক, সামাজিক ও আচারিক নানা নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ ও প্রথাপদ্ধতিরূপে সমাজে চালু করেছে ও রেখেছে। তবে লাভ-লোভের বশে অধিকাংশ মানুষই নীতি-নিয়ম, বিবিধ-বিধান লঙ্ঘন করে ও করতে চায়। তার জন্যে পাপভীতি, [Sin]. নিন্দাভীতি [Vice] এবং রাষ্ট্রিক শাস্তি [Crime] ভীতি জিইয়ে রাখার শাস্ত্রিক, সামাজিক-নৈতিক ও রাষ্ট্রিক চেষ্টা সর্বত্র অব্যাহত ও অপরিহার্য মনে করা হয় বটে, কিন্তু কোথাও তা কখনো বিশেষ কেজো হয়নি। মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-বিবেক-বিবেচনা ও আত্মসত্তার মূল্য-মর্যাদাচেতনা দিয়েই কেবল মানুষকে সহযোগিতায়, সততায়, স্বাধিকারে স্বাধীনভাবে অপরের সঙ্গে বির্বিরোধ সহাবস্থানে সম্মত রাখা কিংবা অভ্যস্ত করা কিছুটা সম্ভব। কেননা ষড়রিপু সংযত রাখা সব সময়ে সম্ভব হয় না।

আজো পৃথিবীব্যাপী প্রায় সর্বত্র অজ্ঞানের-অজ্ঞতার-অনক্ষরতার অন্ধকার বিরাজ করছে। তাই ছল-ছুতোয়-শোষণে-পীড়নে-পেষণে-বঞ্চনায়-প্রতারণায়-কাপট্যে-ধূর্ততায় মানুষ মানুষের উপর জুলুম চালাচ্ছে। সর্বত্রই জোর যার মুলুক তার, সর্বত্রই 'দুর্জনেরে রক্ষা করা, দুর্বলেরে হানাই' রীতি, সর্বত্রই মানুষের সামাজিক সম্পর্ক মূলত জালিমের ও জুলুমের। পদে-অর্থে-সম্পদে-জনে ও পেশীতে যে প্রবল সে ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করেই, জোর-জুলুম চলেই। জুলুম, জালিম-মজলুম গাঁয়েগঞ্জে-শহরে-বন্দরে সর্বত্র দৃশ্যে কিংবা অদৃশ্যে প্রত্যক্ষে কিংবা পরোক্ষে রাজনীতিতেও রয়ে গেছে এ মুহূর্তেও। সর্বত্র যেন 'দুষ্টের লালন এবং শিষ্টের দমন', সর্বত্রই মানব প্রজাতির প্রাণীসুলভ প্রবৃত্তির তথাকথিত মানবিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রূপায়ণই আমরা প্রত্যক্ষ করি। এমন নিষ্ঠুর প্রতিহিংসাপরায়ণ এবং প্রজন্মক্রমে প্রতিশোধলিপ্সু প্রাণীজগতে মানুষ প্রজাতি ছাড়া আর কোন প্রাণী দেখা যায় না। অন্য প্রাণীরা ভিন্ন প্রাণীকে হত্যা করে খাদ্য হিসেবে। মানুষ কেবল কাড়ে, কেবল মরে, কেবল হানে দুর্বলকে। সে দুর্বল ব্যক্তি, পরিবার বা অঞ্চল কিংবা রাষ্ট্র— যেই হোক। অন্য জীব-উদ্ভিদ মরে প্রাকৃতিক দুর্যোগে। কিন্তু সামাজিক মানুষ স্বাভাবিক অবস্থাতেই মরে ক্ষুধার অন্ন জোটে না বলে, আর অনাহারে, অর্ধাহারে, অপুষ্টিতে, রোগে-অচিকিৎসায়, অস্বাস্থ্যে, অকালে, অস্থানে অন্য মানুষের জুলুমে কিংবা ঔদাসীন্যে। এজন্যেই বর্তমান সমাজব্যবস্থা বদলানো দরকার। মানুষকে স্বাধিকারে সুস্থ ও স্বস্থ হয়ে নির্বিরোধে-নিরুপদ্রবে-নিরাপদে নিশ্চিন্তে-নির্বিঘ্নে বাঁচার অধিকার তথা অন্যের সঙ্গে সহযোগিতায় সহাবস্থানে বাঁচার ব্যবস্থা করার জন্যে।

মা-বাবার দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে সন্তানদের সযত্নে ও সস্নেহে লালন-পালন। কোন মা-বাবাই এ অপরিহার্য দায়িত্ব ও কর্তব্য এড়াতে পারে না, এড়ায় না। ব্যতিক্রম অমানবিক আচরণমাত্র। সন্তানদের মধ্যে যদি আঁধা-কানা-খোঁড়া কিংবা নির্বোধ প্রতিবন্ধী-পাগল-রুগ্ন কেউ কেউ থাকে তাদের ভাত-কাপড়ে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্বও মা-বাবার। কেননা মানুষ মাত্রেরই প্রাণে বেঁচে থাকার রয়েছে জন্মগত অধিকার। পরের সন্তানকেও আদর করা যায়-পোষা যায়, কিন্তু নিজের সন্তানকেও প্রাণে মারা যায় না— এমনকি অমানবিক-অস্বাভাবিক নিষ্ঠুর আচরণও পাপ, নিন্দনীয় ও দণ্ডনীয় অপরাধ।

এ যুক্তিতেই বলা যায় একটি রাষ্ট্রের প্রতিটি মানুষের বেঁচে থাকার রয়েছে জন্মগত অধিকার। যারা অনাথ শিশু, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, অথর্ব নারী, আঁধা-কানা-খোঁড়া-পঙ্গু-রুগ্ন তাদের ভাত-কাপড়-নিবাস-চিকিৎসা প্রভৃতির স্থায়ী ব্যবস্থা করা ও রাখা মা-বাবার মতোই রাষ্ট্রের বা সরকারের অবশ্য কর্তব্য ও দায়িত্ব। আর যারা দৈহিক-মানসিকভাবে সুস্থ, তাদের যোগ্যতানুসারে কাজ দিয়ে স্ব স্ব জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা করাও সরকারেরই প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য। এক কথায় পারিবারিক বা দাম্পত্য জীবনে সন্তানের প্রতি মা-বাবার যা যা দায়িত্ব ও কর্তব্য, দৈশিক, জাতিক ও রাষ্ট্রিক জীবনে সে-সব দায়িত্ব হচ্ছে সরকারের। এমনি দায়িত্ব যে-সরকার স্বীকার ও পালন করে, তার সাধারণ নাম গণহিতৈষী সরকার, রাষ্ট্রের নামও হতে পারে Wellfare state, কিন্তু এতে সবার প্রতি সমদৃষ্টির সুবিচার মেলে না। তাই মার্কসবাদ অঙ্গীকার করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই এ যুগের দাবি হওয়া আবশ্যিক ও জরুরী।

বিশ্বে রাষ্ট্রিক যুগান্তর সংকেত!

আমরা বলে থাকি, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এবং ভিক্টোরিয়া বংশীয় সরকার দেড়শ' দু'শ বছর ধরে ভারতবর্ষের তথা তার উপনিবেশের-সাম্রাজ্যের ধনসম্পদ লুটই করেছে, শোষণ পেষণ পীড়ন করেছে শাসন-পোষণের নামে। তাদের গরজেই দিয়েছে সামান্য, নিয়েছে আমাদের ধনসম্পদ, স্বাধীনতা, প্রতিবেশিক সম্প্রীতি, সাম্প্রদায়িক সদ্ভাব, জাগিয়েছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধার্মিক দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-সংঘাত, হরণ করেছে আমাদের সত্তার সম্মানচেতনা, বিদ্যা-বিত্ত-পদ সরকারী সম্মান দিয়ে, পীড়নে ভীত রেখে ও আর্থিক প্রলোভনে দীক্ষা দিয়ে মানুষকে করেছিল দাসত্বে ও আনুগত্যে অভ্যস্ত। এ সবই সত্য। কিন্তু আমরা স্বাধীন হয়ে সর্বপ্রকারে আমাদের ঘৃণ্য বৃটিশ প্রভুর মতোই আচরণ করছি। আমরা পরাধীনতার গ্লানি বেদনা যন্ত্রণা অপমান, আর্থিক মানসিক ক্ষতি সম্বন্ধে জেনে-বুঝেও আমাদের বিভিন্ন বর্গের ও বিবিধ প্রকারের সংখ্যালঘুকে কার্যত মানসিক সংকীর্ণতার দরুন নানাভাবে তাদের স্বদেশে ও স্বঘরে, স্বাধিকার ও সমাধিকার থেকে আমাদের ভাব-চিন্তা-কর্ম আচরণে বাস্তবে বৈষয়িক ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এবং মানসিক জীবনে পীড়িত-নির্যাতিত রাখি অনেক সময়ে আমাদের অজ্ঞাতেই। এমনকি এতে যে দৈশিক-রাষ্ট্রিক জীবনে নানা ক্ষতির কারণ ঘটে, তাও আমাদের শহরে শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী জ্ঞানী মনীষীরাও কখনো জানতে, বুঝতে ভাবতে ও মানতে চায় না। ফলে গোটা পৃথিবীব্যাপী সর্বত্রই জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-নিবাস-মত-পথ-পদ্ধতি-নীতিনিয়ম-রীতিরেওয়াজগত পার্থক্যের জন্যেই উনজন তথা সংখ্যালঘু আদিবাসী, উপজাতি, গোত্র, কৌম, গোষ্ঠী, সম্প্রদায় প্রভৃতি স্বাধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠ হতে পারে না, পারে না স্বাভাবিক মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা করে স্বচ্ছ ও সুস্থ জীবনযাপন করতে। অথচ আমরা মানবাধিকার সনদ তৈরি করেছি, রাষ্ট্রসঙ্ঘের আনুগত্যও নামত স্বীকার করি। মানুষের প্রথম ও শেষ পরিচয় যে, কেবল মানুষ-এর চেয়ে বড় ও ভিন্ন কোন পরিচয় যে নিবাস সাদা কালো জাত জন্ম শ্রেণী, বিদ্যা-বিত্ত আঙ্গিক খুঁত নির্বিশেষে নেই— থাকতে পারে না, থাকা বাঞ্ছিত নয়, তাও আমরা মুখে উচ্চারণ করি উচ্চকণ্ঠে, কিন্তু বুকে এতে আস্থা রাখি না, তাই কাজেও কোথাও কোনকালেই রূপায়িত হয় না। সমস্যা-সারাত্মক আকারে কিংবা লঘু-গুরু বিষয়েও প্রকট হয়ে বিরাজ করছে গোটা পৃথিবীর সভ্য অর্ধসভ্য, বিশেষ সভ্য দেশে রাষ্ট্রে অঞ্চলে সমাজে। এ ক্ষেত্রে, এ সমস্যার সমাধান ক্ষেত্রে মানুষ ও সরকার যেমন সব জেনে, বুঝেও অবুঝ, তেমনি গোটা পৃথিবীর খণ্ড, ক্ষুদ্র, অনুন্নত, অজ্ঞ অনক্ষর, নিঃস্ব, নিরন্ন, দুস্থ, দুর্বল তথাকথিত স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলোও সব জেনে-বুঝেও গৌরব গর্ব অভিমান দ্বেষ দ্বন্দ্ব হিংসা ঈর্ষা অসূয়া বশে সৈন্যদল পালন পোষণ করি। অথচ তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলো জানে, তারা যুদ্ধে কখনো জয়ী হতে পারবে না অর্থে ও অস্ত্রে স্বয়ম্ভর ও স্বনির্ভর নয় বলেই। আগে যে বলেছি, ব্রিটিশ দু'শ বছর ধরে ভারতের অর্থসম্পদ লুট করেছে, সেগুলোর আধুনিক অর্থমূল্য ধরে তুলনা করলেও দেখা যাবে– আমাদের একালে বার্ষিক অস্ত্র ও সামরিক যন্ত্রপাতি ক্রয়ে ও সেনা পোষণে যা অপচিত হয়, তারচেয়ে বেশি নয়। তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র রাষ্ট্র কেন জলসেনা ও জলযান, বায়ুসেনা ও বায়ুজযান পোষণে রক্ষণে অর্থ অপব্যয় করবে, যখন জানে যে সত্য সত্যই যুদ্ধ কারবার জন্যে যে সংখ্যার সৈন্য এবং জল-বায়ু যান দরকার, তা কখনো অর্থাভাবে তাদের আয়ত্তে আসবে না। তারা বরং গেরিলা-কমাণ্ডো প্রশিক্ষণ দিয়ে দেশ রক্ষা সম্ভব করে-তুলতে পারে। তাদের প্রয়োজন আর্টিলারি ও ইনফ্যান্ট্রি অর্থাৎ স্থল বাহিনী। কেননা স্বরাষ্ট্রের নাগরিকদের শাসনে শায়েস্তা রাখার জন্যে, দ্রোহ মিছিল আন্দোলন দমনে স্থলবাহিনীই তারা ব্যবহার করে থাকে, ব্যবহার করে সেনানীনায়ক অস্ত্রের মুখে জঙ্গীজান্তা শাসন চালু করার জন্যে। দ্বন্দ্ব প্রবণ বৃহৎ শক্তির মুৎসুদ্দী হয়ে বাঁচার দিনও দ্রুত অপগত হচ্ছে। এখনতো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ব্রিটিশ ভারত ছিল খাইবারপাস থেকে সিঙ্গাপুর অবধি বিস্তৃত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজ যদি সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, বার্মা, শ্রীলঙ্কা, বাঙলাদেশ, ভারত, নেপাল, পাকিস্তান নির্বিবাদে নিরস্ত্র সহযোগিতায় ও সহাবস্থানে সম্মত থাকে তা হলে দরিদ্রপ্রজাদের অর্থে কেনা মারণাস্ত্রে স্থল-জল-আকাশযান প্রভৃতির বাবদ ব্যয় বন্ধ হয় এবং দেশের মানুষের আর্থিক অবস্থার বাঞ্ছিত মানের উন্নতিও হবে। অথবা যৌথ বাহিনী রাখায় যদি রাজি হয়, তাহলে ব্যয় পাবে হ্রাস। সে অর্থ উৎপাদনে নির্মাণে অশনে বশনে নিবাসে নিদানে শিক্ষায় স্বাস্থ্যে আধুনিকতম কৌশল-প্রকৌশল-যন্ত্র-প্রযুক্তির-প্রয়োগব্যবস্থা হবে সহজেই সম্ভব। তা ছাড়া আমাদের রয়েছে SAARC নামে একটি সংস্থা বা সমিতিও। সদস্য রাষ্ট্রগুলো যদি সহাবস্থানে সম্মত হয়ে অনাক্রমণ চুক্তি করে, তা হলে জঙ্গ-জঙ্গী বিষয়ক অপচয় হ্রাস করা এবং সে-অর্থ জনগণের সেবায় সাহায্যে অন্নে বস্ত্রে নিবাসে চিকিৎসায় শিক্ষায় স্বাস্থ্যে পালন পোষণ সম্ভব করবে। তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটিশ, ফ্রান্স, রাশিয়া, চীন প্রভৃতির অস্ত্রাদি ক্রয় করার প্রয়োজন হবে না। আমাদের ভাবতে, বুঝতে, জানতে ও মানতে হবে যে পৃথিবীর জনসংখ্যা বাড়ছে; অজ্ঞ অনক্ষর মানুষও, এ যন্ত্রযুগে ও যন্ত্রজগতে রেডিও-টিভি, ক্যাসেট, সিনেমা, পত্রপত্রিকা, দেয়াললিপি, ইস্তেহার, বিজ্ঞপ্তি, মেঠো বক্তৃতা, মিছিল, কাগুচে প্রচারণা মাধ্যমে স্বশিক্ষিত ও স্বার্থ-স্বাধিকার, স্বপ্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে সচেতন, সতর্ক, সযত্ন প্রয়াসী হচ্ছে। ফলে সবাই সাধ্যমতো স্বদেশ-স্বরাষ্ট্রের জন্যে ভোগ্যপণ্য উৎপাদন নির্মাণ করে এবং কাঁচা-পাকা রফতানী পণ্যও তৈরি করে স্বনির্ভর হবার জন্যে সততা প্রয়াস চালাচ্ছে। আজ দুনিয়াব্যাপী এ দৃশ্য অদৃশ্য প্রতিযোগিতা প্রতিদ্বন্দ্বিতা যখন বিশ্বের বড় ছোট মাঝারি সব রাষ্ট্রেই ছড়িয়ে পড়েছে, উৎপাদন-নির্মাণ-বণ্টন যখন এভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে, কারো নিয়ন্ত্রণে থাকছে না, থাকবে না, প্রত্যেক রাষ্ট্রের জন্যেই যখন রফতানী পণ্য ও রফতানী বাজার সঙ্কুচিত– এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে বিলুপ্ত হচ্ছে, তখন পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলোকে কেবল আপোসে, সদ্বুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে পণ্য উৎপাদনে নির্মাণে আদানে প্রদানে চুক্তিবদ্ধ হয়ে সহযোগিতায় সহাবস্থানে অঙ্গীকারাবদ্ধ হতেই হবে আগামী পনেরো বিশ বছরের মধ্যেই। কেননা কেবল ন্যাটো জোট নয়, সমস্যায় পড়েছে পূর্ব য়ুরোপ ও চীনও, আর তৃতীয় বিশ্বের বিশৃঙ্খলতা অজ্ঞতা ও দারিদ্র্যদুষ্ট রাষ্ট্রগুলোর তো কথাই নেই। কাজেই কেউ আর স্বাতন্ত্র্যে, সাচ্ছন্দ্যে, সগর্বে বাঁচতেই পারবে না। পৃথিবীতে নিজ নিজ স্বার্থেই এখন ভৌগোলিক অবস্থানগত, রাষ্ট্রিক ব্যবস্থাগত, প্রাকৃত সম্পদগত, আর্থিক অবস্থানগত কারণেই Remodelling, Restructuring Re-grouping বা Reshaping, পন্থায় রাষ্ট্রগুলোকে গ্রহণ-বরণ করতে হবে।

ভাঙা-গড়ার আবর্তে আজকের বিশ্ব ঃ যুগান্ত লক্ষণ

আমরা এখন এক ক্রান্তিকালে বাস করছি। মানব মনের এক আর্তব পরিবর্তন হচ্ছে পৃথিবীব্যাপী। এতোকাল পরে ডারুইন, কার্ল মার্কস, ফ্রয়েড, পাভলভ আর ইলেকট্রন, প্রোটন, নুট্রন, মানুষের নভ-অভিযানজাত জ্ঞান-অভিজ্ঞতা, বিগ ব্যাঙ, ব্লাকহোল, গ্রীনহাউজ, ওজোন নব নব গ্রহের আবিষ্কার, আসমানীশূন্যতার প্রসার, চাঁদ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভিজ্ঞতা, মানবজিজ্ঞাসার বৈচিত্র্যের বৃদ্ধি, বিগতকালের জ্ঞানভাণ্ডার নামে পরিচিত, শাস্ত্র, দর্শন ইতিবৃত্ত প্রভৃতিতে তাত্ত্বিক ও তাথ্যিক ভুল, ভৌগোলিক জ্ঞানের একান্ত অভাব আর গণিত-রসায়ন-পদার্থ সম্বন্ধে অজ্ঞতা মানুষকে অতীতের শাস্ত্রে, দর্শনে, নীতি-নিয়মে অবিশ্বাস-অনাস্থা-সন্দেহ পোষণে উৎসাহিত করেছে, করছে, করবে। এভাবেই হচ্ছে মানবজীবনের এতোকালে পরিচালিকাশক্তি বিশ্বাস-সংস্কারের অপমৃত্যু ও অবসান। মানুষ এখন আত্মায়, তার অমরত্বে, পারত্রিক জীবনে স্বর্গসুখ ও নরকযন্ত্রণায় সন্দিহান। দেহ-প্রাণ-মন হচ্ছে জৈব জীবনের চেতনাপ্রসূন, চেতনাই আত্মা এবং তার জনকও হচ্ছে চতুর্ভুজঃ ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুত, আব-আতস- খাক-বাত। এ কারণেই মানুষের ভাব-চিন্তা-চেতনা-মনন-মনীষা অতীতবিমুখ এবং ইহজাগতিক বিষয় নিষ্ঠ হয়েছে, হচ্ছে, হবে। শোষণপীড়ন সহজ হবে না, যৌক্তিক ও বৌদ্ধিক হবে মানুষের ব্যক্তিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক আচরণ। যে-কোন অঞ্চলে সমাজে মানুষের মানস-বিকাশ, মানস-অনুশীলন সুপ্ত, গুপ্ত কিংবা চর্চার অভাবে লুপ্ত হয়ে যায় অধিকাংশ মানুষের মধ্যে। তারা হয় আহার-নিদ্রা-মৈথুননিষ্ঠ অর্থ-সম্পদ লিপ্সু ছাপোষা মানব-প্রজাতির দলীয় তথা যান্ত্রিকভাবে পারিবারিক-সামাজিক-শস্ত্রিক নিয়ম মানায় অভ্যস্ত প্রাণী মাত্র। তাই মানবপ্রগতি এতো মন্থর কালপরিসরের মাপে। প্রায় প্রতিদিন জ্ঞান তথা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দ্রুত পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। নতুন নতুন তথ্যের ও যন্ত্রের আবিষ্কার-উদ্ভাবনে পৃথিবী এখন একখণ্ড ক্ষুদ্র দ্বীপে পরিণত হয়েছে, হয়েছে একটি হাট বা বাজার কেন্দ্রিক জনপদে। আজ আর সচেতন মানুষের কোন অজ্ঞতা থাকছে না। খোলা আকাশের মুক্ত বায়ু ঘরের ফাঁকে-ফুকরে রেডিও-টিভি-ভিসিআর-ক্যাসেট-ফ্যাক্স-টেলেক্সে, তারে-বেতারে গোটা পৃথিবীর অসাধারণ গুরুত্বের ঘটনা, জ্ঞাতব্য বিষয় প্রচারযোগ্য সংবাদ, দ্রষ্টব্য বস্তু, প্রভৃতি আজকাল ঘরে শুইয়ে-বসেই দেখা-শোনা-জানা যায়। বিজ্ঞানের বদৌলত অনেক কিছুরই কারণ-কার্য জানা হয়ে গেছে। সে-কারণে ভূত-ভগবানও ভেগেছে, ড্রাগণ-রাক্ষস-ওলা-শীতলাও হয়ে গেছে বিলুপ্ত। মানুষ এখন প্রত্যক্ষবাদী, যুক্তিনিষ্ঠ, সাক্ষাৎ-প্রমাণ প্রবণ হয়েছে, হচ্ছে, হবে। ফলে মানুষের মানস জীবনে শীতের সুপ্তি, গুপ্তি, জরা-জীর্ণতা-জড়তা হচ্ছে অবসিত। এখন মেধা-মনীষা-মননশীল মানব মানসে বয়ে চলছে বাসন্তী হাওয়া। ঘটছে সুপ্তি ও অস্তিত্বগুপ্তি থেকে মুক্তি, দেহে-প্রাণে-মনে এসেছে নব জাগরণ, সে নতুন করে বাঁচতে বাঁচানোতে, এ জীবনকে, এ জগৎকে নতুন মানদণ্ডে মেপে তার ওজন, মূল্য ও মর্যাদা নিরূপণে আগ্রহী। সে নতুন চোখে প্রত্যক্ষ করতে চায় এ জীবন ও জগৎ। প্রাগ্রসর চিন্তা-চেতনার, মনন-মনীষার মানুষ এখন আত্মসত্তার মূল্য মান মর্যাদা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করছে। সে এখন আত্মপ্রত্যয়ী, অপরের প্রতি ভয়-ভক্তি-ভরসা রেখে, অন্যের অকারণে দাস বা অনুগত থেকে সে আজ আর আত্ম অবমাননায় রাজি নয়। তাই সে স্বাধিকারে স্বসত্তার মর্যাদা ও স্বাধীনতা বজায় রেখে প্রতিবেশীর পরিচিত জনের সঙ্গে সহযোগিতায় ও সহাবস্থানে আগ্রহী। তাই গর্বাচেভ যখন 'গ্লাসনস্ত' ঘোষণা করলেন, তখন জারের সাম্রাজ্যের প্রাক্তন প্রজারা সবাই অর্থে-বিত্তে সাচ্ছন্দ্য দাবি করেনি, দাবি করেছিল বিচ্ছিন্নতা ও স্বাধীনতা। যুক্তি ছিল আমরা সত্তায় স্বতন্ত্র ও ভিন্ন। আমাদের গোত্র-গোষ্ঠী-দেশ-ভাষা-সংস্কৃতি-সভ্যতা ভিন্ন। কাজেই আমরা আত্মসত্তার স্বাতন্ত্র্য, বৈচিত্র্য, সংস্কৃতির ভিন্নতা, পরম্পরার বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ব। এ মনোভাব বিগত শতকে য়ুরোপে ভাষিক-গৌত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অনুপ্রাণিত করেছিল জনগণকে, বিশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শতকের প্রথম মহাযুদ্ধের পরেও হাঙ্গেরীয়-প্রুশীয়-তুর্কী সাম্রাজ্য এভাবেই হয়েছিল খণ্ডবিখণ্ড। আজ আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বলকান রাষ্ট্রগুলো গৌত্রিক স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সংগ্রামে মেতেছে, ভারতেও— কিছুটা হয়তো পাকিস্তানেও চলছে একই যুক্তিতে আঞ্চলিক স্বাধীনতার সংগ্রাম। এ বিচ্ছিন্নতার লঘু-গুরু কাঙ্ক্ষা ও আন্দোলন আফ্রো-এশিয়ার, কানাডার, বর্মার, ফিলিপাইনের, পেলেস্টাইনের মধ্যেই এখন নিবদ্ধ নেই, থাকবে না, আত্মসত্তার চেতনার, মূল্যের, গুরুত্বের, মর্যাদার প্রশ্নে আর আপোস চলবে না, স্বার্থসচেতন মানুষ স্বাধিকারে স্বাধীনভাবে স্ব ও সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়বেই, জয়ী হবেই, হচ্ছেও। এ বিচ্ছিন্নতা ও স্বাধীনতা সুসম্পন্ন হলেই, যেহেতু এ যন্ত্রযুগে ও এ যন্ত্রজগতে এ যন্ত্রনির্ভর প্রাত্যহিক জীবনে বিচ্ছিন্নতায়, স্বাতন্ত্র্যে, কূর্মস্বভাব রেখে বাঁচা যাবে না, বিশ্বের অভিন্ন বাজারে ক্রেতা-বিক্রেতা রূপে লেনদেনের ক্ষেত্রে একত্রিত হতেই হবে স্ব স্ব গরজে ও স্বার্থে, সেহেতু বিচ্ছিন্ন ও স্বাধীন রাষ্ট্রগুলো Confederation-এ কিংবা য়ুরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর মতো একক বাজারে পণ্যভিত্তিক সমঝোতায়, অথবা জাতিসংঘের মতো আঞ্চলিক Guild-এর সদস্য হিসেবে উৎপাদনে-নির্মাণে-বণ্টনে সমতা-সহযোগিতার ভিত্তিতে পারস্পরিক নির্ভরশীলতায় বাঁচতে বাধ্য হবে। কেননা, অজ্ঞতার-অনক্ষরতার-অসামর্থ্যের নিষ্ক্রিয় নিশ্চিন্ততার-পরনির্ভরতার দিন দ্রুত অপগত ও অবসিত হচ্ছে। শাসন-শোষণ-পেষণ-পীড়ন চলবে না কোন অর্থে-সম্পদে দুর্বল ও ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের মানুষের উপর কোন প্রবল প্রতাপ রাষ্ট্রশক্তির। বরং পৃথিবীর সর্বত্র অসংখ্য মানুষ গবেষণায়-আবিষ্কারে-উদ্ভাবনে-সৃজনে-জীবনে-সমাজে-রাষ্ট্রে-জগতে বাসন্তী সুখ-সাচ্ছন্দ্য-আনন্দ-আরাম প্রভৃতির গুণ-মান-মাপ-মাত্রা হাজারগুণ বৃদ্ধি করে দেবে। সে-পৃথিবী এ মুহূর্তে অবাস্তব বটে, কিন্তু কল্পনাতীত নয়। এখন উৎপাদনে-নির্মাণে-বণ্টনে সুবিচার পাবে মানুষ। মানুষের বাঁচার জন্মগত অধিকার স্বীকৃত হলেই সমাজতন্ত্র হবে কাম্য, কারণ এর বিকল্প এখনো অজ্ঞাত।

যুক্তিবাদী আরজ আলি মাতুব্বর

আজ উষালগ্নেই অসামান্য অনন্য পুরুষ আরজ আলী মাতুব্বরকে মনে পড়ল। জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তিবাদী শিক্ষিত লোকের নিরীশ্বর নাস্তিক হওয়া দুঃসাধ্য কিছু নয়। কৈশোরে যৌবনে সব-হামবাগ-স্মার্টরা নিজেদের নিরীশ্বর নাস্তিক বলে গর্ববোধ করে, পায় আত্মপ্রসাদও। যেমন গত শতক কিছু ইয়ংবেঙ্গল সেগর্বে গর্বিত ছিল, যদিও চল্লিশোত্তর জীবনে ওঁরা কেউ নিরীশ্বর-নাস্তিক থাকেনি, থাকেনি সংস্কারমুক্ত যুক্তিবাদী দ্রোহীও, এমনকি প্রগতিবাদীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ও উত্তরপ্রদেশে জমিদারী পেয়ে ব্রিটিশের বশংবদ হয়ে ধন্য হন। তাছাড়া বিদ্যাসাগর ব্যতীত আমরণ নাস্তিক থাকেননি তেমন কেউ।

শৈশবে-বাল্যে ভূত-ভগবান-প্রেত-পিশাচ-জীন-পরী-নিয়তি-তিথি-লগ্ন-দিন-ক্ষণ রাশিক্রম-কপাল-কর্মফল, অদৃষ্ট এবং আসমানি শক্তি নিয়ন্ত্রিত জীবনচেতনার পারিবারিক,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামাজিক প্রতিবেশিক কারণে লালিত তাবিজ-মন্ত্র-মাদুলী দারু-পোনা ঝাঁড়-ফুঁক, বাণ-উচাটন, তুকতাক প্রভৃতিও ব্যক্তিকে আশৈশব-আবল্য বিশ্বাস-সংস্কারবদ্ধ জীবনযাপনে অভ্যস্ত করে তোলে। সারা জীবনে এর বৃদ্ধি ও গাঢ়তাই ঘটে, হ্রাস বা ফিকে হয় না কখনো। আশ্চর্য এর মধ্যেও ব্যতিক্রম ঘটে। তেমনি এক অসাধারণ, অনন্য অসামান্য ব্যক্তি ছিলেন আরজ আলি মাতুব্বর।

বরিশাল শহর থেকে নদী হাওর-খাল আকীর্ণ চৌদ্দ মাইল দূরে এক আজপাড়াগাঁয়ে ছিল এঁর নিবাস। অজ্ঞ অনক্ষর নিতান্ত গরীব ঘরে আরজ আলির জন্ম। শৈশবেই পিতার মৃত্যু হওয়ায় গেঁয়ো অজ্ঞ নারী মা যথাসময়ে রাজস্ব দিতে না জানায় বিঘে-দেড়বিঘে জমি নিলেম হয়ে যায়। পরের ঘরে কাজ করে মা শিশুসন্তান পালন-পোষণ করেন। গাঁয়ের মক্তবের মুন্সীকে বলে কয়ে শিশুকে বর্ণ-পরিচয় শেখাতে রাজি করান বিনে-পয়সায়, আরজ আলি মাতুব্বরের লেখাপড়া এখানেই শেষ।

খেটে-খাওয়া কিশোর আরজ আলির যখন সতেরো বছর বয়েস তখন ইহজগতে একমাত্র আত্মীয়া এবং মর্ত্যজীবনের ভরসা মা হঠাৎ মারা গেলেন। আরজ আলির দেশদুর্লভ ও প্রথাবিরুদ্ধ এক আকাঙ্ক্ষা জাগল ওই শোকগ্রস্ত নির্বান্ধব অবস্থায়। তিনি মায়ের মূর্তি ছবিতে ফটোতে ধরে রাখবেন। গাঁয়েতো বটেই, শহরেও তখনো সব মুসলিম শিক্ষিত ঘরে এ পাপবাঞ্ছা বা রুচি-সংস্কৃতি চালু হয়নি। একগুঁয়ে ও আবেগতাড়িত আরজ আলি মৃত মাকে ঘরে রেখে ছুটলেন বরিশাল শহরে খাল-বিল পার হয়ে। নিয়ে এলেন ফটোগ্রাফার, ব্যয়বহুল তো বটেই। মায়ের ফটো তোলা হল। এ বেশরা কাজ করা হল বলে গাঁয়ের লোক তাঁর মায়ের জানাজাও পড়ল না, কবরস্থ করার জন্যে যে একাধিক লোকের প্রয়োজন, তেমন কাউকেও পাওয়া গেল না, ক্ষুব্ধ অসহায় আরজ আলি নিজে নিজেই মাকে মাটিতে পুঁতে কর্তব্য শেষ করলেন। এভাবেই আরজ আলির মনে হাজারো প্রশ্নের উদয়, আসমান-জমিনে বিস্তৃত বহু জিজ্ঞাসার উন্মেষ। জীবন কি, জগৎ কি, শাস্ত্র কেন, সৃষ্টি কি? স্রষ্টা কে? জগৎ ও জীবন নিয়ন্তা কে, তিনি কেমন, তাঁর উদ্দেশ্য কি, লক্ষ্য কি? জগৎ কেন? জীবনেরই বা পরিণাম কি? দৃশ্য-অদৃশ্য সব নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ, প্রথাপদ্ধতি মানার ফল কি? না মানার ক্ষতি কি? ইগ-পরলোকে প্রসূত জীবনের তাৎপর্যই বা কি? আত্মা কি? চৈতনা কি?

আত্মার অমরত্বের কারণ কি? প্রয়োজন– কি? যুক্তিই বা কি?

এ সব জিজ্ঞাসারই উত্তর সন্ধান করার জন্যে আরজ আলি মাতুব্বর বর্ণ পরিচয়কে পুঁজি করে নিজে নিজে বইপড়া শুরু করেন। বাঙলা ভাষায় প্রাপ্য বিজ্ঞানের, দর্শনের, ধর্মশাস্ত্রের, সমাজবিজ্ঞানের, নীতিশাস্ত্রের, ইতিহাসের ও মনোবিজ্ঞানের বই বহুসন্ধানে ও প্রয়াসে যোগড় করে পড়ে ও গুণীজনদের সাথে আলোচনা করে তিনি জ্ঞানে ও মননে ঋদ্ধ হন।

তিনি ঢাকায় এসে মাঝে মধ্যে ইসমাইল আবুল হাসনাতের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত মিলন সঙ্ঘের সভায় যোগ দিতেন সদস্য হিসেবেই। তিনি তাঁর জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-বিবেক-বিবেচনা প্রয়োগে হলেন নিরীশ্বর-নাস্তিক, বিবেকবান যুক্তিবাদী মানুষ। হলেন মানবপ্রেমী দুস্থমানবসেবী, সমাজ-উন্নয়নকর্মী, শিক্ষাবিস্তারে জ্ঞানের প্রসারকর্মী, পাঠাগার স্থাপনকারী। আর সত্যসন্ধ, জিজ্ঞাসু-যুক্তিবাদীর সংখ্যাবৃদ্ধি কল্পে তথ্য-প্রমাণ-যুক্তি-ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ টীকাভাষ্য যোগে বিবিধ গ্রন্থ রচনা করে হলেন লব্ধ প্রতিষ্ঠ লেখক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সত্যের সন্ধানে, মুক্তমন, সৃষ্টির রহস্য, অনুমান, স্মরণিকা প্রভৃতি তার ছয় সাত খানা প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গ্রন্থও রয়েছে। এ স্বশিক্ষিত লোকটির এ কৃতিত্ব আমাকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করে। আমরা ঢাকায় লেখকশিবির থেকে এঁকে সংবর্ধিত ও পুরস্কৃতও করেছিলাম। মিলন সভ্যেও ছিল তাঁর বিশিষ্ট আসন ও মর্যাদা। তাঁর মৃত্যুর পর এ প্রায় অশীতিবর্ষের বৃদ্ধ সম্বন্ধে একটি বিচিত্র ও মূল্যায়নমূলক প্রবন্ধও লিখেছিলেন সংবাদে প্রখ্যাত লেখক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী।

নিরীশ্বর নাস্তিক আমরা অনেক দেখি, দেখেছি। বিশেষ করে কম্যুনিস্টরা নিজেদের নাস্তিক বলেই পরিচয় দেন। কিন্তু আরজ আলি মাতুব্বারের মতো এমন অসাধারণ, অনন্য, অসামান্য বিস্ময়কর রূপে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব আমি জীবনে দেখিনি, শুনিনি।

ভূমি জরিপকারী অর্থাৎ কাঠাকালি পরিমাপক আমিন হিসেবে তিনি গাঁয়ে অর্থ-উপার্জন করে সচ্ছল গৃহস্থ হয়েছিলেন, হয়েছিলেন জমিজমার মালিক। ছেলেমেয়েদের করেছেন সেগুলো ওয়ারিশ, সন্তানদের বণ্টনও করে দিয়েছিলেন। ষাটোত্তর জীবনে জরিপ কাজে আমিন হিসেবে যতো অর্থ-উপার্জন ও সঞ্চয় করেছেন, তা বিদ্যালয় ও পাঠাগার নির্মাণে ব্যয় করে ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে দান করেছেন বলে শুনেছি। সব চেয়ে বিস্ময়ের ও অদ্ভুতকর্ম যা করেছেন, তা হল, মৃত্যুর পূর্বে তিনি নিজের জন্যে একটি পাকা কবর তৈরি করিয়েছিলেন, কিন্তু পরে তাঁর মনের, মতের ও সিদ্ধান্তের যৌক্তিক ও বৌদ্ধিক পরিবর্তন ঘটে। তিনি তাঁর লাশ ও চক্ষু বরিশাল কলেজ মর্গপাতালে দান করার জন্যে উইল করে যান।

এমন বুদ্ধির, স্থিতসংকল্পের, দৃঢ়মনোবলের, নিঃসংশয় বুদ্ধির অসাধারণ, অসামান্য অনন্য নিরীশ্বর-নাস্তিক মানুষ দুর্লক্ষ্য। এমন দরিদ্রঘরের বুভুক্ষাপীড়িত সন্তানে এমন উচ্চতম মানের, মাপের মাত্রার মেধার ও মনস্বিতার, কৃপা-করুণার, দয়া-দাক্ষিণ্যর, সত্যসন্ধানের, ন্যায়পরায়ণতার, মানবতার-মানববাদিতার স্থিতি, এমন একক ব্যক্তিত্বে একাধারত্বে ও যৌগপত্রে এতো অসামান্য গুণের সমাবেশ যে সম্ভব, তা আরজ আলিকে না দেখলে বিশ্বাস করা সম্ভব হত না। তাই আরজ আলি মাতুব্বর গোটা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষের, আদর্শ মানবিকতার অসামান্য মানবতার প্রমূর্ত প্রতীক ও প্রতিভূ। ইনি আমাদের অনুন্নত অজ্ঞতা-অনক্ষরতাদুষ্ট দেশের সন্তান, আমাদের এ গৌরবের ও গর্বের তুলনা নেই। আরজ আলি মাতুব্বর আমাদের গৌরব, আমাদের গর্ব, আমাদের মানুষ্যত্বের আদর্শ।

নারী মুক্তি সংগ্রামী ঃ বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসনে
[১৮৮০-১৯৩২]

মানব-মনীষা যে কত অমেয়, অসাধারণ, অনন্য-অসামান্য হতে পারে তার প্রমাণ স্থলে-জলে-আকাশে-আধুনিক বৈজ্ঞানিক সত্য ও তথ্য আবিষ্ক্রিয়া এবং রোগ নিরূপণ প্রক্রিয়া, প্রতিষেধক উদ্ভাবন, শারীরতত্ত্ব, অস্ত্রোপচার আর প্রকৌশল-প্রযুক্তি সম্পৃক্ত বিবিধ, বিভিন্ন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও বিচিত্র যন্ত্রের আবিষ্কার-উদ্ভাবন ও নিত্যোৎকর্ষ। আমরা বিজ্ঞানীর আবিষ্কারে-উদ্ভাবনে প্রতিমুহূর্তে দেহে-প্রাণে-মনে বৈষয়িক-ব্যবহারিক জীবনে সুখ, স্বস্তি স্বাচ্ছন্দ্য-সাচ্ছল্য ভোগ-উপভোগ করি, কিন্তু সেগুলো নিতান্ত যন্ত্র, সামগ্রী বা বস্তু বলেই তার সঙ্গে আমাদের চেতনাপ্রসূত অনুভূতি-উপলব্ধিযুক্ত নয়, আমরা উপভোগটা গ্রহণ করি, স্বীকার করি, অপরিহার্যও বলে জানি, বুঝি ও মানি আমাদের প্রাত্যহিক জীবনাচারে। কিন্তু আবিষ্কারক-উদ্ভাবকের কাছে আমাদের ঋণের কথা স্মরণ করি না। তাই তাঁদের নামও মনে রাখি না। কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করি না, তাঁদের চিনিই না।

কিন্তু আমাদের জীবন যেহেতু জাগ্রত মুহূর্তগুলোর সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনা-প্রেম-প্রীতি-স্নেহ-মমতা-ঈর্ষা-অসূয়া-ঘৃণা-বিদ্বেষ-লাভ-ক্ষতি, কাঙ্ক্ষা পূর্তি-অপূর্তির তুষ্টি-তৃপ্তি-ক্ষোভ, হতাশার সমষ্টিমাত্র, সেহেতু আমরা যাদের ভালো লাগে তাদের ভালোবাসি, যাদের পছন্দ করতে পারিনে তাদের এড়িয়ে চলি, অবজ্ঞা করি। যে বা যারা তার বা তাদের কথায়, কাজে, লেখায়, আঁকায়, গানে, আচরণে আমাদের প্রাণে-মনে আনন্দ-বেদনার, সুখের-স্বস্তির, আশা-প্রত্যাশার আবেগ জাগায়, আমাদের স্থূল-সূক্ষ্ম অনুভবে সুড়সুড়ি দেয়, আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-প্রজ্ঞা-উপলব্ধি বৃদ্ধির সহায়ক হয়, আমরা তাদের প্রতি আকৃষ্ট, অনুরক্ত ও কৃতজ্ঞ হই। এই হচ্ছে মানুষের সাধারণ স্বভাব। এ ক্ষেত্রে অবশ্য ব্যতিক্রম বিরল নয়।

এককথায় যাঁরা আমাদের প্রাত্যহিক ব্যবহারিক-বৈষয়িক জীবনাচারের সর্বক্ষেত্রে বিস্ময়কর বিকাশ-বিস্তার-উৎকর্ষ ও সহজাতা-সৌকর্যদান করেছেন তাতে প্রাণ-মননের খোরাক নেই বলে আমরা তাঁদের আবিষ্কৃত, উদ্ভাবিত, নির্মিত যন্ত্র ও সামগ্রীনির্ভর জীবন যাপন করেও তাঁদের স্মরণে রাখিনে। আর যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে আমাদের জীবনযাপনের প্রাত্যহিক সঙ্কট-সমস্যা-সহজতা-সৌকর্যের সঙ্গে মোটেই যুক্ত নন, তাঁরাই আমাদের মনের ও মননের চাহিদা যোগান বলেই আমরা তাঁদের নিত্য স্মরণ করি, মাঝে মধ্যে স্মরণ করি, উৎসবে-পালা-পার্বণে স্মরণ করি, গ্রহণ-বরণ করি মানবসেবী, মানবপ্রেমী, শ্রদ্ধা-ভক্তিভাজন মহৎ ও প্রিয়জনরূপে। কৃতী ও কীর্তিমান হিসেবে আমরা তাঁদের চির স্তাবক হয়ে থাকি প্রজন্মক্রমে। অতএব, যাঁরা আমাদের মনকে তাঁদের কথায়-কাজে লেখায়-গানে-সুরে কীর্তি-কৃতি-আচরণে প্রভাবিত করতে পারেন, আমাদের চিত্তজয় করেন, তারাই কেবল স্থানিক, কালিক, আঞ্চলিক, জাতিক, সাম্প্রদায়িক গৌত্রিক কিংবা বৈশ্বিক ও চিরকালীন হয়ে আমাদের স্মরণীয় হয়ে থাকেন।

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনও তেমনি একজন অসাধারণ, অনন্য ও আসামান্য মুসলিম মহিলা। যাঁর পরিচিতি সীমিত ছিল ভাগলপুরের ও কোলকাতার তথা বাঙলার উচ্চশিক্ষিত মুসলিম সমাজে। বস্তুত রোকেয়ার খ্যাতি ক্রমে ক্রমে ছড়িয়ে পড়তে থাকে গোটা শিক্ষিত মুসলিম সমাজে তাঁর মৃত্যুর পরেই। তাঁর সময়ে বাঙলার মুসলিম সামাজেই ইংরেজী শিক্ষিত লোকের সংখ্যা ছিল নগণ্য। তাছাড়া ওয়াহাবী-ফরায়েজী আন্দোলন তাঁর জন্মপূর্বেই অবসিত হলেও বিহারে-বাঙলায় তখনো নারীশিক্ষা বিরোধী ছিল মুসলিমরা সাধারণভাবে এবং পর্দাপ্রথা বিরোধী ছিল না কেউ কোথাও প্রকাশ্যে। উল্লেখ্য যে বিশ্বব্যাপী কোথাও সমাজে তখন নারী শিক্ষা তেমন গুরুত্ব পায়নি। আমাদের দেশে ১৮৭০-এর দশকে কোলকাতার ব্রাহ্ম ও দেশী খ্রীস্টান সমাজে নারীমুক্তি ও নারীশিক্ষা চালু, প্রশ্রয়, আশ্রয় ও উৎসাহ পেলেও খাস লণ্ডন শহরেই তখনো কোন নারী স্নাতক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপাধি স্তর অবধি পড়বার সুযোগ পায়নি, ব্রিটিশ সমাজের রক্ষণশীলতার দরুন। ওই দেশে নারী ভোটাধিকার পায় মাত্র ১৯৩০ সন থেকে। আর ১৯৩৭ সন থেকে আমাদের অজ্ঞ-নিরক্ষর-নিঃস্ব নিরন্ন খেঁদি-পাঁচি-ফুলজান-সোনাবিবিও পায় ভোটাধিকার।

আমাদের দেশে নারী-মুক্তি আন্দোলন, নারীপর্দাবিমোচন কিংবা নারীশিক্ষার প্রসার ঘটেছে আমাদের উদারতার, গুরুত্বচেতনার বা সুবিবেচনার ফলে নয়, প্রতীচ্য সমাজের প্রতি অনুরাগ, শ্রদ্ধা ও তার অনুকরণ-অনুসরণ প্রবণতা থেকেই। তাই হিন্দুসমাজে নারীশিক্ষার প্রসার ঘটে উচ্চশিক্ষিত পুরুষ পরিবারেই। পরিবেশরিক্ত দেশজ মুসলিম পরিবারে ইংরেজী শিক্ষা যেমন হিন্দুবহুল অঞ্চলে, হিন্দু প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় মাধ্যমে মন্থরগতিতে অনুপ্রবেশ করতে থাকে, তেমনি শিক্ষিত মুসলিম পরিবারেও দেশী শিক্ষিত হিন্দুর ও প্রতীচ্য শিক্ষার প্রভাবে নারী শিক্ষা বিনা প্রচারেই ক্রমপ্রসার লাভ করতে থাকে অতি মৃদুমন্থর গতিতে।

এ কারণেই বিধবা রোকেয়া ভাগলপুরে বিদ্যালয় খুলেও উর্দুভাষী ছাত্রী বাঞ্ছিত সংখ্যায় পাননি। পাঁচ/সাত জন মাত্র পেয়েছিলেন। কোলকাতায় তিনি খানদানী উর্দুভাষী পরিবারের কন্যা বধূ হিসেবে খানদানী উর্দুভাষী ছাত্রী পেয়েছিলেন বেশি। ১৯২৭ সনে স্কুলের ১১৪ জন ছাত্রীর মধ্যে মাত্র দু'জন ছিল বাঙলাভাষী ছাত্রী। ঘরে ঘরে গিয়ে অভিভাবকদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সাধাসাধি করে তিনি নিম্নবিত্তের দু'চারটি বাঙালী ছাত্রীও যোগাড় করে বিদ্যালয় চালু করেছিলেন কোলকাতায়, সতীসাধ্বী বিধবা আস্তিক্য বিশ্বাস বশে পতিভক্তির সাক্ষ্য প্রমাণরূপে বিদ্যালয়ের নাম দেন : [সৈয়দ] সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল। এ বিদ্যালয় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়রূপে কোলকাতায় পর্দানশীন ছাত্রীর উচ্চ শিক্ষা লাভের সুযোগ করে দেয়। রোকেয়ার মৃত্যুর অনতিকাল পরে ১৯৩৪ সনে এটির দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করে। ফলে আজো সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল সরকারী বিদ্যালয় হিসেবে রোকেয়ার স্থায়ী কৃতি ও কীর্তি ঘোষণা করছে।

রোকেয়ার প্রভাবেই বাঙলার মুসলিম সমাজে নারীশিক্ষা চালু হয়েছে বা নারীপর্দা উঠে গেছে বা নারীমুক্তি ঘটেছে বললে সত্য ও তথ্য মিলবে না, স্তাবকতা হবে মাত্র যা আমাদের দেশের আবেগপ্রবণ ভক্তিবাদী শ্রদ্ধাচ্ছন্ন লেখকদের প্রায় স্বভাবেরই অন্তর্গত। কারণ রোকেয়ার আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও বাঙালী শিক্ষিকা ও ছাত্রী সংখ্যায় ছিল নগণ্য।

স্বীকার করতেই হবে যে রামমোহন-বিদ্যাসাগর প্রমুখ উনিশ শতকে প্রতীচ্য শিক্ষা-সংস্কৃতি-চিন্তা-চেতনা-মনন-দর্শন-বিজ্ঞানের প্রভাবে কোলকাতার উচ্চবর্ণের ও উচ্চবর্গের শিক্ষিতদের মধ্যে প্রতীচীর আদলে জীবনাচার গ্রহণ ও সমাজ গঠন আন্দোলন শুরু করেন, তাঁদের সহায়ক সহযোগী অনুরাগী অনুচর ও উত্তরসূরি ছিল আস্তিক, নাস্তিক, সংশয়বাদী, প্রত্যক্ষবাদী ইংরেজী শিক্ষিত তরুণ দল। এ প্রভাবে যখন কোলকাতায় বহুজনসেবায় ও বহুজনমননে একটা সমকালীন ক্ষুদ্র কৃত্রিম লণ্ডন শহর গড়ে উঠল সাংস্কৃতিক চাল-চলনে, আচারে-আচরণে, ভাব-চিন্তা-কর্মে, তখন মুসলিমরা তাদের অনুকরণে অনুসরণে ইংরেজী শিক্ষা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই চালে-চলনে-মননে সংখ্যাল্পতার দরুন কিছুটা সংকোচে শরমে দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে-চেতনায় নিজেদেরও প্রাত্যহিক জীবনাচার গড়ে তুলতে থাকে।

কাজেই নারী শিক্ষার জন্যে কোলকাতার বাইরে কোথাও মুসলিম সমাজে আন্দোলন করতে হয়নি, যারা ছেলেকে স্কুলে পাঠিয়েছে, তারা মেয়েদেরও সাক্ষর করাতে আগ্রহী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছে, অবশ্য উচ্চশিক্ষাদানের মতো সামাজিক পরিবেশ বা আর্থিক সামর্থ্য তাদের ছিল না স্কুলের অভাবে। এটি হিন্দু সমাজের ক্ষেত্রেও ছিল প্রযোজ্য অনেককাল। নারীশিক্ষা উভয় সমাজেই আনুপাতিক হারে বিলম্বিত হয়েছে। তাছাড়া নিরক্ষর মুসলিম ঘরে ও সমাজে চিরকালই কেবল হরফ চিনে ভাষা না-জেনে বা না-বুঝেও কোরআন পাঠ শেখা ছিল রীতি-রেওয়াজ। এর নাম 'নাজিরি' [নজর] পাঠ। কাজেই ইংরেজী শিক্ষিত বাপ-ভাইয়ের প্রভাবে বাঙলা-ইংরেজী পড়া মুসলিম ঘরে বেশিদিন বাধা হয়ে থাকেনি নারীর পক্ষে। ১৯২০/২৫ সনের পরে তাই আমরা বেশি সংখ্যায় স্বল্প কিংবা সম্পূর্ণ ইংরেজী শিক্ষিত মুসলিম পুরুষ ও নারী দেখতে পাই।

২

এবার রোকেয়া বেগমের কথা বলি। রংপুরের পায়রাবন্দ গাঁয়ের এক দ্রুত ক্ষয়িষ্ণু জমিদার পরিবারে তাঁর জন্ম। পিতার নাম জহির উদ্দিন মুহম্মদ আবু আলি হায়দার সাবের। নিম্নবর্ণের, নিম্নবর্গের ও নিম্নবিত্তের ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ পেশাজীবী কিংবা প্রান্তিক চাষী বৌদ্ধ-হিন্দু থেকে দীক্ষিত দেশজ মুসলিমদের মধ্যে তুর্কী-মুঘল আমলে সাক্ষর ও সচ্ছল পরিবারের সংখ্যা ছিল নগণ্য। তাদের কেউ কেউ আরবী, বাঙলা ও ফারসী নিয়ে মোল্লা মৌলবী মুনশী হয়ে কাজী-উকিল-আমলা-ফৌজদার হয়েছিল বটে, তবে কোন দেশজ লোকই সভাসদ মন্ত্রী সেনানী হওয়ার যোগ্যতা লাভ করেনি। ফলে বাঙলার মুসলিম সমাজে খানদানী, ব্যবসায় আর জমিদারমাত্রই ছিল বিদেশাগত মুসলিম বা তাদের উর্দুভাষী ফারসী-আরবী জানা পরিবার। রোকেয়াও তেমন বিদেশাগত তথা ইরানের তাব্রিজ থেকে সেকালীন রীতি-রেওয়াজ মতো ভাগ্যান্বেষণে আগত পূর্বপুরুষ এক বাবর আলি আবুল বাবর প্রথমে বিহারের মংপুর গাঁয়ে পরে রঙপুরের পায়রাবন্দ গাঁয়ে বাস করতে থাকেন কুর্সীনামা অনুসারে ৯৯০ বঙ্গাব্দে বা ১৫৮৩ সনের দিকে। কিন্তু এটি বানানো। কারণ ১৯১৩ সনে মৃত রোকেয়ার পিতা সাবের ছিলেন বাবরের ষষ্ঠ প্রজন্মের বংশধর। কাজেই আসলে এ পরিবার আঠারো শতকেরই। সম্ভবত সেনানী হিসেবে কিংবা বেণে হিসেবেই তিনি ধনসম্পদ জমি-খ্যাতি-প্রতিপত্তির ও খানদানের অধিকারী হয়েছিলেন। রোকেয়ার বড় বোন করিমুননিসার বিয়ে হয়েছিল টাঙ্গাইলের দেলদুয়ারের জমিদার গজনভী পরিবারে। তাঁর কৃতী ও কীর্তিমান সন্তান দুজন স্যার আবদুল হালিম গজনভী ও স্যার আবদুল করিম গজনভী রাজনীতিক নেতা ছিলেন। মন্ত্রীও ছিলেন, এখনো শ্যামা-হক মন্ত্রীসভার মতো গজ-চক্র (গজনভী-চক্রবর্তী) মন্ত্রীসভা বিরূপ বিরক্ত বিরোধী লোকের মুখে প্রচারিত হয়ে শ্রুতি-স্মৃতিরূপে পরিহাস ব্যঞ্জক হয়ে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। রোকেয়ার পিতার মৃত্যু ঘটে ১৩২০ সালে তথা ১৯১৩ সনে। তখন তিনি নিঃস্ব, চার স্ত্রীর স্বামী ও বহু পুত্র-কন্যার পিতা। রোকেয়াকে যে পালটে ঘরে সুপাত্রের অর্থাৎ যোগ্য যুবকের সঙ্গে বিয়ে দিতে পারেননি তাঁর পিতা, তার মুখ্য কারণ তাঁর অর্থ-সম্পদ নিঃস্বতা। রোকেয়ারা ছিলেন সহোদর তিন ভাই ও দু'বোন। রোকেয়া গৌরবর্ণা ছিলেন, লাবণ্যে রূপসী ছিলেন কি-না জানিনা, তবে কোন কোন ছবি দেখে মনে হয় তাঁরও শ্রী ছিল চেহারায়। অর্থাভাবে সমঘরে যোগ্য তরুণের যোগাড়ে ব্যর্থ হয়ে নিঃস্ব পিতা এ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কন্যার বিয়ে দেন সেকালে খানদানী ভাগলপুরী সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন (১৮৬৫-১৯০৯) নামের এক বিপত্নীক মধুমেহরোগী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে। তখন তাঁর বয়স চল্লিশ বছর আর রোকেয়ার বয়স ষোল। স্বামী-স্ত্রীর বয়সের ব্যবধান ছিল চব্বিশ। বিয়ে হয় ১৮৯৬ সনে। প্রৌঢ় বহুমূত্ররোগী সাখাওয়াতের কাছে বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যার মতো রোকেয়ার আদর-কদর নিশ্চয়ই ছিল, এ আমরা নিঃসংশয়ে মেনে নিতে পারি। কিন্তু প্রায় পিতার বয়সের রুগ্ন স্বামীতে তাঁর আকর্ষণ-অনুরাগ-আসক্তি থাকা তো স্বাভাবিক নয়। কাজেই দাম্পত্য সুখ বা আনন্দ তাঁর জীবনে অনুভূত হয়নি বলেই আমরা ধরে নিতে পারি। তাঁর একপত্রে তার সাক্ষ্যও মেলে, প্রশ্রাব পরীক্ষা আর তিক্ত রস তৈরি করাই ছিল তাঁর নিত্যকার প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য ও মুখ্য কর্ম। এ দাম্পত্যে রোকেয়ার দুটো কন্যা সন্তান জন্মেছিল। একটি পাঁচ মাস বয়সে ও একটি চার মাস বয়সে মারা যায়। দাম্পত্য অবসিত হয় সাড়ে তেরো কিংবা চৌদ্দ বছর পরে ১৯০৯ সনের তেসরা মে তারিখে, তখন রোকেয়ার বয়স ত্রিশ। একালে এ বয়সে অনেকের বিয়ে হয় মাত্র। তার ভরা যৌবনে তিনি হলেন বিধবা। তারপরে তিনি স্বামীর প্রথম পক্ষের কন্যা-জামাতার হাতে লাঞ্ছিত ও বিতাড়িত হয়ে ১৯১০ সনের কোন সময়ে কোলকাতায় আশ্রিতা হন। তাঁর স্বামী সাখাওয়াত হোসেন সজ্জন ছিলেন, তিনি বন্ধু ছিলেন প্রখ্যাত প্রবন্ধকার মনীষী ভূদের মুখোপাধ্যায়ের পুত্র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রায়বাহাদুর মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়ের। মুকুন্দদেবের স্মৃতি কথায় এঁর উল্লেখ রয়েছে। সাখাওয়াত হোসেন শেষ বয়সে অন্ধও হয়ে গিয়েছিলেন, কাজেই দাম্পত্য জীবনে রোকেয়ার ছিল অশেষ মানসিক দুঃখ যন্ত্রণা এবং স্বামীর সেবা শুশ্রূষা সম্পৃক্ত দুঃসহ শারীরিক শ্রম।

রোকেয়া চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নিয়তিকে মেনে নেয়া। তাই রুগ্ন প্রৌঢ় স্বামীর ঘর করতে হল বলে তিনি পিতার প্রতি রোষও প্রকাশ করেননি, দেখাননি স্বামীর প্রতি অশ্রদ্ধার অবহেলার ও বিরক্তির অভিব্যক্তি। কেননা শাস্ত্রমানা রোকেয়া জানতেন পিতৃভক্তি একটা সদগুণ এবং পতিভক্তি আবশ্যিক ও জরুরী। কেননা পতির প্রসন্নতাই বেহেস্তে প্রবেশের কুঞ্জি। এ কারণেই এ হেন স্বামীর নামেই প্রতিষ্ঠিত করলেন স্কুল। পতিপ্রাণতার সাক্ষ্য প্রমাণ আদর্শ সমুজ্জ্বল রাখার জন্যে।

যৌবনজীবনে এমনিভাবে বৃথা ও ব্যর্থ হল বলেই রোকেয়া নারীমুক্তির লক্ষ্যে নারীকে স্বাবলম্বী করা যে আবশ্যিক ও জরুরী, তা মর্মে মর্মে নিজের ব্যর্থজীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে অনুভব-উপলব্ধি করেছিলেন। কেবল শিক্ষাই নারীকে শাস্ত্রিক সামাজিক নৈতিক সাংস্কৃতিক অন্ধ বিশ্বাস-সংস্কার মুক্ত করতে পারে, পারে রোজগেরে স্বনির্ভর স্বয়ম্ভর স্বাধীন জীবন যাপনের যোগ্য করে তুলতে। এ উপলব্ধি কেবল রোকেয়া মুসলিশ সমাজের হয়ে নয়, কেবল বাঙলার বা ভারতের হয়েও নয়, বিশ্বের হয়েই প্রথম অনুভব-উপলব্ধি করে কলম ধরেছিলেন লেখার মাধ্যমে প্রচার ও প্রচারণা চালানোর জন্যে, শিক্ষার মাধ্যমে জানিয়ে বুঝিয়ে দেয়ার জন্যে। আশ্চর্য তিনি স্বরূপে অন্তরে বিদ্রোহিনী হলেও তাঁর লেখার কোথাও রোষ উষ্মা ক্রোধ ক্ষোভ তেমন মাত্রাতিরিক্ত হয়ে প্রকাশ পায়নি, মানে চাবুকাঘাত হয়নি। যা লিখেছেন স্থির বিশ্বাসে ও ধীর বুদ্ধিতে বিচার-বিশ্লেষণ করে, দৃষ্টান্ত দিয়ে, যুক্তি প্রয়োগে বিশ্বাসযোগ্য ও যুক্তিগ্রাহ্য এবং পরিবারে সমাজে গ্রহণীয়, প্রয়োগযোগ্য করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লিখেছিলেন, বলেছিলেন। কৃচিৎ বিদ্রূপ ও রোষ প্রকাশ পেয়েছে। আর বাঙলার, বাঙালীর ও নারীর দুরবস্থার জন্যে ক্ষোভ দুঃখ প্রকাশ পেয়েছে। খান্দানী জমিদার ঘরের সংস্কৃতি-সৌজন্যের প্রমূর্ত প্রতীক, প্রতিভূ ও প্রতিম এ মহিলা এক তাৎপর্যে বৈশ্বিক পরিপ্রেক্ষিতেই প্রথম দেশাচারদ্রোহী নারী, প্রতিকার প্রতিবাদ প্রতিরোধ লক্ষ্যে প্রথম আত্মোৎসর্গকারিণী, যিনি নারীকে স্বাধিকারে স্ব ও সুপ্রতিষ্ঠাকামী অহিংস সংগ্রামী আপোসহীন বিরামহীন সংগ্রাম তিনি চালিয়ে গেছেন ১৯৩২ সনের ৯ই ডিসেম্বর আকস্মিক হৃদরোগে মৃত্যু মুহূর্ত অবধি। তাঁর মৃত্যুর দিনেই তাঁর টেবিলে তাঁর অসমাপ্ত প্রবন্ধ "নারী অধিকার" দেখা গেছে। তাঁর ৫২/৫৩ বছরের জীবনে তিনি ইংরেজীতে, বাঙলায় এবং উর্দুতে কেবল নারীশিক্ষার, নারীপর্দার ও নারীমুক্তির তথা নারীর স্বাবলম্বী হওয়ার কথাই বলেছেন, লিখেছেন, এবং এ-ই ছিল তাঁর ধ্যানের ও অনুধ্যানের বিষয়। কেননা প্রেরণার ও প্রণোদনার উৎস ছিল তাঁর নিজের জীবনে প্রতিমুহূর্তে অনুভূত ট্রাজিক যন্ত্রণা, ব্যর্থতা ও শূন্যতা। যদিও শরীফ ঘরের সন্ততি নিজের কথা কোন লেখায় পরিব্যক্ত করেননি, তবে কিছু ব্যক্তিগত পত্রে অবশ্য ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজনকে কিছু বেদনার অভিব্যক্তি দিয়েছেন মাত্র। কিন্তু অভিমান ছিল না সমাজের প্রতি, ক্রোধ ছিল না পুরুষ জাতের প্রতি। কেবল যুক্তি, দৃষ্টান্ত আর আবেদনই ছিল তাঁর সম্বল। ব্রাহ্মরা ও দেশীয় খ্রীস্টানরা নারীর পর্দামুক্তিতে নারীশিক্ষায় ছিলেন উদার উৎসাহী। বিদ্যাসাগর ছিলেন উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণের বহুবিবাহ নিরোধে ও বিধবাবিবাহ প্রচলনে আর গাঁয়ে গাঁয়েও বর্ণ হিন্দু বালক-বালিকার শিক্ষাদানে ব্রতী। রামমোহন ছিলেন সতীদাহ প্রথা বিলুপ্ত করার প্রয়াসী। অন্য অনেকে বাল্যবিবাহ ও বালিকা সহবাসরূপ বর্বরতা প্রতিরোধে উদ্যোগী। সেকালে বর্ণ হিন্দুরা দেশজ অজ্ঞ অনক্ষর নিঃস্ব, দরিদ্র নিরন্ন বিধর্মী প্রজা-খাতক ও শাসনপাত্র অস্পৃশ্য মুসলিম সম্বন্ধে ছিল অবজ্ঞাপরায়ণ ও উদাসীন। এরাও গণ্য ছিল অবশ্য অস্পৃশ্য শূদ্রের মতোই। বিশ শতকের তৃতীয় দশক অবধি বাঙালী হিন্দু-মুসলিমে কোন সাংস্কৃতিক-সাহিত্যিক সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি, নীলনদের জলের মতো ছিল দুই রূপ-রঙের ভিন্ন ধারায় অবিমিশ্র। তাই কোলকাতার দেশজ মুসলিম সাংবাদিক, কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, সমাজসংস্কারকদের মতোই কোলকাতায় মুসলিম বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাত্রী সৃজনশীল লেখিকা, সমাজসংস্কারক নারীর অবরোধ ও অবগুণ্ঠনমুক্তি আর শিক্ষা প্রচারক, নারীর স্বাধীনতা ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার স্বাপ্নিক, নারীকে স্বনির্ভর-স্বয়ম্ভর করার প্রয়াসী রোকেয়াও ছিলেন এতোকাল কোলকাতার শিক্ষিত হিন্দুসমাজেই অজ্ঞাত, এখনো রয়েছেন হয়তো নামসার বা স্বল্প ও সামান্যজ্ঞাত। আজ এ মুহূর্তে বাঙালী মুসলিমদের এক অংশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র চালায়, জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্য-শিল্প-স্থাপত্য-ভাস্কর্য চর্চা করে, করে কারু-দারু-চারু প্রভৃতি চৌষট্টিকলার অনুশীলন, কিন্তু এখনো কোলকাতার শিক্ষিত লোকেরা বাঞ্ছিত মাত্রায় আগ্রহী বা জিজ্ঞাসু হয়নি এদের কীর্তি-কৃতি সম্বন্ধে, এরা যে গুণে মানে মাপে মাত্রায় সবক্ষেত্রে বেশি পিছিয়ে রয়েছে তা-ও নয়, কিন্তু চুয়াল্লিশ বছর আগেকার কুলি মজুর মাঝি মাল্লা বেপারী নিকারী তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র পেশাজীবী ও চাষী, যারা ছিল প্রায়শ বর্ণহিন্দুর মজুর সেবক খাতক ও প্রজা– তাদের জ্ঞানী বিদ্বান বুদ্ধিমান, গুণ-মান-যশ-খ্যাতি-ক্ষমতাবান সন্তানদের প্রতি ওই বর্ণহিন্দুদের আজো মানসিক অবজ্ঞা, অশ্রদ্ধা, ঘৃণা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও তাচ্ছিল্য প্রভৃতির রেশ ও লেশ রয়ে গেছে বলেই ওরা আজো ঢাকার কবিতা-গান-গাথা-নাটক, গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ, চিত্রশিল্প ও স্থাপত্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু ও কৌতূহলী নয়।[১] মনে রাখতে হবে বাঙালীসত্তা চেতনার একমাত্র উৎস হচ্ছে বাঙলাভাষা। এটি আমাদের আত্মিকবন্ধন সূত্র। এক্ষেত্রে স্মর্তব্য যে বিভিন্ন রাষ্ট্রে– ইরানে, ইরাকে, তুরস্কে, রাশিয়ায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কুর্দীদের ভাষাগত পার্থক্যই তাদের ঐক্যের স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের পথে একমাত্র বাধা। যেমন আফ্রিকায় ভাষা ও গোষ্ঠীগত স্বাতন্ত্র্যচেতনাই অনেক অনর্থের ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মূল। অভিন্ন ভাষীর অভিন্ন জাতীয়তায় আত্মীয়তার সংস্কৃতিতে ও মননে মৌখিক আস্থা কিন্তু অভিন্ন সত্তাচেতনা রাখে না। আন্তরিক হওয়া আমাদের বিশকোটি বাঙলাভাষীর মানসঐক্যের জন্যেই আবশ্যিক ও জরুরী, যা ভবিষ্যতে কখনো প্রয়োজনীয় হয়েও উঠতে পারে ইহুদীর মতোই। কাজেই ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রিক বাধা ব্যবধান সত্ত্বেও আজ বাঙালী সত্তা অঙ্গীকার করেই আমাদের ভাষিক, আত্মিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্য ও বন্ধন অটুট রাখতে সযত্ন ও প্রয়াসী হতে হবে, হবে আগেকার মন-মত-পথ বদলাতে।

রোকেয়া কবিতা, হালকা গল্প বা রসরচনা, প্রবন্ধ, উপন্যাস লিখেছেন, সবটাই লিখেছেন, অভিন্ন লক্ষ্যে। নারীর পারিবারিক সামাজিক দুঃখ দুর্দশা নিবারণ বা বিমোচন ছিল উদ্দেশ্য। ভাইয়ের সাহায্যে ও পরে স্বামীর সহায়তায় এ উর্দুভাষী মহিলা বাঙলা ও ইংরেজী আয়ত্ত করে বাঙলায় ও ইংরেজীতে বই লিখেছেন। তাঁর ভূমিকা ছিল শাস্ত্রিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পারিবারিক উপযোগবিরহী বিশ্বাস-সংস্কারের বিরুদ্ধে। তিনি ছিলেন একাধারে বিদ্রোহিনী, সমাজসংস্কারিকা, নারী অবরোধ বা পর্দামুক্তি সংগ্রামী, নারীর শিক্ষার প্রচারে প্রসারে নিষ্ঠ, নারীকে পরিবারে ও সমাজে স্বাধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠ ও স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জনে স্বনির্ভর হওয়ার পন্থা আবিষ্কারে প্রেরণাদাত্রী আর পুরুষ সমাজকেও বিবেক বিবেচনার অনুগত হয়ে নারী কল্যাণে ও মুক্তিতে এগিয়ে আসার আহবায়িকা। কাজেই তাঁর রচনামাত্রই প্রচার-প্রচারণা সঞ্জাত। অতএব গুণে মানে মাপে মাত্রায় এর শিল্পমূল্য উঁচুদরের নয় বটে, কিন্তু উদ্দিষ্ট ও অন্বিষ্ট ফল দানের ও প্রাপ্তিতে উপযুক্তই ছিল অর্থাৎ এর সাহিত্য মূল্য যাই হোক, সমকালীন মুসলিম সমাজের সমস্যা সঙ্কট সম্বন্ধে চেতনা দানে এবং প্রতিকার-প্রতিরোধ পন্থা নির্দেশে তাঁর রচনা সার্থক ও সফল হয়েছিল তখনো সীমিত শিক্ষিত মুসলিম সমাজে। তাঁর রচনার ও প্রয়াসের মূল্য তাই তাঁর সমকালীন মুসলিম সমাজে অতুল্য, অনন্য, এবং গোটা ভারতে কোন মহিলার এমনি ঐকান্তিক ও একাগ্রতা ছিল দুর্লভ ও দুর্লক্ষ্য। সেদিক দিয়েও তিনি কেবল বাঙলায় কলকাতায় নয়, সমগ্র ভারতবর্ষে ছিলেন অনন্যা, অসামান্যা।

তাঁর রচনায় মৌলিকতা রয়েছে চিন্তায় চেতনায় মননে এবং উদ্ভাবনে। আর রয়েছে তাঁর অবিশ্বাসী নাস্তিক্য নিরীক্ষার চিন্তার সাক্ষ্যও। যদিও তিনি স্বকালের স্বদেশের

১. ১৯৯১ সনের জুনের বিচিত্রায় ঈদুল আজহা সংখ্যায় কোলকাতার ১২ জন প্রখ্যাত সাহিত্যিক নিঃসংকোচে স্বীকার করেছেন যে তাঁরা বাঙলাদেশের সাহিত্য সম্বন্ধে কোন ধারণা পোষণ করেন না, কেন না তাঁরা পড়েন না। এঁদের মধ্যে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী থেকে দিব্যেন্দু পালিত অবধি প্রখ্যাত লেখকরা রয়েছেন। কোলকাতার সাহিত্য সম্বন্ধে এমন উদাসীনতার কথা ঢাকার কোন লেখক তো নয়ই, পাঠকও লজ্জাবশে উচ্চারণ করবেন না। সাপ্তাহিক বিচিত্র ২০ বর্ষ, ৬ সংখ্যা ২১শে জুন, ১৯৯১।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বসমাজের ভয়ে নিজেও ছিলেন শাস্ত্রমানা পর্দানশীল অবগুণ্ঠনবর্তী মহিলা, তবু আকস্মিক দ্রোহ অভিব্যক্তি পেয়েছে শাস্ত্রদ্রোহিতায় ও অবিশ্বাসে, যেমন নবনূর পত্রিকার ১৩১১ সালের ভাদ্র সংখ্যায় তিনি 'আমাদের অবনতি' নামে প্রবন্ধে লিখেছিলেন সাহস করে : 'আমাদিগকে অন্ধকারে রাখিবার জন্য পুরুষগণ ঐ ধর্মগ্রন্থগুলিকে ঈশ্বরের আদেশপত্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।... পুরাকালে যে ব্যক্তি প্রতিভা-বলে দশজনের মধ্যে পরিচিত হইয়াছেন, তিনিই আপনাকে দেবতা কিংবা ঈশ্বর প্রেরিত দূত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এবং অসভ্য বর্বরদিগকে শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন ক্রমে যেমন পৃথিবীর অধিবাসীদের বুদ্ধি-বিবেচনা বৃদ্ধি হইয়াছে, সেইরূপ পয়গম্বরদিগকে (অর্থাৎ ঈশ্বর-প্রেরিত মহোদয় দিগকে) এবং দেবতাদিগকেও বুদ্ধিমান হইতে বুদ্ধিমত্তর দেখা যায়।

'এই ধর্মগ্রন্থগুলি পুরুষ-রচিত বিধি-ব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে। মুনিদের বিধানে যে-কথা শুনিতে পান, কোন স্ত্রীলোকদের সেরূপ যোগ্যতা কই যে মুনি-ঋষি হইতে পারিতেন? যাহা হউক ধর্মগ্রন্থসমূহ ঈশ্বর-প্রেরিত কি-না তাহা কেহই নিশ্চয় বলিতে পারে না। যদি ঈশ্বর কোন দূত রমণী-শাসনের-নিমিত্ত প্রেরণ করিতেন, তবে সে-দূত বোধহয় কেবল এশিয়ায় সীমাবদ্ধ থাকিতেন না। দূতগণ ইউরোপ যান নাই কেন? আমেরিকা এবং সুমেরু হইতে কুমেরু পর্যন্ত যাইয়া 'রমণীজাতিকে নরের অধীন থাকিতে হইবে' ঈশ্বরের এই আদেশ শুনান নাই কেন? ঈশ্বর কি কেবল এশিয়ারই ঈশ্বর? আমেরিকায় কি তাহার রাজত্ব ছিল না? ঈশ্বরদত্ত জলবায়ুত সকল দেশেই আছে, কেবল দূতগণ সর্বদেশময় ব্যাপ্ত হন নাই কেন? এখন আমাদের আর ধর্মের নামে নত মস্তকে নরের অযথা প্রভুত্ব সহা উচিত নহে। যেখানে ধর্মের বন্ধন অতিশয় দৃঢ়, সেইখানে নারীর প্রতি অত্যাচার অধিক। যেখানে ধর্মের বন্ধন শিথিল সেখানে রমণী প্রায় পুরুষের ন্যায় উন্নত অবস্থায় আছেন, [মতিচুর ১ম খণ্ডে সংকলনকালে এ প্রবন্ধের নাম দেন 'স্ত্রীজাতির অবনতি'। এবং পাঠকের অসন্তোষের ভয়ে এ অংশটুকু বর্জন করেন।] উর্দুভাষী জমিদার কন্যা হয়েও ভাগলপুরী বধূ হয়েও বিভাষা বাঙলা ও ইংরেজী শিখে তিনি মনে প্রাণে বাঙালীই হয়েছিলেন, একালে অবশ্য পারিবারিক ভাষা উর্দু হওয়া সত্ত্বেও কথায়, কাজে, লেখায়, ও সত্তাচেতনায় মনে প্রাণে বাঙালী হতে আরো কিছু গুণী লেখক রাজনীতিককে দেখা যায়। এ ক্ষেত্রে রোকেয়াই প্রথম এবং প্রধান।

তাঁর প্রথম গ্রন্থ সুলতানা'স ড্রিম ইংরেজীতে লেখা (১৯০৫ সন), পরে বাঙলায় তর্জমা করা হয়েছে। নারীস্থান এ গ্রন্থেরই অংশ।

তাঁর মতিচুর ১ম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯০৫ সনে। এটি তাঁর প্রবন্ধ সংকলন গ্রন্থ। এতে রয়েছে সাতটি প্রবন্ধ। নামেই বোঝা যায় তাঁর চিন্তা-চেতনার ধারা। স্ত্রীজাতির অবনতি, নিরীহ বাঙালী, অর্ধাঙ্গী, বোরকা, গৃহ ইত্যাদি। তখন তাঁর বয়স পঁচিশ।

মতিচুর (২য় খণ্ড বের হয় ১৯২১ সনে। এর প্রবন্ধগুলো বিবিধ বিষয়ক। এতে চিন্তা-চেতনার পারম্পর্য নেই। নিতান্ত রচনা সংকলন মাত্র। দশটি লেখা রয়েছে : নূর ইসলাম, সৌরজগৎ, সুলতানার স্বপ্ন (তর্জমা) ডেলিসিয়া হত্যা, [মেরী করেলীর মার্ডার অব ডেলিমিয়ার সংক্ষিপ্ত অনুবাদ] জ্ঞান ফল (গল্প), নারীসৃষ্টি, নাস নেলী, শিশুপালন, মুক্তিফল (গল্প) সৃষ্টিতত্ত্ব।

পদ্মরাগ একটি উপন্যাস। এটি ১৯২৪ সনে মুদ্রিত বটে, তবে এটিও সুলতানা'স ড্রিমের মতো তাঁর বাইশ বছর বয়সের রচনা, অর্থাৎ ১৯০২ সনের দিকে রচিত। এখানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নায়িকা সিদ্দিকা ওর্ফে জয়নব ভাগ্য বিতাড়িতা বা নিরাশ্রয় হয়ে তারিনী ভবন নামের নারী আশ্রমে ঠাঁই পায় এবং গুণবতী এ নারীর গুণপনার পরিচিতিই লক্ষ্য। হতভাগিনী অনাথাদের সেবাব্রতই গ্রহণ করে সে। অবরোধবাসিনী রোকেয়ার শ্রেষ্ঠ অবদান। এতে রয়েছে সাতচল্লিশটি সত্য ঘটনার বেদনা করুণ বয়ান। এগুলোর কয়েকটি ইতিহাসসম্মত এবং কয়েকটি চাক্ষুষ ঘটনা। এসব সত্য ও চাক্ষুষ ঘটনাও মনে হয় রূপকথার মতো। সত্যও যে মাঝে মধ্যে অসম্ভব অস্বাভাবিক অসত্য প্রতীয়মান, কল্পনাকেও হার মানায়, এগুলো তারই প্রমাণ। তাই সমকালে এক অবিশ্বাসী সমালোচকের মত-মন্তব্যের উত্তরে রোকেয়া বলেছিলেন, "শুনিলাম কেহ কেহ বলিতেছেন, অবরোধবাসিনীর ঘটনাগুলি অনেক জায়গায় এতই আজগুবি যে, সত্য ঘটনা বলিয়া বিশ্বাস হয় না। আমি নিজে জানি যে, ইহার একটি অক্ষরও সত্যের সীমা অতিক্রম করিয়া যায় নাই।"

এগুলো ছাড়াও এখনকার সম্পাদিত রোকেয়া রচনাবলীতে এবং রোকেয়া সম্বন্ধে লিখিত গ্রন্থে ও অভিসন্দর্ভে আরো কিছু অপ্রকাশিত রচনা মেলে, মেলে বিশ বাইশটি চিঠিপত্র যা তাঁর মন মনন মেজাজ রুচি সংস্কৃতি জানা-বোঝার সহায়ক।

মুক্তচেতনার জীবনরসতাত্ত্বিক বঙ্কিমচন্দ্র

AMARBOI.COM

প্রবীণের প্রজ্ঞাবশে নয়, অনন্য মনন ও মনীষা নিয়েই যৌবনেই ম্যাকলে [১৮০০-৫৯] বুঝেছিলেন যে শাসন-শোষণ-পীড়নের রাজ্য-সম্রাজ্য চিরকাল থাকবে না, লুণ্ঠিত অর্থ-বিত্তও চিরস্থায়ী হবে না, ক্ষমতার দর্প-দাপট গৌরব-গর্বও হবে কালে বিলুপ্ত। কিন্তু আমরা যদি শিক্ষার মাধ্যমে আমাদের জ্ঞান-প্রজ্ঞা-মনন-সুরুচি-সংস্কৃতির আলো দিয়ে ভারতবাসীকে আধুনিক য়ুরোপীয় নাগরিক করে গড়ে তুলতে পারি, তা হলেই আমরা হব চিরস্মরণীয় গৌরব-গর্বের অধিকারী। `To have found a great people sunk in the lowest depth of slavery and superstition, to have so ruled them as to have made them desirous and capable of all the privileges of citizens, would indeed he a title to glory all our own ... ... There is as empire exempt from all natural causes of decay... ... ... that empire is the unperishable empire of our arts and our morals, our literature and our Laws'— এ বক্তৃতাই লর্ড ম্যাকলে তেত্রিশ বছর বয়সে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে দিয়েছিলেন ১৮৩৩ সনের ১০ই জুলাই তারিখে। তিনি বলেছিলেন সমকালীন বিজ্ঞান-দর্শন-সাহিত্য-ইতিহাস-প্রকৌশল-প্রশাসন-প্রযুক্তি কিংবা রাজনীতি-অর্থনীতি বিষয়ক এক তাক ইংরেজী বইয়ের সঙ্গে গুণে-মানে-মাপে-মাত্রায়-তত্ত্বে-তর্থে-চিন্তা-চেতনার উৎকর্ষে তুলিত হবার যোগ্যতা সত্যই প্রাচীন ও মধ্যযুগের জ্ঞানে-মননের আকর উনিশশতক অবধি রচিত আরবী-ফারসী-সংস্কৃত বইয়ের নেই। এতে স্বদেশ-স্বজাতি অভিমানী ভারতবাসীরা অপমান বোধে ক্ষুব্ধ হয়েছিল। কিন্তু যুক্তি-তর্ক-সাক্ষ্য-প্রমাণে তাঁর ধারণা বা উক্তি খণ্ডন করার সাধ্য ছিল না তাদের। ১৮৩৫ সনে ভারতে শিক্ষার ও প্রশাসনের ভাষা ইংরেজী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করার যুক্তি ও প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গেও তিনি বলেছিলেন, ইংরেজীর মাধ্যমে প্রতীচ্যবিদ্যা পেলে এ দেশের মানুষেরা রক্তে ভারতীয় ও রঙে [তামাটে] কালো থেকেই যাবে বটে, কিন্তু দেশী অঙ্গে নতুন অন্তর তৈরী হবে, চিন্তায়-চেতনায়, মনে-মেজাজে, মতে-মননে-রুচিতে-সংস্কৃতিতে, দায়িত্ববোধে ও কর্তব্যনিষ্ঠায় কালো অবয়বের এক এক জন মানুষ য়ুরোপের প্রাগ্রসর সুনাগরিকের সমকক্ষ হবে। `To form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern, a class of persons Indian in blood and colour but English in taste, in morals and in intellect'. — লর্ড ম্যাকলের এসব উক্তি বা যথার্থ মূল্যায়ন সেদিনকার কোলকাতার তথা ব্রিটিশ ভারতের মানুষের আত্মসম্মান আহত করেছিল। জ্ঞানী, মনীষী মনস্বী লেখক ও ঐতিহাসিক লর্ড ম্যাকলে দাম্ভিক বলে ভারতে নিন্দিত ও কুখ্যাত ছিলেন বিশ শতকের প্রথমার্ধ অবধি। এখনো হয়তো সেই নিন্দা ও দুর্নাম পুরো বিলুপ্ত হয়নি কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখছি স্বজাতির গৌরবগর্বী ম্যাকলের যৌবনের স্বপ্ন ও সাধ বাস্তবেও দিয়েছিল বাঞ্ছিত ফল। ম্যাকলে প্রোক্ত ও বাঞ্ছিত ইংরেজী শিক্ষিতরাই তাঁদের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে বুর্জোয়া বাঙালীর গৌরব-গর্বের সেই 'রেনেসাঁস' এনেছিলেন উনিশ শতকে। যার মোহে নীরদ চৌধুরী আজো মুগ্ধ, যার এ কালিক অনুপস্থিতিতে তিনি ক্ষুব্ধ ও হতাশ। আসলে প্রাগ্রসর প্রতীচ্য জীবন-চেতনা ও জগৎ ভাবনা-প্রতীচ্য বিদ্যাপ্রাপ্ত বাঙালীদের মন ভুলিয়েছিল, চোখ ধাঁধিয়েছিল, পুরোনো বর্জনের এবং নতুন কিছু অর্জনের জন্যে তাদের চিত্তে জেগেছিল অপ্রতিরোধ্য চাঞ্চল্য এবং এ চাঞ্চল্য সমিতি-সংস্থা মাধ্যমে নয়, অভিব্যক্তি পেয়েছিল, পরিব্যক্ত হয়েছিল ব্যক্তির মননে, মনীষায়, কর্মে ও আচরণে। এবং বাঙলার রেনেসাঁসে শিক্ষার চেয়ে সংস্কার স্পৃহাই ছিল বেশি। অনুকরণ-অনুসরণ প্রবণতাই ছিল অধিক। এঁরা প্রায় সবাই ছিলেন মেরামতে প্রয়াসী, আগ্রহী ছিলেন না নতুন কিছু নির্মাণে। এ বিষয়ে অন্যত্র আমাদের বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে।[১] কাজেই এখানে পুনরালোচ্য নয়। যে রেনেসাঁসের গৌরব-গর্ব করছি, তার স্বপ্নদ্রষ্টা ম্যাকলের নিন্দা করা চলে না, বরং কৃতজ্ঞতারই দাবিদার তিনি। বিদ্যায়-বিত্তে-বেসাতে, সমাজে-শাস্ত্রে, চিন্তায়-চেতনায়, সেবায়-সংস্কারে, সাহিত্যে-শিল্পে-বিজ্ঞানে-দর্শনে-ইতিহাসে জ্ঞানের ও সৃষ্টির অনুশীলনে-পরিশীলনে আগ্রহ-উৎসাহ-উদ্যম-উদ্যোগ কোলকাতায় ইংরেজী শিক্ষিতদের জান্যে একটা ক্ষুদ্র ও কৃত্রিম লন্ডন শহর সৃষ্টি করল। ব্রিটিশ কোম্পানী শাসক-প্রশাসকের ও সওদাগরের কৃপা-করুণা-মৈত্রী পুষ্ট বিদ্যা-বিত্ত-বেসাত ঋদ্ধ এবং য়ুরোপীয় সাহিত্য-শিল্প-দর্শন-বিজ্ঞান-সভ্যতা-সংস্কৃতি-মনন-মনীষা-মুগ্ধ কোলকাতাবাসীরা আনন্দিত জীবনে জীবন-জীবিকার, ভোগ-উপভোগের, মননের ও মানসের উৎকর্ষের অশেষ সম্ভাবনার সন্ধান ও আশ্বাস পেয়ে ধন্য ও কৃতার্থ। উনিশ শতকী কোলকাতাবাসীর ইহজাগতিক ও মানসিক মানবিক বিচিত্র চিন্তার ও কর্মের চমক ও ঐশ্বর্য মুক্ত আজকের স্থিতধী বামপন্থীরা 'রেনেসাঁস'-কে একটা শূন্যগর্ভ, রঙিন ফানুস বলেই জানেন এবং মানেন। কেননা, তাঁদের মধ্যে স্বাধীনতার স্পৃহা ছিল না, শোষিত-দলিত মানুষের মুক্তির চিন্তা-চেতনা ছিল না, জমিদার-মহাজন ও ব্রিটিশ বেণের লুণ্ঠন বন্ধ করার প্রয়াস-প্রযত্ন ছিল না, কৃষকবিদ্রোহ সমর্থনে, নীলকরের শোষণ-পীড়ন প্রতিরোধে, সিপাহী বিপ্লব

১. উনিশ শতকে বাঙলার জাগরণের স্বরূপ : 'কালের দর্পণে স্বদেশ' গ্রন্থ, পৃ: ২৬-৪৫। এবং দীপঙ্কর চক্রবর্তী রচিত 'বাংলার রেনেসাঁস এবং রামমোহন রায়' পুস্তকটি দ্রষ্টব্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমর্থনে তাঁদের আগ্রহ ছিল না, তাঁরা ছিলেন কোম্পানী সরকারের অনুগৃহীত ও অনুগত বিদ্যায়-বিত্তে-বেসাতে ঋদ্ধ বিলাসী মান-যশ-খ্যাতি-ক্ষমতালোভী জনসেবক, সমাজ-সংস্কারক কিংবা কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী-দার্শনিক ও শাস্ত্র-ব্যাখ্যাতা। তাঁরা ছিলেন শাহ-সামন্ত-বেণে-বুর্জোয়া শ্রেণীরই প্রতীক-প্রতিভূ। আচণ্ডাল দেশজ মুসলিম জনসাধারণের প্রতি তাঁদের কোন দায়িত্ব-কর্তব্য চেতনাই জাগেনি। তাঁরা স্বশ্রেণীর ও স্বসম্প্রদায়ের সেবায় ও হিতসাধনেই সীমিত রেখেছিলেন তাঁদের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ। এমনকি জাতপাত-এর মতো মানবতাবিরোধী সমাজব্যবস্থা কিংবা চিরস্থায়ী ভূমিব্যবস্থা বিরোধী প্রজাস্বত্ব প্রতিষ্ঠাকামীও ছিলেন না কেউ। যদিও অন্যায়টা বুঝেছিলেন অনেকেই।

উনিশ শতকের অবসানের পরেও চার দিকপালের মতো, চার সুউচ্চ মিনারের মতো, চার নক্ষত্রের মতো নিত্য স্মরণীয়, নিত্য উচ্চারিত, মনীষী রূপে এবং নিত্য আলোচিত জাতীয় মন-মনন-মনীষা-মনস্বিতারূপে, জাতীয় ইতিহাসের নিয়ামক নায়করূপে এবং জাতীয় চিন্তা-চেতনার প্রতীক ও প্রতিভূ রূপে রয়ে গেলেন কেবল চারজন– রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দ। আর সব জোনাকি প্রসঙ্গক্রমে দৃষ্টিগোচর ও স্মরণীয় হন বটে, তবে উক্ত চারজন নক্ষত্র হলে, অন্যরা হন খদ্যোত মাত্র। আর একটি কথা, ওই চারজনও প্রথম বলেই প্রধান, পথিকৃৎ বলেই অনন্য, শিক্ষিতবিরল নিঃসঙ্গ বলেই অতুল্য ও অসামান্য। বিশ শতকের এদিনে শিক্ষিতবহুল সমাজে, বলা চলে বিদ্বান আর্যিণ অরণ্যে বিজ্ঞানে-দর্শনে-সাহিত্যে, চিত্রশিল্পে, স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে-ইতিহাসে-সমাজবিজ্ঞানে, অর্থবিজ্ঞানে, রাজনীতিতত্ত্বে নতুন তথ্যের আবিষ্কারক, নতুন তত্ত্বের উদ্ভাবক, নতুন তাৎপর্যে টীকাভাষ্য প্রণেতার অভাব নেই কোথাও। এতো নক্ষত্রের মধ্যে, এতো বিদ্বানের মধ্যে, এতো গবেষকের মধ্যে তাই আমরা সহজে কাউকে অনন্য, অসামান্য বা অতুল্য বিশিষ্ট বলে চিহ্নিত করতে পারিনে। এ ধারণার ও বিবেচনার অভাবেই নীরদ চৌধুরী ও অন্য অনেকে বাঙালী মনীষার-মননের মন্দাভাব এবং বাঙালীর আবিষ্কার-উদ্ভাবন শক্তির অভাব লক্ষ্য করেন। অথচ মানবসভ্যতা-সংস্কৃতির উৎকর্ষের ক্রমধারা দৃষ্টে আমরা জানি ও বুঝি যে 'অতীতের চেয়ে নিশ্চয়ই ভালো হবেরে ভবিষ্যৎ'।

চরিত্রহীন ও আদর্শরিক্ত হলে তো কথাই নেই, আদর্শনিষ্ঠ চরিত্রবান হলেও আবেগহীন হয়ে জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেক-বিবেচনা প্রয়োগে সব সময়ে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয় না বলেই যে-কোন মানুষের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে মাঝে মধ্যে অসঙ্গতি ও স্ববিরোধ প্রকট হয়ে ওঠে। রামমোহনে এ অসঙ্গতি ও স্ববিরোধ ছিল সবচেয়ে বেশি। আর সবচেয়ে কম ছিল বিদ্যাসাগরে। এ দুজনই মুখ্যত ছিলেন সমাজ-শাস্ত্রকর্মী। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন স্বদেশ-স্বসমাজ ও স্বশাস্ত্র প্রেমী হিতবাদী তাত্ত্বিক-দার্শনিক লেখক-শিল্পী। আর বিবেকানন্দ কালীমাতার ভক্ত সাধক মানবসেবী ভক্তিবাদী রামকৃষ্ণের শিষ্য হয়েও বেদ-গীতা-উপনিষদবিধৃত ব্রাহ্মণ্য মনীষার, সূক্ষ্ম তত্ত্বচিন্তার, দার্শনিক উপলব্ধির এবং সুপ্রাচীন সংস্কৃতির গৌরবগর্বী। সমাজ-শাস্ত্র-জীবিকার দায়বদ্ধতামুক্ত বঙ্কিম যখন স্বাধীনভাবে তাঁর চেতনার গভীরে স্বচ্ছন্দ মানসবিহার করেন, তখন তাঁর মুক্ত জীবনে মুক্ত চেতনা জগৎকে এবং জীবনকে কি চোখে দেখে এবং কিভাবে বরণ করে তা জানা-বোঝার প্রয়াসই হবে এ লেখায় প্রতিভাত। আর তার জন্যে উনিশ শতকী কোলকাতার চিন্তা-চেতনাপ্রবাহ প্রতিবেশ রূপে হল আভাসিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

[২]

বঙ্কিমচন্দ্ররা ছিলেন গম্ভীর প্রকৃতির রাশভারী লোক। নবীনচন্দ্র সেনও পরিচয়ে আগে শুনেছিলেন যে বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর বাপ-ভাইরা দাম্ভিক ও অহংকারী এবং সহজে সাধারণত কাউকে পাত্তা দেন না, সৌজন্যে তাঁদের কার্পণ্য আছে। তাই কবি নবীনচন্দ্র দ্বিধা নিয়ে ভয়ে ভয়ে বর্ধমানে সঞ্জীবচন্দ্রের সঙ্গে পরিচিত হতে গিয়েছিলেন। যৌবনে ভক্ত দীনেশচন্দ্র সেনও বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে বঞ্চিত বা প্রত্যাশিত পাত্তা পাননি। পরবর্তী কালে রাজশেখর বসু সম্বন্ধেও শুনেছি যে তিনিও গম্ভীর প্রকৃতির স্বল্পভাষী লোক ছিলেন, তাঁর মুখেও নাকি হাসি ছিল দুর্লভ। অথচ বঙ্কিমচন্দ্রের বা পরশুরামের মতো রহস্যপ্রিয় রসিক বাঙলা সাহিত্যক্ষেত্রে আজো করগণ্য।

গম্ভীর প্রকৃতির ও বন্ধুবিরল বঙ্কিমচন্দ্র গাম্ভীর্য, সৌজন্য, ভাষার শালীনতা, শৈলীর গুরুত্ব, বাকভঙ্গির শ্লীলতা রক্ষা করে যেসব কথা তাঁর প্রবন্ধে লিখতে পারেননি, অথচ সমাজ-স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে, ব্যক্তিচরিত্র শোধনের প্রয়োজনে, সামগ্রিক, সামষ্টিক ও সামূহিকভাবে মানুষের কল্যাণ লক্ষ্যে লেখা দরকার, সে-ধরনের ব্যঙ্গাত্মক ও ব্যঙ্গার্থক রচনা, কৌতুক ও রহস্য অভিধায় চিহ্নিত করে প্রকাশিত করেন তাঁর 'লোকরহস্য' নামের গ্রন্থে। এসব রচনা চালে লঘু, রসে হালকা, আপাত লক্ষ্যে ব্যঙ্গপরিহাস, কিন্তু তথ্যে, তত্ত্বে ও তাৎপর্যে গভীর ও ব্যাপক। আর এক রকমের রচনাও বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন। যে-কথা সমকালীন শাস্ত্র-সমাজ ও শাসনব্যবস্থা অনুমোদন নয়, শাস্ত্রিক তত্ত্ব-তথ্য বিরোধী, সামাজিক নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ, বিশ্বাস-সংস্কার প্রভৃতির বিপরীত, রাষ্ট্রিক বিধি-বিধান শাসন-প্রশাসন দ্রোহিতা জ্ঞাপক, সেসব কথাই বলেছেন নেশাগ্রস্ত কমলাকান্তের জবানীতে। 'কমলাকান্তে' বঙ্কিমচন্দ্র আসলে নিজের শাস্ত্র-সমাজ-সংসার সব মিথ্যে জেনেই, নিজের প্রাণ-মন-আত্মার সঙ্গে নির্জনে-নিভৃতে কথা বলেছেন। এ হচ্ছে নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলা– স্বগতোক্তি। তাই এতে শাস্ত্রিক সামাজিক নৈতিক নীতি-নিয়মের আবরণ-আভরণ নেই, এ হচ্ছে স্বচ্ছন্দ অনুভব-উপলব্ধির নির্ভর নিরপেক্ষ অভিব্যক্তি। এ হচ্ছে শাস্ত্র-সমাজ-সংসার বন্ধনমুক্ত স্বচ্ছন্দবিহারী স্বরূপে বঙ্কিমচন্দ্র। মুচিরাম গুড়ের রচিত হচ্ছে ব্রিটিশ শাসনপদ্ধতির ত্রুটির প্রতি ও প্রভুর পদলেহী চাটুকার-চামচার প্রতি প্রচণ্ড ঠাট্টা-বিদ্রূপ, পরিহাস, অবজ্ঞা, ঘৃণা ও ক্ষোভ আর মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিতে রয়েছে চাকুরে অবস্থায়ও বঙ্কিমচন্দ্রের বাস্তবে দেখা, জানা বোঝা ও ঘা-খাওয়া জীবনের আক্ষরিক বয়ান বা প্রতিবেদন। এ মুচিরাম ঘটিরামের প্রতি নিচর ব্যঙ্গ, পরিহাস-রসিকতা নয়, এর মধ্যে ঈর্ষার-অসূয়র-চিত্তদাহের তীব্র তীক্ষ্ম হুল ও শূল দু-ই রয়েছে। এ ধরনের রচনায় থাকে কাণ্ডুয়নের সুখ। তবে আদর্শনিষ্ঠ চরিত্রবান বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন যে "সামাজিক যে সকল দোষ, তাহাতে রহস্য লেখকের অধিকার সম্পূর্ণ। ব্যক্তি বিশেষের যে দোষ তাহাতে রহস্য লেখকের কোন অধিকার নাই, – কদাচিৎ অবস্থা বিশেষে অধিকার জন্মে। ... ... এ গ্রন্থে শ্রেণী বিশেষ বা সাধারণ মনুষ্য ব্যতীত ব্যক্তি বিশেষের প্রতি কোন ইঙ্গিত নাই।" [বিজ্ঞাপন, লোকরহস্য] আমাদের ধারণায় বঙ্কিমচন্দ্র এ তিন গ্রন্থেই স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন।

কোঁতে প্রভাবিত বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্বাস করতেন যে "মানুষের যত গুণ আছে, সবই সমাজে আছে। সমাজ আমাদের শিক্ষাদাতা, দণ্ডপ্রণেতা, ভরণ, পোষণ এবং রক্ষা কর্তা, সমাজই রাজা, সমাজই শিক্ষক। ভক্তিভাবে সমাজের উপকারে যত্নবান হইবে।" অতএব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমাজ হিতৈষী ও সেবক বঙ্কিমচন্দ্র এ প্রকার রচনায় ও উপন্যাসে প্রবন্ধের মতোই মনুষ্য সেবাকেই মূল লক্ষ্য করেছেন। 'লোকরহস্য' গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ 'ব্যাঘ্রাচার্য বৃহল্লাঙ্গুল' – এতে তিনটে প্রচণ্ড ঠাট্টা রয়েছে। এ তিনটের একটি হচ্ছে নেতা-বক্তার বুকের ও মুখের কথার অসামঞ্জস্যের প্রতি, দ্বিতীয়টি হচ্ছে অর্থের শক্তির বা মানুষের অর্থ-লিপ্সার প্রতি এবং তৃতীয়টি হচ্ছে পুরোহিতগোষ্ঠীর প্রতি।

"সম্ভ্রান্তলোকের আহারান্বেষণের নাম বিষয় কর্ম, অসম্ভ্রান্তের আহরান্বেষণের নাম জুয়াচুরি, উঞ্ছবৃত্তি এবং ভিক্ষা। ধূর্তের আহারান্বেষণের নাম চুরি। বলবানের আহারান্বেষণের নাম দস্যুতা। লোকবিশেষে ... ... তৎপরিবর্তে বীরত্ব বলিতে হয়।"

"পুরোহিত চালকলাভোজী বঞ্চনা ব্যবসায়ী মনুষ্য বিশেষ। অনেক পুরোহিত মদ্য মাংস খাইয়া থাকেন, অনেক পুরোহিত সর্বভুক। বঞ্চক যদি চালকলা খায়, তাহা হইলেই পুরোহিত হয়।"

"এমন কাজ নাই যে এই দেবীর [মুদ্রাদেবীর] অনুগ্রহে সম্পন্ন হয় না। ... ... এমন দুষ্কর্ম নাই যে এই দেবীর উপাসনায় সম্পন্ন হয় না, এমন দোষ নাই যে ইহার অনুকম্পায় ঢাকা পড়ে না। [আবার] মুদ্রাই মনুষ্য জাতির যত অনিষ্টের মূল।... ... ... মুদ্রা এক প্রকার বিষচক্র।"

'ইংরেজ স্তোত্রে' ইংরেজের ও বাঙালীর চরিত্র স্বল্প কথায় পরিব্যক্ত। দুটোই নিন্দার, তারিফের নয়। কিন্তু যথার্থ মূল্যায়নজাত। আত্মসম্মানবোধহীন বাঙালীর কাঙাল মনের ও চাটুকারিতার চিত্র এটি।

'তোমার [ইংরেজের] সত্ত্বগুণ তোমার প্রণীত গ্রন্থাদিতে প্রকাশ, তোমার রজোগুণ তোমার কৃত যুদ্ধাদিতে প্রকাশ, তোমার তমোগুণ তোমার প্রণীত ভারতবর্ষীয় সম্বাদ পত্রাদিতে প্রকাশ।'

বাঙালীর প্রার্থনা "হে বরদ! আমাকে বর দাও। আমি শামলা মাথায় বাঁধিয়া তোমার পিছু পিছু বেড়াইব। তুমি আমাকে চাকরি দাও। আমি তোমার খোশামোদ করিব, তোমার প্রিয় কথা কহিব, তোমার মনরাখা কাজ করিব। হে মানদ! আমায় টাইটেল দাও, খেলাত দাও।... ... আমি যাহা কিছু করি তোমাকে ভুলাইবার জন্য।... ... ... হে সর্বদ! আমাকে ধন দাও, মান দাও, যশ দাও, আমার সর্ববাসনা সিদ্ধ কর।"

বিদ্রূপের হুল ফুটিয়ে আর ব্যঙ্গের শুল বিদ্ধ করে যে-বাবুচরিত্র বিশ্লেষণে-ব্যবচ্ছেদে বিক্ষত করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র তাতে উপহাস-পরিহাসের আবরণে ও আভরণে জাতিপ্রেমী তীব্র আত্মমর্যাদা বোধসম্পন্ন বঙ্কিমচন্দ্র অপমানবোধে হৃদয়ের রক্তক্ষরা যন্ত্রণাও অনুভব করেছেন প্রচ্ছন্নভাবে। "যাঁহার বাক্য মনোমধ্যে এক, কথনে দশ, লিখনে শত এবং কার্যকালে অদৃশ্য তিনিই বাবু। যাঁহার ইষ্টদেবতা ইংরাজ, গুরু ব্রহ্মাধর্মবেত্তা, বেদ দেশী সম্বাদপত্র এবং তীর্থ ন্যাশনাল থিয়েটার তিনিই বাবু। যিনি মিশনারির নিকট খ্রীস্টিয়ান, কেশবচন্দ্রের নিকট ব্রাহ্ম, পিতার নিকট হিন্দু এবং ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের নিকট নাস্তিক, তিনিই বাবু। যিনি নিজ গৃহে জলখান, বন্ধুগৃহে মদ খান, বেশ্যাগৃহে গালি খান এবং মুনিব সাহেব গৃহে গলাধাক্কা খান তিনিই বাবু।" এ-ই হচ্ছে সংক্ষেপে বঙ্কিমচন্দ্র প্রদত্ত বাবুর সংজ্ঞা।

Bransonism-এ রয়েছে উত্তম্মন্য ইংরেজ শাসক-প্রশাসকের, বিচারকের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। নিতান্ত আপাত লঘু এ রচনায় ইংরেজদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনস্তাত্ত্বিক চরিত্র ইতিহাসগত হয়ে রয়েছে। 'বাঙলা সাহিত্যের আদর'- বাঙলা ভাষা-সাহিত্যে ইংরেজী শিক্ষিতদের অবজ্ঞা অবহেলার জন্যে প্রচ্ছন্ন ক্ষোভই প্রকাশ পেয়েছে।

'লোকরহস্য' গ্রন্থটিতে বঙ্কিমচন্দ্র যে দেশের মাটিকে ও মানুষকে গভীরভাবে ভালোবাসেন, তাদের দুর্বলতায় যে বেদনা বোধ করেন, তাদের কাঙালপনায় যে অপমান বোধ করেন, তাদের চরিত্রহীনতায় যে মানবিক যন্ত্রণা অনুভব করেন, তারই স্বাক্ষর মেলে এসব আপাত লঘু রসাত্মক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক রচনায়।

আমরা জানি বঙ্কিম-পরিবারের সবাই কম বেশি দাম্ভিক ছিলেন, দাম্ভিক মানুষ রাশভারী ও উন্নাসিক হন। বঙ্কিমচন্দ্রও চাকরি জীবনে কখনো উপরস্থ ইংরেজদের প্রতি আর দশজন চাকুরের মতো প্রয়োজনীয় মাত্রায় বিনয়ী, তোয়াজে ও অনুগত ছিলেন না। তাঁর চাকুরি জীবনে কোন কোন বসের সঙ্গে তাঁর লঘু-গুরু দৃশ্য-অদৃশ্য দ্বন্দ্ব লেগেই ছিল। অবশেষে মেয়াদ পূর্তির আগেই অবসর গ্রহণ করেছিলেন 'বসের' সঙ্গে খিটমিটির দরুন। বঙ্কিমচন্দ্রই কমলাকান্ত। শাস্ত্র-সমাজ-মানব সম্বন্ধে চাকুরে বঙ্কিম যেসব কথা বলতে পারেননি, জগৎ ও জীবন এবং সমাজ সম্বন্ধে তাঁর সে-সব অকৃত্রিম অনুভব-উপলব্ধি তিনি কমলাকান্ত নামের আফিমখোর দায়িত্বহীন স্বেচ্ছাচারী পাগলের মুখে দার্শনিক তত্ত্বচিন্তা জড়িত করে পরিব্যক্ত করেছেন। শ্রীভীষ্মদেব খোশনবীসের মুখে কমলাকান্তের বনামে বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মকথার ও অভিজ্ঞতার আভাস রয়েছে গোড়াতেই। কমলাকান্ত কিছু ইংরেজী, কিছু সংস্কৃত জানিত। আসল কথা এই, [চাকরি বাগানোর জন্য] সাহেব সুবোর কাছে যাওয়া আসা চাই। কত বড় মূর্খ, কেবল নাম দস্তখত করিতে পারে— তাহারা তালুক মুলুক করিল [চাকরির বদৌলত] [মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত স্মর্তব্য]। কমলাকান্ত 'পে-বিল'-এ যে চিত্র এঁকেছিল তা হচ্ছে শাসক-শোষক প্রভু ইংরেজের ও শাসিত-শোষিত দরিদ্র বান্দা ভারতবাসীর রূপক। 'কমলাকান্ত বিল বহি লইয়া একটি চিত্র আঁকিল যে, কতকগুলি নাগা ফকির সাহেবের কাছে ভিক্ষা চাহিতেছে, সাহেব দুই চারিটা পয়সা ছড়াইয়া ফেলিয়া দিতেছেন। নীচে লিখিয়া দিল; যথার্থ 'পে-বিল।' তবু চাকুরে বঙ্কিমচন্দ্র গা-পা বাঁচিয়ে কমলাকান্তের দপ্তরটিতে অনিদ্রার অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ আছে বলে উপহাসের মোড়কে মনের কথা বলে গেছেন। চাকুরে বঙ্কিমচন্দ্র 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' প্রজা-শোষণের ফাঁদ জেনেও চাকুরি হারানোর ভয়ে এর বিলুপ্তির জন্যে সমাজবিপ্লববিরোধী, যে-বঙ্কিমচন্দ্র ব্রিটিশ সৃষ্ট, পোষ্য মুৎসুদ্দী জমিদাররা প্রজাপীড়ক শোষক জেনেও জমিদারের বিরুদ্ধে প্রজা বিদ্রোহের আশঙ্কায় মীর মোশাররফ হোসেনের 'জমিদার দর্পণ'– এর প্রচার অবাঞ্ছিত মনে করেন, 'কমলাকান্ত' গ্রন্থে আমরা সে-বঙ্কিমচন্দ্রের সাক্ষাৎ পাই না। এখানে বঙ্কিমচন্দ্র জ্ঞান-প্রজ্ঞা-যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেক ও হৃদয়বান উঁচুমানের মানবিক গুণসম্পন্ন কেবলই প্রমূর্ত মানবতা।

কমলাকান্তে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুভব-উপলব্ধিসমূহ তথা জগৎ ও জীবনচেতনাকণাগুলো উদ্ধৃত করছি :

১. কেহ একা থাকিও না। পুষ্প আপনার জন্য ফুটে না। পরের জন্য তোমার হৃদয় কুসুমকে প্রস্ফুটিত করিও।

২. যৌবনে... পৃথিবী সুন্দরী ছিল... প্রতি পুষ্পে সুগন্ধ পাইতাম, প্রতি পত্রমর্মরে মধুর শব্দ শুনিতাম। প্রতি মনুষ্য মুখে সরলতা দেখিতাম। এখন আশাহত প্রৌঢ় বয়সে অভিজ্ঞতায়... ... ... জানিয়াছি যে, এ অরণ্যে পথ নাই, এ প্রান্তরে জলাশয় নাই, এ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নদীর পার নাই, এ সাগরে দ্বীপ নাই, এ অন্ধকারে নক্ষত্র নাই। এখন জানিয়াছি যে, কুসুমে কীট আছে, কোমল পল্লবে কণ্টক আছে, আকাশে মেঘ আছে, নির্মলা নদীতে আবর্ত আছে, ফলে বিষ আছে, উদ্যানে সর্প আছে, মনুষ্য হৃদয় কেবল আত্মাদর আছে। এখন জানিয়াছি যে, বৃক্ষে বৃক্ষে ফল ধরে না, ফুলে ফুলে গন্ধ নাই, মেঘে মেঘে বৃষ্টি নাই, বনে বনে চন্দন নাই, গজে গজে মৌক্তিক নাই, এখন বুঝিতে পারিয়াছি যে কাচও হীরকের ন্যায় উজ্জ্বল, পিত্তলও সুবর্ণের ন্যায় ভাস্কর, পঙ্কজ চন্দনের ন্যায় স্নিগ্ধ, কাংস্যও রজতের ন্যায় মধুর নাদী।

৩. প্রীতি সংসারে সর্বব্যাপিনী– ঈশ্বরই প্রীতি। প্রীতিই আমার কর্ণে এক্ষণকার সংসার সঙ্গীত।... ... ... মনুষ্য জাতির উপর যদি আমার প্রীতি থাকে, তবে আমি অন্য সুখ চাই না।

৪. নারী তুলিত হয়েছে নারকেলের সঙ্গে, জল [শাঁস] শস্য, মালা, ছোবড়া, দেশহিতৈষী তথা দেশসেবীরা তুলিত হয়েছে বড় বড় রাঙা রাঙা শিমুল ফুলের সঙ্গে। গন্ধমাত্র নাই, কোমলতা নাই, ফলও তুলা হয়ে দেশময় ছড়িয়ে পড়ে। অধ্যাপক ব্রাহ্মণ তুলিত হয়েছেন ধুতুরা ফলের সঙ্গে। আর 'আমাদের দেশের লেখকদিগকে আমি তেঁতুল বলিয়া গণি।' 'এরা সাক্ষাৎ কাষ্ঠাবতার- তেঁতুল কাঠ এবং তেঁতুলের মতো কুসামগ্রী আমি সংসারে দেখিতে পাই না।' আর 'দেশী হাকিমেরা পৃথিবীর কুষ্মাণ্ড। যদি চালে তুলিয়া দিলে, তবেই ইহারা উঁচুতে ফলিলেন– নহিলে মাটিতে গড়াগড়ি যান।'

৫. আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এ তিন প্রকারের উদর পূর্তিই পুরুষার্থ বটে, তবে আধিভৌতিক পূর্তিই বিহিত। আর বিদ্যা, বুদ্ধি, পরিশ্রম, উপাসনা, বল এবং প্রতারণা এই ষড়বিধ পুরুষার্থের উপায়। বুদ্ধি : তুলাকে লৌহ, লৌহকে তুলা বিবেচনা করার শক্তিই বুদ্ধি। ঈষদুষ্ণ অন্নব্যঞ্জন ভোজন, নিদ্রা, বায়ুসেবন, তামাকে ধূমপান, গৃহিণী সম্ভাষণ ইত্যাদিই পরিশ্রম। সুবিধে মতো স্বার্থে দোষকে গুণ, গুণকে দোষ রূপে কারুর নিন্দা বা গুণ কীর্তনই উপাসনা। বলও ছয় প্রকার : মৌখিক অভিসম্পাৎ গালি নিন্দা ইত্যাদি। হাস্ত-কিল, চড় প্রভৃতি পাদ-পলায়নাদি। চাক্ষুষ-রোদনাদি, বালানাং রোদনং বলং। ত্বাচ-প্রহার সহিষ্ণুতা মানস-দ্বেষ-ঈর্ষা, হিংসা প্রভৃতি। প্রতারণা প্রতারক হচ্ছে পণ্যাজীব [পণ্যবিক্রেতা] চিকিৎসক ও ধর্মোপদেষ্টা। তবু এসব উপায়েও উদর পূর্তি পুরুষার্থ অসাধ্য। কাজেই জনহিত 'হিতসাধন' লেবেল এঁটেই উদরপূর্তি সম্ভব। অতএব সকলে দেশের হিত সাধন কর।

৬. প্রাণী প্রবৃত্তির সম্বন্ধে তথা জীবনের স্বপ্ন-সাধ-অন্বিষ্ট সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের এক তীক্ষ্ণ দৃষ্টির অনুভব-উপলব্ধির প্রকাশ ঘটেছে 'পতঙ্গ' নামের শ্রেষ্ঠ রচনাটির মধ্যে। একে সাধারণ মানুষের জীবনদর্শনের নির্যাসও বলা চলে।

"মনুষ্যমাত্রেই পতঙ্গ। সকলেরই এক একটি বহ্নি আছে– সকলে সেই বহ্নিতে পুড়িয়াই মরিতে চাহে সকলেই মনে করে, সেই বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে তাহার অধিকার আছে– কেহ মরে, কেহ কাচে বাধিয়া ফিরিয়া আসে। জ্ঞানবহ্নি, ধনবহ্নি, মানবহ্নি, রূপবহ্নি, ধর্মবহ্নি, ইন্দ্রিয়বহ্নি, সংসার বহ্নিময়। আবার সংসার কাচময়। যে আলো দেখিয়া মোহিত হই... ... ... যাহাতে ঝাঁপ দিতে চাই, কই তাহাতো পাই না– আবার আসিয়া ফিরিয়া বেড়াই।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭. আমি চিরকাল আপনার রহিলাম– পরের হইলাম না, এই জন্যই পৃথিবীতে আমার সুখ নাই।... ... ... আমি পরের জন্য দায়ী হই নাই, সুখে আমার অধিকার কি?... ... ... যদি আত্মপরিবারকে ভালবাসিয়া, তাবৎ মনুষ্য জাতিকে ভালবাসিতে না শিখিয়া থাক। তবে সংসারে ধনে মানে বিবাহে সুখ নাই। [আমার মন]

৮. তুমি বসন্তের কোকিল, বেশ লোক। যখন ফুল ফুটে, দক্ষিণ বাতাস বহে, এ সংসার মুখের স্পর্শে শিহরিয়া উঠে, তখন তুমি আসিয়া রসিকতা আরম্ভ কর। তুমি বসন্তের কোকিল, শীত বর্ষার কেহ নও। তোমার মত আমাদের মাঝখানে অনেক আছেন। যে সুন্দর, তাকেই যাকি, যে ভাল তাকে ডাকি, যে আমার ডাক শুনে তাকেই ডাকি। বসন্তের কোকিল সংসারে সবাই সুদিনের বন্ধু সুখের পায়রা দুর্দিনের সহায় দুর্লভ। [বসন্তের কোকিল]

৯. পুরুষের রূপ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের রূপ অনেক দূর নিকৃষ্ট। ... ... পুরুষে ভূষণ বিনা সন্তুষ্ট থাকে, স্ত্রীলোক ভূষণ বিনা মনুষ্য সমাজে মুখ দেখাইতে লজ্জা পয়। অতএব স্ত্রীজাতি সৌন্দর্য বিষয়ে নিকৃষ্ট। (স্ত্রীলোকের রূপ)।

১০. এত দিনে জানিলাম মনুষ্য জাতি নিতান্ত স্বার্থপর, ... যে সকল আশা ভরসা হৃদয় ক্ষেত্রে রোপণ করিয়া বিশ্বাস জলে পুষ্ট কর, সকলই বৃথা। ... ... সে (প্রসন্ন গোয়ালিনী) বুঝে না যে গোরু কাহারও নহে, গোরু গোরুর নিজের দুধ যে খায় তারই।... ... ... এ বিশ্বসংসার একটি বৃহৎ বাজার– সকলে সেখানে আপনাপন দোকান সাজাইয়া বসিয়া আছে। দোকানদার খরিদদারে কেবল যুদ্ধ, কে কাকে ফাঁকি দিতে পারে। সস্তা খরিদের অবিরত চেষ্টাকে মনুষ্য জীবন বলে। যশের পণ্যশালা। বিক্রেয় অনন্তযশ। বিক্রেতা কাল মূল্য জীবন। [বড় বাজার।]

১১. 'মনুষ্য মনুষ্যের জন্য হইয়াছিল– এক হৃদয় অন্য হৃদয়ের জন্য হইয়াছিল, সেই হৃদয়ে হৃদয়ে সংঘাত, হৃদয়ে হৃদয়ে মিলন, ইহা মনুষ্য জীবনের সুখ। ইহজন্মের মনুষ্য হৃদয়ে একমাত্র তৃষ্ণা, অন্য হৃদয়-কামনা।' এর পরে কমলাকান্ত আকস্মিকভাবে বিষয়ান্তরে গিয়ে 'একটি গীত' রচনাটিতে কমলাকান্তরূপী বঙ্কিম ভারতে-বঙ্গে মুসলিম বিজয়ের জন্য ক্ষোভ-বেদনা-লজ্জা-গ্লানি-অপমান বোধ করেছেন। স্মরণ করেছেন হিন্দুগৌরব-হিন্দুঐতিহ্য মুসলিম বিজয়কে হিন্দুর দুর্ভাগ্য ও পরাধীনতা বলে জেনেছেন। অন্যত্র অবশ্য প্রবন্ধে তিনি পাঠান আমরকে বাঙলার স্বাধীনতার, উন্নতির ও ঐশ্বর্যের যুগ বলে মেনেছেন। আবার শাসক বিদেশী হলেও দেশ পরাধীন হয় না তেমন মতও প্রকাশ করেছেন। ভারতবর্ষের [স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা] শাসনকর্তা ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় হইলেও রাজ্য পরতন্ত্র হইল না। পক্ষান্তরে শাসনকর্তা স্বজাতীয় হইলেও রাজ্য যে স্বতন্ত্র হয় না তাহারও অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

১২. কমলাকান্ত গ্রন্থের আর একটি শ্রেষ্ঠ রচনা 'বিড়াল'। এটিও বঙ্কিমচন্দ্রের তীক্ষ্ণদৃষ্টির, মনুষ্য চরিত্র সম্বন্ধে সূক্ষ্মচেতনার ও অভিজ্ঞতার এবং প্রবলের দুর্জনের বাহুবলে জনবলে শাসনে-শোষণে-পেষণে-পীড়নে দুর্বলের দুস্থতা-নিঃস্বতা-নিরন্নতার যে প্রসার তিনি তা অনুভব করেছেন। 'সাম্য' এ বোধের, এ অনুভব-উপলব্ধির দান। এ রচনাটির শৈল্পিক লাবণ্য ও রম্যতাও বিশিষ্ট।

'কেহ মরে বিল ছেঁচে, কেহ খায় কই। দুধ আমার বাপেরও নয়। দুধ মঙ্গলার,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুহিয়াছে প্রসন্ন। অতএব দুগ্ধে আমার যে অধিকার, বিড়ালেরও তাই। সুতরাং রাগ করিতে পারি না।

একটু বিচার করিয়া দেখ দেখি। এ সংসারে ক্ষীর, সর, দুগ্ধ, দধি, মৎস্য, মাংস, সকলই তোমরা খাইবে, আমরা কিছু পাইব না কেন? তোমরা মনুষ্য, আমরা বিড়াল প্রভেদ কি? তোমাদের ক্ষুৎপিপাসা আছে, আমাদের কি নাই? দেখ আমি চোর বটে কিন্তু আমি কি সাধ করিয়া চোর হইয়াছি? খাইতে পাইলে কে চোর হয়। কিন্তু তাঁহাদের প্রয়োজনাতিরিক্ত ধন থাকিতেও চোরের প্রতি যে মুখ তুলিয়া চাহে না, ইহাতে চোরে চুরি করে। অধর্ম চোরের নহে, চোরে যে চুরি করে সে অধর্ম কৃপণ ধনীর। তেলা মাথায় তেল দেওয়া মনুষ্য জাতির রোগ– দরিদ্রের ক্ষুধা কেহ বুঝে না। ধনীর দোষেই দরিদ্র চোর হয়। পাঁচশত দরিদ্রকে বঞ্চিত করিয়া একজনে পাঁচশত লোকর আহার্য সংগ্রহ করিবে কেন? অতিরিক্ত অংশ তাহা দরিদ্রকে দিবে না কেন? যদি না দেয় তবে দরিদ্র অবশ্য তাহার নিকট হইতে চুরি করিবে, কেন না অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্য এ পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই।... ... ... থাম থাম মার্জারপণ্ডিত। তোমার কথাগুলি ভারি সোসিয়ালিষ্টিক। সমাজ বিশৃঙ্খলার মূল। সমাজের ধনবৃদ্ধির অর্থ ধনীর ধনবৃদ্ধি। ধনীর ধনবৃদ্ধি না হইলে দরিদ্রের কি ক্ষতি? আমি বুঝাইয়া বলিলাম যে সামাজিক ধনবৃদ্ধি ব্যতীত সমাজের উন্নতি নাই। বিড়াল রাগ করিয়া বলিল যে, 'আমি যদি খাইতে না পাইলাম, তবে সমাজের উন্নতি লইয়া কি করিব? যে বিচারক চোরকে সাজা দিবেন, তিনি আগে তিন দিবস উপবাস করিবেন। তাহাতে যদি তাঁহার চুরি করিয়া খাইতে ইচ্ছা না করে, তবে তিনি স্বচ্ছন্দে চোরকে ফাঁসি দিবেন।'

১৩. কমলাকান্তের পত্রেও লঘুচিত্ত আনাড়ি, অবিদ্বান লেখকদের লেখায় অজ্ঞতার ও অনধিকার চর্চার প্রতি বিদ্রূপ রয়েছে। বিশেষ করে মেকলের ইতিহাসকে নভেলের সঙ্গে তুলিত করেছেন আর ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেছেন মাইকেল মধুসূদনের ব্যর্থ অনুকারকদের।

১৪. আমি রাজা, না খোশামুদে, না জুয়াচোর, না ভিক্ষুক, না সম্পাদক যে আমাকে পলিটিকস লিখিতে বলেন? কোথায় আমার এমন স্থূলবুদ্ধির চিহ্ন পাইলেন যে, আমাকে পলিটিকস লিখিতে বলেন? আমি এমন স্বার্থপর চাটুকার অদ্যাপি হই নাই যে পলিটিকস লিখি।... ... ... সপ্তদশ অশ্বারোহী মাত্র যে জাতিকে জয় করিয়াছিল তাহাদের পলিটিকস নাই। 'জয় রাধে কৃষ্ণ। ভিক্ষা দাও গো।' – ইহাই তাহাদের পলিটিকস্। অভিন্ন অন্য পলিটিকস্ যে গাছে ফলে তাহার বীজ এ দেশের মাটিতে লাগিবার সম্ভাবনা নাই।... ... [কুকুর পলিটিশিয়ানের] পলিটিক্যাল এজিটেশন সফল হইল। কলুপুত্র একখানা মাছের কাঁটা উত্তম করিয়া চুষিয়া কুক্কুরের দিকে ফেলিয়া দিল। কুক্কুর আগ্রহ সহকারে আনন্দে উন্মত্ত হইয়া, তাহা চর্বণ, লেহন, গেলন ও হজম করণে প্রবৃত্ত হইল। আনন্দে তাহার চক্ষু বুজিয়া, আসিল। কলুর ছেলে (পরে) একমুষ্টি ভাত কুকুরকে ফেলিয়া দিল। ... ... কুকুর সেই সুখে অন্নমুষ্টি ভোজন করিতে লাগিল। ... ... ততক্ষণ এক বৃহদাকার বৃষ আসিয়া কলুর বলদের সেই খোলবিচালিপূর্ণ নাদায় মুখ দিয়া জাবনা খাইতেছিল। ... ... কলু গৃহিণী এই দস্যুতা দেখিতে পাইয়া এক বংশখণ্ড লইয়া... ... ... তৎপ্রতি ধাবমানা হইলেন, কিন্তু বৃষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৃহৎ শৃঙ্গ হেলাইয়া তাঁহার হৃদয় মধ্যে শৃঙ্গাগ্রভাগ প্রবেশের সম্ভাবনা জানাইয়া দিল। কলুপত্নী তখন রণে ভঙ্গ দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। আমি ভাবিলাম যে, এও পলিটিকস। দুই রকমের পলিটিকস দেখিলাম– এক কুকুর জাতীয়, আর এক বৃষ জাতীয়। বিস্‌মার্ক এবং গর্শাকফ এই বিশেষ দরের পলিটিশিয়ান। আর উল্‌সি হইতে আমাদের পরমাত্মীয় মুচিরায় রাম বাহাদুর পর্যন্ত অনেকে এই কুকুরের দলের পলিটিশিয়ান।'– এ হচ্ছে উনিশ শতকের কুকুর ও বৃষ প্রকৃতির পলিটিশিয়ানের তথ্য ও সত্যনিষ্ঠ আলেখ্য। এ কালে ও এ মুহূর্তেও আমাদের সমাজ-রাজনীতি-রাষ্ট্রনীতি প্রায় বঙ্কিম-উক্ত অবস্থায় ও অবস্থানে রয়েছে। [পলিটিকস]

১৫. বাঙ্গালীবাবু যিনিই দুই চারিটা ইংরেজি রোল শিখিয়াছেন তিনি অমনি উমেদওয়ার রূপে পরিণত হইয়া দরখাস্ত বা টিকিট হাতে দ্বারে দ্বারে ঘ্যান ঘ্যান– ডাঁশমাছির মত খাবার সময়ে, শোবার সময়ে, দাঁড়াবার সময়ে, দিনে রাত্রে, প্রাহ্নে, অপরাহ্নে, মধ্যাহ্নে সায়াহ্নে– ঘ্যান ঘ্যান। তোমরা না জান মধুসংগ্রহ করতে, না জান হুল ফুটাইতে, কেবল ঘ্যান ঘ্যান পার।... ... ... মধু করিতে শেখ, হুল ফুটাইতে শেখ। [বাঙালীর মনুষ্যত্ব]

১৬. বুড়ো বয়সের কথায়– যাঁহারা আর যুবা নাই বলিয়াই বুড়া– তাঁদের হৃদয় সঞ্জাত করুণ কান্না অভিব্যক্তি পেয়েছে দুটো পরিচ্ছেদে : যে কুসুমদাম এ জীবনকানন আলো করিত তাহা খসিয়া পড়িয়াছে। যে মুখমণ্ডল সকল ভালবাসিতাম, একে একে অদৃশ্য হইয়াছে।... কই আর এ ভগ্ন মন্দিরে, এ ভাঙ্গা মজলিসে সে উজ্জ্বল দীপাবলী কই? কেবল মুখ নহে– হৃদয়। সে সরল, সে ভালবাসাপূর্ণ, সে বিশ্বাসে দৃঢ়, সৌহার্দ্যে স্থির, অপরাধেও প্রসন্ন, সে বন্ধু হৃদয় কই? নাই। 'অন্য পরিচ্ছেদে রয়েছে' যেখানে আগে ভালবাসার প্রত্যাশা করিতে, এখন সেখানে তুমি কেবল ভয় বা ভক্তির পাত্র। যে পুত্র তোমার যৌবন কালে তাহার শৈশবকালে তোমার সহিত এক শয্যায় শয়ন করিয়াও অর্ধনিদ্রিত অবস্থাতেই ক্ষুদ্রহস্ত প্রসারণ করিয়া তোমার অনুসন্ধান করিত, সে এখন লোক মুখে সন্ধান লয়, পিতা কেমন আছেন। ইত্যাদি।

১৭. কমলাকান্তের বিদায়ও করুণ : [যে বয়সে] দপ্তর লিখিয়াছিলাম, এখন সে বয়স, সে রস নাই– এখন সে রস ছাড়া কথা কেহ শুনিবে কি? আর সে বসন্ত নাই এখন গলাভাঙ্গা কোকিলের কুক্কুরর কেহ শুনিবে কি? ... ... সুখ গিয়াছে আশা কেন? জন্মিবামাত্র কাঁদিয়াছিলাম, কাঁদিয়া মরিব।

১৮. জোবানবন্দীতে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি, উকিলের, তাঁর পেশার ও ময়লা জামা-শামলার প্রতি বিদ্রূপ রয়েছে। গোরু [ছাত্র] প্রথম বয়সে গুরুমহাশয়ের, মধ্য বয়সে [স্বামী হিসেবে] স্ত্রী জাতির, শেষ বয়সে [উত্তরাধিকারীর], এবং দড়ি ছিঁড়িবার সময় কারও নয়। যে বেণুর দুগ্ধ পান করে সেই যথার্থ অধিকারী। এই হলো ভীষ্মদেব ঠাকুরের Hindu Law আর ইহাই এখনকার উইরোপের International Law, যদি সভ্য ও উন্নত হইতে চাও, তবে কাড়িয়া লইবে। গোশব্দে ধেনুই বুঝ আর পৃথিবীই বুঝ, ইনি তস্করভোগ্য। সেনান্দর হইতে রণজিৎ সিংহ পর্যন্ত সকল তস্করই ইহার প্রমাণ। Right of Conguest যদি একটা Right হয়, তবে Right of theft কি একটা Right নয়?' কমলাকান্তের জোবানবন্দীর মধ্যে Wit ও humour-এর যে দীপ্তি, সূক্ষ্মতা এবং বুদ্ধির লীলা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সাক্ষ্য-প্রমাণ রয়েছে, তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাহ্যত দাম্ভিক, গম্ভীর রাশভারী, বিদ্বান মনন-চিন্তানশীল স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় ব্যক্তিত্ব সুবিচারক, আত্মমর্যাদা-সচেতন শ্রদ্ধা-ভক্তি-ভয় জাগানো ব্যক্তি বঙ্কিমকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিচয়ে আমাদের সুমুখে উদ্ভাসিত করে। বজ্রদপি কঠোরাণি এবং কুসামাদপি কোমলানি আর রসে রহস্যে কৌতুকে লঘু পরিহাস নৈপুণ্যে তিনি ছিলেন অনন্য, অসামান্য ও অতুল্য তাঁর কালে।

১৯. কাকাতুয়া– যার নাই, তাকে যদি লোকে না দেবে ত সে কোথায় যাবে!... ... ... আপনার বেলা লীলা, পাপপুণ্য পরের বেলা।... ... ... দেখ কথায় কথায় ছল ধরিলে পুরাতত্ত্ব শেখা যায় না। শিবের কপালে চোখ হইল কেমন করিয়া? হিমালয় পর্বতটা দুর্গার বাপ হইল কেমন করিয়া? কুমারী মেরীর গর্ভে যিশুর জন্ম হইল কেমন করিয়া?

২০. নিন্দুকরা বলে যে আমরা [বাঙালীরা] সকলেই ভিক্ষা করি। আমাদের ধর্মে ভিক্ষা, কর্মে ভিক্ষা, তাপে ভিক্ষা, হর্ষে ভিক্ষা, সকল উপলক্ষেই ভিক্ষা, ভিক্ষা আমাদের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়াছে। অধিক কি আমরা যে দেবাদিদেব মহাদেব কল্পনা করিয়াছি তাঁহাকেও ভিক্ষুক সাজাইয়া তাঁর স্কন্ধে ঝুলি ঝুলাইয়া দিয়াছি। তাঁহাকে ভিক্ষুক ভাবিয়া পূজা করি। আমাদের উপযুক্ত দেবতা বটে। [বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১২৮০ বঙ্গাব্দ]

আমরা সর্বসংস্কারমুক্ত দেশ-কাল সমাজ শাস্ত্র সংস্কৃতি বিস্মৃত মুক্তচেতনার ও চিন্তার কৌতুকপ্রিয়, রসিক, জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে বিজ্ঞ-অভিজ্ঞ বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাধীন মানস-বিহার, তাঁর লঘু-গুরু স্বপ্ন-সাধ-রুচির ঠিকানা, তাঁর লোকচরিত্র চেতনার, তার লোকচরিত্রচেতনার তাঁর তীক্ষ্ণদৃষ্টির, সূক্ষ্ম অনুভবের, দার্শনিক উপলব্ধির আর পরিহাসপ্রিয়তার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপপ্রিয়তার পরিচয় পাই লোকরহস্য, কমলাকান্ত ও মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিতে– এ বঙ্কিম আমাদের নন্দিত সাহিত্যশিল্পী নন, স্বদেশ স্বজাতি, স্বধর্মনিষ্ঠ মনীষী নন, মানবপ্রেমী, দেশসেবী চিন্তানায়ক নন, এ মানুষ মুক্ত মন-বুদ্ধি-যুক্তি-বিবেক-বিবেচনা আর জ্ঞান-প্রজ্ঞা অভিজ্ঞতা লব্ধ নির্মোহ দৃষ্টি দিয়ে তাঁর চারপাশের জীবনযাত্রাকে আনন্দিতচিত্তে ক্রীড়াদর্শকের মন নিয়ে প্রত্যক্ষ করেছেন। এখানে তিনি কেবলই একজন কৌতুক ও কৌতূহলী রসিক ব্যক্তিমানুষ। অবশ্য ক্বচিৎ স্বদেশ-স্বজাতি চেতনাও তাঁকে তাঁর অজ্ঞাতেই যেন কোথাও কোথাও প্রভাবিত করেছে– তা সামান্যই।

বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে আরো কিছু কথা

বাঙলাদেশে উনিশ শতকে প্রতীচ্যপ্রভাবে চারজন অসাধারণ পুরুষ আপন আপন মননে মনীষায় এবং বর্ণহিন্দু সমাজ সংস্কারে, সংগঠনে, তথা ভাব-চিন্তা-কর্ম আচরণে এবং কথায় ও লেখায় অসামান্য এবং অনন্য হয়ে ধন্য বরেণ্য, চিরস্মরণ্য ও ইতিহাসগত হয়ে রয়েছেন। এঁরা হলেন রামমোহন রায় (১৮৭৪-৩৩), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১),

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-৯৪) এবং নরেন্দ্রনাথ দত্ত ওর্ফে স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২)। এক্ষেত্রে অনুপস্থিত উনিশ শতকের রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মুখ্যত কবি। প্রতীচ্যপ্রভাবিত সমকালীন ইহজাগতিক সামাজিক চিন্তা-চেতনায় তখনো ওই চারজন স্ব স্ব ক্ষেত্রে অতুল্য ও অনন্য বটে, তবে প্রতীচ্যশিক্ষা প্রভাবে অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২১-৯৭), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫), কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-৮৪) এবং হিন্দু কলেজের ডিরোজিয়ো (১৮০৯-৩১) প্রভাবিত কয়েকজন ছাত্র এঁদের ভাব-চিন্তা-কথা-কাজ আন্দোলনের পরিবেশ ও প্রতিবেশ তৈরি করে দিয়েছিলেন কোলকাতার শিক্ষিত সমাজে। আস্তিক-নাস্তিক-নিরীশ্বর-প্রত্যক্ষবাদী-অজ্ঞেয়বাদী-যুক্তিবাদী বহু বহু প্রতীচ্য জ্ঞানপ্রাপ্তরাও ছিলেন এঁদের অনুরাগী সমর্থক সমঝদার পাঠক আর সহকারী সহযোগী। তাতেই একটা প্রগতিশীল মন-মনন চিন্তা-চেতনা ঋদ্ধ শিক্ষিত সমাজ কোলকাতায় দ্রুত গড়ে উঠতে পেরেছিল উঠতি বেণে-বুর্জোয়া-আমলা-দুর্নীতিবাজ প্রভৃতির বহুল উপস্থিতি সত্ত্বেও।

কোন মানুষেরই ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ-স্বভাব-চরিত্র-সংযম-সহিষ্ণুতা, বোধ-বুদ্ধি-যুক্তি-জ্ঞান-প্রজ্ঞা নিখাদ নিখুঁত হতে পারে না। শৈশবে-বাল্যে শাস্ত্রিক বিশ্বাস-সংস্কারে আচারিক ও আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক কল্পনাজাত ধারণায় পুষ্ট এবং লাভ-ক্ষতিচেতনাপ্রসূত ভয়-ভক্তি-ভরসা বিজড়িত জীবনের প্রয়োজনে তুকতাক, ঝাড়ফুঁক, বাণ-উচ্চাটন, মন্ত্র-মাদুলী, তাবিজ-কবচ, তাগা-আংটি যোগে অরিদেবতার রোষমুক্তি, এবং মিত্রদেবতার করুণা-কৃপা প্রাপ্তি অপরিহার্য বলে দৃঢ় ধারণা জন্মে পারিবারিক-সামাজিক-শাস্ত্রিক ও সাংস্কৃতিক জীবন যাপনে। তাই মানুষ নির্মোহ, বা প্রভাবমুক্ত চিন্তা-চেতনানির্ভর জীবন যাপনে অসমর্থ। সাধারণ মানুষ তো এ আশৈশবের মগজ-ধোলাই মুক্ত হতেই পারে না, যুক্তিবাদী জ্ঞানী মনীষীরাও লঘু-গুরুভাবে এ প্রভাবের রেশ ও লেশমুক্ত থাকে না, তাই মানুষের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ সমকালীন দেশ-কাল-অঞ্চল-আবহাওয়ার প্রভাব মুক্ত হতেই পারে না। স্বকাল-স্বদেশ-স্বসমাজ-স্বশাস্ত্র এবং আবাল্য অর্জিত বিশ্বাস-সংস্কারই তার জীবন নিয়ন্ত্রণ করে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আমাদের ধারণায় উনিশ শতকের সবচেয়ে উঁচুমানের জগৎ-চেতনার ও জীবন-ভাবনার অধিকারী মনীষী ছিলেন। তিনি দেশ-কালের দাবি জানতেন ও বুঝতেন, কিন্তু তাঁর শাস্ত্রিক, সামাজিক, পারিবারিক, আর্থিক এবং পদগত অবস্থা ও অবস্থান তাঁকে জানা-বোঝা প্রকাশে এবং মানা-না-মানার জ্ঞান-বুদ্ধি, শক্তি-সাহস-উদ্যম-উদ্যোগ থেকে বিরত রেখেছিল অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর ব্যক্তিগত বাস্তব প্রয়োজনচেতনা। বিপদাশঙ্কা তাঁকে অনেক বিষয়েই দ্রোহী হতে দেয়নি। এর প্রমাণ মেলে তাঁর 'লোকরহস্য' নামের রম্য রচনায়, আর 'কমলাকান্ত' নামের বেপরওয়া রসিকতার ছলে বলা জীবন ও জগৎ সম্বন্ধীয় আপাত পরিহাসের আবরণে ও আভরণে ঢাকা দার্শনিক চেতনায়। আর প্রবন্ধে পাঠান রাজত্বের তারিফ এবং মুঘল সাম্রাজ্যের বাঙলা-শোষণের নিন্দা আছে। উপন্যাসে ও প্রবন্ধে বঙ্কিম বাঙলার ও ভারতের বাস্তব প্রতিবেশ-পরিবেশ সচেতন ছিলেন। উপদ্রব-উপসর্গ হলেও মুসলিমবিহীন বাঙলা বা ভারত কল্পনা করেননি। এবং তুর্কী-মুঘল শাসকগোষ্ঠীকে ও দেশজ মুসলমানকে অন্যদের মতো একার্থক ও একাত্মক ভাবেননি। হিন্দুয়ানীর প্রবক্তা ভূদেব মুখোপাধ্যায় বলেছেন, 'ভারতভূমি হিন্দু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাতীয়দেরই মাতৃভূমি। আর মুসলমানেরা ইহারই পালিত সন্তান। এক মাতারই একটি গর্ভজাত ও অপরটি স্তন্যপালিত। দুটি সন্তানেই কি ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ হয় না?'

[স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস, ১৮৯৫ সন]

সমুদ্দেশে উচ্চারিত হলেও এতে কেবল তুর্কী-মুঘল শাসকগোষ্ঠীকে লক্ষ্যে রাখা হয়েছে। দেশজ মুসলিমরা বাদ গেছে। হিন্দু-বৌদ্ধজ ওইসব মুসলিম এই মাটিরই সন্তান, হিন্দুর মতোই।

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ছয়শ বছরের তুর্কি-মুঘল শাসকগোষ্ঠীর উপস্থিতিকে ভারতে নিশীথ রাতের দুঃস্বপ্ন বলে অভিহিত করে ক্ষোভ-জ্বালা ও উপেক্ষা পরিব্যক্ত করে ছেড়েছেন। অথচ গোটা ভারত তুর্কী মুঘল শাসনে কখনো ছিল না। তথাকথিত হিন্দুশাসনে প্রজার কোন্ রামরাজ্যে বাস ছিল অর্থসম্পদে, নির্বিঘ্ন-নিরুপদ্রব ছিল জীবন, সে-খবরও এখনকার দেশী ঐতিহাসিকরা আজও আবিষ্কার করতে পারেন নি। তা ছাড়া ছয়শ বছরের তুর্কী-মুঘল শাসনকালে বিচার ছিল কাজির হাতে, রাজস্ব আদায় ছিল হিন্দুর দায়িত্ব আর সিপাহী সেনাপতি ছিল হিন্দু ও মুসলমান। ষোলশতক অবধি গাঁ-গঞ্জে মুসলিম সংখ্যা ছিল নগণ্য এবং তারা ছিল অন্ত্যজ শ্রেণীর। আজো হিন্দুদের পদবীগুলো স্মরণ করিয়ে দেয় যে প্রশাসন ছিল তাদের হাতে আর রাজধানীতে এবং দেশের সর্বত্র তারাই ছিল মুখ্য বাসিন্দা। তুলনায় মুসলিম সংখ্যা আজো নগণ্য, কাজেই স্বল্প সংখ্যক মুসলিম শাসকের হিন্দু-পীড়নের সুযোগ ছিল কি?

উনিশ-বিশ শতকে বঙ্কিমচন্দ্রের মতো এমন সামূহিক, সামগ্রিক ও সামস্টিক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি আবির্ভূত হন নি। রামমোহন রবীন্দ্রনাথকে স্মরণে রেখেও একথা বলা চলে। বদ্ধতা, সংকীর্ণতা-অজ্ঞতা, দৃষ্টির আচ্ছন্নতা তখনকার হিন্দুর সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রাতিবেশিক অবস্থার ও অবস্থানের প্রসূন মাত্র। তাই জেনে-বুঝেও অনেক সমস্যার মীমাংসা দেননি নিজের মুখে বা লেখায়। কিন্তু জানিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন অন্যদের দ্রোহ করার, আন্দোলন করার, দাবি করার জন্যে। যেমন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে প্রজার ক্ষতি হয়েছে বলেও, বলছেন আমরা সমাজবিপ্লব চাই না। (কেননা তিনি চাকুরে কিন্তু অন্যরা চাইতে বাধা কোথায়? ভারতে কি কেবল বঙ্কিমচন্দ্রই নেতা?) বঙ্কিমের উপন্যাসে যেমন, রবীন্দ্রনাথের গল্পে-উপন্যাসেও সাধারণ চাষী-মজুরের কথা নেই, আছে জমিদার ও ভদ্রলোকের কথা। কারণ উদীয়মান সূর্যের কিরণ যেমন কাঞ্চনজঙ্ঘার শোভা, প্রথম যুগের সাহিত্যের বিষয় ছিল তেমনি শাহ্-সামন্তের, জমিদারের রূপকথা, ঐশ্বর্য, বিলাস, খ্যাতি-ক্ষমতা, দর্প-দাপট, শক্তি-সাহস বর্ণনাই ছিল লক্ষ্য। রোমাঞ্চ ও রোমান্স সৃষ্টির গরজে। পাঠকতো তখনো বাস্তব জীবনসচেতন ছিল না। একে ভাবত প্রাত্যহিকতায় তুচ্ছ ও জিজ্ঞাসা-কৌতূহলের ছিলই না কিছু। 'জীবন যাহার অতি দুর্বহ দীন দুর্বল সবি/রসাতলে বসি গড়িছে স্বর্গ সে জন বটে কবি।' [মোহিতলাল মজুমদার] এ-ই ছিল কম্যুনিস্ট প্রভাব ছড়িয়ে পড়ার আগে সাহিত্যের শিল্পের বিষয় সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা। সাহিত্যে স্বপ্নের, সাধের ও অপূর্ত কাঙ্ক্ষার রূপায়ণই ছিল বাঞ্ছিত আদর্শ, কিন্তু বঙ্কিম বাস্তবে তাঁর বয়োকনিষ্ঠ সিভিলিয়ান আর্থিক জীবনের ইতিবৃত্ত রচয়িতা রমেশচন্দ্র দত্তের চেয়েও বেশি বুঝেছিলেন যে 'দেশের মঙ্গল কাহার মঙ্গল? তুমি আমি কি দেশ? তুমি আমি দেশের কয়জন? আর এই কৃষিজীবী কয়জন? তাহাদের ত্যাগ করিলে দেশে কয়জন থাকে? হিসাব করিলে তাহারাই দেশ– তোমা হইতে আমা হইতে কোন্ কার্য হইতে পারে? কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সকল কৃষিজীবী ক্ষেপিলে কে কোথায় থাকিবে? কি না হইবে? যেখানে তাহাদের মঙ্গল নাই, সেখানে দেশের কোন মঙ্গল নাই।' পরেও কম্যুনিস্টরা কি মার্কসপন্থীরা কি এর চেয়ে বেশি কিছু বলেছেন বা ভেবেছেন? অবশ্য তাঁর সাম্য মার্কসবাদসম্মত নয় বটে, কিন্তু তাঁর পরের প্রজন্মের রবীন্দ্রনাথ কি দুস্থ চাষী-মজুরের কথা সত্তর বছর বয়সের পরেও রাশিয়া দেখেও ভেবেছেন? 'যে জন আছে মাটির কাছাকাছি/সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি' কথাটা কি বিদ্রূপ না ব্যাজস্তুতি? যিনি কল্পনায় চেতনায় মননে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালে প্রাচীন ভারতের আরণ্য জীবনে বিহার বিচরণ করেন, তিনি তাঁর নিঃস্ব নিরন্ন প্রজার জীবনের আর্থ-মানসিক অবস্থা-অবস্থান জানেন না, বোঝেন না এও কি মানতে হবে?

অজ্ঞ-অনক্ষর চাষী-মজুরই লিখবে তাদের নিজেদের কথা? ওরা যদি সাক্ষর-শিক্ষিত হত, তাহলে ভাববাদী সামন্ত-বুর্জোয়া কবির কৃপার জন্যে কি অপেক্ষা করত? তারা বিদ্রোহ ও বিপ্লবই করত। উনিশ শতকী সমাজ প্রতিবেশে তখনো ইংরেজী শিক্ষিত-বিরল হিন্দু সমাজের, শাস্ত্রের ও সংস্কৃতির প্রতি দেশ-কালগত একটা দায়বদ্ধতা তাঁরও ছিল। জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে এ জন্যেই তাঁর উপন্যাসেও সংকীর্ণতা, রক্ষণশীলতা ও উপযোগরিক্ত আচারনিষ্ঠা দুর্লভ নয়।

হিন্দুর বাহুবল প্রদর্শনের জন্যে রাজসিংহ সুপরিকল্পিতভাবে রচিত, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত শেষ বয়সে, সেখানে প্রতিপক্ষ ধর্মহীন কপট আওরঙ্গজেব চরিত্র সম্বন্ধে উনিশ শতকী রুচির কটূক্তি যদি আজ অশ্লীল প্রতিভাত হয়, তাতে তাঁকে নিন্দা করা নিরর্থক। কিন্তু পরিণামে দরিয়া-জেবুননিসা-মুবারক এবং আওরঙ্গজেব-নির্মলার হার্দিক সম্পর্ক রাজসিংহের সব হিন্দুচরিত্র ম্লান করে দিয়ে রাজসিংহ রচনার উদ্দেশ্য বৃথা ও ব্যর্থ করে দিয়েছে। দরিয়া-জেবুননিসা-মাবারক কাহিনীই হয়ে উঠেছে রাজসিংহ। আওরঙ্গজেবের পরাজয়-লাঞ্ছনা পাঠক আর অনুভবে আনন্দ পায় না। ওটা নিতান্ত অপ্রধান প্রাসঙ্গিক বিষয় হয়ে ওঠে। কারণ জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয়েছে মুবারকের বীরত্বে ও কৌশলে। রাজসিংহের নায়ক-নায়িকা মুবারক-জেবুননিসা। রাজসিংহ ও আনন্দমঠ ব্যতীত আর কোন্ উপন্যাসে মুসলিমবিদ্বেষ প্রকাশ পেয়েছে, তাও প্রমাণ করা দরকার। আনন্দমঠে দেবীচৌধুরানীতে কিংবা চন্দ্রশেখরে ইংরেজমাত্রই বঙ্কিমের বিদ্রূপের পাত্র। আর তার চাকুরে জীবনে বিদ্বেষের, ক্ষোভের ও ক্রোধের ঘৃণ্য বস্। কাজেই বঙ্কিমের ইংরেজপ্রীতি ছিল না, প্রতীচ্য জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন-যন্ত্র-প্রকৌশলে আকর্ষণ-অনুরাগ-আসক্তি-শ্রদ্ধা সবই ছিল।

আনন্দমঠের সমাপ্তিতে যে প্রতীচ্যশিক্ষাই কেবল আমাদের মনুষ্যত্বের, সংস্কৃতির, চরিত্রের ও মন-মননের বিকাশের জন্যে আবশ্যিক ও জরুরী বলে তিনি নিঃসংকোচে উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন, ইংরেজের তারিফ করেছেন সেসূত্রেই। অন্যত্র বাবু, গর্দভ ও ইংরেজস্তুতি এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। মুচিরামগুড়ের জীবনচরিত তো পরোক্ষে ইংরেজ রাজত্বের দুঃশাসনের ও অবিবেচনারই সাক্ষ্য-প্রমাণ আর বিদ্রূপ। বঙ্কিমের মানসগঠন কালে গোটা ভারত ব্রিটিশ অধিকারে আসেনি বলেই হয়তো বঙ্কিম ছিলেন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি বা সুবাহ বাঙলার জাতীয়তাবাদী– বাঙলা-বিহার-উড়িশ্যার জাত-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সাতকোটি বাঙালীর কল্যাণই ছল তাঁর অনুধ্যানের বিষয়, বন্দেমাতরম তারই সাক্ষ্য-প্রমাণ। দেশকে মা ও মাতৃভূমি এবং ভাষাকে মাতৃভাষা বলে বরণ বা আবিষ্কার বঙ্কিমচন্দ্রের অসামান্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অসাধারণ অবদান। বাঙালীর ইতিহাসই রচনা করেছেন তিনি তাঁর উপন্যাস-রোমান্সগুলোর আবরণে। মনে রাখা দরকার বঙ্কিম ইউরোপীয় প্রগতিশীল দর্শনের, নাস্তিক্য দর্শনের সমর্থক এবং বেদের এবং দেবতাতত্ত্বেরও সমালোচক ছিলেন যৌবনে, ভক্ত ছিলেন না। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন একশ সোয়াশ বছর পরে যে 'আনন্দমঠ', 'দেবীচৌধুরানী', 'সীতারাম' রচনার জন্যে তুষ্ট, তৃপ্তি প্রসন্ন ধন্য হিন্দুরা। বিপিনচন্দ্র পালের মতো নেতা, শ্রীঅরবিন্দের মতো মনীষী সাধক বঙ্কিমকে ঋষি আখ্যাত করেছিলেন, স্বাধীনতার বাঞ্ছার উদগাতা ও বন্দেমাতরম মন্ত্রদ্রষ্টারূপে তাঁর রচনাকে গ্রহণ বরণ করেছিলেন, আজ সেই আনন্দমঠকে ঋষির নয়, সাম্প্রদায়িক মুসলিম-বিদ্বেষী বঙ্কিমচন্দ্রের অপসৃষ্টি বলে কেন নিন্দা করছেন? আনন্দমঠের এ পাঠ তো শতোর্ধ বছর আগেও ছিল? এখন কোন মতলবে এ নিন্দা? প্রথমত বিশ শতকের তৃতীয় দশক অবধি জীবন-চেতনার ও কর্ম-আচার-আচরণে সর্বক্ষেত্রেই হিন্দু-মুসলিম ছিল দুটো জাতি-সম্প্রদায় নয়, কেননা তখনো দৈশিক রাষ্ট্রিক জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হয়নি প্রতীচ্য আদলে, কাজেই শেষ বয়সে হিন্দু বঙ্কিম ছিলেন বিজাতি বিধর্মী বিদেশী বিদ্বেষী–সাম্প্রদায়িক নন। আমরা অব্যশ জানি এবং মানি যে বঙ্কিম পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স অবধি নাস্তিক ছিলেন এবং তাঁর দেশ-কালানুগ চেতনায় মনুষ্যপ্রীতি ছিল, তাঁর লোকরহস্যে, কমলাকান্তে, ও বহু প্রবন্ধে তা সুপ্রকট।

বঙ্কিম যদি সাম্প্রদায়িকই হবেন, তা হলে মুঘলের দাসত্বে আনুগত্যে ও মুঘলের কাছে কন্যা ভগ্নী বিবাহ দানে যে মানসিংহ-জগৎসিংহ হিন্দুসত্তা হারিয়েছে, হিন্দু জাতিকে করেছে লজ্জিত, সেই জগৎ সিংহকে তিনি কেন নায়ক করেন তাঁর প্রথম উপন্যাসে। তাছাড়া বিমলা-ওসমান, আওরঙ্গজেব-নির্মলা, দলনী-শৈবলিনী, মীরকাসিমের হয়ে প্রতাপের যুদ্ধ করা, চঞ্চলকুমারী-জেবুননেসা, মোহাম্দ আলী-পশুপতি প্রভৃতির প্রীতির ও কল্যাণকামীর সম্পর্ক-সম্বন্ধ কি সাম্প্রদায়িকতার বা বিজাতি বিদ্বেষের লক্ষণ? 'পাঠান সম্রাটদিগের শিরোভূষণ হোসেন শাহর বা মুঘল সম্রাটদিগের কুলতিলক মহামতি আকবরের সশ্রদ্ধ উল্লেখ কি বিধর্মীবিদ্বেষ জ্ঞাপক? মানুষকে ভালো না বাসলে, নাস্তিক না হলে বঙ্কিম কি নীতিভ্রষ্ট লোক নিয়ে শেখা শুরু করতেন? বঙ্কিমের প্রথম রচনা রাজমোহনস্ ওয়াইফে যে দস্যু লম্পট চরিত্র রয়েছে, অধীর দাম্ভিক পিতৃদ্রোহী লম্পট ধীরেন্দ্র সিংহ ও তার লম্বট শ্বশুর শশি শেখর ভট্টাচার্য [অভিরাম স্বামী] কোন গুণে গুণী? পশুপতি, দেবেন্দ্রনাথ, হীরা, কুন্দ, হরলাল, রোহিনী, হরবল্লভ, ভবানন্দ, গঙ্গারাম, সীতারাম, মৃণালিনীতে বর্ণিত লম্পট ব্রাহ্মণ সন্তান কি শ্রদ্ধেয়? বিমলাই কি শশি শেখরের বিবাহিতা শূদ্রী গর্ভজাত কন্যা? তিলোত্তমাও তো শশিশেখরের লাম্পট্যজাত প্রোষিতভর্তৃকার অবৈধ সন্তান। 'রাজমন্ত্রী দয়াল শাহ মালবে মুসলমানদের সর্বনাশ করিতে লাগিলেন, এ দোষদুষ্ট চরিত্র কি মুসলমান? সীতারামের মতোই শেষ মুহূর্তে জেবুননিসাও কষিতকাঞ্চন হয়ে উঠেছিল, চাঁদশাহ ফকিরও বিজ্ঞ, পণ্ডিত, নিরীহ এবং হিন্দু-মুসলমানে সমদর্শী। বিরক্ত এ ফকিরই আবার বলেছে, 'যে দেশে হিন্দু আছে, সে দেশে আর থাকিব না। এই কথা সীতারাম শিখিয়েছে।' অতএব বঙ্কিমের পরিচয় প্রয়োজনচারিত চরিত্রস্রষ্টা শিল্পীর– সাম্প্রদায়িকের বা বিজাতি-বিদ্বেষীর নয়। তাঁর দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম' নামে গবেষণাধর্মী রচনায়ও নেই হিন্দুয়ানী আবেগ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধর্মতত্ত্ব অনুশীলন গীতাতত্ত্ব কৃষ্ণচরিত্র চিন্তক ও আলোচক হাঁপানী ও বহুমূত্ররোগগ্রস্ত, নিহত কন্যার শোকগ্রস্ত পারিবারিক কোন্দলে বিরক্ত অপুত্রক বঙ্কিম গেরুয়াপরা ভক্ত হিন্দুতে পরিণত হয়েই হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী হন। তখনো বিজাতিবিদ্বেষী হননি। কেবল স্বধর্মীর হিতচিন্তায় ও স্বধর্মের শ্রেষ্ঠত্বে অভিভূত ছিলেন মাত্র।

সাহিত্যে নায়ক-নায়িকার প্রতিপক্ষকে তুলনায় হীন করে অঙ্কিত করতেই হয়, সাহিত্যে এ নীতি-নিয়ম সনাতন। ভিলেন বা খল দুবৃর্ত্ত দুষ্কৃতী চরিত্রও হয় আবশ্যিক। বঙ্কিমচন্দ্রের মানুষের প্রতি ভালোবাসা, আস্থা ও শ্রদ্ধা ছিল, সেজন্যে বঙ্কিমসাহিত্যে ভিলেন নেই। রূপবহ্নি বৃত্তচ্যুতি ও নিয়তিই মনুষ্য চরিত্র ও জীবন নিয়ন্ত্রণ করে বলেই বঙ্কিমের ধারণা ছিল। অতএব নায়ক নায়িকা চরিত্রে গৌরব ও ঔজ্জ্বল্য দান করার জন্যে জাত-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে প্রতিপক্ষ শক্তিকে ও চরিত্রকে দুর্বল ও হীন করে দেখতে হয়েছে মাত্র। শতোর্ধ্ব বছর পরে এর মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা দর্শন কি হিন্দু পাঠক মনে অসাম্প্রদায়িকতার বা সেক্যুলারিজমের উন্মেষ বিকাশের ফল, না রাজনীতিক অভিসন্ধি বশে নতুন কথায়, ব্যাখ্যায় ভোট যোগাড়ের নতুন চালমাত্র তা পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। কেন না বঙ্কিমমানস ও তাঁর রচনা আক্ষরিক অর্থে, আক্ষরিকভাবেই রয়েছে অভিন্ন হঠাৎ ঋষিকে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণচিত্ত অশ্লীল রুচির ইতরজনরূপে আখ্যাত করার মধ্যে মতলব বা অভিসন্ধি আবিষ্কার করা নিরপেক্ষ পাঠকের পক্ষে স্বাভাবিক। কেননা বঙ্গদর্শন মুদ্রণ কালে যারা ছিল ইংরেজ যবন তারাই গ্রন্থাকারে মুদ্রণ কালে যে চাকুরে ভীরু বঙ্কিমের হাতে নেড়ে মুসলিম যবন হয়েছে জেনে বুঝে মেনেও কেন এতোকাল পরে পশ্চিমবঙ্গে কোলকাতার সর্বত্র বঙ্কিম দূষণের হিড়িক পড়ে গেল আকস্মিকভাবে, তা স্বরূপে জানা-বোঝা আবশ্যিক ও জরুরী। – বিশ কোটি বাঙলাভাষীর ভাষিক ঐক্য ও আত্মীয়তা রক্ষার গরজেই।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে বঙ্কিমচন্দ্রই পাঠান আমলকে বাঙলার মানস স্ফূর্তির কাল ও স্বাধীনতার যুগ বলে অভিহিত করেছিলেন। তিনি জানতেন 'শাসনকর্তা ভিন্ন জাতীয় হইলে রাজ্য পরতন্ত্র হইল না, পক্ষান্তরে শাসনকর্তা স্বজাতীয় হইলেই রাজ্য স্বতন্ত্র হয় না।' তিনিই বলেছিলেন যে সব মানুষ কখনো ইংরেজী শিখতে পারবে না। কাজেই বাঙলা ভাষার মাধ্যমেই বিদ্যাচর্চা করে আমাদের আত্মোন্নয়ন ঘটাতে হবে, তিনিই জেনেছিলেন যে ইংরেজ দেশ জয় করে নিল, হিন্দুরা তাদের সাহায্য করল। তিনিই বুঝেছিলেন যে উর্দুওয়ালা খানদানী তথাকথিত বাঙালীরাও বাঙলাভাষার চর্চা না করলে অর্থাৎ মুসলমানরাও বাঙলাভাষার চর্চায় এগিয়ে না এলে বাঙলার ও বাঙালীর সামগ্রিক, সামষ্টিক ও সামূহিক উন্নতি হবে না।

তাঁরই 'বন্দেমাতরম' গানে বাঙলা-বিহার-উড়িশ্যার তথা সুবাহ-ই বাঙলার হিন্দু-মুসলিম-খ্রীস্টানকে ধরেই সাতকোটি বাঙালীর জাতীয়তা বা অভিন্নসত্তা অঙ্গীকার করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রই কমলাকান্তরূপে উচ্চারণ করেছেন যে 'মনুষ্য জাতির প্রতি যদি আমার প্রীতি থাকে, তবে আমি অন্যসুখ চাই না। বাঙ্গলা হিন্দু-মুসলমানের দেশ– একা হিন্দুর দেশ নহে কিন্তু হিন্দু-মুসলমান এক্ষণে পৃথক। পরস্পরের সহিত সহৃদয়তাশূন্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঙলার প্রয়োজনীয় যে হিন্দু-মুসলমানে ঐক্য জন্মে।' [বঙ্গদর্শন ১২৮০/১৮৭৩ সন] ইংরেজরা দেশ দখল করল, হিন্দুরা তাদের সহায়তা করল– এমনি কথাও বঙ্কিমচন্দ্রেরই। বাঙালার নব্য লেখকদের প্রতি নিবেদনও এখানে স্মর্তব্য : 'যদি এমন বুঝিতে পারেন যে লিখিয়া দেশের বা মনুষ্য জাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টি করেত পারেন তবে অবশ্য লিখবেন। যাহা অসত্য, ধর্মবিরুদ্ধ, পরনিন্দা বা পরপীড়ন বা স্বার্থসাধন যাহার উদ্দেশ্য, সে সকল প্রবন্ধ কখনও হিতকর হইতে পারে না। সুতরাং তাহা একেবারে পরিহার্য। সত্য ও ধর্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। অন্য উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ মহাপাপ।'

কিন্তু বঙ্কিম উপন্যাসের ক্ষেত্রে কথা রাখেননি, বলেছেন 'উপন্যাসের লেখক সর্বত্র সত্যের শৃঙ্খলে বদ্ধ নহেন। ইচ্ছামত অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য কল্পনার আশ্রয় লইতে পারেন।' [রাজসিংহ, ভূমিকা]। বঙ্কিমচন্দ্র মুচিরাম গুড় রচনার মাধ্যমে ব্রিটিশের ভারত শাসন পদ্ধতির এবং প্রভুপদলেহী চাটুকারদের বিদ্রূপ মাধ্যমে চরিত্র প্রকটিত করেছিলেন। হাশিম শেখ ও রামা কৈবর্ত সমভাবেই বঙ্কিমের সহানুভূতি পেয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রই কেবল ধনসাম্য মনুষ্যসাম্য ও নারী-পুরুসের সাম্য কামনা করেন। কমলাকান্ত বলছে 'দুধ আমার বাপেরও নহে, দুধ মঙ্গলার, দুহিয়াছে প্রসন্ন। কাজেই দুধেই আমার অধিকার কি?' তুলনায় ১৯০৮ সন অবধি রবীন্দ্রনাথে কেবল প্রাচীন হিন্দুর আরণ্যজীবন মহিমা ও সংস্কৃতি গৌরব গর্বচেতনা প্রকটিত দেখি আর দেখি হিন্দু-ব্রাহ্মের কল্যাণ চিন্তা, তাঁর সত্তরোর্ধ্ব বয়সে সংখ্যাগুরু শিক্ষিত মুসলিমদের রাজনীতিক জাগরণ ও দাবি দেখে শুনে বুঝে এবং কম্যুনিস্টদের ক্রম প্রাবল্য অনুভব করে, রাশিয়াও দেখে এসে ১৯৩২ সনে রাশিয়ার চিঠিতে [তাঁর মত মন্তব্য কোথাও কোথাও বিভ্রান্তিকর ও অস্পষ্ট] আর ১৯৩৭ সনে উনজন হিন্দুর স্বার্থে অধিজন মুসলিমদের তুষ্ট করার বাণী প্রচার করতে থাকেন কয়েকটি প্রবন্ধে কালান্তর গ্রন্থের।

তবু রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুর পূর্বে পাকিস্তান প্রস্তাব শুনে গেছেন, আর কম্যুনিস্টদেরও প্রভাববিস্তার অনুভব করে গেছেন। দুটোর কোনটাই তাঁর অভিপ্রেত ছিল না, ছিল না তাঁর চিন্তা চেতনার অনুকূল। সাতচল্লিশ বছর বয়স অবধি যিনি ইহজাগতিক সামাজিক চিন্তা-চেতনায় কেবল হিন্দুব্রাহ্ম, ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্বে ও নেতৃত্বে আস্থাবান, হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্যে মুগ্ধ, প্রাচীন আরণ্য-ব্রাহ্মণ্য জীবনাচারে আকৃষ্ট ও পুনপ্রতিষ্ঠার স্বাপ্নিক, পরে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি-উত্তরকালে জীবনদেবতার নিয়ন্ত্রণমুক্ত বৈশ্বিক চিন্তার-চেতনার অনুশীলন প্রয়াসী, তবু আমৃত্যু নিষ্ঠ ব্রাহ্ম ও পুরোহিত, সেই রবীন্দ্রনাথ অতুল্য, অনন্য অসামান্য নিখাদ নিখুঁত মনস্বী মনীষী। আর সারাজীবন যিনি জগৎচেতনায় ও জীবনভাবনায় জীবন কি, জগৎ কি, জীবন কেন, কিসে– এর সার্থকতা সন্ধান করলেন, তিনি আজ কেবল সাম্প্রদায়িক লেখক আজকের আর্থ-রাজনীতির-জাতিক-সাংস্কৃতিক সব অনর্থের মূল রূপে চিহ্নিত হচ্ছেন। বিড়ম্বনা আর কাকে বলে! এসূত্রে উল্লেখ্য যে উনিশ শতকের শেষ দশকে বিবেকানন্দ ইহজাগতিক জীবনে দেশ-কালের প্রয়োজনচেতনায় ঋদ্ধ ছিলেন প্রাচীন ভারতের অদ্বৈতদর্শনের গৌরবগর্বী হওয়া সত্ত্বেও। কেউ একা শাস্ত্র-সমাজ-শাসন-প্রশাসন-পীড়ন-পেষণ-শোষণের বিরুদ্ধে, দেশাচার-লোকাচারের বিরুদ্ধে, আশৈশব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লালিত বিশ্বাস-সংস্কারের বিরুদ্ধে লড়তে পারে না, বঙ্কিমচন্দ্রেও সময়ে কোন কোন ক্ষেত্রে দেশাচার-লোকাচারে ও বিশ্বাস-সংস্কারে প্রভাবিত ছিলেন অনেক বিদ্বান মণীষী। তা ছাড়া তিনি চাকুরে ছিলেন। কিন্তু তাঁর আগে সমকালে এবং পরেও ছিলেন, রামমোহন থেকেই অনেক মনীষী সমাজসেবী দেশপ্রেমী, ভদ্রলোকেরা কি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে, নীলচাষের বিরুদ্ধে, অর্থপাচারের বিরুদ্ধে, খাজনা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে জাত-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে বাঙালীর হয়ে সঙ্ঘ-সমিতি মাধ্যমে কেজো আন্দোলন করেছেন? তা হলে, ডেপুটি বঙ্কিমচন্দ্রের কাছেইবা এতো প্রকারের দাবি কেন? সিপাহী বিদ্রোহকালে বাঙালী ভদ্রলোকেরা ব্রিটিশ স্তাবক ছিলেন কেন? তাঁরা কি সবাই চাকুরে ছিলেন?

ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে প্রতীচীর মন-মনন-মনীষার সঙ্গে আমাদের যে পরিচয় ঘটে, তাতে, আমরা যেন আকস্মিকভাবে নিশীথরাত্রে জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন-সভ্যতা-সংস্কৃতিরূপ সূর্য রশ্মি স্নাত হয়েছিলাম। ফলে পরাধীনতার গ্লানিময় আত্মোন্নয়নের সুযোগই আমাদের কৃতার্থ করেছিল। এ জন্যেই রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ এমন কি প্রথম স্বদেশ প্রেমের গান-কবিতা রচক দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ও ভারতে ব্রিটিশ স্থিতি মনে প্রাণে কামনা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। আর শৈশবে-বাল্যে স্বশাস্ত্রিক-আচরিক-ঐতিহ্যিক যে মগজধোলাই হয়ে গিয়েছিল, তা থেকেও রামমোহন থেকে বিবেকানন্দ অবধি কেউ মুক্ত থাকতে পারেননি। এজন্যে গ্রহণশীলতা-বর্জন-প্রবণতা এবং রক্ষণশীলতা– এ তিনটের টানাপোড়েনে এঁরা সবাই কমবেশি ভুগেছেন। তাই তাঁদের ভাব চিন্তা-কর্ম-আচরণে লঘু গুরু অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্য রয়েই গেছে। ব্যতিক্রম ছিলেন বিদ্যাসাগর– সর্বসংস্কারমুক্ত নিরীশ্বর হিসেবে। বঙ্কিমও দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগেছেন– বিজ্ঞান ও যুক্তি প্রিয় হয়েও। তিনিও ইংরেজ রাজত্বের স্থিতি বাসনা করেছেন। চিরস্থায়ী ভূমিবন্দোবস্ত ক্ষতিকর জেনেও হাসেম শেখের পরান মণ্ডলের প্রতি সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও। তিনিও বিধবাবিবাহ পছন্দ করেন নি, বাঙলা সংবাদপত্র বন্ধ করে দেয়া বাঞ্ছিত মনে করেছেন, নাবালিকা বধূসহবাস রহিত করার আবেদনে সই করেন নি।

বঙ্কিম ইংরেজ আনুগত্যবশে বলেছেন, আমরা সামাজিক বিপ্লবের অনুমোদক নহি।

তিনি নীলদর্পণ জমিদারদর্পণের প্রচারও অবাঞ্ছিত মনে করেছেন, খুলনার মোরেলগঞ্জের ইংরেজবিরোধী কৃষকনেতা রহিমুল্লাহ তাঁর সাক্ষাৎ-সহায়তা-সহানুভূতি কিংবা সুবিচার পায়নি। রামেশচন্দ্র দত্তও হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী ছিলেন কিন্তু তাঁর রাজপুত্রজীবনসন্ধ্যায় কিংবা মারাঠা জীবনপ্রভাতে তিনি ছিলেন কিন্তু সতর্ক সংযতবাক মুসলিমরা মুঘল সম্বন্ধে মতে-মন্তব্যে ও বয়ানে। বঙ্কিম এ বিষয়ে সতর্ক সংযত ছিলেন না। তবে এরও একটা ব্যাখ্যা বা কৈফিয়ত দেয়া চলে, যেমন নাটকের সব সংলাপই একক ব্যক্তির রচনা, তাই বলে সবটাই কি নাট্যকারের মত? নায়কের পক্ষে-বিপক্ষে পাত্রের ক্ষোভ-ক্রোধ-আনন্দ-উল্লাস-হিংসা-ঘৃণা-জ্বালা-প্রতিহিংসা-ষড়যন্ত্র সবটাই নাটকের কাহিনীতে সংলাপে যোজনা করেন নাট্যকার, এ জন্যে একজনকে নায়ক, অন্যজনকে ভিলেন করা হল কেন সে প্রশ্ন কি করা যায়, গল্পে উপন্যাসে-নাটকে? লেখক বঙ্কিম বলছেন, কি হিন্দু পাত্রপাত্রী বলছে, তা পরখ করা কি সহজ? মার্চেন্ট অব ভেনিসে ইহুদীবিদ্বেষীকে? নাট্যকার শেক্সপীয়ার না শাইলকের সমকালীন খ্রীস্টানরা? এ সবও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিবেচনার মধ্যে আনলে বিশেষত আয়েষা-ওসমান, মোহাম্মদ আলী-দলনী, মীর কাসিম, চাঁদশাহ ফকির, দরিয়া, মুবারক-জেবুননিসা-মতিবিবি, মেহেরুননেসা চরিত্র যে বঙ্কিম সৃষ্ট, তা মানলে এবং কয়েকটি প্রবন্ধের কথা স্মরণে রাখলে নাস্তিক বঙ্কিমকে সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট বলে অভিহিত করা সহজ নয়। আগেও বলেছি বঙ্কিম হিন্দু হয়েছেন কৃষ্ণচরিত্র, ধর্মতত্ত্ব অনুশীলন রচনাকালে। তখন তিনি কেবলই হিন্দু, বাঙালীও নন, বন্দেমাতরম রচয়িতাও নন। সীতারামে, দেবীচৌধুরানীতে শাস্ত্রীয় তত্ত্বের, সংযমের, সহিষ্ণুতার, নারীধর্মের তাত্ত্বিক রূপায়ণ রয়েছে মাত্র। আর আনন্দমঠের আরম্ভের ও সমাপ্তির উদ্দেশ্যগত পরিবর্তনের কথা তো আগেই বলা হয়েছে। উল্লেখ্য যে সে-সময়েও সর্বপ্রকার বিশ্বাস-সংস্কার-আচার-পালা-পার্বণমানায় হিন্দুত্বের প্রবক্তা শশধর তর্কচূড়ামণি যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন প্রত্যক্ষবাদী, সংশয়বাদী, অজ্ঞেয়বাদী ও শাস্ত্রবিদ্বেষী নীতিবাদী প্রভৃতি।

প্রথম দিকে সামাজিক উপন্যাসে হিন্দুর সমাজগঠন ও সংরক্ষণ, প্রমাণে অনুমানে প্রাপ্ত বাঙলার মুসলিম আমলের ইতিবৃত্তের উপন্যাসে হিন্দু সমাজপরিপ্রেক্ষিত রূপায়ণই ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের লক্ষ্য। সেকালের প্রতীচ্যশিক্ষাবিরল প্রতিবেশে তিনি কেবল উচ্চবিত্তের বর্ণহিন্দু জমিদারের সামন্তের কাহিনী অকলম্বনে রোমান্সের মাধ্যমে বর্ণহিন্দুর সংহতি, জাগরণ, দেশ-কাল-সমাজ চেতনা কামনা করেছেন।

শেষদিকের বঙ্কিমের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে প্রমাণিত হল যে তাঁর স্বধর্ম হিন্দুর গীতাগত ভক্তিধর্ম, তাঁর স্বজাতিও হিন্দু, তাঁর স্বদেশও কেবল হিন্দুর কিংবা হয়তো হিন্দু বাঙালীর, তখন তাঁর ধারণা 'জাতীয়ধর্মের পুনরুজ্জীবন ব্যতীত ভারতবর্ষের মঙ্গল নাই, ইহা আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস।' [দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম] কিন্তু সামগ্রিক, সামষ্টিক ও সামূহিক হিসেবে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স অবধি নাস্তিক ও য়ুরোপীয় দার্শনিক প্রভাবিত বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন উনিশ শতকের সবচেয়ে উঁচু মনীষার দূরদর্শী ও প্রাগ্রসর চিন্তা-চেতনার অনন্য-অসামান্য-অসাধারণ ব্যক্তি। তবু এর মধ্যেও 'দেবতত্ত্ব ও হিন্দু ধর্ম' এ সুদীর্ঘ আলোচনায় বিজ্ঞ-প্রাজ্ঞ যুক্তিবাদী বঙ্কিমচন্দ্রেরই প্রাধান্য দেখতে পাই। যদিও তিনি বলেন, 'জাতীয় ধর্মের পুরুজ্জীবন ব্যতীত ভারতবর্ষের মঙ্গল নাই' আর লোক-রহস্য, বিজ্ঞানরহস্য ও কমল কান্তরচক বঙ্কিমচন্দ্র একেবারে ভিন্ন মানুষ।

অক্ষয় কুমার দত্তের পরে তিনিই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন বিজ্ঞানের গুরুত্ব মানসিক ও ব্যবহারিক জীবনের বিকাশের জন্যে। লোকরহস্যে তাঁর সূক্ষ্মদৃষ্টি এবং মানবচরিত্র সম্বন্ধে গভীর ও ব্যাপক অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য-প্রমাণ প্রকট। আর কমলাকান্তের দপ্তরেও লোকচরিত্র যেমন, তেমনি সর্বসংস্কারমুক্ত মানবিক ও মননশীল চিন্তাচেতনা ও সুপরিব্যক্ত। এ বঙ্কিমও উনিশ শতকে ছিলেন অতুল্য ও অসাধারণ। জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, তীব্র অনুভূতি, উপলব্ধি রসিকতা, কৌতুক, পরিহাস, বিদ্রূপ ব্যাজস্তুতি, সূক্ষ্ম চিন্তা সবটাই মেলে এসব রচনায়। তবু 'বাঙ্গালা সাহিত্য বাঙ্গালার ভরসা–' উক্তিও তাঁরই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিন্দু পুনর্জাগরণবাদী বঙ্কিমচন্দ্র

প্রায় শোয়াশ' বছর ধরে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙলার সাহিত্য, বাঙলার রাজনীতি এবং সমাজ-শাস্ত্র ক্ষেত্রে বিশেষভাবে আলোচ্য ব্যক্তি, ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্যিক। তাঁর সম্বন্ধে নতুন কথা বলা সহজ নয়, তবে সম্ভব। কেননা প্রতি প্রজন্মে মানুষের জীবনদৃষ্টি, জগৎ-চেতনা এবং সমাজের প্রতিবেশ ও পরিবেশ বদলায় এবং ব্যক্তি মানুষের তথা আলোচকের বা পাঠকের জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-রুচির গুণে-মানে-মাপে-মাত্রায় পার্থক্য থাকে বলেই মন মত মন্তব্য ও সিদ্ধান্ত হয় বিভিন্ন, বিবিধ ও বিচিত্র। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে মূল্যায়নেও বৈপরীত্য ও বৈচিত্র্য দেখা দিয়েছে। আগে মুসলিম মাত্রই না পড়ে ও শুনে শুনে বঙ্কিমের প্রতি ক্ষুব্ধ ছিল। এখন কোন কোন মুসলিম পাঠক লেখক [রেজাউল করিম ছাড়াও] বঙ্কিমের প্রতি সহিষ্ণু নন কেবল, মনীষী বলে তাঁকে উচ্চকণ্ঠে স্বীকারও করেন। যে হিন্দুরা বিপিনচন্দ্র পাল-শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের প্রভাবে বঙ্কিমচন্দ্রকে স্বাদেশিকতার, হিন্দু জাতীয়তার ও স্বাধীনতার উদগাতা বলে তাঁকে মুসলিম দ্বেষণাজাত রাষ্ট্রিক দৈশিক জাতীয়তা গড়ে না ওঠার জন্যে দায়ী করছেন। বলছেন বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন সাম্প্রদায়িক দ্বেষ-দ্বন্দ্ব প্ররোচক লেখক। সৈয়দ জামালউদ্দীন আফগানী উনিশ শতকে বিশ্ব মুসলিম জাগরণ কামনা করেছিলেন। তাঁকে মুসলিমরা শ্রদ্ধা-ভক্তি করে, করে তাঁর গৌরবও। হিন্দুরা রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দকেও সেই চোখে দেখে, অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে সাম্প্রদায়িক পরিভাষা ব্যবহার করা যাবে না। কেননা, উনিশ শতকে দৈশিক কিংবা রাষ্ট্রিক জাতি চেতনার উন্মেষ ঘটেনি এদেশে। প্রতীচ্য শিক্ষা পেয়েও হিন্দু হিন্দুজাতীয়তাবোধে, মুসলিম বৈশ্বিক মুসলিমভ্রাতৃত্ব চেতনায় উদ্বুদ্ধ বা প্রবুদ্ধ হচ্ছিল মাত্র। বিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে মোহনলাল করম চাঁদ গান্ধীই কংগ্রেস মাধ্যমে জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-নিবাস বির্বিশেষে সবাইকে ভারতীয় জাতীয়তাবোধে সংহত করতে বৃথা ও ব্যর্থ প্রয়াস পেয়েছিলেন। কাজেই বঙ্কিমচন্দ্রকে বড় জোর বিজাতি-বিদ্বেষী বলা যেতে পারে। এতেও অবশ্য পুরো তথ্য ও সত্য নেই। আমরা ব্রিটিশ বিদ্বেষী বলে আমাদের কেউ নিন্দা করে না, বরং তা আমাদের স্বদেশ প্রাণতারই প্রমাণ। হিন্দু জাতির কেউ মুসলিম জাতিকে হিংসা-ঈর্ষা-ঘৃণা-অবজ্ঞা করলে কিংবা কোন মুসলিম হিন্দু-খ্রীস্টান-ইহুদী-বৌদ্ধের প্রতি অনুরূপ মনোভাব পোষণ করলে তাকে দোষ দেয়া রীতিবিরুদ্ধ। যদিও উদারভাবে জাত-জন্ম-বর্ণ-ভাষা-নিবাস নির্বিশেষে মানুষকে কেবল মানুষ রূপেই জানা ও মানাই মনুষ্যত্ব। স্বজাতিপ্রীতি বিজাতি বিরাগ জাগায়। তবে তা সক্রিয় না হয়ে সুপ্ত ও গুপ্ত থাকাই বাঞ্ছনীয় ও নিরাপদ। আমরা বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে পূর্বেই সাতটি প্রবন্ধে[১] আমাদের মত, মন্তব্য ও সিদ্ধান্ত পরিব্যক্ত

১ বঙ্কিম মানসে– বিচিত চিন্তায়, বঙ্কিমদীক্ষা-প্রত্যয় ও প্রত্যাশায়, বঙ্কিমচন্দ্রের মনোজগৎ, বঙ্কিমচন্দ্র, মানববাদী বঙ্কিম– বাঙলার সাম্প্রতিক চালচিত্রে, মুক্তবেতনার জীবনরস তাত্ত্বিক বঙ্কিম, বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে আরো কিছু কথা-জাগতিক চেতনার বিচিত্র প্রসূন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছি। কাজেই আজ কেবল আমাদের আলোচনার ও সিদ্ধান্তের নির্যাস বা সারাংশ এখানে লিপিবদ্ধ করছি।

বঙ্কিমচন্দ্র পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স অবধি নিরীশ্বর নাস্তিক ছিলেন। তিনি মানুষকে মানুষ রূপেই জানতেন ও ভালোবাসতেন। তিনি পাপকে ঘৃণা করতেন, কিন্তু পাপীর প্রতি তাঁর কৃপা-করুণা ছিল। কুন্দ, হীরা, সীতারাম, রোহিণী প্রভৃতি তার সাক্ষ্য ও প্রমাণ, বঙ্কিম-সাহিত্যে দুর্বৃত্ত বা Villain নেই এ জন্যেই। শোভাবাজারের জমিদারবাড়ির এক শ্রাদ্ধ বাসরে ওরিয়েন্টাল সেমিনারীর অধ্যক্ষ হেস্টি হিন্দুয়ানীকে তথা হিন্দুশাস্ত্রকে নিন্দা-বিদ্রূপ করায় হিন্দু সন্তান বঙ্কিমের আত্মসম্মানে প্রচণ্ড ঘা লাগে। তাই তিনি হিন্দুশাস্ত্র ঘাঁটাঘাঁটি শুরু করেন তার সত্য, তথ্য ও শ্রেষ্ঠত্ব আবিষ্কার লক্ষ্যে। শ্রীকৃষ্ণকে অবতার রূপে নয়, রাজনীতি-কূটনীতি প্রাজ্ঞ রাষ্ট্রনায়করূপে চিত্রিত করার ব্যর্থ চেষ্টায় সময় ব্যয় করেন, অনুশীলন-ধর্মতত্ত্বে তাঁর প্রজ্ঞার ও মনীষার গভীর ও ব্যাপক স্বাক্ষর রয়েছে বটে, কিন্তু বাস্তবে মনুষ্যত্বের তথা আদর্শ হিন্দুত্বের রূপায়ণে দেবীচৌধুরানীতে ও সীতারামে শোচনীয়ভাবে হলেন ব্যর্থ। আওরঙ্গজেবকে তিনি ঘৃণা করেন ধর্মহীন বলে, সীতারামেরও পতন ঘটান অসংযত, কামুক উচ্ছৃঙ্খল প্রজাপীড়ক বলেই।

হিন্দুর বাহুবলের ইতিবৃত্ত লিখে হিন্দুদের মধ্যে ঐতিহ্য গৌরব গর্ব জাগিয়ে তাদের অনুপ্রেরণা-প্রণোদনা-প্রবর্তনা দেয়ার চেষ্টাও তাঁর অজ্ঞাতেই তাঁর 'রাজসিংহ'-এর চতুর্থ সংশোধনে বৃথা ও ব্যর্থ হয়ে যায়, কেননা বর্তমান আকারে 'রাজসিংহ' উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা-প্রতিনায়িকা-মোবারক-জেবুননিসা ও দরিয়া। রাজসিংহের বিজয়ও মোবারকের বাহুবলের ফলে, কোন হিন্দুর বীরত্বে নয়। আর যে গ্রন্থের জন্যে বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুর 'ঋষি' হয়েছিলেন, সে-গ্রন্থ গোড়ায় ছিল ব্রিটিশ বিদ্বেষপ্রসূন। কিন্তু চাকুরে বঙ্কিম চাকরী রক্ষার জন্যেই, রাঙামুখো ইংরেজের স্থলে নেড়ে-যবন-মুসলিম বসিয়ে মনের খেদ প্রকাশ করতে চেয়েও শেষে ঘাটে তরী ডুবিয়েছেন। ভবানন্দকে লম্পট বানিয়ে, জীবনান্দকে আদর্শচ্যুত করে এবং সর্বোপরি প্রতীচ্য প্রভু ইংরেজের মতো জ্ঞানে-গুণে-যোগ্যতায় ঋদ্ধ না হলে স্বাধীন রাষ্ট্র শাসন সম্ভব হবে না বলেই মহাপুরুষ গুরুর নির্দেশে তারা ইংরেজকেই দেশের শাসক শোষক বানাল, 'বিসর্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়া গেল'। যে গ্রন্থে স্বাধীনতা চাওয়ার ও পাওয়ার অযোগ্য বলে নিজেদের ঘোষণা করা হল, সে-গ্রন্থের জন্যেই বঙ্কিম হলেন 'ঋষি' আর গ্রন্থটি হল স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষা দানের শাস্ত্র বা উৎস। যা হোক, বর্তমানে সম্ভবত মুসলিম-ভোট যোগাড়ের ফন্দিবশে মুসলিম তোষণ নীতি গ্রহণ করেছেন পশ্চিবঙ্গের বামপন্থীরা এবং কিছু ডানপন্থীও, তাঁর এতোকাল পরে অর্থাৎ শোয়াশ বছর পরে আবিষ্কার করেছেন যে সাম্প্রদায়িকতার বীজ উপ্ত, অঙ্কুরিত, পুষ্পিত ও ফলবন্ত হয়েছে বঙ্কিমের হাতেই। কাজেই তিনিই যত নষ্টের মূল। এমনকি পাকিস্তানও হল তাঁরই পরোক্ষ প্রভাবে।

অথচ আমরা জানি ও মানি যে দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী, রজনী, ইন্দিরা, বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, সীতারাম, দেবীচৌধুরানী, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি উপন্যাসে, তাঁর লোকরহস্যে, ধর্মতত্ত্বে, অনুশীলনে, গীতার ব্যাখ্যায়, কৃষ্ণচরিত্রে, রাজসিংহেও [আওরঙ্গজেব-নির্মলা সম্পৃক্ত আলেখ্যে আওরঙ্গজেব এক হিসেবে মহৎ চরিত্র।] মুসলিম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিদ্বেষ নেই, রয়েছে জিজিয়াকর পুনঃ প্রবর্তনের জন্যে জীবিত সম্রাট আওরঙ্গজেবের তসবিরে চঞ্চল কুমারীর পদাঘাত [এ এক অশ্লীল রুচি-সংস্কৃতির অপদৃষ্টান্ত, যেমন এক মুসলিম সীতারামের পথ আগলে রাস্তায় শুয়ে থেকেছিল] কিন্তু আকবর-জাহাঙ্গীরের তসবিরের প্রতি চঞ্চল কুমারীর শ্রদ্ধা-সমাদরের অভাব ছিল না। তাছাড়া আয়েশা, উসমান, মোহাম্মদ আলী, দলনীবেগম, মীর কাসিম, দরিয়া, শেষের দিকে জেবুনিসা, মোবারক, চাঁদশাহ, মতিবিবি, মেহেরউন্নিসা প্রভৃতি মুসলিম চরিত্রে কলঙ্ক কোথায়? কৎলু খাঁ যদি কামুক হয়, তাহলে বীরেন্দ্রসিংহ আর অভিরাম স্বামীও লম্পট। কৎলু খাঁর চরিত্র তাহলে মুসলিম দ্বেষণাজাত নয়। এসব মুসলিম চরিত্র দেশজ নয়, তুর্কী-মুঘল প্রশাসক। কৃষকের ক্ষেত্রে হাসেম শেখ-পরান মণ্ডল-রামা কৈবর্ত তার চোখে অভিন্ন।

এবার আনন্দমঠের কথা বলি। লেখক গল্প-উপন্যাস-নাটকের সব চরিত্রের মুখে প্রয়োজন পরিকল্পনানুসারে নানা কথা পুরে দেন, সেগুলো সব লেখকেরই মন, মত, মন্তব্য ও সিদ্ধান্ত বলে মনে করা কি বিদ্যা-বুদ্ধি-যুক্তি-বিচার-বিবেচনার পরিচায়ক? বীরেন্দ্রসিংহ শশী ভট্টাচার্য (অভিরাম স্বামী), পশুপতি, হীরা, দেবেন্দ্রনাথ, রোহিণী, শৈবলিনী, ভবানন্দ, সীতারাম, গঙ্গারাম প্রভৃতি কি নিন্দিত বা নিন্দনীয় হিন্দু চরিত্র নয়? তাছাড়া মার্চেন্ট অব ভেনিসে অঙ্কিত শাইলক বা ইহুদী বিদ্বেষ কি সেকালের খ্রীস্টানের না শেক্সপীয়রের? উল্লেখ্য যে, বন্দেমাতরম-এর সাতকোটি মানুষ হচ্ছে বৈঙ্গল প্রেসিডেন্সির বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যার সর্বধর্মের লোক মিলে।– ইংরেজরা দেশ দখল করে নিল, হিন্দুরা তাদের সাহায্য করল। পাঠান আমলে বাঙলাদেশ স্বাধীন ছিল, সাম্রাজ্যবাদী মুঘল বাঙলার অর্থ শোষণ করে দিল্লীতে নিয়ে গেল। দেশ স্বজাতির শাসনে থাকলেই দেশকে স্বাধীন বলা যায় না।– এসব তো বঙ্কিমচন্দ্রেরই উক্তি ও মত। 'সাম্য'ও এক কালের বঙ্কিমেরই রচনা, এ সূত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধাবলীও স্মর্তব্য এবং কমলাকান্তও বিচার্য। তা হলেই বিজ্ঞ বিবেচক পাঠক জানবেন, বুঝবেন ও মানবেন যে, নাতিদীর্ঘ জীবনে বিপুল কলেবর রচনায় দুচারটে উক্তিতে অসঙ্গতি, অসামঞ্জস্য থাকলেও মনীষী বঙ্কিম মনস্বীও ছিলেন, বিধর্মী-বিজাতি বিদ্বেষ তাঁর সচেতন সুনিশ্চিত পরিকল্পিত নয়। আকস্মিক অসতর্ক উক্তি বা অভিব্যক্তি মাত্র। স্বজাতিপ্রীতির অভিব্যক্তি পরোক্ষে বিজাতি বিরাগের আভাস দেয়ই। সবার রচনায়— রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের রচনায়ও তার সাক্ষ্য-প্রমাণ ছড়িয়ে রয়েছে, রয়েছে মুসলিম বাঙালীর রচনায়ও। মানুষ সর্বক্ষেত্রে দলগত তথা যৌথ সামাজিক, দৈশিক, শাস্ত্রিক, রাজনীতিক জীবনই যাপন করে। কাজেই সে দলচেতনার উর্ধ্বে উঠতেই পারে না, কেবল সংযত, সহিষ্ণু ও সুজন হতে পারে। শাস্ত্র ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়ে নাস্তিক বঙ্কিম তাঁর অজ্ঞাতেই গোঁড়া হিন্দু বনে গেলেন, ভক্তিবাদই মোক্ষের উপায় বলে জানলেন, হিন্দুধর্মই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে মানলেন। মদ্যে-মাংসে যাঁর অনীহা ছিল না, হাঁপানীগ্রস্ত, মধুমেহ রোগী, অপুত্রক দাম্ভিক রাশভারী বঙ্কিম গেরুয়া পরে, নিরামিষভোজী হয়ে মৃত্যু ত্বরান্বিত করেছিলেন। এ হিন্দু অর্থাৎ কৃষ্ণচরিত্র থেকে শুরু করে অনুশীলন ধর্মতত্ত্ব রচক এবং দেবী চৌধুরানী, সীতারাম, আনন্দমঠ, রাজসিংহ প্রণেতা গীতার ভাষ্যরচক বঙ্কিমচন্দ্র জীবনের শেষ বারো বছর ছিলেন হিন্দুর শাস্ত্রের, সমাজের, জাতীয়তার পুনরুজ্জীবন বা পুনর্জাগরণবাদী সংস্কারক [Reformer o Revivalist]।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর প্রথম জীবনের বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন কেবলই মানববাদী ও মানবতার আদর্শে অনুপ্রাণিত। তাই শেষ জীবনেও গোঁড়াহিন্দু বঙ্কিম উচ্চারণ করেন : 'সকল বৃত্তিগুলির সমুচিত স্ফূর্তিই মনুষ্যত্ব। পরের জন্য তোমার হৃদয় কুসুমকে প্রস্ফুটিত করিও। আমি চিরকাল আপনার রহিলাম পরের হইলাম না, এই জন্যই পৃথিবীতে আমার সুখ নাই।' মনুষ্যজাতির প্রতি যদি আমার প্রীতি থাকে, তবে আমি অন্য সুখ চাই না।' 'দুধ আমার বাপেরও নয়, দুধ মঙ্গলার, দুহিয়াছে প্রসন্ন, সে দুগ্ধে আমারও যে অধিকার, বিড়ালেরও তাই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবি মতিউর রহমান পঞ্চম স্মারক বক্তৃতামালা, ১৯৯২

সংস্কৃতি

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম বক্তৃতা

সংস্কৃতি

সংস্কৃতি কথাটা উচ্চারণ করা সহজ, তাই সবাই সর্বক্ষণ বুঝে না বুঝে, জেনে না জেনে 'সংস্কৃতি' শব্দটি নানা প্রসঙ্গে উচ্চারণ করে থাকে। কিন্তু Culture, কৃষ্টি বা সংস্কৃতির তাৎপর্য বোঝা কঠিন, বোঝানো কঠিনতর। শোনা যায় প্রতীচ্যদেশে Culture-এর বা কৃষ্টির তথা সংস্কৃতির একশ চৌষট্টিটি সংজ্ঞা চালু রয়েছে [Merrill, p. 120] বিস্ময়ের কথা, কোনটাই সর্বতোভাবে বাতেল হয় নি, কেবল কেউ গ্রাহ্য, কেউ অগ্রাহ্য করে মাত্র। কোন কোন সংজ্ঞার সমর্থক বেশি, কোনটার সমর্থক স্বল্প কিংবা নগণ্যমাত্র।

রবীন্দ্রনাথ Culture-এর পরিভাষা 'কৃষ্টি' ব্যবহার করতেন বটে, তবে তাতে তাঁর মানসের বা রুচির সমর্থন ছিল না। হয়তো নাঙলের রেশ-লেশ ছিল বলে। যদিও Culture বা জার্মান Kulture কর্ষণ সম্পৃক্ত শব্দ। কাজেই কর্ষণ, কৃষি বীজ উপ্ত অঙ্কুরিত এবং পরিণামে উদ্দিষ্ট ফলপ্রসূ করার লক্ষ্য সম্বন্ধীয় শব্দই গভীরতর তাৎপর্যে সামান্য ভিন্ন লক্ষ্যে অর্থাৎ আত্মানুশীল অর্থেই প্রযুক্ত হয়েছে মাত্র। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় [১৮৩৮-৯৪] প্রায় কৃষ্টি-সংস্কৃতিচর্চার্থেই 'অনুশীলন' শব্দটি প্রয়োগ করেছেন। এখনকার দিনে বিদ্যালয়ে তা' ইংরেজী Exercise-এর পরিভাষারূপে প্রচল রয়েছে।

ডক্টর নীহার রঞ্জন রায় আমাদের জানিয়েছেন, যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি এবং ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রাচীন কোন এক সংহিতা থেকে প্রায় Culture বা কৃষ্টি-এ তাৎপর্যেই শব্দটা ব্যবহৃত হতে দেখে তা রবীন্দ্রনাথকে জানালে তিনি সমস্যামুক্তির স্বস্তিতে ও হৃষ্টচিত্তে সংস্কৃতিকে Culture-এর পরিভাষা হিসেবে বাঙলা ভাষায় চালু করেন। সংস্কৃতির আক্ষরিক অর্থও পরিমার্জনা, ঔজ্জ্বল্যের চাকচক্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। এক্ষেত্রে সংস্কার [Reform] শব্দটি স্মতব্য।

আগেই বলেছি 'সংস্কৃতি' শব্দটি উচ্চারণ করা সহজ, বোঝা কঠিন এবং বোঝানো কঠিনতর। আমার পক্ষে অসাধ্য জেনে বুঝেও আমি এ কঠিনকে গ্রহণ বরণ করলাম আমার বক্তৃতার বিষয় হিসেবে এ জন্যে যে এটি মানুষের ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক এবং সর্বোপরি মানসিক জীবনের একটি আবশ্যিক ও জরুরী বিষয়। একে এড়িয়ে যাওয়া আর সঙ্কট-সমস্যাকে জিইয়ে রাখা প্রায় একার্থক। কেননা গভীরতর ও ব্যাপকতর তাৎপর্যে সংস্কৃতি হচ্ছে মনুষ্যত্বেরই নির্যাস, অথবা নামান্তর কিংবা মনুষ্যত্বের বা মানবতার প্রতীক, প্রতিম, প্রতিভূ বা প্রতিরূপ। লেখাপড়া-জানা স্থূলবুদ্ধি সাধারণ মানুষের ধারণা নাচ-গান-বাজনা-অভিনয় প্রভৃতিই সংস্কৃতিচর্চা, সংস্কৃতির অভিব্যক্তি এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। কেউ কেউ আচারে-আচরণে-সুরুচি-সৌজন্য-বিনয়-আদব-কায়দা প্রভৃতিকেও সংস্কৃতি-মানতা বলে জানে ও মানে। আবার সামন্ত-বেণে-বুর্জোয়ার বিলাস-ব্যসন আর উঁচুমানের, মাপের ও মাত্রার ব্যয়বহুল জীবনাচারকেও সংস্কৃতি বলে মানে কেউ কেউ। জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তিপ্রয়োগে মননশীল-মনস্বীরা সংযম, সহিষ্ণুতা, সততা, উদারতা, উপচিকীর্ষা, সৌজন্য প্রভৃতিকে সংস্কৃতিমানতার বাহ্যলক্ষণ বলে জানেন। কাজেই সংস্কৃতি সম্বন্ধে একটা একক পরিচ্ছন্ন কোন ধারণা প্রাচ্যে-প্রতীচ্যে কারো নেই। যেহেতু সংস্কৃতি মনুষ্যত্বের বা মানবতার অপর নাম, সেহেতু সংস্কৃতি সম্বন্ধে পূর্ণধারণা পাওয়ার ও দেওয়ার জন্যে তর্কে-বিতর্কে, আলোচনায়, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে, টীকাভাষ্যে প্রয়াস প্রযত্ন চালানো মানবতার বা মনুষ্যত্বের বিকাশের ও উৎকর্ষের স্বার্থেই আবশ্যিক। কেননা, সংস্কৃতির উৎস হচ্ছে মানবমনীষা। এ এক হিসেবে ব্যক্তিক ভাব-চিন্তা-মন-মনন-মনীষার উদ্ভাবন ও আবিষ্কার। একের উদ্ভাবন ও আবিষ্কার, চিন্তার ও চেতনার ফসল, অন্যদের গৌত্রিক, গোষ্ঠীক, জাতিক, বার্ণিক, ভৌগোলিক, ভাষিক ও আঞ্চলিক পরিসর-পরিধিতে সীমিত আচার-আচরণ হয়েই থাকে। একে আমরা সাধারণভাবে এক এক গোত্রের, গোষ্ঠীর, জাতির, অঞ্চলের, ভাষীর স্বাতন্ত্র্য-পরিচায়ক সংস্কৃতি বলে চিহ্নিত করে থাকি। অতএব, একের চিন্তা-চেতনার-রুচির-প্রয়োজনবোধের প্রসূন তার স্বসমাজের মানসিক ও ব্যবহারিক আচার-আচরণ, ব্যবহার্য আসবাব, তৈজস, খাদ্য প্রভৃতি সামগ্রিক, সামূহিক ও সামষ্টিক জীবনচর্যা ও জীবনাচার বা ঐহিক-পারত্রিক জীবন-জিজ্ঞাসা সম্পৃক্ত জীবনযাত্রার স্থূল-সূক্ষ্ম বিষয়াদি সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত উপাদান-উপকরণ। এক কথায় অমর আত্মাবাদীদের ইহজাগতিক ও পারত্রিক জীবন সম্বন্ধীয় শ্রেয় ও শ্রেয় চেতনার সামষ্টিকরূপ ও রূপের বিভিন্ন বিচিত্র অভিব্যক্তিই সংস্কৃতি। আসলে আজকের সভ্যতা-সংস্কৃতির এ স্তরে উন্নয়ন ঘটেছে মানুষের, কয়েকজন জ্ঞানী ব্যক্তির মনীষার, আবিষ্কারের ও উদ্ভাবনের ফলে। পৃথিবীর মানুষ দুনিয়ার সর্বত্র সমভাবে আত্মবিকাশ ঘটাতে পারে নি। এভাবে, এমনি জিজ্ঞাসু কৌতূহলী জীবন যাত্রায় স্বাচ্ছন্দ্যকামী মনীষাসম্পন্ন উদ্যমশীল উদ্যোগী ধৈর্যবান অধ্যবসায়ী ব্যক্তির অভাবে। তার কারণও অনেক। ভৌগোলিক অবস্থান, আবহাওয়ার প্রভাব, সমতলে ও অরণ্যে জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর সুলভতা, স্বল্পতা, দুর্লভতা এবং অলভ্যতা, আর্তবপ্রভাব প্রভৃতি ছাড়াও কৌমে গোত্রে গোষ্ঠীতে বিভক্ত স্বাতন্ত্র্যগর্বী, রক্ষণশীল, গ্রহণ বা অনুকরণ বিমুখ, ভৌগোলিক ব্যবধানজাত অপরিচিতি, পৃথিবীর পরিসর-পরিধি সম্বন্ধে অজ্ঞতা, দুর্লঙ্ঘ্যতা ও অলঙ্ঘ্যতা, মনীষার অভাব, গতানুগতিকতাপ্রীতি, সন্দেহ-জিজ্ঞাসা-কৌতূহলরিক্ততা, আলস্য ও নিষ্ক্রিয়তা, আবিষ্কারে-উদ্ভাবনে প্রয়াসহীনতা প্রভৃতি বহু বিচিত্র কারণে আজো কোন কোন কৌম গোত্র অন্যান্য প্রাণীর মতো প্রাণীসুলভ স্বভাব বা বৃত্তি-প্রবৃত্তি চালিত জীবন যাপনে তুষ্ট ও তৃপ্ত। আবার কোন কোন অঞ্চলের মানুষ আজ জল-স্থল-আকাশ চারিতায় প্রাগ্রসর। কাজেই বুনো-বর্বর-ভব্য-সভ্য মানুষ এ মুহূর্তেও পৃথিবীতে সুলভ। অর্থাৎ মানব প্রজাতির প্রাণী যেমন সুলভ, তেমনি দেহ-প্রাণ-মন-মনন-মনীষার চরম ও পরমবিকাশসম্পন্ন কিছু কিছু মানুষও সাধারণভাবে সভ্যসমাজে দুর্লভ নয়। আর সমাজে সাধারণ মানুষ অনুকরণে অনুসরণে নীতিনিয়ম রীতিরেওয়াজ প্রথাপদ্ধতির আনুগত্যে জীবন যাপন করে। মানুষের মতো কোন কোন কীট, পতঙ্গ যেমন উই, পিঁপড়ে, মৌমাছি, কিংবা বুনো হাতী, গরিলা-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওরাংওটা-সিম্পাঞ্জি প্রভৃতি বহু প্রাণীও একত্রে যৌথ তথা দলবদ্ধ জীবন যাপন করে। কিন্তু এখনো তারা প্রধানত মুখে মুখে নিত্যকার খাদ্য সংগ্রহ করে বলে, এবং মানুষের মতো তাদের আবয়বিক সৌকর্য বা উৎকর্ষ তথা দু'টো হাত এবং ঋজু মেরুদণ্ড নেই বলে তারা মানুষের মতো খাদ্য সংগ্রহের ও সঞ্চয়ের জন্যে একে অপরের উপর নির্ভর করতে পারে না। যৌথখাদ্য সংগ্রহকালেও পিঁপড়ে প্রভৃতির মতোই ভাষার বিকাশ সাধন করতে পারে নি। মানুষ তার দলীয় কর্মে, আচরণে ও জীবনে ভাষার অনুশীলন ও সাধ্যমতো কিংবা প্রয়োজন মতো বিকাশ বা প্রসার সম্ভব করেছে। তাই বলে অন্যান্য প্রাণী যে বুদ্ধিতে মানুষের চেয়ে হীন তা সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় নি। কেননা, দেখা যাচ্ছে প্রশিক্ষণ পেলে অর্থাৎ ভাষার অভাব সত্ত্বেও উচ্চারিত ধ্বনির ও ইঙ্গিতের মাধ্যমে পশু-পাখি-মাছ প্রভৃতি অর্থাৎ জল-স্থল-আকাশচারী জীবজন্তুও মানুষের অভিপ্রায় আদেশ-নির্দেশ হুকুম-হুমকি বোঝে, প্রমাণ কাক ইঁদুর বানর সিম্পাঞ্জি কুকুর ঘোড়া হাতী বাঘ সিংহ নিয়েও সার্কাসে সিনেমায় অভিনয় করানো সম্ভব হচ্ছে। দৈহিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ওদের যে প্রশিক্ষণে মানসোৎকর্ষ এবং কর্ম-নৈপুণ্য সম্ভব, তা আর অস্বীকার করা যাবে না। আর আমরা জানি প্রশিক্ষণ না পেলে, সমাজে বাস করার সুযোগ না পেলে মানব প্রজাতির প্রাণীও স্বভাব বা বৃত্তিপ্রবৃত্তি চালিত প্রাণীই থেকে যায় সর্বব্যাপারে।

২.

পশু-পাখি প্রশিক্ষণ পেলে তাদের অনুশীলনজাত অর্জিত গুণ তাদের বা মানুষের কি কাজে লাগবে বা লাগতো তা নিয়ে আলোচনা আপাতত নিরর্থক। কিন্তু মানবপ্রজাতি যে তার দৈহিক সৌকর্যের দরুন প্রাণিজগতে স্বকল্পিত স্বসৃষ্ট স্বনির্মিত স্বনির্ভর ও স্বয়ম্ভর জীবন যাপনে অনন্য, অসামান্য ও অসাধারণ উৎকর্ষ ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে, সে-কৃতিত্ব প্রাণিজগতে বিস্ময়কর। ভাষার মাধ্যমে একের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ অন্যকে জানিয়ে বুঝিয়ে দেয়া, অন্যের বুদ্ধিগম্য এবং হৃদয় বা আবেগগ্রাহ্য করা সম্ভব হয়েছে বলেই, প্রকৃতিকে দাস, বশ এবং প্রকৃতির প্রতিকূলতা বুদ্ধিযোগে প্রতিকার-প্রতিরোধ করা আংশিকভাবে সম্ভব হয়েছে, কিংবা আর্তব-লক্ষণের ও শক্তির সঙ্গে আপোস করার বা আত্মরক্ষার কিছু কৌশল আয়ত্ত হয়েছে। ফলে সে স্বরচিত জীবনের ও স্বনিয়ন্ত্রিত ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের অধিকারী হয়েছে অনেকাংশে।

নৃবিজ্ঞানীরা মানুষের এ আত্মশক্তির উন্মেষ, বিকাশ ও প্রয়োগকে বলেন অর্জিত আচরণ [earned behaviour]। এ অর্জিত আচরণ দিয়েই মনুষ্যসংস্কৃতি-সভ্যতার শুরু। বর্তমান কালের সংস্কৃতিই কালান্তরে সভ্যতা নামে হয় অভিহিত। মানুষের ভাব-চিন্তা কর্ম-আচরণ মাত্রই মানুষের মেধা-মগজের দান। প্রাণী বলেই সব মানুষই কেবল তিনটে বিষয়ে স্ব স্ব দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে : আহার-নিদ্রা-মৈথুন বিষয়ে তার উদ্যোগ-আয়োজন চেতনাকে সে আবশ্যিক ও জরুরী মনে করে বেঁচে থাকার গরজেই। অন্য সব বিষয়েই সে সাধারণভাবে পরান্নজীবী, পরশ্রমজীবী, পরবুদ্ধিজীবী, পরচিন্তা-চেতনার অনুকারী ও অনুসারী। তাই পৃথিবীতে নতুন মনন-চিন্তন-আবিষ্কার-উদ্ভাবন, এককথায় মানসিক ও ব্যবহারিক সংস্কৃতি-সভ্যতা উৎপাদন-নির্মাণ বিবিধ বিচিত্র-কৌশল-প্রকৌশল-যন্ত্র-হাতিয়ার-প্রযুক্তি-পদ্ধতি গোটা পৃথিবীতেই করগণ্য কিছু মানুষের চিন্তা-চেতনার,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনন-মনীষার, আবিষ্কার-উদ্ভাবনের অবদান। সংস্কৃতি-সভ্যতার দু'টো রূপ ঃ একটা মানসিক বা মানবিক অনুভব-উপলব্ধির সূক্ষ্ম উন্মেষ, বিকাশ ও পরিণতির রূপ। যেমন সুরুচি-সৌন্দর্যচেতনা, -যা দেখতে, শুনতে, করতে, বলতে কুৎসিত, তা পরিহার করলে সংযম, সহিষ্ণুতা, কৃপা-করুণা-দয়া-দাক্ষিণ্য, উপচিকীর্ষা, স্নেহ-মায়া-মমতা-প্রেম-ভক্তি-ভালোবাসা-সম্প্রীতি, সাহায্য-সহায়তা প্রভৃতি গুণের উদ্ভব এবং সম্ভব হয় প্রাণীসুলভ ঈর্ষা-অসূয়া-হিংসা-ঘৃণা-দ্বেষ-দ্বন্দ্ব, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতির নিয়ন্ত্রণ। অন্যরূপটা হচ্ছে প্রাত্যহিক জীবন যাপন সম্পৃক্ত। রোদ-বৃষ্টি-শৈত্য থেকে আত্মরক্ষার জন্যে-ঘর-গুহা-দালান-কোঠাশ্রয়ী হওয়া, রেঁধে খাওয়া, তার জন্যে পাত্রাদি তৈজস, আসবাব, বস্ত্রাদি আবরণ-আভরণ উদ্ভাবন-নির্মাণ, রোগ প্রতিষেধক ঔষধ আবিষ্কার, জীব-উদ্ভিদ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান সঞ্চয়, গণিত রসায়ন পদার্থবিদ্যায় জ্ঞানের উন্মেষ প্রভৃতি আর যৌথ জীবনে স্ব স্ব সম ও সহস্বার্থে, সংযমে, সহিষ্ণুতায়, সহযোগিতায় সহাবস্থানের জন্যে কিছু নীতিনিয়ম, রীতিরেওয়াজ, প্রথাপদ্ধতি চালু করা। প্রথমটার নাম মানসসংস্কৃতি, দ্বিতীয়টার নাম ব্যবহারিক সংস্কৃতি। কিন্তু দুটোই মেধা-মগজেরই তথা মনন-চিন্তন-উদ্ভাবন-আবিষ্কারের, মনীষা-মনস্বিতার অবদান। কাজেই জ্ঞানী-বিজ্ঞানী-মনীষীর আবিষ্কার-উদ্ভাবন-সৃষ্টিই জনগণের অনুকরণে-অনুসরণে আচারে-আচরণে চিন্তায়-চেতনায় দৃঢ়মূল হয়ে দৈশিক, জাতিক, বর্ণিক, ভাষিক, ধার্মিক আচারে আচরণে, চর্যায় চর্চায় পালা-পার্বণে রূপায়িত ও প্রচল হয়ে স্থানিক, কালিক, জাতিক সংস্কৃতি-সভ্যতা নামে হয় পরিচিত। একের আবিষ্কার-উদ্ভাবন, মনীষার সৃষ্টি আসলে অন্যদের আচার মাত্র। 'সংস্কৃতি'টা আবিষ্কারক, উদ্ভাবক মনীষীর বা স্রষ্টারই সংস্কৃতি, কেননা সংস্কৃতিমাত্রই সার্বক্ষণিক সৃজনশীলতা, চিন্তনে-মননে-আবিষ্কারে-উদ্ভাবনে গতিশীলতা, নতুনত্ব, বৈচিত্র্য, প্রসারমাণতা ও প্রাগ্রসরতাই এবং সর্বোপরি প্রবহমানতা। তরুলতার পাতাঝরা পাতাগজানোর মতো, এককথায় কিশলয়ের মতোই সংস্কৃতি প্রতি অনুভবে, প্রতি উপলব্ধিতে, তিলে তিলে নতুন রূপে-রসে-বোধে-বৈচিত্র্যে পরিবর্তিত হতে থাকে। কারণ সৃষ্টিশীলতাই এর প্রাণ। আর প্রাণের তেজ বা শক্তিই দেহ-মন-মস্তিষ্কের প্রবৃদ্ধির উৎস ও কারণ। এ কারণেই সংস্কৃতিমাত্রই নিত্য বহমান ও রূপান্তরপ্রবণ। সংস্কৃতির কালান্তরে পরিত্যক্ত দীর্ঘস্থায়ী কিন্তু জ্ঞান-বুদ্ধি-সুরুচি-সৌন্দর্য-কৌশল-প্রকৌশল-উপযোগ পরিচায়ক মানসসম্পদ ও ব্যবহৃত সর্বপ্রকার সামগ্রীর নিদর্শনই সভ্যতার, পরম্পরার বা ঐতিহ্যের সাক্ষ্য, প্রমাণ ও ইতিবৃত্ত।

৩.

এবার সংস্কৃতির উৎস সন্ধান আবশ্যিক। নৃবিজ্ঞানীদের সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞায় সংস্কৃতি হচ্ছে Eamed behaviour বা অর্জিত আচার-আচরণ। এতে কিন্তু সব কথার নির্যাস বা তাৎপর্য মেলে না। নদীর উৎসমুখে যেমন নদীর বিশাল স্রোতধারার নমুনা বা চিহ্নমাত্র দেখা যায় না, কেবল ঝিরঝিরে ক্ষীণ জলপ্রবাহমাত্র বহমান থাকে, এবং তার নিম্নমুখী ক্রম ও দ্রুত প্রসার বিস্তার কল্পনা করাও সম্ভব হয় না, তেমনি অর্জিত আচার-আচরণও আমাদের সংস্কৃতির উৎসমসূহ সম্বন্ধে কোন ধারণাই দেয় না। বলেছি সংস্কৃতি জিজ্ঞাসুর, কৌতূহলীর মেধাবী মনীষীর চিন্তা-চেতনার, মনন-মনীষার ফসল। তার উৎসও বহুমুখী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং বিবিধ এমনকি বিচিত্রও। আমরা যদি ডারুইনের বিবর্তনবাদে আস্থা রাখি, তা হলে ওরাংওটা, গরিলা, সিম্পাঞ্জি, বানর-হনুমান থেকে ক্রমোৎকর্ষ ধারায় মানবকের উদ্ভবেও বিশ্বাস রাখতে হবে। ভাষা বিকাশ না পেলেও এরাও পৃথিবীর চাক্ষুষ ও শ্রুত বিবর্তন সম্বন্ধে শ্রুতি-স্মৃতির অধিকারী ছিল বলে মনে হয়। এখন যেমন বিজ্ঞানীরা বলছেন এক আদি অখণ্ড ভূমিই আকস্মিক প্রাকৃতিক আলোড়নে তথা কম্পনে উৎক্ষেপণে বিচ্ছিন্ন হয়ে এখনকার পাঁচটি মহাদেশে বিভক্ত হয়ে গেছে কয়েক কোটি [সতেরো বা বিশ কোটি] বছর আগে। সূর্য থেকে খসে-পড়া অগ্নিপিণ্ড যে প্রথমে অগ্নিময়, ধূম্রময়, কুয়াশাময়, জলময়, পঙ্কিল ছিল আদি ও আদিম মানবজাতির 'সৃষ্টিপত্তন' তত্ত্বে ও তথ্যে, উপকথায় ও বিশ্বাসে আজো শাস্ত্ররূপেও প্রচল কোথাও কোথাও কোন কোন গোত্রে। মাছ, কূর্ম।

মৎস্যাবতার কূর্মাবতার কর্দমপ্রিয় বরাহাবতার এ সূত্রে স্মর্তব্য দিয়েই হিন্দু-বৌদ্ধ সৃষ্টিপত্তন তত্ত্বের শুরু। তথা জলজ জেলিতেই যে প্রথম প্রাণের উদ্ভব, তা বিজ্ঞানীরা আমাদের এ যুগে শেখাচ্ছেন। অতএব মর্ত্য তথা আকাশ ও মাটি যে সূর্যসম্ভব তা মানুষ বহু আগেই অবচেতনভাবে অনুভব-উপলব্ধি করেছে। অগ্নি আজো ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রে জাতবেদ তথা দেবতার ও মানুষের সংযোগসূত্র। অগ্নি মাধ্যমেই হয় দেবতার আবাহন। শুধু তা-ই নয়, পৃথিবীতে মনুষ্যধারণায় যা কিছু মহৎ, পবিত্র, সুন্দর, মঙ্গলময়, শুভঙ্কর তার সবটাই জ্যোতির্ময়। আর জ্যোতি তো কেবল আকাশে সূর্যের এবং মর্ত্যে সূর্য প্রতীক, প্রতিম ও প্রতিভূ অগ্নিরই কেবল রয়েছে। আর জ্যোতি রয়েছে অন্ধকারে জোনাকির, হীরার আর গ্রহ-তারার। মুসাও যেহোভাকে দূর থেকে প্রথমে ধূম্রময় এবং পরে তুরপর্বতে অগ্নিময়ই দেখেছিলেন। সূর্য জীব-উদ্ভিদ প্রভৃতি সবকিছুরই প্রত্যক্ষে-পরোক্ষে প্রাণের উৎস, তা অবচেতন ভাবেই মানুষ গোড়া থেকেই অনুভব-উপলব্ধি করেছে অভিজ্ঞতা থেকেই। তবু আদি অজ্ঞ মানুষের বিভ্রান্তি ঘুচতে, সুনিশ্চিত হতে সময় লেগেছিল, তাই জল, বায়ু, সূর্য, অগ্নি ও মাটি— এ চারটির মধ্যে কোন্‌টি গুরুত্বে মুখ্য এবং প্রাণের উৎস বা ভিত্তি, তা বিতর্কের বিষয় ছিল গ্রীকসভ্যতার যুগেও।

কিন্তু আদি অজ্ঞ মানবগোষ্ঠীর আকাশের নক্ষত্র থেকে মাটির দূর্বা অবধি সব কিছু যখন অপরিচিত ছিল এবং কার কি শক্তি তা অজ্ঞাত ছিল, তা ছাড়া জীব-উদ্ভিদের দেহের, স্বভাবের, খাদ্যের, জীবনযাপনপদ্ধতির, আকারের ও রূপের বৈচিত্র্য মানুষকে বিস্মিত, বিভ্রান্ত, ভীত, ত্রস্ত রেখেছিল, তরু-লতার পাতার চিত্রিত রূপ, রঙ, রস, আকার-প্রকার, জীব-উদ্ভিদের দৈহিক ক্ষুদ্রত্ব, সামান্যত্ব আবার বিশালত্ব ও বিরাটত্ব এবং ফলমূলের বৈচিত্র্য যেমন বটফলের ক্ষুদ্রতা, লতার ফুল, লাউয়ের বৃহদাকার, কীট-পতঙ্গ ক্ষুদ্রাকৃতির আর হাতী-ঘোড়া-তিমির আকারে-প্রকারে নিবাসেস্বভাবে খাদ্যে পার্থক্য ও বিচিত্রতা মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছে, দিশেহারা করেছে, বিভ্রান্ত করেছে। মানুষের ভয়-বিস্ময়-কল্পনা-অনুমান প্রয়োগে জিজ্ঞাসা-কৌতূহল নিবারণের মানসিক গরজে একটা কারণ কার্য নিরূপণের চেষ্টা করেছে মেধাবী মনীষী বুদ্ধিমান গোষ্ঠীপতি বা সর্দার শ্রেণীর লোক। এ অনুমানই উদ্ভব ঘটিয়েছে সর্বপ্রাণবাদের, যাদুবিশ্বাসের, ট্যাবু-টোটেম তত্ত্বের, সৃষ্টি পত্তনতত্ত্বের, অলৌকিক-অলীক-অদৃশ্য শক্তির, নিয়তির, ভয়-ভক্তি-ভরসার উপাস্য-পূজ্য অরি-মিত্রশক্তির, যা প্রাজন্মক্রমিক চর্চায় সংস্কারে অবিমোচ্য হয়ে বিশ্বাস রূপে হয়েছে দৃঢ়মূল এবং ইহপরলোকে প্রসৃত চৈতন্যরূপ অমর-অজর আত্মার পরিণতি-পরিণাম চেতনা দর্শনে অমোঘ ও প্রায় প্রত্যক্ষ সত্যে স্থিতি লাভ করেছে মনুষ্যমনে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪.

শৈশবে বাল্যে কৈশোরে পরিবার-পরিবেশ-সমাজ থেকে প্রাপ্ত ও শ্রুত বিশ্বাস-সংস্কারই সাধারণভাবে মানুষের সারা জীবন নিয়ন্ত্রণ করে। এ যুগে যাকে বলে মগজধোলাই, জীবন-জগৎ ইহলোক-পরলোক, আত্মা-ভূত-ভগবান-জীন-পরী-প্রেত-পিশাচ-ড্রাগন-নিয়তি-অদৃষ্ট-কর্মফল প্রভৃতি যাবতীয় অলীক-অলৌকিক অযৌক্তিক অবৌদ্ধিক অসঙ্গত অসমঞ্জস চিন্তা-চেতনা, আচার-আচরণ, উপযোগরিক্ত পালা-পার্বণ ঝাড়ফুঁক, তুকতাক, বাণ-উচ্চাটন, তাবিজ-কবচ, তাগা-মাদুলী, মন্ত্র-পানিপড়া-তেলপড়া আর লোকাচার-দেশাচার প্রভৃতি যাবতীয় অলীক অদৃশ্য অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস-সংস্কারের মূলে রয়েছে অমানুষের প্রাথমিক চিন্তা-চেতনার রেশ ও লেশ। এর মধ্যে সর্বপ্রাণবাদ, যাদুশক্তি, ট্যাবু-টোটেম, মন্ত্রশক্তি সব আছে। জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তির বিকাশে ওই বিশ্বাস-সংস্কারকেই সত্যের তথ্যের ও তত্ত্বের মর্যাদা দিয়ে মানুষ গ্রহণ বরণ করেছে নির্বিচারে। কেননা আগেই বলেছি আহার-নিদ্রা-মৈথুন ছাড়া অন্য বিষয়ে সাধারণভাবে মানুষ উদাসীন। এ কারণেই মানুষ যে-পরিবারে বা সমাজে জন্মে, সে-পরিবারের ও সমাজের শাস্ত্র ও বিশ্বাস-সংস্কার, আচার-আচরণ, জীবনদর্শনই একমাত্র সত্য, নিখুঁত নিখাদ এবং শ্রেষ্ঠ বলে জানে ও মানে। এজন্যে স্বধর্ম ব্যতীত অন্যদের ধর্মকে ভুল, ত্রুটিপূর্ণ মিথ্যা বলেই জানে। ফলে একটা অবচেতন অনাস্থা-অবজ্ঞা পর ধর্মের প্রতি অন্তরের গভীরে অজ্ঞাতেই দানা বাঁধে কিংবা উপ্ত ও অঙ্কুরিত হয়। যার ফলে পৃথিবীতে ধর্মবিশ্বাসীর ও ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে শাস্ত্র নিয়ে মারামারি-হানাহানি রক্তক্ষরা প্রাণহরা যুদ্ধ-লড়াই আজো থামেনি দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে। কোথাও কোথাও সুপ্ত রয়েছে কিংবা কমেছে মাত্র। প্রকৃতির জগতে বৈচিত্র্য এবং একটা ত্রুটিপূর্ণ হলেও স্থূল নিয়মের প্রতিফলন দেখে এবং অনুমান করে মানুষ এ বৈচিত্র্যকে স্রষ্টার স্বৈর সচেতন সৃষ্টিশক্তির অভিব্যক্তি ও প্রদর্শনী বলে মেনে নেয়, জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধির অভাবে। যেখানেই মানুষ কার্যের বা ফলের কারণ অনুমান-আবিষ্কারে ব্যর্থ হয়, সেখানেই স্রষ্টার বা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করে। স্রষ্টা-সৃষ্টি তত্ত্বের উদ্ভবের মূলে রয়েছে কার্যের কারণ আবিষ্কারের অসামর্থ্য। মনুষ্য মনে স্রষ্টার অস্তিত্বের অনুভূতি ও স্থিতি এ কারণেই হয়েছে, দৃঢ়, যদিও নাস্তিক্য বা নিরীশ্বরবাদও সুপ্রাচীন। ভারতেই সাংখ্য, যোগ, বৈশেষিক দর্শন মূলত নাস্তিক্য দর্শন, জৈনরা ঈশ্বরকে নিষ্ক্রিয় বলেই মানে, ওরা অনেকান্তবাদী, চার্বাক দর্শন তো মিথ হিসেবে সর্বত্র চলে, পশ্চিম এশিয়ায়ও রয়েছে অদৃশ্য সৎ শক্তির ও মন্দশক্তির দ্বান্দ্বিক অবস্থান দয়াবিল ও দইবো [Devil ও দেব], শয়তান ও যেহোভার কিংবা— আল্লাহর ভালো-মন্দের প্রভাবচালিত জীবন চেতনা। জোরাস্ট্রসও ভালো-মন্দ Good-Devil শক্তির লীলাই প্রত্যক্ষ করেছেন জগতে ও জীবনে।

অতএব সংস্কৃতির প্রথম ও প্রধান উৎস ভয়-বিস্ময়-কল্পনা-অনুমান ক্ষতিভীতি ও প্রাপ্তিলিপ্সা প্রসূত ভয়-ভক্তি-ভরসা। চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে যে সাফল্যের ও ব্যর্থতার একটা অদৃশ্য কারণ রয়েছে, কাঙ্ক্ষাপূর্তি যে সহজ নয়, ক্ষতি এড়ানোও যে প্রায়ই অসম্ভব হয়ে ওঠে, তার জন্যে স্বল্পবুদ্ধি অসহায় মানুষ কল্পনা করেছে অরিশক্তি ও মিত্রশক্তি। ভয়ে অরিশক্তির স্তব স্তুতি করে তাকে তুষ্ট রেখে রোগ-মৃত্যু খাদ্যাভাব প্রভৃতি এড়ানোর লক্ষ্যে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর মিত্রশক্তির স্তব-স্তুতি-পূজা-উপাসনা করে মিত্রশক্তির আশ্রয়প্রাপ্তির ভরসায়। সাহায্য পায় বলেই মিত্রশক্তির প্রতি ভক্তি, ক্ষতি করে বলেই ভয় পায় অরিশক্তিকে।

অতএব সংস্কৃতির তথা সমাজবদ্ধ মানুষের ব্যক্তিক ও যৌথজীবনের চর্যার নীতিনিয়মের, রীতিরেওয়াজের, প্রথা-পদ্ধতির, আচার-আচরণের উৎস হচ্ছে অদৃশ্য, কল্পিত, অলীক, অলৌকিক, অমোঘ অপ্রতিরোধ্য প্রাকৃত শক্তি, যা সর্বপ্রাণবাদ দিয়ে শুরু হয়ে দার্শনিক চিন্তা-চেতনা-মনন-মনীষা-জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি প্রয়োগে মন-মত-মন্তব্য সিদ্ধান্ত যুক্ত হয়ে, ন্যায়শাস্ত্রভুক্ত হয়ে, বিশ্বাস-সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের স্রষ্টা বা ঈশ্বরপ্রোক্ত শাস্ত্ররূপে অবশ্য মান্য হয়ে তার ঐহিক পারলৌকিক জীবন নিয়ন্ত্রিত করছে বলে তার নিশ্চিত বিশ্বাস। যদিও এ প্রত্যয়মাত্র, এতে যুক্তিগ্রাহ্য সত্য তথ্য ও তত্ত্ব নেই। স্রষ্টা কে, কেন তিনি জগৎ [Universe] সৃষ্টি করেছেন, তার আদর্শ কি, উদ্দেশ্য কি? কিংবা মানুষকে অনুগত রেখে তোয়াজ-স্তুতি পেয়ে তাঁর কি লাভ? তিনি তাঁর ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগে তাঁর কাঙ্ক্ষিত পথে বা কাজে এদের চারিত করেন না কেন? শাসকের মতো শাসনপাত্রকে ভয়ে ভীত রাখা কি ঈশ্বরে শোভা পায়? স্রষ্টা যদি থাকতেন, তা হলে তিনি এক এক সময়ে এশিয়ার এক এক গোত্রের, গোষ্ঠীর ও অঞ্চলের মানুষকে বিপরীতমুখী আদেশ-নির্দেশ-পরামর্শ-উপদেশ দিতেন না। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষকে ভিন্নরূপ নির্দেশ দিয়ে মানুষে মানুষে কোন্দলের কারণ ঘটাতেন না। আজো লোকে জানে না যে স্রষ্টা বা ঈশ্বর পুরুষ না নারী, সাকার বা নিরাকার। স্বয়ম্ভু যদি হন, তা হলে কবে থেকে? তার আগে কে ছিলেন, কি ছিল, স্বয়ম্ভু হবার জন্যে তিনি সময় ও স্থান [Time and Space] পেলেন কার কাছ থেকে? সময় ও কাল কর সৃষ্টি, তাঁর অস্তিত্বে আসার জন্যে, স্থিতি পাওয়ার জন্যে এবং জগৎ [Universe] সৃষ্টির জন্যে এ শূন্য স্থানকে নির্মাণ করে কে রেখে ছিল? কিংবা তিনিই বা এ অসীম-অশেষ শূন্যতা পেলেন কিভাবে? এ পতিত শূন্যতা কেন ছিল, কিভাবে ছিল, শূন্যতা তো Time and Space সাপেক্ষ। একালে বিজ্ঞানীরা বলছেন কোন একক কারণে কিছু ঘটে না, নির্মিত হয় না, অ্যাটমের মধ্যেও অণুতর উপাদান থাকে, ইলেকট্রন প্রোটন নুট্রনেরও নাকি অণুউপাদান রয়েছে। তাই যদি হয়, তাহলে স্বয়ম্ভু তত্ত্বটা নতুন করে যুক্তিগ্রাহ্য করতে হবে পরোক্ষ তথ্য প্রমাণযোগে। অথচ ১৯৯২ সনেও আমাদের বিশ্বাস-সংস্কারের তথা ঈশ্বরবাদের কিংবা শাস্ত্রে আস্থার উৎস হচ্ছে জ্ঞান নামে চালু বিস্ময়-কল্পনা-অনুমান-ভয়-ভক্তি-ভরসা, যেগুলোর যৌক্তিক কিংবা বৌদ্ধিক ভিত্তি নেই মোটেও। বুদ্ধিমান লোকে আগেও এসব বুঝত, এখনো বোঝে, কিন্তু ভীত ও সংশয়াচ্ছন্ন বলে সাহস পায় না অস্বীকার করতে, তাই বলে 'বিশ্বাসে মিলায় ঈশ্বর, তর্কে বহুদূর।' শাস্ত্রে আস্থামাত্রই তা-ই বিশ্বাস নির্ভর। পুরুষের উপর বিরক্ত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন তাই একবার যুক্তি দিয়ে শাস্ত্রীদের লা-জবাব জব্দ করেছিলেন এ বলে–"আমাদিগকে অন্ধকারে রাখিবার জন্য পুরুষগণ ঐ ধর্মগ্রন্থগুলিকে ঈশ্বরের আদেশপত্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ... পুরাকালে যে-ব্যক্তি প্রতিভার বলে দশজনের মধ্যে পরিচিত হয়েছেন। তিনিই আপনাকে দেবতা কিংবা ঈশ্বরপ্রেরিত দূত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন এবং অসভ্য বর্বরদিগকে শিক্ষাদিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ক্রমে যখন পৃথিবীর অধিবাসীদের বুদ্ধি-বিবেচনা বৃদ্ধি পাইয়াছে, সেইরূপ পয়গম্বরদিগকে [অর্থাৎ ঈশ্বরপ্রেরিত মহোদয়দিগকে এবং দেবতাদিগকেও বুদ্ধিমান হইতে বুদ্ধিমানতর দেখা যায়। ... এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধর্মগ্রন্থগুলি পুরুষরচিত বিধি-ব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে। ... যাহা হউক, ধর্মগ্রন্থসমূহ ঈশ্বরপ্রেরিত কি-না তাহা কেহই বলিতে পারে না। ... দূতগণ ইউরোপে যান নাই কেন? ... ঈশ্বর কি কেবল এশিয়ার ঈশ্বর? আমেরিকায় কি তাঁহার রাজত্ব ছিল না? ঈশ্বরদত্ত জলবায়ুতো সকল দেশেই আছে। কেবল দূতগণ সব দেশে ব্যাপ্ত হন নাই কেন?" ['আমাদের অবনতি,' প্রবন্ধ, *নবনূর* পত্রিকার ১৩১১ সনের ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত]

৫.

মানুষের সংস্কৃতির প্রধান উৎস ঈশ্বরপ্রোক্ত ধর্মশাস্ত্র ও তার আনুষঙ্গিক নীতিনিয়ম, রীতি - রেওয়াজ, আচার-আচরণ এবং পালা-পার্বণ। যদিও মানুষ অদৃশ্য-অপ্রত্যক্ষ-অনুমিত ঈশ্বরতত্ত্বে প্রমাণাভাবে তেমন দৃঢ় আস্থা রাখে না। সমাজের ভয়ে এবং অজ্ঞেয়তার দরুন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নিয়ে ভয়-ভরসা রেখে পারলৌকিক অনিশ্চয়তার শঙ্কাভীরু মানুষ সাধারণভাবে ঈশ্বরবাদী ও শাস্ত্রানুগত। কিন্তু ঈশ্বর অন্তর্যামী জেনেও প্রলোভন প্রবল হলে আস্তিক মানুষ করে না হেন অপকর্ম-অপরাধ নেই। আসলে সে অনিশ্চিত শোনা পারত্রিক তিরস্কার-পুরস্কারের পরোয়া করে না জরাজীর্ণ বার্ধক্যের পূর্বে। সে কেবল পার্থিব জীবনে লাভ-ক্ষতির হিসেব নিয়েই, ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগ চেতনা নিয়েই জীবনযাপন করে। স্বর্গপ্রত্যাশা কিংবা নরকভীতি জাগে তার শরীর যখন জড়তা ও জীর্ণতার শিকার হয় তখন, কেননা শৈশবে-বাল্যে আত্মা যে অমর এ তত্ত্বে তার মগজধোলাই হয়েই রয়েছে। কাজেই জ্ঞাত-অজ্ঞাত পাপভীতি তাকে পেয়ে বসে বলেই সে তখন দিবা-রাত্রির জাগ্রত মুহূর্তগুলোতে ফাঁসির হুকুমপ্রাপ্ত কয়েদীর মতো ঈশ্বরের কৃপা-করুণা ক্ষমা প্রার্থী হয়ে দুঃসহ মানসিক ও মনস্তাত্ত্বিক দুঃস্বপ্নে অতিবাহিত করে। আর যে নিরীশ্বর, তার বাঁচার আগ্রহ ও আনন্দ থাকে বটে, কিন্তু মৃত্যুচিন্তা তাকে ভীত করে না, কেননা মৃত্যু মানে চেতনার বিলুপ্তি বা অবসান। চেতনাই তার আত্মা, যা অমর বা চিরন্তন নয়। তাই চার্বাক বলতে পেরেছেন 'যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ। ঋণং কৃত্ত্বা ঘৃতং পিবেৎ। ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ।' অথবা উমর খৈয়ামের ভায়ায়ও বলা চলে, 'সব বুলি মিছা, শুনহ গোপনে একটি বচন সত্যসার/যে ফুল নিশীথে পড়িছে ঝরিয়া, সে নাহি কখনো ফুটিবে আর।' এ জন্যেই নিরীশ্বরের মর্ত্য আছে, স্বর্গ-নরক নেই। তাই বলে নিরীশ্বরেরা সমাজ-সদস্যরূপে সমাজের নীতি-নিয়ম রীতি-রেওয়াজ প্রথা-পদ্ধতি দ্রোহী নয়, কারণ তারাও যৌথজীবনে সম ও সহস্বার্থে সংযমে সহিষ্ণুতায় সহযোগিতায় সহাবস্থানে জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি বিবেক বিবেচনা নিয়ন্ত্রিত জীবনযাত্রায় অঙ্গীকারবদ্ধ থাকে। এ জন্যে নাস্তিকরা সাধারণভাবে নৈতিক চরিত্রে অন্য আস্তিকদের থেকে উন্নত থাকে। নিরীশ্বর হতে জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-মানসশক্তি সংস্কারমুক্ত নির্ভীকতাঋদ্ধ মন-মনন-মনীষা প্রয়োজন। ধীরবুদ্ধির ও নৈয়ায়িক চেতনার প্রয়োজন। শাস্ত্র ব্যতীত লোকাচার এবং দেশাচার ও সংস্কৃতির তথা আচার-আচরণের অন্যতর উৎস। সমাজে অন্যদের সঙ্গে বাস করতে গেলে তাদের মন-রুচি-ইচ্ছা প্রভৃতিকে প্রশ্রয় দিতে হয়, তাল মিলিয়ে চলতে হয়।

আগেই বলেছি 'সংস্কৃতি' মূলত সৃজনশীলতা, নতুন ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ, আবিষ্কার-উদ্ভাবন, তৈজস-আসবাব থেকে বিভিন্ন ব্যবহার্য সামগ্রীর উদ্ভাবনে জীবনযাত্রায় সৌকর্য, সৌন্দর্য ও সুরুচির ক্রমোৎকর্ষ সাধন প্রয়াসই সংস্কৃতির তথা আচার-আচরণের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্যতর উৎস। সমাজে অন্যদের সঙ্গে বাস করতে গেলে তাদের মন-রুচি-ইচ্ছা প্রভৃতিকে প্রশ্রয় দিতে হয়, তাল মিলিয়ে চলতে হয়।

আগেই বলেছি সংস্কৃতি মূলত সৃজনশীলতা, আবিষ্কার-উদ্ভাবন, নতুন ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ, তৈজস-আসবাব থেকে বিভিন্ন ব্যবহার্য সামগ্রীর উদ্ভাবনে জীবনযাত্রায় সৌকর্য, সৌন্দর্য ও সুরুচির ক্রমোৎকর্ষ সাধন প্রয়াসই সংস্কৃতিমানতা। একের মেধা-মনীষার ফসল অনুকারক-অনুসারকদের আচারমাত্র। তবু একে আমরা সাধারণভাবে দৈশিক, শাস্ত্রিক, রাষ্ট্রিক, জাতিক কিংবা আঞ্চলিক বা সাম্প্রদায়িক সংস্কৃতি নামে অভিহিত করে থাকি।

এমন এমন কৌম, গোষ্ঠী, গোত্র, জাতি, দেশ, কাল ছিল এবং আজো রয়েছে যারা আবিষ্কার-উদ্ভাবনবিমুখ, গতানুগতিকতায় তুষ্ট ও তৃপ্ত। কাঙ্ক্ষাহীন, জিজ্ঞাসারিক্ত কৌতূহলশূন্য। তাদের নিজেদের আবিষ্কার নিতান্ত স্থূল তুচ্ছ ও নেহাত সামান্য। দুনিয়ার অধিকাংশ আরণ্য গোত্র তাই আজো আদি ও আদিম প্রজাতি পর্যায়ে রয়েছে।

আবার যারা নিজেরা আবিষ্কার-উদ্ভাবন-সৃষ্টি করতে পারে নি বা পারে না বটে, কিন্তু জীবনযাত্রার অনুকূল সৌকর্যে, সৌন্দর্যে, সুরুচিতে আকৃষ্ট, তারা অনুকরণ-অনুসরণ করে সংস্কৃতি-সভ্যতায় অগ্রসরমাণ বা প্রাগ্রসরদের সঙ্গে সমতালে পা ফেলে এগিয়ে যায়। যেমন একালে আমরা প্রতীচ্যের অনুকৃত সংস্কৃতি-সভ্যতার–মানসিক ও ব্যবহারিক দুটোরই ধারক, বাহক ও প্রচারক। অনুকরণ-অনুসরণ করেই আমরা মনে-মননে-মনীষায় আত্মোন্নয়নে নিষ্ঠ।

আজো বহু আরণ্য মানব গোষ্ঠী-গোত্র রয়েছে, যারা নিজেরাও সৃষ্টিশীল নয় এবং নিজেরা একান্তই গ্রহণ বা অনুকরণ-অনুসরণবিমুখ, নিতান্ত রক্ষণশীল কূর্মপ্রবৃত্তির মানুষ, তাই আদিবাসী, উপজাতি নামে অভিহিত। গোষ্ঠীবদ্ধ বহু বহু বুনো ও আরণ্য সমাজ আদি ও আদিম মানব প্রজাতি হিসেবেই সর্বপ্রকারে জীবনযাপন করে। এ সূত্রে উল্লেখ্য যে আমরা বাঙালীরা বিদেশীর, বিজাতির, বিধর্মীর ও বিভাষীর ধর্ম, পোশাক, ভাষা, আচার-আচরণ, প্রাশাসনিক-নীতিনিয়ম, দর্শন, সাহিত্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য প্রভৃতি গ্রহণ-বরণ করেই হয়েছি সভ্য-ভব্য সংস্কৃতিমান আধুনিক মানুষ। যুক্তিবাদী না হলেও, বিশ্বাস-সংস্কার চালিত হলেও ব্যবহারিক বৈষয়িক রাষ্ট্রিক জীবনে-জীবনযাত্রার ও জীবনাচারের নানা ক্ষেত্রে অসামঞ্জস্য ও অসঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও আমরা অবশ্যই আধুনিকতম যন্ত্রযুগের যন্ত্রজগতের মানুষ। কিন্তু আমাদের আদি ও আদিম নিকট জ্ঞাতি গ্রহণবিমুখ, রক্ষণশীল বলেই আজো বুনোজীবন আরণ্যস্বভাব পুরো ছাড়তে পারে নি, আমি আমাদের জ্ঞাতি সাঁওতাল, মুন্ডা, হো, পাঞ্চা প্রভৃতির কথাই বলছি। আজো সুসভ্য মঙ্গোল গোত্রীয়দের বিচ্ছিন্ন ও আরণ্য জ্ঞাতিরাও নাগা-মিজু-কিন্নর-গারো-মার্মা কিংবা খাসিয়া প্রভৃতিরা গ্রহণবিমুখ, স্বাতন্ত্র্যে স্বস্তিপ্রিয় এবং কূর্মস্বভাবে স্বস্থ।

সবাই সবকিছুই ভৌগোলিক অবস্থানজাত নানা দুঃসাধ্য দুর্লক্ষ্য কারণে আবিষ্কার-উদ্ভাবন-সৃষ্টি-নির্মাণ-উৎপাদন করতে পারে না উপকরণ-উপাদান-আবহাওয়ার ও মাটি-পাথরের গুণগত পার্থক্যের দরুন। তাই বুদ্ধিমান গতিশীল আগ্রহী জনগোষ্ঠীরা একে অপরের সঙ্গে লেনদেন করে ভাব-চিন্তা-কৌশল-প্রকৌশল-প্রযুক্তি-চিকিৎসাবিদ্যা কিংবা রসায়ন-পদার্থ বিদ্যা বিনিময় করে সংস্কৃতি-সভ্যতা ক্ষেত্রে এগিয়ে গেছে, যাচ্ছে এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাবে। যেমন আফ্রো-এশিয়া-লাতিন আমেরিকা-নিউজিল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার লোকেরা প্রতীচ্যে উদ্ভূত ও সৃষ্ট সামগ্রী, বিদ্যা-কলা-কৌশল-প্রকৌশল-প্রযুক্তি নিয়ে প্রতীচ্যবাসীর মতোই তাদের আদলেই জীবন-যাপনপদ্ধতি রচনা করে সুখী, তৃপ্ত ও তুষ্ট।

অতএব সংস্কৃতি হচ্ছে মানবসম্পদ। যে-কোন নতুন চিন্তায়-চেতনায় নির্মাণে-উদ্ভাবনে সর্বমানবের রয়েছে উত্তরাধিকার। একে Human heritage রূপেই বরণ করতে হয় আত্মকল্যাণের গরজেই।

৬.

সংস্কৃতিকে সমাজের মানুষের নৈতিক, শৈক্ষিক, ধার্মিক, বার্ণিক, বৃত্তিক এবং বিত্ত-বেসাত-সম্পদ সম্পৃক্ত অবস্থা ও অবস্থানভেদেও নানা স্তরে বিভক্ত করা যায় এবং বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়ও। যেমন কম্যুনিস্ট বা সমাজবাদীদের মতে সংস্কৃতিতেও শ্রেণীভেদ বা রকমফের রয়েছে, শাহ-সামন্ত, বেণে-বুর্জোয়া, চাষী-মজুর, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত এবং শিক্ষা-প্রশিক্ষণ ভেদে সংস্কৃতি তথা ব্যক্তি মানুষের ভাব-চিন্তা-রুচি স্বভাব-চরিত্র প্রভৃতিতেও প্রভেদ পার্থক্য দেখা যায়। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, কিংবা ধনী ও দরিদ্র দুই সহোদরের মধ্যেও ভাব-চিন্তা-রুচি-জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-বিবেক-বিবেচনা সংযম-সহিষ্ণুতা-লিপ্সা-ক্ষমা প্রভৃতির মান মাপ মাত্রা ভেদ থাকেই। কাজেই এ বিশেষ অর্থে ও তাৎপর্যে সংস্কৃতিতে বা আচারে-আচরণে অভিব্যক্তিগত তথা প্রয়োগ-প্রকাশগত ব্যক্তিক বৈষম্যও বর্তমান। সৈয়দ মোতাহার হোসেন চৌধুরী অজ্ঞলোকের অনুকৃত-অনুসৃত সংস্কৃতির এবং বিদ্যা-বিবেক-রুচিমান স্বশিক্ষিত মানুষের স্বরচিত বা স্বঅনুসৃত সংস্কৃতির পার্থক্য নির্দেশক একটা সংজ্ঞা দিয়েছেন। তা এই : ধর্ম অজ্ঞ-অনক্ষর লোকের সংস্কৃতি। আর সংস্কৃতিই শিক্ষিত বিবেকী রুচিমানের ধর্ম। 'ধর্ম সাধারণ লোকের কালচার, আর কালচার শিক্ষিত মার্জিত লোকের ধর্ম'। [– সৈয়দ মোতাহার হোসেন চৌধুরী]। কাজেই সংস্কৃতির শ্রেণীচরিত্র আছে। যেমন সাহিত্যেও প্রতিফলিত রয়েছে শ্রেণীচরিত্র বা চেতনা, আর লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্য তো আমরা সার্বক্ষণিক উচ্চারণে প্রকাশ ও প্রচার করি। অশিক্ষিত গেঁয়ো হলেই 'ফোক' Folk আর শিক্ষিত শহুরে হলেই তথা বিদ্যা-রুচি-বুদ্ধি-সংস্কৃতি যা-ই থাক, সাফকাপুড়ে হলেই 'মানুষ' হয়। এ হচ্ছে মানুষকে স্বজাতিকে জ্ঞাতিকে অপমানিত করার গান্ধীর 'হরিজন' মার্কা পরিভাষা। এখনো বর্ণের বৃত্তির প্রতি ঘৃণা ঘোচেনি। এখনো লোকে কুকুর-বিড়াল কোলে নিয়ে আদর করে বটে কিন্তু মানুষের স্পর্শে সেই লোকই অপবিত্র হয়।

৭.

একালে ডারুইন, কার্ল মার্কস, ফ্রয়েড, পাভলভ, অ্যাডগার, সাত্র এবং এখনকার মনোবিজ্ঞানীরা মানুষের শাস্ত্রের, সংস্কারের ও বিশ্বাসের দুর্গের দেয়াল নানাভাবে ভেঙে মানুষকে যুক্তিবাদী করেছে, করছে এবং দ্রুত ও বিচিত্র বৈজ্ঞানিক সত্যের তথ্যের এবং তত্ত্বের আবিষ্ক্রিয়া এবং নানা যন্ত্রের বিস্ময়কর বিচিত্র ব্যবহারযোগ্যতা রেডিয়ো, টিভি, সিনেমা, ক্যাসেট, বেতারবার্তা, জল-স্থল-আকাশ যানের উৎকর্ষ, জল-স্থল-আকাশচারিতার সহজতা ও বিস্ময়কর বিচিত্র ও বিবিধ জ্ঞান-অভিজ্ঞতা, যন্ত্রের ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকৌশলের প্রয়োগবৈচিত্র্য, প্রভৃতি পৃথিবীকে একক বাজারকেন্দ্রী চারপাশের জনপদের মতো নিকটবর্তী ও পরিচিত করেছে, হ্রাস করেছে ভৌগোলিক ব্যবধান, শহুরে শিক্ষিত লোকের মধ্যে এক অভিন্ন বৈশ্বিক আচার-আচরণ তথা প্রাত্যহিক জীবনযাত্রাপদ্ধতি চালু করেছে। কিছুকালের মধ্যেই গোটা বিশ্ব আচারে-আচরণে, পোশাকে খাদ্যে ঘরোয়া ও সামাজিক জীবনযাপনপদ্ধতিতে হবে প্রায় অভিন্ন, কেবল গায়ের রঙ ও চেহারা আর ভাষাই থাকবে বিভিন্ন–আর স্থানিক অবস্থানও। অনুমানে প্রমাণে বলা চলে পৃথিবীতে ইংরেজী ভাষা এবং যুক্তরাষ্ট্রের ডলারই হবে সর্বজন বোধ্য ভাষা ও গ্রাহ্য মুদ্রা।

কাজেই সংস্কৃতিও স্থানিক, গৌত্রিক, জাতিক, ধার্মিক, সাম্প্রদায়িক রূপ হারিয়ে রূপান্তরে বৈশ্বিক হয়ে উঠবে এমন কথাও হয়তো স্বপ্ন-সংশয় নিয়ে উচ্চারণ করা সম্ভব হবে অদূর ভবিষ্যতে।

এখন মানস সংস্কৃতির বাঞ্ছিত সংজ্ঞা কিভাবে দেব? দিলেও তা সর্বজনগ্রাহ্য হওয়ার সম্ভাবনা কম। কেননা, প্রথমত যত মন তত মত, তত পথ এবং তত প্রকার যুক্তি আর সিদ্ধান্তও। তবে যথার্থ সংস্কৃতি যে মানবতার পূর্ণবিকাশ নির্ভর, তা নিয়ে সম্ভবত তর্ক চলে না। এজন্যেই বলেছি পরিপূর্ণভাবে বিকশিত, উৎকর্ষপ্রাপ্ত মানবিকগুণের-মানের-মাপের-মাত্রার সমষ্টিই মনুষ্যত্ব। তা হলে মনুষ্যত্ব ইন্দ্রিয় সংযম-দমন-নিয়ন্ত্রণভিত্তিক। মনুষ্যত্ব সম্পন্ন ব্যক্তি যেহেতু যুক্তিবাদী ও বিবেকবান, সে বিচারে সর্বদা ও সর্বথা নির্ভীক ও নিরপেক্ষ [Fear and favour বিহীন]। সে জেনে বুঝে যা বলতে, করতে, দেখতে, শুনতে কুৎসিত এবং কারো না কারো পক্ষে অন্যায়ভাবে ক্ষতিকর, তা থেকে বিরত থাকে। সে সর্বাবোস্থায় জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-বিবেক-বিবেচনা-নীতিনিয়ম ও আদর্শ প্রভৃতির অনুগত থাকার জন্যে সতর্ক সযত্ন প্রয়াসী থাকবে। সে হবে সংযত, সহিষ্ণু, উপচিকীর্ষু, সুজন সজ্জন। সে কথায় কাজে ও মতপথে অভিন্ন। সে নিজের জন্যে যে দুঃখ, যে ক্ষতি, যে যন্ত্রণা কামনা করে না, অন্যের জন্যেও তা কখনো তার কাম্য হবে না। সে Live and let others live তত্ত্বে থাকবে আস্থাবান সহিষ্ণু সজ্জন। তার আচারে-আচরণে থাকবে সহিষ্ণুতা, সহৃদয়তা ও সৌজন্য। সততা ও আদর্শ নিষ্ঠাই সংস্কৃতিমানের আচারিক ও ব্যবহারিক লক্ষণ, সংস্কৃতিমান কখনো বহুরূপী হতে পারে না। সে কেবল ভদ্রলোক হবে না, ভালো মানুষ হবে। অর্থাৎ সাফকাপুড়ে মাত্রই সংস্কৃতিমান নয়।

৮.

এখানে আরো একটি কথা বলে নিতে হয়। লেখাপড়া জানা এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েও সাধারণত খুব কম লোকই জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তিবাদী হয়, তারা শৈশবে-বাল্যে-কৈশোরে ভূতে-ভগবানে, নিয়তিতে, তিথিতে লগ্নে-গ্রহে-রাশিতে যে আস্থারূপ মগজধোলাই পেয়েছে, তা থেকে মুক্ত হতে পারে না, অর্জিত বিদ্যাবুদ্ধি-যুক্তি-জ্ঞান-প্রজ্ঞা-বিচার-বিতর্ক প্রয়োগ করে না বলেই। তাই ঈশ্বরের সর্বময় ক্ষমতায় আস্থা রেখেও গ্রহ-নক্ষত্রের, তিথি-লগ্নের-রাশির প্রভাবে যে তার ভাগ্য বা জীবন নিয়ন্ত্রিত, তাও স্বীকার বা বিশ্বাস করে। এ অসঙ্গতি বা অযৌক্তিক অবৌদ্ধিক অসামঞ্জস্য তার মন-বুদ্ধির অগোচর থাকে। রাশিই যদি, হস্তরেখাই যদি তার জীবন নিয়ন্ত্রণ করে, তা হলে ঈশ্বর কি করেন? তাঁর শক্তির প্রয়োগ কোথায় হয়, তিনি কি সাংসদীয় সরকারের নামমাত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাক্ষীগোপাল। শরীরের বা যে কোন বস্তুর যেখানেই ভাঁজ পড়ে, সেখানেই রেখা থাকে। হাতে নয় শুধু পায়েও এবং বার্ধক্যে সর্বাঙ্গ রেখায়িত হয়ে যায় জরাজীর্ণ কুঞ্চিত ত্বকের দরুন। আকাশের নক্ষত্র কি জীবন নিয়ন্তা এ বিজ্ঞানের যুগেও? যখন মানুষের যন্ত্র ও পা গ্রহ-উপগ্রহ স্পর্শ করছে, মানুষ ওগুলোর প্রকৃতি ও বাস্তব জড়রূপ প্রত্যক্ষ করছে, তখনও গণক, নজুম, জ্যোতিষ শিক্ষিত লোকের আস্থাভাজন সর্বজ্ঞ ব্যক্তি। সরকারী গোপন তথ্যই ফাঁস করা যেখানে দুঃসাধ্য, অসাধ্য সেখানে ঈশ্বরের অভিপ্রায়, গ্রহ, নক্ষত্রের অভিপ্রায় জ্যোতিষ ফাঁস করে দিতে পারে। যেমন কোন রাষ্ট্রপতি কবে নিহত হবে, কোন দেশ মারী-খরা-ঝড় কবলিত হবে, কে পদচ্যুত বা পদোন্নতি পাবে ইত্যাদি। হাই-হাঁচি-কাশি-হুহুট-টিকটিকি-পেচক-ঘট-দীপ-ধূপ-মাছ-দই প্রভৃতির শুভাশুভ প্রতীকও এখনো শিক্ষিতজনের মন-বুদ্ধি আচ্ছন্ন করে রয়েছে।

তবু এর মধ্যেও পৃথিবীর নানাস্থানে মানব সংস্কৃতি মনীষী মনস্বী চিত্তে ও চরিত্রে মাঝে মধ্যে চরম ও পরম উৎকর্ষ লাভ করেছে। বিদ্যুতের মতো ক্ষণপ্রভা দিয়ে চমকে দিয়েছে, ইতিহাস পাঠককে। গ্রীক বিদ্যাবত্তা, রোমান প্রজ্ঞাবানদের চিন্তাচেতনা, রেনেসাঁস যুগের চিত্রী-কবি-স্থপতি-রাজনীতিক-দার্শনিক প্রমুখদের এবং ফরাসী মনীষীসৃষ্ট Enlightenment-এর কথাও আমরা স্মরণ করতে পারি। স্মরণ করতে পারে চৈনিক সংস্কৃতি, ঔপনিষদিক সংস্কৃতি, আকবরের আমলের মানবজিজ্ঞাসামূলক সংস্কৃতি, গ্রীক দর্শন-বিজ্ঞানচর্চামূলক বোগদাদীয় সংস্কৃতি, এমনকি আমাদের মধ্যযুগীয় দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণ্য দ্বৈতাদ্বৈতবাদী দর্শন প্রচারক দার্শনিকদের সংস্কৃতি কিংবা উত্তর ভারতের শূদ্র-সন্ত সংস্কৃতি আর আমাদের বাঙলার চৈতন্যচিত্তের ও চরিত্রের প্রভাবিত প্রেমবাদী মহাজন সংস্কৃতি এবং সর্বশেষে প্রতীচ্য শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রথম যুগের রামমোহন-বিদ্যাসাগর-বঙ্কিম-বিবেকানন্দ মনীষার মনস্বিতায় প্রকটিত সংস্কৃতি কি আমরা উপেক্ষা করতে পারি? সর্বোপরি, মানবদরদী কার্ল মার্কস মানুষ মাত্রেরই দেহ-প্রাণ-মনের, জীবনের মূল্য-মর্যাদা-অধিকার স্বীকার করে নারী-শিশু-বৃদ্ধ আঁধা-কানা-খোঁড়া সব মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার রাষ্ট্রিক দায়িত্ব ও কর্তব্যের তত্ত্ব ঘোষণা করে মানুষের বাঁচার জন্মগত অধিকার উপলব্ধি করে পরম মনুষ্যত্বের ও চরম সংস্কৃতিমানতার স্বাক্ষর রেখেছেন। মারণাস্ত্র তৈরি করার জন্যে যারা জীবনপণ গবেষণা করছে আর রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কারের প্রয়াসে জীবন উৎসর্গ করছে, তাদের উদ্দেশ্য আপাত বিপরীত হলেও এ-ও মানবিক শক্তির সু ও কু প্রয়োগ হলেও, কিন্তু এর মধ্যেও মনুষ্যশক্তির বিস্ময়কর বিচিত্র বিকাশ ও প্রকাশ অস্বীকার করা যায় না। অস্ত্রনির্মাতাদের মধ্যে আইনস্টাইনও রয়েছেন, কাজেই এ মারণাস্ত্র মানুষকে হননের ও বাঁচানোর লক্ষ্যেই নির্মিত। অর্থাৎ দুর্জনকে হানার জন্যে এবং দুর্বলকে রক্ষার জন্যে, শক্তির ভারসাম্য রাখার জন্যে, শান্তি বজায় রাখার জন্যে এরও প্রয়োজন হয়েছে এ শতকে। দুষ্টের দমনের ও শিষ্টের পালনের জন্যেও শক্তি চাই, চাই অস্ত্র। কাজেই একে সংস্কৃতিবিরোধী বর্বর কর্ম বলে নিন্দা করা চলে না। দুষ্ট দুর্জন দুর্বৃত্ত দুষ্কৃতী প্রভৃতিকে বহু জনহিতের বহুজন সুখের জন্যে প্রয়োজনে নিষ্ঠুরভাবে হনন করেও দমন বা উৎখাত করতে হয়।

তাছাড়া আগেও বলেছি সংস্কৃতির উন্মেষ ব্যক্তিমনে, সংস্কৃতি ব্যক্তির সৃষ্টি আর তা সমাজের অনুকৃত আচার-আচরণ মাত্র এবং ব্যক্তির আবিষ্কৃত-উদ্ভাবিত বস্তু-যন্ত্র-কৌশল-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকৌশল-প্রযুক্তি মানুষের বা সমাজের ব্যবহার্য ভোগ্য-উপভোগ্য-সম্ভোগ্য সম্পদ। কাজেই একই সময়ে একই ঘরে পরিবারে, সমাজে পরিশীলিত চিত্তের বিকশিত মানবিক গুণের মানের, মাপের, মাত্রার আদর্শ সংস্কৃতিমান মনুষ্যত্বসম্পন্ন এক বা একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে অবিকশিত মানবিক গুণের তথা কেবল আকৃতিতে-প্রকৃতিতে মানুষরূপী, মানবপ্রজাতির অসংখ্য প্রাণী থাকে। তারা সমাজের নিন্দার এবং সরকারী শাস্তির ভয়েই কেবল বাহ্যত নিরীহ ও শায়েস্তা থাকে। সুযোগ পেলেই কাড়া-মারা-হানা, জেনা-ধর্ষণ, লুট-দাঙ্গা প্রভৃতি করে না, হেন কর্ম নেই। নরহত্যায় এদের উল্লাস পূজা-কুরবানীর পশু-পাখি হত্যার আনন্দ-উল্লাসের চেয়ে মাত্রায় কম নয়। আজো নরহত্যার জন্যে সভ্যতম সমাজে ভাড়াটে লোক মেলে, আজো লোকে স্ত্রী বা স্বামী হত্যা করে নির্দ্বিধায়, আজো গুণ্ডা-মাস্তান-খুনী ভাড়া করে রাজনীতি করা চলে, জমি দখল চলে, নারীহরণ চলে, সবচেয়ে বড় কথা স্থল-জল-বায়ু সেনা মেলে। এ চাকুরীর শর্তই হচ্ছে নিহত হবার ঝুঁকি নিয়ে দেশের বা রাষ্ট্রের বা সরকারের শত্রুহত্যায় নিপুণ নিষ্ঠুর হওয়া। সুজন-সজ্জন ন্যায়বান-বিবেকবান মানুষের সংখ্যা দুনিয়ার সব গোষ্ঠীতে, সমাজে ও রাষ্ট্রে এতো কম যে হত্যায় প্রস্তুত সেনাদলের প্রয়োজনও আজ অবধি অস্বীকার করা যায় না। সব মানুষ যেহেতু প্রাণীর সহজাত বৃত্তিপ্রবৃত্তি ও আজন্মলালিত অলীক অলৌকিক কাল্পনিক বিশ্বাস-সংস্কার ভয়-ভরসা থেকে মুক্ত হতে পারবে না, চেষ্টাও করবে না, সেহেতু মর্ত্যভূমি কখনো স্বর্গলোক হবে না। কাম ক্রোধ লোভ ঈর্ষা হিংসা ঘৃণা প্রতিহিংসা প্রভৃতি রিপুমুক্তও হবে না কখনো।

তবু আভাসে ইঙ্গিতে ভাবে ভঙ্গিতে, উচ্চারিত ভাষায় সংস্কৃতিকে সংজ্ঞাবদ্ধ করতে প্রয়াসী হচ্ছি একশ চৌষট্টিটা সংজ্ঞা প্রতীচ্য জগতে চালু থাকা সত্ত্বেও, এবং সেখান থেকে নেয়া অনেক সংজ্ঞা আমাদের মন-মত-মগজমত হওয়া সত্ত্বেও।

সংজ্ঞাবদ্ধ করলে বলা চলে কোন দেশের বা সমাজের বা সম্প্রদায়ের মানুষের শ্রেয়োচেতনাজাত পরিস্রুত ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচার-আচরণের প্রাত্যহিক বা সার্বক্ষণিক অভিব্যক্ত রূপই তার সংস্কৃতি। এ সংস্কৃতি গুণে মানে মাত্রায় স্থূলও হতে পারে কিংবা বহুপরিশীলনে মনন-মনীষার পরিমার্জনায় সূক্ষ্ম, সুন্দর, সুরুচি ও সৌজন্য জ্ঞাপকও হতে পারে। একটা কৌম-গোষ্ঠী-গোত্র-শাস্ত্রিক সমাজ, দৈশিক বা রাষ্ট্রিক জাতি কিংবা মতবাদী সম্প্রদায় প্রভৃতির শ্রেষ্ঠগুণের, কর্মের, ব্যবহার্য সামগ্রীর ও রুচির প্রকাশিত রূপই তার সংস্কৃতি। অতএব গুণ মান মাপ মাত্রভেদ সত্ত্বেও কৌম, গোষ্ঠী, গোত্র, কিংবা শাস্ত্রিক সমাজ বা রাষ্ট্রিক জাতিগুলো স্ব স্ব স্থানে কালে ও সমাজে শাস্ত্রে চৌষট্টিকলা, এবং মানবপ্রীতি, সংযম, সৌজন্য, দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যচেতনা, ন্যায় ও শ্রেয়স বোধ জ্ঞাপক এবং জ্ঞান বুদ্ধির উপরে যুক্তির, প্রজ্ঞার ও বিবেকের গুরুত্ব চেতনা প্রভৃতির অধিকাংশই তাদের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি। শেষের কবিতায় রবীন্দ্রনাথ-উক্ত কমলহীরের চোখে চমক লাগানো কমলহীরের প্রভা স্মরণে রেখে চলা চলে 'যা কিছু মানসিক ও ব্যবহারিক স্থূল প্রয়োজনের অতিরিক্ত, তা-ই রুচির ও সংস্কৃতির প্রসূন। শীত নিবারণের জন্যে সূতীর বা পশমের চাদর প্রয়োজনীয়, আর তার জমির রঙিন চিত্রিত রূপ ও লাবণ্য সৌন্দর্য তৃষ্ণারই অভিব্যক্তি। অতএব যা কিছু বাহ্যত প্রয়োজনাতিরিক্ত, কেবল মনের ও চোখের সৌন্দর্য তৃষ্ণা মেটানোর লক্ষ্যে শোভা বৃদ্ধির প্রয়াস প্রসূন, তা-ই সংস্কৃতি। তাই রোদ-বৃষ্টি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিবারক কবরগৃহ তাজমহলের সৌন্দর্যটা সংস্কৃতির প্রতীক, প্রতিম ও প্রতিভূ, শাহজাহানের সংস্কৃতির অভিব্যক্তি এবং তার সংস্কৃতিমানতার স্বাক্ষর। আর তার তাৎপর্য অনুসরণে সংস্কৃতির সংজ্ঞারূপে বলা চলে আচরণে সুরুচি ও সৌন্দর্যবুদ্ধিজাত সৌজন্য, নির্মিত সামগ্রীতে শ্রী, যন্ত্রে উৎকর্ষ, চিন্তায় শ্রেয়োবুদ্ধির দীপ্তি, কর্মে কল্যাণচেতনার ব্যঞ্জনা কথায় সৌজন্যের আভা, সজ্জায় সৌন্দর্য, আলাপে আন্তরিকতার ও বিনয়ের মাধুর্য, চোখে প্রীতি-প্রসন্নতার প্রভা এবং জীবনাচারে সম ও সহস্বার্থে স্বাধিকারে সংযমের, সহিষ্ণুতার, সহযোগিতার ও সহাবস্থানের প্রয়োজনীয় গুণের বা প্রত্যাশিত আচার-আচরণের বা ব্যবহার নীতিরীতির অনুশীলনে ও প্রয়োগে আগ্রহ আর সুরুচির ও সৌজন্যের সামগ্রিক লাবণ্যই সংস্কৃতি।' ভব্য সমাজে সংস্কৃতি জ্ঞানে-প্রজ্ঞায় মনীষায় শ্রেয়োবাদী বিবেকমান মানুষের ব্যক্তিগত উঁচুমানের ও অনন্য অসামান্য মনন চিন্তন মনীষার প্রসূন বা ফসল। একের সৃষ্টি সমাজের সবার গ্রহণে-বরণে অনুকরণে-অনুসরণে হয়ে ওঠে দৈশিক সাম্প্রদায়িক সামাজিক আচার-আচরণ, রীতি-রেওয়াজ, নীতি-নিয়ম বা প্রথা-পদ্ধতি। এ আচার-আচরণর নিত্য প্রকটিত রূপই জাতিক বা দৈশিক কিংবা সামাজিক ভাষিক বা ধার্মিক সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি নামে স্থূল সংজ্ঞায় অভিহিত বা পরিচিত কিংবা চিহ্নিত হয়। সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞায় যথাসময়ে ও যথাপ্রয়োজনে উঁচুমানের মানবিক গুণের যথা সংযম, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা-কৃপা-করুণা-দয়া-দাক্ষিণ্য-সহানুভূতি-সৌজন্য-সুরুচি-সৌন্দর্যবোধের এবং স্নেহ-প্রীতি-মমতার অনুশীলনে সমাজে সহস্বার্থে সহযোগিতায় সহাবস্থানের যোগ্যতা অর্জনই সংস্কৃতি।

মনে রাখা প্রয়োজন সংস্কৃতির উৎকর্ষ ও প্রবহমানতা বা গতিশীলতা যে-কোন ও যে-কারো উন্নত শ্রেয়স্কর সৃষ্টি উদ্ভাবন-আবিষ্কার-গ্রহণ-অনুকরণ-আত্মীকরণ নির্ভর এবং কালান্তরে স্থানান্তরে এমনকি প্রজন্মান্তরে উপযোগরিক্ত আচার-আচরণ, নীতিনিয়ম, নীতিরেওয়াজ বর্জনশীলতার মতো মুক্তবুদ্ধি, যুক্তিনিষ্ঠা এবং অভ্যাস ও সংস্কার পরিহারের সামর্থ্য আবশ্যিক। উন্নতমানের সংস্কৃতি মাত্রই দেশী-বিদেশী বিজাতি-বিভাষী-বিধর্মী নির্বিশেষের সংস্কৃতিরও শ্রেয়স্কর অংশের [এমনকি প্রেয়ো অংশেরও] মিশ্রণ-সমন্বয়-স্বাঙ্গীকরণ আত্মীকরণ জাত। অবিমিশ্র স্বকীয় সংস্কৃতি কেবল আদি ও আদিম মানব প্রজাতির কূর্ম স্বভাবের রক্ষণশীল কোন কোন আরণ্য গোত্রের মধ্যেই আজো লভ্য। এবং তা দৃশ্যত সামান্য অর্জিত আচরণ মাত্র। এতো তুচ্ছ যে তাকে আমরা সংস্কৃতি বলে স্বীকারও করিনে। এমনকি আধুনিক সভ্যরাষ্ট্রগুলোর মধ্যেও তেমন রক্ষণশীল প্রান্তবাসী আদি-আদিম অজ্ঞ অনক্ষর কৌম-গোষ্ঠী-গোত্র রয়েছে, যাদের আমরা একালের ভাষায় কোথাও আদিবাসী, কোথাও উপজাতি নামে আখ্যাত করি।

অতএব পৃথিবীর যেখানে যা কিছু ভালো, কল্যাণকর, জীবনাচারে উপযোগঋদ্ধ, যা সৌন্দর্যে সৌকর্যে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনোপভোগ উন্নততর করে, তা-ই নির্দ্বিধায় গ্রহণ-বরণ করাই প্রকৃত প্রাগ্রসর ও প্রবহমান তথা গতিশীল সংস্কৃতিমানতা। গ্রহণবিমুখ বন্ধ্যা সংস্কৃতি আচারমাত্র এবং তা শীতকালীন বদ্ধ জলাশয়ের মতো ক্ষীয়মাণ পচনশীল। গ্রহণ বা সৃষ্টি শূন্য বন্ধ্যা সমাজের মানসিক ও নৈতিক অবক্ষয় অনিবার্য। সংস্কৃতিমাত্রই চির বিকাশমান তরুলতার কিশলয়ের মতো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৯.

এবার অনেকের অপ্রিয় এবং যুগবিরোধী হলেও একটা সত্য কথা বলতে হচ্ছে। মানস ও ব্যবহারিক সংস্কৃতির বিকাশের জন্যে আর্থিক বা অর্থ-সম্পদের প্রাচুর্য প্রয়োজন। নিঃস্ব নির্ধনের সংস্কৃতিচর্চা চলে না। কেননা নিশ্চিন্ত নিশ্চিত অর্থসম্পদের প্রাচুর্য না থাকলে সংস্কৃতির অবক্ষয়ই সূচিত হয়। বন্ধ্যা হয় সৃষ্টি, অন্ন-বস্ত্র-নিবাসের অভাব মানুষের সবগুণ বিনষ্ট করে। এ জন্যেই সভ্যতা-সংস্কৃতির ধারক বাহক প্রচারক প্রবর্তক মাত্রই ছিলেন শাহ-সামন্ত বেণে-বুর্জোয়া সৌখিন সৌন্দর্যপ্রিয়, মান-যশ-খ্যাতি-ক্ষমতা-অমরত্বলোভী সব ধনী মানুষই। তাজমহল তৈরির জন্যে সম্রাটের প্রয়োজন, দীঘি খননের জন্যে স্থানীয়ভাবে ধনীলোক থাকা চাই। মন্দির মসজিদ গীর্জা সিনাগগ সমাধি সৌধ নির্মাণের জন্যে আর্থিক সঙ্গতি আবশ্যিক। তেমনি ভাস্কর্য, স্থাপত্য, চিত্রশিল্প-সাহিত্য প্রভৃতির জন্যেও উৎসাহী সমঝদার প্রতিপোষাক থাকা চাই-ই। আজ অবধি সমকালীন সংস্কৃতির বিকাশের জন্যে প্রতিবেশ নির্মাণে, পত্রিকা প্রকাশে, গ্রন্থ রচনায় মুদ্রণে প্রকাশনে প্রচারে প্রচারণায় অর্থবিত্তই হয়েছে সহায়ক। অর্থবিত্ত না থাকলে সন্তানকে বিদ্যালয়ে পাঠানো সম্ভব হয় না। আর আমরা জানি সব শাহ-সামন্ত-বেণে-সওদাগর-ধনীর সৃষ্টি ক্ষমতা ছিল না, ছিল ভোগ-উপভোগের বিবিধ বাঞ্ছা, সংস্কৃতির স্বপ্ন ও সাধ। মনন চিন্তন মনীষা, সৃষ্টিশীলতা কল্পনা-পরিকল্পনা ছিল ওদের অর্থে অনুগৃহীত জ্ঞানী-গুণী বিদ্বান সৃষ্টিশীল মনীষী মেধাবীর আয়ত্তে। ওরাই স্রষ্টা বা নির্মাতা। ওরাই মধ্যবিত্ত বা শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী। দুনিয়ার সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সভ্যতার নিদর্শন মাত্রই অর্থসম্পদ ব্যয়েরও সাক্ষ্য প্রমাণ, তা ময়েনজোদারো-হরপ্পা-কোটদিজি, অজন্তা-ইলোরাই হোক, গ্রীস-রোম ইরাক-ইরান, মধ্য এশিয়া কিংবা চীনা হোক এবং সবটাই শাহ-সামন্ত-বেণে-জমিদার প্রভৃতি বিত্তবানের মানস ও ব্যবহারিক প্রয়োজনেই তৈরি হয়েছে। সুতরাং প্রাচীন সংস্কৃতি-সভ্যতা যেমন শাহ-সামন্ত সওদাগরের বিলাসব্যসন ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগ সৌন্দর্য-সুরুচি মান-যশ-খ্যাতি-ক্ষমতা-অমরত্ব বাঞ্ছা প্রভৃতির প্রসূন ও ফল। একালেও নব নব আবিষ্কার উদ্ভাবন নির্মাণ-উৎপাদন স্থাপত্যে-ভাস্কর্যে চৌষট্টি কলায় তৈজসে-আসবাবে পোশাকের কারখানাসামগ্রীর উৎকর্ষ সাধনে, ব্যবহারে সৌকর্যের মাত্রা বৃদ্ধি, চিকিৎসা বিজ্ঞানে রোগ নিরূপণ যন্ত্র আবিষ্কারে প্রতিষেধক ঔষধ আবিষ্কারের-গবেষণায়, প্রকৌশলের উৎকর্ষে, প্রযুক্তির সহজতর প্রয়োগে, জলের স্থলের আকাশের কিনারা সন্ধানের জন্যে অর্থের প্রয়োজন। এ আবশ্যিক অর্থ যোগানোর সামর্থ্য ও আগ্রহ বিগত চারশ বছর ধরে ছিল ও রয়েছে প্রতীচ্য জগতের কয়েকটি দেশের, রাজ্যের বা রাষ্ট্রের। একালের জাপান, চীন ব্যতীত এশিয়ার বিশেষ করে তৈল রাষ্ট্রগুলোর আর্থিক সামর্থ্য থাকলেও গুরুত্বচেতনার ও আগ্রহের অভাবে সেখানে স্থূল দৈহিক বিলাস এবং সম্ভোগই সংস্কৃতিচেতনা নামে চিহ্নিত। এ ক্ষেত্রে সেসব দেশ সৃষ্টিশীল নয়, বন্ধ্যা, তবে প্রতীচ্যের অক্ষম অবুঝ অনুকারক অবশ্যই। অতএব সংস্কৃতি-সভ্যতা সম্পদ নির্ভর। জিজ্ঞাসা ও মনীষা, কাঙ্ক্ষা ও উদ্যোগ অর্থসম্পদহীনের কাছে কেবল স্বপ্ন ও সাধ হয়েই থাকে, বাস্তবে রূপায়িত হয় না। দরিদ্রের পোশাক যেমন ময়লা, ছেঁড়া ও স্বল্পমূল্যের, তেমনি দরিদ্রের মানস-মননে-মনীষায় ও অর্থে কোন সংস্কৃতি-সভ্যতা উন্মেষ বিকাশ লাভ করে না। যেমন কালো আফ্রিকায় নিউজিল্যান্ডে অস্ট্রেলিয়ায় বহু বহু বিচ্ছিন্ন দ্বীপে আদিবাসীর উল্লেখ্য মানের ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাত্রার সংস্কৃতি আজো নেই। বহতা নদীর মতো সংস্কৃতিমানের জীবনে মননে রুচিতে নতুন নতুন উন্মেষশীলতা তথা সৃজনশীলতা থাকতে হবে, নইলে বন্ধ্যা সংস্কৃতি বদ্ধজলার মতো অবক্ষয় প্রবণ, পচনশীল এবং তাৎপর্য ও উপযোগরিক্ত বিকৃত আচারমাত্রে পরিণত ও আবর্তিত হয়।

১০.

এবার ফোকলোরের বা লোকসংস্কৃতির, ঐতিহ্যের এবং সাহিত্যের কথা বলি। প্রথমত 'লোক' পরিভাষা ব্যবহারটাই আপত্তিকর, কেননা তাতে আমরা আমাদের পিতৃমাতৃকুলেরই অবমাননা করি। এ সময়ে শাহ-সামন্ত-সওদাগর ও সেনানী-রাজসভাসদ কিছু শাসক-প্রশাসক ব্যতীত আর সবাই ছিল অজ্ঞ-অনক্ষর-অপরিশীলিত-গ্রামীণ মানুষ। এ হচ্ছে অস্পৃশ্য শূদ্রদের 'হরিজন' নামের আড়ালে কৃপা-করুণা রূপে অবমাননার মতো। লোকলোর, লোকজ সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, সাহিত্য, শিল্প গান-নাচ-বাজনা-অভিনয়-সঙসাজা প্রভৃতি অবশ্যই অশিক্ষিত অমার্জিত পটুত্ব ও নৈপুণ্য শক্তির সামর্থ্যের অপরিশীলিত রূপ। অসামর্থ্যের সূক্ষ্ম সুরুচির অভাবের স্থূলসৌন্দর্য চেতনার সাক্ষ্য ও প্রমাণ হচ্ছে তথাকথিত লোকলোর। এসবই আমাদের প্রাচীন সমাজের ও কুলের জীবনাচারের জীবনযাত্রার ধারক বাহক পরিচায়ক নিদর্শন। এ শ্রদ্ধারও নয়, অবজ্ঞারও নয়, নয় বিস্ময়ের কিংবা করুণার। নিন্দারও নয়, প্রশংসারও নয়, এ কেবল আমাদের ঐতিহাসিক বিবর্তনাধারার মূল্যবান স্মারক, আমাদের ইতিবৃত্তান্তের আবশ্যিক উপকরণ। আজকাল কিছু বিদ্বান এগুলোর বিলুপ্তির জন্য আপসোস করেন, তাঁদের ইচ্ছে কিছু জেলে সাপুড়ে অজ্ঞ-অনক্ষর নিঃস্ব নিরন্ন লোক থাকুক, যারা মাটির হাঁড়ি-সরা, বেতের বা বাঁশের ঝাঁপি, রশির সিক্কা আজো ব্যবহার করতে থাকুক, আর তারা আঞ্চলিক গ্রাম্য বুলিতে বেসুরো গান বাঁধুক, বেতালা বেসুরো তাল লয়ে নাচুক, আর নিজেরা সসন্তান য়ুরোপীয় আদলে জীবনযাপন করে ওদের চিরকালের মতো অজ্ঞ গেঁয়ো গরীব লোকরূপে বাঁচিয়ে রেখে শহরে লোকলোরের, সংস্কৃতির, ঐতিহ্যের, সাহিত্যের সম্মেলন সনিদর্শন সম্মেলন করে ধন্য ও কৃতার্থ হোন। এ এক অমানবিক চিন্তা-চেতনা-রুচি-বাঞ্ছা বলেই আমরা মনে করি। লোকলোর যদি এতো মূল্যবান হয়, তাহলে শহরে এসে আমরা তা ছাড়ি কেন? যা নিজেদের জন্যে পরিহার্য, তা অন্যদের জন্যে স্থায়িভাবে কামনা করি কি করে, বিবেক-বিবেচনা সম্পন্ন শিক্ষিতলোক হয়ে? এবার লোকলোরের একটা সংজ্ঞা দিই :

'কোন দেশের, কালের বা সমাজের গোত্রের, গোষ্ঠীর বা সম্প্রদায়ের প্রাকৃতজনের অর্জিত কৌশলের, আচরণের, কর্মের, নীতিনিয়মের রেওয়াজের প্রথাপদ্ধতির, বিশ্বাসসংস্কারের পৌনিঃপুনিকতা ও প্রাত্যহিকতা দুষ্ট জীবনযাত্রা পদ্ধতির সামূহিক, সামষ্টিক ও সামগ্রিক রূপই তথা গোটা মানসিক ও ব্যবহারিক নিত্যকার জীবনাচারই হচ্ছে লোকসংস্কৃতি। এর হ্রাস, বৃদ্ধি ও রূপান্তর এতো মন্থর ও সামান্য যে পরিবর্তন বা বিবর্তন সহজে চোখে পড়ত না, কেবল আবর্তনই প্রজন্মক্রমে চক্রবৎ পরিদৃশ্যমান ছিল। এতে ব্যক্তির অবদান অনির্দিষ্ট ও অনির্দেশ্য, যৌথ সৃষ্টি, আচার, উৎকর্ষই সামগ্রিকভাবে ছিল বিবেচ্য। এ তাৎপর্যে লোকসংস্কৃতি হচ্ছে অনুকৃত ও অনুসৃত এবং আবর্তিত রীতিপদ্ধতিরই নামান্তর।' এই ছিল বিশ শতকের প্রায় প্রথম পাদ অবধি লোকসংস্কৃতির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গণরূপ। আজকাল আর লোকলোর, লোকঐতিহ্য, লোকসংস্কৃতি, লোকসাহিত্য, লোকাচার বা দেশাচার বলে তেমন কিছু গাঁয়ে গঞ্জে দেখা যায় না। এ যন্ত্রনির্ভর যুগে এ যন্ত্রনিয়ন্ত্রিত জগতে খোলা আকাশের নিচে ঘরে শুইয়ে বসেই গোটা পৃথিবীর দৃশ্যময়, ধ্বনিময়, রূপময় বিচিত্র স্বরূপ দেখা-শোনা-জানা সম্ভব হচ্ছে রেডিয়ো, টিভি, ভিসিআর, ক্যাসেট প্রভৃতি যোগে এবং যানবাহনের বৈচিত্র্যে ও উৎকর্ষে যাতায়াতের সুবিধের দরুন জীবিকাক্ষেত্রের ভৌগোলিক প্রসারে গাঁয়ের অজ্ঞ গেঁয়ো মানুষও আজ আর কেউ গ্রাম্যতাদুষ্ট নয় অজ্ঞতায় ও আচারে-আচরণে পোশাকে খাদ্যে তৈজসে আসবাবে। সবাই এখন সাক্ষর না হলেও স্বশিক্ষিত। এরা পৃথিবী যে অনেক বড়, মানুষ যে বিচিত্র রূপের ও চরিত্রের তা উপলব্ধি করে, এরা এখন আপনসত্তা চেতনায় ঋদ্ধ, স্বাধিকারে স্বস্থ ও সুস্থ থাকার প্রয়াসী। এদের জীবনচেতনা প্রসারমাণ, স্বপ্ন ও কাঙ্ক্ষা এবং আত্মপ্রত্যয় ও প্রত্যাশা ক্রমবর্ধমান। কাজেই রেডিয়ো-টিভিতে শহুরে শিক্ষিত লোকের রচিত জেলে-সাপুড়ে কৃষাণী নৃত্যও তাই এখন অচল বলে পরিহার্য।

শেষ কথা এই, আগেকার দিনে ব্যক্তিক স্বাতন্ত্র্যচেতনা এবং ঐহিকতা বা ইহজাতিকতা ভব্য মানুষে স্বীকৃত ছিল না। তাই জীবনের ও সমাজের কালিক স্থানিক প্রয়োজনে পরিবর্তন বা সংস্কার তথা নতুন কিছু করা সম্ভব হত কেবল শাস্ত্রানুগ পারিত্রিক ও নৈতিক প্রয়োজনের ও উপযোগের দোহাই উচ্চারণ করে। স্রষ্টার বা উপাস্যের তথা ঈশ্বরের নামে সুকৌশলে ফতোয়া-পাতি প্রচার করতে হত। তাই জগতের সব সংস্কারক [Reformers] বা নবমত প্রচারকরা কালিক ও স্থানিক নতুন প্রয়োজনে নতুন করে শাস্ত্রিক মতবাদই প্রচার করতেন। সমাজে স্থান কালের উপযোগী নীতি-নিয়ম-আচার চালু হত এ পন্থায়। আজকাল তা প্রয়োজন হয় না। জ্ঞান-যুক্তি-প্রয়োজনবুদ্ধিই যে-কোনরূপ পরিবর্তনের জন্যে সাধারণভাবে যথেষ্ট। অবশ্য মন্দির-মসজিদ-গির্জা-মঠ-বিহার সিনাগগ এখনো রক্ষণশীল ও প্রায় গতানুগতিক।

পরিশিষ্ট

সংস্কৃতি কথাটা উচ্চারণ করা সহজ, বোঝা কঠিন এবং বোঝানোটা কঠিনতর। শোনা যায় কালচার বা সংস্কৃতির তথা কৃষ্টির একশ' চৌষট্টিটা [Merrill' pl 20] সংজ্ঞা বিশ্বময় চালু রয়েছে। বিস্ময়ের কথা কোনটাই সর্বতোভাবে বাতিল হয় নি, কেবল কেউ গ্রাহ্য কেউ অগ্রাহ্য করে মাত্র। কোন কোন সংজ্ঞার সমর্থক বেশি, কোন কোন সংজ্ঞার সমর্থক নগণ্য বা স্বল্প। F. R. Cowell বলেন, Scarcely Two people can be found to have the same ideas on the subject or to be willing to say percisely what they mean by culture (Preface). Cowell-এর গ্রন্থের প্রথম বাক্যটি এরূপ : Culture has something of the elusive, attractive quality of the rainbow. এমনও বলা যায় যে, Culture meaning, value, truth, beauty, goodness. Since the subjectmatter of these and of all major branches of human knowledge arises from and centres around mankind's search for truth, beauty and

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

moral worth, each contributes to the broad stream of culture (p. 25). Civilizaion is regarded as the state of those who have acquired a culture (p. 35).

1. J. C. Shairp said, 'Culture sets before a man a high ideal end to aim at, which shall enter into and control his life. Secondly, it trains all the faculties, all the inward powers and onward instruments— hand, eye, ear; so as to enable him in some measure to realise that ideal end' (p. 249). Culture must embrace religion and end in it.
2. Seeley said 'Culture is the samething as religion... It is in the growth of the doctrine and theory if culture in the modern world rather than in any mere signs of revive activity in religious bodies that we see the true revival of religion and the true antidote of secularity'. [Natural Religion, 1895]. "Religion or the impulse in man to seek God and culture or the impules in man to seek his own highest perfaction both come from the same Divine source.
3. Bradley 'A true account of culture supplies a foundation and frame work for the development of theories of human behaviour in general and of morality and ethical thought in particular. [p268].
4. T. S. Eliot [notes towards the Definition of Culture, 1948] pp. 15, 41, 57.
   (a). 'No culture has appeared or developed, except together with religion. (b) Culture is not merely the sum of the several activities but a way of life (c) Culture is a peculiar way of thinking, feeling and behaving (p. 57).

Society and Culture : Francis E. Merrill 4th edi., 1958.

"Society exists in and through social interaction, as human beings react to others and in turn are influenced by them. Each member learns to take into account the behaviour of others and in so doing learns to make appropriate response social interaction is thus reciprocal and each member governs his behaviour in terms of the expectation of others." (p. 115).

... The first important concept in our study is society (or the group) in interaction. The second central concept deals with the outgrowth of that interaction, namely the Culture (p 116)... we may provitionally define Culture as all the learned behaviour shared by the members of the society.

... Society and Culture are related but not similar. Society is the group in interaction and Culture is the product. In brief

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"Intraction makes possible the development of culture on the human level and gives culture its significance in the deternination". (p116 quoted from '*Toward a General Theory of Action* p. 117, Cambridge, Havard University Press, 1951)

Definitions

1. *Anthropologist E. B. Tylor* : 'Culture ... is that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, customs and any other capabilities and habits acquired by man as a member of Society (E. B. Tylor, *Primitive Culture,* London, 1871, p. 1, as quoted by Merrill, p.117)
2. Leslie A. White : 'Culture is an organisation of phenomenon acts (patterns of behaviour), objects (Tools, things, made with tools), ideas (belief, knowledge) and sentiments (attitudes, values)—that is dependent upon the use of symbols ... culture is therefore a symbolic, continuous, cumulative and progressive process (as quoted by F. E. Merrill p.118).
3. Coon "The sumtotal of the ways in which human beings live,. transmitted from generation to generation by learming" from the story of man by Coon as quoted by Merrill, p 118.
4. Bidney : A culture consists of the acquired or cultivated behaviour and thought of individual within a social Has well as of the intellectual, artistic and social ideals and institutions which the members of the society profess and to which they strive to conform [Quoted from Theoretical Anthropology, p. 80, by Merrill, p. 119.
5. Linton : "Society is an organized group of individuals. A culture is an organised group of learned responses characteristic of a particular society. (Merrill p. 119).
6. Kroeber and Kluckhohn নতুন সংজ্ঞা দেন নি বটে, তবে বিস্তৃতভাবে Culture-এর স্থূল লক্ষণগুলো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। (Merrill p 120)
7. F. E. Merrill প্রদত্ত সংজ্ঞা

"Culture, therefore, (a) is the characteristically human product of social interaction, (b) provides socially acceptable patterns for meeting biological and social needs, (c) is cumulative as it is handed down from generation to generation in a given society, (d) is meaningful to human beings because of its symbolic

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

quality, (e) is learned by each person in the course of his development in a particular society, (f) is therefore a basic determination of personality and (g) depends for its existence upon the continued functioning of the society but is independent of any individual or group. (pp. 120-21)

7. G. S. Ghurye : Culture and Society, 1917, Bombay
"A Society entertains certain ideals; it supports, propagates certain beliefs and ideas, it has a certain type of material cultuer—tools, weapons and so on–it has crtain crrafts. All these and many other things considered together are regarded by anthropologists, since the day of Tylor, to be the culture of that society." (p.1).

8. Civilization thus includes the tools and weapons, houses and utensils, dress and ornaments, agricultural products and dressed food, customs and manners, beliefs and ideas as well as magic and science, religion and philosophy, morality and social organization of the people. What are called arts and crafts, art and architecture are put in the same category with philosophy, morality and religion (p 2).

... Civilization is the sum-total of social heritage projected on the social plane while Culture is the same heritage focused on the individual plane. This distinction is the same as is current in the dictum 'Civilization is what we have and culture is what we are' (ibid p 3).

9. According to Emerson (Quoted in chapter III of the book *'Culture and society* of G. S. Ghurye (Bombay 1947)
(a) The word of ambition as the present day is culture.
(b) We must begin with education so that every fine soul is provided with culture... Quite manners are another ingredient of culture... Culture reveals to the mind its own powers. (p 53)

11. Mathew Arnold (as quoted by G. S. Ghurye) pp 61, 62
(a) Culture is a pursuit of our total perfection by means of getting to know, on all the matters which most concern us the best which has been thought and said in the world and through this knowledge, turning a stream of free thought upon own stock notions and habits which we now follow staunchly. (p. 62)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(b) Culture does not necessarily mean action not does a believer in culture take to dependency and violence, (p 61)

In the opinion of both Emerson and Mathew Arnold culture implies a large knowledge-content and constitutes essentially an intellectual attitude. (G. S. Ghurye, p 80)

12. John Morley says (Quoted by G. S. Ghurye, p 77)
The History of Civilization is the history of the displacement of old conception by new ones more conformable to the facts ... and satisfying human requirements (p 78).

13. In the Universities, the teachers of the universities must be of high culture as well as of intellectual distinction. It is at least equally important.

a. that its students should be seeking knowledge as culture and not something else– G. M. Trevelyan (ibid p 217)

b. It is the business of a University to make this cultivation of the intellect or intellectual culture its direct scope and function. (ibid p 197)

14. Culture Theory : *Essays on Mind, Self and Emotion* edited by Richard Shweder and Robert Levine 1984, Cambridge University Press, London.

(1) Geertz defines culture as a historically transmitted pattern of meanings embodied in symbols, a system of inherited conceptions expressed in symbolic form by means of which men communicate, perpetuate and develop their knowledge about and attitudes towards life." (p-1)

(2) Robert A. Levine : Culture cannot be reduced to its explicit or implicit dimensions. It would be fallacious to take what is given by informants at face value and assume that the rest of behaviour and belief is untouched by culture. It is equally fallacious to discount explicit rules, beliefs etc. (p 77).

(3) There are, at present, at least three major views about the nature of Culture : (a) One is a notion of Culture as knowledge, as the accumulation of information. (b) A second view is that culture consists of conceptual structures that create the central reality of a people so that they inhabit the world they imagine (Geertz 1983). Or according to Schneider (1976) culture consists of

আহমদ শরীফ রচনাবলী-৭-১০
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'elements which are defined and differentiated in particular society as representing reality– not simply social reality, but he total reality of life within which human beings live and die' [ibid p. 115]. (c) A third view of the nature of culture falls between the 'culture as knowledge' and the culture as constructed reality positions. It treats culture and society as almost the samething– something made up of institutions, such as the family, the market, the farm, the church, the village and so on, that is, system or clusters of norms defining the roles attached to various sets of statuses. (ibid p. 115).

15. *The Nature of culture :* A. L. Kroeber :
'I have tried with cumulative consciousness to extricate the forms and patterns of culture from out of the mixture of behaviour, events, institution, individuals and psychic and somatic reactions which constitute the primary and raw material of the historical and social sciences. (Preface)

AMARBOI.COM

References

1. G. S. Ghurye, *Culture and Society*, University of Bombay, 1947.
2. Richard Shweder and Robert Levine, *Culture theory : Essay on Mind, Self and Emotion,* edited, Cambridge University Press, 1984.
3. Francis E. Merrill, *Society and Culture : An Introduction to Sociology,* 4th Printing 1958.
4. A. L. Kroeber, *The Nature of Culture,* The University of Chicago press, 2nd impression, 1960.
5. F. R. Cowell, *Culture in Private And Public Life,* London, 1959.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় বক্তৃতা

সাংস্কৃতিক তথা আচারিক স্বাতন্ত্র্যচেতনা, রক্ষণশীলতা ও অপসংস্কৃতি

ব্যক্তিরও আত্মসত্তার স্বাতন্ত্র্যরক্ষার একটা অবচেতন বা ব্যক্তিবিশেষে সচেতন উগ্রপ্রয়াস দেখা যায়। আর কৌম, গোত্র, গোষ্ঠী, শাস্ত্রিক ও ভাষিক কিংবা বার্ণিক দল বা জাতি স্ব স্ব আচরিক তথা সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য সযত্ন সতর্ক আচরণে ও পরিচর্যায় লালনে যেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আদিবাসী ও উপজাতি নামে চিহ্নিত আরণ্য গোত্রসমাজে এ যেন তাদের মানস স্বাধীনতারও প্রতীক প্রতিম ও প্রতিভূ। এরা কিছুতেই প্রাজন্মক্রমিক আচার-আচরণ বিশ্বাস-সংস্কার রীতি-রেওয়াজ, নীতি-নিয়ম ছাড়তে রাজি হয় না। এমন কি পাদরীর প্রচারে-প্রচারণায় খ্রীস্টান হয়ে আচরিক তথা সাংস্কৃতিক জীবনে লালিত পালা-পার্বণ পরিহারে সম্মত হয় না—নতুন বৃত শাস্ত্রবিরোধী জেনেও।

এ যে কেবল অনুন্নত বুনো বলেই ওদের মধ্যে এ মনোভাবসুলভ ভাবলে আমরা ভুল করব। সভ্যভব্য আধুনিক দৈশিক, শাস্ত্রিক, রাষ্ট্রিক ও মতবাদী সমাজেও এমনি নানারূপ রক্ষণশীলতা দৃঢ়মূল হয়ে প্রচল থাকে। কেন থাকে তার একটা মনোবিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা হয়তো দেয়া সম্ভব, তাতে বিদ্যাবত্তার পরিচয় মেলে মাত্র। মানুষের স্বভাব বদলানো যায় না। এর উৎসে থাকে অনেকটা শাস্ত্রিক প্রভাব, আর কিছুটা তথাকথিত ঐতিহ্যপ্রীতির অভিব্যক্তি। যেমন বাঙালীর জল ও পানি, ধুতি ও তহবন, পাজামা—এগুলো শাস্ত্রিক নয়, ঐতিহ্যিক রক্ষণশীলতা। আবার শ্রেয়োবোধে বা প্রয়োজনে গ্রহণ বরণ করে প্রায় অবচেতনভাবেই। এ জন্যে মানুষের মননে, আচরণে কর্মে কথায় সবসময়ে সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায় না। যেমন তুর্কী-মুঘল আমলে রাজসরকারের চাকুরেরা তুর্কী-মুঘলের চৌকা-চাপকান ইজার শামলা পরলেন, আবার ইংরেজ আমলে বুট স্যুট কোট হ্যাট ধরলেন—নেপাল রাজের পোশাকে আজো তুর্কী-মুঘল-ব্রিটিশ পোশাকের সমন্বয় ও মিশ্রণ প্রয়াসচিহ্ন রয়েই গেছে। রাজা চোস্তপাজামা, পাঞ্জাবী কোট বিলেতী জুতা ও টুপি পরেন। আবার ম্যাজেস্টি, দেব শাহ, জঙ্গবাহাদুর, শমসের জঙ্গ প্রভৃতিও বাহ্যত চিরস্বাধীন নেপাল রইসদের মধ্যে চালু হয়েছিল, ওই রাজ্য নানাভাবে ভারতনির্ভর ছিল বলেই হয়তো। আবার গৌতমবুদ্ধের পিতৃ-মাতৃকুল হওয়া সত্ত্বেও ওখানে বৌদ্ধ নিতান্ত সংখ্যালঘু, একেই বলে গাঁয়ের যোগী ভিখ পায় না। কর্মস্বভাবের হওয়া সত্ত্বেও সুখ-সম্পদ প্রাপ্তিলোভী মানুষ প্রলোভন প্রবল হলেই লিপ্সাবশে দলছুট আদর্শভ্রষ্ট চরিত্রহীন সুবিধেবাদী ও সুযোগসন্ধানী হয়ে ওঠে। লোভে আশৈশব লালিত ধর্মবিশ্বাস ছাড়তেও যে দ্বিধা করে না সে প্রমাণও সর্বত্র সুলভ। কিন্তু তেমন আকর্ষণ আসক্তির কিছু না থাকলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষ কথায় কথায় ঐতিহ্যের গৌরব-গর্ব প্রকাশ করে। কিন্তু ঐতিহ্য কি? এতো এক প্রকার সুবিধেবাদের নামান্তর মাত্র। ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক, নৈতিক, দৈশিক, শাস্ত্রিক, রাষ্ট্রিক, জাতিক, ভাষিক জীবনে জয়ের-পরাজয়ের, লজ্জার-গৌরবের ক্ষতির-লাভের, দানের-কাড়ার, বাঁচানোর-হননের সম্পদের-দারিদ্র্যের, মানের-অপমানের, হার-জিতের, পাণ্ডিত্যের-মূর্খতার, বিশ্বস্ততার-বিশ্বাসভঙ্গের, কৃতজ্ঞতার-কৃতঘ্নতার প্রাজন্মক্রমিক নানা ঘটনা থাকে প্রাত্যহিক জীবনে। কিন্তু লজ্জার, ভিক্ষার, হারের, হননের, বিশ্বাসঘাতকতার কৃতঘ্নতার, দারিদ্র্যের, মূর্খতার, চুরি-ডাকাতির ঘটনা ও কর্ম-কর্মী ঐতিহ্য হয় না। অর্থাৎ অতীতে ঘটলেই করলেই তা ঐতিহ্য হয় না। ঐতিহ্য কেবল গৌরব-গর্বের ঘটনার, ব্যক্তির কর্মের ও আদর্শের স্মরণ ও উচ্চারণ প্রেরণা-প্রণোদনা প্রবর্তনের উৎস হিসেবে।

২

ঐতিহ্যকে অনেকেই সংস্কৃতির সঙ্গে অভিন্নার্থক ও অভিন্নাত্মক বলে জানেন, বোঝেন ও মানেন। তাই এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা আবশ্যিক। ঐতিহ্যকে মানুষ জাতীয় ও গোত্রীয়ভাবে সম্মুখে এগিয়ে যাওয়ার ভিত্তি, প্রেরণার প্রণোদনার ও প্রবর্তনার উৎস বলে জানে ও মানে। কিন্তু সত্যই ঐতিহ্যের ওই গুণ ওই শক্তি আছে বা ছিল কখনো? তা হলে গ্রীকদের মিশরীয়দের রোমকদের আব্বাসীয়দের উসমানীয়দের পতন হল কেন? আমরা জানি পিতৃধনে ক্ষয় আছে গ্লানিমা আছে, বৃদ্ধি নেই ঋদ্ধি নেই, ঔজ্জ্বল্য নেই। ঐতিহ্যকে যদি তেমনি পিতৃধন বলে মানি, তা হলে ঐতিহ্য উত্থানের, উৎকর্ষের, আত্মশক্তির উদ্বোধনের ও আত্মপ্রত্যয়ের জন্যে যে-প্রয়াস প্রয়োজন; তা কখনো অনুভব উপলব্ধিগত হয় না, বরং নিষ্ক্রিয় জীবনে সহজলভ্য ভোগ্য উপভোগ্য ও সম্ভোগ্য মানস ও কায়িক উপাদান-উপকরণেই আসক্ত ও মোহাচ্ছন্ন থাকারই কথা। উনিশ শতকে য়ুরোপে ভাষিক জাতীয়তাবাদ প্রায় উগ্ররূপ ধারণ করে। তখন তারা তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তথা নিজেরা অনুপ্রাণিত হবার জন্যে স্বতন্ত্র ঐতিহ্যের সন্ধানে ও সৃজনে, স্বতন্ত্র সংস্কৃতির রক্ষণে ও উদ্ভাবনে উদ্যোগী হয়। বিশ শতকে সমাজবাদীরা আরো এক ধাপ এগিয়ে আসে, তারা গণসাহিত্যে ও গণসংস্কৃতিতে গুরুত্ব দেয়ার গরজবোধে লোকসাহিত্যে ও লোকঐতিহ্যে অসামান্য মূল্য-মর্যাদা আরোপ আবশ্যিক ও জরুরী মনে করে। তাদের কাছে লোকঐতিহ্য ও লোকসাহিত্য চর্চা গণমানবকে শাহ-সামন্ত-বেণে বুর্জোয়ার শোষণমুক্ত করে স্বাধিকারে সুপ্রতিষ্ঠিত করার অন্যতর বিপ্লবী পন্থারূপে বিবেচিত হয়। ফলে এ-ও প্রগতিশীলতার ও প্রগতিবাদিতার লক্ষণ হয়ে দাঁড়ায়।

অতীতকে অতীতের নিরিখে যাচাই করা ও প্রত্যক্ষ করা সদ্বুদ্ধিজাত সদুপায়, সন্দেহ নেই। কিন্তু অতীতকেও বর্তমানের ও ভবিষ্যতের পুঁজি করার মধ্যে বুদ্ধিমত্তার কিংবা সুষ্ঠু কল্যাণচেতনার সাক্ষ্য নেই, আছে অন্ধ আবেগ যা আপাতদৃষ্টিতে কেজো বটে, কিন্তু পরিণামে রক্ষণশীলতার ও সংস্কারচ্ছন্নতার জনক। কেননা, পুরাতনে আসক্তিহীনতা, অশ্রদ্ধা, সন্দেহ এবং উপযোগিতায় অনাস্থা, বিরক্তি ও পরিহারসামর্থ্য নতুন জিজ্ঞাসা, কৌতূহল, উৎকর্ষ সাধনের কাঙ্ক্ষা ও পরিবর্তন প্রয়াসই অগ্রগতির স্বাভাবিক সদুপায়। জাতীয় জীবনের জাগরণ মুহূর্তের আবেগ, উৎসাহ ও কর্মোদ্যমকে পুরাতনের, অতীতের,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঐতিহ্যের প্রেরণা বলে ভুল করার ফলেই পুরোনোকে, অতীতকে, ঐতিহ্যকে জীবনোন্নয়ন প্রয়াসের মুখ্য ও অপরিহার্য উৎস বলে প্রতীতি জন্মায়। এরই নাম Revivalism বা পুনর্জাগরণ বা শীতে সুপ্ত-লুপ্ত ঔষধির মতো পুনরুজ্জীবনবাদ। পুরাতনের অতীতের ঐতিহ্যের আবর্তন অঙ্গীকারে নতুনের অগ্রগতির প্রগতির কিংবা প্রাগ্রসরতার উন্মেষ বিকাশ প্রত্যাশা স্ববিরোধী অদ্ভুত অসঙ্গত অস্পষ্ট অপরিচ্ছন্ন অঋজু চিন্তার প্রসূন। এ সংকীর্ণ ঐতিহ্য প্রীতির দরুনই মধ্যযুগে রামায়ণ মহাভারত ও বিভিন্নদেবতার- চণ্ডীর, মনসার, ধর্মঠাকুরের, ষষ্ঠীর, শীতলার, সত্যনারায়ণের কাহিনী তাঁদের কাব্যের তথা সাহিত্যের, সংস্কৃতিচর্চার অবলম্বন করেছেন ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ লক্ষ্যেই। তেমনি মুসলিমরাও প্রথমে ইসলামে জ্ঞানের অভাবে উত্তর ভারতীয় হিন্দুস্তানী ও পরে ফারসী প্রণয়কাব্য চর্চা করেছেন এবং তারপরে ইসলামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হলে নবী-রসুল কাহিনী, শরীয়তনামা, জঙ্গনামা, পীরপাঁচালী, রাগতালনামা এবং তথাকথিত যোগ-তন্ত্র প্রভাবিত সূফী সাহিত্য রচনা করেন উনিশ শতকের ইংরেজী শিক্ষিতরাও য়ুরোপীয় আদলে বিভিন্ন গীতিকাব্য ছাড়াও রচনার ক্ষেত্রে হিন্দু ইতিবৃত্ত এবং মুসলিমরা মুসলিম-কাহিনী-কিস্‌সাকে অবলম্বন করেছিলেন। শুধু তা-ই নয়, আজো গল্পে-উপন্যাসে-নাটকে হিন্দু হিন্দুর কথা লেখেন, মুসলিমরা অবলম্বন করেন নিজেদের পরম্পরা অনুগ কাহিনী। কেবল কম্যুনিস্টরাই প্রথম যথার্থ তাৎপর্যে মানুষের জন্যে লেফ্‌ট্‌লার সাহিত্য সৃষ্টি করতে থাকে, যদিও সেখানেও শ্রেণীপ্রীতি ও শ্রেণীবিদ্বেষ মুখ্য হয়ে উঠেছে। পুরাতন অতীতের ঐতিহ্যের মূল্যে উপযোগে আস্থাহীনতাই বরঞ্চ নতুন আত্মপ্রত্যয় নিয়ে আত্মোৎকর্ষের, জাতীয় উন্নতির ঠিক পথ-পদ্ধতি বা উপায় আবিষ্কার-উদ্ভাবন সম্ভব ও সহজ।

'ঐতিহ্য প্রেরণার ও অগ্রগতির উৎস' বলে যে বিশ্বাসটা চালু রয়েছে, তা আক্ষরিক অর্থে সত্য নয়, তা হলে প্রাচীন বিদ্যাবিত্তের পরিবারের, সভ্যতা-সংস্কৃতি-ক্ষমতার জাতির পতন বা অবক্ষয় ও উৎখাত ঘটত না কখনো। অন্য তাৎপর্যে অবশ্য এর একটা কষ্টকল্পিত ও দূরান্বিত ব্যাখ্যা খাড়া করা সম্ভব। যেমন যে-ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ-আদর্শ-চরিত্র-প্রথাপদ্ধতি অতীতে ব্যক্তিক কিংবা জাতিক জীবনে কল্যাণ ও সাফল্য-বিজয় এনেছে, তা-ই ঐতিহ্য। দেশ-কালের পরিবেশে প্রতিবেশে পরিপ্রেক্ষিতে যা সেদিন উপযোগঋদ্ধ, মঙ্গলকর ও ফলপ্রসূ ছিল, পরিবর্তিত পরিবেশে তা উপযোগরিক্ত, অহিতকর এবং নিষ্ফল হতেই পারে। কাজেই ঐতিহ্যের অবলম্বন মানে ইতিহাসের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও শিক্ষাগ্রহণ, তার অনুকরণ-অনুসরণ নয়, তার নবরূপায়ণ নয়, তার আশ্রয়গ্রহণ নয়, নয় তার প্রশ্রয় কামনাও। যেমন এক সময়েপ্রশিক্ষণ প্রাপ্ত তুরঙ্গ, তুরঙ্গগতি ও বন্দুক-তীর-বর্শাই যুদ্ধজয়ের ছিল ব্যবস্থা ও আয়োজন। তা একালে কি চলে? একালে প্রয়োজনের ও পরিবেষ্টনীর দিকে নজর রেখে কালোপযোগী হিতকর ও ফলপ্রসূ ব্যবস্থা গ্রহণ, নতুন উদ্ভাবিত উপায়-পথ-পদ্ধতি গ্রহণ, আধুনিকতম অস্ত্রে ও প্রশিক্ষণে শক্তিমান হওয়াই হচ্ছে অতীতের ঐতিহ্যের কিংবা ইতিহাসের তাৎপর্যগত শিক্ষা গ্রহণ বা অনুসরণ বলে ব্যাখ্যা করা চলে। কাজেই টিকে থাকার, ঋদ্ধ থাকার, শক্তিমান থাকার, বিদ্যাবান ও বিত্তবান থাকার জন্যে প্রতিবেশী-প্রতিযোগী-প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে আদর্শে, চরিত্রে, কৌশলে, গুণে মানে মাপে মাত্রায় যোগ্যতর হওয়ার ও উৎকর্ষলাভ করার সযত্ন প্রয়াসী থাকাই হচ্ছে ঐতিহ্য চেতনা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবু বলি ঐতিহ্য অনুসরণের পুঁজি নয়, ঐতিহ্য সৃষ্টি করার বিষয় নিজের যোগ্যতায়। এভাবেই সংস্কৃতি-সভ্যতা এগিয়েছে। তা'ছাড়া অতীত কখনো বর্তমানের বা ভবিষ্যতের পুঁজি-পাথেয় হতে পারে না। কেননা ব্যক্তি কিংবা দৈশিক জাতিক জীবনে পরিবর্তন ও মন্থর বিবর্তন আছে, আবর্তন নেই। আবর্তন বন্ধ্যা এবং অবক্ষয়ী আচার ও বিকৃত উপযোগরিক্ত অবাঞ্ছিত ভাবচিন্তা-আচরণ মাত্র।

অতীত মানে হৃত সময়, হৃত উপযোগ জীবনাচার, হৃত-সম্পদ চিন্তা-চেতনা-কর্ম-আচরণ। কাজেই কোন অতীতই বা ঐতিহ্যই বর্তমানের তথা চলার পথের পুঁজি-পাথেয় হতে পারে না কার্যত, যদিও বাহ্যত তা কেজো বলে মনে হয়। যদি আমরা দেহের উপমা উপস্থিত করি, তা হলে কথাটা জানা-বোঝা-মানা সহজ হবে। প্রাণীদের তথা আমাদের চোখ দুটো ও পায়ের পাতা সামনের দিকেই দেখার ও চলার জন্যেই গঠিত। পেছনে তাকাতে হলে সম্মুখ-গতি বন্ধ করে দেহ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তবেই পেছনটা দেখা সম্ভব। এমনকি চোখ পা পাশেও সহজে বাঞ্ছিতরূপে কেজো হয় না। জীবনে রয়েছে অতীত ও ভবিষ্যৎ, কারণ বর্তমান মাত্রই মৌহূর্তিক, ক্ষণে ক্ষণে বর্তমান অতীত হয়ে যাচ্ছে, আর ভবিষ্যৎ বর্তমান হয়েই অতীতে বিলীন হচ্ছে। কাজেই সে-অতীত কখনো মানুষের জীবনযাত্রার পুঁজি-পাথেয় হতে পারে না, অতীতের জ্ঞান-অভিজ্ঞতাও সব সময়ে অকেজো বা উপযোগরিক্ত মিথ্যে হয়ে যাচ্ছে, প্রতিমুহূর্তের নতুনতর আবিষ্কার-উদ্ভাবন-মনন-চিন্তন-মনীষা প্রসূত জ্ঞানের, বিজ্ঞানের, সৃষ্টির, উৎপাদনের, নির্মাণের যন্ত্র ও বস্তুর সৌকর্যের, সৌন্দর্যের, বৈচিত্র্যের ও উৎকর্ষের কারণেও ফলে। যেমন তৈজস, আসবাব, পোশাক, যন্ত্র, প্রকৌশল প্রযুক্তি পদার্থ প্রভৃতির নানা উপযোগ হ্রাস-বৃদ্ধি পাচ্ছে তার ব্যবহার বৈচিত্র্যের ফলে। পুরোনো পাতা ঝরিয়ে নতুন পাতা গজিয়েই তরুলতা বৃদ্ধি পায়, তেমনি অতীত যে মৃত– এ চেতনা, অতীত যে বর্তমানে অকেজো– এ জ্ঞান-চেতনা-যুক্তি কিংবা অভিজ্ঞতাই সম্মুখগতির, অগ্রগতির, দ্রুতিগতির এবং প্রগতির ও প্রাগ্রসরতার পুঁজি এবং পাথেয়। অতীতকে আঁকড়ে বসে থাকলেও গতি হয় রুদ্ধ। এ ক্ষেত্রেও সাক্ষ্য-প্রমাণ মেলে। যেমন একজন শাস্ত্রনিষ্ঠ ইহুদী সাড়ে তিন হাজার বছরের আগেকার মিশরে কেনানে চালু চিন্তা-চেতনা-আচার-আচরণের ও জ্ঞানের জগতে বাস করে, একজন শাস্ত্রনিষ্ঠ গোঁড়া হিন্দুর জগৎ তিন হাজার বছরের পুরোনো ও আরণ্য জীবনচেতনায় আবিষ্ট। একজন বৌদ্ধের বা জৈনের মানসবিহার চলে আড়াই হাজার বছরের আগেকার বিহারে আর একজন খ্রীস্টানও তেমনি বাস করে দুই হাজার বছর আগেকার জেরুজালেমে। একজন শাস্ত্রনিষ্ঠ মুসলমান দেড় হাজার বছরের অতীত অতিক্রম করে সমকালীন মানসজগতে ও জীবনে ফিরে আসতে পারেনি। একালের ইহুদী খ্রীস্টান হিন্দু বৌদ্ধ মুসলিম মৌলবাদীদের জীবন-চেতনার, জগৎভাবনার, আদর্শের ও লক্ষ্যের স্বরূপ বিশ্লেষণে এই গতিহীন দেশকাল ভূগোলহীন ধ্রুব অতীতনিষ্ঠাই আমাদের মত, মন্তব্য ও সিদ্ধান্ত সমর্থন করে।

৩.

স্বাতন্ত্র্যচেতনা রূপ আধিরও উৎস এই অযৌক্তিক অবৌদ্ধিক ঐতিহ্যনিষ্ঠা। শাস্ত্রে দৃঢ় আস্থা এবং ঐতিহ্যে আসক্তি মানুষকে অত্যন্ত গ্রহণবিমুখ, অসহিষ্ণু, রক্ষণশীল এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কূর্মস্বভাবগ্রস্ত করে। তার থাকে পুরাতনপ্রীতি ও নতুনভীতি। নতুন ভাব চিন্তা জ্ঞান বুদ্ধি যুক্তি বিবেক বিবেচনা সে সযত্নে ও সতর্কভাবে পরিহার করে চলে, পাছে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে স্বর্গবঞ্চিত হয়–এ আশঙ্কায়। আবার উদ্যম উদ্যোগহীন লক্ষ্যভ্রষ্ট নিষ্ক্রিয় মানুষের ঐতিহ্যপ্রীতি ও স্বাতন্ত্র্যচেতনা ও গর্ব আরো মারাত্মক। পিতৃধনে তৃপ্ত ও তুষ্ট ধনী সন্তানের জীবন যেমন আত্মোন্নয়নের প্রয়াসশূন্য থাকে বলেই ক্ষয়িষ্ণু ম্লান জীবনে সম্পদচ্যুতি বাড়তে থাকে, পতন হয়ে ওঠে অনিবার্য, তেমনি ঐতিহ্যগর্বী স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় মানুষের সংস্কৃতি বলে কিছু থাকেই না, থাকে সংস্কৃতিচর্চার নামে গতানুগতিক আচারনিষ্ঠা, যা নতুন চিন্তা-চেতনা-রুচিবিরহী বলে বন্ধ, বন্ধ্যা ও বিকৃত হয়ে তাদের মানসিক বিকাশ এবং ব্যবহারিক আচারিক বৈষয়িক জীবনে উৎকর্ষপথ রুদ্ধ রাখে।

এ ঐতিহ্য ও শাস্ত্রনিষ্ঠ দেড়-দুই-আড়াই-তিন-চার হাজার বছরে পিছিয়ে পড়া চিন্তা-চেতনার মানুষের সমাজে কোন কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি জাতীয় বা সাম্প্রদায়িক কিংবা সামাজিক-দৈশিক অবক্ষয় প্রতিরোধকল্পে আকস্মিকভাবে Revivalist বা পুনর্জাগরণ, পুনরুত্থান বা পুনরুজ্জীবনবাদী রূপে সংস্কারক [Reformer] নামে নীতি-নিয়মের, রীতি-রেওয়াজের, প্রথা-পদ্ধতির, শাস্ত্রিক পালা-পার্বণের, কিছু আচার-আচরণের সংস্কারে তথা পরিমার্জনায়, বর্জনে, বিশুদ্ধিকরণে, সংশোধনে উদ্যোগী হন। প্রচার-প্রচারণার যুক্তি-বিতর্কের মাধ্যমে আন্দোলন করেন। তাঁদের লক্ষ্য সমকালীন জগতের সঙ্গে তাল রেখে জীবনের নতুনতর চাহিদা মেটানো, তাঁদের নিজেদের ধারণায় এ হচ্ছে তাঁদের প্রগতিবাদিতা।

বাস্তব তাৎপর্যে Reformer বা Revivalist রা হচ্ছেন প্রাচীনপন্থী, সনাতন শাস্ত্রপ্রীতি এবং রক্ষণশীলতা থাকে তাঁদের মজ্জায়, চেতনার গভীরে তাঁরা পুরোনো শাস্ত্রে দৃঢ় আস্থাবান বলে কোন মৌল নীতি নিয়ম উপযোগরিক্ত হলেও বর্জনে ভাঙায় পরিহারে বা নতুন নির্মাণে অনীহ কেবল মেরামতের মাধ্যমে পরিমার্জনায় নতুনের বা সমকালীনতার ঔজ্জ্বল্য ও উপযোগ দানে তাঁরা বৃথা প্রয়াসী হন মাত্র। Revivalist Reformer-রা মূলত ও কার্যত রক্ষণশীল প্রগতিশীল নন। বাহ্যত কেবল বিভ্রান্তিকর সমকালীনতার অভিনয় করেন মাত্র। এতে মনুষ্যত্বের, মানবতার, মানবিকগুণের ও আচরণের উৎকর্ষ ঘটে না। প্রমাণ এ যুগের জ্ঞান-যুক্তির ও বিজ্ঞানের তথ্য কপচানো মৌলবাদীদের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ-আদর্শ ও লক্ষ্য। এঁদের নজরে না পড়লেও আমরা সাদা চোখেই দেখতে পাই এঁদের চিন্তা-চেতনা আজকের যন্ত্রনির্ভর জীবনের, যুগের ও জগতের সমস্যাসঙ্কট নিরসনের অনুপযুক্ত, জনকল্যাণের, জীবনের মানসিক ও যান্ত্রিক উৎকর্ষের বিরোধী অহিতকর ও অযৌক্তিক অবৌদ্ধিক এবং জনগণতান্ত্রিক সমাজ সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রিক শাসন-প্রশাসন, সেবা, উন্নয়ন, পরিচর্যাপদ্ধতি বিরোধীও। কাজেই Revivalism ও Reform কার্যত সংস্কৃতি-সভ্যতা বিকাশের প্রতিরোধক। স্থিরতার, গতিহীনতার ও স্থায়িত্বের ধারক বা রক্ষক।

আমাদের ভুললে চলবে না যে বহমান গতিশীল জীবনের বাঁকে বাঁকে যেসব নতুন সমস্যা-সঙ্কট ও চাহিদা দেখা দেয় নতুন পরিবেশে-প্রতিবেশে, তার সমাধান আবশ্যিক ও জরুরী। তার জন্যে চাই নতুন মনন চিন্তন মনীষা প্রয়াস প্রযত্ন উদ্যম উদ্যোগ ও আয়োজন। আজকের প্রতীচ্যজগৎ তার প্রকৃষ্ট সাক্ষ্য ও প্রমাণ। নব নব আবিষ্কারে-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উদ্ভাবনে নির্মাণে উৎপাদনে, উৎকর্ষ ও বৈচিত্র্য সাধনে জীবনের নব নব চাহিদা সৃষ্টি, নব নব প্রয়োজন পূরণ, জীবনযাত্রার বিস্ময়কর মান-মাপ-মাত্রার বৃদ্ধি, মানসিক জীবনের বিকাশ প্রসার উৎকর্ষ, ব্যবহারিক জীবনের বিচিত্র সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগ সামগ্রীর নির্মাণ ও সৌকর্য প্রভৃতি আধুনিক মানুষের পুরোনোতে অনাস্থা, বিরাগ, নতুন জিজ্ঞাসা, জিগীষা, সৃষ্টির স্পৃহা, রহস্য উদ্‌ঘাটনের অশেষ কৌতূহল প্রভৃতিই আজকের সর্বপ্রকার উদ্যম-উদ্যোগ-আয়োজনের প্রেরণা-প্রণোদনা যোগাচ্ছে। কাজেই নব চেতনা ও সৃষ্টিশীলতাই মানবতার, মনুষ্যত্বের, মানবিকতার কালিক জীবনকাঠি। নতুন চিন্তা-চেতনা-মনীষা ও সৃষ্টিশীলতা শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর বা মধ্যবিত্তেরই দান। য়ূরোপীয় রেনেসাঁস কালের ব্যাপ্তি প্রায় আড়াইশ-তিনশ বছর। এর মধ্যেই এর উন্মেষ, বিকাশ ও পরিণতি ঘটেছে। এর মধ্যে অজ্ঞ-অনক্ষর শ্রমিকের কৃষকের কোন দান নেই। শাহ-সামন্ত-বেণে-বুর্জোয়ার বিত্ত-বেসাতের অর্থসম্পদের দান অবশ্যই স্বীকার্য। কিন্তু মেধা-মগজ-মনীষা-সৃষ্টিশীলতা হচ্ছে মধ্যশ্রেণীর শিক্ষিত গুণ-জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-প্রজ্ঞা-ধৈর্য-অধ্যবসায়সম্পন্ন ব্যক্তিদের। পুরাতনে সন্দিহান, বিরাগী নতুন জিজ্ঞাসু জিগীষু কৌতূহলীই নতুনের স্রষ্টা ও উদ্ভাবক।

ফ্লোরেন্সে লিওনার্ডো দা-ভিঞ্চি [১৪৫২-১৫১৯] কেবল সৌন্দর্যপিপাসু ছিলেন না, ছিলেন মনীষী, বিজ্ঞানী এবং ভাস্করও। মাইকেল অ্যাঞ্জেলো ছিলেন ভাস্কর ও স্থপতি। রাফেলও কেবল শিল্পী ছিলেন না, ছিলেন জীবনের তাৎপর্যসন্ধিৎসু জগৎজিজ্ঞাসুও। এ ফ্লোরেন্সের জিজ্ঞাসা-জিগীষাসৃষ্ট পরিবেশেই জন্মেছিলেন তেরো শতকে কবি দান্তে ও পেত্রার্কা। পনেরো-ষোল-সতেরো শতকেও ঘটেছে অনেক ঘটনা, হয়েছে নতুন নতুন তথ্যের ও সত্যের আবিষ্কার ও উদ্ভাবন। নেদারল্যান্ডের কৃষকদের ভূমিদাসত্ব-মুক্তি-সংগ্রাম, কলম্বাস, ভাস্কো-দ্য গামার মহাসমুদ্রাভিযান, নতুন দেশ আবিষ্কার, সম্পদ অর্জন, এর ফলে সামন্ত সমাজে বেণে বুর্জোয়ার উদ্ভব, যাজকের, শাসকের দ্বন্দ্ব, সামন্ত-বুর্জোয়ার স্বার্থ-সম্পদ-ক্ষমতার বিরোধ, Inquisition-এর বিরুদ্ধে Huss ও Martin Luther-এর নেতৃত্বে গণবিদ্রোহ, ধর্মসংস্কার, কোপার্নিকাস-ব্রুনো-গ্যালিলিও উচ্চারিত বাইবেল বিরোধী তথ্য, মুদ্রণযন্ত্রের প্রয়োগে বিদ্যার সহজ বিস্তার, বাইজেনটাইন গ্রীক বিদ্বানদের ছড়িয়ে ছিটিয়ে য়ূরোপে বসবাস প্রভৃতির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াই য়ূরোপীয় শাহ-সামন্ত-বেণে-বুর্জোয়ার শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর মধ্যে রেনেসাঁস ঘটায়। যেমন উনিশ শতকে ইংরেজী শিক্ষিত রামমোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষর কুমার, কেশব সেন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ ও কিছু ডিরোজিও শিষ্য কোলকাতা শহরকে কিছুকালের জন্যে নকল লন্ডন শহর করে তুলেছিলেন নাস্তিকতায়, প্রত্যক্ষবাদে, অজ্ঞেয়বাদে, সংশয়বাদে, বিজ্ঞান-দর্শন সাহিত্য চর্চায় মনীষা-মনস্বিতা প্রদর্শনে। বীজ-বৃক্ষ-ফলের মতোই রেনেসাঁস হচ্ছে একাধারে ও যুগপৎ বিশ্বাস-সংস্কার-মুক্তি, মানসিক ও বৌদ্ধিক যৌক্তিক চেতনার সর্বপ্রকার মুক্তি। যুক্তিবাদিতা ও সৃষ্টিশীলতা, জিজ্ঞাসা, জিগীষা, রহস্যসন্ধিৎসা, অশেষ কৌতূহল এবং আত্মপ্রত্যয় আর ইহজাগতিকতা, জীবনে শ্রেয়োচেতনা, সমাজচেতনা, মানবতার ও মানবিকতার অনুশীলন, বহুজনহিত ও বহুজনসুখ চিন্তা এবং হিতৈষণা প্রভৃতিই রেনেসাঁসের দান। রেনেসাঁসপুষ্ট একজন ব্যক্তি নিজের জন্যে ও অপরের জন্যে Live and let others live-এ আদর্শের অনুরাগী। ব্যক্তিজীবনে মর্যাদা ও ব্যক্তিসত্তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বাতন্ত্র্য, সামাজিক জীবনে সাম্য ও স্বাধীনতা, সাংস্কৃতিক জীবনে মুক্তবুদ্ধি ও গ্রহণশীলতা, আর্থিক জীবনে সমসুযোগ ও সুবিচার, রাষ্ট্রিক জীবনে দায়িত্ব ও কর্তব্য চেতনা আর স্বাধিকার বোধ সৌজন্য ও সুরুচি একজন সংস্কৃতিমান মানুষে প্রত্যাশিত নয় কেবল, এসবে আস্থা আবশ্যিক ও জরুরী।

৪. স্বাতন্ত্র্যবোধ

এতক্ষণ মানুষের রক্ষণশীলতার কথা বললাম বটে, এ রক্ষণশীলতা তার আধিমাত্র। কিন্তু বাস্তব জীবনে আর্থিক ব্যবহারিক ও বৈষয়িক জীবনচেতনায় ও জীবনযাত্রার আধুনিকতম উপকরণ-উপাদান সামগ্রী গ্রহণে বরণে সে আদর্শচ্যুত, চরিত্রভ্রষ্ট, লিপ্সু, সুযোগসন্ধানী ও সুবিধেভোগী। তাই সে য়ুরোপের মানবিক মানসিক উদার বৌদ্ধিক যৌক্তিক মনীষা-মনস্বিতার অবদান গ্রহণে বিমুখ। কিন্তু য়ুরোপে আবিষ্কৃত রেডিয়ো-টিভি, ভিসিআর, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, মোটর, রেল, স্টিমার, বিমান, কম্প্যুটার, ফ্যান, ফ্রিজ, শীতাতপ যন্ত্র গ্রহণে অথবা স্বদেশী তিব্বিয়া য়ুনানী আয়ুর্বেদী চিকিৎসা পরিহারে তার আপত্তি কখনো দেখা যায় নি। যে-মগজ-মনীষা জল-স্থল-আকাশের রহস্য অনেকাংশে আয়ত্তে আনল, যাদের আবিষ্কৃত উদ্ভাবিত তৈজস আসবাব, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, শাসন-প্রকাশন পদ্ধতি অনন্য, অসাধারণ, অসামান্য ও উৎকৃষ্ট বলে স্বীকৃত, তাদের নিরীশ্বরতত্ত্ব, তাদের বৈজ্ঞানিক ইহজাগতিক নিরীশ্বর অজ্ঞেয়বাদ, তাদের উদার মানবতা গ্রহণে বিমুখ থাকা য়ুরোপের বা পৃথিবীর শিক্ষিত লোকের পক্ষে চরম কূর্মবৃত্তির ও তাদের সনাতন শাস্ত্রে আস্থা নির্বোধের রক্ষণশীলতার পরিচায়ক বললে কারো রুষ্ট হওয়া সাজে না। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার মাত্রই সাধারণভাবে শাস্ত্রিক বিশ্বাসের, তথ্যের, তত্ত্বের ও সত্যের মূলে আঘাত করে। তবু বিজ্ঞানের তথ্য বর্জনীয়, আর আদিকালে কল্পিত সত্যে আস্থা ও মহিমায় বিশ্বাস সাধারণ মানুষে অটুট-অনড় থাকে। এ আধি বিমোচন সাধ্যতীত, এ আধি দুশ্চিকিৎস্য।

মানুষের স্বাতন্ত্র্যচেতনা আপাত তীক্ষ্ণ-তীব্র মনে হলেও তাতে কোন সঙ্গতি, সামঞ্জস্য নেই। এ ক্ষেত্রে তাদের গ্রহণশীলতা হচ্ছে লিপ্সাপ্রসূন আর আস্ফালন হচ্ছে মিথ্যা আত্মসম্মান রক্ষার গা-জোরি দাবি। যেমন আমাদের মন্ত্রী-সাংসদ-বুদ্ধিজীবীরা জাতীয় সংস্কৃতি লালনের এবং বিদেশীর বিজাতির বিধর্মীর বিভাষীর সংস্কৃতি-আচার-আচরণ পরিহারের আহ্বান-আবেদন জানান বক্তৃতা-ভাষণে-লেখায়। অথচ বলতে গেলে আমাদের আচরিক ও মানসিক সংস্কৃতিতে আমাদের স্ব-সৃষ্টি বলে কিছু খুঁজে পাওয়া অতি বড় সূক্ষ্মবুদ্ধি চক্ষুষ্মান সন্ধানীর পক্ষেও প্রায় অসম্ভব। আমাদের ধর্মশাস্ত্র, আমাদের পোশাক ভাষা, আমাদের আবরণ-আভরণ, বিচার-শাসন-প্রশাসন, অস্ত্র সৈন্য প্রশিক্ষণ প্রণালী, আমাদের স্থাপত্য-ভাস্কর্য, আমাদের উচ্চাঙ্গের নাচ-গান-বাজনা-অভিনয় প্রভৃতিও এসেছে বাঙলার বাইরে থেকে। আমাদের বাউল সহজিয়া তত্ত্বও এসেছে মহাযানী বৌদ্ধতন্ত্রের বিকৃতি থেকে। আমাদের ভাওয়াইয়া [ভাবের গান], ভাটিয়ালী [ভাটার স্রোতে নৌকা ভাসিয়ে বিশ্রামকালীন গান] আমাদের লোকজ তথা গ্রাম্য অশিক্ষিত লোকের কাম-প্রেম-জীবন-তত্ত্ব সম্পৃক্ত। আবার জারি-সারি-হাপু গান আপাতদৃষ্টে দেশী মনে হলেও এগুলো জড় রয়েছে উত্তর ভারতে। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাও কি আমাদের? এ সূত্রে এ-ও উল্লেখ্য যে সভ্যজাতির ভাষা-সংস্কৃতি-সভ্যতা মাত্রই বিমিশ্র, সমন্বিত, আত্মীকৃত, স্বাঙ্গীকৃত ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বীয়কৃত, কারণ দেয়া-নেয়ার মাধ্যমেই সংস্কৃতির বিকাশ সম্ভব। এককভাবে কোন গোষ্ঠী, গোত্র, সম্প্রদায়, জাতি সবকিছু সৃষ্টি করতে পারে না। এভাবে ভাষা, আচার-আচরণ, দ্রব্যসামগ্রী, আদব-কায়দা, খাদ্যবস্তু, পাকপ্রণালী প্রভৃতি জীবনাচারের ও জীবনযাত্রার সর্বক্ষেত্রে মিশ্রণ ঘটে। এতে লজ্জার কিছু নেই। এখানে আরো একটা ভুল ধারণার ও দাবির উল্লেখ করা বাস্তব সাংস্কৃতিক-রাজনীতিক প্রয়োজন।

যদিও একালে 'হিন্দুধর্ম' বলতে যা স্থূলভাবে লোকব্যবহারে বোঝায়, তা কোন একক প্রবর্তিত ধর্ম বা শাস্ত্র নয়। এখানে বেদের বৈদিক আর্যভাষীর ধর্ম, আর্য-অনার্য মানসজাত বৈদান্তিক বা ঔপনিষদিক অটদ্বৈতবাদী ধর্ম, পশ্চিম এশিয়ার নবীবাদ প্রভাবিত অবতারবাদী শাস্ত্র, সৌর, লিঙ্গায়েৎ মূর্তিপূজক-পশু-পাখি-নারী-বৃক্ষ-পূজক, নানা মতের বৈরাগ্য মতবাদী সম্প্রদায়, জ্ঞান-মায়াবাদী ব্রহ্মবাদী মূর্তিদ্বেষী সম্প্রদায় প্রভৃতি বহু বিচিত্র মতের সামষ্টিক এ কালীন নাম হিন্দুধর্ম। 'হিন্দু' শব্দ ধর্মসম্প্রদায় বাচক ছিল না। এমনকি ষোল-সতেরো শতক অবধি সিন্দুনদ উপত্যকাবাসীই ছিল হিন্দ, হিন্দু ইন্দু ইন্ডিস, ইন্ডিয়ান। ভারতই হিন্দুস্তান, ভারতবাসীই হিন্দুস্তানী, বাঙালীর মুখে এ অর্থে এ শব্দ আজো উচ্চারিত। মারাঠা অভ্যুত্থানের পরে দেশজ মানুষের শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় হিন্দুস্তানী 'হিন্দু' এবং অমুসলিম প্রাকৃতজনের ধারণায় অভিন্ন হয়ে ওঠে। সম্ভবত তখন থেকেই তথা সতেরো শতকের শেষপাদ থেকেই অমুসলিম ও দেশজ ধর্মমতবাদী অর্থে হিন্দু শব্দ গোড়ায় বিভ্রান্তিকরভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে। আর ব্রিটিশেরা ভেদনীতির ফায়দা ওঠানোর জন্যে তুর্কী-মুঘলদের 'মুসলিম' আর তৎপূর্বকালের অধিবাসীমাত্রকেই-'হিন্দু'-এ সাধারণ ধর্মমতাবাদী অভিধায় অভিহিত করতে থাকে। ব্রিটিশ কৃপাপুষ্ট, হৃষ্ট, তুষ্ট, তৃপ্ত, শিক্ষিত হিন্দুরাও জেমস মিলের বর্ণিত কিস্সাকে ইতিহাসরূপে গ্রহণ বরণ করে সাতশত বছরের বাসিন্দা তুর্কী-মুঘলদের বিদেশী বলে জানল, বুঝল ও মানল, যদিও তুর্কী-মুঘল শাসক গোষ্ঠীর লোক পরবর্তীকালের ইংরেজদের মতোই শতে দু'জনও সর্বত্র ছিল না। শতে আটানব্বইজন মুসলিম শূদ্র বা নিম্নবর্ণের, নিম্নবর্গের ও নিম্নবিত্তের তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র বৃত্তিজীবী হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিমের বংশধর। এ ধারণাবশে এ কালের হিন্দুরা ইরানী, গ্রীক, কুষাণ, শক, হুন, দ্রাবিড় [ভেড্ডিড] অস্ট্রিক প্রভৃতি বিভিন্ন কালের ভারত শাসককূলের সংস্কৃতি-সভ্যতার কোন দান-অবদান-প্রভাবই স্বীকার করে না, সবটা যেন বিদেশাগত আর্যভাষীর দান, যদি আমরা জানি আগত আর্যভাষীরা ছিল পশুপালক যাযাবর দস্যুবৃত্তিপ্রবণ বস্তুগত সভ্যতারিক্ত দরিদ্র সংস্কৃতিরিক্ত স্বল্প আবেগ-অনুভূতিঋদ্ধ সূক্তরচক ছিল মাত্র। জন্মান্তরবাদ, স্বর্গ-নরকচেতনা, পশু-পাখি-নারী-মূর্তি পূজা, মন্দিরে উপাসনা, দেউল-দেহারা-নির্মাণ, ধ্যান প্রভৃতি ভারতের দ্রাবিড়-অস্ট্রিক-ইরানী, গ্রীক, কুশান, হুন, শক প্রভৃতি থেকে পাওয়া। বৈদিক আর্যভাষী দলপতির নাম ইন্দ্র, এ সর্দার বা রাজা ইন্দ্রের কাজই ছিল স্থায়ী বাসিন্দা শহুরে সভ্য সমাজের সম্পদ লুট করা, পুর লুট বা ধ্বংস করতেন বলে তাঁর অপর নাম পুন্দর। বেদের সূক্তের মধ্যেই রয়েছে তাঁর কাছে অন্ন ও পশু লুট করে এনে দেয়ার জন্যে গোত্রের লোকদের আবেদন বা প্রার্থনা। অতএব প্রাচীন ভারত নামে একালে হিন্দু নামে পরিচিত জাতির বা সম্প্রদায়ের একচেটে সম্পদ-সভ্যতা-সংস্কৃতি নয়। এ গৌরব-গর্বে তাদের একক ও একান্ত অধিকার নেই। এ সত্য স্বীকার করলে বিভাষী বিধর্মী ও বিবর্ণের লোকের সঙ্গে সম ও সহ স্বার্থে সংযমে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সহিষ্ণুতায় সহযোগিতায় শান্তিতে সৌজন্যে সহাবস্থান সম্ভব ও সহজ হবে, হিন্দু-মুসলিম-খ্রীস্টান বৌদ্ধের মৌলবাদপ্রিয়তা ও অসহিষ্ণুতা কমবে।

আমরা এখন য়ুরোপীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি-মনন-চিন্তন মনীষার অনুকারক ও ধারক জীবনের সর্বক্ষেত্রে-ঘরে বাইরে, মনে রুচিতে ও আচারে-আচরণে। আমরা শিক্ষিতরা, ধনীরা য়ুরোপীয় আদলেই মানসিক ও ব্যবহারিক আর প্রাত্যহিক আচারিক জীবন রচনায় আগ্রহী ও নিরত। এ অবস্থায় স্বাতন্ত্র্যের আস্ফালন নিতান্ত হাস্যকর আত্মঅবমাননা মাত্র। আমরা নকল করি, ধরা পড়ি, তবু সত্য স্বীকার করি না, হিন্দুরা হিন্দুদের 'বাঙালী' বলে জানে। কিন্তু দেশজ মুসলিমদের বাঙালী বলে মানে না, বলে মুসলিম। আবার তুর্কী-মুঘলের জ্ঞাতি হয়ে খান্দানী হওয়ার লোভে আরবের শেখ সৈয়দ বলে ভুল পরিচয়ে তৃপ্তি পাওয়ার গরজে মুসলিমরাও সহজে দেশজ ও অন্ত্যজ হিন্দু-বৌদ্ধ বংশীয় বলে স্বীকার করতে ব্যক্তিগত ও পারিবারিকভাবে রাজি নয়। ফলে আমরা সবাই একপ্রকার আত্মপ্রতারণার শিকার। সে-হিসেবে আমরা না ঘরকা না ঘাটকা। বাঙালী হিন্দুর সভ্যতা ও সংস্কৃতি মাত্রই উত্তর ভারতীয় হিন্দুর। বাঙালী মুসলিমের গৌরব-গর্বের স্থাপত্য ও আচার-সংস্কৃতি মাত্রই তুর্কী-মুঘল মাধ্যমে বৈশ্বিক মুসলিম অবদান। এ হীনম্মন্যতার দরুন বাঙালী হিন্দু আর্যভাষীর সভ্যতার সংস্কৃতির ধারক-বাহক হওয়ার গৌরব-গর্বী এবং মুসলিমরাও তেমনি বিশ্বমুসলিম ঐতিহ্যে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের সন্ধান পায়। এ-ও আত্মপ্রতারণার এক উপায়। নীহার রঞ্জন রায় প্রমুখ অনেকেই বলেছেন বাঙালী ব্রাহ্মণের মধ্যেও এক ফোঁটা আর্যভাষীর রক্ত নেই, সুদিও সুকুমার সেন আলপাইনীয় আর্যভাষীর একটা শাখার বাঙলায় আগমনে ও বসবাসে আস্থাবান। তেমনি দেশজ শেখ-সৈয়দ-খাঁর মধ্যে নেই মক্কী-মদনী-ইরাকী-ইরানী-সমরখন্দী রক্ত। আমরা সবাই অস্ট্রিক এবং দ্রাবিড়-মোঙ্গল [নিষাদ-কিরাত-ভেড্ডিড প্রভৃতির মিশ্ররক্তের কৈবর্ত। আমরা সত্যই মাছে ভাতে মানুষ। আমাদের সব পেশাই প্রাজন্মক্রমিক ও ঘরানা। আমাদের হিন্দুর বর্ণবিন্যাস হয় শ্রুতিস্মৃতির আদিশূরের অথবা বল্লালসেনের নেতৃত্বে। তাই নিতান্ত বানানো, কৃত্রিম, এ কারণে জাতিমালা কাচারিতে দরবার চলেছে প্রায় সতেরো শতক অবধি। কুলপঞ্জিগুলোও গোঁজামিলে ভেজাল। নইলে খাঁটি আর্যভাষীর রক্তজ কুলীন ব্রাহ্মণ গভীর কালো রঙের হয় কি করে, সৈয়দই বা কিভাবে কয়লা-কালো হয়? এ জন্যে বেঁটে পাঠান, কালো ব্রাহ্মণ ও কটারঙের শূদ্র সম্বন্ধে চালু ঠাট্টা সবার জানা। আসলে আমাদের এ অঞ্চল রক্ত বা বর্ণ সঙ্কর মানুষের দেশ। আমাদের অতীত গৌরবময় নয়, নয় কৃতি-কীর্তি বহুল, আমাদের অতীত ঐতিহ্য নেই, আমাদের ভবিষ্যৎ অবশ্যই উজ্জ্বল। কিছু দ্রাবিড় মোঙ্গল রক্তমিশ্রিত হাড়ি ডোম বাগদী চাঁড়াল চামার কামার কুমার সাঁওতাল হো-মুন্ডা পাখ্যা তথা অস্ট্রিকরা আমাদের নিকট জ্ঞাতি। আমরা চিরকাল বিদেশী বিজাতি বিধর্মী বিভাষী শাসিত। একালেই আমরা স্বদেশী স্বজাতি, স্বভাষী এমনকি স্বশ্রেণী শাসিত নতুন জাতি বা আঞ্চলিক অবস্থানে মানুষ। উত্তর ভারতীয়েরা আমাদের জ্ঞাতিও নয়, কুটুম্বও নয়, অন্য বিদেশীদের যারাই এ দেশে এসেছে, তারাও স্বল্পসংখ্যক সন্তান অবশ্যই দু'হাজার বছর ধরে রেখে গেছে, তা শুরু হয়েছে মৌর্যযুগ থেকে এবং তা চিরকাল বিরল প্রজ হয়ে চলতেই থাকবে, কামের প্রেমের বিয়ের মাধ্যমে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজনীতিকরা কুমতলবে এবং সাধারণ শিক্ষিত লোকেরা জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তির স্বল্পতার দরুন আর একটি বিষয়ে অপ্রয়োজনীয়, অসার্থক, গতি-অগ্রগতি ও প্রগতিবিরোধী অত্যন্ত ক্ষতিকর স্বাতন্ত্র্যচেতনায় গুরুত্ব দিয়ে থাকে। যেন স্বাতন্ত্র্যই স্বাধীন বিকাশের, প্রগতির বা অগ্রগতির চাবিকাঠি। দৈশিক, জাতিক, গৌত্রিক, শাস্ত্রিক সংস্কৃতির তথা আচার-আচরণ নিষ্ঠাকেই তারা স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণ ও স্ব-সংস্কৃতির লালনের উপায় বলে জানে ও মানে। এর সঙ্গে দেশাচারে লোকাচারে অদৃশ্য ভূতে ভগবানে প্রেতে পিশাচে আস্থাকে এবং অলীক অলৌকিক শক্তির প্রভাবকেও তথা মন্ত্র মাদুলী, তাবিজ কবচ, তুকতাক, ঝাড়ফুঁক প্রভৃতি সাংস্কৃতিক আচার-আচরণকেও সংস্কৃতির অপরিহার্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বলে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কে যুক্ত বলে মানে ও জানে। মূলত কিংবা বাস্তবেও এটি যে কূর্মবৃত্তি, মানসিক আধি, চরম রক্ষণশীলতা, অনগ্রসরতা, অগতিশীলতা, বন্ধ্যাত্ব ও বদ্ধচিত্ততা, শ্রেয়সকে বরণের গ্রহণের অনুসরণের অনুকরণের ক্ষেত্রে মন-মত-পথ রুদ্ধ করে রাখা, কূপমণ্ডুকের জীবনে হৃষ্ট, তৃপ্ত ও কৃতার্থ থাকারই নামান্তর মাত্র তা বোঝে না। এদের ধারণায় স্বাতন্ত্র্যের চেয়ে বড় ও বাঞ্ছিত সম্পদ দৈশিক, জাতিক, গৌত্রিক, শাস্ত্রিক, এমনকি ভাষিক আঞ্চলিক জীবনে আর কিছুই হতে পারে না, থাকতে পারে না। অথচ আমরা ইতিহাসের সাক্ষ্যে প্রমাণেই জানি যে সভ্যতা-সংস্কৃতিতে রয়েছে মানব উত্তরাধিকার। মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতি এগিয়েছে, এগুচ্ছে এবং চিরকাল এগুবে, ঋদ্ধ হবে লেনে-দেনে, দানে প্রতিদানে, গ্রহণে-বরণে, সৃজনে-অনুকরণে। উদ্ভাবনে-আবিষ্কারে একের মনীষা গবেষণার ফলে-ফসলে সর্বমানবিক অধিকারের স্বীকৃতিতে। যারা নির্বিচারে শ্রেয়সকে, উৎকর্ষকে, জীবনে প্রয়োজনীয় নব আবিষ্কৃত, উদ্ভাবিত ও নির্মিত সামগ্রী গ্রহণ-বরণ করেছে, তারাই কেবল সভ্যতায় সংস্কৃতিতে এগিয়েছে, লাভ করেছে সমকালীনতা, মুক্ত থেকেছে রুচির সংস্কৃতির, আচার-আচরণের বিকৃতি ও অবক্ষয় থেকে। এ জেনে বুঝেও, এমনকি এক বিশেষ প্রাণীর মতো নির্বিচারে অনুকৃত জীবনে অভ্যস্ত ও আগ্রহী হয়েও আমাদের একশ্রেণীর রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবী ভাষণ-বক্তৃতার সুযোগ পেলেই বিদেশী সংস্কৃতি গ্রহণের নিন্দা এবং স্বদেশী সংস্কৃতি সর্বপ্রযত্নে রক্ষণের উপদেশ দিয়ে থাকে। আবার জনপ্রিয়তার লোভে আদিবাসী উপজাতিদের কল্যাণচেতনা দানের পরিবর্তে তাদের রক্ষণশীলতাকে সমর্থন ও উৎসাহ দিয়ে থাকে। এভাবে এরা ওদের স্থিতিশীলতা তথা অবক্ষয়ী অকল্যাণই কামনা করে। ওরা গ্রহণশীল না হলে, কট্টর স্বাতন্ত্র্যচেতনা বর্জন না করলে কখনো কি আধুনিক বা সমকালীন সভ্য ভব্য সংস্কৃতিমান, অগ্রসরমান, প্রগতিশীল প্রাগ্রসর সমাজের সমকক্ষ হতে পারবে? পারবে শ্রেষ্ঠ মননশীল মনীষাসম্পন্ন সৃষ্টিশীল মানুষের স্তরে উন্নীত হতে? অরণ্যবাসীদের ও উপজাতিদের আচরিক এবং বিশ্বাস সংস্কারাচ্ছন্ন আদি ও আদিম জীবনযাপনের প্রথা-পদ্ধতি রক্ষার জন্যে উপদেশদান শহুরে শিক্ষিত সংস্কৃতিমান এবং প্রতীচ্য আদলে জীবনরচনাপ্রবণ ব্যক্তিদের নৈতিক চেতনা ও চরিত্র ভ্রষ্টতাজাত হরবোলাস্বভাবেরই পরিচায়কমাত্র। এতে রাজনীতিক ফায়দা হয়তো ওঠানো সম্ভব। কিন্তু কার্যত এদের সংস্কৃতি-সভ্যতার বিকাশ আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করার পরিবর্তে চিরকাল এদের অনগ্রসর অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অপ্রতিযোগী রাখাই এদের মূল উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অমানবিক স্বার্থপরতা। নতুবা তারা এদের বোঝাত, এদের মধ্যে খ্রিস্টান মিশনারীদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতো শিক্ষার আলোদানের সদ্বুদ্ধি সঞ্চারের, এদের উচ্চাশী ও উন্নত উৎকর্ষকামী করার জন্যে কাজ করত। এদের প্রাচীন বিশ্বাস-সংস্কার, আচার-আচরণ পালা-পার্বণ চেতনা-চিন্তার আবিষ্কার-উদ্ভাবনের ও সৃজনশীলতার অসামর্থ্যজাত এবং অন্য অগ্রসর সমাজের আচার-আচরণ, জীবনযাপনের প্রথা-পদ্ধতির, নীতি-নিয়মের ও রীতি-রেওয়াজের অনুকরণে অনুসরণে অনীহাপ্রসূত। কেননা সভ্যতার ও সংস্কৃতির বিকাশ সম্ভব কেবল নতুন চেতনার, চিন্তার, আবিষ্কারের, উদ্ভাবনের, সৃজনের, হাতিয়ারের উৎকর্ষসাধন সামর্থ্যের, মননের মনীষার প্রয়োজন— প্রেরণাজাত প্রয়াস-প্রযত্নের, অধ্যবসায়ের সঙ্গে জীবনের সাচ্ছল্য, স্বাচ্ছন্দ্য, সুযোগ সুবিধে সৌকর্য সৌন্দর্য সুষমা মাধুর্য উন্নয়নের একাগ্র একান্ত উদ্যম উদ্যোগ আয়োজন প্রভৃতিরই প্রসূন, ফল ও ফসল। সংস্কৃতি হচ্ছে প্রতিমুহূর্তে বৃক্ষের কিশলয়ের মতো সদা বিকাশশীল ও সদাউন্নয়নশীল। যে দেশের, জাতির বা গোত্রের মানুষের জীবনে নতুন চিন্তার, চেতনার, আবিষ্কারের, উদ্ভাবনের, প্রেরণা-প্রণোদনা অঙ্গীকার উদ্যম উদ্যোগ আয়োজন নেই, পুরোনোতে বিরক্তি-বিরাগ নেই, নতুন জিজ্ঞাসা, নব কৌতূহল নব নব আকাঙ্ক্ষা বা অভাববোধের উন্মেষ-অনুভূতি নেই, জীবনে প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক সামগ্রীর সৌকর্যের উৎকর্ষের বৈচিত্র্যদানের উৎসাহ নেই, সে-সমাজ বন্ধ্যা। এবং গতানুগতিকতায় প্রাণহীন, জীর্ণতা ও জড়তার শিকার। সে-সমাজ বন্ধ্যা বলেই অবক্ষয়গ্রস্ত,-বিকাশ বিস্তার উন্নয়নশীলতা থাকতেই পারে না সে সমাজের। ওতে আবর্তন আছে, বিবর্তন নেই, ওদের আচার-আচরণ সমকালীন উপযোগরিক্ত অকেজো। যা কেজো নয়, সমকালীন নয়, যা কেবল পিছু টানে, ধরে রাখে, দেহ-প্রাণ-মন-মনন-প্রগতি অগ্রসরতা-প্রগ্রসরতা ঘটায় না, যা নতুন দিনের প্রয়োজন মেটায় না, পৃথিবীর সভ্য, উন্নত ও নিত্য বিকাশশীল জাতির বা দেশের থেকে গুণে মানে মাপে মাত্রায় কেবল বিচ্ছিন্নতার ব্যবধান বৃদ্ধি করে, উন্নত মানবিক চিন্তা-চেতনার, মনন-মনীষার সংযোগ ঘটায় না, তা সম্পদরূপে, স্বাতন্ত্র্যগৌরব রূপে, ভিন্ন সংস্কৃতিরূপে অনন্য স্বকীয় সম্পদরূপে সার্থক ও গৌরবগর্বের হয় কি করে?

আজ সময় এসেছে স্বধর্ম-বিধর্ম, স্বশাস্ত্র-পরশাস্ত্র, স্বসংস্কৃতি-পরসংস্কৃতি প্রভৃতির পার্থক্য চেতনা, গৌরব-গর্ব নিতান্ত সংকীর্ণচিত্ততার, অবৌদ্ধিকতার ও অযৌক্তিকতার ফল বলে বিবেচনা করার, এ মনোভাব আত্মমঙ্গলের জন্যেই পরিহার করার। সংস্কৃতি-সভ্যতা ক্ষেত্রে সৃজনশীলতার অভাব এবং গ্রহণবিমুখতা অবক্ষয়েরই পথ প্রশস্ত করে মাত্র। মানব সংস্কৃতি-সভ্যতার সামগ্রিক, সামূহিক ও সামষ্টিক বিকাশ-বিস্তার ও উৎকর্ষ চর্চা সাপেক্ষ। পরিচর্যার জন্যে, মনুষ্যত্বের বা মানবতার বিকাশের জন্যেই আমাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে ভৌগোলিক, জাতিক, ভাষিক, গৌত্রিক, শাস্ত্রিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধি পরিহার করে মানব-উত্তরাধিকারে আস্থাবান হয়ে যেখানে যা কিছু কল্যাণকর ব্যবহার উপযোগী ও প্রয়োজনীয় এবং গুণ-মান-মাপ-মাত্রার বিচারে শ্রেষ্ঠ, তা-ই গ্রহণ- বরণ অনুকরণ অনুসরণ করা আবশ্যিক ও জরুরী। তাছাড়া, সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য কথাটাই তো ভুল। সংস্কৃতি যদি হয় (ক) মানুষের মন মনন, চিন্তা-চেতনা, আচার আচরণ, জ্ঞান-বুদ্ধি, যুক্তি, বিবেক-বিবেচনা, মনীষা, মনস্বিতা প্রভৃতির উন্মেষ, প্রকাশ ও বিকাশ এবং (খ) ব্যবহারিক বৈষয়িক জীবনের, প্রয়োজনের, হাতিয়ারের, সাচ্ছল্যের, স্বাচ্ছন্দ্যের, সৌকর্যের, সৌন্দর্যের, বৈচিত্র্যের, উৎকর্ষের নিরন্তর চর্চা বা অনুশীলন, নতুন আবিষ্কার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উদ্ভাবন সৃজন (গ) আর সামাজিক যৌথ জীবনে পারস্পরিক সম্পর্কের, সাহায্যের, সৌজন্যের, সুরুচির, সহানুভূতির, সহযোগিতার মানস অনুশীলন এবং পরিবারে সমাজে রাষ্ট্রে সম ও সহস্বার্থে সংযমে সহিষ্ণুতায় সহাবস্থানের অঙ্গীকারবদ্ধতার বা দায়বদ্ধতার আবশ্যিকতার উপলব্ধি এবং (ঘ) জীবনে নির্বিঘ্নে নিরুপদ্রবে নিরাপদে নিশ্চিন্তে ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগ সম্ভব ও সহজ করার জন্যে শাস্ত্রিক, নৈতিক, প্রাশাসনিক বিধিবিধান লঙ্ঘন না করার মতো রুচি, দায়িত্ব, কর্তব্য, অধিকার এবং আত্মসম্মান সম্পর্কে সচেতনতা, তা হলে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বলে কিছুর অস্তিত্বে আস্থা রাখা অসম্ভব। যে-মানুষ থেকে অকারণে ক্ষতির ভয়ের আশঙ্কা নেই, বরং আসন্ন-আপন্ন যে-কোন বিপদে বিপর্যয়ে সহায়তার আশ্বাস ও ভরসা মেলে, সে-সুজনই সজ্জনই তো আদর্শ সংস্কৃতিমান ভালো মানুষ। উল্লেখ্য, ভদ্রলোক [সাফকাপুড়ে White Collar] হলেই, তথাকথিত লেখাপড়া জানা উচ্চউপাধিধারী হলেই কেউ ভালোমানুষ হয় না। ভালোমানুষে ও ভদ্রলোকে তফাৎ আসমান-জমিনের।

আগেই বলেছি সৃষ্টিমাত্রই আবিষ্কার-উদ্ভাবনমাত্রই ব্যক্তিক চিন্তা-চেতনা-মনন-মনীষী, জ্ঞান-বুদ্ধি, জিজ্ঞাসা-কৌতূহল, ধৈর্য-অধ্যবসায়, সংকল্প-উদ্যম, উদ্যোগ-আয়োজনের প্রয়াসের প্রযত্নের প্রসূন। এবং তাই অন্যদের আচার আচরণ চর্চা চর্যা ভুক্ত হয়ে সংস্কৃতি নামে হয় অভিহিত। তাই এতে থাকে সর্বকালের, সর্বভৌগোলিক অঞ্চলের, সব ভাষার, গোত্রের, বর্ণের, ধর্মের মানুষের অবাধ মানবিক অধিকার এবং কল্যাণকর ও উৎকর্ষ-সৌকর্য ঋদ্ধ বলেই সবার গ্রহণীয়। মানুষের মানসজীবনে ও ব্যবহারিক জীবনযাত্রায় উৎকর্ষ ঘটায়, তা-ই তো সংস্কৃতি।

সংস্কৃতি তো এ তাৎপর্যে মানব প্রজাতির মনুষ্যত্বের তথা মানবিকগুণের বিকাশ বিস্তার, উৎকর্ষ ও লাবণ্য মাত্র। মনুষের মনুষ্যত্বে মানবতায় উত্তরণই তো সংস্কৃতি। বৃত্তি-প্রবৃত্তির সংকীর্ণতা পরিহারে, অহিংসায়, সহায়তায়, সহযোগিতায়, সহাবস্থানে, সৌজন্যে, বহুজনহিতের বহুজনসুখের চেতনায়, সহমর্মিতায় উদারতায়, ক্ষমায়, উপচিকীর্ষায়, মানবপ্রীতির ও মানবসাম্যের অনুশীলন প্রবণতায় এবং সততায় সজ্জনতায় আর ভালোবাসায় ও সহিষ্ণুতায় সংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ ও বাঞ্ছিত রূপায়ণ ব্যক্তিজীবনে চরিত্রে ও আদর্শে অব্যশই সম্ভব। কিন্তু সমাজে তেমন মানুষ কখনো প্রত্যাশিত সংখ্যায়ও মেলে না, মিলবে না। কেননা সবাই স্বভাবে শক্তিতে মেধায়-মনীষায় বিবেকে এবং জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তির ক্ষেত্রে সমমানের, মাপের ও মাত্রার অনুশীলনে চর্চায় ও চর্যায় সমর্থ হবে না জৈবিক কারণেই- ইন্দ্রিয় প্রভাবেই। সংযমে, সহিষ্ণুতায়, পাপী-তাপী-পণ্ডিত-মূর্খ-পতিতাকে অভেদচেতনায় দেখার কিংবা বিভিন্ন শাস্ত্রানুসারীকেও সমাদরে, সহানুভূতিতে গ্রহণের বা মানুষ নির্বিশেষের প্রতি সমদর্শিতার কিছু সাক্ষ্য প্রমাণ মেলে সাধু-সন্ত-শ্রমণ-শ্রাবক-ভিক্ষু-দরবেশ-সন্ন্যাসী-বিবাগী-বিরাগী নামের সমাজবহির্ভূত অস্বাভাবিক জীবনাসক্ত কিছু ব্যক্তির মধ্যে।

তা হলে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যচেতনার গৌরব, গর্ব, মূল্য ও উপযোগটা কি এবং কেন? পর-উদ্ভাবিত আবিষ্কৃত, সৃষ্ট, নির্মিত, ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগ সামগ্রী থেকে, যন্ত্র-প্রকৌশল-প্রযুক্তি প্রয়োগ থেকে নিজেদের বঞ্চিত রাখার, শ্রেষ্ট স্থাপত্য-ভাস্কর্য পোশাক থেকে, সৌন্দর্য, সৌকর্য, লাবণ্য কিংবা সাচ্ছল্য স্বাচ্ছন্দ্য সুখের ও আরামের উপকরণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে নিজেদের স্বেচ্ছায় বঞ্চিত রাখার মতো রক্ষণশীলতায় কূর্মস্বভাবে স্বাতন্ত্র্যগৌরবের ও গর্বের কি আছে?

৫. অপসংস্কৃতি

'অপসংস্কৃতি' একটি আপেক্ষিক অভিধার পরিভাষা। একের পক্ষে যা অপসংস্কৃতি অপরের পক্ষে তা-ই সংস্কৃতি। যেমন একজন মুয়াজ্জিন বা ইমাম পুরোহিত পূজারী স্যুট পরে ইমামতি বা দেবতাপূজা করতে গেলে তা হবে আমাদের অনভ্যস্ত চোখে-মনে অপসংস্কৃতি। আমাদের নারীরা সালওয়ার কামিজ পরলে হয়তো অপসংস্কৃতি হবে না, কিন্তু প্রতীচ্য নারীর স্কাট নিশ্চয়ই আমাদের চোখে অবাঞ্ছিত অশ্লীল নগ্ন অপসংস্কৃতি। অথচ পাশ্চাত্যে তা-ই সংস্কৃতি। বল নাচ কিংবা কপোলে চুম্বন সে-দেশের সংস্কৃতির স্বাভাবিক সামাজিক নির্দোষ আচরণের ও সৌজন্যের অভিব্যক্তি। অথচ কপোলে চুম্বন আমাদের দেশে সমাজে যৌনাচার সম্পৃক্ত। আমাদের গ্রামের পঁচাত্তরোত্তর বয়সের চাষী-মজুর দাড়ি টুপিশূন্য হলে কিংবা গ্রাম্য চাষী-মজুর পরিবারের নারী মাথায় ঘোমটা তথা মাথায় শাড়ির আঁচল না রাখলে হবে তা অপসংস্কৃতির নিদর্শন, আর শহুরে শিক্ষিত পুরুষকে দাড়িহীন টুপিহীন দেখতেই আমরা অভ্যস্ত নয় শুধু, তাদেরই আমরা সুরুচি সংস্কৃতিমান উদার মনোভাবের লোক বলেই মনে করি, তেমনি শহুরে মেয়েদের প্রত্যাশা করি খোলা মাথায় নেকাববিহীন হয়ে দোকানে বাজারে অফিসে বিদ্যালয়ে নিঃসংকোচে চলাফেরা করবে। এটাকেই আমরা এখন চোখসহা, মনসহা এবং গাসহা সুরুচি বলে মানি। এক সময়ে বোরকা (গরীবের ছাতা)-ধারিণী মুসলিম নারীই কেবল পথে ঘাটে দেখা যেত, এমনকি ছাত্রীও। আজ কৃচিৎ কখনো কাউকে দেখা যায় এবং অতীতের স্বাভাবিক দৃশ্য এখন হাস্যকর ও দৃষ্টিকটু হয়ে উঠেছে– কাজেই সংস্কৃতি, সুরুচি আর অপসংস্কৃতি, কুরুচি, অশ্লীল সংস্কৃতি জনে জনে, স্থানে স্থানে, কালে কালে অভিন্ন ছিল না, এখনো নেই এবং ভবিষ্যতেও থাকবে না।

আমাদের দেশে কাব্যে উপন্যাসে রূপকথায় প্রেম মূল্য-মর্যাদা পেলেও বাস্তবে ঘরোয়া ও সামাজিক জীবনে বিবাহপূর্ব প্রেম ছিল পাপ, গর্হিত, নিন্দনীয় এবং অমার্জনীয় অপরাধ। আজকাল অন্তত শহুরে শিক্ষিত লোকের ঘরে বাইরে ছেলে-মেয়েদের মেলামেশা ও প্রেম কেবল নির্দোষ নয়– বাঞ্ছনীয়ও হয়ে উঠেছে, এ সঙ্গে সহশিক্ষার প্রসারও লক্ষণীয়। আগের দিনে হিন্দুঘরে ৮, ৯ বা ১২ বছর বয়সে নারীর বিয়ে দেয়া ছিল শাস্ত্রানুগ, তা-ই ছিল আবশ্যিক ও জরুরী। তারপর ইংরেজ আমলে ব্রাহ্মদের প্রভাবে নারীশিক্ষা চালু হওয়ায় শিক্ষিত হিন্দুঘরে মেয়েদের বিয়ে বিশোত্তর বয়সে হওয়ার রেওয়াজ চালু হল, পরে কালো কুৎসিত বলে কিংবা স্বল্পবিদ্যার কারণে অথবা যৌতুক যোগাড়ের অভাবে হিন্দুর ঘরে ঘরে অবিবাহিত নারীর তথা অধবা নারীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। দায়ে পরেই ভদ্র হিন্দু সমাজ পাপচেতনা, সামাজিক নিন্দা, পারিবারিক সমস্যাজাত দুশ্চিন্তা পরিহার করেছে। একেই সমাজে একটি অসাধ্য বিষয় রূপে সহজেই মেনে নিয়েছে। মুসলিমসমাজেও নারীশিক্ষা বেড়েছে, তারাও একই রূপে এবং একই কারণে অধবা কন্যা নিয়ে আর মাথা ঘামায় না, নিন্দা করারও কেউ নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু গ্রামের অজ্ঞ অনক্ষর হিন্দু-মুসলিম সমাজে অনূঢ়া বয়স্কা নারী থাকা ও রাখা এখনো নিন্দার, অবজ্ঞার, খোঁটার, লজ্জার, পাপের ও অসামাজিক আচরণ বা উদাসীন্য বলে বিবেচিত। তাই ঘরে ঘরে এ এক মহাসমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে নিরন্ন নিঃস্ব বিত্তহীন বর্গাচাষী, প্রান্তিকচাষী ও ক্ষুদ্র তুচ্ছবৃত্তিজীবী পরিবারগুলোতে। মিথ্যা আশা ও আশ্বাস দিয়ে চুক্তি বা শর্ত অনুযায়ী প্রদেয় যৌতুকের অর্থ যথাশিগগির পরিশোধের অঙ্গীকার করে ও চুক্তিভঙ্গের, কথা না রাখার, প্রতারণার প্রতিশোধ-প্রতিহিংসাবশে বধূকে নির্যাতনে নির্যাতনে আত্মহত্যায় বাধ্য করা কিংবা শ্বশুর-ভাশুর স্বামী-দেবর মিলে পিটিয়ে মেরে গায়ে আগুন দিয়ে লাশ পুড়িয়ে বেসামাল আঁচলে উনুনের আগুন লাগায় বধূ পুড়ে মরেছে বলে রটায়। এমনি ঘটনা ঘটছে বছরে কয়েক হাজার। এর থেকে উদ্ধারের একমাত্র আশু উপায় হচ্ছে নারীকে শিক্ষিত করা ও নারীমাত্রকেই যোগ্যতানুসারে রোজগেরে করা এবং কঠোর আইনে যৌতুক দান-গ্রহণ শাস্তিযোগ্য অপরাধ করলেই হবে না, গাঁয়ে তদন্ত করে অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া।

আগের দিনে কৌলীন্য অর্জনের জন্যে তথা খান্দানী হওয়ার জন্যে কুলীন ঘরের খান্দানী পরিবারের অপদার্থ অযোগ্য ছেলেকে ঘরজামাই করে রাখত ধনী হিন্দু-মুসলিমরা। তাতে সে সময়ে ঘরজামাই হওয়া ছিল অবজ্ঞেয় উপহাস্যকর। তখন নারীরা শিক্ষিতা রোজগেরে ছিল না, তাই বাপেরই দায়িত্ব ছিল ভাতে কাপড়ে জামাই পোষণ। এখন স্ত্রীও রোজগার করে, সে-তাৎপর্যে স্বামীমাত্রই আধা-ঘরজামাই। তাই স্বামী স্ত্রীর উপর খবরদারির, বকাবকির অধিকার প্রায় হারিয়ে ফেলেছে ভাতে কাপড়ে স্ত্রী পোষণ করে না বলেই। অনেক ক্ষেত্রে প্রেমজ বিয়ের ক্ষেত্রেও স্বামী হয় স্বল্প বেতনের চাকুরে কিংবা বেকার, রোজগেরে স্ত্রীই স্বামীর ভাত কাপড় যোগায়, সে ক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রীরই অনুগত থাকে। দাম্পত্য হয় শান্তির সুখের ও স্বস্তির। জুয়া-মদ-মাগ আসক্তি থাকে না এমনি অবস্থায় স্বামীর, যা চিরকাল শাহ সামন্ত বেণে বুর্জোয়া ধনী ঘরের বধূদের নিত্য যন্ত্রণার কারণ ছিল। নারী শিক্ষিত ও অর্থোপার্জনশীল হওয়ায় এ সমস্যা একালে প্রায় বিলুপ্তির পথে। তবে দাম্পত্য বিচ্ছিন্নতা তথা তালাকাদি মনের, মতের, মেজাজের ও স্বভাবের এবং ব্যক্তিত্বের বৈপরীত্য ও সংঘাত প্রসূন হিসেবে বাড়তে থাকবে প্রতীচ্যের বিভিন্ন দেশের একশ্রেণীর অবিবেচক অসহিষ্ণু নারী-পুরুষের স্বল্প কালস্থায়ী দাম্পত্যের মতো।

সমাজ ব্যবস্থা কখনো স্থির থাকে না, অতি মন্থরগতিতে হলেও প্রজন্মক্রমে বিবর্তিত হয় প্রায় লোকচক্ষুর অন্তরালে, অস্পষ্টভাবে, লঘুতরঙ্গে কেবল আবর্তিতই হয় না। এ চিরকাল হয়ে এসেছে নতুন ধর্ম মত বা শাস্ত্রের আকারে কিংবা শাস্ত্রিক আচারিক ও প্রাশাসনিক নীতিনিয়ম-প্রথাপদ্ধতি-রীতিরেওয়াজের আকারে, তা ছাড়া যখনই বিদেশী বিজাতি বিধর্মী বিভাষী শাসক দেশ দখল করে ঘাড়ে এসে বসেছে, তার শাস্ত্রিক, নৈতিক, আচারিক, শৈক্ষিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক নীতিনিয়ম, রীতিরেওয়াজ, প্রথাপদ্ধতি, পোশাক ও নিত্যকার জীবনাচার, খাদ্যপ্রস্তুত প্রণালী প্রভৃতি বিবিধ, বিভিন্ন ও বিচিত্রভাবে প্রভাবিত করে শাসিত সমাজকে-তার জ্ঞাতে অজ্ঞাতে। শাসিতজনেরা প্রয়োজনে-প্রলোভনেও প্রভুতুষ্টির জন্যে গ্রহণ-বরণ করে শাসকগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা পদ্ধতি। শাসকগোষ্ঠী তার নিজের ভাষাও দরবারের দফতরের প্রশাসনের ভাষা হিসেবে চালু করে বলেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাসকগোষ্ঠীর শাস্ত্র, ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য প্রভৃতি শিক্ষিত শাসিত সমাজকে সহজেই প্রভাবিত করে, সে-আদলে মনন চিন্তন মনীষা প্রয়োগে উৎসাহিত হয়, আগ্রহী হয় সে-কায়দায় জীবন রচনাতেও। এ সব প্রাচীন ও সনাতনপন্থীদের কাছে অনাচার অপসংস্কৃতিরূপে প্রতিভাত হয়। ব্রিটিশ আমলে কোলকাতায় হিন্দুরা যখন বুট, কোট প্রভৃতি পরা শুরু করল তখন তা সনাতনীদের কাছে শুধু দৃষ্টিকটু ছিল না, সমাজ-সংস্কৃতি ভ্রষ্টতার আশঙ্কায় বিচলিতও হয়ে ছিল তারা। বলেছি নতুন সংস্কৃতি ব্যক্তির সৃষ্টি। কিন্তু তা গৃহীত হয়ে হয় দেশের বা সমাজের আচার, পরিচিত হয় দৈশিক সাম্প্রদায়িক বা জাতিক সংস্কৃতি নামে। এটি সামগ্রিক, সামষ্টিক ও সামূহিকভাবে একটা দেশের সম্প্রদায়ের, সমাজের বা জাতির জীবনাচাররূপে অভিহিত হয়।

কূর্মবৃত্তির রক্ষণশীলদের কাছে যে-কোন পরিবর্তন পোশাকে, আচারে-আচরণে, অভ্যাসে, খাদ্যে, অনাচার, অসংস্কৃতি কিংবা অপসংস্কৃতি তথা সংস্কৃতির বিকৃতিরূপে প্রতিভাত হয়।

স্বভাবের ও স্বাস্থ্যের বিকৃতি ঘটানো অনেক অভ্যাস, আচার ও পানাহার রয়েছে যা ক্ষতিকর হলেও সমাজে নিন্দনীয় নয়, যেমন তামাক পান সুপারি গাঁজা চরস সেবনের সুযোগ দেয়া আমাদের দেশে গৃহস্থের আতিথেয়তা নামেই ছিল প্রশংসিত রীতি। এখনো নিম্নবর্ণের, বর্গের, বিত্তের পেশার মানুষের মধ্যে ধেনো, তাড়ি, হাড়িয়া মদ উৎসব-পার্বণের সামাজিক নির্দোষ উপকরণ ও আয়োজন, যেমন উঁচু শ্রেণীর লোকের মদ, জুয়া, মাগ-সম্ভোগ সামাজিক সাংস্কৃতিক চালু লৌকিকতা মাত্র।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে বিশেষ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিণামে প্রতীচ্যদেশে নারী শিক্ষার ও নারী চাকুরের প্রসারে নারী পর্দা হয় পরিহার্য, পরপুরুষ সংসর্গ এড়ানো হয় অসম্ভব। ফলে নারী-পুরুষের সুপ্রাচীন স্বাতন্ত্র্য সংকোচ শরম আড়ষ্টতা হয় সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত। আমাদের মধ্যশ্রেণীর, নিম্নবিত্তের বর্গের ও শ্রেণীর মধ্যে বেগানা পুরুষ নারীর মধ্যে 'সেকহ্যান্ড' বা হস্তস্পর্শ এখনো যৌন শিহরণ সম্পৃক্ত অনাচাররূপেই দেখা হয়, অথচ অন্যত্র এটা একটা আবশ্যিক সাংস্কৃতিক আচারিক সামাজিক সৌজন্য মাত্র।

এ যন্ত্রযুগে ও যন্ত্রজগতে যন্ত্রনির্ভর যান্ত্রিক জীবনে নারী-পুরুষের শিক্ষাভেদ, কর্মভেদ, চেতনার পার্থক্য, সংসর্গের ব্যবধান, সংকোচ-শরম-দ্বিধা-লজ্জা ঘুচে গেছে, যাচ্ছে এবং যাবেই। কেননা দোকানে-বাজারে-রাস্তায়-বাসে-ট্রামে-রেলে-জাহাজে-বিমানে অফিসে-আদালতে, বিদ্যালয়ে-কলে-কারখানায় জীবনের সর্বক্ষেত্রে সর্বত্র নারী-পুরুষ এখন পরস্পরের সহযাত্রী, সহযোগী ও সহকর্মী। এ অবস্থায় শাস্ত্রিক বিধিবিধান, পাপপুণ্য, সামাজিক নৈতিক নীতিনিয়ম, পারিবারিক ঐতিহ্যিক রীতিরেওয়াজ প্রভৃতি জীবনে জীবিকা অর্জনের জন্যেই নয় কেবল, নানা যন্ত্রের আবিষ্ক্রিয়ার ফলেও পরিহার আবশ্যিক ও জরুরী হয়ে পড়েছে, এর থেকে এ যুগে কেউ বিচ্ছিন্নভাবে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে সনাতনী কায়দায় জীবন যাপন করতেই পারবে না। পুরুষ ডাক্তার দিয়ে নারী অঙ্গে অস্ত্রোপচার করতেই হয় যেমন, তেমনি একালে ঘরোয়া জীবনে অসম সম্পর্কের সদস্যদের নিয়ে তথা ভ্রাতৃবধূ, পুত্রবধূ, ভাই, ছেলে-মেয়ে, মা নিয়ে টিভি-ভিসিআরে সিনেমায় ক্যাসেটে নগ্নতা দেখতেই হয়, শুনতেই হয় রেডিয়োতে নাটকের কামপ্রেম জ্ঞাপক সংলাপ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যদিও এক দলের, এক রুচির, এক সম্প্রদায়ের, গোত্রের, দেশের, কালের ও শাস্ত্রের সংস্কৃতি, অন্য এক দলের, ভিন্ন রুচির, ভিন্ন সম্প্রদায়ের, গোত্রের, দেশের, কালের মানুষের চোখে অপসংস্কৃতি, তবু একালে তা বর্জন পরিহার করে চলা অসম্ভব। একে আত্মস্থ করে এতে অভ্যস্ত হতেই হবে সবাইকে। যুগান্তরে পুরোনো সব কিছুই পাকা-পাতার মতোই ঝরে পড়ে, রাখা যায় না। সংস্কৃতি-সভ্যতার বিবর্তন পরিবর্তন উৎকর্ষ বিকাশ বিস্তার এভাবেই ঘটে, ঘটেছে, ঘটবে। যদিওবা নতুন মাত্রই বয়স্কদের চোখে অপসংস্কৃতি ও নতুন অনাচার বলেই চিরকাল প্রতিভাত হয়, তাতে নতুনকে, পরিবর্তনকে বিবর্তনকে প্রতিরোধ করা যায় না। পুরোনোরা প্রাচীনপন্থীরা পরাজিত ও কালে মৃত্যুতে বিলীন হয়। নতুন প্রতিষ্ঠা পায়, প্রচল হয়। আবার কৈশোরে যৌবনে যেসব তরুণ-তরুণী প্রগতিশীল ও নতুনের আবাহনে মুখর থাকে, তারাই বয়স্ক হলেই নতুন প্রজন্মের প্রয়াস-প্রযত্ন-চিন্তা-চেতনাকে ভ্রষ্টতা ও বিকৃতবুদ্ধির অপকর্ম বলেই জানে, এ-ই নিয়ম। অর্থাৎ এ হচ্ছে নতুন-পুরাতনের রুচি-অভ্যাস-বুদ্ধি-যুক্তি-জ্ঞান-বিবেচনার দ্বন্দ্ব। আজ বৈষ্ণবকীর্তন, রামপ্রসাদী-কালীসঙ্গীত, বাউল গান, দ্বিজেন্দ্রলাল-রজনীকান্তের গান শোনার লোক নিতান্ত স্বল্প, রবীন্দ্রসঙ্গীতে-নজরুলসঙ্গীতেও অনীহ ও না-শোনার লোক কম নয়, এরা পপ গানে-ভঙ্গিতে-বাজনায় আসক্ত। এদের রবীন্দ্র-নজরুল গীতি আর তেমন আকৃষ্ট করে না, যেমন করে না সাধারণ লোককে ধ্রুপদী সঙ্গীত ও নৃত্য-মুদ্রা-ভঙ্গি। 'কালো ঘসতি ভূতানি–' কাল সব কিছুকেই গ্রাস করে, বিলুপ্ত করে। নতুন সূর্যের মতো নতুন প্রজন্মের লোক আপাতদৃষ্টিতে অভিন্ন আকৃতির-প্রকৃতির বলে মনে হলেও বাস্তবে ভবিষ্যৎ প্রতিমুহূর্তে বর্তমান হয়ে অতীত হয়ে যাচ্ছে, প্রতিক্ষণ পল যে অদৃশ্যভাবে যুগান্তরের– কালের যাত্রার গতির অস্পষ্ট অব্যক্ত ধ্বনি ধ্বনিত হয়ে চলেছে কিছু কালের তথা আর্তব বছরের ব্যবধানে আমরা তা চোখে দেখি, কানে শুনি, মানে জানি, অন্তরে অনুভব করি, প্রজ্ঞা-অভিজ্ঞতা দিয়ে উপলব্ধি করি। জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি প্রয়োগে বুঝতে পারি, নতুনে ভীতি আমাদের মানায় না, কারণ নতুন কখনো অকল্যাণকর হয় না। বৃথা, ব্যর্থ ও বিলুপ্ত বা পরিহার্য হওয়ার জন্যে কোন নতুন আসেনি, আসবে না। কেননা, নতুন হচ্ছে নতুন ও উঁচুমানের মনন-মনীষার, আবিষ্কার-উদ্ভাবনের, দর্শনের, অনুভবের ও উপলব্ধির প্রসূন ও ফসল। ওই নতুনকে বরণের-গ্রহণের আগ্রহের মধ্যেই থাকে নতুন প্রাণরস, যা আমাদের জরাজীর্ণতা জড়তামুক্ত রাখে, রাখে গতিশীল উদ্যমশীল উদ্যোগী ও উচ্চাশী।

সংস্কৃতি চলমান মানুষের প্রাত্যহিক জীবন-জীবিকা সম্পৃক্ত। সেজন্যেই সংস্কৃতি গতিশীল এবং প্রতিমুহূর্তে বিকাশমান। হাতিয়ারের সৌকর্য ও বৈচিত্র্য মানুষের জীবনে প্রয়োগভিন্নতার প্রভাব ফেলেছে, ফেলছে, তাতেও জীবন-যাপন পদ্ধতি, জীবনযাত্রার রূপ বদলাচ্ছে। শিক্ষার, প্রশিক্ষণের, শ্রমের, কৌশলের, প্রকৌশলের, নৈপুণ্যের ও কাজের তুচ্ছতার, বৃত্তির ক্ষুদ্রতার দরুন এবং আর্থিক ও শৈক্ষিক অবস্থা ও অবস্থান ভেদে এবং শ্রমের রূপভেদে মার্কসবাদীরা সংস্কৃতিকেও শ্রেণীচেতনাভেদনীতি দিয়ে ব্যাখ্যা ও আখ্যাত করে। এভাবেই লোকসংস্কৃতি, গণসংস্কৃতি, সামন্ত ও বেণে-বুর্জোয়া সংস্কৃতি বর্গীকৃত হয় লাক্ষণিকভাবে।

বাঞ্ছিত মাত্রার জ্ঞান বুদ্ধি যুক্তি বিবেক বিবেচনা শক্তি না থাকলে কোন সমাজেই মানুষ মাত্রেই সংস্কৃতিবান হয় না, এমনকি শাস্ত্রমানা ধার্মিক মানুষও সংস্কৃতিমনা বা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুরুচিমনস্ক হয় না, সৎ ও আদর্শনিষ্ঠ সংবেদনশীল ন্যায়বান সুজনই সংস্কৃতিমান তথা সংযত সহিষ্ণু সজ্জন হয়। সেই জন্যে সৌজন্যই সংস্কৃতি। ভদ্রলোক নয়, সহৃদয় ভালোমানুষই সংস্কৃতিমান। জীবন্ত বাড়ন্ত গাছে যেমন মরা ডাল, মরা পাতা, ভাঙা শাখা থাকে, তেমন, চোর ডাকাত গুন্ডা মাস্তান খুনী প্রবঞ্চক-প্রতারক-লম্পট নিয়েও সমাজ চিরকাল সংস্কৃতি-সভ্যতায় এগিয়েছে, এগুচ্ছে এবং এগুবে। মানুষের জ্ঞান-মন-বুদ্ধি-স্বভাব সমস্তরের ও মাত্রার হয় না, হবে না। সমাজে বাঞ্ছিত সুষম সংস্কৃতি প্রত্যাশিত মাত্রায় কখনো কোথাও প্রত্যক্ষ করা যাবে না। তবে সংস্কৃতিমান মানুষ মাত্রেই আত্মপ্রত্যয়ী হয়, হয় মনে মননে স্বাধীন ও নির্ভীক।

মানুষ মনে মননে সাধারণভাবে নতুন ভীতি ও পুরোনোপ্রীতি পোষণ করে নিশ্চিন্ত জীবন যাপন লক্ষ্যে। বাঁধাপথে চলা নিরাপদ, নতুন পথ উপলবন্ধুর ঝাড়জঙ্গল সঙ্কুলও হয় অনেক সময়ে। তাই মানুষ বাঁধা পথের, চালু রীতির, নীতি-নিয়মের ধারক ও সমর্থক। ঝামেলাহীন জীবন তাদের কাম্য। কারণ তারা বাঁচে ছাপোষা গৃহী গৃহস্থ হিসেবেই। এ জন্যেই আমাদের কথায়-আচরণে কিছু স্বাতন্ত্র্যগৌরব-গর্ব জিইয়ে রেখেছি, যদিও তা উপযোগরিক্ত। সংস্কৃতজ শব্দ হওয়া সত্ত্বেও বাঙালী হিন্দু পানি বলেই না, মুসলমানরাও খাবে না জল। হিন্দুরা নলহীন লোটা, সমতল থালা আঁকড়ে থাকল, বদনা-বাসন-হুঁকা-তহবন [লুঙ্গি] নিলই না। কলাপাতার ব্যবহারে হিন্দু-মুসলিমের বিপরীত রীতি আজো ঘোচেনি, পাগড়ী-উষ্ণীষেও রয়েছে আকৃতিগত পার্থক্য। হিন্দু-মুসলিমের দাড়ি-গোঁফও নয় অভিন্ন। যদিও সবাই একই রোদ-বৃষ্টি-খরা-বন্যা-ঝড়-ঝঞ্ঝা-মারীর শিকার ও মাঠে-বাটে-ঘাটে অভিন্ন লক্ষ্যে বিচরণশীল। এসব অবশ্য শিগগির যাবে। এদের ইচ্ছায় নয়, কালই, যন্ত্রই এসব পার্থক্য ঘোচাবে। আবারও বলি, স্বাতন্ত্র্যচেতনায় লাভ নেই, ক্ষতি আছে, গৌরব নেই, সংকীর্ণ চিত্ততার লজ্জা আছে। স্বাতন্ত্র্যচেতনা কেবল নির্বোধকে স্বর্গসুখ দেয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৃতীয় বক্তৃতা

বিকাশের পথে অভিন্ন বৈশ্বিক সংস্কৃতি

বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড কত বড় তার কোন ধারণা ছিল না মানুষের, তার সাক্ষ্য প্রমাণ রয়েছে অপৌরুষেয় বলে বর্ণিত বিশ্বের শাস্ত্রগ্রন্থগুলো। সূর্যের উপগ্রহ বলে চিহ্নিত আমাদের এ পৃথিবীর পরিধি-পরিসরও উনিশ শতকেও পুরো জানা ছিল না। সাম্প্রতিককালে মানুষ জল-স্থল-আকাশের অনেক খবর, অনেক রহস্য, অনেক তথ্য, তত্ত্ব ও সত্য আবিষ্কারে সফল হয়েছে। তবু এখনো মানুষ অজ্ঞতার মহাসমুদ্রে জ্ঞানের ভেলায় বাস করছে মাত্র। প্রকৃতির রহস্য অশেষ। আড়াই হাজার বছর আগে গ্রীকরা এবং সে-সূত্রে ভারতীয়রা অণু বা অ্যাটমের ধারণা করতে পেরেছিল। কিন্তু আজ ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রন নয় কেবল, তাদের ভেতরও রয়েছে আরো ক্ষুদ্রতর সূক্ষ্মতর শক্তিসত্তা যা এখনো জানা-বোঝার অপেক্ষায় রয়েছে মানুষ।

আজ আমরা নতুন করে Big Bang এবং Black Hole, ওজোন, গ্রীন হাউস প্রভৃতি নানা তথ্যের সংবাদ পাচ্ছি গবেষকদের কাছে। নতুন নতুন সূর্যসম, সূর্যের চেয়ে বড় নক্ষত্র বা গ্রহের সন্ধানও পাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। পৃথিবীতে প্রকৃতির যেসব গুণ বা শক্তি রয়েছে তার অভাবে চন্দ্র নীরব বন্ধ্যা। অন্যান্য গ্রহের অবস্থা সরজমিনে এবং পৃথিবীর পূর্ণ ও নিশ্চিত জ্ঞান আয়ত্তে আসেনি এখনো। আমাদের এ ভূমণ্ডল সম্বন্ধেই আমরা আজো কতটুকু জানি? এ সেদিন শোনা গেল পৃথিবী পনেরো বা সতেরো কোটি বছর আগে পানি বেষ্টিত এক টুকরো ভূমি ছিল, এ জমি এক আকস্মিক প্রচণ্ড কম্পনে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিশাল পানি-সমুদ্রের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে, এভাবে গড়ে উঠেছে দেশ মহাদেশ দ্বীপ পর্বত প্রভৃতি।

কাজেই পাঁচ-ছয় হাজার বছর আগে থেকেই মানুষের সচেতন জিজ্ঞাসা, অপ্রতিরোধ্য কৌতূহল প্রভৃতি অজ্ঞতার ও অসহায়তার দরুন এবং যন্ত্রের অভাবে প্রকৃত জ্ঞান অর্জনের সহায়ক হয়নি, তাদের প্রয়াস প্রযত্ন প্রকৃত সাক্ষ্যের ও পাথুরে প্রমাণের অভাবে অনুমান, সাদৃশ্য ন্যায় এবং কাল্পনিক যুক্তি নির্ভর হয়ে যেসব তথ্য, তত্ত্ব ও সত্য আবিষ্কারের তুষ্টি, তৃপ্তি এবং জ্ঞানগর্ব তাদের প্রসন্ন রেখেছিল, সেসব আজকাল ভুল প্রমাণিত হয়েছে। দুনিয়ার দুটো স্থানে অপৌরুষেয় শাস্ত্র তথা ঈশ্বরপ্রোক্ত জ্ঞান পাওয়া গেছিল বলে লোকে আজো দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। পশ্চিম এশিয়ার কেনান তথা একালের ইজরাইল থেকে মিশর অবধি স্বল্পলোক অধ্যুষিত স্থানে হয় এক লক্ষ তেইশ হাজার নয়শ আটানব্বই জন কিংবা দু'লক্ষ উনচল্লিশ হাজার নয়শ আটানব্বইজন নবী এবং বক্কায় তথা মক্কায় দু'জন নবী আবির্ভূত হয়েছিলেন, আর ভারতে হয়েছিলেন নয়জন অবতার, তার মধ্যে একজন নৃসিংহ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও দু'জন মানুষ্যকৃতির নারায়ণ-রাম ও কৃষ্ণ। রাজনীতিক সামাজিক প্রয়োজনে কোন কোন আপোসকামী সমাজনায়ক গৌতমবুদ্ধকেও অবতার বলে মেনেছেন, কিন্তু বর্ধমান মহাবীরকে নয়। এদের সবার উচ্চারিত বাণী শ্রুতি-স্মৃতিতে ধৃত নেই। পশ্চিম এশিয়ায় রয়েছে নবা উচ্চারিত ঈশ্বরপ্রোক্ত বাণী, ওগুলো সমকালে নয়, পরবর্তীকালে শ্রুতি স্মৃতি থেকে লিপিবদ্ধ হয়েছে। ভারতেও লিখিত কাব্য মহাভারত কাহিনী-কিস্‌সার একটি পর্বের কৃষ্ণ-অর্জুনের তাত্ত্বিক সংলাপই 'গীতা' নামে নারায়ণপোক্ত দেশনারূপে গৃহীত ও অনুসৃত। পড়লেই বোঝা যায় এ সব বাণীতে সমকালীন মনুষ্যসমাজে তথা যৌথজীবনে উদ্ভূত নানা আর্থিক নৈতিক সামাজিক আচারিক ব্যবহারিক এবং ইন্দ্রিয়জ সমস্যা-সঙ্কটের সমাধানের উপায় বা পন্থা নির্দেশ করার প্রয়াস রয়েছে যৌথজীবনে নির্বিরোধ সহযোগিতায় সহাবস্থানে ব্যক্তিক ও সামাজিক জীবনে ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগ নিরুপদ্রব নিরাপদ নির্বিঘ্ন করার লক্ষ্যে।

এ ছাড়াও সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টটল, কনফুসিয়াস, লুৎসে, হাম্মুরাব্বী, কৌটিল্য প্রমুখ জ্ঞানী মনীষীরাও স্বাধিকারে নির্বিঘ্ন সহাবস্থানের নানা নীতি-নিয়ম বিধি-বিধানের আবশ্যিকতার কথা বলেছেন। আগেই বলেছি, গণিত, রসায়ন প্রভৃতির বাস্তব পরীক্ষণ নিরীক্ষণ প্রয়োগ জাত জ্ঞান, আর কিছু পুনঃপৌনিক অভিজ্ঞতা ব্যতীত আর সব তথাকথিত সত্য, তথ্য ও তত্ত্ব সম্পৃক্ত জ্ঞান হচ্ছে নিতান্ত মেনে-নেয়া আন্দাজী জ্ঞান তথা আনুমানিক জ্ঞান। তাই অতীতে অর্জিত, স্বীকৃত জ্ঞান মাত্রই ছিল ভিত্তিহীন। ত্রুটিপূর্ণ তথাকথিত সত্য, তথ্য ও তত্ত্ব। নৃবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী এবং জ্ঞানী-মনীষী-দার্শনিকরা বলেন ভয় থেকেই ভগবানের উৎপত্তি। অচেনা ও আপাত নীরব শান্ত ও বিবিধ বিচিত্র রূপ-রস-শব্দ-গন্ধময় এ প্রকৃতিই কিন্তু আকস্মিক ক্রোধে ক্ষোভে প্রলঙ্কর ভয়ঙ্কর বৈনাশিকরূপ ধারণ করে। ঝড়ঝঞ্ঝা-খরা-বন্যা কম্পন-অগ্নিউদগীরণ করে জনজীবনের বিপর্যয় ও মৃত্যু ঘটায়। কলেরা-বসন্ত-ম্যালেরিয়া-কালাজ্বর-প্লেগ-যক্ষ্মা মহামারীর আকারে এসব রোগ সময়ে সময়ে অকাল ও আকস্মিক মৃত্যু ঘটায়, ধারণ করে বৈনাশিক রূপ।

প্রতিকারের প্রতিরোধের প্রতিষেধক ছিল না এসব যম-প্রতীক রোগের। তাছাড়া ছিল জলে-স্থলে হাঙ্গর কুমীর হিংস্র রক্ত মাংসখেকো পশু কীট সরীসৃপ। এ সবের মধ্যে আদি ও আদিম মানুষ এক প্রবল প্রচণ্ড অরিশক্তির অদৃশ্য অনিশ্চিত, আকস্মিক অকারণ রোষের অভিব্যক্তি সাদাচোখে দেখতে পেত, অজ্ঞ-সরল মনে অনুভব করত। বুঝতে পারত এ অরি বিরূপ রুষ্ট শক্তিকে তোয়াজে তোষামোদে স্তবে স্তুতিতে চারুবাকে প্রশস্তিগানে তুষ্ট রাখতে হবে, আর সে সঙ্গে সন্ধান করতে হবে এ অরিশক্তির প্রতিযোগী প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির। তাকেও বশ করতে হবে তোয়াজে উপচারে পূজায় ভক্তিতে-শ্রদ্ধায়, তাঁকে বানাতে হবে অভয়শরণ, যাচ্‌ঞা করতে হবে তাঁর আশ্রয় ও প্রশ্রয়। বিস্ময় ভয় ত্রাস কল্পনা অজ্ঞতা অনুমান অসহায়তা প্রভৃতি থেকে আদি ও আদিম মানুষ এভাবেই ভয়-শক্তি-ভরসার চেতনা লাভ করে অনুভব করে অরি-মিত্র শক্তির দ্বান্দ্বিক অবস্থান। মানুষের জ্ঞান অভিজ্ঞতা মন্থরতা ও মাত্রাভেদ সত্ত্বেও ক্রমবর্ধমান। এভাবেই বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে গোত্রিক গোষ্ঠীক জীবনে নানা শক্তিপ্রতীক বিভিন্ন দেবতা কল্পিত হয়েছে, তাঁদের কৃপা করুণা দয়া দাক্ষিণ্য আশ্রয়-প্রশ্রয় নির্ভর হয়েছে লোক মানসিকভাবে। তাই তাদের আত্মশক্তির সন্ধান করার সাহস, উদ্যম, উদ্যোগ ছিল স্বল্প ও সামান্য। আত্মপ্রত্যয়ী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আত্মনির্ভর ও স্বয়ম্ভর হওয়ার যৌক্তিক ও বৌদ্ধিক জীবন যাপনের লোক সেকারণেই আজো এতো হাজার বছর পরেও দুর্লভ, বিরলতায় দুর্লক্ষ্য। দেবতা নামের, নিয়তি নামের, কর্মফল নামের কল্পশক্তিচালিত ও জীবনে দুঃখে সুখে বিপদে সম্পদে মানুষ আজো প্রবোধ পায়, কারণ কার্য খোঁজে না জীবনের বাস্তব সুখ-দুঃখের, লাভ-ক্ষতির। আগেই বলেছি এর শুরু সর্বপ্রাণবাদ, যাদুশক্তি-ট্যাবু টোটেমবাদ হয়ে ঝাড়ফুঁক, তুকতাক, বাণ উচ্চাটন, মন্ত্র-মাদুলী, তাবিজ-তাগা, কবচ-কুণ্ডল, পানিপড়া, ধূলিপড়া, অষ্টধাতু পাথর মণি প্রভৃতিও মানুষের আত্মরক্ষণের, আত্মপ্রসাদের, বিপদতাড়নের ধনে জনে পদে মানে সৌভাগ্য-সুযোগ লাভের, শত্রুবিনাশের, আসন্ন ও আপন্ন বিপদের প্রতিকারের প্রতিরোধের অবলম্বন হয়ে রয়েছে আজ অবধি।

সংস্কৃতি-সভ্যতার তথা জ্ঞান-যুক্তি মনন-মনীষার বিকাশের ফলে গোত্রপতি বা জ্ঞানী গুণী ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বুদ্ধিমান কিন্তু লোকহিত ও সমাজশৃঙ্খলাকামী যৌথজীবনে তথা সামাজিক জীবনে সম ও সহস্বার্থে সংযমে সহিষ্ণুতায় নির্বিরোধে স্বাধিকারে সহযোগিতায় সহাবস্থান সম্ভব করার জন্যে পূর্বলব্ধ বিশ্বাসসংস্কারকে যুক্তিসিদ্ধ করেছেন। বিশেষ করে কাহিনীর বা ঘটনার দৃষ্টান্ত বা বয়ান মাধ্যমে ফলপ্রসূ সাক্ষ্য-প্রমাণরূপে উপস্থাপিত করে প্রাজন্মক্রমিক বিশ্বাসসংস্কারকে কোথাও কোথাও ঈশ্বরপ্রোক্ত দেশনারূপে অলঙ্ঘ্য শাস্ত্রের গুরুত্বে উন্নীত ও প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, সেকালের উন্নততর তথা সভ্যতর মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তির ও ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ও প্রচারে। বিশেষ করে পশ্চিম এশিয়ার কালিক গুণে মানে মাপে মাত্রায় উন্নত কিন্তু ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীই প্রথম Time and space কাল ও স্থান নিরপেক্ষ নিরাকার ও সর্বশক্তিমান স্রষ্টাতত্ত্ব উদ্ভাবন করে স্বয়ম্ভু স্রষ্টার মর্ত্য প্রতিনিধির নাম নবী, পহলীতে পয়গম্বর, আর ভারতে সেই নবীবাদই অবতারবাদরূপে প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত। আদি ও আদিম মানব প্রজাতির ভয়-বিস্ময়-কল্পনা-অনুমান-অনুভব-গরজজাত অদৃশ্য শক্তিরূপী স্রষ্টাতত্ত্ব সর্বত্র স্বীকৃত বা অনুভূত ছিল বটে, কিন্তু সে-শক্তি বা স্রষ্টা নারী কি পুরুষ, সাকার কি নিরাকার, তিনি কেমন, কেন বা কি তাঁর আদর্শ উদ্দেশ্য লক্ষ্যই বা কি? তিনি স্বয়ম্ভু হওয়ার আগে তাঁর অস্তিত্বের অর্থাৎ তাঁর উদ্ভবের উৎস কি ও কোথায়? অস্তিত্বে আসার আগেই কি Time and space তৈরি ছিল? এ স্থান-কাল-পরিসর-পরিধি কে রচনা করেছিল? এমনি অনেক অনেক প্রশ্ন মনে জাগে বটে, তার উত্তর যুক্তি-বুদ্ধি প্রয়োগে পাওয়া যায় না। এ জন্যে প্রশ্ন মনে জাগলেও প্রকাশ্যে উচ্চারণ নিষিদ্ধ। স্রষ্টা বা ঈশ্বরবাদীরা তাই এ প্রশ্ন তোলে না। এ ক্ষেত্রে জ্ঞান যুক্তি বুদ্ধি প্রশ্নহীন বিশ্বাসই আস্থার, দাসত্বের ও আনুগত্যের ভিত্তি। তবু বুদ্ধির সঙ্গে জ্ঞানের, সাহসের সঙ্গে শক্তির, মেধার সঙ্গে মনীষার যোগে আর জিজ্ঞাসার সন্দেহের ও কৌতূহলের আধিক্যে গোড়া থেকেই কোন কোন মানুষ স্রষ্টায় বা ঈশ্বরতত্ত্বে আস্থাহীন ছিল। ভারতে সংখ্যা যোগ বৈশেষিক দর্শন মূলত নিরীশ্বর, জৈনরা নিষ্ক্রিয় ঈশ্বরতত্ত্বে আস্থা রাখে মাত্র। তারা হচ্ছে অনেকান্তবাদী। আর চার্বাকদর্শন তো সুপরিচিত। আড়াই হাজার বছর আগে সক্রেটিস অরাকলে [oracle] আস্থাহীন ছিলেন। মাউন্ট ওলিম্পিয়া-সাহারা-তুর-সিনাই-হিমালয় প্রভৃতি অগম্যস্থানে মানুষ দেবনিবাস কল্পনা করত। এখন সেসব গেছে। কিন্তু জন্মমুহূর্ত থেকে মগজধোলাই হয়ে যায় বলে মানুষ গতানুগতিক সামাজিক জীবনে অভ্যস্ত হয়ে যায়, মৌলিক বৌদ্ধিক যৌক্তিক চিন্তা-চেতনার অনুশীলন করে না। তাই হাজার হাজার বছর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধরে মিথ্যা সব বিশ্বাস-সংস্কার মনোমধ্যে লালন পাচ্ছে এবং জীবনও তাদের সেভাবে নিয়মিত, নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হচ্ছে। অথচ আজ ঔষধ আবিষ্কারের ফলে ওলাদেবী শীতলাদেবী তাদের অস্তিত্ব হারিয়েছেন, পূজা পান না অগ্নি ব্যতীত অন্যান্য বৈদিক দেবতা। প্রজাপতি ব্রহ্মাও নিত্যপূজা বঞ্চিত। যুক্তিতে টেকে না স্রষ্টাতত্ত্ব, বিজ্ঞানীর গবেষণালব্ধ তথ্যের সঙ্গে মেলে না কোন ঈশ্বরপ্রোক্ত শাস্ত্রতথ্যও। তাছাড়া ঈশ্বর যদি হন একক এবং অভিন্ন, তাহলে কালে কালে স্থানে স্থানে তার আদেশে নির্দেশে বাণীতে লক্ষ্যে বৈপরীত্য কেন? কাউকে বলছেন মশা-মাছি-কীট-পতঙ্গও মারতে নেই, সব প্রাণীর জীবনের মূল্য সমান। কাউকে বলছেন নিরীহ পশু-পাখি-মাছ বলি দাও স্রষ্টার নামে। কেউ ভাবছেন স্রষ্টা নিরাকার। কেউ জানছেন স্রষ্টা সাকার, কেউ বলেন স্রষ্টা আদ্যশক্তি নারীস্বরূপ, কেউ বলছেন স্রষ্টা ও সৃষ্টি আলাদা, কেউ বলছেন স্রষ্টা-সৃষ্টি অভিন্ন। আমি আমার মহিমা ও শক্তি প্রদর্শনের জন্যেই সৃষ্টি করেছি বিশ্ব ভুবন, আমি একা, তাই নিজেকে সানন্দে অনুভব করবার জন্যেই বহুতে বিচিত্র হয়ে আত্মপ্রকাশ করছি। [I have created the universe for the manifestration of my power. I have created the universe so that I may derive pleasure out of it.] একোহম বহু শ্যাম| কুরআন অনুসারে আল্লাহ হচ্ছেন রব আর সৃষ্টি তথা মানুষ হচ্ছে আবদ্ অর্থাৎ আল্লাহ হলেন প্রভু, মানুষ হল দাস, গোলাম, বান্দা। আল্লাহর স্তুতি-স্তব-প্রশস্তি গাওয়া আর অনুগত থাকাই তার দায়িত্ব ও কর্তব্য। [সূরা ফাতেহা ও আর-রহমান বিশেষভাবে স্মর্তব্য] পুরুষের উপর বিরক্ত হয়ে বেগম রোকেয়া একবার নবী-অবতারে অনাস্থা প্রকাশ করেছিলেন, তাঁর যুক্তি ছিল এই, আমেরিকায় ইউরোপে আফ্রিকায় নবী প্রেরিত হননি কেন? নারী নবীই বা কেউ হল না কেন? কাজেই সবটা পুরুষের স্বার্থেই কল্পিত ও পরিকল্পিত। কাজেই আস্তিক-নাস্তিক, সেশ্বর-নিরীক্ষর জগতে সবযুগেই অন্তত ব্যক্তিগতভাবে সর্বত্র ছিল, আছে, থাকবে। আর আমরা তো জানিই মার্কসবাদী মাত্রই নিরীশ্বর বস্তুবাদী, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে দৃঢ় আস্থাশীল।

প্রকৃতির জগতের বিবিধ বিচিত্র রূপ রঙ রস আকৃতি প্রকৃতি, খাদ্য ফুল ফল মূল পাতা প্রভৃতি মাটি ঘাস তরুলতা পাহাড়-পর্বত, নদী-সমুদ্র, ব্যাক্টেরিয়া-জেলি-পিঁপড়ে থেকে স্থলে হাতী জলে হাতীর বিশগুণ তিমি [১২০ টন] অবধি বিচিত্র প্রাণিজগৎ দেখে মানুষের মনে স্বাভাবিকভাবেই সুনিপুণ সচেতন নির্মাতাতত্ত্ব জাগেই। আমরা জানি জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধির আয়ত্তাতীত হলেই অর্থাৎ কারণ-কার্য বোধগত না হলেই বিস্মিত মানুষ কল্পনায় অনুমানে একটা অলীক অলৌকিক অনন্য অসামান্য অদৃশ্য শক্তির ক্রিয়ায় বা ক্রীড়ায় তথা লীলায় আস্থা বা বিশ্বাস রেখে জিজ্ঞাসার ও কৌতূহলের নিবৃত্তি খোঁজে, নিবৃত্ত করে আবেগ। আদি ও আদিম অজ্ঞ অসহায় মানুষের মনে এভাবেই স্রষ্টার উদ্ভব ঘটে। তা-ই ক্রমে জ্ঞান বুদ্ধি যুক্তি বিশ্বাস সংস্কার ভয় ত্রাস, ভক্তি ভরসা যুক্ত হয়ে শাস্ত্রে ও দর্শনে উন্নীত হয়েছে। হয়েছে দলবদ্ধ, গোষ্ঠীবদ্ধ সম্প্রদায়। আর সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনদর্শনের অঙ্গীভূত হয়ে জীবনাচারের নীতিনিয়ম, রীতিরেওয়াজ, প্রথাপদ্ধতি, আচার-আচরণ-পালাপার্বণ রূপে জীবনচর্যার ও জীবনচর্চার আবশ্যিক ও জরুরী বিষয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু নানা কারণে বিদেশী বিজাতি বিধর্মী বিভাষী বিশ্রেণীর মানুষের সংসর্গে আসার অবশ্যম্ভাবী প্রভাবে সব আচারে-আচরণে বিশ্বাসে-সংস্কারে কথায়-কাজে সঙ্গতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাখা সম্ভব হয়নি সভ্য জগতের কারো পক্ষেই কোথাও। যেমন ব্রিটিশ আমলে একজন বিশ্বাসী হিন্দুও বাধ্য হয়েছে অগস্ত্যযাত্রা অশুভ জেনেও পয়লা ভাদ্রে অফিসে আদালতে কিংবা পরীক্ষা কেন্দ্রে হাজির হতে। শনি-মঙ্গলবারে বৃহস্পতিবারে বিকেল বেলায়ও তাকে পরীক্ষার খাতা লিখতে হয়েছে। তবু কিন্তু তার বিশ্বাস নড়েনি। যেমন ইহুদী-খ্রীস্টান-মুসলিম বিশ্বাস করে লোহিত সাগর মুসার দলদের পলায়নের জন্যে শুকিয়ে গেছিল, কিংবা হিন্দু জানে অগস্ত্য মুনি গণ্ডূষে সাগর জল উদরস্থ করেছিলেন। যদিও আজকাল নিরক্ষর লোকেও জানে গোটা পৃথিবীময় নদী সাগর উপসাগর ও মহাসাগর অবিচ্ছিন্নভাবে জলময়, তা আংশিকভাবে শুকানো কিংবা শোষণ করা অসম্ভব। কাজেই দুটোই অজ্ঞ মানুষের কল্পনাজাত বানানো গল্প। তেমনি টুকরো পাথরে সেতু বন্ধন, তেমনি আবাবিলের ঠোঁটচ্যুত কাঁকর কণার আঘাতে আবরাহা বাহিনীর বিনাশ। অজ্ঞ লীলাবাদী মানুষের বিশ্বাসযোগ্য অদ্ভুত বানানো গল্পমাত্র। এ কালে এসব অচল অবিশ্বাস্য হওয়ারই কথা। তবু জীবন্ত মানুষ চাঁদ নামের উপগ্রহ পায়ে মাড়িয়ে আসার পরও বারোমেসে চাঁদের সু ও কুপ্রভাব, পূর্ণিমা অমাবস্যা-তিথি-ক্ষণ-লগ্নের মাহাত্ম্য-মহিমা-শুভাশুভ প্রভাবপ্রতিপত্তি ও রাশিচক্র নিয়ন্ত্রিত জীবনে আস্থা মোটেই কমেনি। অথচ জীবন ঈশ্বর, না রাশিচক্র নিয়ন্ত্রণ করেন, সে-জিজ্ঞাসা কারো মনে জাগে না। সরকারী গোপন তথ্য বের করাই যেখানে দুঃসাধ্য বা অসাধ্য, সেখানে ঈশ্বর বা রাশিচক্র কাকে মারবেন, কাকে গদীতে বসাবেন, তা নজুম-গণক-জ্যোতিষ বলে দিতে পারেন। এদের নিয়ন্ত্রণেই যেন রয়েছে রাশিচক্র, গ্রহ-উপগ্রহ এবং স্বয়ং ঈশ্বরও। কারণ মন্ত্র আদুলী, তাবিজ-কবচ, তাগা, ধাতুর আংটি, পাথর, মণিযোগে ঈশ্বরের ও রাশিচক্রের ইচ্ছে বা কাজ প্রতিরোধ করা, ব্যর্থ-বৃথা করে দেয়া জ্যোতিষী গণক নজুমের সাধ্যাতীত নয়। এতো কথা বলতে হল, শৈশবে বাল্যে কৈশোরে পারিবারিক, পারিবেশিক ও সামাজিক প্রভাবে যে মগজধোলাই হয়েছে, সেই অজ্ঞতাজাত অভ্যস্ত বিশ্বাসসংস্কার চালিত মানুষের সংখ্যা [পৃথিবীর অর্ধেক মানুষ মার্কসবাদ অঙ্গীকার করা সত্ত্বেও] আজো কম প্রভাবশীল নয়। আমাদের সংস্কৃতিতে শাস্ত্রিক বিশ্বাসসংস্কারের এবং দেশাচার-লোকাচারের প্রভাব অধিক বলেই এতো কথা বলতে হল। নইলে এ যন্ত্রযুগে ও যন্ত্রজগতে যন্ত্রনির্ভর মর্ত্যজীবনে ভূত-ভগবানের অস্তিত্ব প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় অনুভব করা সহজ নয়, সহজ নয় ইহজাগতিক জীবনে ঈশ্বরের লীলা উপলব্ধি বিজ্ঞানীদের নব নব আবিষ্কার উদ্ভাবন দেখে। হিন্দুরা আজো নবগ্রহ ধরে আছে, পশ্চিম এশিয়ার ইহুদী খ্রীস্টান মুসলিম আজো সাত আসমান মানে। Big Bang, Black hole, ওজোন, গ্রীন হাউস নতুন নতুন বিরাট বিশাল নক্ষত্র আবিষ্কার এদের ভাবিয়ে তোলে না, করে না অতীতে সঞ্চিত জ্ঞানে আস্থাহীন। তবু পৃথিবীর সমাজগুলো বদলাবে। মানুষ তাদের বিশ্বাস সংস্কার পরিহারে আগ্রহী হবে অকেজো ও মিথ্যা জেনে।

২.

স্রষ্টা থাকলেই স্রষ্টাপ্রোক্ত শাস্ত্র একটা বানাতে হবেই কেন? স্রষ্টা জলে স্থলে আকাশে জীব উদ্ভিদ গ্রহ নক্ষত্র কত কিছুই সৃষ্টি করেছেন, ব্যাক্টেরিয়া জেলি পিঁপড়ে থেকে তিমি অবধি ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রাণী, ঘাস থেকে বটবৃক্ষ অবধি উদ্ভিদ, সূর্যের চেয়েও বৃহৎ জ্ঞাত-অজ্ঞাত বহু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রহ-উপগ্রহ স্রষ্টা সৃষ্টি করেছেন, তাদের যদি শাস্ত্র গ্রন্থের পূজা উপাসনার, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের স্তব-স্তুতি-প্রশস্তি উচ্চারণে প্রয়োজন না থাকে, তাহলে বিবর্তন মাধ্যমে আমরা মেরুদণ্ড খাড়া করে দু'পায়ে দাঁড়াতে পারি বলে কিংবা দু'হাতে কাজ করতে পারি বলেই ঘর বাড়ি ধান গম পাট আগুন প্রভৃতি প্রয়োজনে উৎপাদন-নির্মাণ ও প্রয়োজনে প্রয়োগ করতে পারি বলেই কি আমাদের স্রষ্টার দাসত্ব বরণ করতে হবে, সর্বক্ষণ তাঁর অনুগ্রহের আশায়, নিগ্রহের আশঙ্কায় অস্বস্তিতে দিনরজনী যাপন করতে হবে? আমাদের প্রস্তাব আপনি ব্যক্তিগতভাবে আপনার জ্ঞানবুদ্ধি যুক্তির মান মাপ মাত্রা অনুযায়ী স্রষ্টার অস্তিত্বে আস্থা রাখুন, তার জন্যে শাস্ত্র বানাবেন না। কেননা তিনি যে আপনার পূজা-উপাসনা দাসত্ব আনুগত্য কৃতজ্ঞতা প্রশংসা প্রশস্তি স্তব-স্তুতি চান, তা আপনি নিশ্চিত করে বলতেই পারছেন না।

কেননা, মুসা-ঈসা-কৃষ্ণের কিস্‌সা কাহিনীতে ঈশ্বরের বা স্রষ্টার সাক্ষ্য মিললেও, আজ অবধি কোন সাধারণ মৃত মানব আত্মার, ঈশ্বরের, স্রষ্টার পারত্রিক জীবনের কোন প্রামাণিক সন্ধান মেলে না। স্বপ্নে, প্ল্যানসেটে বিশ্বাসীরাও কেবল মৃতব্যক্তিদের দেখে বা উপস্থিতি নাকি অনুভব করে। কিন্তু তাদের স্বর্গসুখ, নরকযন্ত্রণার খবর আজো মেলেনি, শক্তির পবিত্রতার প্রতীক হচ্ছে জ্যোতির্ময়তা। জ্যোতির আসমানী উৎস হচ্ছে সূর্য ও নক্ষত্র আর মর্ত্যে প্রত্যক্ষ দেখি তাপময় অগ্নি। আমরা আজকাল এ-ও জানি সূর্যই হচ্ছে আমাদের মর্ত্যে প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে জীবনের উৎস। আজকাল নব নব আবিষ্কার উদ্ভাবন শাস্ত্রকে কেবল ভুল ও মিথ্যা বলেই প্রমাণ করছে। ডারুইন-মার্কস-ফ্রয়েড-পাভলভ যুক্তিবাদী মানুষকে বিশ্বাসসংস্কার মুক্ত করে স্বাধীন চিন্তা-চেতনার-নিরপেক্ষ মনন-মনীষার প্রয়োগে জীবনযাপন করার অধিকারী করেছে।

এখন শিক্ষার বিশ্বময় প্রসারে যুক্তিবাদীর সংখ্যাধিক্যে এবং শ্রেয়স চেতনাবশে ব্যবহারিক জীবনে সুখ-সৌন্দর্য-সৌকার্য-সাচ্ছল্য-স্বাচ্ছন্দ্যের আকর্ষণে বিশ্বময় একক সংস্কৃতিই চালু হবে মানুষের ব্যক্তিক, সামাজিক, নৈতিক এবং আচারিক জীবনে। তার সাক্ষ্য প্রমাণ উন্মেষ বিকাশ বিস্তার হিমালয় কন্দরের ভুটান থেকে আফ্রিকার জঙ্গল অবধি সর্বত্র শিক্ষিত শহুরে মানুষের জীবনে জীবনাচারে সুপরিব্যক্ত হয়েছে, হচ্ছে এবং দ্রুত হবে মানসিক ও ব্যবহারিক জীবনে, শহুরে শিক্ষিত সম্পদশালী মানুষের জীবনযাত্রায় এখন আর জাত-জন্ম; বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-নিবাস ভেদ নেই। পাঁচতারা হোটেলে কিংবা চীনা রেস্তোরাঁয় নয় কেবল, পোশাক-পরিচ্ছদে, আচারে-আচরণে, আদবকায়দায়, আলাপচারিতায় সৌজন্যে শিক্ষিত শহুরে ধনী মানুষমাত্রই এখন প্রায় অভিন্ন। খোলা আকাশ আজকাল সব স্বাতন্ত্র্য, সব কূপমণ্ডূকতা, সব রক্ষণশীলতা, অজ্ঞতা প্রতিমুহূর্তেই ঘুচিয়ে দিচ্ছে রেডিয়ো-টিভি-ভিসিআর-ক্যাসেট-সিনেমা-নাটক, পর্যটন, বাণিজ্যিক লেনদেন, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, নৃবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, বাণিজ্যবিজ্ঞান, অর্থবিজ্ঞান, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্র, যন্ত্র প্রভৃতিও এখন অভিন্ন চিন্তার, চেতনার, রুচির, উপযোগ বুদ্ধির, প্রকৌশল-প্রযুক্তি প্রয়োগের পরিচয় বহন করছে।

কিন্তু অভিন্ন বৈশ্বিক সংস্কৃতির প্রসারের ও উৎকর্ষের জন্যে সবমানুষের সাক্ষর এবং স্ব ও সুশিক্ষিত হওয়া আবশ্যিক অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষকে আশৈশবের পারিবেশিক-শাস্ত্রিক বিশ্বাসসংস্কার ও রুচিবদ্ধতা থেকে মানস-মুক্তির জন্যে সচেতন সযত্ন সতর্ক প্রয়াসী হতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হবে। কেবল শ্রেয়সকে সুন্দরকে কল্যাণকে বরণে উৎসাহী হতে হবে, পরিহারে বর্জনে আগ্রহী হতে হবে অতীতকে মিথ্যা ও অকেজো অজ্ঞতাজাত ভুল সত্য, তথ্য ও তত্ত্ব জেনে।

এর জন্যে যুক্তিবাদের আশ্রয় নিতে হবে। যৌক্তিক ও বৌদ্ধিক বিচার বিবেচনাই মাত্র মানুষকে সর্বপ্রকার মানসিকবদ্ধতা থেকে– যেমন বিশ্বাস-সংস্কার, হিংসা-ঘৃণা-ঈর্ষা-দ্বন্দ্ব-সংঘাত প্রবণতা থেকে মুক্ত করতে ও রাখতে পারে। মানবিকতার, মানবতার তথা মনুষ্যত্বের পূর্ণ উন্মেষ-বিকাশ-বিস্তারের ও উৎকর্ষের জন্যেই আজকের সংহত ছোট পৃথিবীতে নির্বিরোধে সহযোগিতায় সহাবস্থানে মানুষকে অঙ্গীকারবদ্ধ করতে পারে। গরজ বড় বালাই, Necesity knows no law| এর মধ্যেই জাতীয় স্বাতন্ত্র্যাভিমান পরিহার করে জগদ্বাসী কবিরাজী হেকিমি চিকিৎসা বর্জন করেছে। বৈশ্বিক বাণিজ্য ক্ষেত্রেও বার্তা বিনিময়ে এখন যুক্তরাষ্ট্রের ডলার আর ইংরেজী বৈশ্বিক বাজারে সমাজে ও রাষ্ট্রে অর্থসম্পদের ও সর্বপ্রকার ভাববিনিময়ের আর আলাপপরিচয়ের মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে সম্ভবত চিরকালের জন্যেই। এর নামই আন্তর্জাতিকতা। এ কালে কেউ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র নয়, পরস্পর নির্ভরশীল বড় ছোট এ ক্ষেত্রে সমান, কেউ কাউকে অবহেলা করতে পারে না। কেননা এ যুগ হচ্ছে বাণিজ্য ও বাজারসাম্রাজ্যবাদের যুগ। ক্রেতা-বিক্রেতা কেউ কাউকে অবহেলা বা তাচ্ছিল্য করতে পারে না। এধার এ আন্তর্জাতিক সমঝোতার, সংহতির ও অভিন্নতার পক্ষের দু'টো বাধার কথা বলছি।

AMARBOI.COM

৩. 'স্রষ্টা' থাকলেই কি শাস্ত্র বানাতে হয়?

এ বিচিত্র প্রকৃতির, গ্রহ-উপগ্রহের, জীব-উদ্ভিদের ধরেই নিলাম একজন বা একাধিক স্রষ্টা রয়েছেন। তিনি স্রষ্টা, ঈশ্বর, ইয়াহোভা, এলাহি, ইলোয়, আল্লাহ, ব্রহ্ম, বোঙা প্রভৃতি যে-কোন আঞ্চলিক ও ভাষিক নামে অভিহিত হতে পারেন। স্রষ্টা মানার জন্যে কি শাস্ত্রেরও প্রয়োজন? এ কি লাজিক না ম্যাজিক ভিত্তিক? স্রষ্টার অস্তিত্ব কি শাস্ত্র নির্ভর? আমরা স্রষ্টা কে, কি, কেমন, কোথায়, কখন তার আবির্ভাব সে-সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই তুলব না। তাঁর আকার প্রকার, সৃষ্টির উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, ফায়দা, আনন্দ প্রভৃতি সম্বন্ধেও চিন্তা-ভাবনা করব না। আমরা কেবল এক বা একাধিক স্রষ্টার এবং তাঁর বা তাঁদের সহকারী-সহযোগী-অনুগত হুকুমমানা আরো কিছু অদৃশ্য উপশক্তির অস্তিত্বও মেনে নিচ্ছি। কেননা, আমরা হাজার হাজার বছর ধরে পৃথিবীব্যাপী বসবাসকারী বুনো বর্বর ভব্য সভ্য মানুষের বিস্ময়-কল্পনা-ভয়-ভক্তি-ভরসার এবং মিত্র-ইষ্ট-অনিষ্টকারী শক্তিগুলোর কল্পনায় অনুমানে অনুভবে নিজেদের বুদ্ধিতে অজ্ঞিতায় এবং যুক্তিতে পাওয়া কিংবা ভাব-চিন্তা-চেতনার ফসল সিদ্ধান্তগুলো নির্বিচারে যাচাই বাছাই ছাড়াই মেনে নিচ্ছি। এদের ভাব-চিন্তা-চেতনা-মননের স্তর অসম বলে এদের ধারণায়ও রয়েছে অমিল, অসঙ্গতি, বৈপরীত্য অসামঞ্জস্য আর জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তিরিক্ত নানা বিশ্বাস-সংস্কার বা ধারণা বা সিদ্ধান্ত কিংবা মীমাংসা। এতেও আমাদের আপত্তি নেই।

আমাদের মাত্র একটি প্রশ্ন, একটি জিজ্ঞাসা বা একটি আপত্তি–স্রষ্টা থাকলেই কি শাস্ত্র থাকতে হবে? একটা শাস্ত্র বানাতেই হবে? শাস্ত্র যদি হত স্রষ্টাপ্রোক্ত, তাহলে সব ভৌগোলিক ব্যবধান সত্ত্বেও, অরণ্য-পর্বত-সমুদ্রের দুস্তরতা সত্ত্বেও শাস্ত্রোক্ত বাণীর,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিধিনিষেধের, দেশনার, জীব-উদ্ভিদ সৃষ্টির আদর্শ-উদ্দেশ্য-লক্ষ্য-পরিণাম-পরিণতি প্রয়োজন-উপযোগ, আবশ্যিকতা সম্বন্ধেও অভিন্ন কথা মিলত। কোন দু'টো শাস্ত্র অভিন্ন তো নয়ই, বরং ভিন্নতা ও বৈপরীত্যই বেশি। তাহলে শাস্ত্র না মেনে পৈতৃক, গোষ্ঠীক, স্থানিক, কালিক, দলীয় বা যৌথজীবনের সম ও সহস্বার্থে কিংবা বিজ্ঞ বুদ্ধিমান শক্তিমানের স্বার্থে সংযমে, সহিষ্ণুতায়, সাধারণের দাসত্বে, আনুগত্যে, সহায়তায় সহযোগিতায় সহাবস্থানের দায়বদ্ধতা দৃঢ় ও অবশ্য মান্য করার অভিপ্রায়ে কালে কালে স্থানে স্থানে, কৌমিক গৌত্রিক গোষ্ঠীক প্রয়োজনে শাস্ত্রগুলো তৈরি বলে জানলে, বুঝলে ও বর্জন করলে মানুষে মানুষে বিভেদের বিচ্ছেদের ব্যবধানের, দ্বেষণার প্রাচীর মুহূর্তেই ভেঙে পড়ে, উবে যায়। মানুষ তখন কেবল মানুষ নামেই হবে অভিহিত ও পরিচিত। আর ভূত-প্রেত পিশাচ-জীন-পরী-দৈত্য-দানু প্রভৃতি অদৃশ্য শক্তির অপদৃষ্টি ও অপকার ঠেকানোর জন্যে এখনকার মতো ঝাড়ফুঁক, তুকতাক, বাণউচ্চারণ, তাবিজ-কবচ-মন্ত্র-মাদুলী-তাগা ধূলি-তেল-পানি পড়াও চলতে পারবে। সর্বপ্রকার বিশ্বাস-সংস্কারও ব্যক্তিগত জীবনের নিরাপত্তার লাভ-লোভ-লিপ্সার ও ক্ষতি ঠেকানোর গরজে কাজে লাগানোও যাবে এখনকার মতো। কেবল শাস্ত্র মানা ধর্মীয় দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-কোন্দল-দাঙ্গার হবে অবসান। বাড়বে বিশ্বমানবের মৈত্রী।

৪. শাস্ত্র মাত্রই কি স্রষ্টাপ্রোক্ত?

স্রষ্টা থাকলেই কি শাস্ত্রও একটি থাকতে হয়ে হবে? চিরন্তন স্রষ্টা দেশ কাল পাত্র ভেদে বারবার শাস্ত্র বদলান কেন? একই স্রষ্টার বা একদল স্রষ্টাপ্রোক্ত কোন দুটো শাস্ত্রের সত্যে, তথ্যে ও তত্ত্বে মিল নেই কেন? প্রকৃতির জগতে জীব উদ্ভিদের রূপে রসে অঙ্গে অন্তরে বৃত্তি-প্রবৃত্তির বিভিন্নতায়, শক্তিতে গুণে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির সামর্থ্যে বিস্মিত অভিভূত বিমূঢ় বিভ্রান্ত মানুষ কাল্পনাশ্রিত না হয়ে পারে নি। জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তির কিংবা কারণ-কার্যচেতনার ও বিবর্তন তত্ত্বের, আঞ্চলিক জলবায়ুর প্রভাব সম্বন্ধে জ্ঞানের এবং সৌরমণ্ডলের নিয়ন্ত্রণ বৈচিত্র্যের ধারণাশূন্যতার দরুন ও শৈশবে-বাল্যে-কৈশোরে পরিবারে ও সমাজের পরিবেশে প্রাপ্ত বিস্ময় কল্পনা ভয় ভক্তি ভরসা, অরি-মিত্র শক্তির ধারণাবশে দৃঢ়মূল বিশ্বাস-সংস্কারের প্রভাবে পড়ে। একে এ কালের ভাষায় বলে মগজধোলাই। এতে একজন বা একদল স্রষ্টায় বিশ্বাসের উন্মেষ ঘটা ও আস্থা রাখা হয়তো সহজেই সম্ভব। কিন্তু শাস্ত্রমাত্রই কি স্রষ্টাপ্রোক্ত? তাহলে দুনিয়ায় সর্বত্র বারবার পুরোনো শাস্ত্র পরিহার করে মানুষ নতুন নতুন শাস্ত্র বানাল কেন?

কিন্তু শাস্ত্রে মানুষ আস্থা রাখে কি করে? অজ্ঞ-অনক্ষর ভাব-চিন্তা-মননহীন উদাসীন মানুষের বিশ্বাস বা আস্থা অনড় থাকার বা রাখার কারণ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না বটে, শিক্ষিত গুণী জ্ঞানী দার্শনিক, বিদ্বান পণ্ডিত, তার্কিক, যুক্তিবাদীও হতে পারে ঈশ্বরবাদী আনুমানিক হওয়াই অনুভব-উপলব্ধি বশে। কিন্তু এরা স্ব স্ব পরিবারের, সমাজের ও সম্প্রদায়ের শাস্ত্র মানেন কি করে নির্বিচারে? তাঁরা জানেন ও বোঝেন যে কালে কালে, দেশে দেশে, স্থানে স্থানে বিগত কয়েক হাজার বছর ধরে নানা প্রকারের ও ধারণার এবং গুণের, মানের ও স্বভাবের, শক্তির আর ন্যায়-অন্যায় ভালো-মন্দ চেতনার-ঈশ্বরের উন্মেষ-বিকাশ-বিস্তারের প্রভাব মনুষ্যচিত্তে-চেতনায় ঘটেছে। কিছুকাল পরে অর্থাৎ সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্বাসী মানুষের মনে মননে হৃদয়ে আবার ওই ঈশ্বরের বিনাশ, বিবর্তন কিংবা ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে তার জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি আর প্রাকৃতিক জলবায়ুর পরিবর্তনে। স্রষ্টা থাকলেই শাস্ত্র থাকবে, এবং তাও আসমানী হবে, এ বিশ্বাসের বা যুক্তির মূলে কোন যুক্তিবাদী চেতনা নেই। আজো যে-কোন অজ্ঞ বিজ্ঞ, সাক্ষর অনক্ষর, স্বল্প বা বিশেষ বিদ্বান লোকও সহজেই উপলব্ধি করে যে বিভিন্ন জাতির, অঞ্চলের মানুষ যে সব শাস্ত্র মানে সেগুলো বানানো, অযৌক্তিক, উপযোগরিক্ত, নিষ্ফল, পরিহাসযোগ্য অবজ্ঞেয় নিবুর্দ্ধিতার পরিচায়ক। সে কেবল নিজের শাস্ত্রেই এসব কোন দোষ-ত্রুটি, উপহাস্য অজ্ঞতার উপাদান-উপকরণ আচার-বিশ্বাস খুঁজে পায় না। এ এক অদ্ভুত মূর্খতা ও মুগ্ধতা। এর মধ্যে সে-বালকের বোধগত জটিল চেতনারিক্ততার সাক্ষ্যই মেলে, যে My head মানে 'আমার মাথা' বোঝে না, বোঝে মায়ের, বাবার ও গোষ্ঠীর মাথা। সবাই নিজের শাস্ত্রকেই বিশুদ্ধ, নির্ভুল ও সর্বশ্রেষ্ঠ বলে জানে ও মানে, অন্যদের শাস্ত্রগুলো যে নির্বোধেরই মান্য, তাও মুহূর্তেই যুক্তি তর্ক দিয়ে, সাক্ষ্য-প্রমাণ-বিজ্ঞান দিয়ে প্রমাণ করে দিতে পারে এবং নির্দেশ করে চোখে আঙ্গুল দিয়ে, অকাট্য যুক্তিপ্রমাণ যোগে বিশ্বাসযোগ্য বা যুক্তি গ্রাহ্য করে তোলে। বিবর্তনতত্ত্বে না হয় বিশ্বাস না-ই করল, বিজ্ঞানের বহু আবিষ্কার শাস্ত্রোক্ত সত্য, তথ্য ও তত্ত্ব বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও। কিন্তু স্রষ্টায় আস্থা আর শাস্ত্রে বিশ্বাস অপরিহার্য হয় কেন? আসলে শৈশবের-বাল্যের-কৈশোরের শাস্ত্রিক মগজধোলাই-ই ব্যক্তির সারা জীবন নিয়ন্ত্রণ করে বিশ্বাস-সংস্কার রূপে। কেউ সাহস করে যাচাই বাছাই করে না। প্রয়োজনও মনে করেন না। কাজেই স্বশাস্ত্রোক্ত আত্মায়, আত্মার পাপ-পুণ্যজাত পারত্রিক পরিণামে, ঐহিক ও ইহজাগতিক নীতি-নিয়ম, আচার-আচরণ, চর্যা-চর্চা প্রভৃতির প্রতি আস্থা, কৈশোরে যৌবনে বয়োধর্মে ঔদাসীন্য থাকলেও, প্রৌঢ়ত্বে বার্ধক্যে মৃত্যুচেতনা বশে জ্ঞাত-অজ্ঞাত পাপের পরিণামভীতি মানুষকে বার্ধক্যে রোবোটের মতো শাস্ত্রসম্মত চর্যায়, অনুশীলনে প্রবর্তনা দেয়। ধর্মীয় কোন্দল ও বিধর্মীদ্বেষণা বিলোপ করার জন্যেই এমনি আলোচনা প্রয়োজন।

৫.

স্রষ্টা শাস্ত্র ঈশ্বর সম্বন্ধে এতো কথা বলতে হচ্ছে এ জন্যে যে সাধারণ মানুষের সাংস্কৃতিক উৎস শাস্ত্রিক দেশনা এবং সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি পায় শাস্ত্রিক আচারে ও শাস্ত্রতত্ত্ব সম্পৃক্ত মনে মতে মননে চিন্তনে। আসলে যে-মানুষ বহুবলে বলী, জনবলে প্রবল, ধনী বলে ক্ষমতাবান, সে-মানুষ নিজ স্বার্থে বেপওয়াভাবে তথা নির্ভীক নির্বিঘ্ন জীবনযাপনে অর্থাৎ স্বৈর স্বেচ্ছাজীবনযাত্রায় কার্যত শক্তির, ইচ্ছার, অভিলাষের, ক্ষমতার অপ্রয়োগে অবাঞ্ছিত ব্যবহারে অনধিকার চর্চা করেই। তাই দুর্বলকে প্রবলের দৌরাত্ম্য থেকে রক্ষা করার জন্যেই অদৃশ্য আসমানী শক্তির দোহাই দিয়ে, তাঁকে ইহ-পরলোকের মালিক বানিয়ে এবং অমর আত্মার স্রষ্টা ও নিয়ন্তা বলে জেনে তাঁর কবলমুক্তির তাঁর শাসন-শাস্তি এড়ানো অসম্ভব বলে ধারণা দিতে হয়েছেন জ্ঞানবান ও বুদ্ধিমান মানুষ। মানুষকে স্বকল্যাণেই সংযমে, সহিষ্ণুতায় অনধিকারচর্চায় ক্ষমতার অপব্যবহারে বিরত রাখার অভিপ্রায়ে সমাজসর্দার বুদ্ধিমান সমাজহিতৈষীরা মানুষকে নির্বিরোধ নিরুপদ্রব নিরাপদ ব্যক্তিক জীবনে সহযোগিতায় সহাবস্থানের প্রবর্তনা দেয়ার জন্যে ঐশ শাস্ত্রের নীতিনিয়ম প্রচার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছেন। এ লক্ষ্যেই এভাবেই শাস্ত্রের উদ্ভব। কিন্তু স্বধর্মীর মধ্যেও মতের পথের পার্থক্যজাত বিরোধ বিবাদ সংঘর্ষ সংঘাত নিরোধ করা যায় নি পৃথিবীর কোথাও। বাস্তবে ধর্ম মত পথ নিয়ে বিরোধ বিবাদ স্বধর্মীর মধ্যে এবং বিধর্মীদের সঙ্গে যত রক্তক্ষরা প্রাণহরা লড়াই-দাঙ্গা-যুদ্ধ হয়েছে হাজার হাজার বার এবং বছরের পর বছর ধরে লাগাতার, আর যত প্রাণহানি ঘটেছে, বিগত দুই য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে ততলোক কোথাও কখনো কোন পরাক্রান্ত-বিজেতা, – ঘটানো যুদ্ধে নিহত হয় নি, তীর বর্শা গদা তরবারী বন্দুক কামানের যুদ্ধে।

পৃথিবীর কোন শাস্ত্রগ্রন্থেরই ঈশ্বরপ্রোক্ত কোন বাণীতেই পৃথিবীর ভৌগোলিক পরিধি পরিসরের কোন খবর মেলে না, মেলেনা পৃথিবীর বনে জঙ্গলে দ্বীপে মহাদেশে বৃহৎ দ্বীপপুঞ্জেও যে মানুষ বাস করত তারও কোন উল্লেখ এসব খবর পাইনে পৃথিবীর জ্ঞানী গুণী মনীষীর বাণীতে। সব উল্লেখ্য ও আলোচ্য এবং উক্ত বিষয় নিবদ্ধ ছিল কাছাকাছি অঞ্চলের বাসিন্দা কৌম গোত্র গোষ্ঠী সম্বন্ধে। অরণ্য জনপদ-পর্বত-সাগর-নদীও ছিল আঞ্চলিক জ্ঞানেই সীমিত। এ শাস্ত্রকে তাই স্থানিক কালিক প্রয়োজনে আঞ্চলিক জ্ঞানী মনীষী রচিত এবং জ্ঞাত অজ্ঞাত বহুজনের জ্ঞানের অভিজ্ঞতার মননের চিন্তনের প্রসূন আপ্তবাক্যের, প্রবাদের, প্রবচনের, কিংবদন্তীর দেশাচার-লোকাচারের এবং পরম্পরাগত শ্রুতি-স্মৃতির সংগ্রহ-সংকলন সঞ্চয়মাত্র বলেই নিরীশ্বর নাস্তিক দার্শনিকদের এবং নৃবিজ্ঞানীর ও সমাজবিজ্ঞানীর ধারণা।

জল স্থল আকাশের নানা রহস্য বিজ্ঞানীদের গবেষণার ও তৈরি যন্ত্রের মাধ্যমে রোজ জানা যাচ্ছে। জীব-উদ্ভিদ-মানুষের দেহের আর চেতনারও বিস্ময়কর ও বিচিত্র সব রহস্য অন্ধি সন্ধি জানা যাচ্ছে। আরো অনেক রহস্য আজো অজানা অনুদঘাটিত। জানার বিষয়ও অশেষ। তবে জিজ্ঞাসু কৌতূহলী, মেধা মনীষাসম্পন্ন অধ্যবসায়ীরা ধনী দেশের সরকারের অজস্র আর্থিক সহায়তায় নানারূপ যন্ত্র তৈরি করে, যান্ত্রিক গবেষণায় সমুদ্র তলের মাটির গভীরের, অসীম অশেষ আকাশের খোঁজে খবর নিচ্ছেন পরম আগ্রহে। কাজেই আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে আমাদের জীবনে জানা ও মানা জ্ঞানের অনেক কিছু ভুল ও অসম্পূর্ণ বলে পরিত্যক্ত হবে, অনেক জ্ঞানের সীমা বিস্তৃত হবে, নতুন রহস্যের উদঘাটন জ্ঞানের পরিধি প্রসারিত করবে। অভাবিত অকল্পিত অসম্ভব বিবেচিত বিষয়ও আমাদের জ্ঞানগত হবে। তখন আমরা সবাই স্বীকার করতে বাধ্য হব যে অতীতে শাস্ত্রে সমাজে বিজ্ঞানে চিকিৎসাবিদ্যায় দর্শনে জীবনে অনুভবে জ্ঞান বলে জানতাম, তাদের অনেকটা বা সম্পূর্ণটা মিথ্যা-মরীচিকা বলে প্রমাণিত ও পরিহার্য হবে। আমরা এ আশার আশ্বাসে ও প্রত্যাশায় রয়েছি।

এ বিজ্ঞানীরাই তাঁদের তাথ্যিক, তাত্ত্বিক ও যান্ত্রিক আবিষ্কার-উদ্ভাবনের মাধ্যমে প্রকৌশল প্রযুক্তি প্রয়োগে দেহ-প্রাণ-চেতনা-মনন রহস্য সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান দিয়ে মর্ত্যে অভিন্ন ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে, আসবাব-তৈজসপত্র-স্থাপত্য-চিকিৎসা-যানবাহন, খাদ্য-পোশাক প্রভৃতি প্রাত্যহিক জীবনাচারের জীবনযাপন পদ্ধতির অভিন্নতা এক অভিন্ন মানস ও ব্যবহারিক মানব-সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটাবেন। ইতোমধ্যেই পৃথিবীর শিক্ষিত শহুরে ধনী মানুষ জীবনাচারে অনেকটা অভিন্ন হয়েই গেছে। বিজ্ঞানীদের গবেষণার ফলে দ্রুত প্রসারমাণ হবে জ্ঞান বুদ্ধি যুক্তি বিবেচনা এবং ব্যবহারিক জীবনের নিত্য প্রয়োজনের ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিলাসের ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগের সামগ্রীর, যন্ত্রের প্রসারে জীবনযাত্রায় আসবে সৌন্দর্য সৌকর্য স্বাচ্ছন্দ্য সাচ্ছল্য সুখ আনন্দ আরাম। রোগমাত্রেরই থাকবে প্রতিষেধক, আয়ু বাড়বে, জরা জীর্ণতা জড়তা যাবে ঘুচে।

অবশ্য সব পার্থক্য ঘুচে যাবে না। মানসিক ও ব্যবহারিক কিছু পার্থক্য থাকবেই। কেননা মানুষও মানবপ্রজাতির প্রাণী। তারও থাকবে অনিয়ন্ত্রিত অসংযত ইন্দ্রিয়জ বৃত্তি-প্রবৃত্তি চালিত ভাব-চিন্তা-আচার-আচরণের সাময়িক প্রকাশ বা অভিব্যক্তি। আর ব্যবহারিক জীবনেও কিছু স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য চেতনার প্রভাব মুছে ফেলা যাবে না। যেমন মন্দির মঠ মসজিদ গির্জা সিনাগগ পেগোডার স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য আকার আকৃতি বজায় রাখার আগ্রহ থাকবে পরম্পরা প্রীতিবেশে। তবু :

১. চিকিৎসাবিজ্ঞানে কেবল প্রতীচ্য গবেষণালব্ধ জ্ঞানজ চিকিৎসাপদ্ধতি হবে পৃথিবীর সর্বত্র অনুসৃত।

২. স্থাপত্য বিজ্ঞানেও বিশ্ববাসী থাকবে প্রতীচ্য নির্ভর। দালান কোঠা মাত্রই বিচিত্র হয়েও প্রতীচ্য মনন-মনীষা প্রসূন থাকবে আকারে প্রকারে কৌশলে। আবার আফ্রো-এশিয়ার গবেষক-উদ্ভাবক নতুনতর কোন রীতি-পদ্ধতি আবিষ্কার-উদ্ভাবন করলে তাও হবে বিশ্বব্যাপী অনুকৃত। কেননা একালে কোন নতুনই কোন বিশেষ অঞ্চলে সীমিত থাকবে না।

৩. পূর্ব পুরুষের পোশাকে প্যান্ট শার্ট হাওয়াই শার্ট কোট স্যুট টাই জুতা হবে পৃথিবীর সর্বত্র অনুকৃত। আমাদের নারীরাও ট্রামে বাসে ট্রেনে চড়বার, দ্রুত হাঁটবার এবং কলেকারখানায় কায়িক কর্মের সুবিধের জন্যে শাড়ির বদলে প্রথমে সালওয়ার কামিজ পরে শাহর আমলের শহুরে শিক্ষিতা ইরানীদের মতো পাক-ভারত-বাঙলাদেশেও স্কার্ট অন্যান্য খ্রীস্টানমতবাদী য়ুরোপীয় খ্রীস্টান প্রভাবিত নারীদের মতো পোশাক পরবে।

৪. ফোন-ফ্যান-ফ্রিজ-স্টোভ-পেষণযন্ত্র প্রভৃতি সর্বপ্রকার প্রতীচ্য উদ্ভাবিত যন্ত্র নয় কেবল, আমাদের সর্বপ্রকার আসবাব তৈজসপত্রও এ মুহূর্তেও কেবল সমতলের উচ্চ ও মধ্য ও নিম্নশ্রেণীর শহুরে লোকের মধ্যে নয়, অরণ্য পর্বতবাসী শিক্ষিত ও ধনী পরিবারেরও অভিন্ন।

৫. পৃথিবীব্যাপী জল স্থল বায়ু বাহিনী গঠিত হয় প্রতীচ্য আদলেই। প্রশিক্ষণে, পোশাকে প্রশাসনে পুনর্বিন্যাসে ক্ষমতার মানে মাত্রায়, আর প্রতীচ্যে উদ্ভাবিত ও নির্মিত অস্ত্রেই এবং যানবাহনে হয় সজ্জিত, বায়ুযান বিমান, জলযান ফ্রিগেট জাহাজ সাবম্যারিন, স্থল যান কনভয় ট্যাঙ্ক সবটাই অবিকল অনুকৃত ও ক্রীত।

৬. আমাদের অফিস দফতর আদালত সেক্যুলার আইন-কানুন, বিচারালয় বিচারপদ্ধতি সবটাই য়ুরোপীয়। আমাদের রাজনীতির তত্ত্ব, আদর্শ, তন্ত্র, দায়িত্ব, কর্তব্য, স্বাধিকারবোধ, জাতীয়তাবোধ, রাষ্ট্রগঠন প্রভৃতিও য়ুরোপের অবদান। এক কথায় রাষ্ট্রে আমাদের শাসন-প্রশাসন নীতিনিয়ম, রীতিরেওয়াজ, প্রথাপদ্ধতি সবটাই ব্রিটিশ তথা প্রতীচ্য থেকে পাওয়া ও নেওয়া।

৭. আমাদের আধুনিক দার্শনিকতত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান, সাহিত্যতত্ত্ব, সৌন্দর্যতত্ত্ব, কাব্য নাটক গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ আলোচনা সমালোচনা প্রভৃতিও প্রতীচ্য ধারণার প্রসূন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৮. আমাদের নৃবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থবিজ্ঞান, বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি, এমন কি দোকান সজ্জাও প্রতীচ্য থেকে নেয়া।

৯. আমাদের বিজ্ঞান রসায়ন পদার্থ গণিত জীবরসায়ন উদ্ভিদবিজ্ঞান জীববিজ্ঞান মৃত্তিকাবিজ্ঞান, এমনকি পরিসংখ্যান ও ভূগোল বিদ্যা দানপদ্ধতিও অনুকৃত এবং প্রতীচ্য বিদ্বানের গবেষণালব্ধ জ্ঞাননির্ভর। ওদের লিখিত গ্রন্থই আমাদের অবিকল অবলম্বন।

১০. কৃষিবিপ্লবও ঘটিয়েছে ওরাই, কেবল ইরি নয়, ট্রাক্টার, বীজ বুননপদ্ধতি, রাসায়নিক সার তৈরি, শস্য কর্তন কল, ধান গম খড় বিচ্ছিন্ন করার কল, ধান-গমের খোসা খসানো কল, আখমাড়াই কল, বিভিন্ন তরুলতা গুল্ম সম্বন্ধে প্রকৃত কেজো জ্ঞান অর্জন ওদেরই সৃজনশীলতার ফল।

১১. গরু-মোষ-ঘোড়া টানাগাড়ির বিলুপ্তি এদেশে ত্বরান্বিত করেছে জাপানী রিক্সা। নৌকাও হবে অচল মোটর ইঞ্জিন থেকে। আর প্রতীচ্য মোটরইঞ্জিন, রেলইঞ্জিন, আর বায়ুযান বিমান তো সত্যই দূরকে করেছে নিকটবন্ধু, পরকে করেছে ভাই; সে-সঙ্গে রেডিয়ো টিভি ভিসিআর ক্যামেরা স্যাটেলাইট কেন্দ্র, ফোন ও তারে-বেতারে বাণী বিনিময় ব্যবস্থা পৃথিবীব্যাপী মানুষের পরিচয়ের ও দূরত্বের বাধা ঘুচিয়েছে। পাখি যা পারে না, মানুষ তা পারে, সমুদ্র গর্ভে তিমি-সিন্ধুঘোড়া-হাঙ্গর-কুমীর যা পারে না, মানুষ তা পারে, স্থলে পিপঁড়ে-হাতীর যা অসাধ্য, মানুষের পক্ষে তা সহজ সাধ্য। মানুষের জিজ্ঞাসা-কৌতূহল-আবিষ্কারের নেশা, শক্তি ও বুদ্ধি মানুষকে ক্রমে প্রকৃতির বশ্যতা মুক্ত করছে। আজ মানুষ জল-স্থল-আকাশের কিনারাসন্ধানী।

১২. কম্প্যুটারের এবং ছাপাখানার সৌকর্য বিস্ময়কর এবং টেলিপ্রিন্টারও অচল করে দিচ্ছে ফ্যাক্স টেলেক্স। ফোনেও দেখা যাচ্ছে আলাপরত ব্যক্তির চেহারা, আরো কত কিছু যে আবিষ্কার-উদ্ভাবনের অপেক্ষায় রয়েছে, তা আমাদের মতো আনাড়ির কল্পনাতীত।

১৩. খাদ্যবস্তুতে অবশ্য ভৌগোলিক অবস্থানজাত আবহাওয়ার প্রভাবে ফুল-ফল-মূল-সব্জির অনেক কিছুই উৎপাদন হয়তো অসম্ভব থাকবে, এবং স্থানিকভাবে সহজপ্রাপ্যতার এবং অপ্রাপ্যতার দরুন সামান্য পার্থক্য হয়তো থাকবে, তবে আদান-প্রদানের, আমদানী-রফতানীর সহজতার ফলে খাদ্যও অভিন্ন হয়ে উঠবে। এখন যেমন বিস্কুট, কেক, লজেন্স, চকলেট, আইসক্রিম, নুডলস, পুডিং ও নানা চীনাপদ্ধতিতে রান্না করা খাদ্য আমরা পৃথিবীব্যাপী শাহুরে লোকেরা পরমানন্দে গ্রহণ করে তৃপ্ত ও তুষ্ট হই।

১৪. উদ্যান রচনায়ও পৃথিবীর তরু-লতা-ঘাস আমরা একস্থানে উদ্ভিদ বাগানে জন্মাচ্ছি। পশু, পাখি, বানর, শিম্পাঞ্জি, ওরাংওটাং, গরিলা প্রভৃতি আমাদের আদি ও আদিম জ্ঞাতিদের, কিংবা সমুদ্রগর্ভস্থ তরুলতা ফুল ফল আর সর্বপ্রকার প্রাণী সংগ্রহের ও রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬.

এভাবে দেখলে জানা বোঝা যায় যে আমাদের সংস্কৃতি-সভ্যতার এখনকার একমাত্র উৎস, আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের, আমাদের মনন-চিন্তনের, আমাদের মনীষা-মনস্বিতার, আমাদের আবিষ্কার-উদ্ভাবনের এবং সর্বপ্রকার সৃষ্টির, নির্মাণের ও উৎকর্ষ সাধনের আদর্শ নায়ক-দিশারী-স্রষ্টা ও নির্মাতা প্রতীচ্যদেশ। আর জাপান অনুকরণপটুতায়, আত্মীকরণশক্তিতে স্বীকরণে ও সাঙ্গীকরণে শ্রেষ্ঠ। আর পাঁচটি মহাদেশের অন্যরা অনুকরণে গ্রহণে বরণে সংস্কৃতিতে সমকালীন স্তরে আত্মোন্নয়নে প্রয়াসী। কিন্তু এ অবস্থা তো চিরকাল থাকবে না। আফ্রো এশিয়া লাতিন আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড এবং বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন দ্বীপপুঞ্জের মানুষের অশিক্ষা অজ্ঞতাও ঘুচবে যুগ প্রভাবে। তখন তারাও আবিষ্কারে উদ্ভাবনে সৃজনে নির্মাণে উৎপাদনে, গবেষণালব্ধ নতুন নতুন তথ্য ও তত্ত্ব পরিবেশনে মর্ত্যমানবদের জীবনে মননে মনীষায় উৎকর্ষ ও লাবণ্য বৃদ্ধি করবে। তখন আমরা আর প্রতীচীর অবদানের প্রতীক্ষায় থাকব না। একের অবদান হবে সর্ব মানবের সর্বকালের সর্বস্থানের এজমালী মানবসম্পদ।

মানুষ আজ জ্ঞানে বিজ্ঞানে আবিষ্কার-উদ্ভাবনের, সৃষ্টির কৌশল-প্রকৌশল-প্রযুক্তির ও যন্ত্রের সৌকর্যের ক্ষেত্রে অনেক এগিয়েছে, আরো বিস্ময়কর ও বিচিত্রভাবে এগুবে। কেননা, ইতোমধ্যেই বোঝা গেছে মানুষের মস্তিষ্কের শক্তি অশেষ এবং বিচিত্রমুখী। মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীরা প্রশিক্ষণ পায় না বলেই সহজাত বৃত্তি-প্রবৃত্তিচালিত হয়েই জীবনযাপন করে, তাই বুনো তথা মানুষের লালন-পোষণ অপ্রাপ্ত প্রাণীমাত্রই, আবহাওয়ার প্রভাবজাত রূপ-রঙ-আকৃতিক পার্থক্য সত্ত্বেও, ভৌগোলিক ব্যবধানের অলঙ্ঘ্য প্রাচীর থাকা সত্ত্বেও স্বভাবে অভিন্ন। যেমন কুকুর, বেড়াল, ইঁদুর, হাতী, বাঘ, সিংহ সবাই স্ব স্ব স্বভাবে চালিত। মানুষ ও প্রাণী প্রশিক্ষণরিক্ত বিচ্ছিন্ন বুনো মানুষও সহজাত বৃত্তি-প্রবৃত্তিচালিত থাকার কথা। তার আভাস মেলে পৃথিবীর বিভিন্ন ভৌগোলিক ও যান্ত্রিক অবস্থানের বিচ্ছিন্ন মানুষের অসম বিষম মানসিক ও আচরিক স্তর দেখে। তাই মানুষের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ, শক্তি-সামর্থ্য, জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-বিবেক-বিবেচনায়, নীতিনিয়মে, রীতিরেওয়াজে প্রথাপদ্ধতিতে, খাদ্যে পোশাকে এতো পার্থক্য। কিন্তু এ যন্ত্রযুগে ও যন্ত্রজগতে যন্ত্রনির্ভর মানুষের সংস্কৃতি বিশ্বময় অভিন্ন ও সদৃশ্য হয়ে উঠবে, পার্থক্য এতো সূক্ষ্ম, তুচ্ছ ও দুর্লভ হবে যে, তা বিরলতায় হবে দুর্লক্ষ্য। আমরা মানুষের এ অভিন্ন বৈশ্বিক সংস্কৃতির প্রত্যাশী। তাহলেই কেবল মানুষের জাত জন্ম বর্ণ ধর্ম ভাষা নিবাস সম্পদ জ্ঞান অজ্ঞান প্রভৃতি জাত পার্থক্য তথা ঘৃণা হিংসা ঈর্ষা অসূয়া অবজ্ঞা অনাকর্ষণ বিরাগ বিরক্তি বিদ্বেষ প্রভৃতির উপজাত দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-সংঘাত অন্তত অনেকাংশে কমবে। কারণ সংস্কৃতির নির্যাস সংস্কৃতিমানতার লক্ষণ হচ্ছে স্বভাবে সংযম, সহিষ্ণুতা এবং আচরণে সৌজন্য।

এ যন্ত্রনির্ভর যুগে, জগতে ও জীবনে এখন মানুষ পরস্পরের নিকট প্রতিবেশী, মানসিকভাবে তো বটেই যানবাহনের উৎকর্ষে কায়িকভাবেও পড়শী। কেননা, এ কালে গোটা পৃথিবীটাই অচিরে হয়ে উঠবে একটা হাট-বাজারকেন্দ্রী চারপাশের গাঁয়ের মতো কিংবা চতুষ্পার্শ্বের গ্রাম মধ্যস্থ ক্রেতা-বিক্রেতার মিলন ময়দানরূপ হাট-বাজারের মতো। অভিন্ন যন্ত্রের ও সামগ্রীর ব্যবহার প্রভাবিত অভিন্নরুচি সংস্কৃতির অনুশীলন ও অভ্যাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষকে একাধিক বাজারের ক্রেতা-বিক্রেতা করে তুলছে। পৃথিবীতে বাস্তবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মানুষগুলো এ যন্ত্রযুগে যানবাহনের, পত্রপত্রিকার, রেডিয়ো-টিভি-ভিসিআর-ক্যাসেট-সিনেমা-সেমিনার-পর্যটন প্রভৃতির বদৌলতে এক বিরাট কিন্তু অদূরবর্তী জনপদবাসী হয়ে উঠছে। তাই আমরা অভিন্ন বিশ্ব সংস্কৃতি-সভ্যতার স্বপ্ন দেখছি, যা মানবিকগুণের বিকাশ ঘটাবে। সহযোগিতার সহাবস্থানের জন্যে আবশ্যিক ও জরুরী বলে সম ও সহস্বার্থে সংযমে সহিষ্ণুতায় স্বাধিকারে নিরুপদ্রবে নির্বিবাদে নিরাপদে বাস করার অনুশীলনে ও অঙ্গীকারে মানুষকে প্রেরণা ও প্রণোদনা দেবে। এর প্রয়োজন রয়েছে। এ অসংযম, পরমত অসহিষ্ণুতা ও অসৌজন্যই সক্রেটিস, যিশু, শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী, মনসুর হাল্লাজ প্রভৃতির হত্যার এবং মুসা-মুহম্মদের দেশ ত্যাগের কারণ। আর রাজনীতি ও স্বার্থ সম্পৃক্ত হত্যাও অজস্র ও অসংখ্য। আজো মানুষই সবচেয়ে স্বার্থপর, হিংস্র, নিষ্ঠুর, প্রতিহিংসা-প্রতিশোধপরায়ণ। আজো মানুষ ক্ষমা করতে, কৃপা করুণা করতে শেখেনি লোভ-ক্ষোভ-ক্রোধের সময়ে। তার একটা প্রমাণ এ সেদিন– আত্মসমর্পণের জন্যে আহ্বান না জানিয়ে ক্রুদ্ধ মার্কিন সৈন্যরা পরিখাস্থিত আট হাজার ইরাকী সৈন্যকে জীবন্ত মাটি চাপা দিয়েছে ট্যাঙ্ক যোগে। যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার পরেও বোমাবৃষ্টিতে মার্কিনরা তিন লাখ ইরাকী হত্যা করে বর্বরতার নতুন প্রমাণ রাখল। দু'বছর হতে চলল তবু বর্মী সামরিক জান্তা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিচ্ছে না। আজো বিরোধীদলের লোককে নানা ছলছুতোয় ফাঁসিতে ঝুলায়, নির্মমভাবে হত্যা করে সব সভ্য দেশেই সভ্যতা সংস্কৃতিবাদী নীতিনিয়ম মানা সরকারও। এ জন্যেই অভিন্ন বৈশ্বিক সংস্কৃতির অনুশীলন আবশ্যিক মানুষের জীবনে জীবিকার নিরাপত্তার লক্ষ্যেই। আমাদের অনুভব ও উপলব্ধিগত হতেই হবে যে একজন মানুষ কেবল নির্বিশেষে মানুষ। তার প্রথম পরিচয় সে মানুষ, তার শেষ পরিচয় সে মানুষ এবং এ অধিকারেই তার স্বাধিকারে স্বাধীনভাবে নিরুপদ্রবে নিরাপদে এবং আসন্ন আপন্ন ব্যক্তিক বিপদ-আপদকালে অপরের, প্রতিবেশীর, সমাজের সাহায্য-সহায়তা কৃপা-করুণা দয়া-দাক্ষিণ্য পাবার জন্মগতভাবেই দাবিদার বা হকদার। এমনিতর নানা চরম ও পরম মানবিক চেতনার ও গুণের উন্মেষ বিকাশ এবং সূক্ষ্ম সুন্দর শুভকর পরিণামপ্রসূ, বহুজনহিতকর ও বহু জনসুখবর্ধক যৌথজীবনাচার এবং সামাজিক সৌহার্দ্যই সংস্কৃতিচর্চার ও সংস্কৃতিচর্যার লক্ষ্য ফল ও ফসল। তাই মানবজীবনে সংস্কৃতির গুরুত্ব অনেক।

৭.

এবার একালের বাঙলার [পশ্চিমবঙ্গের ও বাঙলাদেশের] কথা বলি। ইতিহাসে, ইতিবৃত্তে কিংবা কিংবদন্তীতে ইতিহাসের অস্পষ্ট ছায়া এবং অসংলগ্ন কঙ্কালাংশ মেলে, কায়া-কাঠামো মেলে না। তাই নিশ্চিত সাক্ষ্য-প্রমাণে কিছু বলা চলে না। তবে পরোক্ষ প্রমাণে, নানা নিদর্শনে এবং সাদৃশ্যমূলক সাক্ষ্যে আর অনুমানে বাঙলার ও বাঙালীর কথা কিছু শোনা জানা বোঝা যায়।

গঙ্গাহৃদী বা হৃদয় [<হৃৎ>হৃত>হৃদয়] রাজ্য সম্ভবত একালের পদ্মা ভাগীরথী এবং এগুলোর উপনদী করতোয়া তিস্তা দামোদর অজয় পরিবেষ্টিত অঞ্চলই ছিল। কেননা বর্ধমান অঞ্চলেই মিলেছে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগেকার তাম্র প্রস্তর যুগের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিদর্শন। [পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য] এবং বৌদ্ধ জাতককাহিনীর সাক্ষ্য। গ্রীকসূত্রে জানা যায় এখানে গঙ্গারোহীর প্রবল বাহিনীও ছিল। সম্ভবত তাম্রলিপি তথা একালের তমলুক ছিল সমুদ্রবন্দর। এ বন্দরে ক্রিট দ্বীপেরও ছিল বাণিজ্য সম্পর্ক [অতুল সুর] এবং এ পশ্চিমবঙ্গেই হয়তো অষ্ট্রিক-আলপাইনীয় আর্যভাষীর রক্তমিশ্রণ ঘটেছিল গোড়াতে, যেমন উত্তর পূর্ববঙ্গে রক্তসঙ্কর গোত্রের উদ্ভব সম্ভব হয়েছিল প্রত্যন্ত অঞ্চলের মঙ্গোল ও মধ্য অঞ্চলের অষ্ট্রিকদের প্রতিবেশিক পরিবেশে। অষ্ট্রিকরা ছিল নিষাদ আর মঙ্গোলরা ছিল কিরাত নামে অভিহিত।

এখনকার বাঙলাভাষী অঞ্চল ১৯৪৭ সন পূর্বকালে ছিল বিদেশী বিজাতি বিধর্মী বিভাষী শাসিত এলাকা। পশ্চিম উত্তরবঙ্গ ঐতিহাসিককালে মৌর্য সুঙ্গ গুপ্ত কর্ণ পাল সেন তুর্কী মুঘল ব্রিটিশ শাসনে ছিল। আর পূর্ববঙ্গ সমতট প্রভৃতি ছিল খড়্গ দেব চন্দ্র বর্মন সেন তুর্কী মুঘল ব্রিটিশ শাসনে।

আমরা জানি দাসত্বে ও আনুগত্যে মানুষের সত্তার মূল্য-মর্যাদাবোধ বিলুপ্ত কিংবা শীতকালীন ঔষধি গুল্মের মতো অদৃশ্যে সুপ্ত থাকে। বাঙালীরও ছিল তাই। তার চরিত্রে চাটুকারিতা স্তুতি প্রশস্তি প্রবণতা বেশি, আর সম্ভবত আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে আত্মনির্ভর হয়ে স্বাধীনচেতনা-চিন্তা নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়ানোর সুযোগ প্রজন্মক্রমে না থাকায় সে কর্মকুণ্ঠ হয়ে পড়েছিল, অথচ ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগ স্পৃহা কিংবা লিপ্সা ছিল অটুট। এমন মানুষ সাধারণভাবে কৃপা-করুণা-দয়া-দান-দাক্ষিণ্যে প্রত্যাশী হয়ে স্তাবকতায় চাটুকারিতায় সেবায় আনুগত্যে অভ্যস্ত হয়। আর এভাবে চরিত্র তথা আত্মসম্মানবোধ বিনষ্ট বলেই মিথ্যা ভাষণে, চুরিতে, ঠকাঠকিতে আর ভিক্ষাবৃত্তিতে তার কোন শরম-সংকোচ ছিল না। গরীবেরা অসূয়াগ্রস্ত আর কোন্দলেও হয়। বাঙালীর মিথ্যাভাষণের কোন্দলপ্রবণতার, চুরির এবং প্রতারণার কাহিনী দেশী ও বিদেশী পর্যটক থেকে ব্রিটিশ প্রশাসক অবধি সবাই অল্প বিস্তর বলে গেছেন বিগত পাঁচ/ছয়শ বছর ধরে। যেমন,

১. তোমেপিয়েস [১৫১১- "১৫ খ্রীস্টাব্দের অভিজ্ঞতা]
বাঙালীরা বড় বণিকের জাত এবং খুব স্বাধীন প্রকৃতির। ব্যবসায়ের মধ্যে তারা মানুষ হয়। সব ব্যবসায়ীই অসৎ [All the marchants are false]... কোন লোককে অপমান করতে হলে তাকে 'বাঙালী' বলা হয়। তারা অত্যন্ত বিশ্বাসঘাতক। তারা খুবই তীক্ষ্ণবুদ্ধি। মলাক্কায় অনেক বাঙালী পুরুষ ও নারী থাকে। পুরুষদের অধিকাংশই জেলে ও দর্জির কাজ করে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ খুব খারাপ কাজ করে।" সুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলার ইতিহাসে দু'শ বছর : স্বাধীন সুলতানদের আমল, ৪র্থ সং, ১৯৮৮ সন, পৃ. ৫২৩-২৪, ২৯।

২. রিয়াজুস সালাতিন [১৭৮৮ সন] গোলাম হোসেন সেলিম রচিত, আবদুস সালাম-এর ইংরেজী তরজমা:
"But in affairs relating bargains giving and taking and purchases and sales and other worldly matters, no race in all the four quarters of the globe is equal to the Bangalees in wicketness. duplicity, knavery and

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

villainy, they do not consider loans repayable and the promises which they pledged to perform in one day, they do not fulfil in one year."

৩. এলাহি বখশ রচিত 'খুরশীদ-ই জাহান নুমা : Beverage-এর সংক্ষিপ্ত মন্তব্য: 187 [G. JASB p196] এ বই উনিশ শতকে রচিত। এখনো অমুদ্রিত : Both (i,e salim and Elahi) are severe on the Bengalee character and customs but [Elahi] has considerably softened Ghulam Husain's remarks.

4. Raja Ram mohan Ray [1774-1833]
As regards physical, upon the whole inferior to the mothern nations... a great portions of these are inferior in character to the former class and are very often met tools of the neferious of verjery and foregery."

তবে বাঙালীর প্রশংসাও রয়েছে। প্রাচীন বাঙলার খবর আমাদের জানা নেই, তবে গত হাজার বছরের বাঙালীর সাহিত্য-শিল্প-ব্যাকরণ অলঙ্কার স্থাপত্য ভাস্কর্যচর্চার অনেক উঁচুমানের নিদর্শনও মেলে। এখানে তা আলোচ্য নয়। তবে উল্লেখ্য যে বৌদ্ধবিলুপ্তির পরে কিংবদন্তীর আদিশূর এবং বারো শতকের সেনরাজ বল্লাল ব্রাহ্মণ্য সমাজভুক্ত বৌদ্ধদের বর্ণে বিন্যস্ত করেন এবং সে সূত্রেই কৌলীন্য প্রথারও প্রবর্তন করেন। তখন বুদ্ধির ও অর্থের জোরে ধূর্ত ও বিষয়ী লোকেরা সৎশূদ্রে, বৈশ্যে, বৈদ্যে ও ব্রাহ্মণে বর্গীকৃত হয়ে সমাজে সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কেননা ডক্টর নীহার রায়ের ও অন্য অনেক বিদ্বানের মতে বাঙালীদের মধ্যে আর্যভাষীর রক্ত বিরলতায় দুর্লভ। তবু বাঙলাদেশে জীমূতবাহন, রঘুনন্দন, রামনাথ প্রমুখরা উত্তরভারতীয় উত্তরাধিকারপদ্ধতি স্মৃতি ও ন্যায় দ্রোহিতার ও নতুন টীকা ভাষ্য পাঁতি যোগের সাহসর্য ও বিদ্যা-বুদ্ধি-যুক্তির স্বাক্ষর রেখে গেছেন। চৈতন্যদেব তো স্বয়ং দেব-দ্বিজ-বেদদ্রোহী হয়ে প্রেমধর্ম প্রচার করেন 'এহেন মহাঠাকুরাণী ভাব যার মন উপজয়, বেদধর্ম তেজি সে কৃষ্ণকে ভজয়।' উনিশ শতকেও রামমোহন, বিদ্যাসাগর, কেশব সেন বঙ্কিমচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ প্রমুখ অনেকেই সনাতন মন-মনন-মত-পথ পরিহার করে য়ুরোপীয় যুক্তিবাদ অঙ্গীকার করে স্বকীয় মত পথ বরণ করেছিলেন।

আমাদের আদি অষ্ট্রিক অধিবাসীরা বিদেশী বিজাতি বিভাষী বিধর্মীর সংসর্গ পরিহার করে স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্যে অরণ্যবাসী হয়, যেমন সাঁওতাল, ওঁরাও, হো, মুণ্ডা, পঞ্চা এবং বাঙলা বিহার ও ছোট নাগপুর অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা একালের ঝাড়খণ্ডবাসীরা আর যারা সমতলে বিদেশীর শাসন মেনে নিল কিন্তু নিঃস্ব ও ক্ষুদ্র তুচ্ছ পেশাজীবী, তারাই মুচি মেথর চাঁড়াল বাগদী হাড়ি ডোম কামার কুমার ধোপা নাপিত প্রভৃতি স্পৃশ্য ও অস্পৃশ্য হয়ে সৎশূদ্র কায়স্থ বৈদ্য ব্রাহ্মণ্যের অনুগত দাস ও কৃপাজীবী সেবিকরূপে বহির্গ্রামে ঠাঁই পেল।

এদের থেকেই অর্থাৎ বৌদ্ধ হিন্দু নিম্নবর্গের, নিম্নবর্ণের ও নিম্নবৃত্তের লোকেরাই ইসলামে দীক্ষিত হয়ে হয়ে পনেরো/ষোল শতকের দিকে গাঁয়ে গঞ্জেও মুসলিম সমাজ গড়ে তোলে। দীক্ষিতদের মান-মর্যাদা বাড়ানোর জন্যে তাদের সঙ্গে গোড়ার দিকে শেখ, এবং তুর্কী মুঘল-আমল থেকে খাঁ যুক্ত হতে থাকে। কেউ কেউ মক্কী মাদানী কোরেশী হাশেমী ও শেখ হয়ে যায়। তুর্কী-মুঘল আমলে অর্থসম্পদের দেশী মালিক ছিল বর্ণহিন্দুরাই। ব্রিটিশ আমলের মতোই দেশশাসনেও ছিল তাদেরই সংখ্যাধিক্য। কেবল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৈন্যবাহিনীতে থাকত মুসলিম সংখ্যাধিক্য। বিচারবিভাগও ছিল কাজির ও সদর আমিনের অধিকারে, সেজন্যে মুসলিম উকিলের সংখ্যাও ছিল সতেরো-আঠারো এবং উনিশ শতকের প্রথমার্ধ অবধি অধিক। আরবী শিক্ষিতরা মৌলবী, ফরাসী শিক্ষিতরা মুনশী, সংস্কৃত শিক্ষিতরা পণ্ডিত এবং ইংরেজী শিক্ষিতরা উনিশ শতকে পরিচিত ছিল 'এজু' [Educated] নামে। এখনকার বিদ্বানদের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে ও হচ্ছে যে তুর্কী-মুঘল আমলে শাসন-প্রশাসন-রাজস্ব আদায় প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত থাকত স্থানীয় ভাষা-জানা এবং স্থানীয় অধিকাংশ লোকের স্বধর্মী হিন্দুরাই। আর ধন সম্পদ শিক্ষা, চিকিৎসাবিদ্যা, টাকাখাটানো সুদের ব্যবসা, অন্যান্য অনেক সওদাগরী ছিল সাধু (সাহা)-লালাদের হাতে। সুকুমার সেন বলেছেন এবং সুখময় মুখোপাধ্যায়ও স্বীকার করেছেন আর এখনকার সব ঐতিহাসিকই জানেন ও মানেন যে রাজধানীতেও হিন্দুরাই ছিল সংখ্যাগুরু এবং তুর্কী-মুঘল আমলে ভাঙা ও পরিত্যক্ত মন্দিরে ইট-পাথরে মসজিদ তৈরি হলেও যুদ্ধকালে আশ্রিত শত্রু ধরার জন্যে ছাড়া, অন্য সময়ে মুসলিম শাসকরা কোন মন্দির ভাঙেন নি। আর কোন গ্রামে বা গঞ্জে তরবারী সাহয্যে তথা হত্যার হুমকি দিয়ে ভারতের কোথাও ছয়শ বছরের তুর্কী-মুঘল শাসনে গ্রামসুদ্ধ হিন্দুদের সপরিবারে ইসলাম বরণে বাধ্য করার একটা সাক্ষ্য প্রমাণও আজ অবধি মেলেনি। ওটা ছিল ভেদনীতির সুপ্রয়োগে ব্রিটিশশাসন পাকাপোক্ত করার লক্ষ্যে ব্রিটিশ শাসক-প্রশাসক ও ঐতিহাসিকদের বানানো কিস্‌সা। ব্যক্তিগত অপরাধে হিন্দু জমিদার-মহাজন-ধনী-মানী লাঞ্ছিত, সম্পত্তিবঞ্চিত, নিহত এবং সাজাপ্রাপ্ত অবশ্যই হয়েছে তুর্কী-মুঘল শাসনে। জিজিয়া অন্য মুসলিম রাজ্যে মুসলিমদের উপরও বসানো হত। এ সূত্রে হিন্দু জমিদারের দাড়িকর স্মর্তব্য। তীতুমীরের দ্রোহের মুখ্য কারণই ছিল এ কর। বাঙালী মুসলিমও দ্রোহী হয়েছে তিনবার ধর্মসংস্কার ও স্বাধীনতা অর্জন লক্ষ্যে। ওয়াহাবী, ফরায়েজী ও সিপাহি বিপ্লব স্মর্তব্য।

তবু বাঙালী শূদ্রের ও অজ্ঞ-অনক্ষর দরিদ্র মুসলিমদের উল্লেখ্য কোন সংস্কৃতি ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণের আগে দুর্লক্ষ্য। এমনকি নিম্নবর্ণের হিন্দু ও মুসলিম গ্রামীণ লোকের নামেও কোন সংস্কৃতির, শাস্ত্রের বিশুদ্ধতার, সুরুচির ছাপ ছিল না, [ঢাকা *বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, ৪৯ তম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী ১৯৯১, পরিচ্ছেদ-৩ দ্রষ্টব্য। ডক্টর শাহজাহান মিয়া সংকলিত পুরোনো বাংলা দলিলপত্র পৃ. ১৫৯-৬৪।] এক প্রকার লোকাচার-লৌকিকতা ছিল বটে, তবে তা উল্লেখ্য নয়, গতানুগতিক আচার মাত্র। কাজেই সংস্কৃতি ক্ষেত্রে আমাদের গৌরবময় উল্লেখ্য অতীত নেই, রয়েছে সম্ভাবনাময় উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, যা অশেষ। তার প্রমাণ মুসলিম সমাজে গোটা উনিশ শতকে ইংরেজী শিক্ষিতের সংখ্যা কম ছিল বলে কেবল কায়কোবাদ-মোজাম্মেল হকের মতো দু'জন পদ্য লেখক পেয়েছিলাম। আজ শিক্ষার দ্রুতবিস্তারের ফলে ঢাকায় কয়েকশ' কবি, গল্প-নাটক-উপন্যাস-প্রবন্ধ লেখক পাচ্ছি, পাচ্ছি ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার, নানা শাখার বিদ্বান বিজ্ঞান, ইতিহাস লেখক, স্থপতি, ভাস্কর, মনোবিজ্ঞানী, নতুন চিন্তা-চেতনার মনন-মনীষার সমাজ-দর্শন-রাষ্ট্র-বাণিজ্য ও অর্থবিজ্ঞানবিদ। সবাই হয়তো বাঞ্ছিতমানের নন, কিন্তু উৎকর্ষের দ্বার তো মুক্ত। হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রীস্টান প্রভৃতি বাঙলাদেশীর মানস অবদানে এবং আবিষ্কারে উদ্ভাবনে গবেষণায় ও নির্মাণে আমাদের মানসিক ও ব্যবহারিক সংস্কৃতি হবে প্রত্যাশিত গুণের মানের রূপের ও মাত্রার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিশিষ্ট

আজ আমরা ভৌগোলিক, ভাষিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ে যে-জনগোষ্ঠীকে বাঙালী এবং যে-ভূখণ্ডকে বাঙলা বা বাঙলাদেশ বলে জানি, তা আধুনিককালের। প্রাচীনকালে এ দেশে একক নামের ও অভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষের কোন পরিচয় মেলে না। মোটামুটিভাবে বলা যায় গৌড়, রাঢ় ও পুণ্ড্র অঞ্চলই প্রাচীন জনপদ। এসব অঞ্চলে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু বর্বর বুনোমানুষ গোষ্ঠীজীবনে অভ্যস্ত ছিল। বসতি ছিল বিরল। কেননা সেকালে রোগের প্রতিষেধক অজ্ঞাত ছিল বলে নানা ব্যাধিতে মহামারীতে এবং গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লোকক্ষয় হত। তাই জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেত অত্যন্ত মন্থর গতিতে। ফলে গোষ্ঠীর মিলনে গোত্রীয় সমাজগঠন বিলম্বিত হয়েছিল। মনে হয় খ্রীস্টপূর্ব পাঁচশতকের পূর্বেই গৌড়া, পুণ্ড্রা, বঙ্গা, রাঢ়া প্রভৃতি গোষ্ঠীয় সমাজ দৃঢ়মূল হয়ে ওঠে। তাই আমরা ঐতরেয় আরণ্যক [আনু খ্রীঃ পূঃ পাঁচ শতক] গ্রন্থে বঙ্গাঃ [বঙ্গাবগধশ্বর পাদাঃ][১] এবং প্রাচীনতর সংস্কৃত রচনায় গৌড়াঃ রাঢ়াঃ পুণ্ড্রাঃ প্রভৃতি গোত্রীয় সমাজের উল্লেখ পাই। উত্তর ভারতের কোশাম্বীর নিকটে পভোসায় প্রাপ্ত গুহালিপিতে [আনু খ্রীঃ প্রথম শতক] 'বঙ্গপাল' নামের রাজার উল্লেখ রয়েছে। মানসোল্লাসে 'গৌড় বঙ্গাল' নাম মেলে। হাজার বছরের পুরোনো চর্যাগীতিতে বঙ্গালী, বঙ্গাল [দঙ্গাল?] দেশ-এর উল্লেখ রয়েছে। তার আগেই যে গোত্র জ্ঞাপক গ্রাম [গাঁই] যে অর্থান্তর লাভ করে নিবাসস্থল রূপে নির্দেশিত হচ্ছিল, তাও নানা সূত্রে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এতেই বোঝা যায় খ্রীস্টপূর্ব প্রায় হাজার বছর আগেই ওদের অধিকাংশ মানুষ যাযাবর জীবন পরিহার করে কৃষিনির্ভর জীবিকায় অভ্যস্ত হয় এবং স্থানীয় নিবাস গড়ে তোলে। প্রাচীন দেশী দেবতা শিবের কাহিনীর মধ্যেই এ তথ্য মেলে।

ব্রাহ্মণ্য গ্রন্থাদির প্রমাণে মনে হয় খ্রীস্টপূর্ব হাজার বছরের গোড়ার দিকেই উত্তর ভারতীয় আর্যসমাজ এ অঞ্চল সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে এবং দাক্ষিণাত্যের মতো এ অঞ্চলকেও অবজ্ঞা ও কিছুটা ঈর্ষার চোখে দেখত তারা। শতপথ ব্রাহ্মণে পূর্বাঞ্চলের মানুষকে বায়াংসি ভাষী অসুর [বিকৃত আর্যভাষী, 'সুর' দেব বিরোধী দল] এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পুণ্ড্রদেব দস্যু বলে আখ্যাত করা হয়েছে।[২]

পাণিনি [খ্রীঃ ৭ম/৫ম শতক] তাঁর ভাষাবিজ্ঞানগ্রন্থ *অষ্টাধ্যায়ীতে* যে 'গৌড়'-এর উল্লেখ করেছেন, তা আমাদের গৌড় নয়। ওই গৌড় গোত্র জাতি বা গোত্রবাচক উত্তর বা মধ্য ভারতীয় কোন গোত্র হবার সম্ভাবনা। পরবর্তীকালের 'পঞ্চগৌড়' নামই একাধিক গৌড়ের অস্তিত্ব নির্দেশ করছে। রাজতরঙ্গিনীতে গৌড়, সারস্বতদেশ, কান্যকুব্জ, মিথিলা ও উৎকলকে 'পঞ্চগৌড়' বলা হয়েছে। পাণিনির ভাষ্যকার পতঞ্জলি অঙ্গ, বঙ্গ সুহ্ম, পুণ্ড্র, মগধ, কলিঙ্গ এবং কাত্যায়ন ও অঙ্গাঃ, বঙ্গাঃ সুহ্মাঃ, পুণ্ড্রাঃ-র উল্লেখ করেছেন। বোধায়ন ধর্ম সূত্রেও [১/২/১৪] পুণ্ড্রের ও বঙ্গের অবজ্ঞার্থে উল্লেখ রয়েছে। পুরাণে পূর্বাঞ্চলের দেশ হিসেবে অঙ্গ, বিদেহ, পুণ্ড্র প্রভৃতির সঙ্গে বঙ্গও উল্লেখিত।[৩] রামায়ণে 'বঙ্গ'-এর এবং মহাভারতে বঙ্গ পুণ্ড্র সুহ্ম ও তাম্রলিপ্তির এবং তারও আগের বন্দর Portabis বা পরস্থলী [সম্ভবত নদীয়ার কাছে] উল্লেখ পাই রোমান ঐতিহাসিক Plini-র লেখায়।[৪] আচারাঙ্গ সূত্র [আয়ারাঙ্গ সুত্ত] নামের জৈনগ্রন্থে সুহ্মের নাম আছে। বৌদ্ধ 'মহাবর্গে' [মহাবগ্গো রাঢ়-এর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মিলিন্দপঞ্হে' বঙ্গের আর 'দিব্যাবদানে' পুণ্ড্রের উল্লেখ মেলে। তাছাড়া ললিতাবিস্তরে ও মহাবস্তুতে [মহাবস্তু] বঙ্গ ও বঙ্গলিপির কথা আছে। গ্রীকসূত্রে প্রাপ্ত গঙ্গাহৃদি বা গঙ্গাহৃদয় [গঙ্গারিডই] সম্ভবত গৌড়ে পুণ্ড্রেই বিস্তৃত ছিল। ১৯৬২-৬৩ সনে অজয়নদের দক্ষিণে নানা স্থান উৎখননের ফলে জানা যায় অনেক কিছুই।

"পশ্চিমবঙ্গের পাণ্ডুরাজার ঢিবি, হরিনন্দনপুরে বা হরিনারায়ণপুরে, চব্বিশপরগনার বেরাচম্পায়, দেগঙ্গায় কিংবদন্তীর চন্দ্রকেতুর গড় প্রভৃতি উৎখননের ফলে আবিষ্কৃত নানা সামগ্রী দৃষ্টে মনে হয় জৈন-বৌদ্ধদের সঙ্গে পরিচয়ের পূর্বেও অন্তত রাঢ় অঞ্চল তিন হাজার বছর আগেও আমাদের চিরকেলে ধারণামতো বুনো বর্বরের দেশ ছিল না, যদিও তাদের কোন স্বতন্ত্রভাষার নমুনা নেই। এ দেশে যে উন্নয়নশীল দু'চারটি গোত্র ছিল, তাদের যে বিকাশমান সংস্কৃতি ছিল, তা জানা যায়। দু'তিনটে বৌদ্ধ জাতককাহিনীর উদ্ভব স্থল ও তথা কাহিনীর বর্ণিত ঘটনাও বর্ধমান অঞ্চলের। ক্রীটদ্বীপের সঙ্গে এদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল বলেও কোন কোন বিদ্বান অনুমান করেন। মহাভারতেও অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ সুহ্ম রাজারা ছিলেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কুরুপক্ষে। কালিদাসের রঘুবংশে নৌযুদ্ধে নিপুণ ও সাহসী বাঙালীদের রঘু পরাস্ত করেছিলেন বলে বর্ণিত রয়েছে। এতে মনে হয় বাঙালীদের গোত্র-রক্ত পরিচয় যাই হোক, রাজনীতিতেও তারা পিছিয়ে ছিল না। রক্ত সঙ্কর বাঙালীর স্বভাব-চরিত্র যেমন অনন্য, তাদের কৃতি-কীর্তিও বিচিত্র।

'পাণ্ডর্জত দেশ বলে এর নিন্দার মধ্যেই এর অস্তিত্বের প্রতি ঈর্ষীর স্বীকৃতির স্বাক্ষর মেলে। প্রমাণে অনুমানে প্রায় নিঃসংশয়ে বলা চলে যে মহাবীর স্বয়ং এবং জৈন-বৌদ্ধ শ্রাবক শ্রমণ ভিক্ষুরাই প্রথম গৌড়ে-রাঢ়ে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে আগমন করেন। তার আগে হয়তো পূর্বাঞ্চলীয় কিছু কিছু ব্রাহ্মণ্যবাদী নানা কাজে এসে ফিরে গিয়ে সমাজে নিন্দিত হয়েছে এবং প্রায়শ্চিত্ত করে সমাজে ঠাঁই পেয়েছে। কিন্তু ব্রাত্যদোষ এড়ানোর প্রয়াসে ব্রাহ্মণ্য সমাজে এ তথ্য অস্বীকৃত রয়েছে। আর্যভাষীর গৌরবগর্বী বহিরাগত এবং আর্যাবর্তেও ব্রহ্মাবর্তে নির্বাসিত লোকেরা বহুকাল স্থানীয় অনার্যভাষীদের স্পর্শদোষ এড়িয়ে চলবার প্রয়াসী ছিল— তা আদিশূর সম্পৃক্ত কিংবদন্তী ও বল্লালী কৌলীন্য চেতনা থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়।[৫] অতএব জৈন-বৌদ্ধ শ্রাবক-শ্রমণ-ভিক্ষুর মাধ্যমেই উত্তর ভারতের শাস্ত্র-সংস্কৃতি, ভাষা-সাহিত্য, আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, সমাজ-শাসন, অন্ন-বস্ত্র প্রভৃতি-জীবনপদ্ধতির ও সভ্যতার সর্বপ্রকার আয়োজনের সঙ্গে এ দেশীয়দের পরিচয় ঘটে। এভাবে এদের জীবন-জীবিকার আর্যায়ন সম্ভব হয়। মৌর্য আমলে এ আর্যায়ন হয়তো গৌড়ে, রাঢ়ে, পুণ্ড্রে সীমিত ছিল। গুপ্তযুগে তা কলিঙ্গে সুহ্মে বঙ্গে সমতটে ও প্রাগজ্যোতিষপুরে তথা আধুনিক উড়িষ্যায় বাঙলায় আসাম অঞ্চলে পরিব্যাপ্ত ছিল— যদিও শিশুনাগ, মৌর্য, কণ্ব, সুঙ্গ, গুপ্ত, পাল বা সেন- কোন শাসনই সমগ্রবঙ্গে চালু ছিল না। এঁদের মধ্যে কোন কোন রাজবংশের প্রাশাসনিক বিভাগ ছিল বর্ধমানভুক্তি, কঙ্কগ্রামভুক্তি, পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি ও ওদন্তপুরীভুক্তি। মধ্যযুগপূর্ব বঙ্গের স্থিতি ঠিক এখনকার কোন অঞ্চলে তা সুনির্দিষ্টভাবে বলা যাবে না। তবে মহাভারতবর্ণিত ভীমের লোহিত্য নদই ছিল বিজয়সীমা। বঙ্গ লোহিত্যের তীর সীমায় অবস্থিত থাকার কথা। কালিদাসের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রঘুবংশে দেখা যায় রঘু সুহ্ম জয় করেই বঙ্গ জয় করেন। গঙ্গার বঙ্গীয় নাম ভাগীরথী ও পদ্মা। অতএব ভাগীরথী তীরে সুহ্ম এবং পদ্মা তীরে বঙ্গ অবস্থিত ছিল বলে অনুমান করা চলে। বখতিয়ার খলজি জয় করেন লক্ষ্মৌতি গৌড় এবং বঙ্গ ও কামরূপ তখনো ছিল অবিজিত। গিয়াসউদ্দীন ইওয়াজ খলজি ও পরবর্তী শাসকগণ বঙ্গ-কামরূপ জয়ে প্রয়াসী ছিলেন। এতে বোঝা যায় বঙ্গ একটি স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল, কামরূপের ও সমতটের মতো।

চর্যাপদে বঙ্গাল, বঙ্গালী নাম মিললেও, 'বঙ্গ'-এর পরিবর্তে 'বঙ্গালা' ব্যবহৃত হয় ইবন বত্তুতার বৃত্তান্তে। মিনহাজ সিরাজের পরবর্তী ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বরনী এবং গিয়াসউদ্দীন বলবন 'বঙ্গালা' 'বঙ্গ' অর্থে প্রয়োগ করেছেন, দেখতে পাই। সুলতান শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহ স্বয়ং 'শাহ্-ই-বঙ্গলা' নাম গ্রহণ করেই ১৩৩৮ সনে গৌড় সিংহাসনে বসেন।৬ তুর্কী আমলে বঙ্গ, গৌড়, রাঢ়, বরেন্দ্র আলাদাভাবে চিহ্নিত হত। মুঘল আমলে এক বিস্তৃত পূর্ব-দক্ষিণ অঞ্চলীয় ভূখণ্ড সুবাহ-ই-বাঙ্গলা বা ব্রিটেশের 'বেঙ্গল Presidency'। তবু উনিশ শতক অবধি 'গৌড়' ও 'বঙ্গ' নামে দু'ভাগে নির্দেশিত হত এ বৃহৎ অঞ্চলটা। তুর্কী পূর্বকালে গৌড়, রাঢ়, সুহ্ম, পুণ্ড্র, বগুড়া থেকে মিথিলা অবধি বরেন্দ্র, বঙ্গ ও কামরূপ [আসাম] নামে পরিচিত হত বিভিন্ন অঞ্চল এবং স্বাধীন শাসক বা সামন্তের রাজ্য অনুসারে এসব এলাকার পরিসরের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটত। আশ্চর্য চিরকালের অবজ্ঞেয় বঙ্গ-বঙ্গাল-বাঙ্গলা শেষ অবধি গোটা অঞ্চলের মাটির ও মানুষের নামের ও পরিচয়ের ভিত্তি ও অবলম্বন হল। এটি পর্তুগীজ বেঙ্গলা ও ইংরেজী বেঙ্গল-এরই জনপ্রিয়তার এবং বহুল প্রচারের ফল। রামমোহন রায়ের বা মধুসূদন দত্তের 'গৌড়' এভাবে হল বিলুপ্ত। মোটামুটিভাবে 'গৌড়'—রাজশাহী, মালদহ, রাজহল, মুর্শিদাবাদ; রাঢ়-বর্ধমান বিভাগ; সুহ্ম-প্রেসিডেন্সি বিভাগ, পুণ্ড্র-বরেন্দ্র-বগুড়া, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, কোচবিহার, মিথিলা। বঙ্গ-ঢাকা, ময়মনসিংহ, পাবনা; সমতট-কুমিল্লা, নোয়াখালী; হরিখেল [<অরিক্রীড়া [ক্ষেত্র]-চট্টগ্রাম, পার্বত্য ত্রিপুরা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম। বঙ্গাল— সোমদ্বীপ>চন্দ্রদ্বীপ, সন্দ্বীপ [বাকলা শহর— বরিশাল] আর তাম্রলিপ্তি তমলুক ছিল বলে মনে করা চলে। সুতরাং আজকের সংহত বাঙালী জাতি গড়ে উঠেছে বিদেশী-বিজাতি-বিভাষীর শাস্ত্র-সংস্কৃতি, জীবন জীবিকা সম্পৃক্ত জীবনচর্যা গ্রহণ করেই। কাজেই তার নৃতাত্ত্বিক পরিচয় অন্য রকম হলেও তার ব্যবহারিক জীবন উত্তর ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি প্রসূত।

পাদটীকা

১. বঙ্গ শব্দের এক অর্থ কার্পাস তুলা, [হিন্দি-বাঁগা-তুলা]
[ডক্টর সুকুমার সেন *বঙ্গভূমিকা*, পৃ: ৮]

খ. বঙ্গা বগদ [>বাগদী?] = মগধ, চের-ওরাওঁ প্রভৃতি আষ্ট্রিক গোত্রীয় একটি। ছোট নাগপুরে নিবাস।

২. মহাভারতোক্ত অসুর বলি রাজার পাঁচপুত্র : বঙ্গ, অঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম এবং রূপকার্থ সম্ভবত এই যে— এ অঞ্চলে সুরবিরোধী অসুর পূজক আর্যভাষীর বা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর্যেতর ভাষী লোকে অধ্যুষিত ছিল। ডক্টর সুকুমার সেনের মতো সুহ্ম < সুম্ম মানে বীর্যশালী দুর্ধর্ষ, নিষ্ঠুর। গৌড় > গুড় উৎপাদন স্থান বা উৎপাদক অথবা গোণ্ড গোত্র নির্দেশক; সাত শতক থেকে 'গোড়' নাম লেখ্যভাবে পাওয়া যায়। তেমনি রাঢ় সৌন্দর্য ও বৈভব অর্থে পুণ্ড্র, ইক্ষু, ইক্ষু উৎপাদক অর্থে, বরেন্দ্র-উৎকৃষ্ট, উর্বর ভূমি। [সুকুমার সেন, *বঙ্গ ভূমিকা]*

প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থে বঙ্গ-এর আরো উল্লেখ রয়েছে। ক. শক্তি সঙ্গম অন্দ শিবপ্রোক্ত বঙ্গদেশ [পার্বতীকে শিক জানাচ্ছেন কথাপ্রসঙ্গে]। খ. মহাভরতে ভীষ্মপর্বে নবম অধ্যায়ে ৪৬ তম অঙ্গ বঙ্গ, কলিঙ্গাশ্বর ইত্যাদি। গ. ঐতরেয় আরণ্যকের মতে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এবং শতপথ ব্রাহ্মণে মেলে বঙ্গের উল্লেখ। ঘ. রামায়ণেও বঙ্গ অজ্ঞত দেশ নয়। ঙ. মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ে পৌণ্ড্র গোষ্ঠীর উল্লেখ মেলে। চ. কাত্যায়নকৃত সূত্রের মহাভাষ্যেও বঙ্গ উল্লেখিত রয়েছে। ছ. এগুলো ছাড়াও কশ্যপ আর্যভট্ট মিহির ব্রহ্মগুপ্ত, শ্রীহর্ষণ, পুলিতা, প্রমুখ পণ্ডিতদের কাছেও বঙ্গ অজ্ঞাত ছিল না। জ. ১৯৬৩-৬৩ সনে অজয়নদের দক্ষিণে বর্ধমান জেলায় পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে যেসব সামগ্রী মিলেছে সেগুলো প্রায় দেড় হাজার খ্রীষ্টপূর্বাব্দের। এটি তাম্র প্রস্তর যুগের সভ্যতা। রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড পৃঃ ২০

৩. D. C. Sircar, Studies in the Geography of Ancient and Medieval India, Delhi, 2nd edition, 1971, pp. 36-38, 'বঙ্গ, বাঙ্গালা, বাংলাদেশ' প্রবন্ধে ডক্টর আবদুল করিম উক্ত।

৪. সুকুমার সেন, বঙ্গ ভূমিকা, পৃ. ১৮-১৯।

৫. 'আদিশূরের বংশ ধ্বংস সেন বংশ রাজা/বিষঙ্ক সেনের ক্ষেত্রপুত্র বল্লাল সেন রাজা। সম্বন্ধ নির্ণয়, পৃ: ২০৮, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত *বাঙলার ইতিহাসের ধারা* গ্রন্থের উদ্ধৃতি।

৬. Sir Jaadunnath Sarkar, *Commomoration,* Volume, Hoshiapur, India, Part II p. 56. 'বঙ্গ বাঙ্গলা: বাংলাদেশ' প্রবন্ধে ডক্টর করিম উদ্ধৃত, পৃ. ১৪।

৭. ময়নামতীতে প্রাপ্ত লড়হচন্দ্রের তাম্রলিপিতে সমতট পোণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্গত বঙ্গাল-এর পাশে অবস্থিত।

৮. চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম, পার্বত্য ত্রিপুরা অরিক্রীড়া [ক্ষেত্র] ১ হরিখেল, চীনা পরিব্রাজক ইৎসিঙের গ্রন্থে উল্লেখিত প্রান্ত ভূমি হরিখেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংকট : জীবনে ও মননে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার অসুস্থতার সংবাদে এবং আমার বিপন্নতার সময়ে যিনি আত্মীয়ের মতো সদা-উদ্বিগ্ন ছিলেন, সেই প্রখ্যাত প্রবীণ কথাশিল্পী শ্রদ্ধাস্পদ শওকত ওসমান-এর দরদীমূর্তি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংযম, মনুষ্যত্ব ও সংস্কৃতি

শুনে ও অনুকরণে শৈশব থেকেই মানুষের শাস্ত্রিক ও আচারিক-পার্বণিক জীবন শুরু হয় বলে তাতে বুদ্ধি-যুক্তি ও বিবেক বা হৃদয়াবেগ প্রয়োগের কোন সচেতন প্রয়াস-প্রযত্ন-প্রবৃত্তি থাকে না। বিশ্বাস-সংস্কারচালিত প্রাকৃতিকপ্রতিবেশলালিত এবং শাস্ত্র-সমাজের আচারে-পার্বণে আর লোকাচারে-দেশাচারে নিয়ন্ত্রিত যান্ত্রিক জীবনে মানুষের মনে-মননে সন্দেহ-অবিশ্বাস-জিজ্ঞাসা-বিরক্তি-কৌতূহল জাগে না বলে জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-বিবেক-বিবেচনা প্রয়োগে নতুন চিন্তা-চেতনার অনুশীলন তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। অনুকৃত গতানুগতিক ও যান্ত্রিক ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে অভ্যস্তজীবন সুপ্রাচীন উপযোগরিক্ত তাৎপর্যবিরহী নীতিনিয়মের লৌহকঠিন কাঁটাল সরু-সংকীর্ণ পিঞ্জরে বিকাশের অশেষ সম্ভাবনাময় মগজী মানসজীবন নিষ্ক্রিয়তায় অনুশীলনের অভাবে অপ্রয়োগে বৃথা ও বন্ধ্যাভাবেই অবসিত হয়। তাই মানুষে প্রত্যাশিত মনুষ্যত্বের উন্মেষ, বিকাশ, বিস্তার, উৎকর্ষ গোটা পৃথিবীতেই দুর্লভ ও দুর্লক্ষ্য। মনুষ্যত্বের-মানবতার অনুশীলন ব্যক্তিগত জীবনেই আবশ্যিক ও জরুরী। এ-ও শাস্ত্রিক বচন হিসেবে আশৈশব শুনে শুনে এর তাৎপর্য ও গুরুত্ব মন-মনন গ্রাহ্য থাকে না। জীবনে আরো হাজার হাজার শোনা কথার মতো শ্রুতি-স্মৃতিরূপে জানা থাকলেও মানা হয় না। এখন প্রগতিশীলদের কাছে অবজ্ঞেয় হলেও মৌলমানবিকগুণের উন্মেষ-বিকাশ ঘটানোর জন্যে আধি বিনাশের সেই পুরোনো ও বহুল উচ্চারিত দাওয়াই বাতলাতে হচ্ছে। বাল্যকাল থেকেই ইন্দ্রিয় সংযমের ও ষড়রিপু দমনের, উৎপাটনের নয়—অনুশীলনে প্রয়াসে প্রযত্নে শিক্ষা ও দীক্ষা দিতে হয়—আদেশ-উপদেশ-নির্দেশ-নিষেধ ও দেশনা মাধ্যমে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে চোখ রাঙিয়ে—ভয় দেখিয়ে নয়। এ কাজ তথা দায়িত্ব ও কর্তব্য একান্তই অভিভাবকের এবং কিছুটা সমাজের নীতিনিয়ম অনুগ আচার-আচরণ নিয়ন্তা সমাজপতির, গ্রামীণ সর্দারের এবং শাস্ত্রবেত্তারও। তা-ও সংযমনের ও দমনের বা দমিত রাখার প্রয়োজন, কারণ এবং তাৎপর্য ও গুরুত্ব আর অসংযমনের ও অনিয়ন্ত্রণের পরিণামচেতনা দানই হবে লক্ষ্য, শাসন বা জবরদস্তি নয়। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের তথা চোখ-কান-নাক-জিহ্বা-ত্বকের যথাপ্রয়োজনে, যথাস্থানে যথাসময়ে ও যথাপাত্রে প্রয়োগের ও অপ্রয়োগের শুভাশুভ ফলাফল জ্ঞানদানই হচ্ছে অভিভাবকের, শাস্ত্রীর ও সমাজপতির দায়িত্ব ও কর্তব্য। স্বাধিকারে সমস্বার্থে নিরুপদ্রবে নিরাপদে স্বস্থ ও সুস্থ থাকার সামাজিক গরজেই রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ বেপরওয়াভাবে যত্রতত্র যেমন তেমনভাবে উপভোগের অধিকার থাকে না মানুষের যৌথ জীবনে। তেমনি কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য দেহে চেতনার অমোঘ প্রসূন হলেও যথাপ্রয়োজনে যথাকালে যথাস্থানে ও যথাপাত্রে প্রয়োগের-অপ্রয়োগের শুভাশুভ, ভালোমন্দ, ন্যায়-অন্যায় প্রভৃতির সীমা মেনে চলতে হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রাণীর বৃত্তি-প্রবৃত্তিমাত্রই হচ্ছে প্রাকৃতিক। তাই সহজাত প্রশিক্ষণ-প্রাপ্তির উপায় নেই বলে বিশেষ করে কোন না-কোন প্রকারে শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী বলে মানুষ ব্যতীত আর সব প্রাণীই স্বসংগৃহীত খাদ্যজীবী, পরার্জিত খাদ্যজীবী নয়। তারা সহজাত বৃত্তি-প্রবৃত্তি চালিত। প্রশিক্ষণ পেলে অন্যান্য প্রাণীও যে মনুষ্য-সুলভ গুণ, চরিত্র ও কৌশল আয়ত্ত করে, তা সিনেমায়-সার্কাসে-কার্নিভালে পশু-পাখি চরিত্রে সপ্রমাণ অভিব্যক্তি পায়।

মানুষও প্রাণিপ্রজাতিরই একটি শ্রেণী। মানুষ ঋজু মেরুদণ্ডের ও দুটো হাতের মালিক। তাই তার যৌথ জীবন অন্য প্রাণীদের মতো নয়, সর্বার্থক ও সর্বাত্মক ভাবে সর্বত্র ও সর্বকাজে পরস্পর নির্ভরশীল-লেনদেনের হাজারো বন্ধনে বাঁধা। তাই সমস্বার্থেই সামবায়িক ভিত্তিতে সংযমে সহযোগিতায় নিরুপদ্রবে নিরাপদে নির্বিবাদে নির্বিরোধে সহাবস্থানের গরজে স্বাধিকার লঙ্ঘন না করার অঙ্গীকার করতেই হয়। নইলে যৌথজীবন অচল হয়ে পড়ে। জাঙ্গল জীবনের বিপদ-আপদ-অনিশ্চয়তা ও ত্রাস মানুষের গৃহগত সামাজিক ও রাষ্ট্রিকজীবন বিঘ্নিত ও ব্যাহত করে।

এজন্যেই ইন্দ্রিয় সংযমন ও ষড়রিপু দমন মানুষের মানবিক গুণের উন্মেষ-বিকাশ সাধনের জন্যেই আবশ্যিক ও জরুরী বলে বিবেচিত। এর জন্যে অনুভব-উপলব্ধি শক্তির বিস্তার ও উৎকর্ষ সাধনও আবশ্যিক। এ ইন্দ্রিয় সংযমনের ও রিপু দমনের জন্যেই বিবেকের ও হৃদয়বৃত্তির অনুশীলন ও আনুগত্য প্রয়োজন ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে। জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি ও ন্যায়চেতনার আনুগত্যের অপর নামই বিবেকানুগত্য। যা জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি ও ন্যায়বোধ প্রয়োগে অন্যায়, অশোভন, ক্ষতিকর, অযৌক্তিক বলে ধারণা হবে—অনুভূত বা উপলব্ধ হবে, তা থেকে বিরত থাকাই হচ্ছে মনুষ্যত্ব বা মানবিকগুণ। অন্যভাবেও ইন্দ্রিয় সংযমন ও রিপুদমন সম্ভব। তা হচ্ছে মানুষের প্রতি স্নেহ-প্রেম-প্রীতি-দয়া-দাক্ষিণ্য-কৃপা-করুণা-মৈত্রীর অনুশীলন এবং হিংসা, ক্ষমা, ক্ষান্তি, তিতিক্ষা, ত্যাগ, বিরাগ প্রভৃতি বিবেচনাপ্রসূত গুণের মানের, মার্গের ও মাত্রার মনুষ্যত্ব বা মানবিকগুণ অর্জিত বা আয়ত্ত হলে। বাঞ্ছিত মাত্রায় মানুষ হবে সংযত, সহিষ্ণু ও সুজন। আর সংযম, সহিষ্ণুতা ও সৌজন্যই হচ্ছে সংস্কৃতির প্রথম ও শেষকথা, প্রথম ও শেষ পরিচয়। অতএব, সচেতনভাবে বিশ্বাস-সংস্কারের যৌক্তিকতা ও উপযোগ যাচাই-বাছাই করতেই হবে জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি যোগে, মানুষকে যুক্তিবাদী ও মানববাদী হতেই হবে। মানুষ নির্বিশেষকে কেবল 'মানুষ' রূপেই গ্রহণ করতে হবে—অন্য কোন বিবেচনার ঠাঁই থাকবে না এতে। তা হলেই কেবল 'বেঁচে থাক এবং অন্যদের বাঁচতে দাও' নীতির বাস্তবায়ন পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে এবং বৈশ্বিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সম্ভব ও সার্থক হবে। মনে-মগজে-মননে-মনীষায় মানুষ সর্বসংস্কারমুক্ত হয়ে মানবে সম্ভব অশেষ চেতনার, অনুভবের ও উপলব্ধির আনন্দসুন্দর জীবন চরম ও পরম উপভোগ্য করে তুলতে পারবে।

ঐতিহ্য ও আস্তিকের মনুষ্যত্ব

প্রাণীমাত্রই চলে সম্মুখের দিকে। তার আঙ্গিক গঠনই তাকে সম্মুখগতি দান করে। তার চোখ, পা, পাখা, পাখনা প্রভৃতি সবটাই সম্মুখগতিরই সহায়। উদ্‌ভিদ মাত্রই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আত্মপ্রসারেই উন্মুখ, বৃক্ষমাত্রই ঊর্ধ্বগামী আর কোন কোন লতা আত্মবিস্তার করে তার চারপাশ আচ্ছাদিত করে। পেছন ফেরার বা যাওয়ার নাম হচ্ছে পিছুহঠা—এগুনো নয়, এর নাম জীবনবিমুখতা, পলায়ন, পরাজয়, বন্ধ্যাত্ব, স্থবিরতা, নিষ্ক্রিয়তা, মৃত্যুমুখিতা, মৃত্যুর প্রতীক্ষা। প্রকৃতির এ স্বভাব যে জীবতত্ত্ব আর জীবনতত্ত্বও, তা সবাই বোঝে না। তাই তারা বৃক্ষের, তরুলতার শেকড়ের সঙ্গেই মানবসমাজের অতীত-মননের, কৃতি-কীর্তির তথা ঐতিহ্যের তুলনা করে। পাতাও যে বায়ু ও রোদ থেকে খাদ্য গ্রহণ করে, তা স্মরণ করে না। তারা বলে অতীতই বর্তমানের নির্মাতা ও প্রেরণার-প্রবর্তনার উৎস। এ জন্যেই গোষ্ঠী, গোত্র, জাতি হিসেবে মানুষ আজো অতীতের ও ঐতিহ্যের গৌরব-গর্বী। এ যে স্থূল বোধের ও সূক্ষ্ম পার্থক্য চেতনার অসামর্থ্যজাত বিভ্রান্তি, তা কেউ সহজে উপলব্ধি করে না। আসলে অতীত বা ঐতিহ্য গৌরব-গর্বের পুঁজি এবং সম্মুখে চলার, পাথেয় করার সম্পদ নয়, অতীতের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে ও প্রয়োগে প্রাপ্ত সাফল্যের ও ব্যর্থতার কারণ-কার্যজ্ঞান অর্জন, স্মরণ এবং বর্তমান ও ভাবীজীবনে সতর্ক-সচেতন সযত্ন-প্রয়াসে ব্যর্থতার কারণ এগিয়ে সাফল্যের নিশ্চিত ব্যবস্থা গ্রহণের শিক্ষা নেয়ার জন্যেই অতীতজ্ঞান রূপ ইতিহাস লেখন-পঠন ও স্মরণ আবশ্যিক ও জরুরী। আমরা সেভাবে অতীতকে ঐতিহ্যকে দেখি না, [আমাদের সাফল্যের, কৃতিত্বের ও গৌরবের কৃতি ও ভাব-চিন্তা-মনন-মনীষাই ঐতিহ্য—পরাজয়ের, ব্যর্থতার লজ্জার কৃতি ঐতিহ্য বলে স্বীকৃত নয়, সেগুলো অনুল্লেখে বিস্মৃত ও বিলুপ্ত করাই নিয়ম] ঐতিহ্য বা অতীত আমাদের সমকালীন জীবন-জীবিকায় কোন কাজে আসে না। আমরা বুঝি না বলেই অতীতকে, ঐতিহ্যকে স্মরণ করে কণ্ডূয়নের আপাত সুখ অনুভব-উপভোগ করি। কিন্তু কণ্ডূয়ন ব্যাধিজাত, তাই তা কখনো বাঞ্ছিত হতে পারে না, সুখকর হলেও কণ্ডূয়ন যে-ব্যাধিপ্রসূন, সে ব্যাধির চিকিৎসা অবশ্যই প্রয়োজন। আমাদের ক্ষেত্রেও অতীতের ও ঐতিহ্যের রোমন্থন সুখের, আনন্দের, গৌরবের, গর্বের হলেও, তা বর্তমান জীবনের পুঁজি-পাথেয় নয় বলে, প্রেরণা-প্রবর্তনার উৎস নয় বলে, কেবল অযোগ্য অসমর্থের অক্ষমতার অযোগ্যতার গ্লানি-লজ্জা ঢাকবার আস্ফালনের অবলম্বন মাত্র বলেই তা পরিহার্য। ঐতিহ্য-অতীত প্রেরণার, প্রবর্তনার, শক্তির, সাহসের, জ্ঞানের, অঙ্গীকারের, উদ্যমের ও উদ্যোগের উৎস হলে মিশর-গ্রীস-রোম-বোগদাদ-চীন হৃতগৌরব হত না।

আমরা জন্মসূত্রে পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশে ও প্রতিবেশে আশৈশব নিখাদ নিখুঁত নিশ্চিত তত্ত্ব, তথ্য ও সত্যরূপে শ্রুত সবকিছুই বিনাপ্রশ্নে নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করি। এমনি বিশ্বাস-সংস্কারই আমাদের মনোজীবনে ভাব-চিন্তা-মনন-মনীষা নিয়ন্ত্রণ করে, জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি-যোগে যাচাই-বাছাই করে সত্যাসত্য কিংবা উপযোগ নিরূপণ করার আগ্রহ থাকে না সাধারণত কারোই। কাজেই শৈশবে-বাল্যে প্রাপ্ত শ্রুত বিশ্বাস-সংস্কার যেমন আমাদের মানসজীবন চালিত করে, তেমনি প্রবর্তনা দেয় আচারিক-পার্বণিক জীবন যান্ত্রিকভাবে যাপনে, বিশ্বাস-সংস্কার চালিত চিন্তা-চেতনা-মন-মনন-মনীষা নিতান্ত গতানুগতিক যান্ত্রিক বলেই তা জ্ঞান-বুদ্ধি যুক্তি ও উপযোগ-প্রয়োজনচেতনা বিরহী,—অনুভব-উপলব্ধিরিক্ত। অথচ সন্দেহ, অবিশ্বাস, বিরক্তি, বিরাগ, উৎকর্ষবাঞ্ছা প্রভৃতিই জাগায় নতুন প্রশ্ন, জাগায় নতুন আকাঙ্ক্ষা মানুষকে নতুন নতুন অনুভবের গুণে-মানে-মাপে-মাত্রায়-প্রসারে এবং উপলব্ধির উৎকর্ষে 'তিলে তিলে নতুন' করে তোলে। বিশ্বাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাত্রই স্থির, দৃঢ় ও বন্ধ্যা বলেই কখনো সৃষ্টিশীল, বিবর্তনশীল বা পরিবর্তনশীল হতে পারে না। তাই আস্তিক মানুষের মানবিক গুণের, মানবতার তথা মনুষ্যত্বের স্বেচ্ছা অনুশীলনজাত কোন বিকাশ বিস্তার সম্ভব হয় না, এবং শাস্ত্রানুগ তাৎপর্যহীন ও উপযোগ চেতনাহীন যান্ত্রিক জীবন যাপন করে বলেই তারা লাভে-লোভে নির্ভয়ে অপকর্ম-অপরাধ ধরে। কারণ তারা আশৈশব শ্রুত ও ডিগদড়ি দেয়া মনে-মতে চলা শাস্ত্রসম্মত আর অলীক-অলৌকিক শক্তি নিয়ন্ত্রিত জীবন-চেতনার সীমায় বা পরিসরেই জীবনযাপন করে নিরুদ্বেগে ও নিঃসংশয়ে। আমরা জানি বিশ্বাসমাত্রই প্রশ্নহীন, যুক্তিহীন ও নতুন কাঙ্ক্ষাহীন। এ জন্যেই আস্তিক মানুষের শাস্ত্রিক বিশ্বাসজাত মনুষ্যত্ব ব্যতীত অন্য কোন মনুষ্যত্ব চেতনা সাধারণত থাকে না। মনুষ্যত্ব বিকাশের অনুশীলনে থাকে না তাদের আগ্রহ। ফলে ইহুদীর মনুষ্যত্ব সাড়ে তিন হাজার বছর আগেকার অবিকশিত পশ্চিম এশিয়ার প্রান্ত সীমার প্রাকৃতিক প্রতিবেশে সৃষ্ট সমাজ থেকে পাওয়া, খ্রীস্টানের মনুষ্যত্ব বা মানবিকগুণের ধারণা দু'হাজার বছর আগেকার জেরুজালেমের সমাজ-সংস্কৃতি থেকেই লব্ধ। তেমনি হিন্দুর, জৈনের, বৌদ্ধের মানবতারূপ গুণচেতনা তিন ও আড়াই হাজার বছরের পুরোনো, মুসলমানের মানবতাই যেমন দেড়হাজার বছর আগেকার মরু আরবের চিন্তা-চেতনার ও সংস্কৃতির ফসল। তাই যথার্থ শাস্ত্রনিষ্ঠ আস্তিক মানুষের জীবনে ও চিন্তায়-চেতনায় মননে-মনীষায় কোন সমকালীনতা, কোন প্রতিবেশ প্রয়োজন চেতনা থাকে না। শাস্ত্রলব্ধ এ মনুষ্যত্ব তাৎপর্যরিক্ত, সংস্কৃতিহীন, আচারিক ও যান্ত্রিক। তাই তারা অতীতের অনুধ্যানে তৃপ্ত, তুষ্ট, হৃষ্ট অতীতের রোমন্থনে সুখী, তারা অতীতমুখী ও অতীতাশ্রয়ী— বাস্তব জীবনে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নতুন যন্ত্র, হাতিয়ার, তৈজস-আসবাব, ঔষধ, চিকিৎসা, পোশাক, খাদ্য গ্রহণে-বরণে উৎসুক হলেও মানসিক জীবনে তারা কূর্মপ্রবৃত্তির রক্ষণশীল, গ্রহণবিমুখ ও নতুনভীরু পুরাতন বা সনাতনপন্থী। বিশ্বাসীর মন-মনন মুক্ত নয় বলে দেশ-কাল-বিদ্যাও সমকালীন ভুবনের প্রয়োজন ও দাবি অনুযায়ী নির্বিশেষে মানুষকে কেবল মানবপ্রজাতির মানুষ বা মানবিক রূপে গ্রহণ আস্তিকের পক্ষে সম্ভব না।

প্রাণিত্ব ও মনুষ্যত্ব

সুপ্রাচীন কাল থেকে দলীয় তথা যৌথ গৌষ্ঠীক-গৌত্রিক জীবনে মনুষ্যাত্মা অমরত্বের এবং দেহান্তরে অনন্ত জীবনের স্বীকৃতিতে নির্বিরোধে-নির্বিবাদে-নিরুপদ্রবে ও নিরাপদে সহযোগিতায় সহাবস্থান করতে চেয়েছে। এ জন্যে মানুষকে স্বর্গসুখের লোভ এবং নরকাগ্নির ভয় দেখিয়ে সংযত ও সহিষ্ণু রাখার জন্যে পাপ-পুণ্য চেতনাদানের চেষ্টা হয়েছে। এর মধ্যে একেবারে নিতান্ত জৈবিক স্থূল মাটিলগ্ন জীবনের চেতনাই সম্বল হয়েছে। মানুষের অশেষ সম্ভাবনাময় মানবিক গুণের উন্মেষের-বিকাশের ও প্রকাশের কোন সহায়তা করে না এই স্থূল চেতনা ও লক্ষ্য। তাই শাস্ত্রানুগত্য যান্ত্রিক জীবনাচারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিবদ্ধ আর দড়ি-বাঁধা প্রাণীর মতো চেতনার গতানুগতিক ও সীমিত পরিসরে বিচরণ করে। অথচ মানুষের লক্ষ্য হচ্ছে চেতনার, অনুভবের ও উপলব্ধির সূক্ষ্ম শেকড় বহু ও বিচিত্রভাবে এই ইহজাগতিক জীবনে চারদিকে ছড়িয়ে দেহ-প্রাণ-মন-মনন-মনীষার প্রসার ও উৎকর্ষ ঘটিয়ে এ বিচিত্র ও চিরনতুন জগতের রূপ-রস-শব্দ-গন্ধজাত অনুভূতিকে মানসভোগের-উপভোগের ও সম্ভোগের স্তরে গুণে-মানে-মাপে-মাত্রায় উন্নত ও অশেষ করে তোলা।

বিভিন্ন দেশে সভ্যতর সমাজে সাহিত্যের ও দর্শনের চর্চায় নগণ্য সংখ্যক মানুষ এ লক্ষ্যেই এগিয়ে এসেছেন বটে, কিন্তু তাদের প্রভাব সর্বব্যাপী ও সর্বজনগ্রাহ্য না হওয়ায় আজো মানুষের মধ্যে মানবিক গুণের বিকাশ-প্রকাশ বিরলতায় দুর্লক্ষ্য। তাই খাদ্য-খাদক সম্পর্কের জাঙ্গল ও আরণ্যপ্রাণী জগতের মতো মানব প্রজাতির প্রাণীও বৃত্তি-প্রবৃত্তির অসংযমে ও অসহিষ্ণুতায় আর লাভে-লোভে কিংবা বুঝে না-বুঝে ও হুজুগে তথাকথিত সভ্য-ভব্য ও সাংস্কৃতিক জীবন যাপনের গর্বে ও গৌরবে তৃপ্ত, তুষ্ট ও হৃষ্ট। অপহৃতি ও অবক্ষয় চেতনা মানুষকে আত্মোন্নয়নের উদ্যম যোগায় ও পন্থা বাত্‌লায়। আমাদের অধিকাংশ মানুষের চেতনা আশৈশবলব্ধ বিশ্বাস-সংস্কারের দুর্ভেদ্য পাথুরে দুর্গে কিংবা লৌহ-কঠিন কাঁটাল পিঞ্জরাবদ্ধ থাকে বলে তাদের বৌদ্ধিক ও যৌক্তিক চেতনার উন্মেষ ঘটে না। তারা বৃত্তি-প্রবৃত্তি চালিত জীবনই যাপন করে। একারণে প্রাণীসুলভ স্বভাব বশে তাদের স্নেহ-প্রীতি-মমতা-দায়িত্ব-কর্তব্য-ত্যাগ-তিতিক্ষা অপত্যে তথা কেবল সন্তানেই নিবদ্ধ থাকে, কৃচিৎ নিন্দাভয়ে মা-বাবায় কিংবা ভাই-বোনে সামান্য প্রসারিত হয় মাত্র। যে মনুষ্যত্ব অনুভব-উপলব্ধির ও মুক্ত মননের উৎস ও ভিত্তি, সে-মনুষ্যত্ব উন্মেষ-বিকাশের অবাধ পথ রুদ্ধ বলেই আমাদের সমাজ এখনও লাভ-লোভ চালিত স্বার্থপর। যৌথ জীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য চেতনাবিক্ত দুষ্ট-দুর্জন-দুর্বৃত্ত-দুষ্কৃতী আর কাড়া-মারা ও হানা প্রবণ লোকে আকীর্ণ। বিদ্যায় ও মানবিক গুণে দীন; মননে-মনীষায়, আবিষ্কারে-উদ্‌ভাবনে এমন রিক্ত যে আমরা জাতি হিসেবে ধনে-মনে ও মানে কাঙাল, চিন্তায়-চেতনায় গতানুগতিক। আমাদের গতি কূর্মগতিও নয়, লাটিমের গতি।

অতএব ইতিহাস, দর্শন ও সাহিত্য সৃষ্টি করে ও চর্চা করে আমাদের অনুভব, উপলব্ধি ও মনন সূক্ষ্ম ও উন্নত করতে হবে। এভাবেই আমাদের মানবিক গুণের বিকাশ সাধন সম্ভব।

দুই

সংস্কৃতিমান মাত্রেই বিবেচক হয়। সংযমে, সহিষ্ণুতায় ও সৌজন্যেই সংস্কৃতির অভিব্যক্তি মেলে। যে মানুষ সংযত সে স্থান-কাল-ব্যক্তির পরিপ্রেক্ষিতে যথাপ্রয়োজন ও যথাযোগ্য কর্ম ও আচরণ করে। যে লোক সহিষ্ণু সে জানে ও বোঝে যত জন, তত মন, তত মত এবং তত রকমেরই রুচি ও বিবেচনা শক্তি। কাজেই প্রতি দ্বিতীয় জনের কর্ম, আচরণ ও রুচি প্রত্যাশিত মানের, মাপের ও মাত্রার না হলেও সংস্কৃতিমান মানুষ স্থান-কাল ও পাত্র বিবেচনায় সহিষ্ণু হয়ে সহ্য করে। আর সংস্কৃতিমান মাত্রই প্রতিবেশীর-পরিজনের প্রতি তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সচেতনভাবে সযত্ন পালনে প্রয়াসী থাকে। সুজন মাত্রই বিপন্ন শত্রুকেও ক্ষমা করতে, সাহায্য করতে, বিপন্মুক্ত করতে এগিয়ে আসে, কেননা সে জানে ক্ষমা-কৃপা-করুণাতেই, দয়া-দাক্ষিণ্যেই মনুষ্যত্বের বিকাশ ও প্রকাশ। 'মানুষ' নামের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যোগ্য হতে হলে ক্ষুদ্রতার উপরে উঠতেই হয়। সংযম সহিষ্ণুতা, ন্যায়বোধ সেজন্যই সংস্কৃতিমানের পুঁজি ও পাথেয়। সুজনই একাধারে ও যুগপৎ মনুষ্যত্বের ও সংস্কৃতির প্রতীক, প্রতিম ও প্রতিভূ।

মানবতার সংকট-সমস্যা

লৌকিক, অলৌকিক, অলীক, শাস্ত্রিক বিশ্বাস-সংস্কারের জগৎ হচ্ছে অতীতমুখিতার, কল্পনার, বিস্ময়ের, অজ্ঞতার, যাদু ও নিয়তিনির্ভরতার, অজিজ্ঞাসার, অযুক্তিবাদিতার, জ্ঞানবিমুখতার, বিজ্ঞান-অস্বীকারের, প্রকৌশলের ও প্রযুক্তির গুরুত্ব অস্বীকৃতির, মানসিকতায় সমকালীনতার অনুপস্থিতির, মননে-মনীষায় এ যন্ত্রজগতের ও যন্ত্রযুগের প্রভাব ও চাহিদা চেতনা শূন্যতারই সাক্ষ্য ও প্রমাণ।

আর আবিষ্কার-উদ্ভাবন-যন্ত্র-প্রকৌশল-প্রযুক্তি-প্রভৃতির দেহে-প্রাণে-মনে-মননে প্রভাব ও গুরুত্বচেতনা, বিজ্ঞানের ও যুক্তির আলোকে প্রকৃতিবাদে তথা প্রাকৃতশক্তির আবর্তনবাদে আস্থা রেখে ঐহিক বা একান্ত ইহজাগতিক জীবন-জীবিকা এবং সমাজ-রাষ্ট্র ব্যবস্থা নির্বিবাদ-নির্বিরোধ-নির্বিঘ্ন-নিরুপদ্রব-নিরাপদ করার লক্ষ্যে সামবায়িক ভিত্তিতে সম ও সহস্বার্থে সংযমে, সহিষ্ণুতায়, সৌজন্যে ও সহযোগিতায় শান্তিপূর্ণভাবে মানবে-প্রত্যাশিত ন্যূনতম গুণের মানুষের সহাবস্থান সম্ভব করে না তুললে মানুষের জীবন এমনি শোষণ-পীড়ন-বঞ্চনা আকীর্ণ রক্তক্ষরী ও প্রাণহারা সংঘর্ষ-সংঘাতবহুল থেকেই যাবে। কাড়া-মারা-হানাই হবে সাধারণ ও স্বাভাবিক নীতিনিয়ম রীতিরেওয়াজ ও প্রথাপদ্ধতি জীবন-জীবিকাক্ষেত্রে।

জ্ঞান ও যুক্তিবাদ হচ্ছে প্রত্যক্ষবাদিতা, বিজ্ঞানমনস্কতা, ন্যায়-ন্যায্যতানিষ্ঠা, প্রতিবেশ-পরিবেশপ্রেরণা, প্রয়োজন ও প্রয়োগচেতনা এবং যথাপ্রয়োজনে যথাকালে, যথাস্থানে, যথাব্যবস্থা গ্রহণ-উন্মুখতা আর দেহ-প্রাণ-মন-মননের অশেষ, অসীম অপরিমেয় বিকাশ-প্রয়োগ সম্ভাবনা সম্বন্ধে সচেতনতা এবং বিকাশ ও উৎকর্ষ লক্ষ্যে অনুশীলন প্রবণতা। এই যুক্তিবাদী জিজ্ঞাসু মুক্তবুদ্ধি অধ্যবসায়ী মানুষেরই নিরলস-নির্ভীক সাধনায় এ শতাব্দীতে আবিষ্কারে-উদ্ভাবনে বস্তুগত ও মননগত যে অভাবিত অগ্রগতি হয়েছে, তার তুলনা অতীতে ইতিহাসে মিলবে না। বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে নানা সূক্ষ্ম তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য জানার ফলে মানুষ যথা প্রয়োজনে, যথাকালে প্রকৃতির সঙ্গে আপোস করে, তাকে বশে এনে কিংবা কৌশলে রুখে দাঁড়িয়ে আত্মরক্ষার, প্রকৃতিকে কাজে লাগানোর ব্যবস্থা করতে অনেকক্ষেত্রেই সমর্থ হয়েছে, হচ্ছে। যন্ত্র আবিষ্কার-উদ্ভাবন করে যন্ত্রী হয়ে জল-স্থল-আকাশের অন্ধি-সন্ধি, কূল-কিনারা জানা-বোঝার ও জল-স্থল-আকাশকে কাজে লাগানোর শক্তিও অর্জন করেছে মানুষ। জলে-স্থলে-আকাশে অগম্যতা ও দুর্গম্যতাও দূর করেছে এ শতকের মানুষ। গোটা বিশাল পৃথিবীটা এখন যান ও যন্ত্রযোগে ছাদের নীচে ঘরের কোণে বসে থাকা, শুইয়ে থাকা উদাসীন নিষ্ক্রিয় মানুষের চোখে-কানে মনে-মননে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধরিয়ে দিচ্ছে গোটা পৃথিবীর নিত্যকার সচিত্র ঘটনা ও রটনা, ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ-ঘটার বা রটার সঙ্গে সঙ্গেই। এখন কেউ বা কিছু কোথাও দূরে দূরত্বে নেই। আর মানুষের শ্রম ও শ্রমশক্তি আর সময় বাঁচিয়ে দিয়েছে ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রোনিক যন্ত্র। শ্রমিক মানুষের বিকল্প হয়েছে রোবট। মৃত্যুঞ্জয়ী চিকিৎসা ও ঔষধ যেমন মানুষেরই আবিষ্কার-উদ্‌ভাবন, তেমনি আণবিক-উদ্‌যানী বিশ্ববিধ্বংসী মারণাস্ত্র তারই নির্মিত ও প্রযুক্ত। এতে মিত্রকে বাঁচানোর এবং শত্রুকে মারানোর সমপরিমাণ আগ্রহেরই প্রমাণ মেলে। একারণেই বিজ্ঞানের ও প্রযুক্তির এমন সূক্ষ্ম ও বিচিত্র প্রয়োগ মানুষের জীবন-জীবিকা ক্ষেত্রে সম্ভব ও সহজ হলেও, মানুষের ব্যবহারিক জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-সৌকর্য এলেও ব্যক্তি মানুষের দেহে-প্রাণে-মনে-মননে শান্তি নেই, তৃপ্তি নেই, তুষ্টি নেই, হৃষ্টতা নেই, নেই সুখ, নেই নিশ্চয়তা ও নিশ্চিন্তি। এ প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা-সংকুল জগতে ও জীবনে প্রতিষ্ঠার দৌড়ে কেউ পিষ্ট হচ্ছে, কেউ হচ্ছে দলিত, কেউ হারাচ্ছে প্রাণ, কেউ হচ্ছে বিজয়ী। সর্বত্রই মনুষ্যত্বে ঘটছে অবক্ষয়, মানবিক গুণের প্রকাশ-বিকাশপথ হচ্ছে এ জীবনসংগ্রামেও তীব্র, কঠিন প্রতিযোগিতায় সঙ্কীর্ণ, কোথাও কোথাও নিরন্নতা ও নিঃস্বতা করেছে এ পথ রুদ্ধ ও বিস্মৃত। আজ এটিই সভ্যতা-সংস্কৃতি-মানবিকতার ও মানবতার উন্মেষ, লালন ও বিকাশক্ষেত্রে সংকট-সমস্যা সৃষ্টি করেছে। দার্শনিক হবসের সিদ্ধান্ত যেন এতকাল পরে আক্ষরিকভাবে সত্য, পষ্ট ও প্রকট হয়ে উঠেছে, অর্থাৎ এখন জীবন-জীবিকাক্ষেত্রে মানুষমাত্রেই একে অপরের প্রতিযোগী-প্রতিদ্বন্দ্বী-শত্রু।

আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রিক বুর্জোয়া ব্যবস্থায় মানুষের অসম প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা মূলক আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষা-সামর্থ্য আর বুদ্ধিগত চক্রবৎ বিবর্তমান ও পরিবর্তমান অস্থির অবস্থা ও অনিশ্চিত অবস্থান মানুষকে যতটা বহির্মুখী চিন্তায় ও চেতনায় ধূর্ত ও সতর্ক সন্ধানী ও শিকারী করে তুলেছে, সে-পরিমাণে অন্তর্মুখী অনুভব-উপলব্ধির সচেতন অনুশীলনে আগ্রহ ও গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে। ফলে ধনবল, পেশীবল, অস্ত্রবল, জনবল সংগ্রহের অঙ্গীকার ঋদ্ধ উদ্যম, উদ্যোগ, আয়োজন যতটা গুরুত্বপূর্ণ, আবশ্যিক ও জরুরী বিবেচিত হচ্ছে, মানসিকগুণের অনুশীলনে-পরিশীলনে, মানবিকতার বিকাশ-বিস্তার সাধনে ঔদাসীন্য সে-পরিমাণেই বেড়ে চলেছে। আজ তাই মানুষের মধ্যে আদর্শনিষ্ঠা নেই, নেই ন্যায়-নীতি-নৈতিকতাচেতনা, নেই চরিত্রশক্তিরূপ সংযম, সহিষ্ণুতা, সৌজন্য ও বিবেকানুগত্য। ফলে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিযোগী-প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে চলছে পাশব দ্বেষ-দ্বন্দ্ব সন্দেহ-অবিশ্বাস সংঘর্ষ-সংঘাত। গোটা দুনিয়ার সর্বত্র তাই পারিবারিক, সামাজিক, বার্ণিক, ধার্মিক, ভাষিক, গৌত্রিক, গৌষ্ঠীক, জাতিক ও রাষ্ট্রিক স্তরে চলছে অবিরাম পারস্পরিক ছল-চাতুরী প্রবঞ্চনার আর কাড়ার, মারার ও হানার খেলা। তাই আজ পৃথিবীব্যাপী সর্বশ্রেণীর মানুষের ব্যবহারিক ও মানসিক জীবনে দেখা দিয়েছে অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা, অনিশ্চিন্তি ও বিপন্নতা। এতে 'চাচা, আপন প্রাণ বাঁচা' কিংবা 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম'—এ দুটো আপ্তবাক্য জীবনে টিকে থাকার অভয়মন্ত্র কিংবা জীবনে অমোঘ-অভ্রান্ত তত্ত্ব, তথ্য ও জীবনসত্য রূপে প্রতীয়মান হয়ে উঠেছে। তাই মানুষ আজ কৃপা-করুণা-দয়া-দাক্ষিণ্য, প্রীতি-মৈত্রী প্রভৃতিকে মানস-বিলাস বলেই জানে-বোঝে ও মানে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফলে মানুষ এখন বেহায়া, বেচশম, বেলেহাজ, বেআক্কেল, বেল্লিক, বেআদপ। অথচ আমরা জানি, বুঝি ও মানি যে, মনুষ্যত্বের হ্রাস, মানবিক গুণের অবক্ষয় মানুষকে আবার মানব প্রজাতির প্রাণী করে তুলবে মাত্র। কাজেই আমাদের নতুন করে সযত্ন প্রয়াসে মানবিকগুণের সচেতন অনুশীলনমুখী হতেই হবে।

ক্ষয়িষ্ণু মানবিকতা

বিশশতকের নিঃস্ব নিরন্ন শোষিত পীড়িত দলিত দমিত বঞ্চিত গণমানব তাদের ভাতে-কাপড়ে ন্যূনতম মানবিক অধিকার প্রাপ্তি সম্বন্ধে আশান্বিত ও আশ্বস্ত হয়েছিল, সোভিয়েট রাশিয়া-চীন দেখে। পরে প্রত্যাশা পূরণ সম্বন্ধে প্রত্যয়ী হয়েও উঠেছিল। মনে করেছিল এ কেবল সময়ের ব্যাপার। শোষিত-বঞ্চিত মানবের-মানবতার বিশ্বময় মুক্তি ঘটবেই।

আকস্মিকভাবে পূর্বয়ুরোপে-সোভিয়েট রাশিয়ায় [এবং চীনেও কিছুটা] সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মারাত্মক বিপর্যয় ঘটে গেল। শুনে শেখা শুনে আশ্বস্ত হওয়া, শুনে সমাজবাদী হওয়া গুরুবাদী অজ্ঞ উৎসাহী কম্যুনিস্টরা এ বিপর্যয়ে বিশ্বব্যাপী সর্বত্র যেন নিরাশা-হতাশায় নয় কেবল, ভুল মতাদর্শ সমর্থনের ও অনুসরণের জন্যে লজ্জিত এবং অনুশোচনায়ও যেন মর্মাহত। কাস্তে-হাতুড়ি অঙ্কিত পতাকা বর্জনে নয় শুধু, সঙ্ঘ-সমিতি-সংস্থাগুলোর নাম বদলেও হতে চাইল স্বস্থ। যেন তাদের কুমতলব-অপকর্ম হঠাৎ ধরা পড়ে গেছে, অপরাধের নিন্দা-লজ্জা-শাস্তি এড়ানোর অপপ্রয়াসে সমাজবাদীদের অধিকাংশই দলছুট হয়ে অন্য বুর্জোয়া দলে ও মতে আশ্রিত হবার জন্যে ছুটোছুটি করতে থাকে। যেন পূর্বয়ুরোপে-রাশিয়ায় কিংবা দিকভ্রান্ত চীনে যেন মার্কসবাদের ব্যর্থতা ও অলীকতাই প্রমাণিত হয়ে গেল। তারা কিন্তু শিশু-বৃদ্ধ অন্ধ-পঙ্গু-পাগল নির্বিশেষে মানুষ মাত্রেরই বেঁচে থাকার জন্মগত অধিকার এবং বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব ও কর্তব্য যে সরকারের তথা রাষ্ট্রের, এ তত্ত্বের ও তথ্যের ন্যায্যতা অস্বীকার করছে না, তবে মার্কসবাদ সম্ভূত এ তত্ত্বের বাস্তবায়নের অন্য কি বিকল্পপন্থা রয়েছে, সে- সম্বন্ধেও তারা কিছু বলছে না।

ফলে এ শতকের আশ্বস্তগণমানব সমাজতন্ত্রের এ বিপর্যয়ে নিরাশা, হতাশা ও দিশেহারা হয়ে আশা-ভরসার নোঙর অন্য কোন উপায় বা পন্থালগ্ন করবার জন্যে ছুটোছুটি করছে। সনাতন বিশ্বাস সংস্কার চালিত এ অসহায় মানুষ আবার ভূত-প্রেত-পিশাচ-জীন-পরী-ড্রাগন-ভগবান-দেবতা উপ-ও-অপদেবতা প্রভৃতি অরি-মিত্র শক্তির উপর আস্থা-ভয়-ভক্তি-ভরসা-নির্ভরতা দৃঢ়প্রত্যয়ে গ্রহণ-বরণ করতে তুক-তাক, ঝাড়-ফুঁক, বাণ-উচ্চাটন, মন্ত্র-মাদুলী, তাবিজ-কবচ, মন্ত্রপূত ধূলি-তেল-পানি-সুতাপড়া কিংবা পাথুরে-ধাতব আঙটি নির্ভর হয়ে উঠছে। দিন-ক্ষণ-তিথি-নক্ষত্র ও মনুষ্যজীবন নিয়ন্ত্রক রাশিচক্র তাই যুক্তিবিরহী অজ্ঞ মানুষের জীবন-জীবিকা নিয়ন্তারূপে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে দ্রুত। গণক-নজুম-জ্যোতিষী নতুনভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে, রোগীদের চিকিৎসকের মতোই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ সঙ্গে লেখাপড়া জানা কিন্তু জ্ঞানে-প্রজ্ঞায় যুক্তিবাদে স্বশিক্ষিত নয়, এমন লোকেরা তাদের আর্থিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাষ্ট্রিক জীবনের স্থবিরতা, অবক্ষয় অনুন্নতির কারণ খুঁজে বেড়াচ্ছে বিপথে। তাদের কেউ কল্যাণ খুঁজে পাচ্ছে অতীতমুখিতায়, রক্ষণশীলতায়, বিজ্ঞানবিমুখতায়, যুক্তিবাদ পরিহারে, অতীতে, ঐতিহ্যে ও বিশ্বাস-সংস্কারের পরম্পরায়। কেউ স্বস্তি খুঁজছে বিজাতি-বিধর্মী-বিদেশী-বিবর্ণ-বিভাষী বিদ্বেষে ও বিতাড়নে, কেউ আশ্রিত হচ্ছে ধর্মভাবে ও ধর্মাচারে, কেউ বা উৎসাহ পাচ্ছে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-বিষ ছড়াতে ও নিজেদের দুর্ভোগ ভুলে থাকতে, কেউ বা ক্ষোভ, জ্বালা, ক্রোধ উপশমের উপায় সন্ধান করছে বাঁচার গরজে আত্মরতিবশে বেপরওয়া কাড়ায় মারায় ও হানায়। এভাবে মানুষ নীতি-নিয়মের বাঁধনমুক্ত হচ্ছে, অথচ জীবনে প্রয়োজনীয় কোন নতুন নীতি-নিয়মের অঙ্গীকারও নেই। মানুষ হচ্ছে অধিক পরিমাণে প্রকৃতিচালিত, ফলে মানুষ দ্রুত মানবিক গুণ হারাচ্ছে, মানবতা ক্রমে দুর্লভ ও দুর্লক্ষ্য হয়ে উঠছে, মানুষ নামের গৌরব-গর্ব করবার যেন কিছুই থাকছে না। মানুষ অবশ্য বিজ্ঞানী-কৌশলী-প্রকৌশলী-প্রযুক্তিবিদরূপে মননশীল মনীষীরূপে আরো অভাবিত অনেক উন্নতি ও উৎকর্ষ লাভ করবে, আত্মপ্রকাশ করবে বহু, বিবিধ ও বিচিত্রভাবে। কিন্তু মানবিকতা, মনুষ্যত্ব, মানবতা প্রভৃতি আমরা এতোকাল যে আকাশচুম্বী তাৎপর্যে উচ্চারণ করেছি, আজো করছি, তা কি বজায় থাকবে? অনুভব-উপলব্ধি সূক্ষ্মতায়, মাধুর্যে, উদারতায়, ক্ষমায়, ভালোবাসায়, কৃপায়, করুণায় ব্যক্তিসত্তার মূল্য ও মর্যাদা দানে মানবচৈতন্য বাঞ্ছিত ও প্রত্যাশিত মাত্রা পাবে কি এ অবস্থায় ও অবস্থানে?

আপাতত বিশ্বময় জীবনযাত্রায় আর্থিক অসচ্ছলতার দরুন, বেকারত্বের অসহ্য যন্ত্রণার দরুন, অর্থ-সম্পদের স্থিতি সম্বন্ধে অনিশ্চয়তার আতঙ্কের দরুন জীবন-জীবিকাক্ষেত্রে নীতি নিয়মহীন যে অসম প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা সঙ্কুল অবস্থা বিরাজ করছে, তাতে সবার জীবনে-জীবিকায় নেমে এসেছে অবিমোচ্য অনিশ্চয়তা অনিশ্চিন্ততা। তারপর পৃথিবীব্যাপী শাহ-সামন্তযুগের অবসানে এখন বলতে গেলে শ্রেণী স্থূল মাপে মাত্র দুটো—মালিক ও বিভিন্নস্তরের শ্রমজীবী। সে-মালিকও হয় ব্যক্তি অথবা সরকার। এখন আর চাষী-ক্ষেতমজুর, কৃষক-বেণে, কারখানামালিক-শ্রমিক কিংবা কায়িকশ্রমজীবী ও মস্তিষ্কশ্রমজীবী রূপে জীবিকাক্ষেত্রে শ্রেণীভাগ করা নিরর্থক ও নিষ্ফল। এখন কেবল কাজদেনেওয়ালা ও কাজকরনেওয়ালাই আছে, আর কেউ নেই, কিছু নেই। এ-ই একমাত্র তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য। এ তাৎপর্যে কাজে নিয়োগকর্তা আর কাজে নিযুক্ত কর্মজীবীই রয়েছে। দৈহিক শ্রমজীবী আর মগজীশ্রমজীবী— উভয়ই স্বরূপে কর্মজীবী মাত্র। এখন তাই কৃষকসঙ্ঘ, শ্রমিক ইউনিয়ন, কর্মজীবী সমিতি নামে আলাদা সঙ্ঘ-সমিতি, সংস্থা-প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। এখন দরদাম চুক্তি চলবে মালিক-কর্মজীবীর মধ্যে। মনে রাখতে হবে আজ মানুষের প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রতিকূল ও সামাজিক পরিবেশ বিকৃত। দুটোই বিপন্ন। যুক্তিবাদী প্রজ্ঞা ও বিবেকবান জ্ঞানী-বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে সে-বিপদ আসন্ন ও আপন্ন। বাঁচার-বাঁচানোর গরজেই আজ সতর্ক-সযত্ন প্রয়াসে ও বিবেচনায় তা এড়াতে হবেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যক্তিজীবনে মনুষ্যত্বের অনুশীলন জরুরী

প্রাণিজগতে বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে খাদ্য-খাদক সম্পর্কই প্রকট। আর অপরিচয়জাত সন্দেহ, অবিশ্বাস, বিপদাশঙ্কা প্রভৃতির দরুন যে-কোন অচেনা ও অপরিচিত স্বভাবের ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রাণী মাত্রকেই দেহ-প্রাণের বৈরীভাবা প্রাণীজগতে চিরচালু নিয়ম। প্রাণী প্রজাতির অন্যতম বলেই মনুষ্য স্বভাবেও প্রাণীর সর্বপ্রকারের বৃত্তি-প্রবৃত্তি দৃশ্য-অদৃশ্যভাবে, সুপ্ত-গুপ্তভাবে কিংবা প্রকট ও উগ্রভাবে রয়েইছে। মশা-মাছি-পিঁপড়ে-ছারপোকা থেকে বাঘ-সিংহ হাতী প্রভৃতি এমনকি বুনো শূকর-বানর-কুকুর-ষাঁড় সবই মানুষের শত্রু আর প্রকৃতি যখন খরা-বন্যা-ঝড়ঝঞ্ঝা-মারীরূপে বৈনাশিকরূপ ধারণ করে, তখন যে-প্রকৃতির কোলে জীব-উদ্‌ভিদ লালিত, সে-প্রকৃতিই অমোঘ সংহারক রূপে দেখা দেয়।

এ জন্যেই জীবন আপোসাত্মক নয়, জীবন হচ্ছে আত্মরক্ষার আত্মপ্রসারের ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। জীবন হচ্ছে সার্বক্ষণিক লড়াই বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে। জীবন হচ্ছে সার্বক্ষণিক প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ এবং প্রতিকার প্রয়াস। জীবন তাই সর্বার্থক ও সর্বাত্মকভাবেই এক জীবনপণ কঠিন কঠোর প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা সঙ্কুল সংগ্রাম। যে টেকে, জয়ী হয়, জীবনোপভোগের যোগ্য ও অধিকারী সে-ই। যে হারে, বঞ্চিত, শোষিত, দলিত ও দমিত হয় সে-ই।

দেহে বলবান এবং মগজে বুদ্ধিমান আর আত্মপ্রত্যয়ী সাহসী আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী ব্যক্তিই অন্যকে শক্তি-সাহস, জ্ঞান-বুদ্ধিযোগে অনুগত দাস কিংবা পীড়নে-বন্ধনে বশ করে চালু করে দাস-প্রভু বা বান্দা-মনিব সমাজ। তখনো বিনিময় মুদ্রা ছিল অচিন্ত্য। তাই ভাতে-পুষে দাসের সংখ্যাবৃদ্ধি করেই, শ্রমশক্তিকে পুঁজি করেই পশুপালনে কিংবা চাষাবাদে হতে হত ধনী, মুদ্রাযোগে নয়, পণ্য বিনিময়েই পারস্পরিক চাহিদা বা প্রয়োজন মেটানো হত। পরে মুদ্রা চালু হলেও দাসপ্রথা সহজে বিলুপ্ত হয়নি, মনিব সংখ্যা ছিল সীমিত বা করগণ্য আর দাসদাসী ছিল শতে শতে হাজারে হাজারে। বিনিময় মুদ্রা চালু হওয়ার পরেও দুর্বলদের জোরে-জুলুমে-জবরদস্তিতে ধরে বেঁধে নিয়েই করা হত দাস-ব্যবসা, অন্যরা মানে সাধারণ গৃহস্থরা শ্রমিক-সেবক বানাবার জন্যে বাজারে অন্য পশু-পাখির মতো মানুষকে কিনে নিত দাস হিসেবে।

আজকের মানুষের প্রথম দিককার প্রজন্মের নারী-পুরুষ কত হাজার বছর আগে থেকে ঋজু মেরুদণ্ডের মনুষ্যাবয়ব পেয়েছে, তার ঠিক সময় নিরূপণ আজ আর সম্ভব নয়। কেবল প্রমাণে-অনুমানে বিশ্বাসযোগ্য কাল নির্ধারিত ও আপাতত গৃহীত বা স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু প্রাণিজগতের মানবপ্রজাতি বুনো-বর্বর স্তর অতিক্রম করে কবে কোথায় গৌষ্ঠীক বা গৌত্রিক পর্যায়ে সভ্য-ভব্য হতে থাকে, তা-ও আমরা সুনির্দিষ্টভাবে জানি না।

কেবল প্রমাণে-অনুমানে বড়জোর সাত/আট হাজার বছর আগে থেকেই বলে ধারণা কিংবা বিশ্বাস করতে পারি। ঋজু শিরদাঁড়ার ও দু'হাতের বদৌলত মানুষ দলীয় বা যৌথজীবনে খাদ্য সংগ্রহের, সঞ্চয়ের, দীর্ঘকালরক্ষণের ক্ষেত্রে পরস্পর নির্ভরশীল যেমন হতে পেরেছে, তেমনি হয়েছে ক্রমে পরান্নজীবীও। একারণেই যৌথজীবন নির্বিরোধে নির্বিবাদে নিরুপদ্রবে নিরাপদে সামবায়িক ভিত্তিতে পারস্পরিক স্বার্থে সহযোগিতায় সহাবস্থানের অঙ্গীকারে যাপন করার জন্যে কিছু সর্বজনগ্রাহ্য ও সর্বজনমান্য নীতিনিয়ম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উদ্‌ভাবন ও চালু করতে হয়েছে। নতুন নতুন পরিস্থিতিতে নতুন কালে নতুন মানুষের সামাজিক-মানসিক-আচারিক প্রয়োজনে নতুন নতুন নীতিনিয়ম উচ্চারণ ও বিধেয় করেছেন যুগে যুগে, স্থানে স্থানে নবী-অবতার নামের শাস্ত্রীরা, ফকির, দরবেশ, মুনি, ঋষি, সন্ত, ভিক্ষু, শ্রমণ, শ্রাবক, জিন, সন্ন্যাসী, কবি, দার্শনিক, সমাজবেত্তা, মনন-মনীষা ঋদ্ধ লেখকরা। মানুষকে ভালোবাস, মানুষের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন কর, সহযোগিতায় সহাবস্থান কর—এভাবে নীতিকথার, আপ্তবাক্যের, চিরন্তন সত্যের লাখ লাখ ছড়া-শ্লোক-প্রবণ চালু হয়েছে, রয়েছে, হচ্ছে কালে কালে স্থানে স্থানে, ভাষায় ভাষায়। বলতে গেলে জগৎ এখন মহৎ কথায় আকীর্ণ। কিন্তু মানব জীবনের ও সমাজের ট্রাজেডী হচ্ছে এই যে মহৎকথা ভাষণে, শ্রুতিতে, স্মৃতিতে এবং পার্বণিক উল্লেখে থাকে নিবদ্ধ। কখনো কারো জীবনে সাধারণভাবে রূপায়িত বা বাস্তবায়িত হয় না। যদি কারো জীবনে ক্বচিৎ কদাচিত কোন একটি আপ্তবাক্য, মহৎ আদর্শ আচারে-আচরণে পরিব্যক্ত ও প্রকট হয়, তা হলে তিনি তখন আর অনুকরণযোগ্য মানুষ থাকেন না, হয়ে যান দেবকল্প মহাপুরুষ, যিনি হন অলীক ও অলৌকিক আসমানী শক্তিধর ও শক্তিপ্রতিম, প্রতীক ও প্রতিভূ-প্রতিনিধি। কৃপা-করুণা পাওয়ার জন্যে দেবতার অনুগত হওয়া ও থাকা চলে, দেবতার অনুকরণ-অনুসরণ অসম্ভব বুঝেই নিবৃত্ত থাকতে হয়। কাজেই মহৎকথার ও মহত্ত্বের পরম ও চরম চমক আছে বটে, কিন্তু তাৎক্ষণিকের জন্যে মন ধাঁধায়, মগজ চাঙা করে, হৃদয়ও করে অভিভূত মাত্র, বাস্তবে কাজে লাগে না। এই মানুষের মধ্যে আজো প্রত্যাশিত গুণের, মানের, মাপের ও মাত্রার মনুষ্যত্ব ক্বচিৎ কারো মধ্যে মেলে মাত্র। মানবিক গুণসম্পন্ন মানুষ যে-কোন অঞ্চলে ও যে-কোন সমাজে আজো দুর্লভতায় দুর্লক্ষ্য। এদিক দিয়ে মনুষ্যত্বের বিকাশ ও উৎকর্ষ কালের হিসেবে নিতান্ত মৃদু-মন্থর।

তাই এ পুরোনো পৃথিবীতে মানুষে মানুষে সম্পর্ক আজো বান্দা-মনিবের, প্রভু-ভৃত্যের, শোষক-শোষিতের, পীড়ক-পীড়িতের, শাসক-শাসিতের, জালিম-মজলুমের হন্তা-হতের। দাস-প্রভু যুগ অবসিত, শাহ-সামন্ত যুগও অপসৃত। এমন কি বুর্জোয়া-বৈশ্য যুগও কোথাও কোথাও আপাতত অপগত তবু মানুষের মধ্যে বাঞ্ছিত ও কেজো মাত্রায় মানবতার প্রকাশ ও বিকাশ ঘটল না। আজো সাংবিধানিক রাজতন্ত্রে, গণতন্ত্রে, নায়কতন্ত্রে কোথাও মানুষের খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার যে জন্মগত অধিকার এবং সমর্থকে কাছ দিয়ে, অসমর্থকে অন্ন দিয়ে পোষার প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব যে রাষ্ট্রের, তা স্বীকৃত নয়। এ জন্যেই সর্বত্র মানব সমাজের সমস্যা-সংকটমাত্রই আদিম, আদি ও অকৃত্রিম অবস্থায় ও অবস্থানে রয়ে গেছে।

নৈতিকতা ও শিক্ষা সম্বন্ধে ধারণা বদলাতে হবে

আমরা মানুষের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার চাই। মূল উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য হচ্ছে মানুষ যে প্রাণিজগতে মনে-মস্তিষ্কে-মননে-কৌশলে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ তা অনুভব ও উপলব্ধি করানো। যৌথজীবনে পারস্পরিক ব্যবহারে, সৌজন্যে, সহযোগিতায় সহস্বার্থে আবশ্যিক গুণাবলী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও আচার-আচরণ, নীতিনিয়ম-রীতিরেওয়াজ-প্রথাপদ্ধতির উপযোগ, গুরুত্ব ও আবশ্যিকতা জেনে বুঝে ব্যক্তিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনে বাস্তবায়ন এবং মননশীল চেতনায় রূপায়ণই হবে লক্ষ্য।

মানুষের গোড়া থেকেই ধারণা, শিক্ষা হচ্ছে মানুষ গড়ার কল বা যন্ত্র তথা পদ্ধতি। কিন্তু শেখার ও শেখানোর বিষয় সম্বন্ধে মানুষ কখনো এক মতের ও এক পথের ছিল না। কেউ জানত শেখার বিষয় হচ্ছে পরমের জ্ঞান তথা স্রষ্টার ও স্রষ্টার প্রতি মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্যজ্ঞান। ঈশ্বরের, আত্মার ও জগৎ-কারণ ও স্বরূপ জ্ঞান লাভই লক্ষ্য। কেউ জানত 'দীন-ই-এলম' কেবল শাস্ত্র জ্ঞানই যথার্থ ও একমাত্র সার জ্ঞান। জাগতিকজ্ঞানের অভিজ্ঞতার মূল্য-মর্যাদা কখনো স্বীকৃত ছিল না। কেননা, জীবন স্বল্পস্থায়ী। জাগতিক জীবন মানে জৈবিক-ক্ষুন্নিবৃত্তি ও কামচর্চা। এ সব প্রাকৃতিক, জৈবিক-প্রাণীসুলভ স্থূলবিষয় তাই আলোচ্যও নয়।

তারপরে একসময়ে সংস্কৃতি-সভ্যতার বিস্তারে শাহ-সামন্ত ধনী-বিলাসী ভোগে-উপভোগে-সম্ভোগে আসক্ত মানুষের মানসিক প্রয়োজনে স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা, আর বৈষয়িক প্রয়োজনে গণিত-পদার্থবিদ্যা-রসায়নবিদ্যা এবং রোগের প্রতিষেধক হিসেবে ভেষজবিদ্যা মানুষের অনুশীলনের জরুরী বিষয় হয়ে ওঠে।

বাস্তবে যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, আন্দাজে-অনুমানে-চিন্তনে-মননে আমরা আসমান ও আসমানী শক্তি— যেমন ভূত-প্রেত-পিশাচ-পরী-জীন-ভগবান-ঈশ্বর সম্বন্ধে অর্থাৎ নানান দৈব অপদৈব, নানা অরি ও বিভিন্ন মিত্র অদৃশ্য শক্তির ও শক্তিমান সচেতন শক্তির নিয়ন্ত্রণ আমাদের জীবনে অনুভব করি আমাদেরই অসহায়তার, অজ্ঞতার ও আত্মপ্রত্যয়ের, শক্তির, সাহসের ও জ্ঞানের এবং বুদ্ধির-যুক্তির অভাবে। সেগুলো তো জ্ঞানই নয়, বিস্ময়-কল্পনা-ভয়-ভক্তি-ভরসা প্রসূত বিশ্বাস-সংস্কার মাত্র। একালে যখন বিজ্ঞানীরা জল-স্থল-আকাশের তত্ত্ব, তথ্য, সত্য স্বরূপ নিত্য আবিষ্কারে আমাদের অজ্ঞতা ও পূর্বে কল্পিত ধারণা ভেঙে দিচ্ছে, তখন বিস্ময়-কল্পনা-ভয় ভক্তি-ভরসাজাত আন্দাজি-আনুমানিক বিশ্বাস-সংস্কারকে কি অতীতের মতো এখনো জ্ঞান বলা যাবে? একালের মানুষের কাছে যা সাক্ষ্য-প্রমাণে পরীক্ষণে, পর্যবেক্ষণে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করা সম্ভব, তা-ই জ্ঞান। এ তাৎপর্যে সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাসও নির্ভরযোগ্য নিঃসংশয় জ্ঞান নয়। কেননা, এগুলো ব্যক্তিক বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, এবং মন-মত-মননের, গুণের, মনের, মাপের ও মাত্রার স্তর অনুসারে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে মতে মন্তব্যে সিদ্ধান্তে বিভিন্ন হয়। আজ অবধি বিজ্ঞানীর আবিষ্কৃত-উদ্‌ভাবিত জ্ঞানই অসম্পূর্ণ তথা নিঃসংশয়পূর্ণ পূর্ণতা না পেলেও যতটুকু জ্ঞাত ততটুকু আপাত নির্ভরযোগ্য। কেননা, আমাদের ধারণা আমরা আজো অজ্ঞতার বা অজ্ঞানের মহাসমুদ্রে জ্ঞানের ভেলায় ভাসছি। আরো অনেক অনেক অনেক জানার আবিষ্কারের মহাসমুদ্র রয়ে গেছে, হিমালয়সদৃশ অজানা তত্ত্বের তথ্যের ও সত্যের বিরাট বিপুল স্তূপ।

কাজেই একালে শেখার ও শেখানোর বিষয় হচ্ছে বস্তুগত এবং বিভিন্ন বিষয়ক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রযোগে পরীক্ষণে, নিরীক্ষণে, পর্যবেক্ষণে, সমীক্ষণে প্রমাণ সম্ভব বা প্রমাণিত তত্ত্ব, তথ্য ও সত্যই প্রকৃত জ্ঞান। আর বিশ্বাস-সংস্কার জাত যা কিছু ধারণা কোথাও তা সর্বজনগ্রাহ্য নয়। তাই তা জ্ঞান নয় ধারণা মাত্র। আর শেখার বিষয় হচ্ছে পরমত সহিষ্ণুতায় সংযমে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৌজন্যে, জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-বিবেক চালিত হয়ে ইহজাগতিক জীবনে প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতায়ও তবু নির্বিরোধ সহযোগিতায় ও সহাবস্থানের অঙ্গীকারবদ্ধ সামাজিক, আর্থিক নৈতিক ও রাষ্ট্রিক জীবন যাপন করার মতো যোগ্যতা অর্জন।

একালে নৈতিক শিক্ষার উৎস কোন অবস্থাতেই শাস্ত্রিক হতে পারে না। কেননা, 'শাস্ত্র' একক নয়, স্থানে-কালে-সম্প্রদায়ে বহু ও বিবিধ এবং বিচিত্র আবার বৈপরীত্যেও বিরোধবহুল সংঘর্ষ-সংঘাতজনক। তাই একালে নৈতিকতার উৎস হবে আত্মসত্তার মূল্য ও মর্যাদা চেতনা, যুক্তিবাদ—Rationalism আর Positivism. তা হলেই কেবল মানুষ সমাজের নীতিনিয়মের রীতিরেওয়াজের, প্রথাপদ্ধতির উপযোগ ও তা মেনে চলার আবশ্যকতা ও গুরুত্ব জানবে, বুঝবে ও মানবে। এমনি নৈতিক চেতনাই অধিকাংশ মানুষকে বিবেকবান করবে। আর অধিকাংশ মানুষের মনোগত রুচিগত ও সংস্কৃতিগত নিষ্ক্রিয় বিরূপতার ও বিরোধিতার দরুন, দুষ্ট-দুর্জন-দুর্বৃত্ত-দুষ্কৃতীর প্রয়াস-প্রযত্ন সহজে সফল হবে না।

কাজেই শেখা-শেখানো, সাক্ষরতা-নিরক্ষরতা, জ্ঞান-বিদ্যা, নীতি, শাস্ত্র প্রভৃতি সম্বন্ধে আমাদের প্রচল ধারণা বর্জন করতে হবে। যন্ত্র, যন্ত্রী ও যন্ত্রনির্ভরতা আমাদের জীবনাচারে ও জীবিকাক্ষেত্রে, শাসন-প্রশাসন-রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে, ব্যবসা-বাণিজ্য-পণ্যক্ষেত্রে আমাদের সেকেলে মন-মত-লক্ষ্য-সিদ্ধান্ত বদলাতেই হবে। কাজেই শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের নতুন ধারণা গড়ে তুলতে হবে। গুরু-শিষ্য, উস্তাদ-সাগরেদ ধারণাও পরিহার করতে হবে। শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রূপেই স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রাচীন ভাববাদী চেতনামুক্ত হয়ে দেখতে, জানতে, বুঝতে ও মানতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই এ বাস্তববোধ, বাস্তব ও ইহজাগতিক চেতনাজাত শিক্ষালয়ের ধারণা পাওয়া যায় এ মুহূর্তেও। যেমন আই-বি-এ, আই-ই-আর, আই-এম-এল, এমনকি বাণিজ্য বিভাগগুলোতেও রাজনীতি কিংবা পূর্বতন গুরু-শিষ্য, উস্তাদ-সাগরেদ এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য পুরোনো ভাববাদিতা নেই। কারণ এরা জীবিকার্জনের যোগ্য হবার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে আসে। সাহিত্য-শিল্প-দর্শন-ইতিহাস-সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি ভাববাদী বিদ্যা অর্জনে আনন্দ পেতে এবং অনুভব-উপলব্ধির জগৎ প্রসৃত করতে আসে না। তেমনি বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগেও বাস্তব জ্ঞান অর্জনে অর্থোপার্জনের যোগ্যতা অর্জন করতে আসে বলে, কিংবা মেডিক্যাল কলেজে ও ইঞ্জিনিয়ারিং ও কৃষিকলেজে ছাত্রসংখ্যা কম ছিল বলে, চাকরী প্রাপ্তি সুনিশ্চিত ছিল বলে, সেখানেও রাজনীতিক আন্দোলন একসময়ে দানা বেঁধে উঠতে পারত না।

অতএব, বাস্তব সংকট-সমস্যা-প্রয়োজন, চাহিদা-সরবরাহ প্রভৃতিও ইহজাগতিক জীবন-জীবিকা প্রসূত বলে শিক্ষাকে আসমানী ধারণা নিরপেক্ষ করে ঐহিক, ইহজাগতিক এবং রূঢ় জীবিকা সম্পৃক্ত করলেই এবং আদর্শ বা নীতি হিসেবে বিজ্ঞানের সত্য এবং সামাজিক সৌজন্যে সহাবস্থানের নীতি বরণ করলেই শিক্ষাঙ্গনের ও শিক্ষাক্ষেত্রের সমস্যা-সংকট বিদূরণ বিমোচন সম্ভব হতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উন্নয়নের জন্যে মানসমুক্তি আবশ্যিক

মানুষ অবচেতনভাবেই সর্বপ্রকার বন্ধনমুক্তি কাঙ্ক্ষা করে। কিন্তু নিষ্ক্রিয় বলেই সে সারাজীবন প্রবৃত্তির ও আশৈশবপ্রাপ্ত মনে লাগা, মর্মে লাগা ও গায়ে লাগা বিশ্বাস-সংস্কারের, আচার-আচরণের, নীতি-নিয়মের রীতি-রেওয়াজের ও প্রথা-পদ্ধতির নিগড়মুক্ত হতে পারে না। তাই সে অর্জিত জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-প্রজ্ঞা জীবনযাত্রায় মানসিক কিংবা ব্যবহারিকভাবে কাজে লাগাতে পারে না। এ বন্ধনমুক্তি সম্ভব হয় না বলেই বিভিন্ন শাস্ত্রিক, আঞ্চলিক, ভাষিক, গৌত্রিক কণ্টকাকীর্ণ অয়োময় খাঁচাবদ্ধ মানুষ বিভিন্ন দলের মানুষ থেকে বিচ্ছিন্নতার ও বিরোধের ব্যবধানে বাস করছে দুনিয়াব্যাপী। এ জন্যেই আজো মানুষে মানুষে মন-মত-মনন-মনীষার ঐক্যে কোন মিলন-ময়দান তৈরি হয়নি। কেবল বিবাদের-সংঘর্ষের-সংঘাতের সম্পর্কই মাঝে মধ্যে বহুসাধনালব্ধ সম্প্রীতির, সহযোগিতার ও সহাবস্থানের সংকল্প ও অঙ্গীকার বৈনাশিক ধাক্কায় বিলুপ্ত করে দেয়।

স্বাতন্ত্র্যবোধজাত এ বিচ্ছিন্নতাপ্রীতি আসলে আবাল্যের মগজধোলাইয়ে প্রাপ্ত বিশ্বাস-সংস্কারমাত্র। এ বিশ্বাস-সংস্কারপুষ্ট ও চালিত মানুষের মগজে জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেক-বিবেচনা প্রবেশপথ পায় না। কেননা এসব শক্তি কখনো বুদ্ধিবৃত্তিকে ও যুক্তিকে জীবনযাত্রার পুঁজি ও পাথেয়রূপে পাবার আকাঙ্ক্ষাও মনের কোণে পোষণ করে না, এর উপযোগ-চেতনারিক্ত বলেই। নিজের মানস নিগড়ের ও মুগ্ধতার ধারণাই এমন মানুষে অনুপস্থিত থাকে। তাই নির্মোহ হবার বাঞ্ছাজাত অনুশীলনে আগ্রহ জাগে না এ মানুষে কখনো।

এরূপ মানুষ জানে না যে তারা যে-সত্য, তত্ত্ব ও তথ্য আঁকড়ে থেকে নিশ্চিন্ত জীবন যাপনে নিজেদের ধন্য মনে করছে, তা আসলে বিশ্বাসের চোরাবালিমাত্র। ওসব সত্য-তথ্য-তত্ত্ব বা জ্ঞান নয়—কল্পনায়-আন্দাজে-অনুমানে গড়া ও গ্রাহ্য খেয়ালি জগৎ মাত্র, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যজগৎ ও ইন্দ্রিয়লব্ধ অনুভব-উপলব্ধি তার অস্তিত্ব খুঁজে পায় না। ফলে কোন দুটো শাস্ত্রিক-দার্শনিক তত্ত্বেও ভিন্ন কালের কিংবা ভিন্ন পরিবেশের সংস্কারপুষ্ট হলে ঐকমত্যের সন্ধান মেলে না, বরং তাদের মতে-মননে বিশ্বাসে-সংস্কারে থাকে আসমান-জমিনের ফারাক। তাই মানবেন্দ্রনাথ রায় বলেন : শাস্ত্র হচ্ছে : a body of superstitions, prejudices, social customs and irrational modes of living [Fragments of prisoners diary (i) p.29].

আমরা শাস্ত্রমানা আস্তিক মানুষ বলেই আমরা ব্যবহারিক জীবনে একই রোদ-বৃষ্টি-শৈত্যের আর্তবপ্রভাবক্লিষ্ট বা পুষ্ট হওয়া সত্ত্বেও, একই মাঠ-হাট-ঘাট-বাটে জীবিকা সন্ধানী হওয়া সত্ত্বেও আমরা মানসবিচ্ছিন্নতায় দলীয়ভাবে তথা শাস্ত্রিক-ভাষিক-সামাজিকভাবে অনাত্মীয়তার অপরিচয়ের অচেতনার অনাকর্ষণের অনৈক্যমত্যের সুদূরস্থানের খণ্ড ক্ষুদ্র দ্বীপে বাস করি। একারণেই আমাদের ভাষা বাহ্যত অভিন্ন হলেও, অন্তরে মন-মত-মনন রুচি— লক্ষ্য ক্ষেত্রে ভিন্ন, এমন ভিন্ন যে মাঝখানে চিন্তা-চেতনার দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর থাকে খাড়া। এ জন্যেই বিভিন্ন শাস্ত্রিক বর্গের মানুষের রচনায় ইহজাগতিক ও পারলৌকিক প্রেয়স্ ও শ্রেয়স্ চেতনা স্বরূপে অভিন্ন রঙের রসের হয়ই না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মন-মনন হচ্ছে মানবজীবনে steering wheel-এ জন্যেই মানসরুচি, লক্ষ্য ও বিরাগ কিংবা অনুরাগ, আসক্তি কিংবা বিরক্তিই মানুষের পরিব্যক্ত ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের নিয়ন্ত্রক-নিয়ামক। এই শাস্ত্রিক, গৌত্রিক, গোষ্ঠীক, ভাষিক, ভৌগোলিক স্বাতন্ত্র্যচেতনা ও বিচ্ছিন্নতাবোধ থেকেই বৈষয়িক জীবনেও দলগত কাড়া-মারা-হানার উদ্‌ভব সেই প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই। মুসার জ্ঞাতির অধিজন হয়ে উঠবে আশঙ্কায় ফেরাউন মুসাকে মিশর থেকে সগোষ্ঠী পলায়নে বাধ্য করেছিলেন। বিগত দু'হাজার বছর ধরে ইহুদীরা কেবল উনজন বলেই পশ্চিম এশিয়ার ও য়ুরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে লাঞ্ছিত, অর্থসম্পদে বঞ্চিত ও বিতাড়িত হয়ে হয়ে কেবলই যাযাবরের মতো ছুটোছুটি করতে বাধ্য হয়েছে, আজো হচ্ছে। অধিজন-উনজনের দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-সংঘাতের বৃত্তান্ত বা ইতিবৃত্ত পৃথিবীর সর্বত্রই সুপ্রাচীন। করুণ, নিষ্ঠুর ও ট্রাজিক সে বৃত্তান্ত। মানবতার লাঞ্ছনারই বীভৎস কাহিনী তা। মানুষ জল-স্থল-নভোচারী, সমুদ্র-পর্বত ও আকাশের মালিক, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে ঋদ্ধ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সীমানা সন্ধানে ব্রতী। তবু এ হীনতা, ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণতা ও দ্বেষ-দ্বন্দ্ব থেকে সে মুক্ত হতে পারল না। লাভ-লিপ্সা বসেই সে আজো রাজনীতিক্ষেত্রে নয় কেবল, ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থসম্পদ, শাস্ত্র-সংস্কৃতি গৌরব-গর্ব, স্বাতন্ত্র্য-বিচ্ছিন্নতা ঐতিহ্য বা পরম্পরা প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রেই তার দ্বেষণা-রেষারেষি-বিবাদ-বিরোধ প্রভৃতির মীমাংসা বা অবসান ঘটাতে রাজি নয়। ফায়দা ওঠানোর মতলবে সে প্রলুব্ধ ও প্ররোচিত। আমাদের উপমহাদেশের ইতিহাসও অধিজন-উনজনের দ্বেষণার ইতিবৃত্ত মাত্র। উনজন চিরকালই বঞ্চিত-লাঞ্ছিত, দলিত-শোষিত হয়েই থাকে। উনজনের দুর্দশা-দুর্ভোগ আজো কোথাও কোন দেশেই ঘোচেনি, মানুষ নাস্তিক না হলে, সমাজবাদী না হলে, নিদেনপক্ষে সেক্যুলার না হলে, চাকরির ক্ষেত্রে, ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, জীবিকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে এবং সর্বোপরি রাজনীতি ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে অধিজনেরা উনজনকে বঞ্চিত-দলিত-শোষিত-লাঞ্ছিত রাখবেই আর উনজনেরা প্রতিকার-প্রতিবাদ প্রতিরোধশক্তির অভাবে মার খাবেই জীবনযাত্রার সর্বক্ষেত্রে অর্থ-সম্পদে নয় কেবল, মানে ও মানসিক লাঞ্ছনায়ও। মানুষ জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি চালিত তথা যুক্তবাদী ও প্রত্যক্ষবাদী না হলে মানবতার বাঞ্ছিত ও প্রত্যাশিত বিকাশ-বিস্তার হবেই না কখনো। বলা বাহুল্য, নির্মোহ কল্যাণ দৃষ্টিতে জীবনকে জগৎকে প্রত্যক্ষ করতে না জানলে ও না পারলে পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে, সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে মানবতার-মানবচেতনার উন্মেষ, বিকাশ ও বিস্তার ঘটানো সম্ভব হয় না– হবে না। অথচ প্রতিটি মানুষের বাঁচার জন্মগত অধিকার স্বীকৃতির জন্যে মানবতার-সংবেদনশীলতার অনুশীলন আবশ্যিক ও জরুরী। বঙ্কিমচন্দ্র শত বছর আগেই বলেছেন আমাদের ভাষায়, কিন্তু কেউ তখন শোনেনি, এখনো শুনতো চায় না "পাঁচশত দরিদ্রকে বঞ্চিত করিয়া একজনে পাঁচশত লোকের আহার্য সংগ্রহ করিবে কেন? অতিরিক্ত অংশ তাহা দরিদ্রকে দিবে না কেন? যদি না দেয় তবে দরিদ্র অবশ্য তাহার নিকট হইতে চুরি করিবে, কেননা অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্য এ পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই।" [বিড়াল]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্বাসের নয়, একাল যুক্তিবাদিতার

প্রাচীন ও মধ্যযুগ ছিল অজ্ঞ-অসহায় মানুষের বিস্ময়-কল্পনা-ভয়-ভক্তি-ভরসা প্রসূত নির্বিচার বিশ্বাস-সংস্কারের কাল। জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-বিবেক-বিবেচনা শক্তির স্বল্পতা হেতু অচেনা আসমান-জমিনের প্রতিবেশে অসহায় অসমর্থ অজ্ঞ ভীরু মানুষ প্রাণে বাঁচার ও জীবিকার তথা খাদ্য সংগ্রহের গরজে নানা অরি-মিত্র প্রাকৃতশক্তির অদৃশ্য স্থিতি ও প্রভাব কল্পনা করেছে। চাওয়া-পাওয়ার মধ্যকার অদৃশ্য বাধা-ব্যবধান এবং আকস্মিক ব্যর্থতা ও অকারণ সাফল্য তাকে করেছে দৈব তথা অদৃশ্য অরি-মিত্র শক্তিতে দৃঢ় আস্থাবান ও একান্তভাবে নির্ভরশীল। ফলে তার মনে ছিল যাদুশক্তির সত্যতায়, কার্যকারিতায় ও অনুশীলন সম্ভাব্যতায় পরিপূর্ণ আস্থা। এভাবেই সে হয় তুক-তাকে, ঝাড়-ফুঁকে, বাণ-উচ্চাটনে, তাবিজে-কবচে, মন্ত্রে-মাদুলীতে, পানিপড়ায়, ধূলিপড়ায়, তাগাপড়ায় আর পাথরে ও যাদুশক্তিতে আস্থা রেখে হয় আত্মরক্ষায় ও আত্মপ্রসারে আত্মপ্রত্যয়ী ও আসমান-জমিনের মধ্যকার মর্ত্যজীবন সর্বার্থক ও সর্বাত্মকভাবে নিয়ন্ত্রিত হত এবং এখনো হয় এ অদৃশ্যশক্তিসমূহের নিয়ন্ত্রণে ও নির্ভরতায়। আর প্রাচীন ও মধ্যযুগের প্রায় সব লোকের [ব্যতিক্রম বিরলতায় দুর্লক্ষ্য] জীবন ছিল বিশ্বাস-সংস্কার চালিত। এবং এযুগেরও সাক্ষর-নিরক্ষর ও জ্ঞান-যুক্তিবিমুখ শক্তিমান-বুদ্ধিমানদের অধিকাংশের মানসিক জীবন চালিত হয় ওই অমূলক বিশ্বাস-সংস্কারেই। এ হচ্ছে অনুশীলনবিমুখ অজিজ্ঞাসু মানুষের অশৈশবের মগজ ধোলাইয়ের ফল ও ফসল। এদের মধ্যে জীবনচেতনার কিংবা জগৎভাবনার নতুন অনুশীলনের প্রয়াস প্রযত্ন নেই বলে এদের লব্ধ জ্ঞান, শ্রুত যুক্তি, অর্জিত বুদ্ধি এদের মন-মনন-আবেগ প্রভাবিত করে না। এ জন্যে এরা, কেবল শাস্ত্রের ক্ষেত্রে নয়, মনুষ্যত্বের বিকাশক্ষেত্রেও মধ্যযুগ অতিক্রম করে না, সংকীর্ণ চেতনা-পরিসরে স্বাতন্ত্র্যপ্রীতি নিয়ে প্রাণীর আহার-নিদ্রামৈথুন সর্বস্বজীবন মুখ্যত যাপন করে। অনুশীলন-প্রসূত প্রসৃত অনুভব-উপলব্ধির বৈশ্বিক জীবন তার বোধগত কিংবা মনন-মনীষার আয়ত্তগত হয় না কখনো। তার হচ্ছে মাটিলগ্ন অবাস্তব অলীক অলৌকিক জীবনবিলাস। মানে মাপে মাত্রায় মানবিক শক্তির বিকাশে তার কোন আগ্রহই থাকে না তার অদৃশ্য দৈব্যশক্তি চালিত ভৌতিক জীবনে। যৌক্তিক-বৌদ্ধিক জীবনের মতবাদ ও আনন্দ থেকে সে চিরবঞ্চিতই থাকে। ফলে তার মানসজীবনে কোন সমকালীনতা থাকে না। সে শাস্ত্রমানা প্রাণীরূপে অজ্ঞতার প্রাচীন কিংবা মূর্খতার আদিম যুগেই বাস করে একালের লোক হয়েও, বিদ্বান হয়েও।

আর একাল হচ্ছে আবিষ্কার-উদ্‌ভাবনের বহুলতায় ও বৈচিত্র্যে জ্ঞানের, বুদ্ধির, যুক্তির, যন্ত্রের, কৌশলের, প্রকৌশলের ও প্রযুক্তির। এ কাল ও এ জগৎ বিশ্বমানবের মিলনের, মিশ্রণের, সহযোগিতার, সামবায়িক ভিত্তিতে সহাবস্থানের। এ কাল ও এ জগৎ হচ্ছে বৈশ্বিক চেতনায়, চিন্তায় এবং অস্ত্রে-শস্ত্রে, সেনা-সাম্রীতে, খাদ্যে, পোশাকে, আদবকায়দায়, জীবনাচারে, আসবাবে-তৈজসে চিকিৎসায়— শাসন-প্রশাসন ব্যবস্থায়, অভিন্ন আচারের, আচরণের, রুচির ও সংস্কৃতির ধারক, বাহক ও প্রচারক হওয়ার আর বিচ্ছিন্নতা, ক্ষুদ্রতা, খণ্ডতা, স্বাতন্ত্র্য পরিহারের কাল ও জগৎ। এ কালের মানুষের জীবনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুঁজি-পাথেয় হবে জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-বিবেক-বিবেচনা। জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি নির্ভর যৌক্তিক-বৌদ্ধিক ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ মানুষকে প্রতারিত করে না, ভুল হলেও প্রবোধ মেলে। একালের ও এজগতের বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক চেতনাঋদ্ধ মানুষ মাত্রেরই হতে হবে যুক্তিবাদী ও মানববাদী। প্রাচীন ও মধ্যযুগে কৃচিৎ কোন মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্বের উন্মেষ-বিকাশ-প্রসার দেখা গেলেও, গৌষ্ঠীক, গৌত্রিক, দৈশিক, ভাষিক, বার্ণিক, শাস্ত্রিক, দলীয় বা যৌথজীবনে মানবিক গুণ ও আচার তাৎপর্যহীন উপযোগরিক্ত গতানুগতিকতায় ছিল বন্ধ্যা ও অবক্ষয়দুষ্ট।

বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক চেতনাঋদ্ধ যুক্তিবাদী মানববাদী মানুষ ওই জাগতিক বৌদ্ধিক-যৌক্তিক-আচার ও আচরণ অঙ্গীকার করলে মানুষের সামষ্টিক, সামূহিক ও সামগ্রিক সামাজিক-রাষ্ট্রিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে সম ও সহস্বার্থেই সংযম, সহিষ্ণুতা ও সৌজন্য হবে নির্বিরোধে নির্বিবাদে নিরুপদ্রবে নিরাপদে সামবায়িক সহযোগিতায় সহাবস্থান করার ভিত্তি ও অবলম্বন, পুঁজি ও পাথেয় এ সুগম ও সংহত সরাবৎ পৃথিবীতে। বিচ্ছিন্নতায় ও স্বাতন্ত্র্যে স্বাবলম্বী হয়ে বাঁচার দিন যন্ত্রনিয়ন্ত্রিত যুগে, জীবনে ও জগতে অসম্ভব। এ তত্ত্ব-তথ্য ও সত্যটি উপলব্ধি করার সময় এসে গেছে। আত্মকল্যাণেই, বাঁচার গরজেই আমাদের এ সত্যটি জানা, বোঝা ও মানা আবশ্যিক ও জরুরী।

AMARBOI.COM

মনুষ্যজীবনের সাধারণ রূপ

প্রাণীপ্রজাতি হিসাবে মনুষ্যের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের একটি সাধারণ রূপ রয়েছে। প্রবৃত্তিচালিত অন্যপ্রাণীর আচরণের মতো এ-ও মানবসমাজে যেন সর্বজনীন ও চিরন্তন। মানুষ লাভে লোভে স্বার্থে কাড়ে-মারে-হানে আর সুযোগ-সুবিধে পেলেই পীড়নে-লুণ্ঠনে-শোষণে-প্রতারণায় উৎসাহী হয়। মানুষ মুখ্যত হিংস্র, নিষ্ঠুর ও শক্তিমত্ত। আবার কামে-প্রেমে-স্নেহে-মমতায় নরম, উদার, সংযত, সহিষ্ণু ও সৃজন হয়। মনুষ্যস্বভাবে বীজরূপে সুপ্ত ও গুপ্ত থাকে প্রভুত্বের, আনুগত্যের প্রশংসার ও ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগের দাবি। দেহে-মনে-ধনে-জনে-বয়সে কিংবা গুণে-মানে অথবা অবস্থায় ও অবস্থানে কাউকে দুর্বল পেলেই প্রবলমাত্রই স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা প্রমত্ত হয়ে তার উপর হুকুম-হুমকি-হুঙ্কার-হামলা চালানোর জন্যে অপ্রতিরোধ্য আন্তরপ্ররোচনা পায়। ঘরে-সংসারে-সমাজে-রাষ্ট্রে অবস্থা ও অবস্থানগত শ্রেণী গড়ে ওঠে এভাবেই। এ চেতনা বা প্রত্যয় সবার অনুভবে-উপলব্ধিতে উপস্থিত থাকে না। কেননা এর জন্যে মনের-মননের, চিন্তার-চেতনার, যুক্তি-বুদ্ধির বাস্তব অবস্থা ও অবস্থান সঞ্জাত বিকাশ-বিস্তার প্রয়োজন। তাই আদিকালে শ্রেণী শাসন-শোষণ-পীড়ন-বঞ্চনা তীব্র-তীক্ষ্ণভাবে কখনো অনুভব-উপলব্ধি করেনি। মনে করেছে এ স্রষ্টার, দৃশ্য-অদৃশ্য-অরি-মিত্র শক্তির কিংবা নিয়তি নামের জীবন নিয়ন্ত্রক শক্তির খেয়ালী লীলা। তাই আজো গণধারণায় দুনিয়ায় মনুষ্যজন্ম হয়, হয়েছে, হচ্ছে—বিপরীতধর্মী দুই কাজে: প্রভু হবার জন্যে ও প্রভুমানার জন্যে, ঘাড়ে চড়বার জন্যে, ও ঘাড়ে চড়াবার জন্যে, সুখ পাবার জন্যে ও সুখ দেবার জন্যে, দুঃখ পাবার জন্যে ও দুঃখ দেবার জন্যে। এমনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারণে ও ধারায় গড়ে উঠেছে মানব সমাজ। তাই সম্পর্ক হচ্ছে প্রভু-ভৃত্যের, বান্দা-মনিবের, শাসক-শাসিতের, শোষক-শোষিতের, বঞ্চক-বঞ্চিতের। আবার কামের-প্রেমের, ভোক্তার-ভুক্তের, খাদ্যের খাদকের, বিজয়ীর-বিজিতের, নিন্দিতের-প্রশংসিতের, স্তুত-স্তাবকের, চাটুকৃত-চাটুকারের, ভক্তের-ভক্তিভাজনের। কেউ কেউ বেহায়া, বেশরম, বেআক্কেল, বেলেহাজ, বেল্লিক। কেউ কেউ পরার্থে সেবায়, হৃদয়বানতায়, ত্যাগে, তিতিক্ষায়, উপচিকীর্ষায় মহান। এ জন্যেই দুনিয়ায় ক্বচিৎ-কখনো দুঃখের স্পর্শ পাওয়া সুখী মানুষ, সুখের সামান্য স্বাদ পাওয়া দুঃখী মানুষ, অভাবের ধারঘেঁষা ধনী মানুষ, যন্ত্রণার ঘা-পাওয়া স্বাস্থ্যবান মানুষ, স্বস্তির সামান্য স্বাদ পাওয়া উপদ্রুত মানুষ, ক্বচিৎ লাঞ্ছিত মানী মানুষ দুনিয়ায় চিরসুলভ। দুঃখের আগুনে পোড় খাওয়া মানুষের সংখ্যাই এ বৈষম্যের সমাজে-রাষ্ট্রে অধিক। তেমনি সুখের সাগরে নিরাপদ-নিশ্চিত জীবনই বা কয়জনে ভোগ করে। আবার চিরমান্য ও প্রশংসিত মানুষ নিন্দিত-পদচ্যুত-লাঞ্ছিত হতে, রাজা ও পথে দাঁড়াতে, নিঃস্ব ও ধনী হতে, নিরন্ন ও সম্পদশালী হতে, স্বাস্থ্যবান ও রুগ্ন হতে, সচল মানুষ ও অচল পঙ্গু হতে, শোষকও শোষিত হতে, পীড়ক ও পীড়িত হতে দেখা যায়। তবে এর মধ্যে স্পষ্টত কোন অভিন্ন কারণ-কার্য আবিষ্কার করা চলে না। এর মধ্যে কোন নিয়মের রাজত্ব নেই। জীবন সাধারণত আবর্তিতই হয়। পরিবর্তিত-বিবর্তিত জীবন বিরলতায় দুর্লভ ও দুর্লক্ষ্য। কারো জীবনে ক্বান্না-দুশ্চিন্তা বেশি, কারো জীবনে হাসির ভাগ বেশি। এ জন্যেই সাধারণভাবে বলা যায় মানুষ জন্মে, লাভে লোভে স্বার্থে চালিত হয়, কাম-প্রেম-স্নেহ-মমতা-শ্রদ্ধা-ভক্তির প্রভাবও সাময়িকভাবে ব্যক্তিসম্পর্কে স্বীকার করা হয়। পঞ্চইন্দ্রিয়েরও হয় বশ। আবার জেদ-আদর্শ-অঙ্গীকার-আত্মসত্তার মূল্য মর্যাদা রক্ষার কারণ বশে জান-মালের ক্ষতি স্বীকার করেও থাকে উন্নতশির মানুষ আমৃত্যু।

AMARBOI.COM

বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা ও জ্ঞান

বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা হচ্ছে প্রমাণাতীত। তাই তা ভৌগোলিক, গৌত্রিক, গৌষ্ঠীক, ভাষিক, বার্ণিক ও যান্ত্রিক ভিন্নতায় বিভিন্ন। বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা বিশেষ পারিবারিক, গৌত্রিক, শাস্ত্রিক, সামাজিক প্রভাবে শৈশবকাল থেকেই গড়ে ওঠে। এবং তা প্রমাণাতীত বলেই তথা প্রমাণ নিরপেক্ষ বলেই মনের, মননের, জ্ঞানের ও যুক্তির জোর না থাকলে ভীরু মানুষের পক্ষে গায়ের জোরে জলে-স্থলে-নভো প্রসৃত ওই অদৃশ্য শক্তির প্রভাব-প্রতিপত্তি-নিয়ন্ত্রণ অস্বীকার করা সম্ভব হয় না কখনো। আজ মানুষ জলযানে স্থলযানে নভোযানে পূর্বে অগম্য অরণ্যে পর্বতে সমুদ্রে আকাশে বিচরণ করছে। এসব অগম্য স্থান নিয়ে যেসব কাল্পনিক শক্তির অলৌকিক লৌকিক ও অলীক কিস্‌সা-কাহিনী তৈরি হয়েছিল, সেগুলো মানুষের মন থেকে নিঃশেষে মুছে যাওয়াই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু যৌক্তিক-বৌদ্ধিক বিচার-বিবেচনা বিমুখ মানুষ আজো তা মনে-মস্তিষ্কে ধরে রেখেছে পরম আস্থায়-ভয়ে-ভক্তিতে ও ভরসায় অথচ নির্মোহ চেতনায় সহজেই অনুভব-উপলব্ধি করা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সহজ ও স্বাভাবিক যে বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা জ্ঞান নয়, ভয়-বিস্ময়-ভরসা প্রসূত কাল্পনিক অলীক শক্তির উপর আস্থাজাত অদৃশ্য ও অলৌকিক অস্তিত্বমাত্র। বাস্তবে তার কোন ভিত্তি নেই। এ জন্যেই আমরা সহজেই দেখতে পাই যে একদলের, গোত্রের, গোষ্ঠীর, সম্প্রদায়ের, জাতির দেশাচারে, লোকাচারে শাস্ত্রিক বিশ্বাসে সংস্কারে ধারণায় ও আচারে আচরণে অন্য দলের, গোত্রের, সম্প্রদায়ের, শাস্ত্রিক সমাজের বিন্দুমাত্র আস্থা-শ্রদ্ধা নেই, বরং মনে মনে অবজ্ঞা ও উপহাসই পোষণ করে অবিশ্বাসীরা। অতএব, একের বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা হচ্ছে অপরের কাছে নিতান্ত বানানো হাস্যকর তরল মিথ্যামাত্র। এ জন্যেই অমুসলিম নির্ভয়ে মসজিদ ভাঙতে ও কেতাব পোড়াতে পারে, অহিন্দু পারে মন্দির ভাঙতে ও গীতা-চণ্ডী-বেদ পোড়াতে। তেমনি অখ্রীস্টান ও অইহুদীরা নির্দ্বিধায় খ্রীস্টানের ইহুদীর বাইবেলকে মিথ্যা বলে জানে, গির্জা-সিনাগোগ পারে ভাঙতে।

কিন্তু জ্ঞানের ক্ষেত্রে এমন বিচিত্র ধারণা পোষণ সম্ভব নয়। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার উদ্‌ভাবনের ক্ষেত্রে মানুষের জ্ঞান অভিন্ন ও অবিতর্কিত। কেবল অজ্ঞেয় ও দুর্জ্ঞেয় বিষয়েই অনুমানে ও মতে পার্থক্য থাকে। পরীক্ষণ, নিরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ অন্তে যে তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য মেলে তা-ই জ্ঞান, কেননা তা হয়ে ওঠে প্রত্যক্ষ ও প্রমাণিত এবং যুক্তি-বুদ্ধিগ্রাহ্যও। অতএব জ্ঞানমাত্রই বস্তুগত আর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পৃক্ত। কোন জ্ঞানই এখন আর বিতর্কিত থাকে না, সন্দেহের স্থলে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মীমাংসা সংশোধন সম্ভব। এতকাল আমরা বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণাকেও 'জ্ঞান' নামে অভিহিত করেছি, এখনো করি। এ ভুল বিশ্বমানবের কল্যাণেই পরিহার আবশ্যিক ও জরুরী।

এ সূত্রে এ-ও উল্লেখ্য যে সাহিত্য আর দর্শনও ব্যক্তিক স্তরের মন-মনন-মনীষার গুণ-মান-মাপ-মাত্রা অনুপ অনুভব-উপলব্ধির, যুক্তি-বুদ্ধির অভিব্যক্তি মাত্র। আমাদের স্বীকৃত সংজ্ঞানুসারে দার্শনিক তত্ত্ব, তথ্য-সত্যও ব্যক্তির অনুভব-উপলব্ধি ও ব্যক্তিক যুক্তি-বুদ্ধি-জ্ঞান-অভিজ্ঞতার প্রসূন মাত্র। সাহিত্যে দর্শনেও জ্ঞান নেই। তবে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার প্রগাঢ় প্রভাব আছে। তাই বলে জ্ঞান ও ধারণা সাহিত্য ও দর্শন ক্ষেত্রে অভিন্ন নয়। যদিও বস্তুগত জ্ঞান ও বাস্তবের অভিজ্ঞতা দর্শনের ও সাহিত্যের উপাদান-উপকরণ। সাহিত্য-দর্শন সবটাই জীবনের প্রয়োজনে জীবন থেকে উৎসারিত। তাৎপর্যে সাহিত্যের ও দর্শনেরই বিষয় হচ্ছে জীবন। জীবনই সাহিত্যে-দর্শনে আলোচ্য ও অনুশীলনযোগ্য বিষয়, জীবনের স্বরূপ উদ্‌ভাসনের জন্যেই আনুষঙ্গিক ভাবে জীবন ও জগৎ সম্পৃক্ত জল-স্থল-আকাশের কথা আসে। জ্ঞান-অভিজ্ঞতা ভিত্তি করেই সাহিত্যের দর্শনের সৃষ্টি বটে, কিন্তু সে-সৃষ্টি আর আদি-অকৃত্রিম জ্ঞান থাকে না। যেমন দুধ থেকেই ঘি হয়। কিন্তু ঘি-কে যেমন পুনরায় দুধে পরিণত করা চলে না, তেমনি সাহিত্যকে-দর্শনকেও 'জ্ঞান' বলা যাবে না। সাহিত্যে অভিব্যক্ত সিদ্ধান্ত কিংবা দর্শনে পরিব্যক্ত তাত্ত্বিক মীমাংসা মানসপ্রবণতা অনুসারে কেউ মানবে, কেউবা অবজ্ঞায় প্রত্যাখ্যান করবে ভুল বলে। উল্লেখ যে শাস্ত্রের অনুশাসনে সমাজে-রাষ্ট্রে কাকেও স্বাধিকারে স্বস্থ রাখতে পারেনি কোথাও কখনো। রাজার শাস্তির ভয় ও সমাজের নিন্দা মানুষকে সংযত রাখে। প্যাগান যুগের ভূত-প্রেত-ভগবান মানুষকে তাদের নিয়ন্ত্রণে ধরে রাখতে পারেনি। বিশ শতকের এই প্রান্তিক দশকে ১৯৯৩ সনেও কোন শাস্ত্রই পৃথিবীর কোথাও কোন ব্যক্তিকে বা সমাজকে কিংবা রাষ্ট্রকে নীতি-নিয়মের শাসনে রাখতে পারছে না। আগেই কখনো পারেনি। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার-উদ্‌ভাবন ঋদ্ধ যুক্তি-বুদ্ধি-জ্ঞাননিষ্ঠ মানুষের যৌক্তিক-বৌদ্ধিক জিজ্ঞাসার তোড়ে ছিন্ন-ভিন্ন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ে যাচ্ছে, উপেক্ষিত হচ্ছে সব নীতি-নিয়মের, ভয়-ভক্তি-ভরসার ও আস্থার বাঁধন। তাছাড়া জীব ও উদ্‌ভিদ, জগৎ ও জীবন, প্রকৃতি ও মানুষ, সৃষ্টি ও স্রষ্টা, আকাশ ও ভূমণ্ডল, চন্দ্র-সূর্য-তারা, অরণ্য-পর্বত-সমুদ্র সম্বন্ধে শাস্ত্রগ্রন্থগুলোতে যা যা বলা হয়েছে, সেগুলো বিজ্ঞানীর আবিষ্কৃত-উদ্‌ভাবিত তত্ত্বের, তথ্যের ও সত্যের সঙ্গে কৃচিৎ কাকতালীয় যুক্তিতে মেলে মাত্র। মৌলিক পার্থক্য এত বেশি যে বিজ্ঞানীর আবিষ্কৃত তথ্য সত্য হলে শাস্ত্রমাত্রই অলীক কাল্পনিক কিস্‌সামাত্র হয়ে যায়। শিগগিরই নতুন মানুষের নতুন জীবন শুরু হচ্ছে নতুন শতকে। এখনই সময় জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-বিজ্ঞানলব্ধ তথ্য ও সত্য খোলা মনে গ্রহণ বরণ করে নেয়ার। জগতের জ্ঞানী-গুণী মনীষী মানবহিতৈষীদের মত, মন্তব্য ও সিদ্ধান্ত ধীর বুদ্ধি ও স্থিরবিবেচনাযোগে পরিব্যক্ত করার সময়ও এখনি। মানুষের কি করা উচিত? মানুষ কি অলীকে, অদৃশ্যে, অলৌকিকে বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণায় গতানুগতিক দৃঢ় আস্থা রেখে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রিত এ যন্ত্রযুগে ও যন্ত্রজগতে নিয়তি চালিত হয়ে কাড়াকাড়ি, মারামারি-হানাহানি করে উচ্ছৃঙ্খল সামাজিক রাষ্ট্রিক আন্তর্জাতিক জীবন যাপন করবে কিংবা সম ও সহস্বার্থে যুক্তিবাদী হয়ে সংযমে সহিষ্ণুতায় সৌজন্যে নির্বিবাদে, নির্বিরোধে, নিরুপদ্রবে নির্বিঘ্নে নিরাপদে সামবায়িক সহযোগিতায় সহ অবস্থানের অঙ্গীকারে বাঁচার যৌক্তিক-বৌদ্ধিক বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করবে?

আমাদের দেশের শিক্ষিত শহুরে যারা দেশের আর্থিক বাণিজ্যিক, সামাজিক রোচিক সাংস্কৃতিক, রাজনীতিক, রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেন, যাঁরা আমাদের শৈক্ষিক, নৈতিক, শাস্ত্রিক জীবন নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালিত করতে আগ্রহী, যারা মাটি ও মানুষ নিয়ে ভাবেন, যাঁরা যুক্তিবাদিতাকে, প্রকৃতিবাদিতাকে, বস্তুবাদিতাকে এবং মানববাদিতাকে গুরুত্ব দেন, তাঁদেরই দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে স্ব স্ব মন-প্রজ্ঞা-মনন-মনীষা প্রয়োগে স্বদেশী মানুষের এবং বিশ্বমানবের শ্রেয়স সন্ধান করা।

আজ দারিদ্র্য আমাদের সাধারণ মানুষের শক্তি-সাহস-বুদ্ধি ও শ্রেয়স চেতনা হরণ করেছে, নষ্ট করছে মানবিক গুণ, প্রবল করছে প্রাণী প্রবৃত্তি, মানুষ কেবলই অসংযত, অসহিষ্ণু, অনৈতিক, অসামাজিক জীবন যাপনে আগ্রহী হয়ে উঠছে। অজ্ঞতাবশে কিংবা কায়েমী স্বার্থবুদ্ধির প্ররোচনায় কিংবা ইয়াঙ্কিমদদপুষ্ট মৌলবাদী উম্মাহ্‌র প্রভাবে ঠিক বলা যাচ্ছে না, আমাদের সব শাসক, সাংসদ, রাজনীতিক দল, বুদ্ধিজীবী, দার্শনিক, শাস্ত্রিক, সাহিত্যিক, শিল্পী কেবল আমাদের পারলৌকিক কল্যাণের কথাই যেন বেশি করে চিন্তা করেন, আজ বাঙলাদেশের অধিজন মুসলিমদের মুমিন বানানোর ও রাখার সর্বাত্মক ও সর্বার্থক প্রয়াস চলছে। রেডিয়ো-টিভি শাস্ত্রিক আপ্তবাক্য উচ্চারণে মুখর। গ্রাম-গঞ্জ-শহর-বন্দর মক্তবে-মাদ্রাসায় আকীর্ণ, কয়েক লক্ষ ছেলে মেয়ে দুইলোকে সমভাবে ফায়দা লোটার জন্যে সোৎসাহে মাদ্রাসায় পড়ছে। সরকার, সাংসদ, শাস্ত্রী ও রাজনীতিকরা এর জাগতিক লাভ-ক্ষতির, দৈশিক-রাষ্ট্রিক কল্যাণ-অকল্যাণের, সমস্যা-সংকটের কথা ভাবছেন না। এ বিজ্ঞান-প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রিত আর্থসামাজিক রাষ্ট্রিক জীবনে এদের জীবিকা ক্ষেত্র কোথায়, এদের মানসবিচরণ ক্ষেত্রই বা আসমানে কি জমিনে তা ভেবে দেখার গরজও নেই যেন কারুর। আমাদের সাংসদ-মন্ত্রী-বেণে-বুদ্ধিজীবী-ধনী রাজনীতিক, সাংবাদিক, ডাক্তার-প্রকৌশলী-উকিল সবাই নিজেদের সন্তান পাঠাচ্ছেন পড়াচ্ছেন নস্‌রা কাফেরের দেশে, পড়াচ্ছেন ইংরেজী মাধ্যমে, পড়াচ্ছেন বিজ্ঞান চিকিৎসাশাস্ত্র এবং প্রকৌশল-প্রযুক্তিবিদ্যা, জনগণের সন্তানদের স্কুলে-কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে দিচ্ছেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধর্মশিক্ষা, এমনকি প্রতীচ্য কৌশল-প্রকৌশল-প্রযুক্তি চিকিৎসা বিদ্যালয়ের নামও দিচ্ছেন ইসলামি প্রকৌশল-প্রযুক্তিবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়। শেখাচ্ছেন মাতৃভাষা বাঙলাভাষার মাধ্যমে যাতে তাঁদের সন্তানদের সঙ্গে বাণিজ্য-চাকরি, রাজনীতি, নেতৃত্ব, বিদ্যা-বুদ্ধি প্রভৃতি ক্ষেত্রেও দরিদ্র জনগণের সন্তানেরা প্রতিযোগিতায় ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিকতে না পারে। উদ্দেশ্য এদের অতীতমুখী স্বল্পশিক্ষিত সংস্কারাচ্ছন্ন মুসলিম করে রাখা, সমকালীন চিন্তা-চেতনা ঋদ্ধ মানুষ হতে না দেয়া। মানবতার খাতিরেই মুক্তবুদ্ধি মানবপ্রেমীদের আন্দোলন করে, প্রচার প্রচারণার মাধ্যমে এ অমানবিক ষড়যন্ত্র রুখতে হবে। জ্ঞান-প্রযুক্তি বিদ্যার জয় হোক, মুক্ত চিন্তা-চেতনা প্রসার লাভ করুক। বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা ব্যক্তিক, গৌত্রিক, সাম্প্রদায়িক, আঞ্চলিক ও জাতির আর জ্ঞান হচ্ছে সর্বজনীন সর্বমানবিক এবং চিরন্তন।

মুক্তবুদ্ধি ও মানবতা

কোন আস্তিক মানুষই মুক্তমনের ও মননের তথা চিন্তা-চেতনার ব্যক্তি হতে পারে না, কেননা তাকে শাস্ত্রের নীতি-নিয়ম, বিধি-নিষেধ, আচার-আচরণ, প্রভৃতির সীমায় থেকে জীবন যাপন করতে হয়। এ মানুষ শাস্ত্রের প্রতি আনুগত্যবশেই রক্ষণশীল ও অনুদার থাকে। সে জীবনে-যৌবনে উদ্দমতাবশে শাস্ত্রের নীতি-নিয়মের, আচার-আচরণের প্রতি উদাসীন থাকতে পারে, সে-অবস্থায়ও বিশ্বাস-সংস্কারের, ধারণার, ভয়-ভক্তি-আস্থা-ভরসার কোন হ্রাসবৃদ্ধি হয় না। সে জেনে-বুঝেই প্রাণীসুলভ প্রবৃত্তিবশে লাভে লোভে স্বার্থে প্রায় বেপরওয়া ভাবেই সর্বপ্রকার পাপ করে। অনেকে অপরাধ-অপকর্ম-পাপকর্ম থেকে বিরত-সংযত থাকে কেবল লোকনিন্দার কিংবা সরকারী শাস্তির ভয়েই।

এ জন্যেই আস্তিক মানুষের মনুষ্যত্ব কখনো পূর্ণতা পায় না, বিশ্বাসের-সংস্কারের-ধারণার বন্ধনমুক্ত হয়ে জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি-প্রজ্ঞা-বিবেক-বিবেচনা যোগে মন-মননকে চিন্তা-চেতনাকে মুক্তবিহঙ্গের মতো চালিত করা তাদের পক্ষে কখনো সম্ভব হয় না। আস্তিক মানুষের মনুষ্যত্ব অনুশীলনের যথেচ্ছ স্বাধীনতা থাকে না বলেই তাদের সহৃদয়তা, মনন, মনীষা, মনস্বিতা টবের গাছের মতো পরিমিতি মানে, বেঁচে থাকে, বাড় পায় না। ক্বচিৎ কখনো শাস্ত্রসম্মত পন্থায় স্বধর্মীর সেবা-সাহায্যের ক্ষেত্রেই মাত্র আস্তিক মানুষের মহত্তর মহা প্রাণতার, মুক্ত মানবিক চেতনার, উঁচু মানবতার প্রকাশ ঘটে। ফলে আপনাকে আপনজনের জন্যে বিলিয়ে দিতে পারে বটে, কিন্তু পরধর্মের, ভিন্ন মতের ও ভিন্নপথের মানুষের প্রতি প্রীতি-করুণা-মৈত্রী প্রভৃতির প্রসার ঘটাতে পারে না। আজ বিজ্ঞান-প্রযুক্তি মানুষকে সাগরের গভীরে, পর্বতের কন্দরে, আকাশের বিস্তারে বিচরণের শক্তি-সামর্থ্য দিয়েছে, দেহ-প্রাণ-মনের পরিচর্যারও বিচিত্র পথ-পদ্ধতি আবিষ্কৃত-উদ্‌ভাবিত হয়েছে, কিন্তু আদি ও আদিম কালের মানুষের ভয়-ভক্তি-ভরসা ও কল্পনা-বিস্ময় সঞ্জাত ভূত-প্রেত-পিশাচ-জীন-পরী ড্রাগন-ভগবান প্রভৃতি অদৃশ্য লৌকিক, অলৌকিক, অলীক বিস্ময়-কল্পনা-বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা প্রসূন অরি-মিত্র দেবতা-উপদেবতা-অপদেবতা-রূপ জীবন-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবিকা নিয়ন্তাশক্তি আজো মানুষের মনোজগৎ নিয়ন্ত্রণ করছে। এখানে চেতনা ও সময় স্তব্ধ হয়ে আছে। এ মনোজগতে কালান্তর নেই, নেই জ্ঞান-প্রজ্ঞা-যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেক-বিবেচনার ঠাঁই। এ দুর্গে কেবল শৈশবে বাল্যে শোনা কিস্‌সাই চিন্তা-চেতনা মন-মনন নিয়ন্ত্রণ করে, এ অর্ভেদ্য দুর্গের ফাঁকে ফুকুরেও জ্ঞান-বিজ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি-প্রজ্ঞা প্রবেশপথ পায় না। তাই আস্তিক মাত্রই শোনাকথায় গভীর, ব্যাপক ও অনড়ভাবে আস্থাবান। অলীক অবাস্তব জগতে বাস করে পৃথিবীর বিভিন্ন মতের আজকের আস্তিক মানুষগুলো। এ জগতে দেশ-কাল নেই, এ জগত প্রশ্নহীন নির্বিকার, এখানে সন্দেহ অবিশ্বাস জিজ্ঞাসা অনাস্থা জন্মে না। বিশ্বাসের এ জগতে জীবন গাড্ডলিক ও গতানুগতিক। জীবন প্রয়াস-মাত্রই লাভ-লোভ-স্বার্থ সম্পৃক্ত। এখানে স্নেহ-মমতা-প্রেম-প্রীতির সঙ্গে দয়া-দাক্ষিণ্য, কৃপা-করুণা যেমন থাকে, তেমনি থাকে ঈর্ষা অসূয়া-হিংসা-ঘৃণা, দ্বেষ-দ্বন্দ্ব, তার ফলে প্রাণীসুলভ সংঘর্ষ-সংঘাতও অবশ্যই থাকবে। থাকবে লাভ-ক্ষতির, হার-জিতের হিসেব। প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা সংকুল জীবনে বিরোধ-বিবাদ-সংগ্রাম এড়ানো যাবে না। কিন্তু তা মনন-মনীষার, উৎকর্ষের, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির বিকাশ-বিস্তারের, সভ্যতা-সংস্কৃতির এ সূক্ষ্মতার কালে তা ব্যক্তিগত পর্যায়েই থাকা ছিল প্রত্যাশিত। আমরা দেখেছি আদি ও আদিম স্তরে যেমন তা গৌষ্ঠীক, দলীয়, আঞ্চলিক ছিল, আজ আরো বিস্তৃতি পেয়ে ভাষিক, বার্ণিক, শাস্ত্রিক, সাম্প্রদায়িক, শ্রেণিক, রাষ্ট্রিক রূপ লাভ করেছে। আজো মানুষ আদি ও আদিম শ্বাপদের মতো হিংস্র রয়ে গেছে। তা হলে সাহিত্য-শিল্প-স্থাপত্য-ভাস্কর্য-দর্শন-বিজ্ঞান-সভ্যতা-সংস্কৃতি-সুরুচি, আমাদের কি দিল? মহৎ ব্যক্তিদের বাণী, আপ্তবাক্য, দেশনা, শাস্ত্র, প্রভৃতির আমাদের উপর প্রভাব কি ও কোথায়? আমাদের ঘন ঘন উচ্চকণ্ঠে উচ্চারিত যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ, মানবতাবাদ, করুণা ও মৈত্রীবাদ, সেবাবাদ প্রেমবাদ, আমাদের কি কোন উপকারে এল? বিবাদে-বিরোধে-লড়াইয়ে-যুদ্ধে-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমরা তো তেমনি গণহত্যাপ্রবণ নিষ্ঠুর, তার প্রমাণ বিশ্বযুদ্ধ বা হিরোসিমা-নাগাসাকি নয়, কিংবা রাষ্ট্রে নিত্য সংঘটিত সংঘর্ষ-সংঘাত নয়, বার্ণিক, ভাষিক, সাম্প্রদায়িক বা বিভিন্ন শ্রেণী দাঙ্গা নয়, শাসক সরকারও তার বিরোধী শাসনপাত্রদের নির্মমভাবে রক্তক্ষরা প্রাণহরা শাস্তি দিয়ে থাকে। তখন স্বদেশী-স্বধর্মী স্বজাতি-স্বভাষার কুটুম্বচেতনার লেশ-রেশ কিছুই দেখা যায় না। রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কারে-উদ্‌ভাবনে যেমন আজকের উন্নত ও সংস্কৃতিমান বিশ্বের মনন-মনীষা-প্রাণপণ গবেষণায় নিয়োজিত, তেমনি নিষ্ঠায়, অধ্যবসায়ে ও উৎসাহে নরঘাতী বিশ্ববিধ্বংসী অস্ত্র নির্মাণেও নিরত জ্ঞানী গুণী মনীষীরা। জ্ঞান-শক্তি-সাহস-মনন-মনীষার চমক, উঁচু ও সূক্ষ্ম মার্গের, এমন কি আকাশচুম্বী বৈশ্বিক ও মানবিক চিন্তাচেতনার প্রকাশ-বিকাশ যত দেখলাম আজ অবধি তার সামান্য মাত্রায়ও তা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে মানুষের জীবনে সমাজে রাষ্ট্রে বাস্তবায়িত হয়নি, যান্ত্রিক ভাবে, আদর্শিক ভাবে বাকে-বাক্যে স্বীকৃত হয়েছে মাত্র। যান্ত্রিক, পার্বণিক ও আনুষ্ঠানিক প্রদর্শনীর অবলম্বনে হয়েছে কিছু কিছু। কিন্তু নিত্যকার জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে নীতিনিয়ম, রীতিরেওয়াজ, প্রথাপদ্ধতি-রূপ ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে অভিব্যক্তি পায়নি আজো।

কি নিষ্ফল মানব চিন্তা-চেতনা, মনন-মনীষা! সহ ও সমস্বার্থে সংযমে সহিষ্ণুতায় সৌজন্যে সামবায়িক সহযোগিতায় নির্বিরোধ নির্বিঘ্ন-নিরুপদ্রব নিরাপদ সহাবস্থানের অঙ্গীকারের মানুষ দলবদ্ধ বা সমাজবদ্ধ হল বাঁচার গরজেই। গড়ল নীতি-নিয়মের, রীতি-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রেওয়াজের, প্রথা-পদ্ধতির নানা শৃঙ্খল। অনুভব-উপলব্ধির অনুশীলনে পেলাম দর্শন, সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান। জীবনযাত্রায় ও জীবিকাক্ষেত্রে শ্রম ও সময় কমানোর ও বাঁচানোর জন্যে যন্ত্রের ও প্রযুক্তিরও বিস্ময়কর বিচিত্র উৎকর্ষ হল, জীবনাচারে এল সৌকর্য ও সৌন্দর্য। কিন্তু সাধারণ মানুষের মনোভূম রইল অকর্ষণে, অনাবাদে, অননুশীলনে পতিত ও বন্ধ্যা। আজো লাভে লোভে স্বার্থে, কামে, ক্রোধে, হিংসায় হিংস্রতায় মানুষ ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক পর্যায়ে আদি, আদিম ও অকৃত্রিম প্রাণী প্রবৃত্তি চালিত। তার শিক্ষা, নৈতিকচেতনা, সুরুচি-সংস্কৃতি যথাকালে যথাস্থানে যথাপাত্রে ও যথাপ্রয়োজনে প্রয়োগসাফল্য আনে না। মানুষ এখনো কেবল বুনো-হিংস্র প্রবৃত্তি চালিত মাত্র।

প্রাগ্রসর সভ্য-সংস্কৃতিমান মনুষ্যজাতির ও সমাজের কিংবা রাজ্যের-রাষ্ট্রের ইতিহাসও তাই অমাবস্যার তারকাখচিত আকাশের মতো। সামগ্রিক অন্ধকারের মধ্যে ব্যক্তিক স্নেহ-মমতা-প্রেম-প্রীতি-ক্ষমা-দয়া-দাক্ষিণ্য-কৃপা-করুণার এবং আবিষ্কারের, উদ্‌ভাবনের অনুশীলনের, মননের, মণীষার ও সৃষ্টিশীলতার উজ্জ্বল নক্ষত্ররূপ চুমকি চমকিত। মহৎ চরিত্রের, মহাবাণীর, আপ্তবাক্যের, দর্শনের, ইতিহাসের, প্রবাদের, প্রবচনের প্রভাবে আমরা আত্মনির্মাণে সযত্ন-প্রয়াসী হই না, কেবল কথায় বক্তৃতায়, দেশনায়, লেখায় তা উচ্চারণ ও উদ্ধৃত করি মাত্র। পৃথিবীর সভ্যতম, উন্নততম, সৌরুচিক-সাংস্কৃতিক সূক্ষ্মতায় আদর্শ বলে স্বীকৃত প্রতীচ্যের রাষ্ট্রগুলোতেই যদি ১৯৯৩ সনেও এ অবস্থা নিত্যদৃশ্যমান, তা হলে নিজ্ঞান, নিরক্ষরতা, নিঃস্বতা, নিরন্নতা দুষ্ট বাঙলাদেশে বুনো-বর্বরের আচরণ এবং জঙ্গল-আইন যে প্রাধান্য পাবে, তাতে বিস্ময় প্রকাশের কিছুই নেই বটে, তবে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ঋদ্ধ ও পুষ্ট আফ্রো-এশিয়া-লাতিন আমেরিকার উচ্চাশী রাষ্ট্রগুলোর মানুষেরা নানাভাবে আত্মোন্নয়নের জন্যে যে আকুলি বিকুলি করছে, তাও অস্বীকার করা যাবে না। আমাদের বাঙলাদেশের গণমানবেরাও অশনে-বসনে-নিবাসে-নিদানে-স্বাস্থ্যে-শিক্ষায় অর্থে-বিত্তে স্বয়ম্ভর ও স্বনির্ভর আর স্বাধিকারে স্বাধীন ভাবে জীবনযাপন করতে চায়। তাদের এ প্রত্যাশা অবশ্য মানুষের ও রাষ্ট্রের এ মানবিক ব্যবহারিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থায় ও অবস্থানে সহজে শিগগির সম্ভব হবে না। তবু মানুষের মনে জীবনপ্রেরণা রূপে আশা থাকা চাই। এক আশা পূর্তির কিংবা অপূর্তির পরে নতুন আশায় দেহ-প্রাণ-মনভরে তুলতেই হয় বাঁচার গরজে। আশার প্রশ্রয়ে ও স্থায়ী বাসার আশ্রয়েই মানুষ সুখে না হোক, স্বস্তিতে দিন কাটায়। কাজেই আশার প্রশ্রয় ও বাসার আশ্রয় মানুষের জীবনে আবশ্যিক ও জরুরী। এ কেবল ব্যক্তিজীবনে নয়, সামাজিক-রাষ্ট্রিক-বৈশ্বিক জীবনেও অপরিহার্য অবলম্বন।

প্রায় সব মানুষই আস্তিক, শাস্ত্রে আস্থা হারিয়েও কেউ কেউ স্রষ্টায় বিশ্বাসী। সভ্যতা-সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের ধারায় প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে, মানবিক অভিজ্ঞতার প্রসারে বিজ্ঞানের নানা তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য উদ্ঘাটিত হওয়ায়, স্থল-জল-নভযানের উৎকর্ষে সমুদ্রের গভীরে, পর্বতের চূড়ায়, আকাশের অনন্তবিস্তারে যাতায়াতের সামর্থ্য অর্জনের ফলে মানুষ আগের অনেক বিশ্বাস-সংস্কার পরিহার করছে, চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রসারে নিশ্চিত মৃত্যুও ঠেকানো সম্ভব ও সহজ হওয়ায় মানুষ ক্রমে আত্মপ্রত্যয়ী, যুক্তিবাদী, প্রকৃতিবাদী, প্রত্যক্ষবাদী কিংবা মানববাদী হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে প্রাক্তন সমাজতন্ত্রী দেশে এবং এখনকার সমাজবাদী সাম্যবাদী ব্যক্তিদের মধ্যে মুক্ত চিন্তা-চেতনার, বুদ্ধির ও যুক্তিবাদিতার বিকাশ বিস্তার ঘটছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাই বলে মানুষ লাভ-লোভের স্বার্থের ক্ষেত্রে যে বিবাদ বিরোধ ঈর্ষা অসূয়া হিংসা ঘৃণা মুক্ত হবে তা নয়, তবে এ ক্রূরতা, নিষ্ঠুরতা, হিংস্রতা আর একটু পরিশীলিত রূপ নেবে। শ্রেণীস্বার্থ, সম্প্রদায় স্বার্থ, পেশাজীবীস্বার্থ, ভাষিক, বার্ণিক, আঞ্চলিক ও মতবাদীর স্বাতন্ত্র্য চেতনাজাত স্বার্থ রক্ষিত হবে সঙ্ঘ, সমিতি, সংস্থা, পর্ষদ, পরিষদ প্রভৃতির মাধ্যমে, দাবি পেশের ও আন্দোলনের মাধ্যমে। সব মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি, বিবেচনাশক্তি, সংযম, সহিষ্ণুতা, অনুভব-উপলব্ধির মাপ মান মাত্রা সমান নয়, তাই আরণ্য নিয়মে কাড়া-মারা-হানাও চলবে লঘু-গুরু ভাবে। পরম মানবতা ও চরম পাশবতা দুটোই মিলবে মানুষের মধ্যে। প্রথমটি থাকবে আজকের মতোই বাস্তবে বিরলতায় দুর্লভ ও দুর্লক্ষ্য, আদর্শিক স্বপ্নে, সাধে ও কল্পনায় থাকবে বাঞ্ছিত ও সুলভ।

তত্ত্বকথা অনেক বলা হল, সবটা হয়তো পষ্ট-প্রাঞ্জল করে গুছিয়ে বলা গেল না। এবার এ তত্ত্বের আলোকে স্বদেশের স্বজাতির দিকে তাকালে কেবল লজ্জা, বেদনা ও হতাশাই জাগে। আমাদের জাতিচেতনা পষ্ট ও সুষ্ঠু নয়, আমাদের জাতিনাম আজো বিতর্কিত। আমাদের রাষ্ট্রিক নাগরিক পরিচিতিও সর্বসম্মত নয়। আমাদের গণতন্ত্রচেতনাও শ্রুতিফল মাত্র, জ্ঞানজ নয়। তাই আধুনিকতম গণতান্ত্রিক ধারণায় যে নাগরিকমাত্রই জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-বিত্ত-বেসাত নিরপেক্ষভাবে কেবলই 'মানুষ' তা দেশে এ মুহূর্তেও আমাদের মন-মগজ-মননগত হয়নি। তাই আমাদের সংবিধান অধিজনের স্বাতন্ত্র্যের, প্রতাপের, লাভের, লোভের, স্বার্থের ও স্বাধিকারের স্বাক্ষর বহন করছে। উনজনেরা তাতেই এ মাটির সন্তান হয়েও স্বদেশে স্বঘরে হল সম নাগরিক অধিকারহৃত জিম্মি। মনস্তাত্ত্বিক কারণেই তার মধ্যে জাগল স্বাধিকাররিক্ত পরভৃত্যের মতো জান-মাল বিষয়ে অনিশ্চিতি। পরিচিত প্রতিবেশী থাকা সত্ত্বেও হল প্রবাসীর মতো অসহায় অনাথ। তাদের মধ্যে যারা সমর্থ, তারা জুলুমের আশঙ্কায় নিরাপদ নিশ্চিত আশ্রয় সন্ধানে কেবলই পালায়। এবং পালায় অর্থসম্পদ ও পেশা নিয়ে, ক্ষতি হয় রাষ্ট্রের। গড়ে ওঠে না জাতীয়তা। বৃদ্ধি পায় না অর্থসম্পদ তাদেরও আন্তরিক প্রয়াসে প্রযত্নে। রেডিয়ো-টিভিতে আজান-উজ্জীবন-জীবনের আলো-কোরআন-হাদিসের বাণী যেভাবে ঘন ঘন প্রচারিত হয়, তাতে মনে হয় রাষ্ট্রে কেবল মুসলমানই আছে, আর কেউ নেই। তাছাড়া সরকারী পর্যায়েও আজো যে 'গণতন্ত্র' দেহ-প্রাণ-মন-মনন-মনীষায় আস্তী ও আত্মীকৃত হয়নি, তার প্রমাণ তাদের জাতিচেতনা এখনো দেশ-কাল নিরপেক্ষ 'মুসলিম' চেতনার নামান্তর মাত্র। তাই সরকার 'উম্মাহ' পন্থী, তাই ধিক্কৃত স্বৈরাচারী এরশাদের খেয়াল-প্রসূন 'ইসলাম' এখনো রাষ্ট্রধর্ম। অথচ সরকার হচ্ছে 'গণপ্রজাতন্ত্রী'। অবশ্য এ ভাবেই জঙ্গীনায়কের স্বৈর-স্বেচ্ছাশাসন কালেও চালু ছিল অসঙ্গতভাবেই। তাতে কারো আপত্তি ছিল না। আজো এ অসঙ্গতি কারো ক্ষোভ জাগায় না। 'ইসলামী' বসানোর দাবিও ওঠে না, কেন বোঝা যায় না।

আজো এ 'গণপ্রজাতন্ত্রী' সরকার ও মুসলিম জনগণ আওয়ারা হয়ে কৃতী ও কীর্তিমান মুসলিম খুঁজে বেড়ায় পৃথিবী চুঁড়ে গৌরবগর্বের ও প্রেরণা-প্রাণোদনার অবলম্বন যোগাড়ের প্রয়াসে। তাই দুশ'পঁয়ত্রিশ বছর পরেও সাম্রাজ্যবাদী মুঘলের সুবাদার নওয়াব সিরাজুদ্দৌলাহ বাঙলার ও বাঙালীর স্বাধীনতা প্রতীকরূপে ডাকটিকেটে সগৌরবে গর্বে ঠাঁই পান। লালমাটিয়া-মুহম্মদপুরে দিল্লীর সম্রাটদের নামাঙ্কিত সড়ক কিংবা 'জাহাঙ্গীরনগর' আমাদের জাতীয় মর্যাদা বাড়ায়। আবার বাঙালী সংস্কৃতি সংরক্ষণও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুরুত্ব পায়। যদিও 'সংস্কৃতি' সম্বন্ধে কারো কোন পষ্ট ধারণা নেই। সংস্কৃতি জাতীয় হয় না স্বরূপে। সংস্কৃতি তরুর নবপল্লবের মতো সদা উন্মেষ ও বিকাশশীল। সংস্কৃতি দেহ-প্রাণ-মন-মনন-মনীষার অনুশীলন ও পরিশীলন প্রসূন। যা কিছু দেখতে শুনতে বলতে করতে কুৎসিত ও অকল্যাণকর, তাই পরিহার্য অপসংস্কৃতি। যা সমকালীন জগতে, জীবনে, ভাবে চিন্তায় কর্মে আচরণে প্রয়োজন, তা-ই গ্রহণ বরণ হচ্ছে সংস্কৃতিমানতা। সংস্কৃতি তাই মানবিক ও বৈশ্বিক উত্তরাধিকার, জাতীয়-বিজাতীয় নয়।

জীবনবোধে হেরফের

আমরা সাধারণভাবে আবেগতাড়িত হয়েই কোন বিষয়ের আলোচনা সমালোচনা করি, যুক্তিও যখন প্রয়োগ করি, তখনো তা সুষ্ঠু ও নির্ভুল কিংবা অপযুক্তি হচ্ছে কি-না তা সযত্ন ও সতর্ক চিন্তা-চেতনা-মননযোগে বিবেচনা করি না। ফলে আমাদের বিচার-বিবেচনা প্রায়ই অসম্পূর্ণ, অসঙ্গত, অসমঞ্জস ছেঁদো সিদ্ধান্ত হয়ে পড়ে। কারণ-কার্য বিশ্লেষণ পষ্ট ও সুষ্ঠু হয় না। কতগুলো তত্ত্ব ও তথ্য স্বতঃসিদ্ধের মতো না মানলে কোন মতে, মন্তব্যে ও সিদ্ধান্তে কারণ-কার্য পরম্পরাগত কিংবা যৌক্তিক বৌদ্ধিক সম্পূর্ণতা, সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য থাকে না, তাই তেমন মত, মন্তব্য কিংবা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে কোন বাঞ্ছিত ফল মেলে না।

একটা তত্ত্ব ও তথ্য হচ্ছে : আজকের মতো পৃথিবী আগে কখনো এমনটি অগ্রসর ছিল না ভাব-চিন্তা-কর্ম আচরণে, কিংবা মননে-মনীষায়, আবিষ্কারে, উদ্‌ভাবনে, অথবা চেতনায়-অনুভবে উপলব্ধিতে। প্রতি মুহূর্তে কোথাও না-কোথাও, কোন-না-কোন ব্যক্তিতে তা নতুনতর, সুষ্ঠুতর, উন্নতর, সূক্ষ্মতর, বৃহত্তর রূপ নিচ্ছেই, ঋদ্ধি পাচ্ছেই। কিন্তু মানুষ অতীতমুখী, শ্রুতিধর ও স্মৃতিধর, তাদের মন-মনন অতীতাশ্রয়ী, তাই তারা সম্মুখগতির মূল্য-মর্যাদা-গুরুত্ব-আবশ্যিকতা বোঝে না, কেবলই নতুনে ভয় পায়, বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হয়, স্বস্থ থাকতে চায় পরিচিত পরিবেশে ও অভ্যস্ত আচারে আচরণে, নিয়মে-নীতিতে, প্রথায়-পদ্ধতিতে, রীতিতে-রেওয়াজে। ফলে তারা নতুনবিমুখ ও পুরাতনপ্রিয়। প্রজন্মক্রমে প্রাপ্ত বিশ্বাসে-সংস্কারে-ধারণায় অযৌক্তিক ও অবৌদ্ধিক আস্থা তাদের মনে মগজে-মননে যুক্তি-বুদ্ধির প্রবেশপথ রুদ্ধ করে রাখে। তাই তারা গতানুগতিক, তারা গাড্ডলিক, তারা প্রবৃত্তিচালিত, বর্ধমান মানবিকগুণে লালিত হবার সুযোগ ঘটে না তাদের জীবনে। তাই আজো প্রত্যাশিত মাত্রায় মনুষ্যত্বসম্পন্ন সামাজিক বা রাষ্ট্রিক কিংবা ধার্মিক মানুষের সংখ্যা জগতের যে-কোন সমাজে দেশ-কাল ভেদে আজো দুর্লভ। এরা 'ধর্ম' নামের বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা চালিত বলেই এরা গাড্ডলিক, গতানুগতিক, জিজ্ঞাসারিক্ত যুক্তিবিরহী রোবট প্রায় যান্ত্রিক জীবনে অভ্যস্ত।

তা সত্ত্বেও আমাদের মানতে হবে যে উনিশ শতকে প্রতীচ্য জ্ঞান-বিজ্ঞান-মনন-মনীষার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার কাল থেকেই আমাদের কিছু লোকের মনে অন্তত আধুনিক, ইহজাগতিক যুক্তিবাদ জাগতে থাকে। এ যুক্তিবাদ ঈশ্বরকেন্দ্রী নয়, মানুষ ও সমাজই এ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুক্তিবাদের অবলম্বন। এ জীবনভাবনায় ও জগৎচেতনায় রয়েছে প্রকৃতি, আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রিক প্রতিবেশ। এর মধ্যে আস্তিক্য থাকলেও তার স্থিতি ইহজাগতিক ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ সম্পৃক্ত, তাই তা মানুষ, স্বদেশ, স্বজাতি এবং জীবিকাসংশ্লিষ্ট মাটিলগ্ন মর্ত্যজীবন, আসমানী নয়। আমাদের জীবনচেতনা বাস্তবতার ভিত্তিতে মাটিতে নোঙর রেখে সাগরের গভীরে, আকাশের বিস্তারে, অরণ্যের গহনে বিচরণ করে, অলীক, অলৌকিকতায় আস্থা পরিহার না করেই। এ-ই হল সামান্য যুক্তি প্রভাবিত জিজ্ঞাসারিক্ত মানুষ, যারা সারা জীবন দেয়াল ঘড়ির প্যাণ্ডুলামের মতো দ্বিধা-দ্বন্দ্বে-বিশ্বাসে-অবিশ্বাসে, ভয়ে-ভক্তিতে-ভরসায়, লাভে-লোভে-স্বার্থে দুলতে থাকে। এ মানুষের সংখ্যাই বেশি। এ-ই হচ্ছে শহুরে শিক্ষিত মানুষের চরিত্র লক্ষণ।

নাস্তিকেরাই কেবল জ্ঞান ও যুক্তিবাদী এবং জীবন-জীবিকা ও সমাজ-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে জ্ঞান ও যুক্তি চালিত হতে পারে নিশ্চিন্তে।

শিল্পসাহিত্যাদি কলার চর্চার গুরুত্ব

মোটাবুদ্ধির ও স্থূলমেধার ছাত্র ছিলাম বলে সূক্ষ্ম ও জটিল কিছু সহজে আমার বোধগত হত না। মেধার কমতি তাই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের লঘুচালে চাপা ও ঢাকা দিয়ে আত্মসম্মান রক্ষা করতাম।

আস্ফালনে অসামর্থ্য লুকোনোর এ কার্যকর পন্থা নতুন নয়, চিরকালীন। আমাদের তৈরি সেকালের একটা প্যারোডি ছিল এরূপ : সখা, তোমরা যে বল শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি কারে কয়?

সে কি কেবলি প্রলাপময়!

এখন জীবনের প্রান্তপর্ব অতিক্রম করছি, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির গুরুত্ব, আদর্শ, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, উপযোগ, প্রয়োজন ও চাহিদা সম্বন্ধে নয় কেবল, তার রূপ-স্বরূপ, তার অঙ্গ ও অন্তর সম্বন্ধেও শুনেছি, জেনেছি অনেক অনেক বিচিত্র বিবিধ তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য কিন্তু মোটাবুদ্ধির ও স্থূলমেধার দরুন কিছুই বুঝিনি, সৌজন্যের খাতিরে সায় দিয়ে চলেছি আজো। কেননা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির ও দার্শনিক তত্ত্বের প্রভাব স্বয়ং শিল্পীর, সাহিত্যিকের, সংস্কৃতিকর্মীর ও দার্শনিকের জীবনে ও আচরণে কৃচিৎ কখনো দেখেছি। এ যেন এক বায়বীয় পদার্থ, দেখতে দেখতে বলতে বলতে উবে যায়, ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, হাওয়া হয়ে যায়। মানুষ কয়েক হাজার বছর ধরে সর্বপ্রকার কলার অনুশীলনে, চর্চায়, সমঝদারিতে তৎপর। বিভিন্ন অঞ্চলে, বিভিন্নকালে ও নানা গোত্রে অনুশীলিত হয়ে হয়ে এ কলা বৈচিত্র্যে ও সূক্ষ্মতায় ও ব্যাপ্তিতে এদেশেই চৌষট্টি কলায় পরিণত হয়েছে। দারু-চারু-কারু প্রভৃতি সব কলাই মানুষের অন্তত ব্যক্তি মানুষের সূক্ষ্ম, তীক্ষ্ণ, তীব্র, গভীর, ব্যাপক অনুভূতি, উপলব্ধি ও রুচি আর সৌন্দর্য বুদ্ধির সৃষ্টি।

আপাতদৃষ্টিতে দৃশ্যত কলা রসিকের ও কলা সমঝদারের অভাব কোন কালেই অনুভূত হয়নি ধনী-মানী ও শহুরে সচ্ছল মানুষের মধ্যে। এমনকি মানুষমাত্রই যেমন ফুলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও সুগন্ধে আকৃষ্ট হয় অন্তত ক্ষণিকের জন্যে হলেও, তেমনি নিঃস্ব নিরন্ন অজ্ঞ মূর্খের মধ্যেও নিতান্ত স্থূল হলেও সৌন্দর্যচেতনা থাকেই, প্রতিকূল পবিবেশে সুপ্ত ও গুপ্ত থাকে মাত্র এবং অনুশীলনাভাবে লুপ্ত হয়ে যায়।

এসব সত্ত্বেও মানুষ আজো চেতনায়-চিন্তায়-মনে-মননে-মনীষায় আদি ও আদিম স্তরেই রয়ে গেছে যেন। তার প্রমাণ আজো ঘরে-সংসারে সমাজে সরকারে-রাষ্ট্রে, ছল-চাতুরী-প্রতারণা, কাড়া-মারা-হানা স্থলে-জলে-নভে, অরণ্যে-পর্বতে-সমুদ্রে সর্বত্র আজো গুণে-মানে-মাপে-মাত্রায় ন্যূনাধিক একই রকম রয়েছে। হিরোসিমা-নাগাসাকি নয় শুধু, বুশের ইরাকে সুপরিকল্পিত ও অকারণ হত্যাকাণ্ডও সেই আদিম হিংস্র মানব প্রজাতির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। আসলে মানবিক গুণের ও মানব মনীষার বিকাশ ঘটেছে এক এক করে অনেক মানুষের মধ্যে, অর্থাৎ ব্যক্তিগতভাবেই, সামাজিকভাবে নয়।

মানুষের মানবিকতা ও মানবতার বিকাশ-বিবর্তন-উৎকর্ষ-উন্নয়ন ঘটেছে এবং এসব মহৎ মানুষের পূর্ণ মনুষ্যত্বের প্রভাবে প্রজন্মক্রমে কিছু ব্যক্তি সত্যিকারভাবে আত্মোন্নয়নে সমর্থ ও ঋদ্ধ হলেও, সমাজের উন্নতি হয়েছে ওই মনুষ্যত্ব সম্পন্ন ব্যক্তির নৈতিক, প্রশাসনিক আচারিক, পারিবেশিক ও পার্বণিক প্রভাবে কৃত্রিম ও লঘুভাবে। এ যতটা আঙ্গিক ও আচারিক, ততটা আন্তরিক ও মানসিক নয়। তাই পৃথিবীর মানুষ মানসিক-সাংস্কৃতিকভাবে এগুচ্ছে কি পিছু হটছে, তা সব সময়ে ঠিকভাবে বোঝা যায় না।

হিংস্রতায় প্রবঞ্চনায় প্রতিহিংসাপরায়ণতায় মনুষ্য প্রাণিজগতে অনন্য অতুল্য। তাই আজো হিংস্রতাকে হিংস্রতা দিয়েই ঠেকাতে হচ্ছে। অস্ত্রের উৎকর্ষ ও বৈচিত্র্য প্রতিযোগিতার মূলেও রয়েছে ওই হিংস্রতা। নবী-অবতার-সাধু-সন্ত-শ্রাবক প্রভৃতি মহৎ চিন্তা-চেতনার সাধক, ধারক, বাহক, প্রচারকরা নানা নীতি-নিয়ম প্রথা-পদ্ধতি, রীতি-রেওয়াজ বেঁধে দিয়েছেন, মানুষকে সহযোগিতায় সহাবস্থানের যোগ্য করে তোলার জন্যে। কিন্তু দেখা গেছে শিক্ষিত-অশিক্ষিত, বুনো-ভব্য, আরণ্য-শহুরে, বর্বর-সভ্য মানুষ নির্বিশেষে যথাপ্রয়োজনে যথাসময়ে যথাপাত্রের প্রতি হিংস্র প্রাণীর মতো শ্বাপদসুলভ আচরণে আজো বিরত হয় না। শাস্ত্রকথা, আপ্তবাক্য, ইতিহাসের শিক্ষা, জীবনের অভিজ্ঞতা, ক্ষতিকর পরিণামের জ্ঞান কোন কালেই মানুষকে লাভ-লোভ-স্বার্থের ও ক্রোধ-ক্ষোভ প্রতিহিংসার ক্ষেত্রে বিবেকানুগত সংযত ও সহিষ্ণু রাখেনি, রাখে না, রাখবে না। কারণ মানুষ বৃত্তি-প্রবৃত্তি চালিত প্রাণী। তবু এ উচ্ছৃঙ্খল-বিশৃঙ্খল মানুষই মনে-মননে-মনীষায়, আবিষ্কারে-উদ্‌ভাবনে-জ্ঞানে-বিজ্ঞানে-প্রকৌশলে-প্রযুক্তিতে, যন্ত্রে ও যান্ত্রিকে, সমুদ্রের তলায়, পর্বতের শিখরে, মাটির গভীরে, আকাশের বিস্তারে প্রকৃতির রূপ-স্বরূপ সন্ধানে বিস্ময়করভাবে এগিয়ে চলছে। এসব মানুষের অসামান্য শক্তিকে বিস্মিত, অবদানে উপকৃত ব্যক্তির অঙ্গের ও অন্তরের অশেষ সম্ভাবনায় আস্থাবান আমরা তাই দুষ্ট হিংস্র প্রাণীপ্রায় মানুষের বিশ্বব্যাপী স্থিতি হাজারে নয়শ' নিরেনব্বইয়ের আধিক্য হওয়া সত্ত্বেও আজো ওই সৃষ্টিশীল, মননশীল-মনীষা সম্পন্ন বিবেক-বিবেচনা ঋদ্ধ নগণ্য সংখ্যক মানুষের প্রতি অনুরাগবশে দুষ্ট-দুর্বৃত্ত-দুষ্কৃতী মানুষকে ক্ষমার চোখে দেখি, মনে করি তারাও হচ্ছে necessary evil. তাদের বাদ দিয়ে বাঁচা যাবে না। অতএব এ মন্দ-মাঝারি লোক নিয়েই আমাদের পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক এবং বৈশ্বিক জীবন।

তবু ন্যায়বান, বিবেকবান ও সংস্কৃতিমান সংযত, সহিষ্ণু সুজনের সংখ্যা সমাজে বৃদ্ধির লক্ষ্যেই আমাদের শিল্পের-সাহিত্যের-ইতিহাসের ও দর্শনের আর সামবায়িক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সহযোগিতায় নিজেদের স্বার্থেই নির্বিরোধ নির্বিবাদ নিরুপদ্রব নিরাপদ সহাবস্থানের অনুশীলনের চর্চায় নিরত থাকতে হবে। স্থূল চেতনার ও মোটাবুদ্ধির মানুষের কাছে তা অকেজো প্রলাপ, বাজে কাজে শ্রম ও সময় নষ্ট বলে প্রতীয়মান হলেও, তা পরোক্ষে আঙ্গিক ও আন্তর প্রভাব ফেলে সব মানুষের উপর, সমাজের ও রাষ্ট্রের উপর নাচ-গান-বাজনা-অভিনয়-চিত্র কিংবা ভাস্কর্য ও স্থাপত্যরূপে।

তাই শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রভৃতি চৌষট্টি কলারই অনুশীলন আবশ্যিক ও জরুরী। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যেমন আমাদের বৈষয়িক জীবনে নিত্য নির্ভর, তেমনি আমাদের মানসিক জীবন বিকাশের জন্যে কলার চর্চা, সুরুচির ও সৌন্দর্যের চর্চা আবশ্যিক ও জরুরী। কেননা আদি ও আদিম কাল থেকে প্রাণী প্রজাতি মানুষের হিংস্রতা, অসংযম, অসহিষ্ণুতা ও অসৌজন্য যদি কিছু মাত্রায়, মাপে ও মানে কমতে থাকে, কমার সম্ভাবনা থাকে, তা হলে তা কলার প্রভাবেই সম্ভব হয়েছে, হচ্ছে ও হবে।

রক্ষণশীলতা ও গ্রহণবিমুখতা একটা আধিমাত্র

ক্রীতদাস, দাস, চাটুকার, স্তাবক, ভক্ত, ভীত, আত্মপ্রত্যয়হীন, পরনির্ভরশীল মানুষ কখনো মুক্ত মন-বুদ্ধি-মননের হতে পারে না। আনুগত্যেই তার আনন্দ, স্বস্তি ও সুখ। এমন মানুষ কখনো জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেক-বিবেচনা চালিত হয় না। কেননা স্বাধীন চিন্তা-চেতনার প্রয়োজনবোধ তার থাকে না বলেই—অনুশীলনেও তার গরজ থাকে না। ফলে শৈশবে বাল্যে কৈশোরে যৌবনে লব্ধ ও প্রভাবিত বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণায় চালিত ও তাড়িত হয় তার মানসিক ও আচারিক জীবন।

সচেতনভাবে জ্ঞান ও যুক্তি নির্ভর হলেই, আরো স্পষ্ট করে বললে বিশ্বাস ও ধারণাবাদী নয়, জ্ঞানবাদী, যুক্তিবাদী ও প্রত্যক্ষবাদী হলেই কেবল মানুষ দেহে-প্রাণে-মনে-মননে আশৈশবলব্ধ অলীক-অলৌকিক-লৌকিক বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা থেকে মুক্ত হতে পারে। বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণামুক্ত বস্তুগত ও বিজ্ঞানীর আবিষ্কার উদ্‌ভাবনগত জ্ঞান ও যুক্তি নির্ভর হওয়া কৃচিৎ কারো পক্ষে সম্ভব হয়। সংস্কারমুক্ত সাহসী মননশীল জ্ঞান-যুক্তিবাদী-নাস্তিক মানুষ কোটিতে গুটিক মেলে মাত্র। এমন মানুষের মধ্যেও আবার মগজ-শক্তি-সাহসগত তথা অনুভব-উপলব্ধিগত গুণের মানের মাপের ও মাত্রার পার্থক্য থাকে। এ জন্যেই মানসিক জীবনে কোন আস্তিক মানুষেরই স্বকাল চেতনা থাকে না। তারা পিছিয়ে পড়া মানুষ। তারা অতীত ও ঐতিহ্যমুখী আচারসর্বস্বচিন্তা চেতনায় স্বস্থ। তাই তারা নতুনভীরু ও নতুনবিমুখ। তারা তাদের স্ব স্ব শাস্ত্রের উদ্‌ভবকালেই মানসবিচরণ করে স্বস্তি ও সুখ পায়। নিশ্চিন্ত হয় জীবনের শাস্ত্রিক আদর্শের, উদ্দেশ্যের ও লক্ষ্যের অনুধ্যানে। দৈশিক পরিবেশ কিংবা কালিক চাহিদা তাদের মনোজীবনে চিন্তা-ভাবনার তরঙ্গ তোলে না। যেন ভৌগোলিক প্রতিবেশ বলে কিছু নেই, যেন কালপ্রবাহ বলেও কিছু নেই, কাল স্তব্ধ হয়ে আছে। এক কথায় বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণাপুষ্ট মানুষের মগজে-মননে দেশ-কাল-প্রজন্ম-প্রয়োজন চেতনা নেই। সবটাই চিরন্তন স্থিরতায় স্তব্ধ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এটিই তাদের শোনা, জানা, বোঝা ও মানা তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য। তাই তাদের মনে সন্দেহ, জিজ্ঞাসা, কৌতূহল কিছুই নেই। জানা-বোঝার কাজ স্ব স্ব শাস্ত্রের উদ্‌ভবকালেই সুষ্ঠুভাবে সমাপ্ত হয়ে গেছে। ছোটখাট টুটা-ফাটা মেরামতের কালেভদ্রে প্রয়োজন হয় বটে, তবে তেমন ভাবনার বা গুরুত্বের কিছু নয়। বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা জনে জনে, গোত্রে গোত্রে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, জাতিতে জাতিতে, দেশে দেশে, অঞ্চলে অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন। কেননা এগুলোর ভিত্তি বস্তুগত জ্ঞান নয়, বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষিত, নিরীক্ষিত, পর্যবেক্ষিত তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য নয়, কাজেই এগুলো কাল্পনিক, লৌকিক, অলৌকিক ও অলীক ধারণামাত্র, এগুলো অলীক, অনৃত, অবাস্তব। এগুলো জন্ম বিস্ময়ে-ভয়ে-ভক্তিতে-ভরসায়, এগুলো অস্তিত্ব পায় শৈশব-বাল্যের মগজধোলাই প্রসূরূপে। আসমানে জমিনে ও ইহ-পরলোকে প্রসৃত বলে এগুলো অবিমোচ্য রূপে মগজে-মনে-মননে-মনীষায় আমৃত্যু স্থিতি পায়। এগুলোই মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতির, মনন-মনীষার উৎকর্ষের পথে অলঙ্ঘ্য ও দুর্লঙ্ঘ্য বাধা হয়ে থাকে। তাই মানুষের বাঞ্ছিত ও প্রত্যাশিত গুণে মানে মাপে মাত্রায় অগ্রগতি হয়নি, প্রগতি প্রাগ্রসরতাও তাই বিরলতায় দুর্লক্ষ্য-দুর্লভ। ফলে এ ১৯৯৩ সনে আমরা যারা দেশব্যাপী বা গোটা পৃথিবী আকীর্ণ করে বেঁচে রয়েছি, বিভিন্ন বয়সের বিদ্যার, পেশার, শাস্ত্রিক বিশ্বাস-সংস্কারের, দার্শনিক ধারণার মানুষ বাস করছি। আমাদের দৈহিক বা আবয়বিক সমকালীনতা আছে বটে, কিন্তু মানসিক জীবনে আমরা শাস্ত্রিক দলগতভাবে সাড়ে তিন/চার হাজার, তিন হাজার, দু'হাজার ও দেড় হাজার বছরের আগেকার জগতের বাসিন্দা। এতেও হয়তো মানবিকতার, মানবতার, মুক্তবুদ্ধির, জ্ঞাননির্ভরতার কিংবা যুক্তিবাদিতার ও প্রত্যক্ষবাদিতার প্রসার ও বিকাশ রোধ করা যেত না। কিন্তু জ্ঞান-যুক্তিবিরোধী বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা চালিত মানুষ সাধারণভাবে ভিন্ন মত শুনতে ও সহ্য করতে চায় না। তারা এ ক্ষেত্রে সংযম, সহিষ্ণুতা ও সৌজন্য রক্ষা করে সহাবস্থান করতে চায় না ভিন্নমতবাদীর সঙ্গে। তাই আজো শাস্ত্রিক, বার্ণিক, ভাষিক, রাজনীতিক জীবনে ভিন্নমতের ও স্বার্থের কিংবা শ্রেণীর মানুষকে দাঙ্গায়, যুদ্ধে, হত্যায়, পীড়নে প্রতিহত বা বিলুপ্ত করতে প্রয়াসী।

একই কালে একই স্থানে আমরা বিভিন্ন মানসযুগে ও জগতে বাস করি। এবং প্রায় সব আস্তিক ও শাস্ত্রনিষ্ঠ মানুষই সাধারণভাবে হাজার হাজার বছর পিছিয়ে-পড়া জীবনের ও জগতের প্রতিবেশে স্বস্তিতে, সানন্দে ও সুখেই মানস-জীবন যাপন করে। দৈহিকভাবে একজন ধার্মিক ইহুদীর বা খ্রীস্টানের বাস একালে হলেও, তার মানস অবস্থান যথাক্রমে সাড়ে তিন ও দু হাজার বছর আগের অজ্ঞতা আকীর্ণ অনুন্নত চিন্তা-চেতনার, মনন-মনীষার দেশে ও কালে। যাঁরা কেবল প্রাচীন ও মধ্যযুগের দর্শন-শিল্প-শাস্ত্রই চর্চা করেন, তাঁদের মধ্যে সমকালীন চিন্তা-চেতনা-সুলভ নয়। কিছু সংস্কারমুক্ত জ্ঞান-যুক্তি-প্রত্যক্ষবাদী মানুষই কেবল সমকালের চাহিদাসচেতন গতিশীল প্রবহমান জীবনযাপন করে। এবং ক্বচিৎ কেউ কালোত্তর প্রাগ্রসর জীবন অনুভব, উপলব্ধি ও উপভোগ করে। তেমন মানুষ স্বকালে প্রায়ই অন্যদের ক্ষোভের, ক্রোধের, ঘৃণার ও পীড়নের পাত্র হয় বটে, কিন্তু পরবর্তীকালে অসাধারণ, অসামান্য, অনন্য ও মহৎ মনীষী-মনস্বীরূপে স্বীকৃত স্মরেণ্য ও বরেণ্য হয়। জগৎ আজো এভাবেই চলছে। এদিক দিয়ে আমাদের বিদ্যা-বুদ্ধি-শিক্ষার, বিজ্ঞানের ও প্রযুক্তির বিস্তার বিকাশ ও উৎকর্ষ মানুষের চেতনার দ্রুত-পরিবর্তনের সহায়ক হতে পারেনি আজো। জ্ঞান-যুক্তি প্রয়োগে অনীহ মানুষের মানস-অবস্থান সমকালের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেক পেছনে। তারাই অসংযত, অসহিষ্ণু, ক্রূরহিংস্র, হত্যাপ্রবণ, তারাই মুক্তবুদ্ধির, চিন্তার, মননের ও মনীষার শত্রু। ইতিহাসের পাতায় পাতায় নতুন চিন্তা-চেতনার মানুষের পলায়নের, সত্যপ্রত্যাহারের রুদ্ধবাক হওয়ার এবং নিহত হওয়ার কাহিনী রয়েছে লিপিবদ্ধ। আজো তেমন মানুষের উপর পাশব আক্রমণের অবসান ঘটল না। আফসোস এজন্যেই যে ইতিহাস থেকে কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না। গ্রহণ বিমুখতা রক্ষণশীলতা যে একটা আধি, তা আজো সাধারণের উপলব্ধিগত হল না। সম্মুখ গতির ও প্রগতির আর সমকালীনতার পথে বাধা, সংকট ও সমস্যা এ-ই।

সংকট : জীবনে ও মননে

আমরা জানি, বিভিন্ন বিদ্যার-বিত্তের-বেসাতের ও বয়সের ব্যক্তি নিয়েই সমাজ। আমরা সবাই একই কালে একই রাষ্ট্রে, গাঁয়ে বা শহরে বাস করি বটে, তবে আমাদের বাহ্য জীবনে যেমন শৈক্ষিক, শাস্ত্রিক, নৈতিক, আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বৃত্তিক প্রভৃতি অবস্থা ও অবস্থান থাকে বিচিত্র। আবার ব্যবহারিক জীবনে আবাসে-আসবাবে-তৈজসে-পোশাকে ও সামাজিক আচারে-আচরণে আপাত-সাদৃশ্য থাকলেও আমাদের প্রত্যেকেরই জীবন-দৃষ্টির মধ্যে থাকে স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্য। স্থূলভাবে যখন একই সম্প্রদায়ের শাস্ত্রিক জীবন-দৃষ্টিকে অভিন্ন মনে করি, তখনো তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-বিবেক-বিবেচনা শক্তির স্তরভেদে ব্যক্তিক জীবন-চেতনায়, চিন্তায় গুণে মানে-মাপে-মাত্রায় কেবল পার্থক্য বা তারতম্য থাকে, তা নয়, বৈপরীত্যও থাকে। একালে সর্দার ও শাহ-সামন্ততন্ত্রের অবসানের ফলে শাসন, সরকার ও রাষ্ট্র জনগণের চিন্তা-চেতনার আয়ত্তে এবং গণ বা শ্রেণীস্বার্থ বিরোধী কিছুর প্রতিরোধে দ্রোহ করার অধিকার পাওয়ার কারণে ব্যক্তিক জীবন দৃষ্টি সাদৃশ্য ও অভিন্নতা অনুসারে সামষ্টিক, সামগ্রিক ও সামূহিক হয়ে দলগত রাজনীতিক, সামাজিক, শাস্ত্রিক, আর্থিক, নৈতিক, সাংস্কৃতিক, আদর্শিক আর প্রশাসনিক নীতিনিয়ম ও দাবিরূপে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনীতিক আন্দোলনের ও নীতি-আদর্শের রূপ নিয়েছে।

আমাদের রাষ্ট্র নিরক্ষরতা, দারিদ্র্য ও নিরন্নতাদুষ্ট এবং বিদেশী আর্থ-বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যবাদী মহাজনের খাতক ও কৃপানির্ভর আর হুকুম-হুমকি কবলিত ও পরামর্শ চালিত মুৎসুদ্দি সরকার শাসিত হলেও আমাদের দেশেও নাকি শতখানেক রাজনীতিক দল আছে, এসব দলেও মতাদর্শ এবং কর্মসূচিও অবশ্যই থাকার কথা। আমরা এত দলের খবর রাখি না। তবে সমর্থকবহুল দলগুলোর মতাদর্শ, শক্তি-সামর্থ্য, বিবৃতি-বক্তৃতা-কর্মসূচি কোন মতেই উপেক্ষা করতে পারি না। কেননা সেগুলো প্রত্যেক নাগরিকের প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে জীবন-জীবিকা এবং জীবনচেতনা ও জগৎভাবনা সম্পৃক্ত।

আজ আমরা এখানে দু'টো চেতনা-বৈপরীত্যই আলোচ্য করছি। ধারণা ও জ্ঞান, বিশ্বাস ও বিজ্ঞান, অতীত ও বর্তমান, অতীত ও ঐতিহ্যমুখিতা আর সমকালীনতা ও ভবিষ্যৎ চেতনা, রক্ষণশীলতা ও প্রগতিশীলতা, বর্জনবিমুখতা ও গ্রহণমুখিতা, বিশ্বাস-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংস্কার-ধারণানিষ্ঠতা আর বিজ্ঞাননির্ভর প্রত্যক্ষবাদিতা, গতানুগতিক জীবনচেতনা জীবনাচার প্রীতি আর নতুন চেতনার ও নতুন মুক্তচিন্তার অনুশীলন প্রবণতা, বিজ্ঞানভীতি ও বিজ্ঞানজাত যন্ত্র-প্রযুক্তি-চিকিৎসা প্রীতি, স্বাতন্ত্র্য প্রীতিজাত আদি ও আদিম বর্বর জীবনধারণ পদ্ধতি আর ভব্য পোশাক-আবাস-তৈজস-আসবাব গ্রহণে অনাগ্রহ, মগজী যুক্তিতে ঔদাসীন্য ও অনুভবের আবেগে গুরুত্বদান, ইহজাগতিক জীবন লঘু এবং পারলৌকিক অনন্ত জীবনকে গুরুত্ব দান, মানুষের যাবতীয় দুষ্কর্ম সহ্য করায় অভ্যস্ত থাকা ও নাস্তিক্যতাকে বধযোগ্য অপরাধ বলে মানা, মুক্তবুদ্ধি-মুক্তিচিন্তা আর শাস্ত্রবিরোধী জ্ঞান-বিজ্ঞানকে এড়িয়ে চলার প্রবণতা ও উপযোগরিক্ত হলেও শাস্ত্রসম্মত শাসন-প্রশাসনে আস্থা ও শ্রদ্ধা এবং প্রবর্তন প্রয়াস আর আধুনিক প্রতীচ্য জ্ঞান-বিজ্ঞান যুক্তিবুদ্ধিকে স্বাতন্ত্র্য-সমাজ-সংস্কৃতি বিনাশী বলে মনে করা। এক কথায় একদল আধুনিক প্রতীচ্য সভ্যতা সংস্কৃতির, মনন-মনীষার, আবিষ্কার-উদ্ভাবনের তথ্য তত্ত্ব ও সত্যকে, তার শিল্প সাহিত্য দর্শন সমাজবিজ্ঞানকে, তার বিজ্ঞানচর্চাকে বিষভাণ্ডবৎ পরিহারযোগ্য বলে প্রচার করে, অন্যদল অর্থাৎ যারা নতুন চেতনার, নতুন চিন্তার ও মুক্তবুদ্ধির প্রগতিবাদী বিজ্ঞানের তত্ত্বে তথ্যে আস্থাবান, বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণাকে অলীক অবৌদ্ধিক ও অযৌক্তিক জেনে পরিহারকামী, তারা প্রতীচ্য মনন-মনীষাকে ও বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ জ্ঞানকে, যন্ত্রকেও রোগ প্রতিষেধক ওষুধ ও চিকিৎসা বিজ্ঞানকে সুধাপাত্র বলেই জানে। অতীত, ঐতিহ্য ও শাস্ত্রমানা লোকেরা বিজ্ঞান-দর্শনকে মানুষের মগজের মননের মনীষার সৃষ্টিকে আবিষ্কৃত জ্ঞানকে স্বীকারে অনীহ হলেও ব্যবহারিক জীবনে বিজ্ঞানের অবদান যন্ত্র-প্রকৌশল-প্রযুক্তি গ্রহণে সদা আগ্রহী সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, সৌকর্য জাত ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগলিপ্সু বলেই।

এ মুহূর্তে আমাদের রাজনীতিক সামাজিক সাহিত্যিক শৈল্পিক, প্রাশাসনিক, সরকারী ও রাষ্ট্রিক সাংবিধানিক ক্ষেত্রে এক প্রায় বৈনাশিক দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। এ দ্বন্দ্ব মূলত অন্ধত্বের ও চক্ষুষ্মানতার, শাস্ত্রানুগ জীবনদৃষ্টির ও সমকালীন জীবনচেতনার, বিজ্ঞান বরণের ও বিজ্ঞান বর্জনের, প্রতীচ্য জ্ঞান-মনন-মনীষা গ্রহণের আগ্রহের ও বর্জনের প্ররোচনার। রক্ষণশীলরা দেড় হাজার বছরের পুরোনো শাস্ত্রসম্মত জীবন-সমাজ-সংস্কৃতি শাসন-প্রশাসন ব্যবস্থা পুনরুজ্জীবনে পুনঃপ্রবর্তনে ঐহিক-পারত্রিক মঙ্গল সমভাবে নিশ্চিত ও নিশ্চিন্তভাবে পেতে চায়। এ শাস্ত্রপন্থীদের একদল মৌলবাদী, অন্যরা সাধারণভাবে শাস্ত্রপন্থী বা ইসলামপছন্দ নামে অভিহিত হয়। আমাদের মৌলবাদীরা মৌলানা আবুল আলা মওদুদী ব্যাখ্যাত ইসলামী জীবনের অনুরাগী, অনুগামী ও অনুগত। এরা এখানে জামায়াতে ইসলামী নামে পরিচিত। এরা ধর্মপ্রচার করে না, মওদুদীর জেহাদী আদর্শে এর কাদিয়ানী বা আহমদীয়াবিরোধী এবং রাজনীতিক ক্ষমতার গুরুত্বসচেতন রাজনীতিক দল রূপেই চিহ্নিত। এরা ইসলামের আদর্শে উদ্বুদ্ধ-প্রবুদ্ধ অনুপ্রাণিত বলে আত্মপরিচয় দেয়। তাদের ছাত্রশিবির নামে অঙ্গদল হচ্ছে সুসংবদ্ধ, সুনিয়ন্ত্রিত, সুদীক্ষিত, সুপ্রশিক্ষিত, অস্ত্রে-শস্ত্রে সুসজ্জিত অঙ্গীকারবদ্ধ জেহাদী নিষ্ঠুর রগ-হাত-গর্দানকাটা সেনাবাহিনী রূপেই বিরোধী রাজনীতিক দলের প্রতিপক্ষ। জামায়াতে ইসলামী এবং এর অঙ্গ সংগঠন শিবির তাই তবলীগী নয়, রাজনীতিক দল। শিবসেনা-রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ বিশ্বহিন্দু পরিষদের সঙ্গে এদের ভাব-চিন্তা-কর্ম আচরণের সাদৃশ্য রয়েছে। রাজনীতিক দল হিসেবে জামায়াত শিবির প্রবল হলে, দেশব্যাপী প্রভাব বিস্তার করতে পারলে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনাচার, সমাজ ব্যবস্থা, শাসন-প্রশাসন, আইন-কানুন হবে ইসলামসম্মত তথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোরআন-হাদিস এজমা-ফিকাহ্ অনুগ। আমাদের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ হবে মধ্যযুগীয়, কেননা য়ুরোপীয় আদলে রচিত, য়ুরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান মনন-মনীষা সভ্যতা-সংস্কৃতি আবিষ্কার উদ্‌ভাবনপ্রভাবে বর্তমানে অনুসৃত ও অনুকৃত আমাদের প্রাত্যহিক ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ-পোশাক-শিক্ষাব্যবস্থা, হয়তো চিকিৎসাব্যবস্থাও তখন বর্জন করতে হবে—খোমেনির ইরানের কিংবা বিভিন্ন মৌলবাদীর আফগানীস্তানের মতোই। এমনি অবস্থার ও ব্যবস্থার বিভীষিকা অনুমান করেই আলজিরিয়ায় জোর-জুলুমের মাধ্যমে মৌলবাদীদের প্রতিহত করা হচ্ছে। Fundamentalism তত্ত্বের উদ্‌ভব ব্রিটেনে, রাজনীতিক চাল হিসেবে প্রয়োগ সারা দুনিয়ায় পূর্ব য়ুরোপে, আফ্রো-এশিয়া-লাতিন আমেরিকায় কমিউনিজম ঠেকানোর লক্ষ্যে মার্কিন সরকারের অভিসন্ধি। এখন মৌলবাদ একাধারে বীজ-বৃক্ষ-ফল। আমাদের বাঙলাদেশে এখন প্রধান ও প্রথম সংকট-সমস্যা হচ্ছে আদর্শিক কিংবা জীবনদৃষ্টির তথা বদ্ধ চিন্তা-চেতনার গতানুগতিক বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণার জীবনাচারের, বদ্ধমনের-মননের-মনীষার সঙ্গে নতুন চেতনার, নতুন মুক্ত-চিন্তার, মুক্ত-যুক্তির, যুক্তবুদ্ধির সমকালীন জীবনের চাহিদাচেতনার উপযোগবোধের দ্বন্দ্ব। এ প্রাচীনতার ও অতীত প্রীতির, ঐতিহ্য চেতনার ও শাস্ত্রসম্মত অতীতমুখিতার সঙ্গে প্রতিবাদী প্রাগ্রসর চিন্তা-চেতনার প্রসারকামী সমকালীন বৈশ্বিক-আন্তর্জাতিক জীবনের সমতালে চলে সমস্তরে ওঠার কাঙ্ক্ষীদের দ্বন্দ্ব। আধুনিকতার, পশ্চাৎদৃষ্টির ও সম্মুখদৃষ্টির, দাঁড়িয়ে স্থির থাকার ও চলে এগিয়ে যাওয়ার দ্বন্দ্ব।

এ দ্বন্দ্বই আমাদের মুখ্য সংকটের ও সমস্যার উৎস। এ দ্বন্দ্বের অবসানে মীমাংসায় হবে আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত। তাই গাঁয়ে-গঞ্জে, পাড়ায়-মহল্লায়, নগরে-বন্দরে, সাক্ষর-নিরক্ষর, ধনী-নির্ধন নির্বিশেষের মধ্যে পারিবারিক, সামাজিক, শাস্ত্রিক, শৈক্ষিক, নৈতিক-শৈল্পিক-সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক জীবনে তথা শাসনে-প্রশাসনে-সরকারে রাষ্ট্রে সাংবিধানিকভাবে এর মীমাংসা আবশ্যিক ও জরুরী। যদিও একদলের কাছে যা সুধাপাত্র, অন্য দলের কাছে তা বিষভাণ্ড। তবু স্পষ্ট করে বলতেই হয় রক্ষণশীল স্বাতন্ত্র্যকামী সনাতনপন্থীদের সুধাপাত্র, অন্য প্রগতিবাদী মুক্ত চিন্তা-চেতনাসম্পন্ন বিজ্ঞানবাদীদের কাছে বিষভাণ্ডই হবে। কেননা, এ দেশ-কাল ও কালিক জীবনচেতনা, জগৎভাবনা, বৈশ্বিক-আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও স্বার্থবিরোধী বলেই রক্ষণশীলতা বর্জনীয়। গ্রহণশীলতাই অবাধে নতুন চেতনার ও মুক্ত চিন্তার বিস্তার ঘটাতে পারে। এমনি নতুন চিন্তা-চেতনার সৃষ্টিতেই সংস্কৃতি উৎকর্ষ ও লাবণ্য লাভ করে।

এ সূত্রে মনে পড়ছে ১৯৫৩ সনে মওদুদীর নেতৃত্বে কাদিয়ানীহত্যার পরে যে তদন্ত কমিটি গঠিত হয়, তাতে পাকিস্তানের প্রখ্যাত মুফতী ফকিহ্ এজমাবিদ আলিমদের মত নেয়া হয় ইসলামী রাষ্ট্রে শাসন-প্রশাসন, আইন-কানুন ও বিধর্মীর অবস্থান সম্বন্ধে : (১) মৌলানা আবুল হাসনাতের মতে অমুসলিম থাকবে জিম্মি, কোন সরকারী পদেও তাদের নিয়োগ করা যাবে না। (২) মৌলানা আহমদ আলীর মতে জিম্মিদের জন্যে অধিকার না থাকলেও, সরকার ইচ্ছে করলে জিম্মিকে চাকরি দিতে পারবে। (৩) মৌলানা তোফায়েল আহমদের মতে মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলিমদের কোন অধিকারই দেয়া চলবে না। (৪) মৌলানা আবদুল হামিদ বাদাউনী কিন্তু উদার মত পোষণ করতেন। তিনি সৈন্য ও বিচার বিভাগে আর মন্ত্রী পদে ছাড়া অন্য বিভাগে জিম্মিদের চাকরি এমনকি পর্ষদ-পরিষদে প্রতিনিধিত্ব করার অধিকারও দেয়া যেতে পারে বলে মত প্রকাশ করেছিলেন। কোরআন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাদিস, ফেকা, কেয়াজ, এজমা, ফতোয়া প্রভৃতি ক্ষেত্রে সুন্নী আলিমদের মতে মতভেদ কৃচিৎ দেখা যায়। অতএব, বাঙলাদেশের ক্ষেত্রেও ইসলামী শাসনে জামায়াতে ইসলামীরা এমনিভাবেই রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিকদের সর্বপ্রকার অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে। অথচ বাঙালী-সত্তা অঙ্গীকার করেই মুক্তিযুদ্ধ করেছিল জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-নিবাস নির্বিশেষে বাঙালীরা, স্বাধীন করেছিল দেশ। সবার সমান অধিকার রক্ষার জন্যেই তৈরি হয়েছিল সেক্যুলার সংবিধান।

অতএব, প্রগতিবাদী ও মৌলবাদীর প্রভাব-প্রতিপত্তির হ্রাস-বৃদ্ধির উপরই নির্ভর করছে এগারো কোটি বাঙালীর মানসিক, আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনীতিক ও রাষ্ট্রিক জীবনের ভাবীরূপ।

সবচেয়ে বড় অভাব আদর্শনিষ্ঠ চরিত্রবান লোকের

দেশ ধনে কাঙাল, তা আমরা একবাক্যে সবাই স্বীকার করি। কিন্তু শহুরে শিক্ষিত লোকেরাও যে সাধারণভাবে আদর্শরিক্ত চরিত্রশূন্য কাঙাল, তা আমরা চোখে দেখে, অন্যের মুখে শুনে এবং নানা আলামতে বুঝেও যেন বিশ্বাস করতে চাই না। আমরা একজনের কাছে ঠকে প্রতারিত হয়েও অন্য একজনের উপর ভরসা করতে, আস্থা রাখতে দ্বিধাবোধ করি না। কেননা মানুষ একা এককভাবে বিচ্ছিন্নতায় স্বাতন্ত্র্যে বাঁচতে পারে না, তার নির্ভর, বিশ্বাস ও ভরসা করবার মতো লোক আবশ্যিক তার ব্যবহারিক বৈষয়িক জীবনের সব কাজে ও লেনদেনে। ব্যক্তি মানুষের এ অসহায়তার এবং অপরিহার্য পরনির্ভরতার সুযোগ নিয়েই মানুষ সততার সরলতার সহানুভূতির উপচিকীর্ষার ভান করে অন্য লোককে প্রতারিত প্রবঞ্চিত করে। তাই জীবনে ব্যক্তিমানুষ অনন্যোপায় বলেই ঠকে ঠকেও নতুন করে মানুষ নতুন মানুষের উপর আস্থা ও ভরসা রেখে ঠকবাজের নতুন ফাঁদে পা রাখে।

মানুষের এ দুর্বলতার খবর যে যত বেশি জানে, সে তত বেশি ফায়দা লুটতে পারে জীবনের সর্বক্ষেত্রে তার ধূর্ততা ও কাপট্য প্রয়োগে। এ ধূর্ততাকে ও কাপট্যকে পুঁজি ও পাথেয় করে শুধু যে বেচা-কেনার বাজারেই এক লোকে অন্য লোককে ঠকাচ্ছে তা-ই নয়, রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবীরাও একইভাবে লোকঠকানোকেই নীতি-নিয়মে রীতি-রেওয়াজে পরিণত করেছে। বিশেষ করে ধনে কাঙাল লোকেরা অর্থ সম্পদে ঋদ্ধ হয়ে সমাজে ধনবলে প্রতিষ্ঠা লাভের প্রতিযোগিতায় ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছে, নেমেছে বিশেষ সুবিধে সুযোগ পাওয়ার জন্যে বাণিজ্য-বাজারে এবং রাজনীতিক ক্ষমতা অর্জনের ও প্রয়োগের প্রতিযোগিতায় ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। আজ সারাদেশে সব পেশায় চলছে কাপট্যের, মতলবের ও ধূর্ততার প্রতিযোগিতা, যে ধূর্ততর জয় তারই। এ অবস্থায় কোন মানুষই বুকে মুখে কথায় কাজে অভিন্ন হতে পারে না, তাই সবারই 'বগলে ইট আর মুখে শেখ ফরিদ।' শিক্ষাঙ্গনে মুখে সবাই শান্তি চায়, সন্ত্রাসমুক্ত পরিবেশ চায় কিন্তু কোন দলই নিজেদের মস্তান-খুনী-গুণ্ডাদের শায়েস্তা-সংযত রাখার ব্যবস্থা করে না। অর্থে অস্ত্রে-আশ্রয়ে প্রশ্রয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাদরে পোষে। এজন্যেই কোথাও সন্ত্রাস কমে না, যদিও রোজ বিভিন্ন মহল থেকে সন্ত্রাসবিরোধী বক্তৃতা বিবৃতি-সভা-কমিটি-বৈঠক চলছে প্রতিদিন। সংবাদপত্রেও লেখা হচ্ছে সম্পাদকীয়, প্রকাশিত হচ্ছে নানা সন্ত্রাস দমনের বিভিন্ন উপায় বাতলানো চিঠিপত্রও। এখন প্রশ্ন : সরকার ও বিরোধী রাজনীতিক দলগুলো যখন সন্ত্রাসবিরোধী, তখন সন্ত্রাস চলে কি করে, সন্ত্রাস সৃষ্টি করে কারা, করায় কারা, এর নীরব দর্শকই বা কেন পুলিশ বিভাগ? বর্তমান সরকারের যেমন বিঘোষিত ও প্রচারিত কর্মসূচী ছিল, বহু বহু দফার গণদাবি পূরণে দায়বদ্ধতাও তেমনি স্বীকৃত ছিল, যেগুলোর জন্যে একটি কানাকড়িও ব্যয় করতে হয় না, সেগুলোও তো বছরোর্ধ্ব কালের মধ্যেও সংসদীয় গণতান্ত্রিক সরকার পূরণ করেনি, করছে না। যেমন রেডিয়ো টিভিকে স্বায়ত্তশাসন দান, বিচারবিভাগকে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র করে দেয়া, নাটক যাত্রা থেকে সেই ব্রিটিশ আমলের নিয়ন্ত্রণমূলক বিধি-নিষেধ তুলে নেয়া, সংবাদপত্রের উপর থেকে সামরিক শাসনকালের সরকারী নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রত্যাহার করা, প্রভৃতি কোন কিছুই করা হয়নি, হচ্ছে না, গুরু-পীর-দরবেশ-দরগাহ-র মতো মহামান্য দিশারী ও নিয়ন্তা রূপে সার্বক্ষণিক উচ্চারণে কেন সরকারী সর্বকাজে শহীদ জিয়ার নাম উচ্চারিত হচ্ছে? জিয়ারাজত্ব কি রামরাজত্ব ছিল? জিয়াউর রহমান কি সেনানীশাসক ও স্বৈররাষ্ট্রনায়ক রাষ্ট্রপতি ছিলেন না? তাঁর আমলে কি সংসদের বা মন্ত্রীদের কোন ক্ষমতা ছিল? ওঁরা কি ডামি সংসদ ও পুতুল বা 'শোবয়' মন্ত্রী ছিলেন না? আদর্শরিক্ত ও চরিত্রশূন্য বলেই আমাদের আমলা-চাকুরে বুদ্ধিজীবীরা এখন বর্তমান সরকারের মন যোগানোর জন্যে রোল ও ভোল পাল্টাচ্ছেন, ঘটনার চেয়ে রটনায় দিচ্ছেন গুরুত্ব। মিথ্যাভাষণেও তাঁদের ঘৃণা-লজ্জা এবং লোকনিন্দা ভয় নেই।

ফলে দেশের ভবিষ্যৎ কুয়াশাচ্ছন্নই থেকে যাচ্ছে। ক্ষতি হচ্ছে দেশের অজ্ঞ-অনক্ষর চাষী ক্ষেতমজুর ও বিভিন্ন তুচ্ছ পেশাজীবী দরিদ্রদের। কেননা দুঃশাসনে আইন-শৃঙ্খলার অভাবে তাদেরই নিস্তরঙ্গ জীবনে আর্থিক বিপর্যয়ের ঝড় ওঠে। ওরা দরিদ্রতর ও দুস্থতর হতে থাকে। নিঃস্ব-নিরন্ন লোকের সংখ্যা বাড়ে। শহুরে শিক্ষিত ধূর্তলোকেরা নানাভাবে লুটের ও ঠকানোর সুযোগ-সুবিধে আরো বেশি করে পায়।

বর্তমান সরকার জনপ্রত্যাশিত কাজ করে তাদের দুঃখ-দুর্দশা ঘোচানোর চেয়ে নিজেদের আখের গোছানোর, গাঁয়ে গঞ্জেও তাঁদের মুৎসুদ্দি বৃদ্ধির চেষ্টায় সরকারী শক্তি প্রয়োগের অন্ধি-সন্ধি সন্ধানে ব্যস্ত। দেশ-জাতি-দুস্থ মানবতা তাঁদের কাছে গৌণ বিষয়, অবসরকালীন আলাপের ও শ্রুতিমধুর বক্তৃতার বিষয় মাত্র।

সরকারী দলের বোঝা উচিত মিষ্টি কথায়, গালভরা কথায়, পুরোনো স্মৃতির ও গৌরবের রোমন্থনে বেশিদিন চলে না, চালানো যায় না, যায়নি কখনো অতীতেও কোথাও। মিষ্টি কথায় সত্যি চিঁড়ে ভেজে না। তরল কিছু ঢালতেই হয়—পানি দুধ দই। আমাদের সবচেয়ে বড় অভাব, আমাদের সব দুঃখের উৎস ও কারণ আমাদের দেশে কোথাও কোন ক্ষেত্রেই চরিত্রবানের নেতৃত্ব কর্তৃত্ব নেই, আত্মস্বার্থনিষ্ঠাই আমাদের প্রবল বা একমাত্র গুণ। কিন্তু দেশের জনস্বার্থ আমাদের কাণ্ডারীদের কর্মীদের চিন্তা-চেতনার বাইরে। তাই আমাদের অবস্থার ও অবস্থানের গতি নিম্নমুখী, উন্নয়নমুখী নয়। আদর্শনিষ্ঠ চরিত্রবান লোকের আজ বড় প্রয়োজন। তেমন মানুষই কেবল জাতীয় দুর্যোগে সংসারসমুদ্রে হাল-পাল-দাঁড় সুসঙ্গত, সুসংহত ও সুসমঞ্জস রাখতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গণহিতৈষণার তিন পন্থা

মানুষ সাধারণভাবে সমাজে রাষ্ট্রে নিজ স্বার্থেই বিচরণ করে। কোন কোন মানুষ সমাজের ও রাষ্ট্রের জনগণের হিতসাধনের দায়িত্ব স্বেচ্ছায় বরণ করে। এমনি মানুষের মধ্যে একদল অতীতের নীতি-নিয়ম-আদর্শ পুনঃপ্রচারে আগ্রহী হয়, কেউ কেউ সমকালের সমস্যার সমাধানপন্থা আবিষ্কারে উদ্‌ভাবনে থাকে নিষ্ঠ। আবার ক্বচিৎ কেউ প্রাগ্রসর চিন্তা-চেতনা যোগে ভবিষ্যতের উন্নততর জীবনের, সমাজের ও রাষ্ট্রব্যবস্থার স্বপ্ন ও সাধ জাগানোর চেষ্টা করে। প্রথম দলের চিন্তা-ভাবনা-কাজ বন্ধ্যাত্বের লক্ষণ। দ্বিতীয় বর্গের লোকেরা যে সমকাল-সচেতন, এ তারই প্রমাণ আর তৃতীয় প্রকার চিন্তকরা যে জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তিবাদী—এ তারই সাক্ষ্য।

প্রথম দল হচ্ছে মৌলবাদী। তারা অতীতমুখী, অতীতের ধারক বাহক ও প্রচারক—তারা বৃক্ষের শেকড়ের গুরুত্বসচেতন এবং শেকড়ের সযত্ন পরিচর্যায় নিষ্ঠ। তারা জানে-বোঝে ও মানে যে শেকড়ের সেবা-পরিচর্যা নিখুঁত নিখাদ হলে বৃক্ষ ফলবন্ত থাকবেই চিরকাল। অবিকৃত শাস্ত্র ধরে থাকলে, মেনে চললে জীবনে-সমাজে-রাষ্ট্রে কোন সমস্যা-সংকট দেখা দেবেই না, দিতে পারে না—এ হচ্ছে তাদের অবিচল বিশ্বাস, দৃঢ় ধারণা। কিন্তু তারা জানে না, বোঝে না এবং মানে না যে জাগতিক সবকিছু কালাধীন, কালনিয়ন্ত্রিত। 'কাল ঘসতি ভূতানি' কাল সবকিছুকে গ্রাস করে, যে-কোন তত্ত্ব, তথ্য, সত্য কালান্তরে ও স্থানান্তরে আর প্রজন্মান্তরে উপযোগ হারায়। তাই কোন পুরোনো নতুনের চাহিদা মেটাতে পারে না। অতীতের বৃত শাস্ত্র থেকে বিচ্ছিন্নতাই সব অবক্ষয়ের, অভাবের, সমস্যার, সংকটের মূল—এ বদ্ধমূল ধারণা তাদের অন্ধ করে রাখে স্বকালের জীবনের ও জগতের গতি-প্রকৃতি ও প্রাতিবেশিক চাহিদা সম্বন্ধে। কিন্তু অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে? তাই আজকের গোটা পৃথিবীব্যাপী মার্কিন স্বার্থে ও মার্কিন অর্থে উৎসাহিত মৌলবাদীরা চাকার মতো নয়—লাটিমের মতোই ঘুরছে পুরোনো বুলি কপচিয়ে, আর ওই ঘুরন্ত অবস্থাকেই মনে করছে জীবন্ত, জাগ্রত ও স্বকালে চলন্ত অবস্থা। এ চেতনা একটি আধিমাত্র। তাই মৌলবাদীরা এক বিড়ম্বিত জীবনচেতনার শিকার। এ একপ্রকারের স্বপ্নাবস্থা, একপ্রকারের আঁধি, একপ্রকারের মুগ্ধতা, মোহাচ্ছন্নতা, এ মোহঘোরমুক্তির চিকিৎসক হচ্ছে সময় বা কাল। পুরোনো শাস্ত্রভিত্তিক এ অতীতমুখিতা ইহ-পরলোকে প্রসৃত জীবন সম্পৃক্ত বলেই এ-চেতনা নির্মূল করা যাবে না, বিভিন্ন উপায়ে এর প্রসার বোধ করা সম্ভব হবে মাত্র। মৌলবাদীর মধ্যে রাব্বি-পাদরী-মোল্লা পুরোহিত ভিক্ষু শ্রমণ শ্রাবক সন্ন্যাসী-সন্ত-দরবেশ ও আধুনিক বিদ্যার শিক্ষিত লোকও রয়েছেন অনেক।

দ্বিতীয় বর্গের লোকেরা সাধারণভাবে শহুরে ও শিক্ষিত রাজনীতিক এবং সাংবাদিক শিক্ষক ও সাধারণ বুদ্ধিজীবী। তাঁরা স্ব স্ব জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি বিশ্বাস ও ধারণাভিত্তিক সংকট-সমস্যার সমাধানপন্থা বাতলান, সেগুলো তাঁদের বিদ্যা-বুদ্ধির, প্রজ্ঞার, মননের স্তরানুসারে গুণে-মানে-মাপে-মাত্রায় লঘু-গুরু, কেজো-অকেজো, সফল-নিষ্ফল, গ্রাহ্য-অগ্রাহ্য হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমকালে লঘু-গুরু চেতনার তর্ক-বিতর্কের তরঙ্গ তুলে একসময়ে থিথিয়ে যায়। এমনি আন্দোলন রাজনীতিক, সাহিত্যিক, দার্শনিক কিংবা সাংস্কৃতিক রূপও নিতে পারে। এগুলো সাধারণভাবে শ্লোগানের ও সিদ্ধান্তের আকারে প্রচার পায়, বাস্তবে রূপায়ণের লোক বা সরকার মেলে না, নানা জটিল টানা-পোড়েনে আকারের বৈপরীত্যের দরুন। তবু মাঝে মাঝে এর মধ্যেই সমাধানপন্থা গোঁজামিলে কিংবা জোড়াতালিযোগে অন্তত সাময়িকভাবে মিলে যায়।

আর তৃতীয় প্রকারের দেশদুর্লভ যুগবিরল নতুন চিন্তার উদ্‌ভাবকরা সাধারণভাবে দার্শনিক রাজনীতিক ও মনীষী লেখক গোষ্ঠীর লোক, প্রাগ্রসর চিন্তার চেতনার মতের পথের জনক ও প্রচারক এঁরাই। এঁদের মত-পথ-সিদ্ধান্ত গতানুগতিক চিন্তা-চেতনায় অভ্যস্তজনের মনে প্রবেশের সহজ পথ পায় না, তাই প্রাগ্রসর চিন্তা-চেতনা গৃহীত ও জনপ্রিয় হতে বিস্তর সময় লাগে। তার পরেও তা বহুজনপ্রিয় হয় না।

জনগণকে সেবার পন্থা

আগের কালেও কেবল শাহ-সামন্তের শাসন-প্রশাসন-হুকুম-হুমকির জন্যে গ্রামীণ সমাজ অপেক্ষা করত না। গোষ্ঠীপতি, পাড়ার মাতব্বর, ধনীসর্দার এবং পঞ্চায়েত সালিশ গাঁয়ের দুষ্ট-দুর্জন-দুর্বৃত্ত-দুষ্কৃতীকে শায়েস্তা রাখত। নাপিত-ধোপা-মোল্লা-পুরোতের সেবা সহায়তা-সহযোগিতা থেকে ব্যভিচারী পরিবারকে বঞ্চিত রেখে, তাকে একঘরে করে, সমাজে পতিত বলে ঘোষণা করে। সর্বপ্রকারের অসহযোগিতায় মানুষ সমাজে বাঁচতে-টিকতে পারে না। তাই দুর্জন অপরাধী হাতে-পায়ে ধরে, কানমলা খেয়ে, মাথা নেড়া করে, মাথায় ঘোল ঢালার অপমান বরণ করে অপরাধের শাস্তি ভোগ করত, করত কাফ্‌ফারা-প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা।

সেকালেও অর্থসম্পদের ও কৌলীন্যের-ক্ষমতার দর্প-দাপট ছিল, ক্ষমতাবান মাত্রই ক্ষমতার অপব্যবহার করত। সেই 'জোর যার মুলুক তার' যুগে সামন্তের ধনীর মানীর ব্রাহ্মণের সৈয়দের গুরু অপরাধের শাস্তির কথা উচ্চারণ করা অসম্ভব বা দুঃসাধ্য ছিল। তাদের অন্যায় অপরাধ জোর-জুলুম নিয়ে লোকসমাজে কানাকানি হত, একক মুখে তা ধ্বনিত হত না। এ অবস্থায় প্রয়োজন হত সঙ্ঘশক্তির। এ সঙ্ঘশক্তি মিলত বার্ষিক নানা পালা পার্বণে। আমাদের দেশেই গাজনে ও আদ্যের গম্ভীরায়, জন্মাষ্টমী উৎসবে, মহররমের উৎসবে সমবেত হাজার হাজার লোক নির্ভয়ে সামন্ত-ধনী-ব্রাহ্মণ-সৈয়দ যে-কোন খ্যাতি-ক্ষমতাবানের দুষ্কর্মের কথা ব্যঙ্গ বিদ্রূপ মাধ্যমে রঙ মেখে সঙ সেজে তথা ক্যারিকেচার মিমিকিং-এর মাধ্যমে প্রচার করে লজ্জা দিত, অবজ্ঞেয় ও ধিক্কৃত করত এভাবেই। এরও আগে বৌদ্ধ যুগে কোন সমাজ, শাস্ত্র, নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ বিরোধী অপরাধের জন্যে অপরাধীকে সমাজে ঘৃণ্য এবং পীড়িত করার লক্ষ্যে এক বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। লোকে একটা পাঁঠা কেটে তার নাড়িভুঁড়ি একটা হাঁড়িতে পুরে রাখত এবং তা দু'একদিনে পঁচে দুর্গন্ধ বের হত। হাটের দিন সে হাঁড়ি হাটে নিয়ে হাটের মধ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছড়ে ভাঙত আর দুর্গন্ধে সবাই কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করত হাটে হাঁড়ি ভাঙার কারণ। তখন অপরাধীর সবিস্তার পরিচয় প্রচার করে বয়ান করা হত তার অপরাধ। এভাবে জনপদে ছড়িয়ে পড়ত নিন্দা-ঘৃণা-অবজ্ঞা।

একালে এসবের প্রয়োজন হয় না, কালান্তরে নতুন পথ-পদ্ধতি ও উপায় উদ্‌ভাবিত হয়েছে। একালে অপরাধী মাস্তান-গুণ্ডা-খুনী-রাহাজান-ডাকাতকে শায়েস্তা করার দায়িত্ব ও কর্তব্য সরকারের। কেননা রাস্তা-ঘাটের, যানবাহনের উন্নতির ফলে এবং প্রশাসন ব্যবস্থার পরিবর্তনে ও তথাকথিত উৎকর্ষে এখন দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন সম্ভব। এখন শোষক-শোষিতের বঞ্চক-বঞ্চিতের দ্বান্দ্বিক আর্থসামাজিক অবস্থার ও অবস্থানের কাল। এখন শ্রেণীদ্বন্দ্বের সংঘর্ষের সংঘাতের তথা কাড়াকাড়ির ঠকাঠকির ঠোকাঠুকির মারামারির হানাহানির কাল। এখন শাসক বেণে-বুর্জোয়া-শাহ-সামন্ত শ্রেণীর বা মনোভাবের ও আদর্শের লোক বলে এখনকার সংগ্রাম চলছে শোষিত শ্রেণীর ও শোষকশ্রেণীর মধ্যেই লঘু-গুরুভাবে, গুপ্ত ও ব্যক্তভাবে, মানসিকভাবেও বাস্তব সক্রিয় পন্থায় নানা স্থানে। শুধু মার্কিন রাষ্ট্রে নয়, ন্যাটো জ্যোটে, কানাডায় জাপানে এবং আফ্রো-এশিয়ার সরকার ও জঙ্গীসেনানীনায়ক শাসনে চলছে শোষক-শোষিতের দ্বান্দ্বিক স্থিতি।

এজন্যে আধুনিক প্রচার মাধ্যমগুলো রেডিয়ো টিভি, সিনেমা, সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র, সরকার নিয়ন্ত্রিত। এ জন্যে এগুলো ভাঙ্ক অনক্ষর অসহায় নিঃস্ব নিরন্ন প্রান্তিক চাষী, শ্রমিক, ক্ষেতমজুর, ভিখিরী প্রভৃতির এ নিঃস্বতার নিরন্নতার দারিদ্র্যের কারণ কি, কারা, এবং বঞ্চনা শোষণের পথ পদ্ধতি নীতি-নিয়মই বা কি তা তারা জানে না, বোঝে না। তাই তারা শোষণকেই বিনা প্রতিবাদে মেনে নেয়। ভাবে এ-ই হচ্ছে তাদের আসমানী নিয়তি কিংবা পূর্বজন্মের অপকর্মের ফলভোগ মাত্র। তাই তারা নিজ নিজ স্বার্থে, স্বাধিকারে স্ব ও সুপ্রতিষ্ঠ হবার পন্থা খুঁজে পায় না। তাদের প্রেরণা প্রণোদনা প্রবর্তনা-প্ররোচনা দিয়ে লড়াকু করে তোলা, স্বাধিকার আদায়ের সংগ্রামী দাবিদার করে তোলা সংবেদনশীল দুস্থ মানবদরদী মানববাদী শোষণবিরোধী শিক্ষিত মানুষেরই দায়িত্ব ও কর্তব্য। যেহেতু সরকারী প্রচার মাধ্যমগুলো এ দায়িত্ব কখনো গ্রহণ করবে না, কেননা সরকারের নীতিই হচ্ছে সর্বপ্রকারে সত্যকে আড়ালে রাখা এবং সরকারী স্বার্থে বিকৃত ও বাঁধানো তথ্য প্রচার করা। আর সংবাদপত্রগুলোর তথা মালিকদেরও হুকুমে হুমকিতে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে সরকার। তাই আমাদের সংবাদপত্রগুলো স্বাধীনভাবে জনস্বার্থে সংবাদ প্রচার করতে পারে না, লিখতে পারে না সম্পাদকীয়, ছাপতে পারে না লেখক পরিবেশিত সত্য বয়ান।

এজন্যেই আমাদের বিরোধী রাজনীতিক দলগুলোর, স্বাধীন তরুণ তরুণীদের, উকিল ডাক্তার শিক্ষিত সাংবাদিক সাহিত্যিক শিল্পী প্রভৃতি বুদ্ধিজীবীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে মুক্তাঙ্গন নাটিকা, যাত্রা, নাচ-গান-বাজনা, বক্তৃতা, চিত্র, বৈঠক-আড্ডা প্রভৃতির মাধ্যমে জনগণকে তাদের শোষক শত্রু সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা, তাদের দাবি আদায়ে অনুপ্রাণিত করা। আদি ও আদিমকালে নাচে গানে বাদ্যে দেবপূজা হত, আজ সেই নাচে-গানে বাদ্যে সঙে যাত্রায়-নাটকে সিনেমায় কথিকায় বক্তৃতায় লেখায় শোষিত জনগণের মুক্তি ত্বরান্বিত করে তুলতে হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রাণে বাঁচার ও বাঁচানোর পন্থা

এমন এককাল ছিল যানবাহনের বা রাস্তা-ঘাটের অভাবে একটি ক্ষুদ্র রাজ্যেরও বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার ব্যবধান বিরাজ করত। এক অঞ্চলে ঝড়ঝঞ্ঝা-খরা-বন্যা-মারী-কম্পনে মানুষ বিপর্যস্ত হলে অন্য অঞ্চল থেকে সাহায্য সহায়তা পাওয়া সহজে এবং শিগগির সম্ভব হত না। সংবাদপত্রাদি ছিল না বলে এবং ব্যক্তি মানুষের চিঠিপত্র বিলি-বিনিময়ের জন্যে ডাক ব্যবস্থাও ছিল না বলে এক অঞ্চলের খবর নিকটবর্তী অন্য অঞ্চলে এলাকায় পৌঁছতেও সময় লাগত এবং তা প্রায় রূপকথার আকারেই বিকৃত ও পল্লবিত কিংবা সংক্ষিপ্ত হয়ে প্রচারিত হত। এ যন্ত্রযুগে ও যন্ত্রজগতে সেকাল অবসিত, নিঃশেষে বিলুপ্ত। একালে পৃথিবীর যে-কোন অজ্ঞাত প্রান্তের ঘটনার খবরও কয়েক মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবীব্যাপী রটিয়ে দেয়া সম্ভব ও সহজ তারে বেতারে খোলা আকাশের বায়ুবাহনে।

কাজেই আজকাল মানুষের দুর্ভোগ-দুর্দশার, দুর্ভিক্ষের, অনাহারের, রোগের অচিকিৎসার অপমৃত্যুর কারণ ভিন্ন।

একালে কোথাও দুর্ভিক্ষ খাদ্যাভাবে তথা চাল-আটার অভাবে ঘটে না, অর্থাভাবই তথা নিঃস্ব মানুষের ক্রয়ক্ষমতার অভাবই হচ্ছে খাদ্যাভাবে অনাহারে কিংবা অখাদ্য কুখাদ্য জনিত উদরাময় ও অপুষ্টিজাত সোঁত প্রভৃতি রোগে মৃত্যুর কারণ। কাজেই দুর্ভিক্ষ মানে একালের ভাষায় খাদ্যবস্তুর আকাল বা অভাব নয়, অর্থাভাব জনিত ক্রয়ক্ষমতার অভাব। তেমনি দারিদ্র্যসীমার নিচে বা অমানবিক স্তরে জীবনযাপনও বুনো-বর্বরতার, সভ্যতার রুচি-সংস্কৃতিহীনতার ফল নয়, অর্থাভাব। মানুষের বেকারত্ব নয় কেবল, শ্রমের উপযুক্ত বা অর্থমূল্য না পাওয়ার কারণই মুখ্য। অনুন্নত দেশে অতি সস্তায় শ্রম বিক্রি হয়, জনসংখ্যার তুলনায় কাজের তথা কাজ করানোর লোকের অভাবেই শ্রম সস্তায় বিক্রয় করতে বাধ্য হয় একজন শ্রমিক বা মজুর। এখানে শ্রমের চাহিদায় ও সরবরাহে সমতা নেই। মিল ফ্যাক্টরি কল-কারখানার অভাবে, কৃষিপদ্ধতির অনুন্নয়নে, দেশের কাঁচামালের ব্যবহারযোগ্য তৈরিপণ্যে পরিণত করার উদ্যম-উদ্যোগ-আয়োজনের অভাবে রফতানীর চেয়ে পণ্যের আমদানীর আধিক্যে আমাদের অর্থসম্পদ ভারসাম্য হারায়। লোক বেকার থাকে, শ্রমও সেকারণে প্রতিযোগিতায় সস্তাদরে বিক্রয় করতে বাধ্য হয়। আহার্য সংগ্রহের তীব্র তীক্ষ্ণ অপরিহার্য তাগিদে দরকষাকষি করার সাধ্য থাকে না গরীব অকুশল শ্রমিক মজুরের। তাই পৃথিবীর গরীব দেশে তো বটেই, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে কিংবা পূর্বজার্মানীতে ভারতে বাঙলায় আজ জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে জীবন-জীবিকা এক দুর্বহ দুঃসাধ্য সংকটের মুখে পড়েছে। এখানকার কোটি কোটি মানুষ অন্ন বস্ত্র নিবাস বঞ্চিত। বারোমাসই অনাহার অর্ধাহারক্লিষ্ট। রোদ-বৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষা করে মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই এদের, বিশেষ করে শহরে বন্দরে নালা-নর্দমা-ফুটপাথ পরিত্যক্ত ওয়াগন, ভাঙা কালভার্ট রেলস্টেশন-জাহাজঘাটই তাদের আশ্রয় ও আবাস। এভাবে আমাদের অধিকাংশ গণমানব সারাটা জীবন সপরিবার যাপন করছে। প্রাকৃতিক কোন দুর্যোগ-হামলা না হলে তিমি-হাতি পিঁপড়ে পতঙ্গ কেউ অনাহারে মরে না, কিন্তু চিরটা কাল মানুষ, সামাজিক মানুষ এখানে সেখানে, এদেশে ওদেশে একালে সেকালে সব সময়ে অনাহারে অর্ধাহারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে অপুষ্টিতে ও রোগে ভুগে অচিকিৎসায় অকালে অপমৃত্যু কবলিত হয়েছে। এখনো দরিদ্রলোক তুচ্ছ আবেষ্টনে আচ্ছাদনে বাস করতে বাধ্য হয় বলে ঝড়ে বন্যায় শীতে খরায় মহামারীতে হাজারে হাজারে লাখে লাখে মরে—শিশু, নারী তরুণ-তরুণী বৃদ্ধ-বৃদ্ধা নির্বিশেষে কিছুক্ষণের বা কয়েক মিনিটের কিংবা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে। আজো সুদৃঢ় ঘরে-দালানে কোঠায় কুঠিতে বসবাসকারীরা ঝড়ে বন্যায়-খরায় শীতে কম্পনে মরে না। শহরে তো নয়ই, গাঁয়েও মরে না।

বুনো প্রাণীরাও চিরকাল সতর্ক-সযত্ন-বিচরণে স্বাধীন জীবন ভোগ-উপভোগ করে, কিন্তু মানবপ্রজাতির মানুষ কোন অপরাধে দলীয় বা যৌথ জীবনে দাসের অনুগৃহীতের কৃপার করুণার, দয়ার দাক্ষিণ্যের পাত্ররূপে বঞ্চনার লাঞ্ছনার শোষিতের দলিতের জীবন যাপনে বাধ্য হয়! ১৯৯৩ সনে শতকের শেষ প্রান্তেও কি শহুরে শিক্ষিত ধনী-মানী জ্ঞানী-গুণী-মেধাবী-মনীষী মানুষেরা এ বিষয়ে গভীর ও ব্যাপকভাবে মনন-চিন্তনের গরজ ও গুরুত্ব উপলব্ধি করবে না? আমরা নিজেদের মানুষ নামে পরিচয় দেব, অথচ মনুষ্যত্ব মানবতা চিরকালই কি আমাদের মন-মস্তিষ্ক-হৃদয়ের আয়ত্তাতীত থাকবে? আমরা কি চিরকাল এমনি স্বার্থপর প্রবৃত্তিচালিত প্রাণীই থাকব? মানবিক গুণানুশীলন করে মানুষ হব না? মানুষের বাঁচার জন্মগত অধিকার আজো স্বীকার করতে শিখব না? মানুষ মাত্রেরই যে প্রথম পরিচয় শেষ পরিচয়ও যে কেবল মানুষ—এ স্বীকৃতি আদায়ের জন্যে কি আমাদের আরো কয়েক শতাব্দী অপেক্ষা করতে হবে? মা-বাপ যেমন আঁধা-খোঁড়া-পঙ্গু-পাগল-নির্বোধ সন্তানের লালন-পালনের দায়িত্ব ও কর্তব্য এড়াতে পারে না, রাষ্ট্রও তেমনি শিশু-রুগ্ন অন্ধ খঞ্জ নারী-পুরুষকে ভাত-কাপড়ে চিকিৎসায় বঞ্চিত রেখে প্রাণে মারতে পারে না, পালন-পোষণই রাষ্ট্রের তথা সরকারের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য। আর সমর্থ লোকমাত্রকেই যোগ্যতানুসারে কাজ পাইয়ে দেয়াও দায়িত্ব হচ্ছে সরকারের। সবচেয়ে বড় কথা সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে সর্বপ্রকারে আয়ের তথা অর্থসম্পদ অর্জনের ও বৃদ্ধির সযত্ন ও সার্বক্ষণিক প্রয়াস চালানো কৃষির উন্নয়নে, উৎপাদনে নির্মাণে লগ্নিপুঁজির বাণিজ্যপুঁজি-শিল্পপুঁজির সুপ্রয়োগের এবং পণ্যের দেশী ও বিদেশী বাজার সৃষ্টির ও প্রসারের সার্বক্ষণিক চিন্তা ও প্রয়াস চালু রাখা। জাতীয় অর্থসম্পদ বৃদ্ধি করা সম্ভব না হলে আমরা সমাজতন্ত্র চালু করে জনগণের অন্ন-বস্ত্র-নিবাস-স্বাস্থ্য-শিক্ষা-চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারব না অর্থাভাবে। কাজেই সমাজতন্ত্র চালু করবার জন্যেও জাতীয় অর্থসম্পদ বৃদ্ধি আবশ্যিক ও জরুরী, যেমন কৃপা-করুণা-দয়া-দাক্ষিণ্যবশে অসমর্থকে, বেকারকে বৃত্তি দিয়ে বাঁচিয়ে রাখাও সম্ভব নয় দরিদ্র দেশের পক্ষে। অর্থসম্পদের প্রাচুর্য এবং তার আনুপাতিক বণ্টনেই শোষণমুক্ত, দারিদ্র্য-বিরল সমাজ গঠন ও রক্ষণ সম্ভব এবং বাঞ্ছিত।

একালে বাঁচার উপায়

আজকের বিজ্ঞান-প্রকৌশল-প্রযুক্তি রোগনিরূপণ ও প্রতিষেধক আর বিচিত্র যানবাহন ও তার-বেতার যন্ত্র বিশ্বের মানুষকে একই যানের যাত্রী, একই বাজারের ক্রেতা-বিক্রেতা, একই হাটের হাটুরে, একই ভাষায় ভাষী (যেমন ইংরেজী) করে তুলছে। এখন জীবনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সর্বক্ষেত্রেই পৃথিবীর ভৌগোলিক ব্যবধান, অলঙ্ঘ্যতা দুর্লঙ্ঘ্যতা ঘুচে গেছে। এখন বলতে গেলে মানুষ জনপদের হাটে হাটুরের মতো স্ব স্ব প্রয়োজনে একত্রিত হয়েছে, এ তাৎপর্যেই পরস্পরের নিকট প্রতিবেশী। পরস্পরের উপর নির্ভর করে আস্থা রেখে, ভরসা করেই মানুষকে বাঁচতে হবে। কাজেই এখন আর স্বাতন্ত্র্যে স্বগরিমায়, স্বসম্পদে কারো বাঁচার উপায় নেই। এখন একত্রিত হলেই চলবে না, জনে জনে জনতা হলেই চলবে না। বৈশ্বিক চিন্তা-চেতনায় মনন-মনীষা নিয়োগ করে বিশ্বজনহিতে তথা বহুজনহিতে, বহুজনসেবায় ও বহুজনসুখে সমঝোতায়, সামবায়িক সহযোগিতায় সমবেতভাবে মানসিক ও সামগ্রিক লেনদেনের বিনিময়ে আদান-প্রদানের মাধ্যমে এবং সমস্বার্থে সংযমে সহিষ্ণুতায় সহাবস্থানের মন-মেজাজ তৈরির অঙ্গীকারে বৈশ্বিক মানবসমাজ গড়ে তুলতে হবে জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-নিবাস-স্বার্থ প্রভৃতিকে উপেক্ষা করে, গুরুত্ব না দিয়ে। কারণ একত্রিত হলে চলবে না, মিলিত হতে হবে মনে-মেজাজে কর্মে ও লক্ষ্যে। এর জন্যে বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের অজ্ঞ, অনক্ষর-অনুন্নত রাষ্ট্রগুলোকে গণশিক্ষার, ভাতে-কাপড়ে গণপোষণের, রাষ্ট্রিক অর্থসম্পদ বৃদ্ধির, বিজ্ঞান চর্চার, আবিষ্কারে উদ্‌ভাবনে অংশগ্রহণের যোগ্য লোক তৈরির দায়িত্ব নিতে হবে। কেননা অসমানে সম্প্রীতি হয় না, জাগে না পরস্পরের প্রতি সম্মান-শ্রদ্ধার ভাব, ঘৃণা-ঈর্ষা-হিংসা-অসূয়া-অবজ্ঞা দূর করা না গেলে স্ব স্ব মতলবে একত্রিত হলে, জনতা গড়ে ওঠে, তাতে বিরোধ বিবাদ সংঘর্ষ সংঘাতই ঘটে ও বাড়ে, মিলন হয় না, বন্ধুত্ব হয় না, সহযোগিতার কারণ ঘটে না। দুশমনি মাত্রই ক্ষতির কারণ, আর দোস্তীমাত্রই সমানুভূতি ও সহযোগিতাপ্রসূ। আফ্রো-এশিয়া-লাতিন আমেরিকার রাষ্ট্রগুলো আজ অজ্ঞতা-অনক্ষরতা-নিঃস্বতা, অসুস্থতা-দরিদ্রতার শিকার। আঞ্চলিক সহযোগিতায়, এলাকাওয়ারী সমস্যা-সংকটের সমাধানে সমবেত প্রয়াসই এদের দ্রুত আধুনিকতায় তথা সমকালীন বা স্বকালীন উঁচু মানের মাপের ও মাত্রার জীবনযাত্রা, জীবনযাপনপদ্ধতি এবং চিন্তা-চেতনা মনন-মনীষা অভিন্ন স্তরে উন্নীত করতে পারে।

আমাদের বাঙলাদেশ রাষ্ট্র শুধু দরিদ্রতম রাষ্ট্র নয়, দুর্নীতিবাজআকীর্ণও। তাছাড়া এ রাষ্ট্র এত দরিদ্র যে সর্বক্ষেত্রে ঋণ, দান ও ত্রাণদাতা প্রভুর হুকুম-হুমকির অনুগত ও নতজানু বান্দা হয়েই থাকতে হয় অভ্যন্তরীণ শাসন প্রশাসন উন্নয়ন উৎপাদন নির্মাণ শিক্ষা স্বাস্থ্য চিকিৎসা কাঁচা-পাকা মালের আমদানীর রফতানীর ক্ষেত্রেও। আমাদের সার্বভৌমত্ব যতটা দেখানো শোনানো যায়, ততটা অনুভব করা যায় না। মুৎসুদ্দি সরকার ও শাসন যন্ত্রীর হাতে যান্ত্রিক না হয়েই পারে না। কিন্তু এর থেকে মুক্ত হবার জন্যে আমাদের দেশে আদর্শনিষ্ঠ সৎ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন নেতা, রাজনীতিক দল, মাটি ও মানুষপ্রেমী জনসেবী ত্যাগপ্রবণ জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক-বিবেচনা সম্পন্ন মানুষও মেলে না অধিক সংখ্যায়। যতই লোকসংখ্যা বাড়ছে ততই দরিদ্র ভুঁইফোড় বলেই হয়তো, মনুষ্যত্বহীন স্বার্থপর মানবপ্রজাতির নিষ্ঠুর প্রাণীর সংখ্যাই যেন বেড়ে চলেছে। শঙ্কা, দুশ্চিন্তা ও হতাশা এজন্যেই এ মুহূর্তে আমরা নীতি-নিয়ম আইনশৃঙ্খলাহীন আরণ্য জীবনই যাপন করছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুঁজিবাদের ছোবল ও মৌলবাদের বিস্তার

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে য়ুরোপীয় চেলাদের সাহায্যে সমর্থনে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর অধিকাংশই বিলুপ্ত। অন্যগুলোর বিলুপ্তি বিপদ হয় আপন্ন অথবা আসন্ন। আজ কিউবা কিংবা চীনও হুমকির মুখে রয়েছে। ক্লিনটন যে-কোন দিন কিউবাকে কাবু ও কবজা করবার জন্যে এগিয়ে আসতে হাত বাড়াতে পারে, এ আশঙ্কা অমূলক নয়, ইতোমধ্যে বৃশ বন্ধুসুলভ হিতবাণী কাস্ট্রোর প্রতি উচ্চারণও করেছেন। একে একে সমাজতান্ত্রিক দেউটি নেভার দিকে এগুচ্ছে মনে হলেও এর মধ্যে পুরো সত্য নেই। আমাদের ধারণা পূর্বয়ুরোপে ও প্রাক্তন সোভিয়েট ইউনিয়নভুক্ত রাষ্ট্রগুলোতে অনুশোচনা জাগবে। কেননা, তারা পুরোনো সামন্ত বুর্জোয়াজীবনের ও সমাজের সব দুর্ভোগের ও দুর্দশার শিকার ইতোমধ্যেই হয়েছে। সেই যোগ্যতমের উর্ধ্বতন, সেই 'জোর যার মুলুক তার' নীতি এখন থেকেই চালু হয়ে গেছে। কাজেই দুষ্ট দুর্জন দুর্বৃত্ত দুরাত্মা দুষ্কৃতী এখন সেসব সমাজে প্রবল হচ্ছে। দুর্বল অজ্ঞ অসমর্থ নির্বোধ অন্ধ খঞ্জ রুগ্ন অনাথশিশু বালক বৃদ্ধ বৃদ্ধা এখন থেকে বঞ্চিত প্রতারিত শোষিত পীড়িত ও লুণ্ঠিত হতে থাকবে। সমাজ এখন ভিখেরী, বেশ্যা, চোর ও চোরাচালানকারী, মজুতদার ঘুষখোর দালাল, জুলুমবাজ জোচ্চোর জুয়ারী আকীর্ণ হয়ে উঠবে। এখন থেকে জনগণ তাদের কিছুকাল আগের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার কালের এবং এখানকার মুক্ত আর্থ সামাজিক ও ধার্মিক জীবনের অবস্থার ও অবস্থানে বৈপরীত্য হাড়ে হাড়ে অনুভব উপলব্ধি করে প্রথমে আফসোসে ভেঙে পড়বে, পরে পূর্বাবস্থায় অর্থাৎ সমাজতন্ত্রে ফিরে যাবার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়বে, এ-ই আমাদের ধারণা ও প্রত্যাশা। কেননা, তারা খেয়ে পরে বাঁচার নিশ্চয়তা হারিয়েছে, হারিয়েছে বেঁচে থাকার জন্মগত স্বীকৃত অধিকার। রাষ্ট্র বা সরকারও বর্জন করেছে সমর্থদের কাজ দিয়ে কিংবা অসমর্থদের ভাতা দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার আবশ্যিক ও জরুরী প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য। জনগণেরও বাঁচার জন্মগত অধিকার ও দাবি রইল না। সামন্ত বুর্জোয়া সমাজ কৃপা-করুণা-দান-দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতিকে ব্যক্তিক হৃদয়বানতা বলেই জানে, ধনীলোকের বা সরকারের দায়িত্ব বলে মানে না। কাজেই হতাশা এবং উল্লাস ত্যাগ করে পৃথিবীব্যাপী মানববাদী মানুষ মাত্রই আবার শোষণ-পীড়ন মুক্ত সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্যে জীবনপণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হবে দরিদ্র পৃথিবীর সর্বত্র—এ আশায়, এ আশ্বাসে ও এ প্রত্যয়ে আমরা আস্থা হারাইনি আজো।

অন্যদিকে আফ্রো-এশিয়ায় অনেক রাষ্ট্রেই মৌলবাদ প্রসারমান। এর বিস্তার আমাদের শঙ্কিত ও ত্রস্ত করছে। প্রাক্তন ফরাসী উপনিবেশ আলজিরিয়ায় ফরাসী ভাষা-সাহিত্য শিল্প-সংস্কৃতি প্রভাবিত মানুষের সংখ্য কম নয়, তবু তেমন দেশেই মানুষের সম্মুখ দৃষ্টির চেয়ে অতীতমুখিতা বেশি, প্রাগ্রসরতার চেয়ে পিছুটান অধিক দেখে ও শুনে আমরা বিশ শতকের শেষ দশকে মানুষের ভবিষ্যৎ ভেবে হতাশ না হয়ে পারি না। আগে বিজ্ঞানের ও যুক্তিবাদের কিংবা প্রত্যক্ষবাদের হিতবাদের অবশেষে মার্কসবাদের প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা দেখে আমরা বিশ্বমানবের সুখের স্বস্তির সুদিন সম্বন্ধে আশ্বস্ত ছিলাম। আমাদের আশা, বিশ্বাস ও ধারণা এখন ভঙ্গুর কাচের মতো ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা যুগান্ত চাই, যুগসংক্রান্তি চাই সুদিন-সুদশার প্রত্যাশায়। কিন্তু বিশ্বমানবের জীবনে যেন দুর্দিন দুর্ভোগ দুর্দশাই বেড়ে চলবে অভাবিতভাবে। কালের চাকা যেন পিছু হটছে। মন-মনন যেন অতীতের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘুচিয়ে সভ্যতার শৈশবে বাল্যে ফিরে যেতে চাইছে। মৌলবাদী মাত্রই অতীতমুখী, বর্তমান তাদের কাছে অসহ্য, ভবিষ্যৎ অনভিপ্রেত। আলজিরিয়ায় তাই ফরাসী মনন ও সংস্কৃতি মৌলবাদীদের কাছে পরিহার্য। তারা নির্বাচনে জয়ী হচ্ছে, হবে। এর একটি প্রত্যক্ষ আপাত কারণ হয়তো সেনাবাহিনীর হাতে মৌলবাদীর লাঞ্ছনাই জনগণকে বর্তমান সরকারের ও সরকারীদলের প্রতি বিরূপ করেছে। সে বিরূপতাই ভোটারদের প্ররোচিত করেছে মৌলবাদীদের পক্ষে ভোটদানে, দ্বিতীয় কারণ বর্তমান জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের একদলীয় লাগাতার ত্রিশ বছরের একঘেয়ে শাসনে জনগণের মনে সঞ্চিত বিরাগ ও ক্ষোভ। যা-ই হোক, ইসলামিক স্যালভেশান দলের এ বিজয় পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ও রাজ্য তিউনিসিয়াকে ও মরোক্কোকে এমনকি মিশর প্রভৃতি সব রাষ্ট্রকে শঙ্কিত করে তুলছেই। কেননা এ মৌলবাদ একপ্রকারের সংক্রামক মতবাদ, এর বিস্তার যেন বাড়ছে দ্রুতগতিতে। আমাদের বাঙলাদেশের বর্তমান সরকারও মানসিকতার ও আদর্শের দিক দিয়ে মৌলবাদ ঘেঁষা এবং মৌলবাদীর সমর্থনপুষ্ট আর মৌলবাদীর ছাত্রদল ও সরকারের প্রশ্রয় ও আশ্রয়পুষ্ট। প্রমাণ চট্টগ্রাম জিলা, এটি এখন শিবির কবলিত। পৃথিবী আজ পুঁজিবাদীর ছোবলে কাতর এবং মৌলবাদীর প্রসারে শঙ্কিত। যুগোপযোগী চিন্তা-চেতনায় ঋদ্ধ শিক্ষিত ছাত্র-যুব-জনতাই কেবল মানবতার ও মানবসমাজের এ সংকটকালে সংকট মোচন লক্ষ্যে প্রতিবাদে ও প্রতিরোধে এগিয়ে আসতে পারে।

AMARBOI.COM

ধূর্তের পুঁজি ধর্ম

সৎ ও মহৎ উদ্দেশ্যে এবং মুখ্যত গণমানবের মানসিক ও বৈষয়িক ব্যবহারিক কল্যাণে কোন বাণী বা মতবাদ উচ্চারিত হলেও তা অচিরে মতলববাজ ধূর্তব্যক্তিরা জীবিকার্জনের কিংবা প্রভাববিস্তারের প্রয়োজনে প্রতারণা, প্রবঞ্চনামূলক কাজে লাগাতে পারে, তাকে বাকপটুতায় মনে ও মর্মে লাগিয়ে। এমনি মতবাদের মধ্যে অদৃশ্য অলীক-অলৌকিক আসমানী ছোট বড় মাঝারি অরি-মিত্র শক্তির উপকারী ও অপকারী লীলা বা ভূমিকা এবং তার ইহ-পরলোকে প্রসৃত জীবনে এ শক্তির প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণসামর্থ্যই সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান এবং হয়তো অবিচ্ছিন্নভাবে চিরন্তনও।

সর্বপ্রাণবাদের কাল থেকেই মানুষ যাদুবিশ্বাস, ট্যাবু টোটেম, ভূত প্রেত দেও দানু রাক্ষস খোক্ষস ড্রাগন জীন-পরী প্রভৃতি নানা শক্তির কল্পনায় ও তাদের অস্তিত্বে আস্থা ও ভয়-ভরসা রেখে আজ অবধি জীবন-জীবিকা ক্ষেত্রে মানস স্বস্তি খুঁজে পাচ্ছে এবং বৈষয়িক ব্যবহারিক জীবনে ভয়-ভক্তি-ভরসা চালিত জীবনে সাফল্যে দৃঢ় বিশ্বাসী হচ্ছে এবং ব্যর্থতায় প্রবোধ পাচ্ছে। যেহেতু যথার্থ অর্থে কৃচিৎ কেউ আজো যুক্তিবাদী ও মানবাদী, সেহেতু সাধারণের মধ্যে যৌক্তিক বৌদ্ধিক জীবন চর্যা ও চর্চা নিতান্ত দুর্লক্ষ্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবাই আশৈশব প্রাপ্ত বিশ্বাস-সংস্কার নির্ভর জীবন যাপন করে। তাদের অজ্ঞতার, অপূর্ণতার, মনুষ্যত্বের স্বল্পতার কিংবা রিক্ততার ধারণাও তারা করতে জানে না, পারে না। তার ফলেই মানুষ প্রজন্ম ক্রমে সর্বত্র তুকে-তাকে ঝাড়ে-ফুঁকে বাণে উচ্চাটনে তাবিজে কবচে, মন্ত্রে-মাদুলীতে পানি-ধুলিপড়ায়, রাশিনিয়ামই ধাতব পাথুরে অঙ্গুরী ধারণে আজো বিপন্মুক্তির ও কার্যসিদ্ধির ভরসা পায়। এবং আমরা জানি Faith is not reasons labour, but repose (Young), মানবেন্দ্রনাথ রায় বলে, 'A body of superstitions prejudices social customs irrational modes of liring'.

রাজা-বাদশাহরা তো চিরকালই মানুষের ধর্মভাবকে ও শাস্ত্রভীরুতাকে কাজে লাগিয়ে অর্থাৎ তাদের উদ্দীপনা-উত্তেজনাকে আবেগ-উদ্বেগকে যথাপ্রয়োজনে যথাস্থানে যথাকালে ও যথাপাত্রে কাজে লাগিয়ে ফায়দা ওঠাতেন। শাহ-সামন্তের সেই নীতি একেবারে অপরিবর্তিত আকারে ও প্রকারে যুগপৎ ও একাধারে আজো রাজনীতিকরা কাজে লাগিয়ে থাকে। আমাদের বাঙলাদেশের রাজনীতি এ মুহূর্তে সবচেয়ে বেশী পরিমাণে ধর্মধ্বজীদের, শাস্ত্র-ব্যবসায়ীদের কবলিত। তারা সর্বক্ষণ ইসলামকে ও মুসলিমকে অদৃশ্য ও দৃশ্য কাফের শত্রুর কাছে বিপন্ন বলে প্রচার করে। অজ্ঞ অনক্ষরদের ও লেখাপড়া জানা নির্বোধদের এ প্রচারণা প্ররোচিতও করে। 'নিকটে কাফের রাজা বড়ই প্রবল' আমাদের সমকালীন জীবনচেতনালাভের পক্ষে প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনার বিস্তার ও উৎকর্ষের পথে এ এক দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। শাস্ত্রনিষ্ঠায়, সমকালীনতা থাকে না, থাকে অতীত ও ঐতিহ্য প্রীতি। এ নিষ্ঠা যন্ত্রযুগের ও যন্ত্রজগতের সঙ্গে জীবনের যে দেহ, প্রাণের সম্পর্ক ও সম্বন্ধ তা বুঝতে দেয় না। কাজেই আমরা প্রগতি-প্রতিক্রিয়ার দ্বিধায় দ্বন্দ্বে ভুগতে থাকি।

অতীতমুখিতা আমাদের বন্ধ্যাত্বের অবক্ষয়ের, গতানুগতিকতার অন্ধত্বের Mysticism, Humanism, Positivism, Marxism, Pragmatism, Utilitarianism, Stoicism, Etheism প্রভৃতি কোন "ism"-ই কিছুটা যুক্তি, বুদ্ধি, বিবেক-বিবেচনা অনুভব উপলব্ধি ভিত্তিক হয়ে সাধারণভাবে মগজ কিংবা সমাজগ্রাহ্য হল না, হবেও না, হয়তো কখনো। অবিকাশের, অপ্রাপ্তির দিকে নিয়ে যায় সমকালীনতা ও আন্তর্জাতিকতা, আমাদের মনের মননের মগজের ও মনীষার বিকাশ-বিস্তার ঘটায় আমাদের বৈষয়িক-ব্যবহারিক জীবন ঋদ্ধ করে।

ধূর্তরা সমাজের সর্বস্তরেই রয়েছে এবং যথাপ্রয়োজনে যথাস্থানে, যথাকালে যথাপাত্রে কাজে লাগায়। ধর্মধ্বজীদের শাস্ত্রানুগত্যের নামে যেমন ভোটযুদ্ধ চলে, তেমনি বাজারে শাস্ত্রপ্রয়োগে চোর নিরূপণও হয় সম্ভব। গোড়ার দিকে রোমান দার্শনিক (Seneca) সেনেকা জানতেন যে Religion is regarded by the common people as true, by the wise as false and by the rulers as useful. কোটিল্যও গণবিশ্বাসকে শাসন-প্রশাসনের কাজে লাগানোর তত্ত্ব জানতেন, ম্যাকিয়াভেলিতো এ তত্ত্বের গুরুত্ব চেতনায় জগৎ-গুরু। এমনকি নোপোলিয়ানও নাকি কলেমা উচ্চারণ করেই বিনা যুদ্ধে মিশর জয় করেছিলেন। আমাদের আজ প্রধান সমস্যা অজ্ঞের ও নিরেট নিখাদ ভুতুড়ে বিশ্বাসসম এ কানে শোনা ধর্মবিশ্বাস যা বিচ্ছিন্নতায় বিকৃত, খণ্ডতায় অসঙ্গত অযৌক্তিক ও অসমঞ্জস ভয়-ভরসা বিজড়িত নিতান্ত অবোধ্য সংস্কার মাত্র। এবং অন্যদিকে চালবাজ মতলববাজ ধূর্ত রাজনীতিকদের এবং ভূত-ভগবানের নামে নানা পেশাজীবীর জীবিকা অর্জনের নামে প্রতারণাজীবিতা। এ কানে শোনা বিশ্বাস ও শাস্ত্রানুগত্য যতকাল প্রবল থাকবে, ততদিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা শাস্ত্রের নামে প্রতারক রাজনীতিকদের ও ধর্মধ্বজী ধার্মিকের ও জীবিকান্বেষী ধর্মব্যবসায়ীদের কবল থেকে অজ্ঞতার ও বিশ্বাসের দুর্গে আবদ্ধ যুক্তি-বুদ্ধি প্রয়োগে অনীহ মানুষকে উদ্ধার করে স্বস্থ ও সুস্থ মানববাদী ইহজগৎ সচেতন মানুষের সমাজ গড়ে তুলতে পারব না, ততদিন আমাদের কোন মানসোৎকর্ষ জাত মঙ্গলও হবে না। এজন্যেই মার্কস ধর্মবিশ্বাসকে আফিমের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। এ ধর্মে বিশ্বাস ও শাস্ত্রপ্রীতি মানুষকে অন্যভাবেও পঙ্গু রেখেছে। মানুষ মানুষে রয়েছে কাঁটাতারের বেড়া, সে-বেড়া শাস্ত্রের, স্থানের, ভাষার, মনের, মতের, বিত্তের, বিদ্যার বটে, কিন্তু অলঙ্ঘ্য অভেদ্য বাধা হচ্ছে স্বশাস্ত্রে দৃঢ় বিশ্বাস। বিশ্বাসের, সংস্কারের, রুচির, সংস্কৃতির ও আচারের পার্থক্যজাত ঘৃণা, অবজ্ঞা, স্বাতন্ত্র্যচেতনা প্রসূত কাঁটাতার খচিত খাঁচায় বদ্ধ মানুষ কোথাও ভিন্ন খাঁচার মানুষের সঙ্গে মিলতে পারছে না। অভিন্ন প্রজাতির প্রাণী হয়েও দুনিয়াতে দার্শনিক চিন্তা প্রসূন কত "ism" বা মতবাদ এল, কিন্তু ঘুচাতে পারল না বাধা-বিবাদ-বিরোধ। Mysticism, Humanism, Positivism, Marxism, Pragmatism, Utilitarianism, Stoicism, Etheism প্রভৃতি কোন "ism"-ই কিছুটা যুক্তি, বুদ্ধি, বিবেক-বিবেচনা অনুভব উপলব্ধি ভিত্তিক হয়েও সাধারণভাবে মগজ কিংবা সমাজগ্রাহ্য হল না, হবেও না, হয়তো কখনো। কিন্তু এসব দর্শনরূপে আলোচিত থাকবে চিরকাল।

AMARBOI.COM

গণতান্ত্রিক মন-মেজাজ গড়ার জন্যেও প্রশিক্ষণ প্রয়োজন

তৃতীয় বিশ্বে প্রতীচ্য আদলে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক সরকার চালু করার আগ্রহ কিংবা দাবি সর্বজনীন বটে, কিন্তু অজ্ঞ অনক্ষর এবং অনভিজ্ঞ বলে আধুনিকতম গণতান্ত্রিক শিক্ষা ও দীক্ষা আমাদের কারো আত্মস্থ না হওয়ায় এর স্বরূপ কোথাও সুপ্রকট নয়, বিকৃতি-বিচ্যুতি একে প্রায় জোর-জুলুমের, জবরদখলের, আইন না মানার, 'জোর যার মুলুক তার' নীতির, অর্থে সম্পদে ক্ষমতার অপ্রয়োগের প্রবণতার পর্যায়ে নামিয়ে দেয়। এবং গোটা দেশের সমস্যা-চাহিদার চেয়ে স্ব স্ব প্রতিনিধিত্বের অঞ্চলের প্রভাবশালী চেলাদের তুষ্ট-তৃপ্ত-হৃষ্ট রাখার জন্যে অনীতি-অন্যায় অপহ্নাবরণের আগ্রহ আর ব্যক্তিগত অর্থসম্পদ মান-খ্যাতি-ক্ষমতা লিপ্সা সাংসদের নীতি ও আদর্শভ্রষ্ট করে। এ জন্যে প্রাতীচ্য কায়দায় এঁদের মধ্যে আত্মরতির স্থলে আত্মমর্যাদা আর দায়িত্ব ও কর্তব্য চেতনা জাগানো দরকার। এ দায়িত্ব শহুরে শিক্ষিত নীতি-আদর্শনিষ্ঠ সরকার-শত্রু বুদ্ধিজীবী বক্তা-লেখকদের।

দলের লোকদের তুষ্ট রাখার জন্যে প্রয়োজনের পাঁচগুণ মন্ত্রীপদ সৃষ্টি ও পূরণ করতে হয়, অন্যান্য দলীয় সাংসদদের আত্মীয়-স্বজন-জামাই সন্তানদের চাকরি-ব্যবসায় ধরিয়ে দিতে হয়, এমনকি দুর্নীতিকেও প্রশ্রয় দিতে হয়, দিতে হয় তাদের অপরাধী আত্মীয়দের আশ্রয়, মুক্তি দিতে হয় লুটেরা খুনীকেও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একবার সাংসদ বা মন্ত্রী হতে পারলে তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোর দুর্নীতিপরায়ণ সাংসদ গুপ্ত পথে অর্জিত অর্থসম্পদে সারাজীবন গাড়ি-বাড়ি-নারী নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করে। জনগণের শ্রদ্ধা-নিন্দা, ভক্তি-অবজ্ঞা কোনটাই তাদের কাছে লাভ-ক্ষতির বিষয় নয়। যথাসময়ে অর্থব্যয়ে মাস্তান গুণ্ডা খুনী নিয়োগে জোরজুলুমে পুনরায় ভোটযোগাড়ের কায়দাকানুন-কৌশল তাদের আয়ত্তে থাকে। এদের প্রায় সবাই নানা অপকর্মের দাগে দাগী। কাজেই তৃতীয় বিশ্বে রাজনীতিক দলে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি কৃচিৎ কখনো মেলে। তারা জনহিতকর ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের কোন অনুশীলনই করে না, কেবল মিথ্যা ভাষণে, আশা-আশ্বাস জাগিয়ে জনগণকে আপাত আশ্বস্ত ও প্রতীক্ষু রাখার মতো বানানো নানা কাজের পরিকল্পনা ও ভিত্তিস্থাপন মানুষের কানে চোখে মনে ধরিয়ে দেয়। হচ্ছে-হবে এ বুলিই মন্ত্রী ও সাংসদের মুখে মুখে প্রতিদিন উচ্চারিত হতে থাকে। এদের মুখে কখনো হবে না, অর্থাভাবে পারা যাবে না, এসব সত্য কথা উচ্চারিত হয় না।

সবচেয়ে যা জনগণকে হতাশ করে, সরকারের উপর আস্থা হারাতে বাধ্য করে তা হচ্ছে, সাংসদ-মন্ত্রীদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতা, নির্মমতা, অবিবেচনা এবং সাধারণ সৌজন্য ও মানবিক সংবেদনশীলতার অভাব। এরা প্রবঞ্চনাকে, প্রতারণাকেই যেন সাংসদ জীবনের পুঁজি-পাথেয় করে নানা বানানো বয়ানে সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য বলে চালিয়ে দেয়। তৃতীয় বিশ্বের রেডিয়ো টিভি সিনেমা-নাটক সংবাদপত্র, প্রভৃতি সব কিছুই সরকার নিয়ন্ত্রিত। অনুগত চাকুরেরা এবং সরকারের কৃপা-করুণাজীবী চিত্রী-কবি-সাহিত্যিক-সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবীরাই সরকার সেবক।

এ স্তাবক চাটুকারদের সমর্থন ও তারিফ আর আনুগত্য পেয়েই সরকার এবং রাজনীতিক প্রধান দলগুলোও এদের গোপন দোস্তী ও সমর্থন পায় বলেই এদেশের সংবাদপত্রে রাজনীতিক নামে খ্যাত দালাল, টাউট, মাস্তান গুণ্ডা সিআই-এ-র (RAW) পূর্বতন কেজিবি আর দেশী ডিজিএফআই, এনএসআই অ্যাজেন্টদের বিরুদ্ধে কিছু জানা শোনা দেখা সাক্ষ্য প্রমাণ কিংবা প্রাপ্ত দলিলে পাওয়া তথ্যও ফাঁস করে না। দেশে মাটি মানুষ প্রেমী-দুর্লভ, দুর্লক্ষ্য, বিরলতায় অপ্রাপ্য, তাই এখানে মিথ্যার, প্রতারণার, প্রবঞ্চনার মিথ্যা আশা-আশ্বাস দানের ফাঁকা চমক লাগানোর ভেল্কীবাজি সব চলে। আজকের দৈনিক সংবাদপত্রে দেখলাম, প্রধানমন্ত্রী আমাদের সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করতে হবে বলে কোন ভাষণে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা দিয়েছেন। কিন্তু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে নিশ্চয়ই আমাদের জিজ্ঞাসা করার অধিকার রয়েছে তাঁকে। সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করার দরকার কি? কার বা কাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্যে? ভারতের সঙ্গে, বার্মার (মায়ানমার) সঙ্গে, চীনের সঙ্গে, নেপালের সঙ্গে? ওরা কি আমাদের দেশদখলের মতলব আঁটছে, আমাদের দেশের প্রতিরক্ষা কি এ মুহূর্তে বিপন্ন? দেশের লোককে ভাতে-কাপড়ে পোষার আর্থিক সামর্থ্য নেই যে-রাষ্ট্রের বা সরকারের ঋণ-দান-ত্রাণ-কৃপা-করুণা নির্ভর যে-রাষ্ট্র তার সরকারের মুখে সেনাবাহিনী শক্তিশালী করার ঘোষণা বা আস্ফালন জনগণকে অজ্ঞ নির্বোধ চমকপ্রিয় ভেবে তারিফ কুড়োনোর কিংবা সেনাবাহিনীকে বশে রাখার দুষ্ট বুদ্ধিপ্রসূত নয় কি? আমাদের মতো দরিদ্র ও ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের দশ/বারো লক্ষ সৈন্য পোষার সামর্থ্য আছে কি? যদি না থাকে, তা হলে নিয়মিত সামরিক জল-স্থল-বায়ুবাহিনী না রেখে কেবল গেরিলা কমাণ্ডো লড়াকু সাহসী যোদ্ধা তৈরি করে রাখাই অর্থাৎ নিয়মিত প্রশিক্ষণ দিয়ে দিয়ে জনগণকে গণযুদ্ধের জন্যে, দেশরক্ষার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্যে শিক্ষা ও দীক্ষা দেওয়াই কি বাঞ্ছনীয় নয়? গরীব দেশে নিয়মিত স্থল-জল-বায়ুবাহিনী পোষা আর গরীবের অকারণে অপ্রয়োজনে হাতী পোষার মতোই অকেজো অপচয় মাত্র। আর দেশের দুষ্টজনদের রাজনীতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের শায়েস্তা রাখার জন্যে মারার হানার কয়েদ করার জন্যে পুলিশই কি যথেষ্ট নয়? বেগম খালেদা জিয়ার স্বামীও জনসাধারণের মনে আশা আশ্বাস জাগিয়ে তারিফ ও আনুগত্য যোগাড় করতেন এখানে ওখানে থানা, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান, সেতু, রাস্তা নির্মাণের ঘোষণা দিয়ে ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে। আর কৃষির উন্নতির জন্যে এখানে সেখানে খাল কেটে জমি নষ্ট করে ও কৃষকের উপকার লক্ষ্যে। উলসি যদুনাথপুরের কিংবা ময়মনসিংহের খালের ফল-ফায়দার হিসেব কিন্তু আজো মেলেনি। এরশাদও লোকপ্রতারণায় পাকা ছিলেন। এখন পথকলি কোথায়? কোথায় তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা চালু করার জন্যে আলাদা করে রাখা এগারোশ' কোটি টাকা? বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্যে বেড়ীবাঁধ বা তিনতলা পাকা আশ্রয়কেন্দ্রই বা কয়টা তৈরি হয়েছে? দানের ও রাষ্ট্রের অর্থ ও সামগ্রী এরশাদের নেতৃত্বে বখরা হিসেবে কারা নিল ভাগবাঁটোয়ারা করে? গণতন্ত্র চালু ও অবিকৃত আর কেজো রাখার জন্যে সচেতন সতর্ক রাজনীতিক ও সৎ শহুরে শিক্ষিত নীতি-আদর্শনিষ্ঠ মাটি ও মানুষ প্রেমী নাগরিকদের সাধারণত সরকার-সমালোচক হওয়া দরকার।

AMARBOI.COM

ঘরে বাইরে শান্তির ও সহাবস্থানের পন্থা

আজকের দিনে শহরে সচ্ছল শিক্ষিত ঘরে যে শিশু জন্মে, সে শৈশব বাল্য কৈশোর থেকেই অনেক অলীক, অলৌকিক ও শাস্ত্রিক বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা থেকে সহজেই মুক্ত থাকে। যেমন শৈশব থেকেই তার ক্যামেরায় ছবিতোলা দেখে রেডিয়ো-টিভি-ক্যাসেটে বিভিন্ন ঘরের ও বিভিন্ন বয়সের অনাত্মীয় নারী-পুরুষের রাস্তা ঘাটে চলাফেরা দেখে, স্কুলে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে সহশিক্ষা দেখে, নায়ক-নায়িকা কিংবা মা-মেয়ে ছেলে-বাপ-বেটি, প্রেমিক প্রেমিকা কিংবা কামুক-কামিনী হয়ে অভিনয় করতে দেখে দেখে এর মধ্যে যে অশাস্ত্রিক কিছু আছে, তা ভাবতেও পারে না। হোটেল-রেস্তোরায় অচেনা হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীস্টান-মুসলমানের অভিন্ন ও নির্বিচার খাদ্য গ্রহণ দেখে দেখে কোন খাদ্য সম্বন্ধে তার কোন পূর্বলব্ধ ভীতি ঘৃণা থাকে না, তেমনি য়ুরোপীয় কিংবা বোম্বে ছায়াছবি দেখে দেখে তার পোশাকী শ্লীলতার অশ্লীলতা সম্বন্ধে দৃষ্টি প্রসারিত হয়, ঘুচে যায় তার রক্ষণশীলতাজাত দৃষ্টিবিভ্রম, তেমনি তার আধুনিক আন্তর্জাতিক মন-মনন, রুচি-সংস্কৃতি, পোশাকী ও খাদ্যিক অভ্যাস আর আচার-আচরণ আদব-লেহাজই বরণীয় হয়ে যায়। এভাবে একালে শহুরে শিক্ষিত ঘরে অতি সহজেই স্ব স্ব মানসশক্তি অনুসারে মুক্ত মনের যুক্তি-বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ হয়ে উঠতে পারে, যদি না মা-বাবা প্রভৃতি পরিবার সদস্যরা লেখা-পড়াজানা ভয়-বিস্ময়-ভক্তি-ভরসাবাদী রক্ষণশীল বিশ্বাস-সংস্কার ধারণাবদ্ধ মানুষ হয়। এমনি শাস্ত্রিক বিশ্বাসানুগ আচারনিষ্ঠায় ব্যক্তির, সমাজের কিংবা রাষ্ট্রের কোন মঙ্গল আনে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুক্তমনে কল্যাণকর মত গ্রহণকেই বলে সমকালীনতা, যুগধর্মিতা, গতিশীলতা ও প্রগতিচেতনা। দেহ-প্রাণ-মন-মনন-মনীষার এ কালানুগত্য, এ সময়ের আহ্বানে সাড়াদান প্রবণতাই প্রতিটি ব্যক্তিতে প্রত্যাশিত। কিন্তু ১৯৯৩ সনেও পৃথিবীর কোন দেশে রাষ্ট্রে ঘরে তা প্রত্যাশিত সংখ্যায় পাওয়া যায় না। ফলে মানুষ একই কালে বাস করেও একই রকম শিক্ষালাভ করেও পারিবারিক শাস্ত্রিক মানসিক প্রতিবন্ধিতার জন্যেই অন্যদের সমসাময়িক হয়েও একই সময়ে মানসবিচরণ করে না, ধার্মিক ইহুদী সাড়ে তিন হাজার বছরের, ধার্মিক হিন্দু তিন হাজার বছরের, ধার্মিক বৌদ্ধ আড়াই হাজার বছরের, ধার্মিক খ্রীস্টান দু'হাজার বছরের এবং ধার্মিক মুসলিম দেড় হাজার বছরের আগে প্রাতিবেশিক ভুবনে বাস করে। সে-মানস ভুবনে অলীক, লৌকিক, অলৌকিক, অযৌক্তিক অসত্য বলে সে কিছু জানে না, বোঝে না, মানেও না। তার জীবনের বাস্তব জ্ঞানকে ও অভিজ্ঞতাকে চোখ চেয়ে অস্বীকার করার মতো মোহ ও মূর্খতা তাকে পেয়ে বসে, এ মানুষকে, এ মানুষের মত-মন্তব্য-সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ না করা ভুলকে, মিথ্যাকে, অকল্যাণকে বিনা শর্তে মেনে নিয়ে মিথ্যাকে ও অনৃতকে স্বেচ্ছায় আশ্রয় প্রশ্রয় দেয়া অবিবেকীয় কাজ। এতে মনুষ্যত্বই অবমানিত হয়, প্রাণীর বৃত্তি-প্রবৃত্তিকেই কেবল সসম্মান সহ্য করা হয় মাত্র। এতে ব্যক্তিমনের যৌক্তিক ও বৌদ্ধিক মুক্তির পথ প্রতিরুদ্ধ হয়। সমাজ বদ্ধ জলাশয়ের মতো হয় পচনশীল, মানব প্রগতির পথ হয় রুদ্ধ। রক্ষণশীলতায়, স্বাতন্ত্র্যচেতনায়, সাম্প্রদায়িকতায়, বিচ্ছিন্নতায় বিরোধে বিবাদে বিতর্কে সমাজ ও রাষ্ট্র হয় দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-সংঘাত বহুল। এতেই আমরা বুঝতে পারি রক্ষণশীলতা অনুদারতা অসহিষ্ণুতা, অসৌজন্য প্রভৃতির জন্ম হয় যুক্তি-বুদ্ধি-প্রজ্ঞা-বিবেকরিক্ত চেতনায় তথা মগজে মননে। এ অবস্থায় একজন ইজরাইলী ইহুদী মনীষী, দার্শনিক, রাষ্ট্রনায়ক কিংবা, দেশের মানুষের মন-মত-মনন-মনীষা নিয়ামক নিয়ন্ত্রক রাজনীতিক অথবা সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির স্রষ্টা ও অনুশীলক যদি সাড়ে তিন হাজার বছরের আগেকার অজ্ঞ জগতেরও অজ্ঞ জীবনের ভাব-চিন্তা-জীবিকা-চাহিদা প্রসূন কেতাবের প্রতি আক্ষরিকভাবে অনুগত থাকে, তা হলে সে কোন শ্রেয়সের সন্ধান দিতে পারবে তার স্বধর্মের, স্বসমাজের কিংবা স্বদেশের ভিন্ন মত-পথের মানুষকে? তার ভালো কি জগতেরও ভালো? তার অনুভূত স্বীকৃত সত্য কি সর্বজনীন ও সর্বকালীন সত্য? একজন ধার্মিক বিশ্বাসনিষ্ঠ ইহুদী ব্যতীত অন্যরা উত্তরে উচ্চকণ্ঠে বলবে 'না'। তেমনি হিন্দু বৌদ্ধ জৈন খ্রীস্টান মুসলিম শাস্ত্র সম্বন্ধেও ভিন্নমতের ও পথের লোক একই রূপ ধারণা পোষণ করে। তা হলে যাদুর খেলটি, শুভঙ্করের ফাঁকিটি কোথায়? একই উত্তর, বাল্যে মগজধোলাই জাত বিশ্বাসের সংস্কারের ধারণার দুর্ভেদ্য দুর্লঙ্ঘ্য দুর্গে বদ্ধতার মধ্যে। তাহলে কথাটা এই দাঁড়ায় যে বিশ্বের আস্তিকমাত্রই এক অলীক অলৌকিক অস্বাভাবিক অবাস্তব অনভিজ্ঞতার অনৃত স্বর্গে বাস করছে। প্রত্যেক আস্তিকই স্ব স্ব কেতাবী কথাগুলোকে নিখাদ নিখুঁত চিরন্তন, ঐশ, প্রয়োগসফল এবং অপরিহার্যভাবে প্রয়োজনীয় উপযোগঋদ্ধ অবিকল্প সত্য, তথ্য ও তত্ত্বরূপে জানে ও মানে। একের কেতাব অপরের কাছে অলীক ত্রুটিপূর্ণ অপ্রয়োজ্য উপযোগরিক্ত বাজে ব্যবস্থা ও নীতি বলেই প্রতিভাত হয়। এ অবস্থায় বিভিন্ন মতের ও পথের লোক সম ও সহস্বার্থে সংযমে, সহিষ্ণুতায়, সৌজন্যে নির্বিরোধে নির্বিবাদে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিরাপদে ও সামবায়িক সহযোগিতায় আপোসে সহাবস্থান করতেই পারছে না কোন দেশেই। উনজনমাত্রই অধিজনের কাছে আর্থিক মানসিকভাবে শোষিত পীড়িত ও লাঞ্ছিত হচ্ছে লঘু-গুরুভাবে। দুনিয়ার সর্বত্র গুণে মানে মাপে মাত্রায় সামান্য লঘু গুরুভেদ থাকলেও আজো জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-গোত্র-নিবাস-রুচি-সংস্কৃতি-শ্রদ্ধা-অবজ্ঞাভেদ ঘোচেনি।

অথচ আজো একশ্রেণীর ধর্মধ্বজী ও ধার্মিক মানুষ নীতিনিষ্ঠার বা নৈতিকতার ও শাস্ত্রনিষ্ঠার দোহাই দিয়ে মানুষকে রক্ষণশীল, স্বাতন্ত্র্যসচেতন, বিচ্ছিন্নতাপ্রিয় এবং বিমতের বিধর্মীর বিদেশীর বিভাষীর বিবর্ণের ও বিজাতির প্রতি বিদ্বিষ্ট করে তুলতে সদা প্রয়াসী। এরা বলছে শাস্ত্রিক ধর্মনিষ্ঠাই মানুষকে সৎ, আদর্শবাদী বিবেচক সুজন ও সুনাগরিক আর মানবিকগুণের সুপ্রতিবেশী, পরার্থপর প্রীতিপ্রবণ করে তোলে। এ ধারণার মধ্যে অবশ্য কোন সত্য নিহিত নেই। কেননা আমরা জানি প্রলোভন প্রবল হলে মানুষ গোপনে ও নির্জনে সব পাপই করে, যদিও জানে এবং মানে যে ঈশ্বর বা স্রষ্টা অন্তর্যামী। মানুষের অপকর্মে অনীহা বা বিরতির কারণ লোকভয় তথা সামাজিক নিন্দা এবং সরকারী শাস্তি। বড়জোর আত্মসম্মানের গুরুত্ব চেতনামাত্র। কাজেই ধর্ম যে মানুষের নৈতিক পতন রোধ করে কিংবা মানবিক গুণের বিকাশ সাধন করায়, তা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের বাস্তব জ্ঞানের-অভিজ্ঞতার সমর্থন পায় না। এ নিতান্ত অপরীক্ষিত ও অপ্রমাণিত চালু কথা আপ্তবাক্যমাত্র। অন্যদিকে আমাদের জ্ঞানে অভিজ্ঞতায়, সাক্ষ্য প্রমাণে যা জানি, তা পৃথিবীর বিভিন্নযুগের ও দেশের জ্ঞান বিজ্ঞান দর্শন সাহিত্য শিল্প স্থাপত্য প্রভৃতি মানববিদ্যার স্রষ্টা, গবেষক, আবিষ্কারক, উদ্‌ভাবক, অনুশীলক অনেক অনেক অনন্য অসামান্য ব্যক্তি ছিলেন মদে জুয়ায় দেহসম্ভোগে আসক্ত-অথচ তাঁদের কৃতি-কীর্তিই আমাদের সভ্যতা-সংস্কৃতির মনন-মনীষার উৎকর্ষের ক্রম প্রসারের উৎস, ফল ও ফসল।

আজ তাই বাস্তব জ্ঞান-অভিজ্ঞতার আলোকে ব্যক্তিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও আন্তর্জাতিক জীবন নির্বিরোধ নিরুপদ্রব নিরাপদ সামবায়িক সহযোগিতায় সহাবস্থানের যোগ্য করে তুলবার গরজেই আমাদের শাস্ত্রিক বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা ব্যক্তিক বিশ্বাসে আচারে নিবদ্ধ রাখতে সম্মত হতে হবে, বিশ্বাসের সামাজিক ও বাহ্যিক ভূমিকা ও সম্পৃক্তি অস্বীকার করতেই হবে। তাহলে আজকের গোটা পৃথিবীর মানুষের শঙ্কা-ত্রাস প্রাণহরা রক্তক্ষরা বর্ণ-ধর্ম-গোত্রদ্বেষণাজাত বার্ণিক, ধার্মিক গৌত্রিক দ্বন্দ্বসংঘর্ষ সংঘাত দাঙ্গা প্রভৃতি ক্ষুদ্র বৃহৎ লড়াই নির্মূল না হলেও অন্তত কমবে তো বটেই।

আজকের যুক্তিবাদী ও মানববাদী শাস্ত্রে আস্থাশীল বা আস্থাহীন ঈশ্বরবাদী প্রকৃতিবাদী মানুষ মাত্রকেই আত্মকল্যাণে ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের প্রয়োজনেই ব্যক্তিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও বৈশ্বিক জীবনে সেক্যুলার হতে হবে। এ নীতি বা অঙ্গীকার বাস্তবায়নের গরজেই বর্ণ, ধর্ম, গোত্র, ভাষা, সম্প্রদায়, অধিজন, উনজন ভিত্তিক রাজনীতিক কিংবা সাংস্কৃতিক অথবা অঞ্চল পেশা বা আর্থিক শ্রেণী ভিত্তিক দলগঠন নিষিদ্ধ করা আবশ্যিক ও জরুরী। আজকের গৌত্রিক, বার্ণিক ধার্মিক ভাষিক বিরোধ বিবাদ সংঘর্ষ সংঘাত কবলিত বিশ্বে এর গুরুত্ব ও অবিকল্পতা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমাজপরিবর্তনেই মানবমুক্তি সম্ভব

শিশু জন্মমাত্র দেহে প্রাণে মনে মুক্ত হয় বটে, কিন্তু শৈশব বাল্য কৈশোর থেকেই তার দেহ-মন-মনন-আচার আচরণ নীতির নিয়মের রীতির, রেওয়াজের প্রথার পদ্ধতির শাস্ত্রের বিবেকের সমাজের আইনের রাষ্ট্রের শৃঙ্খলকে স্বেচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় পরতেই হয় দলবদ্ধ জীবন যাপনের তাগিদে, যূথবদ্ধ সামাজিক জীবনে সহাবস্থানের প্রয়োজনে। তার যৌথজীবনে স্বাধিকারে নির্বিরোধে, নির্বিবাদে নিরুপদ্রবে নিরাপদে বাঁচার এবং অন্যদের বাঁচতে দেয়ার গরজেই নিজের প্রবৃত্তিকে অনেক পরিমাণে নিবৃত্তিমুখী রেখে সংযত, সহিষ্ণু ও সুজন হতে হয় তাকে।

এ তাৎপর্যে মনুষ্য জীবন হচ্ছে সর্বপ্রকারে আচারিক ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ছককাটা ময়দানে দীর্ঘ দড়িবদ্ধ পোষমানা প্রাণীর বিচরণ মাত্র। নিগড়মাত্রই স্বল্পবেড়ের, খাঁচামাত্রই স্বল্পপরিসরের, বন্ধনের মধ্যে সব প্রাণীই বদ্ধজীব। সে দেহে প্রাণে মনে মননে মনীষায় বিবেকে বিবেচনায় উদারও যখন হয়, তখনো সে পুরো মুক্ত মনের মননের ও মনীষার হতে পারে না। জ্ঞান-বুদ্ধি-মেধার একটা সীমার মধ্যে তাকে আটকে থাকতেই হয়, কেননা তার মন বুদ্ধি মগজ অলৌকিক মাত্রা অনুসারে একটা বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা-রুচি-অভ্যাসের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে গেছে। এ জন্যেই মানুষমাত্রেরই ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ দেশ-কাল-শাস্ত্রের পরিবেষ্টনীর প্রভাব প্রসূত। বুদ্ধির মুক্তি বা মুক্তবুদ্ধি কেবল সর্বসংস্কার ও অভ্যস্ত রুচি মুক্ত নিরীশ্বর নাস্তিকেই সম্ভব। আমরা জানি সে-মানুষ চিরকালই বিরলতায় দুর্লক্ষ্য থাকবে। কেননা আত্মপ্রত্যয়ী হওয়ার মতো জ্ঞান-যুক্তি-প্রজ্ঞা-প্রত্যয় নির্ভর সাহসী মানুষ চিরকালই দুর্লভ থাকবে। ভাঙা সোভিয়েত রাশিয়ার ও অন্যান্য দেশের ভ্রষ্ট কম্যুনিস্টরাই তার জাজ্বল্যমান সাক্ষ্য ও প্রমাণ। কাজেই সমাজ-সংস্কৃতি, নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ, প্রথা-পদ্ধতি, আচার-আচরণ, শাসন-প্রশাসন উৎসব-পার্বণ প্রভৃতি সবকিছুই আবর্তিত, বিবর্তিত কিংবা পরিবর্তিত হবে আস্তিক মানুষের মন-মনন-মনীষারূপ মগজী আবিষ্কার-উদ্‌ভাবনের ফুল-ফল-ফসলরূপেই। কেবল বস্তুগত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিই থাকবে মুক্ত জ্ঞান বুদ্ধি যুক্তির আওতায়। কেননা এতে লৌকিক অলৌকিক ও অলীক অদৃশ্য কোন বিশ্বাস-সংস্কার-ধারা প্রভাব থাকে না, নিতান্ত ইহ জাতিক তত্ত্ব তথ্য ও সত্য বলেই। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি তো আমাদের ব্যবহারিক বৈষয়িক জীবনের আবশ্যিক অবলম্বন। আমাদের পরিবারের, সমাজের, রাষ্ট্রের ও বিশ্বের সংকট-সমস্যার অনেকটাই নির্ভর করছে আমাদের জগৎচেতনা ও জীবনভাবনা সম্পৃক্ত লৌকিক, অলৌকিক, অদৃশ্য অলীক শাস্ত্রিক বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা প্রভাবিত মন-মনন-মনীষাজাত ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে দেখা যায় দুস্তর স্বাতন্ত্র্য ও ব্যবধান। নির্বিশেষ 'মানুষ' হবার ও থাকবার কাঙ্ক্ষা তাদের মধ্যে দেখা যায় না। তারা কেবল ইহুদী খ্রীস্টান হিন্দু বৌদ্ধ জৈন মুসলিম হতে, থাকতে চায়, 'মানুষ' পরিচয়ে নিজের ব্যক্তিত্ব আঞ্চলিক, দৈশিক, বার্ণিক, শাস্ত্রিক, শ্রৈণিক সত্তার স্বাতন্ত্র্য বর্জন করতে রাজি নয় কেউ।

অতএব 'মানুষ' হওয়া কারুর লক্ষ্য নয়, স্বাতন্ত্র্যে সগর্ব স্বপ্রতিষ্ঠায় আগ্রহী। এ অবস্থায় পৃথিবীতে মানুষের মধ্যে রাষ্ট্রগত বা জাতিগত প্রীতি-সম্প্রীতি গড়ে ওঠার কারণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেই। কেবল কামে প্রেমে, লাভে, স্বার্থে জাত-জন্ম বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-নিবাস নির্বিশেষে ব্যক্তিগতভাবে মানুষে মানুষে নির্ভেজাল সখ্য বা একাত্মতা গড়ে ওঠে। অন্য কোন অবস্থাতেই অকৃত্রিম মিলন গড়ে ওঠে না।

জাত জন্ম বর্ণ ধর্ম ভাষা নিবাস সংস্কৃতি সভ্যতা অর্থসম্পদ প্রভৃতির স্বাতন্ত্র্যচেতনা ও গৌরবগর্ব হচ্ছে শিক্ষায় সম্পদে খ্যাতিতে ক্ষমতায় মানে মর্যাদায় শাসনে প্রশাসনে সমাজের উঁচু ও মধ্যস্তরে যারা থাকে তাদেরই জীবন ভাবনার উপজাত। অনক্ষর ও স্বল্পশিক্ষার ও মেধা-মগজের নিম্নবিত্তের ও নিম্নবর্গের পেশাজীবী ও শ্রমজীবী মানুষ কোথাও কখনো এসব নিয়ে স্বেচ্ছায় ভাবনাচিন্তা করে না, সচ্ছল স্বচ্ছন্দ জীবনে অবসরভোগী মানুষেরা নেতৃত্ব কর্তৃত্ব মান-যশ-খ্যাতি ক্ষমতা দর্পদাপট প্রভাব প্রতিপত্তি অর্জন লক্ষ্যে পেশাজীবী ও শ্রমজীবী সাধারণ দরিদ্র মানুষকে সাময়িক উত্তেজনা দিয়ে বাইরে সীমান্তের ভিন্ন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কিংবা ঘরে ভিন্ন মতের পথের বর্ণের ভাষার অঞ্চলের পেশার বা শ্রেণীর বিরুদ্ধে লেলায়, সংঘর্ষ সংঘাত লড়াই বাধিয়ে দেয়। মরে ওই দরিদ্র লোকেরাই, জানে মালে গর্দানে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ওরাই জয়ে ও পরাজয়ে উভয়ত।

আবহমান থেকে এভাবে চলে আসছে দুনিয়ার সর্বত্র লঘু-গুরুভেদে মানব সমাজ। কিন্তু এভাবে তো চলতে দেয়া যাবে না। মানুষকে শোষণ পীড়ন প্রতারণা থেকে উদ্ধার করতেই হবে। উপায় সুপরিকল্পিত পদ্ধতির বিপ্লব। হাজার হাজার বছর ধরে হাজারে নয়শ নিরেনব্বইজন কিংবা লাখে নিরেনব্বই হাজার সোয়াশো জন শ্রম ও সময় নিয়োগ করে দেহের ঘাম, প্রাণের আয়ু কৈশোর যৌবন প্রৌঢ়ত্ব অবধি জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত দাসত্বের বন্ধনে থেকে কিংবা অন্নের প্রত্যাশায় অপচয় করে এ পৃথিবীর শ্রমজীবী মানুষ। সঙ্ঘ শক্তিহীন অজ্ঞ অসহায় মানুষের ঘামরক্তে দেহ-প্রাণের রক্তক্ষরা আয়ুহরা শ্রমের ও সময়ের ফল-ফসল ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগ করে প্রতাপে প্রবল ধন-জন-বুদ্ধি বলে বলবান স্বল্পসংখ্যক চতুর মানুষ— নীতিনিয়ম রীতিরেওয়াজ প্রথাপদ্ধতি, যৌক্তিক ন্যায়, আইন, শাস্ত্র প্রভৃতির আসমানী ও পার্থিব দোহাই দিয়ে। আজ অবধি কোন শাস্ত্রেই কিংবা রাজনীতির গ্রন্থে সসৈন্য আক্রমণ, দখল, লুণ্ঠন, যুদ্ধে নরহত্যা প্রভৃতি নৈতিক বা বিবেকী কিংবা আইনগত অন্যায় অথবা পাপকর্ম বলে বিবেচিত বা ঘৃণ্য হয়নি, হয় না। আজো নরহত্যার জন্যে সৈনিক ও পুলিশ মেলে। অর্থের বিনিময়ে খুনী মেলে।

আমরা সবাই জানি, জগতে ও জীবনে যা কিছু ব্যবহার্য, যা কিছু প্রয়োজনীয় তা আয়ু-হরা শ্রমে উৎপাদিত ও নির্মিত।

অথচ এরাই প্রজন্মক্রমে নিঃস্বতায়, নিরাশ্রয়ে রোদ-বৃষ্টি-খরা-বন্যা-ঝড়-শৈত্যে অনিশ্চিত জীবন যাপন করে। ওদের কেবল উৎপাদনের দায়, নির্মাণের দায়িত্ব। ওদের আধিকার অতীতে কোন কালে ছিল না, আজো নেই। য়ুরোপে সমাজতন্ত্র বিলুপ্ত হওয়ায় আশা, আশ্বাস ও প্রত্যাশাও যেন ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর নানা দেশে।

কিন্তু আমাদের ভুললে চলবে না যে জনগণের, সর্বপ্রকারের শ্রমজীবীর শোষণ পীড়ন বঞ্চনার মুক্তি না ঘটলে মানবিকতারও বিকাশ ও প্রকাশ কখনো অবাধ হতে পারে না। মনুষ্যত্বসম্পন্ন মানুষের সংখ্যা সমাজে বাঞ্ছিত সংখ্যায় বাড়বে না। কাজেই আমাদের নতুন করে বিপ্লবে দীক্ষা নিতে হবে, নতুন বিপ্লবের পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে, সমাজ কাঠামো পরিবর্তন করতেই হবে। প্রান্তিক চাষী ক্ষেতমজুর কারখানা শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ করতে হবে। ওদের রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ডেকে বলতে হবে :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে;
যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে।
যখনি দাঁড়াবে তুমি সম্মুখে তাহার তখনি সে
পথ কুক্কুরের মতো সংকোচে সত্রাসে যাবে মিশে।'

এ মুহূর্তে মানবতার বৈনাশিক শক্তি ও মহাশত্রু হিসেবে অপ্রতিরোধ্য রূপে গোটা পৃথিবীতে দেখা দিয়েছে মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা। রাজনীতিক চেতনাসম্পৃক্ত মৌলবাদ ও মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক না হয়েই পারে না, তাদের সে-সাম্প্রদায়িকতার উৎস তাদের স্বশাস্ত্রনিষ্ঠা। তার প্রকাশ ও প্রসার ঘটে ভিন্ন মতের পথের ও সিদ্ধান্তের স্বজাতি-স্বধর্মীর বিরুদ্ধে রক্তক্ষরা প্রাণহরা লড়াইয়ে। ভিন্নমতের, পথের ও সিদ্ধান্তের দলের প্রতি ঘৃণা হিংসা ঈর্ষা প্রসূনরূপে তাদের জান-মাল-গর্দান নেয়া, তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যে হামলা করা, তাদের আর্থিক জীবন ও স্বাধীন নাগরিক চেতনা বিপন্ন রাখা, সন্ত্রস্ত অপমানিত উনজনের মধ্যে অস্বস্তিজাত মানসিক পীড়াসৃষ্টি করা প্রভৃতি রূপকথা-কর্ম-আচরণের নাম হচ্ছে প্রকাশ্য ও সক্রিয় সাম্প্রদায়িকতা। সাম্প্রদায়িকতা শ্বাপদ প্রাণি প্রজাতির স্থূল প্রাবৃত্তিক চেতনামাত্র। এটি মানুষের 'তমঃ' গুণ। এ 'তমস' ও তামস লজ্জার, অমানবিকতার লক্ষণ। সাম্প্রদায়িকতা মনুষ্যত্বের বিনাশক।

আমরা জাতজন্ম বর্ণ ধর্ম ভাষা নিবাস পেশা বিদ্যাবুদ্ধি রূপ গুণ পাগল পঙ্গু নির্বিশেষে 'মানুষ' মাত্রকেই তার সত্তার সম মূল্য-মর্যাদা স্বীকার করেই তার প্রতি মানবিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করব। তার বাঁচার জন্মগত অধিকার অবশ্যই ন্যায্য, তাকে বাঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব হচ্ছে সরকারেরই— এ তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য আমরা জানি, বুঝি ও মানি।

AMARBOI.COM

'জন্ম যদি তব বঙ্গে'

আমাদের গোটা দেশ ও সমাজ হচ্ছে অর্থ-সম্পদ, শিক্ষা-সুখ-আনন্দ স্বাচ্ছন্দ্য-সাচ্ছল্য, ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগ এবং আত্মসত্তার মূল্য ও মর্যাদা উপলব্ধির ক্ষেত্রে নিতান্তই আক্ষরিক অর্থে ভুঁইফোড়। এ জন্যেই আমাদের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ কোন বিষয়েই প্রত্যাশিত গুণের মানের মাপের ও মাত্রার নয়। আমাদের বুদ্ধি ধূর্ততায়, আমাদের রুচি স্থূলতায়, আমাদের জীবিকা লিপ্সায়-চৌর্যে-লুটে, আমাদের আত্মমর্যাদা শূন্যতায়, আমাদের হিতৈষণা রিক্ততায়, আমাদের সৌজন্য কপটতায়, আমাদের উচ্চারিত নীতি-আদর্শের বুলি অন্তরের সায়শূন্য মিছে কথায় অবসিত হয় জীবন-জীবিকার, ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচার-আচরণের সর্বক্ষেত্রে। এ ফেব্রুয়ারি মাসে আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় কেবল শিক্ষা বিষয়েই নিবদ্ধ রাখব। আমাদের দেশে আজ শিক্ষাক্ষেত্রে কোন সুনির্দিষ্ট জাতীয় বা সরকারী নীতি-নিয়ম-আদর্শ সূত্রাবদ্ধ হয়নি। আমাদের এখানে মক্তব-টোল-সেক্যুলার প্রাথমিক-মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা এবং মাদ্রাসা-টোলে শাস্ত্রশিক্ষা চালু রয়েছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবাধে। এসব শিক্ষা দেশের শিক্ষিত, অশিক্ষিত দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত পরিবারের জন্যেই যেন প্রচল রয়েছে। মুসলিম অশিক্ষিত কিংবা সাক্ষর বা স্বল্পশিক্ষিত গৃহস্থরা পাঠায় মক্তবে-মাদ্রাসায়, অন্যরা মেধাহীন বা উদাসীন শিক্ষার্থীদের পাঠায় মানবিক বিদ্যার্জনে, একটু মেধাসম্পন্নদের পাঠায় বিজ্ঞান-প্রকৌশল-প্রযুক্তি কিংবা চিকিৎসাশাস্ত্র শেখার জন্যে।

এ নিম্নবিত্তের গাঁ-গঞ্জের এবং শহুরে দরিদ্র লোকের সন্তানরা যেন দলে দলে বিদ্যা-বুদ্ধিতে জ্ঞানচক্ষু পেয়ে অর্থ-সম্পদ নিয়ন্ত্রক এবং শাসন-প্রশাসন নিয়ামক শাসক-শোষক শ্রেণীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্র-তীক্ষ্ণ, কঠিন-কঠোর করে তুলতে না পারে, সেজন্যেই ওই সব দরিদ্র লোকদের টোল-মাদ্রাসা শিক্ষায় দেয়া হয় উৎসাহ, যাতে ওদের সন্তান সহজে লেখাপড়া শিখতে না পারে, সেজন্যে অজ্ঞ-অনক্ষর ঘরের সন্তানদের জন্যে ইংরেজী-আরবীর ব্যারিকেড বসিয়েছে সরকার। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চার/পাঁচ বছরের কচি-ছেলেমেয়েরা গৃহশিক্ষক ছাড়া ইংরেজী-আরবী ভাষার ও গণিতের অলঙ্ঘ্য দুর্লঙ্ঘ্য বাধা কখনোই অতিক্রম করতে পারবে না, শিক্ষারও প্রসার ঘটবে না, শোষক-শাসক-বঞ্চকদেরও দুর্দিন ঘনিয়ে আসবে না—এসব জেনে-বুঝেই করা হয়েছে বিদেশী অর্থ-মদদদাতা অভিভাবকেরও অভিপ্রায় অনুসারে। এ বছরও তাই বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করার নামে তথাকথিত গণতান্ত্রিক সরকার নামের মুৎসুদ্দি-স্বৈরাচারী সরকার জনগণের চোখে ধুলো দিয়ে যাদুকরের খেলার নৈপুণ্য দেখাতে চেয়েছেন এককোটি টাকা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চারটি উপজিলায় পটিয়ায়-পুটিয়ায়-ফুলতলিতে ও সাভারে চালু করার নামে। আর বিনে পয়সায় নামকেনার লক্ষ্যে ভাওতা দিয়েছে ৬৪ খানা জিলাসদরে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা দানের ও গ্রহণের হুকুমমাত্র জারি করে। এতো চালাকি কি ভালো?

এভাবে নিম্নবিত্তের অজ্ঞ-অনক্ষর, স্বল্পশিক্ষিত এবং দরিদ্র জনগণের জন্যে এমনি ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা সুপরিকল্পিতভাবে চালু রাখা হয়েছে। তাদের জন্যে দীনিয়াত তথা ধর্মশিক্ষা করেছে আবশ্যিক। বাঙলা করেছে শিক্ষার মাধ্যম, যদিও এখনো ইংরেজীই বাস্তবে চাকরি-বাকরি আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজনীতি-কূটনীতি ক্ষেত্রে আবশ্যিক ও অপরিহার্য ভাষা। কাজেই বড় চাকরিও যেন ধনীসামন্ত-বুর্জোয়া বেণেদের আয়ত্তে থাকে শাসন-প্রশাসন-অর্থ-সম্পদ প্রভৃতির মতো, সে ব্যবস্থাই রাখা হয়েছে।

অন্যদিকে এসব লুম্পেন উঠতি বুর্জোয়া শ্রেণীর সন্তানদের শিক্ষাদানের জন্যে রয়েছে শহরে শহরে ইংরেজীর মাধ্যমে শিশুকাল থেকে শিক্ষাদানের লক্ষ্যে কিন্ডারগার্টেন স্কুল, মাধ্যমিক শিক্ষার তেমনি ব্যবস্থা রয়েছে, ক্যাডেট স্কুল ও কলেজ, তাছাড়াও ব্যবস্থা রয়েছে 'এ' 'ও' লেভেল টোফেল প্রভৃতি নির্বাচনী পরীক্ষার ব্যবস্থা যাতে সন্তানদের বিদেশে য়ুরোপে-লন্ডনে-আমেরিকায় নিদেন পক্ষে ভারতে পাঠানো-পড়ানো যায়। এরা দেশে ফিরে হবে শাসক-প্রশাসক, ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার-রাজনীতিবিদ উচ্চ আদালতের কৌসুলি কিংবা কারখানাদার, বেণে প্রভৃতি। অথবা দেশে অর্থসম্পদ পাচার করে যুক্তরাষ্ট্রে-যুক্তরাজ্যে-কানাডায়-অস্ট্রেলিয়ায় করবে বসবাস। এখন এটাই চালু নীতি-নিয়ম ও চালচিত্র। তারা কি বাঙালী? বাঙলাদেশ প্রেমী? বাঙলাভাষাদরদী? তারা কারা? অথচ বুর্জোয়ারাই ডেমাগগ রূপে কৃত্রিম মাতৃভাষা প্রীতিবশে বাঙলাভাষার মহিমা-মাহাত্ম্য-মর্যাদা-গুরুত্ব প্রচার করে বেড়ায় সাংসদ মন্ত্রী-বুদ্ধিজীবী-ধনী-মানী শহুরে নেতা হিসেবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেন বাঙলা ভাষা প্রীতি আর স্বদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব প্রীতি একার্থক ও একাত্মক। উদ্দেশ্য এরা যেন ইংরেজী ভাষায় দক্ষতা অর্জন করে, প্রতীচ্য বিদ্যা-রুচি-মনন-মনীষায় ঋদ্ধ হয়ে তাদের কায়েমী স্বার্থের ক্ষেত্রে প্রতিযোগী-প্রতিদ্বন্দ্বী হতে না পারে কখনো, প্রকৃত জ্ঞান-যোগ্যতা থেকে এদের দূরে রাখা উচ্চাশী হতে না দেয়াই তাদের অপরিব্যক্ত উদ্দেশ্য। ফল দাঁড়িয়েছে এই, আজ দেশের সাধারণ ঘরের শিক্ষিতদের মধ্যে প্রত্যাশিত মানের-মাত্রার ইংরেজীভাষা জানা লোক দুর্লভ হয়ে উঠেছে। এর ফায়দা লুটছে শহুরে উচ্চবিত্তের-উচ্চপদের, উচ্চমানের ধনী পরিবারগুলো। সর্বত্র তাদেরই প্রভাব-প্রতিপত্তি, সুখে-সম্পদে ভোগে-উপভোগে-সম্ভোগে তাদেরই শ্রেণীগত অধিকার রয়েছে অটুট।

এরা নিজেদের সন্তানের জন্যে কামনা করে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে প্রতীচ্যশিক্ষা। সাধারণের সন্তানের জন্যে গুরুত্ব দেয় ধর্মশিক্ষার। আর সাধারণ লোককে প্রবর্তনা দেয় পারত্রিক মুক্তি লক্ষ্যে ধর্মচর্চার জন্যে, যাতে দুনিয়াতে বঞ্চিত হলেও স্বর্গসুখ তারা না হারায়। আর নিজেদের জন্যে কামনা করে বিদেশী ভূস্বর্গগুলোতে সন্তানের নিবাস। তারা কি দেশের মানুষের হিতকামী বন্ধু, নাকি শত্রু-শোষক-প্রতারক?

মুক্তিযুদ্ধচেতনা : আমাদের শক্তির ও সংগ্রামের উৎস

AMARBOI.COM

আমাদের সংকট-সমস্যার, সংহতির, সংগ্রামের ও বিজয়ের চারটি স্তম্ভ, চারটি বীকন রশ্মি, চারটি মীনার। এক. বায়ান্নর ভাষাসংগ্রাম, দুই. বাষট্টির শিক্ষা-দ্রোহ, তিন. উনসত্তরের অভ্যুত্থান এবং চার. একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ। এগুলোই আমাদের ঐতিহ্যের সম্পদ। তাই বলে এগুলো নিষ্ক্রিয় নিরুদ্যম মানুষের বন্ধ্যা মনের গৌরব-গর্বের, আস্ফালনের সম্বল নয়। নিরুদ্যম-নিষ্ক্রিয় মানুষের মন অতীতের ও ঐতিহ্যের নিরাপদ-নিরুপদ্রব আশ্রয় খোঁজে। এর ফলেই যদিও তেমন মানুষ অতীতকে ঐতিহ্যকে প্রেরণার-প্রণোদনার-প্রবর্তনার উৎস বলে প্রচার করে আত্মপ্রসাদ লাভ করে, বাস্তবে তা ব্যক্তিক, পারিবারিক-সামাজিক, জাতিক কিংবা রাষ্ট্রিক জীবনে কেবল অবসাদ ও অবক্ষয়ই বৃদ্ধি করে। অতীত ও ঐতিহ্য বস্তুত প্রেরণার উৎস নয়, জ্ঞানের অভিজ্ঞতার শিক্ষার আকর মাত্র। মানুষের জীবনের বাঁকে বাঁকে যে সংকট ও সমস্যা থাকে, এবং তা এড়িয়ে যে পার পাওয়া যায় না, তাকে যে সংকট ও সমস্যাগ্রস্তদের সংহত ঐক্যবদ্ধ ঐকান্তিক এবং আন্তরিক প্রয়াসে-প্রযত্নে জান-মাল-গর্দান হারানোর ঝুঁকি নিয়ে মোকাবেলা করতে হয়, এবং তাতে যে বুদ্ধির সঙ্গে জ্ঞানের, সাহসের সঙ্গে শক্তির, অঙ্গীকারের সঙ্গে উদ্যমের ও উদ্যোগের সংযোগ-সমন্বয় প্রয়োজন, আর তাতেই যে সংগ্রামে সাফল্য সুনিশ্চিত হয়—এ তত্ত্বে, তথ্যে ও সত্যে অবশ্যই দৃঢ় আস্থা আবশ্যিক।

আমাদের সমকালীন সব আর্থিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাষ্ট্রিক সংকট-সমস্যা সমাধানের জন্যে আমাদের মুক্তিযুদ্ধচেতনাকেই সম্পদ ও সম্বল করা ফলপ্রসূ বলেই আবশ্যিক। আমাদের যে-কোন অন্যায়, অবিচার-দুঃশাসন-নিপীড়ন-শোষণ-পেষণ প্রতিরোধ লক্ষ্যে প্রতিবাদ প্রতিকার পন্থাই হবে মুক্তিযুদ্ধ চেতনালব্ধ ও চেতনাপ্রসূত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংহতি, সংগ্রামীশক্তি আন্তরিক ও ঐকান্তিক প্রয়াস-প্রযত্ন। আমরা জানি, বুঝি ও মানি যে 'বীরভোগ্যা এ বসুন্ধরা', অর্থাৎ সাহসী শক্তিমান উদ্যমশীল উদ্যোগী কখনো কোন কাজে সহজে ব্যর্থ হয় না। প্রয়োজনমতো যে ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত, যে প্রয়োজনমতো যথাসময়ে যথাস্থানে যথাকাজে মরতে প্রস্তুত, জয়ে, সাফল্যে জীবনে এবং মর্ত্যে অর্থসম্পদে সুখে-খ্যাতিতে-ক্ষমতায় ভোগে-উপভোগে অধিকার তারই। ইতিহাস চিরকাল এ সাক্ষ্যই দিচ্ছে। নিষ্কর্মার-নিষ্ক্রিয়ের, নিরুদ্যমের, ভীরুর, নির্বোধের, দুর্বলের জীবনে কোন কৃতি-সাফল্য থাকে না।

আমরা বিশ্বের দরিদ্রতম রাষ্ট্রের বাসিন্দা। ঋণ-দান-অনুদান-ত্রাণেই আমাদের ভরসা ও নির্ভর। আমাদের আশা-আশ্বাসের উৎস কৃপা-করুণা ও ভিক্ষা, ব্যক্তিক জীবনের মতো জাতিক জীবনেও এ হচ্ছে বিশ্বরাষ্ট্র সমাজে সবার নিচে, সবার পিছে সব ভিক্ষানির্ভর কৃপা-করুণাজীবীর মতো লাঞ্ছিত ঘৃণ্য অবস্থায় ও অবস্থানে। আমাদের মন্ত্রী-সচিবেরা যখন স্যুট-টাই পরে সহাস্য ভিক্ষা কিংবা ঋণপত্র সই করেন, তখন আমরা টিভিতে সে ছবি দেখে লজ্জায়-অবমাননাবোধে মরমে মরে যাই। যদিও জানি হায়া-শরম-সঙ্কোচ-আব্রুল থাকলে কেউ ঘৃণা-লজ্জা-ভয়রিক্ত হয়ে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতেই পারে না। দারিদ্র্য, নিঃস্বতা, নিরন্নতা বেকারত্ব আমাদের জনগণকে যেমন করেছে ভিক্ষাজীবী, চৌর্যপ্রবণ, কপটাচারী ও মিথ্যাভাষী, আমাদের শহুরে শিক্ষিত বেণে বুর্জোয়া-আমলা-সাংসদ, পার্ষদ-পরিষদ, সংস্থা প্রভৃতিকেও তেমনি লোভ-লিপ্সা করেছে বেহায়া-বেশরম-বেরহম বেল্লিক এবং কাড়া-মারা-হানাপ্রবণ, নীতি-নিয়ম রীতি-রেওয়াজ নিষ্ঠা বিলুপ্ত, আদর্শ পরিত্যক্ত। মানবতা-মনুষ্যত্ব বিরল উচ্চারিত জ্ঞানমাত্র। জালিম-মাস্তান-গুণ্ডা-খুনী কবলিত দেশ। মুক্তিযুদ্ধচেতনা নিয়ে আমাদের মানুষ ও সমাজ গড়ার কাজে নামতে হবে।

AMARBOI.COM

দৈশিক ও বৈশ্বিক মিলন-ময়দান সন্ধানে

কথায় বলে দুটো হাঁড়িতেও ঠোকাঠুকি লাগে। এক জায়গায় থাকতে গেলে মতভেদের, মন ভাঙার কারণ ঘটেই। বিরোধ-বিবাদ-দ্বন্দ্ব-সংঘাত তাই এড়ানো যায় না। কাজেই জীবজগতে সাময়িক দ্বন্দ্ব-সংঘাত ঘটেই। তাই দ্বন্দ্ব-মিলনেই জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্র চলে। এ অনেকটা পজিটিভ-নিগেটিভ তারের মতোই জীবনে অপরিহার্য। প্রাণীর ক্ষুধা-তৃষ্ণা-অভাববোধ, আকাঙ্ক্ষা, লাভ-লোভ-স্বার্থ-চেতনা না থাকলে জীবন হত নিশ্চিন্ত, নিষ্ক্রিয় ও নিশ্চল। কাজেই চাওয়ার পাওয়ার না পাওয়ার, কাড়ার-মারার-হানার-দানের-প্রতিদানের, স্নেহ-প্রীতি-প্রেমের এবং ঘৃণা-হিংসা-ঈর্ষার আপেক্ষিকতার টানাপোড়েনে বোনা প্রবৃত্তিতাড়িত এবং আত্মরক্ষার ও আত্মপ্রসারের চেতনাচালিত বলে জীবন এত প্রিয়, পৃথিবী এমন আকর্ষণীয়, ব্যক্তিবিশেষের প্রতি এমন অনুরাগ কিংবা বিরাগ। জীবনে প্রেরণা-প্রণোদনা-উদ্যম-উদ্যোগ-আয়োজনের মূলে রয়েছে অভাববোধের বা আকাঙ্ক্ষা পূর্তির মানসিক আবেগ-অভিপ্রায়। ব্যক্তি মানুষ আত্মরক্ষার গরজে এবং আত্মপ্রসারের বাঞ্ছাবশে গোড়াতে অজ্ঞতার ও অসহায়তার দরুন বিস্ময়-কল্পনা-ভয়-ভক্তি-ভরসা চালিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ে অনুভব করছে অদৃশ্য অলীক, অলৌকিক, অরি ও মিত্রপ্রতীক শক্তির অমূর্ত ও প্রমূর্ত অস্তিত্ব, সর্ব প্রাণবাদে, যাদুশক্তিতে, ট্যাবুটোটেম তত্ত্বে দেব-দৈত্য তথ্যে, শুভাশুভোক্তি সত্যে মানুষের মনস্তাত্ত্বিক আস্থা জন্মেছে, দৃঢ়মূল হয়েছে এবং জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি প্রয়োগে অসমর্থ ও উদাসীন মনে প্রাজন্মক্রমিক স্থায়িত্ব পেয়েছে, যা শাস্ত্রান্তর্গত হয়ে আজো জন্মমুহূর্ত থেকে মানুষের মগজ ধোলাই করে চলেছে।

আমরা জানি, বিশ্বাস-সংস্কারের যে-অংশ ব্যক্তিক, তা একান্তভাবেই ব্যক্তির মনে-মতে-মননে-আচরণে ব্যক্তিগত সংস্কার-সম্পদ হয়েই তার ভয়-ভক্তির ও বল-ভরসার আশ্রয় হয়ে থাকে। তাতে অন্য কারুর ক্ষতি-বৃদ্ধির তেমন কোন কারণ ঘটায় না। ফলে তাতে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-সংঘাতের কোন কারণও ঘটে না। কিন্তু শাস্ত্রভুক্ত হয়ে বিশ্বাস সংস্কারের ও আচার-আচরণের যে অংশ যখন কৌমিক, গৌষ্ঠীক, গৌত্রিক কিংবা দালিক সংহতির ভিত্তি হয়ে সামাজিক অভিন্ন বিশ্বাসের ও আচার-আচরণের আবশ্যিক পদ্ধতি বা অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায়, তখনই তা ভিন্ন মনের, মতের, পথের ও পদ্ধতির মানুষের দলের বা সমাজের সঙ্গে দ্বন্দ্বের কারণ হয়ে ওঠে। যে-কোন দলবদ্ধতায় বা গোষ্ঠীবদ্ধতায় স্বাতন্ত্র্য চেতনা আবশ্যিক ও অপরিহার্য হয়ে ওঠে। কাজেই যে-কোন দলবদ্ধতা ও গোষ্ঠীবদ্ধতা ভিন্ন দলের ও গোষ্ঠীর প্রতি ওই স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধির উপজাত হিসেবে অবজ্ঞা-উপহাস-হিংসা-ঈর্ষার এবং প্রতিযোগিতার ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব জাগায়। এ তত্ত্ব তথ্য সত্য ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না। এ হচ্ছে এতকালের ইতিহাসের তত্ত্বের, তথ্যের ও সত্যের অমোঘ নির্যাস। এর সাক্ষ্য প্রমাণও আছে। প্রায় চার হাজার বছর আগের আর্যভাষীদের মনের-মতের-মননের-সিদ্ধান্তের বৈপরীত্যের ফলে যে দুটো দ্বান্দ্বিক দল গড়ে উঠেছিল এবং তার ফলে দুর্বল পক্ষ ইরান ত্যাগ করে ভারতে কিংবা ভারত ত্যাগ করে ইরানে চলে গিয়েছিল, তার সাক্ষ্য প্রমাণ আজো অম্লান।

যেমন ইরানে 'দেও' হচ্ছে অপশক্তি। ভারতে 'দেব' বা 'দইব' হচ্ছেন সহায়ক শক্তি। ইরানে অহোর বা অসুর [আহোরমজদা] সহায়কশক্তি, ভারতে তিনি অরিশক্তি। এমনি সুর-অসুর, বেতরো-বৃত্র, দেব-দৈত্য নিয়ে যে মতভেদ ও মনান্তর ঘটে তা-ই তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত-সংঘর্ষ ঘটায় বলে সহজেই নিঃসংশয় অনুমানে প্রলুব্ধ করে। ইহ-পরলোকে প্রসৃত জীবনবোধে স্বাতন্ত্র্যচেতনার ভিত্তি হচ্ছে শাস্ত্রিক বিশ্বাসের ভিন্নতা। তবে ভৌগোলিক অবস্থানে, ভাষায়, শাস্ত্রিক বিশ্বাসে ও রক্তে অভিন্ন হলেও অন্য লাভে-লোভে স্বার্থে স্বাতন্ত্র্য ও বিচ্ছিন্নতা পছন্দ করে মানুষ। যেমন আরবীভাষী মুসলিম রাষ্ট্রগুলো। আবার ভৌগোলিক অবস্থানের ভাষায় শাস্ত্রে ও রক্তে ভিন্নতা ও ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের হিন্দুরা অভিন্ন রাষ্ট্রে সংহতিকামী। কাজেই স্বাতন্ত্র্যচেতনার ও অভিন্নতারোধের কারণ নানা অবস্থায় অবস্থানে বিভিন্ন। আগেই বলেছি, নানা লাভ-লোভ-স্বার্থ চেতনা মানুষে মানুষে বিরোধ-বিবাদ ঘটাবেই। কিন্তু শাস্ত্রিক স্বাতন্ত্র্যচেতনা যত সহজে বিরোধে বিবাদে-দ্বেষে-দ্বন্দ্বে-দাঙ্গায় যুদ্ধে উত্তেজনা, উদ্দীপনা, প্রেরণা, প্রণোদনা-প্রবর্তনা যোগায় দুই ভিন্ন শাস্ত্রপন্থীদের মধ্যে, তত আর কোন ক্ষেত্রেই এমন ব্যাপক গভীর ও চিরস্থায়ী দল বা সম্প্রদায় কিংবা জাগতিকভাবে আর কোন বিষয়ই দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-সংঘাত জিইয়ে রাখতে পারে না। আজ মনে-মননে-মনীষায় জ্ঞানে-বুদ্ধিতে-যুক্তিবাদে-বিজ্ঞানে-প্রযুক্তিতে মানুষ বিস্ময়করভাবে এগিয়েছে। আবিষ্কারে উদ্‌ভাবনে ও স্থিতিশীলতায় মানুষ আজ কল্পনাকে বাস্তব-অসম্ভবকে সম্ভব করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুলেছে। আজ মানুষ জল-স্থল-বায়ু যানে, সমুদ্রের তলায়, পর্বতের চূড়ায় ও কন্দরে, মাটির গভীরে নভোলোকে স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করে। কিন্তু তবু শৈশবে-বাল্যে-কৈশোরে শোনা বিশ্বাস-সংস্কার ও শাস্ত্রিক সত্য থেকে জ্ঞান যুক্তি বুদ্ধি যোগে যাচাই-বাছাই করে মানসমুক্তি লাভ করতে আগ্রহী নয়। আজকের মানুষের জাতি-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-নিবাসগত বাধা-ব্যবধান-বিচ্ছেদ-বিভেদ-বিবাদের বারো আনাই হচ্ছে শাস্ত্রিক স্বাতন্ত্র্যচেতনাজাত। আমরা যদি আমাদের জন্ম-জীবন-মৃত্যু নিয়ন্তা রূপে স্রষ্টায় আস্থাটি ব্যক্তিক বুকের সত্যরূপে অন্তরের গভীরে পুষে রাখি, এবং তুকতাক-ঝাড়ফুঁক বাণ-উচ্চাটন-পানি-ধূলা-তাগার কিংবা ধাতু-পাথরের মতো আমাদের সামাজিক, সামূহিক, সামগ্রিক ও প্রাত্যহিক জীবনে স্রষ্টার নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব অনুভব করি, কেবল দলীয় বা সাম্প্রদায়িক বা দৈশিক জাতিক স্তরে সামাজিক ও পার্বণিকভাবে শাস্ত্রিক বিশ্বাস-সংস্কার-আচার-আচরণ বর্জন করি, তা হলে শাস্ত্রিক স্বাতন্ত্র্যজাত ও সম্পৃক্ত বিরোধ-বিবাধ-বিচ্ছেদ-ব্যবধান ভুলে থাকতে পারব। রাষ্ট্রিক, ভাষিক বার্ণিক ও গুণে-মানে-মাপে-মাত্রায় ভেদ থাকা সত্ত্বেও আমরা বিশ্বময় কেবল মানুষই দেখব এবং পাব। ইহুদী-হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীস্টান-মুসলিম প্রভৃতি স্বাতন্ত্র্যচেতনা আমাদের মধ্যে জাগবেই না, থাকবেই না। আমরা প্রাণীর মধ্যে মানব প্রজাতি। আমরা গোটা জীবনে আমৃত্য কেবল মানুষ নামেই পরিচিত হব। আমরা প্রবৃত্তি প্রশমনে, সংযমে, সহিষ্ণুতায়, সৌজন্যে, সততায় মানুষ নামেই পরিচিত হব। আমরা প্রবৃত্তি প্রদমনে, সততায়, মানুষে-প্রত্যাশিত ও প্রয়োজনীয় গুণের অনুশীলনেই মানুষ হব। মানুষ থাকব এ লক্ষ্যে যদি জীবন-জীবিকা ক্ষেত্রে অনুকূল প্রতিবেশ তৈরি করতে পারি, তা হলে আমরা বৈশ্বিক চেতনায় বিশ্ব নাগরিক হতে পারব। বিশ্বে শান্তি সুখ ও স্বস্তি আনা এভাবেই হবে সম্ভব। তাই আজকের স্লোগান বা জিগির হোক : সৃষ্টা মান, শাস্ত্র ছাড়। সহজ ও সম স্বার্থে সংযমে, সহিষ্ণুতায়, সৌজন্যে, সততায়, সামবায়িক সহযোগিতায় ব্যক্তিক জীবনেও শান্তিতে স্বস্তিতে সহাবস্থানের অঙ্গীকারে আমরা দৈশিক ও বৈশ্বিক মিলন-ময়দান তৈরি করতে পারি।

গণমুক্তিসংগ্রাম চলবেই

য়ুরোপে কম্যুনিস্ট দলগুলোর বিলুপ্তির এবং সমাজতান্ত্রিক সরকারগুলোর পতনের দরুন কি দুনিয়া থেকে হাভাতে গণমানবের জীবনসংগ্রাম, বাঁচার সংগ্রাম, ভাত-কাপড়-নিবাস-নিদান-শিক্ষা-স্বাস্থ্য-চিকিৎসার দাবিও কি অবৈধ বলে পরিহার্য হয়ে গেল? শ্রেণী যুদ্ধের কি আর প্রয়োজন নেই? লড়াই কি শেষ? গণমানব কি স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম আর করবে না? গণমানব কি আর শোষণ-পীড়ন-বঞ্চনা-প্রতারণা-লুণ্ঠন মুক্ত হতে চায় না? তবে কেন এ নিষ্ক্রিয়তা, কেন এ নিস্পৃহা, কেন লড়াকু সংগ্রামে এ অনীহা? কেন হাতুড়ি-কাস্তে-লুকোনোর এ ব্যস্ততা? কিসের শঙ্কা? হাতুড়ি-কাস্তে-প্রতীক, প্রতিম প্রতিভূ ছাড়া কি গণযুদ্ধ শুরু হতে পারে না স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা লক্ষ্যে? আজ কি আমরা সুকান্তর ভাষায় উচ্চকণ্ঠে লড়াইয়ের সংকল্প ব্যক্ত বা ঘোষণা করতে পারি না? তা হলে বলে উঠি না কেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসো তবে আজ বিদ্রোহ করি—
উঠুক তুফান মাটিতে পাহাড়ে
জ্বলুক আগুন গরীবের হাড়ে
কোটি করাঘাত পৌঁছুক দ্বারে
ভীরুরা থাক।
মানবো না বাধা, মানবো না ক্ষতি
চোখে যুদ্ধের দৃঢ় সম্মতি
রুখবে কে আর এ অগ্রগতি সাধ্য কার?

গণমুক্তি সংগ্রামের প্রয়োজন কি ফুরিয়েছে? তা হলে এখন সংগ্রামে নেতৃত্ব দেবে কারা? আগের বামপন্থীরা যে কেবল গণপন্থী হয়ে গেছে ও যাচ্ছে তা নয়, তারা আগের পীর-গুরু-পয়গম্বর মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-মাওকে এখন উপহাস-অবজ্ঞা-নিন্দা করেই আত্মগ্লানি মোচন করে। ওরা শাহ-সামন্তের মানসিকতা নিয়ে বুর্জোয়া গণতন্ত্রী রাজনীতিক। তাদের আত্মরতি ও জনসেবা সমমাত্রার। এখন ধূলিকাদামাখা মানুষের শিশুদের কে দেবে, কারা দেবে নেতৃত্ব? কাদের প্রেরণায়, প্রবর্তনায় ও নায়কত্বে ওরা আপন প্রাপ্যে অধিকার চাইবে? কাদের নেতৃত্বে ও সৈনাপত্যে ওরা দলে দলে রণসজ্জায় সজ্জিত হবে? কাদের প্রেরণায়, প্রবর্তনায় ও নায়কত্বে ওরা আপন প্রাপ্যে অধিকার চাইবে? কাদের উপর বিশ্বাস-ভরসা-নির্ভর করে ওরা স্বাধিকার আদায়ের লড়াইয়ে বুকের লালরুধির ঢালবে? আজ কে বা কারা আছে, কোথায় যারা ধরবে হাল, তুলবে পাল চালাবে তুঙ্গ-তরঙ্গ ক্ষুব্ধ-মুখর বিপদসমুদ্রে ঝড়োহাওয়াকে উপেক্ষা করে, দানবিক জলোচ্ছ্বাসকে উপেক্ষা করে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়বে গণমানবকে চিরকালের মতো শঙ্কা, ত্রাস, শোষণ-পীড়ন-বঞ্চনা-অবমাননা মুক্ত করার লক্ষ্যে, মানবিকতা ও মানবতাই যে মানুষের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, সাম্য-মৈত্রীই যে শ্রেয়স্কর, মগজ ও হৃদয় দুটোরই আনুপাতিক অনুশীলন যে সমাজ স্বাস্থ্য ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা সুষ্ঠু রাখার প্রশস্ত পন্থা, জীবন যে জাতিক-রাষ্ট্রিক নয়, বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক, তা জানার বোঝার ও মানার সময় এসে গেছে।

আজ মানুষকে তার বাঁচার জন্মগত অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করার এবং এ জন্মগত অধিকার দাবি করার, এর জন্যে জীবনপণ যুদ্ধ করার সময় এসে গেছে। মানুষকে কাজ দিয়ে কিংবা অসমর্থকে ভাতা দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য যে রাষ্ট্রের ও সরকারের, তা একালে সভ্যজগতে আর অস্বীকৃত হয় না।

মার্কসবাদের নির্যাস হচ্ছে : প্রতিটি মানুষের খেয়ে পরে সুখে-স্বাস্থ্যে আনন্দে নিরুপদ্রব-নিরাপদ জীবন যাপনে জন্মগত অধিকার রয়েছে। এবং এ সব কিছু যুগিয়ে জনগণের চাহিদা মেটানোর দায়িত্ব ও কর্তব্য রাষ্ট্রের বা সরকারের। কোথাও মার্কসবাদের থেকে উন্নততর কোন নীতিনিয়ম, রীতিরেওয়াজ, প্রথাপদ্ধতি, তত্ত্ব-তথ্য-সত্য আবিষ্কৃত-উদ্‌ভাবিত এখনো হয়নি। তাই এর বিকল্প নেই, কাজেই এর বিলুপ্তি নেই। এ পৃথিবীর সর্বত্রই বিশেষ করে জনবহুল দরিদ্র রাষ্ট্রে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবেই। যেখানে আপাতত পরিত্যক্ত ও বিলুপ্ত বলে মনে হচ্ছে, সেখানেও মার্কস্‌বাদ বারবার ফিরে আসবে। প্রয়োগ-পদ্ধতি বদলাবে, উন্নততর হবে, ত্রুটিমুক্ত ও সুষ্ঠু হবে। আমরা আপাতত আমাদের দেশে সে-সুদিনের, সে-সুব্যবস্থার, সে-মুক্ত গণসমাজের প্রতীক্ষায় রইলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসলে প্রতীক্ষায় রয়েছি নতুন প্রজন্মের নওযোয়ানের ও মানববাদীর আবির্ভাবের জন্যে, প্রত্যাশা করছি নতুন প্রজন্মের তরুণদের জন্যে, যারা মানবজাতিকে সর্বপ্রকার মানসিক ও ব্যবহারিক জীবনের দাসত্ব ও অন্ধতা, বিবেকহীনতা ও অন্যায্যতা থেকে মুক্ত করবে তাদের মনন-মনীষা ও প্রত্যক্ষভাবে শক্তি-সাহস প্রয়োগে।

য়ুরোপীয়শিক্ষাবিরল রাষ্ট্রে গণতন্ত্র ভোটতন্ত্রেই বিকৃত হয়, গণতান্ত্রিক সরকার ও সাংসদরা নির্বাচকদের অজ্ঞতা-অসহায়তা-গ্রাম্যতার সুযোগে স্বেচ্ছা ও স্বৈরাচারী হয়। এমনি ভোটতন্ত্রে গণতন্ত্রের স্বাভাবিকতা থাকে না, যেমন থাকে না দাম্পত্যের মতো স্বাভাবিকতা পরকিয়া গোপন প্রেমে। লুকানো প্রেম নিয়মের স্বস্তি ও সময় মেনে চলতে পারে না, নিভৃতি ও নির্জনতারূপ জরুরী সুযোগ মেলা কঠিন ও দুর্লভ বলেই। তেমনি যোগ্যতায় নয়, নানা ছলচাতুরী আর ধন-জন-বাক্য বলে ও দলে সমর্থনে নির্বাচিত ব্যক্তিরা অর্থ-বিত্ত-মান-যশ-খ্যাতি-ক্ষমতা-প্রভাব-প্রতিপত্তি-দর্প-দাপট অর্জন লক্ষ্যে বেপরওয়াভাবে বিবেক-বিবেচনাবিরহী কাজে লিপ্ত হয় হায়া-শরম-সঙ্কোচ পরিহার করে সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার আগেই। এবং দারিদ্র্যদুষ্ট রাষ্ট্রে অন্যরাও নীতি-নিয়ম-আদর্শনিষ্ঠ থাকে না। তারাও ভিখিরী মজুর, ঠিকেদার, মজুতদার, আমলা-পার্ষদ-পারিষদরূপে প্রায় বেহায়া-বেশরম-বেলেহাজ বেচশম বেআক্কেল-বেল্লিক-বেআদপ রূপে লাভ-লোভের ক্ষেত্রে নীতি-নিয়ম-বিবেক-বিচার চেতনা উপেক্ষা করে। দায়িত্ব ও কর্তব্যভ্রষ্ট হয়ে স্বাধিকার লঙ্ঘন করে, আত্মরতিবশে লুটেরার ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করে। এতে সাধারণ মানুষের নৈতিক, আর্থিক, মানসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রিক জীবনে অবক্ষয় বৃদ্ধি পায়। উন্নতি-উৎকর্ষ সম্ভব হয় না। অতএব, দারিদ্র্যদুষ্ট রাষ্ট্রের চরিত্রভ্রষ্ট মানুষের গণতন্ত্র লোকোপকারে আসে না, কেবল ধূর্ত ধনবান শ্রেণীর অর্থবিত্ত ও দর্প-দাপট আর শক্তি-সাহস বাড়ায় মাত্র। মানুষের ভাত-কাপড়ের নিশ্চিত ব্যবস্থা করতে হলে অন্যপন্থায় গণ-আন্দোলন আবশ্যিক। নতুন চিন্তায়-চেতনায়, জ্ঞানে-বুদ্ধিতে-যুক্তিতে-মননে-মনীষায়-শক্তিতে-সাহসে ঋদ্ধ অঙ্গীকারবদ্ধ উদ্যমশীল উদ্যোগী সংবেদী মানববাদী লড়াকুদের আবির্ভাবের অপেক্ষায় ও ভরসায় তাই থাকতেই হবে।

প্রগতির প্রতিপক্ষ

অজ্ঞ-অনক্ষর মানুষের জগৎচেতনা ও জীবনভাবনা নিয়ন্ত্রিত হয় আশৈশবলালিত শাস্ত্রিক লৌকিক, অলৌকিক ও অলীক বিশ্বাসে সংস্কারে ও ধারণায়। জ্ঞান যুক্তি বুদ্ধি তাদের নিয়তিমানা মনে-মননে প্রবেশাধিকার পায় না। ফলে দুর্দশার দুর্ভোগের দুর্দিনে তারা অদৃশ্য অলৌকিক আসমানী আর মিত্র শক্তির কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণে আনুগত্য অস্বীকার করে স্ব স্ব জান-মাল-গর্দানের নিরাপত্তা প্রার্থনা করে।

নিঃস্বতা, নিরন্নতা, বেকারত্ব, অর্থসম্পদ প্রাপ্তির ও রক্ষণের অনিশ্চিতি, দেশের মানুষের অজ্ঞতা ও অনক্ষরতা, জীবন-জীবিকাক্ষেত্রে আশা-আশ্বাসের অপ্রতুলতা আত্মপ্রত্যয়ী আস্তিকেরা কেবল ঈশ্বর নির্ভরতায়, শুভাশুভ দিন ক্ষণ গ্রহ রাশি ও নিয়তি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্ভর। তাই দুর্দশার দুর্ভোগের দুর্দিনে সংকট-মুক্তির, বেঁচে থাকার অনন্যপন্থা বা উপায় বলেই জানে, মানে। অজ্ঞ অসহায় ভীরু মানুষ তখন ভয়-ভক্তি-ভরসার অবলম্বন করে ইশ্বরাদি সর্বপ্রকার অদৃশ্য আসমানী শক্তিকে আশৈশব বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণায় চলে বলেই সমকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রকৌশল প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রিত জীবনের তাৎপর্য তারা উপলব্ধি করতে পারে না। অভিজ্ঞতার আলোকে প্রকৃতির কিংবা ঘটনার কারণ যাচাই করার সাহসও হয় না তাদের। যৌক্তিক ও বৌদ্ধিক চেতনার শূন্যতার দরুনই তারা ঈশ্বরে আস্থা রেখেও গ্রহ-নক্ষত্রজ রাশিকে জীবন-জীবিকার নিয়ন্ত্রক বলে মানে। এতে যে তত্ত্বের ও সত্যের অসঙ্গতি রয়েছে, তা তাদের মনে জাগেই না। এজন্যেই তাদের জীবনে ঈশ্বর আর রাশি কি পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী বা প্রতিযোগী শক্তি, কিংবা একে অপরের পরিপূরক শক্তি, সে-সম্বন্ধে তাদের মনে কোন প্রশ্নই জাগে না। তাই ঝাড়-ফুঁক, তুকতাক, বাণউচ্চাটন তাবিজ কবচ, মন্ত্র-মাদুলী পানি ধূলি তাগা আর অষ্টধাতু প্রভৃতি আজো তাদের দুর্দিনের দুরবস্থা-মুক্তির নির্ভরযোগ্য সহায়। আজকের আর্থ-সামাজিক বিপর্যয় পৃথিবীর উন্নত অনুন্নত দেশগুলোর মধ্যে তাই মৌলবাদ কোথাও মন্থর গতিতে, কোথাও বা দ্রুতগতিতে জনগণের মন জয় করছে। আমেরিকা অবধি ছড়ানো ছিটানো আনন্দ কিংবা হরেকৃষ্ণরাম, রজনীশমার্গী অথবা শিবসেনা, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ বা বিশ্বহিন্দুপরিষদ, বিজেপি অথবা বিভিন্ন নামের খ্রীস্টান মুসলিম তবলীগী মৌলবাদ মূলত একই আর্থসামাজিক হতাশা-নিরাশায় বিকৃত মননপ্রসূন-ব্যক্তির বৈরাগ্য যেমন বিকৃত জগৎচেতনার ও জীবনভাবনার ফল।

মৌলবাদে ইহজাগতিকতা নেই, নেই সমকালীন জগৎচেতনা ও জীবনভাবনা। এ যতটা পারত্রিক, তার শিকিপরিমাণও ঐহিক নয়, এ তাই অতীতমুখী, সম্মুখদৃষ্টি ও সম্মুখগতি এতে বাঞ্ছিত নয় কেননা এমত শাস্ত্রকে ও আচারকে অমোঘ কল্যাণের ধারক, বাহক ও উৎস বলে জানে ও মানে। এ শাস্ত্র দেশ কাল বাঞ্ছিত নয়। কেননা এ মত শাস্ত্রকে ও আচারকে অমোঘ কল্যাণের মানুষ-প্রজন্ম নিরপেক্ষ চিরকল্যাণের ও সর্বমানবিক। ব্যক্তিক সামাজিক রাষ্ট্রিক ও সম্ভাব্য সর্বপ্রকার সংকট-সমস্যার চিরন্তন সমাধানও নিহিত রয়েছে শাস্ত্রে।

কাজেই সর্বকালের সর্বমানবিক কল্যাণের আকর হচ্ছে শাস্ত্র। শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ অনুসরণই মিলবে ইহজাগতিক জীবনে নির্বিঘ্ন ভোগ উপভোগ সম্ভোগজাত সুখ-শান্তি-আনন্দ-আরাম, আর পারত্রিক জীবনে মিলবে অনন্তকালের স্বর্গসুখ। অতএব আত্মকল্যাণেই মৌলবাদী হও। ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্যবশেই তারা বিপথগামী মানুষদের পথে আনার জন্যে তাদের বিপন্মুক্তির লক্ষ্যেই, তাদের কল্যাণেই মানবিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করছে জোরে জবরদস্তিতে তাদের মত, পথ, সিদ্ধান্ত গ্রহণে অন্যদের বাধ্য করে, যেমন শিশুর কল্যাণেই শিশুকে শাসনে রাখে অভিভাবক।

আসলে তো যারা ভূত প্রেত পিশাচ দেবতা উপদেবতা অপদেবতা প্রভৃতি অদৃশ্য অরি-মিত্র শক্তির প্রতি ভয়-ভক্তি-ভরসা রাখে, তারা জেনে বুঝে যে বিশ্বাস-ভরসা রাখে তা নয়, শুনে শুনে ভয়-ভক্তি সংশয় নিয়েই তা করে, এর মধ্যে থাকে একটা মস্ত যদি'র ফাঁক ও ফাঁকি। মানুষ মূলত ইহজাগতিক জীবনকেই সত্য ও বাস্তব বলে জানে ও মানে, অজ্ঞাত ভাবী বিপদ এড়ানোর জন্যেই যুক্তির অভাবে পরলোক মানে। অন্যদিকে জ্ঞান বুদ্ধি যুক্তি বিবেক বিবেচনা সম্পন্ন মানুষ কেবল যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেকের অনুশীলনে নিষ্ঠ নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সহজে ও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে যদি মনে-মননে এ প্রবণতা জাগে, তাহলেই কেবল কেউ কেউ যুক্তিনিষ্ঠ মুক্তবুদ্ধির মানুষ হয়। তাই সমাজে আমরা নগণ্য সংখ্যক লোককে যৌক্তিক ও বৌদ্ধিক জীবন যাপন করতে দেখি। আর সাধারণ সামাজিক লোকেরা ভাবে চিন্তায় কর্মে আচারে আচরণে প্রজন্মক্রমে কেবল গড্ডলজীবনেই অভ্যস্ত হয়ে প্রশ্নহীন নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করে। একারণেই বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা চালিত সমাজবদ্ধ মানুষকে জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধিযোগে বুঝিয়ে সুঝিয়ে আবেদনে নিবেদনেও যাচাই বাছাই মাধ্যমে যৌক্তিক বৌদ্ধিক জীবন-চেতনায় প্রবুদ্ধ করা যায় না। এরা আশৈশবলব্ধ ও লালিত বিশ্বাস সংস্কার-ধারণা চালিত। এরা যখন নিঃস্বতায় নিরন্নতায়, রোগে শোকে পীড়নে শোষণে প্রবলের হুকুমে হুমকিতে হুঙ্কারে হামলায় আশা-আশ্বাসরিক্ত বিপর্যস্ত জীবনযন্ত্রণায় ভোগে, তখনই তারা শাস্ত্রীয় উচ্চারিত নিরাপত্তার বা সংকটমুক্তির আশ্বাসে শাস্ত্রানুগত হয়, কিংবা রাশিচক্রের প্রভাব অনুকূল করার জন্যে তাবিজ-কবচ, মন্ত্রপূত মাদুলী অষ্টধাতু ধূলি পানি তাগাধারণ করে। মৌলবাদীরা পাঁতি-ফতোয়া যোগে মানুষকে আদি অকৃত্রিম শাস্ত্রাশ্রিত হয়ে ইহপরকালের সর্বপ্রকার বিপদ আপদ এড়ানোর পথ-পদ্ধতি বাতলায়। আবাল্যের অভ্যাস বশে শাস্ত্রবাক্যের ও অদৃশ্যশক্তির প্রভাব চেতনা তাদের সহজেই অভিভূত করে। এভাবে মৌলবাদীর প্রভাবে পড়ে কিশোর-কিশোরীরা এবং ক্লান্তি ও গ্লানিক্লিষ্ট প্রৌঢ় প্রৌঢ়ারা, বয়োধর্মে দেহে মনে যাঁরা আপাত আত্মপ্রত্যয়ী ইহজাগতিক, তারা শাস্ত্রকথায় সহজে কাবু হয় না। আমাদের দারিদ্র্যক্লিষ্ট নিঃস্বতায় নিরন্নতায় সদাবিপন্ন, জীবিকার অনিশ্চয়তায় নিরাশ ব্যক্তিরাই তবলীগওয়ালাদের এবং মৌলবাদীর প্রভাবে পড়েছে। তাদের সংখ্যা ও প্রভাব বাড়ছে, ফলে প্রতিক্রিয়াশীলতা, অতীতমুখিতা নিয়তিবাদিতা পশ্চাৎপদতা বাড়ছে, প্রগতিশীলতা ও প্রাগ্রসরতা হচ্ছে বিঘ্নিত। প্রতিরোধ আবশ্যিক ও জরুরী। সন্তানের, জাতির ও মানুষের সামষ্টিক সামূহিক ও সামগ্রিক কল্যাণ লক্ষ্যেই জীবনের স্বাভাবিক প্রবাহ ও বিকাশ রক্ষার জন্যেই প্রতিরোধ আবশ্যিক।

হামলা কবলিত সংস্কৃতি

লোকে সংস্কৃতি ও অপসংস্কৃতি নামে বাঞ্ছিত সংস্কৃতির ও অবাঞ্ছিত সংস্কৃতির পার্থক্য নিরূপণ করে। আমরা বাঞ্ছিত সংস্কৃতি শুদ্ধসংস্কৃতি এবং অবাঞ্ছিত ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়াদুষ্ট সংস্কৃতিকে বিকৃত সংস্কৃতি নামে অভিহিত করতে পারি। তবে নাম নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজনই নেই। কেননা আমরা সাধারণের সংস্কৃতির স্বরূপ কিংবা সংজ্ঞা ও সংজ্ঞার্থ জানিও না, বুঝিও না। সংস্কৃতি আমাদের শোনা শব্দ মাত্র। তাই জনগণ সংস্কৃতি বলতে বাহ্যত ও আপাতত নাচ-গান-বাজনা-অভিনয়ই বোঝে। আর মানস-সংস্কৃতি কি এবং কেমন, তা জানা-বোঝার গরজও বোধ করে না অশিক্ষিতরা এবং শিক্ষিতরাও কখনো জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি প্রয়োগে সংস্কৃতির স্বরূপ জানা-বোঝার চেষ্টা করে না। জীবনে জীবিকায় পরিবারে সমাজে রাষ্ট্রে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধের ক্ষেত্রে সংস্কৃতির প্রভাব যে কত গুরু, গভীর ও ব্যাপক তা কখনো অনুভব-উপলব্ধিও করে না। তাই সচেতনভাবে সাধারণত লোকে চর্যারূপে কখনো সংস্কৃতির অনুশীলন করে না। তারা শাস্ত্রিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আচাররূপে কিংবা সামাজিক লৌকিকতা রূপেই ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে সভ্যভব্য সমাজভুক্ত ব্যক্তি হিসেবে অনুকৃত অনুসৃত রীতিরেওয়াজ স্বরূপ সংস্কৃতিমানতার পরিচয় দেয়। এর মধ্যে তাৎপর্যচেতনা কিংবা উপযোগচেতনাও গভীর থাকে না বলে লাভে লোভে স্বার্থে তা যথাপ্রয়োজনে, যথাকালে যথাস্থানে ও যথাপাত্রে লঙ্ঘন করতে কারো বাধে না। তাই 'সংস্কৃতি' আমাদের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে না, যা কিছু দেখতে, শুনতে, বলতে, করতে কুৎসিত, তা থেকে আমাদের ব্যক্তিক সংস্কৃতিচেতনা আমাদের বিরত রাখার শক্তি ধরে না। এর ফলে সংস্কৃতি আমাদের ব্যক্তিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে একটি উচ্চারিত সৌজন্যমূলক সৎকথা, সদুক্তিমাত্র।

এ জন্যেই আমরা যাঁদের ইংরেজীতে Intelligentia এবং বাঙলায় বুদ্ধিজীবী বলি, তারা নামে ভদ্রলোক, দেখতে সাফাকাপুড়ে (White collar) কিন্তু সাধারণত প্রত্যাশিতমাত্রার ভালো মানুষ নন চরিত্রে, চেতনায়, আদর্শে, আচরণে। আর আমাদের দেশে ও সমাজে তো Intellectual বা আঁতেল যাঁদের আমরা বাঙলায় মনীষী বলে মানি, তাঁদের সাক্ষাৎ তো ক্বচিৎ কখনো মেলে। বস্তুত তাঁরা দুর্লভতায় দুর্লক্ষ্য।

এঁদের মানসশক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এঁদের মানস সততা। পৃথিবীর কোন কোন স্বীকৃত মনীষীকেও তাই লক্ষ্যভ্রষ্ট, আদর্শচ্যুত কিংবা চরিত্রভ্রষ্ট হতে দেখা গেছে। আর বুদ্ধিজীবীরা তো তিন তালির তিন রঙের তিন ঢঙের থাকেনই। জীব-উদ্‌ভিদ সবাই আত্মপ্রসারের গরজে বুদ্ধিকে পুঁজি করে জীবন চালিত করে। এ তাৎপর্যে বুদ্ধিজীবী কথাটা ভুল ও নির্লক্ষ্য যোগরূঢ় মাত্র। আমরা এঁদের মগজজীবী কিংবা মস্তিষ্কআজীব স্বাধীন পেশার লোক বলে এককথায় 'মগজী' বলে অভিহিত করতে পারি। কেননা আমরা সরকারী চাকুরেদের বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করি না, আমরা স্বাধীন পেশার উকিল ডাক্তার শিক্ষক সাংবাদিক লেখক রাজনীতিক কর্মীদেরই বুদ্ধিজীবী বলে চিহ্নিত করি, অর্থাৎ যাঁরা কাগুজে বিবৃতি, মেঠো বক্তৃতা, হুজুগে মিছিল প্রভৃতিতে স্বেচ্ছায় অংশ নেন, আর যাঁরা গাইয়ে বাজিয়ে লিখিয়ে আঁকিয়ে নামের শিল্পী সাহিত্যিক চিত্রী ও অন্য নানা বিষয়ের চিন্তাশীল লেখক তাঁরা সবাই 'মগজী' বা বুদ্ধিজীবী।

এখন আমাদের 'সংস্কৃতি' ও মগজী বা বুদ্ধিজীবী সম্বন্ধে দু'চার কথা বলতে চাই। শিল্পী সাহিত্যিক চিত্রী ও অন্যান্য লেখক অভিনেতা সাংবাদিক প্রভৃতি তিন তালের তিন রঙের তিন ঢঙের থাকেন, এক প্রকারের আঁতেল বুদ্ধিজীবী আছেন যাঁরা ঘৃণা লজ্জা মন থেকে মনন থেকে, ঝেড়ে মুছে ফেলেছেন, তাঁরা হলেন সরকারঘেষাঁ। তাঁরা চাটুকার, স্তাবক, স্তুতিকার। তাঁরা সব সময়েই সরকারপক্ষের। তাঁরাই এরশাদী সংস্কৃতির বটিকা তৈরি করেছিলেন আলী আহসানী নেতৃত্বে। সরকার ডাক দিলেই তাঁরা Out fitters ও General order Suppliers হিসেবে সরকারী হুজুরে হাজির হয়ে ফরমায়েশ খাটেন। তাঁরা দেশের, জাতির ও মানুষের শত্রু। তাঁরা নিজের ও নিজের স্ত্রী-সন্তানের জন্যেই বাঁচেন ও করেন।

আর একদল আছেন, তাঁরা সরকারভীরু অর্থাৎ ক্ষতিভীরু। তাঁরা হচ্ছেন 'ভিক্ষে চাইনে, কুকুর ঠেকাও,' নীতির অনুসারী। তাঁরা সাহস করে বলতে ও করতে পারেন না, তাঁদের যত কথা মনে ওঠে। তাঁদের শক্তি মরে ভীতির কবলে, পাছে সরকার ঘাড়ে ধরে। তাঁরাও জনগণের কোন কাজে লাগেন না, তাঁরাও লাভে লোভে ও স্বার্থে বকের মতো, কূর্মের মতো নীতিনিয়ম মেনে চলেন। তাঁরা আসলে সমাজের দায়, সম্পদ নন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমাজে প্রথমোক্ত শ্রেণীর শিল্পী সাহিত্যিক চিত্রী লেখক অভিনেতা রয়েছেন শতে তেত্রিশজন, দ্বিতীয় বর্গের শিল্পী সাহিত্যিক চিত্রী লেখক অভিনেতা রয়েছেন শতে পঁয়ষট্টিজন আর গোঁয়ার, জেদী আদর্শনিষ্ঠ বেপরওয়া নির্ভীক প্রতিবাদী সংগ্রামী শিল্পী সাহিত্যিক চিত্রী লেখক অভিনেতা রয়েছেন বড়জোর শতে দু'জন। ফলে এঁদের জ্ঞান-বুদ্ধি, সাহস-শক্তি, অঙ্গীকার-উদ্যোগ গণতারিফ পেলেও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সংখ্যাল্পতার দরুন তাঁদের কোন প্রয়াস-প্রযত্ন-দ্রোহ-সংগ্রামই সফল হয় না।

সংস্কৃতি হচ্ছে ভাবে চিন্তায় কথায় কাজে আচারে আচরণে সংযমে সহিষ্ণুতায় সৌজন্যে সুন্দর হওয়ার ও সৌন্দর্য মাধুর্য প্রীতি সৃষ্টির অন্য নাম। সংস্কৃতিমান থেকে অন্য মানুষের অকারণে ক্ষতির, ভয়ের আশঙ্কা থাকে না, সংস্কৃতিমান মাত্রই মানুষমাত্রেরই অভয় আশ্রয়। সহ স্বার্থে, সংযমে, সহিষ্ণুতায়, সামবায়িক সহযোগিতায় অন্য মানুষের সঙ্গে সহাবস্থানে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়াই সংস্কৃতিমানতা।

ব্রিটিশরা বিদেশী ছিল বলে তারা আমাদের সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবনে বাহ্য নিরপেক্ষতা বজায় রাখত। কিন্তু পাকিস্তানে ও বাঙলাদেশে বিগত চুয়াল্লিশ বছর ধরেই আমাদের দৈশিক, ভাষিক ও মানসিক সংস্কৃতির উপর নানাভাবে মারাত্মক হামলা চলছে। শিক্ষাক্ষেত্রে তিন ধরনের শিক্ষা পদ্ধতি চালু করে জাতিসত্তার ও জাতীয় মন-মানসিকতার বিকৃতি ঘটানো হচ্ছে সুপরিকল্পিতভাবে, ভাষাব্যবহারে আর পাঠ্যপুস্তকে বিষয় বিন্যাসেও সে বিকৃতি প্রয়াস প্রকট। সংবিধানও সেক্যুলার নয়, সংখ্যাগুরুর ঐহিক না হোক, পারত্রিক কল্যাণ লক্ষ্যে দু'দুবার সংশোধিত।

সংবাদ ও সাময়িক পত্রগুলোতেও খাঁটি নির্ধন নির্বিশেষ মানুষ গড়ার প্রয়াস প্রযত্ন নেই, আছে শাস্ত্রিক, সাম্প্রদায়িক, রাষ্ট্রিক ও আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যচেতনা জাগিয়ে দেয়ার ও রাখার সযত্ন প্রয়াস। এ যন্ত্রযুগ ও যন্ত্রজগৎ যে বিচ্ছিন্নতার ও স্বাতন্ত্র্যের নয়, উদার মনুষ্যত্বের স্তরে আন্তর্জাতিকতার ও বৈশ্বিক চিন্তা-চেতনার উন্মেষ-বিকাশের কাল ও জগৎ, তা অনুভব উপলব্ধিগত না হলে আমাদের উন্নতি ও প্রগতি কেবল রুদ্ধই থাকবে, কেবল ব্যাহত হবে। আমাদের ন্যায়ের, কল্যাণের ও মানবতার অনুরাগী, অনুগত ও অনুগামী হতেই হবে আত্মকল্যাণের ও রাষ্ট্রিক কল্যাণের স্বার্থেই।

একটা দিশা খুঁজতেই হবে

ক্ষোভের ও লজ্জার কথা এই, আমরা একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের নাগরিক, আমরা বাহ্যত একটা জাতি, আমরা একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের ধারক ও শাসক এবং মালিক। তবু আমরা আজো যেন বিমূঢ় ও দিশেহারা। আমরা আজো আমাদের সত্তার ও জাতীয়তার স্বরূপ নিঃসংশয়ে অবিসম্বাদিতভাবে নিরূপণ করতে পারিনি। আজো আমরা বিবাদে বিতর্কে মেতে রয়েছি। আমাদের মনে, মতে, যুক্তিধারায় ও সিদ্ধান্তে বিচ্ছিন্নতার, বৈপরীত্যের ও ব্যবধানের পর্বতপ্রমাণ দুর্লঙ্ঘ্যতা কিংবা সাগরসম বিস্তার বর্তমান। আমাদের বিবাদে বিতর্কে জেদে যত আগ্রহ, দেশের, রাষ্ট্রের বা মানুষের স্বার্থে মীমাংসার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুরুত্বচেতনা সে-তুলনায় নেই। ফলে আমরা বাঙালী না বাঙলাদেশী, আমরা প্রথমত ও প্রধানত শাস্ত্রিক পরিচয়ে হিন্দু কিংবা মুসলমান অথবা বৌদ্ধ-খ্রীস্টান, নাকি আমাদের মৌলপরিচয় আমরা ভৌগোলিক বাঙলায় উদ্ভূত এবং ভাষিক বাঙলার ধারক হিসেবে কেবলই বাঙালী। রক্তসাঙ্কর্য থাকা সত্ত্বেও যারই মাতৃভাষা বাঙলা সেই নিখাদ, নিখুঁত নির্বিশেষে বাঙালী। এ বাঙালী এখন ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিশ্বের নানাস্থানে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে বাস করে। মাতৃভাষা রূপে বাঙলাভাষাকে ধরে রাখলে তারা বাঙালীই থাকবে। অতএব, আমরা জাতিসত্তায় বাঙালী। নাগরিক হিসেবে বাঙলাদেশী/দৈশিক রাষ্ট্রিক জীবনে এর চেয়ে বেশি কোন পরিচয় আমাদের প্রয়োজন নেই। বিবদমান রাজনৈতিক দলগুলো এখন কোন অবিসম্বাদিত মীমাংসায় রাজি হবে না রাজনীতিক মতের ও মতলবের বিভিন্নতায় লভ্য ফায়দা লোটার লোভে।

কিন্তু কোন রাজনীতিক দলভুক্ত নন, এমন ডাক্তার, উকিল, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, শিল্পী স্থপতি ভাস্কর, চিত্রী, সাহিত্যিক-সাংবাদিক প্রভৃতি বেসরকারী মগজী আঁতেলরা এবং সাধারণভাবে সচেতন সমাজ-সংস্কৃতি কর্মীরা মিলে একটা জাতীয় সম্মেলন আহ্বান করে এর একটা অরাজনৈতিক ঐতিহাসিক স্থায়ী মীমাংসায় উপনীত হওয়া দেশের, রাষ্ট্রের, মানুষের স্বার্থেই আবশ্যিক ও জরুরী বলে আমরা গভীর ব্যাপক ও তীব্রভাবে অনুভব-উপলব্ধি করি।

আমাদের এমনি আর একটি অমীমাংসিত জাতীয় গুরুত্বের এবং মানবিক গুরুত্বের সমস্যা আমাদের ব্রিটিশ শাসনোত্তর পঁয়তাল্লিশ বছরেও স্বাধীন সার্বভৌম বাঙলার বিশ বছরেও একটা সুনির্দিষ্ট একক শিক্ষাব্যবস্থা চালু হল না। টোলমাদ্রাসা শিক্ষা চলছে। দেশ-কাল জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রকৌশল-প্রযুক্তির সঙ্গে সম্পর্কহীন কালিক উপযোগরিক্ত মাদ্রাসা শিক্ষা অভাবিতভাবে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। অথচ আমরা জানি ও মানি যে শাস্ত্র হচ্ছে অপৌরুষেয় সনাতন চিরন্তন সত্য তথ্য ও তত্ত্ব। তার কোন হ্রাস-বৃদ্ধি বা পরিবর্তন পরিবর্ধন নেই। এ অবস্থায় শাস্ত্র জানার ও মানার জন্য কি বিদেশী পুরোনো ভাষা শেখার ও বহু বছর ধরে পড়ার প্রয়োজন আছে? দেশী ভাষায় মূলগ্রন্থাদির অনুবাদই সাধারণের জন্যে যথেষ্ট নয় কি? আবার বাঙলা মাধ্যমে শিক্ষাদানের মাহাত্ম্য-মহিমাও আশু প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে ও প্রচার-প্রচারণায় গুরুত্ব দিয়ে ও বাঙলাভাষার তথাকথিত প্রবক্তারা নিজেদের সন্তানদের শৈশবকাল থেকেই ব্যয়বহুল ইংরেজী মাধ্যমে শিক্ষাদানে উৎসুক ও অভ্যস্ত। উঠতি ধনী আমলা, সাংসদ, মন্ত্রী, ব্যবসায়ী মাত্রই সন্তানদের বিদেশী নাগরিক করতেও আগ্রহী। তিন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রাখা কি দেশের, রাষ্ট্রের ও সমাজের সংস্কৃতির উন্নয়ন-উন্নতির অনুকূল? নিশ্চয়ই নয়। তাহলে একটি একক অভিন্ন শিক্ষানীতি ও শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা দেশের, রাষ্ট্রের, জাতির ও নাগরিকের স্বার্থে একান্ত আবশ্যিক ও জরুরী।

কাজেই বিদ্বান উকিল ডাক্তার শিক্ষক সাংবাদিক শিল্পী সাহিত্যিক সবাই দেশ রাষ্ট্র জাতি ও মানুষের স্বার্থে ও হিতার্থে জাতীয় সম্মেলন করেই অরাজনীতিকভাবে একটা সুপরিকল্পিত একক এবং আধুনিক লিবারেল বা উদার জিজ্ঞাসাঋদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা গ্রহণ করতে সরকারকে ও দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ ও বাধ্য করা অত্যাবশ্যিক এবং জরুরী।

'সংস্কৃতি' শব্দটা উচ্চারণ করা সহজ, বোঝা কঠিন এবং বোঝানো কঠিনতর। এর সংজ্ঞা ও সংজ্ঞার্থ জটিল ও ব্যাপক, য়ুরোপে 'সংস্কৃতি'র একশ ছাব্বিশটা সংজ্ঞা চালু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রয়েছে। কিছু কিছু সংজ্ঞা জনপ্রিয় হলেও নিঃসংশয়ে নির্দ্বিধায় গ্রাহ্য সংজ্ঞা আজো দুর্লভ। তবু সংস্কৃতি যে সৌন্দর্যের, সুরুচির, সৌজন্যের, সচ্চরিত্রের, সুনীতির, কল্যাণের হিতৈষণার, সদিচ্ছার, পরার্থপরতার, নির্লোভতার, সংযমের, সহিষ্ণুতার, সদাচারের, প্রীতির, কৃপার, করুণার বীজ-নির্যাস সমষ্টির প্রতীক, প্রতিম ও প্রতিভূ, তা বলে দেয়ার অপেক্ষা রাখে না। যা কিছু দেখতে, শুনতে, করতে, বলতে অশোভন তা পরিহার করা এবং নিজের স্বার্থে অপরের ক্ষতি না করার নীতিই সংস্কৃতিমানতা। সৌজন্যেই, সংযমেই, সহিষ্ণুতাতেই সংস্কৃতির স্থিতি। এখন আমাদের নাচের-গানের-বাজনার নাটকের সিনেমার বিষয়ের উপর, আমাদের ভাষা ব্যবহারের উপর, আমাদের সাহিত্যের বিষয়ের উপর, আমাদের পাঠ্যবিষয়ের উপর একপ্রকার অদৃশ্য সূক্ষ্ম হামলা শুরু হয়েছে। স্কুলের পাঠ্যবইয়ে এখন বহির্বিশ্বের সমাজ ও মানুষ মেলে না, এখন 'লিবারেল' দৃষ্টি অধিজনের শাস্ত্রসম্মত দৃষ্টির রূপ পাচ্ছে। এখন য়ুরোপ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে হাজার দেড় হাজার বছরের আগের পৃথিবীর দিকে তাকানোর আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। অতীত ও ঐতিহ্যপ্রীতি সংস্কৃতির প্রবহমানতা রোধ করে। আত্মরতি পরপ্রীতির পরিপন্থী। শ্রেয়সকে, সুন্দরকে, নতুনকে গ্রহণ করার আগ্রহই মানস-স্বাস্থ্যের লক্ষণ। আমাদের মানব-উত্তরাধিকারে আস্থা ও অধিকার রাখা দরকার। তাতেই আমরা অঙ্গে ও অন্তরে, মনে-মননে ও ব্যবহারিক জীবনের আচার-আচরণে সমকালীনতা রক্ষা করে যুগদ্ধর থাকতে পারব। আমাদের মনের, মননের ও চরিত্রের, কর্মের ও সংস্কৃতির উন্নতি হবে।

অতএব, আমাদের জাতিপরিচয়, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা, আমাদের সংস্কৃতিচেতনা সুষ্ঠু ও নিঃসংশয় হওয়া আবশ্যিক ও জরুরী।

AMARBOI.COM

ধারণাবাদী ও জ্ঞানবাদী

সবাই সব শাস্ত্র মানে না, কেউ একটি শাস্ত্র মানে, অন্যগুলোকে স্বীকারও করে না। কেউ কেউ বিশেষ কোন শাস্ত্র মানে না বটে, তবে কোন কোন শাস্ত্র মানে। তারা শাস্ত্রকে দু'ভাগে ভাগ করে। একভাগ হচ্ছে কল্পনা, বিস্ময়, ভয়, ভক্তি ভরসাপ্রসূন অলীক, অলৌকিক এবং লৌকিক অরি-মিত্র শক্তিশালীর শাস্ত্র। এ হচ্ছে একান্তভাবে ধারণা মাত্র, জ্ঞান নয়। জ্ঞান মাত্রই বস্তুগত ও সাক্ষ্য-প্রমাণ সমর্থিত প্রত্যক্ষ, পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ, নিরীক্ষণ ও যন্ত্রযোগে প্রমাণসম্ভব। কাজেই ধারণার শাস্ত্রে বিশ্বাসীদের মধ্যে মন, মত, মনন, বিশ্বাস ও সিদ্ধান্তগত পার্থক্য অনেক ক্ষেত্রেই প্রায় উত্তর-দক্ষিণ মেরুর মতো। একের শাস্ত্রে অপরের কোন আস্থা বা শ্রদ্ধা নেই, বরং প্রচ্ছন্ন, নিষ্ক্রিয় অবজ্ঞা, অনাস্থা ও উপহাস থাকে। কেউ কবচ, কেউ তাবিজ, কেউ তাগা-মন্ত্র মাদুলী নির্ভর। কেউ কেউ ঝাড়-ফুঁক বাণ উচ্চাটন-ধূলি পানি সর্ষে পড়ায় আস্থাবান, কেউ জ্যোতিষে, কেউ রাশিতে, কেউ হস্তরেখায় অদৃশ্য নিয়তির নিয়ন্ত্রণ দেখে। মানুষ সাধারণভাবে আশৈশব দেখে শুনেই শেখে, বিশ্বাস-সংস্কারে আবদ্ধ হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জিজ্ঞাসা কৌতূহল সন্দেহ কিংবা যা জেনে শুনে এসেছে, তা তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য হিসেবে প্রমাণে অনুমানে গ্রহণযোগ্য কি-না, তা বুদ্ধির সঙ্গে জ্ঞানের, সাহসের সঙ্গে শক্তির, সন্দেহের বা জিজ্ঞাসার সঙ্গে নিষ্ঠ গবেষণার, অঙ্গীকারের সঙ্গে উদ্যমের, উদ্যোগের ও আয়োজনের আর মনের, মননের ও মনীষার সঙ্গে যুক্তিপ্রমাণের সমন্বয় ঘটিয়ে কেউ জীবনের তাৎপর্য ও জগতের রহস্য সন্ধান করে না। তাই মানুষ প্রজন্ম পরম্পরায় শোনা কথালব্ধ ধারণাকে জ্ঞান, সত্য, তথ্য ও তত্ত্ব বলে জেনে, বুঝে ও মেনে জীবন যাপন করে। এধারণাকেই এরা জ্ঞান, সত্য, তত্ত্ব, তথ্য এবং অমোঘ চিরন্তন শাস্ত্র বলে জানে, বোঝে ও মানে। এরা আস্তিক, এদের জীবন ইহলোকে পরলোকে প্রসৃত। এদের কাছে অদৃশ্য অরি-মিত্র আসমানী শক্তির স্থিতি ধ্রুব। এরা জীবনে সর্বক্ষণ এ অরি-মিত্র নিয়তির নিয়ন্ত্রণ জীবনে সুখে দুঃখে, লাভে স্বার্থে, আনন্দে, বেদনায়, রোগে-শোকে, অর্জনে, ক্ষয়ক্ষতিতে অনুভব করে, হয়তো আশৈশবের মগজ ধোলাইয়ের ফলে উপলব্ধিও করে। এদের নিয়েই বিশ্বের আস্তিক শাস্ত্রিক মানুষের সমাজ।

এদের মধ্যে ফকির, দরবেশ, সাধু, সন্ন্যাসী, ভিক্ষু, শ্রমণ, শ্রাবক-পাদরী, রাব্বী রয়েছেন, রয়েছেন ধার্মিক আচারনিষ্ঠ ব্যক্তিরা, রয়েছেন চোর-ডাকাত-জোচ্চোর-জুয়ারী শোষক বঞ্চক পীড়ক। রয়েছেন দুষ্ট, দুর্জন, দুর্বৃত্ত, দুষ্কৃতী, পতিতা, রয়েছেন অসৎ ঠিকেদার, আড়তদার, দোকানদার, ভেজালদার, কারখানাদার। রয়েছেন নীতি-আদর্শরিক্ত উকিল ডাক্তার শিক্ষক সাংবাদিক বুদ্ধিজীবী শিল্পী লেখক প্রভৃতি দেশের সব রকমের শিক্ষিত অশিক্ষিত পেশাজীবী। এ-ই হচ্ছে ধারণারূপ জ্ঞাননির্ভর তথা শাস্ত্র, আপ্তবাক্য, প্রবাদ প্রবচন ভূত প্রেত, পিশাচ ড্রাগন অদৃশ্য অরি-মিত্র শক্তিতে আস্থাবান মানুষের তথা অলীকে অলৌকিকে লৌকিকে দেশাচারে লোকাচারে নিয়তিলীলায় রাশির প্রভাবে আস্থাবান মানুষের অলীকের অদৃশ্যের অনুরাগী, অনুগামী ও অনুগত মানুষের ইতিবৃত্তান্ত। কাজেই শাস্ত্র, দর্শন, জ্যোতিষ প্রভৃতি জ্ঞান নয় ধারণা। ধারণার ভিত্তি আনুমানিক যুক্তি। জ্ঞান মাত্রই বস্তুগত। জ্ঞান প্রমাণ সম্ভব। এ জন্যে বিজ্ঞান-প্রকৌশল-প্রযুক্তি প্রভৃতি জ্ঞান, চিকিৎসা, জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়ন গণিত পদার্থ উদ্‌ভিদ জীববিদ্যা প্রভৃতি প্রমাণজ, প্রমাণ নির্ভর, প্রমাণ ও প্রমাণসম্ভব জ্ঞান। এ জ্ঞানে আজো হয়তো অনেক অপূর্ণতা রয়েছে, পূর্ণতায় পৌঁছতে আরো শ্রম ও সময়, মনন ও মনীষা লাগবে। তাই জ্ঞাননির্ভরতাই বিজ্ঞতা ও যুক্তিবাদিতা। লব্ধজ্ঞান প্রতারিত করে না। ধারণার পার্থক্য কেবল বিচ্ছিন্নতা, স্বাতন্ত্র্য দ্বেষ-দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ-সংঘাত ঘটায়। নির্বিবাদে, নির্বিরোধে, নির্বিঘ্নে নিরুপদ্রবে, নিরাপদে মানুষকে সহযোগিতায় সহাবস্থান করতে দেয় না। ধারণারূপ জ্ঞান-বিশ্বাসওয়ালারা সাধারণভাবে স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়, রক্ষণশীল ও অসহিষ্ণু। অথচ মুক্তবুদ্ধির যুক্তিবাদী মানুষ না হলে কেউ উদার ও মানবতাবাদী হতে পারে না।

আজকের বাঙলাদেশ : চোরাবালিতে স্থিতি

আমরা একালে অবিসম্বাদিতভাবে স্বীকার করে নিয়েছি যে যত জন, তত মন, তত মত, তত রুচি এবং বিভিন্ন লাভে ও লোভে ও স্বার্থে ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ এবং সিদ্ধান্তও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিচিত্র। এর ফলেই মানুষের মন-মনন মগজের ও মনীষার বিকাশের ফলেই উৎকর্ষ সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এ বিকাশ, উৎকর্ষ ও বৈচিত্র্য পৃথিবীর সর্বত্র সমমানে মাপে ও মাত্রায় সম্ভব হয়নি। কেননা যেখানে-জিজ্ঞাসা, কৌতূহল, সন্দেহ, নতুনের কাঙ্ক্ষা, বৈচিত্র্যে আকর্ষণ, আবিষ্কার-উদ্‌ভাবন ও সৃষ্টির আগ্রহ, প্রয়াস ও প্রযত্ন নেই, সেখানে বন্ধ্যাত্ব, গতানুগতিকতা, রক্ষণশীলতা, বৈচিত্র্যবিদ্বেষ ও নতুনভীতি মানুষের মন-মনন-মগজ ও মনীষা নিয়ন্ত্রণ করে। এজন্যেই আদি ও আদিম অবস্থায় আরণ্য-বর্বর কৌম গোত্র-গোষ্ঠী সমাজ আজও সুলভ, তেমনি মানুষের মন-মত-পথের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের স্বাধীনতা মানুষকে আবিষ্কারে উদ্‌ভাবনে বিচিত্র ভাব-চিন্তার সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে। আজকের পৃথিবীতে আবিষ্কারে উদ্‌ভাবনে ও সৃষ্টিতে যারা যত প্রাগ্রসর তারা পরিবারের সমাজের সরকারের ও রাষ্ট্রের নৈতিক আর্থিক সমর্থন ও সাহায্য পেয়েই বিকাশের এ স্তরে উন্নীত হয়েছে। এমনি রাষ্ট্রে ও সমাজে ব্যক্তিমানুষও নাগরিক হিসেবে ব্যক্তিসত্তার মূল্য-মর্যাদা-গুরুত্ব ও স্বাধীনতা নিয়ে স্বাধিকারের সীমার মধ্যে থেকে আত্মবিকাশের ও আত্মপ্রতিষ্ঠার পূর্ণ সুযোগ পায়। এমনি সমাজকে আমরা সভ্যতম সমাজ এবং এমনি রাষ্ট্রকে আমরা পূর্ণ বিকশিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে স্বীকার করি। কিন্তু আফ্রো-এশিয়ার ও ল্যাটিন আমেরিকার রাষ্ট্রগুলো য়ুরোপীয় আদলে জীবন-পরিবার সমাজ-রুচি-সংস্কৃতি শাসন-প্রশাসন গঠনের প্রয়াসী কিন্তু যে মন-মনন-মগজ-মনীষা, রুচি-সংস্কৃতি-বিবেক বিচাররূপ মানসপ্রসূন থেকে এর উদ্‌ভব, তা এদের নেই বলে, কৃত্রিম অনুকরণে ও অনুসরণে তৈরি বাহ্য কাঠামো এবং কৃত্রিম আচার-আচরণ সুফল দেয় না। এখানে ন্যূনতম নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ, প্রথা-পদ্ধতি, সংযম-সহিষ্ণুতা-সৌজন্য মেনে চলা এবং চালানো সম্ভব হয় না। ফলে লাভে-লোভে স্বার্থে এবং পরমত অসহিষ্ণুতায় মারামারি কাড়াকাড়ি হানাহানি কেবল জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রেই নয়, শাস্ত্রিক নৈতিক শৈক্ষিক, আর্থবাণিজ্যিক, প্রাশাসনিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও নিত্যকার ব্যাপার হয়ে জনজীবন উপদ্রুত ও বিঘ্নিত করে রাখে। আইনের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করা এখানে সহজ হয় না।

আফ্রো-এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকার সব রাষ্ট্রেরই অবস্থা ও অবস্থান কম বেশি এমনই। এর প্রধান ও প্রথম কারণ (১) অজ্ঞতা-নিরক্ষরতা এবং সাক্ষরতাকে শিক্ষা বলে চালিয়ে দেয়ার প্রবণতা (২) অধিকাংশ মানুষের নিঃস্বতা নিরন্নতা তুচ্ছ আয়ের বিভিন্ন বৃত্তিজীবিতা, মজুরী প্রভৃতির আধিক্য (৩) উচ্চ শিক্ষার, উচ্চ বৃত্তির, উচ্চ বর্গের মানুষের অপ্রতিরোধ্য লাভ-লোভ স্বার্থ, খ্যাতি-ক্ষমতা, দর্প-দাপট, প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং অর্থ বিত্ত অর্জনের অবাধ সুযোগ সুবিধে। কোন প্রকারের মানবিক বা বিবেকী-বিবেচনা ব্যবসায় বাণিজ্যে, কলেকারখানায় দফতরে-আদালতে চালু নেই। এমনকি সামাজিক সম্পর্কে পর্যন্ত কোন বিবেকী সংযম-সহিষ্ণুতা-শোভনতা, মানবিক হৃদয়বানতা, ন্যায্যতা এবং সাংস্কৃতিক রুচি সৌন্দর্যের সীমা রক্ষা করার গরজও বোধ করে না কেউ। তাই এখানে আইন থাকে, আইনের মুদ্রিত কেতাব থাকে, পবিত্র ও অবশ্যমান্য একটি রাষ্ট্রিক সংবিধানও থাকে, কিন্তু উপর্যুক্ত কারণে বাস্তবে কিছুই মানা হয় না। যথাকালে, যথাস্থানে, যথাপ্রয়োজনে, যথাপাত্রে এসব পবিত্র আইন-কানুন, নীতি-নিয়ম, প্রথা-পদ্ধতি ভঙ্গ করতে এদের বিবেকে, নৈতিক চেতনায়, ন্যায়বোধে আত্মসম্মানবোধে বাধে না। শহুরে শিক্ষিত ধনী-মানী খ্যাতিমান লোকের মুখে প্রায় সর্বদা মানবিকতার, মানবতার, মনুষ্যত্বের ও ন্যায়-অন্যায়ের কথা উচ্চারিত হলেও, লাভে লোভে ও স্বার্থে মুহূর্তেই বেচশম বেশরম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেহায়া বেদানাই বেআক্কেল বেদরদ বেআদব বেল্লিক হতে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে মুহূর্তকালও ভোগে না। এজন্যেই শহুরে শিক্ষিত উচ্চবিত্তের ও উচ্চবর্গের উচ্চপদের মানুষের মধ্যেই প্রত্যাশিত ও সমাজে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নেকমায়েশ লোক মেলে না। তাই আমাদের জাতীয় জীবনে ও সমাজে, জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে, শাসনে-প্রশাসনে, আর্থ-বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে সমাজ-স্বাস্থ্যের জন্যে প্রয়োজনীয় গুণের মানের মাপের ও মাত্রার আদর্শ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যনিষ্ঠ চরিত্রবান মানুষ বিরলতায় দুর্লভ ও দুর্লক্ষ্য। এজন্যেই আমাদের আর্থিক জীবনে, শৈক্ষিক জীবনে, নৈতিক জীবনে, শাসন-প্রশাসনিক জীবনে আদালতে কোথাও মানবিক সাংস্কৃতিক উন্নতির, উৎকর্ষের কিংবা আর্থিক জীবনে বৃদ্ধির কোন সাধারণ লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয় না সহজে। এ অবস্থার উন্নতির জন্যে দেশপ্রেমী-মানবসেবী-গণমুক্তিকামী জীবন, জগৎ ও সমাজসচেতন, পরার্থপর আদর্শবান মনীষা-সাহস ও চরিত্রবান কিছু সংখ্যক মানুষের সমবেত প্রয়াসে সংগঠিত একটি সেক্যুলার জাতীয় রাজনীতিক দল আবশ্যিক ও জরুরী, যাতে করে সে-দলের ও নেতাদের সদিচ্ছার কার্যক্ষমতার উপর ভরসা রেখে উজ্জ্বল-উন্নত ভবিষ্যতের আশায় ও আশ্বাসে নতুন শক্তি-সাহস, উদ্যম-উদ্যোগ ও আয়োজন নিয়ে আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে কাজে নামতে পারে তরুণ তরুণীরা। এত কথা বলতে হল এজন্যে যে এখন দেশের শহুরে শিক্ষিত অর্থবিত্তবান মানুষেরা দেশের ভবিষ্যতের প্রতি আস্থা হারিয়ে বিদেশে সপরিবার আশ্রয় সন্ধান করছে। ফলে দেশে থেকেও এরা স্ব-স্ব দায়িত্বে ও কর্তব্যে অবহেলাপরায়ণ। আর তাতে দেশের আর্থিক প্রাশাসনিক ও আইন শৃঙ্খলার সংকট কেবলই বাড়ছে।

আমাদের অর্থাৎ সাক্ষর-নিরক্ষর দরিদ্রজনেরা যাদের দেশ ছেড়ে যাওয়ার কোন উপায় নেই, এ আসন্ন ও আপন্ন বিপদ সম্পর্কে গভীরভাবে ভাবনা-চিন্তা করার সময় এসেছে।

AMARBOI.COM

পাকা কাণ্ডারী চাই

জ্ঞান-অভিজ্ঞতা-বিজ্ঞতাকেই যদি আমরা wisdom বা প্রজ্ঞা বলে মানি, তাহলে সেগুলোর বড় বড় চিন্তাচেতনা কিসসা কাহিনী ঘটনা থেকে মেলে তুচ্ছ ঘটনা, আচরণ কিংবা কর্ম থেকেই। শুক্তিতেই মুক্তো মেলে, হাঁড়র-তিমিতে নয়। আমাদের জীবনে ক্ষয়ক্ষতি বিপদমুক্তির জন্যে আমাদেরও প্রবাদ প্রবচন ধাঁধা আপ্তবাক্য ছড়া শ্লোক থেকেই সদা সর্ব প্রযত্নে প্রয়াসে সতর্কভাবে গা-পা বাঁচিয়ে ঘরে বাইরে মেলায়-মজলিসে, আড্ডায়-সমাজে, যৌথকর্মে শাসনে প্রশাসনে সরকারে রাষ্ট্রে চলতে জানার ও পরার শিক্ষা ও দীক্ষা নেয়া দরকার। অবশ্য এ দাওয়া হচ্ছে ক্ষতিভীরু সুখকামী-লাভ-লোভ স্বার্থ সন্ধিৎসু স্বার্থপর মানব প্রজাতির যারা প্রাণীসুলভ জীবন যাপনে আগ্রহী, কেবল তাদের জন্যেই। এদের জন্যেই ঈসপের, পঞ্চতন্ত্রের, গোপাল ভাঁড়ের, নাসিরউদ্দীন হোজ্জার গল্প সৃষ্ট, রচিত চাণক্য ও উদ্‌ভট শ্লোক।

আর এক ধরনের লোক আছে, তারা অসংযত, অসহিষ্ণু, লাভ-লোভ স্বার্থসচেতন এবং বৃত্তি-প্রবৃত্তি চালিত স্বল্পবুদ্ধি, অদূরদর্শী প্রাণী প্রকৃতির মানুষ। তারা প্রায়ই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবিমৃষ্যকারী, আপাত লাভ লোভ স্বার্থ সুখ আনন্দ-আরামকামী। তাদের মন-মননের নিবাস চোখের কোলেই, তারা আবেগতাড়িত, জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-বিবেক-বিবেচনা চালিত নয়। বৌদ্ধিক ও যৌক্তিক জীবন তাদের অনভূত ও অনউপলব্ধ। তারা অপরিণামদর্শী। তারা মাছের মতোই। মাছ যেমন চেনে না বর্শি ও জাল, মানুষও বোঝে না কাল। পাখি যেমন খাদ্যলোভে ফাঁদে পা দেয়, মানুষও তেমনি আপাত লাভে-লোভে-স্বার্থে-সুখে আত্মবৈনাশিক পন্থা বরণ করে সাগ্রহে সানন্দে।

এ কেবল ব্যক্তিগত জীবনে নয়, দেশের মাটির ও মানুষের প্রতি প্রীতি দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ না থাকলে দেশের আর্থ-বাণিজ্য, শাসন-প্রশাসন, রাজনীতিক দল, সাংসদ, দফতর, সরকার ও রাষ্ট্র যদি তাদের নেতৃত্বে, কর্তৃত্বে, জ্ঞানে-যুক্তিতে, পরামর্শে মদদে এবং শক্তি সামর্থ্যে চলে, তাহলে সে দেশ কেবল বন্ধ্যা, অবক্ষয়গ্রস্ত, গতানুগতিক রীতি-রেওয়াজবদ্ধ হয়েই থাকে। তার বিকাশের, উন্নয়ন-উৎকর্ষের কোন আশা আশ্বাস থাকে না।

বিদেশীর ঋণে দানে অনুদানে ত্রাণে পরামর্শে, মদদে-হুকুমে-হুমকিতে, এমনকি হুঙ্কার হামলার ভয়ে চালিত আফ্রো-এশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকার দরিদ্র অজ্ঞ অবক্ষয় আকীর্ণ রাষ্ট্রের মুৎসুদ্দি সরকারগুলোর মধ্যে দেশপ্রেমী, মানবসেবী, গণমুক্তিকামী নেতা-উপনেতা আবিষ্কারক উদ্‌ভাবক শিল্পী সাহিত্যিক ঐতিহাসিক দার্শনিক সমাজবিজ্ঞানীও সহজে মেলে না। এরা দেশের বা রাষ্ট্রের বা দেশবাসীর সামগ্রিক, সামষ্টিক ও সামূহিক স্বার্থে কাজ করে না। মান-যশ-খ্যাতি-ক্ষমতা-দর্প-দাপট-প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে উচ্চকণ্ঠে বাণী উচ্চারণ করে, তা মুখের সত্য হলেও, বুকের সত্য হয় না, মেঠো বক্তৃতায় আস্ফালন করে, কাগুজে বিবৃতিতে হুমকি ছাড়ে, মিছিলে নানা 'নারা' দিয়ে আকাশ-বাতাস কাঁপায়, কিন্তু ফল ও ফসল থাকে প্রায় শূন্য।

এসব অপরিণামদর্শী রাজনীতিকরা ক্ষমতার গদি দখলে রাখার জন্যে পরিণামে আত্মবিনাশী নীতি গ্রহণ করে। এ মুহূর্তে তার একটি বিষময় ফল হল— দেশের মসজিদগুলো মৌলবাদী মোল্লা-মুয়াজ্জিন-ইমাম-মৌলভীর খপ্পরে পড়ে গেছে। তথা দেশের গাঁ-গঞ্জের নয় শুধু শহর-বন্দরের, পাড়ার-মহল্লার সবাই এখন ধর্মের নামে তথাকথিত ধর্মবেত্তা মোল্লা মুয়াজ্জিন ইমাম মৌলভীর অনুরাগী, অনুগামী ও অনুগত হয়ে পড়েছে। এদের য়ুরোপীয় বা দেশীয় আদলে উদার মতবাদে ও শিক্ষায় কিংবা য়ুরোপীয় পরমতসহিষ্ণু Liberalism-এ বা মার্কসবাদে অনুপ্রাণিত করা অসাধ্য-দুঃসাধ্য হয়ে উঠবে। জাতি হিসেবে আমরা বহু বহু কালের জন্যে পিছিয়ে পড়ব। সমকালীন বা আধুনিক জ্ঞানে বিজ্ঞানে প্রকৌশলে প্রযুক্তিতে মতে-মনে-মননে মনীষায় এবং ইতিহাস দর্শন শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি রুচি বিবেক বিবেচনা ন্যায্যতা প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে। আমাদের জীবনে আসবে অতীত, ঐতিহ্য, অতীতমুখী জীবনানুরাগ।

আমরা হব সমকালীন জীবন ও জগৎ বিমুখ। আমরা কূর্মের এবং কূপমণ্ডূকের মতো রক্ষণশীল, আন্তর্জাতিকতাভীরু, বৈশ্বিক চেতনারিক্ত বন্ধ্যা ও অবক্ষয়গ্রস্ত গতানুগতিকতায় ও রক্ষণশীলতায় যাপন করব আবর্তিত জীবন। দেশ ও মানুষ হবে এ-যন্ত্রযুগ, যন্ত্রজগৎ বিজ্ঞান-প্রকৌশল প্রযুক্তি, সংযম-সহিষ্ণুতা ও সৌজন্যঋদ্ধ বৈশ্বিক সমাজ ও মৈত্রীবঞ্চিত এক বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র আরণ্য সমাজে ও রাষ্ট্রে পরিণত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজ মাটিপ্রেমী, মানবসেবী ও গণমুক্তিকামী গণআস্থাভাজন কোন রাজনীতিক দল দেশে আছে বলে সাক্ষর-নিরক্ষর অধিকাংশ দেশবাসী স্বীকার করে না। রাজনীতিক দল মাত্রেই বিদেশীর অর্থ, পরামর্শ ও মদদনির্ভর। তাই এদেশে দেশপ্রেমী নেতা গণমানব হিতকামী সরকার মেলে না, কেবল ক্ষমতার, গদি দখলের মৌসুমী রাজনীতিক দল মেলে, যারা কার্যত কেবল ভোট যোগাড়ের রাজনীতিই করে এবং তারা যখন ক্ষমতার গদিতে বসে তখন তাদের নিজেদের এবং নিজেদের আত্মীয়-স্বজনদের শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক স্বাস্থ্য এবং সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি পায় বটে, কিন্তু অন্য কারো কোন উপকার হয় না। কোন প্রত্যাশাও পূরণ হয় না। আধিকাংশ লোকের নিঃস্বতা, নিরন্নতা ও দারিদ্র্য আর অসহায়ত্ব ও বেকারত্ব কেবল বাড়তেই থাকে মুদ্রাস্ফীতির ও জনসংখ্যাবৃদ্ধির অনুপাতে।

আমাদের দেশে এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে শিক্ষিত শহুরে লোকেরা যারা আর্থ-বাণিজ্য ক্ষেত্রে শাসনে-প্রশাসনে বিভিন্ন উঁচুমানের পেশায় রয়েছেন যেমন উকিল ডাক্তার অধ্যাপক সাংসদ আমলা মন্ত্রী প্রমুখ সবাই একটা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগছে। সেই দ্বিধা হচ্ছে সন্তানের আর্থিক-সামাজিক নির্বিঘ্ন নিরাপদ স্থিতি সম্পর্কে। ঋণে দানে অনুদানে ত্রাণে এবং আর্থ-বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যবাদী মহাজনের স্বার্থে তাদের হুকুমে পরামর্শে এবং নির্দেশে চালিত মুৎসুদ্দি সরকার ইচ্ছে থাকলেও যে দেশ গড়তে পারে না— দেশের মানুষের আর্থিক জীবনের উন্নতি সাধন করতে পারে না, তা জানা-বোঝা আছে বলেই তারা তাদের সন্তান-সন্ততির সঙ্গে তাদের সঞ্চিত অর্থ-বিত্ত যুক্তরাষ্ট্রে যুক্তরাজ্যে কানাডায় প্রভৃতি অঞ্চলে পাচার করছে। তারা বুঝেছে, এদেশ তাদের সন্তানের নিশ্চিন্ত নিরাপদ আর্থিক জীবনের অনুকূল থাকবে না। কাজেই তাদের এখন কোন দেশপ্রেম নেই। বাঙলাদেশে তাদের বেণে আমলা-উকিল ডাক্তার মন্ত্রী সাংসদ অধ্যাপক প্রভৃতি ধনীমানী হিসেবে স্থিতি হচ্ছে অনেকটা অর্থ উপার্জনের জন্যে দুবাইয়ে থাকার মতো। কাজেই দেশের যথার্থ নিয়ন্তা-নিয়ন্ত্রক শ্রেণী দেশ ছেড়ে পালাবার তালে রয়েছে। দেশটা যেন একটা ক্লাবের জুয়া-জুয়ারীর টেবিল, ভূত ভবিষ্যৎহীন। অন্যদিকে ১৯৪৭ থেকে কিংবা ১৯৭২ থেকে নানা ঐতিহাসিক রাজনীতিক শাস্ত্রিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রিক কারণে এ পঁয়তাল্লিশ বছরেও একটা সেক্যুলার বাঙালী জাতি গড়ে ওঠেনি। ফলে দেশের মানুষের শাস্ত্রিক বিচ্ছিন্নতা, স্বাতন্ত্র্য মানসিক ও ব্যবহারিক জীবনে দ্বেষ-দ্বন্দ্বের একটা বিষাক্ত সম্পর্ক থেকেই গেছে। ফলে পাকিস্তান আমলের মতোই আজকের স্বাধীন সার্বভৌম বাঙলাদেশেও অমুসলিমরা স্বদেশে স্বভিটায় স্বঘরে নির্বিরোধ -নির্বিবাদ নির্বিঘ্ন নিরুপদ্রব নিরাপদ নিশ্চিন্ত জীবনের আশা আশ্বাস ও ভরসা পাচ্ছে না। তাই অমুসলিমরা এই অনিশ্চিতির মানসিক কারণে ভারতে বা অন্য কোন বিদেশে অর্থ পাচার করে নিজেদের এবং সন্তানের ভাবী আর্থিক জীবন সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চায়। অতএব এ দুই ভাবেই জাতীয় অর্থ-সম্পদ বিদেশে পাচার হওয়ায় দেশের আর্থিক উন্নতি প্রচণ্ডভাবে ব্যাহত হচ্ছে। কাজেই লগ্নীপুঁজি শিল্পপুঁজি বাণিজ্যপুঁজি গড়ে উঠতে পারছে না। অন্যদিকে উচ্চশ্রেণীর ধনীদের দেখাদেখি অপেক্ষাকৃত নিম্ন আয়ের শহুরে শিক্ষিত ব্যক্তিরা, এমনকি গাঁয়ের সচ্ছল সচেতন গৃহস্থরাও সন্তানদের ভারতে পাঠাচ্ছে শিক্ষাদানের জন্যে। এতেও কোটি কোটি টাকা বিদেশে চলে যাচ্ছে। বাকী থাকে ভিখারি-দিনমজুর কামার-কুমার তাঁতী হাড়ি ডোম জেলে মুচি মেথর ক্ষেতমজুর প্রান্তিক বর্গাচাষী প্রভৃতি যারা দিনে এনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিনে খায়, যাদের জীবনে কোন স্বপ্ন-সাধ ও আশা-প্রত্যাশা নেই, তারাই থাকবে দেশে। তারাই মাঝে মধ্যে মরবে ঝড়ে ঝঞ্ঝায় খরায় বন্যায় মহামারীতে ও দুর্ভিক্ষে। যারা সদা বিপন্ন জীবনে দিনান্তে ভাবে আজ অন্তত বেঁচে গেলাম, কেননা তাদের জীবন হচ্ছে সব সময়েই আপন্ন ও আসন্নবিপদ সংকুল। তাদেরই তো রয়েছে ওমর খৈয়ামী দর্শন : 'আজ বাদে কাল ভরসা কি!' তাদের জীবন-জীবিকা সবসময়েই 'নলিনী দলগত জলমতি তরলম তদ্বৎ জীবনম অতিশয় চপলম।' এখন বেঁচে আছ তো, একটু পরে আর নেই।

অতএব বলতে গেলে এ স্বাধীন সার্বভৌম বাঙলাদেশ সত্যিই অভিভাবকহীন লাওয়ারিশ। সে কারণেই এই মুহূর্তে আর্থিক নৈতিক শৈক্ষিক প্রাশাসনিক নীতি-নিয়ম-প্রথা-পদ্ধতির প্রয়োগ প্রায় সর্বক্ষণই আসন্ন ও আপন্ন বিপদের কবলিত।

দেশের শিক্ষাব্যবস্থাও তিন ধরনের : ইংরেজী, বাঙলা ও আরবী। পদ্ধতির লক্ষ্যও তিন তিনমুখী, ফল-ফায়দাও তিন প্রকারের। একারণেই দেশের জ্ঞানী-গুণী, মনন ও মনীষাসম্পন্ন মানববাদী দেশহিতৈষীর প্রতি আমাদের আকুল আবেদন এই যে সেক্যুলার মন-মেজাজের চরিত্রবান মানবপ্রেমী মানুষ নিয়ে সুপরিকল্পিত আদর্শ উদ্দেশ্য নিয়ে একটা সেক্যুলার রাজনীতিক দল গঠন করুন। দেশের মানুষের মনে উন্নততর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশা ও আশ্বাস জাগিয়ে তুলুন। মানুষকে ও সমাজকে আজকের বিশ্বের তথা আন্তর্জাতিক স্তরের জাতি গড়ে তুলুন।

এ দেশটাকে যদি একটা যাত্রী বোঝাই হাল-পালহীন নৌকোর সঙ্গে তুলনা করা যায়, তা হলে এ বিপন্ন জীবন ও দেশ রক্ষার জন্যে আজকে কে ধরবে হাল, কে উড়াবে পাল, কে টানবে দাঁড়, কে বাঁচাবে তরী? — এ বিপদে দেশপ্রেমী ও মানবপ্রেমী ও গণমুক্তিকামী এগিয়ে আসুন। কেননা অন্তত একজন সাচ্চা নিপুণ পাকা কাণ্ডারী চাই!

AMARBOI.COM

হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী

প্রকৃতির জগতে প্রকৃতির নিয়মেই প্রাণিদুনিয়ায় কেবল খাদ্য-খাদক সম্পর্ক যেমন রয়েছে, মিত্রতার সম্পর্কও যেমন বিরল নয়, তেমনি দুর্লক্ষ্য নয় জন্মগত বৈরিতার সম্বন্ধ, যেমন অহি-নকুলের কিংবা বাঘ-মোষের সম্বন্ধ। তরু-লতার জগতে যেমন, তেমনি কোন জন্তুর ক্ষেত্রেও অবয়বগত সামান্য সাদৃশ্য থাকলেও স্বভাবগত পার্থক্য ও বৈপরীত্য তাদের সত্তার স্বতন্ত্র্য প্রকটই রাখে। যেমন ঘোড়ায়-গাধায়, শেয়ালে-কুকুরে, কিংবা বাঘে-বিড়ালে আবয়বিক সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু স্বভাবে পার্থক্য অবিমোচ্য।

বিজ্ঞানীরা ও নৃবিজ্ঞানীরা মানুষ নির্বিশেষকে একই প্রজাতির প্রাণী বলেই জানে ও মানে বটে, বর্ণ-ধর্ম-নীতিনিয়ম-আচার-প্রথা-পদ্ধতি-রীতি-রেওয়াজের মধ্যে আর্থসামাজিক ভাব-চিন্তা আচরণের পার্থক্য ও বৈচিত্র্য ঘটে।

এ পার্থক্যকে গুরুত্ব দিয়ে এর গুণ মান মাপ মাত্রা অনুসারে মানুষকে আরণ্য, বর্বর, বুনো, ভব্য, সভ্য, সংস্কৃতিমান, প্রগতিশীল, প্রাগ্রসর কিংবা রক্ষণশীল, বিশ্বাস-সংস্কারজালে বদ্ধ বন্ধ্যা ও অবক্ষয়গ্রস্ত প্রভৃতি নানা স্তরে বিভক্ত করে সমাজিক মানুষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিসেবে তাদের অবস্থা ও অবস্থান নিরূপণ করেন বিদ্বানেরা। আমরাও এক এক গোত্রের, গোষ্ঠীর, সমাজের, ভাষার অঞ্চলের বর্ণের ধর্মের মানুষকে তাদের শাস্ত্রের বাণী, সাহিত্যের ভাবসম্পদ, দর্শনের নমুনা, নীতি-নিয়ম ও কর্ম-আচরণ দেখে যাচাই করে তাদের সভ্যতা সংস্কৃতি পরিমাপ করি।

কিন্তু লাভে লোভে স্বার্থে প্ররোচিত এবং ক্ষোভে ক্রোধে কামে উত্তেজিত বুনো বর্বর ভব্য সভ্য মানুষের হিংস্রতায় ও প্রতিহিংসাপ্রবণতায়, কঠোরতায় ও নিষ্ঠুরতায় কোন গুণ মান-মাপ-মাত্রাগত পার্থক্য আজ অবধি দেখা যায়নি, বুশের ইরাকবিজয় কিংবা আফ্রো-এশিয়ার বর্ণ-ধর্মদ্বেষণাজাত দাঙ্গা হাঙ্গামা কাড়া মারা হানাই তার প্রমাণ। এ সূত্রে স্বদেশী স্বজাতি স্বধর্মী স্বভাষী সরকারের দ্রোহী নাগরিক হত্যার বীভৎসতার দৃশ্যগুলো স্মরণীয়। লাভ-লোভ-স্বার্থশূন্য কামনাহীন নিষ্ক্রিয় মনুষ্য সমাজ কি সম্ভব? প্রতিযোগিতা প্রতিদ্বন্দ্বিতা দ্বেষ-দ্বন্দ্ব কাড়া মারা হানা সংকুল প্রাণী জীবনই কি মনুষ্যে অপরিহার্য? অথচ আমরা একালের কিংবা সেকালের শ্রেষ্ঠ মানুষগুলোর প্রচারিত বাণী বা দেশনা, দর্শন, বিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা, সাহিত্য, চিত্র, ভাস্কর্য, স্থাপত্য প্রভৃতি শিল্পের আলোচনা করি, তখন তাদের মানবিক গুণের ও মানবিক অনুভব উপলব্ধির গভীরতায় ও ব্যাপকতায় মনুষ্যত্বের বা মানবতার বিকাশে বিস্তারে উৎকর্ষে মুগ্ধ হয়ে যাই। অভিভূত চিত্তে মানব মহত্ত্বে ও মানব মাহাত্ম্যে সভ্যতা-সংস্কৃতির অবদানচেতনায় আমরা তুষ্ট তৃপ্ত ও মানসিক স্বাস্থ্য পুষ্ট করি, যদিও বাস্তবে ঘরে ঘরে ভাইয়ে ভাইয়ে, বিভিন্ন বার্ণিক, ধার্মিক, ভাষিক, দলের বা সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বেষ দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ সংঘাত দুনিয়াব্যাপী প্রাত্যহিক জীবনে লঘু-গুরুভাবে লেগেই রয়েছে। গভীর তাৎপর্যে মনুষ্যসমাজও দ্বান্দ্বিক অবস্থা ও অবস্থান ভিত্তিক। আপাত সহযোগিতা এবং সহাবস্থানের মধ্যেও প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতাজাত প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ কাড়াকাড়ি মারামারি হানাহানিপ্রসূ হিংসা ঘৃণা ঈর্ষা-অসূয়ার-শূল ও হুল সূক্ষ্ম কিংবা লঘু-গুরুরূপে মানুষের চিন্তায় চেতনায় জড়িয়ে থাকেই। এজন্যেই মানুষ শত্রুঘ্ন সূক্ষ্ম শক্তি শেল নির্মাণে এখন সযত্ননিষ্ঠ নিপুণ। এজন্যে যথাপ্রয়োজনে যথাস্থানে তা আজো হিংস্র ও বীভৎস বর্বরতায় নরহত্যায় প্রযুক্ত হচ্ছে। একারণেই এত আপ্তবাক্য, এত অভিজ্ঞতার সঞ্চয় থাকা সত্ত্বেও আজো মানুষের ব্যক্তিজীবনেও অবলম্বন হচ্ছে 'মারি অরি পারি যে কৌশলে।' এটিই আন্তঃরাষ্ট্রিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে, বাণিজ্য থেকে, রাজনীতি কূটনীতি ক্ষেত্রে শাসন প্রশাসন ক্ষেত্রে সর্বত্র সুফলপ্রসূ নীতিনিয়ম রীতিরেওয়াজ প্রথাপদ্ধতিরূপে স্থূল-সূক্ষ্ম কায়দায় চালু রয়েছে। তাহলে জীবন মানে কি কাড়া-মারা-হানার সমষ্টি? সংগ্রামের প্রতিরোধের ও আপোসের নামান্তর অহিংস জীবন কি অসম্ভব?

আজকের বিশ্বের অপ্রতিদ্বন্দ্বী আর্থ-বাণিজ্যিক ও রাষ্ট্রিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র তাই প্রতিদিন বিশ্বের কোন না-কোন রাষ্ট্রকে শাসাচ্ছে, হুকুমে হুমকিতে হুঙ্কারে হামলায় কাবু করছে, কিংবা রাখছে। আফ্রো-এশিয়া-লাতিন আমেরিকার ও সোভিয়েত ভাঙা রাষ্ট্রগুলোতে কাড়ার মারার ও হানার লড়াই চলছে। মানুষ হারাচ্ছে জান-মাল-গর্দান। হারাচ্ছে স্বস্তি, শান্তি, সুখ, আনন্দ। পদ্মবনে মত্ত হস্তীর মতো এমনি রাষ্ট্রিক কিংবা সরকারী দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-দর্প-দাপট-সংঘর্ষ-সংঘাতের শিকার হয়ে ধনে-মনে-প্রাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সাধারণ মানুষ। আর এমনি লড়াইয়ের জয়ে পরাজয়ে-শোকে লাভবান হয় ধনী মানী শাসক-শোষক পীড়ক বঞ্চকশ্রেণী। যারা শাসিত শোষিত পীড়িত বঞ্চিত চালিত ও দমিত তাদের জীবনে কেবল দুঃখ-যন্ত্রণা, অস্বস্তি, অশান্তি, অসুখ অভাব অনটনে হ্রাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পায় না, বরং বাড়ে। শাহ্-সামন্ত যুগে যেমন, বেণেবুর্জোয়া সমাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক শাসনামলে তেমনি সরকারী ও রাষ্ট্রিক পর্যায়ে শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থেই, খেয়াল খুশীতেই, মানে-অপমানেই বাধে লড়াই, হয় যুদ্ধ। কাজেই জান মাল গর্দান যায় কেবল জঙ্গী সাধারণ সৈনিকের নয়, ধনে মনে প্রাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নিরীহ নিরপরাধ জনগণও।

এ মুহূর্তেও পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে অভ্যন্তরীণ কোন্দলে, রাষ্ট্রিক দ্বন্দ্বে, আন্তর্জাতিক কূটনীতিক-বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সংঘর্ষে দুর্ভিক্ষে মরছে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র নিরন্ন নিঃস্ব শ্রমজীবী অজ্ঞ অসহায় সাধারণ মানুষ।

সরকার বা রাষ্ট্র সর্বত্র ধনসম্পদ রক্ষার কিংবা বৃদ্ধির প্রতিযোগিতায় মান যশ খ্যাতি ক্ষমতা দর্প-দাপট রাখার কিংবা বাড়ানোর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আজ লাভ লোভ-স্বার্থ বশে হিংসায় হননে প্রমত্ত, এ তাদের পক্ষে একপ্রকার জুয়াখেলা, আর ধনে প্রাণে বলি হচ্ছে গণমানব। এ-ই কি জীবন-প্রেরণা? এর কি কোন বিকল্প নেই?

তা হলে-জীবনের ভিত্তিই হচ্ছে Positive-Negative-এর দ্বন্দ্ব প্রসূন, সুখ-দুঃখের আনন্দ-বেদনার, আকর্ষণ-বিকর্ষণের প্রেম-ঘৃণার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সংঘর্ষমাত্র। তাই শক্তি সাহস যার আছে, সেই ভীরু দুর্বলকে শাসনে শোষণে পীড়নে কথায় দমনে দলনে উদ্যোগী হয়। অধিজনেরা বার্ণিক, গৌত্রিক, গৌষ্ঠীক, ভাষিক, ধার্মিক উনজন সম্প্রদায়ের স্বাধিকারে হামলা চালায় লঘু-গুরুভাবে উনজনের মানসিক, ব্যবহারিক ও সাংস্কৃতিক জীবন দৃশ্য-অদৃশ্য পীড়নে বিকৃত ও অস্বস্থ রাখে। কিন্তু মানুষের মনুষ্যত্বের তথা মানবিকগুণের বিকাশে উৎকর্ষে উদ্ভাবিত ও গৃহীত কোন গাণিতিক জ্যামিতিক নীতি নিয়ম পরিবারে সমাজে রাষ্ট্রে মানুষ নির্বিশেষের নির্বিবাদ, নির্বিরোধ নিরুপদ্রব নিরাপদ সহাবস্থানে নিশ্চয়তা দান করবে অদূর অভিষ্যতে এমনি আশা-প্রত্যাশা কি নিতান্তই মূর্খতা?

AMARBOI.COM

ভবিষ্যতের মানুষ

হিন্দু পুরাণের সাধারণ ও স্থূল সৃষ্টিপত্তনতত্ত্বরূপ কিস্‌সায় বিবর্তনবাদের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। (সূর্য থেকে খসা) অগ্নিপিণ্ড প্রথমে অগ্নিময়, পরে ধূম্রময় পরে জলময় অন্ধকার রূপ ধারণ করে, (এ সময়ে বাইবেলের জেহোভা অন্ধকার জলে ভাসমান অবস্থায় উচ্চারণ করেন আলো হোক)। 'এ জন্যেই মৎস্য অবতারের আবির্ভাব।' (ব্রহ্মের ঘর্ম থেকে মৃত্তিকা কিংবা) পানি থেকে ডাঙা জেগে উঠলে তখন ঘটে কূর্ম অবতারের আবির্ভাব। কূর্ম কতকটা উভচর। তার পরে কর্দমাক্ত স্থলে দেখা পাই বরাহ অবতারের। জলভাগ বেশি হলেও স্থলভাগ বাসযোগ্য হয়ে ওঠে, তখন নরপশুবৎ নৃসিংহ অবতারের আবির্ভাব ঘটে, তার পরেরকার বামন, রামকৃষ্ণ প্রমুখ সবার মনুষ্যাকৃতি লাভ ঘটে। পৃথিবীর সব গোত্রের ও অঞ্চলের সৃষ্টিপত্তন তত্ত্বে ধূম্রাকার জলাকার ও অন্ধকার অবস্থার লঘু-গুরু বয়ান রয়েছে। মনে হয় জলের জ্যালি থেকে নরাকৃতি প্রাপ্তি অবধি ক্রমবিবর্তন বিকাশের ধারায় প্রতিস্তরের প্রাণীই প্রজন্মক্রমে শুনে শুনে অর্থাৎ শ্রুতিস্মৃতি রূপে জেনে বুঝে এসেছে। তাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের মধ্যেও তা, প্রচল রয়েছে। তবে এ তত্ত্ব বিবর্তনবাদের অনুকূল। একালে বিজ্ঞানীর আবিষ্কার উদ্‌ভাবন যতই প্রসার লাভ করছে, ততই প্রকৃতিবাদে আস্থা আমাদের দৃঢ় হচ্ছে। বিগব্যাঙ, নভ, নক্ষত্র এবং ভূখণ্ড, সমুদ্র, পর্বত সম্বন্ধে আবিষ্কৃত ও পরীক্ষিত নব নব তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য আপেক্ষিকতা ও বিবর্তন সম্বন্ধেই আমাদের জ্ঞান-অভিজ্ঞতা বিচিত্র করে তুলছে।

আজকের প্রাগ্রসর চিন্তা-চেতনা-মন-মনন-মনীষার মানুষ বুঝতে কিংবা অনুভব ও উপলব্ধি করতে পারছে যে বিস্ময়-কল্পনা-বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণার লৌকিক, অলৌকিক অলীক জগৎ ও জীবন দ্রুত অবসিত হতে চলেছে। এখন কেবল নিখাদ নিখুঁত অসম্পূর্ণ বা সম্পূর্ণ পরীক্ষণ, নিরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ সম্মত জ্ঞান-বিজ্ঞানলব্ধ তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য মানুষের জগৎচেতনা ও জীবনভাবনা নিয়ন্ত্রিত করবে। মানুষের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে আবেগ থাকবে বটে, লাভ-লোভ-স্বার্থচেতনা থাকবে বটে, কাড়া-মারা-হানাও থাকবে কিন্তু ভূত-প্রেত জীন-পরী-পিশাচ-ড্রাগন-দেবতা-দৈত্য-দানব প্রভৃতি অদৃশ্য অতিপ্রাকৃত অলীক অলৌকিক কোন অরি-মিত্র শক্তি থাকবে না, মানুষের মনে-মননে মনীষায় জ্ঞানে যুক্তিতে বিবেকে বিবেচনায় কোন অদৃশ্য অলীক অলৌকিক লৌকিক কোন সংস্কারের, ধারণার ছায়া বা প্রভাব থাকবে না। মানুষের মন-বুদ্ধি মেধা থাকবে মুক্ত। সিদ্ধান্ত হবে যৌক্তিক ও বৌদ্ধিক এবং স্ব স্ব মানসসামর্থ্যানুসারে, তাদের চিন্তা-চেতনা মনন হবে প্রকটিত ও প্রযুক্ত। অতএব, পরিপূর্ণ মানবমুক্তিও হবে ব্যক্তিক জীবনের নাস্তিক্য-নির্ভর। বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণামুক্ত-বুদ্ধি তৈরি করে মুক্তমন, মুক্তমন তৈরি করবে মাটিলগ্ন মর্ত্যের মুক্তমানুষ। সে-মানুষ হবে জ্ঞানের ও যুক্তির অনুগত সম ও সহস্বার্থে সংযমে সহিষ্ণুতায় সামবায়িক সহযোগিতায় ন্যায়নিষ্ঠায় নির্বিবাদে নির্বিরোধে নিরুপদ্রবে নিরাপদে প্রতিবেশীরূপে রাষ্ট্রের ও বিশ্বের নাগরিক হিসেবে সহবাবস্থানে অঙ্গীকারবদ্ধ। আমরা আশাবাদী। আমরা সেদিনের প্রতীক্ষায় দিন গুনব। আর মানুষের সদ্বুদ্ধির কাছে আবেদন করতে থাকব অনলসভাবে— ভালো হও, ভালো চাও এবং অন্যের ভালোও কর। দেশিকরা এ দেশনাই দেবেন।

বিবিধ প্রবন্ধে ও অনুশীলনে-ধর্মতত্ত্বে বঙ্কিমচন্দ্রের জগৎচেতনা ও জীবনভাবনা

উনিশ শতকের প্রথম ও প্রধান চারজন শাস্ত্র-সমাজ-জাতি-কাল সচেতন ব্যক্তি ছিলেন রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দ— এচারজন ছিলেন চার দিকপালের মতো, চার স্তম্ভের মতো, চার বিকন আলোর মতো প্রতীচ্য বিদ্যা-শাসন-মনন-মনীষা প্রভাবিত বাঙলার তথা ভারতের রাজধানী কলকাতার হিন্দুসমাজের শাস্ত্র-সমাজ সংস্কৃতি চিন্তা-চেতনা মনন-মনীষা নিয়ন্তা। এঁদের মধ্যে একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রেরই ছিল বহুমুখী চিন্তা-চেতনা ও মনন-মনীষা; তাঁর জীবনচেতনা ছিল সর্বাত্মক ও সর্বার্থক প্রগতিশীল ও প্রাগ্রসর। এ চেতনা ছিল দেশে দুর্লভ, কালে দুর্লক্ষ্য। বঙ্কিম ছিলেন ধীর-স্থির চিন্তা-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চেতনার, মনন-মনীষার অধিকারী। তাই যে-কোন বিষয় বিচারে তিনি সামগ্রিক, সামূহিক ও সামষ্টিক দৃষ্টি প্রয়োগে হয়েছিলেন অভ্যস্ত। য়ূরোপীয় আস্তিক নাস্তিক নিরীশ্বর দার্শনিকদের প্রভাবে তিনি ছিলেন সংস্কারমুক্ত স্বচ্ছ মগজের মানুষ। ফলে তাঁর উক্তি মাত্রই ছিল যুক্তি-বুদ্ধি, মনন-মনীষা, বিবেক-বিচার-বিবেচনার প্রসূন, ফল ও ফসল। একারণে তিনি এ বিশ শতকের অন্তিমকালেও একালের প্রগতিশীল প্রাগ্রসর চিন্তা-চেতনা মনন-মনীষা সম্পন্ন ব্যক্তিদের কাতারে ঠাঁই পাবার যোগ্যতা হারান নি। উনিশ শতকের বঙ্কিমচন্দ্র আজো আমাদের বিস্ময়, এত বড় মাপের মানুষ আমরা এশতকেও আর কাউকে পাইনি। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী পাঠ আজো আমাদের মগজ ধোলাইয়ের, মন-মত পরিচ্ছন্ন করার সহায়ক হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। কিন্তু একালে রেডিয়ো, টিভি, সিনেমা, নাটক, ক্যাসেট প্রভৃতি মানুষের পাঠ স্পৃহা হরণ করেছে। সাধারণ পাঠক শ্রম ও সময় ব্যয় করে কিছু খুঁটিয়ে পড়ার ধৈর্য রাখে না। বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা আজকাল প্রশ্নোত্তরে সারতত্ত্ব জানা-বোঝার সাধনায় সীমিত করেছেন তাঁদের জ্ঞান-পিপাসা। তাছাড়া মাথা গুনতি হিসেবে বাঙলাভাষীর অধিকাংশই হচ্ছে মুসলিম সমাজভুক্ত [বাঙলাদেশে], যারা বঙ্কিমচন্দ্রের ও তাঁর সাহিত্যের প্রতি প্রাজন্মক্রমিক শ্রুতি-স্মৃতি পরম্পরায় বিরূপ-বিরক্ত। বিশেষ করে তাদের হিতার্থেই, তাদের দৃষ্টিগ্রাহ্য করার লক্ষ্যেই বঙ্কিমচন্দ্রের হীরে-মোতি সদৃশ মূল্যবান ও উজ্জ্বল এবং আপ্তবাক্যতুল্য তত্ত্ব-তথ্য-সত্যগর্ভ ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা উক্তিগুলো একত্রে সংকলন করে দিলাম। উল্লেখ্য যে বঙ্কিমচন্দ্র যখন শাস্ত্রও সমর্থন করেন, তখনো প্রজ্ঞা প্রয়োগে যাচাই-বাছাই করেই গ্রহণ বরণ করেন। এজন্যেই তিনি বিশশতকের গোড়ার দিকে হিন্দুর নতুন শাস্ত্রিক Code of life তথা শাস্ত্রানুগ 'জীবন বিধি' প্রণেতারূপে 'ঋষি' আখ্যায় বন্দিত হন। বিভিন্ন সময়ে ও প্রসঙ্গে পরিব্যক্ত বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তিগুলোর মধ্যে ক্বচিৎ স্ববিরোধী অযৌক্তিক অসঙ্গতিও লক্ষণীয়। স্মর্তব্য যে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবৎকালে বাঙলার ও বাঙালীর এখনকার ইতিহাসের অনেক তত্ত্ব, তথ্য, সত্য ও তাৎপর্য অজ্ঞাত ছিল। তবু বঙ্কিমচন্দ্রের তথ্য বিশ্লেষণক্ষমতা ছিল সুপ্রকট।

বঙ্কিমচন্দ্র সংস্কৃত সাহিত্যেরও দক্ষ রসবেত্তা ছিলেন। ছিলেন গীতায়, বেদে অনন্য পণ্ডিত, বেদান্তে, পুরানে ও দেবতাতত্ত্বে ব্যুৎপন্ন এবং উঁচুমানের ও মননের মনীষী ভাষ্যকার। আমরা এখানে তাঁর অনুভূত-উপলব্ধ তত্ত্ব, তথ্য ও সত্যরূপ সুভাষিত ভাবগর্ভ, 'বচন'গুলোই কেবল চয়ন করছি, যাতে উনিশ শতকের অন্যান্য মনীষীর চেয়ে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব এবং বহুমুখী বিদ্যাবত্তা ও যুগদুর্লভ চিন্তা-চেতনা সুপ্রকট। তিনি কেবল লেখক ছিলেন না, ছিলেন দেশিক। তাঁর অনেক বচনই গুরুত্বে দেশনা।

সাহিত্য শিল্প ও সৌন্দর্য চেতনা

গীতিকাব্যের সংজ্ঞা : ক. বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটতামাত্র যাহার উদ্দেশ্য সেই কাব্যই গীতিকাব্য। বিবিধ প্রবন্ধ, গীতিকাব্য, বঙ্কিম রচনা সমগ্র [১ম খঃ ১ মে অংশ, পৃঃ ২৩১, সাক্ষরতা প্রঃ]।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খ. 'কাব্যরসের সামগ্রী মানুষের হৃদয়। পূর্ব কবিগণ দেব বা অতিমানুষ চরিত্র সৃষ্ট করিয়া লোকরঞ্জনে সক্ষম হইয়াছেন, তাহার একটি বিশেষ কারণ আছে। তাঁহারা দেবচরিত্রকে মনুষ্যচরিত্রানুকৃত করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।' এরূপ কাব্য হচ্ছে 'কুমারসম্ভব' এবং 'Paradise Lost' [ঐ প্রকৃত এবং অতিপ্রকৃত, পৃঃ ২৩২-৩৩, বঙ্কিম রচনা সমগ্র, প্রবন্ধ খণ্ড, ১ম অংশ, সাক্ষরতা প্রকাশন]।

গ. ধর্মই তৃষ্ণা, ধর্মই আলোচনা, ধর্মই সাহিত্যের বিষয়। এই ধর্মমোহের ফল পুরাণ। কিন্তু যেমন একদিকে ধর্মের স্রোতঃ বহিতে লাগিল, তেমনি আর একদিকে বিলাসিতার স্রোতঃ বহিতে লাগিল। তাহার ফল কালিদাসের কাব্য নাটকাদি। [বিবিধ প্রবন্ধ, বিদ্যাপতি ও জয়দেব। সাক্ষরতা প্রঃ ১ম খণ্ড, ১ম অংশ, পৃঃ ২৩৫]।

ঘ. [বাঙ্গালার] উচ্চাভিলাষশূন্য, অলস, নিশ্চেষ্ট, গৃহসুখপরায়ণ চরিত্রের অনুকরণে এক বিচিত্র গীতিকাব্য সৃষ্ট হইল। সেই গীতিকাব্যও উচ্চাভিলাষশূন্য, অলস, ভোগাসক্ত, গৃহসুখপরায়ণ। ... অন্য সকল প্রকার সাহিত্যকে পশ্চাতে ফেলিয়া, এই জাতি চরিত্রানুকারী গীতিকাব্য সাত আট শত বৎসর পর্যন্ত বঙ্গদেশে জাতীয় সাহিত্যের পদে দাঁড়াইয়াছে। এইজন্য গীতিকাব্যের এত বাহুল্য। [ঐ, বিদ্যাপতি ও জয়দেব। ঐ। পৃঃ ২৩৬, ঐ]।

ঙ. আমরা যে সকল সুন্দর বস্তু দেখিয়া থাকি, তন্মধ্যে কতকগুলির কেবল বর্ণমাত্র আছে, আর কিছু নাই; যথা আকাশ। আর কতকগুলির, বর্ণভিন্ন আকারও আছে; যথা পুষ্প। কতকগুলির, বর্ণ ও আকার ভিন্ন, গতিও আছে; যথা উরগ। কতকগুলি বর্ণ, আকার ও গতিও ভিন্ন রব আছে; যথা কোকিল। অতএব সৌন্দর্য্য সৃজনের জন্য, এই কয়টি সামগ্রী বর্ণ, আকার, গতি, রব ও অর্থযুক্ত বাক্য।

যে সৌন্দর্য্য-জননী বিদ্যার বর্ণমাত্র অবলম্বন, তাহাকে চিত্রবিদ্যা কহে। যে বিদ্যার অবলম্বন আকার, তাহা দ্বিবিধ। জড়ের আকৃতি সৌন্দর্য্য যে বিদ্যার উদ্দেশ্য, তাহার নাম স্থাপত্য। চেতনা বা উদ্‌ভিদের সৌন্দর্য্য যে বিদ্যার উদ্দেশ্য, তাহার নাম ভাস্কর্য্য।

যে সৌন্দর্য্যজনিকা বিদ্যার সিদ্ধি গতির দ্বারা, তাহার নাম নৃত্য। রব যাহার অবলম্বন, সে বিদ্যার নাম সঙ্গীত। বাক্য যাহার অবলম্বন, তাহার নাম কাব্য। কাব্য, সঙ্গীত, নৃত্য, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য এবং চিত্র— এই ছয়টি সৌন্দর্য্যজনিকা বিদ্যা। ... সৌন্দর্য্য প্রসূতি এই ছয়টি বিদ্যায় মনুষ্য জীবন ভূষিত ও সুখময় করে। [ঐ, আর্যজাতির সূক্ষ্মশিল্পী। ঐ। ঐ। পৃঃ ২৩৯]।

বাঙালী চরিত্র

'জগদীশ্বর কৃপায়, ঊনবিংশ শতাব্দীতে আধুনিক বাঙালী নামে এক অদ্‌ভূত জন্তু এই জগতে দেখা গিয়াছে।... ইহারা বাহিরে মনুষ্য এবং অন্তরে পশু। ... আমরাও বাঙ্গালীর পশুত্ববাদী। আমরা ইংরেজী সম্বাদপত্র হইতেও এ পশুতত্ত্ব অভ্যাস করিয়াছি। ... পশুবৃত্তির তিল তিল সংগ্রহ পূর্বক ... শৃগাল হইতে শঠতা, কুক্কুর হইতে তোষামদ ও ভিক্ষানুরাগ, মেষ হইতে ভীরুতা, বানর হইতে অনুকরণ পটুতা, এবং গর্দ্দভ হইতে গর্জ্জন এইসকল একত্র করিয়া... [বিধাতা] নব্য বাঙ্গালীকে সমাজাকাশে উদিত করিয়াছেন' [পৃঃ ২৪৯]। এ বিদ্রূপবাণের পরে বঙ্কিমচন্দ্র বলেন— 'কিন্তু যিনি বাঙ্গালীর যত নিন্দা করুন, বাঙ্গালী তত নিন্দনীয় নহে' [পৃঃ ২৪৯]।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক. সামাজিক সভ্যতার আদি দুই প্রকার : কোন কোন সমাজ স্বতঃ সভ্য হয়, কোন কোন সমাজ অন্যত্র হইতে শিক্ষালাভ করে। প্রথমোক্ত সভ্যতালাভ বহুকাল সাপেক্ষ; দ্বিতীয়োক্ত আশু সম্পন্ন হয়। [পৃঃ ২৫৩]।

খ. যখন কোন অপেক্ষাকৃত অসভ্যজাতি, সভ্যতর জাতির সংস্পর্শ লাভ করে তখন ... অপেক্ষাকৃত অসভ্য সমাজ সভ্যতর সমাজের সর্বাঙ্গীণ অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়। ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। [পৃঃ ঐ]

গ. অতএব বাঙ্গালীর সমাজের দৃশ্যমান অনুকরণ প্রবৃত্তি অস্বাভাবিক বা বাঙ্গালীর চরিত্র দোষ জনিত নহে। [ঐ]।

ঘ. অনুকরণ মাত্রই অনিষ্টকারী নহে, কখন কখন তাহাতে গুরুতর সুফলও জন্মে; প্রথমাবস্থায় অনুকরণ, পরে স্বাতন্ত্র্য আপনিই আসে।

ঙ. [অনুকরণের] উপযুক্ত কাল উত্তীর্ণ হইলেও সর্বনাশ উপস্থিত হইবে। [বিবিধ প্রবন্ধ অনুকরণ, ঐ, ঐ, পৃঃ ২৪৮-২৫৩]।

ধর্ম, প্রেম ও মানবকল্যাণ

ক. যে ভালোবাসে সে-ই অত্যাচার করে।... রাজা ও সমাজ ও প্রণয়ী, এই তিন জনে এরূপ অত্যাচার করিয়া থাকেন। ... প্রথমাবস্থায় বাহুবলের অত্যাচার; দ্বিতীয়াবস্থায় ধর্মের অত্যাচার; তৃতীয়াবস্থায় সামাজিক অত্যাচার; এবং সকল অবস্থাতেই ভালোবাসার অত্যাচার। এই চতুর্বিধ পীড়নের মধ্যে প্রণয়ের পীড়ন... সর্বাপেক্ষা অনিষ্টকারী,... অন্য অত্যাচারের সীমা আছে। [২৬৬-৬৮]।

খ. অত্যাচার শক্তির স্বভাবসিদ্ধ। জ্ঞানেরও অত্যাচার আছে। তাহার উদাহরণ, হিতবাদ এবং প্রত্যক্ষবাদ। [পৃঃ ২৬৯]

গ. ধর্মের যিনি যে ব্যাখ্যা করুন না, ধর্ম এক। দুইটি মাত্র মূল সূত্রে সমস্ত মনুষ্যের নীতিশাস্ত্র কথিত হইতে পারে। তাহার মধ্যে একটি আত্মসম্বন্ধীয়, দ্বিতীয়টি পরসম্বন্ধীয়। যাহা আত্মসম্বন্ধীয়... আত্মচিত্তের স্ফূর্তি এবং নির্মলতা রক্ষাই তাহার উদ্দেশ্য। দ্বিতীয়টি পরসম্বন্ধীয় বলিয়াই তাহাকে যথার্থ ধর্মনীতির মূল বলা যাইতে পারে। 'পরের অনিষ্ট করিও না; সাধ্যানুসারে পরের মঙ্গল করিও।' এই মহতী উক্তি জগতীয় তাবদ্ধর্মশাস্ত্রের একমাত্র মূল এবং একমাত্র পরিণাম।... পরহিতরতি এবং পরের অহিতে বিরতি, ইহাই সমগ্র নীতিশাস্ত্রের সার উপদেশ। [পৃঃ ২৭০]।

ঘ. সত্যভঙ্গে পরের অনিষ্ট হয়, এজন্য সত্য পালনীয়। কিন্তু যখন এমন ঘটে যে, সত্য পালনে পরের গুরুতর অনিষ্ট, সত্যভঙ্গে ততদূর নহে, তখন সত্য পালনীয় নহে। [পৃঃ ২৭১]।

ঙ. অস্বার্থপর প্রেম এবং ধর্ম, ইহাদের একই গতি, একই চরম। উভয়ের সাধ্য, অন্যের মঙ্গল। বস্তুত প্রেম এবং ধর্ম একই পদার্থ। সর্ব্বসংসার প্রেমের বিষয়ীভূত হইলেই ধর্ম নাম প্রাপ্ত হয়। এবং ধর্ম যতদিন না সার্বজনীন প্রেমস্বরূপ হয়, ততদিন সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। [বিবিধ প্রবন্ধ, ১ম খণ্ড, ভালোবাসার অত্যাচার, ঐ, ঐ পৃঃ ২৬৬-২৭১]।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'জ্ঞান'-এর উৎস ও বিকাশ

ক. যাহা জানি, তাহাই জ্ঞান। [পৃঃ ২৭৩]।

খ. পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাধ্য পাঁচ প্রত্যক্ষ। মনও একটি ইন্দ্রিয় বলিয়া আর্য্য দার্শনিকেরা গণিয়া থাকেন, অতএব তাঁহারা মানস প্রত্যক্ষের কথা বলেন। [ঐ]।

গ. মনুষ্য অল্প বিষয়ই প্রত্যক্ষ করিতে পারে। অধিকাংশ জ্ঞানই অনুমিতির উপর নির্ভর করে। [পৃঃ ঐ]।

ঘ. শব্দ একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া গণ্য— আপ্তবাক্য মাত্র গ্রাহ্য। [পৃঃ ২৭৫]।

ঙ. প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব্দ ভিন্ন নৈয়ায়িকেরা উপমিতিকেও একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ বিবেচনা করেন।... উপমিতি, অনুমিতির প্রকারভেদ মাত্র, এবং... বস্তুর প্রত্যক্ষ এবং অনুমানই জ্ঞানের মূল।... (আবার) প্রত্যক্ষই জ্ঞানের একমাত্র মূল— সকল প্রমাণের মূল। [ঐ, ঐ, জ্ঞান, ঐ, ঐ, পৃঃ ২৭৩-২৭৫]।

['প্রত্যক্ষই জ্ঞানের একমাত্র মূল, সকল প্রমাণের মূল'—এ মত বঙ্কিমচন্দ্র পরবর্তীকালে পরিত্যাগ করেছিলেন [পাদটীকা দ্রষ্টব্য— রচনাবলীর পৃঃ ২২০, সংসদ, জ্ঞান]।

'আত্মা'

ক. ১. শারীরতত্ত্বে প্রতিপন্ন হইতেছে যে শরীরই বা শরীরের অংশবিশেষই আত্মা।... দেহনাশের পর যে আত্মা থাকিবে, তাহা ধর্মপুস্তকে বলে; কিন্তু তদ্‌ভিন্ন অণুমাত্র, প্রমাণ নাই [ঐ, ঐ, সাংখ্যদর্শন, ২য় পরিচ্ছেদ, বিবেক, পৃঃ ২৮২-৮৩]।

ক. ২. পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল কথা, 'জ্ঞানই শক্তি (Knowledge is power); হিন্দু সভ্যতার মূলকথা, 'জ্ঞানেই মুক্তি'। [ঐ, সংখ্যাদর্শন, ঐ, বিবেক, ঐ, ঐ, পৃঃ ২৮৩]।

খ. জাগতিক পদার্থ পঞ্চবিংশতি প্রকার— ক্ষিতি, জল, তেজ, মরুৎ এবং আকাশ স্থূল [পাঁচটি] ভূত। পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়, পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং অন্তরিন্দ্রিয়— এই একাদশ ইন্দ্রিয়। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, পাঁচটি তন্মাত্র। "আমি" জ্ঞান অহঙ্কার। মহৎ মন (Consciouce) [ঐ, সংখ্যা দর্শন সৃষ্টি, পৃঃ ২৮৫]।

গ. সাংখ্যের এই নিরীশ্বরতা বৌদ্ধধর্মের পূর্বসূচনা বলিয়া বোধ হয়।... অনেকে বলেন কাপিল দর্শন নিরীশ্বর নহে।... সাংখ্যকার বলেন, জ্ঞানেই মুক্তি, আর কিছুতেই মুক্তি নাই।... [সাংখ্য নিরীশ্বর দর্শন, কারণ] সর্বকর্তা অর্থে সর্বশক্তিমান, সর্বসৃষ্টিকারক নহে। [সাংখ্য দর্শন, ৪র্থ নিরীশ্বরতা, পৃঃ ২৮৮]।

ঘ. বেদ সম্বন্ধে তেইশটি প্রাচীন মত চালু রয়েছে। 'কেহ বলেন, বেদ নিত্য এবং অপৌরুষেয়,' কেহ বলেন, বেদ সৃষ্টি এবং 'ঈশ্বর প্রণীত।' কিন্তু মুণ্ডকোপনিষদে 'বেদাদি শ্রেষ্ঠতর বিদ্যা' বলে অভিহিত রয়েছে। শ্রীমদ্‌ভগবদগীতায় 'বেদপরায়ণদিগের নিন্দা' আছে। 'ভাগবতপুরাণে নারদ বলিতেছেন যে, পরমেশ্বর যাহাকে অনুগ্রহ করেন, সে বেদ ত্যাগ করে।' 'কঠোপনিষদে আছে যে বেদের দ্বারা আত্মা লভ্য হয় না— যথা' 'নায়মাত্মা প্রবচনেন লাভ্যে ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন'। [ঐ, সংখ্যাদর্শন ৫ম পৃঃ বেদ, পৃঃ ২৮৯-৯৮] নৈয়ায়িকরা বলেন 'বেদ আপ্তবাক্যমাত্র।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাতি, রাজনীতি ও ইতিহাস

ক. [হিন্দুদিগের] বিবেচনা "যে ইচ্ছা রাজা হউক, আমাদের কি?" স্বজাতীয় রাজা, পরজাতীয় রাজা, উভয় সমান।... সুশাসন করিলে দুই সমান। স্বজাতীয় রাজা সুশাসন করিবে, পরজাতীয় সুশাসন করিবে না, তাহার স্থিরতা কি? যদি তাহার স্থিরতা নাই, তবে কেন স্বজাতীয় রাজার জন্য প্রাণ দিব? রাজ্য রাজার সম্পত্তি। তিনি রাখিতে পারেন রাখুন। আমাদিগের পক্ষে উভয় সমান। কেহই আমাদিগের ষষ্ঠভাগ ছাড়িবে না, কেহই চোরকে পুরস্কৃত করিবে না। যে রাজা হয় হউক, আমরা কাহারও জন্য অঙ্গুলি ক্ষত করিব না। [ঐ, ভারত কলঙ্ক, ভারতবর্ষ পরাধীন কেন? পৃষ্ঠা ২৯৮-৯৯]।

খ. লক্ষ লক্ষ হিন্দুমাত্রেরই যাহাতে মঙ্গল, তাহাতেই আমার মঙ্গল।... অতএব সকল হিন্দুর যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহাই আমার কর্তব্য। [ঐ, পৃঃ ৩০১]।

গ. হিন্দুজাতি ভিন্ন পৃথিবীতে অন্য অনেক জাতি আছে।... অনেক স্থানে তাহাদের মঙ্গল আমাদের অমঙ্গল। যেখানে তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল, সেখানে তাহাদের মঙ্গল যাহাতে না হয়, আমরা তাহাই করিব। ইহাতে পরজাতি পীড়ন করিতে হয় করিব।... পরজাতির অমঙ্গল সাধন করিয়া আত্মমঙ্গল সাধিতে হয়, তাহাও করিব।... এইরূপ মনোবৃত্তি নিষ্পাপ পরিশুদ্ধ ভাব বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। ইহার গুরুতর দোষাবহ বিকার আছে। সেই বিকারে, জাতি সাধারণের এরূপ ভ্রান্তি জন্মে যে, পরজাতির মঙ্গলমাত্রেই স্বজাতির অমঙ্গল, পরজাতির অমঙ্গল মাত্রেই স্বজাতির মঙ্গল বলিয়া বোধ হয়। [পৃঃ ঐ]।

ঘ. এই ভারতবর্ষে নানা জাতি। বাসস্থানের প্রভেদে, ভাষার প্রভেদে, বংশের প্রভেদে, ধর্মের প্রভেদে নানা জাতি। [ঐ, ঐ, পৃঃ ৩০২]।

ঙ. ইংরেজ ভারতবর্ষের পরমোপকারী। ইংরেজ আমাদিগকে নতুন কথা শিখাইতেছে। যাহা আমরা কখন জানিতাম না, তাহা জানাইতেছে; যাহা কখন দেখি নাই, শুনি নাই, বুঝি নাই তাহা দেখাইতেছে, শুনাইতেছে, বুঝাইতেছে।... সেই সকল শিক্ষার মধ্যে অনেক শিক্ষা অমূল্য।... তাহার মধ্যে দুইটি... স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা এবং জাতি প্রতিষ্ঠা (Nationality) ইহা কাহাকে বলে, তাহা হিন্দু জানিত না। [ঐ। ভারত কলঙ্ক ভারতবর্ষ পরাধীন কেন? পৃঃ ২৮৯-৩০৩]।

স্বাধীনতা ও পরাধীনতা তথা পরতন্ত্রের মৌল ব্যাখ্যা

ক. শাসনকর্তা ভিন্ন জাতীয় হইলেই, রাজ্য পরতন্ত্র হইল না। পক্ষান্তরে শাসনকর্তা স্বজাতীয় হইলেই রাজ্য যে স্বতন্ত্র হয় না, তাহারও অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। [পৃঃ ৩০৫]।

খ. ভারতেশ্বরী ভারতবর্ষে থাকেন না— ভারতবর্ষের রাজা ভারতবর্ষে নাই। অন্য দেশে। যে দেশের রাজা অন্য দেশের সিংহাসনারূঢ় এবং অন্য দেশবাসী, সেই দেশ পরতন্ত্র।... দেশীয় প্রজা, এবং রাজার স্বজাতীয় প্রজার এইরূপ তারতম্য। সেই দেশকে পরাধীন বলিব। [পৃঃ ঐ]।

ঘ. অতএব পরতন্ত্র রাজ্যকেও কখন স্বাধীন বলা যাইতে পারে। যথা প্রথম জর্জের সময়ে হানোবর, মোগলদিগের সময়ে কাবুল। পক্ষান্তরে কখন স্বতন্ত্র রাজ্যকেও পরাধীন বলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাইতে পারে; যথা, নর্মানদিগের সময়ে ইংলণ্ড, ঔরঙ্গজেবের সময়ে ভারতবর্ষ।... আকবরের শাসিত ভারতবর্ষকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বলি। [পৃঃ ৩০৫-৩০৬]।

ঙ. [রাজা স্বজাতি ও বিজাতি প্রজার প্রতি পৃথক ব্যবহার করলে] [পরতন্ত্র এবং সমদৃষ্টিতে স্বজাতি বিজাতি প্রজাকে দেখলে] স্বতন্ত্র। অতএব কোন রাজ্য পরতন্ত্র এবং পরাধীন নহে। কোন রাজ্য স্বতন্ত্র অথচ স্বাধীন নহে। কোন রাজ্য পরতন্ত্র এবং পরাধীন। [পৃঃ ৩০৯]।

চ. যে রাজ্যে লোক সুখী, তাহাই উৎকৃষ্ট, যে রাজ্যে লোক দুঃখী তাহাই অপকৃষ্ট। [ঐ]

ছ. আধুনিক ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় অর্থাৎ উচ্চশ্রেণীস্থ লোকের অবনতি ঘটিয়াছে, শূদ্র অর্থাৎ সাধারণ প্রজার একটু উন্নতি ঘটিয়াছে। [পৃঃ ঐ] [ঐ, প্রথম খণ্ড, ঐ। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা, ঐ, ঐ, পৃঃ ৩০৫-৩০৯]।

প্রাচীন ভারতে রাজার দায়িত্ব কর্তব্য, ঔদাসীন্য-ত্রুটি

কৃষি, বাণিজ্য, দুর্গসংস্কার, সেতুনির্মাণ, আয়-ব্যয় শ্রবণ, পৌরকার্য দর্শন, জনপদ পর্যবেক্ষণ প্রভৃতি অষ্টবিধ রাজকার্য সম্পাদনই প্রাচীন ও মধ্যযুগে রাজকার্য বা রাজার দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল। 'নারদবাক্য' রূপে নানা ব্যঙ্গ বিদ্রূপাত্মক অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ রাজনীতি ও ইংরেজের শাসননীতির প্রতি বঙ্কিম কটাক্ষ করেছেন।

ক. এদেশের কৃষকেরা মহাজনের নিকট বিক্রীত। মহাজনের নিকটেও সকলে সকল সময়ে (ঋণ) পায় না— অনেকেই অন্নাভাবে শীর্ণ বীজাভাবে ভরসাশূন্য। ... যাহাকে রাজা না দিলে সে দুর্দশাগ্রস্ত হইবে তাহাকে (রাজা ঋণ) দিবেন। ... অর্থাৎ প্রজার জীবন নির্বাহার্থে যে পর্যন্ত প্রয়োজন, তাহা রাজা ঋণস্বরূপ দিতে পারেন। [বিবিধ প্রবন্ধ, ১ম খণ্ড, ভারতবর্ষের রাজনীতি, পৃঃ ৩১৪ ঐ, ঐ]।

খ. ১. নাস্তিক্য, অনৃত, ক্রোধ, প্রমাদ, দীর্ঘসূত্রতা, জ্ঞানবান ব্যক্তিদিগের সাক্ষাৎকার ত্যাগ, আলস্য, চিত্ত চাপল্য, নিরন্তর অর্থচিন্তা, অনর্থক ব্যক্তির সহিত পরামর্শ, নিশ্চিত বিষয়ের অনারম্ভ, মন্ত্রণার অপরিরক্ষণ, মঙ্গলকার্যের অপ্রয়োগ ও অত্যুত্থান, এই চতুর্দ্দশ রাজদোষ। (রাজার দোষসমূহ) [ঐ, পৃঃ ৩১৫]।

খ. ২. অন্ধ, মূক, পঙ্গু, বিকলাঙ্গ, বন্ধুবিহীন, প্রব্রজিত ব্যক্তিদিগকে পিতার ন্যায় প্রতিপালন... রাজার দায়িত্ব ও কর্তব্য। — [ঐ। পৃষ্ঠা ৩১৫]।

সমাজে নারীর মূল্য-মর্যাদা ও সমাধিকার প্রশ্নে

ক. আমাদিগের প্রধান কথা এই যে, স্ত্রীগণ সংখ্যায় পুরুষগণের তুল্য বা অধিক; তাহারা সমাজের অর্দ্ধাংশ।... তাহাদিগের উন্নতিতে সমাজের উন্নতি; যেমন পুরুষের উন্নতিতে সমাজের উন্নতি...। স্ত্রী পুরুষের সমান ভাগের সমষ্টিকে সমাজ বলে; উভয়ের সমান উন্নতিতে সমাজের উন্নতি। [পৃঃ ৩১৬]।

খ. পাপ দুই সমান; এক পুরুষভাগিনী স্ত্রীতে পুরুষের যে স্বাভাবিক অধিকার এক স্ত্রীভাগী পুরুষে স্ত্রীলোকের ঠিক সেইই স্বাভাবিক অধিকার, কিছুমাত্র ন্যূন নহে। তথাপি পুরুষে এ নিয়ম লঙ্ঘন করিলে, তাহা বাবুগিরির মধ্যে গণ্য; স্ত্রীলোক এ দোষ করিলে সংসারের সকল সুখ তাহার পক্ষে বিলুপ্ত হয়;... কুষ্ঠগ্রস্তের অধিক অস্পৃশ্যা হয়। কেন? পুরুষের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুখের পক্ষে স্ত্রীর সতীত্ব আবশ্যক। স্ত্রী জাতির সুখের পক্ষেও পুরুষের ইন্দ্রিয় সংযম আবশ্যক...। [এ সূত্রে সাম্য প্রবন্ধের পঞ্চম পরিচ্ছেদ (ঐ, প্রথম খণ্ড, প্রাচীন ও নবীনা, ঐ, ঐ, পৃঃ ৩১৬-৩১৭) দ্রষ্টব্য বা স্মর্তব্য]।

ধর্মের ব্যাপক পরিধি

ক. ধর্ম আত্মপীড়ন নহে— আপনার উন্নতি সাধন। আপনার আনন্দ বর্ধনই ধর্ম। ঈশ্বরে ভক্তি, মনুষ্যে প্রীতি এবং হৃদয়ে শান্তি, ইহাই ধর্ম। ভক্তি, প্রীতি, শান্তি, এই তিনটি শব্দে যে বস্তু চিত্রিত হইল, তাহার মোহিনীমূর্তি অপেক্ষা মনোহর জগতে আর কি আছে? [পৃঃ ৩২৬]।

খ. সাহিত্যও ধর্মছাড়া নহে। কেননা সাহিত্য সত্যমূলক। যাহা সত্য, তাহা ধর্ম।... কিন্তু সাহিত্যে যে সত্য ও ধর্ম, সমস্ত ধর্মের তাহা এক অংশ মাত্র। সাহিত্য ত্যাগ করিও না, কিন্তু সাহিত্যকে নিম্নসোপান করিয়া ধর্মের মঞ্চে আরোহণ কর। [পৃঃ ৩২৭]।

[বিবিধ প্রবন্ধ ২য় খণ্ড ধর্ম ও সাহিত্য, ঐ, ঐ, পৃঃ ৩২৬-৩২৭]।

যাহার চিত্তশুদ্ধি নাই, তাহার কোন ধর্মই নাই। যাহার চিত্তশুদ্ধি আছে, তাহার আর কোন ধর্মেই প্রয়োজন নাই।... ইহা সকল ধর্মের সার। ইহা... নিরীশ্বর কোমৎ ধর্মেরও সার।... চিত্তশুদ্ধিই ধর্ম। চিত্তশুদ্ধির স্থূল লক্ষণ : হৃদয়ে শান্তি, মনুষ্যে প্রীতি এবং ঈশ্বরে ভক্তি। [ঐ। চিত্তশুদ্ধি। ঐ, পৃঃ ৩২৮-৩০]।

গ. যখন চিত্ত বশীভূত, ইন্দ্রিয় দমিত, ঈশ্বরে ভক্তি, মনুষ্যে প্রীতি, হৃদয়ে শান্তি উপস্থিত হইবে, যখন সকলেই বৈরাগ্য, সকলেই সমান সুখ—তখন তুমি পৃথিবীতে থাক বা না থাক, সংসারে থাক বা না থাক, তুমি তখন বৈকুণ্ঠে।

[বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় গৌরদাস বাবাজির ভিক্ষার ঝুলি ১/রামবল্লভ বাবুর ভিক্ষাদান। ঐ পৃঃ ৩৩৪]।

ঘ. যখন তাঁহাকে [উপাস্যকে] অব্যক্ত, অচিন্ত্য, নির্গুণ এবং সর্বজগতের আধার বলিয়া চিন্তা করি, তখন তাহার নাম ব্রহ্ম বা পরব্রহ্ম বা পরমাত্মা। যখন সর্বত্র সমান জ্ঞান, সকলকে আত্মবৎ জ্ঞানই বৈষ্ণব ধর্ম।

[বিবিধ প্রবন্ধ ২য় গৌরদাস বাবাজির ভিক্ষার ঝুলি ২/পূজাবাড়ির ভিক্ষা, ঐ পৃঃ ৩৩৯-৮১)]

ঙ. ধর্ম আত্মসম্বন্ধীয় নহে, পরসম্বন্ধীও নহে। সমস্ত বৃত্তিগুলির উচিত অনুশীলন ও পরিণতিই ধর্ম। তাহা আপনার জন্যেও করিবে না, পরের জন্যেও করিবে না। ধর্ম বলিয়াই করিবে। সেই বৃত্তিগুলি নিজ সম্বন্ধিনী ও পর-সম্বন্ধিনী। তাহার অনুশীলনে স্বার্থ ও পরার্থ একত্রে সিদ্ধ হয়।

[বিবিধ গৌরদাস বাবাজির ভিক্ষার ঝুলি, কাম, ঐ, ঐ, পৃঃ ৩৪৪-৪৫]

লেখকদের প্রতি নিবেদন

ক. যশের জন্য লিখিবেন না।... লেখা ভাল হইলে যশ আপনি আসিবে, [পৃঃ ৩৪৫]।

খ. টাকার জন্য লিখিবেন না। [পৃঃ ৩৪৫]।

গ. যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গলসাধন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন। [ঐ]।

ঘ. যাহা অসত্য, ধর্মবিরুদ্ধ; পরনিন্দা বা পরপীড়ন বা স্বার্থসাধন যাহার উদ্দেশ্য, সে সকল প্রবন্ধ কখনও হিতকর হইতে পারে না, ...। সত্য ও ধর্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। অন্য উদ্দেশ্যে লেখনী ধরণ মহাপাপ। [ঐ]

ঙ. বিদ্যা প্রকাশের চেষ্টা করিবে না। বিদ্যা থাকিলে আপনিই প্রকাশ পায়, চেষ্টা করিতে হয় না। বিদ্যা প্রকাশের চেষ্টা পাঠকের অতিশয় বিরক্তিকর। [ঐ]।

চ. অলঙ্কার-প্রয়োগ বা রসিকতার জন্য চেষ্টিত হইবেন না। ... সকল অলঙ্কারের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার সরলতা।

ছ. কাহারও অনুকরণ করিও না।

জ. যে কথার প্রমাণ দিতে পারিবে না, তাহা লিখিও না।

ঝ. বাঙ্গলা সাহিত্য বাঙ্গলার ভরসা।

[বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় খণ্ড, বাঙ্গলার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন। ঐ, ঐ, পৃঃ ৩৪৫-৩৪৬]

ভাষা প্রসঙ্গ : ইংরেজীর গুণ, বাঙলার গুরুত্ব এবং শ্রেণীগত বিভেদ

ক. ইংরেজি আমাদের জ্ঞানোপার্জনের একমাত্র সোপান।... ইংরাজ হইতে এদেশের লোকের যত উপকার হইয়াছে, ইংরাজি শিক্ষাই তাহার মধ্যে প্রধান... তিন কোটি বাঙালী হঠাৎ তিন কোটি ইংরাজ হইতে পারিত, তবে সে মন্দ ছিল না। কিন্তু তাহার কোন সম্ভাবনা নাই; আমরা যত ইংরাজি পড়ি, যত ইংরাজি কহি বা যত ইংরাজি লিখি না কেন, ইংরাজি কেবল আমাদিগের মৃত সিংহের চর্মস্বরূপ হইবে মাত্র। ডাক ডাকিবার সময়ে ধরা পড়িব। পাঁচ সাত হাজার নকল ইংরাজ ভিন্ন তিন কোটি সাহেব কখনই হইয়া উঠিবে না। [পৃঃ ৩৫৭-৩৫৮]।

ক. ২. আমাদিগের এমনও ভরসা আছে যে অগৌণে দুর্গোৎসবের মন্ত্রাদি ইংরাজিতে পঠিত হইবে। [পৃঃ ৩৫৭]।

ক. ৩. নকল ইংরাজ অপেক্ষা খাঁটি বাঙালী স্পৃহণীয়। [পৃঃ ৩৫৮]।

খ. ১. যতদিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালীরা বাঙ্গলা ভাষায় আপন উক্তিসকল বিন্যস্ত করিবেন, ততদিন বাঙ্গালীর উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই। [৩৫৮]।

খ. ২. বাঙ্গালায় যে কথা উক্ত না হইবে, তাহা তিন কোটি বাঙ্গালী কখন বুঝিবে না বা শুনিবে না।... যে কথা দেশের সকল লোকে বুঝে না বা শুনে না সে কথায় সামাজিক বিশেষ কোন উন্নতির সম্ভাবনা নাই। [ঐ]।

খ. ৩. বাঙ্গালা ভাষার প্রতি বাঙ্গালীর অনাদরেই বাঙ্গালার অনাদর বাড়িতেছে। সুশিক্ষিত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা রচনায় বিমুখ বলিয়া সুশিক্ষিত বাঙ্গালী বাঙ্গালা রচনা পাঠে বিমুখ। [পৃঃ ৩৬০]।

গ. ১. যে যে সমাজের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে, সেই সেই সমাজে উভয় সম্প্রদায় উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণী সমকক্ষ, বিমিশ্রিত এবং সহৃদয়তা সম্পন্ন।... যখন উভয় সম্প্রদায়ের সামঞ্জস্য হইল সেইদিন হইতে শ্রীবৃদ্ধি আরম্ভ। [পৃঃ ৩৫৯]।

গ. ২. প্রাচীন ভারতবর্ষে বর্ণগত পার্থক্যের কারণ, উচ্চবর্ণ এবং নীচবর্ণে যেরূপ গুরুতর ভেদ জন্মিয়াছিল, এরূপ কোন দেশে জন্মে নাই, এবং এত অনিষ্টও কোন দেশে হয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাই।... সেই পার্থক্যের এক বিশেষ কারণ ভাষাভেদ।... এক্ষণে বর্ণগত পার্থক্যের অনেক লাঘব হইয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে শিক্ষা এবং সম্পত্তির প্রভেদে অন্যপ্রকার বিশেষ পার্থক্য জন্মিতেছে। [পৃঃ ৩৫৯]।
[বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় বঙ্গদর্শনের পত্র সূচনা। ঐ, ঐ, পৃষ্ঠা ৩৫৭-৩৬০]।

১২ সঙ্গীতের উপযোগিতা

ক. সামান্য কণ্ঠভঙ্গীতেও মনকে চঞ্চল করে। কণ্ঠভঙ্গীর চরমোৎকর্ষই সঙ্গীত।... সঙ্গীতের দ্বারা সকল প্রকার মনের ভাব প্রকাশ করা যায়। [পৃঃ ৩৬২-৩৬৩]।
খ. যেমন রাজনীতি, ধর্মনীতি, বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতি সকল মনুষ্যেরই জানা উচিত, তেমনি... চিত্তপ্রসাদার্থ মনোমোহনীসঙ্গীতবিদ্যাও সকল ভদ্রলোকের জানা কর্তব্য। [পৃঃ ৩৬৫]।
গ. শাস্ত্রে রাজকুমার রাজকুমারীদের অভ্যাসোপযোগী বিদ্যার মধ্যে সঙ্গীত প্রধান স্থান পাইয়াছে। বাঙ্গালীর মধ্যে ভদ্র পৌরকন্যাদিগের সঙ্গীত শিক্ষা যে নিষিদ্ধ বা নিন্দনীয়, তাহা আমাদিগের অসভ্যতার চিহ্ন। কুলকামিনীরা সঙ্গীত নিপুণা হইলে, গৃহমধ্যে এক অত্যন্ত বিমলানন্দের আকার স্থাপিত হয়। [বিবিধ প্রবন্ধ, দ্বিতীয় খণ্ড। সঙ্গীত ঐ, ঐ, পৃঃ ৩৬২-৬৫]।

বঙ্গদেশের কৃষক : শেখ আর কৈবর্ত্তের বঞ্চনা যেখানে অভিন্ন

ক. ১. হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্ত্ত দুই প্রহরের রৌদ্রে, খালি মাথায় খালি পায়ে, এক হাঁটু কাদার উপর দিয়া দুইটা অস্থিচর্মবিশিষ্ট বলদে, ভোঁতা হাল ধার করিয়া আনিয়া চলিতেছে, উহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে?... তুমি বল দেখি যে, তোমা হইতে এই হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্ত্তের কি উপকার হইয়াছে, [পৃঃ ৩৬৭]।
ক. ২. [কৃষিজাত ধন] কৃষকেরই প্রাপ্য... বাস্তবিক তাহারা পায় না।... সেই অর্থ রাজা, ভূস্বামী, বণিক, মহাজন সকলেই কুড়াইতেছে। সেই অর্থে... সকলেরই শ্রীবৃদ্ধি। কেবল কৃষকের শ্রীবৃদ্ধি নাই। সহস্র লোকের মধ্যে কেবল নয়শত নিরানব্বই জনের তাহাতে শ্রীবৃদ্ধি নাই। এমত শ্রীবৃদ্ধির জন্য যে জয়ধ্বনি তুলিতে চাহে তুলুক, আমি তুলিব না। এই নয়শত নিরানব্বই জনের শ্রীবৃদ্ধি না দেখিলে, আমি কাহারও জয়গান করিব না। [পৃঃ ৩৭০-৭১]। [বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় খণ্ড বঙ্গদেশের কৃষক, প্রথম পরিচ্ছেদ, দেশের শ্রীবৃদ্ধি, পৃঃ ৩৬৭, ৩৭০, ৩৭১]।
খ. ১. জীবের শত্রু জীব; মনুষ্যের শত্রু মনুষ্য, বাঙ্গালী কৃষকের শত্রু বাঙ্গালী ভূস্বামী [পৃঃ ৩৭২] বঙ্গীয় কৃষকরা নিঃসহায়, মনুষ্য মধ্যে নিতান্ত দুর্দশাগ্রস্ত এবং আপনাদিগের দুঃখ সমাজ মধ্যে জানাইতেও জানে না। যদি মূকের দুঃখ দেখিয়া তাহা নিবারণের ভরসায় একবার বাক্য ব্যয় না করিলাম, তবে মহাপাপ স্পর্শে।... [বঙ্গদর্শন] কাতরের হইয়া কাতরোক্তি না করে— পীড়িতের পীড়া নিবারণের জন্য যত্ন না করে, তবে যত শীঘ্র বঙ্গদর্শন বঙ্গভূমি হইতে লুপ্ত হয়, ততই ভাল। যে কণ্ঠ হইতে কাতরের জন্য কাতরোক্তি নিঃসৃত না হইল, সে কণ্ঠ রুদ্ধ হউক। যে লেখনী আর্তের উপকারার্থ না লিখিল, সে লেখনী নিষ্ফলা হউক [জমিদার ২৯২]।
২. জমিদার নামক বড় মানুষ কৃষক নামক ছোট মানুষকে ভক্ষণ করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩. বাঙ্গালী কৃষক যাহা ভূমি হইতে উৎপন্ন করে, তাহা কিছু অধিক নহে। তাহা হইতে... চাষের খরচ কুলাইতে হয়।... বীজের মূল্য পোষাইতে হইবে, কৃষাণের বেতন দিতে হইবে, গোরুর খোরাক আছে; এ প্রকার অন্যান্য খরচও আছে। তাহা বাদে যাহা থাকে তাহা প্রথমে মহাজন আটক করে।... [তাহাকে] দেড়ী সুদ দিতে হইবে।... পরে যাহা বাকি রহিল অল্প বিশিষ্ট, অন্ধ খুদের খুদ, চর্ব্বিত ইক্ষুর রস, শুষ্ক পল্বলের মৃত্তিকাগত বারি তাহাতে অতিকষ্টে দিনপাত হইতে পারে, অথবা দিনপাত হইতে পারে না। [ঐ, ঐ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, জমীদার, পৃঃ ৩৭২-৭৩]।

গ. ১. জ্ঞানবৃদ্ধিই যে সভ্যতার মূল এবং পরিমাপ, ইহা বকল কর্ত্তৃক সপ্রমাণ হইয়াছে। বকল বলেন যে জ্ঞানিক উন্নতি ভিন্ন নৈতিক উন্নতি নাই। সেকথায় আমরা অনুমোদন করি না। কিন্তু জ্ঞানিক উন্নতি যে সভ্যতার কারণ, একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। [পৃঃ ৩৮২ প্রাকৃতিক নিয়ম]।

২. কোন দেশে সামাজিক ধনসঞ্চয় হয়, কোন দেশে হয় না। যেখানে হয় সেদেশ সভ্য হয়। যে দেশে হয় না, সে দেশ অসভ্য থাকে। [ঐ পৃঃ ৩৮৩]।

৩. [দরিদ্র দেশে] লোকসংখ্যা বৃদ্ধি শ্রমোপজীবীদের মহৎ অনিষ্টের কারণ।... শ্রমোপজীবীদিগের সহিত সমাজের অন্য সম্প্রদায়ের তারতম্য অধিকতর হইতে লাগিল। প্রথম, ধনের তারতম্য— তৎফলে অধিকারের তারতম্য। শ্রমোপজীবীরা হীন হইল বলিয়া তাহাদের উপর বুদ্ধ্যুপজীবীদিগের প্রভুত্ব বাড়িতে লাগিল। অধিক প্রভুত্বের ফল অধিক অত্যাচার। এই প্রভুত্বেই শূদ্রপীড়ক স্মৃতিশাস্ত্রের মূল।

৪. শ্রমোপজীবীদের অবনতির যে সকল কারণ... তাহার ফল ত্রিবিধ। প্রথম ফল, বেতনের স্বল্পতা হইলেই পরিশ্রমের আধিক্যেরও আবশ্যক হয়; কেননা, যাহা কমিল, তাহা খাটিয়া পোষাইয়া লইতে হইবে। তাহাতে অবকাশের ধ্বংস। অবকাশের অভাবে বিদ্যালোচনার অভাব। অতএব দ্বিতীয় ফল মূর্খতা। তৃতীয় ফল বুদ্ধ্যুপজীবীদিগের প্রভুত্ব এবং অত্যাচার বৃদ্ধি। ইহার নামান্তর দাসত্ব। দারিদ্র্য। মূর্খতা, দাসত্ব। [ঐ পৃঃ ৩৮৬]।

৫. এই সকল কারণে শ্রমোপজীবীদের দুরবস্থা যে চিরস্থায়ী হয়, কেবল তাহাই নহে।... যেমন একভাণ্ড দুগ্ধে দুই এক বিন্দু অম্ল পড়িলে সকল দুগ্ধ দধি হয়, তেমনি সমাজের এক অধঃশ্রেণীর দুর্দশায় সকল শ্রেণীরই দুর্দশা জন্মে। [পৃঃ ৩৮৭] [ঐ, ঐ, বঙ্গদেশের কৃষক, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, প্রাকৃতিক নিয়ম, পৃঃ ৩৮২-৩৮৭ ঐ, ঐ]।

ঘ. ১. বঙ্গদেশের কৃষকরা যে দরিদ্র অন্নবস্ত্রের কাঙ্গাল, তাহা কেবল জমিদারের দোষ নহে। কেবল প্রাকৃতিক নিয়মের ফলে নহে।... "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত" বঙ্গদেশের [কৃষকদিগের] অধঃপাতের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মাত্র— কস্মিনকালে ফিরিবে না। ইংরাজদিগের এ কলঙ্ক চিরস্থায়ী; কেননা, এই বন্দোবস্ত "চিরস্থায়ী।" [ঐ, ঐ। চতুর্থ পরিচ্ছেদ, আইন, পৃঃ ৩৯০-৯১]

বহুবিবাহ রোধে শাস্ত্র নয়, সুশিক্ষা ও মানবিক আইন আবশ্যক

ক. বহুবিবাহ অতি কুপ্রথা; যিনি তাহার বিরোধী, তিনি আমাদিগের কৃতজ্ঞতার ভাজন।

খ. বহুবিবাহ এদেশে স্বতঃই নিবারিত হইয়া আসিতেছে; অল্পদিনে একেবারে লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা; তজ্জন্য বিশেষ আড়ম্বর আবশ্যক বোধ হয় না। সুশিক্ষার ফলে উহা অবশ্য লুপ্ত হইবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ. আমাদিগের বিবেচনায় বহুবিবাহ নিবারণের জন্য আইনের প্রয়োজন নাই। কিন্তু যদি প্রজার হিতার্থে আইনের আবশ্যকতা আছে ইহা স্থির হয়, তবে ধর্মশাস্ত্রের মুখ চাহিবার আবশ্যক নাই!

[বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় খণ্ড/বহুবিবাহ, পৃঃ ৪০৯। ঐ। ঐ]।

'বাঙ্গালার ইতিহাসে' পাঠান-ও-মুঘল

ক. ১. পরাধীন রাজ্যে যে দুর্দ্দশা ঘটে, স্বাধীন পাঠানদিগের রাজ্যে বাঙ্গালার সে দুর্দ্দশা ঘটে নাই। রাজা ভিন্নজাতীয় হইলেই রাজ্যকে পরাধীন বলিতে পারা যায় না। সে সময়ের জমীদারদিগের যেরূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে তাহাদিগকেই রাজা বলিয়া বোধ হয়; তাঁহারা করদ ছিলেন মাত্র।

২. পরাধীন জাতির মানসিক স্ফূর্তি নিবিয়া যায় কিন্তু পাঠান শাসনকালে বাঙ্গালীর মানসিক দীপ্তি অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছিল। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস, বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠকবিদ্বয় এই সময়েই আবির্ভূত; এই সময়েই অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক, ন্যায়শাস্ত্রের নূতন সৃষ্টিকর্তা রঘুনাথ শিরোমণি; এই সময়ে স্মার্তাতিলক রঘুনন্দন; এই সময়েই চৈতন্যদেব; এই সময়েই বৈষ্ণব গোস্বামীদিগের অপূর্ব্ব গ্রন্থাবলী;— চৈতন্যদেবের পরগামী অপূর্ব্ব বৈষ্ণব সাহিত্য। পঞ্চদশ ও ষোড়শ খ্রীষ্টশতাব্দীর মধ্যেই ইঁহাদিগের সকলেরই আবির্ভাব। এই দুই শতাব্দীতে বাঙ্গালীর মানসিক জ্যোতিতে বাঙ্গালার যেরূপ মুখোজ্জ্বল হইয়াছিল; সেরূপ তৎপূর্বে বা তৎপরে আর কখনও হয় নাই। [পৃঃ ৪২৭]।

খ. ১. যে আকবর বাদশাহের আমরা শতমুখে প্রশংসা করিয়া থাকি, তিনিই বাঙ্গালার কাল। তিনিই প্রথম প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালীকে পরাধীন করেন। সেই দিন হতে বাঙ্গালীর শ্রীহানির আরম্ভ।

খ. ২. মোগলই আমাদের শত্রু, পাঠান আমাদের মিত্র। মোগলের অধিকারের পর হইতে ইংরেজের শাসন পর্য্যন্ত একখানি ভাল গ্রন্থ বাঙ্গালাদেশে জন্মে নাই।... মোগলের সাম্রাজ্য-ভুক্ত হইয়া বাঙ্গালা দুরবস্থাপ্রাপ্ত হইল,... বাঙ্গালার ধন আর বাঙ্গালায় রহিল না।

খ. ৩. বাঙ্গালার সৌভাগ্য মোগল কর্তৃত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালার হিন্দুর অনেক কীর্ত্তির চিহ্ন আছে, পাঠানের অনেক কীর্ত্তির চিহ্ন পাওয়া যায়,... বাঙ্গালার মোগলের কোন কীর্ত্তি কেহ দেখিয়াছে?

[বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় খণ্ড/ বাঙ্গালার ইতিহাস, পৃঃ ৪২৭-৪২৮। ঐ, ঐ]।

বাঙ্গালীর ভীরুতায় ঐতিহাসিক সত্যতা নেই, অথচ

১. যাহা ভারতের কলঙ্ক, বাঙ্গালারও সেই কলঙ্ক।... বাঙ্গালীর বাহুবলের প্রশংসা কেহ কখন শুনে নাই। সকলেরই বিশ্বাস, বাঙ্গালী চিরকাল দুর্ব্বল, চিরকাল ভীরু, চিরকাল স্ত্রীস্বভাব, চিরকাল ঘুসি দেখিলেই পালাইয়া যায়।... এ নিন্দার কোন মূল ইতিহাসে কোথাও পাই না।

২. আমরা একশত বৎসর পূর্ব্বেই বাঙ্গালী পহলোয়ানের, বাঙ্গালী লাঠি শড়কিওয়ালার যে সকল বলবীর্য্যের কথা বিশ্বস্ত সূত্রে শুনিয়াছি তাহা শুনিয়া মনে সন্দেহ হয় যে, সে কি এই বাঙ্গালী জাতি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩. বাঙ্গালা জয় যে সহজে হয় নাই, ইহার প্রমাণ দিতে আমরা প্রস্তুত আছি। [ঐ, ঐ, বাঙ্গালার কলঙ্ক, পৃঃ ৪২৯, ৪৩৩। ঐ, ঐ]।

বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীর যথার্থ ইতিহাসের অনুসন্ধান আবশ্যিক

ক. বাঙ্গালার ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙ্গালী কখন মানুষ হইবে না। [পৃঃ ৪৩৩]।

খ. বাস্তবিক বাঙ্গালীরা কি চিরকাল দুর্ব্বল, অসার, গৌরবশূন্য? তাহা হইলে গণেশের রাজ্যাধিকার; চৈতন্যের ধর্ম; রঘুনাথ, গদাধর, জগদীশের ন্যায়, জয়দেব বিদ্যাপতি মুকুন্দদেবের [মুকন্দরাম?] কাব্য কোথা হইতে আসিল? [পৃঃ ঐ]।

গ. বাঙ্গালার ইতিহাস নাই, যাহা আছে, তাহা ইতিহাস নয়, তাহা কতক উপন্যাস, কতক বাঙ্গালার বিদেশী বিধর্মী অসার পরপীড়কদিগের জীবন-চরিতমাত্র। বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই। [পৃঃ ৪৩৫]।

ঘ. [ইতিহাস] কে লিখিবে? তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙ্গালী, তাহাকেই লিখিতে হইবে।... আইস আমরা সকলে মিলিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসের অনুসন্ধান করি। যাহার যতদূর সাধ্য, সে ততদূর করুক, ক্ষুদ্র কীট যোজন ব্যাপী দ্বীপ নির্মাণ করে। একের কাজ নয়, সকলে মিলিয়া করিতে হইবে। [পৃঃ ৪৩৫, বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা]।

ঙ. পাঠানেরা কস্মিনকালে প্রকৃত পক্ষে বাঙ্গালা অধিকার করেন নাই। স্থানে স্থানে তাঁহারা সৈনিক উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়া উপনিবেশের পার্শ্ববর্তী স্থান সকল শাসন করিতেন মাত্র। তাঁহাদিগের আমলে বাঙ্গালীই বাঙ্গালা শাসন করিতেন।... ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দুরাজাগণ বাঙ্গালাদেশের অধিকার শাসন করিতেন... [পৃঃ ৪৩৭]।

চ. [পাঠান আমলে] [আমাদের সাহিত্য-ন্যায়-স্মৃতিতে-দর্শনে] এই Renaissance কোথা হইতে? কোথা হইতে সাহসা এই জাতির এই মানসিক উদ্দীপ্তি হইল?... এ আলোক নিবিল কেন? নিবিল বুঝি, মোগলের শাসনে। হিন্দুরাজা তোড়লমল্লের 'আসলে তুমার জমা' রদোষে। [ঐ]।

ছ. জমীদারদিগের উৎপত্তি কবে? কিসে উৎপত্তি হইল? মুসলমানেরা দেশের রাজা ছিল কিন্তু জমীদারী সকল... হিন্দুদিগের করতলগত হইল কি প্রকারে? [পৃঃ ৪৩৮]।

জ. মোগল জয়ের পরে বাঙ্গালার অধঃপতন হইয়াছিল। বাঙ্গালার অর্থ বাঙ্গালায় না থাকিয়া দিল্লীর পথে গিয়াছিল। [পৃঃ ঐ]।

ঝ. বাঙ্গালার অর্দ্ধেক লোক মুসলমান। ইহার অধিকাংশই যে ভিন্ন দেশ হইতে আগত মুসলমানদিগের সন্তান নয়, তাহা সহজেই বুঝা যায়। কেননা, ইহারা অধিকাংশই নিম্নশ্রেণীর লোক-কৃষিজীবী। রাজার বংশাবলী কৃষিজীবী হইবে, আর প্রজার বংশাবলী উচ্চশ্রেণী হইবে, ইহা অসম্ভব।...

অতএব দেশীয় লোকেরা যে স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান হইয়াছে, ইহাই সিদ্ধ।... কেন মুসলমান হইল? কোন জাতীয়েরা মুসলমান হইয়াছে?

বাঙ্গালার ইতিহাসে ইহার অপেক্ষা গুরুতর তত্ত্ব আর নাই। [পৃঃ ৪৩৮-৩৯] [ঐ। ঐ। বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, পৃঃ ৪৩৩-৪৩৯]।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বাহুবল' অপরিহার্য, 'বাক্যবল' শ্রেষ্ঠ

ক. ১. সামাজিক দুঃখ নিবারণের জন্য দুইটি উপায় মাত্র ইতিহাসে পরিকীর্ত্তিত— বাহুবল ও বাক্যবল। [পৃঃ ৪৭০]।

ক. ২. মনুষ্য সুখী হইবার জন্য সমাজবদ্ধ হয়; [ঐ]

ক. ৩. কতকগুলি সামাজিক দুঃখ, সমাজ সংস্থাপনেরই ফল— যথা দারিদ্র্য... সমাজবদ্ধ হইলেই দারিদ্র্যাদি কতকগুলি সামাজিক দুঃখ আছেই আছে। এ সকল সামাজিক দুঃখের উচ্ছেদ কখনও সম্ভবে না। কিন্তু আর কতকগুলি সামাজিক দুঃখ আছে, তাহা সমাজের নিত্যফল নহে, তাহা নিবার্য্য, এবং তাহার উচ্ছেদ সামাজিক উন্নতির প্রধান অংশ। সামাজিক মনুষ্য সেই সকল সামাজিক দুঃখের উচ্ছেদ জন্য বহুকাল হইতে চেষ্টিত। সেই চেষ্টার ইতিহাস সভ্যতার ইতিহাসের প্রধান অংশ, এবং সমাজনীতি ও রাজনীতি, এই দুইটি শাস্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য। [পৃ ৪৭০]।

ক. ৪. যে সকল সামাজিক দুঃখ নিত্য ও অনিবার্য্য, তাহারও উচ্ছেদ জন্য... যাহারা চেষ্টিত, ইউরোপে সোশিয়ালিষ্ট, কম্যুনিষ্ট প্রভৃতি নামে তাহারা খ্যাত।... যাহা অনিবার্য্য, তাহার নিবারণ সম্ভবে না; কিন্তু অনিবার্য্য দুঃখের উচ্ছেদ সম্ভবে না। [পৃঃ ৪৭১]।

ক. ৫. মনুষ্য শক্তির আধার। সমাজ মনুষ্যের সমবায়, সুতরাং সমাজও শক্তির আধার। সে শক্তির বিহিত প্রয়োগে মনুষ্যের মঙ্গল...। অবিহিত প্রয়োগে সামাজিক দুঃখ। [পৃঃ ৪৭২]।

খ. ১. অতএব... যে বলে পশুগণ এবং মনুষ্যগণ উভয়ে প্রধানত: স্বার্থসাধন করে, তাহাই বাহুবল।... যাহার আর কিছুতেই নিষ্পত্তি হয় না— তাহার নিষ্পত্তি বাহুবলে।... বাহুবল পশুবল; কিন্তু মনুষ্য অদ্যাপি কিয়দংশে পশু, এজন্য বাহুবল মনুষ্যের প্রধান অবলম্বন। [পৃঃ ৪৭৪-৭৫]।

গ. ১. কেবল ভাবীফল বুঝাইতে পারিলেই, বিনা প্রয়োগে বাহুবলের কার্য্য সিদ্ধ হয়। এই প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিদায়িনী শক্তি আর একটি দ্বিতীয় বল। কথায় বুঝাইতে হয়। এইজন্য আমি ইহাকে বাক্যবল নাম দিয়াছি।

গ. ২. বস্তুত বাহুবল অপেক্ষা বাক্যবল সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ।

গ. ৩. বাক্যবলে এইরূপ যাদৃশ সামাজিক ইষ্ট সাধিত হয়, বাহুবলে তাদৃশ কখনও ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। (৪৭৭)।

গ. ৪. মুসা, ইসা, শাক্যসিংহ প্রভৃতি বাহুবলে বলী নহেন— বাক্যবীর মাত্র। কিন্তু ইসা, শাক্যসিংহ প্রভৃতির দ্বারা পৃথিবীর যে ইষ্ট সাধিত হইয়াছে, বাহুবলবীরগণ কর্ত্তৃক তাহার শতাংশ নহে। (অবশ্য) আত্মরক্ষার জন্য বাহুবলই শ্রেষ্ঠ। (বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় খণ্ড। বাহুবল ও বাক্যবল, পৃঃ ৪৭০-৪৭৭, ঐ, ঐ)।

প্রসঙ্গ 'বাঙ্গালা ভাষা'— সমৃদ্ধি স্বার্থেই ঋণ আবশ্যিক

ক. বাঙ্গালা আজিও অসম্পূর্ণ ভাষা, তাহার অভাব পূরণ জন্য অন্য অন্য ভাষা হইতে সময়ে শব্দ কর্জ করিতে হইবে। কর্জ্জ করিতে হইলে, চিরকেলে মহাজন সংস্কৃতের কাছেই ধার করা কর্তব্য। প্রথমতঃ সংস্কৃত মহাজনই পরম ধনী; ইহার রত্নময় শব্দভাণ্ডার হইতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাহা চাও, তাহাই পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ সংস্কৃত হইতে শব্দ লইলে, বাঙ্গালার সঙ্গে ভাল মিশে। বাঙ্গালার অস্থি, মজ্জা, শোণিত, মাংস সংস্কৃতিই গঠিত। [পৃঃ ৪৮২-৮৩]।

খ. সাহিত্য কি জন্য? গ্রন্থ কি জন্য? যে পড়িবে তাহার বুঝিবার জন্য। [পৃঃ ঐ]।

গ. পরোপকার ভিন্ন গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশ্য নাই; জনসাধারণের জ্ঞানবৃদ্ধি বা চিত্তোন্নতি ভিন্ন রচনার অন্য উদ্দেশ্য নাই; অতএব যত অধিক ব্যক্তি গ্রন্থের মর্ম গ্রহণ করিতে পারে, ততই অধিক ব্যক্তি উপকৃত, ততই গ্রন্থের সফলতা, জ্ঞানে মানুষ মাত্রেরই তুল্যাধিকার। [পৃঃ ৪৮৩]।

ঘ. লিখনের ভাষা এবং কথনের ভাষা চিরকাল স্বতন্ত্র থাকিবে।... কথনের উদ্দেশ্য কেবল সামান্য জ্ঞাপন, লিখনের উদ্দেশ্য শিক্ষাদান, চিত্তসঞ্চালন। [পৃঃ ঐ]।

ঙ. বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত। রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন সরলতা এবং স্পষ্টতা।... তাহার পর ভাষার সৌন্দর্য্য, সরলতা এবং স্পষ্টতার সহিত সৌন্দর্য্য মিশাইতে হইবে। [পৃঃ ৪৮৮৪]।

চ. বলিবার কথাগুলি পরিস্ফুট করিয়া বলিতে হইবে— যতটুকু বলিবার আছে, সবটুকু বলিবে— তজ্জন্য ইংরাজি, ফার্সি, আরবি, সংস্কৃত, গ্রাম্য, বন্য, যে ভাষার শব্দ প্রয়োজন, তাহা গ্রহণ করিবে, অশ্লীল ভিন্ন কাহাকেও ছাড়িবে না। তারপর সেই রচনাকে সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট করিবে— কেন না যাহা অসুন্দর, মনুষ্যচিত্তের উপরে তাহার শক্তি অল্প। [পৃঃ ৪৮৪] বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় খণ্ড। বাঙ্গালাভাষা, [পৃঃ ৪৮৭-৪৮৪]।

মনুষ্যত্ব কি?

ক. উদরপূর্ত্তির পর ধনে হইক বা অন্য প্রকারে হউক, লোকমধ্যে যথাসাধ্য প্রাধান্য লাভ করাকে মনুষ্যগণ আপনাদিগের জীবনের উদ্দেশ্য বিবেচনা করিয়া ধার্য্য করে। এই প্রাধান্য লাভের উপায়, লোকের বিবেচনায় প্রধানতঃ ধন, তৎপরে রাজ্যপদ ও যশঃ... এই তিনটির সমবায়, সমাজে সম্পদ বলিয়া পরিচিত।... বিশেষতঃ ধন থাকিলেই সম্পদ বর্তমান বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে। এই সম্পাদাকাঙ্ক্ষাই... সমাজের ঘোরতর অনিষ্টের কারণ। সমাজের উন্নতির গতি যে এত মন্দ, তাহার প্রধান কারণই এই যে, বাহ্য সম্পদ মনুষ্যের জীবনের উদ্দেশ্য স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। [পৃঃ ৪৮৫-৮৬]।

খ. ধনসঞ্চয়াদির ন্যায় সুখশূন্য, শুভফল শূন্য, মহত্ত্বশূন্য ব্যাপার প্রয়োজনীয় হইলেও কখনই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য গৃহীত হইতে পারে না। [৪৮৬]।

গ. কার্যকারিণী বৃত্তিগুলির অনুশীলন যেমন মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিগুলিরও সেইরূপ অনুশীলন জীবনের উদ্দেশ্যে হওয়া উচিত। [৪৮৭]।

ঘ. বস্তুত সকল প্রকার মানসিক বৃত্তির সম্যক অনুশীলন, সম্পূর্ণ স্ফূর্তি ও যথোচিত উন্নতি ও বিশুদ্ধিই মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য। [পৃঃ ৪৮৭] বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় খণ্ড, মনুষ্যত্ব কি? ঐ, ঐ।

'লোকশিক্ষার' প্রসারে শ্রেণীগত দূরত্বের অবসান জরুরী

ক. ইংরাজি শিক্ষা সত্ত্বেও দেশে লোকশিক্ষার উপায় হ্রাস ব্যতীত বৃদ্ধি পাইতেছে না, তাহার স্থূল কারণ বলি— শিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদনা নাই। শিক্ষিত, অশিক্ষিতের হৃদয় বুঝে না। শিক্ষিত, অশিক্ষিতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। [পৃঃ ৪৮৯]।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খ. সুশিক্ষিত যাহা বুঝেন, অশিক্ষিতকে ডাকিয়া কিছু কিছু বুঝাইলেই লোক শিক্ষিত হয়। এই কথা বাঙ্গালার সর্বত্র প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু সুশিক্ষিত অশিক্ষিতের সঙ্গে না মিশিলে তাহা ঘটিবে না। সুশিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদনা চাই। [পৃঃ ৪৯০]।

বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় খণ্ড, লোকশিক্ষা, পৃষ্ঠা ৪৮৭-৪৯০। বঙ্কিমরচনা সমগ্র, প্রথম খণ্ড, ১ম অংশ, সাক্ষরতা প্রকাশন। শতবর্ষ পূর্বে 'রামধন পোদ' রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র গরীবের জন্ম-নিয়ন্ত্রণের আবশ্যকতার কথাও বলেছেন সবিস্তার বিশ্লেষণে।

ভারতবর্ষের নারী ও সমানাধিকার/সাম্য ৫ম পরিচ্ছেদ

প্রসঙ্গ : সমানাধিকার

১. মনুষ্যে মনুষ্যে সমানাধিকার বিশিষ্ট ইহাই সাম্যনীতি।... স্ত্রীগণও মনুষ্যজাতি, অতএব স্ত্রীগণও পুরুষের তুল্য অধিকার শালিনী। যে যে কার্য্যে পুরুষের অধিকার আছে, স্ত্রীগণেরও সেই সেই কার্য্যে অধিকার থাকা ন্যায়সঙ্গত। [৫২৩]।

২. যে সকল বিষয়ে স্ত্রী পুরুষের অধিকার বৈষম্য দেখা সে সকল বিষয়ে স্ত্রী পুরুষে যথার্থ প্রকৃতিগত বৈষম্য দেখা যায় না। যতটুকু দেখা যায়, ততটুকু কেবল সামাজিক নিয়মের দোষে। সেই সকল সমাজিক নিয়মের সংশোধনই সাম্যনীতির উদ্দেশ্য [৫২৩]।

৩. স্ত্রী ও পুরুষে সর্ব্ব প্রকারে সাম্য থাকাই উচিত (৫২৪)।... সাম্যের ফল কদাচ অনৈতিক হইতে পারে না। সাম্য এবং স্বানুবর্ত্তিতা, এই দুই তত্ত্বমধ্যে সমুদয় নীতিশাস্ত্র নিহিত আছে। [৫২৯]।

স্ত্রীশিক্ষা

১. স্ত্রীশিক্ষা অতিশয় মঙ্গলকর, সকল স্ত্রীলোকের শিক্ষিতা হওয়া উচিত [পৃঃ ৫২৬]।

AMARBOI.COM

বিধবা বিবাহ

১. বিধবা বিবাহ ভালও নহে, মন্দও নহে; সকল বিধবার বিবাহ হওয়া কদাচ ভাল নহে, তবে বিধবাগণের ইচ্ছামত বিবাহে অধিকার থাকা ভাল। [৫২৬]।

২. যদি কোন বিধবা, হিন্দুই হউন, আর যে জাতীয়ই হউন, পতির লোকান্তর পরে পুনঃপরিণয়ে ইচ্ছাবর্তী হয়েন, তবে তিনি অবশ্যই তাহাতে অধিকারিণী। [৫২৬]।

৩. সাম্যনীতির ফলে... পত্নীবিযুক্ত পতি এবং পতিবিযুক্ত পত্নী ইচ্ছা হইলে পুনঃপরিণয়ে উভয়েই অধিকারী বটে। [৫২৭]।

৪. বিধবার চিরবৈধব্য যদি সমাজের মঙ্গলকর হয়, তবে মৃতভার্য্য পুরুষের চিরপত্নীহীনতা বিধান কর না কেন? [পৃঃ ৫২৭]।

স্ত্রীপর্দা/অবরোধ

১. স্ত্রী পুরুষে যত প্রকার বৈষম্য তন্মধ্যে... স্ত্রীগণকে গৃহমধ্যে বন্য পশুর ন্যায় বদ্ধ রাখার অপেক্ষা নিষ্ঠুর, অধর্মপ্রসূত বৈষম্য আর কিছুই নাই। রজ্জুটি পুরুষের হাতে বলিয়া স্ত্রী জাতির (প্রতি) এত দৃঢ় বন্ধন! [৫৩০]।

২. যে ধর্ম এরূপ বস্ত্রাবৃত বারিবৎ, সে ধর্ম থাকা না থাকা সমান— তাহা রাখিবার জন্য এত যত্নের প্রয়োজন কি? তাহার বন্ধন ভিত্তি উন্মূলিত করিয়া নতুন ভিত্তির পত্তন কর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই প্রথার... অনিষ্টকারিতা অধিকাংশ সুশিক্ষিত ব্যক্তিই... স্বীকার করিয়াও তাহা লঙ্ঘন করিতে প্রবৃত্ত নন। ইহার কারণ অমর্য্যাদা ভয়। [পৃঃ ৫২৮]।

পুরুষের বহুবিবাহ

১. মনুষ্যজাতির মধ্যে কাহারওই বহুবিবাহ অধিকার নীতিসঙ্গত হইতে পারে না।... পুরুষেরও স্ত্রীর ন্যায় একমাত্র বিবাহে অধিকার।

স্ত্রীর পিতৃসম্পত্তিতে অনধিকার

১. স্ত্রী পুরুষে যে সকল বৈষম্য প্রায় সর্বসমাজে প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকার সম্বন্ধীয় বিধিগুলি অতি ভয়ানক ও শোচনীয়।

স্ত্রীশিক্ষা : স্ত্রী স্বাধীনতার প্রধান উপায়

নারী স্বাধীনতার তিনটি বিঘ্ন নিবারণের একই উপায়— শিক্ষা। লোকে সুশিক্ষিত হইলে, বিশেষত স্ত্রীগণ সুশিক্ষিতা হইলে তাহারা অনায়াসেই গৃহমধ্যে গুপ্ত থাকার পদ্ধতি অতিক্রম করিতে পারিবে। শিক্ষা থাকিলেই অর্থোপার্জ্জনে নারীগণের ক্ষমতা জন্মিবে। এবং এদেশী স্ত্রী পুরুষ সকল প্রকার বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইলে, বিদেশী ব্যবসায়ী, বিদেশী শিল্পী বা বিদেশী বণিক তাহাদিগের অন্ন কাড়িয়া লইতে পারিবে না। শিক্ষাই সকল প্রকার সামাজিক অমঙ্গল নিবারণের উপায়।

উপসংহারের পূর্বে লেখকের, পুরুষদের উদ্দেশ্যে ব্যঙ্গোক্তিঃ পশুগণকে কেহ প্রহার না করে, এজন্যে একটি সভা আছে, কিন্তু বাঙ্গালার অর্দ্ধেক দেশবাসী স্ত্রীজাতি তাহাদিগের উপকারার্থ কেহ নাই। [পৃঃ ৫৩২]।

(উপরন্তু), পুরুষের অপরাধে স্ত্রী অশিক্ষিতা— কিন্তু সেই অপরাধের দণ্ড স্ত্রীগণের উপরেই বর্তাইতেছে। বিচার মন্দ নয়!

উপসংহার : যেখানে বুদ্ধি, মানসিক শক্তি, শিক্ষা, বল প্রভৃতির স্বাভাবিক তারতম্য আছে, সেখানে অবশ্য অবস্থার তারতম্য ঘটিবে— কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না। তবে অধিকারের সাম্য আবশ্যক— কাহারও শক্তি থাকিলে, অধিকার নাই বলিয়া বিমুখ না হয়। সকলের উন্নতির পথ মুক্ত চাহি। [পৃঃ ৫৩৩] এ সঙ্গে পূর্বের ৯ সংখ্যক উদ্ধৃতি প্রযোজ্য।

(সাম্য, পঞ্চম পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা ৫২৩-৫৩৩, বঙ্কিম রচনা সমগ্র, ১ম খণ্ড, ১ম অংশ, সাক্ষরতা প্রকাশন)।

ধর্মতত্ত্ব (অনুশীলন)

(এই পর্যায়েও সাক্ষরতা প্রকাশনের মুদ্রিত বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ প্রবন্ধ খণ্ড, শেষ অংশ-এর সাহায্য নেয়া হয়েছে)।

১. আমাদিগের সমস্ত শারীরিক ও মানসিক শক্তির অনুশীলন ও পরিচালনাই ধর্ম, ও তাহার অভাবই অধর্ম। ধর্মতত্ত্ব প্রথম অধ্যায়, দুঃখ কি? [পৃঃ ৭৯৮]।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২. মুক্তি সুখ নয়—সুখ দুঃখ মাত্রেরই অভাব। ধর্মতত্ত্ব।ঐ, ঐ, পৃঃ ৭৯৯]।

৩. সুখ দুঃখ মানসিক অবস্থা মাত্র—সুখ দুঃখের কোন বাহ্যিক অস্তিত্ব নাই। [ঐ, দ্বিতীয় অধ্যায়, সুখ কি? পৃঃ ৮০০]।

৪. মুক্তি সুখের অবস্থা বিশেষ। সুখের পূর্ণমাত্রা এবং চরমোৎকার্য।... ভারতীয় অনুশীলনের উদ্দশ্যেও সুখ।... ইহকালে সুখ পরকালে সুখ।।ঐ, পৃঃ ৮০০]।

৫. জ্ঞানে পাণ্ডিত্য, বিচারে দক্ষতা, কার্য্যে তৎপরতা, চিত্তে ধর্মাত্মতা এবং সুরসে রসিকতা— এই সকল হইলে, তবে মানসিক সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতি হইবে। আবার তাহার উপর শারীরিক সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতি আছে।... যাহারা মনুষ্যজাতির মধ্যে উৎকৃষ্ট, তাহারা চেষ্টা করিলে সে সম্পূর্ণরূপে মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারিবে না, এমত কথা স্বীকার করা যায় না। আমার এমনও ভরসা আছে, যুগান্তরে যখন মনুষ্যজাতি প্রকৃত উন্নতি প্রাপ্ত হইবে, তখন অনেক মনুষ্যই এই আদর্শানুযায়ী হইবে। [ধর্মতত্ত্ব, ৪র্থ অধ্যায়, মনুষ্যত্ব কি? ৮০৮]।

৬. শারীরিকী, জ্ঞানার্জ্জনী কার্য্যকারিণী, চিত্তরাঞ্জিনী—এই চতুর্ব্বিধ বৃত্তিগুলির উপযুক্ত স্ফূর্তি, পরিণতি ও সামঞ্জস্যই মনুষ্যত্ব! [ঐ। পঞ্চম অধ্যায়, অনুশীলন, পৃঃ ৮১২]।

৭. '(বৃত্তির) দমনই প্রকৃত অনুশীলন, কিন্তু উচ্ছেদ নহে।'... আমাদের সকল বৃত্তিই মঙ্গলময়। যখন তাহাতে অমঙ্গল হয়, সে আমাদেরই দোষে।... মনুষ্য মধ্যে ধর্ম লইয়া এত বিবাদ বিসম্বাদ কেন, আমি বুঝিতে পারি না। [ধর্মতত্ত্ব, ষষ্ঠ অধ্যায়, সামঞ্জস্য, পৃঃ ৮১৫ ও ৮১৬]।

৮. আমাদের সমুদয় বৃত্তিগুলির স্ফূর্তি, সামঞ্জস্য এবং উপযুক্ত পরিতৃপ্তিই সুখ।... অনুশীলনের উদ্দেশ্য সুখ; যেরূপ অনুশীলনে সুখ জন্মে, দুঃখ নাই, তাহাই বিহিত। [ঐ, সপ্তম অধ্যায়, সামঞ্জস্য ও সুখ, পৃঃ ৮১৮ ও ৮২৭]।

৯. ইন্দ্রিয় সংযম মানসিক বৃত্তির অনুশীলনের অধীন; মানসিক শক্তি ভিন্ন ইহা ঘটে না।... মানসিক বৃত্তির উচিত অনুশীলন শারীরিক বৃত্তির উপর নির্ভর করে... শারীরিকী বৃত্তির উচিত অনুশীলন আবার মানসিক বৃত্তির উপর নির্ভর করে। শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিগুলি এইরূপ সম্বন্ধ বিশিষ্ট; একের অনুশীলনের অভাব অন্যের অনুশীলনে অভাবে ঘটে। [ঐ, শারীরিক বৃত্তি, অষ্টম অধ্যায়, পৃঃ ৮]।

১০. জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি সকলের অনুশীলন জন্য জ্ঞানার্জ্জন নিশ্চিত প্রয়োজন।... জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিগুলির পরিতৃপ্তি [ঐ, জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি]।

১১. ভক্তি, প্রীতি, দয়া, মনুষ্য বৃত্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ তন্মধ্যে ভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ। এই ভক্তি ঈশ্বরে ন্যস্ত হইলেই অন্য ধর্মাবলম্বীরা সন্তুষ্ট হইলেন, ধর্মের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল।... ভক্তির সামাজিক প্রয়োজনে এই যে ভক্তি ভিন্ন নিকৃষ্ট কখন উৎকৃষ্টের অনুগামী হয় না। নিকৃষ্ট উৎকৃষ্টের অনুগামী না হইলে সমাজের ঐক্য থাকে না, বন্ধন থাকে না, উন্নতি ঘটে না। [ধর্মতত্ত্ব, অধ্যায় মনুষ্য ভক্তি, পৃঃ ৮৪০]।

১২. রাজা যতক্ষণ প্রজাপালক ততক্ষণ তিনি রাজা। যখন তিনি প্রজাপীড়ক হইবেন, তখন তিনি আর রাজা নহেন, আর ভক্তির পাত্র নহেন।... যাঁহারা সমাজের শিক্ষক, তাঁহারা ভক্তির পাত্র। যে গুণের জন্য ভক্তি করিব, সেগুণ যাহার নাই, তাহাকে ভক্তি করিব কেন? সেখানে ভক্তি অধর্ম। [ঐ, ঐ, মনুষ্যে ভক্তি, পৃঃ ৮৪১, ৮৪২, ৮৪৩]।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৩. সমাজকে ভক্তি করিবে।... মনুষ্যের যত গুণ আছে, সবই সমাজে আছে। সমাজ আমাদের শিক্ষাদাতা, দণ্ডপ্রণেতা, ভরণ পোষণ এবং রক্ষাকর্ত্তা। সমাজই রাজা, সমাজই শিক্ষক। ভক্তিভাবে সমাজের উপকারে যত্নবান হইবে। এই তত্ত্বের সম্প্রসারণ করিয়া ওগুস্ত কোমৎ "মানবদেবীর" পূজার বিধান দিয়াছেন। [ঐ, ঐ, ঐ, পৃঃ ৮৪৫]।

১৪. যখন মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরমুখী বা ঈশ্বরানুবর্তিনী হয়, সেই অবস্থাই ভক্তি। [ঐ, একাদশ অধ্যায়, ঈশ্বরে ভক্তি, পৃঃ ৮৪৫]।

১৫. অতি তরুণ অবস্থা হইতেই আমার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইত, "এ জীবন লইয়া কি করিব?" "লইয়া কি করিতে হয়?" সমস্ত জীবন ইহারই উত্তর খুঁজিয়াছি।... সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, দেশী বিদেশী শাস্ত্র যথাসাধ্য অধ্যয়ন করিয়াছি।... এই পরিশ্রম, এই কষ্টভোগের ফলে এইটুকু শিখিয়াছি যে, সকল বৃত্তির ঈশ্বরানুবর্ত্তিতাই ভক্তি, এবং সেই ভক্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই। "জীবন লইয়া কি করিব।" এ প্রশ্নের এ উত্তর পাইয়াছি। [ঐ, পৃঃ ৮৪৯]।

১৬. বৈদিক ধর্মে ভক্তি নাই।... বৈদিক ধর্মে উপাস্য উপাসকের... সম্বন্ধ ছিল।... কাম্যাদি কর্মাত্মক যে উপাসনা, তাহার সাধারণ নাম কর্ম।... জ্ঞানবাদ বড় অসম্পূর্ণ বলিয়া আমার বোধ হয়। জ্ঞানে ঈশ্বরকে জানিতে পারি বটে, কিন্তু জ্ঞানে কি ঈশ্বরকে পাওয়া যায়?... বরং যাহার প্রতি আমাদের অনুরাগ আছে, তাহাকে পাইবার সম্ভাবনা। সেই প্রকারের অনুরাগের নাম ভক্তি। [ধর্মতত্ত্ব, একাদশ অধ্যায়, ঈশ্বরে ভক্তি, পৃঃ ৮৫০-৫১]।

১৭. মনুষ্যে প্রীতি ভিন্ন ঈশ্বরে ভক্তি নাই, ভক্তি ও প্রীতি হিন্দুধর্মে অভিন্ন অভেদ্য... ঈশ্বরই প্রীতি, ঈশ্বরই ভক্তি—বৃত্তিস্বরূপ জগদাধার হইয়া তিনি লোকের হৃদয়ে অবস্থান করেন। [ধর্মতত্ত্ব, প্রীতি, একবিংশতিতম অধ্যায়, পৃঃ ৮৮৬]।

এভাবে আত্মপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি, স্বদেশপ্রীতি, পশুপ্রীতি, দয়া, চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তি প্রবৃত্তি হিন্দুর শাস্ত্রচেতনার আলোকে যুক্তি প্রয়োগে বিশ্লেষিত ও সংজ্ঞায়িত হয়েছে। স্বদেশপ্রীতির ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র হার্বার্ট স্পেন্সারকে অনুসরণ করেছেন : "The life of the Social Organism must, as an end, rank above the lives of its units." বলেছেন 'আত্মরক্ষার অপেক্ষা দেশরক্ষা শ্রেষ্ঠধর্ম, সেই কারণেই ইহা স্বজন রক্ষার অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠধর্ম। কেননা তোমার পরিবারবর্গ সমাজের সামান্য অংশমাত্র, সমুদয়ের জন্য অংশমাত্রকে পরিত্যাগ বিধেয়। [ধর্মতত্ত্ব, চতুর্ব্বিংশতিতম অধ্যায়, স্বদেশপ্রীতি, পৃঃ ৯০০]।

স্বদেশপ্রীতিকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলা উচিত।... সকল ধর্মের উপরে স্বদেশপ্রীতি, ইহা বিস্মৃত হইও না। [ধর্মতত্ত্ব, উপসংহার, পৃঃ ৯১৪]।

হেস্টির হিন্দুশাস্ত্রের ও আচারের নিন্দা নাস্তিক কিন্তু স্বজাতিপ্রেমী বঙ্কিমের কানে মনে-মননে-মস্তিষ্কে প্রচণ্ড ঘা দিয়েছিল, তাই হেস্টির ধারণা যে মিথ্যে, অমূলক এবং হিন্দুধর্মের সারতত্ত্ব উপলব্ধির অসামর্থ জাত, তা প্রমাণ করতে গিয়েই বঙ্কিম শাস্ত্র চর্চা শুরু করেন। এবং পরিণামে নিষ্ঠ গীতানুগ ভক্তিবাদী হয়ে ওঠেন। তিনি ভক্তিকেই মুক্তির মোক্ষের রাজপথ বলে মানলেন এবং হিন্দুধর্মকেই বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে জানলেন। এখানেই তিনি তাঁর জ্ঞান ও প্রয়াস সীমিত রাখেননি। তাঁর জ্ঞান মস্তিষ্ক মন-মনীষা হিন্দুর জন্য একটা ঋজু পরিচ্ছন্ন শাস্ত্রানুগ কিন্তু যৌক্তিক বৌদ্ধিক জীবন বিধান (code of life) রচনায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্রতী হয়ে জীবনের শেষদিন অবধি সময়, শ্রম, মনন, মনীষা একান্ত নিষ্ঠায় প্রয়োগ করেছিলেন।

হিন্দুর জীবনে অবশ্য অনুসরণীয় নীতি-আদর্শ সংযম সহিষ্ণুতা ত্যাগ প্রভৃতি মডেল দেখালেন 'দেবী চৌধুরানী'তে ও 'সীতারাম'-এ হিন্দুশাস্ত্রের ও হিন্দুর অনুসরণীয় নীতি নিয়মের, জীবনাচারে আবশ্যিক ও জরুরী বিষয়গুলো যৌক্তিক-বৌদ্ধিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণযোগে শাস্ত্র সম্পৃক্ত করে লিখলেন অনুশীলন : ধর্মতত্ত্ব। এ-ই হচ্ছে বঙ্কিম রচিত গীতার নির্যাস। 'বেদান্ত'র মতো এরও নাম দেয়া যায় 'গীতান্ত।' শ্রীকৃষ্ণকে দাঁড় করাতে চাইলেন আধুনিক জাতি সংগঠক, জাতীয় রাষ্ট্রনায়ক রূপে। আর স্বদেশপ্রীতি শেখালেন আনন্দমই।

এভাবেই তিনি হলেন হিন্দুর অঙ্গে ও অন্তরে নবজাগরণের, পুনর্জাগরণের, পুনরুজ্জীবনের সামগ্রিক সামূহিক ও সামষ্টিকভাবে প্রকৃষ্ট, প্রথম ও প্রধান উদ্গাতা। এবং জাতিবৈর জাগিয়ে জাতি গৌরব-গর্বচেতনা দাতা। এককালের নাস্তিক অবশেষে আস্তিক হয়ে বললেন, 'সকল বৃত্তির ঈশ্বরানুবর্তিতাই ভক্তি, এবং সেই ভক্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই।' অন্যত্র "সর্ব্বভূতে প্রীতি ব্যতীত ঈশ্বরে ভক্তি নাই, মনুষ্যত্ব নাই, হিন্দুর ঐহিক-পারত্রিক চর্যার ও মুক্তির পন্থা নির্দেশক বলেই বঙ্কিমকে হিন্দুর ঋষি বলে স্বীকার ও প্রচার করেন বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রী অরবিন্দ প্রমুখ বিদ্বান ও লোকমান্য ব্যক্তিরা। তবু বঙ্কিম কমলাকান্তের জবানীতে নির্বিশেষ ও পরম মনুষ্যত্বের সর্বোত্তম রূপও নির্দেশ করেছেন একান্ত আন্তরিকতায় 'পরের জন্য তোমার হৃদয়কুসুমকে প্রস্ফুটিত করিও।... মনুষ্য জাতির উপর যদি আমার প্রীতি থাকে তবে আমি অন্য সুখ চাহি না।'

এসব কারণেই মনে করি যে উনিশ শতকের বাঙলায় বঙ্কিমমনীষাই অতুল্যরূপে দীপ্র, গভীর ও ব্যাপকভাবে বহুমুখিতায় অভিব্যক্ত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাস্ত্র সমাজ ও নারীমুক্তি

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেশ কাল সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে পাঠোপযোগিতার নিরিখে আমার লেখাগুলো সংগ্রহ, সংকলন, বিন্যস্ত করেছেন কলকাতার বিদ্যাসাগর মহিলা কলেজের অধ্যাপক আমার কন্যা ডক্টর প্রথমা রায় মণ্ডল। মুদ্রণে ও প্রকাশনায় জনাব আজিজ মেহেরকে সম্মতও করিয়েছেন তিনিই। বিশুদ্ধ মুদ্রণের তত্ত্বাবধানও তাঁরই। কাজেই সব নিন্দা-তারিফ তাঁরই প্রাপ্য।

AMARBOI.COM

তাঁর জীবনে সুদীর্ঘ আয়ু ও প্রতিষ্ঠা কামনাসহ
ছোট্ট দাদু প্রতাক মণ্ডল সেতুকে দিলাম।

আহমদ শরীফ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিচ্ছিন্নতা

এককালে মানুষ ছিল কূর্মস্বভাবের। তারা তখন কৌমে, গোত্রে, গোষ্ঠীতে ছিল বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন। আজো তেমন স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় রক্ষণশীল বুনো বর্বর আরণ্য আদিবাসী বা উপজাতি পৃথিবীর সর্বত্রই কম বেশি মেলে।

আবার যারা গ্রহণশীল অনুকরণপ্রিয় এবং আত্মবিস্তারে উৎসুক, তাদেরও অনিচ্ছায় বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করতে হত পৃথিবীর পরিধি-পরিসর জানা ছিল না বলে। এবং কাছের ও পাশের প্রতিবেশীরাও থাকত অজ্ঞাত-অচেনা অগম্যতার, অলঙ্ঘ্যতার ও দুর্গমতা—দুর্লংঘতার দরুন। রাস্তাঘাট না থাকলে নিকটও হয় সুদূর। আবার একালে যানবাহনের উৎকর্ষে পৃথিবীর যে-কোন প্রান্তে স্বল্পসময়ে পৌঁছা সম্ভব ও সহজ। গোটা পৃথিবীর সীমা পরিসীমা জানা গেল তো মাত্র উনিশ শতকের প্রান্তপর্বে ও বিশ শতকের গোড়ার দিকে। এখন আমরা বিজ্ঞানীদের ও উদ্যোগী সাহসী মানুষদের আবিষ্কার-উদ্ভাবনের বদৌলত জল-স্থল-আকাশের অনেক কিছুই জেনেছি, জানছি, এবং জানব। যা আগের দিনের কোন নবী-অবতারের অপৌরুষেয় গ্রন্থেও মেলেনি—বেদে, বাইবেলে-কোরআনে-পুরাণে, কিংবা প্রাচীন সভ্যসমাজের কোন জ্ঞানী-মনীষীর রচনায়; তা আজ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্ররাও সহজেই বই পড়ে অল্পস্বল্প জেনে বুঝে নিতে পারে।

উপর্যুক্ত দু'প্রকারের বিচ্ছিন্নতা ছিল প্রাকৃতিক বাধা-ব্যবধানের দরুন। এ ব্যবধান ও বিচ্ছিন্নতা, স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্য ছিল অচেনার ও অজানার প্রসূন। আমরা আজ এখানে মুখ্যত মানসিক, আচারিক, সাংস্কৃতিক, শাস্ত্রিক, আর্থসামাজিক ও রাজনীতিক বিচ্ছিন্নতার কথাই আলোচনা করব।

বিচ্ছিন্নতা একালের বা আগের কালেরও মানুষের আত্মসত্তার স্বাতন্ত্র্য, মূল্য ও মর্যাদা বোধের প্রসূন। এমন দিন ছিল, যখন 'জোর যার মুলুক তার' নীতিই ছিল দুনিয়ার সর্বত্র চালু। কল্পনা করা যাক, দু'জন ব্যক্তির মধ্যে যে দেহে ও বুদ্ধিতে প্রবল সে-ই দ্বিতীয় ব্যক্তিকে তারই স্বার্থে হুকুমে হুমকিতে চালিত করবে। দাসপ্রথার ভূমিদাসপ্রথার সৃষ্টি হয়েছিল এভাবেই। সংস্কৃতি-সভ্যতা মনন-মনীষার অগ্রগতির ও উৎকর্ষের ফলে ধনে জনে বাহুবলে ও বুদ্ধিতে কিংবা ধূর্ততায়, সাহসে প্রবল ব্যক্তি, গোত্র কিংবা গোষ্ঠীই হয়েছে পরাক্রান্ত, জনগণকে ও জনপদকে করেছে পদানত।

কাজেই আত্মসত্তার স্বাতন্ত্র্য-মূল্য-মর্যাদাবোধ আত্মপ্রত্যয়ী মানুষকে দাসত্ব ও আনুগত্য পরিহারের প্রবর্তনা দেয়। দ্রোহী হওয়ার, বিচ্ছিন্ন হওয়ার, স্বতন্ত্র হওয়ার এবং স্বাধীন হওয়ার প্রেরণা ও প্রণোদনা জাগায় আত্মসত্তার বিকাশ এবং স্বাধিকারে স্ব ও সুপ্রতিষ্ঠাবাঞ্ছা থেকেই। দুর্বলের মধ্যে এসব স্বপ্ন ও সাধ হিসেবে সুপ্ত ও গুপ্ত থাকে। কিন্তু প্রবলে বিচ্ছিন্নতার, স্বাতন্ত্র্যের, মুক্তির, স্বাধীনতার, স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার, আত্মবিকাশের ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আত্মোন্নয়নের রূপে কার্যত অভিব্যক্তি পেতে থাকে দাবির ও দ্রোহের আকারে। এবং বুদ্ধির সঙ্গে জ্ঞানের, স্বপ্ন-সাধের সঙ্গে আত্মপ্রত্যয়ের, সাহসের সঙ্গে শক্তির, অঙ্গীকারের বা সঙ্কল্পের সঙ্গে উদ্যোগের ও উদ্যমের সংযোগ ঘটলে সাফল্য প্রায় অপ্রতিরোধ্য বা সুনিশ্চিত হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে বিজিত ও বিজয়ী উভয়পক্ষই যখন ধনে-জনে-মনে বিপর্যস্ত, তখনই আফ্রো-এশিয়া-লাতিন আমেরিকার উপনিবেশগুলোকে সামান্য আন্দোলনের মুখেই প্রায় বিনা প্রতিরোধে স্বাধীনতা দিয়ে ঘরে ফিরতে হল য়ুরোপীয় শক্তিগুলোকে। যদিও বা মাটি ছেড়ে 'বাজার' দখলের কুমতলবে বাণিজ্যিক সাম্রাজ্য বিস্তারের নব নব উপায় ও কৌশল আবিষ্কারে উদ্ভাবনে সক্রিয় হয়ে উঠল তারা মুখ্যত মার্কিন নেতৃত্বে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে রাশিয়াও লেনিনের নেতৃত্বে সমাজতন্ত্র কায়েম করল বটে, কিন্তু জারের সাম্রাজ্য ছাড়ল না, বলপ্রয়োগে জার সাম্রাজ্যভুক্ত সব দেশ বা জাতিগুলোকে সোভিয়েত ইউনিয়নভুক্ত রাখল, যদিও ওরা মার্কসবাদে শিক্ষা বা দীক্ষা কোনটাই প্রত্যাশিত ও কেজোমাত্রায় আয়ত্ত করেনি বা করতে আগ্রহী হয়নি। আবার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে রাশিয়ার সৈন্যরা তাদের অধিকৃত পূর্ব জার্মানীর ও পূর্ব য়ুরোপের রাষ্ট্রগুলো স্বাধিকারে রেখে কৃত্রিমভাবে সমাজতন্ত্র চালু করে দিল, ওদের ওই মতে শিক্ষা-দীক্ষা প্রয়োজনানুগ মাত্রায় না দিয়েই। ওদিকে মঙ্গোলিয়ায়, উত্তর কোরিয়ায়, ভিয়েতনামেও চালু হল একই কারণে অনুরূপ ব্যবস্থা। কিউবা অবশ্য চে গুয়েভারার দান।

পৃথিবীর ভেটো-শক্তিগুলোর মতোই তাদের সমর্থনে আর্থিক সাহায্যে তথা ঋণে-দানে-ত্রাণে-পরামর্শে ও মদদে তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোতে চলছিল একই আদর্শে বা নীতিতে জোর-জুলুমের, জবর দখলের তথা 'জোর যার মুলুক তার' নীতির প্রয়োগে শাসন-শোষণ-পেষণ-পীড়ন, আর দুষ্ট, দুর্জন, দুর্বৃত্ত-দুষ্কৃতীর কাড়া-মারা-হানার ত্রাসকর রাজত্ব।

এদিকে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক-আবিষ্কার-উদ্ভাবনের ফলে এ যন্ত্রযুগে ও যন্ত্রজগতের যন্ত্রনির্ভর জীবনে মানুষের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে এসেছে অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তন। খোলা আকাশের বাতাসবদ্ধ ঘরেও রেডিয়ো-টিভি-ভিসিআর-সিনেমা প্রভৃতি তার-বেতারযোগে অজ্ঞ-অনক্ষর মানুষের কানে-চোখে মনে-মননে ধরিয়ে দিচ্ছে স্বকালের পৃথিবীর হালচাল, জানিয়ে-বুঝিয়ে-দেখিয়ে দিচ্ছে যতসব শোষণের বঞ্চনার প্রতারণার ইতিবৃত্ত ও অন্ধি-সন্ধি, জাগিয়ে দিচ্ছে জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-নিবাসের পার্থক্য প্রসূত দ্বেষ-দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ-সংঘাতের কথা। সচেতন হচ্ছে, হয়েছে, আরো হবে দুনিয়ার সব মানুষ।

তাই গর্বাচেভ বিঘোষিত 'গ্লাসনস্ত' কিংবা 'পেরেস্ত্রৈকা' অ-রুশ এলাকার লোকমনে কোন সাড়া জাগায়নি, করেনি আশ্বস্ত। তারা বাকস্বাধীনতা পেয়েই ফেরুপালের মতোই উচ্চারণ করল উচ্চতম কণ্ঠে 'স্বাধীনতা চাই, স্বাতন্ত্র্যেই আত্মবিকাশ চাই, বিচ্ছিন্ন হয়েই স্বাধিকারে স্বস্তিতে বাস করতে চাই, চাই স্বপ্রতিষ্ঠ হতে।'

আঠারো শতক অবধি শাহ-সামন্ত-বেণে-বুর্জোয়া জগতে মানুষের নাগরিক চেতনা ছিল সুপ্ত। তার মন-মেজাজ ছিল ভাড়া করা বাড়ির ভাড়াটের মতো। রাজ্য ছিল রাজার। বাড়ি যেমন বাড়িঅলার। মাতৃভূমিতে যে তার জন্মগত অধিকার, তার জীবন যে জন্মভূমির মাটিলগ্ন, দেশ যে তার, রাজার বা শাসকের নয়, এ দেশে যে রয়েছে তার জন্মগত অধিকার, দায়িয়ত্ব ও কর্তব্য, জনগণই যে দেশের মালিক, সরকার যে কেবল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমবায় সমিতির কার্যনির্বাহী পরিষদের মতো তার প্রাত্যহিক জীবনের চাহিদা মেটানোর ও সরবরাহের, তার সুখ-স্বস্তি-সাচ্ছল্য, স্বাচ্ছন্দ্য রক্ষার ও বৃদ্ধির দায়িত্বে নিযুক্ত, সরকার যে শাসক নয়, সেবক মাত্র, তাদের সামাজিক জীবনে নির্বিরোধ নিরুপদ্রব নিরাপদ নির্বিঘ্ন সংযত, সহিষ্ণু সহযোগিতায় সহাবস্থানের ব্যবস্থা করাই যে সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য, তা এ কালের আগে অজ্ঞ-অনক্ষর-দুস্থ-দরিদ্র-নিঃস্ব-নিরন্ন এবং দাসত্বে ও আনুগত্যে সমর্পিতচিত্ত ব্যক্তিমানুষ, সমাজবদ্ধ মানুষ অনুভব উপলব্ধি করেনি।

এখন মানুষের জীবনভাবনা ও জগৎচেতনা পালটে গেছে। এতকাল যে তাদের ভূত-প্রেত-পিশাচ-জীন-পরী-ড্রাগন-তুকতাক, ঝাড়ফুঁক, মন্ত্র-মাদুলী, বাণ-উচ্চাটন, তাবিজ-কবচ, ট্যাবো-টোটেম, স্রষ্টা-শাস্ত্র প্রভৃতি লৌকিক অলৌকিক অলীক বানানো ভয়-ভক্তি-ভরসার কিস্‌সা-কাহিনী দিয়ে শান্ত, আশ্বস্ত ও শায়েস্তা রেখেছিল। এখনো অজ্ঞ-অনক্ষর নিঃস্ব নিরন্নদের সুকৌশলে অনুগত ও অজিজ্ঞাসু রাখতে চাইছে বটে, আজ আর তা সম্ভব হচ্ছে না গোটা পৃথিবীর খবর ও হালচাল, আসমান-জমিনের, জল-স্থল-আকাশের, অরণ্য-পর্বত-সমুদ্রের, দেহ-প্রাণ-মনের রোগের ঔষধের-চিকিৎসার যন্ত্রের-প্রকৌশল প্রযুক্তির বিভিন্ন পূর্ণ-অপূর্ণ তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য চোখে-কানে-মনে নানাভাবে জাগ্রত জীবনে অস্পষ্টভাবে ধরা পড়ার ফলে। পৃথিবীতে আজ তাই আদিবাসীরা, উপজাতিরা, শাস্ত্রিক সম্প্রদায়গুলো, ভাষিক গোষ্ঠীগুলো, বার্ণিক গোত্রগুলো, আঞ্চলিক অধিবাসীরা জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-সংস্কৃতি-আচার-বিশ্বাস-সংস্কার, লোকাচার-দেশাচার-নিবাস প্রভৃতির স্বাতন্ত্র্যের পার্থক্যের বৈপরীত্যের অজুহাতে দৈহিক, রাষ্ট্রিক, আঞ্চলিক, ভাষিক, বার্ণিক, শাস্ত্রিক, প্রাশাসনিক বিচ্ছিন্নতার, স্বাতন্ত্র্যের ও স্বাধীনতার দাবিদার হয়ে উঠছে, উঠেছে। যদিও এ যন্ত্রযুগে ও যন্ত্রজগতে যন্ত্রনির্ভর জীবনে গোটা পৃথিবীই যখন প্রায় একক বাজারকেন্দ্রী সংলগ্ন জনপদ হয়ে উঠেছে, শিক্ষিত শহুরে মানুষ মাত্রই যখন আসবাবে-তৈজসে-পোশাকে-রুচিতে-খাদ্যে-শিল্পে-সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক দার্শনিক চিন্তায়-চেতনায়-মননে, মনীষায় প্রায় অভিন্ন ও সদৃশ হয়ে উঠছে, জীবনাচারে অশনে-বসনে-নিবাসে-শিক্ষায়-চিকিৎসায়-স্বাস্থ্যে-যানবাহনে একাকার হয়ে যাচ্ছে, এমনকি মার্কিন ডলার ও ইংরেজী ভাষাও সর্বজনীন ব্যবহারের তথা পণ্য ও ভাব বিনিময়ের মুদ্রা ও ভাষা হয়ে উঠছে, তখন এ পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্য চেতনা, আর বিচ্ছিন্নতাবুদ্ধি অবিমৃষ্যকারিতা বলেই প্রতীয়মান হয় বুদ্ধিমানের কাছে। তথ্য ও সত্য হিসেবে ও অবশ্যই অবিসম্বাদিত।

তবে এর মধ্যে অন্য এক গভীর তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। আজ রাশিয়ায়, যুগোশ্লাভিয়ায়, ভারতে, চীনে, তিব্বতে, পাকিস্তানে, সোমালিয়ায়, শ্রীলংকায়, আফ্রিকার নানা রাষ্ট্রে এবং অন্যত্রও বিভিন্ন দ্বীপে উপদ্বীপে গৌত্রিক, ভাষিক, বার্ণিক-ধার্মিক-দৈহিক, রাষ্ট্রিক, প্রাশাসনিক বিচ্ছিন্নতার ও স্বাধীনতার কিংবা নিদেনপক্ষে স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনে, দাবিতে ও সংগ্রামে বিভিন্ন দল মেতে উঠেছে বটে, কিন্তু তারাও জানে, বোঝে ও মানে যে এ যুগে সভ্য ভব্য এমনকি বুনো-বর্বর মানুষও বিচ্ছিন্নতায় বাস করতে পারবে না, যন্ত্রযুগে তা সম্ভবও নয়, স্বাভাবিকও নয়, তা কেবল আত্মবঞ্চনার ও আত্মহননের নামান্তর হবে মাত্র।

সেই যে বলেছি মানুষের অভ্যস্ত মানসিক জীবনে বিপ্লব ঘটে গেছে, তারা এখন স্বাধিকার প্রমত্ত। 'আপন প্রাপ্য অধিকার চায়। তার লাগি দেবে লাল রুধির'। সেজন্যেই তারা এখন বিচ্ছিন্ন ও স্বাধীন হয়ে প্রজন্মক্রমিক 'দাসত্ব ও আনুগত্য'—অভ্যাসমুক্ত হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আত্মসত্তার গ্লানি ও ক্লিষ্টতা মুছে ফেলতে চায়, তারপর আত্মসত্তার মূল্য, মর্যাদা এবং আত্মসম্মানবোধ বজায় রেখে অন্যদের সমকক্ষ হয়ে সমাধিকার নিয়ে নির্বিরোধে, নির্বিবাদে নির্বিঘ্নে নিরুপদ্রবে নিরাপদে থেকে বাজারী পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের মতো নিজেদের সম ও সহস্বার্থে, সংযমে, সহিষ্ণুতায়, সমবায়ী সহযোগিতায় কাড়া-মারা-হানার আশঙ্কামুক্ত প্রতিযোগিতায়-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সহাবস্থান করতে অঙ্গীকারবদ্ধ হতে আগ্রহী। এ আগ্রহ না জেগেই পারে না, কেননা এ যন্ত্রচালিত যন্ত্রনির্ভর সংহত পৃথিবীতে স্বাতন্ত্র্যে ও বিচ্ছিন্নতায় বাঁচার উপায় নেই কারো। এ ক্ষুদ্র পৃথিবীতে এখন বড় ছোট সব রাষ্ট্রই পরস্পর নির্ভরশীল কোন না-কোন প্রয়োজনীয় পণ্যের জন্যে। যে-কোন ভোগ্য উপভোগ্য সম্ভোগ্য সামগ্রী নয় কেবল, রোগ হচ্ছে বাঁচা-মরার লড়াই, সে লড়াইয়ে চিকিৎসক ও প্রতিষেধক প্রয়োজন, তা এখন প্রতীচ্য দেশেই আবিষ্কৃত ও উদ্ভাবিত। সব যন্ত্র-যান-কৌশল-প্রকৌশল-প্রযুক্তিও প্রতীচ্যের অবদান। আবার অনেক কাঁচা-পাকা পণ্য-খনিজ পদার্থ প্রভৃতিও রয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। এখন তো মানুষের অনেক চাহিদা। আগের মতো মানুষ এখন কেবল মানবপ্রজাতির প্রাণীমাত্র নয় যে আহার-নিদ্রা-মৈথুনেই জীবনের চাহিদা পূরণ হবে।

কাজেই আজকের রাষ্ট্রিক জীবনে 'বাণিজ্য-বাজার' বন্ধন অবিচ্ছিন্ন। এ বন্ধন আবশ্যিক ও জরুরী। এ বন্ধন বাঁচার ও বাঁচানোর, মিত্রতার, সহযোগিতার ও সহাবস্থানের রাখী, প্রতীক, প্রতিম ও প্রতিভূ। প্রমাণ ন্যাটো জোটের সাধারণ বাজার, মিশরের প্রাক্তন সেনানী শাসক গামেল আবদুল নাসেরের ঐক্যবদ্ধ আরব রাষ্ট্র গঠনের প্রয়াস, ন্যাটো জোটের আর্থ-বাণিজ্যিক সঙ্কট-সমস্যা উত্তরণের জন্যে অভিন্ন মুদ্রা চালু করার প্রস্তাব।

এখন দুনিয়ার বড় ছোট সব রাষ্ট্রই কোন কোন ক্ষেত্রে সাধ্যমতো স্বনির্ভর ও স্বয়ম্ভর হতে চাইছে বাঁচার গরজেই। তাই প্রতীচ্য দেশগুলোর পণ্য বিক্রয়ের বাজার দিন দিন সংকুচিত হয়ে আসছে। শ্রমিকদের বসিয়ে রেখে বেতন দিতে হচ্ছে পণ্যের বাজার নেই বলে। সঙ্কট পৃথিবীব্যাপী বিস্তার লাভ করবে। তাই বাঁচার-বাঁচানোর শর্তে ও স্বার্থে আপোসে সামবায়িক সহযোগিতায় বাঁচার অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হবে পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলোকে। অস্ত্র বিক্রয়ে যুদ্ধ বাধিয়ে বাঁচার দিন বৃহৎ বুদ্ধিমান ও ধনী ধূর্ত রাষ্ট্রগুলোর পক্ষে অবসিত বা বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এ অঙ্গীকার ও আপোস আবশ্যিক এবং জরুরী। নইলে আত্মঅবক্ষয় ও আত্মবিনাশ ত্বরান্বিত হবে মাত্র।

২

এবার ভারতবর্ষের তথা এ উপমহাদেশের এবং বাঙলার কথা বলি। ব্রিটিশ কেড়ে-মেরে-হেনে-প্রতারণায়-প্রবঞ্চনায়-শোষণে-পীড়নে তাদের শাসনকালে আমাদের দেশের মানুষের যে ক্ষতি করেছে, তা কালের মাপে ছিল সামান্য ও সাময়িক। কিন্তু সে-তুলনায় বিকৃত ও মিথ্যা তথ্যে ও ব্যাখ্যায় জেমস মিল থেকে এলিয়ট-ডাওসন-স্মিথ হয়ে যেসব ব্রিটিশ বিদ্বান ভারতের মধ্যযুগের তুর্কী-মুঘল আমলের ইতিহাস ভেদনীতির সফল প্রয়োগ লক্ষ্যে রচনা করে যে-চিরস্থায়ী অপূরণীয় অবিমোচ্য অপ্রতিরোধ্য মানসিক ক্ষতি ও ক্ষত হিন্দু মনে সৃষ্টি করেছেন, তার রক্তক্ষরা ও প্রাণহরা ফল প্রায় নিত্যই আজকের প্রজন্মের লোক ভোগ করছে এবং ভাবী প্রজন্মের মানুষও এড়াতে পারবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্যত্র এ বিষয়ে কয়েকটি প্রবন্ধে প্রায় বিস্তৃত আলোচনা করেছি। এখানে সংক্ষেপে সে-কথাগুলোই উল্লেখ করব। ব্রিটিশ ঐতিহাসিকরা দেড়শ বছর ধরে লিখেছেন যে তুর্কী মুঘলরা— ১. তরবারীর জোরে এ দেশে হিন্দুর ধর্ম কেড়েছে, ২. নির্বিচারে হিন্দুর জান-মাল-গর্দান নিয়েছে, ৩. হিন্দুর মন্দির ও মূর্তি ভেঙে মসজিদ তৈরি করেছে, ৪. জিজিয়া কর বসিয়ে হিন্দুর অর্থসম্পদ কেড়েছে, প্রজাশাসনে সমদৃষ্টির পরিচয় দেয়নি, ৫. ওরা মুখ্যত অশিক্ষিত বর্বর নিষ্ঠুর, রক্তপিপাসু ও লম্পট ছিল, ৬. আওরঙ্গজেব, নওয়াব সিরাজুদ্দৌলাহ ও টিপু সুলতান বিশেষ করে হিন্দুপীড়নের জন্যে কুখ্যাত, আর ভারতের ধনীর ও মন্দিরের ধনরত্ন লুণ্ঠনে চিরনিন্দিত রয়েছেন তাঁর স্বরাজ্যের আদর্শ মহান সুলতান মাহমুদ গজনভী। এবার সাক্ষ্যে-প্রমাণে-অনুমানে নয়, যৌক্তিক ও বৌদ্ধিক বিচারে এ মিথ্যার ও বিকৃত তথ্যের অমূলকতা প্রতিপাদনের চেষ্টা করছি, বিশ্বাস করা না-করা পাঠকের জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি-রুচি-মন-মত-সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করবে।

১. আজ অবধি কোন জনপদে কবে কে বা কারা একহাতে কোরআন অন্যহাতে তরবারী নিয়ে অনুপ্রবেশ করে হননের বিকল্প হিসেবে হিন্দুদের ইসলামে দীক্ষিত করেছে, কিংবা ডান হাতের তরবারী-বর্শায় তাদের বক্ষবিদ্ধ করেছে, তার কোন সাক্ষ্য প্রমাণ মেলেনি। ভারতে হিন্দু অধিজন বলে কেবল হিন্দুর গাঁ মেলে, কিন্তু কেবল মুসলিমের গাঁ মুলতানের কিংবা সীমান্ত প্রদেশের এ দিকে মেলে না। এখানে উল্লেখ্য যে পাঞ্জাব অবধি হাজার বছর ধরে ভারতের পশ্চিমাংশ ছিল ইরানীর গ্রীকের, শক-হূন-কুষাণদের শাসনে। ফলে ওই অংশে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রের ও ব্রাহ্মণের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ ছিল শিথিল। তাই ইসলাম মদিনা থেকে মুলতান অবধি এবং মধ্য এশিয়ার বৌদ্ধ অধ্যুষিত এলাকায় অপ্রতিহত গতিতে প্রচারিত ও গৃহীত হয়েছে, জোর-জুলুমের, হুকুম-হুমকি-হামলার প্রয়োজন হয়নি। অশোক তাঁর কর্মচারীদেরও বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারে নিয়োগ করেছিলেন কিন্তু কোন মুসলিম শাহ-সামন্ত ইসলাম প্রচারে উৎসাহী ছিলেন বলে প্রমাণ নেই। তাঁরা রাজত্ব করতে এসেছিলেন মাত্র। কাসিম পুত্র মুহম্মদ যখন সিন্ধু জয় করেন, তখন ইসলামকে ঠেকানোর জন্যেই ব্রাহ্মণ শঙ্কর-ভাস্কর-রামানুজ-নিম্বার্ক-বল্লভ এক এক প্রকারের অদ্বৈতবাদ তথা একেশ্বরবাদ প্রচার করে কেবল যে ইসলামের প্রচার প্রসার দাক্ষিণ্যত্যে রুদ্ধ করেছিলেন, তা নয়, তান্ত্রিক বৌদ্ধমতেরও বিলুপ্তি ঘটিয়েছিলেন—সন্ন্যাসে ও মায়াবাদে গুরুত্ব দিয়ে।

আবার উত্তর ভারতে যখন তুর্কী মুঘল বিজয় ঘটল, তখন নিম্নবর্ণের, নিম্নবর্গের, নিম্নবৃত্তির ও নিম্নবিত্তের অজ্ঞ অনক্ষর মানুষেরা সবিস্ময়ে প্রায় শতোর্ধ্ব বছর ধরে দেখল— আজ যে দাস বা দাসী বাজার থেকে কেনা হল, কয়দিন পরে তাকে জামাতা বা বধূ করা হচ্ছে এ কেবল সাধারণ তুর্কীর মধ্যে নয়, বাদশাহ-বেগমের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ছিল না শতোর্ধ্ব বছর ধরে দিল্লীতে ও অন্যত্র। এ ইসলামী সাম্যই অচ্ছুৎ অস্পৃশ্য তুচ্ছ ঘৃণ্য বৃত্তিজীবী শূদ্র মনে দ্রোহ জাগাল ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রের ও সমাজের বিরুদ্ধে। এতকাল ধরে দেব-দ্বিজ-বেদের নামে প্রতারিত ও প্রবঞ্চিত ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ শূদ্ররা অপরিচিত বিদেশী ভাষায় লিপিবদ্ধ বিদেশীর শাস্ত্র ও মত গ্রহণ না করে দেব-দ্বিজ-বেদদ্রোহী হয়ে [আড়াই হাজার বছর আগে যেমন একই কারণে বর্ধমান মহাবীর ও গৌতমবুদ্ধ দেব-দ্বিজ-বেদদ্রোহী হয়ে অহিংসার ও সাম্যের ধর্ম প্রচার করেছিলেন ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়সেবী অর্থ-সম্পদরিক্ত ও পেশান্তর গ্রহণে বঞ্চিত শূদ্রদের মুক্তির লক্ষ্যে] সন্তধর্ম প্রচার করেন শূদ্রদের মধ্যে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র-শাসন, ব্রাহ্মণ্য শোষণ-পীড়ন-হুকুম-হুমকি-হামলা-বঞ্চনা মুক্তির লক্ষ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং ইসলামী সামাজিক সাম্যের অনুকরণে ও অনুসরণে। ফলে উত্তর ভারতেও এবং বাঙলায়ও ব্রাহ্মণ চৈতন্যদেবের প্রচারিত প্রেমধর্মের প্রভাবে ইসলামের প্রচার ও প্রসার মৃদু-মন্থর হয়ে পড়ল। একারণেই গোটা দক্ষিণ ভারতে এবং মুলতানের পূর্বে সমগ্র উত্তর ভারতে ব্রাহ্মণ্যবাদীর তথা হিন্দুর বিপুল সংখ্যাধিক্য আজ অবধি রয়ে গেছে। ইসলাম প্রচারে যে মুসলিম শাসকগোষ্ঠী তুর্কী-মুঘল জোর-জুলুম-হুকুম-হুমকি-হামলা চালায়নি তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ কোন তুর্কী-মুঘল রাজধানীতেও মুসলিমরা অধিজন ছিল না কখনো এবং এখনো নেই। আর গোটা ভারতের গাঁয়ে-গঞ্জে [পশ্চিম ভারত ও পূর্ববঙ্গ ব্যতীত] কোথাও মুসলিম অধিজন তো নয়ই, বরং নিতান্ত নগণ্য সংখ্যার, শতে ৮/১০/১২ কিংবা ১৪ জনের বেশি নয় কোথাও। তাহলে জোর জবরদস্তিতে ধর্মান্তর যৌক্তিক বৌদ্ধিক বিবেচনায় টেকে না। চালু সিদ্ধান্ত ও বিশ্বাস ভিত্তিহীন।[১]

২. শাসক-শাসিত চিরকালই দুটো আলাদা জাত। এদের সম্পর্কও হচ্ছে পীড়ক-পীড়িতের, শোষক-শোষিতের, বান্দা-মনিবের, ভৃত্য-প্রভুর। এখানে অর্থ-সম্পদ, মান-যশ-খ্যাতি-ক্ষমতা-প্রতিপত্তি-আনুগত্য-দাসত্ব প্রভৃতি দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক, অবস্থা ও অবস্থানই দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-সংঘাত, এক কথায় কাড়া-মারা-হানা প্রভৃতির কারণ। জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-অঞ্চল এখানে বিবেচ্য হয় না। কাজেই শাসক তুর্কী-মুঘল তাদের স্বার্থে প্রয়োজনে শক্তিমান, সাহসী, দ্রোহী উচ্চাভিলাষী হিন্দু মহাজন, জমিদার, তালুক-তরফদার কোন কোন ব্যক্তির সম্পত্তি হরণ করেছে, কাউকে ভিটে ছাড়া করেছে, কারো গর্দান নিয়েছে, তেমনি মুসলিম ও সগোত্রের দ্রোহীকেও জানে-মালে-গর্দানে বিনাশ করেছে। কাজেই এ জাতিদ্বেষণার ফল নয়। উল্লেখ্য যে দুনিয়ার কোন শাস্ত্রেই বেদে-বাইবেলে-কোরআনে-পুরাণে-গীতায়-স্মৃতিতে পরাক্রান্ত রাজার পররাজ্য হরণে কিংবা সেনাবাহিনীরূপ হন্তাবাহিনী পুষে নরহত্যা করানোতে কোন পাপ হয় বলে লেখা নেই। অর্থাৎ রাজা-বাদশাহর, শাহ-সামন্তের জোর-জুলুম-কাড়া-মারা-হানার কোন বিচার ঈশ্বরও করেন না, করবেন না। শাস্ত্রিক ন্যায়, অন্যায়-পাপ-পুণ্য সব সাধারণ মানুষের জন্যেই অর্থাৎ সাধারণ মানুষকে ভয়-ভক্তি-ভরসার অনুগত রেখে শাসনে শায়েস্তা রাখাই হচ্ছে ধূর্ত বা বুদ্ধিমান শাস্ত্রকারের লক্ষ্য। শাস্ত্রে সমাজে রাষ্ট্রেও তাই দ্বৈতনীতি প্রচল-শাসকের শাস্ত্রীর সর্দারের জন্যে এক রকম আর শাস্ত্র-সমাজ-সরকারমানা সাধারণের জন্যে থাকে ভিন্ন নীতিনিয়ম। কাজেই কেবল হিন্দু প্রজাই পীড়িত নির্যাতিত হয়েছে এ তথ্য বানানো। চৈতন্য ভাগবতে আছে 'ব্রাহ্মণে-যবনে বাদ যুগে যুগে আছে'—এর তাৎপর্য হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্ব নয়, শাস্ত্রীয় বৈপরীত্য জাত শাস্ত্রকারের ও শাস্ত্রবিদের পারস্পরিক মানসিক অবজ্ঞা ও অবিশ্বাস কিংবা উপহাস-পরিহাস মাত্র, দাঙ্গা-হাঙ্গামা নয়, যা একালে রক্তক্ষরা ও প্রাণহরা সংঘর্ষ-সংঘাতের রূপ নিয়েছে ব্রিটিশ সৃষ্ট ভেদনীতিরূপ বিষবৃক্ষের ফল বিতরণের ফলে ব্রিটিশ আমল থেকেই।

এর আগে তুর্কী-মুঘল আমলে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা হতে পারেনি শহরে-বন্দরে রাজধানীতে উনজন হলেও তুর্কী-মুঘলরা শাসক ছিল বলেই, আর গাঁয়ে গঞ্জে দাঙ্গা-হাঙ্গামা নয় কেবল, দ্বেষণারও কারণ ঘটেনি নিঃস্ব, নিরন্ন নিম্নবর্ণের, নিম্নবর্গের, নিম্নবৃত্তির ও নিম্নবিত্তের অজ্ঞ-অনক্ষর অন্ত্যজ অস্পৃশ্য শ্রেণীর শূদ্ররাই তথা বৌদ্ধ-হিন্দুজ মুসলিমদের জীবিকা ক্ষেত্রে এবং সামাজিক-প্রাশাসনিক ক্ষেত্রে গাঁয়ের বর্ণহিন্দুর ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থের উপর তাদের নির্ভরশীল ও ওদের প্রতি অনুগত থাকতেই হত বলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেশজ মুসলিমদের প্রতি অন্ত্যজ শ্রেণীর বলেই বর্ণহিন্দুর ঘৃণা-অবজ্ঞা-তাচ্ছিল্য ছিল প্রাজন্মক্রমিক এবং তাই তা আজো বর্ণহিন্দুর মনের গভীরে হয় সুপ্ত কিংবা গুপ্ত রয়েছে, লুপ্ত হয়নি আজো। এ সূত্রে বিপ্রদাস পিপিলাই-এর 'জোলাপাড়ার বয়ান' স্মর্তব্য। অতএব তুর্কী-মুঘল আমলে হিন্দু-মুসলিমের পারস্পরিক দ্বেষণা-দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-সংঘাতের তথা রক্তঝরা প্রাণহরা দাঙ্গা-হাঙ্গামার রূপ পায়ইনি কখনো। উনিশ শতক থেকে ব্রিটিশ প্ররোচিত দাঙ্গার শুরু। সিপাহি ওয়াহাবী দ্রোহ দমনের লক্ষ্যে হিন্দু মুসলিম মিলনে বা ঐক্যে ভাঙন ধরানোর জন্যেই ১৮৫৩ সনে 'বাবরী মসজিদ রামমন্দির' তত্ত্ব উদ্ভাবন ও তথ্যরূপে প্রচার করে ব্রিটিশ প্রশাসকই এবং হিন্দুদের দিয়ে দাঙ্গা বাধানোর চেষ্টাও করে। দিল্লি-আগ্রার নিকটবর্তী অঞ্চলে বিদেশাগত ধনী-মানী-খ্যাতি-ক্ষমতাবান জমিদার-ওমরাহ বংশীয়ের আধিক্য ছিল বলে শাসিত এবং তুলনায় অজ্ঞ-অনক্ষর ও নির্ধন প্রজা হিন্দুরা দাঙ্গা বাধাতে সাহস না পাওয়ায় রুষ্ট ব্রিটিশ শাসকরা হিন্দুদের নানা অজুহাতে জেল-ফাঁসী পর্যন্ত দিয়েছিল বলে শোনা যায়।

৩. যুদ্ধকালে মন্দিরাশ্রিত রাজাকে কিংবা বিদ্রোহী জমিদার প্রজাকে ধরবার জন্যে মন্দির আক্রান্ত, লুণ্ঠিত এবং দেবমূর্তি ভাঙা অবশ্যই হয়েছে অনেক স্থানে এবং অনেকবার। হিন্দুরাজা সুভাত বর্মণ-শ্রীহর্ষও মন্দিরের ধনরত্ন লুট করাতেন, দিল্লির সম্রাট ফিরোজ তুঘলকও মসজিদ ভেঙে ছিলেন। আবার উড়িষ্যায় হোসেন শাহ এবং কাশীতে আওরঙ্গজেব মন্দির ভেঙেছিলেন বলে যেমন জানা যায়, তেমনি ওঁরা দুজনেই মন্দির নির্মাণ-মেরামতের জন্যে জমি ও অর্থদান করেছিলেন বলেও শোনা যায়। ঐতিহাসিক তথ্য এই আওরঙ্গজেবই প্রায় শতে তেত্রিশ জন হিন্দুকে উঁচুপদে নিয়োগ করেছিলেন, যা বাদশাহ আকবরও করেন নি। আওরঙ্গজেবের অধিকাংশ সেনাপতি ছিলেন হিন্দু—জয় সিং, যশোবন্ত সিং, কেশব সিং, দলীপ সিং প্রমুখ। আর শেরশাহ ছিলেন বাদশাহ ও শাসক এবং মানুষ হিসেবে অতুল্য, যিনি যুগদুর্লভ প্রাগ্রসর চেতনাপ্রসূন উক্তির জন্যে প্রখ্যাত। তিনি নাকি বলতেন 'আমি হলাম প্রজার, মানুষের সেবক। 'I am a servant of the people' আর এটি সহজেই অনুমেয় যে যুদ্ধে ভাঙা মন্দিরের পাথর দিয়ে মসজিদ তৈরি হয়নি। সেকালে দু'কারণে পাকা মসজিদ-মন্দির-মঠ পরিত্যক্ত হত। এক. মহামারী শুরু হলে লোক প্রাণ নিয়ে ভিটে বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র পালাত। আর পাকা মসজিদ কিংবা মন্দির পরবর্তীকালে স্থানীয় ধনীলোকের অভাবে মেরামত হত না বলে ক্রমে কালিক জীর্ণতায় ভেঙে পড়ত। ফলে মন্দির বা মসজিদ পরিত্যক্ত বা অব্যবহৃত হয়ে পড়ে থাকত। মুসলিমদের মন্দির সম্বন্ধে কোন ভীতির সংস্কার ছিল না বলে ওরা ভাঙা বা পরিত্যক্ত জীর্ণ মন্দিরের পাথর নিয়ে মসজিদ নির্মাণ করত। এমনি পরিত্যক্ত জীর্ণ বা ভাঙা মন্দির-মসজিদ আজো বিরল নয়। এ তথ্যের বিকৃতি ঘটিয়ে ব্রিটিশেরা তুর্কী-মুঘলরাই হিন্দু-মন্দিরকে মসজিদ এবং মন্দির ভেঙে পাথর নিয়ে মসজিদ বানিয়েছে বলে প্রচার করে হিন্দুমনে স্থায়ী ক্ষোভ-ক্রোধ ও মুসলিম বিদ্বেষ জাগিয়েছে যা আজো তাজা এবং অম্লান।

৪. জিজিয়া মুসলিম অধ্যুষিত রাজ্যেও মুসলিম রাজারা মুসলিমদের উপরও বসাত, রাজারা-জমিদারেরা এবং একালের গণতান্ত্রিক সরকারও অর্থাভাব মেটানোর লক্ষ্যে শত প্রকারের কর বসায়। এ সূত্রে কৃষ্ণদেব রায়ের 'দাড়িকর' বসানোর কথা স্মর্তব্য। তীতুমীরের দ্রোহ ও সংগ্রাম মুখ্যত এ কর-বিরোধিতারই ফল। তাছাড়া এও স্মর্তব্য যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভারতে মধ্যযুগে স্বায়ত্তশাসিত হিন্দু রাজ্যই ছিল কয়েক শ', সেগুলো রাম রাজ্য ছিল না। আর তুর্কী-মুঘলের প্রত্যক্ষ শাসনে ছিল খুব কম অঞ্চলই। আরো স্মর্তব্য যে ব্রিটিশ ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলো তুর্কী-মুঘল আমলেরই। স্বাধীন বিজয়নগর কিংবা মারাঠা রাজ্যই কি রামরাজ্য ছিল? সেসব রাজ্যে বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা, ষড়যন্ত্র, গুপ্তহত্যা, রক্তপিপাসা, প্রজাপীড়ন, দুঃশাসন কি কম ছিল? 'জিজিয়া' তো প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধে না যাওয়ার বিকল্প কর কিংবা সেনানী না হওয়ার বিকল্প কর। আর এ তো গরিব হিন্দুর দেয় কর ছিল না। আকবরের সময়ে ভারতে শাসক-শাসিত তথা দেশজ মুসলিম সংখ্যা ছিল নিতান্ত নগণ্য। নিজের এবং নিজ বংশের রাজত্ব পাকাপোক্ত ও প্রাজন্মক্রমিক করার সূক্ষ্ম কুমতলবে যেমন তিনি রাজপুত কন্যা বিয়ে করেন, তেমন স্বধর্ম ত্যাগ করে একধর্ম একরাজ্য এবং একবংশীয় রাজত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 'ইলাহি' ধর্ম নামে এক কৃত্রিম ধর্ম রাজনীতিক-কূটনীতিক চালও নীতি হিসেবে চালু করেন। কাজেই তিনি জিজিয়া কর রহিত করেছিলেন। আওরঙ্গজেবকে দাক্ষিণ্যত্যে বিশেষ করে শিবাজী প্রভৃতির দ্রোহ দমনে ও যুদ্ধে আসাম-চট্টগ্রাম জয়ে, পর্তুগিজ দস্যুতা দমনে ব্যয়বহুল বিপুল সামরিক বাহিনী পুষতে হয়েছিল, তাই তাকে বাধ্য হয়েই অর্থ সংগ্রহের জন্যে জিজিয়া কর পুনঃপ্রবর্তন করতে হয়। একেই হিন্দুপীড়ন বলে চালিয়ে দেয়াটা ব্রিটিশ ঐতিহাসিকের সুপরিকল্পিত ভেদনীতি বিস্তারের ও প্ররোচনা দানের অঙ্গমাত্র। পরবর্তীকালে W. W. Hunter-কে দিয়ে মুসলিমতোষণ লক্ষ্যে এবং হিন্দুর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়ার কুমতলবে The Indian Mussalmans are they bound to be loyal to the British queen? নামের বই লিখিয়েছিল ব্রিটিশ সরকার [1873 A.D.]। সে বইতে লেখা হল One hundred and fifty years ago, it was impossible for a mussalman to be poor. এ কোন মুসলমান? শাসকগোষ্ঠীর মুঘল ইরানী মধ্য এশিয়া থেকে আগত চাকুরে সেনানী মুসলমান কিংবা অন্ত্যজ শ্রেণীর বৌদ্ধ-হিন্দুজ দেশী মুসলমান, তা কিন্তু গোপন রাখা হল। আর দেশজ মুসলিমরা ভাবল তারা তুর্কী-মুঘলের জ্ঞাতি বাদশাহর জাত, কাজেই তারাও ইংরেজ শাসন-পূর্বকালে ধনী ছিল, ব্রিটিশ আর দেশী ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ মিলে তাদের নিঃস্ব-নিরন্ন অজ্ঞ-অনক্ষর চাষী-মজুর-কুলিতে পরিণত করেছে তাদের অর্থসম্পদ নানা কৌশলে হরণ করে। এর ফলও বাঙলায় মারাত্মক হল। বিশ শতকে নব্য শিক্ষিত দেশজ মুসলিম মনে জাগল, হিন্দুরাই তাদের দুর্দশার জন্যে দায়ী। ইংরেজী শিক্ষিত মুসলিম বাঙালীর মন হিন্দুবিদ্বেষ বিষে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। মুসলিম লীগ এখানে তাই হল জনপ্রিয়, নেতৃত্ব দিল দেশী ও উত্তর ভারতীয় ধনী-শিক্ষিত কিন্তু সংখ্যালঘু মুসলিম রইস শ্রেণীর নেতারা। তাদের প্রয়োজনেই তাদের মাতৃভাষা উর্দু হল পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। যদিওবা লাহোর শহর ব্যতীত কোথাও উর্দু কারো জানা ছিল না। ব্রিটিশ মদদে ও স্বীকৃতিতে বাঙালী মুসলিমের ভোটে উত্তর প্রদেশের মুসলিম নেতৃত্বে আর কংগ্রেসের হিন্দুয়ানী প্রীতির ফলে মুসলিম লীগ ও তার নেতা জিন্নাহ গোটা ভারতের মুসলিমদের অপ্রতিদ্বন্দ্বী মুখপাত্র হয়ে দাঁড়ালেন। ভারত দ্বিখণ্ডিত হল। সাত লক্ষ মানুষের প্রাণের বিনিময়ে পাকিস্তান হল, ঠকল মুসলিমরাই। কেননা তারা পশ্চিমে হারাল পূর্ব পঞ্জাব, পূর্বে হারাল পশ্চিমবঙ্গ এবং লুঠ করার, সম্পদ আহরণের দীর্ঘকালীন সুযোগ হারাল আসামে। এখন যেটা পাকিস্তান সেখানে চিরকালই ছিল মুসলমানেরা বিপুলসংখ্যায় অধিজন। এখন যেটা বাঙলাদেশ, এখানেও ছিল মুসলিমরাই অধিজন। ব্রিটিশ ভারত দ্বিখণ্ডিত ত্রিখণ্ডিত হয়ে কার কি লাভ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হল? তিনটে রাষ্ট্রেই উনজনের জান-মাল-গর্দান এবং মানসিক স্বস্তি ও স্বাধীনতা বিপন্ন ও অনিশ্চিত হল এবং হয়তো আরো বহুকালের জন্যে অনিশ্চিত ও বিপন্ন রইল, শঙ্কা-ত্রাস ছাড়াও স্বঘরে স্বদেশে প্রবাসীর মতো অবজ্ঞেয় অবাঞ্ছিত অপ্রয়োজনীয় ব্যক্তির মতো, পরগৃহে কাজের লোকের মতো মানসিকভাবে হীনম্মন্যতায় ও পরাধীনতায় ভুগতে থাকবে উনজনেরা—এতে এদের মানুষ্যত্বের নয় কেবল, দেহ-প্রাণ-মনের স্বাভাবিক বিকাশ ও উৎকর্ষ ব্যাহত হচ্ছে।

৫. পাঁচ সংখ্যক ধারণা আজকাল উদার ঐতিহাসিকরাই খণ্ডন করছেন, করেছেন এবং করতে থাকবেন নিছক জাতিবিদ্বেষ প্রসূন বলে। ব্যক্তি দুষ্ট-দুর্জন-বর্বর-দুর্বৃত্ত-দুষ্কৃতী হয়, জাত হিসেবে ভালো-মন্দ হয় না, তবে জাতপাতের বাধা ছিল না বলে হরণ করে বধূ করে ঘরে তোলা যায় বলে মুসলিমরা নারী হরণে বেপরওয়া। হিন্দুর জাতপাতের বাধা বলে সে লাম্পট্যপ্রবণ হলেও সংযত থাকে পতিত হওয়ার ভয়ে।

৬. সুলতান মাহমুদ গজনভী, আওরঙ্গজেব, টিপু সুলতান ও সিরাজুদ্দৌলাহ সম্বন্ধে যে সব গালগল্প চালু রয়েছে, উদ্দেশ্যমূলকভাবে রটানো হয়েছে, তা এ কালের ঐতিহাসিক গবেষণায় মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে ও হচ্ছে। রঞ্জিত গুহ প্রমুখের Sub altern গবেষণায় রমিলা থাপার, হরবংশ মুখিয়া, বিপানচন্দ্র, সতীশ চন্দ্র, ইরফান হাবিব প্রমুখ প্রখ্যাত, খ্যাত, স্বল্পখ্যাত গবেষক, প্রবন্ধকার ও গ্রন্থকারদের রচনার বহুল প্রচারের ফলে মিথ্যের কুয়াশা কেটে যাচ্ছে। কিন্তু দেশের মানুষ শিক্ষিত কৌতূহলী, জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি বিবেক-বিবেচনাসম্পন্ন না হলে এ দ্বেষ্বর্ণামুক্তি ঘটবে না, ক্ষোভ-ক্রোধ-দাঙ্গা-হত্যা-অসংযম-অসহিষ্ণুতা সহজে বিলুপ্ত হবে না। তা ছাড়া রাজনীতিকরা যদি আদর্শনিষ্ঠ ও সৎ চরিত্রের না হয়, তা হলে সাম্প্রদায়িক সংযম-সহিষ্ণুতা-সম্প্রীতি কখনো সম্ভব হবে না। এদের স্বার্থেই এরা বিচ্ছিন্নতার সাম্প্রদায়িকতার বিবাদের-বিরোধের, দাঙ্গার-হত্যার প্ররোচনা দিতে থাকবে দুস্থ, নিঃস্ব, নিরন্ন, দরিদ্র, ধনলিপ্সু, অজ্ঞ-অনক্ষর, দুর্জন, দুষ্টদের, যারা দাঙ্গায় আগ্রহী হয় অর্থ-সম্পদ প্রাপ্তি লিপ্সায়।

তুর্কী-মুঘল আমলে যে দেশের অন্ত্যজ শ্রেণীর দীক্ষিত মুসলিমরা কাজী উকিল মুনশী ফৌজিদার প্রভৃতি কয়েকটি পদ পেলেও বাকি বেসামরিক তথা রাজস্ব আদায় প্রভৃতি সর্বপ্রকার প্রাশাসনিক কাজে বর্ণহিন্দুই নিযুক্ত থাকত, তার প্রমাণ হিন্দুরা আজো পদবী হিসেবে ঘরে ঘরে বহন করছে। এরূপ পদবী অজ্ঞ-অনক্ষর অন্ত্যজ শ্রেণী থেকে ক্ষুদ্র তুচ্ছ ও অবজ্ঞের বৃত্তিজীবী মুসলিমের মধ্যে দুর্লভতায় বিরল।

হিন্দু বলে কোন শাস্ত্রিক জাতি ছিলই না সতেরো শতক অবধি। দেশজ ব্যক্তি শিবাজী একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করায় সিন্ধু উপত্যকার আদিবাসী হিসেবে এটি সিন্ধুবাসীর রাজ্য অর্থে 'হিন্দুরাজ্য' নামে সম্ভবত অভিহিত হতে থাকে। সেকালের বিদেশীরা দৈশিক নামে পরিচিত হত এবং কবি বিদ্যাপতিও 'হিন্দু তুরুক' অর্থে ভারতবাসী ও তুর্কী নির্দেশ করেছেন, এ পরিচয় অবশ্যই শাস্ত্রিক নয়, পরেও আমরা দৈশিক ও গৌত্রিক পরিচয়েই মানুষকে চিহ্নিত করেছি : যেমন মক্কী, মাদানী, ইরানী, ইরাকী, খোরাসানী, বদখসানী, সমরখন্দী বোখারী-ইংরেজ-ফরাসী, ওলন্দাজ, দিনেমার, পর্তুগীজ কিংবা খলজি, তুঘলক, লোদী, আইবক, বরবক, উজবক, মারাঠী, মাদ্রাজী, হিন্দুস্তানী, গৌড়ী, উড়িয়া, মৈথিলী প্রভৃতি নামে। ইংরেজরা নিজেদের 'খ্রীস্টান' পরিচয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আখ্যাত করেনি, কিন্তু ভেদনীতি ফলপ্রসূ করার জন্যে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের 'হিন্দু' এবং ইসলামপন্থীদের 'মুসলিম' নামে অভিহিত করে জাতি-দ্বেষণা চালু করে।

এ সূত্রে আরো একটা তথ্য বিবেচ্য। উনিশ শতক অবধি প্রতীচ্য শিক্ষার প্রভাবে আমাদের মধ্যে নতুন জাতি-চেতনা জাগলেও তা ছিল ধর্ম বিশ্বাসভিত্তিক। এ জন্যে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক অবধি হিন্দুজাতি, মুসলিম জাতি, খ্রীস্টানজাতি, শিখজাতিই ছিল। গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস দৈশিক তথা রাষ্ট্রিক জাতীয়তা প্রচারে উদ্যোগী হলেই 'জাতি' স্থলে 'হিন্দু মুসলিম খ্রীস্টান সম্প্রদায়' নাম রাজনীতিক তাৎপর্যে ও স্বার্থে চালু হয়।

আজ উপমহাদেশের সর্বত্র বিচ্ছিন্নতার, সাম্প্রদায়িকতার, স্বাতন্ত্র্যচেতনার অনুশীলন ও সংগ্রাম, বা আন্দোলন বৈনাশিক আগুনের রূপ নিয়ে সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে। এর বিলুপ্তির উপায় তিনটে। এক, সবার নাস্তিক হওয়া অথবা স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার করেও শাস্ত্র মনুষ্য বানানো বলে বর্জন করা অর্থাৎ ঈশ্বর থাকলেও শাস্ত্রমানার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা। দুই, নিরীশ্বর সমাজবাদী বা কম্যুনিস্ট হওয়া। তিন, ইহজাগতিক সর্ব ব্যাপারে ও বিষয়ে রাষ্ট্রিক তথা সরকারী নীতি হিসেবে শাস্ত্রের ও শাস্ত্রিক পালা-পার্বণের সামাজিক ভূমিকা অস্বীকার বা শাস্ত্রিক আচার-আচরণ পালা-পার্বণকে কেবল ব্যক্তিক বিশ্বাসে ও আচারে আচরণে নিবদ্ধ রাখা। এক কথায় ইহজাতিক সর্ববিষয়ে এবং সামাজিক, বাণিজ্যিক, রাষ্ট্রিক তথা সরকারী নীতি-নিয়মে, রীতি-রেওয়াজে, প্রথা-পদ্ধতিতে, আসবাবে, তৈজসে, পোশাকে, নামে, খাদ্যে সেক্যুলার হওয়া। অবশ্য আজকাল পৃথিবীব্যাপী শিক্ষিতজনেরা আসবাবে, তৈজসে, পোশাকে, খাদ্যে, আদব-কায়দায়, রুচিতে, সংস্কৃতিতে, চিত্রে, সাহিত্যে, দর্শনে, ইতিহাসে, সমাজবিজ্ঞানে, অর্থবিজ্ঞানে, বাণিজ্যবিদ্যায়, আর বিজ্ঞানচর্চায় চিকিৎসাবিদ্যায়, যন্ত্রের প্রকৌশলের প্রযুক্তির প্রয়োগে অভিন্ন বা সদৃশ হয়ে উঠেছে। কাজেই বাস্তবে আজকালকার লোক সেক্যুলার কিন্তু মানসিকভাবে সে অতীত ও ঐতিহ্য বা পরম্পরাশ্রয়ী তথা শৈশব-বাল্যের পারিবারিক-সামাজিক প্রতিবেশে যে-মগজধোলাই হয়ে গেছে, তার জের বা প্রভাব বয়ে চলছে। তাই সে গ্রহণবিমুখ-কূর্মস্বভাবের ও কূপমাণ্ডুক্যনীতির ধারক। এ যন্ত্রযুগে ও যন্ত্রজগতে যন্ত্রনির্ভর জীবনে এ রক্ষণশীলতার জীর্ণ দুর্গদেয়াল ফুটো হয়ে হয়ে অচিরে ভেঙে পড়বে। আজ মানুষ জল-স্থল-আকাশের রহস্য জেনে যাচ্ছে, মানব-মনীষা বিস্ময়কর উদ্ভাবনে আবিষ্কারে নিয়োজিত। আদি ও আদিমকালের ভূত-ভগবান, প্রেত-পিশাচ, জীন-পরী, ড্রাগন-দৈত্য, দানু-তুকতাক, ঝাড়-ফুঁক, বাণ-উচ্চাটন, মন্ত্র-মাদুলী, তাবিজ-কবচ প্রভৃতিতে আস্থা আর কয়দিন টিকবে শিক্ষিত-শহুরে মনে, যখন পৃথিবী একটা ক্রয়-বিক্রয়ের বাজারকেন্দ্রী জনপদে পরিণত হয়ে গেছে? তবু মানুষ হয়তো নিরীশ্বর হবে না, কম্যুনিস্টও হচ্ছে না আপাতত। বাকি থাকল সেক্যুলারিজম। আমাদের সেক্যুলার হতেই হবে। সেক্যুলার সরকার আবশ্যিক ও জরুরী।

অতএব, আমাদের সত্যসন্ধ হয়ে প্রত্নতত্ত্বের আবিষ্কারে, ইতিহাসের—অতীতের তথ্য ও সত্য সন্ধানে আত্মনিয়োগ করতে হবে, মিথ্যার আবরণ-আভরণ-আবর্জনামুক্ত করে সত্যকে সবার চোখে-কানে-মনে ধরিয়ে দিতে হবে, তাহলেই কেবল বিদ্বেষের, বিচ্ছিন্নতার, স্বাতন্ত্র্যের, সাম্প্রদায়িকতার, অনাত্মীয়-তার, অতীতমুখিতার আধি-ব্যাধি থেকে আমরা মুক্ত হয়ে যৌক্তিক বৌদ্ধিক জীবন নির্বিবাদে নির্বিরোধে নির্বিঘ্নে নিরুপদ্রবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিরাপদে সম ও সহস্বার্থে স্বাধিকারে সংযত ও সহিষ্ণু থেকে ভোগ-উপভোগ ও সম্ভোগ করতে পারব।

পাদটীকা

১. ১৪০০ সালে ভারতে মুসলিম জনসংখ্যা ছিল বত্রিশ লক্ষ, ১৬০০ সালে হলো দেড় কোটি। ১৮০০ সালে প্রায় আড়াই কোটি। [সাম্প্রদায়িকতা ও সংস্কৃতি : অশোক চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ৫৭]
অতএব, জোর করে ইসলামে গণদীক্ষা একটা বানানো কিস্‌সা, রটনামাত্র-ঘটনা নয়।

বিতর্কিত জাতীয়তা : বিকৃত ইতিহাস

আমরা অনেক অনেক শতকের পথ অতিক্রম করে নানা দুর্লঙ্ঘ্য বাধা ডিঙিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের মালিক হয়েছি। আমাদের একটা দেশ আছে, আমাদের একটা উন্নত ভাষা আছে, আমাদের শাস্ত্র আছে, সমাজ আছে, ইহ-পরলোকে প্রসৃত একটা স্থূল জীবনচেতনাও আছে। আপাত দৃষ্টিতে আমাদের সব আছে। আমরা নিখাদ-নিখুঁত একটা জাতিসত্তা ও জাতি। আমাদের স্বীকৃত একটা অতীত আছে, ঐতিহ্যও আছে, আছে আমাদের নানা ও বিচিত্র আচারিক পরম্পরা। আমাদের অতীত, আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের পরম্পরা হয়তো তেমন উচ্চমানের নয়, নয় হয়তো অন্যদের সসম্মানে স্বীকৃত কিছু। তাতে কি আসে যায়? রাজার ঘরে থাকে রাজকীয় সুখ-সম্পদ, গৌরব, গর্ব, খ্যাতি-ক্ষমতা-মান-যশ-দর্পদাপট। তেমনি গরিবেরও থাকে তার আদিপুরুষ থেকে নানা গ্রামীণ গৌরবের ঐতিহ্য ও পরম্পরা। রাজার রাজভোজে রাজার তৃপ্তি ও তুষ্টি, গরিবেরও পেটভর্তি শাক-ভাতে সানন্দ সুখ। কেননা সুখ তো খুঁজলে মেলে না, সুখ কেউ কাউকে দিতে পারে না, সুখ পেতে জানতে হয়, সুখ অনুভব-উপলব্ধি গ্রাহ্য, সুখ যুক্তিতে কিংবা চুক্তিতে মেলে না, সুখ ধনে-সম্পদে, ভোগের সম্ভোগের ব্যবস্থায়ও নেই। সুখ মনোগ্রাহী, মনোজ্ঞ, মনসিজ।

আমরা আমাদের জাতিক রাষ্ট্রিক জীবনে সুখ-স্বস্তি পেতে জানিনে কিংবা পেতে চাইনে। তাই আমরা স্ব স্ব দলীয় তুচ্ছ রাজনীতিক ফায়দা ওঠানোর জন্যে, ভোট যোগাড়ের জন্যে, জেনে বুঝেও স্বেচ্ছায় বিভ্রান্তিকর মত, মন্তব্য ও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করি, এতে দলীয় স্বাতন্ত্র্য, প্রেরণা-প্রণোদনা-উত্তেজনা-প্ররোচনা দান সম্ভব ও সহজ হয় বটে, কিন্তু সুস্থ ও স্বস্থ মন-মননের, নীতি-আদর্শের অনুসরণে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা সৃষ্টি হয়। আমরা চুয়াল্লিশ বা বাইশ বছর পরেও কয়েকটি মৌলিক ও তুচ্ছ প্রশ্নের মীমাংসায় আগ্রহী হইনি, বরং জিইয়ে রাখাই শ্রেয়স ও শ্রেয়স মনে করেছি। আমাদের বিতর্কের ও বিপদের বিষয়গুলো হচ্ছে—

১. আমরা কি বাঙালী কিংবা হিন্দু বা মুসলিম বাঙালী অথবা বাঙালী হিন্দু বা মুসলিম?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২. আমরা বাঙালী না বাঙলাদেশী?

৩. ১৯৫২ সনের ২১ শে ফেব্রুয়ারি মিছিল করল ছাত্ররা, কেবল অছাত্ররা মরল কেন? প্রখ্যাত অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাকের মতে শহীদ বরকত না কি গোয়েন্দা পুলিশের লোক ছিলেন? এর মত খণ্ডনের জন্যে আজো কেউ এগিয়ে আসেনি। বরকতই কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন এবং ছাত্রাবাসের ভেতরেই তিনি গুলিবিদ্ধ হন।

৪. ২১ শে ফেব্রুয়ারির ঘটনা, নেতৃত্ব, ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করার, না করার সিদ্ধান্ত প্রভৃতির বয়ানে কোন দু'জনের স্মৃতিকথা অভিন্ন হয় না। ইতিহাসের প্রয়োজনে আন্দোলনকারীদের একটা সেমিনার সম্মেলন করে অধিকাংশের গ্রাহ্য বা সর্বজন সম্মত একটা 'বৃত্তান্ত' তৈরি করা বাঞ্ছনীয় নয় কি?

৫. আওয়ামী নেতৃত্বের গোড়ার কথা বয়ানের ভিত্তিতে ছয় দফার প্রভাব ও ফসল আলোচনা সূত্রে আওয়ামী লীগের ভূমিকা, আগরতলা ষড়যন্ত্রের ও মামলার অনুপুঙ্খ ও আনুপূর্বিক ইতিবৃত্ত নয় কেবল, বাঙালীর স্বাতন্ত্র্যচেতনার, বিচ্ছিন্নতাস্পৃহার এবং স্বায়ত্তশাসনপ্রাপ্তি প্রয়াসের ও মুক্তিযুদ্ধে তার সার্থক রূপায়ণ প্রভৃতিতে যাঁরা গোড়াতেই রাজনীতিকভাবে জড়িত, তাঁদের মধ্যে যাঁরা মনে-মননে-ইতিহাসচেতনায়, মনীষায় ও লেখার অভ্যাসে যোগ্য তাঁদের পাঁচ/সাত জনকে উঁচুহারের সরকারী বৃত্তি দিয়ে কমিটি-কমিশনের মর্যাদাদানে নিয়োগ করলে একটা ঐতিহাসিক দলিল তৈরি হতে পারে চিরকেলে ব্যবহারের জন্যে। বাইশ বছর পরে সময় এসেছে ইতিহাসের প্রয়োজনে জান-মালের ক্ষতি নিরূপণের ও মুক্তিযুদ্ধকালে পাকবাহিনীর ও রাজাকার প্রভৃতির হাতে কত হাজার বা লক্ষ বাঙালী ও বিহারী নিহত হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধে, হিন্দু-মুসলিমের আনুপাতিক হার কত ছিল, কোলকাতায় কয় হাজার মুসলিম এবং কত লক্ষ হিন্দু আশ্রিত হয়েছিল তাও হিসেব করার।

৬. স্বাধীনতা প্রথম কে বা কারা ঘোষণা করেছিলেন, কোথায় করেছিলেন, সে-ঘোষণার উচ্চারিত বাক্যগুলো কি কোথাও লিখিত কিংবা ক্যাসেটভুক্ত আছে? ঘোষণার কাজে সহযোগী-পরামর্শদাতা এবং যন্ত্রী-প্রকৌশলীরূপে কারা কারা ছিলেন, তাঁদের তালিকা নির্মাণ কি আবশ্যিক ও জরুরী নয় ইতিহাসের পাথুরে প্রমাণরূপে সংরক্ষণের গরজে ও দেশপ্রেমী সাহসীদের প্রতি জাতির কৃতজ্ঞতা স্বীকারের জন্যে? আর কোলকাতায় স্বাধীন বাঙলাদেশ সরকারের নেতা-উপনেতা-কর্মীদের ভূমিকাই বা ব্যক্তিগতভাবে কি ও কেমন ছিল, তাও বর্ণিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৭. বাহ্যত যে নামেই চলুক, কার্যত ১৯৪৭ সন থেকেই কি আমরা স্বৈরশাসনে ছিলাম না? আইয়ুব খান তো স্বৈর-স্বেচ্ছা শাসক বিঘোষিতভাবেই ছিলেন, সেভাবেই কি মোস্তাক আহমদ, জিয়াউর রহমান আর এরশাদ শাসন করেননি? জঙ্গীসেনার নায়কত্বই তো রাষ্ট্রপতি শাসন নামে চলছিল মাত্র। লোক ভোলানো তথাকথিত গণতন্ত্র কি অনুগত চাটুকার 'শোবয়' দিয়ে চালু ছিল না? জিয়ার ও এরশাদের আমলের নির্বাচন পদ্ধতিতে, নির্বাচিত সাংসদদের মধ্যে গুণগত কিংবা মনে-মতে-আনুগত্যে আর হাঁ হুজুরী-খয়ের খাঁ গিরিতে কোন পার্থক্য ছিল কি? এমনকি ১৯৭২ সন থেকে ১৯৭৪ সন অবধি সাংবিধানিক শাসনও কি রেষারেষি-কাড়াকাড়ি-মারামারি-হানাহানি বহুল ছিল না? অবশেষে 'বাকশাল' তো স্বৈর-স্বেচ্ছাতন্ত্র প্রতিষ্ঠারই উদ্যোগ-আয়োজন প্রসূন। বাঙলাদেশ সরকারের ইসলামি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাম্মিটে [Summit] যোগদান, আলীয়া মাদ্রাসায় কোটি টাকা দান, বাকশাল গঠন প্রভৃতি তো সংবিধানের চার নীতি লঙ্ঘনেরই সাক্ষ্য-প্রমাণ।

জাতি পরিচয় 'নির্বিরোধ, অবিতর্কিত, অবিসম্বাদিত দ্বিধা-দ্বন্দ্বহীন বিশ্বাস ও ভরসা যোগ্য করা আমাদের জাতীয় জীবনে গতি সঞ্চারের জন্যে, অগ্রগতি, প্রগতি ও প্রাগ্রসরতা দানের জন্যে আবশ্যিক ও জরুরী। তিনটে ভিন্ন ধারার মন-মত-সিদ্ধান্ত চালু যে রয়েছে তাতে সন্দেহ করা আত্মপ্রতারণাই নামান্তর মাত্র। আওয়ামী লীগার কম্যুনিস্টরা মনে জানে ও বলে যে তারা 'বাঙালী' কিন্তু আওয়ামী লীগারের মধ্যে সবাই সেক্যুলার যে নয়, তা হিন্দু বিদ্বেষের ও মন্দির ভাঙার ক্ষেত্রে নয় কেবল, সংবিধানে বিসমিল্লাহ সংযোজনের ও এরশাদের রাষ্ট্রধর্মরূপে ইসলাম গ্রহণকালেও তাদের প্রতিবাদী ভূমিকার মৃদুতা ও ক্ষীণতাই এবং পরিণামে স্বীকার করে নেয়াই তার প্রমাণ। সুদূরপ্রসারী মারাত্মক কিংবা বৈনাশিক প্রভাব পড়েছে ও পড়ছে জনগণমনে এ শাস্ত্রসাপেক্ষ রাজনীতিক মতের-পথের প্রাবল্যে। সংবিধান 'বিসমিল্লাহ' অঙ্কিত হওয়ার ফলে ধর্মমতভিত্তিক রাজনীতিক দল গড়ে উঠল, পুনরুজ্জীবিত হল মুসলিম লীগ, ডেমোক্রেটিক লীগ, জামায়াতে ইসলামির রূপান্তর ঘটল উগ্র রাজনীতিক দলরূপে, জন্ম নিল হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীস্টান পরিষদ, তফসিলী ফেডারেশন ইত্যাদি ছড়াল সম্প্রদায় চেতনার বীজ ও বিষ। আজকের মৌলবাদ যে জাতীয় জীবনের বা রাষ্ট্রিক জীবনের প্রধান সঙ্কট-সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে—ও বিষ তো বিসমিল্লাহ যোজনের সঙ্গে উপ্ত ও উদ্ভূত হয়েছে। জাতি পরিচয় দৈশিক হবে, কি শাস্ত্রিক হবে, অথবা জাতিসত্তাভিত্তিক হবে কি রাষ্ট্রিক হবে, তার চিরকেলে মীমাংসার উপরই আমাদের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রিক জীবনে উন্নতি-অবনতি, উৎকর্ষ-অপকর্ষ, বৃদ্ধি ও ক্ষয় সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে। কেননা এর মীমাংসিতরূপের উপরই নির্ভর করছে আমাদের দৈশিক রাষ্ট্রিক জীবনের ঐক্য সংহতি সহযোগিতা সহাবস্থান কিংবা বিরোধ-বিবাদ-অসংযম-অসহিষ্ণুতা আর রেষারেষি-কাড়াকাড়ি-মারামারি-হানাহানি প্রসূন সাম্প্রদায়িকতা।

আমরা স্কুলে-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ার নামে প্রশ্নোত্তরে পরীক্ষা-সমুদ্র উত্তরণের জন্যে যা শিখি, জানি ও বুঝি তাতে আমাদের মনে-মননে জ্ঞান-প্রজ্ঞা-যুক্তি-বুদ্ধি-রুচি-মনীষার প্রভাব পড়ে না। কেননা জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি-রুচি-বিবেক-বিবেচনাস্পৃহা ও শক্তি এ শিক্ষা ব্যবস্থায় আমাদের মগজে প্রবেশপথ পায় না, আমরা অপরিশীলিত অশিক্ষিতই থেকে যাই এবং যাচাই বাছাই করার যোগ্যতার ও গরজবোধের অভাবে আমরা আশৈশবের শাস্ত্রিক-পারিবারিক-সামাজিক-পারিবেশিক মগজধোলাইজাত বিশ্বাস-সংস্কার চালিত জীবনই পোষমানা প্রাণীর মতো যাপন করি দৃঢ়প্রত্যয়ে ও যথাসাধ্য নিষ্ঠায়। অবশ্য যৌবনে ও প্রৌঢ়ত্বে আচার আচরণে শৈথিল্য আসে, নীতি-নিয়মও হয় লংঘিত। ফলে বার্ধক্যে জরা-জড়তা-জীর্ণতা এলে জাগে বৃথা অনুশোচনাও।

মৌলবাদীর পরোক্ষ প্রভাবে সাধারণের মনে আরো একটি নতুন উপসর্গ দেখা দিয়েছে দেখতে পাই, আগে যারা অতিসহজে মুক্তিযুদ্ধ প্রভাবে ও স্বাধীনতাপ্রাপ্তির আনন্দে ও গৌরবে সহজে সানন্দে বলে উঠত 'আমি বাঙালী' তাদের কেউ কেউ এখন বলতে চায় 'আমার প্রথম ও প্রধান আনুগত্য আল্লাহর প্রতি, দ্বিতীয় ও পার্থিব আনুগত্য মাটির প্রতি। কাজেই আমি আগে মুসলমান বা হিন্দু এবং পরে অবশ্যই বাঙালী।' অতএব এরা হিন্দু বা মুসলিম বাঙালী, অন্য অনেকে বিশেষ করে কম্যুনিস্টরা, নিরীশ্বরেরা এবং অধিকাংশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজনীতিসচেতন আওয়ামী লীগারেরা এখনো কেবল বাঙালী, আর সাধারণ আওয়ামী লীগারেরা বাঙালী হিন্দু বা মুসলিম বা বৌদ্ধ বা খ্রীস্টান। আর সাধারণ শাস্ত্রনিষ্ঠ হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রীস্টানরা ধার্মিক পরিচিতিতেই স্বস্থ। এদের মাতৃভূমি আছে বটে, তবে তা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়, এ জন্যেই এরা সহজে স্বদেশ স্বভূম ত্যাগ করে বিদেশে ডেরা গাড়ে।

আমরা জানি সেকালের পাকিস্তানিদের শোষণ-বঞ্চনার প্রতিক্রিয়ায় ও প্রতিবাদে প্রতিরোধপ্রয়াসরূপে আমাদের মধ্যে বাঙালীচেতনা জাগছিল, যা স্বাতন্ত্র্য, স্বার্থ ও বিচ্ছিন্নতা চেতনারূপে বর্ধিষ্ণু ও প্রকট হয়ে উঠছিল আওয়ামী লীগের প্রচারে-প্রচারণায় ও নেতৃত্বে উনসত্তরের গণআন্দোলনে ও মুক্তিযুদ্ধকালে এবং উনিশ শ' পঁচাত্তর সাল অবধি আওয়ামী বাকশালী শাসনকালে 'বাঙালী' জাতীয়তা অন্তরে এবং সাংবিধানিক স্বীকৃতিতে ও মর্যাদায় অঙ্গেও তুঙ্গে উঠেছিল সর্বার্থক ও সর্বাত্মক হয়েই। তারপরে মোস্তাক আহমদ বেতারকে রেডিয়ো, রাষ্ট্রপতিকে প্রেসিডেন্ট বানিয়ে, শেরওয়ানী পরে আর ইফতারে খেজুর ঢুকিয়ে দেশের বা রাষ্ট্রের উপর ইসলামি ওড়না বা চাঁদোয়া ঝুলালেন গায়ের জোরেই। শেখ মুজিবুর রহমান কৃপা বশে জ্ঞাতি রাজাকারদের ক্ষমা করেছিলেন। জিয়াউর রহমান অন্তরে ছিলেন পাকিস্তানি ও ইসলামীনিষ্ঠ, তাই তিনি রাজাকারদের নিয়েই শুরু করলেন রাজত্ব, সংবিধানকে দিলেন ইসলামি আবরণ। তাঁর পরবর্তী জঙ্গী নায়ক ছিলেন পাকিস্তানপন্থী ও ইসলামের রাজনীতিক প্রয়োগের ফায়দায় দৃঢ় আস্থাবান। এদের অর্থাৎ জিয়ার ও এরশাদের আশ্রয়ে ও প্রশ্রয়ে মৌলবাদীরা হয়ে ওঠে উচ্চাশী ও আত্মপ্রত্যয়ী। আজকের জামায়াত, শিবির ও গোলাম আজম এ দুই জঙ্গী নায়কের অপদান।

সত্য বটে বাঙলাভাষী মাত্রই সত্তায় ও জাতিচেতনা নিখুঁত নিখাদ বাঙালী এবং তারাই 'বাঙলাদেশ' নামের রাষ্ট্রে শতে আটানব্বই কিংবা নিরেনব্বই জন। কিন্তু আধুনিকতম ধারণায় যেহেতু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অধিবাসীমাত্রই জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-গোত্র-অঞ্চল আর্থিক-শৈক্ষিক অবস্থা ও অবস্থান নির্বিশেষে সম অধিকারের নাগরিক, সেহেতু অধিজনের কোন বিশেষ সুযোগ সুবিধে অধিকার থাকা বা রাখা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বাঞ্ছিত নয়, তাই যতই স্বল্পসংখ্যক হোক না কেন গারো-সাঁওতাল-রাজবংশী-কোচ-চাকমা-মার্মা-ত্রিপুরা প্রভৃতি তথাকথিত আদিবাসী বা উপজাতি স্ব স্ব জাতিসত্তায় স্বস্থ থেকেও বাঙালীর মতোই স্বাধিকারে সুপ্রতিষ্ঠিত থেকেই রাষ্ট্রিক পরিচয়ে 'বাঙলাদেশী' রূপে পরিচিত হবার অধিকারী। এ তাৎপর্যে বাঙালীরাও বাঙলাদেশের অধিবাসীরূপে বহির্বিশ্বে বাঙলাদেশী। অতএব, বাঙলাদেশ রাষ্ট্রের বাঙালীরা বাঙলাভাষীরা সত্তায় বাঙালী এবং রাষ্ট্রিক পরিচয়ে এখন বাঙলাদেশী, যেমন আগে ছিল ব্রিটিশ ভারতীয় এবং পাকিস্তানি। স্বেচ্ছায় ত্যাগ না করলে শাস্ত্রিক, গৌত্রিক ও ভাষিক সত্তার পরিবর্তন বিলুপ্তি ঘটে না। এ তত্ত্বে, তথ্যে ও সত্যে কোন বিরোধ বিতর্ক বিবাদের কারণ ছিল না, কিন্তু প্রথম স্বেচ্ছায় এক অভিসন্ধি বশে এ চেতনার পুষ্পে কীট ঢোকালেন জিয়াউর রহমান, হিন্দুদ্বেষণা বশে তিনি বাঙলাদেশের বাঙালী মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্য-সচেতন করার লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু বাঙালী থেকে পার্থক্যজ্ঞাপক পাকিস্তানি স্থলে 'বাঙলাদেশী' জাতীয়তা চিহ্নিত করলেন। আদি ও প্রান্তবাসী নাগরিকদের স্মরণে রেখে নয় অবশ্য, রাষ্ট্রিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তার ইসলাম প্রীতি ছিল সুপ্রকট। কিন্তু এ পরিভাষা আকস্মিকভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুগপৎ ও একাধারে যৌক্তিক বলেও অধিক ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রযোজ্য ও গ্রহণযোগ্য বলে স্বীকৃত হল ধীর বুদ্ধির ও স্থির বিশ্বাসের লোকের কাছে। এ বাঙলাদেশী জাতীয়তা জিয়াউর রহমানের ক্ষতিকর অভিসন্ধি প্রসূন বলেই রাজনীতিক প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী দলের পক্ষে তার স্বকালীন রাজনীতিক স্বার্থে তা স্বীকার করা সম্ভব হচ্ছে না। এভাবেই আরো বহুকাল রাজনীতিক মতবাদীদের মধ্যে 'বাঙালী' ও 'বাঙলাদেশী' জাতীয়তা নিয়ে দ্বেষ-দ্বন্দ্ব, বিরোধ-বিবাদ চলতে থাকবে তাদের স্ব স্ব রাজনীতিক তথা ভোটযুদ্ধে জয়-পরাজয়ের ফায়দা ওঠানোর লক্ষ্যে। অতএব, এর কোন আপাত মীমাংসা নেই, যদিও নিরপেক্ষদের ও ইতিহাস লেখকদের চোখে এর মধ্যে তত্ত্ব তথ্য ও সত্যগত কোন স্থায়ী জটিলতা নেই, রাজনীতিক ও মনস্তাত্ত্বিক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-দ্বেষ এর মধ্যে আরো অনেক কাল হয়তো তাজাই থাকবে বর্তমান হয়ে। নিরপক্ষে দৃষ্টিতে বিশ্বময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বাঙলাভাষীমাত্রই রাষ্ট্রিক ও ভৌগোলিক পার্থক্য ও ব্যবধান সত্ত্বেও জাতিসত্তায় নিখাদ নিখুঁত বাঙালী, যারই মাতৃভাষা বাঙলা সেই বাঙালী, এতে জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-নিবাস-সংস্কৃতির পার্থক্য স্বীকৃত নয়। বিশ্বে বিশ কোটি বাঙালী।

১৯৪৭ সনে আমরা স্বাধীন হয়েছিলাম কি নতুন করে উত্তর পশ্চিম ভারতীয় মুসলিমদের ঔপনিবেশিক শাসনের খপ্পরে পড়েছিলাম দ্বিজাতিতত্ত্বের ফাঁদে বা মোহে পড়ে—এ সংশয় রয়েছে কারো কারো মনে, অনিরুদ্ধ নামে কলাম লেখক প্রখ্যাত প্রবীণ সাংবাদিক পণ্ডিত সন্তোষ গুপ্তও প্রশ্ন তুলেছিলেন আমার একটি লেখার সূত্রে, আমি সংবাদপত্র মাধ্যমে এর যে ব্যাখ্যা দিয়েছিলাম তা এখানে উদ্ধৃত করে আমার কথা শেষ করছি।

AMARBOI.COM

প্রসঙ্গ অনিরুদ্ধের উপসম্পাদকীয়—
১৪ই এপ্রিল ১৯৯১ সন

'কাহারে করিবে রোষ/কার পরে দিবে দোষ'

আহমদ শরীফের প্রবন্ধের সারকথা বা তাৎপর্য ছিল এই, 'দ্বিজাতিতত্ত্ব' অঙ্গীকার করেই মুসলিমরা হিন্দুপীড়নমুক্ত স্বাধীন মুসলিম নিবাস বা রাষ্ট্র দাবি করেছিল। কাজেই ১৯৪৭ সনের ১৪ই আগস্টে পাকিস্তানে মুসলিমরা স্বাধীন হয়েছিল আর পাকিস্তানে থেকে যাওয়া অমুসলিমরা হয়েছিল বাস্তবে জিম্মি। তারাই ১৯৭১ সনের ১৬ই ডিসেম্বর মুসলিমদের মতোই বাঙালী সত্তা অঙ্গীকার করে প্রথম স্বাধীন বাঙালী বা পুরো নাগরিক হন। অনিরুদ্ধ মুসলিম ছিলেন না, কিন্তু পাকিস্তানে বাস করছিলেন, কাজেই ১৯৪৭ সনে তিনি স্বদেশে স্বঘরে স্বাধীন ছিলেন না, জিম্মি-প্রায় ছিলেন। যেমন অকংগ্রেসী বা মুসলিম লীগারেরা ভারতে ১৯৪৭ সনে স্বাধীন হয়নি। হিন্দু ভারতে জিম্মি বলে ভেবেছে নিজেদের। এ জন্যেই মুসলিমরা ভারত এবং হিন্দুরা পাকিস্তান ত্যাগ করছিল। এ বাস্তব ও মনস্তাত্ত্বিক কারণেই তাঁর 'স্বাধীনতা' শুরু হয়েছে ১৯৭১ সনের ১৬ই ডিসেম্বরে। আর ১৯৭১ সন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকেই বাঙালী মুসলিমরা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করছে যে দ্বিজাতিতত্ত্ব ভুল ছিল। এ উচ্চারণ আন্তরিক হলে তারা একক ভারতীয় জাতীয়তায় আস্থাবান হয়ে তারাও 'ইউনিয়নভুক্ত হতে চাইত। কোন বাঙালী মুসলিম কিন্তু তা চায়নি, স্বতন্ত্র অস্তিত্বে স্বাধীন রাষ্ট্রই চেয়েছে। অতএব বদর উদ্দীন উমরের মন্তব্যেই বা ভুল কোথায়?

আজকাল তো মুসলিম বাঙালী ও হিন্দু বাঙালীই দেখি, শুধু বাঙালী তো দুর্লভ। বরং নাস্তিক আহমদ শরীফ ও বদরউদ্দীন উমরই তো কেবল খাঁটি বাঙালী।

বিনয় সম্ভাষণান্তে

নিবেদক আহমদ শরীফ

তথ্যঋদ্ধ ইতিহাসই মুক্তিসনদ

ব্রিটিশ পূর্বকালে হিন্দুর ও দেশজ মুসলিমের মধ্যে কোন বিরোধ-বিদ্বেষ ছিল না, শাস্ত্রিক আচার-আচরণে পার্থক্য ছিল। একের ধর্মের ও আচার-আচরণের প্রতি অপর ধর্মবিশ্বাসীর মনের গভীরে ছিল অনাস্থা ও অবজ্ঞা। কিন্তু এসব মনের গভীরে সুপ্ত ও গুপ্ত থাকত। প্রকাশ্যে দ্বন্দ্বে-দ্বেষে-অবজ্ঞায় বাস্তবায়িত হত না, হওয়ার উপায়ও ছিল না। দেশজ মুসলিমরা ছিল নিম্নবর্ণের, নিম্নবর্গের, নিম্নবিত্তের হিন্দু-বৌদ্ধজ। মুসলিম হয়েও তারা অজ্ঞ অনক্ষর প্রায়-নিঃস্ব নিরন্ন ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ বৃত্তিজীবী ছিল। তবু তাদেরও নিত্যদিনের জীবনযাত্রায় সেবার ও সামগ্রীর যোগানদার ছিল হিন্দু তাঁতী-কামার-কুমার-নাপিত-ধোপা-মুচি-মেথর-হাড়ি-ডোম-বাগদী-চাঁড়াল-বৈদ্য-ওঝা-কায়স্থ এবং অর্থলগ্নিকার মহাজন। আর শাসক-প্রশাসক ছিল সেনানী ফৌজদার, আমীর, রাজা, কানুনগো, মজুমদার, কায়স্থ, পাটোয়ারী, পাকরাশী, খাস্তগীর, দস্তগীর, সেহলানবিশ, খানসবিশ, মহলানবিশ, দেওয়ান, মুৎসুদ্দী, গোমস্তা, চৌধুরী, আমিন, মুনশী, দারোগা, থানাদার, সাধুখাঁ, লস্কর, মৃধা, বন্দুকসি, তীরন্দাজ, কামানচি প্রভৃতি সব হিন্দুরা। উপরে ছিল তুর্কী-মুঘল-ইরানী-ইরাকী ও মধ্য এশিয়া থেকে আগত বৃত্তি ও বেতনজীবী সৈনিক সেনানী এবং দরবারী আমীর। এরা ক্বচিৎ এদেশে স্থায়ী নিবাসী হত। অবসর প্রাপ্তরা স্বদেশেই ফিরে যেত। কেউ কেউ উত্তরভারতে রাজধানীতে থেকে যেত। বাঙলা জলাভূমি ছিল বলে এর আবহাওয়া উত্তর ভারতীয় হিন্দু-মুসলিমদের এবং বিদেশাগতদের কায়িক-মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার অনুকূল ছিল না, এজন্যে বাঙলাকে ওরা বলত 'দোজখ পুরে নেয়ামত' ভোগ্যসামগ্রীপূর্ণ দোজখ। অতএব গাঁয়ে গাঁয়ে হিন্দু-মুসলিমের বিরোধ ছিল না, মুসলিমরা দরিদ্র অজ্ঞ-সংখ্যালঘু এবং হিন্দুশাসিত ও সেবিত ছিল বলেই, শহরে হিন্দু-মুসলিমে বিরোধ-বিদ্বেষ প্রকাশ্য হতে পারেনি, সুপ্ত ও লুপ্ত ছিল, হিন্দু সংখ্যা গুরু হওয়া সত্ত্বেও সংখ্যালঘু মুসলিম তুর্কী-মুঘলরা শাসকগোষ্ঠী ছিল বলেই। ব্রিটিশ সরকার ভেদনীতির প্রয়োগে দুই ধর্মাবলম্বীকে বিবদমান ও বিচ্ছিন্ন রেখে ব্রিটিশ শাসন-শোষণ নিরুপদ্রব, নিরাপদ, নির্বিঘ্ন রাখার সফল প্রয়াস চালিয়েছে। প্রাক্তন শাসক তুর্কী-মুঘলের তথা মুসলিমের দুঃশাসনের, হিন্দু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্যাতনের, হিন্দুর ধর্ম কাড়ার, হিন্দু নারীহরণের ও ধর্ষণের, হিন্দুর মন্দির ভাঙার সব বানানো বয়ান ইতিহাস রচনার নামে চালাতে থাকেন জেমস মিল, এলিয়ট, ডাওসন প্রমুখ সব তথাকথিত ইংরেজ ঐতিহাসিকরা। হিন্দু তাদের বয়ান আক্ষরিক সত্যরূপে গ্রহণ করে দেশজ ও বিদেশাগত মুসলমান নামের সবার প্রতি ক্ষোভে, ক্রোধে, ঘৃণায় এবং প্রতিশোধ বাঞ্ছায় অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। শিক্ষিত হিন্দু-মন থেকে তা আজো মুছে যায়নি। অন্য দিকে বাঙলার অনক্ষর নিঃস্ব-নিরন্ন ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ পেশাজীবীরা ব্রিটিশ আমলে রইস তথা শিক্ষিত খানদানী উর্দুওয়ালা মতলববাজ নেতাদের প্ররোচনায় ও উস্কানীতে বিভ্রান্ত হয়ে ভাবতে থাকে যে তারা প্রাক্তন তুর্কী-মুঘল বাদশাহর জ্ঞাতি। অতএব, তারা ধনী, মানী ও শিক্ষিত ছিল। ব্রিটিশ আমলেই কেবল হিন্দু ও ব্রিটিশেরা আঁতাত করে ফারসী তুলে দিয়ে মুসলিমদের অজ্ঞ-অনক্ষর এবং তাদের চাকরিচ্যুত করবার অভিপ্রায়ে ইংরেজীকে প্রশাসনের ভাষারূপে চালু করে তাদের আয়-উন্নতির ও শিক্ষার পথ রুদ্ধ করে দিয়ে ক্রমে অর্থ-সম্পদ রিক্ত করে তুলল। তারা রিক্ত হল আর হিন্দুরা সে অর্থসম্পদে হল ঋদ্ধ।

পরে হিন্দুরা স্বাধীনতাকামী হয়ে উঠলে ব্রিটিশ সরকার মুসলিমদের প্রতি কৃপা-করুণা ও সহানুভূতি দেখাতে শুরু করে। ফলে ব্রিটিশপূর্ব প্রাক্তন শাসকগোষ্ঠীর ও তাদের স্বধর্মীর প্রতি হিন্দু যেমন ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ ও বিদ্বিষ্ট হয়ে ওঠে, ব্রিটিশ আমলের মুসলিমরা তেমনি সমকালীন হিন্দু প্রতিবেশীকে শোষক-পীড়করূপে জেনে ও মেনে হিন্দুকেই পয়লা নম্বরের শত্রু বলে জানল। ভারত বিভক্তির মূলে ছিল ব্রিটিশ কারসাজিজাত ভেদনীতিরই সাফল্য। তারপরেও কিন্তু পাকিস্তানে-ভারতে এবং ভারতের প্রত্যক্ষ সাহায্যে সৃষ্ট বাঙলাদেশে হিন্দু-মুসলিমে বিদ্বেষ-বিবাদ ঘোচেনি। পারস্পরিক বিদ্বেষ-বিবাদ-অবজ্ঞা দুষ্টক্ষতের মতো রক্তক্ষরা প্রাণহরা এবং মনস্তাত্ত্বিক আধিরূপে তাজাই রয়েছে।

আশার ও আশ্বাসের আলো ও স্বস্তির কথা এই, আজকাল গবেষকরা ইংরেজরচিত ইতিহাসকে আর আক্ষরিক সত্যরূপে গ্রহণ করেন না, তাঁরা গবেষণালব্ধ সত্য ও ব্যাখ্যা দিয়ে ভারতের ও বাঙলার নতুন ইতিহাস রচনায় প্রয়াসী হচ্ছেন ও হয়েছেন। তবে আরো অনেক সময় লাগবে অতীতকে প্রায় নির্ভেজাল ইতিবৃত্তে পরিণত করতে। তবু এর মধ্যেই সিরাজুদ্দৌলাহ, টিপু সুলতান প্রমুখ সম্বন্ধে অনেক তথ্য বের হয়েছে, এঁদের চরিত্রে আরোপিত অনেক বানানো কলঙ্ক গায়েলাগা ধূলির মতো উবে যাচ্ছে। পুরোনো রাজধানীগুলোতে হিন্দুবাসিন্দার আধিক্যই প্রমাণ করে যে হিন্দু শাসিত ও পীড়িত হয়নি বরং শাসন-প্রশাসনের অপরিহার্য সহায় চাকুরে ছিল। শেরশাহ থেকে আওরঙ্গজেব অবধি সব সুলতানেরই অধিকাংশ সেনাপতি ছিল হিন্দু। হিন্দু সভাসদও কম ছিল না কোন দরবারে। আর কোন গ্রামেও জোরজুলুমের মাধ্যমে ইসলামে কাউকে দীক্ষিত করা হয়নি, ভারতের প্রায় সব গ্রামেই হিন্দু-মুসলিম এপাড়ায়-ওপাড়ায় বাস করে, আর উঁচুবর্ণের হিন্দুর থেকে দীক্ষিত মুসলমান সারা ভারতের সর্বত্রই বিরল। এতেই বোঝা যায় জোরজুলুম করে ইসলামে দীক্ষা দেয়া হয়নি কোন পুরো গ্রামের, চাকলার বা এলাকার লোককে। জোরে-জুলুমে হিন্দুদের দীক্ষিত করলে হিন্দুরা কি সংখ্যাগুরু থাকত? তা ছাড়া ভারতের সর্বত্র হাজার খানেক স্বাধীন ও সামন্ত হিন্দুশাসিত রাজ্যও ছিল। এখানে কয়েকটি তথ্য পরিবেশন করেই এ লেখা শেষ করব।

ক. 'তারিখে বাঙ্গালায়' সলিমুল্লাহ বলেছেন, মুর্শিদকুলি খাঁ ইজারাদার হিসেবে কেবল হিন্দুকেই নিয়োগ করতেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খ. 'তারিখে বাঙ্গালায়' এও বলা হয়েছে যে মুর্শিদকুলি খাঁ উচ্চপদেও হিন্দুদের নিয়োগ করতে থাকেন।

গ. সিরার-উল-মুতাখখারিনে এসব তথ্যের সমর্থন মেলে, এ ইতিহাস গ্রন্থে উচ্চপদে হিন্দু নিয়োগপ্রথা মুর্শিদ কুলিখানের আমল থেকে পরবর্তী নওয়াবরাও চালু রাখেন বলে ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন উল্লেখ করেছেন।

ঘ. দেশজ মুসলিমদের বর্ণ ও বৃত্তি ধর্মান্তরিত হবার পরেও অপরিবর্তিত ছিল। অধিকাংশ মুসলিম মূলত এ দেশীয় অমুসলমানের উত্তরপুরুষ।

ঙ. খানদানী উর্দুভাষীরা পলাশী-বক্সার যুদ্ধের পরে বাঙলা ত্যাগ করে।

চ. সৈন্যবাহিনী ও রাজস্ব বিভাগ মুসলিমদেরই অধিকারে ছিল বলে W. W. Hunter বলেছেন বটে, কিন্তু তা সত্য নয়, সৈন্যবিভাগে হিন্দু সৈন্য থাকতই। সৈন্যবিভাগে গোড়া থেকেই দেশী পদাতিক নিয়োগ করা হত। আর রাজস্ব বিভাগে দেশী রাজস্ব আদায়কারীই [মুখ্যত হিন্দু মজুমদার, কানুনগো, আমিন, দেওয়ান, মুৎসুদ্দী, গোমস্তা, নায়েব] নিযুক্ত হত, মহারাজ নন্দকুমার বাঙলার শেষ দেওয়ান।

ছ. মুঘল শাসনের অবসানকালে গোটা ভারতের অধিকাংশ অঞ্চল ছিল পরোক্ষ শাসনে, স্বাধীনভাবে শাসন করতেন করদ রাজা, সামন্ত ও জমিদারেরা। তাই ১৯৪৭ সনের পরে ৭৮১টি করদ শাসকের রাজ্য ভেঙে ভারত ইউনিয়ন গড়ে ওঠে, পাকিস্তানে ঘটে কয়েকটি সামন্তরাজ্যের বিলুপ্তি। অতএব দেখা যাচ্ছে তুর্কী-মুঘলরা প্রত্যক্ষভাবে শাসন-শোষণ-পীড়ন চালাতে পারেইনি।

জ. ব্যক্তিগতভাবে বিদ্রোহী সামন্ত জমিদার জায়গীরদার হিন্দু হয়তো জান-মাল-গর্দান হারিয়েছে তুর্কী-মুঘল শাসকের হাতে, কিন্তু হিন্দুমাত্রই পীড়িত-নির্যাতিত হবার কারণ ছিল না। বস্তুত তেমন কোন ঘটনার সাক্ষ্য প্রমাণ মেলে না।

ঝ. পরিত্যক্ত ও জীর্ণ বা ভাঙা মন্দিরের পাথর কুসংস্কারমুক্ত মুসলিমরা মসজিদ নির্মাণে ব্যবহার করেছে, কিন্তু হিন্দুর পাড়ার পূজা-উপাসনামন্দির ভেঙে তার পাথর নিয়ে মুসলিমদের কোন মসজিদ নির্মাণের সাক্ষ্য প্রমাণ নেই। প্রজাসমাজের উপর এমনি জোরজুলুম চালিয়ে বেশিদিন রাজত্ব করা যায় না। আমরা অবশ্য আগেই বলেছি শাসন-প্রশাসন মুখ্যত প্রায় গোটা তুর্কী-মুঘল ভারতে হিন্দুর হাতেই ছিল তৃণমূল স্তরেও।

ঞ. বিদ্রোহী রাজা-জমিদার-জায়গীরদার-সামন্ত মন্দিরাশ্রিত হলেই কেবল সরকারী সৈন্যরা মন্দিরে প্রবেশ করেছে, সম্পদ লুট করেছে ও মন্দির-মূর্তি ভেঙেছে। যেমন, আলাউদ্দীন হোসেন শাহ [১৪৯৩-১৫১৯] উড়িশ্যা অভিযানে দেউল-দেহারা ভেঙেছিলেন। এমনি বর্ণনা রয়েছে 'নিরঞ্জনের রুস্মা'তেও।

ট. ইংরেজী শিক্ষা চালু হওয়ার পূর্বে হিন্দুরা ব্রিটিশ কৃপাপুষ্ট ও অনুগত হয়েও কালাপানি পাড়ি দিতে রাজি ছিল না, তাই মুসলিম আজিমুল্লাহ ও এহতেশামউদ্দীনই প্রথম বিলেত যান এবং মুসলিম শিক্ষকও তাতে হেলিবারি কলেজে অধ্যাপক পদ সাগ্রহে গ্রহণ করেন। আর ওয়াহাবী আন্দোলনের নেতা সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী গোড়াতে ব্রিটিশ বিদ্বেষী ছিলেন না, বরং কোলকাতায় এসে তিনি কোম্পানি সরকারের সংবর্ধনা নিয়েছিলেন। কাজেই বোঝা যাচ্ছে পলাশী যুদ্ধে নওয়াবের পরাজয় তখনো দৈশিক জাতীয়তাবোধের ও জন্মভূমিকে মাতৃভূমিরূপে গ্রহণের চেতনার অনুপস্থিতিতে কোন হিন্দু-মুসলিমকেই বিচলিত করেনি, একে মালিকের ভূমি বা শাসকের শাসনক্ষমতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হারানোর মতো করেই ব্যক্তিক বা শাহ-শামন্তের নিতান্ত পারিবারিক বিপর্যয় হিসেবে দেখা হত। ফলে মুসলিমরা স্বধর্মীর বাদশাহী হারানোকে জাতীয় ক্ষতি বলে মনে করেইনি। কাজেই ব্রিটিশের প্রতি ক্ষোভ, ক্রোধ, বিদ্বেষ ও ঘৃণাবশেই মুসলিমরা ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণে বিরত থাকে বলে যে জনপ্রিয় কিস্‌সা তথ্যের আকারে হিন্দু-মুসলিম সমাজে আজো চালু রয়েছে তার কোন সাক্ষ্য প্রমাণ নেই। আসলে উচ্চবিত্তের খানদানী পরিবারের বিরলতা বাঙালী মুসলিম সমাজে যে-কোন ধরনের শিক্ষা বিস্তারের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কেননা হিন্দু-বৌদ্ধ যে-শ্রেণী থেকে দেশজ মুসলিমের সৃষ্টি তাদেরও শিক্ষার ঐতিহ্য ছিল না। এক্ষেত্রে Robert Orme-র উক্তিই যথার্থ The moors of Indostan may be divided into two kinds of people differing in every respect..... under the first are reckoned the descendants of the conquerors. The second rank of moors comprehends all the descendants of converted, a miserable race as none but the miserables of the gentoos castes are capable of changing their religion. কাজেই এদের মধ্যে শিক্ষার নয়, সাক্ষরতার ঐতিহ্যও না থাকার কথা। আর একালের এক বিদ্বানের সিদ্ধান্তই যথার্থ বলে মেনে নেয়া চলে। এ. আর. দেশাইয়ের মতে, The upper strata of the Muslim community in the pre-British period, were, on the Whole, divorced from mediaval trade or money-landing and were mainly engaged in military and administrative careers. Farther, they predominantly resided in northern India which came under British rule much later. The vast Muslim population of Bengal mainly belonged to the poorer classes. Hence a modern intelligentia, a modern educated middle class and a bourgeoisie on a substantial scale sprang from within the Muslim community later than from within the Hindu community.[১০]

ঠ. আরো একটি বিশেষ তথ্য ও সত্য সদা স্মর্তব্য যে বাঙলার দেশজ মুসলিমদের মতো ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের বাসিন্দারা ব্রিটিশ আমলেই ইংরেজী শিক্ষায় হিন্দুদের চেয়ে এগিয়েছিল। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে মুসলিমের সংখ্যা শতে ১০/১২ জনের বেশি ছিল না, তবু সরকারী চাকরিতে ওদের সংখ্যা অধিজন হিন্দুর চেয়ে বেশি ছিল। যেমন ১৮৬১ সনে বাঙলা সরকারের মোট চাকুরের সংখ্যা ছিল ২১১১। এদের মধ্যে—

ক. য়ূরোপীয় ছিল ১৩৩৮

খ. হিন্দু ছিল ৬৮১

গ. মুসলিম ছিল ৯২

অথচ গোটা বাংলায় ১৯১১ সনে মুসলিম জনসংখ্যা দাঁড়ায় শ'তে ৫২.৭ ভাগ[১১] কিন্তু ১৮৭১ সনে তাদের সংখ্যা ছিল শ'তে ৩২ জন[১২] মাত্র। এদিকে ১৮৬১ সনে উত্তর প্রদেশে [তখনকার উত্তর পশ্চিম প্রদেশে] চাকুরের সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ :

ক. য়ূরোপীয় ৬০

খ. হিন্দু ১৭৮

গ. মুসলিম ১৮২

অথচ উক্ত প্রদেশে মুসলিম জনসংখ্যা শ'তে পনেরো জন মাত্র[১৩], দক্ষিণ ভারতেও[১৪] এমনি মুসলিম চাকুরের সংখ্যা জনসংখ্যার তুলনায় বেশিই ছিল। ১৮৭১-৮৬ সনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সর্বভারতীয় হিসেবে মুসলিম ছিল শ'তে ২৩ জন, কিন্তু চাকরিতে ছিল শতে ৩১.৩ ভাগ। এসব নানা তথ্য ভবিষ্যতে আরো আবিষ্কৃত হবে। ইতিহাসের উপকরণগুলো তথ্য ও সত্যভিত্তিক হবে, হবে বিশ্বাসযোগ্য ও স্বীকৃত। তখন হিন্দু-মুসলিম মনে ব্রিটিশ-ছড়ানো বিদ্বেষ বিষের ক্রিয়া হবে বিলুপ্ত।

তাছাড়া এ সময়টি পৃথিবীর জনসমাজেরও রাষ্ট্রিক মত-পথ-পদ্ধতির পরিবর্তনকাল। এ ক্রান্তিকাল পৃথিবীর সর্বত্র আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ই সৃষ্টি করছে, তার থেকে উদ্ধার পেতে হলে বিচ্ছিন্নতার ও স্বাতন্ত্র্য বুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে এ যন্ত্রনির্ভর সংহত ও ক্ষুদ্র পৃথিবীতে নিজেদের স্বার্থে সহিষ্ণুতায় সহযোগিতা সহাবস্থান করতে হবে, পশ্চিম য়ুরোপীয় রাষ্ট্রগুলো সম্পদে বাঁচার সে পন্থাই বেছে নিচ্ছে স্ব স্ব জাতের মানের, স্বাতন্ত্র্যের ও স্বাধীনতার অভিমান পরিহার করে। আমাদেরও বাঁচার গরজেই [SAARC] সার্কভুক্ত দেশগুলোর সংহতি ও মিলন আবশ্যিক ও জরুরী। অনাক্রমণ চুক্তির ও যৌথ বাহিনী গঠনের অঙ্গীকারে ও সম্মতিতেই কেবল রাষ্ট্রে জনগণের অশন-বসন-নিবাস-শিক্ষা-স্বাস্থ্য-চিকিৎসা প্রভৃতির চাহিদানুগ ব্যবস্থা হতে পারে। একাল বিচ্ছিন্নতার ও স্বাতন্ত্র্যের নয়—ঐক্যের, মিলনের, সমস্বার্থে সহিষ্ণুতার সহযোগিতার ও সহাবস্থানের।

AMARBOI.COM

তথ্যসূচী

১. History of Bengal, Vol II. pp. 403-04. D. U.
২. Ibid p. 454
৩. সিয়ার-উল মুতাখখারিন, ইংরেজী অনুবাদ, 2nd edition, calcutta, 1902, pp I, 279, 281, 386, [ডক্টর আবদুল কাদের অনূদিত বাঙলা গ্রন্থও দ্রষ্টব্য]
৪. Indian Islam. M. T. Titus. Oxford 1930 p. 169
৫. Encyclopaedia of Islam Vol. I [Leyden, 1913 caption Bengal Caption India p. 696.]
৬. Statistical Account of Bengal. W. W. Hunter. Vol IX, London, 1876. p. 60
৭. Indian Musalmans etc, W. W. Hunter. 3rd edition 1876 p. 59.
৮. History of Bengal, Vol II. D. U.
৯. Robert Orme, Historical Fragments of Mugal Empire
১০. A. R. Desai, 'Social Background of Indian Nationalism, 2nd edition, Bombay, 1954. p. 152
১১. W. W. Hunter. [Statistical Accounts] Calcutta, 1945 p 161
১২. Indian Muslims and the public service JASP. Vol. IX, No I, 1964. Dacca, p. 130, p. 89. Zafarul Alam & Raymad L. Feusen JASP. Dacca. Vol. IX. no. I June-85-149. 88-91
১৩. বিনয়েন্দ্র মোহন চৌধুরী, বিভক্ত ভারত, ১৩৫৬ সন, পৃ. ৫-৬।
১৪. Indian Muslims and the public service 1871-1981 by Zafarul Alam and Raymond L. Feusen JASP, Vol. IX, no. 1. June 1964. Dhaka pp. 85-149, 88-91.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সমদর্শিতা

একদিন দেশের রাষ্ট্রপতি এক সভায় বলেছেন, দেশের সব নাগরিক আইনের চোখে সমান এবং সব নাগরিকের রাষ্ট্রেও রয়েছে সমান অধিকার। আবার সেদিন ঢাকেশ্বরী মন্দিরে স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলী বলেছেন, দেশে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে রয়েছে, দেশের অধিজন সাম্প্রদায়িকতামুক্ত নয়, কাজেই উনজন হচ্ছে নানাভাবে সাম্প্রদায়িকতার শিকার। স্পীকার আরো বলেছেন বেশ জোর দিয়ে ও উচ্চকণ্ঠে যে শত্রুসম্পত্তি তথা অর্পিত সম্পত্তি আইন ও আদেশ বাতিল না করলে উনজনের প্রতি অবিচারের ও উনজনের অধিকার হরণের অবসান ঘটবে না। এ সরকারী বৈষম্যজ্ঞাপক আইন-কানুন আদেশ-আচরণ বিলুপ্ত না হলে সাম্প্রদায়িকতা, উনজনের অধিজনের উপর অনাস্থা, উনজনের জান-মাল-গর্দান বিষয়ক অনিশ্চয়তা বিপন্নতা কখনো ঘুচতেই পারে না। তাছাড়া আমাদের সংবিধান এখনো আধুনিক গণতন্ত্রের নীতি-আদর্শ বিরোধী স্বার্থ-ক্ষমতা ও অধিকার প্রতীক 'বিসমিল্লাহ' অঙ্কিত এবং এরশাদ আমলের ইসলামও এখনো রাষ্ট্রধর্ম। এ অবস্থায় বাঙলাদেশে অমুসলিমরা যে জিম্মি, তা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না। কাজেই বিসমিল্লাহপন্থী বি.এন.পি'র বাঙলাদেশী জাতীয়তাবাদ মানে কার্যত মুসলিম অধিবাসীর জাতীয়তাবাদ। এর অন্য বা ভিন্ন ব্যাখ্যামাত্রই হবে স্বেচ্ছাকৃত মতলবী অপব্যাখ্যা। প্রভু বা গৃহস্থ যদি উদার ও সংবেদনশীল হয় তা হলে গৃহপোষ্য পালিত হাঁস-মোরগ-গরু-ছাগল-মোষ-ভেড়া-বিড়াল-কুকুর এবং ক্ষেতমজুর ও অন্যান্য কাজের লোক নানা সুব্যবহার ও সুবিচার আর আদর পায়, কদর অবশ্য তাদের থাকে না। কিন্তু তাই বলে একে কোন প্রকারেই স্বাধিকারের সুপ্রতিষ্ঠা বলা যাবে না, কৃপা-করুণা-দয়া-দাক্ষিণ্যপুষ্ট সুখী প্রাণী বলা যাবে অবশ্য। তেমনি বাঙলাদেশে যদি অমুসলিমরা সুবিচার কৃপা-করুণা-আদর পায়, নির্ভয়ে বাস করার এবং জীবিকা অর্জনের সুযোগও পায়, তাহলেও তাদের মন থেকে জিম্মির হীনম্মন্যতা ঘোচে না এবং স্বঘরে, স্বভিটায়, স্বদেশে প্রবাসীর মতো সমনাগরিকত্ব না থাকার বেদনা ও ক্ষোভমুক্ত থাকতেই পারে না। মাঝে মধ্যে পদাধিকার সূত্রে আমাদের প্রধানমন্ত্রীও অমুসলিমদের প্রতি সমদর্শিতার ও সুবিচারের আশ্বাসবাণী উচ্চারণ করে থাকেন। কিন্তু কার্যত না 'বিসমিল্লাহ' না রাষ্ট্রধর্ম 'ইসলাম' সম্বন্ধে তাঁর মন-মত, চিন্তা-চেতনা ও সিদ্ধান্ত পরিব্যক্ত করেন না। ফলে সাঁওতাল, গারো, চাকমা, ত্রিপুরা, মার্মা, খ্রীস্টান, বৌদ্ধ, হিন্দু প্রভৃতি উনজনেরা সরকারের সমদর্শিতার সুবিচারের উপর আস্থা রেখে সরকারনির্ভর হওয়ার মতো ভরসা পাচ্ছে না। কেননা সামরিক বিভাগে তাদের কার্যত প্রবেশাধিকার নেই, পুলিস বিভাগেও তারা আনুপাতিকহারে তাদের প্রাপ্য চাকুরি পায় না। অন্যান্য বিভাগেও যেমন আদালতে হাকিমি বা অন্যান্য দফতরে কর্মচারীর পদে তাদের যোগ্যতানুগ নিয়োগ পায় না, সংখ্যানুগ মন্ত্রীপদও তাদের মেলে না। অমুসলিম যদি হয় এক কোটি, তা হলে বিশেষজ্ঞ হিসেবেও অন্তত তাদের ৪৪/৪৫ জন মন্ত্রীর মধ্যে চার/পাঁচজন মন্ত্রী থাকার কথা। রাষ্ট্রপতির বা স্পীকারের উনজনের উপকার করার মতো সাংবিধানিক কোন ব্যবস্থা নেই। কাজেই তাঁরা ভাষণে উনজনদের ন্যায্য কথা শুনিয়ে আপাতপ্রবোধ দিতে চেষ্টা করেন মাত্র। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিপরিষদ ও সরকার আর দলীয় সাংসদরা অমুসলিম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উনজনদের যথাপ্রাপ্য মিটিয়ে তাদের আপন করে নিতে পারেন। তা হলেই হবে বাঙালীর ও বাঙলাদেশবাসীর জাতীয়তা দৃঢ়ভিত্তিক ও সম্প্রীতি স্থায়ী এবং নির্বিরোধ নিঃসংশয় মনে সুনিশ্চিত পারস্পরিক আস্থার ভিত্তিতে একক জাতীয়তায় সংহত রাখা সম্ভব হবে। অধিজন মুসলিমরা তা হলে গাঁয়ে-গঞ্জে হুমকি-হামলায় অমুসলিমদের ত্রস্ত রাখবে না, দেশ ত্যাগে বাধ্য করবে না, অমুসলিমরাও অর্থসম্পদ বিদেশে পাচার করে নিশ্চিন্ত হবার প্রয়োজনবোধ করবে না। স্বদেশের মাটিকে ও মানুষকে, স্বঘরকে ও স্বভিটেকে আঁকড়ে থাকবে গভীর ভালোবাসায়।

এ কাজ সরকারের পক্ষে সহজ, বি.এন.পি সরকার যদি দেশ-কাল বিরোধী 'বিস্‌মিল্লাহ' ও রাষ্ট্রধর্ম বর্জন করে, সেক্যুলার সংবিধান গ্রহণ করে নির্বিশেষ মানুষকে কেবল মানুষ হিসেবে জানে ও মানে। মানুষের প্রথম ও শেষ পরিচয় যে কেবল মানুষ, আর কিছু নয়, মানুষের লক্ষ্য যে কেবল মনুষ্যত্ব মানবতা বা মানবিক গুণেরই বিকাশ সাধন ইহুদী-খ্রীস্টান-বৌদ্ধ-জোরাষ্ট্রীয়-জৈন-হিন্দু-মুসলিম শাস্ত্রিক পন্থায়, মানুষের লক্ষ্য যে ইহুদী-খ্রীস্টান-বৌদ্ধ-জোরাষ্ট্রীয়-জৈন-হিন্দু-মুসলিম থাকা নয়, মানুষ হওয়া— এ তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য যদি আমরা স্বীকার করি, তাহলে আমাদের অধিকাংশ জনগণের এবং সরকারের মনুষ্যসুলভ গুণাবলীর বিকাশ, উৎকর্ষ এবং সূক্ষ্মতা সাধন সহজে সম্ভব হবে। এ হচ্ছে কালের দাবি, প্রয়োজনের চাহিদা। সুরুচির, সংস্কৃতির ও মানবতার অভিব্যক্তি-বৈশ্বিক সম্পর্ক-সম্বন্ধের উন্নতির জন্যেও এ যুগে এ আবশ্যিক ও জরুরী—এর নামই সংস্কৃতিমানতা, সৌজন্য ও মনুষ্যত্ব বা মানবতা। আমাদের শিক্ষিত শহুরে জ্ঞান-প্রজ্ঞা-যুক্তি-বুদ্ধি, ভাব-চিন্তা-মনন-মনীষা সম্পন্ন ব্যক্তিরা এবং রাজনীতিকরা, ডাক্তার-উকিল-ইঞ্জিনিয়ার-শিক্ষক-ছাত্র-সাংবাদিক-আমলা-বেণে-বুর্জোয়া প্রভৃতি সবশ্রেণীর ব্যক্তিরা এবং সরকার কথাগুলো ভেবে দেখলে দেশের মাটি ও মানুষ উপকৃত ও উন্নত হবে বলে মনে করি। উল্লেখ্য যে আমাদের এ কথাগুলো আমাদের দেশের ও সমাজের ক্ষেত্রে নয় কেবল, দুনিয়ার সব রাষ্ট্রের প্রতিই কম-বেশি প্রযোজ্য। তাই এ আবেদন রইল দুনিয়ার প্রতাপে প্রবল কিন্তু মানবিকগুণে ক্ষীণ সব সরকারের ও অধিজনদের প্রতিও।

রূপে-স্বরূপে রাষ্ট্রিক বাঙলাদেশ

দেশের অধিকাংশ মানুষ অজ্ঞ-অনক্ষর এবং শহর থেকে দূরে গ্রামে স্থিত থাকায় শিক্ষিত জনগণের মানসসান্নিধ্য পায় না বলে তারা যথার্থ অর্থে প্রকৃতির কোলে লালিত প্রাকৃত জনই থেকে যায়। মূলত অবজ্ঞা জ্ঞাপক 'লোক' নামে এ অজ্ঞ অনক্ষর গ্রামবাসী এবং 'লোকলোর' পরিচয়ে তাদের মন-মনন ও জীবনাচার চিহ্নিত হয়। এদেরকে স্বাভাবিক মানুষ ভাবা হয় না। ফলে শিক্ষিতজনেরা মানুষ আর অশিক্ষিতজনেরা গান্ধীর হরিজন মার্কা 'লোক' নামে অভিহিত হয়। প্রকারান্তরে কিন্তু আমরা এই নামে আমাদের পূর্ব প্রজন্মের মানুষকেই নিজেদের অজান্তে অবমানিত করি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখনকার দিনে যদিও রেডিয়ো-টিভি, সিনেমা-ক্যাসেট প্রভৃতি যোগে রাষ্ট্রের ও বিশ্বের বিভিন্ন বিষয় মানুষের কানে আসে, চোখে পড়ে এবং মনে ধরে ও মর্মে লাগে, তবু ওগুলো ক্ষণিকের বিখণ্ড বিচ্ছিন্ন পারম্পর্যহীন ঘটনা বা সংবাদমাত্র। তাই ওগুলো তাদের জ্ঞানে পূর্ণতা দেয় না বলে মননে ধারাবাহিকতা এবং বোধে সুষ্ঠুতা আসে না, বরং তাদের মনে-মতে ও মননে খণ্ডতা-বিচ্ছিন্নতা ও অসম্পূর্ণতা জাত বিভ্রান্তি ও বিকৃতি বৃদ্ধি পায়।

আমাদের শহুরে শিক্ষিত রাজনীতিকেরা, বুদ্ধিজীবীরা, লেখকরা তাদের স্ব স্ব মন-মত-জ্ঞান-বুদ্ধি ও যুক্তি অনুযায়ী প্রচারণা চালিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে এদের মধ্যে বিভ্রান্তিকর ও বিকৃত মত-পথ সৃষ্টি করে। ফলে আমাদের জাতীয় জীবনের কোন ক্ষেত্রেই অধিজনসম্মত কোন নীতি-আদর্শ স্বীকৃত, গৃহীত ও বাস্তবায়িত হচ্ছে না; এর ফলে উনিশ শ সাতচল্লিশোত্তর কিংবা উনিশ শ বাহাত্তরোত্তর জাতীয় জীবনে আমরা দিশেহারা হয়ে শ্রেয়সের সন্ধানে, মানসিক ও আর্থিক মুক্তির সন্ধানে, উন্নতির পন্থার খোঁজে এদিক সেদিক ছুটোছুটি করেছি। গতির বা প্রগতির পন্থা পাইনি। কেবল লাটিমের মতো ঘুরেছি। এর ফলে আমরা আত্মরক্ষার ও আত্মোন্নয়নের নীতি-আদর্শ গড়ে তুলতে পারিনি। অথচ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে যুদ্ধবিধ্বস্ত য়ুরোপীয় রাষ্ট্রগুলো জাপান, চীন, এমনকি মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত বহুদেশ সুপরিকল্পিতভাবে আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বাণিজ্যিক, প্রাশাসনিক ও রাষ্ট্রিক জীবনে নির্দিষ্ট নীতি-নিয়মে, আদর্শে ও লক্ষ্যে চালিত করে, মানসিক ও ব্যবহারিক জীবনে সমকালীন গতির ও প্রগতির সঙ্গে তাল রেখে কিংবা আবিষ্কারে উদ্ভাবনে এবং উৎপাদনে ও নির্মাণে তার চেয়েও প্রাগ্রসর জীবন যাপন করছে।

আমাদের অপরিকল্পিত নির্লক্ষ্য শৈক্ষিক, আর্থিক এবং উৎপাদিত ও নির্মিত পণ্যের অপরিকল্পিত বাণিজ্যিক নীতির ফলে আমরা একটা বিশৃঙ্খল দিশেহারা আর্থিক ও রাষ্ট্রিক জীবন যাপন করছি। ফলে আমাদের মনের, মতের, মননের ও মনীষার এবং চেতনা-চরিত্রের কোন উৎকর্ষ ঘটে নি। ফলে আমাদের অজ্ঞ-অনক্ষর-নিঃস্ব নিরন্ন-দরিদ্র সাহস ও উদ্যমহীন জনগণ ভিক্ষাপ্রবণ, তাদের মধ্যেই যারা শক্তিমান ও সাহসী এবং ধূর্ত তারাও মিথ্যাভাষী এবং চৌর্যপ্রবণ। আর স্বল্পশিক্ষিত এবং শিক্ষিতদের যারা ধূর্ত শক্তিমান ও সাহসী তারা সর্বার্থক ও সর্বাত্মকভাবে নীতি-আদর্শহীন দুর্নীতিআশ্রয়ী স্বার্থবাজ। গাঁয়ে-গঞ্জে, হাটে-বাটে, শহরে-বন্দরে আমরা জীবন-জীবিকার ও শাসন-প্রশাসনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এদের সাক্ষাৎই পাচ্ছি। ফলে দেশের অর্থসম্পদ দু'চার লাখ লোকের ঘরে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে। তারা কালো জগতের, কালো বাজারে লেনদেন করেই ধনী ও মানী এবং খ্যাতি-ক্ষমতা দর্প-দাপটের অধিকারী। তাদের ঐশ্বর্যের প্রকাশ শহরে-বন্দরে, তাদের এই অসঙ্গত ধনস্ফীতি গোদের মতো সমাজ দেহের ও রাষ্ট্রশরীরের রোগচিহ্ন মাত্র, রাষ্ট্রের উন্নতির লক্ষণ নয়। একারণেই আফ্রিকার অনুন্নত ও দরিদ্রতর রাষ্ট্রেরও নীচে আমাদের রাষ্ট্রের স্থান। আমরা এমনি আত্মসম্বিৎ ও আত্মসম্মানহীন জীবনযাপন করি যে আমরা জাতীয় বা রাষ্ট্রিক জীবনে লজ্জা বা অপমানবোধ করি না। এজন্যেই আমরাও আমাদের জাতিক ও রাষ্ট্রিক স্তরে আমাদের ভিক্ষাজীবীদের মতোই নির্লজ্জভাবে উদ্যমহীন ও ভিক্ষাপ্রবণ। আমাদের বিদ্বানেরা ও আঁতেলরাও একই চারিত্রিক দোষে এন.জি.ও কৃপায় উপার্জনপ্রবণ ও বিদেশে রোজগার আর সেমিনারে উপস্থিতিপ্রবণ। ফলে আমাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজকের বাঙলাদেশ রাষ্ট্র বিশ্বের দরবারে একটি কৃপাজীবী উদ্যম-উদ্যোগহীন তথাকথিত স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রবিশেষ।

এমন রাষ্ট্রের বাইরে যেমন কোন মূল্য-মর্যাদা থাকে না, ভেতরেও তেমনি কোন নিয়ম-নীতিজাত শৃংখলা রীতি-পদ্ধতি বিরল হয়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে সর্বত্র চলে মাৎস্যন্যায়। এখানে যার ধনবল, জনবল, পেশীবল থাকে তারই অবাধে কাড়ার-মারার ও হানার অধিকার স্বীকৃত, সেই-ই যোগ্য বলে বিবেচিত। এখানে 'যোগ্যতমের উদ্‌র্বতন' সেই তাৎপর্যেই প্রযোজ্য। তাই 'জোর যার মুলুক তার' এখানে স্বীকৃত। এক কথায় জাঙ্গল বা আরণ্য নীতি-নিয়মই এখানে প্রবলভাবে প্রচল।

সামগ্রিক সামূহিক ও সামষ্টিক বিবেচনায় আমাদের জাতিক ও রাষ্ট্রিক জীবন হচ্ছে বন্ধ্যা ও অবক্ষয়প্রবণ। তাই আমাদের সম্মুখগতি নেই, নেই সৃষ্টিশীলতা কিংবা প্রগতিশীলতা। এ অবস্থা ও অবস্থান থেকে আমাদের জাতিক ও রাষ্ট্রিক জীবনে মুক্তি পেতে হলে আমাদের নতুন জগৎচেতনায় ও জীবনভাবনায় প্রবুদ্ধ হতে হবে।

সাধারণভাবে ব্যক্তিরও তিনটি অস্তিত্ববাচক পরিচিতি প্রয়োজন হয়। তারও নির্দিষ্ট নাম, নিবাস ও পেশা জরুরী বলে বিবেচিত হয়। জাতিক ও রাষ্ট্রিক জীবনেও এ পরিচয় আবশ্যিক। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমাদের আদৌ সুনির্দিষ্ট নাম মানসিক ও ব্যবহারিকভাবে নির্ধারিত হয়নি নানা ঐতিহাসিক, শাস্ত্রিক ও রাজনীতিক কারণে। আজকের এ মুহূর্তেও আমরা নানা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের শিকার। আমাদের বাঙলাভাষীদের মধ্যে অধিকাংশই আজো হিন্দু বা মুসলিম বাঙালী, অন্য অনেকেই বাঙালী হিন্দু বা মুসলিম। রাজনীতিসচেতন কিছু অংশ কেবল সেক্যুলার বাঙালী। ভিন্ন রাষ্ট্রের বাঙলাভাষীর থেকে পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষার রাজনীতিক মতলবে কেউ কেউ বাঙলাদেশী। যদিও বাঙলাভাষীরা রক্তে বর্ণশঙ্কর, ভাষায় অভিন্ন শাস্ত্রাচারে ভিন্ন, নিবাসে ও জীবিকায় অভিন্ন, প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনীর রোদ-বৃষ্টি, ঝড়-ঝঞ্ঝা, খরা-বন্যা, মারীর কালিক কবলগ্রস্ত, দেশাচারের ও লোকাচারের, ঐতিহ্যের ও আচারিক পরম্পরার হাজারো বাঁধনে আবদ্ধ বাঙালীসত্তা অবিচ্ছেদ্য অবিচ্ছিন্নভাবে চিরস্থিত। এই তত্ত্ব তথ্য ও সত্যকে বোধগত করে বাঙালীসত্তায় সম্পৃক্ত জেনেই আমাদের আত্মকল্যাণে জাতিক ও রাষ্ট্রিক স্বার্থে জাতিসত্তা পরিচয়ে অবিশেষিত বাঙালী নাম গ্রহণ করতেই হবে। সে-সঙ্গে আমাদের বাঙলাদেশ রাষ্ট্রের প্রান্তিক উপজাতিগুলোর গৌত্রিক, ভাষিক ও আচারিক স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতির ভিত্তিতে তাদেরকে আমাদের মতোই রাষ্ট্রিক নামে বাঙলাদেশী বলে অভিহিত করার মধ্যেই রয়েছে যৌক্তিক ও বৌদ্ধিক সঙ্গত সমাধান।

২

মানুষের নিবাসও নিষ্কণ্টক, নিরুপদ্রব ও নিরাপদ হওয়া আবশ্যিক। নইলে নিশ্চিন্তে সুস্থ জীবন যাপন সম্ভব হয় না। তেমনি একালে বিভিন্ন শাস্ত্রিক মতবাদী গোত্রের, গোষ্ঠীর, সম্প্রদায়ের এবং নানা রক্তের ও বর্ণের এবং ভাষার আর পরম্পরার মানুষ অধ্যুষিত আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ধর্মমতের, ভাষার, আচারের স্বাতন্ত্র্যকে ব্যক্তিক পর্যায়ে নিবদ্ধ রেখে আর সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রিক জীবনে শাস্ত্রিক গৌত্রিক আচারকে গুরুত্ব না দিয়ে ইহজাগতিক জীবনচেতনাঋদ্ধ সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রিক জাতিচেতনা সচেতনভাবে গড়ে তুলতেই হয় রাষ্ট্রবাসী নির্বিশেষে মানুষকে ঐক্যে, সহযোগিতায় ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সহাবস্থানে সংহত রাখার গরজেই। এজন্যে আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংখ্যাগুরু কোন সম্প্রদায়ের, দলের বা গোষ্ঠীর আচারকে কিংবা ঐতিহ্যকে কার্যত গুরুত্ব দেয়া আর ভাঙনের, অনৈক্যের, ও অপ্রেমের পন্থার প্রসার ঘটানোরই নামান্তর। তাই এ যুগের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রমাত্রকেই হতে হবে সেক্যুলার রাষ্ট্র। এক কথায় রাজনীতি ও রাষ্ট্রিক শাসন-প্রশাসনকে ধর্মমতের প্রভাবের অনুগত করলে কখনো বৈদেশিক বা রাষ্ট্রিক জাতীয়তা গড়ে উঠতেই পারবে না। আমাদের বাঙলাদেশ তার প্রমাণ। এ যে কত উগ্র মারাত্মক হতে পারে তার প্রমাণ—ধর্মধ্বজী সরকার অধিজন মুসলিমদের খুশি করার জন্যে রমজানের তথাকথিত মর্যাদা ও মহিমা রক্ষার অজুহাতে শিশু, বৃদ্ধ, রুগ্ন, অমুসলিম নির্বিশেষে রোজা না-রাখা মানুষ মাত্রেরই মৌল মানবিক অধিকার অমানবিকভাবে নির্মমভাবে হরণ করেছিল। ঘরের বের হওয়া মানুষকে তৃষ্ণার জল সংগ্রহে, ক্ষুধার অন্ন কেনা থেকে বঞ্চিত করেছিল। এ অমানবিক আচরণ সম্ভব হয়েছিল পুণ্যকামী অধিজনের বিশ্বাসের মূল্য ও মর্যাদা রক্ষার প্রণোদনায়। সারা দুনিয়ার সর্বত্র ধর্মধ্বজীদের শাস্ত্রানুগ শাসনে বিধর্মীরা বাস্তবে কার্যত জিম্মি হয়েই থাকে; কখনো মানুষ হিসেবে তথা রাষ্ট্রের নির্বিশেষ নাগরিক হিসেবে কোন অধিকার মানসিক জীবনে কিংবা ব্যবহারিক জীবনে ভোগ করে না। দেহে-প্রাণে-মনে-মননে, জাগ্রত জীবনে পীড়িত থাকে বলে আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও দৈশিক বা রাষ্ট্রিক জীবনচেতনায় তারা স্বস্থ হয় না, অসহায়ভাবে একটা যান্ত্রিক জীবনে অভ্যস্ত হয় মাত্র। আজকের এ মুহূর্তে বাঙলাদেশের গণমানব ও আজকের এই মুহূর্তের বাঙলাদেশে বিসমিল্লাপন্থী ধর্মধ্বজী বি.এন.পি সরকারের প্রশ্রয়ে গোলাম আযম যদি বাঙলাদেশে বাসের অধিকার পায়, তাহলে মৌলবাদী জামায়াতে ইসলামী এবং অন্যান্য ইসলামভিত্তিক ও ইসলামপ্রিয় রাজনীতিক দলগুলো বাঙলাদেশের শৈক্ষিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-প্রশাসনিক-রাজনীতিক ও রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে তাদের প্রভাব গভীর, ব্যাপক ও অবিমোচ্য করে তুলবে। অর্থাৎ সর্ব ব্যাপারে মধ্যযুগীয় অজ্ঞতার অনগ্রসরতার বন্ধ্যাত্বের অতীতমুখিতার অনাবিষ্কারের অনুদ্ভাবনের অসৃষ্টিশীলতার রক্ষণশীলতার গতানুগতিকতার সচল কিন্তু বিবর্তন-পরিবর্তনহীন লাটিম সদৃশ আবর্তিত জীবনে অবক্ষয় কবলিত হবে, এই যন্ত্রজগতের ও যন্ত্রযুগের সমকালীনতা ও প্রসাদ থেকে আমরা আর্থিক-নৈতিক-সামাজিক-বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে বঞ্চিত থাকব। ধর্মধ্বজীরা চৌদ্দশ বছর আগের জগতে করবে মানস বিহার। তাদের ন্যায় ও শ্রেয়োচেতনার উৎস হবে চৌদ্দশ বছর আগেকার শাস্ত্র। সমকালীন জ্ঞান-মনীষা কিংবা বিজ্ঞান-ইতিহাস-দর্শন-সমাজবিজ্ঞান-যুক্তিবাদ তাদের বদ্ধচিত্তে প্রভাব বিস্তার করতে পারবেই না। তাদের প্রভাবিত-কবলিত ও শাসিত বাঙলাদেশ হবে হাজারো বছরের আগেকার চিন্তা-চেতনার জগতে আবর্তিত। মানুষ হিসেবে, জাতি হিসেবে তথা রাষ্ট্র হিসেবে আমরা সমকালদর্শিতা হারাব। উল্লেখ্য যে গোলাম আযম আমাদের চোখে কোন ব্যক্তি নন, মৌলবাদ নামের এক অপশক্তির প্রতীক, প্রতিম, প্রতিভূ। আর গোলাম আযম বিতাড়নের সঙ্গে মৌলবাদী রাজাকারের রাজনীতিক দল দেশ প্রভাব হারাতেই থাকবে। তাদের কালবিরুদ্ধ জীবনচেতনার ও জগৎভাবনার কারণেই ধর্মধ্বজী বি.এন.পি ও অন্যান্য ইসলামপ্রিয় রাজনীতিক দলও হারাতে থাকবে তাদের প্রভাব, তাদের চিন্তা-চেতনাও আধুনিক বিজ্ঞান-দর্শন-ইতিহাস ও রাষ্ট্রিক জীবনচেতনা বিরোধী বলেই। কাজেই প্রগতিশীলের প্রভাব প্রবল হলে মানুষকে কেবল জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে মানুষ বলে গ্রহণ করা সহজ হবে জীবন-জীবিকার ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাষ্ট্রিক প্রশাসনের ক্ষেত্রে। তখন জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি প্রয়োগেই, যৌক্তিক-বৌদ্ধিক বিচারেই সহজেই সাধারণ মানুষও অনুভব-উপলব্ধি করবে যে ইহুদী-খ্রীস্টান-হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমান থাকার জন্যেই শাস্ত্র মানা নয়, মনুষ্যত্ব অর্জনই, মানবতার বিকাশ সাধনই শাস্ত্রানুশীলনের লক্ষ্য। এই ধারণা বহুমনে যখন ছড়িয়ে পড়ে, তখন জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-নিবাস নির্বিশেষে মানুষকে কেবল মানুষ হিসেবে গ্রহণ ও বরণ করা সম্ভব ও সহজ হবে। এভাবেই আমরা মানস ও ব্যবহারিক জীবনে আধুনিক আবিষ্কার উদ্ভাবন প্রকৌশল প্রযুক্তি প্রয়োগে-উৎপাদনে-নির্মাণে আমাদের সম্পদ বৃদ্ধির ও পণ্যের বাজার সৃষ্টির সুযোগ পেয়ে আজকের কৃপাজীবী ও ভিক্ষাপ্রবণ রাষ্ট্রকে গুণে মানে মাপে মাত্রায় ঋদ্ধ করে তুলতে পারব।

অতএব 'গোলাম আযম' তথা মৌলবাদ সমস্যার বাঞ্ছিত সমাধান না হলে প্রগতিশীলদের জীবনে নেমে আসবে বহুকালের জন্যে মানসিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনীতিক বিপর্যয়, দেশ হবে অবক্ষয়গ্রস্ত। সে অবক্ষয় শৈক্ষিক, সাংস্কৃতিক, বৈষয়িক, বাণিজ্যিক সামাজিক ও রাজনীতিক ক্ষেত্রে হবে সর্বার্থক ও সর্বাত্মক। আমরা সেই মধ্যযুগের বর্বরতায় অমানবিক আদর্শের ও নীতি-নিষ্ঠার লৌহ-কঠিন খাঁচাবদ্ধ জীবনে নিশ্চিন্ত হতে চাই কিংবা মনের-মননের ও জীবনাচারের উদার অঙ্গনে ও আকাশে অবাধ বিচরণের অধিকারে মানবিক জীবনের ও মানবতার পরম ও চরম স্বাদ গ্রহণ করতে চাই, তা নির্ধারিত হবে গোলাম আযম তথা মৌলবাদ সমস্যার অনুকূল কিংবা প্রতিকূল সমাধানের ওপর।

আমরা ব্রিটিশ শাসনমুক্ত হয়েছি প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর আগে, স্বাধিকারে স্বাধীনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছি বাইশ বছর আগে। কিন্তু এই সুদীর্ঘকাল আমরা সহায়-সম্পদহীন নিঃস্ব, নিরন্ন, দরিদ্র দিনমজুরের মতো সামর্থ্য ও আকাঙ্ক্ষা রিক্ত, দিনে এনে দিনে খাওয়ার, কেবল দিন যাপনরূপ বাঁচার আনন্দে বেঁচেছি জাতিক ও রাষ্ট্রিক জীবনে বিদেশীর ঋণ, দান-অনুদান ও ত্রাণসম্পদ-নির্ভর হয়ে। কাজেই জাতি বা রাষ্ট্র হিসেবে আমাদের কখনো সুনির্দিষ্ট ও পরিকল্পিত আদর্শ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিলই না মানে-মাপে-মাত্রায় আত্মোন্নয়নের ও আত্মপ্রসারের। তাই আমরা রাষ্ট্রিক জীবনেও অর্থ-সম্পদে নিঃস্ব দিনমজুরের মতোই অনিশ্চিত অসহায় জীবন যাপন করি। এভাবে একালে একটা জাতি বা রাষ্ট্র চলতে পারে না। কাজেই আমাদের ইহজাগতিক জীবনে চাহিদা পূরণের জন্যে আমাদের আর্থিক-শৈক্ষিক-সামাজিক-বাণিজ্যিক-রাষ্ট্রিক শাসন-প্রশাসন বিষয়ে সুনির্দিষ্ট ও সুপরিকল্পিত গণজীবনের বিকাশ ও উৎকর্ষ লক্ষ্যে নীতি-নিয়ম ও পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে আমরা আমাদের কিছু ব্যক্তিগত মত, মন্তব্য, সুপারিশ ও সিদ্ধান্ত দেশপ্রেমী জনসেবী আদর্শনিষ্ঠ জাতির ও রাষ্ট্রের কল্যাণকামী বিদ্বানদের, যুক্তিবাদীদের বিবেচনার জন্যে পেশ করছি।

ক. ব্যক্তির মতোই ঋণে-দানে-ত্রাণে কোন জাতি বা রাষ্ট্র বাঁচতে পারে না, অর্থ-সম্পদে তার স্বনির্ভর ও স্বয়ম্ভর হতেই হয়। আমাদেরও তাই সম্পদ অর্জন ও বৃদ্ধি করতেই হবে। আধুনিককালে এর মুখ্য উপায় দেশের ভেতরে ও বাইরে পণ্য উৎপাদন ও নির্মাণ এবং স্বদেশে ও বিদেশে তার বাজার সন্ধান। আজকাল বাজারমাত্রই আন্তর্জাতিক এবং তা তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতা সঙ্কুল। কাজেই স্বদেশে ও বিদেশে কোন্

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধরনের কি পণ্য প্রতিযোগিতার ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখেও লাভজনকভাবে বাজারজাত করা সম্ভব সযত্ন দৃষ্টিতে সতর্ক প্রয়াসে যুক্তি-বুদ্ধিযোগে যাচাই-বাছাই করে পণ্য উৎপাদনে ও নির্মাণে এবং বাজারজাত করার ব্যবস্থা গ্রহণে যোগ্যতার ও দক্ষতার উপরই আমাদের অর্থ-সম্পদ অর্জন ও বৃদ্ধি নির্ভর করে। এক্ষেত্রে কোন্ ধরনের পণ্য উৎপাদন ও নির্মাণ এবং বাজারজাতকরণ সরকারের আয়ত্তে ও পরিচালনায় থাকবে আর কোন ধরনের পণ্যের উৎপাদন, নির্মাণ ও বিক্রয় ব্যক্তির বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের থাকবে তাও যথাকালে যথাপ্রয়োজনে ও যথাস্থানে নির্ধারিত হওয়া আবশ্যিক। আর পুঁজিবাদী সমাজে পুঁজি যোগাড় হতে পারে সামবায়িক অংশীদারীতে কিংবা ব্যক্তিক ঐশ্বর্যের প্রয়োগে।

খ. এবার আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্যের কথা বলি। মানবতার বা মনুষ্যত্বের উন্মেষ-বিকাশকামী মানববাদীর শিক্ষার আদর্শই হচ্ছে বিদ্যাদানের মাধ্যমে মানুষের মনে-মননে মানবিক অনুভূতির ও গুণের সুষ্ঠু বিকাশ সাধনের এবং ব্যবহারিক জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে যোগ্য, বিশেষজ্ঞ কুশল ও দক্ষ কর্মী সৃষ্টি করা আর আবিষ্কারে-উদ্ভাবনে এবং সৃষ্টিশীলতায় আগ্রহী করে তোলা এবং সাধারণভাবে সমস্বার্থে-সংযমে-সহিষ্ণুতায়-সহযোগিতায় সমাজে নির্বিবাদে নির্বিরোধ সহাবস্থানের যোগ্য করে তোলা। সুনাগরিক এভাবেই তৈরি হতে পারে। আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা নির্লক্ষ্য; এখানে অদ্ভুত নিয়মে তিন প্রকারের নির্লক্ষ্য ও উপযোগরিক্ত শিক্ষাব্যবস্থা চালু রয়েছে। টোল-মক্তব-মাদ্রাসার হৃত-উপযোগ শিক্ষা ব্যবস্থা, ইংরেজী মাধ্যমে কিন্ডার গার্টেন সিনিয়ার-জুনিয়ার শিক্ষা পদ্ধতি এবং (তিন) নিম্ন-মধ্যবিত্তের জন্যে প্রবর্তিত মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা পদ্ধতি। প্রথমটি অজ্ঞ ও অনক্ষর সরলপ্রাণ, কোজো-অকেজো শিক্ষা-অসচেতন ব্যক্তিদের সন্তানের জন্যে, দ্বিতীয়টি ধূর্ত, স্বার্থপর, শিক্ষিত শহুরে ধনী-মানী-বেণে-আমলা-সাংসদ-মন্ত্রী-উকিল, ডাক্তারদের সন্তানের জন্যে যাদের মতলব দেশের ভেতরে শাসক-প্রশাসক কিংবা বেণে-বুর্জোয়ারূপে শাসক-শোষক হয়ে মান-যশ, খ্যাতি-ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও দর্প-দাপট প্রভৃতি আয়ত্ত করা অথবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কানাডায় কিংবা লন্ডনে স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার যোগ্য করে তোলা। তৃতীয়টি প্রায় নিয়তিনির্ভর। এ শিক্ষার বাহন মাতৃভাষা হলেও এটিই হচ্ছে প্রশ্নোত্তরে পরীক্ষা বৈতরণী পার হওয়ার একটা ঋজু পন্থা বিশেষ। এর মধ্যে মেধাবী নিষ্ঠ ছাত্রদের স্বপ্রয়াসে স্বশিক্ষিত হওয়ার সুযোগ ঘটে। তবে অধিকাংশ লোক কেজো লেখাপড়া শেখে বটে কিন্তু তাদের মনের আঁধার ঘোচে না, মনে-মানসে মানবিক অনুভব-উপলব্ধির উন্মেষও ঘটে না, আদি অকৃত্রিম মানব প্রজাতির প্রাণীই থেকে যায়। এ মানুষগুলোই জীবিকাক্ষেত্রে মতলববাজ, দুর্নীতিবাজ, কাড়া-মারা-হানা-প্রবণ, ঘুষ-কমিশন-পাওন-দালালী-বকশিস-নজরকামী দুষ্ট-দুর্জন-দুর্বৃত্ত-দুষ্কৃতী হয়ে সমাজস্বাস্থ্য পূতিগন্ধময় করে তোলে। এমনি সমাজে দুষ্ট দুর্জন দুর্বৃত্তরা প্রশ্রয় পায়, দুর্বলেরা শোষিত-পীড়িত ও বঞ্চিত হয়। অতএব জাতীয় উন্নতির প্রয়োজনেই গোটা রাষ্ট্রের নির্বিশেষ মানুষের জন্যে এক প্রকারের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে, যে-শিক্ষা গোড়া থেকেই শিক্ষার্থীকে মানবতার অনুশীলনে দীক্ষা দেবে এবং জীবিকা অর্জনে সমর্থ ও সমাজে রাষ্ট্রে বাঞ্ছিত গুণের মানের মাপের মাত্রার সুনাগরিক তৈরি করবে। আজকের শিক্ষাব্যবস্থা মনুষ্যত্ব বিকাশক নয়, প্রয়োজনপূরক। মানবিকগুণ অর্জন যুক্তিবাদীর ও মানববাদীর পক্ষেই সম্ভব ও সহজ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩

এযুগে মানবতাবাদী ও যুক্তিবাদী ব্যক্তিমাত্রেই জানে, বোঝে ও মানে যে এ জগতে মানুষ মাত্রেই এমনকি প্রাণী মাত্রেরই রয়েছে বাঁচার জন্মগত অধিকার। মানুষের ক্ষেত্রেও সে-অধিকার একালে সর্বজনীন বলে স্বীকৃত। কাজেই একজন লোকের দুটো সন্তান যদি অঙ্গে ও মগজে নিখুঁত হয় তাহলে সে-দুটোকে জীবিকা অর্জনের জন্যে কাজ ধরিয়ে দেয়ার এবং আর দুটো সন্তানের একজন যদি পঙ্গু এবং অন্যজন পাগল হয়, তাহলে তাদের প্রতিপালনের দায়িত্ব মা-বাবারই। তেমনি রাষ্ট্রবাসী সমর্থ মানুষকে যোগ্যতানুসারে কাজ দিয়ে জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা করে দেয়া এবং অন্ধ-পঙ্গু-পাগল ও শিশু-রুগ্ন-বৃদ্ধ প্রভৃতিকে ভাতা দিয়ে প্রতিপালন একালের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য। অতএব রাষ্ট্রের নাগরিকদের খোরপোশের সুস্থ ব্যবস্থা করার জন্যে সরকারের সম্পদ বৃদ্ধি আবশ্যিক ও জরুরী। কেননা এ দায়িত্ব পালন একালের রাষ্ট্রের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। এক কথায় নিঃস্ব নিরন্ন, ভিক্ষাজীবী কিংবা অনৈতিক বৃত্তিজীবীশূন্য সমাজই বাঞ্ছিত। এলক্ষ্যে উত্তরণের জন্যে আমাদের কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের দ্রুত উন্নতি সাধন করতে হবে। মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা রাখা এবং সর্বপ্রকার রোগের আধুনিকতম চিকিৎসার জন্য বিদ্বান ও অভিজ্ঞ চিকিৎসকের এবং আধুনিকতম যন্ত্রের ও ঔষধের ব্যবস্থা রাখাও আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য। আর না বললেও চলে যে দেহের ব্যায়ামের মতো মন-মানসের ব্যায়াম বা অনুশীলনও আবশ্যিক। তাই খেলাধুলার ও সংস্কৃতিচর্চার সুষ্ঠু ব্যবস্থা রাখাও মুখ্যত সরকারেরই দায়িত্ব।

আমরা মানুষের ইহজাগতিক জীবনে প্রয়োজনীয় খুঁটিনাটি বিষয়েও আলোচনা এখানে নিরর্থক মনে করছি বটে, সেগুলোর গুরুত্ব অস্বীকার করছি না। আর এক কথায় রাষ্ট্রবাসীর সব চাহিদার মানসিক ও ব্যবহারিক জীবনোপকরণ সরবরাহের দায়িত্ব যে সরকারের তা একালে আর কাউকে বলে দিতে হয় না।

৪

রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনও হবে প্রায় আমূল পরিবর্তিত। সাংবিধানিক-আদর্শগতভাবে আমাদের রাষ্ট্রকে হতে হবে কল্যাণমূলক রাষ্ট্র। এর অঙ্গীকার হবে সামাজিক ন্যায় ও আর্থিক সুবিচার। এ দুটোকে রাষ্ট্র ব্যবস্থার বীজ-বৃক্ষ-ফল-ফসলরূপে জানতে বুঝতে ও মানতে হবে। এ যন্ত্রজগতে ও যন্ত্রযুগে দূরত্বহীন সংহত একক বাজারকেন্দ্রী জনপদ সদৃশ বিশ্বে মানুষকে কেবল শাস্ত্রিক আচারে, দেশাচারে ও লোকাচারে নিষ্ঠ ও সংকীর্ণ চেতনায় ঋজু মানসপরিসরে সীমিত রাখা যাবে না। আজকের শহুরে শিক্ষিত লোকের ব্যবহারিক জীবনাচারে য়ুরোপীয় তৈজস-পোশাক-আসবাব-যন্ত্রের, রুচির ও পানাহারের প্রভাব প্রায় ষোলআনায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের মন-মনন শৈশবে পারিবারিক পরিবেশে মগজধোলাই প্রসূত বিশ্বাস-সংস্কারই আচ্ছন্ন রাখে; সে-দুর্ভেদ্য দুর্গে জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি প্রবেশপথ পায় না সাধারণের সারা জীবনে কখনো। তাই মানুষ বাহ্য জীবনে সদা-সমকালীন জগতে বাস করলেও মনোজগতে তারা তাদের স্ব স্ব শাস্ত্রের বয়সানুসারে সাড়ে তিন/তিন/আড়াই/দুই ও দেড় হাজার বছরের পুরোনো পৃথিবীতেই মানসবিহার করে। তবু আজকাল বিজ্ঞানের ও প্রযুক্তির, দর্শনের ও যুক্তির বৈশ্বিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাণিজ্যিক প্রভাবে ও আন্তর্জাতিক রুচি-সংস্কৃতির লেন-দেনে নিজেদের শাস্ত্রের, লোকাচারের, দেশাচারের লৌহকঠিন কাঁটাল খাঁচার বন্ধনে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র করে রাখা আর সম্ভব হবে না। ফলে পুরোনো নৈতিক পারিবারিক সামাজিক নীতি-নিয়মের, রীতি-রেওয়াজের, প্রথা-পদ্ধতির ও আচার-আচরণের ক্ষেত্রে দ্রুত পরিবর্তন হবে, অনেকটা আন্তর্জাতিক রূপ পাবে য়ুরোপ-আমেরিকার উন্নত ও সংস্কারমুক্ত সমাজের প্রভাবে। মানুষমাত্রই দাবি করবে মন-মত-মনন ও সিদ্ধান্ত নির্ভয়ে প্রকাশ করার স্বাধীনতা, অন্যের অধিকারে হামলা এড়িয়ে চিন্তায় প্রসূন, মনীষার ফসল প্রকাশের অবাধ অধিকার, অন্যের স্বার্থে আঘাত না হেনে শাস্ত্রিক ও সামাজিক নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ, প্রথা-পদ্ধতি উপেক্ষা করার ভাঙার, না-মানার স্বাধীনতা আর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ও চেতনার, মূল্যের, মর্যাদার স্বীকৃতি। এভাবেই এগুবে নতুন প্রজন্মের মানুষ, চির নতুনের পিপাসু মানুষ, নতুন চোখে দেখা নতুন সূর্যের নতুন পৃথিবীতে। পৃথিবী ও সূর্য চির-পুরোনো হয়েও ভালবাসার মতো যেমন প্রতিজনের অনুভবে চির নতুন। এ স্বাধীনতা লাইসেন্স নয়, ল্যাসেফ্যায়ার নয়, মন-মানসের ওপর শৈশব থেকে সুকৌশলে আরোপিত শৃঙ্খলের বন্ধনমুক্তির ইচ্ছার বাস্তব ও প্রকট প্রয়াসমাত্র; এ যথার্থ অর্থে মুক্তি ও মোক্ষমাত্র। এভাবে নতুন প্রজন্মকে নতুন সমাজকে, নতুন মনন-মনীষাকে গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু আমাদের নগণ্য সংখ্যক প্রগতিবাদীর এ চিন্তা-চেতনা, এ স্বপ্ন-সাধ তো আমাদের প্রয়াসে প্রযত্নে বাস্তবে রূপায়িত হবার নয়, কারণ আমাদের প্রভাব সামান্য ও সীমিত। এর জন্যে কল্যাণবাদী, দেশপ্রেমী, গণসেবী, মানববাদী, সংবেদী ব্যক্তির নেতৃত্বে পরিচালিত রাজনীতিক দল প্রয়োজন, সে-দল এখন দেশে নেই। আমাদের আরো কিছুকাল তেমন নেতার ও দলের প্রতীক্ষায় থাকতে হবে।

পরিশেষে তাই একথা স্বীকার করতেই হয়, এমুহূর্তে আমাদের অভাব রয়েছে যোগ্য নেতৃত্বের তথা দেশপ্রেমিক মানবসেবী মনীষা সাহস ও চারিত্রিক দার্ঢ্য সম্পন্ন নেতার। তাই আমরা জাতীয় ও রাষ্ট্রিক জীবনের এগুনোর পথ খুঁজে পাই না। এর কারণও রয়েছে—আমরা সাধারণভাবে দুহাজার বছরের পুরোনো অজ্ঞ-অনক্ষর কাঙালের বংশধর। আমরা ভুঁইফোড়, তাই আমরা ভোগ-উপভোগ ও সম্ভোগ লিপ্সু। আমরা তাই ন্যায়-অন্যায়-চেতনা ও মান-অপমানবোধ শূন্য হয়ে কাড়ায়-মারায়-হানায় উৎসুক এবং লুটপ্রবণ। তবু আমরা আশাবাদী। আমাদের তৃতীয় প্রজন্ম শুরু হয়ে গেছে। আর কিছুকালের মধ্যেই ন্যায়সচেতন, মান সচেতন, সৎ ও মানবসেবী ডাক্তার-উকিল-আমলা-সাংসদ এবং রাজনীতিক অবশ্যই পাব। আঠার-উনিশ শতকের কোলকাতার কোম্পানির কৃপাজীবীদের চালচিত্র ও চরিত্র দেখেই আমাদের মনে এ দৃঢ় প্রতীতি জন্মেছে। আমাদের জীবনেও গতি-প্রগতি-সৃষ্টিশীলতা ও আবিষ্কারে উদ্ভাবনে প্রাগ্রসরতা আসবে, মগজী বাঙালীর প্রতি আমাদের এ আস্থাই রয়েছে।

অবশ্য বৈশ্বিক প্রতিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে বলতেই হয় এ যুগ যেমন কেউ কারো অধীনে থাকার যুগ নয় তেমনি এ যন্ত্রযুগে ও যন্ত্রজগতে একক বাজারকেন্দ্রী জনপদের মতো সংহত ও ব্যবধানরহিত পারস্পরিক নির্ভরতায় আন্তর্জাতিক জীবনে স্বাতন্ত্র্যে বিচ্ছিন্ন থাকারও উপায় নেই। একাল সামবায়িক পদ্ধতিতে নির্বিবাদে-নির্বিরোধে-নিরুপদ্রবে নিরাপদে সহাবস্থানের যুগ। কাজেই আমাদের চরম ও পরম কালিক কল্যাণ নিহিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রয়েছে মণ্ডলাকারে [Federal Form-এ] বা সমামেলে বৃহত্তর আঞ্চলিক সমবায়ে সমন্বয়ে ও সহযোগিতায় বাঁচার মধ্যেই। তাই আবার বলছি অধীনতায় ও বিচ্ছিন্নতায় নয়, স্বাধীনভাবে সহযোগিতায় খণ্ড-ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র গোষ্ঠীর গোত্রের উপজাতির রাষ্ট্রগুলোর জনগণ নিশ্চিন্তে বাঁচার সুযোগ ও অধিকার পাবে। আজকের মানববাদী মাত্রেরই বিশ্বমানবের স্বার্থেই সন্নিহিত ও সংলগ্ন রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে মণ্ডল গঠন বাঞ্ছনীয়।

শাস্ত্র, সমাজ ও নারীমুক্তি

পরিবারে জননী কখনো সন্তানের শত্রু হয় না। পুত্র কখনো মাকে পর ভাবতে পারেই না বরং মা-ই হচ্ছে জগতে ও জীবনে ভালো-মন্দ-মাঝারি, আঁধা-কানা-খোঁড়া-পঙ্গু-পাগল সন্তানের অভয় আশ্রয়। শৈশবে মায়ের কোলই তো শিশুর সার্বক্ষণিক কাম্য শরণ। কাজেই মা সন্তানের অপ্রিয় হতেই পারে না, তবে অসমর্থ উদাসীন সন্তান মায়ের আদর-কদর-যত্ন-সেবা নাও করতে পারে। সেক্ষেত্রে মা অবহেলা পায় মাত্র, পীড়ন পায় না।

তারপর মনের মতো পত্নী তো প্রিয়াই, রূপবতী নারী গুণবতী না হলেও কাম-প্রেমের বন্ধনে অনুরাগের আসক্তির ভালোবাসার-ভালোবাসার, সে কারণে আদর-কদরের পাত্রী হয়, দাম্পত্যে পারস্পরিক আকর্ষণ-অনুরাগ থাকলে পত্নী কখনো পীড়িতা-নির্যাতিতা হয় না স্বামীর হাতে। পুরুষের সম্মতি না নিয়ে তার অদেখা অপছন্দের বউ নিয়ে তাকে পারিবারিক বা সামাজিকভাবে তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে যৌবনে বউয়ের প্রতি কামে-প্রেমে আকৃষ্ট না হয়েও বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সন্তানের জননী স্ত্রী চোখসহা, মনসহা আপনজন-আত্মীয়া এবং আস্থার-নির্ভরতার ও ভরসার পাত্রী হয়ে ওঠে।

আর জননী-জায়ার পরেই পুরুষ মাত্রেই নিঃশর্ত স্নেহ-মমতার পাত্রী হয় কন্যা। মনস্তাত্ত্বিক কারণেই কন্যা পিতার আদর পায়, তা রূপ-গুণের উপর নির্ভর করে না। মায়া জাগায় বলেই তো কন্যা 'মেয়ে'। জননী-জায়া-জাতা নিয়েই তো আত্মীয় সমাজ গড়ে ওঠে। এ দৃষ্টিতে ঘরোয়া জীবনে জননী-জায়া-কন্যা কেউ পুরুষের অশ্রদ্ধার, অবজ্ঞার, হিংসার, ঘৃণার কিংবা ঈর্ষার পাত্রী নয়, এক্ষেত্রে পরিবারের অন্য সদস্য বা পরিজনের কথা ওঠে না। কেননা পৃথগন্ন হলেই শাশুড়ি-জা-ননদ-দেবর-ভাশুর পীড়নের অধিকার হারায়। অতএব, আপাতত পুত্রের হাতে জননীর, স্বামীর হাতে স্ত্রীর এবং পিতার হাতে কন্যার অনাদর-বঞ্চনার কোন স্বাভাবিক কারণ নেই। বরং পুত্রের ঘর মায়ের, স্বামীর ঘর স্ত্রীর এবং বাপের ঘর কন্যার সর্বোত্তম আশ্রয়। এ অবধি প্রত্যাশিত ও স্বাভাবিক সম্পর্ক-সম্বন্ধের কথা বয়ান করা হল। তবু নারীর চেতনায় বাপের বাড়ি ও শ্বশুরের বাড়ি আছে। নিজের বাড়ি নেই।

এবার আমরা নারীর বাস্তব অবস্থা ও অবস্থান সম্বন্ধে তাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক এবং পরম্পরাগত শাস্ত্রিক ও সামাজিক কারণগুলো বর্ণন, আলোচনা ও বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করব। গোড়াতেই বলে রাখি নারীমুক্তির বাধা শাস্ত্রিক বিধি-নিষেধ, সামাজিক নীতি-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ ও প্রথা-পদ্ধতি আর কিছু অবস্থা ও অবস্থানগত অলীক বিশ্বাস সংস্কার।

পশ্চিম এশিয়ার শামীয় সমাজে আদম-হাওয়া দিয়েই মনুষ্য সৃষ্টির কিস্‌সার শুরু। তাতে দেখা যাচ্ছে, নারী হাওয়া স্বল্পবুদ্ধি, সহজে প্রলুব্ধা এবং আবেগাভিভূতা, তাই শয়তানের খপ্পরে পড়ে সস্বামী স্বর্গচ্যুতা হন। কিস্‌সার প্রভাবেই আরবে আপ্তবাক্য আজো প্রচল রয়েছে যে 'নারী জাহান্নামের দ্বার'। আরো আগের মিশরীয় কাহিনীর বাইবেল—উক্ত বর্ণনায় দেখা যায় পেটিফ্যারার পত্নী নবী যোশেফের প্রেমে পড়েন। কোরআনে এ ঘৃণ্য পরকীয়া প্রেমের উল্লেখ রয়েছে। মুসলিম সূফীরা অবশ্য আজিজ মিসির পত্নী জোলেখার ও ইউসুফের এ প্রেমকে রাধা-কৃষ্ণ প্রেমের মতো আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় প্রশংসিত করেছে। সাহিত্যে উপভোগ্য হলেও আবেগতাড়িতা নারীর অসংযমের উপাখ্যানের প্রভাব সামাজিক জীবনে অনভিপ্রেত বলেই বিবেচিত হয়েছে ইদানীং পূর্বকালে। উপাখ্যানের প্রভাব সামাজিক জীবনে গ্রীকরা নারীতে ও দাসেতে আত্মার অস্তিত্ব প্রায় স্বীকারই করত না। ভারতেও চালু প্রবচন হচ্ছে 'স্ত্রীয়াশ্চরিতম দেবা ন' জানন্তি, কুতঃ মনুষ্যা।' নারী আজো দুনিয়ার পুরুষের চোখে 'রহস্যময়ী'—তার 'হ্যাঁ' ও 'না' নাকি সব সময়েই দ্ব্যর্থবোধক। আরো এক আপ্তবাক্য আমরা জানি, তা এই, 'নারীর বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না'।

যদিও আমরা ইতিহাসের সাক্ষ্যে ও চালুরীতির প্রমাণে বিবাহপ্রথা চালু হওয়ার আগে একটা মাতৃতান্ত্রিক সমাজের অস্তিত্ব স্বীকার করি এবং পৃথিবীর বহু বুনো-বর্বর ও সভ্য-অসভ্য সমাজে এখনো সেই মাতৃতান্ত্রিক সমাজের রেশ-লেশ রয়ে গেছে, তবু তা যে আদি ও আদিম অবিকশিত স্তরেরই ছিল, তার সাক্ষ্য-প্রমাণ মেলে পৃথিবীতে চালু ভাষাগুলোতে। প্রতিটি ভাষায় অধিকাংশ বিশেষ্য-বিশেষণ পুরুষবাচক, আকার-ইকারযোগে শব্দের রূপান্তর ঘটিয়ে নারীবাচক শব্দ তৈরি হয়, এতেই বোঝা যায় সংস্কৃতি-সভ্যতা পুরুষের প্রয়াসের-উদ্যমের-উদ্যোগের অনুশীলনের ও অধ্যবসায়ের ফল। এজন্যেই যদিও নরপ্রাণীর চেয়ে নারীপ্রাণী আকারে ও রূপে খাটো, তবু কাম-প্রেমবশে নারী নরচোখে আকর্ষণীয়া। কিন্তু সৃষ্টির আন্তঃপ্রেরণা ব্যতীত ক্ষেত্রপ্রতীক নারীজাতীয় প্রাণীরা সাধারণত যৌন সম্ভোগে বিমুখ। এবং প্রাণিজগতে এ-ও দেখা যায়, কিছু ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত থাকলেও পুরুষ প্রাণীও বলাৎকারে বিমুখ। সৃষ্টিসম্ভবা না হলে ক্ষেত্রপ্রতীক উর্বরা নারীজাতীয় প্রাণীর এবং মানুষের মধ্যে যৌন সঙ্গমে নারীর নিষ্ক্রিয়তা থেকে সমাজে ধারণা হয়েছে যে নারী মাত্রই সম্ভোগপাত্রী, সম্ভোগী ভোক্তা হচ্ছে পুরুষ। মানুষের জীবনাচার স্বরচিত, তাই কৃত্রিম। প্রকৃতিকে দাস ও বশ কিংবা প্রকৃতির সঙ্গে আপোস করে মানুষ প্রকৃতিনির্ভর হয়েও তার চাহিদা পূর্তিলক্ষ্যে উৎপাদনে নির্মাণে ব্যবহারের উপযোগ সৃষ্টিতে যত্নবান হয়ে জীবন-জীবিকা ক্ষেত্রে মাটি-জল-বায়ু-আগুন আর প্রকৃতির সৃষ্ট জীব-উদ্ভিদকে হাতের-হাতিয়ারের-যন্ত্রের ও বুদ্ধির প্রয়োগে কাজে লাগিয়েছে। এর মধ্যে বিদ্বানেরা বলে থাকে বটে যে আঙিনায় কৃষির বৃক্ষ লতার বীজ বপন নারীরই মানস ও উদ্যম প্রসূন।

তবু বিবাহ প্রথা চালু হওয়ার আগেও নারী পুরুষের সম্পর্ক ছিল ভোগ্যা-ভোক্তাভোগীর। অর্থাৎ নারী ছিল পুরুষ সম্ভোগ্যা আর পুরুষ হল সম্ভোগকারী। এ ধারণার উদ্ভবের কারণ নারী যৌনসুখ পায় দলিতা হয়ে নিষ্ক্রিয়া থেকে আর পুরুষ পায় দলিত করে। সম্পর্কটা যে-দলক-দলিতার, পীড়ক-পীড়িতার। সচেতনভাবে নারীও সজ্ঞাপ্রিয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুরুষকে আকৃষ্ট করার জন্যেই। সৃষ্টিসম্ভবা হলেই নারীর পুরুষ সান্নিধ্য আবশ্যিক হয়ে ওঠে। প্রাণিজগতের সবশ্রেণীর মধ্যেই পুরুষ যৌন সম্ভোগে সদা প্রস্তুত বলেই এবং সদা আগ্রহী বলেই সে নারীর মন যুগিয়ে বশ করার চেষ্টায়ও থাকত। বিবাহ প্রথা চালু হওয়ার পূর্বাবধি তাই নারীর মনকাড়ার মাধ্যমে নারীদেহে অধিকার লাভই ছিল লক্ষ্য। এ আপোসে বিশেষ নারীর প্রতি আসক্তি বিস্তারের কামজ প্রয়াসের নাম প্রেম। সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে গোটা দুনিয়াব্যাপী যত রূপকথা, উপকথা, প্রেমকথা, গাথা-গীতিকা, কাব্য, কবিতা মুখে মুখে কিংবা লিখিতভাবে তৈরি হয়েছে, সবগুলোরই নায়ক তাই পুরুষ আর নায়িকা হচ্ছে অপরিচিতা রূপসী জীন-পরী-অপ্সরা এবং মানবী। এক পলক চোখে দেখে, তসবীর বা আলেখ্য দেখে, কিংবা স্বপ্নে দেখা পেয়ে অথবা লোকমুখে শুনে নায়ক অজানা অলঙ্ঘ্য দুর্লঙ্ঘ্য সমুদ্র অরণ্য পর্বত অতিক্রম করে সেই রূপসীকে পাবার জন্যে প্রাণপণে অনিশ্চিত অভিযানে অভিসারে যাত্রা করেছে। কেবল মৌখিক বয়ানে কথকতায় শ্রুতি-স্মৃতির রোমন্থনে নয়, পৃথিবীর আদি ও আদিম লিখিত গান-গাথা-গল্প-গীতিকা এবং কাব্যগুলো কাম-প্রেম বিষয়ক। এ জন্যেই শৃঙ্গাররস আদি ও প্রধানরূপে অভিহিত। হাজার আফসানা, আলেফ লায়লা, ইলিয়াড, ওডেসি, রামায়ণ, মহাভারত, ইউসুফ-জোলেখা, লায়লী-মজনু, শিরি-ফরহাদ, কিংবা বোকাসিওয়োর রচনা থেকে বৃহৎকথা-কথাসরিৎ সাগর, পঞ্চতন্ত্র, বেতাল পঞ্চবিংশতি, শাহনামা অবধি এবং আধুনিকতম গল্প-উপন্যাস-কাব্য-কবিতা-নাটক চিত্র সর্বত্রই পাই ওই আদি রসেরই লঘু-গুরু-ভিয়ান-এ, না হলে চৌষট্টি কলার অনেক কলাই থাকে অসম্পূর্ণ ও অনাকর্ষণীয়। সাহিত্য চিত্র স্থাপত্য ভাস্কর্য, চারু-কারু-দারু শিল্পে তাই কাম-প্রেম রসাশ্রিত নারী-পুরুষ সম্পর্কের আলেখ্য বিজড়িত। নাচে-গানে-বাজনায়ও পুরুষ নারীরূপের স্তাবক ও ভাবক। এক কথায় পুরুষের সুকুমার কিংবা ললিতকলার তথা পুরুষের ললিত মধুর ভাব-চিন্তা-কল্পনার অবলম্বন চিরকালই নারী। তা সত্ত্বেও নারী কেন পুরুষের বাস্তব জীবনে তাচ্ছিল্যের, পীড়নের, নির্যাতনের পাত্রী, তা এবার বিশ্লেষণ করে দেখা আবশ্যিক। তা না হলে নারীমুক্তির, নারীর স্বাধীনতার পথে বাধা কি কি এবং কোথায় ও কেন, আর জীবন-জীবিকার এবং সমাজের, সংস্কৃতির ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার চাওয়ার ও পাওয়ার এবং দেয়ার যৌক্তিকতা বোঝা-বোঝানো যাবে না।

ফল-মূল-মৃগয়াজীবী মানুষের যাযাবর জীবনের অবসানকালে, মানব প্রজাতির প্রাণীরা পশুপালক কিংবা কৃষিজীবী হয়ে স্থায়ী নিবাস স্থাপনে হল আগ্রহী। তার আগে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ছিল অজ্ঞ মানব সমাজে প্রায় অসম্ভব। কেননা, তারা তখনো রোগের প্রতিষেধক এবং প্রসূতি ও জাতক বাঁচানোর সব জ্ঞান-অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেনি বলে মৃত্যু প্রতিরোধ করা, মহামারী ঠেকানো ছিল এ শতকের প্রথমার্ধ অবধি অনুন্নত দেশে অসম্ভব।

গোষ্ঠীবদ্ধ যাযাবর জীবনে রূপসী-স্বাস্থ্যবতী তরুণীর প্রতি একাধিক পুরুষের আসক্তি-আকর্ষণের দরুন অপ্রতিরোধ্যভাবে কখনো কখনো কোন না-কোন নারী নিয়ে প্রতিযোগী-প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে কাড়াকাড়ি-মারামারি ও হানাহানি চলত। রূপসী নারীহরণ ছিল দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-সংঘাতের মুখ্য কারণ। তাই বেদেও দেখি, ভিন্ন গোত্রের নারীহরণ করা, গোধন লুট করা, ইন্দ্রের হুকুমে ও নেতৃত্বে নগরের সম্পদ লুট করা আর্যভাষীদের পেশায় ও নেশায় পরিণত হয়েছিল। হরণ ও বহন করে আনা হত বলেই হৃতা নারীকে বলা হত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বধূ। তাছাড়া অনার্য গোত্রের নারী ঘরে তুলত বলেই আর্যভাষীর স্ত্রী স্বামীকে বলত আর্যপুত্র। দেবতাদের রাজারা, ইন্দ্ররা পুরলুণ্ঠনকারীরূপে 'পুরন্দর' নামে ছিলেন কুখ্যাত। যৌথজীবন নির্বিরোধ-নির্বিবাদ নিরুপদ্রব ও নিরাপদ শান্তি-স্বস্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্যেই মুখ্যত বিবাহ প্রথা উদ্ভাবিত ও চালু হল। এতে সর্বসম্মতিক্রমে এক একজনকে নারী বণ্টন করে দেয়ার ব্যবস্থা হল যাতে নির্বিঘ্নে পুরুষ নারীসম্ভোগের সুযোগ পায়। একারণেই বুনো-বর্বর সভ্যভব্য সমাজে সামাজিক উৎসবের মাধ্যমেই বিবাহানুষ্ঠান হয় একে সর্বসম্মত ও প্রকাশ্য অধিকার বলে স্বীকৃত করার লক্ষ্যেই। আরো একটা নীতি-নিয়ম হল, সুন্দরী বোন নিয়ে বা রক্তের সম্পর্কের নারী নিয়ে আত্মীয়দের মধ্যে কাড়াকাড়ি নিবারণের জন্যে কোন কোন প্রাচীন গোত্রে সমাজে তথা শাস্ত্রে আত্মীয়বিবাহ নিষিদ্ধও হয়ে গেল। আবার গৌত্রিক-গোষ্ঠীক নিরাপত্তা-প্রতিরক্ষা ও স্বাতন্ত্র্য-সংহতি বজায় রাখার লক্ষ্যে কোথাও কোথাও ভিন্ন গোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ করাও হল। এসব প্রথাপদ্ধতি আজো প্রায় অটুট রয়েছে। ব্যতিক্রম অবশ্যই আলোচ্য নয় বিরলতায় দুর্লক্ষ্য বলে। যেহেতু নারীমাত্রই সম্ভোগ্যা তথা পুরুষভোগ্যা, সেহেতু পুরুষভোগ্যা নারীকে সোনা-রূপার মতো মূল্যবান ভোগ-উপভোগের, সম্ভোগের সামগ্রী হিসেবেই বিবেচনা করা হল। পুরুষের কামজ ঈর্ষার বা রিরংসার প্রসূন হল বালিকা-কিশোরী বিবাহ প্রথা। যাতে অনাঘ্রাত পুষ্পের মতো নারীও থাকে অস্পর্শে অশিহরিতা—এর নাম নারীর সতীত্ব। এটি পুরুষ নিয়ন্ত্রিত সমাজে এখনো নারীর রক্তের সংস্কারে পরিণত রয়েছে। অবগুণ্ঠন অবরোধ পর্দাপ্রথার প্রচলনও হল এ কারণেই। স্থূল যুক্তিতে সন্তানের পিতৃপরিচয় অসংশয়িত রাখাই নারীর সতীত্বে গুরুত্ব আবশ্যিক বলে মানা হলেও ঈর্ষার কারণেই ভারতীয় সমাজে আট-নয়-বারো বছরের মধ্যে কন্যার বিয়েই না দিলে মা-বাবার নরকবাস সুনিশ্চিত হয়ে যেত এবং ওই ঈর্ষার তীব্রতাই পুরুষস্পৃষ্ট বিধবার কৃচ্ছ্রতা ক্লিষ্ট জীবন যাপন বা সহমরণ আর অধবার পতিতা হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। কারণ ওরা পুরুষস্পৃষ্টা বলেই ঘৃণ্য।

পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র বাল্য বিবাহ চালু ছিল। পশ্চিম এশিয়ার আদি সভ্যসমাজেও বিবাহকালে নারী পুরুষ সংসর্গে এসেছিল কি-না, তা পরীক্ষা করে নেয়া হত—এখনো হয়তো নিরক্ষর সমাজে তা চালু রয়েছে। অবশ্য মাতৃতান্ত্রিক সমাজে এখনো দ্রৌপদী বিয়ে তথা সব ভাই মিলে এক নারী সম্ভোগ কিন্নর গোত্রে এবং দাক্ষিণ্যত্যের নায়ার-নামুদ্রী গোত্রে অবিলুপ্ত।

অতএব বালিকা-কিশোরী বিবাহ নারীর সতীত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত-নিশ্চিন্ত থাকার জন্যেই প্রচলিত হয়। ফলে এদের অভিভাবকত্ব পায় শ্বশুর-শাশুড়ি-ননদী প্রভৃতি। এরা গৃহগত জীবনই যাপন করে। এদের ঘর হতে আঙিনাও দূরে কোন সমাজে, এরা অল্পবিস্তর অসূর্যম্পশ্যা। কাজেই অন্ন-বস্ত্র-আশ্রয়ের জন্যে এরা স্বামীনির্ভর। এজন্যেই হিমালয়-মেনকাও গৌরী সম্প্রদানকালে শিবের হাত ধরে মিনতি জানায়, 'কুলীনের পো তোমায় কি বলিব আর। হাঁটু ঢাকি বস্ত্র দিও পেট পুরে ভাত।' এভাবে নারী পুরুষভোগ্যা প্রাণীরূপে শাসিতা-পোষিতা-লাঞ্ছিতা আজো পরিবারে পরিবারে। শিক্ষিতা চাকুরে রোজগেরে নারীই কেবল বাহ্যত স্বাধীন। আর মানসিকভাবে আজো সে দাসী, সেবিকা, চরণাশ্রিতা, কেননা স্বামীর পায়ের তলেই তার স্বর্গ। কোরআনে আল্লাহও বলেন, 'আমি পুরুষকে (স্বামীকে) নারীর অভিভাবক করে দিয়েছি এবং অন্যত্র তুমি স্ত্রীকে (এবং একাধিক) যেমন খুশি তেমনভাবে সম্ভোগ কর।' এখানেও নারী যে সম্ভোগ্যা তা বলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হল। সাংখ্যদর্শনে পুরুষপ্রকৃতিতত্ত্বেও, পুরুষ হচ্ছে বীজ বপনকারী নারীযোনী বা গর্ভরূপ ক্ষেত্রে। স্বামীর অসামর্থ্যে স্বামীর নির্বাচিত ও নিমন্ত্রিত অন্য পুরুষও ক্ষেত্ররূপ নারীতে শুক্ররূপ বীজ বপন করতে পারত। মহাভারতে এমনি ঘটনার ছাড়াছড়ি দেখা যায়। নারী সম্ভোগ্যা প্রাণী বলেই বহু আসমানী শাস্ত্রানুসারেই পুরুষমাত্রই যুগপৎ একাধারে একাধিক, হাজার, অসংখ্য নারী গ্রহণের ও সম্ভোগের অধিকারী।

অতএব ১. নারী পুরুষভোগ্যা। ২. নারী পুরুষের চরণাশ্রিতা সর্বপ্রকারে। ৩. নারী জমিস্বরূপ, পুরুষ হচ্ছে চাষীস্বরূপ, তাই পুরুষনিয়ন্ত্রিত সমাজে-শাস্ত্রে সন্তানে রয়েছে কেবল বাপের অধিকার, মায়ের অধিকার স্বীকৃত নয়। ৪. পুরুষের ভোগ্য বলেই পুরুষের রিরংসা প্রসূন ঈর্ষা সুপ্ত রাখার জন্যেই নারীর স্বামীনিষ্ঠ থাকা আবশ্যিক। এভাবে হাজার হাজার বছর ধরে আশৈশবের মগজধোলাইয়ের ফলে নারীমনে দেহের ত্বকের মতো, প্রাণের উৎস রক্তের মতো এক প্রকার হীনম্মন্যতা, পুরুষনির্ভরতা এবং শাস্ত্রিক বিশ্বাসসংস্কার অবিমোচ্য অপরিত্যাজ্য হয়ে রয়েছে।

একালে নারীরা পুরুষের সহচরী সঙ্গী সহযোগীরূপে পুরুষের সমান অধিকার দাবি করে বটে, কিন্তু এখনো তার স্বাধীনতার বা মুক্তির চেতনা পূর্ণতা পায়নি। প্রমাণ নারী এখনো স্বামীর পদবী পরিচয়ে নিজেকে পরিচিত করতে গৌরব-গর্ববোধ করে। মুসলিম নারী জানে, মুসলিম নারীর দাম্পত্য একটা জাগতিক চুক্তিমাত্র এবং নারী যে পুরুষভোগ্যা সে-স্বীকৃতির প্রমাণ কাবিন। কাবিন হচ্ছে সম্ভোগের দামস্বরূপ আর্থিক মূল্যের দলিল, এ জেনেও উচ্চ দক্ষতার চাকুরে নারীও কাবিন যে লক্ষ লক্ষ মুদ্রার বিনিময়ে সম্ভোগ্যারূপে আত্মবিক্রয়ের অবমাননাকর দলিল মাত্র, তা আজো মনে করে না। এ-ও মনে করে না যে শাস্ত্রানুসারে নারী পুরুষভোগ্যা প্রাণীমাত্র, তাই এক পুরুষের একাধিক স্ত্রী অনুমোদিত।

সাধারণ নারীর মুক্তির কয়েকটি শর্ত পূরণ হওয়া চাই, নারীকে শাস্ত্রিক বিধিনিষেধ দ্রোহিণী হতে হবে। ২. সর্বাবস্থায় পুরুষ একপত্নীক হবে, এবং তালাকে বা বিচ্ছিন্নতায় সমান অধিকার থাকবে। ৩. সন্তানের উপর স্ত্রীরও সমান অধিকার থাকবে। ৪. কাবিন আত্মবিক্রয়ের দলিল বলেই গর্হিত এবং পরিত্যাজ্য হবে, এক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার আনুগত্য পরিহার করতে হবে। ৫. স্ত্রীও স্বামীর সঙ্গী-সহচরী-সহযোগীরূপেই রোজগেরে হয়ে বা স্বাধীনভাবে বাস করবে। স্বামী প্রভু বা অভিভাবক হিসেবে স্বীকৃত হবে না। বন্ধু ও হিতৈষী-সহকারী-সাহায্যকারী-সহযোগীরূপে ঘরে বাইরে সঙ্গী থাকবে মাত্র। ৬. অর্থ-সম্পদে কন্যারও সমান অধিকার থাকবে। পিতৃ প্রধান সমাজে কেবল চার সংখ্যক শর্তটি মুসলিম নারী সম্বন্ধেই প্রযোজ্য হবে। স্বামী বলেই কোন পুরুষই স্ত্রীর বা নারীর মান্যজন, অভিভাবক, শাসক, নিয়ন্ত্রক, কর্তা হবে না। স্ত্রী স্বামীর নাম বা পদবী ধারণ করবে না। পুরুষ কায়িক শক্তিতে, কর্মক্ষমতায় ও বয়সে স্ত্রীর চেয়ে এগিয়ে থাকায় ক্রমে স্ত্রীর নিজের শক্তি-সামর্থ্য-সাহস-কর্মক্ষমতা-সমকক্ষতা সম্বন্ধে আত্মপ্রত্যয় শূন্য হয়ে পড়ে। এ হীনম্মন্যতাই নারীকে তার স্বসত্তার মূল্য ও মর্যাদা সম্বন্ধে আস্থাহীন করে তোলে এবং প্রাজন্মক্রমিক এ ধারণা স্থায়ী মানসিকতায় পরিণত হয়। ফলে নারী প্রথমে পিতার, মধ্যে স্বামীর এবং বার্ধক্যে বৈধব্যে পুত্রসন্তান নির্ভর হয়ে থাকে। অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন আত্মপ্রত্যয়ী নারী ও অবশ্য সব যুগেই নগণ্য সংখ্যায় ছিল। এ যুগে শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং শাসনমুক্ত অর্থাজনে সমর্থ নারী যে-কোন পুরুষের সমান ও সমকক্ষ, তা নিঃসংশয় প্রমাণে ক্রমশ স্বীকৃত হচ্ছে সব সমাজে। ব্যায়ামে, অনুশীলনে, চর্যায় যুদ্ধে কিংবা কায়িক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিশ্রমেও তারা যে পুরুষের সমকক্ষ তা-ও প্রমাণিত হচ্ছে। নারী ললিতলবঙ্গলতা রূপ ললনা থাকবে না। তার প্রকাশ্য লক্ষণও দুর্লভ নয়। যুগান্তরে সমাজ বিবর্তনের ফলে অতীতের নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ, প্রথা-পদ্ধতি বদলাতেই হয় স্বকালে উদ্ভূত পারিবারিক ও জাগতিক জীবনের সমস্যা-সঙ্কট উত্তরণের জন্যে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে য়ুরোপেও নারীশিক্ষা তেমন প্রশ্রয় পায়নি, নারীও কায়িক শ্রমে কিংবা মানসিক শ্রম প্রয়োগে অর্থ উপার্জনের তেমন গরজবোধ করত না। সমাজ ছিল পুরুষশাসিত, ঘরও ছিল পুরুষনিয়ন্ত্রিত। যুদ্ধজাত আর্থিক সামাজিক বিপর্যয় য়ুরোপীয় নারীদেরও ঘরের বাইরে এসে বেপর্দা হয়ে পরপুরুষের পাশে ও সাথে কাজ করতে হল জীবিকার্জনের গরজে। ক্রমে তারা হায়া-শরম-সংকোচ মুক্ত হয়ে স্বাভাবিক মানুষ বা মানবীরূপে সমাজে স্বপ্রতিষ্ঠ হয়েছে, আমাদের দেশেও প্রথমে ব্রাহ্ম ও দেশী খ্রীস্টান সমাজে উনিশ শতকের শেষ দুই দশক থেকে শিক্ষা গ্রহণে এগিয়ে আসে নারী। এমনকি কোলকাতায় যখন নারী গ্রাজুয়েট ও ডাক্তার হয়, তখনো খাস লন্ডনেও উচ্চ শিক্ষা নারীদের মধ্যে চালু ছিল না। ১৯৩০ সনের আগে ব্রিটিশ নারীরা ভোটাধিকারও পায়নি, অথচ ১৯৩৭ সন থেকেই আমাদের গাঁ-গঞ্জের অশিক্ষিতা নারীও ভোটাধিকার পেয়েছে।

নারীশিক্ষা চালু হওয়ায় ব্রাহ্ম-খ্রীস্টান ভদ্রঘরে কেবল যে বাল্যবিবাহ বন্ধ হল তা নয়, চির অনূঢ়া থাকার অধিকারও এসব সমাজে স্বীকৃত হল। তারপরে ভদ্র বর্ণহিন্দুরা যখন মেয়েদের স্কুলে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানো শুরু করে, তখন শাস্ত্রানুগত্য বশে পাপের ভয়ে অল্পবয়সে কন্যার বিয়ে দেয়ার রীতি ভঙ্গ করতেই হল। শুধু তা নয়, লাবণ্যহীনাদের কিংবা অর্থাভাবে পালটি ঘরে কন্যার বিয়ে দেয়া অসাধ্য হয়ে উঠলে ঘরে ঘরে অনূঢ়া বয়স্কা কন্যা থাকায় পাপের ও নরকের ভয় দেখানোর, সামাজিক নিন্দা-কলঙ্ক রটানোর উপায় রইল না কারো। ফলে একটা সঙ্কট এভাবেই কেটে গেল শিক্ষিত ভদ্র সমাজে। এখন মুসলিম সমাজেও বিয়ে না হওয়া কোন অনূঢ়ার পক্ষে আজ আর লজ্জা-শরম-সংকোচের বিষয় নয়, নয় নিন্দা-কটাক্ষের বিষয়ও।

কিন্তু গাঁ-গঞ্জের অজ্ঞ-অনক্ষর-সাক্ষর সমাজে তা আজ এক মারাত্মক সমস্যার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে সব ধর্মের সম্প্রদায়ের মানুষের পক্ষে। পণ বা যৌতুক দিয়ে যোগাড় করতে হয় বর। সে-যৌতুক যোগাড় করা সম্ভব হয় না দরিদ্র পিতামাতার পক্ষে। যৌতুকের অর্থ-সামগ্রী পরিশোধের মিথ্যা অঙ্গীকার-শপথ করে কন্যার বিয়ে দিলে বিবাহোত্তরকালে ছয়/নয় মাস কিংবা বছরের মধ্যেই যৌতুকের বাকি অর্থ বা সামগ্রী না দিলে বধূকে পিটিয়ে পুড়িয়ে মারা, তালাক ত্যাগ মাধ্যমে বাপের বাড়িতে ফিরিয়ে দেয়া প্রভৃতি গোটা উপমহাদেশে একটা অমানবিক বর্বরতার বিস্তার ঘটাচ্ছে। প্রতিবছর কয়েক হাজার নারী এভাবে পীড়িতা-নির্যাতিতা-লাঞ্ছিতা হয়ে হতাশায় ও আত্মহত্যায় অকালে প্রাণ হারাচ্ছে। গাঁয়ে-গঞ্জেও সব পরিবারে নারী শিক্ষার ও জীবিকার্জনের প্রশিক্ষণের প্রসার না ঘটালে এ সমস্যার সমাধানের কোন বিকল্প উপায় মিলবে না। কেননা নারী জীবিকাক্ষেত্রে স্বাবলম্বী হলেই কেবল নারী বিবাহিতা বা অবিবাহিতা অবস্থায় স্বাধীন সত্তায় নিরুপদ্রবে বাঁচতে পারবে। তখন দাম্পত্য আর অপরিহার্য থাকবে না।

এবার আমরা সূত্রাকারে নারী নির্যাতনের ও তার মানবিক অধিকার হৃতা হওয়ার কারণ সন্ধান করছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১. অন্য প্রাণীর মতো কেবল সৃষ্টিসম্ভবা নারীতেই সঙ্গম বাঞ্ছা জাগে না, কৃত্রিম মনন অনুশীলনে নারী-পুরুষের রতি-রমণ বাঞ্ছা বলতে গেলে সার্বক্ষণিক বা বারোমেসে। নারী নিয়ে একাধিক পুরুষের কাড়াকাড়ি, মারামারি, হানাহানি নিবারণের জন্যে ও যৌথ বা সামাজিক জীবনে নির্বিরোধ সহাবস্থানের জন্যে আত্মীয় সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিবাহ প্রথা চালু হয়।

২. যেহেতু গোড়া থেকেই পুরুষেরা নারীকে সম্ভোগ্যা প্রাণীরূপেই জেনেছে, সেজন্যে রিরংসাজাত ঈর্ষাবশে নারীকে একক পুরুষ সম্ভোগ্যা বলে চিহ্নিত করেছে, এ জন্যেই নারীমনে সতীত্বের ধারণা ক্রমে বদ্ধমূল করে দিয়েছে পুরুষেরাই। নারীও তা পুরুষশাসিত সমাজে মেনে নিয়েছে এবং এ আবশ্যিক গুণের ও সংযমের গৌরবে গর্বে নারীও অভিভূতা।

৩. বিবাহ প্রথা চালু হওয়ার আগে মানুষ মাতৃ পরিচয়ে হত চিহ্নিত। তখন পিতার সন্ধান নির্দিষ্ট করে মিলতও না, প্রয়োজন ছিল না। কাজেই সন্তান লালনের দায়িত্ব চিরকালই ছিল স্তন্য দাত্রী মায়েরই। তখন নারী ছিল স্বাধীন এবং পুরুষেরা করত তার স্তাবকতা ও তাকে তোয়াজ। ভারতে সব সহোদরাই কোন এক পুরুষের স্ত্রীরূপে সতীন হতে পারত। উনিশ শতক অবধি বাঙলাদেশেও তা ক্বচিৎ চালু ছিল। ভুটানের রাজা এখনো এমনি বিয়েই করেন।

৪. পুরুষের রিরংসা প্রসূন ঈর্ষা সুপ্ত রাখার জন্যেই নারীর বাল্যবিবাহ চালু হয় ভারতীয় সমাজে এবং অন্যত্র এমনি বিবাহে নারীর সতীত্ব তথা অন্য পুরুষস্পৃষ্টা না হওয়া বিষয়ে নিঃসংশয় হওয়া যায়। এভাবেই নারী শ্বশুর-শাশুড়ি-ননদী-স্বামীর শাসনপাত্রী হয়ে গেল, পীড়ন-নির্যাতন তারই ফল।

৫. পুরুষের চিত্তবিনোদন ও রতি-রমণ পাত্রী হওয়াই যখন নারীজীবনের একমাত্র উপযোগ ও সার্থকতা বলে বিবেচিত হল, তখনই বর্ণহিন্দু সমাজে বিধবা নারী অবাঞ্ছিত বোঝা হয়ে দাঁড়াল। সহমরণে তার মৃত্যুর কিংবা কৃচ্ছ্রতায় তার জীবন ব্যর্থ করে দেয়ার ব্যবস্থা হল। এ সূত্রেই স্মর্তব্য যে, (নারী হল বীরভোগ্যা), সুন্দরী নারীর সন্ধানে নিরুদ্দেশ অভিযাত্রাই হল বীরের ও রাজপুত্রের শক্তি-সাহস-উদ্যম-উদ্যোগের বিষয়। দুনিয়ার কাব্য-কবিতা-চিত্র-ভাস্কর্য-স্থাপত্যের এবং আজকের গল্পের-উপন্যাসের নয় কেবল বিজ্ঞাপনেরও অবলম্বন নারী। আজো প্রগ্রসর সমাজেও জরুরই (নারী) পুরুষচেতনায় রয়েছে প্রাধান্য, এর পরে স্থান জমির এবং জরির (সোনার)।

৬. আদিতে যখন লেখা-পড়ার কোন আর্থিক মূল্য ছিল না, নারীশিক্ষাও ছিল ভদ্র কুলীন ঘরেও অপ্রচল, তখন ধনী-মানী-কুলীন তথা সম্ভ্রান্ত বা খ্যাতি ক্ষমতাবান পরিবারের কন্যা বধূরূপে ঘরে এনে মানুষ কুলীন বা সমাজে সম্মানিত স্থানে উন্নীত হত এবং কোথাও কোথাও যেমন পশ্চিম এশিয়ায়, বেলুচিস্তান থেকে মধ্য এশিয়ায়ও পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা কম থাকত, ফলে কনেপণ প্রথাই ছিল চালু, বহু অর্থব্যয়ে কুলীন ঘরের কন্যা বধূরূপে ক্রয় করে আনতে হত। এটি মুসলিম সমাজে বিশ শতকেও কোথাও কোথাও চালু ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ আমলে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে (যদিও ব্রাহ্মণেরা চিরকালই বিনাপণে কন্যা সম্প্রদানে অভ্যস্ত ছিল) শিক্ষিত চাকুরে লোকের সামাজিক সম্মান ছিল সুউচ্চ। কেরানী-ডেপুটি-মুন্সেফ-জজ-ম্যাজিস্ট্রেট প্রভৃতির স্ব স্ব শ্রেণীর মধ্যে আদর-কদর-সম্মান ছিল বলে ওদের পণ-যৌতুক নামে অর্থ-সম্পদ দিয়ে ক্রয় করার রেওয়াজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চালু হল প্রথমে বর্ণহিন্দু সমাজে, পরে শিক্ষিত মুসলিম সমাজেও। এখন তা গাঁয়ের চাষী-মজুর সমাজেও দুষ্টক্ষতের মতো ছড়িয়ে পড়েছে। গোটা সমাজকে করে তুলেছে মানবিকবোধ বুদ্ধি-যুক্তি-বিবেক-বিবেচনাহীন যান্ত্রিক লেনদেনের বাজার। একালে কেবল বরই বাজারে যোগ্যতানুসারে ক্রীত-বিক্রিত হয়। এও স্মর্তব্য যে, যে-সব দেশে পুরুষ ছিল কম নারী ছিল বেশি, সেখানে পুরুষের বহু বিবাহ ছিল সহজ ও স্বাভাবিক সামাজিক স্বার্থেই, আবার যেখানে নারী কম কিন্তু পুরুষ ছিল বেশি, সেখানে এক নারীর বহুস্বামী গ্রহণে বাধা ছিল না, কিন্নর সমাজে এখনো সব ভাই মিলে একটি বধূই ঘরে আনে।

৭. শাস্ত্রে নিষিদ্ধ অপকর্ম জেনেও সমাজস্বাস্থ্য রক্ষার জন্যেই প্রবাসী বা নিঃসঙ্গ পুরুষের প্রয়োজনে বেশ্যাবৃত্তি পরোক্ষে সমাজ অনুমোদিত একটা ব্যবস্থা ছিল। তার উচ্ছেদ বা বিলুপ্তি সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তন সাপেক্ষ। কিন্তু ইসলামী জোশে বা জনপ্রিয়তার লোভে সরকার হাটে বাজারে পতিতাবৃত্তি নিষিদ্ধ করে কেবল গাঁয়ে-গঞ্জে-শহরে-বন্দরে নারীর সামাজিক নিরাপত্তাই বিঘ্নিত করেছে মাত্র। ধর্ষণ করে হত্যা করার এবং ব্যর্থ কামুকের এসিড প্রয়োগে নারী দেহের বিকৃতি সাধনের মতো দুষ্কর্ম তো পতিতালয়ের অভাবজাত সামাজিক উপসর্গ-উপদ্রব মাত্র।

৮. পণ ও যৌতুকের ক্ষেত্রে সামাজিক বিবর্তন পরিবর্তনের ধারা ছিল পৃথিবীর বিভিন্ন সমাজে ও শাস্ত্রে বিচিত্র প্রকারের। হিন্দু ঐতিহ্যে হরণ-বরণ জোর-জুলুম-প্রেম-প্রস্তাব প্রভৃতি আট প্রকারের বিবাহ প্রথা চালু ছিল। সে-যুগ অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও চালু ছিল :

১. স্বেচ্ছাবৃত বা স্বয়ম্বরা হওয়া
২. পণ নিয়ে কন্যা বিক্রয়
৩. খোরপোশ এবং নগদ অপরিশোধ্য ও পরে পরিশোধ্য অর্থের বিনিময়ে আত্মবিক্রয়।
৪. যুদ্ধে পরাজিত পক্ষের কন্যা-জায়া-ভগ্নী দান করে বিজয়ী পক্ষের তুষ্টি সাধন আর দাসীর, যুদ্ধবন্দিনীদের বিয়ে না করেই সম্ভোগ কোন কোন শাস্ত্রে বিধেয়। ১৮৬৩ সনে দাসপ্রথা রহিত হওয়ার পূর্বমুহূর্ত অবধি মার্কিন রাষ্ট্রে নিগ্রোনারী সম্ভোগে প্রভুগোষ্ঠীর অধিকার ছিল অবাধ।
৫. তারপরে সভ্যতর সমাজে পারিবারিক ও সামাজিক সম্মতিক্রমে প্রেমজ বিবাহ,
৬. পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যাল্পতার দরুন কণেপণ দিয়ে বিবাহ,
৭. পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যাগুরুত্বের জন্যে বিনাপণে বিবাহ ও বহুবিবাহ,
৮. রূপসী নারীর জন্যে প্রতিযোগীর সংখ্যাবৃদ্ধির কারণে বা ফলে নিলামী বস্তুর মতো উচ্চহারে কনেপণ দাবি করা।
৯. সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির জন্যে ধনী-মানী খ্যাতি-ক্ষমতাসম্পন্ন পরিবারে কিংবা উঠতি পড়তি কুলীন পরিবারে বিয়ে করার জন্যে অর্থ দিয়ে কনে ক্রয় করা।
১০. দরিদ্র ও নিঃস্ব কিন্তু অভিজাত পরিবারে অথবা রূপসী কন্যা বিয়ে করার জন্যে কন্যার পিতাকে বিবাহোৎসবের ব্যয় বাবদ নগদ অর্থদান। উল্লেখ্য যে বিয়ের আনন্দভোজ এবং মৃতের সদগতিভোজ পৃথিবীর সর্বত্র সর্বকালেই যেন চালু ছিল এবং এখনো রয়েছে।
১১. ব্রাহ্মণদের সালঙ্কার কন্যা সম্প্রদান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পৃথিবীর নানা গোত্রের ও অঞ্চলের বিভিন্ন সমাজে আরো বিচিত্র সব রীতি-রেওয়াজ, প্রথা-প্রদ্ধতি চালু ছিল, আজো রয়েছে, যা জানা ও বয়ান করা সমাজবিজ্ঞানীদের পক্ষেও অর্থ, সময় ও শ্রমসাধ্য কাজ।

আগে মানুষের ব্যক্তিক পরিচয় ছিল তুচ্ছ। মানুষ পরিচিত হত গৌত্রিক গৌষ্ঠীক পরিচয়ে কিংবা স্বজ্ঞাতি পরিবারের প্রখ্যাত ব্যক্তির বংশীয় বলে। তাই তখন হত 'ক' গোত্রের বরের সঙ্গে 'খ' গোত্রের কনের কিংবা 'ক' বংশের বরের সঙ্গে 'খ' বংশের কন্যার বিবাহ। পরে শিক্ষার প্রসারে মুদ্রিত নিমন্ত্রণপত্রে বাবার নামে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় পুত্র-কন্যার বিয়ে বিজ্ঞাপিত হত, এখন পিতা-মাতা-পুত্র এবং পিতা-মাতা-কন্যা সবার নাম থাকে আমন্ত্রণপত্রে, কারণ এখন ওরা সবাই শিক্ষিত বলেই স্বনামে খ্যাত বা পরিচিত, স্ব সত্তার মূল্যে মর্যাদায় স্বীকৃত।

আমরা যদি সতীত্বকে নারী সম্ভোগে পুরুষের একাধিপত্যের স্বাক্ষর ও স্বীকৃতি বলেই ঘৃণা করি, আমরা যদি কাবিনকে নারী সম্ভোগের দাম বলে অশ্লীল ও নারীর পক্ষে অবমাননাকর বলে জানি, আমরা যদি নারী সম্ভোগ্যা এবং পুরুষ সম্ভোক্তা এ চালু তত্ত্ব ভুল বলে মানি, নারী ও পুরুষ সমমাত্রায় ও সমপ্রয়োজনে দাম্পত্য বন্ধনে আবদ্ধ হয়, এ তথ্য স্বীকার করি, আমরা যদি জানি ও মানি যে মনুষ্য প্রজাতির মধ্যে বহু কাল ধরে নারী ঘরে ঘরে পুরুষপোষ্য হিসেবে ব্যায়ামে, শ্রমে-শিক্ষায় স্বাধীনতায় জীবিকা অর্জনে আত্মবিকাশে অধিকার পায়নি বলেই তাদের সম্বন্ধে আমরা ভুল ধারণাই পোষণ করি, আমরা যদি বুঝি ও মানি যে কেবল সন্তানধারণকালে ব্যতীত কায়িক শক্তিতে শ্রমে, বুদ্ধিতে, শিক্ষায়-শাসনে-প্রশাসনে ঘরে-বাইরে, সমাজে রাষ্ট্রে, সর্বত্রই নারী স্বাধীনভাবে আত্মবিকাশের সুযোগ পেলেই পুরুষের সমকক্ষ হতে পারে, যুক্তিবাদী ও আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে আমরা যদি অতীতের শাস্ত্রে ও পরম্পরাগত বিশ্বাস সংস্কারে আস্থা পরিহার করি, আমরা যদি আজকের জ্ঞান-বিজ্ঞান যুক্তি-যন্ত্র-কৌশল-প্রকৌশল-প্রযুক্তিনির্ভর যন্ত্রজগতে ও যন্ত্রনির্ভর জীবনকে প্রয়োগ ও চাহিদা অনুগ স্বকালের জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে নির্মাণে রাজি থাকি, তাহলে আমাদের পরম্পরাগত ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন ঘটাতেই হবে। আমাদের পণ, যৌতুক ও নারী নির্যাতন বন্ধ করতে হলে সাক্ষর নিরক্ষর নির্বিশেষে নারীতে পুরুষে শ্রম প্রয়োগে কলে-কারখানায়, ক্ষেতে-খামারে, দফতরে, প্রতিষ্ঠানে, সংস্থায়, ব্যবসায়-বাণিজ্যে, আড়তদারিতে বা দোকানদারিতে জীবিকা অর্জন করতেই হবে। কেউ কারো ঘাড়ে বসে খেলে পোষ্যের হীনম্মন্যতা থেকে মুক্তি মেলে না। তাই নারীকে জীবিকা ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী হতেই হবে। সমাজে নতুন দিনের নতুন প্রয়োজন স্বীকার করে নিতে হবে। বিয়ের ক্ষেত্রে ১. সন্তানদের স্ব স্ব জীবনসাথী গ্রহণের পূর্ণস্বাধীনতা দিতেই হবে ২. সমাজতন্ত্র অঙ্গীকার করতে হবে ৩. মানুষকে কেবল মানুষ পরিচয়ে গ্রহণ করতে হবে, কুলশীল জাত-জন্ম-বর্ণ-ভাষা-নিবাসের পার্থক্যকে তুচ্ছ বলে মানতে হবে। আমাদের নারীত্বের প্রতি শ্রদ্ধা এবং নারীর মনে স্বাধীনতার ও পীড়নমুক্তির আকাঙ্ক্ষা আমাদের মনে-মননে-রুচিতে-সংস্কৃতিতে য়ুরোপীয় প্রভাবের ফল। কাজেই আমাদের নারীমুক্তির পথ য়ুরোপীয় আদলেই তৈরি করতে হবে, সেখানে দাম্পত্য সম্পর্ক গড়ার মতো মেয়ে বা ছেলে পাওয়া না গেলে নারী ও পুরুষ অবিবাহিত থাকতে রাজি থাকে। আমাদের দেশেও হিন্দু-মুসলিমে অনেক নারীই আজকাল অনূঢ়া তথা অবিবাহিতা থাকে, তাদের নিন্দা ঘৃণা করে না কেউ। যদি দাম্পত্য জীবনের অভাবে তাদের জৈব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্কট-সমস্যা তাদের জীবন বৃথা ও ব্যর্থ করে দেয়, এর প্রতিকারও প্রতীচ্যদেশে Living together নীতির মাধ্যমে হয়ে যাচ্ছে। আমরা তেমন প্রাগ্রসর মন-মনন-রুচি-অনুশীলনের মতো উদার হতে পারিনি বটে, কিন্তু প্রয়োজন ও পরিবেশ আমাদেরও সে-পথে টানবে। সবটাই প্রয়োজনেই পরিবর্তিত হয়, এ যন্ত্রনির্ভর-জীবনে আমরা কি বহু ক্ষেত্রে প্রাচীন-শাস্ত্রিক-সামাজিক-নৈতিক-আচারিক বিশ্বাসসংস্কার, খাদ্য, পোশাক, তৈজস, আসবাব, শিক্ষা, চিকিৎসাপদ্ধতি পরিবর্তন করিনি—পুরোনোকে বর্জন করে নতুনকে বরণ করছি না প্রতিদিন অঙ্গে ও অন্তরে, ঘরে ও সমাজে? নারীশিক্ষা প্রথম চালু হল ব্রিটিশপ্রভাবে শিক্ষিত শহুরে ব্রাহ্ম ও দেশজ খ্রীস্টান সমাজে। পরে শিক্ষিত বর্ণহিন্দু সমাজে আন্দোলন-প্রচার-প্রচারণা মাধ্যমে চালু হয় নারীর উচ্চশিক্ষা। আর মুসলিম সমাজে যারা ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করল, তারাও নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে থাকলেও নিজেদের নগণ্যতার দরুন কন্যাকে শিক্ষালয়ে পাঠাতে সাহস পায়নি। বিশ শতকের চতুর্থ দশক থেকে শিক্ষিত মুসলিমেরা নারীশিক্ষায় উৎসাহী হয়। এখন যে-কোন সচ্ছল গৃহস্থই ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার গুরুত্ব বোঝে, তাই গাঁয়ে গাঁয়েও সচ্ছল নিরক্ষর পরিবারের মেয়েরাও উচ্চবিদ্যালয়ে লেখাপড়া করছে। শিক্ষিত নারীর হার দ্রুত বাড়ছে। এ সূত্রে স্মর্তব্য যে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত মেমোরিয়েল বালিকা বিদ্যালয় উর্দুভাষী মেয়েদেরই স্কুল ছিল, বাঙালী মেয়ে ছিল, মাত্র দু'জন ১৯২৭ সনে। কাজেই বাঙালী ঘরে শিক্ষা বিস্তারে রোকেয়ার দান প্রত্যক্ষে ছিল না, অবশ্য তাঁর লিখিত সাহিত্য সমকালে কিছু শিক্ষিত বাঙালীকে নারীশিক্ষাদানের গুরুত্বসচেতন করেছিল। কাজেই বাঙলাদেশে মুসলিম নারীশিক্ষার প্রসারে বেগম রোকেয়ার অনুপ্রেরণার চেয়ে কালের দাবিই অধিক কাজ করেছে। এর জন্যে মুসলিম সমাজে আন্দোলন করতে হয়নি কোথাও।

বিশ্ববিজয়ী আলেকজান্ডারের মেসিডোনিয়ার এক লোকগীতিতেও পাই পত্নীত্বের গৃহগত শৃঙ্খলিত জীবনের করুণ আলেখ্য। কেতকী কুশারী ডাইসনের তর্জমা উদ্ধৃত করছি :

তুমি যথেষ্ট দিন বালিকা থেকেছ
যথেষ্ট দীর্ঘ বেণী বেঁধেছ
এখন থেকে অপেক্ষা করবে
হাট থেকে স্বামীর ফেরার জন্য
বন থেকে ভাশুরের ফেরার জন্য
আঁধার কারাগার
তোমার বাহুর উপরে ভারী লোহা
তোমার মাথার উপরে ভারী বোঝা
আঁধার কারাগার তোমার স্বামী
ভারী লোহা তোমার শিশু
ভারী বোঝা তোমার গৃহ।

এতক্ষণ যে-সব কথা বলা হল, তা নারীমুক্তির জন্যে বাঙলাদেশের অজ্ঞতা-অনক্ষরতাদুষ্ট পরিবেশে প্রতিবেশে বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না। তাই এ মুহূর্তে বাঙলাদেশে নারীমুক্তির জন্যে না হোক, নারী নির্যাতনের উপশম ঘটানোর জন্যে যা করা আবশ্যিক ও জরুরী তা হচ্ছে শিক্ষিতা, স্বল্পশিক্ষিতা, সাক্ষর, নিরক্ষর নারী মাত্রকেই বিভিন্ন রকমের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রশিক্ষণ দিয়ে কিংবা কায়িক শ্রমে জীবিকার্জনে সমর্থ করে তুলতে হবে। তাহলেই খোরপোশ আশ্রয়ের অভাবে যেসব অসহায়-নিরুপায় নারী ভাত-কাপড়ের জন্যে স্বামীনির্ভর থাকে বলেই স্বামী-শাশুড়ির নির্যাতন সহ্য করতে বাধ্য হয়, জীবিকার্জনে সমর্থ হলে সে-সব নারী স্বাধীনভাবে বাঁচতে পারবে পীড়ন-মুক্ত হয়ে।

নারীকে শিক্ষা দেয়া ও নারীকে যে-কোন কাজে প্রশিক্ষণ ও প্রেরণা প্রবর্তনা দেয়া সরকারের, রাজনীতিক দলের এবং সাধারণভাবে সর্বশ্রেণীর সমাজসেবী ও বুদ্ধিজীবীর আবশ্যিক নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে মনে করি। নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখলেই কেবল গাঁয়ের গৃহস্থ ঘরের অনূঢ়া মেয়েরাও মা-বাবা-ভাইয়ের বোঝা হয়ে থাকবে না। গাঁয়ে গাঁয়ে, গৃহস্থদের মেয়ের বিয়ে দেয়া যে অবশ্য কর্তব্য ও দায়িত্ব নয়, তা রেডিয়ো-টিভিযোগে কথিকা-নাটক মাধ্যমে প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে, ভদ্রঘরের চির অনূঢ়া মহিলাদের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে গরিব গৃহস্থদের বল-ভরসা যোগাতে হবে, যাতে পণ-যৌতুক দানে অসমর্থ পিতা মিথ্যা অঙ্গীকারে কন্যা বিয়ে দিয়ে কন্যার লাঞ্ছনার, মৃত্যুর কিংবা ফেরত আসার কারণ হয়ে না দাঁড়ায়। ভদ্রলোকদের মতো মেয়ে অনূঢ়া রাখার ও থাকার জন্যে পাপভীতি কিংবা সামাজিক নিন্দাভীতি মুক্ত হতে পারলে পণ ও যৌতুক উঠে যাবে এবং প্রেমের বা পছন্দের বিয়ে চালু হবে। এ পথে অবশ্য ইতোমধ্যেই গাঁয়ের মেয়েরা এগিয়েছে, গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে, কুটির শিল্পকেন্দ্রে, ইট ভাঙা, মাটি কাটার কাজ নিয়েছে। বিয়ে হলেও রোজগেরে বউকে নির্যাতন করা সম্ভব হবে না, আর না হলেও মেয়ে পিতা-মাতার বোঝা হয়ে থাকবে না। পর্দা অবরোধ-অবগুণ্ঠন উঠে যাচ্ছে। পুরুষের মধ্যে নিঃসংকোচে কাজ করতে অভ্যস্ত হয়েছে ও হচ্ছে নারী। এপথেই ঘটবে নারীমুক্তি আর্থ-সামাজিক ও মানসিকভাবে। জানি, এসব বলা সহজ, বোঝানো কঠিন, বাস্তবায়ন কঠিনতর। শহরে শিক্ষিত ধনীরাই কেবল শাস্ত্র, সমাজ ও দেশাচার উপেক্ষার অবাধ শক্তি রাখে। কোন কোন শাস্ত্রমতে নারীর মর্ত্যজীবনে স্বামী মাত্রই ঈশ্বর, মর্ত্যদেবতা। জগতের সব ধর্মশাস্ত্রেই নারী পুরুষসম্ভোগ্যা, পুরুষসেবিকা পুরুষাধীন রূপেই বর্ণিত। সব শাস্ত্রে পুরুষই নারীর অভিভাবক। অতএব শাস্ত্র পরিহার করে নাস্তিক না হলে নারী পুরুষের মতো পূর্ণ স্বাধীন হতেই পারবে না। নাস্তিক না হলে নারীর স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রামের অধিকার মিলবে না। কেননা, শাস্ত্রের অনুরাগী, অনুগামী ও অনুগত কেউ স্বাধীনতার কল্পনাই করতে পারে না।

প্রগতিপন্থী চিন্তা-চেতনার অনুশীলন

মানুষ জন্মসূত্রেই পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশে প্রতিবেশে নানা শাস্ত্রিক ও দেশাচার-লোকাচার সম্পৃক্ত বিশ্বাস-সংস্কারে মন-মনন পূর্ণ ও পুষ্ট করে গেলে সে গ্রাহিকাশক্তি হারায়, জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেচনা তখন তার মনে মস্তিষ্কে কোন প্রভাব ফেলতে পারে না। সে শাস্ত্রিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-আচারিক নীতি-নিয়মে, রীতি-রেওয়াজে, প্রথা-পদ্ধতিতে অভ্যস্ত হয়ে বাঁধা পথে চলতে যেয়ে যে-কোন নতুনে কিংবা বিচ্যুতিতে অস্বস্তিবোধ করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবু কোন মানুষই স্বকালের স্বজীবনের নতুন চাহিদাকে তথা প্রয়োজনকে এড়িয়ে চলতে পারে না, অনিচ্ছায় নতুন প্রজন্মের ও নতুন যুগের আবিষ্কার-উদ্ভাবন-ফ্যাশন-রীতি-রেওয়াজ নিজের অজ্ঞাতেই বরণ করে নেয় অর্থাৎ তার চোখ-সহা, মন-সহা ও গা-সহা হয়ে যায়। ফলে শাস্ত্রিক বিধি-নিষেধ মানুষ চিরকালই প্রজন্মে প্রজন্মে ভেঙে চলেছে। সাক্ষ্য প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও কিন্তু নতুন চিন্তা-চেতনা-আচার গ্রহণে সাধারণ শিক্ষিত মানুষও বিমুখ। কিন্তু নতুনের ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলা সহজ নয়, ব্যক্তির অজ্ঞাতেই ব্যক্তিজীবনে, পারিবারিক জীবনে ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনে কেবল যে উদারতায় সহ্য করতে হয়, তা নয়, আসক্তি আকর্ষণ এবং অনুরাগও অনুভব করে। এজন্যেই শাস্ত্র কেবল বাহ্য খোলস হয়ে টিকে থাকে, অন্তরে মানুষ শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন করে আর ব্যবহারিক জীবনে বর্জন করে, করে অবহেলা, অস্বীকার।

একজন মুসলিম এখন সিনেমা, সহশিক্ষা, নারীর চাকরী, নাচ, গান, বাজনা, খেলাধূলা, একাকী বিদেশে লেখাপড়া করা, ছবি তোলা, চিত্রী হওয়া, ভাস্কর হওয়া, পাসপোর্টে ছবি রাখা, নামাজের সময়েও পকেটে প্রাণীর ছবিযুক্ত টাকা রাখা, ঘরে ফটো, চিত্র, ভাস্কর মূর্তি রাখা প্রভৃতি কর্মে-আচারে আরো অভ্যস্ত হয়ে গেছে। আবার য়ূরোপীয় গণতন্ত্র, অশাস্ত্রিক পদ্ধতিতে অপরাধীর বিচার ব্যবস্থা, বিজাতি-বিধর্মী-নিরীশ্বর রাষ্ট্রের-সরকারের ও ব্যক্তির থেকে ঋণ দান ও ত্রাণ সামগ্রী গ্রহণ, যাত্রা, নাটক প্রভৃতি সাহিত্য চর্চা ছাড়াও রাজনীতিক-কূটনীতিকদের মকরুহ ও হারাম খাদ্য পানীয় দিয়ে মেজবানের [স্বাগতিকের] ভূমিকা পালন, প্রভৃতি বহু বহু অশাস্ত্রিক কর্ম-আচার-আচরণ আমাদের সার্বক্ষণিক জীবনে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

আবার সংস্কৃতি ও জীবনযাপন পদ্ধতিক্ষেত্রেও আমরা হেকিমের তিব্বিয়া-ইউনানী, বৈদ্যের আয়ূর্বেদীয় চিকিৎসা ছেড়ে খ্রীস্টান আবিষ্কৃত চিকিৎসা-পদ্ধতি নির্দ্বিধায় নিঃসংকোচে গ্রহণ-বরণ করেছি। আমাদের মাথার চুল কাটা-ছাঁটা থেকে পায়ের জুতোর আদল, পোশাক-পরিচ্ছদ, আসবাব-তৈজস, আদব-কায়দা ও সৌজন্যমূলক আচরণাদি এবং আমাদের রুচিবান প্রাগ্রসর প্রগতিশীল নারী- পুরুষদের জীবনযাত্রাপদ্ধতি ও খাদ্য তৈরির রীতি-রুচিও য়ূরোপীয়। আর না বললেও চলে যে আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎসও য়ূরোপ। শিক্ষণ প্রশিক্ষণ-পদ্ধতিও য়ূরোপীয়, শাসন-প্রশাসন-সংবিধান এবং দফতরে আদালতে কর্মপদ্ধতি সবটাই ব্রিটিশ প্রবর্তিত, য়ূরোপীয় নীতি-নিয়মজাত। যন্ত্র-যন্ত্রী-চিকিৎসাপদ্ধতি, প্রকৌশল-প্রযুক্তি, শিল্প-সাহিত্য, ভাস্কর্য-স্থাপত্য, খেলাধুলা, খাদ্যবস্তুর বৈচিত্র্যের বৃদ্ধি প্রভৃতি সব কিছুই তো পাচ্ছি য়ূরোপ থেকে। আমাদের নিজেদের ঐতিহ্যিক কিংবা মৌলিক অংশ আমাদের প্রাগ্রসর প্রগতিশীল ভাব-চিন্তা-কর্ম আচরণে দুর্লভ ও দুর্লক্ষ্য এবং গাঁয়েগঞ্জেও এখন দেশী নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ, প্রথাপদ্ধতি বিরলতায় দুর্লক্ষ্য হয়ে উঠছে। এক্ষেত্রে রেডিয়ো-ভিসিআর-ভিসিপি-সিনেমার প্রভাব গভীর ও ব্যাপক আর হাটে-বাটে সর্বত্র আমদানীকৃত বিদেশী পণ্যসামগ্রীই আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সর্বপ্রকার চাহিদা মেটাচ্ছে।

কাজেই আমাদের মন্ত্রী-সাংসদ-বুদ্ধিজীবীর ভাষণ-বক্তৃতায় যতই দেশীয় ও জাতীয় সংস্কৃতির ও বৈশিষ্ট্যের রক্ষণ লালন আবশ্যিক ও জরুরী বলে প্রচার-প্রচারণার ব্যবস্থা করা হোক না কেন, ক্ষয়িষ্ণু বন্ধ্যা পুরাতন চাকচিক্য ও উপযোগরিক্ত সমকালীন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রুচিবিরোধী কিছুই ধরে রাখা যাবে না। কেননা অতীত ও ঐতিহ্য কেবল ধরে রাখে, কেবল পিছু টানে, ক্ষতিকরভাবে সামনে চলার গতি রোধ করে, স্থির স্তব্ধ অতীত বা পেছনমুখী করে তোলে; বন্ধ্যাত্ব তেমন ব্যক্তিকে সমাজকে সংস্কৃতিকে রুচিকে শক্তিকে রাষ্ট্রকে এমনকি সরকারকেও শুধু অবক্ষয়গ্রস্ত করে। পৃথিবীর প্রতি মুহূর্তের আবিষ্কার-উদ্ভাবনঋদ্ধ বিকাশে, উৎকর্ষে, বৈচিত্র্যে ও সৌকর্যে সদা প্রসারমাণ যন্ত্রের প্রসাদ থেকে নিজেদের বঞ্চিত রাখা, স্বকালের প্রগতিশীল প্রাগ্রসর চিন্তা-চেতনা-মনীষা থেকে দূরে সরে থাকা আত্মপ্রবঞ্চনার নয় শুধু আত্মহননেরও নামান্তর মাত্র। একালে সব জাতিকেই স্ব স্ব শাস্ত্রের শাসন, বন্ধন কার্যত পরিহার করতেই হয়েছে, ইহুদী খ্রীস্টান-বৌদ্ধ-জৈন-হিন্দু-মুসলমান কেউ যথার্থ অর্থে এবং শাস্ত্রিকভাবে বাঞ্ছিত ও প্রত্যাশিত মানে মাপে-মাত্রায় শাস্ত্রানুগত ও শাস্ত্রনিষ্ঠ থাকতে পারছে না, পারে না, পারবে না। কেননা, কোন পুরাতনই প্রাগ্রসর চিন্তা-চেতনার, রুচি-সংস্কৃতি-মনীষাঋদ্ধ মনের ও জীবনযাত্রার চাহিদা মেটাতে পারে না। অতীত মাত্রই বর্তমানের তুলনায় অজ্ঞতার, স্বল্পজ্ঞানের, অসম্পূর্ণ জ্ঞানের, বুদ্ধির, প্রজ্ঞার, স্থূল রুচির ও স্বল্পলাবণ্য-লালিত্যের সংস্কৃতির কাল। এ তত্ত্ব ও তথ্য অবশ্যই স্বীকার্য। কাজেই অতীতের তো বটেই বর্তমানের জ্ঞান-বুদ্ধি-প্রজ্ঞা-মনীষাও অসম্পূর্ণ। জ্ঞান-প্রজ্ঞা-বুদ্ধি-যুক্তি-মনীষা-আবিষ্কার-উদ্ভাবন, প্রকৃত ও পূর্ণ তত্ত্ব ও তথ্য প্রভৃতির পূর্ণতা বা পূর্ণরূপ রয়েছে অনন্ত অশেষ ভবিষ্যতের গর্ভে। আমরা আজো বাস করছি অজ্ঞতার মহাসমুদ্রের কিনারায় জ্ঞানের ভেলায়। কাজেই চোখ, কান, মন, মনন, বুদ্ধি, চিন্তা-চেতনা, যুক্তি সব নতুনকে গ্রহণ-বরণ অনুশীলনের জন্যে তৈরি করা ও রাখাই হচ্ছে কাল ও জীবনসচেতন বুদ্ধিমানের দায়িত্ব ও কর্তব্য। গ্রহণবিমুখতার মতো আধি, জিজ্ঞাসাশূন্যতার মতো বন্ধ্যাত্ব, চিন্তাশক্তিহীনতার মতো অসামর্থ্য, মানুষের জীবনকে এ পার্থিব জীবনের গভীর ব্যাপক বৈচিত্র্য, মাধুর্য, সৌন্দর্য, গুরুত্ব প্রভৃতির মানস ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগ থেকে তথা আনন্দ-উল্লাস-আহ্লাদ থেকে বঞ্চিত রাখে।

আগেই বলেছি, এ যুগে শাস্ত্র মানবিক জীবনযাপনের প্রতিকূল, কেননা এ যন্ত্রবাহুল্যের যান্ত্রিক যুগে ও যন্ত্রনিয়ন্ত্রিত জগতে এবং যন্ত্রনির্ভর জীবনে, অজ্ঞতার যুগে তৈরি আন্দাজে অনুমানে শ্রেয়ো বলে স্বীকৃত কল্যাণকর শাস্ত্রিক বিধি-বিধান অচল। বিশেষত হেন দেশ বা রাষ্ট্র বা শহর বন্দর নেই যেখানে ভিন্ন ভিন্ন ও বিপরীতমুখী শাস্ত্রমানা লোক নেই, কাজেই সর্বজনস্বীকৃত নয় বলেই এ যুগে আমাদের সর্বপ্রকার জাগতিক চিন্তায়-কর্মে-আচরণে সেক্যুলার হতেই হবে। নইলে বিশ্ববাজারে পণ্য ক্রেতা-বিক্রেতা-উৎপাদক-নির্মাতা হিসেবে আমরা বিচ্ছিন্নতার ও স্বাতন্ত্র্যের জালে বদ্ধ হয়ে আত্মবিনাশ ও অবক্ষয় ত্বরান্বিত করব মাত্র। যেমন, হিন্দুরা কি এখন অস্পৃশ্যতা, পুরুষের বহুবিবাহ, নারীর বৈধব্য, অবিচ্ছেদ্য বিবাহ, শূদ্রের শাস্ত্রচর্চা, তিথি-লগ্ন-নক্ষত্র-রাশির শুভাশুভ, অগস্ত্যযাত্রা, অমাবস্যা কিংবা শনি-মঙ্গলবার মেনে চলে, কাজ করতে পারে? শনি-মঙ্গলবারে, অমাবস্যার দিনে, পয়লা ভাদ্রে তার পরীক্ষা দিতে হয়, অফিসে যেতে হয়, মামলায় হাজিরা দিতে হয়। কাজেই একালে অতীতের অজ্ঞতার কালের, অপূর্ণ অবিকশিত মানববুদ্ধি প্রসূত শাস্ত্র বাদ দিয়ে সেক্যুলার হওয়ার মধ্যেই রয়েছে কল্যাণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মার্কসীয়তত্ত্বের নির্যাস

দুস্থ নিরন্ন মানুষের প্রতি কিছু মানুষের দরদ ও সহানুভূতি চিরকালই ছিল। এমনকি দাসযুগেও সব প্রভু নিষ্ঠুর ছিল না। কোন কোন মানুষে স্নেহ প্রীতি ভালোবাসা আদর আবেগ কিছু অধিক থাকে। তাদের এ দরদী মনের পরিচয় মেলে তারা কুকুর-বিড়াল-পাখি পোষে, কোলে পিঠে নিয়ে আদর করে, গৃহপালিত গরু-ছাগল-ভেড়াকে, হাঁস-মোরগকেও এমনি সস্নেহ আদর করে কোন কোন গৃহস্থ। প্রায় সন্তানের মতোই যত্নও করে। আশ্চর্য তেমন ব্যক্তিও স্বপ্রজতির মানুষের প্রতি নিষ্ঠুর হয়। পশু-পাখির প্রতি পরম মমতায় যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে দায়িত্ব ও কর্তব্য বরণ করে লালন-পালনের, সেই মানুষও মানুষের স্পর্শে তাঁর দেহ-মন অপবিত্র হয় বলে মনে করে, মানুষকে গায়ের রঙ-রূপের মানে কালো-ধলোর অসাম্যে বৈষম্যে গুরুত্ব দেয়।

নিরন্ন ক্ষুধার্ত মানুষের প্রতি সংবেদনশীল ব্যক্তির দরদ কৃপা-করুণা-দান-দাক্ষিণ্য রূপে অভিব্যক্তি পায়। হাজার হাজার বছর ধরে নবী অবতার সাধু সন্ত প্রভৃতি সমাজসংগঠক নানা প্রসঙ্গে বিভিন্ন সূত্রে তাঁদের বাণীর ও দেশনার মাধ্যমে নিরন্ন-নিঃস্বদের অন্ন-বস্ত্রদানে লালনের-পালনের-পোষণের কথা বলে গেছেন। তাই দরিদ্রকে নারায়ণরূপেও কোন কোন দরদী মানুষ অভিহিত করে তার প্রতি ধনীর দায়িত্ব ও কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। আর মহাবীর ও গৌতমবুদ্ধ কেবল মানুষ নয়, জগতে সব জীবের-ক্ষুদ্র কীটপতঙ্গ মশা মাছি থেকে হাতী তিমি অবধি সব প্রাণীরই বাঁচার এবং পৃথিবীতে সহাবস্থানের অধিকার স্বীকার করেছেন এবং অনুগত ভক্তদের দিয়ে বাস্তবায়নও করিয়েছেন আড়াই হাজার বছর আগেই। তবু অন্য প্রাণীর চেয়ে মানুষের প্রতিই মানুষের ঘৃণা-অবজ্ঞা-হিংসা-ঈর্ষা বেশি নানা কারণে। মানুষের সমাজেও চিরকাল জঙ্গলজীব সুলভ কাড়াকাড়ি-মারামারি ও হানাহানি লঘু-গুরুভাবে চলে আসছে। উদ্ভিদভোজী নয় তেমন বিভিন্ন জীবের মধ্যে রয়েছে খাদ্য-খাদক সম্পর্ক। মানুষ হচ্ছে সর্বভুক। তার লিপ্সার, তার ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগ বাঞ্ছার কোন সীমা শেষ নেই। তার ছল-চাতুরী-কৌশল-ধূর্ততাও অশেষ। তাই তাকে আদেশে-নির্দেশে-উপদেশে পাপের শাস্তির ও নিন্দার ভয় দেখিয়ে শায়েস্তা রাখা যায়নি, যায় না। এভাবেই ভূত-ভগবানের, শাস্ত্রের ও নৈতিকতার দোহাই ব্যর্থ হয়েছে মানুষের সামাজিক তথা যৌথজীবনে, আজো বৃথা ও ব্যর্থ প্রমাণিত হচ্ছে। যদিও হাজার হাজার বছর আগে থেকেই তাদের নানা অলীক-অলৌকিক ভয় ও লৌকিক সামাজিক কারণ দেখিয়ে বোঝানোর চেষ্টা হয়েছে দেশে দেশে কালে কালে, গৌত্রিক গৌষ্ঠীক সাম্প্রদায়িক জীবনে দ্বেষ-দ্বন্দ্বে নয়, সংযমে-সহিষ্ণুতায়-সহযোগিতায়-সৌজন্যে শান্তিতে-স্বস্তিতে সুখে নির্বিরোধে-নির্বিঘ্নে-নিরুপদ্রবে-নিরাপদে সহাবস্থান সম্ভব। বারবার গুণী-জ্ঞানী মানবহিতৈষী শান্তিকামী শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিরা দেশে-দেশে, কালে-কালে স্বসমাজে স্বজনদের বলেছেন—ভালো হও, অপরের ভালো চাও, অন্যের ভালো কর, মানুষকে ক্ষমা করতে শেখ, লোভ করো না, মানুষকে ভালোবাস। বর্ধমান মহাবীর ও গৌতমবুদ্ধের আগে কেউ সর্বজীবের বেঁচে থাকার, পৃথিবীতে অন্য প্রাণীদের সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সহাবস্থানে নিরাপদে জীবন যাপনের জন্মগত অধিকারের কথা উচ্চারণ করেন নি, যদিও আগেই বলেছি দরদী মানুষের স্বল্পসংখ্যায় হলেও কোথাও কখনো অভাব বা অনুপস্থিতি ছিল না। ষোল শতকের উটোপিয়ান টমাস মুরকে এবং আরো কয়েকজন উটোপিয়ান মানববাদীকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলা চলে, উনিশ শতকে কার্ল মার্কসই প্রথম নির্বিশেষ মানুষের আঁধা-কানা-খোঁড়া-পঙ্গু-রুগ্ন-অনাথ-অসহায় নারী পুরুষ শিশু বৃদ্ধ-বৃদ্ধার খেয়ে পরে বেঁচে থাকার জন্মগত অধিকার সযুক্তি স্বীকার ও প্রচার করলেন এবং বাস্তবায়নের পন্থাও বাতলালেন। তিনি যে পন্থা নির্দেশ করলেন, তা হল Maximum বা Greatest good to the majority নীতি বা তত্ত্বভিত্তিক। তিনিই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে মনুষ্যসমাজে সর্বত্র দৃশ্যে ও অদৃশ্যে রয়েছে শ্রেণী বিভক্তি। শোষকের ও শোষিতের শ্রেণী। অবচেতনভাবেই চলছে কাড়াকাড়ির এ শ্রেণীদ্বন্দ্ব ও শ্রেণীলড়াই। বাহুবলে ও বুদ্ধিবলে, ধনে জনে প্রবল ব্যক্তিরাই শোষণ করেছে ক্ষীণপ্রাণ, স্বল্পবুদ্ধি, ভীরু, সরল, দুস্থ, নিরন্ন, নিঃস্ব, দুর্বল, অসহায় মানুষদের।

মার্কস-এঙ্গেলসের নির্দেশিত তত্ত্বে ও পন্থায় প্রায়োগিক হেরফের যুক্ত করে লেনিন-মাও রক্তাক্ত বিপ্লব মাধ্যমে মানুষের বাঁচার জন্মগত অধিকারকে বাস্তব রূপ দিলেন। অতি সরল করে মার্কসবাদের যে নির্যাস বয়ান করা চলে, আমরা এখানে তাই বয়ান করছি। মা-বাপের দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে তাদের জন্ম-দেয়া সন্তানের ভাত-কাপড়ে পোষণ করা। যদি এমন হয় যে মা-বাবার ছয়টি সন্তানদের মধ্যে তিনটে নিখুঁত অবয়বের পুত্র হল আর দুটো পুত্রের একটি হল অন্ধ, অন্যটি হল পঙ্গু আর ষষ্ঠটি হল মেয়ে। মা-বাপের এখন দায়িত্ব হল তিনটে পূর্ণাঙ্গ সন্তানকে যে-কোন কাজের যোগ্য করে কাজ ধরিয়ে বা পাইয়ে দেয়া, অন্ধ ও পঙ্গু সন্তানদের বসিয়ে খাওয়ানো এবং মেয়েকে পাত্রস্থ করা। সন্তানদের যেমন মা-বাবার উপর এ জন্মগত অধিকার ও দাবি, মা-বাবারও তেমনি দায়িত্ব ও কর্তব্য এড়ানোর কোন উপায় নেই।

আধুনিক রাষ্ট্রের বা সরকারের দায়িত্বও হচ্ছে যোগ্যতানুসারে রাষ্ট্রবাসী সমর্থ নারী-পুরুষ মাত্রকেই জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা করে দেয়া। জীবিকার্জনের জন্যে কাজ পাওয়ায় রয়েছে সমর্থ নাগরিকের জন্মগত অধিকার। সে সঙ্গে রয়েছে তার নিম্নতম প্রয়োজনানুযায়ী অশন-বসন-নিবাস-নিদান-চিকিৎসা-স্বাস্থ্য ও শিক্ষা প্রভৃতি সর্ববিষয়ে সরকারী দায়িত্বের ও কর্তব্যের স্বীকৃতি আদায়ের। আর যারা অনাথ শিশু, রুগ্ন, অন্ধ, পঙ্গু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা তাদেরও রয়েছে সরকারী বৃত্তিজীবী হয়ে বেঁচে থাকার জন্মগত অধিকার। মানুষকে কত গভীরভাবে ভালোবাসলে, কত বড় মানববাদী হলে, মনুষ্যত্ব বা মানবতা কত উঁচু মানের মাপের ও মাত্রার হলে, ব্যক্তির মেধা-মনীষার বিকাশ কত উঁচুমানের হলে, মানুষকে খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখার এ চিন্তা মানব-মনীষা-মগজ অনুশীলনে সম্ভব হয়, তা ভাবা যাদের পক্ষে সম্ভব কেবল তারাই কার্ল মার্কসের মনুষ্যত্বের ও মনীষার মূল্য-মর্যাদা বিস্তার-বিকাশ-উৎকর্ষ অনুভব-উপলব্ধি করতে পারে।

আজ পুঁজিবাদীদের চক্রান্তে ও প্ররোচনায় এ প্রজন্মের রাশিয়া-চীনের লোকেরা যথাক্রমে সত্তর বছর আগেকার জারশাসিত রুশসাম্রাজ্যের মানুষের নিঃস্বতা, নিরন্নতা-ভূমিদাসত্ব-অনাহার-অপুষ্টিজাত যন্ত্রণাময় জীবনের অবসানের ইতিবৃত্ত অকালে ভুলে গেছে। তাই এ হুজুগে দ্রোহিতায় আত্মহননের পথে এগুতে তাদের এত উৎসাহ। আমাদের বিশ্বাস অচিরেই তারা উপলব্ধি করবে অনেক কিছু হারিয়ে, অনেক জ্বালা যন্ত্রণা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভুগে, তারা যে পথ বেছে নিয়েছে সোৎসাহে তা অতি পুরোনো সেই শাহ-সামন্ত-বেণে-বুর্জোয়া পন্থা, যাতে রয়েছে 'যোগ্যতমের উর্ধ্বতম' তত্ত্ব, যেখানে জোর যার মুলুক তার, যেখানে শিষ্টের দমন ও দলন আর দুষ্টের লালন-পোষণই রীতি, যে আর্থ-সামাজিক নীতি-নিয়মে রীতি-রেওয়াজে প্রথাপদ্ধতিতে থাকে ভিখিরী, চোর ডাকাত রাহাজান, চোরাচালানী, আড়তদারী, মজুতদারী, মুনাফাখোরী, ঘুষ, দালালি, কমিশন, বখশিস, পাওন, নজর, উপঢৌকন প্রভৃতি নামে সর্বপ্রকার লুটপাটমূলক দুর্নীতি। শ্রেণীদ্বন্দ্ব, শোষক-শোষিত সম্বন্ধই সে-সমাজের বৈশিষ্ট্য। আজ দুনিয়ার অপ্রতিদ্বন্দ্বী পুঁজিবাদী মার্কিন সরকার নানাভাবে ষড়যন্ত্রপটু বুশের নেতৃত্বে সমাজবাদী রাষ্ট্রগুলোর প্রতি আগ্রাসন নীতি চালু করেছেন, সমাজবাদী কম্যুনিস্ট বিনাশের সংকল্প নিয়ে। কিন্তু আমরা জানি মার্কসবাদের বিকল্প কিংবা তার চেয়ে উৎকৃষ্ট কোন পন্থা-পদ্ধতি উদ্ভাবিত না হলে মার্কসবাদই মানবমুক্তির, শোষণমুক্তির, মানবতার, মনুষ্যত্বের, মানুষের বাঁচার এবং মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার অবিকল্প উপায় বলেই, সর্বপ্রকার শ্রেণীদ্বন্দ্বের বিলুপ্তি সনদ রূপে আমরা জানব, বুঝব এবং মানব। মার্কসবাদ জিন্দাবাদ। অক্টোবর বিপ্লব আমাদের প্রেরণার, প্রণোদনার প্রবর্তনার এবং মানববাদ প্রচারের অবলম্বন থাকুক। এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বিড়াল'-এর একটা উক্তি উদ্ধৃত করছি; "ধনীর দোষেই দরিদ্র চোর হয়, পাঁচশত দরিদ্রকে বঞ্চিত করিয়া একজনে পাঁচশত লোকের আহার্য সংগ্রহ করিবে কেন? অতিরিক্ত অংশ তাহা দরিদ্রকে দিবে না কেন? যদি না দেয়, তবে দরিদ্র অবশ্য তাহার নিকট হইতে চুরি করিবে, কেননা অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্য এ পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই।"

AMARBOI.COM

পুঁজিবাদ বনাম মার্কসবাদ

পাকা পুঁজিবাদীরা বলছে সমাজতন্ত্র জীবনচেতনা বিরোধী অস্বাভাবিক ব্যবস্থা বলেই ভেঙে গেল সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব য়ুরোপ, ভাঙন ধরবে চীন প্রভৃতি রাষ্ট্রেও। পুঁজিবাদীরা তাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির পতনে উল্লসিত। সে-সঙ্গে স্তন্যবঞ্চিত ছাগলের তৃতীয় বাচ্চার মতো তৃতীয় বিশ্বের ধর্মধ্বজীরা এবং মৌলবাদীরাও আনন্দে উল্লাসে আটখানা। নিরীশ্বরদের এ পতন ঈশ্বরের অস্তিত্বের শক্তিমত্তার ও সুবিচারেরই যেন প্রমাণ প্রতীক প্রতিম প্রতিভূ। কাজেই অধিকাংশ শাস্ত্রমানা মানুষ দরিদ্র ও বুভুক্ষু হয়েও অনিশ্চিত ও অনিকেত জীবনের শিকার হয়েও নির্বোধের স্বর্গে বাস করছে—এ যেন খোয়াবে খেয়ালির পোলাও খাওয়ার আনন্দ। এতে আমাদের আপাতত কোন ক্ষতি নেই তবে এমনি মনোভাব মানবতার মানবিকতার বিকাশ রুদ্ধ বা প্রতিহত করে। এ জন্যেই আমাদের দুশ্চিন্তা।

সমাজতন্ত্র মানবজীবনচেতনা বিরোধী মানব স্বভাবের বিকাশ বিরোধী, এবং সাধারণভাবে মানুষের মন-মনন-মনীষার স্ফূর্তি প্রতিরোধক, এই হচ্ছে তাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এযাবৎকালের সুচিন্তিত অভিযোগ। কাজেই তাদের ধারণার বাস্তবায়ন ঘটেছে সোভিয়েত রাশিয়ার বিলুপ্তিতে। এ-ই হচ্ছে তাদের বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণীর আক্ষরিক প্রতিফলনের আনন্দ ও উল্লাস।

কিন্তু অন্যদিকে যে কার্ল মার্কসেরও ভবিষ্যদ্বাণী আক্ষরিকভাবে একটু বিলম্বে হলেও ফলতে শুরু করেছে, সে-বিষয়ে আমরা আস্তিক-শাস্ত্রিক-পুঁজিবাদী ও আর্থ-বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যবাদীদের চোখ-কান-মন দিতে অনুরোধ জানাচ্ছি। কার্ল মার্কস বলেছিলেন, পুঁজিবাদী বিশ্বের পতন অবশ্যম্ভাবী, পুঁজিবাদের বিলুপ্তি আসন্ন। তার মৃত্যুলক্ষণ প্রকট। নাভিশ্বাস উঠেই গেছে। মার্কস নবী-অবতার-গণক-দরবেশ-সন্ত-ছিলেন না, তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অধ্যাত্মসিদ্ধির প্রসূন নয়, বৌদ্ধিক ও যৌক্তিক হিসেবে পাওয়া কিংবা চিকিৎসকের দৃষ্টিতে দেখা লাক্ষণিক নিদান বা সিদ্ধান্তমাত্র। তাই সময়ের ব্যবধান ঘটেছে। মার্কসের মৃত্যু হয় ১৮৮৩ সনে। ১৮৭০ সন থেকে নতুন নতুন আবিষ্কারে যন্ত্রযুগ দ্রুত প্রসারমাণ হতে থাকে, মানুষ হতে থাকে যন্ত্র ও প্রকৌশল প্রযুক্তি নির্ভর। কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতিতে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের, তথ্যের ও যন্ত্রের বদৌলত বিচিত্র ও দ্রুত উৎকর্ষ সাধিত হতে থাকে, ফলে মৃত্যুলক্ষণ আপাত অদৃশ্য হল। বরং পুঁজি হল বিস্ময়করভাবে স্ফীত ও প্রতাপে প্রবল, আর সাম্রাজ্যবাদ অভাবিত শক্তিধর হয়ে হল অপ্রতিরোধ্য। নির্বোধেরা আবার আপাত উল্লাসে হল উল্লসিত, কেননা মার্কসের সিদ্ধান্ত ভুল ও ডাহা মিথ্যা বলে হল তাদের কাছে প্রতীয়মান। কিন্তু লোকে বলে 'মাছে না চেনে জাল, মানুষে না চেনে কাল'। আজ দেখা যাচ্ছে বিশ্ববিজেতা অপ্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিবাদী শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সর্বক্ষেত্রেই ক্ষয়িষ্ণু। তার অস্ত্রের বাজার মন্দা। তার লগ্নি পুঁজি আগের মতো লাভজনক নয়। তার বিমান কোম্পানী, মোটর কোম্পানী প্রভৃতি দেউলে হয়ে যাচ্ছে। তার বিশ্ববাজার ক্রমে সংকুচিত হয়ে আসছে। সর্বত্র ক্ষুদ্র বৃহৎ স্থানিক-রাষ্ট্রিক প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্রমে তীব্র হয়ে উঠছে পণ্যের বাজারে। এ নাভিশ্বাস অন্তত তীব্রভাবে প্রকট ও সঙ্কট সমস্যা হয়ে উঠেছে পশ্চিম য়ুরোপের রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে। বাঁচার গরজে ওসব রাষ্ট্র স্বাতন্ত্র্যের সার্বভৌমত্বের গৌরব পরিহার করতেও রাজি। সর্বত্র ত্রাহি ত্রাহি রব। সব পুঁজিবাদী বুর্জোয়া দেশই এ মুহূর্তে সঙ্কটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। কেবল জাপান আরো কিছুকাল দুর্দণ্ডপ্রতাপে বিশ্ববাজার দখল করে থাকবে। সমাজতন্ত্র-ভাঙা নতুন রাষ্ট্রগুলো একইভাবে অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষা-স্বাস্থ্য-নিবাস-চিকিৎসা সঙ্কটে পড়েই গেছে ইতোমধ্যেই। কারণ শাহ-সামন্ত-বুর্জোয়া ব্যবস্থায় অধিকাংশ মানুষের অন্ন-বস্ত্র-নিবাস সমস্যা তীব্র অসমাধ্য না হয়েই পারে না, আবার ভিক্ষাবৃত্তি, বেশ্যাবৃত্তি, চোরাকারবারী, ভেজালদারী, ঘুষ-প্রবঞ্চনা-প্রতারণা, জোরজুলুম ও দুষ্ট-দুর্জন-দুর্বৃত্ত-দুষ্কৃতী আকীর্ণ হয় সমাজ। সমাজতন্ত্র স্বেচ্ছায় হুজুগ বশে সমাজতন্ত্র পরিহার করে এ বঞ্চনার, লাঞ্ছনার শোষণের পীড়নের দুঃশাসনের, দুর্নীতির সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করে যে আত্মপ্রতারণার শিকার হয়ে আত্মহননের পথ যখন বেছেই নিয়েছে, তখন তার ফলে দুর্ভোগ দুর্দশা-দুস্থতা এড়ানো অযোগ্য অসমর্থদের পক্ষে কোন প্রকারেই সম্ভব হবে না। কেননা এখনো আর মার্কসীয় পদ্ধতিতে প্রত্যেক সমর্থ-অসমর্থ মানুষের খোরপোশ পেয়ে বেঁচে থাকার জন্মগত অধিকার ও দাবি স্বীকৃত রইল না, কাজেই নাগরিক নির্বিশেষকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন সরকারের পক্ষে বাধ্যতামূলক ও জরুরী বলে বিবেচিত হওয়ার কারণ রইল না। কারণ শাহ-সামন্ত-বেণে-বুর্জোয়া-সমাজ হচ্ছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাৎস্যন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। এখানে মানুষে মানুষে সম্পর্ক হচ্ছে শোষক-শোষিতের, শাসক-শাসিতের, বঞ্চক-বঞ্চিতের, প্রতারক প্রতারিতের।

নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে এখন থেকে আমরা দেখব পুঁজিবাদী সমাজ কিভাবে স্বখাত সলিলে ডুবে মরে। ধীরে ধীরে, পরিণামে আমাদের বিশ্বাস, সমাজতন্ত্রের তরীই মানুষকে অভাব সমুদ্র থেকে তরাবে। কেননা আর সব সমাজ ও শাস্ত্র নীতি-নিয়ম-আদর্শ ছিল পুরোনো এবং পরীক্ষিত ও বর্জিত। কেবল মার্কসবাদই ছিল মানুষমাত্রেরই বেঁচে থাকার মহান ও অতুল্য সনদ। এর উন্নততর বিকল্প আজো অভাবিত ও অনুদ্ভাবিত। কাজেই আজো নির্বিশেষ মানবত্রাতা হিসেবে মার্কসবাদের জুড়ি নেই।

মার্কসবাদের বিনাশ-বিলুপ্তি নেই

'নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দাণ ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।' আজ রাশিয়ার বুকে নতুন করে জাগরণের, পুনরুজ্জীবনের ধ্বনি সর্বত্র প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, এ তিন/চার মাসের মধ্যেই র‍্যগানের ষড়যন্ত্রের ফাঁদে-পড়া বিভ্রান্ত মুৎসুদ্দী মিক্কাইল গর্বাচেভ না-জেনে না-শুনে ও না-বুঝে স্বেচ্ছায় যে-মৃত্যুবাণ আত্মহননের লক্ষ্যে মুগ্ধ রাশিয়ানদের বুক পেতে গ্রহণে বাধ্য করেছিলেন, সম্বিৎ ফিরে পেয়েই ওরা আজ প্রতিবাদে প্রতিকারে ও প্রতিরোধে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে নতুন উদ্যমে নতুন উদ্যোগ নতুন বুদ্ধি, যুক্তি, শক্তি ও সাহস নিয়ে ফিরে দাঁড়িয়েছে, দাঁড়িয়েছে রুখে। তাই আজ তাদের জিগির বা শ্লোগান হচ্ছে, 'আসুন আমরা কম্যুনিস্ট পার্টিকে ও মাতৃভূমিকে পুনরুজ্জীবিত করি'। এ শ্লোগান ধ্বনিত হয়েছে প্রায় অর্ধলক্ষ কণ্ঠে মস্কোর মানেঝ স্কোয়ারে। শহরে সরকারী বাধা পেয়ে সাবেক সোভিয়েত পার্লামেন্টের বা গণকংগ্রেসের দু'শ সদস্যের সভা বসেছিল মস্কো থেকে সত্তর কিলোমিটার দূরে এক খামারের সাংস্কৃতিক মিলনায়তনে। সেখানে সরকারী নির্দেশে বিদ্যুৎসংযোগ তার কেটে দেয়া হয়, তবু মোমবাতির আলোয় সভা চলে, প্রস্তাব হয় পাস। অতএব নতুন করে শুরু হচ্ছে সংগ্রাম। কেন তিন মাসের মধ্যেই শুরু হল এ আন্দোলন, কেন পূর্বাবস্থায় ফিরে যাওয়ার, পূর্বাবস্থান ফিরে পাওয়ার এ আকুলতা, এ আগ্রহ, এ প্রয়াস?

কারণ বাজার অর্থনীতি নামের সেই মুদ্রা-প্রতীক মাধ্যমে সম্পদ কাড়ার সম্পদ সঞ্চয়ের ও সম্পদ একক বা একশ্রেণীর দানবসম যক্ষের ঘরে স্তূপীকৃত হওয়ার পথ-পদ্ধতি আবার চালু হওয়ায়, জালিমের, ধূর্তের, প্রতারকের প্রবল লুটেরার হাতেই অর্থ-সম্পদ নিয়ন্ত্রণের ও বিনিময়ের অধিকার চলে আসে রাষ্ট্রনামের আজব কলের সরকারের সাহায্যে সহযোগিতায়। এমনি রাষ্ট্রকাঠামোয় দুষ্ট, দুর্জন, দুর্বৃত্ত, দুষ্কৃতী, ধূর্ত প্রতারক, প্রবঞ্চক, মিথ্যাচারী শঠ-কপট কাড়া-মারা-হানাপ্রবণ ও চৌর্যপ্রবণ পার্ষদ পরিষদ সাংসদ সচিব আমলা মন্ত্রী প্রভৃতিই হয় জনগণের মনের-মতের-সিদ্ধান্তের, জানের-মালের-গর্দানের, জীবনযাত্রার পথপদ্ধতির নিয়ামক ও নিয়ন্ত্রক। এখানে হা-ভাতেরা অনাহারে অকালে অচিকিৎসায় মরে, এখানে অসমর্থ-অসহায় ব্যক্তিরা ভিক্ষাজীবী হয়, এখানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যৌবনবতী অনাথ নারী হয় গণিকা, এখানে লাওয়ারিশ এতিম ছেলেরা হয় চোরবদমায়েশ। এখানে জনবলে, ধনবলে ও পেশীবলে বলী মাত্রই হয় জালিম, মস্তান-গুণ্ডা-খুনী-লুটেরা কাড়া-মারা-হানাই যাদের নেশা ও পেশা হয়ে দাঁড়ায়।

পরিবারে যেমন পরম মমতায় ও দায়িত্বে মা-বাবা সন্তানের প্রতি সর্বপ্রকার কর্তব্য পালন করতে থাকে, যেমন অন্ধ পঙ্গু পাগল রুগ্ন সন্তানকে চিরকাল খোরপোশ যোগায় এবং সমর্থ নিখুঁত সন্তানকে যোগ্যতানুসারে কাজে লাগায়, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায়ও তেমনি শিশু, বৃদ্ধ, রুগ্ন, পঙ্গু, পাগল প্রভৃতি সর্বপ্রকার অসমর্থ মানুষকে অশনে-বসনে-নিবাসে-নিদানে-শিক্ষায়-স্বাস্থ্যে-চিকিৎসায় বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে পিতা-মাতার মতোই সরকারের, যে-সরকার একটি সমবায় জনসেবক প্রতিষ্ঠান স্বরূপ, শাসক প্রভু নয়, জনগণও নয় শাসন-শোষণ পাত্র, পালন-পোষণ পাত্র মাত্র।

আমরা যারা জানি, মানি ও বুঝি যে মার্কসবাদের আজো কোন বিকল্প নেই, এবং প্রত্যাশায় মনের গভীরে পোষণ করেছি যে হুজুগে পড়ে যারা মার্কসবাদবিরোধী আন্দোলনে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল, নীরব ছিল, নিষ্ক্রিয় ছিল, তারা শিগগির জানবে ও বুঝবে যে তারা ঠকেছে, প্রতারিত হয়েছে, এখন ক্ষুধার অন্ন যোগাড়ের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ঠেকেছে, ধূর্ত-প্রবলের ও চোরের হাতে মার খাচ্ছে, দলিত-দমিত-শোষিত-পোষিত পীড়িত হচ্ছে, তারা আবার ফিরে দাঁড়াবে পূর্বাবস্থা ও পূর্বাবস্থান ফিরে পেতে। রাশিয়ায় অর্ধলক্ষ জনতার প্রতিবাদমুখর শ্লোগান আমাদের প্রত্যাশা যে ভুল ছিল না, তা প্রমাণ করল। আমরা নতুন আশা ও আশ্বাস পেলাম। মার্কসবাদের বিকল্প নেই, তাই তার মৃত্যু নেই, বিলুপ্তি নেই। বিজ্ঞতামন্য যারা মার্কসীয় সমাজব্যবস্থার বিলুপ্তিতে উল্লসিত এবং সমাজবাদীদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপবাণে ঘায়েল করতে পরিহাসের হুলে জর্জরিত করতে এক মনস্তাত্ত্বিক অসূয়াশূলে দেঁতো হাসিমাধ্যমে বিদ্ধ করতে নির্বোধের আত্মপ্রসাদ অনুভব করেন, তাঁরা ভাবুন 'মরিয়া না মরে রাম এ কেমন বৈরী।' হতাশ সমাজবাদীরাও বুঝুন কেউ কোথাও না শুনলেও 'শিলা ভাসে জলে।' আমরা জানি এবারকার পুনরুজ্জীবিত সমাজবাদ, সমাজব্যবস্থা, মার্কসীয়তত্ত্ব গোটা দরিদ্র পৃথিবী অবশ্যই গ্রাস করবে। কেননা এটিই ভবিষ্যতের পৃথিবীতে মানুষের বেঁচেবর্তে থাকার একমাত্র পথ ও পদ্ধতি।

নাস্তিকের ধর্মচিন্তা

নাস্তিকের জীবনচেতনা আছে, জগৎভাবনা আছে, ধর্মচিন্তা নেই। নাস্তিকের অবশ্য ধর্ম সম্বন্ধে চিন্তা আছে। 'নাস্তিক' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অভিধা হচ্ছে 'বেদের অপৌরুষেয়তায় আস্থাহীন' অর্থাৎ যে বেদকে আসমানী বাণীরূপে মানে না, সেই নাস্তিক। এখন শব্দটি অর্থান্তর লাভ করেছে। এখন নিরীশ্বরকেই নাস্তিক বলা হয়, যারা নাস্তিক তারা শাস্ত্রের সত্যতায় আস্থা রাখে না। তাদের মতে ঈশ্বর যদি এক এবং চিরন্তন হন, তাহলে তিনি জনবহুল য়ুরোপে আফ্রিকার কালো মানুষের মধ্যে আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ানদের কাছে কিংবা চীন-জাপান-অস্ট্রেলিয়া-নিউগিনিতে নবী-অবতার পাঠাননি কেন, কেবল পুরোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেনান তথা আধুনিক ইজরাইল থেকে সুয়েজ অবধি একটা বিরল বসতি অঞ্চলে এবং ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যেই শুধু এক লক্ষ চব্বিশ/চল্লিশ কিংবা দুইলক্ষ চব্বিশ/চল্লিশজন নবী পাঠালেন কেন? ভারতেই বা কূর্ম বরাহ নৃসিংহ ও রামকৃষ্ণকে পাঠালেন কেন? মানুষের কাছে ঈশ্বরই যদি তাদের হিতার্থে আদেশ-নির্দেশ পাঠাতেন, তাহলে সে-বাণীর মধ্যে পার্থক্য ও বৈপরীত্য থাকত না। আর থাকত না সাময়িকতা। অন্তর্যামী ঈশ্বর কেন কালে কালে স্থানে স্থানে স্ববিরোধী বিপরীতমুখী বাণী পাঠাবেন মানুষের মধ্যে বিরোধ-বিবাদ-বিচ্ছেদ এবং নিত্যকালের সংঘর্ষ-সংঘাত ঘটানোর জন্যে? অজ্ঞ মানুষের কল্পনাপ্রসূন বলেই ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার, নারী কি পুরুষ তা আজো নির্ণীত হয়নি। তিনি কেন কি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করলেন বিশ্বজগৎ সে সম্বন্ধেও কেউ একমত নয়। শাস্ত্রগ্রন্থগুলোর মধ্যে সমকালের পৃথিবীর মানুষের গৌত্রিক গৌষ্ঠীক এবং অবস্থানগত ভৌগোলিক পরিচিতিও নেই। নেই প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের বয়ানও। তাছাড়া আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্ব, তথ্য এবং সত্যও দুর্লভ দুনিয়ার সব চালু শাস্ত্রগ্রন্থে। এজন্যে শাস্ত্রগ্রন্থগুলোকে মানবমনীষা প্রসূত বলে সহজেই লোকে চিহ্নিত করে, আস্তিকমাত্রই স্বশাস্ত্র ব্যতীত অন্যদের শাস্ত্রকে ভুল, ত্রুটিপূর্ণ কিংবা সরাসরি বানানো শাস্ত্র বলেই জানে। শৈশব-বাল্যের মগজ-ধোলাইয়ের ফলে বিশ্বাস-সংস্কার পুষ্ট মানুষ তার ইহ-পরকালে প্রসূত জীবনে জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি প্রয়োগে স্বশাস্ত্র যাছাই-বাচাই করার সাহস পায় না আত্মপ্রত্যয়ের ও সাহসের অভাবে। অতএব, কেউ অন্য কারো শাস্ত্র সত্য বলে জানে না, মানে না। কাজেই গড়ে শাস্ত্রমাত্রই মিথ্যা, বানানো, কেবল একটি বিশেষ দলের কাছেই এক একটি শাস্ত্র সত্যমাত্র। ফলে যুক্তিযোগে কোন শাস্ত্রই সত্য বলে এমনকি সর্বকালের সর্বমানবের জীবনে প্রয়োজনীয় বলে প্রমাণ করা যায় না। বিশ্বাসকে যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াসমাত্রই পুতুলে হাত-পা-চোখ-কান-নাক-মুখ-বসিয়ে তাকে জীবন্ত মানুষ প্রমাণ করার নামান্তর মাত্র।

এখনকার শাস্ত্রগুলোকে সত্য ও আসমানী বাণীভিত্তিক মনে করলে মানতেই হবে যে ঈশ্বর একজন বহুরূপী এবং বিচিত্র মতলবে স্ববিরোধী আদেশ-নির্দেশদাতা ঈশ্বরের নীতি-নিয়মে কোন সঙ্গতি-সামঞ্জস্য নেই বলেই তাঁকে লীলাময় বলে। বহুকাল আগে ১৯০৪ [১৩১১ সনের] সালের ভাদ্রসংখ্যা মাসিক 'নবনূর' নামের সাহিত্য পত্রিকায় বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন লিখেছিলেন, "আমাদিগকে অন্ধকারে রাখিবার জন্য পুরুষগণ ঐ ধর্মগ্রন্থগুলিকে ঈশ্বরের আদেশপত্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন... পুরাকালে যে ব্যক্তি প্রতিভাবলে দশজনের মধ্যে পরিচিত হইয়াছেন, তিনিই আপনাকে দেবতা কিংবা ঈশ্বর প্রেরিত দূত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। .... এই ধর্মগ্রন্থগুলি পুরুষ রচিত বিধি-ব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে।... ঈশ্বর কি কেবল এশিয়ারই ঈশ্বর?"

নাস্তিক শাস্ত্র নির্দেশে চালিত নয় বটে, তবে নাস্তিকমাত্রই ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ, বিচার-বিবেচনা করেই কর্ম-আচরণ করে। আত্মরতি বশে পরের ক্ষতি করে না, জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তির আলোকে নৈতিক চেতনা নিয়ে সামাজিক, আর্থিক ও রাষ্ট্রিক ন্যায়ের অনুগত থাকে। নাস্তিক সমস্বার্থে সংযমে সহিষ্ণুতায় সহযোগিতায় সহাবস্থানের তত্ত্বে ও আবশ্যিকতায় আস্থা রাখে। নাস্তিক 'Live and let others live' আদর্শে গুরুত্ব দেয়। যে-ক্ষতি, যে-যন্ত্রণা যে-পীড়ন সে নিজের জন্যে অনভিপ্রেত বলে জানে, বোঝে ও মানে, তা সে তার প্রতিবেশীর জন্যেও অকারণে কামনা করে না, কাজেই নাস্তিক যুক্তিবাদী আত্মপ্রত্যয়ী আত্মমর্যাদাসচেতন বলেই সে অন্যায়-অপকর্ম থেকে বিরত থাকে। পক্ষান্তরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাস্ত্রে আস্থাবান আস্তিক ঈশ্বর অন্তর্যামী বলে জেনে-মেনেও করে না হেন অপরাধ-অপকর্ম-অন্যায় নেই। আস্তিকেরা কেবল সামান্য পরিমাণে বা মাত্রায় লোকনিন্দার ও রোষের এবং বহুল মাত্রায় সরকারী শাস্তির ভয়েই নানা অপকর্ম থেকে বিরত ও সংযত থাকার চেষ্টা করে মাত্র। তবু প্রলোভন প্রবল হলে সেশ্বর আস্তিক মানুষ করে না হেন অপকর্ম জগতে নেই।

মানুষের জীবন ঈশ্বর, না রাশিচক্র নিয়ন্ত্রণ করে, তাও নিয়তিতে ও জ্যোতিষগণনায় আস্থাবানেরা নিশ্চিত করে বলতে পারে না। আজ অবধি আমরা পৃথিবীর প্রাচীন ও আধুনিক ইতিবৃত্তে যত নাস্তিকের সন্ধান পাই, তারা মানুষ হিসেবে সাধারণভাবে উদার ও মহৎ, অনন্য ও অতুল্য। ভারতের বৈশেষিক, সাংখ্য, চার্বাক ও মীমাংসা দর্শন আর বৌদ্ধ-জৈন দর্শনও সাধারণ সংজ্ঞায় নাস্তিক্য দর্শন। কিংবা মিল বেন্থাম কোঁতে স্পিনোজো নিটসে কার্ল মার্কস প্রমুখের দর্শনও মানুষকে মনুষ্যগুণরিক্ত হতে তথা মনুষ্যত্বের মানবিকতার-মানবতার অনুশীলনে নিরুৎসাহ করেন না। বহুজনহিতে বহুজনসুখে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক নীতি নিয়ম চালু করার কথাই বলেন। মানুষ মতবাদীর দলীয় জীবনে ভরসা রাখে, তাই স্বশাস্ত্র-মানা চোর-ডাকু-মিথ্যেবাদী, মস্তান-গুণ্ডা-খুনীদের ঘৃণা মনে করে না, সহ্য করে স্বদলীয় বলে। কিন্তু নিরপরাধ শিক্ষিত ধনী, গুণী, জ্ঞানী নাস্তিককে একেবারেই সহ্য করে না। হত্যা না করে, পতিত না করে, বিতাড়িত না করে অন্তত পীড়িত-লাঞ্ছিত না করে আস্তিকেরা স্বস্তি পায় না। উল্লেখ্য যে গত শতকের ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয় কুমার দত্ত প্রমুখ নাস্তিক ছিলেন, অনেকেই ছিলেন প্রত্যক্ষবাদী ও সংশয়বাদী এবং তাঁরা ছিলেন ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে-চরিত্রে, আদর্শে ও নৈতিক চেতনায় জ্ঞানে-গুণে-মনীষায় মহৎ মানুষ। লেনিন-স্টালিন-মাও সে তুং-জওয়াহের লাল সার্ত্র, বার্ট্রাণ্ড রাখেনি প্রমুখও নাস্তিক, কিন্তু মানবপ্রেমী, অমানুষ নন কেউ। আজো দুস্থ মানুষকে শোষণ-পীড়ন পেষণ-দমন-লাঞ্ছনামুক্ত করার জন্যে যারা প্রাণপণ সংগ্রামে রত, তারা হচ্ছে মানবদরদী নাস্তিক-নিরীশ্বর কম্যুনিস্টরাই। কম্যুনিস্টরা কি নিরীশ্বর বলে অমানুষ?

মনোবিজ্ঞানীর ও দার্শনিকের মতে অজ্ঞ-অসহায় ক্ষতিভীরু মানুষের ভীরুতা থেকেই ঈশ্বরতত্ত্বের উদ্ভব। তাই কল্পনাসৃষ্ট বিভিন্ন কালের ও স্থানের ঈশ্বরে কোন সাদৃশ্য নেই। মানুষকে ও শয়তানকে কেন সৃষ্টি করা হল, মানুষকে কেন পাপ করার অধিকার দেয়া হল, শাস্তিই বা দেয়া হবে কেন? তাতে কার কি উপকার বা লাভ? এসব প্রশ্নের উত্তর মেলে না। যুক্তিবাদী আত্মপ্রত্যয়ী সাহসী মানুষমাত্রই তাই নাস্তিক নিরীশ্বর।

অতীতমুখিতা ও পারত্রিক মুক্তিকাঙ্ক্ষা প্রসঙ্গে

আজ আমাদের জনগণের মধ্যে অতীতমুখিতা ও পারত্রিক মুক্তিকাঙ্ক্ষা যেন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ দেশেই ইংরেজী না-জানা কিছু লোকেরও মানসমুক্তি ঘটেছিল উনিশ শতকের প্রথমার্ধে সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর প্রভাবে স্বল্প শিক্ষিত তীতুমীরের নেতৃত্বে এদেশেরই সহি হাদিস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও কোরআননির্ভর লোকাচার-দেশাচাররূপ শৈবালমুক্ত ইসলামে আস্থা রেখে একদল বাঙালী মুসলমান সেদিন মানুষের ইহজাগতিক জীবনের বিড়ম্বনা এড়ানো লক্ষ্যে দৃঢ় সংকল্পে ও জীবনপণ অঙ্গীকারে এগিয়ে এসেছিল। তারা গণমানবকে জমিদারের অন্যায্য শোষণ-পীড়ন থেকে মুক্ত করবার জন্যে দ্রোহী হয়েছিল, অস্ত্র ধরেছিল এবং প্রাণ দিয়েছিল। তীতুমীরের মৃত্যুতে (১৮৩২ সনে) ওয়াহাবী মত বিলুপ্ত হয়নি। আজো এদেশে শাস্ত্রের ক্ষেত্রে কুসংস্কারমুক্ত যুক্তিবাদী বিপুলসংখ্যক ওয়াহাবী-মুহম্মদী বা আহলে হাদিস মতবাদী রয়েছে। আরো একজন আত্মপ্রত্যয়ঋদ্ধ যুক্তিবাদী শাস্ত্রবেত্তার আবির্ভাব ঘটেছিল আমাদের ফরিদপুরেই, তিনি হাজী শরীয়তুল্লাহ। এ অসামান্য সাহসী পুরুষ হাদিসও বর্জন করেছিলেন, কেবল ওহি তথা কোরআনিক ইসলামকে বরণ করেছিলেন। সুন্নত বর্জন করে কেবল ফরজ মানতেন বলেই তার মতবাদী শিষ্য সম্প্রদায়কে বলা হয় ফরায়েজী। শাস্ত্রের ক্ষেত্রে এমন যুক্তিবাদিতা এবং সাহসিকদ্রোহ তাঁর আগে বিশ্বের কোথাও মুসলিম সমাজে দেখা যায়নি। যুক্তিবাদী না হলে এমন মানসমুক্তি ঘটে না, বিরুদ্ধ পরিবেশে এমন সাহসিক উচ্চারণ, এমন প্রচল মত-পথ দ্রোহিতা কিছুতেই সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে তীতুমীরের চেয়ে বেশি সাহসী যুক্তিবাদী দ্রোহী ছিলেন হাজী শরীয়তুল্লাহ। শোষিত-পীড়িত চাষী-মজুরের হয়ে শোষকগোষ্ঠীর, জমিদারের ও সরকারের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম এ সূত্রে স্মর্তব্য। তাঁর সন্তান পীর দুদুমিয়া ওর্ফে মোহসিন উদ্দীনের পিতার অনুসৃত পন্থায় সংগ্রাম স্মরণীয়। এর পরে মুক্তিযুদ্ধের নির্মোহ দৃষ্টির, সৎসাহসের এবং কালসচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন আহমদীয়ারা ওর্ফে কাদিয়ানীরা এ শতকে। আহমদীয়াদের মধ্যে ব্রাহ্মদের মতোই অনেক লোক নেই। এ মতবাদ হচ্ছে ধীরবুদ্ধির ও স্থিরবিশ্বাসের শিক্ষিত মানুষের। আজ ঢাকায় রাজনীতিক মতলবদুষ্ট লোকেরা আহমদীয়াদের এতকাল পরে রাজনীতিক কারণে অমুসলিম বলে ঘোষণা করার দাবি জানাচ্ছে সরকারের কাছে।

বোধহয় জামায়াত, তবলীগ-খানকা-দরগাহ ওয়ালারাও কেরামত-বুজুরগীর ভেলকীবাজ পীরেরা তাদের প্রতি ক্রমবর্ধমান বিরূপতার প্রতিকার হিসেবেই গণদৃষ্টি কাদিয়ানীদের দিকে ফেরানোর বৃথা প্রয়াসী মাত্র। কিন্তু তীতুমীর-শরীয়তুল্লাহর দেশে কোরআন-হাদিসের ইসলামবিরোধী পীর-খানকা-দরগাহ-মারফত-মদ্রাসার এমন কালবিরোধী প্রসার-প্রভাবের কারণ কি? বিস্ময়ের কথা, আজকাল মেয়েরাও হাজারে হাজারে মাদ্রাসায় ভর্তি হচ্ছে। শিক্ষার্থীর সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাদ্রাসার সংখ্যাও বাড়ছে এবং আঞ্চলিক প্রসারও ঘটছে। কিন্তু কেন? এর আলামত কি? অথচ এ সেদিনও বরিশালের অজপাড়াগাঁয়ে আরজ আলি মাতুব্বরের মতো সাহসী আত্মপ্রত্যয়ী নিরীশ্বর যুক্তিবাদী ও প্রত্যক্ষবাদী লোকের আবির্ভাব ঘটেছিল। আর নেই নেই করেও তো কিছু কম্যুনিস্ট আছেন। আজ সারাদেশে আকস্মিকভাবে লোকের মধ্যে শাস্ত্রপ্রীতি কেন জাগছে, এবং সে-মাত্রায় ধার্মিকতা-সততা কেন দুর্লভ-দুর্লক্ষ্য হয়ে উঠছে, কেন আচারিক ধর্মের পালা-পার্বণের প্রতি জনগণের অনুরাগ বাড়ছে? মানুষ কেন স্বেচ্ছায় মৌলবাদী হচ্ছে গোটা পৃথিবীব্যাপী, তা আজ দেশপ্রেমী মানবসেবী, বিদ্বান, জ্ঞানীদের মনন-মনীষা প্রয়োগে সরজমিনে পর্যবেক্ষণ-পরীক্ষণ প্রভৃতি মাধ্যমে গবেষণা করা জাতীয় স্বার্থেই আবশ্যিক ও জরুরী হয়ে পড়েছে। আমাদের জানতে ও বুঝতে হবে যে এ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারত্রিকচেতনা বিস্তারের উৎস কি, এর শেকড় কোথায় প্রোথিত? যে-সব সূত্র ধরে সন্ধান করতে হবে, সে-সব আনুমানিক সূত্র হয়তো নিম্নবর্ণিতগুলোই :

১. অর্থ-সম্পদের স্বল্পতার দরুন সপরিবার বাঁচার যে সমস্যা দেখা দিয়েছে, দিচ্ছে জমিবিক্রয়ের, অর্ধাহারের, অনাহারের, অপুষ্টির, অচিকিৎসার অনিকেতনের এবং অনাত্মীয়তার, অসহায়তার মানসিক যন্ত্রণার ও আশাশূন্যতার কারণে কি জাগতিক সুখে হতাশ হওয়ায় পারত্রিক সুখের কাঙ্ক্ষা প্রবল হয়েছে?

২. জনসংখ্যা বৃদ্ধির, মুদ্রাস্ফীতির, বেকারত্বের সাংসারিক অনটনের দরুনই কি জীবিকাসমস্যা অপ্রতিরোধ্য-অসাধ্য দেখে ও বুঝে ব্যক্তিজীবনে তেমন অসচ্ছলতা-অনটন না-থাকা সত্ত্বেও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নৈরাশ্যজাত এ বৈরাগ্য বা শাস্ত্রপ্রীতি?

৩. পশ্চিম এশিয়ার অর্থলিপ্সুরাই কি অধিক সংখ্যায় তবলীগওয়ালা ও পীর-দরগাহ খানকাপ্রিয় হয়ে উঠছে, কিংবা জামায়াতে ইসলামির নিষ্ঠপ্রচারের প্রভাবে মুগ্ধ মুসল্লিরাই শাস্ত্রমুখী হওয়ার নামে অতীতাশ্রয়ী ও স্বকালদ্রোহী হচ্ছে অথবা মার্কিন কূটনীতি ও অর্থই কি আমাদের ধর্মধ্বজী করে তুলছেন ভ্রান্তির কুয়াশা ছড়ানোর লক্ষ্যে।

৪. কিংবা ইংরেজী ভাষা শিক্ষাদানে সরকারী তথা জাতীয় পর্যায়ের ঔদাসীন্যের ফলে তথাকথিত শিক্ষিতজনদের মধ্যে প্রতীচ্য দর্শন, সমাজবিজ্ঞান, সাহিত্য ও ইতিহাস পাঠে অসামর্থ্যই কি আমাদের চিন্তন-মনন-মনীষার ক্ষেত্রকে সঙ্কুচিত এবং আমাদের শিক্ষিত জনগণকে কূর্মস্বভাবের করে তুলছে বলেই কূপমাণ্ডুক্য ও শাস্ত্রানুগত্য তথা তাবিজ-কবচ-পীর-দরগাহ নির্ভরতা আমাদের মধ্যে বৃদ্ধি পাচ্ছে? মনন চিন্তন ও মনীষার বিকাশ ক্ষেত্রে আমরা স্বদেশের স্বকালের প্রয়োজন ও উপযোগ অনুগ সমকালীনতা রক্ষা করতে পারছি না বটে, কিন্তু বৈষয়িক জীবনেও কি আমরা দ্রুত অবক্ষয়গ্রস্ত নই? আমাদের অভাবে স্বভাব নষ্ট হচ্ছে, আমরা নৈতিক চেতনাভ্রষ্ট হচ্ছি, চরিত্র হারাচ্ছি, মিথ্যাচারী হচ্ছি। কর্মাভাবে, অর্থাভাবে, বেকারত্বের চাপে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির দরুন জীবিকা ক্ষেত্রে প্রতিযোগী-প্রতিদ্বন্দ্বীর আধিক্যের ফলে, মুদ্রাস্ফীতির পরিণামে বাঁচার এবং প্রিয়জনদের বাঁচানোর তাগিদে আমরা যেমন দিশেহারা, তেমনি বেপরওয়াও। এখন আমরা ঠকাঠকি আর ঠোকাঠুকিই বাঁচার-বাঁচানোর পন্থারূপে জেনেছি। এখন গোটা জাতি, দেশ ও রাষ্ট্র দেহে-প্রাণে-মনে-মানসে কাঙাল, কাঙাল অর্থে সম্পদে, কাঙাল ভাতে কাপড়ে, কাঙাল আত্মসম্মানবোধশূন্যতায়ও। দেহে মনে অসমর্থ হাভাতেরা ভিক্ষাজীবী ও মিথ্যাচারী, অন্যরা ব্যবসায় বাণিজ্যে ভেজালপ্রবণ, কালোবাজারী, চোরাকারবারীরা ছলচাতুরী-প্রবঞ্চনা-প্রতারণাপ্রবণ, আমলা-মন্ত্রীরা লুটপ্রবণ আর সরকার মাত্রই মার্কিন মুৎসুদ্দী ও ভিক্ষাপ্রবণ। কাজেই নাগরিকরা চৌর্যপ্রবণ আর সরকার ভিক্ষাপ্রবণ এবং দেশশুদ্ধ প্রায় সবাই মিথ্যাচারী চাটুকার। এখানে অন্যায়ও অন্যায়কারী নিন্দিত নয়, এখানে অপকর্মে অপরাধে দাগী ও পটুরাই মান-মাল-খ্যাতি-ক্ষমতা-প্রতিপত্তির অধিকারী। এ অবস্থায় জাতীয় কিংবা মানবিক অবক্ষয় কি এড়ানো সম্ভব?

আমরা ক্ষয়িষ্ণুতার খাদে পড়েছি, আমাদের উদ্ধারের উপায় কি? আমাদের ঘরের চাবি, রাষ্ট্রের কুঞ্জি অর্থ-সম্পদের ভাণ্ডারও আমাদের আয়ত্তে নেই, ঋণ-দান-অনুদান ও ত্রাণদাতা প্রভুরাই আমাদের অভিভাবক। 'এনজিও'রা আমাদের সেবক ও ত্রাতারূপী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তত্ত্বাবধায়ক, আমরা কি অবোধ শিশু কিংবা দেহে-মনে পঙ্গু বয়স্ক? আমাদের মাসব্যাপী একুশে ফেব্রুয়ারি উথাপন উৎসবে সভায় সেমিনারে আলোচ্য হওয়া আবশ্যিক আমাদের অবস্থা ও অবস্থান এবং তার প্রতিকার ও উন্নয়ন, উৎকর্ষপন্থা, তা হলেই কেবল অতীতের জাতীয় সংগ্রাম ও বিজয় স্মরণ করা সার্থক হবে। নাইলে মহররমের মতোই এ উৎসব হবে তাৎপর্যহীন গতানুগতিক নিষ্ফল আস্ফালনমাত্র। আমরা জানি ও মানি যে সমাজে এখনো অনেক নেকমায়েশ আছে, সবাই বদমায়েশ হয়ে যায়নি। আমাদের আবেদন তাদের কাছেই।

আজকের বৈশ্বিক জীবনে অতীতমুখিতা অচল

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত আমাদের ঈশ্বরবাদী আস্তিক মানুষের ব্যবহারিক ও মানসজীবন কেবল ঈশ্বরে পাপ-পুণ্যে ও স্বর্গ-নরকে সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত ছিল না। এসঙ্গে ছিল ভূত-প্রেত-পিশাচ-জীন-পরী-দেও-দানু-রক্ষঃ-যক্ষ, ড্রাগন, দেবতা-উপদেবতা-অপদেবতা প্রভৃতি বহু ও বিচিত্র শক্তি প্রতীক, প্রতিম ও প্রতিভূ অমূর্ত ও প্রমূর্ত অদৃশ্য ও ক্বচিৎ দৃশ্য নারী-পুরুষরূপ অলীক, লৌকিক ও আলৌকিক বিস্ময়-ভয়-ভক্তি-ভরসার অবলম্বন অরি-মিত্রশক্তি। এরাই করত ব্যক্তির ও গৃহস্থের ধন-প্রাণ ও জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণ। তখন জীবন-ভাবনা ও জীবন-যাত্রা ছিল গতানুগতিক ও আবর্তনধর্মী, ফলে নিস্তরঙ্গ ও বৈচিত্র্যবিরল। তখন ঝাড়-ফুঁক, জাদু-টোনা, বাণ-উচ্চাটন তুক-তাক, তাবিজ-কবচ, মন্ত্র-মাদুলী, তাগা-ধাতব অঙ্গুরী ধূলিপড়া প্রভৃতি ছিল মানুষের বিপদ তাড়নের কাঙ্ক্ষা পূরণের উপায়। মানুষের জীবনচেতনার, জীবন ভাবনার, জীবনযাত্রার উৎস, ভিত্তি ও চালিকা শক্তিই ছিল অজ্ঞাত কিন্তু বহু শ্রুত এবং পরম্পরাগত বিশ্বাস-সংস্কার। আমরা জানি, জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-বিবেক-বিবেচনা আশৈশবের মগজধোলাইপ্রসূন বিশ্বাসসংস্কারে আচ্ছন্ন মনে-মগজে-মনীষায় প্রবেশপথ পায় না, কেননা বিশ্বাস-সংস্কার এক অক্ষয়, দুর্লঙ্ঘ্য দুর্ভেদ্য দুর্গবিশেষ। সর্বক্ষণ দুষ্ট ও রুষ্ট দেবতা অপদেবতার ভয় এবং তুষ্ট-তৃপ্ত-হৃষ্ট দেবতার বা অদৃশ্য শক্তির প্রসন্ন দৃষ্টির ভরসাই সক্রিয় থাকে এমনি মানুষের মনে ও মননে। জ্ঞান-প্রজ্ঞাপুষ্ট যৌক্তিক বৌদ্ধিক জীবন ছিল সাধারণের অজ্ঞাত, অনায়ত্ত। কেবল ক্বচিৎ কোন অসামান্য অতুল্য মনন-মনীষাসম্পন্ন কোন ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটত কোন অঞ্চলের কোন সমাজের সমকালীন বন্ধ্যাত্ব ও অবক্ষয় ঘুচিয়ে নবচেতনায় ও প্রেরণায় তাদের উজ্জীবিত উদ্দীপিত করার জন্যে। এবং সেকালের গ্রামীণ বাজারকেন্দ্রী পণ্য বিনিময়নির্ভর জীবনযাত্রায় গতানুগতিকতার চাপে তাও উপযোগরিক্ত তাৎপর্যহীন আচারে পার্বণে অবসিত হত। তাই মানবতার ও মানসসংস্কৃতির আর মানবমনীষার শ্রেষ্ঠ নয় কেবল, চরম ও পরম ফুল-ফল-ফসলরূপে জিন বর্ধমান মহাবীর উচ্চারিত জীবমাত্রেরই রয়েছে নিরুপদ্রবে নিরাপদে এ পৃথিবীতে সহাবস্থানে জীবনযাপনের জন্মগত অধিকার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মশা-মাছি থেকে হাতী-তিমি সবারই জীবনের মূল্য সমান, পৃথিবীতে বাঁচার অধিকারও তাই সমান। এমন গুরুত্ব সহকারে গৌতমবুদ্ধ কিংবা যিশু অহিংসার কথা বলেন নি। মহাবীরের বাণী জৈনদেব মধ্যেও কেবল অহত্যায় ও নিরামিশ খাদ্যে সীমিত হয়ে গেছে। ভারতেও তা উপযোগরিক্ত বলে বিবেচিত হয়েছে দু' হাজার বছর আগেই। বাস্তব ও কল্পনা, স্বপ্ন ও অভিলাষ কখনো অভিন্ন হয়ে ওঠে না। উনিশ শতকের প্রথমার্ধেও এ পৃথিবী ছিল সাধারণের অজ্ঞাত ও অলভ্য। উনিশ শতকের শেষপাদ থেকে বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া দ্রুত বহু ও বিচিত্র হয়ে ওঠে, ধরা হল ছোঁয়ার সরাবৎ। ফাঁকা ভূপৃষ্ঠ নয় কেবল, জল-স্থল-আকাশ-অরণ্য-পর্বত-সমুদ্র সবটাই যন্ত্র-প্রকৌশল-প্রযুক্তির প্রসারে মানুষের প্রায় আয়ত্তে এসে গেছে। এখন ঘরে বসে শুয়েই গোটা পৃথিবীর সবকিছুই দেখা জানা শোনা বোঝা সম্ভব ও সহজ রেডিয়ো-টিভি-ভিসিআর ক্যাসেট বইপত্র ও ছবি-চিত্রের মাধ্যমে। ফলে মানুষের মন-মগজ-মনন থেকে এখন ভূত-প্রেত-পিশাচ-জীন-পরী দেবতা-উপদেবতা-অপদেবতা, যাদু ও মন্ত্র-মাদুলী, ঝাড়-ফুঁক প্রভৃতিতে আস্থা অপগত। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ও জীবনযাত্রায় প্রয়োজন প্রসারের ফলে যেমন পৃথিবী আজ আরণ্য ঝাড়-জঙ্গল-তরু-লতা বিরল হয়ে উঠছে, তেমনি মনে-মননেও শিক্ষার, যন্ত্রের যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়নে ও প্রসারে পৃথিবী আজ যেন গাঁ-গঞ্জ পরিবেষ্টিত দৈনিক বাজার কিংবা সাপ্তাহিক হাটমাত্র। ফলে বিভিন্ন বিদ্যার, বিত্তের, প্রথা-পদ্ধতির, জীবনাচারের, মনের, মতের, পথের ও রুচি-সংস্কৃতির আর আচার-আচরণের মানুষকে দেখার, জানার শোনার ও বোঝার সুযোগ সুবিধে পেয়ে আজকের মানুষের মনোভূমে বিশ্বাস-সংস্কারের ঝাড় জঙ্গল রূপ অরণ্য এখন বিরান হয়ে যাচ্ছে এবং সেখানে এখন জ্ঞান-প্রজ্ঞা-যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেক-বিবেচনা বাস্তব জীবনের প্রয়োজন অনুগ হয়ে ঠাঁই নিচ্ছে। আগের গতানুগতিকতাদুষ্ট আবর্তনমুখ্য জীবনে সমাজে অতীতমুখিতার বন্ধ্যাত্ব ও অবক্ষয় অনুভূত উপলব্ধ হত না তাদের কাছে। সংস্কারই (Reform) নতুন চিন্তা ও প্রগতিশীলতা বলে প্রতিভাত হত। তাই উনিশ শতকের প্রতীচ্য শিক্ষা বঞ্চিত মুসলিমদের অতীতাশ্রয়ী ওয়াহাবী ও ফরায়েজী মতবাদ মুক্তিসনদ ও-পন্থা বলে অভিনন্দিত হয়েছিল। এ দুটো আন্দোলন রাজনীতি ঘেঁষাও হয়েছিল, কাজেই সমকালীন সমাজের সঙ্কট-সমস্যা বিমোচন লক্ষ্যে পরিচালিত আন্দোলন ও দ্রোহ রাজনীতিক গন্ধ বিজড়িতও ছিল। দুটোই ইংরেজী-অজ্ঞ সাধারণ মুসলিমের চোখে ছিল প্রগতিশীল এবং সমকাল চেতনাঋদ্ধ মনন-মনীষার প্রসূন।

কিন্তু আজ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার-উদ্ভাবনে পৃথিবীর মানুষের বাস্তব আচারিক ও মানসিক জীবনধারা বদলে গেছে। এখন অতীতমুখিতা মানুষের সমকালীন জটা-জটিল জীবনের সঙ্কটের সমস্যার সমাধান দিতে পারে না। মৌলবাদীরা অতীতাশ্রয়ী ঐতিহ্যগর্বী ও সনাতন শাস্ত্রে চিরন্তনতায় দৃঢ় আস্থাবান বলেই সমকালীন আন্তর্জাতিকতা নির্ভর জীবনের প্রয়োজন অনুভব উপলব্ধি করতে অসমর্থ। তাদের চিন্তা-চেতনা-মনন-মনীষা সুদূর Pastoral বা স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বনির্ভর গ্রামীণ জীবনকেন্দ্রী রয়ে গেছে। ফলে আধুনিক চেতনাঋদ্ধ ব্যক্তির ও সমাজের চোখে তারা শুধু রক্ষণশীল নয়, প্রতিক্রিয়াশীলও। এ কারণেই বিশুদ্ধ অবিকৃত শাস্ত্রনিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও মৌলবাদ ও মৌলবাদীরা আজকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমাজে ও রাষ্ট্রে অবাঞ্ছিত। কেননা তাদের মন, মত, পথ, পদ্ধতি ও মূল্যবোধ আজকের দেশ-কাল-সমাজ-সংস্কৃতি, চিন্তা-চেতনা-মনন-মনীষা বিরোধী। জীবনযাত্রায় গতির প্রগতির ও প্রাগ্রসরতার আর সৃষ্টিশীলতার তথা আবিষ্কারের উদ্ভাবনের পথে বাধাস্বরূপ। এসব কারণেই মৌলবাদের পরিহার ও প্রতিরোধ আবশ্যিক ও জরুরী।

পিছুটানে কল্যাণ নেই, কল্যাণ সম্মুখে

ব্যক্তিক বা পারিবারিক জীবনে ভাব-চিন্তা-যোগ্যতা-কর্ম-আচরণ অনুসারে উত্থান-পতন থাকে। দৈশিক রাষ্ট্রিক জীবনেও মাঝে-মধ্যে নানা কারণে বিপর্যয় ঘটে, অবক্ষয়ের ও বন্ধ্যাত্বের শিকার হয় সমাজ, সংস্কৃতি, ও আর্থিক নৈতিক জীবন। কিন্তু তা সত্ত্বেও মানব প্রজাতির মানসিক ও ব্যবহারিক জীবনের বিকাশ-বিস্তার রুদ্ধ হয় না। কোথাও না-কোথাও, কোন না-কোন দৈশিক ও আঞ্চলিক রাষ্ট্রিক জীবন মননে-মনীষায় আবিষ্কারে-উদ্ভাবনে ঋদ্ধ হতে থাকে এবং প্রবহমান প্রাজন্মিক জীবনের বাঁকে বাঁকে নব নব চাহিদাজাত সমস্যা-সঙ্কটেরও উদ্ভব ঘটে পুরোনো সম্পদে ও ঐতিহ্যে। পুরোনো চিন্তা-চেতনা ও নৈতিক শাস্ত্রিক সামাজিক সাংস্কৃতিক নীতি-নিয়মে প্রথা-পদ্ধতিতে তার সমাধান মেলে না। তখন নতুন চিন্তা-চেতনা এবং উপায় উদ্ভাবের প্রয়োজন হয়। এ যন্ত্র-নির্ভর জগতে ও জীবনে ঘন ঘন এবং অতিদ্রুত পুরোনো নীতিনিয়ম, রীতিরেওয়াজ উপযোগ হারাচ্ছে। নতুন নতুন নীতিনিয়ম চালু করতে হচ্ছে। এভাবেই মেটাতে হয় গতিমান চলমান জীবনের দাবি ও প্রবহমান সময়ের চাহিদা। অতীত কখনো বর্তমানের ও ভবিষ্যতের চাহিদা পূরণ করতে পারে না। জীবনের কোন ক্ষেত্রেই পারে না। বর্তমান হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী, অতীতে বিলীন হচ্ছে প্রতিটি মুহূর্ত। আবার ভবিষ্যৎও প্রতিমুহূর্তে বর্তমান হয়ে অতীত হয়ে যাচ্ছে। প্রবহমান কালই হচ্ছে মানুষের চিন্তাচেতনা-কর্ম-আচরণের উৎস বা কারণ এবং ফলও। এ এক প্রকার বীজ-বৃক্ষ-ফলের মতোই আবর্তনধর্মী হয়েও সদা অগ্রসরমাণ বিবর্তনের পরিবর্তনের ও বিবিধবর্ণের ধারাও বটে। চাকা ঘোরে, কিন্তু গাড়ি অগ্রগর হয়। মানুষের কাজের, ক্ষুধা-তৃষ্ণার ও ভোগ-উপভোগের আবর্তন আছে। কিন্তু তার অনুভব-উপলব্ধি সদাবিকাশশীল, তাই আবর্তন ঋদ্ধি-বৃদ্ধির প্রতীক নয়, লাটিমের মতো চক্রাকারে ঘূর্ণায়মান মাত্র, এ গতি অস্থিরতা মাত্র, অগ্রসরতা নয়। আমরা গতি বুঝি, কিন্তু গতির প্রকৃতি বুঝি না। আমাদের চিন্তা-চেতনা-মনন-মনীষা তাই আবর্তনধর্মী, বিবর্তন পরিবর্তনপ্রবণ নয়। আমরা যতটা অতীতমুখী এবং অতীতরোমন্থন প্রিয় ততটা সম্মুখদৃষ্টি সম্পন্ন নই। অথচ আমরা শুনি জানি ও মানি যে স্থিতিতে ক্ষয় ও মৃত্যু এবং গতিতেই জীবন অথচ দৃশ্যত সচল আমাদের আজকের দৈশিক, রাষ্ট্রিক, সামাজিক, সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক ও শাস্ত্রিক চিন্তাচেতনায় এ আবর্তনধর্মিতা যেন হঠাৎ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ষাট-সত্তরের দশকে আমরা অনেকটা মুক্তবুদ্ধিচালিত ছিলাম বলে মনে হয়। তার আগে যেমন, এখন আবার তেমনি ধার্মিক,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঐতিহ্যিক এবং স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক আবেগতাড়িত জীবনে আমাদের যেন আসক্তি জাগছে নতুন করে। আমাদের স্বাধীন সার্বভৌম বাঙলাদেশে একাধারে ও যুগপৎ সাহিত্য-সংস্কৃতি ও ভাষাক্ষেত্রে নিষ্ঠার সঙ্গে বাঙালীত্বের ও মুসলিমত্বের প্রতিফলন যেন কাম্য হয়ে উঠেছে যথার্থ অসাম্প্রদায়িক ও আস্তিক মানবিকগুণের স্বাভাবিক বিকাশের লক্ষ্যে। আস্তিক মানুষের এ চেতনা জটা-জটিল, সরল ও সহজ নয়। কাজেই তর্ক চলতে পারে বটে, কিন্তু সমাধান মেলা ভার। কেননা, প্রত্যেক মানুষেরই চিন্তার ও চেতনার গতি-প্রকৃতির উন্মেষ, বিকাশ ও নিয়ন্ত্রণ ঘটে ব্যক্তি মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-প্রজ্ঞা-বিবেক-বিবেচনা প্রভৃতির মাপ-মান ও মাত্রা অনুসারে। কাজেই মানুষের মন-মত ও পথ বিচিত্র। কোন দুটো মানুষ একই মানের মাপের ও মাত্রার অভিন্ন চিন্তা-চেতনায় চালিত হবে, এমন আশা প্রত্যাশার কোন ভিত্তি নেই। তবে সাধারণভাবে আপাতদৃষ্টিতে বাহ্যত মানুষ নানা স্বার্থবশে ব্যক্তিক মন-মত-পথের পার্থক্য সত্ত্বেও শাস্ত্রিক সামাজিক রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে অধিজনের মন-মত-পথ-অনুমান ও সিদ্ধান্ত মেনে চলতে, সমর্থন করতে সম্মত থাকে। তাই, সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত মানে নিজের ব্যক্তিক মতকে গুরুত্ব না দিয়ে অধিজনের সিদ্ধান্তকে গ্রহণে ও সমর্থনে রাজি থাকামাত্র। আমরাও চিন্তার স্বাধীনতায় গুরুত্ব দিই। কিন্তু তাতে যদি পিছুটানের ভাটি-স্রোতের আভাস মেলে, তাহলে অবশ্যই বিচলিত হই।

ব্রিটিশ আমলে আটশ/সাড়ে আটশ ছোট-বড়-মাঝারি রাজা আকীর্ণ বিভিন্ন রক্তের, ধর্মমতের, ভাষার নরগোষ্ঠী অধ্যুষিত উপমহাদেশে একচ্ছত্র শাসক বিদেশী ব্রিটিশ বিতাড়ন লক্ষ্যে দৈশিক-রাষ্ট্রিক জাতীয়তার ভিত্তিতে ভারতবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করবার চেষ্টা করে কংগ্রেস। এ প্রয়াসে কোন খাদ ছিল না, খাদ ছিল রাজনীতিকদের চেতনার গভীরে—তারা ছিল একাধারে ও যুগপৎ হিন্দু ও ভারতবাসী, আস্তিক ও অসাম্প্রদায়িক। জাতিচেতনায়, জাতীয়তায় তাদের অজ্ঞাতেই ছিল তাদের হিন্দুত্ব প্রবল, দৈশিক জাতীয়তায় প্রবর্তনা দিতে গিয়ে তাঁরা তুর্কী-মুঘলদ্রোহী ও বিদ্বেষী হিন্দু-শিখ বীরের পূজায় হলেন উৎসাহী। শিবাজী-গুরুগোবিন্দ-রানাপ্রতাপ প্রমুখ হলেন তাঁদের প্রেরণার ও প্রণোদনার উৎস ও প্রতীক, প্রতিম ও প্রতিভূ। তাই মুসলিমরা তাদের অসাম্প্রদায়িক উদার আন্তরিক প্রয়াস সত্ত্বেও দৈশিক জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসের ও তার নেতৃত্বের উপর আস্থা স্থাপন করতে পারেনি, স্বতন্ত্র জাতিসত্তা অঙ্গীকার করে মুসলিম লীগের নেতৃত্বে তারা স্বাধীন নিবাস দাবি করে এবং পেয়েও যায়।

বাঙালীরা স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র পেয়েই অনতিকাল পরে বুঝল, এ এক রূপময় মাকাল ফল মাত্র। এবং চব্বিশ বছরের মধ্যেই তারা মুক্তিযুদ্ধ করে বহু বহু জীবনের বিনিময়ে ভুল শোধরাল, বাঙালীসত্তা অঙ্গীকার করে সমাজতন্ত্রী হয়ে সেক্যুলার মানুষ হয়ে স্বরাষ্ট্রে স্বপ্রতিষ্ঠ হল বাহ্যত। স্বল্পকালের জন্যে তারা স্বীকারও করল যে মানুষের প্রথম ও শেষ পরিচয় সে কেবল মানুষ। অব্যক্তভাবে মনে মনে হয়তো এও জানল যে ব্যক্তিমানুষের লক্ষ্য ইহুদী-খ্রীস্টান-হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম থাকা নয়—মানুষ হওয়া। কিন্তু যেহেতু তারা সবাই আস্তিক এবং সচেতনভাবে মানুষকে মানুষ হিসেবে জানা-বোঝা-মানার জন্যে যে মানস-অনুশীলন প্রয়োজন, যে শিক্ষা-সংস্কৃতি আবশ্যিক, তা তাদের নেই, সেহেতু কয়েক মাসের মধ্যেই দেখা গেল সরকার ও দেশের অধিজনেরা হয়ে গেল মুসলমান বাঙালী কিংবা বাঙালী মুসলমান, কেউ আর নিছক-নিখাদ নিখুঁত খাঁটি বাঙালী রইল না। উনজনেরাও তাই আত্মরক্ষার প্রয়োজনে কূর্মনীতি বরণ করতে হল বাধ্য। গত বিশ বছর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধরে নিষ্ক্রিয় সাম্প্রদায়িক চেতনা কেবলই বাড়ছিল, সরকারী উদ্যোগে এরশাদী চালে তা মন্দির ভাঙার ও হিন্দুর সম্পদ লুটের আকারে সক্রিয় হয়ে ওঠে। একালে শাস্ত্রিক সত্তা নয়, দৈশিক ভাষিক সত্তাও নয়, মানবসত্তা চেতনাই কাম্য। এ একই আস্তিক্যজাত দ্বিধাদ্বন্দ্বের ফলে অর্থাৎ নির্বিশেষ মানুষকে কেবল মানুষ হিসেবে গ্রহণ-বরণের অসামর্থ্যের ফলে উপজাতি আদিবাসীদের সংখ্যাগত করগণ্যতার অজুহাতে 'বাঙলাদেশ' রাষ্ট্রের নাগরিকমাত্রেরই জাতীয়তা বা জাতিপরিচয় 'বাঙালী' অভিধায় চিহ্নিত হয়, আর একদল ইসলামী জোসে এবং প্রচ্ছন্ন ভারত বা হিন্দু বিদ্বেষ বশে বাঙলাদেশী জাতীয়তায় স্বাতন্ত্র্য খোঁজে, যদিও এ জাতীয়তা বা রাষ্ট্রিক জাতি পরিচয় যুক্তিগ্রাহ্য করা যেত। কিন্তু সংবিধান স্রষ্টার নামে না হয়ে 'বিসমিল্লাহ' অঙ্কিত হয়ে বাঙলাদেশী জাতীয়তা কেবল মুসলিম জাতীয়তায় যোগরূঢ় হয়ে পড়েছে। এখন বাঙলাদেশী জাতীয়তা আর 'বাঙলাদেশী মুসলিম জাতীয়তা অভিন্নার্থক ও অভিন্নাত্মক। এর সঙ্গে এখন সাহিত্যে সংস্কৃতিতে ও ভাষায় আস্তিক, শাস্ত্রিক মুসলিমের শরিকানার স্বাক্ষর রাখার দাবিদার যখন জুটে গেছেন, তখন শিগগিরই আমরা টিভির 'জীবনের আলো' ও 'উজ্জীবন' পন্থী হয়ে উঠব, তাতে আর সন্দেহ কি? একালে আস্তিক্য বন্ধনমাত্র, সম্পদ নয়। তেমনি স্বাতন্ত্র্যও নয় কাম্য, নির্বিশেষ মানবচেতনাই কালের দাবি। তবু আমাদের ধারণা পরিব্যক্ত করতে চাই : ১. আরবী-ফারসী এ মুহূর্তেও কেবল মুসলমানের ভাষা নয়, এ দুটো সুপ্রাচীন ভাষা ইহুদী খ্রীস্টান, প্যাগান, কাফের জোরাস্ট্রিয়ান প্রভৃতি অনেকেরই মাতৃভাষা। ২. আস্তিক মানুষ কখনো নিঃশর্ত নিখাদ নিখুঁত উদার ও অসাম্প্রদায়িক হতে পারে না। কেউ কেউ কেবল সীমিত অর্থে সহ ও সমস্বার্থে সংযত পরমতসহিষ্ণু হতে পারে মাত্র। প্রমাণ সোভিয়েত রাশিয়ায় চুয়াত্তর বছর পরেও খ্রীস্টান-মুসলিম-ইহুদীর সন্তান গির্জা মসজিদ সিনাগোগে ঢুকেছে। কাজেই আস্তিক মানুষের সংস্কারবদ্ধতার কোন অদলবদল নেই। অতীত কেবল ধরে রাখে, ভরে তোলে না, এগিয়েও দেয় না। অতীতে নয়, কল্যাণ সামনে ও ভবিষ্যতের গর্ভে। ঝাড়-ফুঁক-তুক-তাক তাবিজ-কবচ-মন্ত্র-মাদুলীর মতো ধর্মীয় বিশ্বাসকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমিত রাখা এবং একে সরকারী ও সামাজিকভাবে অস্বীকৃত রাখাই হচ্ছে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী অধ্যুষিত আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অধিবাসী নির্বিশেষকে সমান নাগরিকরূপে গ্রহণ করার একমাত্র পন্থা বা উপায়। এর নামই সেক্যুলারিজম। একালে মানুষের মানসমুক্তি, মানবতার বিকাশ এ পথেই সম্ভব।

১৮৯৮ সনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর এক প্রবন্ধে যা বলেছিলেন হিন্দু পুনরুজ্জীবন-বাদীদের সম্বন্ধে, তা আজ আমাদের বেলায়ও প্রযোজ্য : 'অতএব একদিকে আমাদের দেশীয়তা, অপরদিকে আমাদের বন্ধন মুক্তি, উভয়ই আমাদের পরিত্রাণের পক্ষে অত্যাবশ্যক। সাহেবী অনুকরণ আমাদের পক্ষে নিষ্ফল এবং হিন্দুয়ানির গোঁড়ামি আমাদের পক্ষে মৃত্যু।'

আরো মনে রাখতে হবে আজকাল আর স্বাতন্ত্র্যে ও বিচ্ছিন্নতায় বাঁচা যাবে না। এ যন্ত্রনির্ভর সংহত ও ক্ষুদ্র পৃথিবীতে এক অভিন্ন হাটুরে সমাজ তথা বৈশ্বিক লেনদেনের ও ভাব-চিন্তা-আচার-আচরণের মানবসমাজ গড়ে উঠেছে। শাস্ত্রিক, লৌকিক, অলীক ও আলৌকিক বিশ্বাস সংস্কারবদ্ধতায় স্ব স্ব কল্যাণ খোঁজা হবে নিতান্ত জীবন-বিরোধী অতীতমুখিতা মাত্র। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য সংস্কারবদ্ধতাকে ও ঐতিহ্যসচেতনতাকে আশৈশব লালিত মজ্জাভূত সম্পদরূপে দেখেছেন :

তুমি জীবনের পাতায় পাতায় অদৃশ্য লিপি দিয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পিতামহদের কাহিনী লিখেছ মজ্জায় মিশাইয়া। [অতীত]

শৈশব বাল্যের গৃহগত পরিবেশে ও সমাজপ্রতিবেশে মগজধোলাই জাত ও বিশ্বাস-সংস্কার ও ঐতিহ্যচেতনা জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি যোগে পরিহার করতে হবে অভিন্ন বৈশ্বিক মানবচেতনায় প্রবুদ্ধ হবার গরজে-মানবিকতার মানবতার পূর্ণবিকাশ লক্ষ্যে।

আর্থ-সামাজিক সুখের মরীচিকা

বাল্যকাল থেকে শুনে আসছি, ব্রিটিশ তাড়াও স্বাধীন হও, সুখ আসবে, জন কোম্পানীদের তাড়াও, সুখ আসবে, মারোয়ারী-মেমন-আগাখানী ব্যবসায়ীদের তাড়াও, সুখ আসবে। নিজেরা লগ্নিপুঁজি, বাণিজ্যপুঁজি, শিল্পপুঁজি খাটাও, সুখ আসবে। পাকিস্তান বানাও, সুখ আসবে, বিধর্মী তাড়াও সুখ আসবে, পাকিস্তান ভাঙ বিভাষী তাড়াও, সুখ আসবে। আবার স্বাধীন হও, বাঙালী হও, সুখ আসবে।

মুজিব হত্যা কর, সুখ আসবে, জঙ্গীনায়ক বসাও, সুখ আসবে, জেলে নেতা হত্যা কর, বাঙালীসত্তা বর্জন কর, মুসলিম হও, বিধর্মী বিদ্বেষী হও, সুখ আসবে। বাঙালী নয়, বাঙলাদেশী হও, সুখ আসবে। জিয়া হত্যা কর, সুখ আসবে। এরশাদের অনুগত হও, সুখ আসবে। এরশাদী তথা জঙ্গীনায়কের নিয়ন্ত্রণে সাংসদ বানাও, সুখ আসবে। কম্যুনিস্ট দমন ও দলন কর, সিরাজ সিকদার-দলকে উৎখাত কর, সিরাজ সিকদারকে হনন কর, সুখ আসবে।

দেশে জঙ্গীনায়কের অধীনে মার্কিন অনুগত মুৎসুদ্দী সরকার বসাও, সুখ আসবে, World Bank, IMF, Consortium কিংবা মার্কিন চেলা রাষ্ট্র থেকে ঋণ-দান-ত্রাণরূপে অর্থসামগ্রী নাও, সুখ আসবে।

চারনীতির সেক্যুলার সংবিধান কর, সুখ আসবে, 'বিসমিল্লাহ' বসিয়ে সংবিধানকে ইসলামী কর, সুখ আসবে, ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম কর, উম্মাহ থেকে অর্থ সম্পদ মিলবে, সুখ আসবে। মন্ত্রী বদলাও, সুখ আসবে, সচিব বদলাও, সুখ আসবে।

জন কোম্পানী গেল, আগরওয়ালা গেল, আল্লাহওয়ালা পাঞ্জাবী-মেমন-আগাখানী-বাহাই গেল, শেখ-সৈয়দ খোন্দকার-কাজী-চৌধুরী-ভূঁইয়ারা এল, সুখ কিন্তু কখনো আসেনি। গাধার নাকের ডগায় ঝোলানো মুলা যেমন গাধার জিহবার আয়ত্তের বাইরেই থেকে যায়, আমাদের সুখও তেমনি আয়ত্তের বাইরে থেকে গেল, সুখ এসে এসেও কাছে আসে না, এল এল করেও এল না আজো।

স্বৈর-স্বেচ্ছাতন্ত্র আমাদের দেশে সেই আইয়ুব খাঁর আমল থেকেই কখনো দীর্ঘস্থায়ী থাকেনি, কার্যত না হোক বাহ্যত ভোটে নির্বাচিত দাসত্বে ও আনুগত্যে অভ্যস্ত স্তাবকতায় ও চাটুকারিতায় উৎসাহী মানবপ্রজাতির শিক্ষিত ধূর্ত বিত্তবেসাত-মান-যশ-খ্যাতি-ক্ষমতালিপ্সু মুখ্য প্রতাপশান প্রাণীরা অর্থে-বিত্তে ও সামাজিক পরিচিতিতে ও মর্যাদায় নিজেরা নয় কেবল, তাদের পরবর্তী তিন প্রজন্মের সন্তান-শ্যালক-ভগ্নীপতির বংশধরদেরও বিপুল বিত্তের ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগ সুনিশ্চিত করেছে, করছে, আর সন্তান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও অর্থ পাচার করছে ভূস্বর্গ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, লন্ডনে, কানাডায়। এদিকে দেশে ছড়িয়ে পড়েছে এন-জি-ও নামের পঙ্গপাল।

এবার নাকি সংকল্পে দৃঢ় এরশাদ বিতাড়নে অঙ্গীকারবদ্ধ ছাত্রঐক্যের সমবেত সংগ্রামে ধমকে ধমকিতে দলনে দমনে ভীতত্রস্ত এরশাদ আত্মসমর্পণে বাধ্য হল, রাজনীতিক দলগুলো ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় ঐক্যবদ্ধ ছাত্রদের দাবি স্বীকার করে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এরশাদ পদচ্যুত, ধৃত এবং শাস্তিপ্রাপ্ত। অথচ তাঁর ও তাঁর দলের জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়নি। এতে বোঝা যায়, হয় আমরা অজ্ঞ অথবা নৈতিকচেতনারিক্ত, চরিত্রশূন্য দুর্নীতিবাজ প্রিয়। ফলে তাঁর দল পঁয়ত্রিশটি আসন পেল সংসদে ভোট ভিক্ষা করার প্রকাশ্য সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত থেকেও এবং স্বৈর-স্বেচ্ছাচারী বলে জননিন্দিত ও গণধিক্কৃত হয়েও। অথচ আল্লাহ-রসুল-কোরআনের প্রতি অনুগত নয় কেবল, বিস্মৃত বিলুপ্ত প্রায় বিপন্ন ইসলামের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় ও ইসলামি শাসন-প্রশাসন চালু করার জন্যে জান-মাল-গর্দান দেয়ার নেয়ার অঙ্গীকারবদ্ধ জামায়াতে ইসলামী রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম হওয়া সত্ত্বেও সংসদে মুমিনের ভোটে আসন পান মাত্র আঠারোটি। কিম্ আশ্চর্য অতঃপরম। বাঙালী মুসলিমরা কি ধরনের মুমিন।

দেশের মানুষ অজ্ঞ অনক্ষর নিঃস্ব নিরন্ন দুস্থ দরিদ্র। তারা ভোট দেয় কিন্তু ভোটের তাৎপর্য ও ফজলিয়ত জানে না, বোঝে না। তারা জানে না, বোঝে না গণ কে, কারা বা কি? কাজেই গণতন্ত্র স্বৈরতন্ত্র স্বেচ্ছাতন্ত্র জঙ্গীতন্ত্র একনায়কতন্ত্র সবটাই তাদের কাছে একই। কারণ তারা জানে এতে তাদের ভাগ্যের উন্নতি হয় না, তারা চির শোষিত-শাসিত-দলিত-দমিত-পীড়িত-বঞ্চিত-প্রতারিত থাকবেই। তাদের হয়ে কাজ করার, ভাবার লোক নেই দেশে। আর যারা তাদের জন্যে রক্তঝরা প্রাণহরা সংগ্রামে জীবন পণ করেছে, সেই রক্তক্ষরা বিপ্লবপন্থী কম্যুনিস্টদেরও তারা চেনে না, জানে না, বোঝে না। তাদের অজ্ঞতার জন্যে বিশ্বাসও করে না চারদিককার বুর্জোয়াদের প্রচারণায়। শত্রুও ভাবে বিপ্লবীদের হত্যাকারী বলে বুর্জোয়ার দেয়া অপবাদের দরুন। অন্য কম্যুনিস্টরা এখন শাস্ত্রমানা গণতন্ত্রী সামাজিক সুবিচারবাদী হয়ে গেছে। সুখ কি, সুখ কেমন, সুখ কোথায় তা গণমানব প্রজন্মক্রমে কোন দিন দেখেনি, অনুভব-উপলব্ধি করেনি, বোঝেনি, চেনেনি, ভোগ-উপভোগও করেনি, তবু গণমানব সুখ চায়। প্রজন্মক্রমে এরা সুখের সন্ধানে, আশায় প্রত্যাশায় প্রতীক্ষায় ও স্বপ্নে জীবন কাটায়। সুখ এদের কাছে আর্থ-সামাজিক সুখ, ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগের সুখ, ভালো-আহারের-পোশাকের সুখ। সুখ এদের কাছে চির স্বপ্নের চিরমরীচিকার সুখ! বাস্তবে অধরা, অদেখা, অজানা।

কিন্তু দুনিয়াতে সুখ যে নেই, তা নয়, সুখ আছে। সুখ অশেষ ও অনন্ত। সুখ রয়েছে অর্থেবিত্তে-সম্পদে-সম্ভোগে। সুখ রয়েছে 'পঞ্চ মকারে'। সুখ রয়েছে দর্পে-দাপটে-প্রতাপে-মানে-যশে খ্যাতিতে-ক্ষমতায়, সুখ অর্থসম্পদ নির্ভর। অর্থসম্পদ দিয়েই এরা পর্ষৎ-পরিষদে সংসদে সদস্য হয়, মন্ত্রী হয়, লেখাপড়া শিখিয়ে সরস্বতীর বরপুত্র করে লক্ষ্মীকে কবজা করে ব্যবসায়ে-বাণিজ্যে, আড়তদারীতে, মৌজুতদারীতে, ভেজালদারীতে, চোরাচালানীতে, ঠিকেদারীতে, চাকুরে-আমলা-সাংসদ-মন্ত্রী হয়ে জুয়া-জোচ্চুরিতে নিপুণ হয়ে কালো জগতে কালো টাকার মালিক হয়ে। সুখ এ শ্রেণীর মানুষের কাছে মরীচিকা নয়, অর্থসম্পদ যারা নিয়ন্ত্রণ করে সেই শাহ-সামন্ত-বেণে-বুর্জোয়া-ঠিকেদার-ভেজালদার-কারখানাদার-চোরাচালানদার-আমলা-সাংসদ-মন্ত্রীরূপে সুখ তাদেরই। সুখে তাদেরই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রাজন্মক্রমিক অধিকার। সাংসদরা সুযোগ পেলেই নানা অজুহাতে সরকারী টাকা লুট করেন। দুবাইয়ে লোক পাঠিয়ে দয়া-দাক্ষিণ্যের জন্যে পঁচাত্তর হাজার টাকা বার্ষিক আয় করে আর শুল্কমুক্ত মোটরগাড়ির ব্যবসা করে ও বেতন-ভাতা বাড়িয়ে। অর্থ সম্পদে প্রাপ্য সুখ অন্য লক্ষ কোটি মানুষের কাছে কেবল মরীচিকা। সেই চিরশোনা প্রবাদই সত্য 'কেহ মরে জল সিঁচে, কেহ খায় কৈ।'

কালে দাবিচেতনা ও প্রগতি

কাল প্রবহমান এবং অনন্ত। আমরা আর্তব আবর্তনের বদৌলত কালকে সীমিত পরিমাপে অনুভব করি ও কাজে লাগাই। এভাবেই হিসেব করি দিবারাত্রির, ঋতুর এবং বছরের। সূর্যের এ অয়ন না থাকলে অনন্ত কালসমুদ্রে আমরা দিশেহারা হয়ে অকূলে অলক্ষ্যে অগন্তব্যে, বন্ধ্যা নিষ্ক্রিয় জীবনই বৃথা ও ব্যর্থভাবে নিঃশেষ করতাম। আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করে 'সময়' এবং 'প্রকৃতি।' সময়ের ও প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণে ও নিয়মে জীব-উদ্ভিদের জন্ম-জীবন ও মৃত্যু। কাজেই মানুষের ব্যক্তিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক, নৈতিক, শৈল্পিক ও আর্থিক সাংস্কৃতিক জীবনে কালচেতনা এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ-প্রতিবেশের আনুকূল্য ও প্রাতিকূল্যসচেতনতা সুষ্ঠু জীবনযাপনের জন্যে আবশ্যিক ও জরুরী। কালের তথা যুগান্তরের চাহিদা সচেতন না হলে কিংবা প্রকৃতি প্রতিকূল হলে মানুষের দেহ-প্রাণ-মন বাঞ্ছিত বাড় হারায়। বন্ধ্যাত্ব অবশ্যম্ভাবী দেখা দেয় শীতকালীন বদ্ধ জলাশয়ের মতো। প্রকৃতিই জীব-উদ্ভিদের লালক-পালক, তার ভারসাম্য নষ্ট হলে, তপন তাপনে মাটি হয় মরু, জীব-উদ্ভিদ হারায় খাদ্য, বিপর্যয় নেমে আসে। মানুষ কেবল নিজেদের বিপর্যয়ের কথা ভাবে বলেই, সামগ্রিক দৃষ্টিবিরহী বলেই এর নাম আমাদের ভাষায় মন্বন্তর। আসলে প্রাণান্ত ঘটে সবারই–সবকিছুরই। গতিশীল প্রবহমান কাল যেমন জীব-উদ্ভিদের প্রাজন্মিক পরিবর্তন ঘটায়, পুরোনো জীর্ণপাতার মতো পুরোনো জীর্ণ প্রাণীর ও উদ্ভিদের উৎখাত ঘটায়, নতুন কিশলয় যেমন বৃদ্ধির ও ঋদ্ধির প্রতীক ও প্রতিভূ, তেমনি নতুন প্রজন্মের সর্বপ্রকার প্রাণীও বিশেষ করে মানব প্রজাতিও বৃদ্ধি ও ঋদ্ধি লাভ করে জ্ঞানে-বুদ্ধিতে যুক্তিতে-কৌশলে-প্রকৌশলে প্রযুক্তিতে আর যন্ত্রের ও তথ্যের এবং তত্ত্বের আবিষ্কারে ও উদ্ভাবনে। তাই প্রতি নতুন দিনে নির্মিত হয় অদৃশ্যে নতুন জগৎ ও নতুন জীবন—সে জীবনের বহিঃপ্রকাশ ঘটে নতুন ভাব-চিন্তায় মননে-আকাঙ্ক্ষায় ও আবিষ্কার-উদ্ভাবন প্রয়াসে, নতুন নতুন জিজ্ঞাসায় ও কৌতূহলে, জীবনযাত্রায়—খাদ্য যোগাড়ে জীবনে সাচ্ছল্য, স্বাচ্ছন্দ্য, সৌকর্য, সৌন্দর্য ও উৎকর্ষ আনয়নে, মগজের নিষ্ঠ ও নিয়মিত অনুশীলনে ও প্রয়োগে মস্তিষ্ক শক্তির অশেষ বিকাশে-বিস্তারে ও উৎকর্ষে। এর জন্যেই অতীতকে ও ঐতিহ্যকে পরিহার করতে হয়। অবশ্য ঐতিহ্য অভিজ্ঞতার বা জ্ঞানের পুঁজি ও পাথেয় হতে পারে কখনো কখনো, তাও সব সময়ে কেজো হয় না, প্রেরণা-প্রণোদনার উৎস হয় না, তার প্রমাণ গ্রীস-রোম-মিশর-বোগদাদের পতন, ঐতিহ্যহীন আফ্রিকার উত্থান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাস্ত্রে-সাহিত্যে-দর্শনে-ইতিহাসে-সমাজবিজ্ঞানে পরিবেশিত জ্ঞান তো স্বীকৃত সত্য, তথ্য ও তত্ত্ব নয়, কেননা, এসব জ্ঞান সর্বজনস্বীকৃত নয়। এগুলো সাম্প্রদায়িক, আঞ্চলিক, গৌত্রিক এবং কালিক এমনকি ব্যক্তিকও—যেমন শাস্ত্র ও দর্শন অনেক ক্ষেত্রেই একান্তই ব্যক্তিমনেরই সৃষ্টি। কাজেই এগুলো হচ্ছে আনুমানিক আন্দাজী কাল্পনিক কিংবা চিন্তা-চেতনা-মনন প্রসূন ধারণা মাত্র। প্রমাণিত বা প্রমাণসাধ্য সত্য নয়। যে মানে কেবল তার কাছেই তা সত্য, অন্যের কাছে অযৌক্তিক মিথ্যা মাত্র। সুতরাং এর মধ্যে সর্বমানবিক, সর্বকালিক ও সর্বাঞ্চলিক কোন কল্যাণ বা উপযোগ নেই, ছিল না, থাকা সম্ভব নয় বলেই। জীবন যেহেতু স্থানিক ও কালিক। সময় ও প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনী যেহেতু জীব-উদ্ভিদের জীবন নিয়ন্ত্রক, সেহেতু কালান্তরে, স্থানান্তরে এবং প্রজন্মান্তরে জীবনের চাহিদাও পরিবর্তিত হয়। নতুন সমস্যা-সঙ্কটও তাই সমাধানের এবং নতুন সম্পদও তাই প্রয়োগের ও ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগের নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ, প্রথা-পদ্ধতি চালু করতে হয়। জীবনে সমকালীনতা ও স্বকালতা আবশ্যিক ও জরুরী। কোন পুরোনো নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ, প্রথা-পদ্ধতি এবং শাস্ত্রিক, দৈশিক ও লৌকিক আচার-আচরণ নতুন কালে উপযোগ রক্ষা করে চাহিদা মেটাতে পারে না, কারণ তা স্থানে কালে মানুষের মনন-চিন্তনের-রুচির-সংস্কৃতির-আকাঙ্ক্ষার ও প্রয়োজনের মান-মাপ-মাত্রায় উৎকর্ষের ও বিস্তৃতির দরুন উপযোগ হারায়। বিশেষত এ কালে যখন জল-স্থল-আকাশের কিনারা খুঁজে বেড়াচ্ছে মানুষ, নতুন নতুন সত্য, তথ্য ও তত্ত্ব আবিষ্কৃত এবং নতুন যন্ত্র-প্রকৌশল-প্রযুক্তি, রোগ নিরূপণ ও প্রতিষেধক আবিষ্কার-উদ্ভাবন হচ্ছে। কাজেই নতুন জীবনের ও নতুন জীবনপদ্ধতির সূচনায় জীবনের গতিপথের বাঁকে বাঁকে নতুন নতুন সমস্যা-সঙ্কট দেখা দেয়ই, দেবেই। তার সমাধান খুঁজতে হবে স্বকালে এবং সমকালের মানুষকেই। অতীতে ঐতিহ্যে এর প্রতিকার প্রতিরোধ কিংবা সমাধান পন্থা মিলবে না—মিলতেই পারে না। জ্ঞান সামনেই, জ্ঞান অতীতে নেই। জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি-কৌশল-মনন-চিন্তন দিয়েই সমাধান বের করতে হবে, সম্পদ বৃদ্ধি করে চাহিদা মেটাতে হবে, সবটাই ভবিষ্যতের গর্ভেই নিহিত। আর আমরা জানি বর্তমান হচ্ছে ক্ষণজীবী, প্রতিটি মুহূর্ত অতীতে হচ্ছে বিলীন। মানুষের-জীব-উদ্ভিদের অস্তিত্ব সংলগ্ন রয়েছে প্রকৃতির আনুকূল্যে ও প্রাতিকূল্যে পরিবেশ-পরিবেষ্টনীর ভারসাম্যে আর মানুষের নতুন নতুন জল-স্থল-আকাশ সম্পৃক্ত জ্ঞানের বৃদ্ধিতে, আবিষ্কার, উদ্ভাবনের ঋদ্ধিতে, প্রয়োজনে ও প্রয়োগে বিপন্মুক্তিতে এবং জীবনযাত্রার সাচ্ছল্য ও স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধিতে।

যেহেতু আজ অবধি সমাজ বিন্যাসে ও ব্যবস্থায় মার্কসবাদের বিকল্প কিংবা নতুনতর কোন পথ-পদ্ধতি আবিষ্কার-উদ্ভাবন সম্ভব হয়নি, সেহেতু আমাদের মার্কসীয় তত্ত্বের আলোকেই সমাজব্যবস্থা পরিমার্জন পরিশোধন মেরামত মাধ্যমে চালু রাখতেই হবে। যদি আমরা মানব প্রজাতির, মানব অবয়বের সবারই গুণ-শক্তি-বুদ্ধি নির্বিশেষে বেঁচে থাকার জন্মগত অধিকার ও বাঁচিয়ে রাখার রাষ্ট্রগত দায়িত্ব স্বীকার করি।

দুনিয়ার সর্বত্র সব ব্যবস্থারই সমকালীন-স্বকালীন উপযোগচেতনাই মানুষকে চলার পথের, প্রগতির পথের, প্রাগ্রসরতার পথের সন্ধান দেয়। আমাদের সর্বপ্রকার আশৈশব লালিত বিশ্বাস-সংস্কার পরিহার করে মুক্তবুদ্ধি নিয়ে যুক্তিবাদী হয়েই স্বকালে ও সমকালীন জগতে সমস্যা-সঙ্কট-সম্পদের মধ্যেই বাঁচতে হবে, এর নামই জীবন। সংগ্রাম। কখনো নিরুপদ্রবে নির্বিরোধে নিরাপদে নির্বিঘ্নে, কখনো বা সংগ্রামে, প্রতিবাদে, প্রতিরোধে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রক্তক্ষরা প্রাণহরা বিবাদে, মতের ও পথের বিবাদে-বিতর্কেই, কখনো বা বাস্তবে লড়াকু যোদ্ধা হয়েই বাঁচতে হয়—এ সংগ্রাম, এ লড়াই প্রকৃতির, সমাজের ও ভিন্ন মানুষের বিরুদ্ধেই চলছে, চলবে চিরকাল। গতি-প্রগতি, প্রাগ্রসরতা আসে জীবনে, সমাজে, রাষ্ট্রে এভাবেই।

আরো একটি কথা মনে রাখা দরকার, এও যুগের দাবি। হাতী, তিমি, বাঘ, সিংহ, গরু, কুকুর বলতে যেমন অঞ্চল এবং আকৃতিক-আবয়বিক ক্ষুদ্রত্ব-বৃহত্ত্ব নির্বিশেষে এক প্রজাতির প্রাণী, তেমনি মানুষও কালো-ধলো, পণ্ডিত-মূর্খ, ধনী-নির্ধন, আঁধা-কানা-খোঁড়া-জন্ম-ধর্ম-ভাষা-নিবাস নির্বিশেষে কেবল মানুষই। তার প্রথম পরিচয় সে মানুষ, তার শেষ পরিচয় সে মানুষ। তার জন্ম মানুষ প্রজাতির প্রাণীরূপে। তার কর্মও এ প্রজাতির প্রাণীরূপে, তার মৃত্যুও মানুষ প্রজাতির প্রাণীরূপে, বৃত্তি-প্রবৃত্তিতে স্বভাবে সে এ প্রজাতিরই।

'প্রিয়েরে দেবতা'-নয়

কাম-প্রেমের মতো ভক্তি-শ্রদ্ধাও মানুষকে আবেগান্ধ, মুগ্ধ ও অভিভূত রাখে, তাদের আসক্ত ও মোহগ্রস্ত রাখে। যৌক্তিক বৌদ্ধিক কোন তত্ত্ব, কোন তথ্য, কোন সাক্ষ্য প্রমাণও তাদের স্থিরবিশ্বাস টলাতে পারে না। মানুষ তাদের ভক্তির পাত্রকে যেমন রক্ত-মাংসের মানুষ বলে ভাবতেই পারে না, তাদের ভক্তিভাজনের যে কোন তমো-রজগুণ থাকতে পারে, তা তারা কল্পনাও করতে চায় না। দেবতারাও মতিভ্রমের শিকার, কিন্তু মানুষের শ্রদ্ধাভাজন মুনি, ঋষি, সাধু, সন্ত, শ্রমণ, ভিক্ষু-শ্রাবক, পীর-ফকির, দরবেশ যেন তাঁদেরও অনেক উর্ধ্বলোকের গুণে-মানে-মাপে-মাত্রায় অনন্য অসামান্য কোন স্তরের মহামানব। ভক্তিভাজনেরা ভক্তের চোখে মহামানব তো বটেই। তাই বলে মর্ত্যমানব রক্ত-মাংসের চাহিদার উপরে উঠবে আমরা এমনি আশা প্রত্যাশা করব কেন? বিশেষ করে যদি সাধু-সন্ত-সন্ন্যাসী-শ্রমণ-ভিক্ষু-পাদরী-রাব্বী না হন। নিতান্ত কবি-সাহিত্যিক মনে মননে মনীষায় অনুভবে উপলব্ধিতে চেতনার সূক্ষ্মতায় তীক্ষ্মতায় অসামান্য হলেও তাঁরা যে মর্ত্যমানব মাত্র, কোন বিশেষ সৃষ্ট অতিমানব নন, অলৌকিক অলীক আসমানী শারীর প্রাণী নন, তা সহজ বুদ্ধিতে বুঝলে, সাদা চোখে দেখলে, সরল মনে জানলে তখন তাদের জানা-বোঝা মানাও হয় সহজ, বিস্ময়-কল্পনা আবেগও স্বল্প মাত্রায় থাকবে সীমিত।

একজন মানুষ মনে-মননে-মনীষায়-অনুভবে-উপলব্ধিতে অনন্যসাধারণ হলেও তিনি যদি মানুষই হন, তাহলে তিনি ভোজনবিলাসী হতে পারেন, একটু বেশি মাত্রায় নিদ্রাপ্রিয় হতে পারেন, হতে পারেন আলসে, হতে পারেন ভোগে-উপভোগে-সম্ভোগে আসক্ত, হতে পারেন নেশারু, থাকতে পারে মদে মাংসে দুর্বলতা, মিথ্যাভাষণেও তাঁর রয়েছে পটুতা, হতে পারেন অর্থলিপ্সু, হতে পারেন নিষ্ঠুর ন্যায়বান প্রশাসক। এমনকি হয়তো তিনি প্রজাপীড়ক শোষকও। নরহত্যা-ষড়যন্ত্র-ঈর্ষা-অসূয়া প্রভৃতিও তাঁকে হয়তো স্পর্শ করেছিল, সব বাঞ্ছিত গুণের আধার হবেন তিনি এমন প্রত্যাশা কেন করব? আমরা কেউ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কি সব গুণের আধার? আবার কোন না কোন গুণে কি আমরা ঋদ্ধ নই? একজন রাজনীতিক, জনসেবী, দেশপ্রেমী, কিংবা কবি-নাট্যকার-গাল্পিক-ঔপন্যাসিক-প্রবন্ধকার-দার্শনিক-ঐতিহাসিক-বিজ্ঞানীকে আমরা সর্বগুণাধার, সর্বাঙ্গসুন্দর মানুষরূপে পেতে চাইব কেন? এর মধ্যে আবেগ ছাড়া কোন যুক্তি আছে কি? আমরা পৃথিবীর বহু জ্ঞানী-মনীষী-কবি-সাহিত্যিক-দার্শনিক-রাজনীতিক-বিজ্ঞানীকে ও চিকিৎসককে জানি, যাঁরা স্ব স্ব ক্ষেত্রে যুগস্রষ্টা কীর্তিমান মানুষ বটে, কিন্তু মাটির মানুষ বলেই, রক্ত-মাংসের ক্ষুধা-তৃষ্ণা লাভ-লোভ-ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগ প্রভৃতি সর্বপ্রকার চাহিদা লিপ্সা, স্পৃহা সম্পৃক্ত প্রাণী বলেই অনেক প্রাণীসুলভ সাধারণ প্রবৃত্তিচালিত মানবসুলভ দোষে দুষ্ট। রুশা-ভলতেয়র-গ্যায়টে-তলস্তয়-বেকন-রাসেল-দস্তয়ভস্কি-রবীন্দ্রনাথ-ইকবাল-নজরুল প্রমুখ লেখকদের জীবনের চরিত্রের আঁধার দিক আমাদের অজানা নয়, তাই তো আমরা তাঁদের আমাদের লোক বলে চিহ্নিত করতে পারি, এবং আশ্বস্ত হই এভেবে যে অনেক দোষ দুর্বলতা নিয়ে আমি, আমরা এবং আমাদের সন্তানেরা জীবনের জীবিকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্ব স্ব জ্ঞান-বুদ্ধি-শক্তি-সাহস-মন-মনন-মনীষা-অঙ্গীকার-উদ্যম-উদ্যোগ নিয়ে স্ব স্ব অবদানে তথা কৃতি-কীর্তিতে স্ব ও সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারি, জীবন করতে পারি সার্থক, হতে পারি জীবনে মান্য, ধন্য ও স্মরণীয়। কাজেই তাঁদের দোষ-দুর্বলতাই তাঁদের অপহ্নুতিই আমাদের বল-ভরসার উৎস। আসল কথা মন-মনন-মনীষা প্রয়োগে জীবনের কোন না কোন ক্ষেত্রে বহুজনহিতে বহুজনসুখে যদি আবিষ্কারে-উদ্ভাবনে-কৌশলে-প্রকৌশলে-প্রযুক্তিতে, যন্ত্রে-উপকরণে-হাতিয়ারে-ঔষধে, রোগলক্ষণ-নিরূপণে, জ্ঞান-বিদ্যার প্রসারে নতুন তত্ত্ব, তথ্য, সত্য আবিষ্কারে, রোগে প্রতিষেধক আবিষ্কারে, সাহিত্য সৃষ্টিতে, নতুন দর্শন সৃষ্টিতে, জীবনের নতুন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে রাজনীতিক বা আর্থিক জীবনে নতুন সুখ-সমৃদ্ধির দিগন্ত উন্মোচনে মানবসমাজকে এগিয়ে যিনি যা যাঁরা দেবেন, তাঁরাই মানববন্দ্য হয়ে স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে থাকবেন। কাজেই 'প্রিয়েরে দেবতা' করা ক্ষতিকর, দেবতাকে প্রিয় পরিজন করে ভাবাই লাভজনক—হিতকর। জীবনচরিত লেখকরা বিশেষ করে রাজনীতিক মহান নেতাদের ও মহান স্রষ্টা হিসেবে নন্দিত সাহিত্যিকদের আর বিজ্ঞানী-দার্শনিকদের জীবনকথা বয়ানকালে এ তত্ত্ব ও আদর্শটি মেনে চললে বিবেক বিরোধী অনেক সত্য গোপনের ও মিথ্যা ভাষণের অপকর্ম এড়িয়ে আত্মসত্তার মূল্য ও মর্যাদা রক্ষা করতে সমর্থ হবেন।

নতুন চিন্তাচেতনাজাত মত-পথ ও সিদ্ধান্ত জরুরী

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে আর্থ-সামাজিক, রাজনীতিক, প্রাশাসনিক, কূনীতি, দুর্নীতি, দুর্দশা, অনিয়ম, অনীতি, অপকর্ম, অপরাধ দেখে দেখে, শুনে শুনে এবং জেনে জেনে আমাদের মন-বুদ্ধি-রুচি-মেজাজ এমন অসুস্থ ও বিকৃত হয়ে গেছে যে আমরা কেবল দোষ সন্ধানে, চরিত্র হননে, সন্দেহ প্রবণতায়, পরনিন্দায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। শুধু অবশ্যই সকারণে-অনুযোগ-অভিযোগ-অসন্তোষ-অপকর্মের ফিরিস্তি প্রকাশে, ক্ষয়ক্ষতির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তালিকা নির্মাণে, দুষ্ট-দুর্জন-দুর্বৃত্ত-দুষ্কৃতী চিহ্নিতকরণে, চোরাচালানদার ভেজালদার, মজুতদার ঠিকেদার আমলা-সাংসদ-মন্ত্রী প্রভৃতির ধূর্ততার, ছলচাতুরীর, প্রতারণা-প্রবঞ্চনার, ঠকাঠকির ইতিবৃত্ত বয়ানেই যেন অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছি। এমনি পরিবেশে নিজেদেরই মনে হয় সুস্থতা ও স্বস্থতা তথা মানসিক স্বাস্থ্য নষ্ট করছি। এবং আমরা যে এক পূতিগন্ধময় পরিবেশে বাস করছি, তা আর অনুভব-উপলব্ধির সামর্থ্য হারিয়ে ফেলছি, যেমন গরিব ঘরের শিশুর মা-বাবারা শেজে শিশুর মল-মূত্রের নিত্যগন্ধে অভ্যস্ত হয়ে হয়ে সে-গন্ধে অস্বস্তিবোধ করে না, তাদের নাকেই সে-গন্ধ ধরা দেয় না, যেমন বস্তির নালা-নর্দমার দুর্গন্ধ কিংবা পোস্তার দুর্গন্ধ অভ্যস্ত বাসিন্দাদের অসহ্য হয় না—এটাই স্বাভাবিক হওয়া বলেই তারা জানে ও মানে। বাঙলাদেশে ঢাকা শহরে কিংবা গাঁয়ে গঞ্জে ও অন্যান্য শহরে বন্দরে আমরা এভাবে বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রাণের দায়ে, বাঁচার এবং পরিবারকে বাঁচানোর সংগ্রামে ও দুশ্চিন্তায় অক্ষম-অসহায়ভাবে কূপমণ্ডূকের মতো ঘোলা পানিতেই নিন্দা-ঘৃণা-কুৎসা-ঈর্ষা-হিংসা কথায় লেখায় চিন্তায় ও চেতনায় রোমন্থন করে করে বৃথা ও ব্যর্থ জীবন অপচয় করছি।

যাঁরা আমাদের অর্থসম্পদ নিয়ন্ত্রণ করেন, সেই লগ্নিপুঁজির বাণিজ্যপুঁজির, কারখানাপুঁজির মালিকরা এবং আমলা-মন্ত্রী-নিয়ন্ত্রকরা নিজেদের স্বার্থেই জনগণের স্বার্থ-বিরোধী ও ক্ষতিকর কুনীতি অনীতি ও দুর্নীতি স্বেচ্ছায় সুপরিকল্পিতভাবে গ্রহণ করে বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোতে যেখানে এখনো শিক্ষিত শহুরে ধনী-মানী-খ্যাতি-ক্ষমতার অধিকারীদের মধ্যে সত্যিকারভাবে দেশ, মানুষ, জাতি প্রভৃতির প্রতি প্রীতির অভাবেই কোন দায়িত্ব-কর্তব্য বুদ্ধি জাগেনি এখনো বাঞ্ছিত মাত্রায় মানে ও মাপে। তাই এখানে শোষক-প্রতারক-প্রবঞ্চক-ঠকবাজ, ধান্ধাবাজ, মতলববাজ, অর্থলিপ্সু, মিথ্যাচারী কমিশন, বখশিস, দালালি, ঘুষ, নজর, পাওন, উপহার, উপঢৌকন প্রাপ্তিকাঙ্ক্ষী লোকের সংখ্যা বেশি।

এসব স্বীকার করেও জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-বিবেক-বিবেচনা-মেধা-মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তিদের বৈশ্বিক চেতনা নিয়ে স্বকালের যন্ত্রনির্ভর জীবনের ও যন্ত্রজগতের গতি-প্রকৃতি জেনে-শুনে-বুঝে দেশবাসীকে বাঁচার ও অন্যদের বাঁচানোর পথ-পদ্ধতি বাতলাতেই হবে। এ হচ্ছে প্রত্যেক গণহিতকামী মানববাদী দেশপ্রেমী মানবসেবীর দায়িত্ব ও কর্তব্য। আমরা অবশ্য জানি দেশপ্রেমী লোকসেবী সরকার এবং বেণে আমলাগোষ্ঠী সৎ ও মানবিকগুণসম্পন্ন বিবেচক না হলে যে কোন রাষ্ট্রের সর্বপ্রকার সমস্যা-সঙ্কট, সর্বক্ষেত্রে কেবল বাড়তেই থাকে মন্ত্রী-আমলার ভাষণ-বক্তৃতা-ঘোষণা এবং কৃত্রিম প্রয়াস-প্রচেষ্টা ও কার্যকর ব্যবস্থা সত্ত্বেও। কারণ যে সততা, আন্তরিকতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য চেতনা ব্যক্তিক ও পারিবারিক কাজকর্ম সুচারুরূপে সমাধানের কারণ হয়, তা সরকারী বারোয়ারী কাজে আমাদের মতো অজ্ঞ-অনক্ষর দারিদ্র্যদুষ্ট দেশে সুলভ নয়, দুর্লভ, দুর্লক্ষ্য এবং বিরলতায় অদৃশ্য। তাই আমরা মুদ্রাস্ফীতি, দেশী মুদ্রার ঘন ঘন অবমূল্যায়ন, রফতানী পণ্যের অবৃদ্ধি ও আমদানি পণ্যের অবাধ অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধি এবং মানবিকগুণের অনুশীলনে ঘরে সংসারে, সমাজে, আড্ডায়, স্কুলে-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে অফিসে-আদালতে, দোকানে, প্রতিষ্ঠানে, কারখানায় অবহেলা ও ঔদাসীন্য প্রভৃতির শিকার।

তবু মননে চিন্তনে নতুন মন, মত, পথ ও সিদ্ধান্ত আমাদের একান্ত প্রয়োজন মানুষ হিসেবে সুস্থ সমাজের ক্রমোন্নয়নশীল রাষ্ট্রে বাস করার প্রত্যাশায়। তাই আমাদের জ্ঞান-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুণ-প্রজ্ঞা-মেধা-মনীষাসম্পন্ন শিক্ষিত তথা যথার্থ বিদ্বান বুদ্ধিমান বিবেকবান মানবহিতৈষী সৎ ব্যক্তিমাত্রেরই দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে বৈশ্বিক পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিমনের সামাজিক আচরণের, রাষ্ট্রিক দুঃশাসনের, ব্যবসায়িক অসততার প্রতিকারে প্রতিরোধে জনমত সৃষ্টি করা এবং সঙ্কট উত্তরণের উপায় বা পথ বের করা। নতুন চিন্তা-চেতনা দানের, নতুন পথ-পদ্ধতি বের করার দায়িত্ব শিক্ষিতদের, বিদ্বানদের, বুদ্ধিজীবী নামের শ্রেণীর, মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তিদের। কাজেই দেশের সমাজের পত্র-পত্রিকায় নিত্য দেখা ধর্ষণ, খুন, জখম, গাড়ি দুর্ঘটনা, লঞ্চ ডোবা, রাহাজানি, ছিনতাই, প্রতারণা ব্যাংকলুট, ঘুষ, ভেজালদার, চোরাকারবারী সম্বন্ধে আলোচনা-সমালোচনা নিন্দা-গালাগাল-ক্ষোভ-ক্রোধ-হতাশা বন্ধ রেখে এর থেকে নিজেদের এবং জনগণকে মুক্ত করার ও রাখার উপায় চিন্তায় স্ব-স্ব জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-মেধা-মনীষা-গবেষণা প্রয়োগ করাই আমাদের কর্তব্য। নতুন পারিবেশিক প্রাতিবেশিক পরিস্থিতিতে আমাদের নতুন জীবননীতি ও সমাজদর্শন আবশ্যিক ও জরুরী। এটি নারীর ও পুরুষের প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য। যুক্তিবাদ হবে আমাদের নীতি-আদর্শ নিরূপণের ভিত্তি ও অবলম্বন।

অনুমান তত্ত্ব

AMARBOI.COM

অনুমানও সত্য নির্ধারণের একটা মৌল উৎস বা ভিত্তি। জানা সত্য প্রয়োগে অজানা সিদ্ধান্তে তথা নতুন সত্যে উত্তরণ বা নতুন জ্ঞান লাভ ঘটে এ অনুমানপদ্ধতি যোগে। অবশ্য গণিতের অনুমান আর ন্যায়ের বা তর্কশাস্ত্রের অনুমান এবং আমাদের লোকব্যবহারে আনাড়ি প্রয়োগের অনুমান অভিন্ন নয়। অনুমান তাই যৌক্তিক অযৌক্তিক, দু-ই হতে পারে। সাদৃশ্য, সম্ভাবনা প্রভৃতি নির্ভর অনুমান আমরা প্রায় সর্বক্ষণ করে থাকি। এমনিভাবে অনুমান আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে নানাভাবে প্রযুক্ত হচ্ছে। যেমন Probable Truth. Suppositional Truth. Analogical Truth. Imperical Truth. Apriori Truth. Premisery Truth. Hypothetical Truth. Conceptual Truth. এমনিভাবে Truth-কে বহু, বিবিধ ও বিচিত্র করে তোলা যায়, কিন্তু তাতে সর্বত্র যুক্তির কিংবা Reasoning প্রয়োগ সম্ভব হবে না। যদিও পরিণামে ধোপে না-টেকা [Fallacious] বহু Inference টানা সম্ভব হয়। মানুষের প্রবণতা পাথুরে Reasoning-এর দিকে নয়, বরং পূর্বলব্ধ বিশ্বাস-প্রত্যয়কে মনের জোরে, গায়ের জোরে ও কথার জোরে সত্যের, তথ্যের ও তত্ত্বের আসন, মর্যাদা ও গুরুত্ব দেয়ার দিকেই বেশি। মনে কর, ধরে নাও, আর স্বতঃসিদ্ধ সত্য [axiom] বলে মেনে নাও, এ চুক্তিতেই সম্মতি দিয়ে আমরা সত্য, তথ্য ও তত্ত্ব আবিষ্কারে অগ্রসর হই। যদিও ন্যায়শাস্ত্রানুসারে আমরা জ্ঞান প্রয়োগেই যুক্তির পথ ধরে নতুন জ্ঞান অর্জন করি। পূর্বজ্ঞান প্রয়োগে নতুন সিদ্ধান্ত বা অনুমান বা Inference লাভ করি, কিন্তু সে বাঁধা-ধরা পদ্ধতি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ও বাঞ্ছিত সত্য প্রতিষ্ঠিত করে জীবনযাত্রায় কাজে লাগাই। এ জন্যেই শাস্ত্রে শাস্ত্রে মিল নেই, আচারে আচারে মিল নেই, মিল নেই কোন দুটো দার্শনিক তত্ত্বে, তথ্যে ও সত্যে। মানুষ তাই শাস্ত্রিকভাবে, সামাজিকভাবে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাষ্ট্রিকভাবে ও দার্শনিকভাবে ব্যক্তিক, সাম্প্রদায়িক, ধার্মিক, জাতিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক জীবনে দ্বান্দ্বিক অবস্থায় ও অবস্থানে বাস করে। সবাই জানে তার ধর্মশাস্ত্রই জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ, সবাই মানে তার ভাষাই মিষ্ট মধুর, সবাই ভাবে তার দেশই সুন্দর, সবাই বলে তার জাত-গোত্র-বর্ণই পরমাশ্রয় অভয় শরণ। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন জীব-উদ্ভিদ-বস্তু-পদার্থ নিয়ে কোন বিতর্ক নেই দুনিয়ার কোথাও। কিন্তু এগুলোর গুণাগুণের, অদৃশ্য লৌকিক-অলৌকিক-অলীক ধারণা নিয়েও রয়েছে বিতর্ক। যেমন হিন্দুর তুলসী গাছ, ভূতের নিবাস বট অশ্বত্থ তেঁতুল গাছ প্রভৃতি কিংবা শৈব মতে বেলগাছ, অথবা শাক্তদের কাছে জবা ফুল প্রভৃতি অদৃশ্যমানস মাহাত্ম্যে গুরুত্বে উদ্বিজ্জ উদ্বিজ্জ অতিক্রম করেছে। তেমনি বাঙালী মুসলিমদের কাছে মেহেন্দী পাতার ও ইরাকী আরবী খেজুরের মর্তবা-মাহাত্ম্য স্বীকৃত।

আদি বিস্ময়, কল্পনা, ভয়, ভক্তি, ভরসা প্রসূন আন্দাজী আনুমানিক অদৃশ্য-অলীক-অলৌকিক তত্ত্ব, তথ্য, সত্য, যাদু বিশ্বাস সংস্কার প্রভৃতি যে জ্ঞানের উৎস, সে জ্ঞানটাই হচ্ছে হাওয়াই, বাস্তব নয়, মানসিক ধারণা। মানলে সত্য, না মানলে মিথ্যে। অতএব এসব জ্ঞানের অস্তিত্ব এবং অনস্তিত্ব দু-ই মনের জগতে নিবদ্ধ। জ্ঞান-যুক্তি-প্রয়োগে বলা যায় ভুয়া। মানুষের লাভ-ক্ষতি ভীতির প্রসূন বিশ্বাসে-সংস্কারে এ অনুভূত সত্য। মানুষ যুক্তি ও জ্ঞানবাদী হলেই কেবল সহজে স্বচ্ছ বুদ্ধিতে ও দৃষ্টিতে বোঝে যে পর্যবেক্ষণে-পরীক্ষণে নিরীক্ষণে বস্তুগত বিজ্ঞানে ছাড়া কোথাও বাস্তব জ্ঞান নেই। আনুমানিক সিদ্ধান্ত বা ধারণা জ্ঞান নয়। এ জন্যে ভীরু বুদ্ধিমানেরা অজ্ঞেয়বাদী আর সাহসী যুক্তিবাদীরা প্রত্যক্ষবাদী। সাধারণ জ্ঞানীরা সংশয়বাদী, আর প্রত্যয়ীরা নাস্তিক নিরীশ্বর।

AMARBOI.COM

ভাববাদীর ও জ্ঞানবাদীর ভাষার ও জীবনানুভূতির পার্থক্য

বাক্যে শব্দের পদরূপে প্রয়োগকালে শব্দ পায় প্রাসঙ্গিক অভিধা, ব্যঞ্জনা ও আসক্তি। কাজেই লেখকমাত্রই চেতন বা অবচেতনভাবে অভ্যস্ত হয়ে যান বলেই মাঝারি লেখকের ভাষা-শৈলী প্রায়ই দ্ব্যর্থহীন ভাব পরিব্যক্ত করে। ব্যতিক্রম ঘটে কৃচিৎ, তাও ঘটে অজ্ঞতার বা অভিধা সম্বন্ধে অস্পষ্ট ধারণার দরুন। লজিকের বা ন্যায়শাস্ত্রের ভাষায় তথা শব্দের পদরূপে প্রয়োগে দ্ব্যর্থহীন হতেই হয়, তেমনি প্রয়োজন হয় আইনের ভাষার কিংবা কোন বিষয়ের সংজ্ঞার জন্যে যথাশব্দের। কাজেই যে কোন মানুষের মনোভাবের দ্ব্যর্থহীন অভিব্যক্তির জন্যে শব্দের বা পদের দ্ব্যর্থহীন সুস্পষ্ট অভিধার প্রয়োগ আবশ্যিক ও জরুরী।

আমাদের লেখকদের সবার এ বিষয়ে সচেতনতা থাকে না, এবং অভিধান দেখার অনীহা ও আলস্য তারা পরিহারেও আগ্রহী নন। তাই অনেক শব্দেরই অপপ্রয়োগ আমাদের লেখায় দেখা যায়। যেমন আমরা যারা নিরীশ্বর নৈরাত্ম্য নাস্তিক আমরাও 'ইহজাগতিক ইহলৌকিক' শব্দ আমাদের লেখায় অবলীলায় ব্যবহার করে থাকি। তখনো আমাদের মনে পড়ে না যে শব্দগুলো আপেক্ষিক নিরপেক্ষ নয়, পরজাগতিক, পারত্রিক, পারলৌকিক জীবনে ও অবস্থায়-অবস্থানে আস্থা না থাকলে 'ইহ' প্রয়োগ নিরর্থক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিভ্রান্তিকর অপপ্রয়োগ হয় মাত্র। তেমনি সূর্য ওঠেও না অস্তও যায় না, চন্দ্রেরও থাকে না শুক্লপক্ষ কিংবা কৃষ্ণপক্ষ। বরং পৃথিবীরই আলো-আঁধার কাল রয়েছে তার আবর্তন অয়ন অনুসারে। কিন্তু আমরা আজো আমাদের অজ্ঞতার কালের ভাষা ব্যবহারে অভ্যস্ত, ফলে আমরা বিশ্বাস-সংস্কার মুক্ত হইনে, জ্ঞানেরও মূল্য মর্যাদা স্বীকার করিনে। আমরা আজো ক্ষণ-দিন-লগ্ন-তিথি মেনে চলি, জীবন যে গ্রহ-নক্ষত্র-রাশি প্রভাবিত ও চালিত তাও দ্বিধাহীনচিত্তে স্বীকার করি। শাস্ত্র শুনে ও পড়ে সৃষ্টিপত্তনে গভীর আস্থা রাখি, আর বিজ্ঞান পড়ে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব-তথ্য-সত্য লিখে পরীক্ষা-পাশ করি। যা বিশ্বাস করি না, তা পরীক্ষা-পাশের জন্যে জ্ঞান বলে উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করি, এবং চাকরী নেবার সময় মুখস্থ আওড়াই তাকেই জ্ঞান বলে, অথচ আবাল্যের মগজধোলাই অনুগ ভূতে ভগবানে আস্থা রেখে সারাটা জীবন যাপন করি। ফলে আমাদের বুকের বিশ্বাসের ও মুখের কথার অসঙ্গতি আমাদের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে প্রতিফলিত হয়। তাই আমাদের চরিত্রে সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায় না। মানুষ মনোজগতে এবং ব্যবহারিক জীবনে এমনিভাবেই দু'নৌকায় পা দিয়ে ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের, ন্যায়-অন্যায়ের, যুক্তি-অযুক্তির, সঙ্গতি-অসঙ্গতির, আস্থা-অনাস্থার দোলায় দোলাচল। একারণে দৃঢ় আদর্শনিষ্ঠ অবিচল এক রঙের একরূপের সর্বদা-সর্বথা অভিন্ন ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের মানুষ সমাজে দুর্লভ, বিরলতায় দুর্লক্ষ্য। মানুষ যুক্তিবাদী বা প্রত্যক্ষবাদী না হলে এ থেকেই যাবে। এবং নৈতিক, সামাজিক, আর্থিক, আচারিক ও রাষ্ট্রিক জীবনে প্রত্যাশিত গুণের মানের মাপের ও মাত্রায় চরিত্রের ও আদর্শের যুক্তিবাদী প্রত্যক্ষবাদী মানুষ মিলবে না নির্বিচারে নির্ভাবনায় কাজেকর্মে বিশ্বাস-ভরসা-নির্ভর করার মতো।

যুক্তিবাদী ও প্রত্যক্ষবাদী হলে শিক্ষিত মানুষমাত্রই অজ্ঞতার যুগে অতীতে উদ্ভাবিত শাস্ত্রে আস্থা হারাত, পৌত্তলিকদের মতো খড়-মাটির মূর্তি বানিয়ে পুজো করত না স্রষ্টার বা দেবতার অর্থাৎ স্রষ্টা তৈরি করে নিজেদের সৃষ্ট প্রাণী ভেবে স্রষ্টানুগত্যে অকারণ ভয়-ভক্তি-ভরসা রেখে নিশ্চিন্ত হতে চাইত না জীবনে। স্রষ্টার দাসত্বে ও আনুগত্যে ধন্য হবার লোভে এমন আত্ম অবমাননা সম্ভব হত না তাদের পক্ষে।

অবুঝ ভীরুমন বুঝ মানে না বলে না হয় ভয়-বিস্ময়-কল্পনাপ্রবণ মানুষ স্রষ্টা বা নির্মাতা একজন বানালই। কিন্তু তার সঙ্গে শাস্ত্র একটা না বানালে বা না মানলেও চলত, যেমন অন্য কোন প্রাণীর কোন শাস্ত্র নেই, স্রষ্টানুগত্য রয়েছে বলেও আভাসে ইঙ্গিতে বোঝা যায় না। অবশ্য আমরা বুঝি যে জ্ঞান-বুদ্ধি-ধূর্ততায় প্রবল মানুষ অন্য মানুষকে দাসত্বে, আনুগত্যে আয়ত্তে, অধীনে রেখে মান-যশ-খ্যাতি-ক্ষমতা, সম্পদ, ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগ, সেবা প্রভৃতি সবকিছু ওদের থেকে আদায় করার কুমতলবে মনুষ্যাকৃতি পাওয়ার স্তর ও কাল থেকেই এ ব্যবস্থা লঘু গুরুভাবে চালু করেছিল পৃথিবীর সর্বত্র কৌম-গোত্র-গোষ্ঠীর সর্দার-মাতব্বর-শাহ-সামন্ত-দেওয়ান-দালাল-গোমস্তা হয়ে এভাবেই শাসন-প্রশাসন মাধ্যমে শোষক-শোষিত, পীড়ক-পীড়িত, দাস-প্রভু, বান্দা-মনিব, সেবক-সেবিত, শ্রদ্ধেয়-সম্মানিত, অবজ্ঞেয়-ঘৃণিত লাঞ্ছিত মানুষের শ্রেণী তৈরি হয়েছে মন-মনন-মনীষা বিকাশের, উৎকর্ষের ও ক্রমবিবর্তনের ফলে।

ইহ-পরলোকে প্রসৃত স্রষ্টায়-আত্মায় আস্থা, ভূত-প্রেত পিশাচ-জীন-পরী ড্রাগন-দৈত্য-দানু প্রভৃতিতে বিশ্বাস মানুষের ভাষায় শব্দের অভিধা, ব্যঞ্জনা আসক্তি সৃষ্টি করেছে, অর্থের প্রসারের সংকোচনেরও সহায়ক হয়েছে। কাজেই ভাষা তথা ভাব-চিন্তা-মন-মনন-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনীষার অভিব্যক্তির বাহনও নাস্তিক্য আস্তিক্য দু-ই হয়েছে। আমরা জানি ভাষা ভাবের অভিব্যক্ত বাহন। ভাষাও ব্যক্তিব্যবহৃত, ব্যক্তিউচ্চারিত ও ব্যক্তিলিখিত। এ জন্যেই নৈয়ায়িকের, বৈয়াকরণের, নিরীশ্বরের, নৈরাত্ম্যের, নাস্তিকের, আস্তিকের, হিন্দুর, মুসলিমের, খ্রীস্টানের, ইহুদীর, দার্শনিকের, বৈজ্ঞানিকের, পণ্ডিতের, মূর্খের ভাষায় পার্থক্য থাকে।

যেহেতু ন্যায়, দর্শন, সাহিত্য, শাস্ত্র আন্দাজ-অনুমান-ভয়-বিস্ময়-কল্পনা-বুদ্ধি, ভাব-অনুভব-উপলব্ধির অপূর্ণ বা ভুল তথ্য নির্ভর জ্ঞান যুক্তি ভিত্তিক, সেহেতু অতীতের উক্ত সব বিষয়ক আলোচনা, তত্ত্ব, তথ্য, সত্য বা জ্ঞান যুক্তিবাদীর, বিজ্ঞানবাদীর ও প্রত্যক্ষবাদীর বিবেচনায় বর্জনীয়। কেবল যুক্তি প্রত্যক্ষ ও পাথুরে সাক্ষ্য প্রমাণযোগে আবিষ্কৃত ও বাস্তবে বাঞ্ছিত ও প্রত্যক্ষ ফলপ্রসূ প্রকৌশল প্রযুক্তি ও যন্ত্র প্রমাণিত জ্ঞানই গ্রাহ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা মানুষ যুক্তিবাদী, প্রত্যক্ষবাদী ও বিজ্ঞানবাদী হলেই কেবল নৈতিক-সামাজিক-আর্থিক-রাষ্ট্রিক জীবন জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি বিবেক-বিবেচনা, ন্যায়-নীতি নিয়মচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হবে। নির্বিবাদে নির্বিরোধে নিরুপদ্রবে-নিরাপদে নির্বিঘ্নে জীবনযাপন হবে মানুষের পক্ষে সহজ ও সম্ভব। স্ব স্ব প্রয়োজনে ও স্বার্থে, সহিষ্ণুতায় সহযোগিতায় সহাবস্থানে সম্মত থাকবে সবাই। এমনি অবস্থায় আমাদের ভাষাও হবে দ্ব্যর্থহীন যৌক্তিক। শব্দের অভিধা থাকবে বাক্যের পদরূপে সুনির্দিষ্ট। তখন মানুষের ভাষা হবে মানুষের জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি-তত্ত্ব-তথ্য-সত্য প্রতীক, প্রতিম প্রতিভূ ও প্রসূন। ভাববাদীর ভাষা শাস্ত্র, সাহিত্য, দর্শন পৃথিবীর মানুষের অনেক ক্ষতি করেছে, করছে। এখন জ্ঞানবাদীর, যুক্তিবাদীর ও বিজ্ঞানবাদীর ভাষা মানবতার বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনের জন্যেই মানবমনীষার পরিপূর্ণ অনুশীলনের ও অভিব্যক্তির জন্যেই আবশ্যিক ও জরুরী। ভাষায় মাধ্যমে জীবনকে অনুভব করি বলেই এ তাৎপর্যে ভাষাই জীবন। ভাষা সুষ্ঠু ও বিশুদ্ধ দ্ব্যর্থহীন হলে জীবনানুভব থাকে বিভ্রান্তি মুক্ত।

ভালো থাকার পন্থা ও বাধা

আমরা সবাই ভালো থাকতে চাই। আমরা নির্বিরোধ, নির্বিবাদ, নিরুপদ্রব, নিরাপদ ও দুশ্চিন্তামুক্ত স্বস্তির ও শান্তির জীবন চাই। এর নামই সুখে থাকা। কিন্তু আমরা সুখে থাকতে পারিনে। কেননা আমাদের জীবনে ভাতের অভাব, কাপড়ের অভাব, ঘরের অভাব, আত্মীয়ের অভাব, প্রেমের অভাব, স্বাস্থ্যের অভাব ও অভাব চেতনাজাত দুশ্চিন্তা থাকে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় আর এক প্রকারের অভাববোধ। তা আসে পরিজন প্রতিবেশীর রূপ-যৌবন, শক্তি-সাহস, বিদ্যা-বুদ্ধি, বিত্ত-বেসাত, অর্থ-সম্পদ, মান-যশ, খ্যাতি-ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি, দর্প-দাপট, প্রভৃতির সঙ্গে তুলনায় নিজের হীনতা, অপহৃতি-অপকর্ষ কিংবা নিজের অবস্থার ও অবস্থানের হীনতা স্বল্পতাজাত বৈপরীত্যবোধ থেকে। একে আমরা হিংসা-ঈর্ষা-অসূয়া অথবা পরশ্রীকাতরতা বলি। এর থেকেও মানুষ এক বিকৃত প্রবৃত্তি প্রসূত সুখ পেয়ে থাকে। আমরা সাধারণভাবে যেমন প্রিয়জনকে আদর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে, খাইয়ে, কিছু পাইয়ে দিয়ে, আনন্দ দিয়ে তার উপকার করে সুখ পাই, হিংসা-ঘৃণা-ঈর্ষা-অসূয়ার পাত্র-পাত্রীকেও তেমনি মেরে-মারিয়ে, কেড়ে-কাড়িয়ে, হেনে-হানিয়ে, বঞ্চিত করে-করিয়ে, তার ক্ষতি করে-করিয়ে, তাকে লাঞ্ছিত করে-করিয়েও সুখ পাই। এ সুখের পূর্বশর্ত বা উৎস হচ্ছে হিংসা-ঘৃণা-ঈর্ষা-অসূয়া প্রসূত মানসিক জ্বালা-যন্ত্রণা।

আর এক প্রকারের দুঃখ-দুশ্চিন্তা থাকে জীবনে। তা অনেকটাই স্বভাবজাত এবং উচ্চাশাপ্রসূনও। আমরা আত্মরক্ষণ বিষয়ে সুনিশ্চিত হলেই অর্থাৎ অর্থসম্পদে স্বাস্থ্যে ও নিরাপত্তায় সুনিশ্চিত হলেই আত্মপ্রসারে আত্মপ্রতিষ্ঠা বাঞ্ছা করি, তখন অন্যের সঙ্গে জীবন-জীবিকার, প্রভাব-প্রতিপত্তির, খ্যাতি-ক্ষমতার, মান-যশের ক্ষেত্রে প্রতিযোগী-প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে লড়তে নামি। এতে ধনবল, মনোবল ও পেশীবল হয় পুঁজি ও পাথেয়। দরিদ্রের প্রাত্যহিক জীবনে দু'বেলার দু'মুঠো অন্ন যোগাড় যেমন আবশ্যিক ও জরুরী হয়ে ওঠে, তেমনি উচ্চাশী ও আত্মপ্রত্যয়ী স্বপ্রতিষ্ঠাকামী ব্যক্তিতেও এ বাঞ্ছাপূর্তি আবশ্যিক ও জরুরী বলে প্রতীয়মান হয়। নইলে অন্নাভাব মুক্ত নিশ্চিত-নিশ্চিন্ত জীবনে সাফল্য কি, সার্থকতা কি, তাৎপর্য কি, মূল্য কি, মর্যাদা কি, লক্ষ্য কি, অর্জন কি এ মর্ত্য জীবনে? এসব প্রশ্ন কিংবা জিজ্ঞাসা, অনুভূত, অনুপলব্ধ, অচিন্তিত, অনুচ্চারিত থেকে যায়। যদি নিজের সত্তার অস্তিত্ব ও উপস্থিতি সমকালীন মানুষকে যথাপ্রয়োজনে, যথাস্থানে ও যথাসময়ে জানানো নাই গেল, তাহলে এ মর্ত্যবাস হয়ে যায় নিরর্থক। নিতান্ত প্রাণী প্রজাতি হিসেবে আহার নিদ্রা মৈথুন সর্বস্ব জীবন লজ্জার, ঘৃণার ও আত্ম অবমাননার। অনধিকার চর্চাই হচ্ছে অমানবিক কর্ম ও আচরণ, সৌজন্যে ও সহিষ্ণুতাতেই মনুষ্যত্বের প্রকাশ। সত্তার মূল্য ও মর্যাদা আর তার প্রকাশ-বিকাশের অশেষ ও বিচিত্র সম্ভাবনার অনুশীলনে-প্রয়াসে-প্রযত্নে সক্রিয়ভাবে আনুকূল্য করতে হয়, সচেতন থেকেই। আত্মপ্রত্যয়ী উচ্চাশী মানুষমাত্রের কাছেই এ জীবন অত্যন্ত মূল্যবান এক পুঁজি, এক পাথেয়, এক হাতিয়ার। জীবনের প্রান্ত পর্বে এসে সগর্বে ও স্বকণ্ঠে কৃতি-কীর্তির সাক্ষ্য প্রমাণ সমেত যে ভিনি-ভিডি-ভিসি বিসম্বাদিত ভাবে উচ্চারণ করতে পারবে বা পারে, সেই ধন্য নরকুলে, তারই মর্ত্যজীবন সফল ও সার্থক। আমি এলাম, দেখলাম আর জয় করলাম। সবাই জুলিয়াস সিজারের মতো রাজশক্তির অধিকারী হয় না। কিন্তু সবারই জীবনে বিচরণক্ষেত্র, শক্তি বিকাশের ও প্রয়োগের ক্ষেত্র রয়েছে। বিদ্যা দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে, যুক্তি দিয়ে, মন দিয়ে, মনন দিয়ে, মনীষা দিয়ে, মনস্বিতা দিয়ে, হৃদয় দিয়ে, ধন দিয়ে, সেবা দিয়ে, দেশনা দিয়ে, চিকিৎসা দিয়ে এমনকি কায়িক সাহায্য সহায়তা দিয়ে স্ব স্ব অবস্থানে ও বিচরণক্ষেত্রে তথা সমাজে যথাপ্রয়োজনে, যথাস্থানে, যথাসময়ে প্রতিবেশীর কাজে লাগার, তাকে নিশ্চিন্ত নিশ্চিত স্বস্তির ও নিরাপত্তার আশা ও আশ্বাস দেয়া হচ্ছে ব্যক্তির জীবন সফল-সার্থক ও ধন্য করার উপায় বা পন্থা। যার মৃত্যুতে প্রতিবেশী আর্তকণ্ঠে 'আহা' উচ্চারণ করে তারই মনুষ্য জন্ম ও মর্ত্যজীবন সার্থক হল বলে মানতে হবে। আমার কি আছে, আমি কি চাই—এ চেতনা তৃষ্ণা বাড়ায়, এ তৃষ্ণা অশেষ। আমি কি, আমি কেমন, আমি একক, অনন্য—এ চেতনা ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায় ও ব্যক্তিকে বিশিষ্ট করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের গতি লাটিমের গতি

বাঙলার গ্রামাঞ্চল এখন শিমুল রাঙা, কিছুদিনের মধ্যে তার সঙ্গে যুক্ত হবে মাদার ফুলের রঙিন শোভা, সে-সঙ্গে সোনালী গাছের সোনার রঙের ফুল। আর বাড়িতে বাড়িতে শোভা পাচ্ছে অজস্র বউল শোভিত রসাল তরু। প্রকৃতি এমনি মৌসুমে মৌসুমে ষড়ঋতুতে ষড়রূপ ধারণ করে। প্রকৃতি ফুল বদলায়, ফল বদলায়, পাতা বদলায়, রঙ বদলায়, বদলায় রূপ।

কিন্তু মানুষের যদিও বা বয়োধর্মে স্বপ্ন জাগে, সাধ জাগে, জাগে রূপতৃষ্ণা ও রসচেতনা, তবু তা বাস্তব জীবনে নিখুঁত নিখাদ নির্বিঘ্ন ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগে রূপায়িত হয় না। গ্রাম বাঙলায় দু' হাজার বছর ধরে মৌসুমী অনাহার, অর্ধাহার, মহামারী লঘু-গুরুভাবে চালু রয়েছে। ঝড়-ঝঞ্ঝা-খরা-বন্যা-মারী জাত অজস্মা কবলিত মানুষ হাজারে হাজারে সেদিনও মরত, আজো মরে। সেদিন এদের নিরন্নতার ও মৃত্যুর খবর ছড়াত না, ছড়ানোর উপায় ছিল না বলে। এখন খোলা আকাশ ভরে পৃথিবীর যে কোন গুহার, প্রান্তের ও খানা-খন্দের খবর মুহূর্তে দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। তাই এ কালে মৃত্যুসংবাদ লুকানো যায় না, যায় না শোষণ-পীড়নের খবরও। ব্রিটিশ বিতাড়িত হল, এদের অবস্থা ফিরল না, পাকিস্তান ভাঙল, স্বাধীনতা এল, এদের অবস্থা ফিরল না, স্বদেশী স্বভাষী স্বজাতির শাসনেও শোষণ-পীড়ন কেবল বাড়ছে। বাঙলাদেশ প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই বিদেশী-বিজাতি-বিভাষী-স্বধর্মী শাসিত ও শোষিত। ব্রিটিশবিতাড়নের পরেই স্বদেশী-স্বজাতি-স্বভাষী-স্বধর্মী শাসনে এসেছে এ উপমহাদেশ। সে-সঙ্গে বাঙালীরাও মৌর্য-গুপ্ত-পাল-তুর্কী-মুঘল-ব্রিটিশ সাম্রাজ্যিক ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ মুক্ত হয়েছে। কিন্তু যোগ্যতার কিংবা চরিত্রের বা আদর্শের অভাবে বাঙলার জনগণের আর্থিক, শৈক্ষিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, মানবিক অবস্থার ও অবস্থানের কোন বিকাশ বিস্তার ঘটেনি, আর্থিক জীবনেও ঘটেনি অভাব-অনাহার-অর্ধাহারমুক্তি, শতে আটানব্বই জনের জীবনে কোন উন্নয়ন উৎকর্ষ আজো বিরলতায় দুর্লক্ষ্য। সৎ ও সহজ এবং প্রকাশ্য পথে অবশ্য কৃচিৎ কারো অর্থসম্পদে ঋদ্ধি ও স্থিতি এলেও অধিকাংশ উঠতি শহুরে স্বল্পশিক্ষিত কিংবা শিক্ষিত লুম্পেন বুর্জোয়ার অর্থ-সম্পদ অর্জিত হয়েছে চোরাগুপ্তা পথে। সে-পথ কাড়ার-মারার-হানার ও লুটের, চুরির আর জোর-জুলুমের। এদের মধ্যে ন্যায়-নীতি-আদর্শ চেতনা নেই, এদের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচার-আচরণ স্থূল এবং লাভ-লিপ্সা-স্বার্থ সম্পৃক্ত বলেই এরা স্বভাবে প্রাণীসুলভ বৃত্তি-প্রবৃত্তি চালিত। সংযম, সহিষ্ণুতা, নিবৃত্তি, পরার্থপরতা, সংবেদনশীলতা প্রভৃতি মানবিকগুণ এদের মধ্যে দুর্লভ বলেই দুর্লক্ষ্য। দেশ এখন মস্তান-গুণ্ডা ও খুনী কবলিত। তাই স্বাধীনতার পরে দেশে একশ্রেণীর মানুষের হাতে বিপুল অর্থ-সম্পদ স্তূপীকৃত হলেও অন্যরা আজো দুস্থ, নিঃস্ব, নিরন্ন রয়ে গেছে, দরিদ্ররাও অনিশ্চিত অবস্থার ও অবস্থানের সীমায় সদা অস্থির জীবন যাপন করে। এমনি বিষম আর্থিক-শৈক্ষিক-সামাজিক-আঞ্চলিক অবস্থানের ফলে ভীরু, দুস্থ, নিঃস্ব, ক্ষীণকায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষেরা হয়েছে মিথ্যাভাষী, ভিক্ষাজীবী। শক্তি সাহসসম্পন্ন লোকেরা হচ্ছে বাঁচার গরজেই বেপরওয়াভাবে চৌর্যবৃত্তিপ্রবণ, লুটেরা ও মিথ্যাবাদী। শহুরে শিক্ষিতরা হয়েছে দুর্নীতিবাজ, জালিম ও লুটেরা। এদের মধ্যে আমলা-সাংসদ মন্ত্রীরাও রয়েছেন। আর এ বিশৃংখল অশাসন-দুঃশাসন কবলিত রাষ্ট্রে সরকার মাত্রই থাকে বিদেশীর কৃপা-করুণা, দয়া-দাক্ষিণ্যকামী এবং সার্বক্ষণিক ভিক্ষাজীবী। এমনি সরকার বিদেশী দেখলেই ভিক্ষার হাত প্রসারিত করে। ফলে এধরনের দরিদ্র রাষ্ট্রের সরকার মাত্রই হয় মুৎসুদ্দী সরকার, মেরুদণ্ডহীন আনুগত্যপ্রবণ সরকার, প্রভুমানা সরকার। হুকুম তামিল করা, হুমকি হজম করা, সবলের হুঙ্কারে কাবু থাকা, আর হামলা মুখ বুজে সহ্য করাই এমনি সরকারের চারিত্র্য লক্ষণ।

ব্যক্তিজীবনের জ্ঞান-অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি, অক্ষম দুর্বল লোকেরা প্রবলের জোর-জুলুম-লাঞ্ছনার শিকার হলে প্রতিবাদের-প্রতিরোধের উপায় খুঁজে পায় না। কিন্তু তখন মনে-জাগা ক্ষোভ-ক্রোধের ও অপমানের জ্বালা ঘরের শাসনপাত্রদের উপর তুচ্ছ কারণেই প্রয়োগ-প্রকাশ করে মনে শান্তি ও সান্ত্বনা পায়। আমাদের সরকারও তেমনি অকাজের কাজ করে সেবার গৌরব ও তারিফ খুঁজে বেড়ায়, তর্জন গর্জন করে আপন শক্তির ও ক্ষমতার দর্প-দাপট অনুভব করে, সর্বক্ষণ স্বৈরশাসক এরশাদের নিন্দা ছড়ায়, যেন গত ত্রিশ বছর ধরে এদেশে আইয়ুব খানের আমল থেকে স্বৈরশাসন চলছে না, বাকশাল থেকে মোস্তাক-জিয়া হয়ে এরশাদ অবধি সবটাই তো সর্বার্থক ও সর্বাত্মকভাবে স্বৈরশাসনই। তথ্য ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিমাত্রই তা অবশ্যই স্বীকার করবেন।

অজ্ঞ-অনক্ষর মানুষের ভোটে গণতন্ত্র আসে না, আসতে পারে না, কেননা, ওরা ভোটের গুরুত্ব বোঝে না। ওরা জানে না 'গণ' কে, গণ কি এবং গণ কেন? সার্বভৌমত্ব গণমানবের-জনগণের-নাগরিকেরই হাতে—এর তাৎপর্য যদি জনগণ জানত-বুঝত, তাহলে কি সাংসদরা, মন্ত্রীরা এদের প্রভু হয়ে মাননীয় হয়ে, ঘাড়ে চাপতে পারত? এরা এসব জানলে বুঝলে নিশ্চয়ই শিক্ষাঙ্গনে স্ব স্ব দলের ছাত্র লেলিয়ে সংঘর্ষ-সংঘাত ঘটানোর প্রতিবাদ করত। ওরা জানলে বুঝলে বলত, পলি জমে জমে ভরাট হওয়া নদী খননই জরুরী। অগভীর নদী বর্ষায় টানতে পারে না বন্যার পানি, শীতে ঢালতে পারে না সেচের জন্যে খালে পানি। কাজেই জনগণের দাবি বা আবেদন ছাড়াই জিয়ার স্মৃতি উজ্জ্বল রাখার জন্যে কোদালের ঘায়ে ঘায়ে জন্মভূমি বাঙলাদেশের শরীর নির্বিচারে ক্ষত-বিক্ষত করে কোন লাভ হবে না। কেবল অর্থের অপচয় ও ধান-পাটের জমিই নষ্ট হচ্ছে। ওরা জানলে বুঝলে বলত, শিক্ষা ক্ষেত্রে ধনীর সন্তানের জন্যে ইংরেজী মাধ্যমে, দরিদ্র সাধারণের সন্তানের জন্যে বাঙলা মাধ্যমে, অজ্ঞ-অনক্ষর লোকের সন্তানের জন্যে মক্তব-মাদ্রাসা কেন? অভিসন্ধিটা কি? এমন অমানবিক নিষ্ঠুর স্বার্থপরতা কেন?

দারিদ্র্যের চাপে গরীবেরা ধন-মানের সঙ্গে মানবিকগুণও হারাচ্ছে, হচ্ছে ভিক্ষাপ্রবণ, চৌর্যপ্রবণ মিথ্যাশ্রয়ী। হাটে-বাজারে, শহরে-বন্দরে, ব্যবসায়ীরা, মজুতদার-আড়তদারেরা, কারখানাদারেরা আর শাসন-প্রশাসনে নিযুক্ত বড় ছোট মাঝারি সবস্তরের চাকুরেরা সুযোগ সুবিধেমতো জোরে-জুলুমে, চোরা-গোপ্তা পথে দেশের মানুষের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করছে। ন্যায়নীতি-আদর্শনিষ্ঠা, ব্যক্তিচরিত্রে সততা বলে কিছু সহজে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখা যায় না, যদিও ব্যতিক্রম রয়েইছে স্বল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে। এখন সর্বত্র দুষ্টের-দুর্জনের পালন এবং শিষ্টের ও দুর্বলের দমনই হচ্ছে চালু রীতি ও নীতি। বৈষয়িক ব্যবহারিক রাষ্ট্রিক জীবনে নয় কেবল, মনে-মননে-মনীষায়ও আমরা আজো নিঃস্ব, দেউলিয়া। মনন-মনীষার চর্চাও আমাদের নেই। আমরা লাটিমের মতো গতিশীল, কিন্তু প্রগতি বা সম্মুখ গতি আমাদের নেই।

কূর্ম ও কূপমাণ্ডূক্য নীতি পরিহার আবশ্যিক

আজকাল আকাশ খোলা, বাতাসও সর্বত্র একইভাবে যুগপৎ প্রবহমান। তাই তারে-বেতারে রেডিয়ো-টিভি প্রভৃতি নানা বিস্ময়কর যান্ত্রিক মাধ্যমে ঘরে দরজা-জানালা দিয়ে নয় কেবল ফুটো-ফাঁক-ফুকর দিয়েও ঘরে শোয়া-বসা জাগ্রত মানুষের কানে-চোখে-মনে ধরা দেয় গোটা পৃথিবীর মানুষের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ। ইহজাগতিক জীবনাচারের রীতি-রেওয়াজ এবং ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগের সামগ্রী ও পদ্ধতি সম্বন্ধেও সর্বপ্রকার ধারণা পাওয়া সহজ। আজকাল সচেতন সাক্ষর-অনক্ষর সব বয়সের সব মানুষের কানে-চোখে-মনে ধরা পড়ে জাগতিক হালচাল। নানা ব্যক্তিক ও সামাজিক সাংস্কৃতিক আর আচারিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও স্বাভাবিক বা অবশ্যম্ভাবীরূপে সৃষ্টি করে এবং পরিবেশ প্রতিবেশ প্রভাবিত করে ব্যক্তিকে, পরিবারকে, সমাজকে তথা রাষ্ট্রবাসীকে।

তাই আজকাল আর ঘরের, পরিবারের, সমাজের কিংবা স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শেখানো-পড়ানো দিয়েই মানুষের মন-মত-সিদ্ধান্ত গড়ে ওঠে না বাঁধা পথে, প্রথায় ও পদ্ধতিতে। এখন জীবনজিজ্ঞাসা বা জীবনচেতনা ও জগৎভাবনা মাত্রই বৈশ্বিক। তাকে শৈশবে-বাল্যে-কৈশোরে পরিবার সূত্রে ও শাস্ত্রিক-সামাজিক পরিবেশ প্রতিবেশ প্রভাবে প্রাপ্ত বিশ্বাস-সংস্কারের মধ্যে কিংবা সরকারী প্রয়োজনে প্রচারিত ও প্ররোচিত নানা মতলব প্রসূত নীতি-নিয়মে মগজধোলাইজাত বাঁধাপথে ঠুলিপরানো ঘোড়ার মত জীবনপথে চালিত বা তাড়িত করা সম্ভব হবে না, হচ্ছেও না। যন্ত্র পৃথিবীর মানুষের ব্যবধান ও স্বাতন্ত্র্য প্রতিদিনই ঘুচিয়ে দিচ্ছে। স্বাতন্ত্র্যের ও অপরিচয়ের বাধা-ব্যবধানের অলক্ষ্য প্রাচীর ভেঙে পড়ছে। উল্লেখ্য যে, ভাটির পানি হয়তো বাঁধ দিয়ে আটকানো যায়, কিন্তু জোয়ারের স্ফীতিমান পানি বাঁধ ছাপিয়ে ওঠে, গড়িয়ে প্রবেশ করে ভেতরে। চিন্তা-চেতনাও তেমনি, সক্রেটিসকে কিংবা শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দীকে যিশুকে হত্যা করে, মুসাকে বিতাড়িত করে, মুহম্মদকে দেশ ছাড়তে বাধ্য করেও তাঁদের মতবাদ বিলুপ্ত করা যায়নি। চিন্তা, তত্ত্ব, তথ্য, সত্য একবার উচ্চারিত হলে তা বাতাসই বিশ্বময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়ে অবিনশ্বর অবিলুপ্ত করে রাখে। অতএব, সংখ্যাগুরুকে ধর্মীয় প্ররোচনা দিয়ে শাসনে ও দলে রাখার প্রয়াস গর্হিতকর্ম একালে। কারণ একাল হচ্ছে বিজ্ঞানের তথ্য, তত্ত্ব ও সত্যনির্ভর যন্ত্রচালিত ব্যক্তিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক, বাণিজ্যিক জীবনাচারের ও জীবনচেতনার যুগ। একালে গৌত্রিক, গৌষ্ঠীক, শাস্ত্রিক, সামাজিক, জাতিক, দৈশিক, সাম্প্রদায়িক ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষার প্রয়াস বৃথা ও ব্যর্থ হবেই, হচ্ছেই। মানুষকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পিতা-মাতার মতোই লালন-পালন করা, খোরপোশ দেয়া, কাজ দেয়া, কিংবা শিশু-রুগ্ন-পঙ্গু-বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে বসিয়ে খাওয়ানো রাষ্ট্রের তথা সরকারেরই দায়িত্ব। আজ বিশ্বমানবও নির্বিশেষ মানবতামুখী চিন্তা-চেতনার উন্মেষ বিকাশ বিস্তার ও উৎকর্ষই শিক্ষিত শহুরে জ্ঞানী-গুণী, মনীষী-বিদ্বান, গবেষক, মনস্বী ব্যক্তিমাত্রেরই আত্মকল্যাণে এবং জাতীয় হিতৈষণাবশে কাম্য হওয়া আবশ্যিক ও জরুরী। কূর্মস্বভাব পরিহারের, মানসসংকীর্ণতা ও রক্ষণশীলতা সচেতনভাবে পরিহারের অনুশীলন ভাব-চিন্তা-মন-মনন-মনীষা ক্ষেত্রে একান্ত আবশ্যিক। আমাদের উপযোগচেতনা নিয়ে গ্রহণশীল এবং হৃতউপযোগ চিন্তা-চেতনা, আচার-আচরণ, বিশ্বাস-সংস্কার বর্জনে আগ্রহী হওয়া দরকার। আমরা ইহজাগতিক তথা সামাজিক, রাষ্ট্রিক, বাণিজ্যিক, চিকিৎসা ও বিজ্ঞান বিষয়ক অনুশীলনে, চিন্তায়, চেতনায়, আবিষ্কারে, উদ্ভাবনে সেক্যুলার না হলে ক্ষতি হবে আমাদেরই। অবক্ষয় আমাদের গ্রাস করবে, আমাদের গতি-প্রগতি-অগ্রগতি সবকিছুই হবে প্রায় রুদ্ধ, কিংবা মন্থর ও মৃদু। কথায় কথায় অকারণে অপ্রয়োজনে ইহজাতিক পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক, বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে চিকিৎসাবিদ্যায় কিংবা যন্ত্রবিদ্যায় ইসলামিয়া, ইসলামিক, ইসলামী প্রভৃতি বিশেষণ যোগ করে অজ্ঞ-অনক্ষর লোককে বিভ্রান্ত, মুগ্ধ ও প্রতারিত রাখা অন্যায় ও বিবেক-বিবেচনাহীন কর্ম। ইসলামিয়া টেকনিক্যাল কলেজ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা ইসলামী হাসপাতাল হতেই পারে না, কেননা বিদ্যাটা ইহুদী-খ্রীস্টানের দান।

AMARBOI.COM

মৌলিক মগজী ফসল চাই

যে-কোন আন্দোলনের, দ্রোহের ও সংগ্রামের জন্যে প্রেরণা, প্রণোদনা, প্রবর্তনা প্রভৃতির সঙ্গে অধিকাংশ মানুষের তথা জনগণের আবেগ, কৌতূহল, হুজোগে চেতনা প্রভৃতিও কাজ করে। সবটা মিলে গোটা দেশের অধিকাংশ মানুষের একটা আবেগ, একটা অনুভূতি-উপলব্ধি এবং একটা দায়িত্ব ও কর্তব্য বুদ্ধিও গড়ে ওঠে। এই সামগ্রিক চেতনাকে আমরা বলি গণজাগরণ আর যা অর্জনের বা বর্জনের জন্যে এ আন্দোলন, দ্রোহ বা সংগ্রাম তাকে বলি গণদাবি। এমনি স্বাধিকারচেতনা, পীড়ন-যন্ত্রণামুক্তি শোষণ-বঞ্চনামুক্তি লক্ষ্যে দ্রোহ বা আন্দোলন পরিণামে রক্তক্ষরা প্রাণহরা লড়াইয়ে পরিণত হয়, এর জন্যে স্থূল বা সূক্ষ্ম চিন্তা-চেতনা প্রয়োজন হয় না। তখন মানসিক ক্ষোভ-ক্রোধ ও স্বার্থচেতনা দৈহিক উত্তেজনায় রূপান্তরিত হয়ে পেশী চালনায় প্ররোচিত করে। লাভ-লিপ্সা কিংবা স্বার্থ-অধিকার বোধ নিয়ে রেষারেষি, কাড়াকাড়ি, মারামারি, হানাহানি শুরু হয়েছে কিংবদন্তীর হাবিল-কাবিল দিয়েই।

আমরাও দৈশিক, রাষ্ট্রিক, ভাষিক, জাতিসত্তা কিংবা জাতি হিসেবে চিরকালই অন্তত দু'হাজার বছর ধরেই লঘু-গুরুভাবে পারিবারিক, গৌষ্ঠীক, গৌত্রিক, আঞ্চলিক, বার্ণিক কিংবা ধার্মিক, সর্বোপরি জীবনজীবিকা ক্ষেত্রে আর্থিক স্বার্থে পরস্পরের মধ্যে, পরস্পরের বিরুদ্ধে আন্দোলন, দ্রোহ ও লড়াই করেছি। এমন লড়াই সব মানুষই করে। সমাজবদ্ধ হয় মানুষ সম-সহ স্বার্থে, সংযমে, সহিষ্ণুতায়, সহযোগিতায় নির্বিবাদে সহাবস্থান করার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অঙ্গীকারে। কিন্তু যেহেতু সমাজবদ্ধ মানুষেরা পৃথিবীর সর্বত্র চিরকাল ঈর্ষা, অসূয়া, হিংসা, ঘৃণা, লোভ-লিপ্সা বশে রেষারেষি, কাড়াকাড়ি, মারামারি, হানাহানি করেছে, করছে, ও করবে, কারণ ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক জীবনে নানা স্বার্থরক্ষার, আদায়ের ও লিপ্সা পূরণের, আত্মপ্রসারের জন্যে এ প্রয়োজনীয় ও জরুরী হয়ে ওঠে, সেহেতু অনৈক্য, বিতর্ক-বিরোধ-বিবাদ-দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-সংঘাতবিহীন মনুষ্যজীবন কল্পনাতীত। একালে আমাদের জাতীয় জীবনে আমরা কয়েকটি অভ্যন্তরীণ তথা সরকারবিরোধী সংগ্রামে চরম ও পরম আর সুদূর, ব্যাপক ও গভীর ফলপ্রসূ বিজয়ের গৌরব-গর্ব অর্জন করেছি। এতে সামগ্রিক, সামূহিক ও সামষ্টিকভাবে জনগণের আর্থিক শৈক্ষিক নৈতিক সাংস্কৃতিক সামাজিক উন্নতি না হোক, একশ্রেণীর ধূর্ত উদ্যমশীল-উদ্যোগী লোকের অর্থবিত্তে, শিক্ষায়-সাচ্ছল্যে, স্বাচ্ছন্দ্যে মানে-যশে-খ্যাতিতে-ক্ষমতায় দর্পে-দাপটে যে উন্নতি-উৎকর্ষ ঘটেছে, তাতে কোন সংশয় নেই। কেননা এ তো দৃষ্টিগ্রাহ্য চাক্ষুষ ও স্থূল বৈষয়িক ব্যবহারিক উন্নতি, গাড়ি-বাড়ি-বিলাস-বসনে উন্নতি।

আমরা কিন্তু মানসোৎকর্ষের সন্ধানী যা একটা জাতির যথার্থ উন্নতির পরিমাপক। সংবেদী মনের, মননের, মনীষার উৎকর্ষই এর মাপকাঠি। ব্যক্তির ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচার-আচরণ যখন গুণে-মানে-মাপে-মাত্রায় উন্নত বা বিকাশ প্রকাশ পায়, তখনই তাকে যথার্থ উন্নতি-উৎকর্ষ বলে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়। বিগত চুয়াল্লিশ কিংবা বাইশ বছরে আমাদের মানসচর্যায় ও মানসচর্চায় কোন গৌরবগর্ব করার মতো, আনন্দিত কিংবা হৃষ্ট-তুষ্ট-তৃপ্ত হওয়ার মতো কিছু মেলে না। সাহিত্যে, দর্শনে বিজ্ঞানে ইতিহাসে সমাজতত্ত্বে, রাজনীতিতে, সংস্কৃতিতে সৃষ্টিশীলতার, প্রগতির, প্রাগ্রসর চিন্তা-চেতনার মনন-মনীষার স্বাক্ষর নেই কোথাও। বরং ভাষাসংগ্রামের ইতিবৃত্তান্ত, যুক্তফ্রন্টের বিজয়গর্ব, শিক্ষানীতিদ্রোহিতা, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা অর্জন আর নব্বইয়ের শহরে ছাত্রের নেতৃত্বে ছাত্রজনতার শহরে গণআন্দোলনের বড়াই-ই এ চুয়াল্লিশ বছরে আমাদের অর্জিত চেতনাসম্পদ। এমনি অর্জিত ঐতিহ্য, এমনি সংগ্রামী পরম্পরা গোত্র ও গোষ্ঠীগত জীবনে বুনো বর্বর আরণ্য দ্বৈপায়ন সমাজেও সুলভ। কাজেই এমনি গৌরবের বার্ষিক-পার্বণিক রোমন্থনে হৃষ্ট তৃপ্ত তুষ্ট ও নিষ্ক্রিয় থাকা জাগ্রত উদ্যমশীল উদ্যোগী জাতীয় জীবনের লক্ষণ নয়। জাগ্রত জীবনের লক্ষণ হচ্ছে জীবনের অভাব-চাহিদা-আকাঙ্ক্ষা পূর্তি লক্ষ্যে আবিষ্কারে উদ্ভাবনে অনুভবে উপলব্ধিতে সংবেদনশীলতায় সৃষ্টিশীলতায় সদা গতিশীল থাকা, প্রগতিশীল প্রাগ্রসর চিন্তা-চেতনায় ঋদ্ধ থাকা, মনের-মননের-মনীষার অভিব্যক্তিতে জীবনানুভূতিকে সূক্ষ্মতা, গভীরতা ও ব্যাপকতাদানে সচেষ্ট থাকা, নিত্য অনুশীলনে জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেক-প্রজ্ঞাকে তীক্ষ্ণ ও দৃঢ়মূল করে তোলা, মানবে সম্ভব শক্তির ও গুণের বিকাশ সাধন করে মনুষ্যত্বে বা মানবিকতায়, মানবতায় পূর্ণতা দানে প্রয়াসী হওয়া। আমরা আজো প্রকৃত অর্থে গতানুগতিকভাবে অনুকৃতির ও অনুসৃতির গ্লানিকর জীবনই যাপন করছি। সৃষ্টিশীলতা ছাড়া, মনীষা ছাড়া কোন জাতি স্বয়ম্ভর 'স্বনির্ভর হয়ে বাঁচতে পারে না। আমাদের স্বাধীন স্বকীয় আবিষ্কারের, উদ্ভাবনের, কৌশলের, প্রকৌশলের, প্রযুক্তির, যন্ত্রের, ঔষধের, মগজ-প্রসূন দর্শনের কোন নিদর্শন জগৎবাসীকে উপহার দিয়ে জগৎসভায় অভিনন্দিত হতে পারিনি। সর্বাত্মক ও সর্বার্থক উন্নতি না হলে দুনিয়ার কোন জাতিই আমাদের সম্মানের চোখে দেখবে তো না-ই, আমাদের পার্থিব স্থিতিও হিসেবে ধরবে না। আমাদের মৌলিক চিন্তায়, চেতনায়, কর্মে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবিষ্কারে, উদ্ভাবনে, মনীষায়, মনস্বিতায়, সৃষ্টিশীলতায়, আত্মোন্নয়নে প্রয়াসী হতে হবে। আজ অবধি বাঙলাদেশের বাইরেও পরিচিত ও প্রখ্যাত তেমন ব্যক্তি বিরলতায় দুর্লক্ষ্য। এমনকি কাব্যে দু'জন, গল্পে দুজন, ইতিহাসে দু'জন, চিন্তাশীল প্রবন্ধে দু'জন আর অর্থবিজ্ঞানে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে, প্রকৃতি বিজ্ঞানে, রসায়ন প্রভৃতি বিভিন্ন বিজ্ঞানে দু'জন করে বাঙলাদেশী কোলকাতার বিদ্বৎ সমাজে সুপরিচিত হয়েছেন বা রয়েছেন কিনা আমাদের পুরো জানা নেই। এ লজ্জাকর দুর্দশা থেকে সচেতন প্রয়াসে উত্তরণ আবশ্যিক ও জরুরী। আমাদের গভীর বিদ্যাবত্তা থাকা চাই, আমাদের বিদ্বান হতে হবে। আমাদের মৌলিক মগজী ফসল চাই।

মানবিক গুণের অনুশীলন জরুরী

বৃত্তি-প্রবৃত্তিচালিত বলেই প্রাণী মাত্রই আত্মরতিবশে আত্মরক্ষণ ও আত্মপ্রসার প্রবণ। স্ব স্ব বুদ্ধি, শক্তি ও সাহসই জ্ঞানী মাত্রেরই পুঁজি। আর চাওয়া ও পাওয়াই তার ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের নিয়ামক। অধিকাংশ মানুষ প্রাকৃতজন বলেই প্রাণীসুলভ প্রবৃত্তিচালিত জীবনই অনুভবের জগতে যাপন করে অর্থাৎ অন্তরে এরা প্রকৃতি লালিত প্রাণীই থাকে, অর্জিত গুণে ভূষিত ও ঋদ্ধ হয় না। এদের মধ্যে সংযম, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, পরার্থপরতা, সম ও সহ স্বার্থে সহযোগিতায় নির্বিবাদে নির্বিরোধে নিরুপদ্রবে, নির্লোভতায়, ঈর্ষা-অসূয়া-হিংসা-ঘৃণা সংযমনে সহাবস্থানের বাস্তব প্রয়োজন চেতনা গুরুত্ব পায় না। তারা সুযোগ পেলেই আরণ্য প্রাণীর মতো দুর্বলকে কাড়ে, মারে ও হানে। সমাজে এমন মানুষই হাজারে আজো নয়শ নিরেনব্বই জন। এদের সব সময়ে শাসনে সংযত রাখতে হয়, বুনো বর্বর মানুষও গৌত্রিক, গৌষ্ঠীক, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে এ সঙ্কট-সমস্যা অনুভব করেছে, তাই সেখানেও পারস্পরিক নির্বিরোধ সহাবস্থানের প্রয়োজনে সানুচর সর্দারতান্ত্রিক শাসন-প্রশাসন চালু হয়েছিল আদি ও আদিমকাল থেকেই। ব্যক্তিক, পারিবারিক, গৌষ্ঠীক, গৌত্রিক, সামাজিক ও আঞ্চলিক-দৈশিক-রাষ্ট্রিক জীবনে জান-মাল-গর্দানের নিরুপদ্রব নির্বিরোধ নির্বিঘ্ন নিরাপত্তা না থাকলে বাঁচা অসম্ভব জেনেই গোড়া থেকেই মানুষ এ সামাজিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল হয়তো বিনা আপত্তিতেই। কিন্তু ব্যক্তিক লাভ-লিপ্সা বশে অসংযত্ব-অসহিষ্ণু শক্তিমান সাহসী এ অলিখিত ও স্পষ্টভাবে জনে জনে অপরিব্যক্ত চুক্তি চিরকালই সর্বত্র লঙ্ঘন করে একে অপরের এবং একজন বহুজনের দুঃখ-যন্ত্রণার, ক্ষতির ও কষ্টের কারণ হয়েছে, আজো হচ্ছে।

সর্দারতন্ত্র, রাজতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র, গণতন্ত্র প্রভৃতি কোন তন্ত্রই অসংযত ও অসহিষ্ণু লিপ্সু লুব্ধ মানুষের এ নীতি-নিয়ম লঙ্ঘন, তাদের সৃষ্ট বিরোধ-বিবাদ-উপদ্রব, কাড়া-মারা-হানা প্রভৃতি বাঞ্ছিত মাত্রায় সীমিত বা দমিত অথবা সুপ্ত, গুপ্ত ও লুপ্ত করতে পারেনি।

আসলে এর জন্যে অনুশীলন আবশ্যিক, দেহের জন্যে যেমন শ্রমই হচ্ছে ব্যায়াম। অর্থাৎ দেহ মাত্রই শ্রমজীবী ও শ্রমপ্রসূ। শ্রম ব্যতীত দেহ তাই সুষ্ঠু সবল ও কেজো রাখা অসম্ভব। দেহের স্বাস্থ্য মাত্রই শ্রমপ্রসূন। দেহের সুপ্ত শক্তি কত প্রবল ও বিচিত্র তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিদর্শন মেলে সার্কাসে, কার্নিভ্যালে অলিম্পিক খেলায় আর নৃত্যে, যাদুকরের খেলায়, গায়কের কণ্ঠে, বাজিয়ের আঙুলে, চিত্রীর হাতে, ব্যায়াম বীরের ও কুস্তিগীরের দেহলীলায়, অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে। মানুষ জীবিকার প্রয়োজনে ব্যবহারিক-বৈষয়িক জীবনে অল্পবিস্তর দৈহিক ব্যায়াম তথা শ্রমানুশীলন করে নানা আকারে ও প্রকারে। এমনকি শ্রমবিমুখ ধনী-মানী-বিলাসীরাও বাঁচার গরজে নানাপ্রকার যৌগিক-দৈহিক ব্যায়াম করে। ঘোড়দৌড়ের মতো দৌড়ে, কুত্তাদৌড়ের মতো জগিঙ করে, কিংবা বলদের মতো সমতালে হেঁটে শরীর সুস্থ রাখে পড়তি বয়সে শ্রমবিমুখরাও।

সমাজস্বাস্থ্য প্রত্যাশিত ও প্রয়োজনীয় মানের মাপের মাত্রায় স্তরে রাখার জন্যেও সামাজিক মানুষের মানসিক গুণের বা স্বাস্থ্যের অনুশীলন আবশ্যিক। আমরা এ তত্ত্বের, তথ্যের ও সত্যের গুরুত্ব আজো উপলব্ধি করতে পারিনি বলেই মুখে স্বীকার করেও কাজে আর আচরণে এমনি অনুশীলনের গুরুত্বচেতনার পরিচয় দিতে পারিনি। আমাদের সামাজিক, আর্থিক, নৈতিক, শৈক্ষিক, সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রিক জীবন আজো আরণ্য পরিবেশ-প্রতিবেশ তুল্য রয়ে গেছে। এখানে দারিদ্র্য দোষে প্রত্যাশিত মানবিকগুণ ও আচরণ বিরল হয়ে উঠছে, এখানে কৃপা-করুণা-দয়া-দাক্ষিণ্য দুর্লভ হয়ে উঠছে, এখানে স্নেহ-প্রীতি-ভালোবাসা-সেবা-পরার্থপরতা যেন কীটদ্রষ্টবৎ বিকৃতি পাচ্ছে, এখানে যেন প্রতি দ্বিতীয় ব্যক্তিই সন্দেহভাজন, বিশ্বাস-ভরসা-নির্ভরতার অযোগ্য ভাবী শত্রু। এখানে যেন নীতিচেতনা, আদর্শনিষ্ঠা, নৈতিক দায়িত্ব-কর্তব্যবুদ্ধি লোকব্যবহারে দুর্লক্ষ্য হয়ে উঠেছে। জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে লেনদেনে বেচা-কেনায় যেন কালো মানুষ-সৃষ্ট কালোজগতে কালোবাজারে কালো অর্থে ও কালো হাতে আপোসে প্রেমসে-পেয়ারসে মিল-মহব্বতের এক জাতিক ও আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, উঠেছে অর্থ-সম্পদ নিয়ন্ত্রক সর্বশক্তিমান এক শাসক-শোষক, পীড়ক-পেষক শ্রেণী। ওরাই প্রত্যক্ষে-পরোক্ষে, দৃশ্যে-অদৃশ্যে জনগণের জীবন-জীবিকার নিয়ামক নিয়ন্ত্রক।

এ অমানবিক প্রতিবেশ-পরিবেশ বদলাতে হলে, মানবতার বিকাশ-বিস্তার ঘটাতে হলে আমাদের মানবজমিন রূপ মনোভূমে কর্ষণ শুরু করতে হবে মুখ্যত শিক্ষা দানের ও গ্রহণের মাধ্যমে। এ সাক্ষরতা নয়, গণশিক্ষাও নয়, নয় প্রশ্নোত্তরের পরীক্ষানির্ভর উচ্চশিক্ষাও। এ শিক্ষাব্যবস্থায় কেবল পেশাজীবী কুশলী দক্ষ কর্মী তৈরি হবে না, মানুষ তৈরি হবে। সে-মানুষ তৈরি করতে হলে ইতিহাস-সাহিত্য-দর্শন-সমাজবিজ্ঞান অবশ্যপাঠ্য করতে হবে। মানুষের কোমল মানবিক বৃত্তির সযত্ন প্রয়াসে বিকাশ-বিস্তার ঘটাতে হবে, অনুভব-উপলব্ধি শক্তিকে করতে হবে তীক্ষ্ণ ও তীব্র।

এমনি শিক্ষা মাধ্যমে মানবিক বৃত্তির অনুশীলন গুরুত্ব পেলেই [উল্লেখ্য এ কাজ জন্মসূত্রে লব্ধ তাৎপর্যশূন্য উপযোগরিক্ত শাস্ত্রানুশীলনে সম্ভবই হবে না কখনো, হয়নি যে তার প্রমাণ এ সমাজ] আমাদের আসছে প্রজন্মের নাগরিকেরা হবে সংযত, সহিষ্ণু, সংবেদী, আত্মসত্তার মূল্য ও মর্যাদা সচেতন, নৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক দায়িত্ব-কর্তব্য বুদ্ধিসম্পন্ন মানবিকতা ও মানবতাপ্রিয় সুজন ও সজ্জন। এমন মানুষের সংখ্যা সমাজে শতে বিশজন হলেই সমাজস্বাস্থ্য, সমাজশৃঙ্খলা, সমাজে নৈতিকচেতনা, ন্যায্যতা ও সততা প্রবণতা, আদর্শপ্রিয়তা প্রত্যাশিত মাত্রায় লক্ষণীয় হয়ে উঠবে। তবে এখানেও সেই রন্তনতত্ত্বই স্মরণীয় : সব কিছুর মূল শেকড় ক্ষুধার অন্ন। অর্থে সম্পদে অন্ন-সাচ্ছল্য না থাকলে মানুষে মনুষ্যত্ব বিরল থাকবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যায়াম : দৈহিক ও মানসিক

আগেকার দিনে রাস্তা ছিল না রাজধানীতে ছাড়া অন্যত্র। পায়ে চলা পথই ছিল। গাঁ-গঞ্জের সঙ্গে হাটের, বাজারের, খেয়াঘাটের ও প্রাশাসনিক কেন্দ্রের সংযোগ রক্ষার জন্যে কিছু প্রশস্ত কাঁচা রাস্তা থাকত। বর্ষায় হত কাদাময়, চলাচলে ঘটত দুস্তর বাধা। তখন জলপথই মানুষের অবাধ ও নির্বিঘ্ন চলাচলের জন্যে মুখ্য অবলম্বন ছিল। এ জন্যে নিম্নবঙ্গে ও পূর্ববঙ্গে বর্ষাকালই ছিল বিয়ের মৌসুম। শীতের শুকনো মৌসুমে এবং গ্রীষ্মেও গরু-মোষটানা গাড়ীও ছিল সচ্ছল লোকের এবং দূরযাত্রী নারীর জন্যে যান। আর বাহন ছিল একালের মানুষের চোখে অমানবিক হলেও, পালকী, সে-পালকী ধনী-মানী লোকেরা একালের মোটর গাড়ির মতোই ব্যবহার করত মালিক হিসেবে। পুষত ১০/৮/৬/৪ বেহারা। পালকীর পরিসরও ছিল বড়, চার জন বসতে পারত। অবশ্য ভাড়াখাটা পালকীতে দুজনের বেশি বসা যেত না, সেগুলো হত আকারে ছোট আর লোকে গরু-মোষ গাধার পিঠে চড়েও কাছাকাছি জায়গায় আসা-যাওয়া করত। শাহ-সামন্ত জমিদারেরা চড়ত হাতীর পিঠে হাওদায় ও গোড়ায় যানবাহনের অভাবে।

কাজেই যানবাহনের অভাবে, চওড়া রাস্তার অভাবে পায়ে চলা পথে কিংবা নায়ে চড়ে যাতায়াত করতে হত বলে মানুষকে হাঁটতেই হত, তাছাড়া সেকালে একালের মতো এত অফিস-আদালত, বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, ব্যাঙ্ক-কারখানা, অফিস ছিলই না। কাজেই লেখাপড়ারও এমন বহুল বিস্তার ছিল না। দেশের লোকেরা ছিল ঘরানা পেশাজীবী-চাষী-মজুর-কামার-কুমার-জেলে-তাঁতী-নিকেরী-মুলঙ্গী-কাগজী-চাঁড়াল-চামার-বাগদী-হাড়ি-ডোম-কাহার-কশাই প্রভৃতি। [পেশাজীবীর তালিকা রয়েছে ভারতচন্দ্র রায়ের ও মুকুন্দরামের কাব্যে] ভিক্ষু-শ্রমণ-শ্রাবক-ব্রহ্মচারী-সন্ন্যাসী-হেকিম-কবিরাজ-ফকির-দরবেশ-পীর-গুরু-মোল্লা-মুয়াজ্জিন-মুনশী-মল্ল-সিপাহী-সৈনিক সবাইকে পদব্রজেই চলতে হত।

আর সেকালে শাহ-সামন্ত-জমিদার এবং সাধারণ পুরুষকে আত্মরক্ষার গরজেই লাঠি চালনা, তরবারী চালনা, খঞ্জর বা ছুরি চালনা, তীর ছোঁড়া, বর্শা ছোঁড়া, বন্দুকের গুলি ছোঁড়া শিখতে হত। সাধারণরাও লেঠেল, গুণ্ডা ও সিপাহী হিসেবে এসবে পারদর্শী হত, তাছাড়া ধন-সম্পদ-জমি দখলে রাখতে হলে এবং একালের নতুন জাগা চরের মতো পরের ধন-সম্পদ-জমি দখল করতে হলে বাহুবলে ঠেকানো ও ঠেঙ্গানোর কৌশলে নৈপুণ্য অর্জন করতেই হয়। রাজা-রাজকুমার রণনিপুণ ও বাহুবলে বলবান না হলে কেবল ভাড়াটে সেনানী-সৈন্য দিয়ে রাজ্যরক্ষা কিংবা রাজ্য জয় করতে পারত না। হাঁটতেই হত সবাইকে, পরিশ্রম সাপেক্ষ ছিল প্রায় সব পেশাই। এভাবে রাজা থেকে ভিখিরী অবধি সবাইকে একভাবে অথবা অন্যভাবে দেহ চালনা করতেই হত। তাতেই এ যুগের ব্যায়ামের কাজ হয়ে যেত। গৃহস্থ ঘরের নারীদেরও বিশ্রাম ছিল না, ধানভানা, বাটনা বাটা, কাপড় কাঁচা, দূরস্থ নদী-পুকুর-দীঘি থেকে ভরা কলসী পানি আনা, ঘরের ঝাড়পোছ লেপন, অঙ্গন ঝাঁট দেয়া প্রভৃতি এবং আরো দরিদ্র, নিম্নবর্ণের, নিম্নবর্গের ও নিম্নবিত্তের বা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিঃস্ব নিরন্ন হলে গাঁয়ের মাঠে ক্ষেতের কাজ করা, জেলেনী, তাঁতী বৌ, বেদের ঘরের বৌ-ঝি হলে গাঁয়ে-হাটে-বাটে কাজ ও বেচা-কেনা করতে হত। কিংবা নিঃস্ব নিরন্নের মা-বোন-স্ত্রী-কন্যা হলে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে ভিক্ষা করতে হত। কাজেই নারীর জীবনও ছিল শ্রমবহুল। কেবল শাহ-সামন্ত জমিদার-সওদাগর গৃহে নারীরা খাটে বসে থাকাকেই গৌরবার্জনের, সুখের ও আনন্দের জীবন বলে জানত ও মানত বলে তারা অকালে স্থূলাঙ্গ হয়ে বুড়িয়ে যেত। দেহ চালনার অভাবে তাদের বার্ধক্যে আসত প্রায় পঙ্গুত্ব, ভুগত বাতব্যধিতে। আর স্থূলাঙ্গ হত, ভুঁড়িওয়ালা হত আর টেকোও হত মুদি-মোদক-বস্ত্রব্যবসায়ী প্রভৃতি গোলা-দোকানের মালিক-বিক্রেতারা। একালে গাঁয়ে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে সর্বত্র প্রায় সর্বপ্রকার যানবাহন চলে। কাজেই একালের লোক সময় ও শ্রম বাঁচানো লক্ষ্যে যে-কোন যানে চড়ে আর্থিক সামর্থ্যানুসারে। কাজেই দৈহিক শ্রম এ শ্রেণীর অফিসে-বসা জীবিকায় রত মানুষের নেই বললেই চলে, অন্তত দেহের প্রয়োজনানুরূপ মাত্রার পরিশ্রম বা দেহচালনা হয় না বলেই, তাদের প্রৌঢ়কাল থেকেই নানা পদ্ধতির ব্যায়ামের একটি অবলম্বন করতে হয়। চর্যার মতো নিষ্ঠার সঙ্গে নিয়মিত চর্চাও করতে হয়। শহুরে দৈহিক শ্রমচ্যুত মানুষ মাত্রেরই ব্যায়াম করতে হয় খেলাধুলার মাধ্যমে কিংবা গরু-হাঁটার তালে, ঘোড়দৌড়ের দ্রুততায় অথবা সারমেয় কায়দার জগিঙে [Jogging]। মনে রাখা দরকার প্রাণীমাত্রেরই শরীর হচ্ছে ব্যায়ামের জন্যে নয়, আহার্য সংগ্রহের জন্যে কায়িক শ্রম লাগানোর জন্যেই—পরশ্রমজীবী পরান্নজীবী শোষক-লুটেরা মাঠে-ময়দানে-ফুটপাতে হেঁটে দৌড়ে সেই কায়িক পরিশ্রম করত বাধ্য হয়েই। প্রকৃতি প্রতিশোধ নেয় এভাবেই।

AMARBOI.COM

২

শারীরিক শ্রমের ও ব্যায়ামের মতো মানসিক শ্রম, ব্যায়াম বা অনুশীলন এ যুগে আবশ্যিক। আগেরকালে গ্রাম ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ ও বিচ্ছিন্নতার ব্যবধানে তুষ্ট। কেননা তখন অজ্ঞ-অনক্ষর তুচ্ছ কাজকার, স্বল্প প্রয়োজনবোধের, সামান্য চাহিদার গ্রামীণ মানুষ ছিল আশুতোষ, তাদের প্রায় পরিবর্তনহীন প্রাজন্মক্রমিক নিস্তরঙ্গ গতানুগতিক জীবন ছিল হাট-বাজারকেন্দ্রিক। নগর থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল জীবন। সাধারণ পুরুষের পর্যটন পরিসর ছিল কাছাকাছি কয়েক গাঁয়ের মধ্যে সীমিত। তাদের চেনা-শোনার বৈবাহিক সম্বন্ধ-সম্পর্কের লোকজন ছিল চারপাশের কয়েক গাঁয়ে সীমিত। তাদের ব্যবহারিক-বৈষয়িক জীবন নিয়ন্ত্রিত ও নিয়মিত হত ঘরানা ক্ষুদ্র পেশালব্ধ পণ্যে ও অর্থে। তাদের মানসজীবন নিয়ন্ত্রণ করত আশৈশবলব্ধ শাস্ত্রিক-নৈতিক অলীক অলৌকিক বিশ্বাসসংস্কার। তাদের মগজধোলাই হত বিশ্বাস-সংস্কার দিয়েই। এ আচ্ছন্নতা, এই ভয়-ভক্তি-ভরসা, এ লাভ-ক্ষতিচেতনা, এ অরি-মিত্র শক্তির লীলা ও নিয়ন্ত্রণ, এ অদৃষ্ট-ভাগ্য-কপাল-নিয়তি-পূর্বজন্ম ফল প্রভৃতিই তাদের মনে-মননে স্থায়ী প্রভাব রাখত। সব মানুষই শাস্ত্রমানা, নিয়তিমানা ভূত-প্রেত-দেও-দানো-তুকতাক-ঝাড়ফুঁক-বাণ-উচ্চাটন-তাবিজ-কবচ-মন্ত্রমাদুলী-তাগা, পানিপড়া, ধূলিপড়া, অঙ্গুরী-পাথর-ধাতু প্রভৃতিতে গভীর আস্থা রাখত। আস্থাও ছিল তাদের অটুট, এমনকি শপথ-কসম-দোহাইও ছিল যাদুশক্তিপ্রজ। কাজেই তাদের নৈতিক সামাজিক-আচারিক জীবনেও আচরণগত বৈপরীত্য-বৈচিত্র্য ছিল বিরলতায় দুর্লভ ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুর্লক্ষ্য। কাজেই তাদের অপকর্ম-অপরাধও মানে-মাপে-মাত্রায় তেমন অভাবিত থাকত না। লঘু-গুরু সব অপকর্ম-অপরাধও মানে-মাপে-মাত্রায় তেমন বিচিত্র থাকত না। লঘু-গুরু সব অপকর্ম-অপরাধও ছিল বৈচিত্র্যহীন এবং সামাজিক-শাস্ত্রিক শাস্তির আওতাভুক্ত ছিল বলেই কারুর ব্যাভিচার-বিদ্রোহ সামাজিক বিপর্যয় ঘটাতে পারত না, সহজেই শাসিত, দমিত ও নিয়ন্ত্রিত হত। এজন্যে সেকালে মানুষের জীবন রেলওয়ের মতো নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট পথ ধরে চলত। তুচ্ছ কাঙ্ক্ষা, সামান্য ভাত-কাপড়ের চাহিদাপরিসরে গতানুগতিক একঘেয়ে ধারায় প্রবাহিত জীবনস্রোত ছিল বলে, তাতে আধুনিক সমাজের বিচিত্র চেতনার, চিন্তার, মনের, মননের, মনীষার এবং অশেষ কাঙ্ক্ষার, বিচিত্র ও বিবিধ চাহিদার সমস্যা-সঙ্কট প্রকট ছিল না কখনো। এখনকার জীবন পৃথিবীসম্পৃক্ত, বিচ্ছিন্ন নয়, আন্তর্জাতিক নির্ভরতার জীবন একাকিত্বে, স্বাতন্ত্র্যে, বিচ্ছিন্নতার ব্যবধানে স্বনির্ভর স্বয়ম্ভর হয়ে চলতেই পারে না। আবিষ্কার-উদ্ভাবনঋদ্ধ এ যন্ত্রযুগ ও যন্ত্রজগৎ স্বাতন্ত্র্যের, বিচ্ছিন্নতার, ব্যবধানের সে-দেয়াল তুলে দিয়েছে। এখন লেন-দেনের, ক্রয়-বিক্রয়ের বিশ্ববাজারে সবাইকে সওদা করতে হয়, হবে। এজন্যেই একালে জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-বিবেক-বিবেচনা প্রয়োগে যথাস্থানে, যথাপ্রয়োজনে, যথাসময়ে ব্যক্তির ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ-আদর্শ-উদ্দেশ্য-লক্ষ্য, নিয়ন্ত্রণ ও নির্ধারণ করতে হয় বৈশ্বিক সম্পর্কের সম্বন্ধের সামাজিক, নৈতিক, শৈক্ষিক, সাংস্কৃতিক, আর্থিক, বাণিজ্যিক পণ্য উৎপাদন-নির্মাণের ক্ষেত্রে সম ও সহস্বার্থে সমকালীনতা রক্ষা করার গরজেই। একালে পিছিয়ে পড়া দুর্বল মানুষ, দেশ ও রাষ্ট্র খেয়েপরে বেঁচেবর্তে থাকতে পারবে না। আমাদের আশৈশবের মগজধোলাইজাত বিশ্বাসসংস্কার থেকে যৌক্তিক ও বৌদ্ধিক মুক্তির প্রয়াসী হতে হবে, হতে হবে সৌজন্যে, সংস্কৃতিতে, গ্রহণমুখিতায়, অনুকরণে, অনুসরণে, অনুশীলনে উদার ও শ্রেয়োবাদী। আমাদের শাস্ত্রিক-নৈতিক-অলীক-অলৌকিক-বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা-ভয়-ভক্তি-ভরসাকে ব্যক্তিক চেতনা-অনুভব-উপলব্ধিগত রেখে বিচিত্রমুখী বিশ্বমানব সমাজের সদস্যরূপে হতে হবে ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে সেক্যুলার। হতে হবে যুক্তি বুদ্ধি নির্ভর। চালিত হতে হবে যৌক্তিক-বৌদ্ধিক সিদ্ধান্তে ও মতে-পথে। এজন্যে জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেক-বিবেচনাকে করতে হবে ব্যক্তি-জীবনের দিশারী ও পরিচালক। এর জন্যে মানসিক জীবনে জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধির, মনের-মননের ও মনীষার অনুশীলন, চর্যা ও চর্চা আবশ্যিক। এর নামই দিতে চাই মানসিক বা মানস ব্যায়াম। দেহ পুষ্ট ও সুষ্ঠু সমর্থ রাখার জন্যে যেমন আহার্য ও শ্রম অপরিহার্য ও নিত্য আবশ্যিক, তেমনি মন-মানসিকতা কালিক স্থানিক রাষ্ট্রিক সামাজিক প্রয়োজনানুগ স্তরে উন্নীত করতে হলে মানসিক ব্যায়ামরূপ অনুশীলন আবশ্যিক। রক্ষণশীলতা ও কূর্মপ্রবৃত্তি নয়, গ্রহণশীলতা ও শ্রেয়োচেতনা আর কালিক প্রয়োজন বুদ্ধিই হবে ওই ব্যায়ামে অনুশীলনে লভ্য।

আমাদের মতো উন্নয়নশীল কিন্তু প্রায় সবদিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া এবং অজ্ঞতা-অনক্ষরতা ও দারিদ্র্যদুষ্ট দেশে দ্রুতগতি, প্রগতি, অগ্রগতি লাভের জন্যে, অগ্রসর ও প্রাগ্রসর চিন্তায়-চেতনায়, কর্মে, আচরণে, মননে, মনীষায় ঋদ্ধ হওয়ার জন্যে আমাদের সযত্ন প্রয়াসে মানসিক ব্যায়াম করা একান্ত আবশ্যিক ও জরুরী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানবমুক্তি

মানবমুক্তি 'Men are born free' মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান। মানুষের জন্যে চাই "Equality, fraternity ও liberty" কেননা 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।' দুস্থ মানুষের সেবাই শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর-উপাসনা। জীবে দয়া করে সেই জন—সেইজন সেবিছে ঈশ্বর। Live and let others live। মানুষকে ভালোবাস। দুস্থ দুঃখী মানুষের প্রতি কৃপা-করুণা রাখ, দানে-দয়ায় দাক্ষিণ্যে তাদের বাঁচাও। যে ক্ষতি, যে-দুঃখ-যন্ত্রণা তুমি নিজের জন্যে কাম্য মনে কর না, তা তোমার প্রতিবেশীর জন্যে কামনা কর না। এমন হাজার হাজার কথা উচ্চারিত হয়ে গেছে। কোন ভালো কথাই আর অনুচ্চারিত থাকেনি। এসব কেজো কথা, মহৎ কথা, ভালো কথা মানুষ কান দিয়ে শুনেছে, মগজে ধরেও রেখেছে। তাই সব কথা প্রবাদ, প্রবচন, আপ্তবাক্য, তত্ত্বকথা শাস্ত্রকথা রূপে সমাজে শ্রুতি-স্মৃতিরূপে চালুও রয়েছে। বৈঠকে, সভায় মজলিসে তা সাবেগ গম্ভীর কণ্ঠে উচ্চারিতও হয়। কিন্তু কোন কথাই কারো অকৃত্রিম অনুভব-উপলব্ধির বিষয় হয়ে কর্মে ও আচরণে বাস্তবায়িত হয় না, হয়নি আজো। মর্মগত না হলে সব ভালো কথাই সব নীতি-নিয়মের কথাই বাণীর আভরণ হয়েই থাকে, অঙ্গের আবরণের মতো সামাজিক আদর্শরূপে সংস্কৃতির মান-মাত্রা রূপে ঐতিহ্যের অহঙ্কার বাড়ায় মাত্র, কিন্তু কাজে লাগে না। মানুষের অবস্থার ও অবস্থানের পরিবর্তন ঘটায় না। প্রীতির বিকাশ-বিস্তার ঘটায় না। আজ অবধি সব কথা ও ব্যর্থই হয়েছে, মানুষের দাসত্ব ও আনুগত্য-মুক্তি ঘটেনি, ঘটেনি শোষণ-পীড়ন-ঘৃণা-অবজ্ঞার অবসান।

কার্ল মার্কস আবেদন নিবেদন নিষ্ফল জেনে ও মেনে মানবমুক্তির, মানবসাম্যের নির্বিশেষ মানবাধিকারের সনদ রচনা করেছিলেন এবং জগতে এই প্রথমবারের মতো বাস্তবায়নের পথ-পদ্ধতিও বাতলে দিয়েছিলেন। লেনিন-মাওসেতুঙ-চেগুয়েভারা প্রমুখের নেতৃত্বে রক্তক্ষরা প্রাণহরা সংগ্রামের ফলে অন্ধ-খঞ্জ-পঙ্গু-পাগল-রুগ্ন-অনাথ-বৃদ্ধ-বৃদ্ধা মাত্রই খেয়ে-পরে বাঁচার জন্মগত মানবাধিকার পেয়েছিল পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক অঞ্চলে। মার্কিন মুৎসুদ্দি গর্বাচেভ-ইয়েলৎসিনের ষড়যন্ত্রে তা অর্ধেক পৃথিবীতে বানচাল হয়ে গেল, অন্যত্রও এ-ষড়যন্ত্র দানা বেঁধে উঠছে, তাই বাকি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর বিপর্যয়ও হয়তো আসন্ন ও আপন্ন। দুস্থ মানবতার, নিরন্ন মানুষের এত বড় ক্ষতি ইতঃপূর্বে কেউ কখনো করতে পারেনি। বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে নরদানবরূপী রক্তখেকো বিজয়ীরা হত্যায়-লুণ্ঠনে-পীড়নে-শোষণে স্বল্পকালস্থায়ী বিভীষিকা ত্রাস সৃষ্টি করত এবং করে বটে, কিন্তু গোটা পৃথিবীতে একাধারে ও যুগপৎ এমন মানসিক আর্থিক ও রাষ্ট্রিক বিপর্যয় ঘটাতে পারেনি। পূর্ব য়ুরোপ-রাশিয়া আবার সেই ভিক্ষার, জোর-জুলুমের, অনাহার-অর্ধাহারের, চৌর্যের, পীড়নের, শোষণের জগতে ও জীবনে ফিরে গেল। যারা মানবমুক্তির লড়াকু ছিল সামন্ত বুর্জোয়াশোষিত পীড়িত মানুষের দেশে, তারাও এখন বিভ্রান্ত ও হতাশ। আমরা কিন্তু জানি যেহেতু মার্কসবাদের কোন উৎকৃষ্ট বা উন্নততর বিকল্প উদ্ভাবিত হয়নি, সেহেতু হুজুগে দ্রোহী পূর্ব-য়ুরোপের ও প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের বাসিন্দারা ঠকে ও ঠেকে মোহমুক্ত হয়ে আবার সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে সংগ্রাম শুরু করবে। কেননা, পুরোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নীতি-নিয়মে যে দুর্বল-অক্ষম বাঁচার প্রতিযোগিতায়-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বাঁচতে পারবে না। তা উপলব্ধি করতে তাদের বেশি সময় লাগবে বলে মনে হয় না। ইতোমধ্যে সে আলামত পূর্ব য়ুরোপে-মস্কোতে প্রকাশও পাচ্ছে ক্ষীণভাবে। আমরা জানি ও মানি দরিদ্র দেশে একালে বণ্টনে ছাড়া বাঁচার অন্যপন্থা নেই। একালে বিচ্ছিন্নতায়ও বাঁচা যাবে না, তাই স্বাধীন রাষ্ট্রগুলো মণ্ডলীভুক্ত হচ্ছে আর্থিকভাবে টিকে থাকার গরজে। আমরা আশাবাদী। আবার মানুষ সমাজতন্ত্রেই স্বস্তি খুঁজবে, স্বস্থ হবে। বাঁচার জন্মগত অধিকার ফিরে পেয়ে মানবমুক্তি সুনিশ্চিত করবে—আমাদের এ বিশ্বাস ঠুনকো নয়, সুদৃঢ় প্রত্যয়ঋদ্ধ আমরা ব্যক্তিরও সামাজিক মানুষের শ্রেয়স চেতনার আস্থা নিয়ে প্রতীক্ষা করব নতুন সংগ্রামী মানুষের আবির্ভাবের প্রত্যাশায়। বর্তমানে আমাদের রাষ্ট্রে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় আমাদের একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী কৃতার্থবোধে উল্লসিত। কিন্তু এ বুর্জোয়া গণতন্ত্র কি ভিক্ষাবৃত্তি-বেকারত্ব ঘোচাতে পারে? পারে কি জোর-জুলুম শোষণ-পীড়নমুক্ত সমাজ গড়তে? এ ব্যবস্থায় মানবমুক্তি ঘটে কি? আমাদের শহুরে শিক্ষিত সমাজ যদি আজো এসব প্রশ্নের জবাব খুঁজতে অনীহ থাকেন, তাহলে দুস্থ গণমানবের মুক্তির উপায় কি?

অন্নের অনিশ্চয়তা মনুষ্যত্বের বিনাশক

AMARBOI.COM

খবরে প্রকাশ, কেবল জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসেই দেশে দশ হাজারেরও বেশি অপরাধমূলক ঘটনা ঘটেছে। দেশের পুলিশ বিভাগ সূত্রেই ১৯৯২ সনের প্রথম দু'মাসের এ তালিকা মিলেছে। জানুয়ারিতে নিহত হয়েছে ১৪০ জন, ফেব্রুয়ারিতে হয়েছে ১৪২ জন, ডাকাতি হয়েছে জানুয়ারিতে ৯৩টি আর ফেব্রুয়ারিতে ৭৫টি, সংঘর্ষ ঘটেছে যথাক্রমে ৫০৫টি ও ৪৪৯টি, আর চুরির সংখ্যা যথাক্রমে ৫৪৭ ও ৫৩১টি, এগুলোর মধ্যে সিঁদেল চুরি হচ্ছে যথাক্রমে ৪৫৯ ও ৩৮৯, রাহাজানির বা অপহরণের ঘটনার সংখ্যা যথাক্রমে ৭৫ এবং ৬০টি, আর অন্য নানা ধরনের অপরাধকর্মের সংখ্যা জানুয়ারিতে ৩১৮৯ এবং ফেব্রুয়ারিতে ৩৩৬৮টি। এসব অপকর্মের কারণ হিসেবে দারিদ্র্য, বেকারত্ব, শত্রুতা, পারিবারিক বিবাদ, নেশাখোরী ও সম্পত্তি দখল প্রভৃতি উল্লেখ করা হয়েছে।

এসব কে, কারা, কবে, কখন, কোথায়, কোন্ অবস্থায় ও অবস্থানে কেন এবং কেমনে করে? প্রশ্নের ব্যক্তিগত মত, মন্তব্য, মূল্যায়ন ও সিদ্ধান্ত অবশ্যই রয়েছে, তবে সেসব ব্যক্তিক নিষ্ক্রিয় নিষ্ফল মত, মন্তব্য, মূল্যায়ন ও সিদ্ধান্ত সঙ্কট-সমস্যাকে প্রত্যাশিত মাত্রায় প্রভাবিত করে না, কেননা এদেশে জনমত যাচাই বাছাই করা হয় না, এ গুরুত্ব চেতনাও সরকারের ও সমাজের মধ্যে দেখা যায় না সহজে। সাধারণত একক কারণে কোন কার্য ঘটে না। লঘুগুরু, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ একাধিক কারণেই অবস্থার ও অবস্থানের আনুকূল্যেই ঘটে কার্য বা ঘটনা। কোন ঘটনা দেখা, জানা, শোনামাত্রই তার কারণ, চেতনা বা জ্ঞান জন্মে না, বোঝার চেষ্টা ও শক্তি না জাগলে বা না থাকলে অর্থাৎ ঘটনা কে, কেন, কেমনে ঘটাল সে-সম্বন্ধে মনন-চিন্তন অনুশীলিত না হলে, অনুপুঙ্খ বিচার-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্লেষণ-গবেষণা না হলে তার তাৎপর্য বা স্বরূপ অনুভব উপলব্ধিগম্য হয় না। জ্ঞান-প্রজ্ঞায় পরিণতি পায় তাৎপর্যচেতনা যুক্ত হলেই। তাই জ্ঞান মাত্রই বন্ধ্যা, যদি না তা প্রজ্ঞায় স্থিতি পায়। কার্যের বা ঘটনার বা পরিণামের তাৎপর্য চেতনাই হচ্ছে যুগপৎ ও একাধারে কারণ ও কারণপ্রসূন। এ হচ্ছে জ্ঞানজ প্রজ্ঞা। কারণ জানা গেলে তার প্রতিকার প্রতিরোধপন্থা আবিষ্কারের-উদ্ভাবনের প্রয়াস-প্রযত্ন চলতে পারে। তার উৎখাত অসাধ্য অসম্ভব হলেও অন্তত উপশম কিংবা প্রকোপ হ্রাস করা সম্ভব ও সহজ হতে পারে।

প্রাণী প্রজাতির মধ্যে দেহের সাংগঠনিক সৌকর্যের দরুনই মানুষ জীবজগতে জীবন-জীবিকা কৃত্রিম উপায়ে রচনা করেছে, করছে এবং করবে, এর উৎকর্ষের গুণ-মান-মাপ-মাত্রা কোথাও কখনো আকস্মিকভাবে চরম-পরম হবে বলেও মনে হয়, মানবিকগুণের এ বিকাশ, মনুষ্যত্বের এ অগ্রযাত্রা আপাতত অশেষ বলেই মনে হয়। তবে প্রজাতি হিসেবে মানুষের মগজের, মননের, মনীষার তথা চিন্তার-চেতনার-বুদ্ধির-যুক্তির-প্রজ্ঞার বিকাশ বিস্তার নতুন নতুন তীক্ষ্ণ অনুভবের ও সূক্ষ্ম উপলব্ধির আর বস্তুজগতে নানা উপযোগঋদ্ধ আবিষ্কার-উদ্ভাবনের জনক। এ আবিষ্কার-উদ্ভাবন পৃথিবীর কোথাও না-কোথাও, কোন না-কোন গোষ্ঠীর জাতির, সমাজের বা দেশের মধ্যে অবিচ্ছিন্নভাবে চলছে, চলে এবং চলবে। এক দালান জীর্ণ হয়ে ভাঙে, কিন্তু অন্যত্র নতুন দালান তৈরি হয়, হচ্ছে হবে, তেমনি এক গোত্রের, গোষ্ঠীর, দলের, সমাজের জাতির আবিষ্কার-উদ্ভাবন প্রয়াসে প্রযত্নে ইতি ঘটলেও, ভিন্নদেশে ও সমাজে নতুন করে মগজ-মন-মনন-মনীষা যোগে মানুষ নব উদ্যমে, নব অঙ্গীকারে ও উদ্যোগে আয়োজনে নব নব আবিষ্কারে-উদ্ভাবনে মেতে ওঠে, এভাবেই মানস সংস্কৃতির এবং ব্যবহারিক সংস্কৃতি-সভ্যতা প্রতীক ও প্রসূন যন্ত্র-প্রকৌশল-প্রযুক্তি বেড়ে চলছে এ জন্যে মনুষ্য উদ্ভাবিত-আবিষ্কৃত তত্ত্বে, তথ্যে, সত্যে, যেমন, তেমনি মানুষের আবিষ্কৃত-উদ্ভাবিত সর্ববিদ্যায় কৌশলে, প্রকৌশলে-প্রযুক্তিতেও দেশ কাল নির্বিশেষে মানুষ মাত্রেরই থাকে অধিকার ও উত্তরাধিকার। এজন্যেই প্রজাতি হিসেবে মানবের গতিশীলতায় প্রগতিতে ও প্রাগ্রসরতায় কোন ছেদ নেই, নেই কোন বিরতি-বিচ্ছিন্নতাও।

কিন্তু স্থানিক, কালিক, পৌত্রিক, গৌষ্ঠীক, আঞ্চলিক ও দৈশিকভাবে দলবদ্ধ বা সমাজবদ্ধ কিংবা রাষ্ট্রশাসিত মানুষের মানসজীবনে বিকাশে বিস্তারে উত্থান-পতন রয়েছে। দেহ-প্রাণ-মন-মনন-মনীষা একসময়ে সৃষ্টিশীলতায় আবিষ্কার-উদ্ভাবনে প্রবল ও প্রধান হয়ে ওঠে। আবার কিছুকাল পরে তাদের তৃপ্ত, তুষ্ট, হৃষ্ট মনে জাগে আত্মশ্লাঘা, জাগে নিষ্ক্রিয় ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগ বাঞ্ছা, এক বৈনাশিক সম্পদ সুখ তাদের করে অঙ্গীকারচ্যুত, হতোদ্যম ও উদ্যোগভ্রষ্ট। অবসিত হয় তাদের সৃষ্টিশীলতা, আবিষ্কার-উদ্ভাবন, প্রয়াস। উদ্যমহীন মানুষ বন্ধ্যাত্ব কবলিত হয়ে শীতকালীন অগভীর জলাশয়ের মতোই শিকার হয় অস্তিত্বগত অবক্ষয়ের।

অতএব মনুষ্যত্বের স্বাভাবিক বিকাশ প্রকাশ রুদ্ধ হলেই রাষ্ট্রান্তর্গত মানুষের জীবনাচারে প্রকট হয়ে ওঠে প্রাণীসুলভ অসংযত, অসহিষ্ণুতা, আত্মরতি, লাভ-লিপ্সা, স্বার্থচেতনা, হিংসা-ঘৃণা ঈর্ষা, অসূয়া, অসততা, অন্যায্যতা, অসৌজন্য প্রভৃতি আর দুর্লক্ষ্য হয় হায়া-শরম-সংকোচ, স্নেহ-মমতা প্রীতি-ভালোবাসা কৃপা-করুণা দয়া-দাক্ষিণ্য। বিবেক-বিবেচনা ও আত্মসত্তার মূল্য মর্যাদা রহিত হয় গোটা সমাজে ব্যক্তিমানুষও। পিতৃধনে ক্ষয় আছে। কাজেই পিতৃধনে যে ধনী সে অবক্ষয় কবলিত হয়ে একসময়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমাজে মনুষ্যত্বের ব্যক্তিক অনুশীলন শুরু হয় শৈশবে-বাল্যেই এক অপরিব্যক্ত অসচেতন অঙ্গীকারবদ্ধতা থেকে। যৌথজীবনে অন্যের সঙ্গে মানিয়ে চলার আগ্রহই এর উৎস। লক্ষ্য হচ্ছে যৌথজীবনে সমাজ সদস্যরূপে নির্বিবাদে নির্বিঘ্নে নিরুপদ্রবে নিরাপদে অন্যদের মধ্যে ও সঙ্গে সহযোগিতায় সহাবস্থান করা।

কিন্তু এ মনুষ্যত্বের স্বাভাবিক বিকাশের প্রথম ও প্রধান অন্তরায় হচ্ছে দারিদ্র্য। দারিদ্র্য মানুষের সবগুণ বিনাশ বিলুপ্ত করে। দারিদ্র্য মানুষের জীবনে জীবিকায় অনিশ্চয়তা আনে। এ অনিশ্চয়তা 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম' এ তত্ত্বের বা দর্শনের উদ্ভব ঘটায়। আত্মরক্ষার গরজেই অর্থাৎ সসন্তান বাঁচার প্রয়োজনেই মানুষ স্বার্থসচেতন ও আত্মরতিপরায়ণ হয়, এমন মানুষ নিজেকে নিয়েই জাগ্রত মুহূর্তগুলোতে ব্যস্ত ও বিব্রত থাকে। এমন মানুষ বিবেক বিবেচনা ঘৃণা-লজ্জা-ভয়-হায়া-শরম-সঙ্কোচ ত্যাগ করে কেড়ে-মেরে-হেনেও বাঁচতে চায়। যেমন, দশ/বারো বিঘে জমির মালিকও আজকের দিনে মুদ্রাস্ফীতির কবলে পড়ে সদা অনিশ্চিত জীবন যাপনে বাধ্য থাকে। কেননা যদি তার হালের বলদ মরে, কিংবা, অপহৃত হয়, তাহলে আর একটি বা একজোড়া বলদ কেনার অর্থ যোগাড় করা প্রায় অসম্ভব, এ ক্ষেত্রে জমি বিক্রয় কিংবা বন্ধক রাখতেই হবে। কিংবা ভরসার ইরি চাষ নষ্ট হলে অথবা বন্যায় আউস-আমনের ক্ষতি হলে, সচ্ছল চাষীকেও প্রান্তিক চাষীতে কিংবা বর্গাচাষীর অনিশ্চিত জীবনের ভেলাবাসী হতে হয়। এমনি অনিশ্চয়তা তাকে স্বার্থপর নিষ্ঠুর ও অসামাজিক করে তোলে। স্থিতি-অস্থিতির টানা-পোড়নে এ-মানুষ অস্থির, অসুস্থ ও অনিশ্চয়তায় বিব্রত। এ যুগে যদি অশিক্ষিত গৃহস্থ ঘরে সন্তান থাকে, তারও বেকার থাকার সম্ভাবনা বাড়ছে, ক্ষেত-মজুরেরা সাধারণভাবে চাষের মৌসুমের পরে বেকার হয়ে পড়ে, কারখানা শ্রমিকরাও ছাঁটাই হয়, চাকরী হারায়, কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। আর শিক্ষিত বেকারেরাও একালে চাকরী পাচ্ছে না, পাবে না, কারণ অত সংখ্যায় শূন্য বা নতুন পদ মিলবে না কখনো কোথাও। এদেরও অনিশ্চিত জীবন ও জীবিকা—এরাও তাই মনুষ্যসুলভ গুণ হারাচ্ছে প্রতিদিন অর্থ-সম্পদে বঞ্চিত ও ক্ষুধায় পীড়িত বলে। এরা বাঁচার গরজেই আজ জালিম, মস্তান, গুণ্ডা, খুনী-চোর-চোরাকারবারী, দয়া-মমতা-সৌজন্য শূন্য। এমনি অবস্থায় কিছু বেণে বুর্জোয়া ছাড়া সাধারণ মধ্যবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত ও শিক্ষিত মানুষও মুদ্রাস্ফীতি কবলিত হয়ে বেহায়া-বেশরম-বেলেহাজ-বেআক্কেলের মতো বিয়ে-শাদীতেও লেনদেন নিয়ে দরকষাকষি করে প্রাপ্তিলিপ্সায়। অপরপক্ষ দেয়ার সামর্থ্য রাখে কি-না তা তার বিবেচ্য নয়। এসব অমানবিক চিন্তা-কর্ম-আচার-আচরণ এখন জীবনের সর্বক্ষেত্রে সার্বক্ষণিক হয়ে উঠেছে। ধার কর্জের ক্ষেত্রেও আত্মীয়তার দায়-দায়িত্ব অস্বীকৃত হচ্ছে। কেননা, একালে ধার-উধার মানে হাজার হাজার কিংবা লক্ষ লক্ষ টাকা। আগের দিনে দশ টাকায়ও একটা পরিবারের খাওয়া খরচ চলত, এখন দশ হাজার টাকায়ও চলে না। কাজেই ধার পাওয়া ও দেয়া এখন দুটোই উভয়পক্ষের জন্যে অসম্ভব হয়ে উঠেছে। এখন মুদ্রাস্ফীতি ভাইকেও ভাইয়ের প্রতি দুর্ভিক্ষকালীন পাথুরে নিষ্ঠুরতায় অমানবিক আচরণে বাধ্য ও অভ্যস্ত করে তুলছে। আবার এ অবস্থা থেকেই ভীরু অসহায় নির্বোধ দিশেহারা মানুষ হয় ঈশ্বরাশ্রয়ী মৌলবাদী। এও জীবনের ও মনের বিকৃতি প্রসূন মাত্র। অতএব, যেখানে হাজারে নয়শ নিরেনব্বই জন মুদ্রাস্ফীতির, বেকারত্বের, উপার্জন বৃদ্ধির, উৎপাদন বৃদ্ধির, নির্মিত উৎপাদিত পণ্যের বাজার বৃদ্ধির সঙ্কটে-সমস্যায় সদা বিব্রত ও অনিশ্চিত অবস্থায় ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবস্থানে রয়েছে, যেখানে কৃষিজ অর্থ-সম্পদ প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি প্রতিবছরই প্রকৃতির আনুকূল্য-প্রাতিকূল্য নির্ভরতাজনিত কারণে অনিশ্চিত, সেখানে মানবিকগুণের, ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচার-আচরণের প্রত্যাশা সঙ্গত হতেই পারে না।

তাই আমাদের ঘরে-সংসারে-দফতরে-বাজারে-গদীতে-গুদামে-আড়তে-কলে-কারখানায় কোথাও সুজন-সজ্জন ক্বচিৎ মেলে মাত্র। তাই ঘুষ-দালালি-কমিশন-নজর-পাওনা-বখশিস-বখরা-উপঢৌকন ছাড়া কোন কার্য উদ্ধার হয় না। তাই দয়া-দাক্ষিণ্যও সুদুর্লভ, তাই সহৃদয়তা-সৌজন্য দুর্লক্ষ্য, তাই ছল-চাতুরী প্রতারণা-প্রবঞ্চনা-শঠতা-কাপট্য-রাহাজানি-ছিনতাই-লুট-ডাকাতি প্রভৃতি এখন শহুরে শিক্ষিত লোকের মধ্যেই বিস্তার লাভ করেছে। কাড়া-মারা-হানার, জোরজুলুম-হুকুম-হুমকি-হুঙ্কার-হামলা করার অধিকার এখন শিক্ষিত বেকার বেপরওয়া তরুণদের আয়ত্তেই। এর ফলেই রাষ্ট্র, সরকার, মন্ত্রী, আমলা-শাসক-প্রশাসক-পুলিশ-সৈন্য প্রভৃতি সভ্যজগতের সব নীতি-নিয়ম কাঠামোগতভাবে চালু থাকা সত্ত্বেও সবটাই বিকল হয়ে অকেজো হয়ে পড়েছে। রাষ্ট্রে চলছে আরণ্য নীতি নিয়ম ও রীতি-রেওয়াজ। রাষ্ট্রের অভিন্নমূল রশুনতত্ত্ব প্রযোজ্য। সব বিপর্যয়ের মূলে রয়েছে ক্ষুধার অন্নের অনিশ্চয়তা। অর্থসম্পদে অন্নে সাচ্ছল্য না থাকলে উন্নতির, সমাজ শৃঙ্খলার, রুচি-সংস্কৃতি বিকাশের সোপানরূপ মানবিকগুণের বিকাশ বিস্তার সম্ভব হবেই না।

AMARBOI.COM

মুক্তিবুদ্ধি ও মুক্তচিন্তা আবশ্যিক

জাগতিক জীবনে মুক্তবুদ্ধি নিয়ে শাস্ত্রনিরপেক্ষ মুক্তিচিন্তা-চেতনা একান্ত আবশ্যিক ও জরুরী। আমরা শাস্ত্রিক ভাষিক, সাম্প্রদায়িক ও আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য ও বিচ্ছিন্নতা পরিহার করে জনকল্যাণ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জনকল্যাণ চিন্তায় এবং জনকল্যাণকর্মে আত্মনিয়োগ করলেই শোষিত মানবমুক্তি ও দেশের উন্নতি ত্বরান্বিত হবে। পাব মনুষ্যত্বসম্পন্ন বাঞ্ছিত নাগরিকও। এজন্যে সেক্যুলারিজ আবশ্যিক চেতনায়, চিন্তায়, কর্মে ও আচরণে আজ পৃথিবী যন্ত্রের বদৌলত প্রকৌশল প্রযুক্তির প্রয়োগে দূরকে নিকট ও পরকে প্রতিবেশী করে তুলেছে। তৈরি করেছে লেনদেনের-বেচা-কেনার, পণ্য-বিনিময়ের অভিন্ন বাজার। শহরে শিক্ষিত মানুষের অঙ্গে ও অন্তরে অঙ্কিত করেছে অভিন্ন রুচি-সংস্কৃতির ছাপ খাদ্যে পোশাকে আর সর্বপ্রকার যন্ত্রের প্রয়োগে এবং সর্বপ্রকার আধুনিক বিদ্যার অনুশীলনে এবং প্রতীচ্য চিকিৎসা বিদ্যার চর্চায় ও প্রয়োগে। এ অবস্থায় পার্থিব তথা ঐহিক জীবনে ইহজাগতিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে শাস্ত্রের, লোকাচারের, দেশাচারের কোন ভূমিকাই থাকতে পারে না। অতএব আমাদের রাজনীতিক ও প্রাশাসনিক চিন্তা-চেতনায়, কথায়-কর্মে-আচরণে শাস্ত্রিক, ভাষিক সাম্প্রদায়িক আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতা বা স্বাতন্ত্র্যচেতনা শুধু বাধা হয়ে অনর্থই ঘটায়। কারো কল্যাণ করে না। পারলৌকিক চেতনা পার্থিব জীবনযাত্রার কোন বাস্তব অভাব মেটায় না। সরকারের কাজ জনগণের মর্ত্যজীবনে স্বাচ্ছন্দ্য-সাচ্ছল্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আনয়ন, স্বর্গপ্রাপ্তির ব্যবস্থা করা নয়। যেমন কৃষিক্ষেত্রে উৎকর্ষ-উন্নয়নের জন্যে প্রয়োজন কেজো মাত্রায় কর্ষণ, জল সেচন এবং সার প্রয়োগ আর যথাসময়ে মৌসুম অনুগ বীজ বপন। দেশের চাহিদা মেটানো এবং বিদেশে বাজারজাত করার সুযোগ লক্ষ্যে ফসল উৎপাদন, আর কলে-কারখানায়-কাঁচামালে পণ্য উৎপাদন ও নির্মাণ করে দেশে ও বিদেশে বাজারজাত করার প্রয়াস চালিয়ে যাওয়াই হচ্ছে কল-কারখানা স্থাপনা ও পরিচালনা করার উদ্দেশ্য।

তেমনি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে রাস্তা-ঘাট-সেতু-ফেরী নির্মাণ করে দুর্গম অঞ্চলের সঙ্গে শহরের সরল সুগম সড়ক তৈরি করিয়ে জনগণের যাতায়াতের এবং তাদের পণ্য সহজে বিনিময়ের এবং পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের সুবিধে করে দেয়া সরকারেরই জরুরী দায়িত্বের ও কর্তব্যেরই অন্তর্ভুক্ত। এখানেও মানস বিশ্বাস-সংস্কারের বন্ধন বা প্রভাব ও প্রয়োগ অবান্তর। এমনি করে বাস-রিকসার-রেলগাড়ীর সড়ক নির্মাণ, মেরামত ও সংরক্ষণ, নদী-খালের নাব্যতা চালু রাখা, জলযানের প্রয়োজন অনুগ ব্যবস্থা রাখা প্রভৃতিও একালের গণতান্ত্রিক বা অন্য যে-কোন ধরনের বা তন্ত্রের সরকারের জরুরী দায়িত্বের ও কর্তব্যের অন্তর্গত। জনগণের অন্ন-বস্ত্র-নিবাস-শিক্ষা-স্বাস্থ্য-চিকিৎসা-আনন্দ-আমোদ প্রভৃতির ব্যবস্থা করাই সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য। এ দৃষ্টিতে দেখলে ও বিচার বিবেচনা করলে দেখা যাবে চৌকিদার থেকে সচিব অবধি, সালিশ-পঞ্চায়েত থেকে বিচারপতি অবধি, পুলিশ থেকে সেনাবাহিনী অবধি স্বরাষ্ট্র-পররাষ্ট্রের সর্ব বিষয় হচ্ছে জনজীবন সম্পৃক্ত ইহজাগতিক চিন্তা-ভাবনা-কর্ম-আচরণ মাত্র। এতে পারত্রিক কোন পাপ-পুণ্যের, লাভ-ক্ষতির বাহ্য বা সামাজিক রাষ্ট্রিক সম্পর্ক-সম্বন্ধ নেই। কেবল ন্যায়-অন্যায়ের, ভালো-মন্দের, ক্ষতি-বৃদ্ধির হিসেব চলে বটে। আর ব্যক্তির শৈশবে বাল্যে পারিবারিক প্রাতিবেশিক প্রভাবে পাপ-পুণ্য সম্বন্ধে যে মগজধোলাই স্থায়ীভাবে হয়ে রয়েছে, সে-প্রভাবও তার মধ্যে প্রায়ই সুপ্ত বা গুপ্ত থাকে সাধারণভাবে। কেননা, আমরা জানি প্রলোভন প্রবল হলে-অন্তর্যামী আল্লাহ-ঈশ্বর-জেহোভা দেখে জেনে, মেনেও আমরা অন্যায়-অপকর্ম-অপরাধ করতে দ্বিধা করি না। কেবল অপকর্ম থেকে বিরত থাকি লোকনিন্দা ও সরকারী শাস্তি এড়ানো যাবে না জেনে ও বুঝে। জরায় জীর্ণতা ও জড়তা প্রাপ্তরা মৃত্যু আসন্ন বা আপন্ন জেনেই আস্তিকরা ঈশ্বরের ক্ষমা প্রাপ্তি লক্ষ্যে শাস্ত্রাশ্রিত হয় ভীরু হৃদয়ের ভিখিরী বাসনা নিয়ে।

আমরা জানি, আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন ব্যক্তিরাই কেবল বিবেক-বিবেচনা ও যুক্তি-বুদ্ধি চালিত হয়ে অন্যায় পরিহার করে চলে। এমন মানুষ অন্যায় ও অন্যায়কারীকে ঘৃণা করে। বহুজনহিতে ও বহুজনসুখে কাজ করে। নিজে আঘাত না পেলে বা আঘাতের আশঙ্কা না করলে কাউকে আহত করে না। আক্রান্ত না হলে শত্রুকল্পকে আঘাত করে না, করে না নিজ স্বার্থে কারো ক্ষতি। কৃত্রিম ও গতানুগতিক শাস্ত্রানুগত্য কাউকে মানুষ করে না। ব্যক্তি মানুষ হয়, মানবিকগুণ ও আচরণ আয়ত্ত করে বিবেক বুদ্ধি-যুক্তি প্রয়োগে এবং আত্মসম্মান চেতনার অনুশীলনেই একজন লোক বাঞ্ছিত হয়ে ওঠে, হয় মনুষ্যত্ব সম্পন্ন মানুষ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যন্ত্রনির্ভর কালের দাবি : বাঁচার উপায়

আদি ও আদিম অজ্ঞতা ও অসামর্থ্যের কালের মানবপ্রজাতির প্রাণীসুলভ অবচেতন সাম্যের সমাজ থেকে জ্ঞাতিত্ব সচেতন কৌম, গোত্র ও গোষ্ঠীসমাজে উত্তরণ ঘটেছে সব মানুষেরই পাঁচ/ছয় হাজার বছর আগেই। কিন্তু এখনো পৃথিবীর সর্বত্র বুনো-বর্বর-আরণ্যমানবের গ্রহণবিমুখতার, স্বাতন্ত্র্যপ্রীতির ও সাচ্ছল্য-স্বাচ্ছন্দ্য-সৌকর্য কাঙ্ক্ষারিক্ততার কারণে ও ফলে তারা আজো সেই পাঁচ/ছয় হাজার বছর আগেকার অবস্থায় প্রায় স্থিতিশীল বন্ধ্যা মানসিক ও ব্যবহারিক জীবনে তুষ্ট, তৃপ্ত ও হৃষ্ট রয়েছে। তারা সর্বপ্রাণবাদে, যাদু বিশ্বাসে, ট্যাবু-টোটেম নিয়ন্ত্রিত জীবনে আস্থাবান এবং রক্ষণশীলতায়, গ্রহণবিমুখতায় এবং জীবনযাত্রার ও জীবনাচারের গতানুগতিকতায় তাদের মৌলিকতার ও স্বাতন্ত্র্যের গৌরবে গর্বিত। এ অনগ্রসরতা তাদের কাছে পরম্পরানুগত্য ও রীতিরেওয়াজনিষ্ঠা অদৃশ্য দৈবশক্তির অনুমোদিত, ফলে তাঁর কৃপা-করুণা-শরণ প্রাপ্তির উপায়। তাই তাদের কাছে নতুন প্রীতিমাত্রই পথভ্রষ্টতা, পুরোনো প্রীতিমাত্রই নিরুপদ্রব, নির্বিঘ্ন নিরাপদ, কারণ তা দেবানুমোদিত। তাদের নতুনভীতির তথা গ্রহণবিমুখতার ও আত্মোন্নয়নের কাঙ্ক্ষার অভাবের মূলে রয়েছে সিঞ্চিত বিশ্বাস-সংস্কারের বাধাপথ পরিহারজাত দৈবরোষে জীবনে বিপর্যয়ের আশঙ্কা। এ কেবল তাদের নয়, আমাদের সভ্যসমাজেও শতে নিরেনব্বই জনই শাস্ত্রিক বিশ্বাস-সংস্কার চালিত এবং তাদের দেশাচার লোকাচারনিষ্ঠ জীবনে ওই একই মনোভাব কাজ করছে, এ জন্যেই সমাজ কেবল আবর্তনে তুষ্ট, বিবর্তনে ভীত। শৈশবে-বাল্যে-কৈশোরে দেখা-শোনা-জানা এবং মানবশাস্ত্রিক দৈশিক ও লৌকিক বিশ্বাসে-সংস্কারে আচারে-আচরণে অভ্যস্ত মানুষের মগজ ধোলাই হয়ে যায়। তাদের সারাজীবনে আর জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-বিবেক-বিবেচনা প্রভৃতি গুরুত্ব পায় না, আলোচ্য বিবেচ্য বলেও মনে হয় না তাদের। এ সমস্যা শহুরে শিক্ষিত সমাজেও পৃথিবীর সর্বত্র দেখা যায়। তাই কম্যুনিস্ট শাসনে-প্রশাসনে পরিবেশে-প্রতিবেশে থেকেও বাহ্যত আচারিক জীবনে শাস্ত্রিক আচার আচরণ, পালাপার্বণ বর্জন করেও দু'পুরুষ পরেও দেখা যাচ্ছে মানুষ আপাত ভুলেথাকা পরিহার করা ইহুদী, খ্রীস্টান, বৌদ্ধ, ইসলামী শাস্ত্র পরমাগ্রহে-সাদরে বরণ করেছে, করছে, এখন আবার সিনাগন, গির্জা-মঠ-মসজিদ-মন্দির প্রভৃতিতে লোকের ভিড় জমেছে, জমছে। মানবমনের গতি প্রকৃতি অজ্ঞেয়। এ জন্যেই বলা হয় যত জন তত মন, যত মত তত পথ। সবাই কখনো কোন বিষয়ে হাঁ যেমন বলে না, তেমনি বলে না না-ও। সাধারণভাবে অনেক বিষয়েই অধিকাংশ মানুষের জানা শোনা বোঝা অসম্পূর্ণ। তারা তাই দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভোগে সমস্যা-সঙ্কটকালে। মন-মত-মন্তব্য-সিদ্ধান্ত পরিব্যক্ত করা তাদের পক্ষে প্রায়ই সম্ভব হয় না, তাই তারা আপাত উদাসীন নিরপেক্ষ ও মৌন। তাদের সম্মতি বা অসম্মতি থাকে না কোন বারোয়ারী দৈশিক, রাষ্ট্রিক সামাজিক, সাংস্কৃতিক বিষয়ে। কেবল স্বার্থে, অর্থ-সম্পদে হামলা হলেই তারা দলবদ্ধ হয় প্রায় বিনা আহ্বানেই। এবং লড়াকু হয়ে ওঠে।

এ শতকের সর্বশাখার প্রকৃতিতত্ত্ব তথা বিজ্ঞানীর গবেষণালব্ধ আবিষ্কার-উদ্ভাবন, প্রকৌশল-প্রযুক্তি বিষয়ক যন্ত্র আবিষ্কার, প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রনির্মাণ প্রভৃতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষকে নানাভাবে স্বশিক্ষিত এবং চিন্তা-চেতনা-মননে উদ্বুদ্ধ করেছে, করেছে আত্মসত্তা সম্বন্ধে সচেতন, করেছে এর মূল্য মর্যাদা ও এর বিকাশ-বিস্তার-উন্নয়ন সম্বন্ধে আস্থাবান। এভাবে মানুষ দ্রুত আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে উঠছে, সেসঙ্গে সে স্বার্থে স্বাধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠ হবার জন্যে সংকল্পবদ্ধ হয়ে উদ্যম উদ্যোগ আয়োজন ব্যবস্থা গ্রহণের অঙ্গীকারবদ্ধ হচ্ছে। তাই গতানুগতিক দাসত্বে ও আনুগত্যে সর্দার-নেতা-মহাবলীর বিরুদ্ধে দ্রোহ প্রবল হয়ে উঠছে। একারণেই আজ দিকে দিকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের, ভাষিক-গোষ্ঠীচেতনার, শাস্ত্রিক দল প্রীতির, গৌত্রিক পার্থক্যের আঞ্চলিক বা দৈশিক দূরত্বের যুক্তিতে এখন পৃথিবীব্যাপী সর্বত্র মানুষ দৈশিক-রাষ্ট্রিক প্রাশাসনিক বিচ্ছিন্নতার ও স্বাধীনতার কিংবা স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনে, দাবিতে ও সংগ্রামে মেতে উঠেছে।

কিন্তু একালে যেহেতু জীবন যন্ত্রনির্ভর ও যন্ত্রচালিত, সংহত ক্ষুদ্র পৃথিবীতে রাষ্ট্র ও মানুষ খাদ্যবস্ত্র থেকে যে-কোন পণ্য সামগ্রীর জন্যে পরস্পর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। এ বন্ধন মুক্তির আর উপায় নেই, এটি এখন বলতে গেলে জনজীবনে তথা রাষ্ট্রিক-বাণিজ্যিক ও ভোগ্য-উপভোগ্য-সম্ভোগ্য উৎপাদিত ও নির্মিত সামগ্রীর জন্যে অপরিহার্য আবশ্যিক ও জরুরী হয়ে পড়েছে। এ বন্ধন বাঁচার, মিত্রতার, সহযোগিতার ও সহাবস্থানের রাখির প্রতীক, প্রতিম ও প্রতিভূ। গোটা পৃথিবী এখন এক হাটের ক্রেতা-বিক্রেতা। একালে চাহিদা ও সরবরাহ কোন অঞ্চলে সীমিত থাকতেই পারে না। সভ্য-ভব্য সংস্কৃতিমান সমাজের বাজার এখন বৈশ্বিক। কাজেই প্রথমে বিচ্ছিন্নতার ও স্বাধীনতার কিংবা নিদেনপক্ষে স্বায়ত্তশাসনের সংগ্রাম চলছে, চলবে। এর পরে স্বাধীন হয়েই বুঝবে সে যে স্বাতন্ত্র্যে বাঁচা এ যন্ত্রযুগে ও যন্ত্রজগতে সম্ভব নয় কোন শাস্ত্রিক, ভাষিক, গৌত্রিক, নৈবাসিক বিচ্ছিন্ন দলের বা সমাজের কিংবা সম্প্রদায়ের অথবা দেশের বা রাষ্ট্রের পক্ষে। তখনি কেবল য়ুরোপীয় সাধারণ বাজারভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর মতো Guild তৈরি করে আপোসে সহযোগিতায় সমবায় পদ্ধতিতে বাঁচার-বাঁচানোর শর্তে ও স্বার্থে রাজি হয়ে যাবে। সামুদ্রিক শামুক যেমন মরেই পরস্পর যুক্ত হয়ে ইন্সকেপ রক্ তৈরি করে স্থায়ীভাবে টিকে থাকে বৃদ্ধি পায়, একালের মানুষ এবং রাষ্ট্র ও সামবায়িক সহযোগিতায় সহাবস্থান করতে অঙ্গীকারবদ্ধ না হলে আত্মঅবক্ষয় ও আত্মবিনাশ ত্বরান্বিত করবে মাত্র। এ তত্ত্ব প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন মিশরের গামেল আবদুল নাসের। তাই তিনি মার্কিন মুৎসুদ্দী স্বৈর ও স্বেচ্ছাচারী শাসকদের হত্যা করিয়ে বৃহত্তর আরব-রাষ্ট্রগঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন, বাস্তবায়নও শুরু করেছিলেন, সিরিয়ার বিচ্ছিন্নতা ও মৃত্যু তাঁর স্বপ্নকে বাস্তব হতে দেয়নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে অন্যভাবেও যূথবদ্ধ বা দলবদ্ধ হয়ে বাঁচার পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে— দুই পরাশক্তির নেতৃত্বে ন্যাটোজোট ও ওয়ার্স চুক্তিজোট তার প্রমাণ। রাশিয়াও চায় স্বাধীন রিপাবলিকগুলো নিয়ে Confederation গড়তে। এছাড়াও সেন্টো, সিয়াটো প্রভৃতি নামেও তৃতীয় বিশ্বের দুর্বল রাষ্ট্রগুলোকে ঐক্যের ও পারস্পরিক সহযোগিতায় বাঁচার আশ্বাস দিয়ে মার্কিন সরকার ওদের কাজে লাগিয়েছে— দলে ও বশে রেখেছিল, রাখছে ও রাখে। আজ নিজ নিজ স্বার্থ বশেই য়ুরোপীয় রাষ্ট্রগুলো স্বাতন্ত্র্যের ও স্বাধীনসত্তার ও মর্যাদার অভিমান পরিহার করে একক মুদ্রা চালু করার, বাজারে আনুপাতিকহারে পণ্য ছাড়ার, পণ্য উৎপাদনে নির্মাণে ও বিভক্তি বিভাজন আপোসে মানা-মানানোর প্রয়াসী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতীচ্য জগতেই যখন আজ বাঁচা-বাঁচানোর এমনি সঙ্কট ও সমস্যা, তখন তৃতীয় বিশ্বের সঙ্কট আপাতত অসমাধ্য মনে হওয়াই স্বাভাবিক। এ অবস্থায় আমাদের সার্কভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর পক্ষে অশেষ কল্যাণকর হবে— ১. অনাক্রমণচুক্তি করা ও যৌথ দেশরক্ষা বাহিনী গঠন, ২. ভারত ইউনিয়নকে Federal রূপ দেয়া অর্থাৎ সব রাজ্যে স্বায়ত্তশাসন চালু করা, ৩. ব্রিটিশের প্রাক্তন ভারত সাম্রাজ্য নিয়ে অর্থাৎ সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, বার্মা, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, পাকিস্তান, ভারত ও বাঙলাদেশ নিয়ে একটা সামবায়িক সাধারণ পণ্য উৎপাদন-নির্মাণের আনুপাতিক হার নির্ধারণ করে বাজারজাত করা তথা অর্থসম্পদের ভারসাম্য রক্ষা করা, এবং ৪. এ জন্যে প্রাক্তন ব্রিটিশ ভারত এমনকি South east Asia-র থাইল্যান্ড, কম্পুচিয়া লাওস নিয়েও মণ্ডলী গঠন করা কল্যাণকর। এ-ই হচ্ছে একালে প্রতিমুহূর্তে বর্ধিষ্ণু নানা সঙ্কট-সমস্যা থেকে মানুষকে তথা রাষ্ট্রকে বাঁচিয়ে রাখার একমাত্র উপায় বা পন্থা এবং এ করতেও সমাজতান্ত্রিক আদর্শ বরণ আবশ্যিক ও জরুরী হবে।

পরম্পরাপ্রীতি, দ্রোহ ও চেতনার বিকৃতি

বহু বহু কাল সাধারণ মানুষের জন্যে ভৌগোলিক ব্যবধান ছিল কায়িক ও মানসিকভাবে দুর্লঙ্ঘ্য। অবশ্য রাজা-বাদশাহরা বেপরওয়া হয়ে অনেক দূর এগুতো বটে, তবে তাও ছিল সীমিত। অজ্ঞাত ছিল পৃথিবীর পরিধি ও পরিসর। তাই অজ্ঞতাও ছিল মানুষের সীমাহীন। বলতে গেলে তখন মানুষ অকূল অজ্ঞতা সমুদ্রে জ্ঞানের ক্ষুদ্র ও নড়বড়ে ভেলায় ভাসত মাত্র। আর জগৎকে দেখত দৃষ্টিগ্রাহ্য দিগন্ত সীমায় নিবদ্ধ। তাতে অবশ্য তাদের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, লাভ-ক্ষতি, স্নেহ-মমতা, প্রেম-প্রীতি-ঈর্ষা-অসূয়া-হিংসা-ঘৃণা আকীর্ণ জীবনে কোন অপূর্ণতার অজ্ঞতার অনুভূতি তাদের ব্যথিত করত না। আজো অজ্ঞতা কারো জীবনেই অপূর্ণতার বেদনা জাগায় না। শোনা-জানা-বোঝার পরিসর সংকীর্ণ হলেও জীবনের প্রাত্যহিকতার সুখে-দুঃখে কোন হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না। যে যতটুকু জানে, শোনে, বোঝে ততটুকুতেই সে ডিগদড়িবদ্ধ প্রাণীর জীবনে মনে করে তার চাক্ষুষ ও মানসিকজীবনের পরিধি ও পরিসর ততটুকুই, এ বেশি থাকলে বা না থাকলে অর্থাৎ এর অতিরিক্ত কিছুর অস্তিত্বে-অনস্তিত্বে তার কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নেই, সে আশুতোষ, সে তৃপ্ত ও তুষ্ট। মানুষ প্রয়োজনের ও অভ্যাসের এবং আশৈশবের ধারণার বাইরে যায় না। কেনান অঞ্চলে ইব্রীয়দের তথা হিব্রুদের জন্যেই কেবল নবী আবির্ভূত হতেন, প্রজন্মক্রমে, কিংবা গোষ্ঠীপতি রূপে কেবল তাদের হিতার্থেই অর্থাৎ তাদের পরিচালনার ও দেশনার জন্যে। ভারতেও অবতার রাম-কৃষ্ণ প্রমুখ কেবল ভরতবংশীয়দের কিংবা উত্তর ভারতের গোত্রগুলোর সামাজিক সঙ্কট-সমস্যা-দুর্যোগ-দুর্দিন [ধর্মস্য গ্লানি] ঘোচানোর জন্যেই হতেন আবির্ভূত। য়ূরোপে-চীনে-আমেরিকায়-আফ্রিকায় এমন নবী অবতার প্রয়োজন হয়নি। কোরআনেও বলা হয়েছে—অতঃপর তোমার লোকদের বোধগম্য করার জন্যেই ওহি আরবীতে নাজেল হচ্ছে। এতে বোঝা যায়, পৃথিবীর পরিসর অজ্ঞাত ছিল বলেই লোকবিশ্বাসের স্রষ্টা বা ঈশ্বর বা ঈশ্বর প্রোক্ত বাণীগুলো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আঞ্চলিক, কালিক, গৌত্রিক প্রয়োজনে ছিল সীমিত। ইহ-পরলোকে প্রসৃত জীবন সম্পৃক্ত তথা অমর আত্মা সম্বন্ধীয় বলেই এসব বিশ্বাস-সংস্কার অবিচল রয়ে গেছে শৈশবের বাল্যের মগজধোলাইয়ের ফলে। আশ্চর্য যে লোকে আজো অজ্ঞতায় জীবনানুভূতির বা উপলব্ধির কোন অসম্পূর্ণতা বা অসুবিধে বোধ করে না। জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি দিয়ে বিচার বিবেচনাও করে না কোন মত-পথ-চিন্তা-চেতনা-সিদ্ধান্তের ন্যায্যতা বা যৌক্তিকতা। তাই কেবলই ভুল করে, জেদ করে, গোঁ ধরে থাকে। ইহজাগতিক হলে পাপ-পুণ্য কিংবা নৈতিক আদর্শিক চেতনাও থাকে না। কোন মতেই যৌক্তিক বৌদ্ধিক শক্তি প্রয়োগে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে না। এটি রাজনীতিক, সাংস্কৃতিক, ঐতিহ্যিক পরম্পরাগত সংস্কার-বিশ্বাসেও বদ্ধমূল হয়ে যায়। তার একটি সদ্য প্রমাণ হচ্ছে আওয়ামী-বাকশালী-সিপিবি গোঁ। তারা শেখ মুজিবের চারনীতির সবটাই বর্জন করেছে। তারা সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, কেবল নির্বিশেষ বাঙালী জাতীয়তা ও বাকশাল বর্জন বা পরিত্যাগ করেছে ভুল বা অকেজো অথবা অপ্রযোজ্য কিংবা অকল্যাণকর বলে। তবু মুজিবকে জাতির পিতারূপে স্বীকৃতি আদায়ের গোঁ ছাড়ে না। আবার অন্যেরাও শেখ মুজিব যতটুকু কৃতজ্ঞতার দাবিদার, তাও প্রকাশ করতে অস্বীকৃত। আগরতলা মামলায় জড়িয়ে দেয়ার ফলে শেখ মুজিবুর রহমান স্বচ্ছবুদ্ধির বাঙালী মাত্রেরই জাতীয় নেতার বা বীরের প্রতীক, প্রতিম ও প্রতিভূ হয়ে ওঠেন ১৯৬৯ সন থেকে। যদিও তখন আমিনা বেগম ব্যতীত কেউ প্রকাশ্যত আওয়ামী লীগার ছিল না ঢাকা শহরে। স্বয়ং আবদুস সালাম খানও পদত্যাগ করে সরে পড়েছিলেন। তারপর আইয়ুবের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই বিশেষ করে ইয়াহিয়া খান Legal Frame Work নামের নীতি-নিয়ম, বিধি-বিধান অনুগ সাংসদ নির্বাচন ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই ধূর্ত ও সুযোগ সুবিধেবাদী ধনী-মানী-খ্যাতি-ক্ষমতাবান উচ্চাভিলাষী মাত্রই সাংসদ ও মন্ত্রী হওয়ার বাসনাবশে শেখ মুজিবুর রহমানের দরবারে ধর্না দিয়েই স্বতঃসিদ্ধভাবে আওয়ামী লীগার হয়ে গেল, আর মানুষের সব আন্দাজ-অনুমান ভবিষ্যদ্বাণী বৃথা ও ব্যর্থ প্রমাণ করে প্রদেশে ও কেন্দ্রে প্রায় সব সাংসদই হল আওয়ামী লীগার।

তারপর আবার মুজিবুর রহমান যখন ধৃত হয়ে ডক্টর কামাল হোসেনসহ করাচি নীত হলেন, শহরের বাজারে বস্তিতে নরহত্যা করা হল, আন্দোলন করল মুখ্যত মুসলিমরা আর পাকিস্তানী সৈন্যরা হিন্দুহত্যায় হল বিশেষ মনোযোগী, তখন প্রায় ষাট/সত্তর লাখ লোক ভারতে আশ্রিত হল, এদের মধ্যে দু'চার লাখ মুসলিমও ছিল। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হল, সাহায্য করল ভারত, মদদ যোগাল রাশিয়া, যুদ্ধ করল মুখ্যত মুসলিম তরুণেরা, নানাভাবে সাহায্য-সহায়তা ও সহানুভূতি-সেবা যোগাল হিন্দুরা, কেউ কেউ প্রত্যক্ষ যুদ্ধেও নামল। কেননা হিন্দুরা পাকিস্তানে ছিল জিম্মি, যুদ্ধের পরে তাদের নাগরিকত্ব ও স্বাধীনতা সমভাবে দেয়া হবে কিনা তা ছিল অনিশ্চিত। তাই হাজারে হাজারে হিন্দু সক্রিয় সৈনিক হতে চায়নি। অনিশ্চয়তার জন্যে মানসিক প্রস্তুতি ছিল না বলেই।

শেখ মুজিবুর রহমান বিস্ময়কর জনপ্রিয়তা নিয়ে বিশ্বের বিস্ময় হয়ে অবিসম্বাদিত নেতৃত্ব পদে আসীন হলেন, গোড়াতেই তিনি রাষ্ট্রপতি হবেন কি প্রধানমন্ত্রী হবেন অর্থাৎ সংসদীয় গণতন্ত্রী হবেন না রাষ্ট্রনায়ক হবেন স্থির করতে পারলেন না, অবশেষে বাকশালী একনায়কত্বই পছন্দ করলেন। ইতোমধ্যে তাঁর রক্ষীবাহিনী ও অনুচর-সহচর-সমর্থক আর দলীয় লোকেরা গাঁয়ে-গঞ্জে-শহরে-বন্দরে, কাড়া-মারা-হানার বিভীষিকা সৃষ্টি করে জনগণের জান-মাল-গর্দানের নিরাপত্তা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত করে তুলল। তিনি এদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলেন না বলে, সেনাবাহিনীকেও গুরুত্ব দিলেন না বলে, জনগণেরও সেনাবাহিনীর শ্রদ্ধা নয় কেবল, আস্থাও হারিয়ে ঘৃণ্য গণশত্রুর নেতারূপে প্রতিভাত হলেন, ফলে ইন্দিরা গান্ধী উক্ত 'জাতির পিতৃত্ব'চ্যুতও হলেন এভাবে। লোকের অনুমান বিদেশীর তথা মার্কিন ইঙ্গিতে ও মদদে মুজিব নিহত হন তাঁর সেনানীদের হাতে। তাঁকে সপরিবার-পরিজন-স্বজন সমেত হত্যাটা রাজনৈতিক হলেও চরম বর্বরতার পরিচায়ক। কেননা মুজিব হত্যাতেই তাদের উদ্দেশ্য সাধিত হত। এর পরে বাহ্যত আওয়ামী লীগার মুস্তাক আহমদই হলেন রাষ্ট্রপতি, তাঁর মন্ত্রীরাও ছিলেন আওয়ামী দলের। কাজেই মুজিব নিহত হলেও ২৯৯ জন আওয়ামী সাংসদ ও আওয়ামী সরকার আপাতদৃষ্টে বহাল ছিল। কিন্তু প্রায় সবাই কাড়া-মারা-হানা-লুট প্রভৃতি অপকর্মে অপরাধী ছিল বলেই 'মুজিবকোট' পরিহার করে সবাই বছরকে বছর পালিয়ে বেড়িয়েছে শাস্তি বা প্রতিশোধ শঙ্কায়, যা জিয়া হত্যার পরে তাঁর সাংসদেরা করেনি। এর মধ্যে লোকের অনুমান ও বিশ্বাস সেনানিবাসে সেনানীদের দলে না ভিড়িয়েই বা ভেড়ানোর চেষ্টা না করেই ভারতের ইঙ্গিতে ও মদদের আশ্বাসে-প্রত্যাশায় খালেদ মুশারফ 'ক্যু' করেন, এ ছিল একপ্রকার প্রস্তুতিবিহীন হঠকারিতা এবং এ সংবাদ পেয়ে বা এমনি কিছু তথ্য পেয়ে অথবা নিছক অনুমান করেই চার আওয়ামী নেতাকে জেলখানায় হত্যা করালেন মুস্তাক আহমদ। এ এক নজিরবিহীন কানুন ও নীতিনিয়ম, সভ্যজগতের বিধি-বিধান বিরুদ্ধ বর্বরতম হত্যাকাণ্ড। তারপরেও হল দ্রুত পরিবর্তন। খালেদকে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাড়িয়ে তাড়িয়ে প্রকাশ্য শহুরে সড়কে গুলি করে হত্যা করে সেনাদলই। আর অচিহ্নিত ব্যক্তিকে তথা যাঁর আনুগত্যে সমর্থনে এবং মতে-পথে-সিদ্ধান্তে সংশয় ছিল বলে যাঁকে গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছিল, সেই জিয়াউর রহমানের উপরেই ভরসা রাখলেন লেঃ কর্নেল তাহের। মুক্তিযোদ্ধা অবঃ লেঃ কর্নেল তাহের কুমিল্লা সেনানিবাসের সেনা-সেনানীদের বশে এনে সিপাহী জনতার নামে আর জাসদপন্থীরূপে ঢাকা সেনানিবাস কবজা করে জিয়াউর রহমানকে তাঁর গৃহবন্দিত্ব হয়তো নিশ্চিত মৃত্যু থেকে উদ্ধার করে দেশপতি পদে বসালেন। কিন্তু সেনানীদের সঙ্গে দল করে শক্তিমান হয়ে তিনি জাসদ নেতা তাহেরের ছদ্ম বিচারের মাধ্যমে হত্যা করে নিশ্চিন্তে সর্বময় স্বৈর ও স্বেচ্ছা ক্ষমতার অধিকারী হন। তাঁর সাত বছরের স্বেচ্ছা শাসনের অবসান ঘটান এরশাদ সূক্ষ্ম ও পরোক্ষ ষড়যন্ত্র জালে চট্টগ্রামে অনেককে জড়িয়ে। নিজে কয়েক মাস ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে জিয়া হত্যার রক্তের ছিটে এড়িয়ে ২৩ শে মার্চ ১৯৮২ সনে ক্ষমতা দখল করেন। তাঁকে সে-ক্ষমতা ছাড়তে হল ১৯৯০ সনের ২৭ শে নভেম্বর। উল্লেখ্য যে যারাই মুসলিম লীগার ছিল তারাই পরে আওয়ামী লীগার হয়ে মুজিবভক্ত হল, তাদেরই এক অংশ মুস্তাকের অনুগত হল, আবার তাদেরও একদল জিয়ার হল অনুগত। এদেরই এক অংশ জিয়ার পতনের পরেই যোগ দিল এরশাদের দলে। কাজেই বিগত চুয়াল্লিশ বছর ধরে আমাদের রাজনীতি চলছে চরিত্রহীন আদর্শভ্রষ্ট, দলছুট, প্রতারক, প্রবঞ্চক, সুবিধেবাদী-সুযোগ সন্ধানী স্তাবক-চাটুকার পদলেহী অসৎ লিপ্সু ও মানবিকগুণরিক্ত আত্মমর্যাদা বোধশূন্য বিবেকহীন রাজনীতিকদের ভাব-চিন্তা কর্ম-আচরণে নিয়ন্ত্রিত হয়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভদ্রলোক ও ভালো মানুষ

দেশে ভদ্রলোকের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। কিন্তু ভালো মানুষ এখনো বিরলতায় দুর্লক্ষ্য। চালচুলো থাকুক আর না-ই থাকুক শিক্ষিত ও স্বল্প শিক্ষিত এবং সচ্ছল অবস্থার অশিক্ষিত সাফকাপুড়ে মাত্রই নিজেদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বলে অভিহিত করে। অতএব 'মধ্যবিত্ত' এখন একটি 'যোগরূঢ়' শব্দ—অর্থসম্পদ সম্পৃক্ত নয়। এ মধ্যবিত্ত মাত্রই আবার ভদ্রলোক অভিধায় সমাজে পরিচিত। কাজেই 'ভদ্রলোক' ও 'ভালো মানুষ'—এ দুটোর অভিধা ও তাৎপর্যগত পার্থক্য রয়েছে। সাক্ষর শিক্ষিত এবং নিরক্ষর ধনীমাত্রই সাফকাপুড়ে [হোয়াইট কলার] হলেই হয় ভদ্রলোক। কিন্তু সৎ, ন্যায়নিষ্ঠ-বিবেকবান না হলে তথা চরিত্রবান না হলে কেউ ভালো মানুষ হয় না। যদিও ভদ্রলোক ও মধ্যবিত্ত সমার্থক কিংবা একটা অন্যটার নামান্তর মাত্র। আবার বড়লোক মানে ধনী লোক, ধনী হলে মানীও হয়। কথায় বলে দারিদ্র্যদোষ সব গুণ নষ্ট করে, অভাবেই হয় স্বভাব নষ্ট, আমাদের দেশ নাকি পৃথিবীর দরিদ্রতম রাষ্ট্রকয়টির একটি। আমাদের অজ্ঞ-অনক্ষর ভূমিহীন মজুর শ্রেণীর এবং ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ ঘরানাবৃত্তিজীবীরও সব মাসে সব দিন দু'বেলা ভাত জোটে না। এ মানুষের সংখ্যা কোটি কোটি, কাজেই এখানকার মানুষ আত্মসম্মান রক্ষা করে, নিজের অভাব-অনটনের কথা গোপন রেখে চলতে পারে না। বাঁচার এবং স্বজনদের বাঁচানোর তাগিদে নানা ছল-চাতুরীর ও লাভ-লোভের আশ্রয় নিতে হয়, প্রশ্রয় দিতে হয় মিথ্যাচারকে প্রতারণাকে।

পাঠে আগ্রহ নেই অথচ চাকুরি করে দারিদ্র্য ঘোচানোর লক্ষ্যে পাসের প্রয়োজন রয়েছে, তাই মন্দ ছাত্ররা এবং তাঁদের অভিভাবকরা স্কুলে-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে নকল আবশ্যিক ও জরুরী বলে জানে ও মানে এবং নকলের অধিকারও দাবি করে কোথাও কোথাও। শ্লোগানও ওঠে 'বহিষ্কার চলবে না। শাস্তি দেয়া চলবে না।' স্কুলে-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে আগে মন্দ ও অনিয়মিত উপস্থিতির শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা দেয়ার অনুমতি দেয়া হত না। বহুকাল থেকে সে নিয়ম মানানো বা প্রয়োগ সম্ভব হয় না বলে, তা কার্যত বিলুপ্তই হয়ে গেছে। দুর্বিনীত ও অসাধু শিক্ষার্থীকে চিরকালের জন্যে লেখাপড়ার অধিকার বঞ্চিত করার নিয়মও অপ্রয়োগে বিলুপ্ত। অশিক্ষিত ও শিক্ষিত বেকারে দেশ আকীর্ণ। এমনি অবস্থায় কোন সমাজেরই, কোন দেশেরই নৈতিক স্বাস্থ্য অক্ষত অটুট থাকে না। যতই অভাব বাড়ে, বেকারত্ব বাড়ে ততই মানুষ বাঁচার গরজেই দুষ্ট, দুর্জন, দুর্বৃত্ত ও দুষ্কৃতী হয়ে ওঠে। ভোগেবঞ্চিত নির্ধন লোক কখনো ত্যাগপ্রবণ হতে পারে না।

প্রাজস্মক্রমিক ঐশ্বর্যবান লোকেই অর্থ-বিত্ত দানে-দাক্ষিণ্যে-কৃপায়-করুণায় ব্যয় বা ত্যাগ করতে পারে। কেননা ভোগে ভোগে ভোগবিরক্তি আনে। যে আগে কখনো পায়নি, সে কেবল পাই-পাই, খাই-খাই করে। সে-মানুষ ন্যায়-অন্যায়ের চেতনারিক্ত হয়। লিপ্সা ও জিগীষাই হয় তার সম্বল, পুঁজি ও পাথেয়। আমাদের শতে নিরেনব্বইজন দুস্থ নিঃস্ব নিরন্ন বলে, আমাদের অধিকাংশ শিক্ষিত লোকও অসচ্ছল পরিবারের সন্তান বলে এবং জীবিকাক্ষেত্রে প্রত্যাশাপূর্তির অনুপাতে সদুপায়ে অর্জিত আয় কম বলেই তারা সহজেই হয় লাভ-লোভের শিকার। এ কারণে আমাদের মধ্যে আদর্শবান, অর্থসম্পদের ক্ষেত্রে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্লোভ, সৎ-ন্যায়নিষ্ঠ-বিবেকবান রাজনীতিকেরও অভাব। অধিকাংশ রাজনীতিক মন্ত্রী, আমলা দাগী। দাগবিহীন লোক দুর্লভ বলেই দাগী লোকেরাই টাকার জোরে, রাজনীতিক দলের সমর্থনে এবং হুমকি-হামলার ভীতি জাগিয়ে 'ভোট' রূপ শক্তি আয়ত্ত করে বসে ক্ষমতার আসনে। কাজেই দাগী লোকে জানে যে 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম', আর মানে যে 'আমার ভালো তো দেশেরও ভালো, কারণ আমিও তো আল্লাহর বান্দা এবং দেশের নাগরিক।' ফলে দুর্নীতি আজ ব্যক্তির কথায় কাজে, বুকে, মুখে সর্বত্র অনুপ্রবিষ্ট। অঙ্গে-অন্তরে, রন্ধ্রে রন্ধ্রে সর্বত্র অস্বাস্থ্যের, অস্বস্তির, অবিশ্বাসের অনিশ্চয়তার ছাপ ও দাগ পরিদৃশ্যমান।

কোন নীতিকথায় মানুষের এ মানসিক অবস্থার এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থানের প্রতিকার মিলবে না। তাই আদেশ-নির্দেশ-উপদেশ হুকুম-হুমকি-হুঙ্কার-হামলাও এর চিকিৎসা বা প্রতিষেধক নয়। নারী-পুরুষের অশিক্ষা ঘোচানো, বেকারত্বের বিলুপ্তি, আর্থিক সাচ্ছল্য সামাজিক নয়, আর্থিক সুবিচার বা ন্যায়বিচার আর ব্যক্তিজীবনে ও আচরণে সমস্বার্থেই সংযম, সহিষ্ণুতা, সামবায়িক সহযোগিতা সৌজন্য প্রভৃতির অঙ্গীকারে জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-প্রজ্ঞা-বিবেক-বিবেচনা প্রয়োগে সহাবস্থানের আন্তরিক ইচ্ছার অনুশীলনই এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতির আনুগত্যই আমাদের আর্থিক মানসিক জীবন মন্থরগতিতে উন্নত করবে। এর জন্যে আমাদের আর এক প্রজন্মকাল অপেক্ষা করতে হবে। যদিও পৃথিবীর মানুষের হালচাল-মন-মত-পথ-পদ্ধতি দ্রুত বদলাচ্ছে। তবু আমাদের মন-মানস-অঙ্গ-অন্তর এখনো একেবারে মাটিলগ্ন বলেই আমাদের কিছু বেশি সময় লাগবে। আমরা আশাবাদী, সুদিনের আনন্দিত জীবন এদেশেও অদূর ভবিষ্যতে সম্ভব হবে। সে সময়ে ভদ্রলোকদের অধিকাংশই ভালো মানুষের আধিক্যে ভালো নুষের মতো আচরণ করবে। এখনকার মতো নির্গুণ মাকালফলের মতো কেবল ভদ্রলোক থাকবে না। ধনের তথা অর্থ সম্পদের বৃদ্ধির উপরই আমাদের ভালো মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং দেশের সর্বাত্মক উন্নতি নির্ভর করছে।

শ্রেয়সের সন্ধানে

মন হচ্ছে জীবন্ত প্রাণীর চেতনা-প্রসূন। তাই মন হচ্ছে দেহজ ও দেহাশ্রিত। রুগ্ন দেহে মন স্বস্থ ও সুস্থ থাকে না। দেহের স্বাস্থ্য তাই সুস্থ মন লালনের পক্ষে আবশ্যিক। দেহের স্বাস্থ্য নির্ভর করে পুষ্টিকর ও পরিপাকযোগ্য খাদ্যের সহজ ও অবাধ প্রাপ্তির উপর। অবশ্য এমন বিচ্ছিন্ন, পৃথক ও স্বতন্ত্রভাবে দেহ-মনের চাহিদা বিশ্লেষণ করা যায় না। যথাসময়ে-যথাস্থানে-যথাপ্রয়োজনে প্রাণীর ক্ষেত্রে খাদ্য, আশ্রয় ও আবহাওয়া আবশ্যিক। আর মানুষের ক্ষেত্রে অন্ন-বস্ত্র-নিবাস-নিদান-শিক্ষা-স্বাস্থ্য-চিকিৎসা-সুশাসন প্রভৃতির কালিক ও স্থানিক উপস্থিতি বা প্রাপ্তি একাধারে ও যুগপৎ হওয়া আবশ্যিক। এর কোন একটার অভাব ঘটলেই, গাড়ির তেল-ইঞ্জিন-চাকার মধ্যে কোন একটার অসহযোগিতার মতো তাল কেটে যায়, ছন্দ হারায়। যেমন রান্নার জন্যে তেল, নুন, মসলা, চাল, ডাল, মাছ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তরকারী, লাকড়ি-উনুন সব যোগাড় হল কিন্তু দিয়াশলাই বা আগুন মিলল না, তখন সব আয়োজন হয়ে যায় বৃথা ও ব্যর্থ। মানুষের গৃহগত সমাজভুক্ত, জীবিকা সম্পৃক্ত ও রাষ্ট্রান্তর্গত জীবনেও তেমনি সব চাহিদার ন্যূনতম প্রাপ্তি আবশ্যিক ও জরুরী। নইলে অন্যসব কিছু থাকা সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় কিন্তু তুচ্ছ সামগ্রীর কিংবা পরিবেশ-প্রতিবেশের অভাবে হুলের মতো, শূলের মতো, ঘায়ে মানুষের ব্যক্তিচেতন বিদ্ধ হতে থাকে। তার সুখ-স্বস্তি-আনন্দ হয় ব্যাহত।

চেতনারও অনুশীলন আবশ্যিক হয়। চেতনাকে সূক্ষ্ম-তীক্ষ্ণ-তীব্র অনুভব উপলব্ধির জন্যে বাহন করতে হলে তাকে জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি ও ন্যায়বোধ চালিত বিবেক-বিবেচনাযোগে ঋদ্ধ করতে হয় এবং এভাবেই চেতনাপ্রসূন মনরূপ কাণ্ডারী দিশারী চালিকা শক্তি স্টিয়ারিং হুইল বৌদ্ধিক-যৌক্তিক নায্যতার ও প্রয়োজনের ভিত্তিতে ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ-মনন-মনীষা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এমনি স্তরে মনের উন্নয়ন ঘটলেই কেবল মানুষ সম ও সহস্বার্থে স্বাধিকারে সংযমে সহিষ্ণুতায় অপরের অধিকার ও স্বার্থ জেনে ও মেনে প্রতিবেশীর সঙ্গে সদ্ভাব রক্ষা করে নির্বিরোধ সহাবস্থানে সম্মত হতে পারে।

সব মানুষ যেহেতু সমভাবে ভাবিত হবে না কখনো মেধা-মনীষার লাভ-লিপ্সার মান-মাপ-মাত্রাভেদে, ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে বিরোধ ও বৈপরীত্য থাকবেই, সেহেতু নৈতিক-সামাজিক নীতিনিয়মের, রীতি-রেওয়াজের বাঁধাধরা বিধি-নিষেধের অতিরিক্ত রাষ্ট্রের সাংবিধানিক ব্যবস্থা ও তার সুষ্ঠু প্রয়োগও আবশ্যিক ও জরুরী। তাহলেই কেবল নৈতিক, সামাজিক, প্রাশাসনিক ও সার্বিক ন্যায় প্রচল রাখা সম্ভব হয়। তাহলেই ব্যক্তি জীবন-জীবিকার সর্বক্ষেত্রে রুচি-সংস্কৃতিমান সভ্যসমাজে নিরুপদ্রব-নিরাপদ জীবন যাপনের অধিকার পায়। সে অবস্থায় ও অবস্থানে ব্যক্তিজীবনে থাকে মর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্য, সামাজিক জীবনে থাকে সাম্য ও স্বাধীনতা, সাংস্কৃতিক জীবনে থাকে শ্রেয়সে ও প্রেয়সে সহাবস্থান এবং কল্যাণকে নতুনকে গ্রহণের এবং উপযোগরিক্ত পুরোনো আচার-সংস্কার বর্জনের অধিকার, জীবিকা ক্ষেত্রে থাকে যোগ্যতানুসারে সুযোগ ও সুবিচার, রাষ্ট্রিক জীবনে কাম্য থাকে দায়িত্ব ও কর্তব্যনিষ্ঠা আর স্বাধিকার চেতনা।

এসব পেতে হলে মানবসত্তার মূল্য-মর্যাদায় নিখুঁত নিখাদ আস্থাবান সংবেদী মানববাদী জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেক-বিবেচনাসম্পন্ন ন্যায়চেতন ব্যক্তি-পরিচালিত সরকার আবশ্যিক। এ মানুষকে একাধারে ও যুগপৎ মানবদরদী ন্যায়প্রবণ সমাজবাদী হতে হবে। আমাদের ১৯৭২ সনের সংবিধানে কিছু অসঙ্গত অসামঞ্জস্য কথা থাকা সত্ত্বেও [যেমন চারনীতি, মূলত এক নীতিকেই চার ভাগে দেখানো, কেননা সমাজতান্ত্রিক সরকার মাত্রই ধর্মনিরপেক্ষ, রাষ্ট্রিক জাতীয়তাবাদী এবং দলীয় গণতন্ত্রে আস্থাবান] জনগণের প্রত্যাশিত অধিকার স্বীকৃত ছিল। সে-সংবিধান পুনঃ চালু হলে ধর্মবিশ্বাসভিত্তিক রাজনীতিক দল, সম্প্রদায়চেতনা প্রভৃতি বিলুপ্ত হবে কার্যত। কিন্তু জনগণের মধ্যে এখন যেন সেক্যুলারিজমের প্রতি কোন আকর্ষণ নেই। শাস্ত্রিক সম্প্রদায়চেতনা মারাত্মকভাবে প্রসার লাভ করছে, বাড়ছে বিষবৃক্ষের মতো। এ চেতনা আত্মহননের পথেই নিয়ে যাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঈর্ষা

এমনিতেই মানুষের জীবনে দৈহিক-মানসিক দুঃখ লঘু-গুরুভাবে রয়েছে, বইছে। তার উপর প্রকৃতির দেয়া, সমাজের দেয়া, প্রতিবেশীর দেয়া, পরিজনের দেয়া এবং আর্থিক বৈষয়িক ব্যবহারিক অবস্থা ও অবস্থানগত দুঃখও কম নয়। প্রতিনিয়ত কিছু না কিছু লঘু-গুরু-দুঃখ লোকে পেয়েই থাকে। এর উপরে মানুষ তার মন-মগজ থেকে আর একটা দুঃখের জন্ম দেয়। তা হচ্ছে হিংসা-ঈর্ষা-অসূয়াজাত দুঃখ। এ দুঃখ বাহ্যত প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষ, আপাতদৃষ্টিতে পরিহার্য মনে হলেও যেন পরিহার্য নয়, এ অনেকটা রবীন্দ্রনাথের সেই গানে পরিব্যক্ত প্রাবৃত্তিক ও মনস্তাত্ত্বিক অপরিহার্যতা। তাই সবাই 'জেনে শুনে'ই এ বিষ পান করে। এবং কণ্ডূয়নের মতো স্মরণে রোমস্থনে আপাত সুখ এবং পরিণামে জ্বালা অনুভব করে। এর থেকে সত্যই অনাসক্ত, নিরীহ ধীরবুদ্ধির ও স্থিরবিশ্বাসের মানুষেরও যেন নিষ্কৃতি নেই। কেননা, দুনিয়াতে সমকালে যোগ্য লোকের প্রতিষ্ঠা প্রশংসা কমই মেলে। চালবাজ সব ধূর্ত-দুষ্ট-চাটুকারেরাই সর্বত্র পদোন্নতি-খ্যাতি-ক্ষমতা-প্রশংসা পায়। সর্বত্র সেই বঙ্কিমচন্দ্র চিত্রিত মুচিরাম গুড়েরই সামাজিক রাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠা দেখা যায়। তাই যোগ্যদের মনে লাগে, মানে লাগে, মর্মে লাগে এ ঘা। নিজের প্রতিও মাঝে মধ্যে ধিক্কার জাগে, পরিবার-পরিজনেরা বিশেষ করে স্বামী বা স্ত্রীও তাকে আত্মধিক্কারে প্ররোচিত করে। যোগ্য লোকের যোগ্যতার আদর-কদর জীবিকাক্ষেত্রে কিংবা সমাজে পরিচিতদের মধ্যে না হলে সংবেদী বা আবেগ-প্রবণ মানুষের চিত্তবিকার বা মগজ বিকৃতি ঘটে। জীবিকাক্ষেত্রে যোগ্য ব্যক্তিকে ডিঙিয়ে কেউ পদোন্নতি পেলে ওই বঞ্চিত, অবহেলিত, অপমানিত ব্যক্তি সহ্যশক্তিহীন বা আবেগপ্রবণ হলে হৃদরোগে মরে কিংবা আত্মহত্যা করে, অথবা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে, আবার বঞ্চনার ও লোকলজ্জার ক্ষোভজাত নিত্য দুশ্চিন্তায় ও হীনম্মন্যতায় হৃতস্বাস্থ্য হয়ে অকালে ভাঙা দেহে ও ভাঙা মনে মৃত্যুও বরণ করে। একে গড়ে মাৎসর্য বা পরশ্রীকাতরতা বলা যাবে না। কেননা এ ঈর্ষা কিংবা হিংসা সবসময়ে স্বশ্রেণীর, অবস্থার, অবস্থানের, পরিচিত এবং জীবিকা কিংবা সমাজ ক্ষেত্রে প্রতিযোগী-প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যেই সীমিত থাকে। স্বকালতার সঙ্গে সমবয়স্কতা বিশেষ করে বয়ঃকনিষ্ঠতা এবং পারিবারিক-সামাজিক-বার্ণিক অবস্থানগত শ্রেষ্ঠত্বও এর সঙ্গে থাকে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বয়োজ্যেষ্ঠ যোগ্যতর কিংবা বার্ণিক-সামাজিক অবস্থানে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির পদোন্নতিতে অন্যদের মনে বিকার উপস্থিত হয় না সাধারণভাবে। কাজেই ঈর্ষা পেশা-মান-যশ-মর্যাদা-অর্থসম্পদ-খ্যাতি-ক্ষমতা-দর্প-দাপট-প্রভাব-প্রতিপত্তিগত নিন্দা-প্রশংসায় নিবদ্ধ।

এ মুহূর্তে বাঙলাদেশেও কেবল অর্জিত অনর্জিত চোরাগোপ্তা পথে অপঅর্জিত অর্থে লোকনিন্দিত ব্যক্তিরাই টাকা দিয়ে ভাড়া করা পেশাজীবী মস্তান-গুণ্ডা-খুনীর সাহায্যে-সমর্থনে পর্ষদে-পরিষদে-সংস্থায়-সমিতিতে সংসদে নির্বাচিত হচ্ছে। এরা ঘরে ঘরে দাগী বলে নিন্দিত ও চিহ্নিত থাকলেও প্রকাশ্যে এদের নিন্দা উচ্চারণের লোক মেলে না দারিদ্র্যক্লিষ্ট অজ্ঞ-অনক্ষর আকীর্ণ ও দুষ্ট-দুর্জনপ্রধান সমাজে। আত্মপ্রত্যয়ী যোগ্যরা তাই নিষ্ক্রিয় ঈর্ষায়-হিংসায় অসূয়ায় ভোগে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নববর্ষে

এই যে একটি বছর জীবন থেকে ঝরাপাতার মতো ঝরে পড়ল, তা আর কোন রকমেই ফিরে পাওয়া যাবে না। একে স্মৃতি রোমন্থনে কল্পনায়-চেতনায় আভাসে ছায়ার মতো অনুভব করা যায় বটে, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ জীবিতকায়া হিসেবে তাকে পাওয়া যাবে না কখনো, ওই ছায়াময় কঙ্কালসার স্মৃতিও একসময়ে মুছে যায় একটা বিশেষ বছরে। কোন জন্ম-মৃত্যুর কিংবা স্থায়ী গুরুত্বের কোন ঘটনা না ঘটলে সে-বছরের কিছু মনে থাকে না, স্মৃতির রোমন্থন প্রয়াসেও কোন কথা-কাজ বা ঘটনা মনে জাগে না। এমনি করে মানুষের জীবনে মুহূর্তগুলো কাটে, দিন যায়, মাস যায়, বছরও যায়। দিনে দিনে, বছরে বছরে বয়স বাড়ে। আয়ু কমে। মানুষ প্রতিক্ষণে জরাজীর্ণতার ও জড়তার দিকে এগুচ্ছে। সে আশা-প্রত্যাশা নিয়ে বাঁচে বলেই প্রাপ্তির দিনটির জন্যে অধৈর্য হয়ে ওঠে, তখন তার মনে জাগে না যে এই নির্দিষ্ট দিনটিতে পৌঁছার জন্যে তার আকুলতা তাকে ভুলিয়ে দেয় যে তার এক এক করে আয়ু কমছে, বয়স বাড়ছে। দিনগুলো যদি মন্থরগতিতে কাটে, জীবনটার প্রতিটি মুহূর্ত যদি অনুভব-উপলব্ধিগত করে ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগ করা যেত, তাহলে বলা যেত 'জীবন অমৃত করে দান।' জীবন একটা বৃক্ষ, এতে সযত্ন পরিচর্যায় ফুল ফোটাতে ও ফল ধরাতে হয়, দুনিয়ায় খুব কম লোকেই জীবনের দিন-মাস-বছর কাজে লাগায়, অন্যরা আলস্যে হেলায় অপচয় করে জীবনের দিন ক্ষণ-মাস বছরগুলো। আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও জীবনের মুহূর্তগুলো কেজো ও ফলপ্রসূ করায় যত্নবান ছিলেন। পৃথিবীর স্বল্পসংখ্যক সার্থককামা ও সার্থকভাবে যাপন করা জীবনশিল্পীর একজন ছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

ঋতুর আবর্তনের হিসেবেই আমরা অনন্তকালকে বোধগত ও সীমিত করে অনুভব-উপলব্ধি করি। এভাবেই আমরা অশেষের শেষ খুঁজি, অসীমকে করেছি সীমিত। নইলে জীবনকে সময়ের অনুগত করে অনুভব করতে না পারলে আমরা দিশেহারা হয়ে পড়তাম, জীবন হত কাণ্ডারী-মাঝিবিরহী সময়সমুদ্রে ভাসমান নৌকা। গোড়ার দিকে বিভিন্ন অঞ্চলের তথা ভৌগোলিক অবস্থানের মানুষ সময়কে মনোগত ও মনোময় করে অনুভব করতে পারত না। সময়কে এক অনুভবযোগ্য কালের পরিসরে অনুভব-উপভোগ করার প্রয়াসেই সম্ভবত মানুষ জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা করে এবং জীবনকে গ্রহ-নক্ষত্রের-রাশিচক্রের অনুগত ও নিয়ন্ত্রিত করে ভাবতে ও বুঝতে প্রয়াসী হয়। আজো ভারতীয় 'হিন্দু' নামের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন শাস্ত্রিক সম্প্রদায়গুলো ক্ষণ-লগ্ন-তিথি-বার নিয়ন্ত্রিত ও রাশি নিয়মিত জীবনে আস্থাবান। সময়ের সীমা বোঝার জন্যে খণ্ডে খণ্ডে পূর্তিমান ও ক্ষীয়মাণ চন্দ্রকে অবলম্বন করেছিল প্রাচীনতম যুগের মানুষ। পরে বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশে সূর্যকে অবলম্বন করে তার 'অয়ন'-এর হিসেবে আর্তব বা মৌসুমী আবর্তন ধরে বর্ষ নামের এক একটি কালখণ্ড অনুভবগত করে মানুষ সময়কে অধিগত করেছে, জীবনকে করেছে সময়ের অনুগত। এভাবে জীবনোপভোগ হয়েছে কালগত।

এ কালগত জীবনকে কালজয়ী করে রাখার একটা সুপ্ত বা গুপ্ত বাসনা অবচেতন মানুষের মনের মধ্যে সন্তর্পণে দানা বাঁধে। তাই মানুষ সন্তানের মাধ্যমে অমর অবিলুপ্ত থাকতে চায়, বাঁচতে চায় কৃতি-কীর্তির মধ্যে স্মরণীয় হয়ে। অমরত্ব বাঞ্ছায় সৃষ্টি করেছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চৌষট্টি কলা-সাহিত্য-শিল্প বিজ্ঞান-দর্শন-ইতিহাস। নাচে-গানে-বাজনায়-চিত্রে স্থাপত্যে-ভাস্কর্যে-সৌধে হর্ম্যে, দুঃসাহসিক অভিযাত্রায় অভিযানে। চিরকাল কালজয়ী হয়ে কায়ারূপে নয় জনমনে ছায়া হয়ে স্মরণীয় বরণীয় হয়ে বেঁচে থাকার, অমর হওয়ার সেকি আকুলতা! ভাস্করমূর্তি হয়ে পাথুরে বাঁচা, ছবি হয়ে কাগুজে বাঁচা, স্কুল-কলেজ-রাস্তা-ঘাট-মাঠ মসজিদ-মন্দিরলগ্ন হয়ে নামে বাঁচা, সাহিত্য-শিল্প-দর্শন-ইতিহাস সৃষ্টি করে রচনার মধ্যে বাঁচা—জনহিতে দেশপ্রেমে প্রাণ দিয়ে শহীদ হয়ে বাঁচা, কেবল বাঁচা বাঁচা বাঁচা আর বাঁচা। তবু এ প্রতিযোগিতার ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার এ জগতে বাঁচতে জানেই বা কয়জনে, আর বাঁচতে পারেই বা কয়জন? আজো পৃথিবীব্যাপী এ মানুষের সংখ্যা করগণ্য। কেননা অনেক কৃতি-কীর্তির মধ্যে 'নাম' থাকলেও নামধারী মানুষটার পরিচিতি হারিয়ে যায়, কালগ্রাসে বিলীন হয়, বিস্মৃতিসমুদ্রে ডুবে যায়। নামটা হয়ে পড়ে নির্গুণ অনির্দেশ্য–তাৎপর্যহীন একটা বিশেষ্যপদ মাত্র। কে সে কেউ জানে না। কাজেই বাঞ্ছাপূর্ণ হয় না। তাই অমর হতে চাইলেও মানুষ বাঁচে না, নিঃশেষে মরে বিলুপ্তির গর্ভে বিলীন হয়। ক্বচিৎ কেউ অন্যের রচনার বদৌলতে বাঁচে, যেমন সক্রেটিস। নইলে রাজা বাদশাহর নামও হারিয়ে যায়। একালে কেতাববদ্ধ হয়ে বাঁচে মাত্র, তাও নামসার, কীর্তিসার নয়। কেননা কাল সব কিছুর উপযোগ আর প্রয়োজনও হরণ করে। এককালের সম্পদ অন্য কালের ঐতিহ্যমাত্র এবং তা কোন কাজে লাগে না। ঐতিহ্য অযোগ্যের আস্ফালনের, হৃত গৌরবের ও হৃতগর্বের অবলম্বন মাত্র। তা হারানো সম্পদ মাত্র। তাই তা ঋদ্ধিও দেয় না, বৃদ্ধিও আনে না, ভরেও দেয় না, গড়েও তোলে না। কেবল অতীতমুখিতায় ধরে রাখে। পিছুটান দেয়, রিক্ত করে, জীর্ণ করে, ক্ষয়িষ্ণু রাখে। অনুপ্রাণিত করে না। প্রমাণ প্রাচীন গ্রীক-রোমক-মিশরী-ব্যাবিলোনী জাতিগুলো। যা যায় একেবারেই যায়, আর ফিরে পাওয়া যায় না। কাজেই অতীতকে পুঁজি পাথেয় করা মানেই মরীচিকার পিছু বৃথা ধাওয়া করা। জীবন অতীতে নেই, সম্পদ অতীতে নেই, কল্যাণ অতীতে নেই, আছে কেবল সম্মুখে—ভবিষ্যতের গর্ভে।

নতুন দিন-নতুন বছর মানুষের মনে বারবার সেই আশা, আশ্বাস ও প্রত্যাশা জাগায়, অনুপ্রাণিত করে নতুন জ্ঞান-বুদ্ধি-শক্তি-সাহস, সংকল্প-অঙ্গীকার, উদ্যম-উদ্যোগ নিয়ে নতুন করে জীবন আরম্ভ করার। পুরোনোর গ্লানি ঝেড়ে মুছে ফেলার সুবুদ্ধি জাগায় নতুন বছরারম্ভের নতুন নতুন দিন। নববর্ষ-চেতনার সার্থকতা এখানেই।

জীবন হচ্ছে আত্মরক্ষার, আত্মপ্রতিষ্ঠার ও আত্মবিস্তারের কাজের ও সংগ্রামের সমষ্টি। সেই Veni, Vidi, Vici—এলাম, দেখলাম আর জয় করলাম—এ-ই হচ্ছে সংক্ষেপে জীবনতত্ত্ব। এ চেতনা জাগানোতেই নববর্ষের প্রথম দিনের সার্থকতা।

পয়লা বৈশাখ : বাঙালী সত্তার প্রতীক, প্রতিম ও প্রতিভূ

ব্যক্তির প্রাথমিক কিংবা মৌল ও মুখ্য পরিচয় রয়েছে তিনটে প্রশ্নের উত্তরে, প্রশ্ন তিনটে হচ্ছে নাম, নিবাস ও বৃত্তিসম্পৃক্ত। কি নাম, নিবাস কোথায় এবং বৃত্তি বা পেশা কি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৈষয়িক ও সামাজিক সম্পর্কের জন্যে এ তিনটে আবশ্যিক। তেমনি জাতিক কিংবা দৈশিক-রাষ্ট্রিক জীবনেও এমনি নিঃসংশয় পরিচিতি আবশ্যিক ও জরুরী। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমাদের মানসে আমাদের আত্মপরিচিতিচেতনা আজো নিঃসংশয় হয়ে ওঠেনি, অনেকের মনেই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব রয়ে গেছে। তার কারণ সাধারণভাবে মানুষের চিন্তা-চেতনা নিয়ন্ত্রিত হয় আশৈশবলালিত পারিবারিক, সামাজিক ও শাস্ত্রিক সূত্রে পাওয়া বিশ্বাস-সংস্কার দিয়ে। এ এক প্রকার স্থায়ী মগজধোলাইয়ের ফুল, ফল ও ফসল। কেননা বিশ্বাস-সংস্কার কখনো যুক্তি-বুদ্ধি-জ্ঞান-প্রজ্ঞা প্রসূন নয়। যৌক্তিক ও বৌদ্ধিক চেতনার অনুপস্থিতিতেই বিশ্বাস সংস্কারের উদ্ভব, লালন, বৃদ্ধি ও নিশ্চিত স্থিতি। তাই আমাদের মধ্যে এখনো লঘু গুরুভাবে এবং উনজন-অধিজন কিংবা নগণ্যজন হিসেবে চার মনের, মতের মননের ও সিদ্ধান্তের লোক মেলে।

১. যারা মনে করে যে তারা তাদের অস্তিত্বের জন্যে স্রষ্টার তথা ঈশ্বরের কাছেই ঋণী, কাজেই ঈশ্বরানুগত্যই তাদের জীবনে মুখ্য, তাই তারা আগে হিন্দু বা মুসলিম এবং তারা তাদের ইহজাগতিক জীবনে যে মাটিতে স্থিত, সে মাটিলগ্ন জীবনে মাটি বা মাতৃভূমির কাছেও তার ঋণ অপরিশোধ্য। কাজেই তারা হিন্দু বা মুসলিম বাঙালী। ২. আর একশ্রেণীর লোক আছে, যারা ইহজাগতিক সেক্যুলার জীবনে ও জীবনাচারে গুরুত্ব দেয় তারা তাদের শাস্ত্রিক বিশ্বাসকে ও পারলৌকিক দায়িত্ব-কর্তব্যকে ব্যক্তিক ও অপার্থিব মানসিক বিষয় বলে জানে, বোঝে ও মানে। তারাই নিজেদেরকে দৈশিক ও ভাষিক পরিচয়ে কেবল 'বাঙালী' বলেই জানতে, মানতে এবং সগর্ব উচ্চারণ করতে গৌরববোধ করে। ৩. কেউ কেউ ভিন্ন অভিসন্ধিবশে অর্থাৎ প্রতিবেশী ভারত রাষ্ট্রভুক্ত পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু বাঙালী থেকে স্বাতন্ত্র্য চেতনা জাগানো লক্ষ্যে নিজেদের বাঙলাদেশী রাষ্ট্রবাসীরূপে রাষ্ট্রিক নামে 'বাঙলাদেশী' বলে পরিচয় দিতে চায়। এ প্রাক্তন জঙ্গীনায়ক শাসক জিয়াউর রহমানের পরিকল্পিত উদ্ভাবন এবং বর্তমান বি.এন.পি সরকার স্বীকৃত, অনুসৃত ও ঘোষিত পরিচিতি। ৪. আর একশ্রেণীর নাস্তিক নিরীশ্বর মার্কসবাদী বা যুক্তিবাদী লোক আছে যারা নিজেদের কেউ 'মানুষ' নামের প্রাণী প্রজাতিরূপে জানে। তারা মানুষকে কেবল নির্বিশেষে 'মানুষ'রূপেই জানে, বোঝে ও মানে, তারাই বলে—মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান। কিংবা বলে, কালো আর ধলো বাহিরে কেবল ভিতরে সবারই সমান রাঙা। অথবা, চামড়ার নিচে লাল রক্ত বহমান ভাই, মানুষে মানুষে কোন ভেদ নাই।

তবু ব্যক্তিমানুষের যেমন একটা ব্যক্তিক নাম, একটা ঠিকানা বা নিবাস এবং জীবিকাসম্পৃক্ত একটা বৃত্তি থাকে, তেমনি দৈশিক, ভাষিক, রাষ্ট্রিক জীবনেরও একটা সুনির্দিষ্ট পরিচিতি আবশ্যিক। আমরা যে রক্তসঙ্কর এবং 'বাঙলা' নামের দেশের বাঙলাভাষী মানুষ এর চেয়ে সুনির্দিষ্ট নিঃসংশয় পরিচিতির কোন প্রয়োজন নেই একালে।

আমরা এ আঞ্চলিক এ ভৌগোলিক আবহাওয়ায় আজন্ম লালিত। আমাদের দেহ-প্রাণ-মন-মনন এ আকাশের নিচে, এ মাটির উপরে রোদ-বৃষ্টি-আলো-বাতাসের পরিচর্যায় পরিবেশে ও প্রতিবেশে গড়ে উঠেছে। মায়ের পরেই মাটির গুরুত্ব। মা জন্ম দেয়, মাটি জীবিত মানুষকে লালন করে, মৃতকে ঠাঁই দেয়। একসময়ে মায়ের প্রয়োজন ফুরায়, কিন্তু মাটি জীবনে মরণে আবশ্যিক। কেননা মাটি ধরে রাখে, ভরে তোলে, আর শেষ শয্যার জন্যেও মাটিই দেয় ঠাঁই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কয়দিনের মধ্যেই পয়লা বৈশাখ এসে আমাদের বিগত বছরের ক্লান্তি, শ্রান্তি ও গ্লানি ভোলাবে; নতুন আশায়, আশ্বাসে আমাদের উদ্দীপ্ত করবে, নতুন শক্তি-সাহস, অঙ্গীকার-উদ্যম ও উদ্যোগরূপ পুঁজি-পাথেয় নিয়ে আমরা নতুন করে শুরু করব নববর্ষে নতুন জীবন। অনন্ত অখণ্ড কালপ্রবাহকে এমনি আর্তব মাপে আমরা সীমিত করে, খণ্ড-ক্ষুদ্র করে অনুভব-উপলব্ধিগণ্য করে আয়ত্তে আনি মানসিক ও বৈষয়িক জীবনযাত্রায়। সূর্যের পয়লা বৈশাখের উষালগ্নে আনন্দিত আভা ও প্রভা, উজ্জ্বল আত্মপ্রকাশ তাম্রতপ্ত দুপুরে মধ্যাহ্ন মার্তণ্ডরূপে ভাস্করস্থিতি, গোধূলিলগ্নে তার রক্তরাঙা-পলাশরাঙা আভা ছড়ানো বিদায়, কিংবা কালবৈশাখীর বৈনাশিক আবাহনে তার আড়ালে থাকার উল্লাস আমাদের মুগ্ধ করে, ভীত করে। তার রুদ্ররূপ আমাদের বিস্মিত ও অভিভূত রাখে, বৈশাখ আমাদের দেহ-প্রাণ-মনের সঞ্জীবনী শক্তির উৎস। বৈশাখ আমাদের অস্তিত্বের-সত্তার প্রতিম প্রতীক ও প্রতিভূ।

বৈশাখের প্রতপ্ত-প্রদীপ্ত প্রবল রূপের মধ্যে রয়েছে স্নিগ্ধ ও রুদ্র রূপের, আশার, হতাশার, সৃষ্টির ও বিনাশের, ঝড়ের ও খরার, মাধুরী ও মেলার, প্রীতির ও প্রতিহিংসার প্রতীকী নিদর্শন। যারা মনে প্রাণে বাঙালী—গ্রামীণ বাঙালী, তারা বৈশাখে নববর্ষের অবির্ভাব অনুভব করে দেহ-প্রাণ-মনের গভীরে। কিন্তু একালের শিক্ষিত শহুরে লোকেরা আজো জানুয়ারিতেই নববর্ষের আবির্ভাব বলে জানে ও মানে। তবু আমাদের একালের বাঙালীসত্তা অঙ্গীকারের ও অনুভবের প্রতীকরূপে, বাহনরূপে পয়লা বৈশাখ আজকাল আমাদের দেহে-প্রাণে-মনে-শহরেও সাড়া জাগায়। আমরা পয়লা বৈশাখে হালখাতা-নিরপেক্ষভাবে উৎসবমুখর হই। পয়লা বৈশাখ এখন আমাদের জাতীয় উৎসব-পার্বণের দিন। এ এখন আমাদের বাঙালীসত্তার প্রকাশ-বিকাশের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আজ রবীন্দ্রনাথের ভাব-ভাষায় উচ্চারণ করতে ইচ্ছে হচ্ছে :

আমরা দাঁড়াব উঠি, আমরা ছুটিয়া বাহিরিব,
অর্পিব পরান॥
চাব না পশ্চাতে মোরা, মানিব না বন্ধন ক্রন্দন
হেরিব না দিক্—
গণিব না দিনক্ষণ, করিব না বিতর্ক বিচার
উদ্দাম পথিক।
মুহূর্তে করিব পান মৃত্যুর ফেনিল উন্মত্ততা
উপকণ্ঠ ভরি—
খিন্ন শীর্ণ জীবনের শতলক্ষ ধিক্কার লাঞ্ছনা
উৎসর্জন করি॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ শতকে
আমাদের জীবনধারার রূপরেখা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার দুর্দিনের সহায়
সুপ্রীমকোর্টের অ্যাডভোকেট ভাষাসৈনিক জনাব গাজীউল হক
প্রীতিনিলয়েষু

শোষিত গণমানবের মুক্তিসংগ্রামী জনাব আবদুল মান্নান
প্রীতিভাজনেষু

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ শতকে আমাদের জীবনধারার রূপরেখা

ক. সংস্কৃতি

সংস্কৃতি কি তা স্বরূপে বোঝা-বোঝানোর চেষ্টা হয়েছে নানা ভাষায়। কিন্তু শব্দের অর্থবহ সুবিন্যাসে সংস্কৃতিকে বাক্যে সর্বজনগ্রাহ্য করে সংজ্ঞাবদ্ধ করা আজ অবধি সম্ভব হয়নি। তাই য়ুরোপেই কেবল একশ ছাব্বিশোর্ধ্ব সংজ্ঞা চালু রয়েছে। কিন্তু কোনটাই সর্বজনগ্রাহ্য হয়নি। কাজেই আমি পঙ্গুর গিরি লঙ্ঘনের চেষ্টা করব না। তবে শিক্ষিত আমজনতাকে একটা আবছা ধারণা দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি। অতি সরল ভাষায় ও ভঙ্গিতে সংজ্ঞা নয়, সংজ্ঞার্থে বয়ান দেয়ার প্রয়াসে বলা যায় : প্রকৃতিকে দাস, বশ ও প্রকৃতির সঙ্গে আপোস করে প্রাণীর প্রজাতি মানব রোদ-বৃষ্টি-শৈত্য থেকে আত্মরক্ষার জন্যে, মানসিক ও ব্যবহারিক জীবন নিরাপদ ও উন্নত, বিকশিত ও বিচিত্র করার জন্যে ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে যা কিছু করে, তাকেই আমরা সংস্কৃতি বলতে পারি নৃবিজ্ঞানীর অনুসরণে। এ তাৎপর্যে মানুষের সব চিন্তা-চেতনা এবং বাহ্য কাজ ও আচরণ মাত্রই সংস্কৃতি পরিচর্যারই অংশ, কেবল নাচ-গান-বাজনা-আবৃত্তি-অভিনয় নয়।

তবে যেহেতু সেকালে যানবাহনের অভাবে মানুষ বিচ্ছিন্নতার ও অপরিচয়ের দরুন পৃথিবীময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে এক গোত্র অপর গোত্রের অজ্ঞাতভাবে স্বনির্ভর গৌত্রিক জীবনই যাপন করত, সেহেতু জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তির উপযোগচেতনার, উচ্চাশার, জিজ্ঞাসার, উদ্যম-উদ্যোগ-প্রয়োজনচেতনার ও পরিবেশের আর উন্নততর গোত্রের আনুকূল্যের অভাবে আজো পৃথিবীর বহু বহু আরণ্য, পার্বত্য ও দ্বৈপায়ণ সংস্কৃতি মনীষীর, উদ্ভাবকের ও আবিষ্কারকের অভাবে আদিম স্তরে রয়ে গেছে। এ কারণেই গোত্রে গোত্রে, দেশে দেশে, অঞ্চলে অঞ্চলে, শাস্ত্রিক বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণানিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক জীবনের গুণে-মানে-মাপে-মাত্রায় ঘটেছে বৈষম্যের ও বৈচিত্র্যের পার্থক্য। আবার বিদ্যা-বিত্ত, জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি, মন-মগজ-মনন, নৈতিকচেতনা-বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা প্রভৃতির পার্থক্য ও বৈষম্যজাত অর্থাৎ স্বল্পতার ও বহুলতার দরুন ব্যক্তিতে ব্যক্তিতেও সংস্কৃতির গুণে-মানে-মাপে-মাত্রায় পার্থক্য ঘটে। জ্ঞানে-বিজ্ঞানে-দর্শনে-চেতনায় উঁচুস্তরের মানুষের সমাজে তাই বিশ্বাস-সংস্কারের বন্ধনযুক্ত গোঁড়া রক্ষণশীল শাস্ত্রিক বিধি-নিষেধলগ্ন রোবোট-প্রায় অর্থোডক্স লোকের সংখ্যাও দুনিয়ার সব সমাজেই অধিক সংখ্যায় মেলে। এসব লোক মগজ প্রয়োগ করে না— কেবল মুনাজাত-নির্ভর জীবন যাপন করে। আর বন্ধনমুক্ত যুক্তিনিষ্ঠ বিবেকী ও উপযোগচেতনাঋদ্ধ মানুষ যে-কোন কালে ও স্থানে, সমাজে ও সম্প্রদায়ে বিরলতায় দুর্লক্ষ্য ও দুর্লভ। মুক্তবুদ্ধির যুক্তিবাদী ব্যক্তিও সাহসের ও শক্তির অভাবে স্বচিন্তা-চেতনার, নতুন অনুভব-উপলব্ধির অভিব্যক্তি দেন না, পাছে নিন্দিত, লাঞ্ছিত, বিতাড়িত ও নিহত হতে হয় এ ভয়ে। তাই সংস্কৃতি-সভ্যতার যে-গতিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিকাশ-বিস্তার পাওয়া প্রত্যাশিত ছিল, তা পায়নি। সংস্কৃতি ও সভ্যতা যতটা আবর্তিত হয়, ততটা বিবর্তন-পরিবর্তন পেত না সেকালে। একালে তৃতীয় বিশ্বে নতুন চিন্তা-চেতনার প্রকাশপথে বাধার অচলায়তন রয়েই গেছে। তাই তৃতীয় বিশ্ব জীবন-জীবিকার সর্বক্ষেত্রে মানসিক ও ব্যবহারিক জীবনে অনুকরণে অনুসরণে গতানুগতিক নীতি-নিয়মে, রীতি-রেওয়াজে, প্রথা-পদ্ধতিতে অভ্যস্ত জীবনই যাপন করতে থাকে। কেবল ধন-মান-যশ-খ্যাতি-ক্ষমতা-দর্পদাপট-প্রভাব-প্রতিপত্তিতে প্রবল স্বল্পসংখ্যক কিছু লোকই সংস্কারমুক্ত বৈশ্বিক-আন্তর্জাতিক মানের জীবন যাপন করে। আমরা মুক্তমনের গ্রহণশীল, উদার, সহিষ্ণু, মানবিক গুণে ঋদ্ধ মানবতার ও মানববাদের সমর্থক যুক্তিবাদী বিবেকবান ব্যক্তিকেই আদর্শ সংস্কৃতিমান লোক বলেই স্বীকার করি। সংস্কৃতিমান মাত্রই সংযমে, সহিষ্ণুতায়, সৌজন্যে ও ন্যায্যতায় গুরুত্ব দিয়ে থাকে। সংস্কৃতিমান জ্ঞাতসারে কোন অন্যায় করে না বলেই এ মানুষই যে-কোন মানুষের অভয়শরণ। নইলে দুনিয়ায় প্রাণীর মানবপ্রজাতির মতো হিংস্র ও প্রতিহিংসাপরায়ণ জীব জগতে নেই। সচেতনভাবে অনুশীলন না করলে প্রাকৃতজন কাড়ায়-মারায়-হানায়-হিংস্রতায়-নিষ্ঠুরতায় অতুল্যই থেকে যায়।

সহজাত বৃত্তি-প্রবৃত্তিকে সচেতনভাবে সংযত না করলে, ইন্দ্রিয়জ ষড়রিপুকে নিয়ন্ত্রণের শক্তি অর্জন না করলে মানুষ সংস্কৃতিমান হতেই পারে না। আজো তাই আফ্রিকায় গৌত্রিক রেষারেষি-কাড়াকাড়ি-মারামারি-হানাহানি অপ্রতিরোধ্য হয়ে রয়েছে। এবং ভিন্ন আকারে সভ্যতম সমাজেও শাস্ত্রিক পার্থক্য, বার্ণিক বৈষম্য, ভাষিক-নৈবাসিক-বৃত্তিগত শ্রেণীক ব্যবধান ও বৈচিত্র্য আজো দ্বেষণার, দ্বন্দ্বের, সংঘর্ষের ও সংঘাতের কারণ হয়ে রয়েছে পৃথিবীর প্রায় সব রাষ্ট্রেই। আমাদের দেশেও তাই এমুহূর্তেও সাঁওতাল, গারো, ত্রিপুরা, চাকমা, হাজং, মার্মা, হিন্দু, খ্রীস্টান, বৌদ্ধ শাস্ত্রিক পার্থক্যের কারণে সংখ্যাগুরুর শাসনে স্বাধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠ হতে পারেনি, সুবিচার পায় না শাসক-প্রশাসকের কাছে আজো।

প্রত্যাশিতমাত্রায় সংস্কৃতিমান হতে পারেনি বলেই আমরা মানুষকে জাত জন্ম বর্ণ ধর্ম ভাষা নিবাস যোগ্যতা নির্বিশেষে কেবল 'মানুষ' রূপে গ্রহণ করতে পারি না। ফলে বুনো বর্বর যুগে প্রাণীসুলভ দ্বেষ-দ্বন্দ্বের লেশ ও রেশ সভ্য-ভব্য হিসেবে পরিচিত আমাদের মধ্যেও রয়ে গেছে। তাছাড়া অজ্ঞতা-অনক্ষরতাদুষ্ট আমাদের রাষ্ট্রে প্রাকৃতজনেরা অনুকরণে অনুসরণে বাহ্যত ব্যবহারিক-আচারিক সামাজিক জীবনে ভব্যতা অর্জন করলেও মানসিক জীবনতো তাদের বন্ধ্যা ও বদ্ধই রয়ে গেছে।

প্রাকৃতজনদের আমরা তো অন্তরে অবজ্ঞা করি এবং প্রকাশ্যে লোক [ফোক] বলে আখ্যাত করি। লোকলোরের ও লোকসংস্কৃতি-সাহিত্যের আলোচনায়-গবেষণায় গুরুত্ব দিই। আতএব, অজ্ঞ অনক্ষর নিঃস্ব নিরন্ন দুস্থ দরিদ্র লোকের বাহুল্যে আমাদের সংস্কৃতি আজো মন-মগজ-মনন-মনীষার সম্যক পরিচর্যায় বাঞ্ছিত গুণের মানের মাপের ও মাত্রার হয়ে উঠতে পারেনি। আদি ও আদিমস্তরের লেশ ও রেশ যেমন মেলে, তেমনি অনুকৃত, অনুসৃত, আত্তীকৃত, আত্মীকৃত, সাঙ্গীকৃত উঁচুমানের, মাপের ও মাত্রার মনন-মনীষার অভিব্যক্তিও সুলভ হয়ে উঠেছে। আমাদের দৈশিক সাংস্কৃতিক জীবন তাই একাধারে ও যুগপৎ লজ্জার ও গৌরবের। লজ্জার, কারণ আমাদের অধিকাংশ জনজাতি আজো আদি ও আদিম বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা-আচার-আচরণ পরিহার করতে, নতুন ও সমকালীন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংস্কৃতি সভ্যতা অর্জন করতে পারেনি। গৌরবের, কারণ প্রতীচ্যবিদ্যায় আমাদের রুচি-জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-বিবেক-বিবেচনা-সংস্কৃতি-আবিষ্কার-উদ্ভাবন সৃষ্টিমুখী হয়েছে। তবু আমরা বাঙলাদেশীরা প্রায় দু'হাজার বছরের ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ পেশাজীবীর এবং দেশজ নিম্নবর্ণের নিম্নবর্গের নিম্নবৃত্তির ও নিম্নবিত্তের বৌদ্ধ-হিন্দুজ মুসলিমের বংশধর এবং হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীস্টানরাও নির্জিত বলে, বিদ্যায়-বিত্তে-বৃত্তিতে ভুঁইফোঁড় বলে আমাদের মধ্যে প্রকৃত সংস্কৃতিমানের আত্মসম্মানবোধ, সততা, যুক্তিবাদিতা, নৈতিক-আদর্শিক চেতনা, বিবেকানুগত্য আজো দুর্লক্ষ্য।

সংস্কৃতিও জীবনের অন্যান্য চাহিদার মতো নিত্য অনুশীলনে ও বর্জনে-অর্জনে পরিচর্যার অপেক্ষা রাখে। উপযোগরিক্ত হলে বর্জন এবং নতুন চাহিদা পূরণের জন্যে নতুন কিছু আবিষ্কার-উদ্ভাবন-সৃষ্টি বা গ্রহণ-বরণ করে সমকালীনতা বজায় রাখতে হয়। সংস্কৃতি বদ্ধকূপের জিয়েল মাছ নয়, বহতা নদীর স্রোত। প্রবহমানতা না থাকলে সংস্কৃতি নিতান্ত কাঁটাল লৌহকঠিন খাঁচার মতো প্রগতির বাধা আর বন্ধ্যা ও অবক্ষয়গ্রস্ত আচারমাত্রে পর্যবসিত হয়। তরু-লতার নব নব কিশলয়ের মতো মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তির মনে-মননে নিত্য নতুন নতুন চেতনার-চিন্তার উন্মেষ ও বিকাশ এবং বৃক্ষের পুরোনো পাতার মতো উপযোগরিক্ত বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা-আচার-আচরণের বর্জনপ্রবণতা আর কল্যাণকর নতুন নতুন নীতিনিয়মের ও আচারের অর্জনই হচ্ছে সংস্কৃতির প্রবহমানতার ও প্রগতি-প্রাগ্রসরতার লক্ষণ।

আজকাল সংস্কৃতিকে রাজনীতিক মত-পথ-আদর্শ সম্পৃক্ত বলে স্বীকার করা হয়। কাজেই রাজনীতিক অঙ্গনে রাজনীতিক কর্মসূচীর প্রত্যক্ষ বা সহযোগী কিংবা মনে-মর্মে প্রেরণা-প্রবর্তনার উৎস হিসেবে সংস্কৃতিটাকে দলীয় প্রয়োজনে আবশ্যিক ও জরুরী বলে মনে করা হয়। কোন বিশেষ আদর্শের অনুসরণে সমাজপরিবর্তন বা সমাজকল্যাণ করার রাজনীতি অনুগ জনমত গড়ার, তাদের মনে প্রেরণা-প্রণোদনা ও প্রবর্তনা দানের লক্ষ্যে সুনির্বাচিত বিষয়ে, বক্তব্যে ও শিল্পসম্মত সংবেদী ভাব-ভাষা-ভঙ্গি ও রসঋদ্ধ শিল্পে-সাহিত্যে-নাচে-গানে-বাজনায়-অভিনয়ে-চিত্রে-সভায়-সেমিনারের সংস্কৃতিচর্চার প্রয়োজন ও গুরুত্ব আর প্রভাব আজকাল সব রাজনীতিক চিন্তাশীল ব্যক্তিই স্বীকার করেন। ফলে সক্রিয় রাজনীতিক কর্ম ও তার অনুগত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি একটা অপরটার পরিপূরক ও পরিবর্ধকরূপে বিবেচিত হচ্ছে। পরিবেশ অনুকূল করার জন্যে, জনসমর্থন আদায়ের জন্যে, জনগণকে প্রবুদ্ধ ও উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে সংস্কৃতিচর্চার প্রয়োজন অবশ্য স্বীকার্য। উল্লেখ্য যে, এ 'সংস্কৃতি' একটা সীমিত রূপের ও বাক-বাদ্য-নৃত্য-অভিনয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। এক কথায় এ সংস্কৃতি সম্পৃক্ত বটে, কিন্তু এ নাচ-গান-বাজনা-অভিনয়ই যথার্থ ও ব্যাপক অর্থের পূর্ণাঙ্গ সংস্কৃতি নয়— সংস্কৃতির প্রত্যঙ্গমাত্র। এ তাৎপর্যে সংস্কৃতিচর্চাকে, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে, উদ্যোগ-আয়োজনকে তুলনা করা চলে শেষ রাত্রের মোরগের 'বাঙের' সঙ্গে কিংবা বুনো পাখির কিচির-মিচির ধ্বনির সঙ্গে— যা ঘুমন্ত মানুষকে জাগিয়ে দেয়, তার কাজের সময় সম্বন্ধে চেতনা দান করে, স্মরণ করিয়ে দেয় সকালে করণীয় বিষয়। অতএব এ সীমিত বা যোগরূঢ় সংস্কৃতিচর্চাও রাজনীতি প্রতিম, রাজনীতি প্রতীক ও রাজনীতি প্রতিভূ। এখানে এ-ও উল্লেখ্য যে সংস্কৃতির আচারিক ও দার্শনিক উৎস হচ্ছে শাস্ত্র। সে-জন্যে বিভিন্ন শাস্ত্রিক মতবাদীর শাস্ত্রাচার সম্পৃক্ত সংস্কৃতি বিভিন্ন। কিন্তু ভাষায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেমন আঞ্চলিক পার্থক্য থাকে, জীবনযাত্রায় যেমন পরিবেষ্টনীগত কারণে বিভিন্নতা ঘটলেও লেখ্য ভাষার বন্ধনে অভিন্ন জাতিসত্তা গড়ে ওঠে, আর অভিন্ন রাষ্ট্রিক কারণেও যেমন অভিন্ন স্বার্থে একক জাতিচেতনা জাগে, আমাদের রাষ্ট্রে তেমনি শাস্ত্রিক আচরণগত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে বটে, তবে তা সত্ত্বেও আমাদের ভাষিক ও নৈবাসিক ঐক্যগত একটা অভিন্ন জাতিসত্তাও রয়েছে। একে পারিবারিক, আঞ্চলিক পার্থক্যের মতো তুচ্ছ ও স্বাভাবিক বলে মানলে অভিন্ন জাতীয়তাবোধে কোন বাধা থাকে না।

খ. সময়

অরূপ অশেষ কাল প্রবাহকে আমরা আর্তব আবর্তনের মাপে ধারণাগত করে অনুভব-উপলব্ধিতে কালকে সীমিত করে জীবনের পরিচর্যা করি। জীবন কালগত। 'কাল ঘসতি ভূতানি' কাল বস্তুজগৎকে বিনাশ করে। আমাদের পৃথিবীর প্রাণী-উদ্ভিদ সব কিছুই কালই সৃষ্টি ও বিনাশ করে। কাল-পরিসরে জন্ম-জীবন-মৃত্যু ঘটে, ঘটে সব কিছুর উন্মেষ, বিকাশ ও বিনাশ। এ কালপ্রবাহের আবর্তিত রূপের মাপে আমরা জীবনের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ নিয়ন্ত্রিত করি। আমাদের সংস্কৃতি-সভ্যতা, আবিষ্কার-উদ্ভাবন-নির্মাণ-সৃষ্টি প্রভৃতি সব কিছু প্রাজন্মক্রমিক মনুষ্য চিন্তার-চেতনার-মননের-মনীষার অবদানে বিস্তৃতি, বিকাশ ও উৎকর্ষ লাভ করছে। এ তাৎপর্যে মানুষের সব কৃতি-কীর্তিই সময়প্রবাহের দান। আমরা চারদিকে যা কিছু বনজ, খনিজ, কৃষিজ, উৎপাদিত, নির্মিত, সৃষ্ট পণ্যের ও কৌষষ্টিকলার যে বিকাশ-বিস্তার-উৎকর্ষ দেখছি, সে-সব কিছুই সময়ের পরিসরে মনুষ্যশ্রমের ফল। মন-মগজ-মনন-মনীষার ফুল-ফল-ফসলই শ্রমযোগে বাস্তবে রূপায়িত হয়। কাজেই নতুন চেতনা, নতুন চিন্তা, নতুন প্রয়োজন বোধ, নতুন রুচি, নতুন জিজ্ঞাসা এবং নতুন গবেষণা ও পরিকল্পনাই সময়ের পরিসরে শ্রম প্রয়োগে বাস্তবরূপ ধারণা করে। চিন্তা-চেতনার, রুচির, সৌন্দর্যবুদ্ধির সূক্ষ্ম অনুভবের ও উপলব্ধির, জিজ্ঞাসার প্রসূন আর উপযোগচেতনাই হচ্ছে সৃষ্টির প্রেরণা, শ্রম স্বীকারের আগ্রহ, উদ্যম, ধৈর্য ও অধ্যবসায় যোগায়। একালে বিজ্ঞানচর্চা মানুষের বুদ্ধি ও সংস্কৃতি-সভ্যতা দ্রুত এগিয়ে নিয়েছে, নিচ্ছে। আগের কালে মানুষ কোন ক্ষেত্রেই দ্রুত এগুতে পারেনি। কেবল ধনবলে জনবল যোগাড় করে উচ্চাশী নরহন্তা দস্যুরা রাজ্যের পর রাজ্য দখল করে পার্থিব জীবন জোরে-জুলুমে ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগ করেছে মাত্র। আর মন-মগজ-মনন-মনীষা প্রয়োগে অন্য একশ্রেণীর মানুষ বিস্ময়-কল্পনা-ভয়-ভক্তি, তথ্যে ও সত্যে আস্থা রেখে যৌক্তিক বৌদ্ধিক সিদ্ধান্তকে শাস্ত্র ও দর্শন বলে লোকগ্রাহ্য করে সমাজ-সংস্কৃতি-সভ্যতা গড়ে তুলেছেন, যা ইহ-পরলোকে প্রসৃত জীবন সম্বন্ধে জ্ঞান রূপে গৃহীত হয়েছে। যদিও প্রমাণসম্ভব বা প্রমাণসাধ্য না হলে কিছুই 'জ্ঞান' নামে অভিহিত হতে পারে না। বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণামাত্র হয়েই থাকে। জ্ঞানমাত্রই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং বিজ্ঞানপ্রসূন যা পরীক্ষণে, সমীক্ষণে, পর্যবেক্ষণে তথ্য রূপে পাওয়া যায়।

আমরা নিম্নবর্গের মানুষেরা সময়কে মন-মগজ-মনন-মনীষা প্রয়োগে আবিষ্কারের উদ্ভাবনের নির্মাণের সৃষ্টির কাজে লাগানোর অধিকার পাইনি বিগত তিন হাজার বছর ধরে। তাই সংস্কৃতি-সভ্যতা বিকাশে মনীষার কোন প্রসাদে-অবদানে আমাদের কোন অধিকার ছিল না। তবু বিগত পাঁচশ' বছর ধরে আমাদের দেশজ মুসলিম সমাজ ব্রাহ্মণ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পীড়ন-শাসনমুক্ত ছিল বলে তারা সাহিত্য সৃষ্টি করেছে, যেমন করেছে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধরা চর্যাগীতি, শূন্যপূরাণ, ধর্মমঙ্গল, নাথসাহিত্য, পালগীতিকা, বাউল ও বৈষ্ণব সহজিয়া সাহিত্য। অনধিকারের কারণে আমাদের আড়াই হাজার বছর অসৃষ্টিতে বন্ধ্যাবস্থায় অপচিত হয়েছে। যেমন মগজ-মনন-মনীষার রয়েছে বিস্ময়কর অশেষ-অসামান্য-অনন্য শক্তি, সে-শক্তির সন্ধান পায়নি আমাদের পূর্ব প্রজন্মের নির্জিত শূদ্র ব্রাহ্মণ্যবাদী বর্ণহিন্দুর দাস-সেবক ছিল বলে। নীহার রঞ্জন রায় বর্ণিত 'বাঙালি সংস্কৃতি' আসলে বহিরাগত শাসকগোষ্ঠীর কৃতি-কীর্তিই। যথার্থ আদিবাসী বাঙালীরা তো শূদ্ররূপে বঞ্চিত ও অবজ্ঞাত এবং মানুষ রূপে অস্বীকৃতই ছিল। লোকশ্রুতির আদিশূর এবং রাজা বল্লাল সেনইতো বৌদ্ধবিলুপ্তির ফলে জনগণকে ব্রাহ্মণ্য বর্ণে বিন্যস্ত করেছেন। সম্ভবত বিন্যাসের নীতি বা মাপকাঠি ছিল অর্থ-সম্পদ আর বুদ্ধি ও উচ্চাশা প্রভৃতির তারতম্য।

এ বর্ণবিন্যাস নিতান্ত কৃত্রিম। নীহার রঞ্জন রায় এ বর্ণসঙ্কর বাঙালীর মধ্যে আদি আর্যভাষীর রক্তের অভাবের কথা স্বীকার করেছেন, বলেছেন বাঙালীর মধ্যে আর্য রক্ত নেই। কাজেই দেশজ আদি জনগণ 'বর্হিগ্রামাৎ প্রতিশ্রয়' হয়ে অর্থাৎ স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য অন্ত্যজ কিংবা সৎশূদ্র হয়ে হাড়ি-ডোম-মুচি-মেথররূপে চাঁড়াল-চামার, কামার-কুমার, কৈবর্ত-নিকেরী, মুলঙ্গী প্রভৃতি ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ বৃত্তিজীবী ছত্রিশশ্রেণীর বৃত্তি থেকে চিরকাল অন্নাভাবে অসাচ্ছল্যে ভুগে ভুগে দাসের, ক্রীতদাসের, ভূমিদাসের ও সেবাদাসের লাঞ্ছিত জীবন যাপন করেছে। তাই এদের নিজেদের কোন সংস্কৃতি-সভ্যতার, সৃষ্টির, উদ্ভাবনের ও আবিষ্কারের উজ্জ্বল ও পাথুরে প্রমাণ নেই। বাঙালার ও বাঙালীর বলে আমরা সাহিত্যে-তাও ধর্মসাহিত্যে বিশুদ্ধ কোন সাহিত্যে নয়-ব্যতীত আর কোথাও কোন কৃতি-কীর্তির নিদর্শন পাইনে, যদিও দেশজ লোকের শ্রমে ও সময় ব্যয়ে গড়ে উঠেছে বহিরাগত শাহ-সামন্ত শাসক-প্রশাসকদের অর্থে-আদেশে-নির্দেশে-প্রয়োজনেই তৈরি ও চালু হয়েছে সংস্কৃতি—সভ্যতার সব নিদর্শন। ভোজন বিলাসী ধনীঘরের পাচক-পাচিকারা প্রভুর প্রয়োজনে সর্বপ্রকার রন্ধনশিল্পে দক্ষ বা নিপুণ হয়ে ওঠে বটে, কিন্তু এ রন্ধন-সংস্কৃতি কি নিঃস্ব নিরন্ন অজ্ঞ-অনক্ষর পাচক-পাচিকার? তাজমহলে সৌন্দর্যবুদ্ধির এ রূপায়ণ সংস্কৃতি কি শাহজাহানের, স্থপতির, নাকি গৃহনির্মাতা শ্রমিকদের? অতএব সময়ের মাপে আমাদের বাঙালী জীবনের তিন হাজার বছর অপচিত হয়েছে। আমাদের আহারে-নিদ্রায়-মৈথুনে কেটেছে জীবন, শ্রমবিক্রয়ে কেটেছে সময়। তাছাড়া ব্যবহারিক সামগ্রীতে ও স্থাপত্যে ভাস্কর্যে সংস্কৃতির যে প্রাত্যহিক অভিব্যক্তি, বিকাশ ও উৎকর্ষ, তার জন্যে অর্থবিত্ত দরকার। ফলে দরিদ্রের স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা কখনো বাস্তবে রূপ পায় না। দরিদ্র সংস্কৃতিতেও দীন থাকে মানসিক নিশ্চিন্তির ও আর্থিক সচ্ছলতার অভাবে।

গ. অর্থ- সম্পদ

ভারতবর্ষে বর্ণে বিন্যস্ত সমাজে অব্রাহ্মণ-চণ্ড সবাই ছিল অন্তত তিন হাজার বছর ধরে প্রজন্মক্রমে ঘরানা বৃত্তিজীবী। পেশান্তরে ছিল বাধা। ফলে ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ বৃত্তিজীবীরা বিগত তিন হাজার বছর ধরে বিশ শতকের পূর্বাবধি আর্থিক সাচ্ছল্য-স্বাচ্ছন্দ্য থেকে বঞ্চিত ছিল। হাড়ি-ডোম-চামার-চাঁড়াল-বগ্‌দী-কামার-কুমার-নাপিত-ধোপা-মুচি-মেথর-দিনমজুর -ক্ষেতমজুর, কিংবা তাঁতী-কাহার-কাগজী-মুলঙ্গী, সবাই ঘরানা পেশায় সামান্য আয়ে কোন প্রকারে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ বাঁচিয়ে রাখত কিছুকাল, রোগে ধরলে মরত অকালে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিকিৎসার ও ভাতের অভাবে। এদের ধনী হওয়ার কোন উপায় ছিল না। সৎশূদ্র কায়স্থ থেকে বৈদ্য-বৈশ্য-ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণরা অবশ্য যোগ্যতা, বুদ্ধিমত্তা কিংবা ধূর্ততা বা উদ্যম-উদ্যোগ প্রয়োগে ধনে মানে খ্যাতিতে ক্ষমতায় দর্পে দাপটে প্রভাবে প্রতিপত্তিতে সেকালেও সেই শাহ-সামন্ত যুগেও সমাজে স্ব ও সুপ্রতিষ্ঠ হতে পারত। কালকেতু কিস্‌সার নায়ক হলেও কৈবর্ত দিব্যক-রুদ্রক-ভীম দ্রোহী ও স্বাধীন রাজাই ছিলেন। এ অবশ্য নিয়মের মধ্যে পড়ে না ব্যতিক্রম মাত্র। তবে বেণেরা-বৈশ্যরা-স্বর্ণকারেরা সহজেই ধনী হত—চাঁদসদাগর ও ধনপতিসদাগর কাহিনী বাস্তবে স্বাভাবিক ও সম্ভব অবস্থার ও অবস্থানের কল্প চিত্রমাত্র। বৌদ্ধসাহিত্য চর্যাপদে আমরা অন্ত্যজশ্রেণীর বর্হিগ্রামবাসীর দারিদ্র্যের আলেখ্যই পাই। শেখ শুভোদয়ায় দেখি দরিদ্র নারীরা তালপাতায় তৈরি অলঙ্কার পরত। শাহ-সামন্ত তো ছিল করগণ্য। বর্ণহিন্দুর কিছু লোক জমিজমায় সচ্ছল গৃহস্থ ছিল বটে। তবে সেকালে জীবনবোধ ও রুচি ছিল স্থূল, ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগস্পৃহাও ছিল স্থূল। আহার-নিদ্রা-মৈথুন নির্বিঘ্ন-নিরুপদ্রব-নিরাপদ হলেই এ ধরনের অজ্ঞ-অনক্ষর তথা সাক্ষর-শিক্ষিত বিরল সমাজে মানুষ নিজেদের সুখী মনে করত। নিয়তিবাদী, পূর্বজন্মের কর্মফল আস্থাবান মানুষ এতেই তৃপ্ত, তুষ্ট ও হৃষ্ট থাকত। তাছাড়া ব্রাহ্মণ্যবাদী আর্যভাষীরা মূলত প্রাজস্মক্রমিক যাযাবর গোত্রের বংশধর ছিল বলেই স্থায়ী গৃহবাসী হয়েও ভোগ্য ও বিলাস সামগ্রী আবিষ্কারে উদ্ভাবনে নির্মাণে সৃষ্টিতে অসমর্থ ছিল বলেই অনাড়ম্বর নিত্যকার জীবনে আত্মা-পরমাত্মা, জগৎ-জীবন সম্বন্ধে তত্ত্ব চিন্তাকেই গুরুত্ব দিত সাদামাঠা জীবনে মহৎ দার্শনিক চিন্তাকেই আত্মতৃপ্তির ও সার্থকজীবনের পুঁজি পাথেয় করে। উপনিষদ এদেরই সৃষ্টি। এ বৈরাগ্য অবশ্য অস্ট্রিক দ্রাবিড় ভেড্ডিড প্রভাবেরই ফল, কেননা আর্যভাষীরা গোড়ায় ছিল ভোগবাদী, ঋগ্বেদ এ সাক্ষ্যই বহন করে। গোত্রপতি রাজা ইন্দ্রের কাছে তারা লুটে-হরণে নারী ও পশু সম্পদ প্রাপ্তির আবেদন জানাচ্ছে, আশীর্বাদও করছে সন্তানে ও পশুসম্পদে ঋদ্ধ হবার জন্যে। তাদের চরম ও পরম প্রাপ্তির বিষয় ছিল অন্ন, প্রাণ, মন, জ্ঞান ও আনন্দ।

যাজ্ঞবল্ক্য, মনু, কৌটিল্য প্রমুখ স্মার্তরা অন্ত্যজ ছুৎ-অচ্ছুৎ শূদ্রের সম্বন্ধে যেসব অমানবিক পাঁতি দিয়ে গেছেন, তা এক কথায় শূদ্রকে মানুষ বলে অস্বীকার করার নামান্তর মাত্র। ব্রাহ্মণ হচ্ছে শূদ্রসেব্য। তার পা অন্যদের মাথার চেয়েও শ্রেষ্ঠ। ঐশ্বরিক নির্দেশের দোহাই যোগে মানুষকে মানুষ বলে অস্বীকৃতির নজির পৃথিবীর আর কোথাও নেই।

ব্রিটিশেরাই হিন্দুর বর্ণে বিন্যস্ত সমাজে ব্রাহ্মণ্য জুলুম ও নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব স্বীকার করেনি। শিক্ষা পেলেই যোগ্য বিবেচিত হলেই জাত জন্ম বর্ণ ধর্ম ভাষা নিবাস নির্বিশেষে উনিশ শতকের শেষপাদ থেকে বিশ শতকের প্রথমার্ধ অবধি যে কাউকে উঁচুপদে বসিয়েছে ব্রাহ্মণের মনিব বা 'বস' করে। বর্ণে বিন্যস্ত সমাজে উচ্চ বর্ণের লোকেরা নিম্নবর্ণের, নিম্নবর্গের ও নিম্নবৃত্তির লোকদের সেব্য ছিল বলেই ইসলামি সাম্য বর্ণহিন্দুদের কায়েমী স্বার্থ-সম্মান রক্ষার ও অর্থ-সম্পদ অর্জনের পথে প্রতিযোগিতার ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার বাধা সৃষ্টি করবে বলেই বর্ণহিন্দুরা ব্যক্তিগতভাবে দায়ে না ঠেকলে ইসলামে দীক্ষিত হয়নি। তাই মূলতানের পূর্বে-দক্ষিণে বর্ণহিন্দুর মধ্যে ইসলামের প্রসার ঘটেনি। মূলতান অবধি অঞ্চল ইরানীর, শকের, হুনের, কুশানের, গ্রীকের অধীনে ছিল বলে সেসব অঞ্চলে ব্রাহ্মণ্য শাসনের ও শাস্ত্রের প্রভাব শিথিল হয়ে পড়েছিল সমাজে, তাই ইসলাম মদিনা থেকে সুলতান অবধি অপ্রতিহত গতিতে প্রসার লাভ করেছিল। বাধা এল দাক্ষিণাত্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্রাহ্মণ শঙ্কর, রামানুজ, নিম্বার্ক, মধ্ব, বল্লভ ও চৈতন্য থেকে, উত্তর ভারতে এল অন্ত্যজ কবীর, দাদু, রামানন্দ, রামদাস প্রমুখ অনেক অন্ত্যজ শ্রেণীর সন্ত থেকে। ওঁরা সবাই মূলত দেব-দ্বিজ-বেদ বিরোধী মতই প্রচার করেছেন। ব্রাহ্মণরা অমূর্ত, অদ্বৈত, দ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, বিশিষ্ট দ্বৈতাদ্বৈত, অচিন্ত্য দ্বৈতাদ্বৈতবাদ প্রচার করেছেন, আর উত্তর ভারতের সন্তরা প্রচার করেছেন 'ভক্তিবাদ'—যাতে জাত-জন্ম-বর্ণভেদ ও দেব-দ্বিজ-বেদ-এর কর্তৃত্ব অস্বীকৃত হয়েছে। বাঙলাদেশের মুসলমানরাও এই ছুৎ-অচ্ছুৎ অন্ত্যজ শ্রেণীর বৌদ্ধ-হিন্দু থেকে দীক্ষিত। এদের মধ্যে নিঃস্বলোকের সংখ্যাই ছিল বেশি। Robert Orme তাঁর Fragments of Mugal India গ্রন্থে বলেছেন 'Most miserables of the gentoo castes are capable of Changing their religion, অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নওয়াব আবদুল লতিফ, ডক্টর জেমস ওয়াইজ, হার্বার্ট রিজলি, বিভারলি, গেইট, বিবেকানন্দ প্রমুখ বিদ্বানেরা ও আদমসুমারীর বয়ানদাতারা সবাই বলেছেন যে বর্ণহিন্দুর ঘৃণা-অবজ্ঞামুক্তির জন্যেই নিম্নবর্ণের, নিম্নবর্গের ও নিম্নবৃত্তির হিন্দুরা-বৌদ্ধেরা স্বেচ্ছায় ইসলাম বরণ করেছিল। এরা ছিল ঘরানা পেশাজীবী। শিক্ষায় তাদের অধিকার ছিল না, তাই তাদের শিক্ষার ঐতিহ্যও ছিল না আর ঘরানা বৃত্তিজীবী বলেই লেখাপড়ার গরজবোধ তাদের মধ্যে কৃচিৎ কারুর জেগেছে। তাই তাদের মধ্যে মুনশী-মৌলবী-উকিল-শিক্ষক-ইমাম-মুয়াজ্জিন-মোল্লা-কাজী-সিকদার-মজুমদার এমনকি সদর আমিনও হয়েছেন। কিন্তু এর থেকে কোন উচ্চতর পদ সামন্ত-শাহ দরবারে আমীরের পদ ভারতের কোথাও কোন দেশজ মুসলিম পাননি। তাই তুর্কী-মুঘল আমলে নয় কেবল, বিশ শতকের প্রথমপাদ অবধি মুসলিম সমাজে শিক্ষার প্রসার ছিল নিতান্ত মন্থর, সংখ্যায়ও ছিল শিক্ষিতরা স্বল্প। মুর্শিদকুলিখানের আমল থেকে মুসলিম সমাজে কিছু শিকদার, তালুকদার, তরফদার, হাওলাদার, জোতদার হলেও বাঙলাভাষী কোন মুসলমান জমিদার ছিল না। হিন্দুর তুলনায় নগণ্য হলেও যে কয়ঘর মুসলিম জমিদার ছিল বাঙলাভাষী অঞ্চলে, সবাই ছিল উর্দুভাষী।

ঘরানা বৃত্তিজীবীদের দুর্দশা বাড়ল য়ুরোপীয় কোম্পানীগুলো ষোল শতক থেকে এদেশে বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চালু করার ফলে। আমাদের পণ্য বিনিময়-নির্ভর নিস্তরঙ্গ স্থিতিশীল আর্থিক জীবনে এল বিপর্যয়, বৃত্তিজীবীদের আন্তর্জাতিক পণ্যের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠল। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সবাইকে গ্রাস করল দারিদ্র্য।

তাছাড়া আমাদের আমজনতার জীবনের চাহিদা ছিল কেবলই ভাত-কাপড় আর রোদ-বৃষ্টি-শৈত্য নিবারক ঘর নামের আচ্ছাদন। গরীবদের কাছে স্বর্ণমুদ্রা মোহর ছিল দুর্লক্ষ্য, বিশ শতকের গোড়ার দিকেও পাই পয়সা অর্থাৎ এক পয়সার এক চতুর্থাংশ পয়সা চালু ছিল। আধপয়সা চালু ছিল ১৯৩৯ সনের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বাবধি। উনিশ শতকের শেষপাদেও চালু ছিল কড়ি। কড়িতেও কেনা-বেচা সম্ভব ছিল পশু-পাখি-মাছ-তরকারী, তামার-রূপার-সোনার দামও ছিল না বেশি। কিন্তু আমজনতা এতো দরিদ্র ছিল যে সেকালেও সোনা-রূপা-মাছ-মাংস গাধার নাকে ঝুলানো মুলার মতোই ছিল আয়ত্তের বাইরে। সেদিনও ভাতচোর ছিল। ভিখিরী ছিল, ধুতি-লুঙ্গি-শাড়ির অভাব ছিল। দু'তিন বছর অন্তর ঝড়-ঝঞ্ঝা-খরা-বন্যা-মারী স্থানিকভাবে দুর্ভিক্ষের ও গণমৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াত। সেদিনও ক্ষেতমজুর, বর্গাচাষী, প্রান্তিক চাষীরা আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে অন্নাভাবে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাও, পান্তা ভাত, আধপেটা ভাত খেয়ে বাঁচত। আজো গাঁয়ে গাঁয়ে এ সময়ে অন্নাভাব থাকে দরিদ্র গৃহস্থ ঘরে। আর আদিবাসী, উপজাতি, জনজাতি নামে আখ্যাত সাঁওতাল, নাগা, কুকি, খাসিয়া, ত্রিপুরা, গারো, মুন্ডা, চাকমা, মার্মা, কোল, ভীল প্রভৃতিদের মধ্যে অভাব-অনটন তো প্রাজন্মক্রমিক।

ওরাও চক্ষুষ্মান হচ্ছে, শোষকদের বঞ্চকদের চিহ্নিত করতে পারছে। স্বাধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠ হওয়ার দাবি উচ্চারণ করছে। ফলে আমরা অসৎ শূদ্র হিন্দু-মুসলিমরা, আদিবাসী-উপজাতি-জনজাতিরা এবং এখনকার বাঙলাদেশ রাষ্ট্রবাসীরা বিদ্যায়-বিত্তে-বুদ্ধিতে বেসাতে-শাসনে-প্রশাসনে যথার্থ অর্থেই অধিকাংশই ভূঁইফোঁড়। আমরা অধিকাংশই প্রথম প্রজন্মের শিক্ষিত শহুরে চাকুরে ব্যবসায়ী, আমলা-উকিল-ডাক্তার-বেণে-শিক্ষক-সাংবাদিক-প্রকৌশলী-প্রযুক্তিবিদ, আমরা অনভিজ্ঞতায় · অনৈপুণ্যের, অদক্ষতায় অযোগ্যতার দরুন দায়িত্ব-কর্তব্য যেমন সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারিনি, তেমনি ধনে-মনে কাঙাল বলে লাভ-লোভ-স্বার্থচেতনা আমাদের সংযম, সততা, আত্মসম্মানবোধ, বিবেকানুগত্য অনেকাংশে হরণ করেছে। আমরা এসেছিলাম বেড়ার, মাটির দেয়ালের কিংবা টিনের ঘর থেকে। আমাদের স্বাচ্ছন্দ্য-সাচ্ছল্য চেতনা ছিল গ্রামীণ, তা শহুরে রূপ নিল দালানবাসী হওয়ার ফলে। ১৯৪৭ সন থেকে একবার এবং ১৯৭১ সন থেকে আর একবার আমাদের অনেকে আঙুল ফুলে কলাগাছ হওয়ার সুযোগ সুবিধে পেয়ে প্রতাপে-প্রভাবে বেপরওয়া হয়ে শাসনদণ্ড পরিচালনার অধিকারও পেয়েছে। ফলে আমরা যতই দুর্নীতি, আর্থিক অনুন্নতি রাষ্ট্রের বাঞ্ছিত মাত্রায় উন্নয়নে কমতি প্রত্যক্ষ করি না কেন, তবু স্বীকার করতেই হবে স্বাধীনতার প্রসাদও আমরা পেয়েছি অঢেল। ব্রিটিশ শুধু অর্থ আদায় ও স্বদেশে প্রেরণ করতেই উৎসাহী ছিল, সব দফতরও দালান করেনি কখনো। ফলে ব্রিটিশ ভারতে যত দালান ছিল সাতচল্লিশ বছরে কেবল বৃহত্তর ঢাকা শহরেই তার চেয়ে বেশি ইটের ঘর হয়েছে। তিন হাজার বছরের দরিদ্ররা আজ অর্থ-সম্পদের, ব্যবসায়-বাণিজ্যের, শাসনক্ষমতার মালিক ও নিয়ন্তা হয়েছে। এতো অর্থ-সম্পদ ইতোপূর্বে এ শ্রেণীর লোকেরা কখনো কল্পনাও করতে পারেনি— লক্ষ টাকার উপরে স্বপ্ন দেখাও সম্ভব হয়নি চাটাইয়ে ঘুমিয়ে।

ভারতবর্ষের ছুৎ-অচ্ছুৎ অন্ত্যজ শূদ্রদের তো বটে, জলচল শূদ্ররা এবং দেশজ মুসলমানরা শিক্ষার ফলে বিশেষত জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত হওয়ার ফলে দাসত্ব, ক্রীতদাসত্ব ও ভূমিদাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে আত্মসত্তার মূল্য-মর্যাদা সচেতন হয়েছে। নিজেকে অন্য যে-কোন মানুষের মতো পরিপূর্ণ মানুষ রূপে জানতে-বুঝতে শিখেছে। পেশান্তর সম্ভব ও সহজ হয়েছে বলে অর্থে-সম্পদেও হয়েছে অনেকে ঋদ্ধ, আর এখন উচ্চাশী হওয়ার মানসিক ও সামাজিক বাধা হয়েছে অপসৃত। এক কথায় এখন প্রাণীর মানব প্রজাতির যে-কেউ আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে সগর্ব উচ্চারণে নিজেকে 'মানুষ' বলে দাবি করতে পারছে। এখন গোটা দুনিয়ার শোষিত, বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, উপেক্ষিত, অবজ্ঞাত, অজ্ঞ-অনক্ষর সমেত সব শূদ্রই স্বাধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠ হওয়ার সংগ্রামে মেতে উঠেছে। এটি হচ্ছে মানবসভ্যতার আদিকাল থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকাল অবধি বঞ্চিত মানবতার প্রথম বিজয় যুদ্ধোত্তরকালীন। এ শতক তাই গণমানবের মুক্তি সংগ্রামের ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার শতক। এ যুগ শূদ্রের আধিপত্য বিস্তারের যুগ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘ. পোশাক-পরিচ্ছদ-ঘরবাড়ি-অলঙ্কার

আমজনতা অজ্ঞ-অনক্ষর নিঃস্ব নিরন্ন দুস্থ দরিদ্র ছিল। শূদ্রের পক্ষে পেশান্তর শাস্ত্রিক বাধার দরুনই সম্ভব ছিল না। শিক্ষার বা সাক্ষর হওয়ার অধিকারও ছিল না। ফলে কায়িক শ্রমের সময়ে গামছা বা কৌপীন পরেই তারা জলে-স্থলে কাজ করত। এ বিশ শতকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বাবধি এভাবেই তাদের কাজ করতে হয়েছে। মুসলিম কৃষক-শ্রমিক ক্ষেতমজুর, ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ বৃত্তিজীবীরাও এক বিশেষ ধরনের ও রঙের কামিজ বা জামা পরত। যেন অন্য কিছু পরার তাদের অধিকারই ছিল না। চাষী-মাঝি-মাল্লা-মজুরের পোশাকও ছিল ভিন্ন। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে খালি গায়ে ও খালি পায়ে চলত। ব্রাহ্মণদের তো উত্তরীয় বা চাদর ব্যতীত সেলাই করা জামা পরা শাস্ত্রীয়ভাবেই ছিল নিষিদ্ধ। তাছাড়া শীতকালে ছাড়া অন্য ঋতুতে খালি গায়ে থাকাই ছিল নিয়ম-রীতি। একটা জামা, বাজু, কামিজ, ফতুয়া, মির্জাই, পাঞ্জাবি নামের 'অঙ্গরাখা' সবারই গ্রামান্তরে হাটে কিংবা কুটুম্ববাড়ি যাওয়ার জন্যে থাকত বটে, তবে শীতকাল ব্যতীত অন্য ঋতুতে অধিকাংশ সময়ে তা কাঁধেই রাখা হত, গায়ে দেয়া হত না। এমনকি অসহযোগ আমলে উচ্চশিক্ষিত ও উচ্চবিত্তের লোকেরা ক্যামেরায় ছবি তোলার কালে কিংবা দেহাকৃতি বা অবয়ব অঙ্কনকালে খালি গায়ে থাকাটাই বাঙালীর স্বাজাত্যের ও সংস্কৃতির পরিচায়ক বলে মানতেন। উকিলের, হাকিমের, মৌলবীর চৌকা-চাপকান-আসকান-শেরোয়ানী, শামলা-পাগড়ী, নাগড়া, চটি, পায়ে মোজা, বুট, সু, পাম্পসু ছিল আভিজাত্য ও বিত্তজ্ঞাপক সজ্জা। ব্রাহ্মণ ও অন্যারাও কাঠের খড়ম পায়ে চলত বাড়ির আঙিনায়। ১৯৪০ সনের আগে লাখে একজনের গায়ে জামা এবং পায়ে জুতা-স্যান্ডেল ছিল না গাঁয়ে-গঞ্জে, এমনকি শহরে-বন্দরেও শ্রমিক-মজুরদের। আর যুদ্ধকালে ও বিশেষ করে যুদ্ধোত্তরকালে আমরা দেখলাম আকস্মিকভাবে সৈন্য চলাচলের আন্তর্জাতিক হাওয়ায় সবার গায়ে ও পায়ে প্রায় একই আকারের প্রকারের জামা-কাপড় ও জুতা-স্যান্ডেল, অবশ্য গুণগত ও দামগত আর কিছুটা রুচিগত পার্থক্য তো ছিলই, এখনো রয়েছে এবং পরেও থাকবে। কিন্তু এখন কোথাও লাখে একজন খালি গায়ের ও উদোম পায়ের লোক গাঁয়ে কিংবা শহরে দেখা যায় না। ১৯৪০ সনের আগে এ কালে যাদের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী বলা হয়, তাদের 'বসের' তথা অফিসারের ঘরে খালি পায়েই প্রবেশ করতে হত। এবং কেরানীদের এখনকার করণিকদের কোট পরার অধিকার থাকলেও টাই বা স্যুট পরার অধিকার ছিল না, অন্তত রেওয়াজ ছিল না। শীতকালে তারা শার্টের উপরে গরম খোলা বুকের কিংবা আকণ্ঠ বোতামওলা গলাবন্ধ কোট পরতেন এবং তখন হিন্দু-মুসলিম নিম্নবিত্তের উকিল-ডাক্তার-মোক্তার-শিক্ষক-কেরানী— সবাই ধুতি-শার্ট কিংবা ধুতি-পাঞ্জাবি পরতেন এবং কোটও পরতেন শীতকালে। চট্টগ্রামে লুঙ্গি-পাম্পসু-শার্টপরা কেরানীও দেখেছি, দেখেছি শহরে স্কুল-কলেজের মুসলিম ছাত্রদের। পাজামা মুসলিম উকিল-মৌলবীদের মধ্যেই মোটামুটি সীমিত ছিল। ব্যতিক্রম ছিল পালা-পার্বণে উৎসবে। অশিক্ষিত মুসলিমরা ধুতি-পাঞ্জাবি বা কামিজ পরেই বর সাজত। মুসলিমরা ধুতি ছাড়ল মুসলিম লীগের প্রভাবে ১৯৩৮-৪০ সনের মধ্যেই। ধরল পাজামা, তা বেশিদিন টেকেনি। যুদ্ধকালে ও যুদ্ধোত্তর কালে তা প্যান্ট-শার্ট উন্নীত হল হাওয়াইয়ান শার্টের জনপ্রিয়তার ফলে। এখন হিন্দুদের মধ্যে, রাজপুতদের ও শিখদের আদলে পাজামা, মেয়েদের মধ্যে সালওয়ার-কামিজ চালু হয়েছে বাসে ওঠার সুবিধের লক্ষ্যে। একালে ভিখিরী থেকে দিনমজুর অবধি সবারই একাধিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেঞ্জি, শার্ট, লুঙ্গি, ধুতি রয়েছে। অন্যদেরও প্যান্ট-কোট-স্যুট রয়েছে কয়েক জোড়া করে। সে-হিসেবে জীবনের, জীবনযাত্রার, রুচির সৌন্দর্যবোধের উন্নতি-উৎকর্ষ যে হয়েছে, তা মানতেই হবে।

এমন দিনও ছিল যখন প্রজন্মক্রমিক হীনম্মন্যতা বশে প্রাকৃতজনদের মনে মাটির দেয়ালের ঘর, ইটের ঘর, সোনার গয়না গরীবকে সয়না বলে বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা ছিল বদ্ধমূল। এ ধারণা উনিশ শতক অবধি চালু ছিল। এ শতকের প্রথমপাদের পরে তা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এ কারণে দেশজ মুসলিম অনক্ষর সমাজে এবং নিম্নবর্ণের হিন্দু সমাজে সোনার ব্যবহার এবং আকস্মিকভাবে ধনী হলেও পাকা ইটের ঘর সইবে না বলে সোনার গয়না ও ইটের ঘর তৈরি করত না। গরীব হিন্দুরা শঙ্খের খাড়ুতে সিন্দূরেই ও অপদেবতার নজর এড়ানোর জন্যে নোয়া [লৌহ] পরে থাকত তুষ্ট। সচ্ছল মুসলিম নারীরা রূপার অলঙ্কারে কান-নাক-সিঁথি-গলা-বাহু-হাত-কোমর এবং পায়ের গোড়ালি সজ্জিত রাখত। আর বড়লোকেরা সেদিন সোনা মুক্তা হীরা পাথর সবকিছুই অলঙ্কার রূপে ধারণ করেছে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে।

আজ পৃথিবী যানে-বাহনে, তারে-বেতারে একটা গমনসাধ্য ও ঘরে বসে দর্শনসাধ্য জনপদে পরিণত হয়েছে। তাই আজ অনক্ষর-সাক্ষর-শিক্ষিত নির্বিশেষে অনেক ভৌতিক অদৃশ্য ভয়-বিশ্বাস-সংস্কার ধারণামুক্ত হয়ে গেছে। আজ পৃথিবীতে হেন জাতি বা সম্প্রদায় নেই, হেন ব্যক্তি নেই যে বা যারা দেশ-কালের দাবি, জীবনের জীবিকার চাহিদা মেটানোর জন্যে শাস্ত্রের, সমাজের উপযোগগতিক লৌকিক, অলৌকিক, অলীক আচার-আচরণের নিয়ম ও বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন করছে না, বলা চলে প্রয়োজনে শাস্ত্রকে আস্থা থাকা সত্ত্বেও উপেক্ষা করতে বাধ্য হচ্ছে নিত্যকার জীবনযাত্রার সমকালীন দাবি মেটানোর গরজে। আজ তাই উচ্চশিক্ষিতের, উচ্চবিত্তের ও উচ্চবৃত্তির মানুষের পুরুষের এবং নারীরও পোশাক য়ুরোপীয় হয়ে উঠছে। এখন আন্তর্জাতিক মানের পোশাক হচ্ছে স্যুট, ভাববিনিময়ের ভাষা ইংরেজী, খাদ্য পাঁচতারা হোটেলে তৈরি সবকিছু। আমাদের মধ্যে এখনো ভিখিরী রয়েছে, অনাহারক্লিষ্ট লোকও বহু, বেকার প্রায় দু'কোটি, তবু সামগ্রিক, সামষ্টিক ও সামূহিকভাবে আমাদের চিন্তা-চেতনার ও জীবনযাত্রার, রুচির, ভোগ-বিলাসের মান বেড়েছে।

৬. শিক্ষা

শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনার আগে জ্ঞান ও বিশ্বাস-সংস্কার ধারণার পার্থক্য নিম্নরূপ আবশ্যিক। জ্ঞান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কিংবা পরীক্ষণ, নিরীক্ষণ, সমীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ অথবা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ফলাফল নিরূপণ প্রসূন। যেমন চিকিৎসাবিজ্ঞান অন্যান্য বিজ্ঞানের মতোই প্রমাণ সম্ভব বা প্রমাণিত জ্ঞান। আর বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা হচ্ছে বিস্ময়-কল্পনা-ভয়-ভক্তি-বল-ভরসা সম্পৃক্ত অদৃশ্য অরূপ অরি-মিত্র শক্তির, শাস্ত্রিক, লৌকিক, অলৌকিক, অলীক আন্দাজ অনুমান কিংবা বৌদ্ধিক যৌক্তিক মনন বিচার বিবেচনাজাত গ্রাহ্য বা স্বীকৃত ধারণা যা প্রমাণিত নয় এবং প্রমাণসম্ভবও নয়, নিতান্ত বিশ্বাস ভিত্তিক। বিশ্বাস আর পুতুল বা একালের রোবোট একই প্রাতিভাসিক সত্য মাত্র। পুতুলকে জীবন্তভাবা, রোবোটকে ব্যক্তি মনে করা আর বিশ্বাসকে সত্যভিত্তিক বলে জানা ও মানা একই রূপ ভ্রান্তির প্রকাশ মাত্র। অতএব আমাদের প্রচল ধারণায় যা-কিছু শেখা ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেখানো হয়, তাই জ্ঞান। কাজেই আমাদের 'জ্ঞানার্জন' সাধারণ সংজ্ঞায় ও সংজ্ঞার্থে আসমানের ও জমিনের মধ্যেকার নয় কেবল, তার বাইরেও যত দৃশ্য-অদৃশ্য রূপ-অরূপ অরি-মিত্র শক্তি আমাদের জীবন-জীবিকা, জন্ম-জীবন-মৃত্যু নিয়ন্ত্রণ করে নিয়তিরূপে, সেগুলোর কাল্পনিক ধারণাই জ্ঞান।

আদি ও আদিম মানুষেরা এবং একালেও যুক্তি প্রয়োগে অনীহ-অসমর্থ ভীরু লোকেরা অদৃশ্যশক্তির রোষের ভয়ে এবং কৃপার ভরসায় অযৌক্তিক ও অবৌদ্ধিক মানসিক জীবন যাপন করে। হরফ আবিষ্কৃত হওয়ার আগে মুখে মুখে শুনে শুনে শ্রুতি-স্মৃতি রূপে এ তথাকথিত জ্ঞান প্রজন্মান্তরেও চালু থাকত, হরফ তৈরির ও লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা হওয়ায় এখন সাক্ষরেরা বই পড়ে দেখে দেখে শিখতে ও জানতে পারে। শুনে শুনে মনে রাখা হত বলে বেদের নাম শ্রুতি। আনুষঙ্গিক শাস্ত্রও স্মৃতিতে ধরে রাখা হত বলে তার নাম হল স্মৃতি, যে স্মৃতিতে ধরে রাখে তার নাম স্মার্ত। কুরআনের স্মৃতিধরেরা 'হাফিজ' বা সংরক্ষক নামে পরিচিত। আজকাল আর শ্রুতি-স্মৃতির কোন প্রয়োজন নেই। হাতের কাছে বই থাকলেই অভিধানের মতো প্রয়োজনে কাজে লাগানো যায়। কিন্তু মানুষ সাধারণভাবে পাঠে অনীহ। শুনে শুনে যা শেখা জানা যায়, তাতেই থাকে তুষ্ট।

আবার এ শতকের আগে পৃথিবীতে বিদ্যার অর্থাৎ সাক্ষরতার মাধ্যমে বিদ্যার বিস্তার উন্নততর রাজ্যে-সাম্রাজ্যেও ছিল দুর্লভ। আজো আফ্রো-এশিয়ার অনেক রাষ্ট্রেই সাক্ষর লোকের সংখ্যা নিতান্ত কম। কাজেই লোকে শুনে শুনেই শেখে শাস্ত্রকথা, উপাসনার প্রয়োজনে শুনে শুনে মুখস্থ করে মন্ত্র, মথি, সূরা। আঠারো শতক অবধি সভ্যজগতেও সাক্ষর লোক গাঁয়ে গঞ্জে শহরে বন্দরে ছিল বিরলতায় দুর্লভ। আর ব্রাহ্মণ্যমতবাদ ও ব্রাহ্মণশাসিত সমাজ ছিল অনন্যতায় অদ্ভুত, এখানে বর্ণবিন্যাস্ত সমাজে শূদ্রের-অস্পৃশ্য-স্পৃশ্য নানা শ্রেণীর শূদ্রের শিক্ষার, হরফশিক্ষার কোন অধিকারই স্বীকৃত ছিল না। এমনকি সৎশূদ্রের মধ্যে বৈশ্যের ও কায়স্থের ছিল শতকিয়া, পণকিয়া, কাঠাকালি, বিঘাকালি ও সরলগণিত শেখার মধ্যেই বিদ্যার্জন সীমিত। ব্রাহ্মণের ঔরসজাত বলে বৈদ্যের ছিল আয়ুর্বেদ তথা চিকিৎসাশাস্ত্র জানার জন্যে সংস্কৃতভাষা শেখার অনুমতি। এমনকি ব্রাহ্মণদের মধ্যেও শাস্ত্রের সবকিছু জানার অধিকারীভেদ ছিল, তাই এক বেদ, দুইবেদ, তিনবেদ ও চারবেদ পড়ার অধিকারী ভেদের লেশ ও রেশ রয়ে গেছে ব্রাহ্মণের কূলবাচিতে বা পদবীতে যেমন দুবে [দ্বিবেদী], তেওয়ারী [ত্রিবেদী] চোরে [চতুর্বেদী]। নারীর ও শূদ্রের বেদ শোনার অধিকার ছিল না, দেবমন্দিরে প্রবেশের এবং ইষ্টদেবতার পূজার অধিকারও ছিলনা। শাস্ত্রমতে আজো নেই। তবে শাস্ত্র আজকাল সবাই লঙ্ঘন করছে নারী-পুরুষ-শূদ্র-অন্ত্যজ নির্বিশেষে। এ হচ্ছে কালান্তরের প্রভাব। এ সূত্রেই স্মরণ করা প্রয়োজন যে যানে-বাহনে তারে-বেতারে পৃথিবী জনপদে পরিণত হওয়ার আগে পর্যন্ত কোন সমাজে, শাস্ত্রে, অঞ্চলে যুগান্তর বা মতপথের পরিবর্তন ছিল প্রায় অসম্ভব। সেকালে দেশে-সমাজে-শাস্ত্রে, পরিবর্তন আসত, যুগান্তর ঘটত বিদেশী-বিজাতি-বিভাষী-বিধর্মীর প্রভাবে। বিদেশীদের সঙ্গে ব্যবসায়িক বাণিজ্যিক সম্পর্কে গণসংযোগ হত না বলে তাদের সঙ্গে পরিচয় হত না ঘনিষ্ঠ। তাই ষোল শতক থেকে য়ুরোপীয়দের ভারতে পণ্য বিনিময়ের বাণিজ্য উপলক্ষে এদেশের বন্দরে বসবাস থাকা সত্ত্বেও ভারতে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগের মুহূর্ত অবধি কোন প্রভাব পড়েনি ভারতবাসীর উপর। শাসকরা চিরকালই নিজেদের ভাষাকে দরবারী বা প্রাশাসনিক ভাষারূপে চালাত। গ্রীক,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রোমান, আরব, ইরানী, ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ, রাশিয়ান প্রভৃতি সবাই এ নীতি ধরে রেখেছিল।

এ কারণেই দাক্ষিণাত্যে প্রাচীনযুগের অবসান ও মধ্যযুগের আরম্ভ ঘটে কাসিমপুত্র মুহম্মদের সিন্ধু বিজয়ের ফলে। শঙ্করাচার্য, রামানুজ, নিম্বার্ক, মধ্ব, বল্লভ প্রমুখের নব-চিন্তা-চেতনার ও দ্রোহের মাধ্যমে এবং উত্তর ভারতে প্রাচীন যুগের মৃত্যুঘণ্টা বাজে সবুক্তগীনের, মাহমুদের, মুহম্মদঘোরীর অভিযানের ফলে, বিশেষ করে কুতুবউদ্দীন আইবকের দিল্লীর বাদশাহ হওয়ার দিন থেকেই। নবযুগের বাসন্তী হাওয়ার প্রমাণ মেলে শূদ্র ও অন্ত্যজ সন্তদের দেব-দ্বিজ-বেদদ্রোহিতায়। অতএব, আরববিজয়ে দাক্ষিণাত্যে এবং তুর্কীবিজয়ে উত্তরভারতে মধ্যযুগের শুরু হয়, তেমনি পলাশী যুদ্ধোত্তর কালেই শুরু হয় আধুনিককাল ইংরেজের ভাষা-সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞানের এবং শাসন-প্রশাসন পদ্ধতির প্রভাব। এ কালান্তরের সূচনা সওদাগরীগদীতে ও রাজস্ব আদায় পদ্ধতিতে হলেও মনন-মনীষায় দ্রোহসূচিত হয় রামমোহন রায়েই।

সুপ্রাচীনকাল থেকেই ভারতে তিনটে নাস্তিক্যদর্শন সাংখ্য, যোগ, ব্রাহস্পত্য এবং দুটো নিরীশ্বর দর্শন-জৈন ও বৌদ্ধ চালু থাকা সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ্যদাপট একালেও কমেনি। ফলে শূদ্রসমাজে শিক্ষার অনুপ্রবেশ তুর্কী-মুঘলের ছয়/সাতশ' বছরে সম্ভব হয়নি। ইংরেজেরা অব্রাহ্মণ-চণ্ডাল সবাইকে প্রায় যোগ্যতার মাপেই যাচাই বাছাই করত। তাই পূর্বসংস্কার বর্জন করে, দৈব বিরূপতার ভয় পরিহার করে, সাহস অর্জন করে লেখাপড়ায় আগ্রহী হতে অবর্ণ শূদ্রদের বিশশতকের উষাকাল অবধি অপেক্ষা করতে হল। আদিবাসী, উপজাতি, জনজাতিরা তো স্বাধীনতা উত্তরকালেই বিদ্যার্জনের অধিকার বা সুবিধে পায়। অবশ্য অরণ্যাঞ্চলে ও শহরে খ্রীস্টান হলেই লেখাপড়ার অধিকার মিলত ওদের।

পনেরো শতকের কবি মালাধর বসু বলেছেন সংস্কৃত 'পুরাণ পড়িতে নাই শূদ্রের অধিকার/পাঁচালী পড়িয়া তর এ ভব সংসার।' তার মানে সৎশূদ্রও বাঙলা বা মাতৃভাষা ছাড়া সংস্কৃত পড়ার অধিকার পেতনা, মাত্র দেড়শ বছর আগে সংস্কৃত কলেজে কায়স্থ সন্তানদের পড়ার অধিকার দিলেন ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর। তফসিলী শূদ্রদের অধিকার দিতে সাহসই পাননি বর্ণহিন্দুর আপত্তির ভয়ে, যেমন তাঁর মেট্রোপলিটন স্কুলে মুসলিমদের ভর্তি তিনি নিষিদ্ধ রেখেছিলেন—যার ফলে আজো বিদ্যাসাগর কলেজে মুসলিম শিক্ষার্থীরা ভর্তির অধিকার পায়নি।

বৌদ্ধহিন্দুজ দেশী মুসলিমরাও ছিল স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য শ্রেণীভুক্ত আজলাফ বা আতরাফ-হিন্দু-বৌদ্ধ নিম্ন ও তুচ্ছ ঘরানা বৃত্তিজীবীবংশজ। তাদেরও ছিল না তাই শিক্ষার-সাক্ষরতার ঐতিহ্য। উচ্চাশী-সচ্ছল পরিবারে যদিও বাঙলা-আরবী-ফারসী পড়ুয়া স্বল্পসংখ্যায় মিলত। কিন্তু অনক্ষরের তুলনায় তারা ছিল করগণ্য। ইসলাম ছিল তেরো নদীর ওপারে উদ্ভূত শাস্ত্র। তার ভাষা ছিল দুরূহ আরবী, শেখাবার লোক ছিল না কেউ। প্রচারকরা দীক্ষা দিয়েই তাঁদের দায়িত্ব শেষ করতেন। ফলে নামাজ পড়ার জন্যে মুসলিমরা ভাষা না জেনে বুঝেই পাখির মতো শেখানো তথা স্মৃতিতে ধরে রাখা সুরাই অর্থ না বুঝেই আওড়িয়ে 'নামাজ' পড়ত পাঁচবেলা, এখনো পড়ে। পরে যখন শিক্ষিত কিছু মৌলবী-মোল্লা মিলল, তাদের মধ্যে কেউ মনন-মনীষাধর সম্ভবত ছিল না বলে এক অদ্ভুত প্রথা-পদ্ধতি ওরা মুসলিম সমাজে চালু করল যা আজো চলছে নয় শুধু, বেড়েছে এ সরকারের আমলে মক্তব বা একত্তেদা মাদ্রাসা নামে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাষা না শিখিয়ে কেবল আরবী হরফ শিখিয়ে এবং উচ্চারণ শিখিয়ে আরবী সুরা, আয়াত প্রভৃতির আবৃত্তি শেখানো এবং শ্রুতিধর বা স্মৃতিধর করার লক্ষ্যে ঘরে ঘরে ছেলেমেয়েদের আজো কুরআন পাঠ শেখানো হয়। নজর বা দৃষ্টি যোগে পাঠ করা হয় বলে এর প্রচলিত যোগরূঢ় নাম 'নাজিরি' পদ্ধতি। এ কারণেই প্রাসঙ্গিক বা অপ্রাসঙ্গিকভাবে নানা শাস্ত্রকথা খণ্ড খণ্ডভাবে শুনে শুনেই আজো ইংরেজী শিক্ষিত কিন্তু আরবীতে অজ্ঞ অসংখ্য লোক আর অশিক্ষিতরা তো বটেই স্বধর্ম ও শাস্ত্র সম্বন্ধে সঙ্গতি-সামঞ্জস্যহীন নানা ধারণায় দৃঢ়ভাবে আস্থা রাখে। সব ধর্মাবলম্বীর মধ্যেই তাই 'শাস্ত্র' নিতান্ত শোনা ধারণাভিত্তিক প্রত্যয়মাত্র। অথচ এসব লোকই স্বধর্মের মর্যাদা রক্ষার নামে স্বধর্মীর স্বার্থ সংরক্ষণের নামে কথায় কথায় দাঙ্গা বাধায়, বিধর্মী হত্যা করে মশা-মাছি মারার মতোই পাপভীতিহীনভাবে।

অবাঙালী উর্দুভাষীর নেতৃত্বে ও শিক্ষকতায় প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা মাদ্রাসার (১৭৮০ খ্রী) গোড়ার দিকে দেশজ বাঙলাভাষী মুসলিম ছাত্র ছিলই না, পরে যখন স্বল্প সংখ্যায় পড়তে গেল তখন আরবী কেতাবের টীকাভাষ্য সেকালের রাষ্ট্রভাষা ফারসীতেই লেখা থাকত হাশিয়ায় বা মার্জিনে। এবং শিক্ষক সম্ভবত উর্দুভাষাতেই শিক্ষার্থীদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দিতেন। ফলে বাঙলা ভাষার ঠাঁই ছিল না পরবর্তীকালে গড়ে ওঠা বিভিন্ন মাদ্রাসায়। বিশেষ করে উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল উত্তরভারতে ও মধ্যভারতের ভূপালে। ফলে দেশী মোল্লা, মৌলবীদের এবং দেশের উর্দুভাষী নেতাদের ধারণায় 'বাঙলা' হল হিন্দুর ও হিন্দুয়ানীর ভাষা। তাই মুসলিমের অবজ্ঞেয় ও পরিহার্য। বাঙলা নিয়ে বাঙলাদেশে বৌদ্ধ-হিন্দুজ বাঙলাভাষী বাঙালী মুসলিম সমাজে বিতর্ক চলেছে বলতে গেলে ১৯২৫/৩০ সন অবধি। অবশেষে শিক্ষিতের হারবৃদ্ধির কারণে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ আবিষ্কৃত পনেরো-ষোল-সতেরো শতকের মুসলিমরচিত বাঙলা সাহিত্যের সাক্ষে এবং নজরুল ইসলামের কবিতা-গানের চমকে বাঙালীমনে বাঙলা যে মাতৃভাষা তা স্বীকার করার মতো, যুক্তি, বুদ্ধি ও আস্থা জাগে। ফলে 'নাজিরি' পদ্ধতিতে বাঙলা শেখানোর কথা কোন বাঙালী মোল্লা-মৌলবীর মনে জাগেনি। কেননা তারা বাঙলা হরফ চিনতই না। সে সময়ে বা এখনো যদি 'নাজিরি' পদ্ধতিতে বাঙলা হরফ শেখানো যায়, তা হলে জাত জন্ম বর্ণ ধর্ম নিবাস নির্বিশেষে গণশিক্ষাদানে অতি স্বল্পসময়ে-পনেরো/বিশদিনে বাঙালী মাত্রকেই সাক্ষর করা সম্ভব। হরফ চিনলেই যে-কোন পত্র-পত্রিকা পড়তে পারবে এবং বুঝবে মাতৃভাষা বলেই, যেমন লেখ্যভাষায় দেয়া বক্তৃতা বোঝে মন্ত্রীদের। এবং আগ্রহীজনেরা নিজেদের চেষ্টায় লিখতেও শিখবে।

অতএব শিক্ষার ঐতিহ্যহীন বাঙালী মুসলিমরা যে আরবী, ফারসী, বাঙলা, ইংরেজী কোন ভাষা না শিখে নিরক্ষর ও অজ্ঞ রইল, তার কারণ তারা ছিল অবর্ণ হিন্দু-বৌদ্ধের বংশধর, যাদের লেখাপড়ার অধিকারই ছিল না-ঘরানাপেশায় যাদের জীবন ছিল অর্থ—সম্পদে সীমিত। ধর্মান্তরে অনেক বৃত্তিজীবীরই পেশান্তর ঘটেনি। অজ্ঞ অনক্ষর বলে শূদ্রের ও দেশজ মুসলিমের কোন শাস্ত্র সম্মত নাম ছিল না। ইধা, বুধা, সোনা, চাঁদ, ময়না, পরান, কালা প্রভৃতিই ছিল। নারীদেরও ছিল খেঁদি, সোনা, ফুলি প্রভৃতি। ইংরেজ আমলে বিশেষ করে বিশ শতকে নানা কারণে বিদেশী শাসক ব্রিটিশের আশ্রয়ে-প্রশ্রয়ে শাস্ত্রিক বিধি-নিষেধ লঙ্ঘনের, বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা বর্জনের এবং উচ্চাশী হওয়ার পরিবেশ তৈরি হল শূদ্রের জন্যে, আজলাফ-আতরাফের জন্যে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেকার শিক্ষিত হিন্দুদের গাঁয়ে গঞ্জে মহকুমায় ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ফলে উচ্চাশী সচ্ছল গৃহস্থ চাষী মুসলিম সন্তানকে স্কুলে পাঠানো শুরু করল বিশ শতকের উষালগ্ন থেকেই। এবং স্যার সৈয়দ আহমদ খানের বিট্রিশপ্রীতি ও হিন্দুভীতি, ওয়াহাবী-সিপাহী পরাজয়ের ফলে মোহমুক্তি এবং জামাল উদ্দীন আফগানী প্রমুখের মুসলিম জাগরণবাণী প্রভৃতি মুসলিমদের বাস্তব জীবনে অবস্থা ও অবস্থান সম্বন্ধে সম্বিৎ দান করে। বিশশতকের দ্বিতীয়পাদে মুসলিম সমাজে ইংরেজী শিক্ষিতের হার দ্রুত বাড়তে থাকে। এ শিক্ষিত বাঙালী মুসলিমরাই চোখের সামনে হিন্দু জমিদার-মহাজন-চাকুরে-ব্যবসায়ী-উকিল-ডাক্তার দেখে এবং নিজেদের সর্বপ্রকারে দৈন্যে নির্জিত শোষিত ও উপেক্ষিত বুঝে বাঙালী মুসলিমরা হিন্দুদের জানল তাদের প্রতাপে প্রবল প্রতিযোগী প্রতিদ্বন্দ্বী শোষক বঞ্চক 'জানি-দুশমন' রূপে। তাই বাঙলাদেশে উর্দূভাষী উত্তরভারতীয় নেতাদের প্ররোচনায় মুসলিম লীগ হল জনগণ সমর্থনে তৃণমূল স্তরেও মুসলিম প্রতিনিধিত্বের অধিকারী একমাত্র রাজনীতিক দল। বাঙালী মুসলিমদের সমর্থনের জোরেই ব্রিটিশরাজ কংগ্রেসকে ঠেকানোর লক্ষ্যে মুসলিম লীগকেই ভারতীয় মুসলিমের রাজনীতিক প্রতিনিধিত্বের অধিকারী বলে স্বীকার করে নিল। পাকিস্তান এল এভাবেই, যদিও পশ্চিম ভারতে [পাকিস্তানে] মুসলিম লীগ প্রবল ছিল না কোথাও।

ব্রিটিশরা অন্যান্য য়ুরোপীয় ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদীদের চেয়ে অনেক ধূর্ত ও উদার ছিল। কিন্তু প্রয়োজনাতিরিক্ত শিক্ষিত শ্রেণিসৃষ্টির নীতি হয়তো রাজ্য হারানোর ভীতিবশে পরিহার করে চলেছিল। শেষদিন অবধি শিক্ষাখাতে ব্রিটিশ সরকার প্রজাদের দাবি সত্ত্বেও ব্যয় বাড়াতে চায়নি। সরকার প্রশাসন চালিয়েছে স্বল্পব্যয়ে। বেশি অর্থসম্পদ অর্জনে এবং স্বদেশে পাচারে ছিল আগ্রহী, এটিই ছিল কোম্পানী আমল থেকে ১৯৪৭ সনের জুলাই অবধি তাদের নীতি। এ জন্যে ব্রিটিশ আমলের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্যালেন্ডার অনুসারে এবং আদমসুমারির প্রতিবেদন অনুসারে দেখা যায় ব্রিটিশ আমলে প্রত্যাশিত সংখ্যায় কোথাও শিক্ষিত হয়নি। স্বাধীনতা উত্তরকালেই শিক্ষার হার সর্বস্তরের ও শ্রেণীর মধ্যে এমনকি আদিবাসীর উপজাতির জনজাতির মধ্যেও দ্রুত বেড়ে চলেছে গোটা উপমহাদেশে। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর মতো মুসলিম সমাজের অধিকাংশও এক প্রজন্মের শিক্ষিত, ক্বচিৎ একাধিক প্রজন্মের শিক্ষিত পরিবার মেলে। এখন অবশ্য তৃতীয় প্রজন্মও চলছে অনেক অনেক পরিবারে। মুনশী-মৌলবী-মোল্লা ছিল, উচ্চ ইংরেজী শিক্ষিত ছিল না। ওই সব শিক্ষিত সাক্ষরেরাই খোন্দকার, আখন্দ, আকুঞ্জি অর্থাৎ হিন্দু বন্দ্য, গঙ্গা, চট্ট, মুখ+উপাধ্যায় [শিক্ষক>ওঝা]-এর মতো মক্তব শিক্ষকগণই খোন্দকার, আখন্দ, আকুঞ্জি উপাধিধারী ছিল, আর ক্বচিৎ কাজীর বংশধরও ছিল কিন্তু সৈয়দটা প্রায়ক্ষেত্রেই বানানো। প্রমাণ এক জিলায় যত সৈয়দ মেলে গোটা আরব-উপদ্বীপেও সে সংখ্যার কোরাইশ আমজনতা নেই এখনো। তুর্কী আমলে দীক্ষিতরা হত শেখ, নিরক্ষরের বসাত নামের শেষে আর মুঘল ও ব্রিটিশ আমলে নব দীক্ষিতরা হত খান। শিক্ষিতরা শেখ এখন নামের আগে লেখে।

শিক্ষিতের অভাবে উনিশ শতকে কায়কোবাদ-মোজাম্মেল হক ব্যতীত মুসলিম সমাজে আধুনিক পদ্য লেখক ছিলেন না, আজ কেবল বাঙলাদেশেই শ' পাঁচেক কবি মেলে। আমাদের মধ্যে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে বিশেষ করে বিভিন্ন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাখার বিদ্যার চর্চা দ্রুত বাড়বে, আমরা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিদ্বান-বিজ্ঞ গবেষক-বিশেষজ্ঞ পাব অবশ্যই। অজ্ঞ-অনক্ষর নিঃস্ব নিরন্ন দুস্থ দরিদ্র সংস্কৃতিচর্চা করতে পারে না। সংস্কৃতিচর্চার জন্যে অর্থ-বিত্ত-বিদ্যা-রুচি-কাঙ্ক্ষা প্রভৃতি প্রয়োজন হয়। এখন আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনেও মানসিক ও ব্যবহারিক উভয় ক্ষেত্রে দ্রুত বিকাশ-বিস্তার ও উৎকর্ষ ঘটবে। আমরা এগারো কোটি মানুষকে সামষ্টিকভাবে গণনা করি বলে শিক্ষিতের হার কম দেখি, আসলে আমাদের পুরুষ সাক্ষর-শিক্ষিতের শতকরা হার পঞ্চাশের মতোই।

পাকিস্তান আমল থেকেই কায়েমী স্বার্থবাদী সামন্ত-বুর্জোয়া মনের মনুষ্যত্বহীন আমলা-সাংসদ-মন্ত্রী জনগণকে তাদের প্রতিযোগী ও প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে দিতে চায় নি। তাই তারা নিজেদের সন্তানদের পড়ায় ইংরেজী ভাষা মাধ্যমে শিশুকাল থেকেই, অশিক্ষিতদের সন্তানদের উৎসাহিত করে মদ্রাসা শিক্ষা গ্রহণে এবং আমজনতার সন্তান যেন কখনো মুক্ত মন-বুদ্ধির মানুষ হয়ে না ওঠে, শাস্ত্রনিষ্ঠ ও গতানুগতিক বদ্ধমনের ও আচারের অভ্যস্ত জীবন যাপনে তুষ্ট, তৃপ্ত ও হৃষ্ট থাকে, সেজন্যেই নারীদেরও লাখে লাখে মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিতা করে স্কুলে কলেজে শিক্ষিকা করে দিচ্ছে। যাতে নিম্নবিত্তের ও নিরক্ষর গৃহস্থ ঘরের লোকেরা কেবল মুসলমান থাকে, উদার বিজ্ঞানমনস্ক মুক্ত মনের মানুষ হয়ে না ওঠে। আর যাদের অর্থবিত্ত নেই, সেসব সাক্ষর শিক্ষিত লোকদের সন্তানদের প্রাথমিক, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে কেবল প্রশ্নোত্তর পড়ানো হয়, এভাবে ওরা লেখাপড়া শেখে বটে, কিন্তু বিদ্বান হয় না, চাকরি পায় না। অথচ এসব উচ্চবিদ্যার ও উচ্চবিত্তের লোকেরা সাংসদ, মন্ত্রী, রাজনীতিক, নেতা, আমলা, ব্যবসায়ী ও বুদ্ধিজীবীরূপে আমজনতাকে বাঙলাভাষী ও বাঙলাপ্রিয় থাকার জন্যে উচ্চকণ্ঠে ভাষণ দিয়ে বেড়ায়। মাতৃভাষার জন্যে সংগ্রামে আমাদের জ্ঞাতিরা প্রাণ দিয়েছে, বাঙলাদেশ স্বাধীন করার জন্যে লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ দিয়েছে, ইজ্জত দিয়েছে হাজার হাজার মা-বোন-মেয়ে-স্ত্রী বলে জনগণমনে গৌরব-গর্ব জাগিয়ে ওদের তুষ্ট, তৃপ্ত ও হৃষ্ট রাখতে চায়। আসলে তো 'স্টেটস' 'স' পাকিস্তান প্রস্তাব থেকে জিন্নাহর নির্দেশে নীরবে আনন্দে বাদ দেওয়ার যে-হুজুগে ভুল সেদিন উর্দুভাষীর পোঁ-ধরা গৃহস্থ ঘরের শিক্ষিত বাঙালী সাংসদ ও রাজনীতিকরা করেছিল, তারই মাসুল দিল বাঙালী তরুণেরা একবার বাঙলা ভাষার দাবিতে, আর একবার শোষণমুক্তি লক্ষ্যে স্বাধীনতার সশস্ত্র সংগ্রামে। এ মুহূর্তেও ধূর্তরা ও বিত্তবানেরা ভারতে পাঠায় সন্তানদের, ধনীরা পাঠায় লন্ডনে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। আর স্বদেশের স্কুলে-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতিক দলগুলো নিজেদের লড়াকু বাহিনী হিসেবে পোষে ছাত্র-যুবার রাজনীতিক অঙ্গদল। কার্যত রাজনীতিক দলগুলো মস্তান-গুণ্ডা-খুনীই পোষে। ফলে রাজনীতিক দলের নির্দেশে ও স্বার্থে লাভে-লোভে-স্বার্থে প্রলুব্ধ প্ররোচিত তরুণেরা মারে ও মরে প্রায় প্রতিদিনই দেশের কোন না-কোন স্কুলের কলেজের বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে ময়দানে হাটে বাটে। ফলে চরিত্র হারাচ্ছে শিক্ষক-ছাত্র সবাই। অবক্ষয় আক্রান্ত হয়েছে সমাজ ও রাষ্ট্র সর্বপ্রকারে ও সর্বক্ষেত্রে। ভারতচন্দ্র রায়ের ভাষায় বলা চলে 'নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়।' আবার এখন জনকল্যাণের নামে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সরকারের সম্মতিক্রমে দেশবাসীকে অদৃষ্টবাদী-লোভী-জুয়ারী করে তুলছে নানারূপ লটারির ব্যবস্থা চালু করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চ. অর্থোডক্‌সি, মৌলবাদ এবং সংস্কারাচ্ছন্নতা

বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞান-প্রজ্ঞা-বিবেক-বিবেচনার প্রভাব এড়িয়ে শিক্ষিত লোকদের মন-মগজ-মননে রয়ে গেছে ভূত-প্রেত-পিশাচ-জীন-পরী-যক্ষ-ড্রাগনের ও দেও-দানুর প্রভাব। ফলে আমরা গোঁড়া শাস্ত্রনিষ্ঠদের দেখি রবোটের মতো শাস্ত্রিক বিধি-নিষেধ চিরন্তন কল্যাণের নিশ্চিতির উৎস হিসেবে পরম ও চরম আস্থায় মানসিকভাবে নিশ্চিন্ত। এরা বন্ধ্যা মন-মননের মানুষ, বাঁধা মতের ও পথের যাত্রী। সংস্কৃতি-সভ্যতায়, আবিষ্কারে-উদ্ভাবনে-সৃষ্টিতে, নতুন চিন্তায়-চেতনায় এদের কোন অবদান থাকে না। ইদানীং যাদের মৌলবাদী বলে চিহ্নিত করা হয়, তারাও মূলত অর্থোডক্‌সই। শাস্ত্রের সত্যতায়, কল্যাণকরতায়, বিশ্বজনীনতায়, চিরন্তনতায়, অপৌরুষেয়তায় তাদেরও আস্থা দৃঢ়। কিন্তু তারা মর্ত্য জীবনের সুখ-সমৃদ্ধির প্রতি আসক্ত। তাই তারা শাস্ত্রকে পার্থিব তথা রাষ্ট্রিক রাজনীতির পুঁজি-পাথেয় রূপে প্রয়োগ করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের প্রয়াসী। এ তাৎপর্যে অর্থোডক্‌সরা সরল ও সৎ এবং ধার্মিক। আর মৌলবাদীরা কূটকৌশলপ্রবণ রাজনীতিক। তারা ধার্মিক নয়, ধর্মধ্বজী। অর্থোডক্‌সরা ঈশ্বরের কৃপাকামী। মগজের শক্তিতে তাদের আস্থা নেই, মুনাজাতেই তাদের ভরসা। দুইদলই বিজ্ঞানের প্রসাদভোগী, কিন্তু বিজ্ঞানের তত্ত্বে, তথ্যে ও সত্যে আস্থাহীন। আর হিন্দুরা উপাস্যের অভিন্নতা নেই বলেই মৌলবাদী হতেই পারে না। রাষ্ট্রীয়ভাবে ওটা আসলে বর্ণহিন্দুর প্রাধান্য রক্ষার কূটবুদ্ধি-প্রসূনমাত্র। আর দুনিয়ার অন্য তাবৎ আস্তিকরা আশৈশব পারিবারিক, সামাজিক ও দৈশিক পরিবেশে শ্রুত ও লব্ধ বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা অনুগ জীবন যাপন করে, কখনো অর্জিত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, যুক্তি, বুদ্ধি, বিবেক, বিবেচনা প্রয়োগে উপযোগ যাচাই করে না কিংবা কালিক জীবনে এসব বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণার উপযোগরিক্ততা তাদের মনে ঠাঁই পায় না। তার কারণ তারা সমাজসম্মত জীবন যাপন করতে চায়, দ্রোহী হয়ে নিন্দিত, লাঞ্ছিত বা নিহত হতে চায় না ভীরু বলেই। তা ছাড়া তারা ইহ-পরলোকে প্রসৃত জীবনে শুনে শুনে প্রচলিত সামাজিক নিয়মে রীতিতে আস্থা রাখে বটে, কিন্তু সত্য ও বাস্তব বলে জানে ও মানে এ মর্ত্যজীবনের ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগকেই। ফলে তারা বাস্তব মর্ত্যজীবনের বাঞ্ছাপূর্তি লক্ষ্যে ঝাড়ফুঁক, তুকতাক, বাণ-উচ্চাটন, তাবিজ-কবচ, মন্ত্র-মাদুলী, ধাতব ও পাথুরে আঙটি, মন্ত্রপূত ধূলি-পানি-তেল যোগে অভীষ্ট সিদ্ধির প্রত্যাশী। তাই তারা যতটা ভরসা রাখে গণক-নজুম-জ্যোতিষীর উপর কিংবা দরবেশ-দরগাহ-সন্ন্যাসী-শ্রমণ-দেবতার অলৌকিক শক্তির উপর, ততটা ভরসা পায় না উপাস্য ঈশ্বরের কৃপায়। কাজেই মানুষ মুখে যতই আদর্শবাদী, বৈরাগ্যবাদী, পাপভীরু ও পুণ্যকামী হোক না কেন, মূলত সবাই মর্ত্যজীবনরসিক ভোগবাদী, অর্থ-সম্পদে নিশ্চিত জীবনের প্রত্যাশী। জীবন রাশি-নক্ষত্র নিয়ন্ত্রিত, কি ঈশ্বর নিয়ন্ত্রিত তা আমজনতা-গণমানব, সাক্ষর শিক্ষিত অনক্ষর নির্বিশেষে কেউ দ্বিধাহীন চিত্তে বলতে পারে না। তবু মানুষ আশৈশব লালিত বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণাচালিত হয়, স্বাতন্ত্র্যচেতনায়, সাম্প্রদায়িকতায় উৎসাহ বোধ করে, স্বশাস্ত্রের, সত্যতার ও শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব করে।

আমরা জানি তুর্কী-মুঘল আমল থেকে ব্রিটিশ আমল অবধি [যদিও দত্তকপুত্রের উত্তরাধিকার আইন রদ করে ব্রিটিশ সরকার কিছু রাজ্য প্রত্যক্ষ শাসনে আনে] ভারতের অধিকাংশ ভূভাগ সামন্তশাসনেই ছিল। তুর্কী মুঘল-ব্রিটিশের প্রত্যক্ষ শাসনে ছিল বলতে গেলে সামন্য অংশই। এবং করগণ্য কয়টি ছাড়া সবদেশীয় রাজ্যই ছিল হিন্দু রাজার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধিকারে। সেখানে ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্র ছিল প্রভাবে প্রতাপে প্রবল। আক্ষরিক অর্থেই সেখানে 'বেদ-ব্রাহ্মণ-রাজা' আর গয়া-গঙ্গা-গরু-গুরুই ছিল পূজ্য, অস্পৃশ্যতাও ছিল প্রবল, বর্ণে বিন্যস্ত সমাজে অবর্ণহিন্দুর ছোঁয়া ও হিন্দু-মুসলিমের গায়ের ছায়া পর্যন্ত অপবিত্র ও ঘৃণ্য বলে বিবেচিত হত, পবিত্র হওয়ার জন্যে স্নান করতে হত। কাজেই 'মানুষ' এতো ঘৃণ্য বলে পৃথিবীর আর কোথাও বিবেচিত হয় না কোন শাস্ত্রে। কুকুর-বিড়াল-গরু-ছাগলের চেয়ে মানুষকে যারা হীন ও ঘৃণ্য ভাবে, তারা কি অসাম্প্রদায়িক হতে পারে? মনের গভীরে মানুষকে 'মানুষ' বলে কি ভাবতে পারে? আসমানী দোহাই দিয়ে বর্ণাশ্রমকে টিকিয়ে রেখেছে ভারতের ব্রাহ্মণ্য সমাজ প্রায় তিন হাজার বছর ধরে। আস্তিক অসৎশূদ্ররা এবং অন্য সৎশূদ্ররা কখনো ব্রাহ্মণের দ্বিজত্ব ও মর্ত্যদেবত্ব অস্বীকার করতে পারবেই না। এটা জেনে বুঝেই গান্ধী-রবীন্দ্রনাথরা বর্ণেবিন্যস্ত সমাজকে বৈচিত্র্যে ঐক্যপ্রতীক ও ঐক্যসূত্র বলে অভিহিত করে এরূপ ঐক্যই ভারতের চিরকেলে আদর্শ বলে, সবার সঙ্গে সহযোগিতায় শান্তিতে সহাবস্থান বলে এর মাহাত্ম্য-মহিমা প্রচার করার চেষ্টা করেছেন কায়েমী স্বার্থ ও সম্মান স্থিত রাখার গরজে। আজো অন্ত্যজ-অস্পৃশ্যরা সুযোগ-সুবিধে দাবি করছে মাত্র। ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব-দ্বিজত্ব-দেবত্ব অস্বীকার করার চিন্তাও শাস্ত্রমানা আস্তিক মনে জাগে না। বিজ্ঞানের এতো সত্য ও প্রমাণিত তথ্য জানা সত্ত্বেও আমরা ভূতে-প্রেতে, অলীকে লৌকিকে অলৌকিকে আস্থা রাখি। আমাদের কেউ সাড়ে তিন/কেউ তিন/ কেউ আড়াই/ কেউ বা দুই এবং কেউবা দেড় হাজার বছরের আগের জগতের জীবন-চেতনা নিয়ে জীবন যাপন করি, আমরা সমকালীন হয়েও স্বকালেই মানসিকভাবে হাজার হাজার বছরের মানস ব্যবধানে বাস করি, এমনকি একই শয্যায় একই ঘরে বাস করেও কিংবা সহযোগী হিসেবে কাজ করেও। মানবপ্রজাতির আমরা যতটা প্রাণী, ততটা মনে মর্মে 'মানুষ' নই। তাই মানুষের মতো হিংস্র ও প্রতিহিংসাপরায়ণ প্রাণী আর নেই। যদিও বিভ্রান্তিকর অন্য একটা সংজ্ঞাও আছে মানুষের। 'সে কখনো ভালো কখনো মন্দ, কারো জন্যে, কারো প্রতি, কারো কাছে ভালো, আবার অন্যদের জন্যে মন্দ। সে-বিচিত্র, কখনো সংযত, সহিষ্ণু, সুজন, কখনো বা হিংস্র শ্বাপদ। কখনো বা করুণায়-কৃপায়-দয়ায়-দাক্ষিণ্যে, স্নেহ-ভালোবাসা-ক্ষমায় অসামান্য, কখনো নিষ্ঠুর শিকারী নরহন্তা। এ মানুষই প্রতিহিংসায় ভাঙে-কাড়ে-মারে-হানে, এ মানুষই আবার পরমনিষ্ঠায় শ্রম-সময় দিয়ে সবকিছু গড়ে। একই ধৈর্য-অধ্যবসায় যোগে মারণাস্ত্র যেমন তৈরি করে, তেমনি করে রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কার লক্ষ্যে গবেষণায় আত্মোৎসর্গ। তাই ঠেকে ঠকেও, ঘা খেয়ে খেয়েও মানুষ নিয়ে নতুন আস্থায় ও ভরসায় আমরা দ্বন্দ্বে-মিলনে-বিরোধে-বিবাদে-ক্ষমায়-প্রেমে বাঁচি। এ মর্ত্যজীবনকে ভালোবাসি। এ জীবন অমূল্য সম্পদ, এ জীবন মধুর। এ পৃথিবী পরম সুন্দর। মানুষই চৌষট্টিকলার স্রষ্টা। বিজ্ঞান-দর্শন তারই দান।

বিশ শতকেই বিজ্ঞানের বিস্ময়কর তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য আবিষ্কৃত হয়, এবং প্রকৌশল-প্রযুক্তিরও উন্নতি হয় কল্পনাতীতভাবে। এ জন্যে এ যন্ত্রযুগে ও যন্ত্রজগতে জীবনযাপন ধারার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। তিথি-নক্ষত্র-লগ্ন-রাশির কিংবা শনি-মঙ্গলবারের বাধা মানুষ লঙ্ঘন, উপেক্ষা ও অস্বীকার করছে, করতে বাধ্য করছে বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পৃক্ত হওয়ায়। ব্যক্তিক ও সামাজিক জীবনে অনেক অনেক অলীক-লৌকিক-অলৌকিক বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা পরিহার করতে হয়েছে, হচ্ছে। কাজেই এ শতকের গোড়ার দিকে শিক্ষার প্রত্যাশিত মাত্রায় বিস্তার ছিল না বলে, এবং আন্তর্জাতিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্পর্ক ১৯৪০ সনের যুদ্ধসংক্রান্ত জীবনধারার পরিবর্তন আনার পূর্বে আমাদের ছিল সংস্কারাচ্ছন্ন কুয়াশা আক্রান্ত জীবন, তা গরজের প্রেষণায় বর্জন করতেই হল। উন্মুক্ত বিশাল জগতের মুখোমুখি দাঁড়ালাম আমরা। মুখ্যত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থে ও নেতৃত্বে গঠিত জাতিসঙ্ঘের মাধ্যমে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ও সম্বন্ধের বিশ্বসমাজ গড়ে উঠল। কুটুম্ববাড়ির মতোই হয়ে উঠল পৃথিবীর সবরাষ্ট্র। আর্থ-বাণিজ্যিক কারণে নয় কেবল, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজ, মানবসেবা, মানবমুক্তি, প্রকৌশলে প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষণ, চিকিৎসাবিজ্ঞানচর্চা এবং অস্ত্র ক্রয়-বিক্রয় আর কূটনীতিক রাজনীতিক প্রয়োজনে বিশ্বমানব রাষ্ট্রিক পর্যায়ে পরস্পরের কাছে এল। ফলে আমাদের দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত জনেরা ও আফ্রিকার নিগ্রোরা যেমন ধৃত হৃত দাস-শ্রমিক হিসেবে আমেরিকায় নীত হয়েছিল, কিংবা ভারতের দুস্থ শ্রমজীবীরা যেমন ব্রিটিশ সরকারের প্রয়োজনে তার আফ্রিকায় ও ফিজিদ্বীপে, বার্মায় নীত হয়েছিল, তেমনি একালে অর্থোপার্জনের জন্যে গোটাপৃথিবীর নানা স্থানে বাঙালীরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে। ফিরেও আসছে, আবার স্থায়ীভাবে বাসও করছে নাগরিকত্ব নিয়ে। ফলে হিন্দুর কালা পানি, ম্লেচ্ছাচার, অস্পৃশ্যতাভীতি গেছে উবে, মুসলিমের গোঁড়ামি ও বদ্ধচিত্ততাও হচ্ছে বিলুপ্ত। মৌলবী-মোল্লারা শাস্ত্রমাহাত্ম্য ও পারলৌকিক কল্যাণচিন্তা অন্যদের মনে সঞ্চারিত করে বটে চরম উৎসাহে উদ্দীপনায়, কিন্তু নিজেদের সন্তানদের নাসারাবিদ্যায় ও বিজ্ঞানে ব্যুৎপন্ন করার জন্যে ভারতে, যুক্তরাজ্যে, যুক্তরাষ্ট্রে, কানাডায়, অস্ট্রেলিয়ায়, সুইডেনে পাঠাচ্ছে সাগ্রহে। এককথায় য়ুরোপে আমেরিকায় এশিয়ায় আফ্রিকায় যেখানেই রোজগারের সুবিধে আছে সেখানেই পাঠাচ্ছে। যেখানে আধুনিক বিদ্যা দানের-গ্রহণের সুনাম আছে, সেখানেই পাঠাচ্ছে। অথচ এ শ্রেণীর শিক্ষিত ও উচ্চবিত্তের লোকেরা দুস্থ স্বদেশীকে অবদমিত রাখার মতলবে কেবল সুন্নাহ মেনে স্বর্গে যাবার জন্যে প্রলুব্ধ রাখার চেষ্টায় প্রাণপণ করছে যেন। কাপট্য এবং প্রতারণা-প্রবঞ্চনা আর কাকে বলে? এরাই কিন্তু মুমীন বলে অজ্ঞ লোকের কাছে পরম শ্রদ্ধেয় এবং গণহিতৈষী বলে পরিচিত। শাসকগোষ্ঠী আর সরকারও জুটেছে এদের সঙ্গে। সারাদেশে অতীতমুখী মাদ্রাসাশিক্ষার প্রসার ঘটাচ্ছে পরম উৎসাহে। আমাদের উঠতি জাতীয় জীবনে এ এক বৈনাশিক বিড়ম্বনা।

কেননা যারা এখানে স্বশাস্ত্রের ও স্বসংস্কৃতির ধারক, বাহক, রক্ষক, অভিভাবক ও তত্ত্বাবধায়ক বলে পরিচিত, তাদের ব্যক্তিক জীবনের চিন্তা-চেতনায়, আশা-ভরসায়, রাষ্ট্র-চেতনায়, রাজনীতিক মতাদর্শে, আইন-কানুনের ধ্যান-ধারণায়, প্রশাসনিক ব্যবস্থার ধারণায়, সামরিক বিন্যাসে, অস্ত্রে, আর তাদের ব্যক্তিত্ব ও পারিবারিক জীবনে নিত্যকার চাহিদায় কিছু কি দেশী উপাদন-উপকরণ, আকৃতি, আদল আছে? তারা কি হেকিমি-কবিরাজী ছাড়েনি, নাসরা-ইহুদীর অবদান বিজ্ঞানের ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রসাদ ভোগ-উপভোগ করছে না, কাজে লাগাচ্ছে না? তবু কেন তারা অজ্ঞ লোককে বিভ্রান্ত করছে কালের ও জীবনের দাবি অগ্রাহ্য ও অস্বীকার করে? নিজেদের জন্যে তারা যা কাম্য মনে করছে, অন্যদের তা পেতে নিরুৎসাহ বা বাধা দিচ্ছে কেন? একে কি আমরা মক্করি, মুনাফেকী, পরপ্রতারণা ও পরশ্রীকাতরতা বলে পারি না অভিহিত করতে? আমরা কি এখন ফোন, ফ্যান, ফ্যাক্স, ফ্রিজ, এসি, টিভি, রেডিয়ো প্রভৃতি তার-বেতারের সুবিধে বর্জন করতে পারি? পারি কি য়ুরোপীয় চিকিৎসাবিজ্ঞান বর্জন করতে? পারি কি ব্লেড, নেইলকাটার বাদ দিতে? আজ আমরা য়ুরোপের জ্ঞানী-বিজ্ঞানীর কোন্ দান অস্বীকার,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিহার করব? আমাদের আবিষ্কার-উদ্ভাবন-সৃষ্টি-নির্মাণ কি আছে? একালে জ্ঞান-বিজ্ঞানের, আবিষ্কার-উদ্ভাবনের, যন্ত্রের-প্রকৌশলের, প্রযুক্তির উৎস য়ুরোপীয় ইহুদী-খ্রীস্টান মানীষা, সাধনা ও গবেষণা। ডারুইন, কার্লমার্কস, ফ্রয়েড-পাভলভ, আইনস্টাইন, হকিং প্রমুখ আমাদের আগের কালের আন্দাজ অনুমান প্রসূন জ্ঞান নামের ধারণা পাল্টে দিয়েছেন। এখন জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-বিবেক-বিবেচনায় যারা গুরুত্ব দেয়, তাদের তো স্বীকার করতেই হবে যে য়ুরোপীয়রা আজ কলেরা-বসন্ত. প্ল্যাগ, শিশু মৃত্যু, প্রসূতি মৃত্যু, কালাজ্বর, প্লীহা, সন্নিপাত, যক্ষ্মা, হৃৎরোগ, মস্তিষ্ক রোগ প্রভৃতির প্রতিষেধক আবিষ্কার করে মৃত্যুর দ্বার রোধ করে মানুষকে দীর্ঘজীবী করে তুলেছে। তাইতো জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, মৃত্যুকম, জন্ম বেশি। হরণে-পূরণে তাই আনুপাতিক হার বিনষ্ট হয়ে গেছে।

আমরা আমাদের অজ্ঞাতেই কল্যাণকর য়ুরোপীয় আদলে আমাদের দেহ-মন-মনন-মনীষা চালিত আর ব্যবহারিক জীবনে য়ুরোপে আবিষ্কৃত, উদ্ভাবিত, সৃষ্ট যন্ত্র, সামগ্রী সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাষ্ট্রিক, সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। আমাদের কোন স্বতন্ত্র আদল-অস্তিত্ব নেইই। আমরা নকলবাজ কিন্তু আত্মসম্মানে, জাতীয় অভিমানে বাধে বলেই স্বীকার করি না। স্বাতন্ত্র্যচেতনাজাত অভিমান, লজ্জা, সংকোচ পরিহার করে মানব-উত্তরাধিকার অঙ্গীকার করে আমাদের প্রকাশ্যে সগর্ব গৌরবে এবং আত্মস্বার্থেই য়ুরোপের সব অবদান প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ-বরণ করতে হবে, করাতে হবে জনগণকে দিয়ে। কেননা আত্মঅস্তিত্ব, জাতীয় অস্তিত্ব ও রাষ্ট্রিক অস্তিত্ব অজ্ঞি য়ুরোপীয় আদলে ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের বিকাশ ও চিন্তার উৎকর্ষ সাধনেই নিহিত রয়েছে আমাদের সামষ্টিক, সামূহিক ও সামগ্রিক কল্যাণ। কেননা নতুন চেতনায়, নতুন চিন্তায়, নতুন আবিষ্কারে, উদ্ভাবনে, সৃষ্টিশীল মননে, মনীষায় আমরা বলতে গেলে বন্ধ্যা, রিক্ত। তাই আমাদের মানসিক ও বস্তুগত সংস্কৃতি মূলত ও কার্যত অনুকৃত ও অনুসৃত, আত্তীকৃত, আত্মীকৃত বা সাঙ্গীকৃত য়ুরোপীয় সংস্কৃতিই। এ তত্ত্ব, এ তথ্য ও এ সত্য সংকোচ-শরম পরিহার করে যত শিগগির অনুভব-উপলব্ধি ও প্রকাশ্যে পরিব্যক্ত করব, আমাদের প্রগতি-প্রাগ্রসরতা ততই দ্রুত হবে। বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমাদের শক্তি ও সাহস ততই পাবে বৃদ্ধি। আসবে আমাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রিক ঋদ্ধি।

ছ. রাজনীতিক আবর্তন-বিবর্তন ধারা

১৬৯০ সন থেকে প্রায় দেড়শ বছর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কৃপা ও সহযোগিতাপুষ্ট, তৃপ্ত, তুষ্ট ও হৃষ্ট বাঙালী বর্ণহিন্দুরা ওয়াহাবী-সিপাহী বিপ্লবে-লড়াইয়ে [১৮৫৭ সন] ছিল ব্রিটিশ পক্ষে। তার ঠিক দশবছর পরে কোম্পানী সরকার ভিক্টোরিয়া-সরকারে রূপান্তরিক হওয়ার ফলে কৃপাচ্যুত শিক্ষিত হিন্দুর মনে আকস্মিকভাবে হিন্দুসত্তার মূল্য-মর্যাদাবোধ ও আত্মসম্মানচেতনা জাগে। ফলে ১৮৬৭ সনে কোলকাতায় অনুষ্ঠিত 'হিন্দু মেলায়' তাদের ক্ষোভ, অভিমান ও ঐতিহ্যগৌরব অভিব্যক্তি পায়। এদিকে স্যার সৈয়দ আহমদের পরামর্শে ওয়াহাবী-সিপাহী পরাজয়ে দিশেহারা মুসলিম-মনে ব্রিটিশপ্রীতি ও সংখ্যাগুরু হিন্দুভীতি জাগরিত হতে থাকে। ব্রিটিশ এবার মুসলিম তোষণনীতি গ্রহণ করে ১৮৭০ সন থেকে। ১৮৭৩ সনে এ তোষণ মতলবেই W. W. Hunter রচনা করেন Indian Musalmans। ১৮৭০ সনে ওয়াহাবী বিচার শেষ হওয়ার পর থেকে ১৯৪৭ সন অবধি ইংরেজী শিক্ষিত মুসলিমরা ছিল ব্রিটিশ কৃপাকামী ও হিন্দুবিদ্বেষী। উনিশ শতকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৃতীয়পাদে ব্রিটিশ-বিদ্বেষ বাড়তে থাকে শিক্ষিত বেকার হিন্দুর মনে। ফলে লর্ড কার্জন প্রশাসনিক সুবিধের অজুহাতে মুঘলের সুবেহ্ বাঙ্গালা ব্রিটিশের বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীকে ভেঙে তিন টুকরো করলেন, উদ্দেশ্য মাথাচাড়া দিয়ে-ওঠা বাঙালী হিন্দুদের চিরদিনের জন্যে পূর্ববঙ্গে, বিহারে, উড়িশায় সংখ্যালঘু করে রাখা। বাঙালীহিন্দু এ ষড়যন্ত্র বুঝতে পেরে প্রাণপণ সংগ্রামে নামে। বাহ্যত আন্দোলনতো চলছিলই, আবার গোপনে সন্ত্রাসী বিপ্লবী দলও গড়ে তুললেন প্রথম মিত্র ১৯০৫ সনেই অনুসন্ধান সমিতি নামে, পরে যুগান্তর নামের দলও গড়ে উঠল। সংখ্যালঘু মুসলিমদের মধ্যে বিদেশাগত রইস মুসলিম বংশধরেরা বিদ্যায়-বিত্তে ছিল সর্বত্র লক্ষণীয়ভাবে প্রভাব-প্রতিপত্তিসম্পন্ন। কিন্তু বৌদ্ধ-হিন্দুজ নিম্নবর্ণের, নিম্নবর্গের ও নিম্নবিত্তের ও তুচ্ছ বৃত্তির মুসলিমদের মধ্যে শিক্ষার ঐতিহ্যই ছিল না। মুসলিম হয়ে মুনশী-মোল্লা-উকিল-কাজী হয়েছে কেউ কেউ, কিন্তু শাসন-প্রশাসন ছিল তুর্কী-মুঘলের প্রত্যক্ষশাসিত অঞ্চলেও হিন্দুর হাতে। আজো ওরা সেই প্রশাসনিক কুলবাচি ধারণ করে রয়েছে, যা দেশজ মুসলিম বিরলতায় দুর্লক্ষ্য। ওয়াহাবী নেতা সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী গোড়ায় ছিলেন ব্রিটিশবন্ধু, কোলকাতায় ইংরেজেরা তাঁকে বন্ধুজ্ঞানে সংবর্ধিত করেছিল। উর্দুভাষী রইস মুসলিমরা মুর্শিদাবাদের নওয়াব অবধি সবাই ইংরেজি ভাষা শেখার-শেখানোর পক্ষেই ছিল। প্রমাণ কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেন্ডার। দেশজ মুসলিমের শিক্ষার ঐতিহ্য ছিল না, দীক্ষিত হয়েও তারা নিযুক্ত ছিল ঘরানাপেশায়। তারা আরবী-ফারসীতেও সাক্ষর ছিল না, কাজেই ব্রিটিশ-বিদ্বেষবশে ইংরেজী শেখেনি–এ তত্ত্ব বা ধারণা ভুল। ব্রিটিশ সরকারের প্রয়াস সত্ত্বেও তাই হুগলী প্রভৃতি কলেজে, কোলকাতামাদ্রাসায় দেশজ মুসলিম শিক্ষার্থী মেলেনি। বিশ শতকের উষাকাল থেকেই গাঁয়ে গাঁয়ে বেকার শিক্ষিত হিন্দু প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণের সুবিধে পেয়ে সচ্ছল গৃহস্থ মুসলিমরা অর্থসম্পদে মানে মর্যাদায় আত্মোন্নয়নকল্পে সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে থাকে। ফলে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকেই বাঙলায় একটা মুসলিম শিক্ষিত শ্রেণী স্বল্পসংখ্যায় গড়ে ওঠে এবং তৃতীয় চতুর্থ দশকে এসব শিক্ষিতরা সরকারি চাকরিতে সংরক্ষিতপদ এবং নির্বাচনে স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথায় প্রতিনিধিত্ব দাবি করে। এভাবেই মুসলিম মনে উর্দুভাষীর নেতৃত্বে হিন্দুবিদ্বেষ প্রবল হতে থাকে। প্রাতিভাসিক সত্যও ছিল প্রত্যক্ষ। যেমন জমিদার, মহাজন, চাকুরে, উকিল, ডাক্তার, ব্যবসায়ী অর্থবিত্তশালী মাত্রই ছিল হিন্দু। জোতদার, তালুকদার, তরফদার, হাওলাদার, জমিদার মুসলিম সমাজে ছিল করগণ্য। বাদশাহর জাত তথা তুর্কী-মুঘলের জ্ঞাতি বলে পরিচিত দেশজ মুসলিমরা সহজেই তাদের অশিক্ষার, অজ্ঞতার, অনক্ষরতার, নিঃস্বতার, নিরন্নতার জন্যে দায়ী করল ব্রিটিশ-হিন্দুর ষড়যন্ত্রকে বা বিরূপতাকে। কাজেই মুহম্মদ আলী জিন্নাহর ও বাঙলাদেশের উর্দুভাষী শিক্ষিত বিত্তবান-জমিদার নেতাদের প্রেরণায়-প্ররোচনায় ও প্রবর্তনায় জিন্নাহর চৌদ্দ দফাকেই উপমহাদেশের মুসলিমেরা বর্ণহিন্দু শাসন-শোষণ-পীড়ন-বঞ্চনা মুক্তির সনদ হিসেবে কিংবা রক্ষাকবচ রূপে গ্রহণ করল, যা গোলটেবিল উত্তরকালে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক ১৯৩৫ সনের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ১৯৩৭ সনে বাস্তবায়নকালে তিক্ততম হয়ে ওঠে এবং পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হয়। চিত্তরঞ্জন দাসের বেঙ্গলপ্যাক্ট, মোতিলালের লাক্ষ্ণৌ চুক্তি, গান্ধীর খেলাফত-অসহযোগ আন্দোলন প্রভৃতি মিলনমুখী আপোসমূলক কোন ব্যবস্থাই ১৯২৬ সনের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা রোধ করতে পারল না কোলকাতায়, অন্যত্রও ঘটল দাঙ্গা দিল্লীতে, পাটনায় ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাওয়ালপিন্ডিতে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পর্যুদস্ত ব্রিটিশ সরকার ভারত ছাড়তে বাধ্য হল কংগ্রেসের আন্দোলনের তীব্রতার ফলে। ১৯৪৭ সনে পাঞ্জাবে রক্তাক্ষরা প্রাণহরা দাঙ্গায় এবং অন্যত্রও দিল্লীতে, কোলকাতায় ঢাকায় স্বাধীনতার মাসুল হিসেবে উপমহাদেশে ছয় লক্ষ লোক প্রাণ দিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য দ্বিখণ্ডিত হওয়ার পরিণামে লাভবান হল পূর্ববঙ্গের মুসলিমরা, পশ্চিম পাঞ্জাবের মুসলিমরা আর বিহার থেকে উত্তর ও মধ্যপ্রদেশ অবধি হিন্দুরা। উপমহাদেশের আর সবাই প্রত্যক্ষে কিংবা পরোক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিপর্যয়ে পর্যুদস্ত হয়েছে অর্থে সম্পদে ও আত্মীয় বিচ্ছেদে, আর জীবিকাক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা বৃদ্ধিতে।

১৯৪৭-৬৫ সনের মধ্যে বিত্তশালী হিন্দুর দেশ ত্যাগের ফলে একবার এবং ১৯৭১ সনে বাঙলাদেশ স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হওয়ার পরে আর একবার পাকিস্তানীদের পলায়নে-বিতাড়নে, আমাদের প্রথম বা দ্বিতীয় প্রজন্মে শিক্ষিত কিন্তু দরিদ্র বাঙালীদের অর্থে-সম্পদে নানা ঋজু ও বাঁকা পথে ঋদ্ধ হওয়ার সহজ সুযোগ ঘটল। এবং ১৯৪৭ সনের ও ১৯৭১ সনের পরে অর্থ-সম্পদে আত্মোন্নয়নের একমাত্র পন্থা যে শিক্ষিত হওয়া ও সন্তানদের শিক্ষিত করা নারী পুরুষ নির্বিশেষে তা অনুভব-উপলব্ধি করল বলে শিক্ষিতের হার অতি দ্রুত বেড়ে গেল। এর ফলে কয়েক হাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কয়েকশ' উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, অনেক মেডিক্যাল ও প্রকৌশল কলেজ, বহু বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। তারপরেও ভর্তির সমস্যা বাড়ছে। কারণ লক্ষ লক্ষ মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী থাকে প্রতিবছর, বিশ্ববিদ্যালয়ে ও কলেজে এখন উচ্চ শিক্ষা লাভ করছে লক্ষাধিক এবং সংখ্যা প্রতিবছর বাড়ছে। সে-হারে নয়, তার চারগুণ হারে বাড়ছে শিক্ষিত বেকার।

এর ফলে আমজনতার অজ্ঞতার সুযোগে প্রয়োগে বিশেষ করে সামন্ত-বুর্জোয়ামনের লুম্পেন বা উঠতি মধ্য শ্রেণীর লাভ-লোভ-স্বার্থচেতনার ও উচ্চাশার প্রভাবে রাজনীতি হয়েছে লুটপাট লক্ষ্যে গদী দখলের রাজনীতি। আমজনতার কল্যাণচেতনা কিংবা গণমানবকে শোষণমুক্ত করার ভাব-চিন্তা-আদর্শ-লক্ষ্য থাকে না এমনি রাজনীতিকের। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাতা নেতারা সব উত্তর ভারতের ও কোলকাতার তথা উর্দুভাষী জমিদারেরা ছিল বলেই পাকিস্তানে উর্দুই হল রাষ্ট্রভাষা। ১৯৫৭ সন অবধি কোন সংবিধানও তৈরি হল না এসব উত্তর ভারতীয় নেতা-শাসক সাংসদের কোন ভোট পাবার মতো গাঁয়ে গঞ্জে স্বভূম-স্বভিটে ছিল না বলেই। একটা সংবিধান দশ বছর পরে অনেক নেতার জীবননাশের ফলে তৈরি হলেও তাও প্রয়োগ বা বাস্তবায়ন সম্ভব হল না। ১৯৫৮ সনে ক্যু করে জঙ্গীনায়ক আইয়ুব ক্ষমতার গদীতে বাদশাহ তথা স্বৈরশাসক হয়ে দশ বছর চালালেন। বুনিয়াদী গণতন্ত্রের নামে গ্রামীণ পর্যায়েও ক্ষমতাবান দালালদের দুর্নীতিবাজ হওয়ার সুযোগ দিয়ে তাদের চরিত্র নয় শুধু, গণচরিত্রও নষ্ট করলেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৫২ সনের, ১৯৬২ সনের, ১৯৬৯ সনের ও ১৯৭১ সনের আন্দোলন করতে হল ও মরতে হল বাঙালীকে দেড় হাজার মাইল দূরের আকৃতিতে-প্রকৃতিতে-বর্ণে-ভাষায়-ভাবে-চিন্তায়, আবহাওয়ায়, পরিবেষ্টনীগত কারণে সাংস্কৃতিক চিন্তা-চেতনায়ও ভিন্ন কেবল সামান্য শাব্রিক সাদৃশ্যের [কেননা, শিয়া, সুন্নী, মযাহাবী, কাদিয়ানী, সুফী, ওয়াহাবী, পীর-দরগাবাদী নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলের চেয়ে অমিল বেশি] ভিত্তিতে মুসলিম ভ্রাতৃত্বের বন্ধনমুগ্ধ হুজুগে ও হীনম্মন্য বাঙালী নেতারা সোল্লাসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একক পাকিস্তান রাষ্ট্রভুক্ত হতে রাজি হল বলেই। এ ছিল তাদের অবিমৃষ্যকারিতারই মাসুল, যা ছিল লক্ষ লক্ষ প্রাণহরা ও মা-বোন-কন্যা-জায়ার ইজ্জতহরা।

আমাদের রক্তাক্ত বিপ্লবে আস্থাবান বামপন্থী রাজনীতিকরা ১৯৬৬ সনেই নীতিগত পার্থক্যে বিভক্ত বিখণ্ডিত হয়ে যান। সিরাজ শিকদার নিহত হন, জাতীয়তাবাদী ধর্ম-নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী সরকারের হাতেই। মস্কোপন্থীরা তো বিপ্লবে আস্থা হারিয়ে ছিল, আস্থাবান হয়েছিল বিবর্তনে। স্বাধীন বাঙলার প্রতিষ্ঠা যাঁর নেতৃত্বে ও প্রেরণায়, তাঁর সময়েই একটা সেক্যুলার সংবিধান তৈরি হয়েছিল, প্রশংসিতও হয়েছিল, কিন্তু তিনিই 'বাকশাল' করে তা বর্জন করলেন। মুজিব-হত্যার পরে অদৃশ্য শক্তির বসানো পুতুল মুশ্‌তাক করালেন জেলে চার নেতাকে হত্যা। মুশাররফ ক্যু করতে গিয়ে ব্যর্থ হলেন, অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল আবু তাহের সিপাহী-জনতার অভ্যুত্থান ঘটিয়ে গদী দান করলেন জিয়াউর রহমানকে। তিনি সেনানীদের তুষ্ট করে হাতে রাখার এবং তাদের সমর্থন পাওয়ার গরজে কৃতঘ্ন হলেন তাহেরকে বিচারের নামে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে। জিয়াউর রহমান নিজে অর্থলোভী ছিলেন না, কিন্তু ক্ষমতালোভী ইসলামপন্থী ও পাকিস্তানদরদী ছিলেন। তাই রাজাকার ও ইসলাম হল তাঁর শক্তির উৎস। তিনি ইসলামের নামে রাজাকারদের সহযোগী করে রাজত্বই করলেন সাড়ে ছয় বছর। নিজের সুনাম বজায় রাখলেন সৎ বলে। কিন্তু গোটা দেশের লোকদের দুর্নীতিবাজ করে তুললেন জনপ্রিয়তা লক্ষ্যে প্রশ্রয় দিয়ে। হোসেন মুহম্মদ এরশাদ ক্যু করে গদীতে বসলেন, তাঁর কোন নৈতিক আদর্শিক চেতনা ছিল না। ধূর্ততায় তিনি ছিলেন অনন্য। পাপ-পুণ্যবোধও ছিল না তাঁর, তাঁর নীতি ছিল যখন যেমন তখন তেমন ভোল ধরা। এ বহুরূপী খেলতে ও খেলাতে জানতেন। বলতে হয় জবরদস্ত হায়া-শরম-সংকোচহীন অভীক খেলোয়াড়। তবু সব কিছুর শেষ থাকে। তাই তাঁরও পতন হল।

পৃথিবীর পরাশক্তিগুলোর তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রের খাতক মুৎসুদ্দী শাসকরা বিদেশীর আর্থ-বাণিজ্যিক ও সামাজিক মহাজনী স্বার্থেই তাদেরই আদেশে-নির্দেশে-পরামর্শে-মদদে দেশ শাসন করেন মান-যশ-খ্যাতি-ক্ষমতা-অর্থসম্পদ-প্রভাব-প্রতিপত্তি-দর্পদাপট অর্জন-উপভোগ-অনুভব করে ধন্য হওয়ার জন্যে। কাজেই অজ্ঞ-অনক্ষর-নিঃস্ব-নিরন্ন-দুস্থ-দরিদ্রদুষ্ট দেশে সামন্ত-বুর্জোয়ামনের আদর্শহীন পুঁজিবাদীর গণতান্ত্রিক সরকার নামে গণতান্ত্রিক বটে, কার্যত অজ্ঞ-উপেক্ষিত-অনক্ষর লোকের ভোটতান্ত্রিক সরকার। কাজেই স্বৈর ও স্বেচ্ছাচারী সাংসদ-মন্ত্রী-আমলা-প্রশাসকের হুকুম-হুমকি-হুঙ্কার-হামলামুক্ত থাকে না শাসনপাত্ররা। আমাদের আজকের এ মুহূর্তের রাজনীতি হচ্ছে মস্তান-গুণ্ডা-খুনীবাহিনী নিয়ন্ত্রিত রাজনীতি। শিষ্টের দমন ও দুষ্টের লালনই এখন নীতি-নিয়ম। শিষ্ট দুর্বল জান-মালের অনিরাপত্তার অনিরুপদ্রবের অনিশ্চয়তায় শঙ্কিত, ত্রস্ত, আর দুষ্ট-দুর্জন-দুর্বৃত্ত-দুষ্কৃতীর নিরাপদ আবাস এ রাষ্ট্র। কাজেই ব্রিটিশ পরবর্তী সাতচল্লিশ বছরেও আমাদের রাজনীতিক অঙ্গনে ও সে-কারণে পরিবারে সমাজে সংস্কৃতিতে শাসনে প্রশাসনে দফতরে স্কুলে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে আদালতে, ব্যবসা-বাণিজ্যে আড়তে কারখানায় হাসপাতালে কোথাও স্বস্থতা ও সুস্থতা প্রত্যাশিত গুণে-মানে-মাপে-মাত্রায় আসেনি। আমরা সর্বক্ষেত্রে অনিশ্চিতির শিকার। একটা লুটেরা শ্রেণী দুর্নীতি-কালোবাজারী ও জবরদখল আর প্রতারণার মাধ্যমে গড়ে উঠেছে বটে, তাদের মধ্যে ধনকুবেরও আছে বটে, অন্যরা গাড়ি-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাড়ি বিদ্যা-বিত্তের মালিক। কিন্তু দেশের অন্তত নয় কোটি লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। আমজনতার দারিদ্র্য বেড়েছে।

ঙ. সাহিত্য

স্বাধীনতা অর্জনের চেয়েও এ শতকের আমজনতার পক্ষে সবচেয়ে গুরুতর ঘটনা হচ্ছে জমিদারী প্রথার তথা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিলোপ। দাসত্বের, ক্রীতদাসত্বের চেয়েও মনুষ্যত্ববিনাশী ছিল এ জমিদারী প্রথা। কেননা ব্যক্তি মানুষের বিদ্যার, চরিত্রের, আদর্শনিষ্ঠা, মানবিকগুণের পরার্থপরতার গুরুত্ব প্রভৃতি কিছুরই স্বীকৃতি ছিল না জমিদারের কাছে। প্রজামাত্রই যেন ছিল অবজ্ঞেয় মানবিক গুণ-মানহীন প্রাণীমাত্র জমিদারের চোখে। জমিদারী উচ্ছেদের ফলে ব্যক্তির জাত জন্ম বর্ণ ধর্ম ভাষা নিবাস যোগ্যতা বৃত্তি নির্বিশেষে ব্যক্তিকে মানুষ রূপে স্বীকার করা হল। বস্তুত জমিদারী উচ্ছেদেই মানুষের ব্যক্তিসত্তার স্বাতন্ত্র্য-স্বাধীনতা-মর্যাদা স্বীকৃতি পেল। এ প্রথম আমাদের দেশে নির্বিশেষ মানুষ মুক্তির স্বাদ পেল। এখন ভিক্ষার জন্যে, চাঁদার জন্যে কিংবা চাকরির জন্যে ধর্না দিতে না হলে যে-কোন ধনী-মানী-খ্যাতি-ক্ষমতা-প্রভাব-প্রতিপত্তি-দর্পদাপট সম্পন্ন ব্যক্তি, মন্ত্রী, সাংসদ, আমলাকে অভীকচিত্তে উঁচুমাথায় উপেক্ষা করা চলে। জমিদারীতে মনুষ্যত্বের অবমাননা ছিল, এখন তা আর নেই। আজ সবাই ধন মান যোগ্যতা পেশা নির্বিশেষে নাগরিক ও ভোটার। এর ফলে ব্রাহ্মণ্য বর্ণবাদজাত অন্ত্যজ অস্পৃশ্য-স্পৃশ্য শূদ্রের প্রতি ঘৃণা-অবজ্ঞাও কমেছে। অসবর্ণ বিয়েও সম্ভব হচ্ছে। উনিশ শতকে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে প্রতীচ্য সাহিত্য-সংস্কৃতি-বিজ্ঞান-দর্শনের সঙ্গে পরিচিতির এবং প্রভাবের ফলে আমাদের মধ্যে সাহিত্যক্ষেত্রে আমজনতার থেকে ইংরেজী শিক্ষিতজনের মানস ও ব্যবহারিক জীবনের ভাব-চিন্তা-কর্ম-রুচি-আচরণে বিচ্ছেদের ও ব্যবধানের এক অলঙ্ঘ্য দেয়াল তৈরি হয়ে গেল। প্রতীচ্য বিদ্যার আর দেশী বিদ্যার লোকের সাহিত্যও চিরকালের জন্যে আলাদা হয়ে গেল। সাহিত্যক্ষেত্রেও সৃষ্টি হল দুটো সম্প্রদায়। আগে আমাদের সাহিত্য ছিল শিক্ষিত সাক্ষরের রচিত এবং পাঠক ও শ্রোতা ছিল যোগ্যতা ও পেশানির্বিশেষে দেশের সব কৌতূহলী নারী-পুরুষ। কেননা সাহিত্য ছিল গেয়। পাঠক পড়ত পদ্যে বা ছন্দে লিখিত কাব্য, আর শ্রোতারা তা শুনেই সাহিত্যরস উপভোগ করত। আর যাত্রা-কথকতা তো ছিল নাট্যগুণের একাধারে ও যুগপৎ দৃশ্য ও শ্রাব্য কাব্য। কাজেই আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রে সাক্ষরে শিক্ষিতে ও নিরক্ষরে কোন পার্থক্য ছিল না। সাহিত্য ছিল সার্বজনিক সম্পদ ও উত্তরাধিকার।

তবে এ-ও স্বীকার্য যে সত্যিকার অর্থে আমাদের ভাষা বাঙলায় প্রাচীন যুগের চর্যাপদ, শেখশুভোদয়া প্রভৃতিসহ মধ্যযুগেও কোন বিশুদ্ধ সাহিত্য ছিল না, রচিতই হত না। বিশুদ্ধ সাহিত্য ছিল প্রায় দেড় হাজার বছর আগে থেকেই সংস্কৃতে। সংস্কৃত ছিল কেবল শাস্ত্রের নয়, প্রশাসনের ও সাহিত্যের ভাষাও। বাঙলা হল লোকভাষা-উপভাষা-প্রাকৃতজনের বিকৃতভাষা। সংস্কৃত থেকে প্রাকৃত অপভ্রষ্ট বা অবহট্ট স্তরে বিবর্তিত ও বিকৃত হয়ে হয়ে এবং আবার শতে সত্তরটা সংস্কৃত শব্দ গ্রহণ করে আমাদের আজকের লেখা বা লিখিত বাঙলা ভাষা গড়ে উঠেছে— সাধুরীতি সাধারণভাবে বিলুপ্ত হয়ে এখন চলতি রীতিই লেখ্যভাষা রূপে স্ব ও সুপ্রতিষ্ঠ হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা একালে ধর্মশাস্ত্রকে ও নীতিকথাপ্রধান রচনাকে সাহিত্য নামে আখ্যাত করি না। মধ্যযুগের হিন্দুরচিত সাহিত্যমাত্রই ধর্ম ও দেবতা সম্পৃক্ত রচনা। এক কথায় অরি-মিত্র লৌকিক দেবতার মাহাত্ম্য বয়ানই ছিল রচনার বিষয়। এগুলো এখন মঙ্গলকাব্য বা মঙ্গলপাঁচালী নামে আখ্যাত। রামায়ণ-মহাভারতও অবতার পাঁচালী মাত্র। সাধারণের অধিকার ছিল না সংস্কৃত শেখার বর্ণে বিন্যস্ত ব্রাহ্মণ্য সমাজে। তা ছাড়া মধ্যযুগ ছিল পৃথিবীব্যাপী নিরপক্ষরতার কাল। শিক্ষিতের সংখ্যা ছিল দুনিয়ার সর্বত্রই স্বল্প। লোকশিক্ষার লক্ষ্যেই শাস্ত্রকথা, দেব-মাহাত্ম্যকথা বাঙলায় পাঁচালীর রূপে রসে ও ছন্দে রচিত ও গেয় হয়েছে বৈঠকে আসরে। কেননা সংস্কৃতে রচিত 'পুরাণ পড়িতে নাই শূদ্রের অধিকার।' তাই বাঙলায় শাস্ত্র ও দেবমাহাত্ম্য জানানোর এ প্রয়াস। ঐসব ধর্মসাহিত্যকে আমরা বিশুদ্ধ গল্প-নাটক-কাব্য-উপন্যাসের অভাবে 'সাহিত্য' হিসেবে গ্রহণ ও বরণ করে নিয়েছি। অবশ্য সে-কালেও অলিখিত রূপকথা, উপকথা, ইতিকথা, নীতিকথা-মূলক বিনোদন সাহিত্য মুখে মুখে বৈঠকেও আসরে বয়ান করা হত।

দেবতা লৌকিক হলেও এগুলো নিতান্ত মুখে মুখে কানে কানে প্রজন্মক্রমে চালু রূপকথা বা লোক [ফোক] সাহিত্য নয়। এগুলোতেও সাহিত্যের সব রস বিন্যস্ত রয়েছে, জ্ঞান-প্রজ্ঞা-শিল্প সৃষ্টির শক্তিসম্পন্ন বিজ্ঞ ও বিদ্বান ব্যক্তির সযত্ন স্বপরিকল্পিত রচনা। ধর্ম ঠাকুর, পীর-নারায়ণ সত্য, চণ্ডী, মনসা, বনদেবী, ষষ্ঠীদেবী, শনি, শীতলা, ওলা, বৎসলা, ক্ষেত্রপাল প্রভৃতি সব দেবতার মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে। এমন যে ত্রিগুণাতীত শিব, এমন যে গৌরী-কালিকা, ওরাঁও লৌকিকদেবতা রূপে দরিদ্র আমজনতার ঘরের লোক হিসেবেই দোষে-গুণে নর-নারী চরিত্র রূপে অঙ্কিত হয়েছেন। এ সূত্রে ভারতচন্দ্রের ও রামেশ্বর ভট্টাচার্যের অলস গাঁজারু ভাঙধুতুরাসেবী ভিক্ষাজীবী শিবের দাম্পত্য ও গার্হস্থ্য জীবন স্মর্তব্য। ফলে এ দেবমাহাত্ম্য সাহিত্যেও আমরা কালকেতু, ফুল্লরা, ধনপতি, চাঁদ, বেহুলা, ভাঁড়ু দত্ত, মুরারিশীল প্রভৃতি বাঙালী চরিত্র এবং বাঙালীর সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা বিজড়িত জীবনচিত্র পাই। 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে'-এর চেয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষা-স্বপ্ন-সাধ বিদেশী-বিজাতি-বিভাষী শাসিত-শোষিত-অবজ্ঞাত দরিদ্র বাঙালীর মনে জাগেনি।

মুখে মুখে রচিত বহু মনের মননের পরিচর্যায় ও রঙে ঋদ্ধ পূর্ববঙ্গ-ময়মনসিংহ গীতিকা আমাদের লোক-সাহিত্যে অতুল্য গৌরবের। গর্ব করবার মতো জীবনসত্যের অভিব্যক্তি। প্রেম-কাম-পীড়ন-বিরহ-বিচ্ছেদ কণ্টকিত জীবনের অপরূপ অনন্য বাস্তব চিত্র মেলে এসব গাথায় আর ফোকলোর ও লোকসাহিত্য লোকজীবনের বাস্তব অনুভব-উপলব্ধি অভিজ্ঞতা থেকেই উদ্ভূত এগুলো যতটা সাহিত্য তার চেয়ে বেশি নৃবিজ্ঞানীর মানব ইতিবৃত্তের অপরিহার্য উপকরণ, উপাদান। আর পীর-নারায়ণ সত্যের পাঁচালীতে, প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমতবাদী বাউল বৈরাগীর মধ্যে আমরা মধ্যযুগে হিন্দু-মুসলিমের মিলন-ময়দান তৈরি হতে দেখি। রাধা-কৃষ্ণও হিন্দু-মুসলিমদের গান রচনার অবলম্বন হয়েছিল। যদিও তত্ত্বগত পার্থক্য ছিল। মধ্যযুগে মুসলিমরচিত ফারসী-হিন্দি-উর্দু সাহিত্যেও সূফীতত্ত্ব প্রাধান্য পেয়েছিল। এ তত্ত্বের রূপকসাহিত্য নারী-পুরুষের, নায়ক-নায়িকার প্রেম-বিরহ-বিচ্ছেদ কাহিনী হিসেবে বর্ণিত হয়েছিল। আমাদের বাঙলা তর্জমায় কিন্তু অধ্যাত্মরূপক রক্ষিত হয়নি বলে এগুলো কেবল মানবিক প্রণয়ণকাহিনী রূপে বিশুদ্ধ রোমান্টিক সাহিত্য আখ্যায় আমাদের গৌরবের গর্বের অবলম্বন হয়েছে। এগুলো মন্ত্রীর ও ধনী লোকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিপোষণে অনূদিত, এ শ্রেণীর লোক মর্ত্য-জীবনের প্রেমরসের রসিকতাই অধ্যাত্মরূপক অনুবাদে বর্জিত।

মধ্যযুগের হিন্দুর সাহিত্য ছিল লোকশিক্ষার লক্ষ্যে রচিত ধর্মসাহিত্য মুসলিমদেরও ধর্মসাহিত্যই ছিল প্রধান, তবে তার সঙ্গে ছিল কালোপযোগী বিশুদ্ধ কিন্তু স্বাধীন অনুসৃতি বা গ্রহণ-বর্জন-সংযোজনমূলক তর্জমায় রোমাঙ্স ও রোমান্টিক সাহিত্য। হিন্দুদের মঙ্গলপাঁচালী অনেকাংশে মৌলিক হলেও পুচ্ছগ্রাহিতাদুষ্ট। পলাশী যুদ্ধোত্তর পরিবর্তমান আলো-আঁধারিতেও কুয়াশার জালাবদ্ধ অন্তর্বর্তীকালে ঝড়াক্রান্ত নীড়-ভাঙা পাখির মতো হিন্দু হলেন [১৮৬০ সন থেকে] ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পর থেকে ভাত-কাপড় যোগাড়ের বাহ্য প্রয়োজনে এবং কবিত্ব প্রকাশের আন্তরপ্রেরণায় বন্দর শহর ও রাজধানী কোলকাতাবাসী। এঁরা অবজ্ঞায় ব্যাকরণসম্মত কবিতাওয়ালা নয়, 'কবিওয়ালা' নামে চরম তাচ্ছিল্যে আখ্যাত হলেন। মুসলিম সমাজে হাওড়া-হুগলির উর্দুওয়ালার বংশধর বা উর্দুওয়ালা প্রভাবিত কবি ফকির গরীবউল্লাহ ও সৈয়দ হামজা মুসলিম পাঠকদের জন্যে লিখলেন ও তর্জমা করলেন হিন্দুস্তানী [উর্দু-হিন্দি] মিশ্রিত বাঙলার রোমান্টিক পাঁচালী। উনিশ শতকের শেষ অবধি এ দোভাষী সাহিত্য রচিত হচ্ছিল। কবিওয়ালারা উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকেই কমছিল।

ইংরেজী শিক্ষিতরা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লিখিয়েদের প্রভাবে গদ্য চর্চা শুরু করেন কোলকাতায়, যদিও ইংরেজরা আইনের বই অনুবাদ শুরু করছিলেন এবং আঠারো শতকের শেষপাদ থেকে বাইবেলও। পর্তুগীজদের প্রয়াস বাঙালীদের প্রভাবিত না করলেও অবশ্যই উল্লেখ্য। যা হোক ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে ইংরেজ কোম্পানী অধিকৃত ও শাসিত ভারতের ভাষাগুলো প্রশাসকদেরও শেখানোর জন্যেই ভাষাক্রম ব্যাকরণ তথা সব ভাষার ব্যাকরণ ও পদ্যগ্রন্থ রচনা করানোর ব্যবস্থা হয়। কোলকাতা রাজধানীতে অন্য শিক্ষিতরাও গদ্য রচনায় এবং পত্রিকা প্রকাশনায় উৎসাহিত হন। অবশ্য এতে শ্রীরামপুরের মিশনারীদেরও প্রভাব অবশ্য স্বীকার্য।

ভবানীচরণ-রামমোহন-রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয়-তারাশঙ্কর-বিদ্যাসাগর-অক্ষয়দত্ত-ভূদেব-বঙ্কিম-মীর মুশারফ-কেশব সেন-দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর-বিবেকানন্দ-মাইকেল মধুসূদন-হেমচন্দ্র-নবীন সেন-বিহারীলাল-দীনবন্ধু-গিরীষ ঘোষ প্রমুখ হয়ে রবীন্দ্রনাথকে মধ্যহ্ন মার্তণ্ড রূপে সাহিত্যাকাশে নিয়ে বিশশতক শুরু হল। মধ্যযুগে যেমন পীর-নারায়ণ সত্য ও তাঁর চেলা উপদেবতাদের মাহাত্ম্যকথা এবং রাধা-কৃষ্ণ রূপকে প্রণয়গীতি ব্যতীত হিন্দু-মুসলিমের সাহিত্যধারা ছিল ভিন্ন। প্রতীচ্য শিক্ষা প্রভাবিত লেখকদেরও গীতিকবিতা ব্যতীত অন্য বিষয়ক কাব্য-নাটক-গল্প-উপন্যাস রচিত হচ্ছিল হিন্দুর ও মুসলিমের চেতনা-চিন্তার এবং অতীত ও ঐতিহ্যানুগ স্বতন্ত্র ধারায়। এমনকি বাঙালী খ্রীস্টান-ব্রাহ্ম-হিন্দু সাহিত্যিকের এবং মুসলিম সাহিত্যিকের রচনার বিষয় ও লক্ষ্য রইল ভিন্ন। হিন্দুদের রচনায় রেনেসাঁস ও রিভাইবেলিজম দুটোই দেখা গেল, আস্তিক্যের নাস্তিক্যের নিরীশ্বরবাদের অভিব্যক্তি দানও প্রায়-নির্বিঘ্ন ছিল।

দ্রোহী রামমোহন ব্রাহ্ম সমাজকে বিমূর্ত ঈশ্বর উপাসনায় প্রবর্তনা দিলেন, অক্ষয় দত্ত, বিদ্যাসাগর, কৃষ্ণকমল, রামকমল, বঙ্কিম নাস্তিক্য কিংবা অজ্ঞেয়বাদ অঙ্গীকার করলেন, অনেকেই প্রত্যক্ষবাদী হলেন, থিওসফিস্টও হলেন কেউ কেউ। দেবেন ঠাকুর, কেশব সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ অনেকেই ব্রাহ্মবাদ প্রচার করে খ্রীস্টধর্মের প্রসার রোধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করলেন, আবার রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ব্রাহ্মমতবাদের জনপ্রিয়তা হ্রাস করে দিলেন। নতুন উদার মাতৃরূপা আদ্যাশক্তির মহিমা-মাহাত্ম্য জনপ্রিয় করে তুললেন রামকৃষ্ণ। ইংরেজী শিক্ষাবঞ্চিত মুসলিমরা ওয়াহাবী-ফরায়েজী আন্দোলন ও সিপাহী বিপ্লব মাধ্যমে ব্রিটিশ বিতাড়নের শেষ চেষ্টা করে পরাজয়ের গ্লানি ও হতাশা নিয়ে দিশেহারা জীবনে কিছুকাল হতভম্ব হয়ে রইল। তারপর স্যার সৈয়দ আহমদের প্রবর্তনায় ও জালাল উদ্দীন আফগানীর প্রেরণায় যথাক্রমে ব্রিটিশপ্রীতি ও বিশ্বমুসলিম ভ্রাতৃত্ব ও জাগরণবাদী হয়ে উঠল। তাদের সাহিত্য অতীত ও ঐতিহ্য প্রীতিতে রইল সীমিত। বিশশতকে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের প্রভাব অতিক্রম করে মোহিতলাল, যতীন্দ্রনাথ, পরে ত্রিশের অন্তর্মুখী (Introvert) কবিদের আর নজরুল-জসীম উদ্দিনের মতো ভিন্ন রসের কবির এবং নরেশ সেনগুপ্তের মতো দ্রোহী ঔপন্যাসিকের আবির্ভাব ঘটে। ঘটে তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে গল্পে-উপন্যাসে বৈচিত্র্য–তারাশঙ্করে, বিভূতিভূষণে ও মানিকে। মুসলিম সমাজেও দ্রোহী দরদী নজরুলের এবং রামমোহনপন্থী সমকালোপযোগী সংস্কার ও উদারতাকামী 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' গড়ে ওঠে ঢাকায়। 'শিখা' ছিল এ সমাজের মুখপত্র। শিখার শেখরে ছিল 'জ্ঞান যেখানে সীমিত, বুদ্ধি সেখানে, আড়ষ্ট, মুক্তি যেখানে অসম্ভব'। লক্ষ্য ছিল মুক্তবুদ্ধির অনুশীলন, তাঁদের ভাষায় 'বুদ্ধির মুক্তি'। এ সময়ে বেগম রোকেয়া নারীমুক্তি আন্দোলন শুরু করেন। মুসলিম সমাজে রেনেসাঁস বা মুক্তচিন্তার সূচনা দেখি আবুল হোসেনে, কাজী মোতাহার হোসেনে, আনোয়ার কাদিরে, কাজী ইমদাদুল হকে, কাজী আবদুল ওদুদে ও রোকেয়ায়। অযোধ্যা থেকে আগত আবদুর রহিম ও প্রথম মুসলিম স্নাতক আহমদ ওর্ফে ডেপটি ম্যাজিস্ট্রেট দেলওয়ার হোসেন উর্দুভাষী ছিলেন বলে এ দু'জনের নাস্তিক্য মুসলিমবাঙলার সমাজকে প্রভাবিত করেনি। দেলওয়ার হোসেন লিখেছেন ইংরেজীতে, রহিম লিখেছেন উর্দুতে, ফারসীতে। এমনকি রোকেয়ার প্রভাবও সমকালীন গোঁড়া মুসলিম সমাজ স্বীকার করেনি। যদিও কোলকাতায় কার্যত উর্দুভাষীর জন্যে রোকেয়া এবং কুমিল্লায় হিন্দু-মুসলিম বাঙালী মেয়েদের জন্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন নওয়াব ফয়েজুননিসা।

প্রথম জাত জন্ম ধর্ম ধর্ম ভাষা নিবাস যোগ্যতা নির্বিশেষে মানুষের জন্যে অসাম্প্রদায়িক আদর্শে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা লক্ষ্যে মার্কসবাদী সাহিত্য রচিত হয় বিশশতকের দ্বিতীয়পাদের শেষ দশক থেকে গোপাল হালদার, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, বিজন ভট্টাচার্য, তুলসী লাহিড়ী থেকে সত্যেন্দ্রনাথ সেন, সমর সেন প্রমুখ অনেকের নামই স্মরণীয় এক্ষেত্রে। মার্কসীয় তত্ত্বসম্মত না হলেও বঙ্কিমচন্দ্রকে ও নজরুল ইসলামকে এ ক্ষেত্রে পথিকৃতের সম্মান দেয়া যায়। উৎকর্ষে বাঙলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ না হলেও এখনকার হিন্দু-মুসলিম কম্যুনিস্ট রচিত সাহিত্যের প্রভাব কিন্তু গভীর ও ব্যাপক হয়েছে। এখনকার দিনের পাঁড় সামন্ত-বুর্জোয়া কিংবা আস্তিকেরাও মানবতার মানবিকতার মানববাদর নিন্দা করাকে নিজেরই যুক্তি-বুদ্ধি-প্রজ্ঞা-বিবেক ও সংস্কৃতিহীনতার পরিচায়ক বলে মনে করে। অন্তরে না হোক, মুখে অন্তত সবার জন্যে আর্থিক সুবিচার প্রয়োজনীয় বলে স্বীকার করে।

উপসংহার : আমরা শতাব্দীর ইতিবৃত্তান্ত লিখতে বসিনি, কেবল বিবর্তনধারার রূপরেখা অঙ্কনের প্রয়াস পেয়েছি মাত্র। এখানে আমরা বিবর্তনধারার সূত্র ও স্বরূপ উল্লেখ করেই আমাদের বক্তব্য শেষ করছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১. এ শতকেই মুসলিম সমাজে ইংরেজী শিক্ষার প্রসার ঘটে। এবং ফলে বিভিন্ন শাখায় স্রষ্টা ও গবেষক সংখ্যায় যেমন বেড়েছে, তেমনি গুণে মানে মাপে মাত্রায় তাদের অনেকের দান উপেক্ষা করার মতো থাকেনি। এখন কেবল বাঙলাদেশের নয়, গুণে মানে অবদানে বাঙলা ভাষার প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও অন্যান্য শাখার কলাকার মেলে।

২. নারীমুক্তি ঘটেছে শিক্ষিত-অশিক্ষিত সমাজেও, পর্দার অবগুণ্ঠনের কড়াকড়ি নেই, বোরখা বলতে গেলে উঠেই গেছে, শহরে এবং গঞ্জে বন্দরে এখন কায়িক শ্রমেও সহকর্মী আর সহশিক্ষা, সহচাকুরে, নার্স, জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, ব্যাঙ্ককর্মী, নাচে-গানে বাজনায়-নাটকে-চলচ্চিত্রে অভিনয়ে নিঃসঙ্কোচ উচ্চশিক্ষিতা নারী মেলে।

সমাজে নারী-পুরুষের সমানাধিকার স্বীকৃত হয়েছে, রাজনীতিতেও। নারীশিক্ষার আবশ্যিকতা উপলব্ধ হয়েছে, গাঁয়েও অশিক্ষিত পরিবারেও মেয়েদের উচ্চশিক্ষা দানের আগ্রহ ও রীতি চালু হয়ে গেছে।

৩. সাহিত্য এখন বাস্তবমুখী ও মানবমুখী হয়েছে, এখন সাহিত্য চিত্র ভাস্কর্য প্রভৃতি সব কলাই যে জীবনের জন্যে, জীবন-চেতনা থেকে বাস্তব প্রয়োজনে উৎসারিত, তা আর অস্বীকৃত হয় না।

৪. ইহুদী-খ্রীস্টান-হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম এখন সবাই শাস্ত্রিক বিধিনিষেধ লঙ্ঘন ও উপেক্ষা করে চলছে। বিজ্ঞানের প্রসাদে জীবনযাপন ও ভাব চিন্তা-কর্ম-আচরণ পদ্ধতি বদলে গেছে। শাস্ত্রনিষ্ঠ থাকা ও আক্ষরিকভাবে মানা দুনিয়ার কারুর পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। আশৈশব শ্রুত-লব্ধ-বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা পালাপার্বণ যদিও আস্তিকমানেরই জীবনযাত্রা কম বেশি নিয়ন্ত্রণ করে, তবু গতানুগতিক রীতিতে অভ্যস্ত লোকেরা মন-মগজ-মনন-মনীষা প্রয়োগে উপযোগ যাচাই-বাছাই করে না বলে তাদের প্রাত্যহিক জীবনভাবনায় ও জগৎচেতনায় এবং কর্মে আচরণে কোন সঙ্গতি-সামঞ্জস্য থাকে না। তারা যখন যেমন তখন তেমন নীতিবশেই স্ববিরোধী ও স্ববিশ্বাসের বিপরীত কর্ম-আচরণে প্রলুব্ধ জীবনে বিরত থাকে না। তাই আস্তিক হয়েও, ইহ-পরলোকে প্রসৃত জীবনে আস্থা রেখেও করে না হেন শাস্ত্রবিরোধী অপকর্ম-অপরাধ নেই। এ কালে বিজ্ঞানের প্রসাদলিপ্সুরা নিজেদের ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগ বাঞ্ছাবশে শাস্ত্রকে বর্জন, লঙ্ঘন কিংবা উপেক্ষা করছে। হাসপাতালে নার্সের, বিমানে বিমানবালার সেবা নিচ্ছে। য়ূরোপীয়দের আবিষ্কৃত উদ্ভাবিত বিজ্ঞানের তত্ত্বে, তথ্যে ও সত্যে এবং বিজ্ঞানী নির্মিত তার-বেতার যন্ত্রে প্রকৌশলে প্রযুক্তিতে, চিকিৎসাবিজ্ঞানে কেবল আস্থা নয়, বাস্তবজীবনে গ্রহণ আর ব্যবহারও করছে সন্ত, সন্ন্যাসী, দরবেশ, মৌলবী, শ্রমণ, শ্রাবক, পাদ্রী, রাব্বী সবাই।

৫. রেডিও, টিভি, ক্যাসেট, ডিস অ্যান্টেনা, চলচ্চিত্র প্রভৃতির এবং যানবাহনের বদৌলত পৃথিবী এখন দরজা-জানালাবদ্ধ ঘরে এসে চোখে ধরা দেয়, কানে তুলে দেয় দুনিয়ার খবর। এ অবস্থায় আমাদের জীবন হয়ে উঠেছে বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক। এর মধ্যেই আমাদের নিত্যব্যবহার্য কিছুই স্বদেশী নেই, সবটা য়ূরোপীয় আদলে তৈরি। আমাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, দার্শনিক, চিকিৎসা বিষয়ক চিন্তা-চেতনা য়ূরোপ প্রভাবিত হয়েই গেছে। এমনকি আমাদের চরস, গাঁজা, ধুতুরা, ভাঙ, ধেনো-তাড়ি, আফিম, তামাক, বিড়িও, চুরুটে সিগারেটে হিরোইনে মারিজুয়ানায় কোকেনে প্যাথড্রিনে ককটেল মদে বিবর্তিত হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬. অন্তরে চরিত্রে আদর্শ না হলেও আজ মুখে সবাই গণতান্ত্রিক, মানবসাম্যে আস্থাবান আর যুদ্ধবিরোধী ও আন্তর্জাতিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ককামী। এখন আপনাকে পর এবং পরকে আপন করার ও ভাবার দিন এসে গেছে। তাই বাঙালীরাও বিদেশমুখী এবং বিদেশে স্থায়ী বসবাসে আগ্রহী।

৭. অসবর্ণ, আন্তঃসাম্প্রদায়িক, আন্তর্জাতিক দাম্পত্যেও আগ্রহ বেড়েছে।

৮. এখন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মূল্য-মর্যাদা দেয় সবাই। আজকাল একের অপরাধের অপকর্মের জন্যে পুরো পরিবারকে কেউ দায়ী করে না, নিন্দা-ঘৃণাও করে না তাই।

৯. মানুষ উদার হয়েছে অনেক। জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-নিবাস-যোগ্যতার জন্যে কেউ প্রকাশ্যে কারুর বিরুদ্ধে কোন মন্তব্য করা সংস্কৃতিমানতাবিরোধী ও রুচিহীনতা বলে মনে করে। সমাজ য়ূরোপীয় আদলে বিবর্তিত হচ্ছে এবং আন্তর্জাতিক আচার-আচরণে হচ্ছে অভ্যস্ত। আসরে আসনে আহারে স্পর্শে আজকাল আর কারো জাত যায় না।

১০. লাভ-লোভ-স্বার্থ বশে চারুবাক চাটুকার প্রতারক থাকবেই কিছু সুযোগ-সুবিধে সন্ধানী আমজনতার অনেকেই। মানুষ চিরকালই থাকবে শক্তের ভক্ত, নরমের যম ও পরস্বাপহারী। রাষ্ট্রিক পর্যায়েও দুর্বল রাষ্ট্রগুলো যেমন মার্কিন-অন্যায়ের জোর জুলুমের প্রতিবাদে তো সাহসই পায় না, বরং সাগ্রহ সমর্থন জানায় কৃপালোভে।

১১. সভ্যতা-সংস্কৃতি ও রুচির বিকাশের দরুন মানুষের কাঙ্ক্ষা ও রুচি বৃদ্ধি পায়। সে-কারণে জীবনযাপনের মান ও রুচি মেনে চলা বাড়ে। চাহিদা বাড়ে বৈচিত্র্যে ও সংখ্যায়। ফলে দ্রব্যমূল্য বাড়ে। মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। আমাদের ও আরো অনেক মুদ্রা প্রয়োজন হবে মাসিক জীবনযাপনের জন্যে। সভ্যতার ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দ্রব্যমূল্য চিরকালই বেড়ে চলেছে।

১২. মানুষের মতো হিংস্র ও প্রতিহিংসাপরায়ণ প্রাণী আর নেই। তবে হিংসার-প্রতিহিংসার পদ্ধতি পরিশীলিত হবে বিদ্যার, রুচির ও সংস্কৃতির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এবং আন্তর্জাতিক ও বৈশ্বিক সম্পৃক্ততার দরুন।

১৩. বিজ্ঞানের তত্ত্বের, তথ্যের ও সত্যের প্রভাবে মানুষের মধ্যে নাস্তিকতা-নিরীশ্বরতা বৃদ্ধি পাবে। ব্রিটেনে-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমকামিতার নারী-পুরুষের বৃদ্ধি ও বৈধতাই তার প্রমাণ। আরো প্রমাণ সাম্প্রতিককালে শাস্ত্রিক বিধি-নিষেধ তুলে দিয়ে কালের দাবি মেটানোর জন্যে সঙ্কট-সমস্যা উত্তরণের লক্ষ্যে আয়োজিত কায়রোর আন্তর্জাতিক সম্মেলন। শাস্ত্র সম্ভবত আর অর্ধশতাব্দীর মধ্যেই পৃথিবীর বিজ্ঞান-নির্ভর ও বিজ্ঞানীবহুল রাষ্ট্রে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এ শতকেই ডারুইন, কার্লমার্কস, নীট্‌শে, বার্ট্রান্ড রাসেল, ফ্রয়েড-পাভলভ, আইনস্টাইন-হকিং-প্রমুখদের প্রভাবে পৃথিবীর মানবের চেতনায়-চিন্তার বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন ঘটেছে। সমাজ-ভীরু শিক্ষিতরা তা প্রকাশ করতে সাহস পায় না মাত্র।

১৪. মানুষ দায়ে পড়েই অর্থাৎ কালগত জীবনের দাবি মেটানোর গরজেই গণতান্ত্রিক সমাজবাদ কিংবা সমাজবাদ ভিত্তিক গণতন্ত্র চালু করবে পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলোতে স্বার্থে সহিষ্ণুতায় সংযমে সামবায়িক সহযোগিতায় এবং ভাব আর পণ্য বিনিময়ে সহাবস্থানে অঙ্গীকারবদ্ধ হবে রাষ্ট্রান্তর্গত বিভিন্ন মতবাদী সম্প্রদায় ও বৃত্তিজীবী সম্প্রদায়গুলো এবং রাষ্ট্রিক পর্যায়েও বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি ও আবশ্যিক হয়ে উঠবে বাঁচার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও বর্ধিষ্ণু জনগণকে বাঁচানোর লক্ষ্যে। এখনই বাজার অর্থনীতির নামে, বাজার বিস্তৃতির নামে নাফতা, মাসস্‌খীট, আশিয়ান, ইইসি, গ্যাট, প্রভৃতি চালু হয়েছে।

স্বাধীনতার সার্বভৌমত্বের গৌরবগর্ব পরিহার করে ন্যাটোজোট বাঁচার গরজেই একক মুদ্রা ও পণ্য বাজার চালু করে প্রায় স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চলে পরিণত হচ্ছে স্বেচ্ছায়।

১৫. আমাদের উপমহাদেশেও তিনটে রাষ্ট্রের দুটো গৃহযুদ্ধ এড়াতে পারছে না। প্রাণহরা রক্তক্ষরা— এ সব যুদ্ধেও রাষ্ট্র বিখণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। পরে বাঁচার গরজে প্রায় সব রাষ্ট্রই ফেডারেশনে রাজি হবে। অন্যথায় টুকরো রাষ্ট্রগুলো অর্থসম্পদে বিপন্ন থাকবে। আদিবাসী, উপজাতি, জনজাতি নামে পরিচিতদের আর দলনে দমনে শায়েস্তা রাখা যাবে না। তাদেরও শোষণমুক্ত করে সমান নাগরিকত্ব দিতে হবে। ভারত-পাকিস্তান-মায়ানমারে কল্যাণ নিহিত রয়েছে আঞ্চলিক ও গৌত্রিক দ্বন্দ্বমুক্তির লক্ষ্যে রাষ্ট্রকে ফেডারেসি বা কনফেডারেসি করার মধ্যেই। এখন আমাদের উপমহাদেশের ও কনফেডারেসিতেই শ্রেয়স সন্ধান করাই হবে দূরদর্শিতার ও যৌক্তিক-বৌদ্ধিক সিদ্ধান্তের পরিচায়ক।

১৬. আমাদের শহুরে লোকেরা তো প্যান্ট-শার্ট পরছেই, কাজেই ক্রমে স্যুট ও সালোয়ার কামিজ স্কার্ট ও প্যান্ট-শার্ট মেয়েদের পোশাক হয়ে উঠবে। তার শুরু আমরা স্বচক্ষেই তো দেখছি।

১৭. আমাদের সাহিত্যে-শিল্পে-চিত্রে-অভিনয়ে, নাচ-গান-বাজনার তাল-লয়-সুরে এবং যন্ত্রেও আন্তর্জাতিক প্রভাব দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকবে। তাও এ ঢাকা শহরেই শুরু হয়ে গেছে।

১৮. ভাষা আন্দোলনে, মুক্তিযুদ্ধে, পয়লা বৈশাখ চেতনায় আমাদের বাঙালী সত্তাপ্রীতি বেড়ে গেছে বটে, আমরা বাঙালী পরিচয়ে গর্বও করব। কিন্তু দৈশিক সাংস্কৃতিক অতীত ও ঐতিহ্য পরিহার করব বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক সামঞ্জস্য ও সমকালীনতা রক্ষার লোভে, লাভে ও গরজে।

১৯. পুলিশ ও জল-স্থল-বায়ু সেনা যখন থাকবে, মারণাস্ত্রের গবেষণা চলতে থাকবে। উৎকর্ষ আরো বিস্ময়কর হয়ে উঠবে এবং পৃথিবীতে এসব নানা কারণে রোগের সংখ্যাবৃদ্ধি পাবে, লক্ষণ হবে জটিল, বিজ্ঞানীরা কাজে-কর্মে-নির্মাণে-উৎপাদনে-উদ্ভাবনে মানুষকে আরো যন্ত্রনির্ভর ও যন্ত্রচালিত করে তুলবে। ফলে সমাজে জীবন-জীবিকা সমস্যাও বাড়বে, কমবে না। তবে নিতান্ত সস্তা ও স্বল্পমাত্রার বিকল্প খাদ্যে ক্ষুধা মেটানো সম্ভব হলে— যেমন হচ্ছে উদ্ভিদের, পশুর, পাখির ও কীটের খাদ্যে— তাহলে জীবনে সাচ্ছল্য স্বাচ্ছন্দ্য আরাম আনন্দ সুখ বাড়বে।

২০. সবচেয়ে গুরুতর কথা মানুষের আয়ু অভাবিতভাবে বেড়ে যাচ্ছে, মৃত্যুর পথ রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে নিদান নিরূপণের কল্পনাতীত বিস্ময়কর যান্ত্রিক উৎকর্ষে এবং রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কারে, দেহের সঙ্গে ও অন্তরে সর্বত্র যন্ত্রযোগে অস্ত্রোপচার ও প্রত্যঙ্গ বদলানোর কৌশল আয়ত্তে আসার ফলে। তিন সপ্তার মধ্যেই গর্ভের সন্তানের লিঙ্গ বদল সম্ভব হচ্ছে। কাজেই জন্ম যদি অপ্রতিরোধ্য থাকে, কালব্যাধির ও দুর্ঘটনার কবলমুক্ত মানুষের শতবছরেও মৃত্যু না হয়, তাহলে জন্মনিয়ন্ত্রণ হবে আবশ্যিক— যা কায়রো সম্মেলনের ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। অশ্বেত সমাজে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে শ্বেতাঙ্গ সমাজের ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে এ আশঙ্কায় নাকি কায়রো সম্মেলন ডাকা হয়— এতে সত্য আছে কিনা জানি না। তবে শাস্ত্রিক বিধি-নিষেধ সমাজ নিয়ন্ত্রণে আর বেশিদিন কেজো থাকবে না মনে-মগজে-মননে-মনীষায় ঋদ্ধ উন্নত রাষ্ট্রগুলোতে।

২১. এতো গৌত্রিক, গৌষ্ঠীক, জাতিক, রাষ্ট্রিক বিরোধ-বিবাদ-সংঘর্ষ-সংঘাত সত্ত্বেও মানুষের জ্ঞান-প্রজ্ঞা-যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেক এবং স্বসত্তার স্বাতন্ত্র্য, মর্যাদা ও অধিকারচেতনা, মর্ত্যজীবনের দায়িত্ব কর্তব্যবোধ আর ভোগ-উপভোগ ও সম্ভোগ লিপ্সা এবং আত্মোন্নয়নের স্পৃহা বেড়েই চলেছে। এ অবস্থায় ব্যক্তিজীবনে মর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্য, সামাজিক জীবনে সাম্য ও স্বাধীনতা, সাংস্কৃতিক জীবনে শ্রেয়স বরণের, ঘরোয়া জীবনে প্রেয়স সন্ধানের, জীবিকার ক্ষেত্রে যোগ্যতা-দক্ষতা অনুসারে সমসুযোগ ও সুবিচার, রাষ্ট্রিক জীবনে অধিকার দাবি-চেতনার সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্ব ও কর্তব্য নিষ্ঠাই হবে, অন্তত হওয়া বাঞ্ছনীয় হবে আগামী শতকের প্রথমপাদেই। শোষণ-বঞ্চনা-বৈষম্য মুক্ত সমাজ গড়তে হলে মানববাদী বা সামাজিক সাম্যবাদী গণতান্ত্রিক সরকার বা রাষ্ট্র আবশ্যিক। গণতান্ত্রিক সমাজবাদেই রয়েছে সমাধান, সমাজবাদী নায়কতন্ত্রে নয়।

রাজধানী শহরেই ঘটে ঐশ্বর্যের, রুচির, সংস্কৃতির, সামাজিক, আর্থিক, শৈক্ষিক, নৈতিক, বাণিজ্যিক, রাজনীতিক, চারিত্রিক, আদর্শিক জীবনের চরম ও পরম উৎকর্ষ কিংবা অবক্ষয়-অপকর্ষ। কাজেই এবার ঢাকা শহরের ধ্যানে মানে পদে-পদবীতে-খ্যাতিতে-ক্ষমতায়-প্রভাবে-প্রতি-প্রস্তিতে-দর্পে-দাপটে-ভোগে-বিলাসে-রুচিতে-সংস্কৃতিতে প্রাগ্রসর সমাজের আবাসিক এলাকার একটা বাস্তব চিত্র দিয়ে শেষ করছি। ধানমন্ডি থেকে বনানী কিংবা উত্তরা অবধি অঞ্চলে পাবেন প্রতি পাঁচ/সাত বাড়ির পরে একখানা NGO অফিস, আট/দশখানা বাড়ির পরে পাবেন একখানা কিন্ডার গার্টেন স্কুল, বারো/চৌদ্দখানা বাড়ির একখানায় পাবেন চিকিৎসার ক্লিনিক, পনেরো/ষোলখানা বাড়ির একখানায় পাবেন বিউটি পারলার, আঠারো/বিশখানা বাড়ির একখানায় পাবেন চাইনিজ রেস্টুরেন্ট এবং দু'তিন সড়কের মধ্যে কোন একটাতে পাবেন বিয়ে প্রভৃতি অনুষ্ঠানের জন্যে একটা কম্যুনিটি সেন্টার। আর প্রায় সর্বত্র পাবেন স্কুলের কলেজের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্যে টিউটোরিয়াল বা কোচিং সেন্টার। আর স্কুল-কলেজও হয়েছে অনেক। মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক পরীক্ষা পাশ নানা পন্থায় সহজতর হওয়ার আশায় আশ্বস্ত শিক্ষার্থীর আধিক্যে। অভিজাতরা এখন আর ঘোড়া পোষে না, ঘোড়ায় চড়ে না, ঘোড়ায় টানা এক্কা বা ফিটনও এখন বিলুপ্ত। সাইকেল রিকসা, স্কুটার, কার, বাস, কোচ, ট্রাক, ঠেলাগাড়িতে আবাসিক এলাকা ছাড়া অন্যত্র যানজট এখন নয়টা থেকে ছয়টা অবধি সার্বক্ষণিক দৃশ্য কোন না কোন বাণিজ্য ও দফতর এলাকায়। আর না বললেও চলে যে শহরেই ধনী-গরীবের অবস্থায় ও অবস্থানে রয়েছে দুই মেরুর ব্যবধান সর্ব প্রকারে, অট্টালিকার পাশেই রয়েছে ঝুপড়ি। অবশ্য কালিক কারণে তো শিক্ষার্থীর সংখ্যা স্বাভাবিকভাবে বাড়ছেই। বেকারত্ব, দারিদ্র্য, নৈরাশ্য প্রভৃতি কারণে সমাজে সাফকাপুড়ে ভদ্রলোকদের মধ্যে 'ভালো মানুষ' কেবলই কমছে। ভদ্রলোকেরা সিনেমা হলে যায় না, ঘরে বসে ক্যাসেটে চলচ্চিত্র দেখে। ডিস অ্যান্টেনাও রয়েছে বা তার সংযোগ নিয়েছে ধানমন্ডি-গুলশান-বনানী-বারিধারায়-উত্তরায় এবং অন্যত্র ও আর পুরোনো শহরেও। শহুরে শিক্ষিত পুরুষের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে-পোশাকে খেলাধুলায় কামে-প্রেমে-দাম্পত্যে সন্তান লালনে পাবেন প্রতীচ্য আদল ও চেতনা। তার সাহিত্যে চিত্রশিল্পে কিংবা স্থাপত্যে পাবেন য়ুরোপীয় ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মার্কিন আদল। এখন আর সমাজে বিয়ে না হওয়া ও বিয়ে না-করা নারী পুরুষ বাড়ছে। আর্থিক দৈন্য এর একটা মুখ্য কারণ। এখন শহুরে জীবনযাত্রায় তৈজসে-আসবাবে-দালানে দেশী সংস্কৃতির লেশ ও রেশ দুর্লভ।

সমস্যা-সঙ্কটের মূলে

সেই ১৯৪৭ সন থেকে এবং ১৯৭২ সন থেকেও আমাদের চাওয়া-পাওয়ার অসঙ্গতির দরুন আমাদের অতৃপ্তির, অতুষ্টির, অহৃষ্টির, ক্ষোভের, ক্রোধের ও হতাশার অভিব্যক্তি গাঁয়ে গঞ্জে শহরে বন্দরে গণমানবের মধ্যে, আমজনতার মুখে দেখতে-শুনতে পাই ও পাচ্ছি। আমাদের নৈতিক চরিত্রের অবক্ষয়, আমাদের আদর্শ চেতনার অভাব, আমাদের লাভ-লোভ স্বার্থচেতনার আধিক্য, আমাদের আত্মসত্তার মূল্য-মর্যাদাবোধের স্বল্পতা, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি, আমাদের খনিজ, বনজ, কৃষিজ ও ফলজ উৎপাদিত ও নির্মিত পণ্যের প্রাচুর্যের ও উৎকর্ষের অভাব, আমাদের পণ্য উৎপাদক, নির্মাতা ও বিক্রেতাদের লাভ-লোভ-অসততাজাত ভেজাল, চোরাচালান, মৌজুতদারি, কালোবাজারি প্রভৃতি হরেক রকমের দুর্নীতি হরহামেশা আমাদের ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক নিত্যকার জীবনে, নৈতিক, আর্থিক, শৈক্ষিক, সাংস্কৃতিক, ব্যবসায়িক, প্রশাসনিক বিপর্যয়ের, বিরক্তির, বিশৃঙ্খলার কারণ হয়ে রয়েছে। ফলে আমাদের মনে-মগজে-মননে-মনীষায় জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-বিবেক-বিবেচনা প্রত্যাশিত প্রভাব ফেলতে পারে না প্রতিকূল প্রতিবেশে ও পরিবেশে। জাতি হিসেবে, রাষ্ট্র হিসেবে আমরা তাই দেশের, কালের, নাগরিকের মানসিক ও বৈষয়িক চহিদা ও দাবি মেটাতে পারি না, পারি না বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক সমাজে মুক্ত বৌদ্ধিক ও যৌক্তিক চিন্তা-চেতনার, মনের, মননের স্বাক্ষর রাখতে। অতএব আমাদের ক্ষোভের, আফসোসের ও হতাশার কোন শেষ নেই আপাতদৃষ্টিতে।

কিন্তু আমরা যদি আমাদের যে গোড়ায় গলদ ছিল, তা স্মরণ করি, বিশ্লেষণ করি, তাহলে আমাদের সর্বপ্রকারে পিছিয়ে পড়া অবস্থা ও ব্যবস্থা সত্ত্বেও ক্ষোভ কমানোর ও প্রবোধ পাওয়ার কিছু কারণ ও যুক্তি খুঁজে পাই।

আমাদের প্রথম গলদ ছিল আমাদের পরিচিত, অবস্থা ও অবস্থান সম্বন্ধে আমাদের অশেষ অজ্ঞতা। আমরা যে, অধিকাংশ মুসলমানই যে নিম্নবর্ণের, নিম্নবৃত্তির ও নিম্নবর্গের ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ ঘরানা বৃত্তিজীবীর বৌদ্ধ-হিন্দুজ মুসলিমের বংশধর, তা আমরা জানি না, স্বীকার করি না, আমাদের যে শিক্ষার ও অর্থ-সম্পদের ঐতিহ্য ছিল না, ধর্মান্তরে যে আমাদের অধিকাংশের পেশান্তর বা আর্থিক অবস্থার ও অবস্থানের পরিবর্তন ঘটেনি বিগত সাত/আটশ বছর ধরে, তা আমরা জানিও না, জানলেও স্মরণ করি না। আমাদের বাঙলাভাষী দেশজ মুসলিমদের মধ্যে কোন সামন্ত-জমিদার ছিল না। জোতদার, তালুকদার, তরফদার, গাঁতিদার, শিকদারও কিছু ছিল অবশ্য। তাদের মধ্যে মুন্সি-মোল্লা-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মৌলবী-উকিল-মুয়াজ্জিন-খোন্দকার [শিক্ষক], কাজী হয়তো দু'একজন মজুমদার-পাটোয়ারীও ছিল। আর অন্যরা ছিল অজ্ঞ-অনক্ষর প্রাজন্মক্রমিক দরিদ্র মজুর বা ঘরানা পেশাজীবী।

এ কারণেই ইংরেজ আমলে যেমন, তুর্কী-মুঘল আমলেও তেমনি গ্রামীণ মুসলিমরা ছিল বর্ণহিন্দু জমিদার-মহাজন-প্রশাসক-দোকানদার-কায়স্থ-চিকিৎসক প্রভৃতির প্রশাসনে ও তত্ত্বাবধানে। আজো বর্ণহিন্দুর পদবীতে তার সাক্ষ্য-প্রমাণ মেলে। কাজেই ইংরেজ আমলে হিন্দুরা নতুন করে জমিদার-মহাজন-তালুকদার-তরফদার-উকিল-ডাক্তার-ব্যবসায়ী হিসেবে ইংরেজ সরকারের আশ্রয়ে প্রশ্রয়ে নতুন কৌশল প্রয়োগে শাসন-শোষণ-পীড়ন করেনি। আরো একটা কথা স্মরণীয় তুর্কী-মুঘল আমলেও ব্রিটিশ শাসনকালের মতো সার্বভৌমশক্তির ও সরকারের প্রত্যক্ষ শাসনে ভারতের অতি সামান্য অংশই ছিল, অধিকাংশ সামন্তরাই প্রত্যক্ষ শাসনে রেখেছিল। কালান্তরে পূর্ববঙ্গে মুসলিম সংখ্যা নানা কারণে বেশি হলেও ১৯০৫ সন অবধি সুবেহ বাঙ্গালায় বা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে তথা বাঙলা-বিহার-উড়িশায় হিন্দুরাই ছিল বিপুল সংখ্যায় গুরু। তুর্কী-মুঘলের বিদেশাগত ফারসী-তুর্কী-উর্দুভাষী প্রশাসকরাই ছিল শাসনকর্তা, সেনানী ও অমাত্য, সেখানে দেশজ মুসলিমের ঠাঁই ছিল না কখনো।

দেশজ হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে ঘরানা ক্ষুদ্র-বৃহৎ পেশাজীবীরা ব্রিটিশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যনীতি ও তাদের স্বদেশী পণ্যের বাজার সৃষ্টির নীতি গ্রহণের ফলে আমাদের গ্রামীণ বিনিময়-নির্ভর অর্থনীতি অচল হয়ে পড়ে এবং ঘরানা পেশাজীবী আমজনতার আর্থিক অবস্থা ও অবস্থান নিঃস্বতার, নিরন্নতার, দুস্থতার ও দরিদ্রতার সীমায় নেমে আসে। তা ছাড়া প্রজন্মক্রমে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ভূসম্পদও বণ্টনে শূন্যতার নিঃস্বতার নিরন্নতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। উল্লেখ্য যে, যে-শ্রেণীর বৌদ্ধ-হিন্দু থেকে এরা মুসলিম সমাজভুক্ত হয়, সে-শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষার অধিকার ও ঐতিহ্য ছিল না। তাই তুর্কী-মুঘল আমলে যেমন ইংরেজ আমলেও তেমনি দেশজ মুসলিমরা সরকারী চাকুরে হতে পেরেছে নিতান্ত করগণ্য সংখ্যায়। তা ছাড়া কাজীর পদ উঠে গেল, ফারসী মুনশী উকিলের পেশা শেষ হয়ে গেল ১৮৬০ সনের দিকে ইংরেজী-জানা হিন্দু উকিলের উপস্থিতিতে। ১৮৪৮ সনে ওয়াক্‌ফ-আয়মা সম্পত্তি থেকেও অনেক মুসলিম পরিবার দলিলের বা প্রমাণের অভাবে বঞ্চিত হল। অতএব বাঙালী মুসলিমজীবনের সর্বপ্রকারে দুর্ভাগ্যের, দুর্দিনের ও দুর্যোগের অমাবস্যার কাল হল উনিশ শতকের শেষার্ধ। বিশ শতকের গোড়ার দিক থেকে বাড়ির কাছে হিন্দু-প্রতিষ্ঠিত ইংরেজী বিদ্যালয়ে সন্তান পড়ানোর সুযোগ পেয়ে মুসলিমরা বিদ্যালয়ে সন্তান প্রেরণ করতে থাকে। ফলে তিন দশকের মধ্যেই মুসলিমরা ইংরেজী শিক্ষা পেয়েও বেকার হতে থাকে। তখন তাদের দাবি ওঠে আনুপাতিক হারে চাকরি পাওয়ার, স্বতন্ত্র নির্বাচনের এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও সাম্প্রদায়িক স্বার্থরক্ষার।

বাঙালী মুসলিমদের সবচেয়ে ক্ষতির কারণ হয়েছিল তাদের নিজেদের জ্ঞাতি-গোষ্ঠী-গোত্রের মধ্যে কোন নেতা ছিল না। নেতা ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমল থেকে বিদেশাগত তুর্কী-ইরানী-মুঘল বিভাষী রইসরাই, যাদের সঙ্গে দেশজ মুসলিমদের কোন ভাষিক, সামাজিক, বৈবাহিক, বাণিজ্যিক আচারিক ও সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ-সম্পর্ক তো ছিলই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না, এমনকি গোমস্তার মাধ্যমে খাজনা আদায়ের সম্পর্ক থাকলেও পরিচয়ও ছিল না। ছিল না বাঙালীদের আর্থিক, মানসিক কিংবা আচারিক-পার্বণিক ও শাস্ত্রিক জীবন সম্বন্ধে উর্দুভাষীদের কোন ধারণা। অথচ ১৭৭০ সন থেকে ১৯৪৭ সন অবধি বাঙালী-বাঙলাভাষী মুসলিমদের সরকার-স্বীকৃত অভিভাবক, তত্ত্বাবধায়ক ও প্রতিনিধিরূপ স্বেচ্ছাবৃত নেতা ছিল উর্দুভাষী শিক্ষিত জমিদার-চাকুরেরা। বাঙলার দেশজ মুসলিম সম্বন্ধে এদের অজ্ঞতা ছিল প্রর্বতপ্রমাণ, অবজ্ঞা ছিল গাঢ়-গভীর। এ সূত্রে এ-ও উল্লেখ্য যে নিম্নবর্গের হিন্দু থেকে দীক্ষিত বলে এবং অজ্ঞ-অনক্ষর ও দরিদ্র বলে বর্ণহিন্দুরও এদের প্রতি ঘৃণা আর তাচ্ছিল্য ছিল অশেষ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ইংরেজেরা মুঘলদের রাজ্য কেড়েছে বলে মুসলিম মনে ব্রিটিশ-বিদ্বেষ জেগেছিল, সেজন্যে ওরা ইংরেজী পড়েনি—এ চালু তথ্যে কোন সত্য নেই। উর্দুভাষীরা ১৮৬০ সন থেকেই কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি নিতে থাকে। ১৮২৪ সনেই, ইংরেজী তখনো রাষ্ট্রভাষা হবে কি না জানা ছিল না, তবু মুর্শিদাবাদের নওয়াব তাঁর ও তাঁর অমাত্যদের সন্তানদের ইংরেজী শেখানোর জন্যে কোম্পানী সরকারের সাহায্যে মুর্শিদাবাদে স্কুল প্রতিষ্ঠিত করেন। এবং ওয়াহাবী নেতা সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী (১৭৭৬ – ১৮৩১) ছিলেন কোম্পানী সরকারের প্রিয়। কোলকাতায় তিনি সরকারী সংবর্ধনা গ্রহণ করেন। শত্রুতা শুরু হয় অনেক পরে।

গোটা ভারতে গড়ে শতে মুসলিম ছিল শেষাবধি তেত্রিশজন। কিন্তু আঠারো-উনিশ শতকে মুসলিম সংখ্যা ছিল আরো কম। তাই স্যার সৈয়দ আহমদ খান থেকেই সংখ্যাগুরু হিন্দুর মুসলিমপীড়ন-বঞ্চনার আশঙ্কায় উত্তর ভারতের বিহার থেকে পাঞ্জাবের সীমা অবধি অঞ্চলের সর্বপ্রকারের সুবিধেভোগী ধনী মানী ও প্রাক্তন শাসক গোষ্ঠীর গৌরবগর্বী রইস মুসলিমের মনে জাগে হিন্দুভীতি। ওরাই সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ, স্বতন্ত্র নির্বাচন, রক্ষাকবচ, চাকরির কোটা নির্ধারণ প্রভৃতির আন্দোলন শুরু করে। অবশেষে গোল টেবিল বৈঠক কাল [১৯৩০-৩২] থেকে কংগ্রেসী আন্দোলনে ব্রিটিশ-বিতাড়ন আসন্ন বুঝে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অন্তে ব্রিটিশবিদায় সুনিশ্চিত জেনে তাদের স্বার্থেই দ্বিজাতিতত্ত্ব প্রচার করে মুসলিমদের জন্যে স্বতন্ত্র নিরাপদ-নিরুপদ্রব স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র দাবি করে, যার নাম দেয়া হয় পাকিস্তান। আন্দোলনের দাবি আদায়ের 'নেতা' হল উর্দুভাষী রইসেরা, আর 'নীত' হলাম আমরা অজ্ঞ-অনক্ষর দরিদ্র বঞ্চিত সাক্ষর ও স্বল্পশিক্ষিত এবং আবেগপ্রবণ যৌক্তিক বৌদ্ধিক বিবেচনাহীন উচ্চশিক্ষিত বাঙলাভাষীরা। পাকিস্তান প্রস্তাবে (১৯৪০ সন) 'স্টেটস' ছিল, ১৯৪৬ সনের দিল্লী কনভেনশনে জিন্নাহ সাহেবের অভিপ্রায় ক্রমে বিনাপ্রতিবাদে বাঙালীরা 'স্টেটস'-এর 'স' বাদ দেয়া বরং সোল্লাসে মেনে নিল। যদিও জিন্নাহ লর্ড মাউন্টব্যাটেনের চাপে পড়ে দ্বিজাতিতত্ত্ব শেষ মুহূর্তে পরিহার করলেন, এবং এ কে ফজলুল হকের লক্ষ্ণৌ বক্তৃতার প্রভাবে কংগ্রেস-মহাসভা অমুসলিমের সংখ্যাগুরুত্বের যুক্তিতে পশ্চিমবঙ্গ, পূর্বপাঞ্জাব ও অসম পাকিস্তান থেকে মুক্ত রাখার সুযোগ পেয়ে গেল। টুটা-ফাটা পাকিস্তান হল, বাঙালী মুসলিম হারাল অর্ধেক বাঙলা যা তারা সংখ্যাগুরু রূপে শাসন করছিল ও ফায়দা পাচ্ছিল ১৯৩৭-৪৭ সন অবধি। পঞ্জাবী মুসলিম হারাল পূর্ব পঞ্জাব। নেতা মুহম্মদ আলি জিন্নাহ অবশ্য স্বাধীন অখণ্ড পঞ্জাব ও অখণ্ড বাঙলা রাখার প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছিলেন। কিন্তু গান্ধীর কংগ্রেস ও মহাসভা রাজি হল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২

অতএব আমাদের বাঙলাভাষী দেশজ বাঙালীর প্রথম ভুল হল স্টেটস-এর 'স' বাদ দেয়ার প্রস্তাবে সম্মতিদানে। পাকিস্তান অঞ্চলে কোন উন্নত বিকশিত ভাষা ছিল না। কাজেই উত্তর ভারতীয় বাস্তুত্যাগী রইসদের ও নেতাদের স্বার্থে উর্দু হল রাষ্ট্রভাষা। বাঙালী তা মেনে নিল, পরে চাকরির ও অন্যান্য ক্ষেত্রে অসুবিধের কথা ভেবে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাঙলা ভাষার স্বীকৃতি দাবি করল, প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হল। আমরা এখন রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে রক্ত দানের, প্রাণ উৎসর্গের এবং সংগ্রামে বিজয়ের গৌরব-গর্ব করি। কিন্তু ভেবে দেখি না যে আমরা আসলে তো আমাদের আবেগের ও হুজুগের বশে যে-ভুল গোড়ায় করেছিলাম, রক্তঝরা প্রাণহরা সংগ্রামে তারই মাসুল দিলাম মাত্র। সেদিন তথা ১৯৪৭ সনের ১৪ই আগস্টে যদি আমরা এ দ্বিখণ্ডিত বাঙলার এক খণ্ডে স্বাধীন হতাম ১৯৪০ সনের পাকিস্তান প্রস্তাবের রূপায়ণে বা বাস্তবায়নে, তা হলে আমাদের ভাষাসংগ্রাম করতেই হত না। এবং ১৯৭১ সনেও করতে হত না লক্ষ লক্ষ জান দিয়ে ও মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে মুক্তিযুদ্ধ স্বাধীনতা অর্জন লক্ষ্যে।

পাকিস্তানে আমরা সংখ্যায় গুরু ছিলাম। কিন্তু অন্য সর্বপ্রকারে ছিলাম অজ্ঞ, অযোগ্য, অদক্ষ, অনভিজ্ঞ ও অসমর্থ। ফলে আমরা যাদের সঙ্গে আমাদের একক রাষ্ট্র তৈরি করলাম, তাদের সঙ্গে আমাদের 'মুসলিম'-এ নামসার সাদৃশ্য ছিল মাত্র। কেননা মুসলিমদের মধ্যে ছিল শিয়া, সুন্নীদের চার মজহাব, কাদিয়ানী, ইসমাইলিয়া, ফরায়েজী, ওয়াহাবী, আহলে হাদিস, পীরবাদী ও সুফী গুরুবাদী নানা সম্প্রদায়। এবং দেহাকৃতিতে, ভাষায়, আবহাওয়ায়, খাদ্যবস্তুতে, পোশাকে, জীবনচেতনায় এবং আচারে-সংস্কৃতিতে, চিন্তায়-চেতনায় আমাদের দেড়হাজার মাইলের ব্যবধানে স্থিত দুই অংশের মানুষের মধ্যে কোন সাদৃশ্য বা যোগ ছিল না, এমন কৃত্রিম অস্বাভাবিক বন্ধন টেকার নয়, বিশেষ করে অসাম্য বা বৈষম্য ছিল সর্বক্ষেত্রে। ওখানে ছিল পীরজাদা, মালিকজাদা, নওয়াবজাদা, মিয়াজাদা, নওয়াব এবং উচ্চ সামরিক ও বেসামরিক পদস্থ ব্যক্তি ও বেণে গোষ্ঠী। সেখানে মধ্যবিত্ত ছিল না, আর আমাদের এখানে ছিল দশ/বারো ঘর খান্দানী জমিদার পরিবার, তাদের ভাষা ছিল উর্দু। আর অন্যদের মধ্যে ছিল প্রথম প্রজন্মের বা দ্বিতীয় প্রজন্মের মুনশী-মোল্লা-মৌলবী-খোন্দকার-দারোগা-কেরানী-শিক্ষক এবং কিছু সংখ্যক করগণ্য পদস্থ চাকুরে-ডেপুটি মুনসেফ প্রভৃতি, আর দু'চারজন উকিল-ডাক্তার বিশেষ করে এল, এম, এফ। কাজেই আমাদের অসামর্থ্যের, অযোগ্যতার, অনভিজ্ঞতার, অব্যবসায়ের, অসামরিকবৃত্তির এবং ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের বাঙালীর অভাবে ওরাই কেন্দ্রে এবং প্রদেশে ব্যবসায়-বাণিজ্যে কলকারখানা স্থাপনে, ব্যাংক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠায় সামরিক-বেসামরিক চাকরিতে সহজেই প্রাধান্য পেয়ে যায়। এমনকি গণপরিষদে আমাদের বাঙালীর সংখ্যাধিক্য থাকা সত্ত্বেও একপ্রকারের হীনম্মন্যতাবশে আমাদের পার্ষদরা দাবি আদায়ে ছিলেন অসমর্থ। ফলে আমাদের দ্রুত শিক্ষিত উঠতি বাঙালীদের মধ্যে উচ্চাশীরা বঞ্চনার-প্রতারণার জ্বালা অনুভব করতে থাকে এবং ক্রমে তা কেবল বাড়তেই ছিল, যার পরিণামে ১৯৭১ সনে শুরু হল মুক্তিযুদ্ধ। আমরা বিজয়ী হলাম, স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের মালিক হলাম। গোটা রাষ্ট্র আমাদের বাঙালী মুসলিমদের হাতের মুঠোয় এল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩

কিন্তু আমরা কারা? অন্তত দু'হাজার বছরের বঞ্চিত শোষিত অজ্ঞ অবজ্ঞেয় নিম্নবর্ণের, নিম্নবর্গের, নিম্নবৃত্তির লোকের বংশধর। আমাদের অধিকাংশই ভুঁইফোঁড় সর্বার্থে। আমরা দুস্থ দরিদ্র শাসিত শোষিত এবং হুকুম হুমকি হুঙ্কার হামলা শোনায়-দেখায় প্রাজস্মক্রমিকভাবে অভ্যস্ত ও বঞ্চিত মানুষের বংশধর। আমাদের অধিকাংশ মানুষ দরিদ্র ঘরের সন্তান, আমরা ছিলাম পাটখড়ির, বাঁশের, মাটির দেয়ালের শন-নাড়ার ছাউনির ও টিনের ঘরের মানুষ। আমরা শহরে এলাম বিদ্যা ও বুদ্ধি নিয়ে আত্মোন্নয়নের ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সাধ, স্বপ্ন ও উচ্চাশা নিয়ে। আমরা ছিলাম লাভ, লোভ ও স্বার্থসচেতন ধনে মনে কাঙাল মানুষ। কাজেই আমাদের মধ্যে ছিল না বাঞ্ছিত মানের আত্মসত্তার মূল্য ও মর্যাদাবোধ, আমাদের ছিল না প্রত্যাশিত মাত্রার ঘৃণা-লজ্জা-ভয়। আমাদের মধ্যে উচ্চবিত্তের ও উচ্চবিদ্যার যেসব লোক ছিলেন, পরিবার ছিল, তাঁরাও কেউ অর্থ-সম্পদে তেমন প্রাচুর্যের মধ্যে ছিলেন না। কাজেই বিদ্যায়-বিত্তে ঋদ্ধ সামন্ত-বুর্জোয়াও আমরা বেশি পাইনি, যাঁরা নেতৃত্বে ও চরিত্রপ্রভাবে উঠতি-উচ্চাশী ধন-মান-ক্ষমতালিপ্সু জনগণের মধ্যে নৈতিকচেতনা, আদর্শনিষ্ঠা কিংবা রাষ্ট্রের ও মানুষের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্যবোধ জাগাতে পারতেন। বিদ্বান-বুদ্ধিমান লোকেরা ধন-মান-ক্ষমতালিপ্সু হলে বুদ্ধিকে ধূর্ততায় এবং বিদ্যাকে অপকৌশলে বিকৃত করে। তখন কেবল 'পাই পাই খাই খাই' ভাব জাগে মনে, তখন সবাই সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে চায়, তখন ভীড়ের চাপে কেউ সরে, কেউ মরে, কেউ হয় সফল অভীষ্ট সাধনে। এমনি অবস্থায় কাড়াকাড়ি-মারামারি-হানাহানি এড়ানো যায় না। প্রাপ্তির ও সাফল্যের অনিশ্চিতির চেতনাচালিত মানুষ তখন মোহমত্ত হয়ে কেবল ছুটোছুটি করে। আমাদের সমস্যা-সঙ্কট তাই কাটে না, কাটছে না। এ অবস্থায় গাঁয়ে-গঞ্জে-শহরে-বন্দরে আমাদের সদ্য সুযোগ-পাওয়া ভুঁইফোঁড় উচ্চাশী উঠতি লিপ্সু লোকেরা দেশত্যাগীদের সম্পদ-সম্পত্তি সস্তায় বা বিনা পয়সায় পেল দু'দুবার। তারপর সরকারী-বেসরকারী সর্বপ্রকারের চাকরিও এল তাদের আয়ত্তে। দেশ হয়ে উঠল কিছু ধনী-মানী হঠাৎ নবাবের 'খ্যাতি-ক্ষমতা-মান-যশ-দর্প-দাপট-প্রভাব-প্রতিপত্তির এবং ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগের প্রদর্শনী ক্ষেত্র। গণমানব কখনো অবাক হয়ে, কখনো হতভম্ব হয়ে, কখনো বা কেউ কেউ শক্তিতে-সাহসে-উদ্যমে-উদ্যোগে বেপরওয়া-বেসামাল হয়ে ধন-মান অর্জন লিপ্সু হয়ে জুটে গেল ওই সব বিদ্যা-বিত্তমানদের সঙ্গে তাদের চেলারূপে। দুর্নীতিতে চোরাকারবারিতে জুয়া-জাল-জোচ্চুরিতে কেবল কালো বাজার নয়, ব্যবসায়িক, বৈষয়িক, আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রতারণার এক স্থায়ী কালো জগৎ তৈরি হয়ে গেল। শাস্ত্র বিধি, সরকারী আইন এবং লোকনিন্দা লঙ্ঘন ও উপেক্ষা করে নতুন অন্যায্য নীতি-নিয়মে, রীতি-রেওয়াজে, প্রথা-পদ্ধতিতে ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক ও সরকারী জীবন চালিত হতে ও নিত্যকার প্রয়োজনের চাহিদা পূরণ হতে কোন বাধাবিঘ্ন রইল না।

আমাদের বাঙলাদেশে বা প্রাক্তন পূর্ব পাকিস্তানে দেশজ যারা শাসন ক্ষমতায় এল, আর্থ-বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে যারা অনুপ্রবেশ করল, কল-কারখানায় যারা খনিজ, কৃষিজ পণ্য উৎপাদনে নির্মাণে ও বিপণনে নামল, তাদের শতে নিরেনব্বই জনই স্ব স্ব ক্ষেত্রে অতীত অভিজ্ঞতা ও ঐতিহ্যহীন। কাজেই শাসনে প্রশাসনে ব্যবসায়ে বাণিজ্যে শিক্ষায় স্বাস্থ্যে চিকিৎসায় সর্বত্র অপটুতার, অদক্ষতার, অযোগ্যতার, আনাড়িপনার সঙ্গে, অর্থে সম্পদে কাঙালপনার সঙ্গে মানসিক দৈন্যের সংযোগে প্রতি দ্বিতীয় ব্যক্তির সততায়, চরিত্রে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আদর্শনিষ্ঠায় নৈতিকচেতনায় আস্থাবান থাকা, সন্দেহ-সংশয়-দ্বিধামুক্ত থাকা সম্ভব হল না কারো পক্ষে। প্রথম প্রজন্মের সন্তানেরা দ্বিতীয় প্রজন্মের হওয়া সত্ত্বেও, ধনী-মানী প্রতিষ্ঠিত পিতার সন্তান হওয়া সত্ত্বেও পিতার স্বভাব-চরিত্র-কর্ম-আচরণের ও নীতির প্রভাবে সেও হারাল আত্মসত্তার মর্যাদাবোধ, হল লাভ-লোভ-স্বার্থচেতনার শিকার। ফলে আমাদের দেশে কম্যুনিস্ট, শাস্ত্রী, শিক্ষক, উকিল, ডাক্তার, সাংবাদিক, কিংবা চিত্রী-গীতিকার-কবি-ঔপন্যাসিক প্রভৃতি বিভিন্ন কলাশিল্পী আত্মপ্রত্যয়হীন, আদর্শভ্রষ্ট, নৈতিকচেতনাচ্যুত বলেই যখন যেমন তখন তেমন হওয়ার নীতি মেনে সুবিধে ও সুযোগসন্ধানী হয়েছেন। ঘৃণা-লজ্জা-ভয় ত্যাগ করে বেহায়া বেশরম বেচশম বেদানাই বেআক্কেল বেপরওয়া হয়ে অনেকেই দল ছুট হন, বোল বদলান, ভোল পাল্টান। আমজনতাকে ধোঁকা দিয়ে কিংবা অর্থলোলুপ করে যে-সব পয়সাওয়ালা মৌসুমী রাজনীতিক মান-ক্ষমতা-খ্যাতি অর্জন লক্ষ্যে নির্বাচনের আগে রাজনীতিক দলে ভীড়েন, তাঁরাও ওই স্তরের চরিত্রের পরিচয় দিয়ে থাকেন তাঁদের কর্মে আচরণে। এতে অবশ্য বৈচিত্র্য বা নতুনত্ব কিছুই নেই। আফ্রো-এশিয়া-লাতিন আমেরিকার তথা তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত অজ্ঞ-অনক্ষর-দুষ্ট-দরিদ্রবহুল রাষ্ট্রগুলোতে এমনি স্বভাব-চরিত্রের লোকই থাকে অধিক। আমরা আঠারো শতকের শেষার্ধের ও উনিশ শতকের প্রথমার্ধের কোলকাতা শহরের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত স্বল্পশিক্ষিত উচ্চবিদ্যার ও বিত্তের লোকগুলোর এবং আমজনতার ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের বৃত্তান্ত শুনে-জেনেও এমনি সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে আমাদের শহুরে শিক্ষিত ধনী, মানী, চাকুরে-বেণে-বুদ্ধিজীবীদের তৃতীয় প্রজন্মের সন্তানেরা হবে আত্মসম্মানসচেতন আদর্শনিষ্ঠ, ন্যায়বোধসম্পন্ন ও যৌক্তিক-বৌদ্ধিক-বিবেকী জীবন যাপনে আগ্রহী। তারা পুঁজিবাদী বুর্জোয়া হলেও উদারতার ও মানবতার মূল্যসচেতন পরিশীলিত মনের সংস্কৃতিমান আত্মপ্রত্যয়ী মানুষ হবে। কেননা বিত্তবান ঘরে মানুষ হবে বলেই মনে কাঙাল ও লিপ্সু হবে না, হবে চিত্তবান, বিবেকবান। সবাই হবে না, কিছু সংখ্যক হলেই তাঁদের মন-মগজ-মনন-মনীষার এবং কর্ম-আচরণের প্রভাবে সমাজ ও নাগরিকরা হবে প্রভাবিত, যেমন হয়েছে একালের য়ুরোপীয় রাষ্ট্রে অধিকাংশ আমজনতা। আমাদের মন্থরগতিতে সাংস্কৃতিক বিকাশ হচ্ছে। আজ শহুরে মুসলিম সমাজ ফুলের, নাচের, গানের, বাজনার, অভিনয়ের, চিত্রশিল্পের, শিক্ষিতা নারীর অবাধ চলাফেরার, মেলা-মেশার, আদর-কদর করছে।

আমাদের সাতচল্লিশ বা তেইশ বছরের রাষ্ট্রের অবস্থা-অব্যবস্থা-অসঙ্গতি-বেঢপ-বেতাল-বিশৃঙ্খল কর্ম-আচরণ দেখে হতাশ হওয়ার কিছু নেই। এ অন্যরূপ হতেই পারত না সর্বপ্রকারে ভূঁইফোঁড় শাসক-শাসিত নাগরিকের নেতৃত্বে কর্তৃত্বে। আরো উল্লেখ্য যে সম্পদে দীন বলে আমাদের রাজনীতিক দলের ও সরকারের থাকে অদৃশ্য অজানা অদেখা বিদেশী আর্থ-বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যবাদী মহাজন মুরুব্বী যাদের হুকুমে, নির্দেশে, মদদে, স্বার্থে ও পরামর্শে আমাদের রাজনীতিকরা করেন রাজনীতিক নীতিগ্রহণ, সরকার হয় মুৎসুদ্দী সরকার। রাষ্ট্র অর্থে সম্পদে বিদ্যায় বৃত্তিতে এবং সামরিক শক্তিতে, অস্ত্রে শস্ত্রে, যানবাহনে স্বনির্ভর ও স্বয়ম্ভর না হলে বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক এ সংহতির, সহযোগিতার ও সহাবস্থানের কালে অজ্ঞ-অনক্ষরবহুল দুর্বল দরিদ্র পরনির্ভর রাষ্ট্রের লোক-চরিত্রের উন্নতি-উৎকর্ষ-বিকাশ-বিস্তার হতেই পারে না। কেননা তার মন-মগজ-মনন-মনীষা মুক্ত নয়, বাধা-বন্ধন তার থাকেই। অতএব আমাদের অতীত শূন্য, বর্তমান কুয়াশাবৃত কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। বিশ্বমানবের ভবিষ্যৎও নির্ভর করছে সমাজতন্ত্রের উপর। সহযোগিতায় ও সহাবস্থানের অঙ্গীকারে বাঁচতে হবে সবাইকে। কাজেই মাভৈঃ।

সাম্প্রদায়িক দ্বেষণার উৎস ব্রিটিশরচিত বিকৃত ভারত-ইতিহাস

গোত্রগত, বর্ণগত, ধর্মগত, ভাষাগত, অঞ্চলগত কিংবা মতবাদগত দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-সংঘাত আজকের পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মানবিক সঙ্কট-সমস্যারূপে দেখা দিয়েছে। এসব দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-সংঘাত অবশ্য মনুষ্য সমাজের সর্বত্র চিরকালই ছিল লঘু-গুরুভাবে। তখন অজ্ঞ-অসহায় অসমর্থ মানুষ যানবাহনের ও যোগাযোগের অভাবে বিচ্ছিন্নভাবে অলঙ্ঘ্য ও দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধানে অপরিচয়ে অজ্ঞাত বাস করত। কাজেই কোন ঘটনাই, কোন রটনাই সহজে প্রচার লাভ করত না জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-নিবাসের অভিন্নতা সত্ত্বেও সবার কাছে।

বিজ্ঞানের বদৌলত যানবাহনের, বিশেষ করে ব্যোমযানের বিস্ময়কর দ্রুতগতির ফলে 'ধরা এখন সরাবৎ' ক্ষুদ্র এবং দৃষ্টি ও শ্রুতিগ্রাহ্য হয়ে গেছে। তাছাড়া তার-বেতারের যাদুশক্তির আবিষ্কারে উদ্ভাবনে সৃষ্টিতে নির্মাণে যে-সব যন্ত্র নিতান্ত মাটির মানুষ মগজ খাটিয়ে তৈরি করেছে, প্রয়োগ করছে সমুদ্রের গভীরের, পর্বতের, সমতলের, অরণ্যের অভ্যন্তরে এবং নভোলোকের রূপ-স্বরূপ জানার অপ্রতিরোধ্য আগ্রহে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আধুনিক মানুষের বিদ্যার বিত্তের রুচির স্বপ্নের সাধের ও জিজ্ঞাসার প্রসূন ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগ বাঞ্ছার মান-মাপ-মাত্রার বৃদ্ধি, স্বসত্তার মর্যাদাচেতনা, মর্ত্যজীবনের গুরুত্ববোধ। এভাবেই একালে বিদ্যা বুদ্ধি বিত্ত যোগ্যতা দক্ষতা নির্বিশেষে মানুষ মাত্রেরই মধ্যে লঘু-গুরুভাবে জেগেছে পরিবারে সমাজে রাষ্ট্রে স্বাধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠ হওয়ার ও থাকার বাঞ্ছা ও স্বসত্তার স্বাতন্ত্র্যচেতনা।

ফলে জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-বিবেকবান সজ্জন-সুজনও বেড়েছে, বাড়ছে পৃথিবীর সব রাষ্ট্রে। তারা বিজ্ঞানের তত্ত্বে, তথ্যে ও সত্যে আস্থা রাখে। তারা উদারতায়, মানবতায়, যুক্তিবাদিতায়, বিবেকানুগত্যে, ন্যায্যতায় এবং সংযমে, সহিষ্ণুতায় ও সৌজন্যে সামবায়িক সহযোগিতায় সমাজে নির্বিরোধে নির্বিবাদে নিরুপদ্রবে নিরাপদে সহাবস্থানের আবশ্যিকতায় আস্থাবান। এমনি মন-মগজ-মনন-মনীষা-মনস্বিতাসম্পন্ন ব্যক্তিরাই আজ পৃথিবীর সব রাষ্ট্রেই জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-নিবাস-লিঙ্গ-যোগ্যতা-দক্ষতাগত বৈষম্য ও দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-সংঘাত বিরোধী। এঁরা সাধারণত বিদ্যা-বুদ্ধি-যুক্তি-বিবেকে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু অর্থসম্পদে এবং সমাজে প্রভাবে-প্রতিপত্তিতে, দর্পে-দাপটে, খ্যাতিতে-ক্ষমতায় দীন। ফলে এঁরা প্রতিকারে প্রতিবাদে প্রতিরোধে সংগ্রামে সর্বদা ও সর্বথা এগিয়ে আসতে পারেন না। এঁরা নীরব নিরীহ নিষ্ক্রিয় দর্শক বাহ্যত এবং অন্তরে ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ ও মানসিকভাবে পীড়িত। এঁদের মধ্যে যাঁরা লিখিয়ে তাঁরাও তিন শ্রেণীর। এক. সমাজ-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সরকার ভীরু, দুই. সরকার-ঘেঁষা চাটুকার, তিন. সরকার-শত্রু প্রতিবাদী। এ শেষোক্ত দলে সহজে কেউ যোগ দেয় না। ফলে প্রতিকার প্রতিবাদ প্রতিরোধ কোন গুরুত্ব পায় না সমাজের-সরকারের কাছে, যদি না রাজনীতিক দল ও তরুণ-তরুণীরা প্রতিবাদে-প্রতিরোধে এগিয়ে আসে।

আজকের পৃথিবীর নানা রাষ্ট্রে ethnic বা Racial, Religious ও Regional কিংবা ভাষিক বিরোধ-বিবাদ-সংঘর্ষ-সংঘাত প্রকট হয়ে উঠেছে। আমাদের উপমহাদেশে আসমানী দোহাই দিয়ে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা বর্ণে বিন্যস্ত সমাজকে চিরন্তন করে রেখেছিল, সে-সঙ্গে পূর্বজন্মের কর্মফল যুক্ত হওয়ায় তিন হাজার বছর ধরে শূদ্রসেব্য ব্রাহ্মণের জীবন ছিল নিরুপদ্রব নিরাপদ শান্তির ও স্বস্তির, যদিও দ্রোহ জেগেছিল বর্ধমান মহাবীরের ও গৌতম বুদ্ধের নেতৃত্বে। ওঁরা ছিলেন দেব-দ্বিজ-বেদ দ্রোহী। আস্তিক বলেই এখনো শাস্ত্রদ্রোহী হতে অন্ত্যজ শ্রেণীর শূদ্ররা সাহস পাচ্ছে না বটে, তবে সামাজিক, আর্থিক ও নাগরিক জীবনে স্বাধিকার আদায়ের জন্যে তারাও এখন প্রায় মারমুখো সংগ্রামী। লড়াকু হয়ে উঠছে পুরো তফশিলী সমাজ ভারতের সর্বত্র। তাদের সঙ্গে জুটেছে আদিবাসী উপজাতিরাও। আমাদের আলোচ্য অবশ্য এ সব নয়। আমাদের কাছে উপমহাদেশের সবচেয়ে মারাত্মক আধি ও সমস্যা হচ্ছে হিন্দু-মুসলিমের পারস্পরিক দ্বেষণা ও দাঙ্গা। অন্য কথায় উপমহাদেশে উনজনের তথা সংখ্যালঘুর জীবন-জীবিকার অনিশ্চয়তাজাত শারীরিক, মানসিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক ও শাস্ত্রিক জীবনের নির্বিঘ্নতার ও নিরাপত্তার অভাবপ্রসূত যন্ত্রণা, যার ফলে তাদের দিবারাত্রির স্বস্তিহীন মর্ত্যজীবনে মন-মগজ-মনন-মনীষা মুক্ত বুদ্ধি, যুক্তি ও বিবেক প্রয়োগের অভাবে বিকাশ পায় না।

আমরা সবাই জানি ও মানি যে স্বদেশী-বিজাতি-বিধর্মী-বিভাষীদ্বেষণা এবং জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-নিবাস-যোগ্যতাচেতনা পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশে শিশু প্রায় জন্মসূত্রেই-আশৈশব শুনে শুনেই জেনে, বুঝে ও মেনে নেয়। আশৈশব শ্রুত, লব্ধ ও জ্ঞাত বলেই তা জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-বিবেক ও উপযোগচেতনা প্রয়োগে অনীহ ও অসমর্থ মানুষের রক্ত-মাংসের মতোই দেহ-প্রাণ-মন-মগজ-মননে অপরিহার্য এবং জীবনযাপনে আবশ্যিক ও জরুরী হয়ে স্থিতি পায় জীবনচেতনার তথা জীবনদর্শনের উৎস ও ভিত্তিরূপে, জীবনের পুঁজি-পাথেয় হিসেবে। আস্তিক মানুষে এ বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা কিছুতেই ঘোচে না। এ সাধারণ ও সর্বমানবিক ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের সঙ্গে আমাদের দেশে আমাদের জীবনে আরো একটা অতিরিক্ত মারাত্মক ও অবিমোচ্য উপসর্গ যোগ করে দিয়েছিল ব্রিটিশ শাসকরা। তা হচ্ছে ব্রিটিশ শাসকদের বিভেদনীতির প্রয়োগের প্রয়োজনে ব্রিটিশ শাসকনিযুক্ত ও অনুপ্রাণিত জেমস মিল থেকে হান্টার অবধি লেখকদের ইতিহাসের নামে বানানো বৃত্তান্ত মাধ্যমে হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে দ্বেষ-দ্বন্দ্ব প্রাজন্মক্রমিক করে রাখার সুপরিকল্পিত প্রয়াসের সাফল্য। নানা বানানো বৃত্তান্ত মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষিত হিন্দুমনে এ ধারণা ও বিশ্বাস বা সত্য বা তথ্য দৃঢ়মূল করে দিয়েছেন যে মধ্যএশিয়া থেকে আগত বর্বর, নিষ্ঠুর বিদেশী বিজাতি বিধর্মী বিভাষী তুর্কী-মুঘল শাসকগোষ্ঠী হিন্দুর মা-বোন-স্ত্রী-কন্যা হরণ, ধর্ষণ ও বিবাহ করে ওদের ইজ্জত নষ্ট করেছে প্রায় সাড়ে সাতশ বছর ধরে, তরবারী হাতে হত্যার ভয় দেখিয়ে হিন্দুদের করেছে ইসলামে দীক্ষিত; ভেঙেছে মন্দির-মূর্তি, লুট করেছে মন্দিদের অর্থসম্পদ, ধনী হিন্দুর অর্থবিত্ত, হত্যা করেছে অব্রাহ্মণ ধনী-মানী হিন্দু সম্ভ্রান্ত ও সামন্ত শ্রেণীর লোকদের। ব্রিটিশ লিখিত ইতিহাসের প্রতিটি বাক্যকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দৃঢ় প্রত্যয়ে নিশ্চিত বিশ্বাসে শিক্ষিত হিন্দুমাত্রই একেবারে আক্ষরিক অর্থেই বেদবাক্যের মতো সত্য ও তথ্য রূপে নির্বিচারে অর্থাৎ সন্দেহ-সংশয়হীন চিত্তে গ্রহণ করে তুর্কী-মুঘল শাসকগোষ্ঠীর প্রতি নয় কেবল, দেশের বৌদ্ধ-হিন্দুঅন্ত্যজ শ্রেণী থেকে দীক্ষিত দেশজ মুসলিমদের প্রতিও তুর্কী-মুঘলের জ্ঞাতি বা স্বধর্মী জেনে ক্ষোভে, ক্রোধে, ঘৃণায় ও প্রতিহিংসায় আজো মারমুখো হয়ে রয়েছে। হিন্দুর সাম্প্রদায়িকতার অর্থাৎ মুসলিম-বিদ্বেষের বীজ, বৃক্ষ, শেকড়, শাখা-পল্লব প্রভৃতির আর প্রতিক্রিয়ার ও প্রতিহিংসার উদ্ভব ঘটেছে ওই ব্রিটিশলিখিত ইতিহাস থেকেই। হিন্দুরাও ভেবে দেখে না জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি প্রয়োগে যে মুসলিমরা কেবল ভারত নয়, সপ্তম শতক থেকে এশিয়া, আফ্রিকা ও য়ুরোপের অনেকাংশও ১৯১৮ সন অবধি শাসন করেছে। রাজনীতিতে, সাম্রাজ্যশাসনে ওরা ভুঁইফোঁড় নয়, সংস্কৃতি-সভ্যতা বিস্তারেও ওদের দান সামান্য নয়।

আবার উনিশ শতকের শেষপাদ থেকে বিশ শতকের প্রথমার্ধ অবধি নিম্নবর্ণের, নিম্নবিত্তের, নিম্নবৃত্তির অজ্ঞ-অনক্ষর বৌদ্ধ-হিন্দুজ-মুসলিম সমাজে হিন্দু-বিদ্বেষের মূলেও রয়েছে হান্টার, কান্টওয়েল স্মিথ প্রমুখ রচিত ইতিহাস নামের বানানো বৃত্তান্ত। হান্টার বলেন 'one hundred and fifty years ago, it was impossible for a musalman to be poor' এরা ঘরানা-পেশাজীবী দেশজ মুসলিম কী তুর্কী-মুঘল শাসকগোষ্ঠীর মুসলিম, তা কিন্তু স্পষ্টভাবে বললেন না। তেমনি কোন্ শ্রেণীর মুসলিম রাজত্ব হারিয়ে ব্রিটিশবিদ্বেষী হয়েছিল, আদৌ হয়েছিল কি-না, তা বলা হল না। অ্যাডামও খোঁজ-খবর নিয়ে জানালেন না স্কুলে পড়ার জন্যে মুসলিম ঘরের সন্তান মিলছিল না কেন? এমন কি প্রাক্তন মুর্শিদাবাদী শাসকগোষ্ঠীর উর্দুভাষী মুসলিমরাই বলতে গেলে দেশজ অজ্ঞ অনক্ষর তুচ্ছ পেশাজীবী ও চাষী-মজুর-মুসলিমের অভিভাবক ও প্রতিনিধি রূপে ব্রিটিশ শাসকদের স্বীকৃতি পেলেন, যদিও দেশজ মুসলিমদের সঙ্গে তাঁদের কোন শাস্ত্রিক, সামাজিক, বৈবাহিক, ভাষিক, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়, সম্পর্ক-সম্বন্ধ ছিলই না কখনো। উর্দুভাষীদের ও হিন্দুদের সঙ্গে দেশজ মুসলিমদের সম্পর্ক-সম্বন্ধ ছিল বাজারি বেচা-কেনার আর খাজনা ও পারিশ্রমিক লেনদেনের। কিন্তু ব্রিটিশ ইতিহাসকার ও শাসকগোষ্ঠী অজ্ঞ মুসলিম মনে এমন এক ধারণার বীজ বপন করে দিল যে মুসলিম মাত্রই তুর্কী-মুঘল শাসকগোষ্ঠীর জ্ঞাতি, কাজেই তুর্কী-মুঘল আমলে, তাদের ছিল শিক্ষা-সংস্কৃতি, অর্থ-সম্পদ প্রভৃতি। ইংরেজ আমলেই কেবল হিন্দুরা ইংরেজের কৃপা-করুণা-দয়া-দাক্ষিণ্য-সহযোগিতা-আশ্রয়-প্রশ্রয় এবং ইংরেজি শিক্ষা পেয়ে জমিদার, চাকুরে, উকিল-মোক্তার-ডাক্তার-দোকানদার-মহাজন রূপে মুসলিমদের শোষণের ও শাসনের মালিক হয়ে বিদ্যায় ও বিত্তে স্ফীত হতে থাকে, আর মুসলিম সমাজ ক্রমে ফারসী উঠে যাওয়ায় অজ্ঞ-অনক্ষর হয়ে বিদ্যায় বিত্তে বেসাতে রিক্ত হয়ে নিঃস্ব নিরন্ন হয়ে পড়ে।

এ ধারণা তাদের মনে দৃঢ়মূল হওয়ায় ব্রিটিশ আমলে মুসলিমমাত্রই জানল ও মানল যে মুসলিমদের সর্বপ্রকার দৈন্যের মূলে রয়েছে শোষক-শাসক হিন্দুরাই। এ জন্যেই ব্রিটিশ চক্রান্তমূলক বঙ্গবিভাগ বা বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করে সাধারণভাবে মুসলমানরা, এমনকি বর্ণহিন্দুর ঘৃণ্য অবজ্ঞেয় ও শোষিত নমঃশূদ্রসমিতিও বঙ্গবিভাগ সমর্থন করেছিল। কাজেই ওদের বিদ্বিষ্ট মনের সিদ্ধান্ত হল একটিই: মুসলিমদের জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে এক নম্বরের শত্রু হল হিন্দুরাই। তাই স্যার সৈয়দ আহমদ খানের প্রবর্তনায় ও ব্রিটিশ প্ররোচনায় ও প্রচারণায় ১৮৭০ সনের পর সিপাহী-ওয়াহাবী দ্রোহের ও বিচারের পরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৮৭০ সনের পর থেকে ১৯৪৭ সন অবধি সাধারণ ইংরেজী শিক্ষিত মুসলিম মনে ছিল ব্রিটিশপ্রীতি, হিন্দুভীতি ও হিন্দুবিদ্বেষ। অতএব, হিন্দু-মুসলিম বিরোধ-বিবাদ, দ্বেষ-দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ-সংঘাত স্রষ্টা হচ্ছে ইংরেজ শাসকরাই। ১৭৮২ সনে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার শুরু, কিন্তু ১৯৪৭ সনের আগস্ট মাসে ব্রিটিশ-বিতাড়নের পরেও উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা বিশেষ করে ভারতে বেড়েই চলেছে। বাঙলাদেশে ও পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক চেতনা আছে। কিন্তু হত্যাকাণ্ড নেই। ভারতে প্রায় প্রতিদিন কোথাও না কোথাও হত্যাকাণ্ড ঘটে, দাঙ্গা বাধে। আর সংখ্যালঘুরা ভারতে, পাকিস্তানে, বাঙলাদেশে কি কোন সুবিচার পায় চাকরিক্ষেত্রে, কিংবা সমান নাগরিক অধিকারে কি স্বপ্রতিষ্ঠ?

শিক্ষিত হিন্দুরা বিশেষ করে বিদ্বানেরা ও ইতিহাসলেখকরা ব্রিটিশ ঐতিহাসিকদের পরিবেশিত তথ্য ও সিদ্ধান্ত যদি যুক্তি-বুদ্ধি-প্রয়োগে যাচাই-বাছাই করতেন, তা হলে হিন্দুমনের এ প্রাজন্মক্রমিক ক্ষোভ-ক্রোধ-ঘৃণা-বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসাপরায়ণতা এমন তীব্র হিংস্রতায় পরিব্যক্ত হত না। শাহ-সামন্তরা অর্থ, পেশী ও জনবল প্রয়োগে জোর-জুলুমে দেশ-রাজ্য-রাষ্ট্র নরহত্যার, লুণ্ঠনের, দহনের মাধ্যমে জবর দখল করেন। তাঁদের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ ভদ্র গৃহস্থের নীতি-চরিত্র-আচরণের ও রীতিনীতির মাপে যাচাই করা, বিচার ও সিদ্ধান্ত করা কি যুক্তিসঙ্গত? এখানে কয়েকটি তথ্য বিবেচনার জন্যে তুলে ধরছি:

১. তরবারির সাহয্যে যদি ইসলাম প্রচারিত হত, তাহলে বর্ণহিন্দুরা মুলতানের পূর্ব দিকে এবং দাক্ষিণাত্যে কোথাও ইসলাম গ্রহণ করেনি কেন? বা গ্রহণ না করায় নিহত হয়ে সংখ্যাল্পই বা হল না কেন? তরবারিগুলো কি কাঠের ছিল? বৌদ্ধ বিলুপ্ত হল; হিন্দু রয়ে গেল কেন? মুসলিম সংখ্যা কোথাও বাড়ল না কেন? বরং Robert orme তাঁর Historical Fragments of Mugal Empire গ্রন্থে বলেছেন, all the descendants of converted Gentoos-a miserable race as none but the most miserables of the Gentoos castes are capable of changing their religion" অতএব কেবল অন্ত্যজ শ্রেণীরাই ব্রাহ্মণ্য পীড়ন-শোষণ থেকে মুক্তি খুঁজছিল। অবশ্য এ তথ্য শত বছর আগে থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, ডক্টর জেমস্ ওয়াইজ, হার্বার্ট রিজলি, বিভারলি, গেইট প্রমুখ সবাই স্বীকার করেছেন যে, বর্ণহিন্দুর ঘৃণা-অবজ্ঞা-পীড়ন থেকে মুক্তির লক্ষ্যেই স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য শূদ্ররা স্বেচ্ছায় মুসলিম হয়েছিল।

২. তুর্কী-মুঘল আমলের কোন রাজধানীতেই মুসলমান সংখ্যাগুরু নয় কেন?

৩. বাহমনী রাজ্যের আহমদনগরে, গোলকুণ্ডায়, বিজাপুরে, বেরারে, বিদরেও তো মুসলিম সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য।

৪. তুর্কী-মুঘল আমল থেকে তো বটেই, তার অনেক অনেক আগে থেকেই রাজ্য থাকত সামন্ত শাসনে, সার্বভৌম সরকার বা সম্রাট রাজস্ব ও আনুগত পেয়েই থাকতেন তুষ্ট। তাই তো লর্ড ওয়েলেসলি [১৭৯৮-১৮০৫] অধীনতামূলক বা আনুগত্যমূলক মিত্রতা নীতি প্রয়োগে গোটা ভারত গ্রাস করলেন। বরং লর্ড ডালহাউসিই [১৮৪৮-৫৬] প্রত্যক্ষ শাসনে সাম্রাজ্য বৃদ্ধির লোভে 'দত্তকপুত্র গ্রহণ' নীতি বিলোপ বা স্বত্ব বিলোপনীতি গ্রহণ করেন। তবু দেখা গেল বর্তমান 'ভারত' রাষ্ট্রই গঠিত হয়েছে প্রাক্তন ৭৮১টি ছোট-বড়-মাঝারি সামন্ত শাসিত অঞ্চল নিয়ে। কাজেই দিল্লীর তুর্কী-মুঘল শাসক হিন্দুপীড়ন করতেই পারেনি। প্রত্যক্ষ শাসনে সামান্য অঞ্চলই ছিল মাত্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫. একজন মুসলিমের পতিতাকেও, গণিকাকেও বধূ করে ঘরে তুলতে শাস্ত্রিক সামাজিক বাধা নেই। কাজেই বয়োধর্মে ভালো লাগলেই যে-কোন নারীর সঙ্গে কাম-প্রেমের সম্পর্ক স্থাপনে মুসলিম তরুণের আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু হিন্দুর পক্ষে গোপনে লাম্পট্য ও পতিতালয় আশ্রয়ী হওয়া ছাড়া উপায় নেই। কাজেই মুসলমান মাত্রই কামুক ও ল্যাম্পট্যদুষ্ট নারীধর্ষক বলে যৌক্তিক-বৌদ্ধিক সিদ্ধান্ত করা চলে না।

৬. অতএব তুর্কী-মুঘল সার্বভৌমত্ব কালেও ভারতের সব অঞ্চল মুসলিম শাসনে ছিল না, স্বাধীন হিন্দুরাজাও ছিলেন। দেশটা ছিল শতে নব্বই জন হিন্দু। ফলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি সৎশূদ্রই করত প্রত্যক্ষভাবে দেশ শাসন। আজো হিন্দুর নামে পদ-পদবীবাচক শব্দগুলো রয়েই গেছে, যা অজ্ঞ-অনক্ষর নিম্নবর্ণের ও বর্ণের মুসলিম নামে দুর্লভ ও দুর্লক্ষ্য।

৭. মন্দির মসজিদ গির্জা মঠ বিহার সিনাগগ পৃথিবীর সর্বত্র ধর্মবিশ্বাস নির্বিশেষে শাসকদের প্রয়োজনে ভাঙতে ও লুট করতে হয়েছে শত্রুকে আশ্রয়চ্যুত করার জন্যে এবং গচ্ছিত ও সঞ্চিত অর্থসম্পদ হস্তগত করার জন্যে। প্রসঙ্গত বলি, আওরঙ্গজেব শতে তেত্রিশজন হিন্দুকে উচ্চপদে নিয়োগ করেছিলেন, ডক্টর আতাহার আলির বইতে তালিকা মিলবে। আর তাঁর সেনাপতি ছিলেন জয়সিং, যশোবন্ত সিং, কেশব সিং ও দলীপ সিং, তুলনায় মুসলিম সেনাপতি কমই ছিলেন। সে সময়ে ইরানী-মুঘল আমীরদের মধ্যে রেষারেষি ছিল, তাই হয়তো আওরঙ্গজেব ভিন্নপন্থা গ্রহণ করেছিলেন। আওরঙ্গজেব ধার্মিক ও নীতিমান ছিলেন তার চিঠিপত্রই তার প্রমাণ, তা চাড়া তিনি সাম্রাজ্যশাসনের সঙ্গে শাস্ত্রকে কখনো জড়িত করেননি। আওরঙ্গজেব পঞ্চাশ বছর রাজত্ব করেছেন, এর ফাঁকে ফাঁকে চৌদ্দ বছরে অনেক মন্দির তাঁর ফরমান যোগে ভাঙিয়েছেন দ্রোহী ও নববিজিত অঞ্চলে। ছত্রিশবছর কোন মন্দির ভাঙাননি। কোচবিহারে, মেদিনীপুরে, গুজরাটে, উত্তর দোয়াবে, রাজপুতনায়, মারাঠাওয়াড়ায়, বিজাপুরে, উদয়পুরে, চিতোরে, পশ্চিম মেবারে–এসব স্থানে রাজা, জমিদার, কৃষক প্রভৃতির দ্রোহের ও দমনের কালে মন্দির ভাঙান হয়েছে দ্রোহীর পলাতকের, আশ্রিতের এবং লুকিয়ে সঞ্চিত-রাখা ধনরত্ন সন্ধানের প্রাচীন ও মধ্য যুগীয় রাজনীতি-রণনীতির নিয়মে, সেকালে সবদেশেই সবরাজাই স্বধর্ম-বিধর্মী নির্বিশেষে স্ব স্ব চরিত্র ও স্বার্থচেতনাবশে এমনি আচরণ করত। বিশেষত প্রবলের স্বার্থ রক্ষা করাই ন্যায়ের ও ন্যায্যতার ছিল মাপকাঠি। এখন নানা সূত্রে এর সাক্ষ্য প্রমাণ দলিল মেলে। তুর্কী-মুঘল শাসকরা হিন্দুর মন্দির কয়টা ভেঙেছে, গাঁয়ে গাঁয়ে ভেঙেছে কি? এতো মন্দির টিকে রইল কি করে? ভাঙা মন্দিরের সাতশ বছরে সংখ্যা কয়টা? কোন্ কোন্ স্থানের?

৮. ভারতে কোথাও কোন গাঁয়ে-গঞ্জে-বন্দরে-শহরে ভয় দেখিয়ে কাউকে ইসলামে দীক্ষিত করা হয়েছে বলে একটা প্রমাণও নেই। ইসলামের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে দক্ষিণ ভারতে অদ্বৈতবাদী শঙ্কর, রামানুজ, নির্মাক, বল্লভ, চৈতন্য প্রমুখ ব্রাহ্মণ এবং উত্তর ভারতে কবীর, দাদু, রামদাস, রামানন্দ প্রমুখ বহু নিম্নবর্গের লোক দেব-দ্বিজ-দেবদ্রোহী একেশ্বরবাদী হয়ে উঠেন ইসলামি মানবসাম্যে প্রবুদ্ধ হয়ে। অন্ত্যজ শূদ্রসেব্য ও সুবিধেভোগী সৎশূদ্র ও ব্রাহ্মণ ইসলামি সাম্যে প্রলুব্ধ হয়নি কায়েমী স্বার্থ ও মর্যাদা রক্ষার গরজে। নইলে তরবারির ও হত্যার ভয় উপেক্ষা করে এতো হিন্দু টিকে রইল কি করে? উল্লেখ্য যে মৈথিল স্মার্ত কবি বিদ্যাপতি যে বলেছেন, ব্রাহ্মণের পৈতা ছেঁড়ে গো-হাড়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার মাথায়-ছোঁয়ায় এবং ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে ত্রস্ত করে— এ হচ্ছে স্থূল ও বর্বর কৌতুক ক্রীড়ামাত্র, সাম্প্রদায়িকতা নয়। বিশেষত মিথিলার স্বাধীন হিন্দু রাজার রাজ্যে বিদ্যাপতি এ দৃশ্য দেখেননি, মিথিলা গো-হাড়ে ও কবরে আকীর্ণ হতেই পারেনি। এ কল্পচিত্র মাত্র।

৯. এ সূত্রে উল্লেখ্য যে মারাঠা বর্গীর দানবিক লুণ্ঠন-পীড়ন-হত্যার সঙ্গে তুলনীয় অন্য কারো কোন অত্যাচারই ভারত-ইতিহাসে মেলে না। আজো কুয়োর পানি নিয়ে ব্রাহ্মণ্যবাদী বর্ণহিন্দু অচ্ছুৎ হত্যা করে, চাকরির সংখ্যা বা বিদ্যালয়ে ভর্তি নিয়ে শূদ্র হত্যা করে, ডক্টর আম্বেদকরের নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরণ সহ্য করে না, অচ্ছুৎ হত্যা করে।

১০. উল্লেখ্য যে এ মুহূর্তেও 'হিন্দুস্তান' নামে উত্তর ভারত ও খোট্টাভাষীর দেশ বোঝায়। কাজেই 'হিন্দু' সিন্ধু নদ সম্পৃক্ত শব্দ, ধর্ম-বিশ্বাসী সম্পৃক্ত নয় ঐতিহাসিকভাবে। ষোল-সতেরো শতকেও হিন্দু বলে স্পষ্ট সংজ্ঞায় ও সংজ্ঞার্থে কোন ধর্মবিশ্বাসী সম্প্রদায় বা জাতি ভারতে ছিল না। ভারতবাসী অর্থে হিন্দু, হিন্দুস্তানী হিন্দুবী এবং দেশ অর্থে হিন্দু, হিন্দুস্তান প্রভৃতি বহুল প্রচলিত ছিল। মিথিলার স্মার্ত কবি বিদ্যাপতির রচনায় পনেরো শতকের প্রথমার্ধে 'হিন্দু-তুরুক' বলতে ভারতীয় ও তুর্কী নির্দেশ করেছেন বলে মনে হয়। আজো হিন্দুধর্ম বলতে কোন একক উপাস্যের উপাসক সম্প্রদায় বা জাতি বোঝায় না। হিন্দু এখন এক রাজনীতিক সংজ্ঞার্থের জনগোষ্ঠী মাত্র, যারা গোটা উপমহাদেশে ছড়িয়ে বাস করে এবং বিদেশেও।

১১. জিজিয়া নামের রাজস্ব আদায় রাজকোষে অর্থবৃদ্ধির উপায়মাত্র। পারস্যেও জিজিয়া কর ছিল, ভারতে ব্রাহ্মণ এবং দরিদ্রদের এ কর দিতে হত না। এ সূত্রে তীতুমীরের সময়কার হিন্দু জমিদারের মুসলিমদের উপর আরোপিত 'দাড়ি কর' স্মরণ করেন না কেন বাঙালী ইতিহাসকারগণ?

১২. বৌদ্ধ ধর্ম বিলুপ্ত হয়েছে বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের আধিক্যে, শঙ্করের বৌদ্ধ আদলে মায়াবাদ, জ্ঞানবাদ, অমূর্ত উপাসনা ও সন্ন্যাসবাদ প্রচারের এবং হিন্দুর বৌদ্ধ-পীড়নের ফলে। নতুবা মুসলিম পীড়নেও হিন্দু যেমন ভারতে গড়ে শতে আশিজন রয়ে গেল, বৌদ্ধও তেমনি থাকত, আসলে তুর্কীবিজয়ের আগেই বৌদ্ধবিলুপ্তি প্রায় সমাপ্তির মুখেই ছিল। প্রমাণ নির্জিত কিছু বৌদ্ধ প্রচ্ছন্নভাবে হিন্দু সমাজভুক্ত হয়ে আজো অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছে। যেমন ধর্মঠাকুরপন্থীরা, নাথযোগীরা বা তাঁতীরা এবং বাউল ও বৈষ্ণব সহজিয়ারা এবং আদিনাথ, চন্দ্রনাথ, জগন্নাথ, গোরক্ষনাথ প্রমুখ সব নাথ ও তারা, বৎসলা, ক্ষেত্রপাল প্রভৃতি সেই বৌদ্ধ দেবতাই হিন্দুর দেবতা রূপে টিকে রয়েছেন।

১৩. হিন্দু ইতিহাসকারগণ কেন স্বচক্ষে দেখা ব্রিটিশ আমলের দেশীয় রাজ্যে 'বেদ-ব্রাহ্মণ-রাজা, গয়া-গঙ্গা-গরু-গুরু' রূপ হিন্দুয়ানী প্রবলভাবে চালু রেখে মুসলিম প্রজার আজানের, মসজিদ নির্মাণের, গরু কুরবানীর ও মুসলিম সংস্কৃতির চর্চার অধিকার বিদ্যালয়ে নিষিদ্ধ রেখেছিল, তা বয়ান করেন না? স্বয়ং বিদ্যাসাগর তাঁর মেট্রোপলিটন বিদ্যালয়ে মুসলিম শিক্ষার্থীর ভর্তি নিষিদ্ধ করেছিলেন। আজো নাকি বিদ্যাসাগর কলেজে সে-নিয়ম চালু রয়েছে। দেশীয় হিন্দুরাজার রাজ্যে ও জমিদারিতে মুসলিম প্রজারাও তো ছিল জিম্মি। সেক্যুলার ভারতে হিন্দুর দাবিতে গোবধ নিষিদ্ধ কেন? মন্ডল কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন প্রতিরোধে রাজনীতিকদের প্ররোচনায় বর্ণহিন্দু কিশোরেরা আত্মহত্যা করে, এ বর্ণহিন্দুর শোষণ-পীড়ন-বঞ্চনামুক্তির জন্যে আম্বেদকর অন্ত্যজদের বৌদ্ধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছিলেন। আজ হরিজনেরা ব্রাহ্মণ্য পীড়ন-শোষণমুক্তির জন্যে আম্বেদকরকে তাদের স্বাধিকার আদায়ের সংগ্রামে প্রেরণার-প্রণোদনার উৎস করেছে।

১৪. ভারতে বৌদ্ধবিলুপ্তি ঘটে (নেপালেও) ব্রাহ্মণ্যবাদীদের সুপরিকল্পিত পীড়নে। প্রমাণ শূন্য পুরাণের 'কলিমা জালাল ও নিরঞ্জনের রুম্মা'। এখন বৌদ্ধবিলুপ্তির জন্যে অযৌক্তিক-অবৌদ্ধিকভাবে তুর্কীদের দায়ী করলে, তা সত্য হয়ে উঠবে না। কেননা তখন বৌদ্ধ শাসক ছিল না ভারতে। হিন্দুদের বাদ দিয়ে কেবল বৌদ্ধদের জোর করে হত্যা করার বা ইসলামে দীক্ষিত করার তথ্য যুক্তিসিদ্ধ নয়। মুসলিম হাতে বৌদ্ধবিলুপ্তি ঘটলে হিন্দুবিলুপ্তিও ঘটত, তা ঘটেনি। বরং তুর্কী আমলে বাঙলায় বিহারে হিন্দুমনীষার পুনর্জাগরণ ঘটেছিল। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও এ সত্য স্বীকার করেছেন, আরো উপলব্ধি করেছিলেন যে বর্ণহিন্দু পোষণ-পীড়ন-বঞ্চনা ঘৃণা থেকে মুক্তির জন্যেই নিম্নবর্ণের ও নিম্নবর্গের হিন্দু বাঙলায়-বিহারে ইসলাম বরণ করেছিল।

১৫. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত, মুসলিম-বিদ্বেষী বলে পরিচিত প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত হিস্ট্রি অব বেঙ্গল ২য় খণ্ডে মাত্র তিন-চারজন হিন্দুবিদ্বেষী অত্যাচারী মুসলিম শাসকের বৃত্তান্ত মেলে এবং তাদের সম্মিলিত শাসনকাল মাত্র বিশ বছর। এবং অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় রচিত মুঘলপূর্ব কালের তথা তুর্ক-আফগান আমলের ইতিহাসে অ্যাটিলা -(চঙ্গিস-হালাকুর মতো অত্যাচারী বর্বর শাসকের সাক্ষাৎ মেলে না এবং অধ্যাপক হীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ের ইতিহাসগ্রন্থেও মুঘল শাসনে ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ ও প্রতিহিংসা গ্রহণলিপ্সু হওয়ার মতো কোন পীড়ন-অত্যাচারের খবর মেলে না।

১৬. দেশজ মুসলিমদেরও জানা, রেখা এবং মানা বাঞ্ছনীয় যে তারা স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য নিতান্ত ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ ঘরানা পেশাজীবী শ্রেণী থেকে ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিল বর্ণহিন্দুর দেব-দ্বিজ-বেদের নামে ঘৃণা-বঞ্চনা-শোষণ-শাসন-অবমাননা থেকে মুক্তি লক্ষ্যে। শিল্পবিপ্লবের মতো এখানে কিছু ঘটেনি বলে তাদের আর্থিক, বৈষয়িক ও পেশাগত জীবনে কোথাও কোথাও নামান্তর ঘটলেও অবস্থার ও অবস্থানের পরিবর্তন ঘটেনি। য়ুরোপীয় কোম্পানীগুলো বিশেষ করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে শুরু করলে আমাদের কুটির শিল্প এবং কৃষিজ পণ্যের বিনিময়-প্রধান গ্রামীণ জীবনে আর্থিক বিপর্যয় আরম্ভ হয়, পণ্যবিনিময়মুখ্য গ্রামীণ সমাজ বৈশ্বিক বাণিজ্যের চাপে বৃত্তিচ্যুত হয়, ফলে অধিকাংশ মানুষ জাত জন্ম বর্ণ ধর্ম ভাষা নিবাস যোগ্যতা দক্ষতা নির্বিশেষে দারিদ্র্যের শিকার হয়, আর প্রজন্মক্রমে ভূসম্পত্তি বা অন্যান্য সম্পদও ভাগে-বন্টনে সচ্ছল গৃহস্থও দুস্থ দরিদ্র নিঃস্ব নিরন্ন পরিবারে পরিণত হতে থাকে।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্ব শুরু হলে সেনা ও শাসন বিভাগীয় উত্তর ভারতীয় ও বহির্ভারতীয় উর্দু, ফারসী তুর্কীভাষীরা সুবেহ বাঙ্গলা ত্যাগ করে চলে যায়, নিতান্ত ব্যক্তিগত সুবিধে-অসুবিধের কারণে কয়েকটি পরিবার মুর্শিদাবাদে ও কোলকাতায় বাস করতে থাকে। রইস বা অভিজাত সে-সব পরিবার আজো টিকে আছে এবং তাদের সংখ্যা গোটা বাঙলাভাষী অঞ্চলে এখনো করগণ্য।

অন্য মুসলিমদের কেউ মুনশী, মোল্লা, মৌলবী, উকিল, মোক্তার, ইমাম, মুয়াজ্জিন, হেকিম এমনকি হয়তো শিকদার-ফৌজদারও হয়েছে, হয়েছে-কানুনগোয়-মজুমদার-পাটওয়ারী প্রভৃতি আর কাজী। এর উপরের কোন পদ দীক্ষিত মুসলিমদের বংশধরেরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুর্কী-মুঘল আমলে পায়নি। অবশ্য যোগ্য দক্ষ উচ্চাশী কেউ কেউ তালুকদার, তরফদার, জোতদার, হাওলাদারও হয়েছিল। দেশজ মুসলিম সমাজে সেদিনও শিক্ষিত লোক লাখে এক মিলত না। কারণ তারা যে শ্রেণীর হিন্দু-বৌদ্ধ থেকে মুসলিম হয়েছে, সে-শ্রেণীতে শিক্ষার ঐতিহ্য ও অধিকার ছিল না। ইংরেজ রাজত্বে তারা কোলকাতায় বা অন্যান্য বন্দরে ব্রিটিশ সহযোগীরূপে ব্যবসা-বাণিজ্যের চাকরির কোন সুবিধে পায়নি। ফলে তারা লোক-সংখ্যাবৃদ্ধির কারণে পারিবারিক জীবনে সম্পত্তিহীন হতে থাকে, আয় কমতে থাকে ঘরানা পেশায়। কেবল উকিল হিসেবে কিছু ফারসী-জানা উকিল ১৮৬০ সন অবধি এবং আয়মা সম্পত্তির মালিক হিসেবে ১৮৪৮ সন অবধি কিছু পরিবার অর্থ সম্পদে সচ্ছল থাকে। আর দেশী মুসলিমরা মুসলিমরাজ্য বিনাশকারী ব্রিটিশবিদ্বেষ বশে ইংরেজী শেখেনি—এর মধ্যে কোন সত্য বা তথ্য নেই। প্রমাণ ১৮২৪ সনে মুর্শিদাবাদের নবাবের দাবিক্রমে মুর্শিদাবাদে অভিজাতদের সন্তানদের জন্যে ইংরেজী স্কুল স্থাপিত হয়। ওয়াহাবী নেতা সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী ব্রিটিশবিদ্বেষী ছিলেন না, ব্রিটিশের বন্ধু ছিলেন, কোলকাতায় ওদের সংবর্ধনায় ধন্য হয়েছিলেন। উর্দুভাষীরা ১৮৬০ সন থেকে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি পেতে থাকে। কাজেই উনিশ শতকে মুসলিম শিক্ষার সমস্যা ও কারণ কারো বোধগত ছিল না। অন্যদিকে ব্রিটিশের আস্থাভাজন সহযোগী চাকুরে হিন্দুরা ব্যবসায়ে, চাকরিতে, ওকালতিতে এবং ১৮৩২ সন থেকে নুনের দারোগা, ডেপুটি কালেক্টর, মুনসেফরূপে, জমিদার, মহাজন, দোকানদার ও শিক্ষিত সচ্ছল গৃহস্থ হিসেবে ধনে-মানে-বিদ্যায়, খ্যাতিতে-ক্ষমতায় দর্পে-দাপটে তুর্কী-মুঘল আমলের মতোই নির্জিত নিরক্ষরতাদুষ্ট হীনম্মন্য মুসলিম সমাজের অভিভাবক-তত্ত্বাবধায়ক এবং মালিক-মনিব হয়ে অধিক সংখ্যায় স্বপ্রতিষ্ঠ হল এবং টিকেও থাকল হিন্দুরাই।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে তাই বাঙালী মুসলিম সমাজের যথার্থ পতন যুগ বা সর্বপ্রকারের বিপর্যয়ের আঁধার যুগ। আবার উনিশ শতকের শেষপাদে ও বিশশতকে যখন হিন্দু-প্রতিষ্ঠিত বাড়ির কাছের স্কুলে পড়ার সুবিধে পাওয়ায় মুসলিম সমাজের মধ্যে মন্থর গতিতে লেখাপড়ার বিস্তার ঘটতে থাকে, তখন তারা বর্ণহিন্দু ও মুসলিম সমাজের সর্বক্ষেত্রে আসমান-জমিন তফাত দেখে, তুর্কী-মুঘল রাজত্বের গল্প কানে শুনে জানল, বুঝল ও মানল যে ব্রিটিশ-হিন্দুর আঁতাতের ও ষড়যন্ত্রের ফলেই তাদের এ দুরবস্থা। তখন থেকেই তারা হিন্দুবিদ্বেষী হয়ে উঠল। ভুল জানার ও ভুল বোঝার দরুন সাম্প্রদায়িকতার বীজ উপ্ত হল মুসলিম-মনেও। বাস্তবে হিন্দু উকিল, ডাক্তার, চাকুরে, জমিদার, মহাজন রূপেই চালু নীতি-নিয়মেই অর্থ-সম্পদের মালিক হয়েছে, কেড়ে-মেরে-হেনে ধনী হয়নি।

১৭. আমাদের জানা ও মানা দরকার যে সর্দার মাতব্বর নেতা শাহ সামন্ত রাজা বাদশাহ প্রভৃতির কাজই হচ্ছে শাসন, শোষণ, দমন, দলন, হুকুম, হুমকি, হুঙ্কার, হামলা চালানো। পৃথিবীর কোন ধর্মশাস্ত্রেই শাহ-সামন্তের পররাজ্য দখল, নরহত্যা, রাজত্ববৃদ্ধি প্রভৃতি পাপ কর্ম বলে নিন্দিত নয়। ফলে কাড়া-মারা-হানা শাহ-সামন্তদের, সেনানী-সৈনিকের দায়িত্বের, কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত বলে আজো বিবেচিত। তাই একালেও রাষ্ট্রিক প্রয়োজনে স্বধর্মী, স্বজাতি, স্বদেশীর মন্দির, মসজিদ, গির্জা, মঠ, সিনাগগও ভাঙতে হয়। এ কালেও তা ঘটে, লাহোর মসজিদে মুসলিম সৈন্যই নরহত্যা করেছে, এখন করাচী মসজিদে গুলি করে নামাজী হত্যা করা হচ্ছে। হজের সময়েও মক্কায় হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। শিখ সৈন্যেরাই ইন্দিরার নির্দেশেই স্বর্ণমন্দিরে নরহত্যা করেছে, ঢাকায় পাকিস্তানী সৈন্যরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রমনার কালীমন্দির নিশ্চিহ্ন করেছে। বিজেপি ও কংগ্রেস সরকার বাবরী মসজিদ ভাঙিয়েছে। এ মুহূর্তের সেক্যুলার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আঞ্চলিক, গৌত্রিক, কিংবা ধর্মভিত্তিক জাতিসত্তার স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা আন্দোলনে রক্তক্ষরা-প্রাণহরা যুদ্ধে, দ্রোহী দমনের নামে, দ্রোহী হত্যার প্রয়োজনে লোকহত্যা করে চলেছে শ্রীলঙ্কায়, লাতিন আমেরিকায়, যুগোশ্লাভিয়ায়, উত্তর আয়ারল্যান্ডে, আফ্রিকায় নানা রাষ্ট্রে, কুর্দিস্তানে, আফগানিস্তানে, পাকিস্তানে, ভারতে কাশ্মীরে-পঞ্জাবে-আসামের সাত রাষ্ট্রে। প্রলুব্ধ ব্যক্তি যেমন লাভ-লোভ-স্বার্থবশে করে না হেন অপকর্ম নেই, তেমনি শাহ-সামন্ত, সরকার, শাসক, সৈন্যরা স্বদেশী, স্বজাতি, স্বধর্মী, স্বভাষী কিংবা বিদেশী, বিজাতি, বিধর্মী, বিভাষী নির্বিশেষে রাষ্ট্রিক স্বার্থের নামে মানুষের জান-মাল-গর্দান বিনাশে দানবীয় আচরণে আত্মপ্রসাদ লাভ করে। আদি ও আদিম কাল থেকে ফেরাও, সিজার, আলেকজান্দার, চেঙ্গিস, হালাকু, অ্যাটিলা, নাদির শাহ, নেপোলিয়ন, স্টালিন, হিটলার–কে নরহত্যায় বিজয়ের উল্লাস বোধ করেনি?

১৮. আমাদের শিক্ষিত লোকদের এ-ও জানা-বোঝা প্রয়োজন যে তুর্কী-মুঘল শাসকরা কেবল মন্দির ভাঙেনি, মসজিদও ভেঙেছে, মুসলিমরাই দু'বার কাবাকেন্দ্রী লড়াই করেছে, কেবল কাফের বলে হিন্দু ধনী-মানীজন ও সামন্ত হত্যা করেনি, মুসলিম শাহ-সামন্ত, অমাত্য-আমীর হত্যাও করেছে, হত্যা করেছে বাপ-ভাইকেও। শিবাজীর বংশধরও হয়েছে ষড়যন্ত্রে রাজ্যচ্যুত ও নিহত; শিবাজী প্রতিষ্ঠিত রাজ্য ভেঙে বাহমনী রাজ্যের মতোই পেশোয়া, হোলকার, সিন্ধিরা, গায়কোয়াড়, ভোঁসলা পাঁচ টুকরো করেছিল। বিজয়নগর শাসকদের, রাজপুতদের বা হিন্দু শাসকদের সুশাসক বলে সুনাম ছিল না। ভালো-মন্দকে জাতিগত ভাগে বিভক্ত করা চলে না, ব্যক্তিগতভাবেই লোক ভালো-মন্দ হয়। সাড়ে সাতশ বছরে কয়জন হিন্দু জমিদার-সামন্তরাজা তুর্কী-মুঘল দুঃশাসনে ধন-প্রাণ হারায়, কয়টা নারী ধর্ষিতা হয় রাজপুরুষদের দিয়ে, কয়টা মন্দির-মূর্তি ধ্বংস হয়েছে তার সকারণ তালিকা তৈরী হলেও বোধ হয় মিথ্যার কুয়াশা বিদূরিত হবে।

এখন মধ্যযুগের তুর্কী-মুঘল ইতিহাস সত্যসন্ধ ও ন্যায়নিষ্ঠ যুক্তিবাদী ঐতিহাসিক ও গবেষকদের প্রয়াসে প্রযত্নে প্রকৃত তথ্যভিত্তিক হয়ে উঠছে, তেমনি ব্রিটিশ আমলে মুসলিমদের অশিক্ষা, দারিদ্র্য ও নিঃস্বতার জন্যে যে হিন্দুরা দায়ী নয় এবং দেশজ মুসলিমদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ-হিন্দুর কোন আঁতাত ও ষড়যন্ত্র যে ছিল না, তা জানা-বোঝার মতো নানাগ্রন্থ ইতোমধ্যেই রচিত হয়েছে ও হচ্ছে। অবশ্য এ তথ্য গোপন করা যাবে না যে বর্ণহিন্দুরা অন্ত্যজ শ্রেণীর হিন্দুদের যেমন অবজ্ঞা করত, তেমনি অবজ্ঞা বাঙালী মুসলিমদেরও করত ১৯৪৭ সন অবধি কিংবা ভারতে এখনো করে। আমাদের মধ্যযুগের ও ব্রিটিশ আমলের প্রকৃত ইতিহাস রচিত হলেই এবং তা শিক্ষিত সমাজের বিশ্বাসযোগ্য করে তথ্য ও যুক্তি যোগে রচিত হলেই সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ চিরকালের জন্যে বিলুপ্ত হবে। অবশ্য অনেক কারণে বিরোধ-বিবাদ-সংঘর্ষ-সংঘাত ঘটবে যেমন ঘটে স্বজাতি-স্বজন-স্বধর্মী-আত্মীয়ের মধ্যেও। কারণ ধূর্ত, খল, দুর্বৃত্ত, মস্তান, গুণ্ডা, খুনী বিহীন দেশ নেই, নেই কোন রাষ্ট্র।

জাত জন্ম বর্ণ ধর্ম ভাষা নিবাস যোগ্যতা দক্ষতা নির্বিশেষে রাষ্ট্রের নাগরিক মাত্রকেই কেবল মানুষ ও সমান নাগরিকরূপে গ্রহণ করার মতো সেক্যুলার গণতান্ত্রিক আধুনিকতম রাষ্ট্রিক জাতীয়তা গড়ে উঠলেই আমরা সাম্প্রদায়িক চেতনামুক্ত হব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিন্দুর মুসলিম-দ্বেষণার এবং মুসলিমের হিন্দু-দ্বেষণার উৎস হচ্ছে ব্রিটিশরচিত ভারতের ইতিহাস। এ দ্বেষণার বিনাশ বা উৎখাত সম্ভব সত্যসন্ধ গবেষক রচিত সত্য ও তথ্য ভিত্তিক ভারতের নতুন ইতিহাস। অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলি যে রাজনীতিকরা ব্যক্তিক ও দলীয় স্বার্থে করে না বা পারে না হেন 'অপরাধ'-অপকর্ম নেই। পঞ্চাশের মন্বন্তর ঘটিয়েছিল বাঙলায় ব্রিটিশের পোড়ামাটি নীতির সুযোগ নিয়ে লীগ শাসনামলে হিন্দু অন্ন-বস্ত্র-ব্যবসায়ীরাই। আড়তে মৌজুত রেখে কৃত্রিমভাবে দুর্লভতা সৃষ্টি করে খাদ্য সামগ্রীকে দরিদ্রের ও আমজনতার ক্রয়ক্ষমতার ঊর্ধ্বে তুলেছিল। তারাশঙ্করের 'মন্বন্তর' বিভূতিভূষণের 'অশনি সংকেত' উপন্যাসে, জয়নাল আবেদিনের চিত্রে এর বীভৎস আলেখ্য মেলে। এবং এরাই ঘুষযোগে মুসলিম লীগ প্রতিনিধিদের বশ করে নাজিমউদ্দিন সরকারের পতন ঘটিয়েছিল। মরেছিল পঁয়ত্রিশ লক্ষ দরিদ্র মুসলিমরা ও নমঃশূদ্ররা।

আগেই বলেছি, বাঙলাদেশে ও পাকিস্তানে হিন্দুরা নানা প্রকারের বঞ্চনার ও অনধিকারের শিকার হলেও মানসিকভাবে মুক্তির স্বাদরিক্ত হলেও প্রাণের নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত। কারণ এখানে দাঙ্গা ও হত্যাকাণ্ড ঘটেনি বিগত ত্রিশবছর যাবৎ। কিন্তু ভারতে রোজ কোথাও না-কোথাও রক্তক্ষরা-প্রাণহরা দাঙ্গা হয়, সংখ্যালঘু মুসলিমরা প্রাণের নিরাপত্তার অভাবে সদা বিপন্ন ও ত্রস্ত থাকে।

কোলকাতার যুবশক্তি প্রকাশনী প্রকাশিত 'ধর্মযুদ্ধ' নামের সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী প্রবন্ধসংকলনগ্রন্থ থেকে পরিশিষ্টাংশ অবলম্বনে দাঙ্গার হিসেব দিচ্ছি। এর থেকেই বোঝা যাবে ব্রিটিশ রাজত্বে ১৭৮২ সনেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার শুরু, যা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র ভারতে আজো শুধু চালু থাকেনি, বেড়েই চলেছে। ব্রিটিশ পূর্বকালে ১৭১৩ সনে আহমদাবাদে, ১৭১৯-২০ সনে কাশীরে, ১৭২৯ সনে দিল্লীতে তিনটে লঘু সীমিত মারামারি রূপ দাঙ্গার সাক্ষ্য প্রমাণ মেলে। আর ব্রিটিশ শাসনকালে ১৭৮২ সন থেকে ১৯৪৭ সন অবধি ছোট-বড়-মাঝারি দাঙ্গা বাধে ব্রিটিশ ভারতের নানাস্থানে। এগুলোর সংখ্যা ৯৮ টি [এর মধ্যে ১৯২৭ সনে বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত ১৭টিও যোগ করা হয়েছে]। তবে সবগুলো সমান গুরুত্বের নয়, তুচ্ছ ব্যক্তিগত বিবাদও অনেক কয়টি ক্ষুদ্র দাঙ্গার কারণ, কিন্তু এরপরে স্বাধীন ভারতের নানা স্থানে রোজই অনেক দাঙ্গা বাধে। ফলে বড়-ছোট দাঙ্গা বেধেছে ভারতের নানা স্থানে আজ অবধি কয়েক হাজার। এবার 'ধর্মযুদ্ধ' গ্রন্থ থেকেই নমুনা স্বরূপ ১৯৬১-১৯৯০ সন-এ ত্রিশ বছরের দাঙ্গার একটা তালিকা পেশ করছি।

বাবরী মসজিদজাত দাঙ্গায় ভারতের নানা স্থানে হতাহতের একটা তালিকাও এখানে যোগ করছি। বাঙলাদেশে এরশাদের ইঙ্গিতে বাবরী মসজিদ সম্পৃক্ত প্রথম আক্রমণে যেমন মন্দির-ভাঙা ছিল উপলক্ষ মাত্র, লক্ষ্য ছিল লোভী ও নিঃস্ব দরিদ্রদের হিন্দুর সর্বপ্রকার গার্হস্থ্য অর্থ-সম্পদ লুণ্ঠন, তেমনি বাবরী মসজিদ ভাঙাজাত প্রতিক্রিয়ায়ও সারা বাঙলাদেশব্যাপী মন্দির-ভাঙা ছিল উপলক্ষ্য, গাঁয়ে গাঁয়ে ও শহরে-বন্দরে হিন্দুর গার্হস্থ্য ও ব্যবসায়িক সম্পদ লুণ্ঠনই ছিল লক্ষ্য। প্রথমবারের হিন্দু-পীড়নের বয়ান রয়েছে 'গ্লানি' নামের মুদ্রিত বইয়ে এবং দ্বিতীয়বারের লুণ্ঠনের ও দহনের বিবরণ মেলে 'Communal Discrimination in Bangladesh : Facts and documents [বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক বৈষম্য : তথ্য ও দলিল] বই দুটোতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের ঘটনা, তাতে নিহত ও আহতের সংখ্যা :

বছর	সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের ঘটনার সংখ্যা	নিহতের সংখ্যা	আহতের সংখ্যা
১৯৬১	৯২	১০৮	৫৯৩
১৯৭১	৩২১	১০৩	১৩৩০
১৯৮১	৩১৯	১৯৬	২৬১৩
১৯৮২	৪৭০	২৩৮	৩০২৫
১৯৮৩	৫০০	১১৪৩	৩৬৫২
১৯৮৪	৪৭৬	৪৪৫	৪৮৩৬
১৯৮৫	৫২৫	৩৩২	৩৭৫১
১৯৮৬	৭৬৪	৪১৮	৫৩৮৯
১৯৮৭	৭১১	৩৮৩	৩৮৬০
১৯৮৮	৭১০	২৫৯	৩১০৩
১৯৮৯	৯২২	৮৯২	৩৮৭১
১৯৯০	১৪২১	১২৪৬	৩৯১৩

সূত্র : আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলনে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে পেশ করা তথ্য।

বাবরী মসজিদ ভাঙ্গার পর বিভিন্ন রাজ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নিহত মানুষের সংখ্যা এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্পত্তির পরিমাণ (২০শ ডিসেম্বর '৯২ পর্যন্ত)

রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের নাম	দাঙ্গায় নিহত মানুষের সংখ্যা	দাঙ্গায় ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্পত্তির পরিমাণ
১ অন্ধ্র প্রদেশ	২০	হিসাব পাওয়া যায়নি।
২ আসাম	৯৪	৪০ লক্ষ টাকা
৩ বিহার	১০	হিসাব পাওয়া যায়নি
৪ দিল্লী	১৫	হিসাব পাওয়া যায়নি
৫ গুজরাট	২০৮	৭.২৫ কোটি টাকা
৬ হরিয়ানা	১	হিসাব পাওয়া যায়নি
৭ কর্নাটক	৭৮	৫.৯৭ কোটি টাকা
৮ কেরালা	২১	১.৫ কোটি টাকা
৯ মহারাষ্ট্র	২৫৯	৩.৯ কোটি টাকা
১০ মধ্যপ্রদেশ	১৩৩	১.৫ কোটি টাকা
১১ উড়িষ্যা	২	৬ লক্ষ টাকা
১২ পঞ্জাব	-	৬ লক্ষ টাকা
১৩ রাজস্থান	৪৯	৭.৩৭ কোটি টাকা
১৪ তামিলনাড়ু	২	৬৮.৫৮ লক্ষ টাকা
১৫ উত্তরপ্রদেশ	১৭০	হিসাব পাওয়া যায়নি
১৬ পশ্চিমবঙ্গ	২৭	হিসাব পাওয়া যায়নি
মোট	১১৮৯	

সূত্র : রাজ্যসভার প্রশ্নোত্তর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অতএব, অতীত ও ঐতিহ্য না ঘেঁটে বর্তমানের বাস্তবজীবনের প্রয়োজনচেতনা ও কল্যাণকর ভবিষ্যৎভাবনা নিয়েই আধুনিকতম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য সচেতন থাকাই আবশ্যিক ও জরুরী আমাদের পক্ষে।

রেনেসাঁস চাই

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে ফ্যাসিস্ট-ফ্যাসিজম শব্দগুলো সার্বক্ষণিক উচ্চারণের ফলে ব্রিটিশ-ফরাসী-স্পেনিশ-ডাচ প্রভৃতি ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদীরা মানবিক গণতান্ত্রিক রূপে তারিফ ও সমর্থন আর হিটলার-মুসোলিনী ফ্যাসিস্ট নামে নিন্দা ও ধিক্কার পাচ্ছিলেন। অথচ হিটলার-মুসোলিনীরা তাঁদের স্বদেশ স্বজাতিদের অর্থসম্পদে ঋদ্ধ করে তাদের জীবনে সাচ্ছল্য স্বাচ্ছন্দ্য আনবার প্রয়াসী ছিলেন, ব্রিটিশ-ফরাসী প্রভৃতি সব পূর্ব থেকেই ঔপনিবেশিক-সাম্রাজ্যবাদীদের আদর্শে ও অনুসরণে আজো ব্রিটিশ সরকার ফকল্যান্ড, উত্তর আয়ারল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ড প্রভৃতিকে নিজেদের মৌরসী ভূসম্পদ বলেই জানে ও মানে। আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তো 'মেষশাবক-ব্যাঘ্র' ন্যায় প্রয়োগে স্বেচ্ছাবৃত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের সার্বক্ষণিক গরজে গোটা দুনিয়ার দুর্বল রাষ্ট্রগুলোকে হুকুম-হুমকি-হুঙ্কার-হামলার ত্রাসে সন্ত্রস্ত করে রেখেছে ঠিক শ্বাপদসঙ্কুল বুনো এলাকার রাখালের বা মেষপালকের সতর্কতায়। আমরা তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রবাসীরা পুরোনো দাস-সমাজের আজন্মশ্রমে, বঞ্চনায়, ভর্ৎসনায় নির্যাতনে শারীরিক ও মানসিকভাবে অভ্যস্ত মানব প্রজাতির প্রাণীর মতোই আজো তা মেনে চলি দ্রোহ করি না, নিজেদের মধ্যে গরজবোধ কিংবা শক্তি খুঁজে পাই না বলেই। তাই বোধ হয় আমরা শিক্ষিত লোকেরা দিনেরাতে কথায় কথায় মৌল মানবাধিকারের, মনুষ্যত্বের, মানবিকতার, মানবতার, নাগরিক অধিকারের, ব্যক্তি স্বাধীনতার বুলি উচ্চারণ করলেও আজো সংস্কৃতি-সভ্যতার স্বরূপের সংজ্ঞা সম্বন্ধে অভিন্ন মতবাদী হয়ে উঠতে পারিনি। এজন্যেই একালের পরিশীলিত রুচির ও স্ব-অনুশীলিত সংস্কৃতির এবং বিবেকী বিবেচনাপ্রবণ যুক্তি-বুদ্ধি-চালিত ব্যক্তির পক্ষে তৃতীয় বিশ্বের পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনীতিক কিংবা আচারিক প্রতিবেশে-পরিবেশে সুখে-স্বস্তিতে থাকা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ তৃতীয় বিশ্বের শিক্ষিত শহুরে কিংবা অজ্ঞ-অনক্ষর নিঃস্ব নিরন্ন দুস্থ দরিদ্র মানুষের মধ্যে মনোজগতে সমকালীনতা নেই, নেই যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেক-বিবেচনা শক্তি প্রয়োগের প্রয়াস, নেই ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের কিংবা নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ, প্রথা-পদ্ধতি, আচার-সংস্কার-ধারণা প্রভৃতির উপযোগ চেতনা। কেন নেই, তাও পষ্টভাবে অনুভব-উপলব্ধি করতে পারি না। কারণ আমাদের অনেকেই মনোজগতে সাড়ে তিন/তিন/আড়াই/দুই/দেড় হাজার বছরের আগের পৃথিবীতে বিচরণশীল হলেও বিজ্ঞানের প্রসাদ ও অবদান গ্রহণে উৎসাহী। তা হলে এর কারণ কি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১. অজ্ঞতা-অনক্ষরতার আধিক্যের দরুন,
২. আর্থিক জীবনের অনিশ্চয়তার, নিঃস্বতার, দারিদ্র্যের, বেকারত্বের কারণে,
৩. একি তাদের মন-মগজ বন্ধ্যা এবং তারা অতীত ও ঐতিহ্যমুখী বলেই,
৪. তারা উদ্যম, জিজ্ঞাসা, কৌতূহল ও কাঙ্ক্ষাহীন বলেই কি তাদের পুরোনোপ্রীতি ও নতুনভীতি এবং নতুন চেতনায় চিন্তায় তারা অনীহ
৫. বিজ্ঞানের প্রসাদে ও অবদানে আগ্রহ, অথচ বিজ্ঞানের গুরুত্ব স্বীকারে ও বিজ্ঞান অনুশীলনে, বিজ্ঞানের তত্ত্বে, তথ্যে ও সত্যে অনাস্থা কেন?
৬. সমকালীনতা অর্জনের জন্যে এদের কেউ কেউ ক্বচিৎ Reformer বা সংস্কারক হতে আগ্রহী, এদের সমকাল চেতনা ও উদারতা এর মধ্যেই থাকে সীমিত।
এরা Revivalist Reformer থেকে যায় এবং রেনেসাঁসভীরু।

এরা অতীত ও ঐতিহ্যপ্রিয় বলেই পুনরুজ্জীবন বা পুনর্জাগরণবাদী তথা মেরামত প্রবণ, ভেঙে নতুন নির্মাণ বিরোধী। এরা মানে না যে শত চেষ্টায়ও পুরাতনে নতুন জৌলুস আনা সম্ভব নয়। তাই Revivalist-রা পুনরুজ্জীবন বা পুনর্জাগরণবাদীরা অতীতের ও ঐতিহ্যের ঘেরাটোপে আত্মরক্ষায় আত্মঋদ্ধির চেষ্টা করে। এ এক রকম কূর্মস্বভাব। তৃতীয় বিশ্বে এখন এটি একটি আত্মবিনাশী অপ্রতিরোধ্য সমস্যা-সঙ্কট হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এদের কিছুতেই বোঝানো যায় না যে সময়স্রোত, জলস্রোত ও প্রজন্মস্রোত ঠেকিয়ে রাখা যায় না, যা যায় চিরকালের জন্যেই বিলীন-বিলুপ্ত হয়ে যায়, কোন পুরোনোই নতুনের অভাব মেটাতে পারে না, কালান্তরে স্থানান্তরে ও জনান্তরে চাহিদা ভিন্ন হয়। প্রতি নতুন সূর্য কেবল নতুন দিন আনে না, নতুন মন-মনন-রুচি-চেতনা-চিন্তা-প্রসাদ এবং সমস্যাও নিয়ে আসে। যুগের চাহিদা, কালিক সমস্যা স্বকালের মানুষের চাহিদা ও সমস্যা। কাজেই অতীত ও ঐতিহ্য তাকে এক্ষেত্রে সাহায্য করে না। ইতিহাসের শিক্ষা আর অতীতের অভিজ্ঞতা ও পরিবর্তিত পরিবেশে খাঁচে খাঁচে খাটানো যায় না। 'ঐতিহ্য' কেবল অসমর্থের, অযোগ্যের, অধমের আত্মপরিচয়ের জন্যে এবং আস্ফালনে আত্মদৈন্যজাত আর্তনাদ ঢাকা দেয়ার হাস্যকর অপচেষ্টায় লাগে মাত্র। ঐতিহ্য যদি গুণ, যোগ্যতা, বিত্ত-বেসাত, সংস্কৃতি, বিদ্যা ধরে রাখার সহায়ক হত, তা হলে সভ্য ও উন্নত জাতি বা দেশগুলোর পতন বা বিলুপ্তি ঘটল কেন?

লোকে বলে বটে ঐতিহ্য ভাব-চিন্তা-কর্ম প্রেরণার উৎস। কিন্তু এতে কোন তত্ত্ব ও তথ্য নেই। বৃক্ষ পুরোনো পত্র ঝরিয়ে ঝরিয়েই নতুনপত্র গজিয়ে গজিয়েই বৃদ্ধি পায়, নতুন নতুন কিশলয় যোগেই আত্মবিস্তার করে, শির উঁচু করে দাঁড়ায়। মানুষও তেমনি নতুন নতুন চেতনা, নতুন নতুন চিন্তা, নতুন নতুন জিজ্ঞাসা, সন্দেহ, উপযোগচেতনা, অভাববোধ থেকেই নতুন নতুন আবিষ্কারের, নতুন নতুন উদ্ভাবনের, নতুন নতুন সৃষ্টির ও নতুন নতুন নির্মাণের প্রেরণা, প্রণোদনা ও প্রবর্তনা পায়। পুরোনোকে বর্জন করে করে নতুনকে অর্জন করে করে সভ্যতা এগিয়েছে। প্রাচীন মিশরীয়, গ্রীক, রোমীয়, ব্যাবিলোনীয়, বাগদাদীয়, ভারতীয় ও চীনা সভ্যতা আজো টিকে থাকলেও আজকের দিনের মানুষের জীবনের ও রুচির চাহিদা মেটাতে পারত না। পুরোনো সভ্যতার ভগ্নাবশেষ বা নিদর্শনই তার প্রমাণ। আমরা ওসবের নির্মাতার তারিফ করি, কিন্তু আজকের জীবনে তা বাঞ্ছিত বলে মানি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজ তৃতীয় বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রে আলজিরিয়ায়, পাকিস্তানে, ভারতে, ইন্দোনেশিয়ায়, মিশরে মৌলবাদীর সংখ্যা ও আন্দোলন ত্রাসকর রূপে বেড়ে চলেছে। গোঁড়া শাস্ত্রপন্থী দুনিয়ার সবদেশে সবকালেই ছিল। ওরা অর্থোডক্স, ওরা মনে-মগজে-মননে বন্ধ্যা বটে, কিন্তু শাস্ত্রের বিধি-নিষেধে আক্ষরিকভাবে নিষ্ঠ অসহিষ্ণু সজ্জন এবং রবোটের মতো তারা শাস্ত্রানুগত থাকে। তাদের দিয়ে দেশের মানুষের, সমাজের ও রাষ্ট্রের কালিক উন্নতি হয় না বটে, কিন্তু তাদের সহ্য করতে ও তাদের সঙ্গে সহাবস্থান করতে আমরা অভ্যস্ত। কিন্তু নতুন মৌলবাদীরা রাজনীতিকদলভুক্ত, রাষ্ট্রক্ষমতা দখলে আগ্রহী ও উদ্যোগী, তৃতীয় বিশ্বে তারাই জনজীবনে বা রাষ্ট্রব্যবস্থায় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের কেবল তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রবাসীরা নয়, য়ুরোপীয় রাজনীতিক ও রাষ্ট্রনায়করাও ভাবী শত্রু রূপে দেখেন। বিশেষ করে মুসলিম মৌলবাদীদের য়ুরোপীয়রা ভাবী অপ্রতিরোধ্য রাষ্ট্রশক্তিরূপে অনুমান করে এখন থেকেই ভীত। মৌলবাদীরাই নতুন চেতনার, নতুন চিন্তার, নতুন সৃষ্টির, বিজ্ঞানের তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য প্রচারের বিরোধী। এককথায় তাদের জন্যেই রেনেসাঁসের উদ্ভব ও বিকাশ, বিস্তার ও প্রচার সম্ভব হয় না। অথচ রেনেসাঁস মাত্রই সৃষ্টিশীলতার, নতুন চেতনার, নতুন চিন্তার, নতুন নির্মাণের, নতুন জিজ্ঞাসার, পুরোনো বর্জনের, নতুন জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেক-মনীষাপ্রসূন সম্পদের, প্রগতির, সংস্কৃতি-সভ্যতার অগ্রগতির প্রতীক, প্রতিম ও প্রতিভূ। আমাদের দুর্ভাগ্য তৃতীয় বিশ্বে এ রেনেসাঁসের পথে বাধা অনেক। উল্লেখ্য যে রেনেসাঁস অবশ্যই দলগত কোন আন্দোলনের, প্রয়াসের, অনুশীলনের ফুল, ফল, ফসল নয়। নতুন চেতনা, নতুন চিন্তা, নতুন আবিষ্কার, নতুন উদ্ভাবন, নতুন সৃষ্টি, নতুন নির্মাণ বাহ্য ব্যবহারিক বৈষয়িক জীবনেও কৌশল-প্রকৌশল-প্রযুক্তি-যন্ত্র-আচার-পোশাক প্রভৃতির উৎকর্ষও কোন না কোন ব্যক্তি মানসের ব্যক্তিক চিন্তার, ব্যক্তিক মনীষার তথা ব্যক্তিক উদ্যম, জিজ্ঞাসা, উদ্যোগ বা সৃষ্টিশীলতার প্রসূন। কাজেই সেই ব্যক্তি যদি স্বাধীনভাবে চিন্তা করবার, কথা বলবার, মত-মন্তব্য প্রকাশের, সিদ্ধান্ত পরিব্যক্ত করার স্বাধীনতা, অধিকার, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক সমর্থনে ও অনুমোদনে না পায়, তা হলে কিভাবে কোন্ পথ দিয়ে মৌলিক চেতনা-চিন্তা প্রমূর্ত হয়ে লোকসমাজে প্রচার ও প্রসার লাভ করবে? গ্রাহ্য হয়ে সমাজকে সমাজমানসকে প্রভাবিত করে প্রগতির ও প্রাগ্রসরতার পথে এগিয়ে নেবে? ব্যক্তির সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রিক চেতনা-চিন্তা গতিশীল ও অগ্রসরমাণ থাকবে? আমরা একবিশেষ অর্থে জীবন্ত ও সচল বটে, তা হচ্ছে যন্ত্রেযুক্ত চাকার মতো কিংবা লাটিমের মতো আবর্তনশীল, পরিবর্তন পরিমার্জন পরিবর্ধন ও পরিশীলনরিক্ত। স্থিতিশীলতা এবং আবর্তনশীলতা অবক্ষয় ঠেকাতে পারে না। আমরা তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রবাসীরা তাই অঙ্গে, আচরণে, লাভে-লোভে-স্বার্থে ও বয়সে অবশ্যই প্রাকৃতিক নিয়মেই পরিবর্তমান, কিন্তু প্রাগ্রসরমাণ নই।

রেনেসাঁস ব্যক্তিক বটে, কিন্তু তার প্রভাব দৈশিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, মানবিক ও রাষ্ট্রিক। তৃতীয় বিশ্বে যেন আরো বহু বহু কাল রেনেসাঁস প্রতিরুদ্ধ থাকবে মধ্যযুগের য়ুরোপে বিজ্ঞান চর্চার মতোই। অথচ রেনেসাঁস না হলে আমরা অঙ্গে ব্যবহারিক জীবনে অনুকৃত জীবন যাপনই করব, মৌলিক আবিষ্কারে, উদ্ভাবনে, সৃষ্টিতে, নির্মাণে থাকব বঞ্চিত। আমরা বেঁচে থাকব, টিকে থাকব, কিন্তু মনুষ্যত্বে মানবিক বোধে, মানবতার প্রসারে, মনে-মগজে-মননে-মনীষায় উন্নত হব না কখনো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংজ্ঞায় ও সংজ্ঞার্থে সেক্যুলারিজম

ধর্মনিরপেক্ষতা, ইহজাগতিকতা, বিভিন্ন শাস্ত্রিক সম্প্রদায়ের সংযমে-সহিষ্ণুতায়-সৌজন্যে নির্বিরোধে প্রতিবেশীরূপে বসবাস প্রভৃতি কোনটাই সেক্যুলারিজমকে স্বরূপে জানার, বোঝার ও মানার সহায়ক হয় না। ঐহিক জীবনবাদে কিংবা মর্ত্যজীবনবাদে গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন জাত জন্ম বর্ণ ধর্ম ভাষা নিবাস পেশার লোক অধ্যুষিত আধুনিক গণতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিক নির্বিশেষকে কেবল প্রাণীর মানবপ্রজাতিরূপে দেখা-জানা-বোঝা ও যথাযোগ্য সুযোগ-সুবিধে দেয়াই জীবন-জীবিকার সর্বক্ষেত্রে-সেক্যুলারিজমের মর্ম কথা। কম্যুনিস্ট তথা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-নিবাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতি প্রভৃতির গৌষ্ঠিক স্বাতন্ত্র্যগৌরব উচ্চারণ রাষ্ট্রিকভাবে নিষিদ্ধ ছিল বলে সেখানে সরকার ছিল বা থাকে আক্ষরিক অর্থেই সেক্যুলার।

অতএব সেক্যুলারিজম স্বরূপে কেবল 'মানুষ' পরিচিতিই স্বীকার করে। ব্যক্তির, গোষ্ঠীর, গোত্রের শাস্ত্রিক বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণার-আচারের-আচরণের-পার্বণের স্বাতন্ত্র্য ও অস্তিত্ব, ভাষার পার্থক্য আঞ্চলিক বা নৈবাসিক ব্যবধান সেক্যুলার রাষ্ট্র বা সরকার স্বীকার করে না। সেক্যুলার রাষ্ট্র বা সরকার নাগরিক নির্বিশেষের মর্ত্যজীবন-জীবিকার সর্বপ্রকার চাহিদা মেটানো ও সাচ্ছল্য-স্বাচ্ছন্দ্য উন্নয়ন লক্ষ্যেই কাজ করে। প্রতিটি মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার এবং প্রতিটি মানুষকে কাজ দিয়ে বা ভাতা দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে সরকারের তথা রাষ্ট্রের। আস্তিক মানুষের শাস্ত্রিক বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা, আচার-আচরণ-পার্বণ প্রভৃতি ব্যক্তিক, পারিবারিক কিংবা গৌষ্ঠীক-গৌত্রিক বিষয়রূপেই সরকার জানবে। কিন্তু এসবের অস্তিত্ব রাষ্ট্র বা সরকার স্বীকারই করবে না। সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে নাগরিকমাত্রকেই মানুষকে কিংবা ব্যক্তিমানুষমাত্রকেই শুধু নাগরিক বলেই জানা এবং তার মর্ত্যজীবনের প্রয়োজন মেটানো। সরকার ঈদের বা পুজোর বা পার্বণের ছুটি দেবে কর্মচারীদের-শ্রমিকদের যেমন দেয় বিয়ের জন্যে, মৃতের সৎকারের-শ্রাদ্ধের জন্যে ব্যক্তিকে। কাজেই আস্তিক মানুষের শাস্ত্রিক বিশ্বাস ও জীবন হবে ব্যক্তিক ও স্বসম্প্রদায়ে সামাজিক সীমায় নিবদ্ধ। অতএব যথার্থ তাৎপর্যে সেক্যুলারিজম স্বরূপে হবে জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-নিবাস-পেশাজাত পার্থক্যের ও স্বাতন্ত্র্যের এবং শাস্ত্রের ও আস্তিক্যের স্থিতি বা অস্তিত্ব রাষ্ট্রিক বা সরকারী স্তরে অস্বীকৃতি।

১৯৭২ সনে বাঙলাদেশের প্রথম সংবিধানে সমাজতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা চালু করার লক্ষ্যে যে-নীতি ঘোষিত হয়, তা আসলে সমাজতন্ত্রেরই মূলভিত্তি। সমাজতান্ত্রিক সরকার মাত্রই শাস্ত্রে থাকে আস্থাহীন আর রাষ্ট্রিক জাতীয়তায়, সমাজতন্ত্রে ও দলীয় গণতন্ত্রে আস্থাবান। কাজেই কুমীরের এক বাচ্চাকে চার করে দেখানো হয়েছিল মাত্র। তবু সংবিধানটা স্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকৃতির ভিত্তিতে মর্ত্যমানবসাম্যের অঙ্গীকারে তৈরি হয়েছিল। তাই এটি যথার্থ সেক্যুলার সংবিধানই ছিল। কিন্তু সরকার সব প্রচল শাস্ত্রের ও শাস্ত্রিক সম্প্রদায়ের স্বীকৃতি দান করায় 'ধর্মনিরপেক্ষতা' তাৎপর্যরিক্ত হল অর্থাৎ সব ধর্মশাস্ত্রকে ও সম্প্রদায়কে রাষ্ট্র বা সরকার সমচোখে দেখবে-পক্ষপাতিত্ব করবে না-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবশাস্ত্রের লালনে, রক্ষণে ও প্রয়োজনে সাহায্য-সহায়তা দানই পরিণামে সেক্যুলারিজম নামে আখ্যাত বা অপব্যাখাত হল। আর এ গোঁজামিলের ফাঁকে বাঙালীসত্তা হারাল গুরুত্ব। সংবিধানও হল আদি ও অকৃত্রিম মুসলিম রাষ্ট্রের দলিল। ভারত ও আরব সাগর থেকে চীনের সীমা অবধি বহুজাতিক ভূখণ্ডগুলোকে অভিন্ন ভারত রাষ্ট্রভুক্ত রাখার মতলবে ১৯৬৩ সনে একবার রাজ্যের বা প্রদেশগুলো বিচ্ছিন্ন ও স্বাধীন হবার সাংবিধানিক ব্যবস্থা রদ করল এবং এ বিশাল ভূভাগ অবিচ্ছিন্ন রাখার মতলবে ১৯৭৬ সনে বিশাল ভারতের নানা রাজ্যে শাস্ত্রিক, গৌত্রিক, ভাষিক, আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের ও সাংস্কৃতিক পার্থক্যের যুক্তিতে বিচ্ছিন্ন ও স্বাধীন হবার স্বপ্ন জনমনে জেগেছে বা জাগছে উপলব্ধি করে ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দিভাষীপ্রধান সরকার ১৯৭৬ সনে সেক্যুলারিজমকে সংবিধানে সংযোজিত করে, যাতে জাত জন্ম বর্ণ ধর্ম ভাষা গোত্র নিবাস প্রভৃতির অজুহাতে কোন অঞ্চল বিচ্ছিন্ন বা স্বাধীন হয়ে হাতছাড়া না হয়। ভারতেও তখন থেকেই সেক্যুলারিজম অর্থে সব শাস্ত্রে, ধর্মে ও ধর্মাচারে রাষ্ট্রিক বা সরকারী সমদর্শিতা বলে অপব্যাখ্যাত হতে থাকে, যদিও বাস্তবে এ সাম্রাজ্যবাদী চাল হিসেবেই প্রযুক্ত। যেমন ভিন্ন ধর্মের শিখদের কিংবা কাশ্মীরের মুসলিমদের অথবা রক্তে, ভাষায়, ধর্মে, নৈবাসিক-অবস্থানে ইংরেজ পূর্বকালের ভারতবহির্ভূত নাগা, কুকি, মণিপুরী, বড়ো, খাসিয়া, গারো, গোর্খা, ত্রিপুর, হাজং, চাকমা প্রভৃতি অধ্যুষিত তথাকথিত ভারত রাজ্যগুলোকে স্বাধীনতা দিচ্ছে না ওই সেক্যুলার রাষ্ট্রাদর্শের নামে এবং বিচ্ছিন্নতার সাংবিধানিক ব্যবস্থা অনস্তিত্বে বিলুপ্ত বলে। নাগরিকদের সেক্যুলার আদর্শে দীক্ষিত করার কোন চেষ্টাই হয়নি। বরং মুসলিমদের গো-বধ করার অধিকার হরণ করে তথা হিন্দুর স্বার্থে গো-বধ নিষিদ্ধ করে সেক্যুলারিজমের গোড়াই শেকড়সমেত উৎপাটন করা হল। ফলে আজো ব্রাহ্মণ্যবাদী বর্ণহিন্দুর সেক্যুলার শাসনেই অহিন্দু শিখ-বৌদ্ধ-খ্রীস্টান-মুসলিম এবং ছুৎ-অচ্ছুৎ নিম্নবর্ণের হিন্দু, আদিবাসী, উপজাতি, জনগোষ্ঠী বর্ণহিন্দুর হাতে শোষিত, বঞ্চিত, লাঞ্ছিত ও নিহত হচ্ছে প্রায় প্রতিদিন। এ যুগে মানবমুক্তি নিহিত রয়েছে সেক্যুলারিজমে। কেননা, সেক্যুলার হওয়ার জন্যে বিজ্ঞানের তথ্যে আস্থা, যুক্তিবাদিতা, বিবেকানুগত্য, পরমত-পরকর্ম-পরআচরণ সহিষ্ণুতা, ন্যায্যতা প্রভৃতি উদারতার সঙ্গে কল্যাণকর সবকিছুর গ্রহণে, মানুষমাত্রকে অভেদে জ্ঞাতি ভাবা প্রভৃতি গুণের ও শক্তির বিকাশ প্রয়োজন হয়। এ তাৎপর্যে সেক্যুলারিজম ও মনুষ্যত্ব অভিন্নাত্মক ও অভিন্নার্থক। একজন সেক্যুলার ব্যক্তি একজন মানবিক গুণসম্পন্ন মানবতাপ্রতীক সংস্কৃতিমান মানুষ। সেক্যুলার ব্যক্তিমাত্রই অপরিচিত বিপন্ন মানুষের অভয় শরণ। অতএব সংস্কৃতি, মনুষ্যত্ব, মানবতা প্রভৃতির প্রতীক, প্রতিম ও প্রতিভূ হচ্ছে সেক্যুলার ব্যক্তি ও সেক্যুলারিজম।

১.

একটি বিবেচ্য প্রস্তাব

প্রাণীজগতে খাদ্য-খাদক সম্পর্কটা প্রধান ও প্রবল। আবার খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ না হলেও প্রজাতিগত দ্বেষ-দ্বন্দ্বও থাকে। যেমন সাপ-নেউল, বাগ-মোষ, সিংহ-হাতী প্রভৃতি। আর মানুষের মধ্যে তো জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-নিবাস-পেশাগত দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-সংঘাত তো সুপ্রাচীন কাল থেকেই আজো প্রায় সমভাবে রয়েছে। তবু আর কিছু প্রাণীর মধ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রয়েছে নিরুপদ্রব-নিরাপত্তায় সহাবস্থানের প্রবৃত্তি। ওদেরও অবশ্য নিজেদের মধ্যে সময়বিশেষে ও বস্তুবিশেষে খাদ্য কাড়াকাড়ি, দ্বন্দ্ব-বিবাদ কৃচিৎ দেখা যায়। কোন কোন উদ্ভিদও নাকি কীট-পতঙ্গাদি প্রাণীভুক। আমরা জানি মানুষ ব্যতীত অন্য জীব-উদ্ভিদ সহজাত বৃত্তি-প্রবৃত্তি চালিত জীবনী যাপন করে। কিন্তু মানুষের সংস্পর্শে এসে অর্থাৎ মনুষ্যপোষ্য ও লালিত হলে যথাপ্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ পেলে তাদের মধ্যেও মানবিক গুণের তথা সংস্কৃতির সংযম, সহিষ্ণুতা ও সজ্জনতা কিংবা হৃদয়ের ও মগজের অনুশীলনে এক প্রকারের যৌক্তিক-বৌদ্ধিক-বিবেকী-বিবেচনাশক্তি অর্জন বা আয়ত্ত করে, যার ফলে ভাষিকভাবে হৃদয়ের কথা, কাজের কথা, আচরণের কথা প্রয়োজনের কথা, জানানো-শোনানো-বোঝানো না গেলেও ইশারায়-আভাসে মনোভাবে প্রকাশ ও বিনিময় করা সম্ভব ও সহজ হয়। আমরা সার্কাসে-সিনেমায় নয় শুধু, অন্যত্রও অন্য কাজেও অনেক পশু-পাখি-মাছ ব্যবহার করি। এ সূত্রে এখানে বাজ, পায়রা, বানর, শিমপাঞ্জি, গরিলা, হাতী, ঘোড়া, কুকুর, কূর্ম, ডলফিন প্রভৃতির অসামান্য বোধশক্তি ইঙ্গিত বোঝার সূক্ষ্মবুদ্ধি প্রভৃতি স্মরণ করতে পারি।

প্রশিক্ষণে পশু-পাখি-মাছ-গরু-ছাগল-ভেড়া-ঘোড়া-হাতী-সিংহ-কুকুর-বেড়াল প্রভৃতি যেখানে জন্মগত বৃত্তি-প্রবৃত্তি সংযত, পরিশীলিত, এমন কি পরিবর্তন করতে পারে ও করে সেখানে তাদের মগদী বুদ্ধিমত্তা অস্বীকার করা যায় কি? কুকুরের, ঘোড়ার, হাতীর আনুগত্য তো আমরা চোখেই দেখি ও জানি, এমন কি বাজের ও পায়রার অনন্য বুদ্ধিমত্তা ছাড়াও মোরগের, ষাঁড়ের, মোষের মতো একটা লড়াকু রূপও রয়েছে। বিশেষ করে এমন সুশীল পায়রা ও মোরগ যখন প্রশিক্ষণ পেয়ে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে প্রভুর নির্দেশে মরণপণ যুদ্ধ শুরু করে তখন তার সাহস, শক্তিমত্তা ও হিংস্রতা দেখে বিস্মিত হতে হয়।

তা হলে আমরা যারা মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণী মাত্রকেই কেবল সহজাত ও প্রাকৃত বৃত্তি-প্রবৃত্তি চালিত যান্ত্রিক ও মন-মননবিহীন জীবনযাপনে অভ্যস্ত বলে জানি ও মানি এবং মৌমাছিতন্ত্রে আস্থা রাখি, আমাদের সে-ধারণা কি তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য ভিত্তিক?

একালে আমরা বিজ্ঞানের প্রসাদে সঙ্করজাতের জীব-জন্তু-মানুষ-তরুলতা সব সৃষ্টি করে চলেছি। আমরা এখন তিন সপ্তাহের মধ্যে গর্ভের শিশুর লিঙ্গও বদলে দিতে পারি, আমরা টেস্ট টিউবে প্রাণী জন্মাতে পারি, আমরা শরীরের অস্থি-চর্ম নয় শুধু, দেহের ভেতরকার বহু কিছু মেরামত করতে, কাটা, ছেঁড়া করতে, বদলাতে ও বাদ দিতে পারি। এমন কি হৃৎ-বৃক্ক প্রভৃতিও বদলাতে পারি।

তা হলে আমাদের মানুষের স্বভাব-চরিত্র কেন সম ও সহস্বার্থে সংযমে, পরমত-পরকর্ম-পরআচরণ সহিষ্ণুতায়, সামবায়িক সহযোগিতায় ও বিনিময়ে সহাবস্থান করার মতো করে গড়ে তুলতে পারব না? কেন মনের, মগজের, মননের, মনীষার, মর্মের সংকীর্ণতা মোচন করতে পারব না? কেন আমরা 'ভুমৈব সুখম' 'বসুধৈব কুটুম্বকম' তত্ত্বে মানুষকে দীক্ষিত করতে পারব না, কেন বোঝাতে পারব না যে নির্বিরোধে, নির্বিবাদে, নিরুপদ্রবে, নিরাপদে সম ও সহস্বার্থে সংযমে সহিষ্ণুতায় ও সৌজন্যে সামবায়িক সহযোগিতায় সহাবস্থানেই সুখ-শান্তি, আনন্দ-আরাম মেলে ও মানবিক গুণের প্রসার ঘটে? কেন বুঝব না সেক্যুলার হওয়াতেই নিহিত রয়েছে মানবমুক্তি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২.

আর একটি বিবেচ্য প্রস্তাব

সমাজ পরিবর্তনের জন্যে মন-মানসিকতার পরিবর্তন আবশ্যিক ও জরুরী। কারণ নতুন তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য গ্রহণ-বরণের জন্যে পুরোনো বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা, নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ, বিধি-নিষেধ, প্রথা-পদ্ধতি বর্জন করে মনে-মগজে-মননে ঠাঁই শূন্য করা প্রয়োজন। যেমন নতুন পত্রের জন্যে বৃক্ষ-লতা পুরোনো পাতা বর্জন করে, যেগুলো আগে ওই তরুলতার জন্যে খাদ্য সংগ্রহ করত। বৃদ্ধি পেতে হলে, এগিয়ে যেতে হলে পুরোনোকে অকৃতজ্ঞের মতো পরিহার করতেই হয়, নইলে জীবন বাড় পায় না, গতি পায় না, অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না। আমাদেরও ঘরোয়া জীবনে একটা প্রবচন রয়েছে, 'বাড়ি না ছাড়লে বড়ো হয় না'। আত্মবিকাশের জন্যে নতুন পুঁজি-পাথেয় যোগাড়ের জন্যে কাঙ্ক্ষা-উদ্যম-উদ্যোগ অঙ্গীকার নিয়ে দিকবিদিকে ছুটে বেড়াতে হয়।

কাজেই আমরা যারা সমাজ পরিবর্তন চাই, সমাজতন্ত্র চাই, মানুষ নির্বিশেষকে তার খেয়ে পরে বেঁচে থাকার জন্মগত অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই, আমাদের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে আমাদের আশৈশব শ্রুত, দৃষ্ট, লব্ধ, অভ্যস্ত, পোষ্য বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা, ভয়-ভক্তি-ভরসা, লাভ-লোভ-স্বার্থবোধ পরিহার করার সচেতন সযত্ন প্রয়াসে বা অনুশীলনে নিষ্ঠ হওয়া।

আর প্রথমত, প্রাকৃতিক নিয়মচালিত বিশ্বতত্ত্বে আস্থাবান হওয়া। সূর্যের নৈকট্য ও দূরত্বই জীব-উদ্ভিদ জগতে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে, একেই বলে বৈচিত্র্যে ঐক্য। একেই বলে নিয়মের রাজত্ব। কেননা জল-বায়ু-মাটি-তাপের তারতম্যই বৈচিত্র্যের কারণ, বিনে কারণে কোনো কার্য হয় না।

দ্বিতীয়ত, আমাদের বিজ্ঞানমনস্ক হতেই হবে। বিজ্ঞানের তত্ত্বে, তথ্যে ও সত্যে আস্থা রাখা আবশ্যিক। বিজ্ঞানীর আবিষ্কার, উদ্ভাবন, সৃষ্টি, প্রমাণিত ও প্রমাণসম্ভব জ্ঞান-আন্দাজ-অনুমান-ধারণা প্রভৃতির মতো প্রাতিভাসিক সত্য বা তথ্য নয়। বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞান অসম্পূর্ণ হতে পারে, কিন্তু মিথ্যা বা ভিত্তিহীন নয়।

তৃতীয়ত, মানুষকে জাত জন্ম বর্ণ ধর্ম ভাষা নিবাস যোগ্যতা নির্বিশেষে কেবল মানুষ রূপে জানতে ও মানতে হবে। তা হলেই আমাদের মানবিক গুণের তথা মানুষ্যত্বের বিকাশ, উৎকর্ষ এবং প্রয়োগ ব্যক্তিক জীবনে, সমাজে, সরকারে ও রাষ্ট্রে সম্ভব। এবং বৈশ্বিক-আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও মানুষে মানুষে ভেদ ঘুচে যেতে পারবে এ চেতনার উন্মেষে, বিকাশে সংরক্ষণে। আমরা সহজেই হতে পারব মনে-মর্মে-ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে যথার্থ সেক্যুলার। মানুষের প্রথম পরিচয় সে মানুষ, তার শেষ পরিচয়ও সে মানুষ।

আর স্বদেশে স্বরাষ্ট্রেও জাত জন্ম বর্ণ ধর্ম ভাষা নিবাস যোগ্যতা নির্বিশেষে ব্যক্তিমাত্রকেই একাধারে ও যুগপৎ মানুষ, নাগরিক ও বাঙালী-বাঙলাদেশী বলে গ্রহণ বরণ করতে বাধবে না। মানুষ, নাগরিক, বাঙালি ও বাঙলাদেশী তখন অভিন্নার্থক ও অভিন্নাত্মক হয়ে উঠবে। স্বদেশে আমরা মানুষকে ভালবাসতে শিখলে ও জানলে মতের-পথের-বর্ণের-ভাষার-যোগ্যতার পার্থক্যজাত হিংসা-ঘৃণা থাকবে না, থাকবে না দ্বেষ-দ্বন্দ্ব, যার সাম্প্রতিক নাম সাম্প্রদায়িকতা। শাস্ত্রিক, ভাষিক, আঞ্চলিক, বার্ণিক, শ্রেণীক স্বাতন্ত্র্য, বিচ্ছিন্নতা, দ্বেষ-দ্বন্দ্ব, প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রভৃতির অবসান ঘটানোর জন্যেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের অন্তর্লোকে সংযমের, সহিষ্ণুতার, সৌজন্যের, ন্যায্যতার ও বিবেকানুত্যের অনুশীলন আবশ্যিক।

আর সর্বোপরি আমাদের মধ্যে যুক্তিবাদের [র‍্যাশনালিজমের] মূল্য-মর্যাদা ও গুরুত্ব চেতনা জাগরূক রাখতে হবে। যৌক্তিক-বৌদ্ধিক জীবনযাপনই হবে আমাদের লক্ষ্য। বুদ্ধির সঙ্গে জ্ঞানের, সাহসের সঙ্গে শক্তির, কর্মের সঙ্গে নিষ্ঠার, লক্ষ্যের সঙ্গে সততার, উদ্যমের সঙ্গে উদ্যোগের, অঙ্গীকারের সঙ্গে আয়োজনের ও প্রয়োগের সংযোগ ঘটলে সমাজ পরিবর্তনে সাফল্য সম্ভব। এসব গুণের ও যোগ্যতার, আদর্শের ও লক্ষ্যের প্রয়োজন কৃষক-শ্রমিক-সমাজবাদী কর্মীর ও নেতামাত্রেরই।

জনসংযোগ ব্যতীত অর্থাৎ জনগণকে শিক্ষিত ও দীক্ষিত আর সংগঠিত না করে উপর থেকে চাপিয়ে দিতে গেলে ব্যর্থতা যে অনিবার্য ও অপ্রতিরোধ্য আফগানিস্তানই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আফগানিস্তান থেকে এটিই আমাদের শিক্ষণীয়।

৩.

আধুনিক রাজনীতি পার্থিব : ধর্ম স্বর্গীয়

আমাদের মানতেই হবে যে মর্ত্যজীবনই বাস্তব ও প্রত্যক্ষ। কাজেই আমাদের পক্ষে সেক্যুলার চিন্তা-চেতনাকে ও কর্ম-আচরণকেই কল্যাণের জন্যেই গুরুত্ব দেয়া আমাদের ব্যক্তিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রিক জীবনে প্রশাসনে আবশ্যিক ও জরুরী। কেননা জীবনের জন্যে ধর্ম, ধর্মের জন্যে জীবন নয়, তেমনি জীবনের জন্যে রাজনীতি, রাজনীতির জন্যে জীবন নয়, তেমনি ধর্মের জন্যেও রাজনীতি নয়, রাজনীতির জন্যেও ধর্ম নয়। তা হলেই সরকার, রাষ্ট্র ও রাজনীতিকরা নিবদ্ধ থাকবে মানুষের মর্ত্যজীবনের, পার্থিব জীবনের চাহিদা, সঙ্কট, সমস্যা প্রভৃতিতে। বস্তুত সরকার তো মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের অন্ন, বস্ত্র, নিবাস, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জীবিকাব্যবস্থা, চিকিৎসা, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ের চাহিদা মেটানোর দায়িত্বেই নিযুক্ত থাকার কথা। লোকের পারলৌকিক জীবনের সুব্যবস্থা করা সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য হতে পারে না। কেননা, আধুনিক রাষ্ট্র কমবেশি গণমানবের অধিকার স্বীকার করে। আর গণমানবেরা সাধারণত বিভিন্ন ধর্মের ও মতবাদী সম্প্রদায়ের হয়ে থাকে। কাজেই সরকারের পক্ষে সব ধর্মশাস্ত্রে বিশ্বাসীদের ঐহিক ও পারত্রিক উপকার একাধারে ও যুগপৎ করা অসম্ভব। এ জন্যেই গণতান্ত্রিক কিংবা রাজতান্ত্রিক অথবা নায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা সেক্যুলার হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

আধুনিক রাজনীতি হচ্ছে বাস্তব জীবন ও জীবিকা সম্পৃক্ত। পার্থিব জীবনের লাভ-ক্ষতি, আয়-উন্নতি, গণমানবের জীবনের নানা চাহিদা-সরবরাহ সম্পৃক্ত কাজই সরকারী ও রাষ্ট্রিক দায়িত্বের ও কর্তব্যের বিষয়। এখানে শাস্ত্রের স্থান নেই। ধর্মবিশ্বাস থাকবে ব্যক্তির বুকে ও মুখে, মনে ও মর্মে, আচারে ও আচরণে পারিবারিক সামাজিক জীবনে। কাজেই আধুনিক রাজনীতি নিতান্ত মাটিলগ্ন মর্ত্যের বিষয়, আর ধর্ম হচ্ছে ইহ-পরলোকে প্রসৃত জীবনের কল্যাণ সম্পৃক্ত। কাজেই তার স্থান ভাত-কাপড়, শিক্ষা-স্বাস্থ্য, লাভ-লোভ-স্বার্থ-জীবিকা সম্পৃক্ত হতেই পারে না। কেননা সব ধর্মশাস্ত্রের বিধি-নিষেধ একরূপ নয়। তাই আধুনিক রাজনীতিতে ধর্মের ঠাঁই নেই। রাজনীতি পার্থিব আর ধর্ম হচ্ছে স্বর্গীয়। অতএব রাজনীতিকদের কাছে আমাদের সবিনয় নিবেদন তাঁরা যেন প্রাত্যহিক প্রয়োজনের রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের কথা তার আদর্শ-উদ্দেশ্য-লক্ষ্য মিলিয়ে মিশিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজনীতির এবং শাস্ত্রের লক্ষ্যিক পার্থক্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে অকারণ-বিবাদ-বিরোধ-দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টি না করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান শিক্ষকদের আবেদনে সাড়া দিলে রাজনীতিকরা নিজেরা এবং দেশবাসীরা নিরাপদ-নিরুপদ্রব-জীবনের আশ্বাস পাবেন। শিক্ষকরা বলেছেন রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার, ধর্মের উল্লেখ বন্ধ করতে ও নিষিদ্ধ করতে।

মনুষ্যত্ব ও সংস্কৃতি

শ্রুত, লিখিত, স্মৃতিতে ধরে রাখা নীতিশাস্ত্র মানুষের যৌথ জীবন যাপনের সমকালীন। তখন হয়তো তার নাম নীতিবাদ বা নীতিশাস্ত্র ছিল না। যেমন amoral, moral বা immoral শব্দগুলোও তৈরি হয় অনেককাল পরে, তবু পরোক্ষ প্রমাণে অনুমানে বোঝা যায় এক রকমের বোঝাপড়া ছাড়া একাধিক ব্যক্তির একত্র থাকা, খাওয়া, কাজ করা বা চলে ফিরে বেড়ানো কখনো সম্ভব নয়। কেননা সখ্য ছাড়া বিরোধে-বিবাদে-বিদ্বেষে-ঘৃণায়-অবজ্ঞায় অনুচর, সহচর সাথি কিংবা সহযোগীরূপে সহবাসী হওয়া বাস্তবে অসম্ভব।

সমাজসর্দার, শাস্ত্রী, মানবহিতকামী ও দার্শনিক প্রমুখ মন-মগজ-মনন-মনীষা সম্পন্ন ব্যক্তিরা ছয়-সাত হাজার বছর থেকে এবং লিখিতভাবে আড়াই-তিন হাজার বছর ধরে লিখিত ও মৌখিকভাবে নৈতিক জীবনচেতনার, নীতিশাস্ত্র মানার আবশ্যিকতা প্রচার করে চলেছেন। কেননা যৌথ জীবনে নির্বিরোধ নির্বিবাদ নিরুপদ্রব নিরাপদ সামবায়িক সহযোগিতায় সহাবস্থানের জন্যে কিছু নীতি-নিয়ম সবারই মেনে চলা আবশ্যিক ও জরুরী হয়। যে-কোন নীতিনিয়মের লাভ-লোভ-স্বার্থ কিংবা ক্ষোভ-ক্রোধ-বিদ্বেষ-ঘৃণাবশে লঙ্ঘন জীবন-জীবিকার নিরাপত্তা এবং শারীরিক, মানসিক ও বৈষয়িক জীবন বিপন্ন করে দুর্বলের, দুস্থের ও অসহায়ের। দর্শনের ইতিবৃত্তান্তে দেখা যায় সোফিস্টরা, অ্যাপিকিউরাস কিংবা স্টোয়িকরা মানুষকে সংযত, পরমত-পরকর্ম-পরআচরণ-সহিষ্ণু ও সজ্জন-সুজন করার চেষ্টা করেছেন নানা জীবনতত্ত্ব ও জগৎভাবনা উদ্ভাবন করে। অবশ্য সব শাস্ত্রী, শিল্পী, সাহিত্যিক, দার্শনিক ও বিজ্ঞানীর তো মূল জিজ্ঞাস্য ও আলোচ্য হচ্ছে জীবন ও জগৎতত্ত্ব। কাজেই ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র প্রভৃতির সঙ্কট-সমস্যা-কল্যাণচিন্তাই ছিল তাঁদের সব প্রয়াসের মূলে। দেশ-কাল-প্রয়োজন-প্রজন্মভেদে এবং ব্যক্তিক মন-মগজ-মনন-মনীষার মান-মাপ-গুণ ও মাত্রাভেদে তা বৈচিত্র্যে বহু ও বিবিধ হয়ে উঠেছে। চিন্তার ও চেতনার এবং যুক্তির ও সিদ্ধান্তের বৈপরীত্য চমকপ্রদভাবে সুপ্রকট। তাছাড়া মহৎ কথা, জ্ঞানের কথা, অনুমানের কথা, অভিজ্ঞতার কথা, বিজ্ঞতার প্রকাশ, কল্যাণের দিশা, হৃদয়ের কোমল-মধুর-মমতামাখা রূপ প্রভৃতি সব কিছুই বলা, শোনা, জানা, দেখা হয়ে গেছে। শ্রুতিধর ও স্মৃতিধরেরা তা দেশে দেশে কালে কালে আজো প্রকাশ ও প্রচার করে বেড়ায় নানা প্রসঙ্গে। আদর্শ ও খল চরিত্রের, সজ্জন-দুর্জনের, প্রাণিপ্রবৃত্তির বীভৎসরূপ ও মানবিকগুণের তথা মনুষ্যত্বের চরম ও পরম প্রকাশও দেখা যায় আজো। অতএব, সব জানা, দেখা ও বোঝা হয়ে গেছে প্রজন্মক্রমে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু এ-ও সত্য যে, গতানুগতিক চেতনা, চিন্তা, আদর্শ, কর্ম, আচার, আচরণ প্রভৃতি প্রাজন্মক্রমিক, ব্যক্তিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আচারিক নীতিনিয়মে, রীতিরেওয়াজে বা প্রথাপদ্ধতিতে আবর্তিত হয়ে অভ্যস্ত জীবনের অঙ্গীভূত হলে তা তাৎপর্যহীন উপযোগরিক্ত নিরুদ্দিষ্ট বন্ধ্যা আচারমাত্র হয়ে দাঁড়ায়। এমন কি ব্যক্তিক অনুভব-উপলব্ধির বিষয়ও থাকে না। মাথায় চুল বাড়তে থাকে, ঘরের কোণে ঝুল বাড়ে, শয্যার উপরের পাখায় ধুলোময়লা জমে—আমাদের অনুভূতিশূন্য চোখে পড়ে না, কেবল সচেতনতা জাগে আকস্মিকভাবে। আমাদের অভ্যস্ত গতানুগতিক জীবনও তাই প্রাণিপ্রবৃত্তির অনুগত থেকেই বয়ে চলে। প্রাণের প্রয়োজনে সচেতন থাকি আমরা, মনুষ্যত্বের অনুশীলনে থাকি উদাসীন। রোগ-জরা-জড়তা-জীর্ণতা যেমন দেহের বিনাশ ঘটায়, ঘটায় চেতনার বা প্রাণের বিলুপ্তি, তেমনি প্রাণীসুলভ লাভ-লোভ-স্বার্থ-সুখ ও নিরাপত্তাচেতনা ঘটায় মনুষ্যত্বের অপমৃত্যু। এমনকি প্রাণীর মানবপ্রজাতির কোটি কোটি জনের মধ্যে মানবিকগুণের, মনুষ্যত্বের, মানবতার উন্মেষই ঘটে না সারা জীবনে, যদিও তারা গৌষ্ঠীক, গৌত্রিক, সামাজিক জীবনে আজন্ম লালিত হয়। এ কারণেই মানুষের স্বভাব ও সমাজ ব্যাঙের মতো স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় ভিন্নমুখী ও বিশৃঙ্খলা।

মানুষ বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা-অনুমান-গতানুগতিক আচার জ্ঞান-যুক্তিযোগে পরিহার করে মুক্ত চিন্তা ও মুক্ত বুদ্ধি চালিত হয় না। তবু মানুষকে গড্ডলের মতো সংহত, একমুখী ও শান্ত সহচররূপে দেখা যায় না কোথাও। মানুষ কেবলই নিয়ম-শৃঙ্খলা ভেঙে দিকবিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে, কাড়া-মারা-হানা তার স্বভাব। তাই সুযোগ পেলেই সে লাজ-ভয়-মান-অপমান ভুলে সামাজিক নিন্দার, সরকারি শাস্তির ও পারত্রিক পাপের ভয় উপেক্ষা করে প্রলুব্ধ হলেই সে পরাক্রান্ত হয়, করে না হেন অপরাধ, অপকর্ম ও পাপ নেই। সর্দার, শাস্ত্রী, রাজা কেউ তাদের সংযত, সহিষ্ণু, সজ্জন, ও অনুগত রাখতে পারেননি কোথাও কখনো। আসমানী বাণীর ও নির্দেশের দোহাই দিয়ে, পারত্রিক অগ্নির ভয় দেখিয়ে, সামাজিকভাবে নিন্দিত, ধিক্কৃত ও পতিত করে, প্রাশাসনিকভাবে শারীরিক শাস্তি দিয়ে, আর্থিকজীবন পঙ্গু করে মানুষকে আজো বাঞ্ছিতমাত্রায় শায়েস্তা করা যায়নি। হরহামেশা সর্দার-মাতব্বর-শাস্ত্রী-প্রশাসক-সরকার বিভিন্ন নতুন নতুন বিধি-নিষেধ আরোপ করেও, নানা প্রকার পন্থা আবিষ্কার-উদ্ভাবন করেও মানুষকে সংযত, সহিষ্ণু ও সজ্জন করা গেল না।

অথচ পাশাপাশি সাহিত্য-শিল্প-দর্শন-বিজ্ঞান-প্রকৌশল-প্রযুক্তি-জ্ঞান-যন্ত্র-বুদ্ধি-যুক্তি-বিবেক-বিবেচনা-ন্যায্যতা প্রভৃতির বিকাশ-বিস্তার ও উৎকর্ষ ঘটছে। এ মানুষই কখনো কখনো একটা রোগের প্রতিষেধক বের করার জন্যে, একটা রোগের কারণ ও লক্ষণ নিরূপণের জন্যে গবেষণাঘরে বিবাগী-বৈরাগীর মতো জীবন কাটিয়ে দিচ্ছেন, আবার একই সঙ্গে লক্ষ কোটি লোক মারার জন্য মারণাস্ত্র উদ্ভাবনে-আবিষ্কারে-নির্মাণে দেহ-মন-প্রাণ, জীবনের আনন্দ-আরাম উৎসর্গ করছেন। একাধারে ও যুগপৎ বাঁচানোর ও মৃত্যু ঘটানোর এ প্রয়াস প্রাণী বলেই মানুষের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে। চেতনার ও যুক্তির বৈপরীত্য থাকা সত্ত্বেও দুটোতেই রয়েছে উঁচুমানের মানবিক শক্তির ও গুণের অনন্য অসামান্য প্রকাশ ও বিকাশ। এ উপযোগচেতনার ও বৈপরীত্য ব্যবধানে স্থিত মনে হলেও অভিন্নমূল রসুনের মতো এখানেও মানবিক চেতনার জীবন-সমাজ-সরকার-রাষ্ট্র-শিক্ষা-সংস্কৃতি-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সভ্যতা-আদর্শ-উদ্দেশ্য-লক্ষ্য প্রভৃতির মধ্যে সাযুজ্য রয়েছে। নরমে-গরমে, দ্বন্দ্বে-মিলনে, ঈর্ষায়-হিংসায়-ঘৃণায়-স্নেহে-প্রেমে-মমতায়-কৃপায়-করুণায়-দয়ায়-দাক্ষিণ্যে-ক্ষোভে-ক্রোধে-ত্যাগে-তিতিক্ষায় মানুষ হচ্ছে সর্বোত্তম। প্রাণী হিসেবে মানুষ হচ্ছে বহুরূপী-করুণায় যেমন হিংস্রতায়ও তেমনি প্রাণিজগতে সে অনন্য। তার তুলনা সে-ই। এ জন্যেই মানুষ ভালোও নয়, মন্দও নয়, কখনো ভালো কখনো মন্দ, কারো প্রতি ভালো কারো প্রতি মন্দ, কারো জন্যে ভালো কারো জন্যে মন্দ। এ কারণেই একজন বন্ধু, একজন ভাই শত্রু হয়ে গেলে নতুন করে একজন ভাই-বন্ধু খুঁজতে হয়, একজনের উপর আস্থা হারালে, নতুন কারো উপর আস্থা-স্থাপন করতে হয়, একের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে অন্যের আশ্রয়ে ভরসা পেতে হয়। মানুষের স্বভাব বিচিত্র, তাই তার জীবন সঙ্কট-সমস্যা বহুল, তাই মনুষ্যসমাজে, দ্বন্দ্ব-মিলন, সন্ধি-বিগ্রহ, আস্থা-অনাস্থা অনিশ্চিত। এ জন্যেই নীতিনিয়ম, রীতিরেওয়াজ, প্রথাপদ্ধতি বদলায়, রুচি-সংস্কৃতি পালটায়। বোল ও ভোল বদলায়, প্রবলের স্বার্থেই যুক্তি, ন্যায্যতা, আইন রূপ-স্বরূপ-তাৎপর্য বদলায়।

তবু মানুষের ধৈর্যের, অধ্যবসায়ের, হিতৈষণার, কল্যাণচেতনার শেষ নেই। কিছু মানুষ, সংখ্যায় যতই স্বল্প হোক, আজো মানুষের নির্বিরোধ নির্বিবাদ নিরুপদ্রব নিরাপদ ও সামবায়িক সহযোগিতায় শান্তিতে সহাবস্থান সম্ভব ও সহজ করার জন্যে মানুষের প্রতি ব্যাকুল হৃদয়ের আকুতি নিয়ে আকুল আবেদন জানায় শাস্ত্র, শিল্প, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতির মাধ্যমে। মানবকল্যাণে বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ করে রোগের নিদান ও প্রতিষেধক আবিষ্কারে এবং বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার বিজ্ঞানচর্চায় মানুষের জীবনে যানে-বাহনে, জীবনযাপনের সাচ্ছল্য-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি লক্ষ্যে জ্ঞানে-যন্ত্রে-প্রকৌশলে-প্রযুক্তিতে উৎকর্ষ সাধনে উৎসর্গিত প্রাণ। তাই মানুষ এতো মন্দ হয়েও এতো ভালো, এতো প্রিয়। তাকে কাছে টানা যেমন আবশ্যিক, তেমনি দূরে ঠেলাও প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। এ জন্যেই মানুষের জীবনে ভালো-মন্দের, প্রেমের-হিংস্রতার, ভাঙার-গড়ার খেলা চলছে সর্বক্ষণ। তবু আবেদন করতে ইচ্ছে হয় ভালো হোন, ভালো করুন, ভালো থাকুন, ভালো রাখুন, নিজে সুখী হোন, অন্যদের সুখ দিন। সংযত হোন, সহিষ্ণু হোন, সজ্জন হোন। যুক্তির, বুদ্ধির ও বিবেকের ফুল-ফল-ফসল হচ্ছে সংযম, সহিষ্ণুতা, সৌজন্য, বিবেকানুগত্য, যুক্তিনিষ্ঠা ও ন্যায্যতা—এ ছয়টি হচ্ছে মনুষ্যত্বের ও সংস্কৃতির লাক্ষণিক ও প্রকটিত রূপ।

শুভবুদ্ধির মানুষের প্রাধান্যের ও প্রাবল্যের প্রতীক্ষায়

মানুষ প্রকৃতিকে দাস-বশ ও তার সঙ্গে আপোস করে কৃত্রিমভাবে স্বরচিত জীবনযাপন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে বলেই প্রাণীর বৃত্তি-প্রবৃত্তি দেশের, কালের, গোত্রের, বিশ্বাসের, সংস্কারের, ধারণার, অনুমানের, জ্ঞানের, প্রজ্ঞার, অভিজ্ঞতার, বিদ্যার, বিত্তের, বৃত্তির, অর্থসম্পদের ও পরিবেশের ভিন্নতার দরুন মানুষের মধ্যে অভিন্ন থাকে না। বৈচিত্র্যে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংযমে-অসংযমে, সহিষ্ণুতায়-অসহিষ্ণুতায়, সৌজন্যে-অসৌজন্যে মানবিকগুণের তারতম্যে, উদারতার-সংকীর্ণতার পার্থক্যে, যৌক্তিক-বৌদ্ধিক চেতনার মাত্রাভেদে বিবেকী ন্যায্যতা বোধের মান-মাপ-গাঢ়তা-গভীরতার ভিন্নতায় মানুষের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ-লাভ-লোভ-স্বার্থচেতনার প্রভাবে বহু ও বিচিত্র হয়ে থাকে। এ জন্যে মানুষকে তার আচার-আচরণকে সাধারণ লাক্ষণিক সংজ্ঞায় চিহ্নিত করা যায় না। চিনতে জানতে বুঝতে ভুল হয়। বারবার ঠেকে ও ঠকে আস্থা হারিয়েও এককভাবে বাঁচার উপায় নেই বলে নতুন মানুষে আস্থা স্থাপন করে নতুন ভরসায় জীবিকাক্ষেত্রে ঠেকে ও ঠকে এগিয়ে যেতে হয়।

এ কেবল ব্যক্তিক-পারিবারিক জীবনে সীমিত নয়, বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বে সামাজিক, প্রাশাসনিক ও সরকারী বা রাষ্ট্রিক জীবনেও এ বিড়ম্বনা নিত্যকার চালচিত্রের অন্তর্গত। এখানে রাজনীতিক ও বাণিজ্যিক কালোবাজার ও সাদাবাজার সমান্তরালভাবে চলে। বিশেষ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কাল থেকে নৈতিকচেতনা, আত্মসম্মানবোধ, পাপভীতি, স্বনির্ভরতা প্রভৃতি প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। প্রাত্যহিক জীবনে প্রয়োজনীয় সামগ্রীর চাহিদা ও সামগ্রীর স্বল্পতাগত সরবরাহে ছেদ ও বিচ্যুতিই মানুষকে গত পঞ্চাশ বছর তথা অর্ধশতক ধরে দুর্নীতিবাজ করেছে। স্বভাব একবার নষ্ট হলে, অভাব ঘুচলেও বিনষ্টি থেকে মুক্তি মেলেনা, প্রজন্মক্রমে তা গতানুগতিকভাবে অভ্যস্ত নীতিতে নিয়মে, রীতিতে, রেওয়াজে, প্রথায় পদ্ধতিতে পরিণতি ও স্থায়িত্ব পায়। তাছাড়া বিদ্যার বিস্তারের ফলে ব্যক্তিমানুষের মধ্যে যুক্তিবাদে অনুরাগ বেড়েছে। ফলে গতানুগতিক বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা-আচার-আচরণ লঙ্ঘনে-উপেক্ষায় মানুষ সাহসী হয়ে উঠেছে।

বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোতে বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোতে দুর্নীতি এখন ব্যতিক্রম নয়, নীতি ও রেওয়াজ। আবার এর মধ্যেও বিভ্রান্তিকর আচার-আচরণ, ভাব-চিন্তা-কর্ম ও আদর্শ দেখা যায়, ফলে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের, সংশয়ের-সন্দেহের-অনাস্থার-ভরসার দোলাচাল অবস্থা তাই আমরা দ্বিধাহীনচিত্তে কাটিয়ে উঠতে পারি না। একের উপর বিশ্বাস হারিয়ে, একের কাছে প্রতারিত হয়েও যৌথ জীবনে বাঁচার গরজেই নতুন আস্থার ও প্রতারণার ফাঁদে স্বেচ্ছায় প্রবেশ করতেই হয়।

ফলে ভূয়োদর্শী কবি জীবনানন্দ দাশ অর্ধশতাব্দীরও আগে জেনে বুঝে দেখে আমাদের জানিয়েছেন যে–

অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ
যারা অন্ধ আজ সবচেয়ে বেশি, আজ চোখে দেখে তারা
যাদের হৃদয়ে কোন প্রেম নেই, প্রীতি নেই, করুণার আলোড়ন নেই,
পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।

কবিরাতো জাতির, মানুষের ভূয়োদর্শী বিবেক, যৌক্তিক ও বৌদ্ধিক মননে উপলব্ধি করেন, চিত্তবান বলেই বাহ্যত গুহায়িত থাকলেও হৃদয়ে তাঁদের বাস্তবচিত্র অঙ্কিত হয়ে যায়। তাই বারো বছর আগেই কবি শামসুর রাহমান দেখেছিলেন, জেনেছিলেন ও বুঝেছিলেন 'উল্টট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ।'

কবি মহাদেব সাহাও তাই বলেন ;

সুন্দরের হাতে আজ হাতকড়া
গোলাপের বিরুদ্ধে হুলিয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হৃদয়ের তরজমা নিষিদ্ধ আর
মননের সম্মুখে প্রাচীর
বিবেক নিয়ত বন্দী।...
আলোর বিরুদ্ধাচারী
আঁধারের করে এরা স্তুতি।

ব্রিটিশ আমলে প্রতীচ্যবিদ্যায় শিক্ষিত লোকেরা জীবনের সর্বক্ষেত্রে মানসিকভাবে আমজনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে সৃষ্টি হয়েছিল দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান। এখনো আবার আমরা আমজনতা থেকে লাভে লোভে স্বার্থে বিচ্ছিন্ন। এতে জাতিচেতনা লুপ্ত হবে। আজ স্বদেশের, স্বজাতির, স্বরাষ্ট্রের মানুষের মধ্যে কল্যাণচেতনা লুপ্ত, বিবেক কীটদ্রষ্ট আর দুর্নীতি, ভীরুতা, লোভ ও স্বার্থপরতা রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবিষ্ট। কাজেই আমাদের সুদিন এখনো সুদূরে। অধিকাংশ মানুষে শুভবুদ্ধির প্রাধান্য-প্রাবল্য ব্যতীত তো শান্তি-স্বস্তি-সুখ ও সুশৃঙ্খল জীবন জাতীয় জীবনে অসম্ভব। তবু বুদ্ধির সঙ্গে জ্ঞানের, সাহসের সঙ্গে শক্তির, যুক্তির সঙ্গে বিবেকের, আদর্শের সঙ্গে অঙ্গীকারের, উদ্যমের সঙ্গে উদ্যোগ-আয়োজনের যোগে এদেশেও প্রত্যাশিত মানের মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, সুদিন যতো বিলম্বেই হোক একদিন আসবে, এ আশা বুকে পুষে বল-ভরসা পুঁজি-পাথেয় করে সুদিনের প্রতীক্ষায় থাকব। বিজ্ঞানের উদারতার, যুক্তিবাদের, ন্যায্যতার ও বিবেকের অনুরাগ, অনুগামিতা ও আনুগত্য মানবিকগুণের, মানবতার তথা মনুষ্যত্বের দ্রুত বিকাশের সহায়ক।

AMARBOI.COM

'আত্মসম্বিৎ' প্রয়োজন

মানবিকগুণের বিকাশের জন্যে অনুভবের ও উপলব্ধির, অন্য কথায় হৃদয়বৃত্তির উৎকর্ষের জন্যে চিত্তসম্পদ বৃদ্ধির জন্যে গান-গল্প-কবিতা-উপন্যাস-নাটক-চিত্র-ভাস্কর্য প্রভৃতির চর্চার আবশ্যিক। কেননা এগুলো আবেগসঞ্জাত সৃষ্টি। এগুলোর আবেদন তাৎক্ষণিক এবং আবেগ মানুষকে প্রেরণা–প্রণোদনা–প্ররোচনা-উত্তেজনা-উদ্দীপনা-উদ্যম যোগায়। কোন কিছু করার জন্যে অঙ্গীকারবদ্ধ বা দায়বদ্ধ করে, জীবনে একটা আদর্শিক মত-পথ-কর্ম-আচরণ গ্রহণে প্রবুদ্ধ ও উদ্বুদ্ধ করে। কাজেই সৃষ্টি সাহিত্যের গুরুত্ব, আবশ্যিকতা অবশ্য স্বীকার্য। কিন্তু পড়ুয়ার সংখ্যা জরুরী ভিত্তিতে বাড়াতে হবে— শিক্ষার বিস্তার ঘটিয়ে গণশিক্ষার ব্যবস্থা করে। কিন্তু জীবন তো ঋজু নয়, জীবনানুভূতিও সরল নয়, জীবনের চাহিদা, প্রাত্যহিক প্রয়োজনচেতনাও সামান্য নয়। এ অবস্থায় কেবল গান-গাথা-গল্প-উপন্যাস-নাটক-রম্যরচনাই মানুষের মানসিক, ব্যবহারিক ও বৈষয়িক জীবনের চাহিদা মেটাতে পারে না। মানুষের রয়েছে ক্ষুধা-তৃষ্ণা, দেহ-প্রাণ-মন, কাজেই মনের, প্রাণের ও দেহের প্রয়োজনও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর্থ-বাণিজ্যিক জীবন এখন আর গাঁয়ের, জিলার, নগরের বা রাষ্ট্রের সীমায় নিবদ্ধ নেই। এ এখন সর্বাত্মক ও সর্বার্থকভাবেই বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক। কাজেই আমাদের খনিজ, কৃষিজ কিংবা কলজ যথাক্রমে উৎপাদিত ও নির্মিত 'পণ্য' হতে হবে দেশের ও বিদেশের বাজারে বিপণনের জন্যে আন্তর্জাতিক মানের। কেন না বিশ্ব এখন যানবাহনের বদৌলতে একটা জনপদে পরিণত হয়ে গেছে। তাই 'পণ্য' বাজার হয়েছে সর্বজনীন ও সার্বত্রিক। ফলে প্রতিটি খাদ্যবস্তু কিংবা ব্যবহার্য সামগ্রী তীব্র প্রতিযোগিতার ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার লড়াইয়ে হার-জিতের, টেকার-না টেকার সঙ্কট-সমস্যার সম্মুখীন। বাজারে চালু থাকা, ক্রেতাপ্রিয় হওয়া কিংবা বিলুপ্ত হওয়া সঙ্কট-সমস্যা অতিক্রম করার শক্তির উপর নির্ভরশীল। একাল বিজ্ঞান চর্চার ও প্রকৌশল-প্রযুক্তি আবিষ্কারের, উদ্ভাবনের এবং এগুলোর উৎকর্ষ সাধনের যুগ। সামরিক অস্ত্র, বিমান, পরিবহন যান, কারখানার যন্ত্র, চিকিৎসার যন্ত্র প্রভৃতি চিরকাল বিদেশ থেকে আমদানী করতে হলে, রাষ্ট্র হিসেবে আমাদের আর্থ-বাণিজ্যিক উন্নতি হবে না। অতএব এগুলো স্বদেশে স্বদেশী দিয়ে স্বরাষ্ট্রে তৈরি করার যথা শিগগির উদ্যোগ আয়োজন গ্রহণ আবশ্যিক ও জরুরী।

আমাদের আবেগচর্চা যেমন চিত্তমান হওয়ার জন্যে আবশ্যিক, বিত্তবান হওয়ার জন্যেও তেমনি দেশের কৃষিব্যবস্থার আধুনিকীকরণ, মাছ, দুধ, ফল-মূল-ফুল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ফসল স্বভূমে উৎপাদনের জন্যে আধুনিক ব্যবস্থা গ্রহণ প্রভৃতিও জরুরী।

আমাদের মধ্যযুগের জীবনযাত্রার এবং রচিত সাহিত্যের সাক্ষ্যে বলা যায় আমরা কোন একটা রীতিরেওয়াজে আত্মসমর্পণ করে নিশ্চিন্তে গতানুগতিক অভ্যস্ত আচারে-আচরণে ও চেতনায়-চিন্তায় স্বস্তি পাই ও সুস্থ থাকতে চাই। ঔপনিষদিক 'চরৈবেতি' আমাদের অনুপ্রাণিত করে না। আমরা স্থিতি পছন্দ করি, গতিতে ঝামেলা দেখি। অথচ বিজ্ঞরা বলেন, গতিই জীবন, স্থিতি জরার-জড়তার-জীর্ণতার শিকার। স্থিতি স্রোতহীন জলাশয়ের মতো কেবল অবক্ষয়ের ও মানসিক আধির ও বন্ধ্যাত্বের শিকার। অবশ্য উল্লেখ্য যে, লাটিমের কিংবা কলের চাকারও গতি আছে, সে-গতি এগিয়ে দেয় না, শুধুই একই স্থানে আবর্তিত হয়ে হয়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে হয়ে অচল হয়ে পড়ে। আমরা ভাষা আন্দোলনের ও বিজয়ের, মুক্তিযুদ্ধের গৌরবে শ্লীত হয়ে রয়েছি। নতুন কোন চিন্তা-চেতনার পরিচয় দিতে পারছি না। অতীত গৌরবের রোমন্থনে বই লেখা হচ্ছে। নতুন প্রয়োজন পূরণের জন্যে দেশবাসীকে বা রাষ্ট্রকে দিশা দেয়ার, পথ বাতলানোর চেষ্টা নেই আমাদের। এ জন্যে বিজ্ঞানের সঙ্গে, সাহিত্যের সঙ্গে, দর্শনের, ইতিহাসের, সমাজবিজ্ঞানের, রাষ্ট্রচিন্তার চর্চাও সমগুরুত্বে গ্রহণ-বরণ করা দরকার। নীতি-নিয়মের একটা গুরু ভূমিকা আছে প্রকৃতির মতো মানুষের যৌথজীবনে, সম ও সহস্বার্থে সংযমে, পরমত পরকর্ম পরআচরণ সহিষ্ণুতায়, সৌজন্যে, সহযোগিতায়, ভাব-চিন্তা-শ্রম-পণ্য বিনিময়ে সামবায়িক সমতায় ও অধিকারে সহাবস্থানের অঙ্গীকারও আবশ্যিক সংস্কৃতিমান সভ্য সমাজেও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কালান্তরে আত্মকল্যাণের কুঞ্জি

কাব্য-কবিতা-নাটক কাল্পনিক বা মিথ্যা বলে ইসলামে এ সবের চর্চা করাই অবাঞ্ছিত বিবেচিত হয়েছিল ইসলামের উন্মেষযুগে এবং আব্বাসীয় আমলে। তাই মুসলিম বিদ্বানেরা গ্রীক চিকিৎসাশাস্ত্র, বিজ্ঞান ও দর্শন পড়েছেন, অনুবাদ করেছেন, আলোচনা করেছেন এবং প্রভাবিত হয়ে অনুকরণে-অনুসরণে আত্মোন্নয়ন ঘটিয়েছেন। গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞান তাঁদের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার উৎস ও ভিত্তি হয়েছিল কয়েক শতক ধরে। গ্রীক কাব্য-কবিতা-নাটক কিন্তু পঠিত কিংবা অনুবাদিত হয়নি। হয়নি ভাস্কর্যেরও অনুশীলন। ফলে সাহিত্য যে মানবিক আবেগ-অনুভব-উপলব্ধির বিকাশ ঘটায়, সৌন্দর্যবুদ্ধি বাড়ায়, রুচি উন্নত করে, মানস ও ব্যবহারিক সংস্কৃতি সূক্ষ্মতর করে, তা মুসলিম সমাজ বহু বহু কাল স্বীকার করেনি। আরবি ভাষায় বহু বহুকাল মুসলিমরচিত সাহিত্য ছিলই না। বৌদ্ধসংস্কৃতি ও বৈদান্তিক দর্শন প্রভাবিত ইরানে ও মধ্য এশিয়ায় মরমীবাদের বিকাশে এবং বৌদ্ধ আর মানী-মজদকীদের বংশজ মুসলিমদের মধ্যে শরীয়তী ইসলামের প্রভাবের লঘুতার দরুন সেখানে সাহিত্যের ও সূফীবাদের চর্চা অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। পীরবাদের উদ্ভবও ইরাকে-ইরানে মধ্য এশিয়ায় ঠেকানা যায়নি। বৌদ্ধ গুরুবাদের প্রত্যক্ষ প্রভাবে এ পীরবাদের উদ্ভব। পীর ও স্থবির [থের] অভেদার্থক। এখানেই শেষ নয়। ইরানে ইসলামের মৌল পরিভাষাগুলো ফারসী তর্জমায় ব্যবহৃত হতে থাকে, পরে তা ভারতবর্ষেও অনুকৃত হয়। যেমন- খোদা, নামাজ, রোজা, ফেরেস্তা, বেহেস্ত, দোখজ প্রভৃতি।

তবু কোরআন ও হাদিস কখনো বিদ্বানদের ও বিজ্ঞানের মধ্যে উপেক্ষিত হয়নি। অনক্ষর-অজ্ঞদের মধ্যেই দৈশিক, লৌকিক ও প্রাতিবেশিক প্রভাব প্রবল ছিল মাত্র। ভাস্কর্য কখনো কদর পায়নি বটে, তবে চিত্রকলা শিয়াদের মধ্যে সমাদৃত ছিল, পরে তুর্কী-মুঘলদের মধ্যে স্থাপত্যের ও চিত্রশিল্পের আদর-কদর বেড়ে যায়। এমনকি ফতেপুরসিক্রির দুর্গের দেয়ালে জীব-জন্তুর ছবিও সযত্নে অঙ্কিত দেখা যায়। আসলে কালের প্রভাব এড়ানো যায় না। ঠেকিয়ে রাখা যায় না গণচাহিদা।

তাই এ কালের ঢাকা শহরে আমরা বিগত সাতচল্লিশ বছরে কালের দাবিকে, জীবনের দাবিকে, মনের চাহিদাকে, হৃদয়ের আবেগকে উপেক্ষা করতে পারিনি, পাপ-পুণ্যের কথা মনে রাখিনি। রীতি-রেওয়াজ, প্রথা-পদ্ধতি ও নীতি-নিয়ম ভেঙেছি। এমন দিন ছিল, যখন মুসলিম পাড়ায়-মহল্লায় ফুলের গাছ দেখা যেত না, ফুলের কদর ছিল না। এখন শিক্ষার প্রসারে ও আর্থিক সচ্ছলতায় শহুরে মানুষের রুচি উন্নত ও পরিশীলিত হয়েছে, সৌন্দর্যচেতনা হয়েছে সূক্ষ্ম। তাই স্বল্পস্থায়ী জেনেও ফুল কেনা, ফুল রাখা, ফুল উপহার দেয়া, ফুল দিয়ে বরণ করা, ফুল দিয়ে অভিনন্দিত করা ঘরে ঘরে চালু হয়ে গেছে। এখন ফুল আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে অপরিহার্য ও উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। এটি আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের বিকাশের একটি উজ্জ্বল সুউচ্চ মিনারের মতোই সাক্ষ্য প্রমাণ হয়ে রইল। ফুল-পায়রা-বেলুনও এখন আমাদের সাংস্কৃতিক উৎসব-পার্বণের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপরিহার্য উপকরণ। আমরা সমকালীন বৈশ্বিক আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির গর্বিত ধারক হয়ে উঠছি।

বিগত শতকে মুসলিম সমাজে ইংরেজি শিক্ষিত লোকের নগণ্যতার দরুন কাব্য-কবিতা রচক মেলেনি, এমনকি কায়কোবাদ-মোজাম্মেল হকের মতো পয়ার-ত্রিপদী লেখকও আর কেউ ছিলেন না। এ সেদিনও মানে বিশ শতকের প্রথম তিন দশক অবধি নারী-পুরুষের গল্প-উপন্যাস রচনাও সুনজরে দেখেননি রক্ষণশীল স্বল্প ইংরেজি শিক্ষিত শহুরে মুসলিমরাও। বেগম রোকেয়ার কিংবা নূরুননেসা বিদ্যাবিনোদিনীর গল্প-উপন্যাস রচনা অনেকের আপত্তির কারণ ছিল। আজ কালান্তরে মুসলিমসমাজেরও মানসিক যুগান্তর ঘটেছে। য়ুরোপীয় বিদ্যা, বিজ্ঞানের তত্ত্ব, তথ্য, সত্য, আবিষ্কার-উদ্ভাবন-সৃষ্টি, প্রকৌশল-প্রযুক্তি আর বিস্ময়কর সব তার-বেতার যন্ত্র মানুষকে অলীক, অলৌকিক, লৌকিক বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা-আচার-আচরণ যাচাই-বাছাই-বর্জন করতে সাহস ও শক্তি যুগিয়েছে। আজ ঢাকা শহরেই শ' তিনেক লিখিয়ে বাস করেন। যে নাচ-গান-বাজনা-অভিনয়-চিত্র নিষিদ্ধ ছিল, আজ ঢাকার শিক্ষিত লোকদের ঘরে ঘরে সন্তানদের বহু অর্থব্যয়ে নাচিয়ে-বাজিয়ে-গাইয়ে-আঁকিয়ে করে তোলার চেষ্টা চলছে। একে সংস্কৃতির ও আভিজাত্যের আর গৌরবের-গর্বের বিষয় বলে জানতে, বুঝতে ও মানতে শিখেছে শিক্ষিত লোকেরা।

নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে, রেডিয়ো-টিভিতে নাটক হচ্ছে অনাত্মীয় নারী-পুরুষের অভিনয়ে। সিনেমা তৈরি হচ্ছে শতে শতে। কালের দাবির ও জীবনের চাহিদার কাছে আমরা অসংকোচে নির্দ্বিধায় আত্মসমর্পণ করে মনে-মননে-রুচিতে-সংস্কৃতিতে সমকালীনতা লাভ করেছি। কালিক-বৈশ্বিক-আন্তর্জাতিক মানের জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি। সিএনএন, কিংবা বিবিসি'র স্টার বা ডিশ-অ্যান্টেনা অথবা দেশী-বিদেশী, সিনেমা-ক্যাসেট আমাদের রুচি-সংস্কৃতিকে বৈশ্বিক করে তুলেছে। আমাদের আঞ্চলিক গ্রামীণ সাম্প্রদায়িক কিংবা শাস্ত্রিক সংস্কৃতি এসবের প্রভাবে আমাদের অজান্তেই পরিবর্তিত হচ্ছে। আমাদের মুসলিম সমাজে চিত্রকলার চর্চাও ছিল নিষিদ্ধ। নিতান্ত সূচি শিল্পই ছিল সমাজ-অনুমোদিত। আজ এ সমাজে সর্বপ্রকার চিত্রের ও চিত্রীর আদর-কদর অত্যন্ত বেড়ে গেছে। এতেও বোঝা যাচ্ছে আমাদের মনে-মননে রুচিতে-সংস্কৃতিতে যুগান্তর ঘটেছে। বইছে বাসন্তী হাওয়া, এ আর্তব পরিবর্তনও আমাদের সংস্কৃতির বিকাশের সাক্ষ্য-প্রমাণ। এসব এখন আমাদের চোখ-সহা, গা-সহা ও মন-সহা হয়ে উঠেছে। আপত্তি করার সাহস ও শক্তি হারাচ্ছে গোঁড়া রক্ষণশীলেরাও। কেননা তারা বুঝেছে আগের যুগের মানসিক ও ব্যবহারিক জীবনের খোল-নলচেও বদলে গেছে আমাদের অজ্ঞাতেই। এখন আর পূর্বাবস্থায় ফেরানো যাবে না। দুধ থেকে ঘি হয় বটে, কিন্তু ঘিকে আর দুধে পরিণত করা চলে না। আমরা এগিয়েছি, পিছুটান ব্যর্থ হবেই।

আমাদের শহুরে শিক্ষিত ধনী-মানী রুচিমান মানুষের পোশাক হচ্ছে স্যুট, ভাষা হচ্ছে ইংরেজি, আচরণরীতি হচ্ছে য়ুরোপীয়, আর খাদ্য হচ্ছে পাঁচতারা হোটেলের খাদ্য।

এখন আমাদের অনুরাগ নব নব সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের প্রতি, আমাদের অনুগামিতা হচ্ছে প্রতীচ্য আদলের জীবন যাপন পদ্ধতির, আমাদের আনুগত্য বাড়ছে প্রতীচ্য আদলের গণতন্ত্রের প্রতি। বিদেশে উৎপাদিত ও নির্মিত পণ্যেই আমাদের আদর। বিদেশী বিদ্যাতেই আমাদের অনুরাগ, বিদেশী চিকিৎসা বিদ্যায় আমাদের ভরসা, বিদেশী বস্ত্রে-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যন্ত্রে আমাদের আকর্ষণ। এক কথায় বিকাশমান উৎকৃষ্ট যন্ত্র, বিদ্যা, পদ্ধতি প্রভৃতিই আমাদের আদরের কদরের অনুরাগের আকর্ষণের বিষয়— এতেই আমরা আত্মকল্যাণের কুঞ্জি খুঁজে পেয়েছি। আমাদের জানতে, বুঝতে ও মানতে হবে যে, 'Old order Changeth yeilding place to new.'

স্বকাল চেতনাই বাঁচার চাবিকাঠি

সহজ সত্য সহজ ও সরলভাবে অনুভব-উপলব্ধি করলেই চিন্তা-চেতনার ও বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা-আচার-আচরণের অনেক জটিল শেকড় ও শাখা-পল্লব থেকে বিচ্ছিন্ন ও মুক্ত থেকে দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধেও ঋজু চেতনা নিয়ে বেঁচে থাকা যায়। সেই সহজ সত্যটি হল : প্রতি নতুন সূর্যের উদয়ে নতুন দিনের শুরুতে ক্ষুধা-তৃষ্ণা প্রভৃতি সর্ব প্রকার দৈহিক-মানসিক-বৈষয়িক চাহিদা-চেতনায় জীবন চালিত করতে হয়। এ ক্ষেত্রে অতীত নেই, ঐতিহ্য নেই, কেবল প্রত্যক্ষ বর্তমানই রয়েছে, যার অপর নাম সমসময় বা স্বকাল। এ কালচেতনাই জীবনের বাস্তব ও আবশ্যিক খুঁজি-পাথেয়। জীবনের দাবি আর জাগ্রত মুহূর্তগুলোর প্রয়োজনচেতনা সমার্থক। এ তাৎপর্যে নতুন সূর্যের উদয়ে নতুন দিনের শুরুতে জীবনের নতুন দাবিরও উদ্ভব ঘটে এবং তা পূরণ করতেই হয়।

বিজ্ঞানীর তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য আবিষ্কারের এবং প্রাকৌশলিক ও প্রাযুক্তিক যন্ত্রাদির উদ্ভাবনে ও উৎকর্ষ সাধনে সদা অগ্রগতির ফলে জীবন-জীবিকা পদ্ধতি পৃথিবীব্যাপী দ্রুত বদলাচ্ছে। মানুষের চিন্তা-চেতনাও অবচেতন ও সচেতন যুক্তি-বুদ্ধি-জ্ঞান-অভিজ্ঞতার প্রভাবে বদলাচ্ছে, এমনকি শাস্ত্রনিষ্ঠও শাস্ত্রিক বিধি-নিষেধের সত্যতায় ও পালনের প্রয়োজনীয়তায় আস্থা রেখেও প্রাত্যহিক জীবন-জীবিকা পদ্ধতির পরিবর্তনের ফলে শাস্ত্রকে লঙ্ঘন ও উপেক্ষা করতে বাধ্য হচ্ছে পৃথিবীর সব শাস্ত্রপন্থী আস্তিকই। এখন হজযাত্রীরও বারোটা ফটো লাগে। অথচ জীবনমাত্রেরই ছবি অঙ্কন কোন কোন মতবাদী সম্প্রদায়ে হারাম। এখন খ্রীস্টানরাও, ইহুদীরাও, হিন্দুরাও, বৌদ্ধরাও, জৈনরাও, পার্সীরাও এবং মুসলিমরাও স্ব স্ব শাস্ত্রের অনেক বিধি-নিষেধ দৈনন্দিন জীবনে লঙ্ঘন করতে দ্বিধা করছে না। বিজ্ঞানের বদৌলতে দুনিয়ার মানুষের জীবনযাত্রা যন্ত্র-নির্ভর হওয়ায় পৃথিবীর শহুরে শিক্ষিত ধনী মানুষের জীবনযাপন পদ্ধতিতে কোন স্বাতন্ত্র্য-পার্থক্য নেই। পোশাকে [স্যুট] ভাষায় [ইংরেজী] খাদ্যে [পাঁচ তারা হোটেলে] আচারে-আচরণে [য়ুরোপীয়] কোন পার্থক্য চোখে পড়ে না। কেবল আঙ্গিক-আকারের ও রঙের পার্থক্য আর স্বাতন্ত্র্যই অভেদ হওয়ার পথের বাধা।

একালে জীবন বিজ্ঞানের তত্ত্ব, তথ্য, সত্য নয় কেবল, বিজ্ঞানীর তৈরি যন্ত্র, ওষুধ, রোগের নিদান এবং উদ্ভাবিত চিকিৎসাবিজ্ঞান এবং উদ্ভাবিত যন্ত্রাদির নিত্য উৎকর্ষ ও সৌকর্য মানুষের মন, মনন, মনীষা, আয়ু, জীবন ও জগৎ চেতনা বদলে দিচ্ছে। অতীত গৌরব-গর্ব ভুলে আজ খাওয়া-পরার সঙ্কট নিরসনের তাগিদে ইটালি-ফ্রান্স-জার্মানী-ব্রিটেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বাতন্ত্র্য বর্জন করে আত্মবিলোপে সম্মত হচ্ছে। এ কালের দাবি কোথাও কেউ অস্বীকার করতে পারবে না, পারে না। কাজেই আমাদের স্বকালের স্বদেশের স্বসমাজের, স্বসরকারের, স্বরাষ্ট্রের ও মানুষের এবং নিজের প্রয়োজন-সচেতন থেকেই বাঁচতে হবে। এ কালে অতীত ও ঐতিহ্যমুখী চিন্তা-চেতনা, অতীত-ঐতিহ্যপ্রীতি নিয়ে প্রগতিশীল হয়ে সমকালীন জীবনের প্রসাদ ব্যক্তিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রিক জীবনে ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগ করা যাবে না। আমরা অনুন্নত, অবক্ষয়গ্রস্ত, গতানুগতিক আবর্তিত আচারিক জীবনে অভ্যস্ত প্রাণীই থেকে যাব। স্বকাল চেতনাই বাঁচার চাবিকাঠি।

কালের চাহিদা সচেতন হতে হবে

প্রতিদিন আজকের এ সংহত ও জনপদপ্রায় পৃথিবীতে মানুষের জ্ঞান-প্রজ্ঞা-বুদ্ধি-যুক্তি-অভিজ্ঞতা বাড়ছে বিভিন্ন মাত্রায় এবং সেই অনুপাতেই পূর্বেকার বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা তথা জীবনচেতনা, জগৎভাবনা ও জীবিকাপদ্ধতি বিচিত্রভাবে বদলাচ্ছে। যেমন ভারতের হিন্দুরা বিশ্বাস করত 'জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে' এ তিন ঈশ্বরের বা নিয়তির হাতে। এখন জন্ম নিয়ন্ত্রণের যুগে জন্ম মা-বাপের ইচ্ছা ও প্রয়োজননির্ভর, আধুনিক জীবনযাত্রায় ঠেকানো যায়। যেমন প্রসূতিমৃত্যু কিংবা শিশুমৃত্যু, হৃৎরোগে মৃত্যু, যক্ষ্মায় মৃত্যু, সন্নিপাতে মৃত্যু প্রভৃতি চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতির ফলে ঠেকানো সম্ভব। আর ত্যাগ-তালাক প্রথা চালু হওয়ায় বিয়ে নিয়তির আয়ত্তে নেই। অতএব জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে আগের তাৎপর্যে জীবনে অমোঘ নিয়তিরূপে স্থিত নয়। কম্যুনিস্ট রাজ্যে রিজিক-দৌলতও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাভুক্ত হওয়ায় অদৃষ্টবাদের আওতামুক্ত। বিদ্যা, ধন, কলেরা-বসন্ত-শিশুজীবন এখন আর সরস্বতী-লক্ষ্মী-ওলা-শীতলা-ষষ্ঠীর দায়িত্বে কর্তৃত্বে নেই। তেমনি নেই জীবনের লাভ-ক্ষতি, রোগ-ব্যাধি, জয়-পরাজয়, শুভ-অশুভ দিন-ক্ষণ-তিথি-নক্ষত্র-লগ্ননির্ভর। শনি-মঙ্গলবার-বারবেলা-অমাবস্যা এখন আর কারুর জীবনে-জীবিকায় সাফল্য-অসাফল্য প্রভাবিত করতে পারে না। এসব বাস্তব জীবনে আমরা ভেবে দেখি না বলেই, আশৈশব শ্রুত ও লব্ধ বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা-যাচাই-বাছাই-ঝাড়াই করি না বলেই আমাদের মন-মননে-আচরণে এসব আজো প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে। ফলে আমরা যেমন স্বেচ্ছায় স্ব-ঔদাসীন্যে খাঁচাবদ্ধ হয়ে রয়েছি, মুক্ত মনে, মুক্ত মননে, যুক্তিসিদ্ধ আচরণে অভ্যস্ত হতে পারিনি। এ স্বেচ্ছাবন্দিত্ব অজ্ঞ-অনক্ষর-দুস্থ-দরিদ্র-নিরন্ন-নিঃস্ব মানুষে জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তিরিক্ত বলে অবাঞ্ছিত হলেও লভ্য ও স্বাভাবিক। কিন্তু শহুরে শিক্ষিত ধনী-মানী লোকেরাও যে অজ্ঞ-অনক্ষর মানুষের মতো যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেক-বিবেচনা প্রয়োগে স্ব স্ব ভাবে-চিন্তায়-কর্মে-আচরণে দেশ-কালের চাহিদা অনুগ পরিবর্তন আনতে অনীহ বরং প্রজন্মপরম্পরায় প্রাপ্ত নীতিনিয়মে, রীতিরেওয়াজে, প্রথাপদ্ধতিতে গতানুগতিক অভ্যস্ত জীবনযাপনে ও ভাবে-চিন্তায়-কর্মে-আচরণে আবর্তনধর্মী হওয়াকেই স্ব স্ব আচার-সংস্কৃতি বজায় রাখা বলে জেনে ও মেনে নিশ্চিন্ত ও স্বস্থ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এতে আমাদের ব্যক্তিক, সামাজিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রিক অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে মুক্ত মনের ও মুক্ত চিন্তা-চেতনার অভাবে। আজকের দুনিয়ার অগ্রসর রাষ্ট্র, মানুষ ও সংস্কৃতি আর প্রকৌশল-প্রযুক্তি নির্ভর জীবন-জীবিকা প্রভৃতির মধ্যে সঙ্গতি-সামঞ্জস্য রক্ষা করে বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক স্তরে বিজ্ঞান ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আর সাহায্য-সহযোগিতায় বাঁচতে হলে আমাদের বিজ্ঞান ও বাণিজ্যে গুরুত্ব দিতে হবে। আর মনে-মগজে-মননে নির্মোহ যুক্তিবাদী ও প্রকৃতির নিয়মে আস্থাবান হতে হবে। মনে জিজ্ঞাসা, উদ্যম, উদ্যোগ, শক্তি, সাহস বাড়াতে হবে। আত্মকল্যাণেই প্রাজন্মক্রমিক অথচ উপযোগরিক্ত উত্তরাধিকারে অনুরাগ, অনুগামিতা ও আনুগত্য পরিহার করতে হবে। এ কালের নতুন নতুন আবিষ্কার-উদ্ভাবনে-সৃষ্টিতে আত্মোন্নয়নের গরজেই নিজেদের ঋদ্ধ করতে হবে। নিজেরা আবিষ্কারে-উদ্ভাবনে-সৃষ্টিতে অসমর্থ হলেই মানব-উত্তরাধিকার হিসেবে যে-কোন কারুর অনুকরণে অনুসরণে আত্মোন্নয়নে উৎসাহী থাকব। আমাদের দেহ-প্রাণ-মনের পরিচর্যার জন্যেই আজ আমাদের প্রতীচ্য সম্পদের ও সৃষ্টির উপর নির্ভর করতেই হচ্ছে। প্রকৌশল-প্রযুক্তি-বিজ্ঞান-বাণিজ্য-পণ্য এখন ওদের সৃষ্ট ও আয়ত্তে। তাই ওরা আমাদের প্রভু না হয়েও পীর-গুরু, ওরা মহাজন আমরা খাতক, ওরা বিক্রেতা আমরা ক্রেতা আর প্রজার মতো, শাসন পাত্রের মতোই আমরা ওদের হুকুম-হুমকি-হুঙ্কার-হামলার পাত্র। আমাদের এ কালে বিজ্ঞানে ও বাণিজ্যে দক্ষ হতে হবে। পণ্য উৎপাদনে, নির্মাণে ও বিপণনে আমাদের উদ্যোগী হতে হবে। দেশে বিদেশে বাজার দখলে এনে স্বপ্রতিষ্ঠ হতে হবে। জাতীয় অর্থ সম্পদ ও শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে।

AMARBOI.COM

বন্ধন মুক্তিই কাম্য

মানুষের মর্ত্যজীবন রূঢ় বাস্তবতা বিজড়িত। এখানে সুখের, যশের, মানের, গুণের স্বপ্ন ও সাধ অন্তরে পোষণ করা চলে, কিন্তু কল্পনাকে প্রশ্রয় দেয়া বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়। কল্পনা, বিস্ময়, ভয়, ভক্তি, ভরসা প্রভৃতি যে বিশ্বাসের, সংস্কারের ও ধারণার উদ্ভব ঘটায়, সেগুলো কখনো বাস্তবে প্রমাণ সম্ভব নয়, কল্পনার সত্য হয়েই মনে-মগজে-মননে বিভ্রান্তি ঘটায় মাত্র। তাই অলীকে ও অলৌকিকে আস্থা এবং লৌকিকে ভরসাহীনতা মানুষকে জীবনপথে দিশেহারা করে জীবনযাত্রায় আশা-নিরাশা-হতাশাজাত দুঃখ-যন্ত্রণা-অনুশোচনা বাড়ায়, সুখ-স্বস্তি-শান্তি-আনন্দ বিনষ্ট করে।

অতীত ও ঐতিহ্যমুখী অসমর্থ, অদক্ষ, অয্যেগ্য মানুষ কখনো আধুনিক মানুষ হতে পারে না। সে জীবনে বিজ্ঞানমনস্কতা, যুক্তিবাদিতা ও উপযোগচেতনা অর্জন করে উপযোগরিক্ত ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচার-আচরণ বর্জন করার যোগ্যতা আয়ত্ত করতে অসমর্থ থাকে। ফলে আশৈশব শ্রুত, লব্ধ ও প্রজন্মক্রমে প্রাপ্ত ঐতিহ্যে-বিশ্বাসে-সংস্কারে-ধারণায় লালিত যাপিত জীবনে তার কোন মানসোৎকর্ষ ঘটে না। সে মনের, মগজের, মননের অনুশীলনে, যুক্তি-বুদ্ধিযোগে বিবেক যাচাইয়ে থাকে অজ্ঞ ও উদাসীন। তার মন-মগজ-মনন থাকে বন্ধ্যা। এ মানুষের সংখ্যা আজকের পৃথিবীর সাড়ে পাঁচশ কোটি মানুষের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যে নারী-পুরুষ মিলিয়ে পাঁচশ উনপঞ্চাশ কোটিরও বেশি হয়তো। তাই পৃথিবীর সর্বত্র মানুষের সমাজ জ্ঞান-বিজ্ঞান-ইতিহাস-দর্শন-সমাজবিজ্ঞান এবং সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি প্রভৃতির এতো চর্চা ও উৎকর্ষ সত্ত্বেও এখনো প্রাণীর মানব নামের প্রজাতিরূপেই রয়ে গেছে, মানবতায়, মানবিকগুণের বিকাশে স্বভাবে প্রবৃত্তিজিৎ হয়ে উঠতে পারেনি। এখনো অধিকাংশ মানুষ আবেগ ও লাভ-লোভ-স্বার্থ-ভোগ তাড়িত ও চালিত জীবন যাপন করে। একারণে আজো মানুষের মতো প্রতিহিংসাপরায়ণ ঈর্ষী হিংস্র কোন প্রাণী পৃথিবীতে নেই। ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক জীবনে তাই মানুষ আজো প্রায় সার্বক্ষণিকভাবে কারুর না-কারুর সঙ্গে ঈর্ষায়, হিংসায়, ঘৃণায়, শত্রুতায় নিষ্ক্রিয়-নীরবতায় জাগ্রত জীবন যাপন করে এবং যথাপ্রয়োজনে যথাসময়ে যথাস্থানে ও যথাপাত্রে বিবাদে-বিরোধে, পীড়নে-শোষণে, কাড়ায়-মারায়-হানায়, দাঙ্গায়, লড়াইয়ে এবং রাষ্ট্রিক পর্যায়ে যুদ্ধে লিপ্ত থাকে। আজ গোটা পৃথিবীর সর্বত্র ব্যক্তিক, পারিবারিক, প্রাতিবেশিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শাস্ত্রিক, আচারিক ও রাষ্ট্রিক জীবন মোটামুটি একই রূপ, অবশ্য গুণে-মানে-মাপে-মাত্রায় পার্থক্য রয়েইছে। কিন্তু তাতেও নির্বিরোধ, নির্বিবাদ, নিরুদ্রব, নিরাপদ, নির্বিঘ্ন, নিশ্চিন্ত, জীবনযাপন সহজে সম্ভব হয় না অবিচ্ছিন্নভাবে। এবং এক্ষেত্রে 'একে নষ্ট করে, সবে দুঃখ পায়'। এ আপ্তবাক্যও আক্ষরিকভাবে বাস্তবে সত্য হয়ে ওঠে।

এ যুগ যে বিজ্ঞানের প্রসাদ প্রযুক্তির ও প্রমাণের, এ কাল যে বৌদ্ধিক ও যৌক্তিক উপযোগচেতনার, এ সময় যে সমকালীন জীবননীতির, নিয়মের ও পদ্ধতির অনুগামী ও অনুগত—এ তত্ত্বে, তথ্যে ও সত্যে আস্থা স্থাপনে যেই ব্যর্থ বা অসমর্থ হবে, সেই কালানুগ জীবনযুদ্ধে পরাজিত ও বিধ্বস্ত হবে, তাকে সন্দেহ করা বৃথা এবং বাতুলতাও।

শোষণপুষ্ট বৈষম্য কণ্টকিত বিদ্যমান শ্রেণীবিন্যস্ত সমাজে সুখ-শান্তি-স্বস্তি তো চিরকালই অনায়ত্ত থাকবে। কাজেই শাস্ত্রিক কৃপা-করুণা-দয়া-দাক্ষিণ্য প্রভৃতিরূপ দুস্থ ও নিঃস্ব মানবতার হিতৈষণা কি বৈষম্যমুক্ত কেবল নির্বিশেষ মানুষচেতনাঋদ্ধ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু করতে পারে? কাজেই সমাজ পরিবর্তনের জন্যে আশৈশব উদ্ভূত ও পল্লবিত লালিত দৃঢ়মূল বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণামুক্তি আবশ্যিক ও জরুরী। বিজ্ঞান ও বাণিজ্যই যে এ কালে মর্ত্যজীবন নিয়ন্ত্রক শক্তি, তা বুকে মুখে স্বীকার না করলে, কথায় ও কাজে অভিব্যক্তি না পেলে সমাজ পরিবর্তন কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় করা সহজসাধ্য হবেই না। এ জন্যে নতুন চেতনার ও নতুন চিন্তার প্রকাশ ও প্রসার প্রয়োজন।

বনজ, খনিজ, কৃষিজ উৎপাদিত ও নির্মিত পণ্য দেশে-বিদেশে বাজার পেলেই কেবল বাণিজ্যিক সাফল্য তথা আর্থিক সাচ্ছল্য আসবে, আর বিজ্ঞানের তত্ত্বে, তথ্যে, সত্যে, বিজ্ঞানপ্রসূত কৌশল-প্রকৌশল-যন্ত্র ও প্রযুক্তি এবং রোগের প্রতিষেধক ও ভোগ্য সামগ্রী প্রভৃতি যথাপ্রয়োজনে প্রয়োগই মর্ত্যজীবনে মানসিক ও মানবিকগুণের বিস্তার সম্ভব করে তুলতে পারে। এজন্যে আশৈশব আচ্ছন্ন মন-মগজ-মনন-বুদ্ধিকে সর্ব প্রকার শ্রুত, লব্ধ ও প্রাপ্ত ধারণামুক্ত করতে হবে। এবং সেই শূন্য স্থানে ঠাঁই করে দিতে হবে বিজ্ঞান-বাণিজ্যকে। মর্ত্যজীবনের যে পুঁজি-পাথেয় বিজ্ঞান ও বাণিজ্য, তা উপলব্ধি করতে হবে। এর সঙ্গে বিভিন্ন কলার নাচ-গান-বাজনা-নাটক-সাহিত্য-শিল্পের অনুশীলন যোগাবে আমাদের মনের খোরাক। হিন্দুরা 'নারিকেল'-কে ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবৃত্তির প্রতীক-প্রতিম ও প্রতিভূ মনে করে বলেই দেবতাকে ভোগ্য অর্ঘ্যরূপে পুজোর সময়ে নারিকেল নিবেদন করে। মানুষেরও পেটের ক্ষুধা এবং মনের তৃষ্ণা মেটানোর ব্যবস্থা সমগুরুত্বে করা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবশ্যিক। কিন্তু আমরা তো পূর্বলব্ধ ধারণার বন্ধনে বাঁধা। তাই বলতেই হয় এ লব্ধ জীবনধারণায় 'তুমিও বাঁধা আমিও বাঁধা। মুক্তি কোথায় বল!" পৃথিবীতে হয়তো কয়েক লক্ষ লোকই মুক্ত মনের মিলবে এ মুহূর্তে। আর সবাই বদ্ধচিত্তের।

'দরদী মানুষ' মেলা ভার

আজকালকার দিনে পৃথিবীর বড়-ছোট-মাঝারি, ধনী-নির্ধন, সাক্ষর-নিরক্ষর আকীর্ণ যে-কোন রাষ্ট্রের স্কুলে-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক মেলে, ছাত্র মেলে, অনেক বিদ্বান বুদ্ধিমান শিক্ষক-লেখক-শিল্পী-কবি-কলাস্রষ্টা ও অনুশীলক মেলে। মেধাবী মননশীল শিক্ষার্থীর সংখ্যাও কম থাকে না। তেমনি ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল, ব্যবসায়ী, সাংসদ, সাংবাদিক প্রভৃতি বিচিত্র বিদ্যার ও পেশার বুদ্ধিজীবী নামের মগজজীবী মেলে। পৃথিবী যেমন প্রাণীর মানবপ্রজাতিতে আকীর্ণ, তেমনি মানবাকৃতির প্রাণীর মধ্যে বিদ্যাবিত্ত, অর্থসম্পদ, নৈপুণ্য, নানাকাজে যোগ্য ও দক্ষ ব্যক্তির অভাব না থাকলেও অভাব থাকে বাঞ্ছিত, প্রত্যাশিত এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যার মানুষের। অর্থাৎ ন্যূনমাত্রার মানবিকগুণ, মানবতা বা মনুষ্যত্বসম্পন্ন মানুষ এতো বিরল যে পরিচিত বা আত্মীয়স্বজন না হলে তার কাছ থেকে স্বপ্রজাতির প্রাণী হিসেবে কোন সাহায্য-সহায়তা পাওয়া বিপন্ন-রুগ্ন-নিঃস্ব-নিরন্ন মানুষের পক্ষে প্রার্থনা করামাত্র পাওয়া অসম্ভব।

পৃথিবীর বহু স্থানে মনুষ্যত্ব প্রতীক, মানবতাপ্রতিম এবং মানবিকতার প্রতিভূ সেবাশ্রম, সাহায্য ভাণ্ডার, হাসপাতাল রয়েছে বটে, কিন্তু আটপৌরে ব্যবস্থা বলে তাতে হৃদয়বৃত্তির, সহানুভূতির, কৃপা-করুণা-দয়া-দাক্ষিণ্যের উষ্ণতার আভাস ক্বচিৎ কখনো কারুর থেকে মেলে মাত্র।

এ জন্যেই বিদ্যার সঙ্গে হৃদয়ের, বিবেকের, দায়িত্ব ও কর্তব্যবুদ্ধির আর মানবিক অনুভব-উপলব্ধির আনুপাতিক যোগ থাকে না বলেই শিক্ষাঙ্গনেও প্রমূর্ত মানবতা ক্বচিৎ কখনো কারুর মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায় মাত্র। লাভে-লোভে-স্বার্থপরতায় সাক্ষরে-নিরক্ষরে, অজ্ঞে-বিজ্ঞে, বিদ্বানে-মূর্খে পার্থক্য দেখা যায় না সাধারণভাবে সমাজের কোন স্তরেই। এ তাৎপর্যে আমরা বাস্তবে প্রাণিজগতেই-স্বপ্রজাতির প্রাণিজগতেই বাস করি।

আমাদের দেশেও সেই শিকাগো-উকিলের আদর্শে ও আদলে রোটারি ক্লাব গড়ে উঠেছে আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রশাখা হিসেবে অনেক অনেক কাল আগে থেকেই। এ ক্লাব শিক্ষিত ধনী-মানীদের-তাঁদের মধ্যে রয়েছেন অতি বিদ্বান উচ্চ সব পদের চাকুরে, অতি ধনী, স্ব ও সুপ্রতিষ্ঠ সব ব্যবসায়ী, কারখানাদার, সুরুচিমান, সংস্কৃতিমান, হৃদয়বান গুণগ্রাহী জিজ্ঞাসু জীবনবাদী অনেক ব্যক্তি। এখানে গণা টাকার গরীব লোক, নিম্নপদের শিক্ষিত ব্যক্তি সদস্যই হতে পারেন না। এই রোটারি ক্লাব বিদেশীর অর্থসাহায্যও পায়, সদস্যরা নিজেরাও চাঁদা দেন এবং যখনই সভা-বৈঠক করেন, সাধারণত সভা-বৈঠক-বক্তৃতা নিয়মিতই হয়, তখন তার ব্যবস্থা দেশের পাঁচতারা হোটেলেই হয় আমাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কল্পনাতীত অর্থব্যয়ে। নইলে যে ভদ্রলোকের মান-ইজ্জত যে অনন্য-অসামান্য, তা বোঝানো-দেখানো যায় না। ওটা তাঁদের স্ট্যাটাস (Status) সিম্বল-মর্যাদা-প্রতীক। তাঁরা জনসেবায় আগ্রহী। তাঁরা দুস্থমানবতার সেবায় নিয়মিতভাবে ও সুপরিকল্পিতভাবে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজে-উপকারে অর্থব্যয় করেন। কিন্তু তবু মনে হয় তাঁরা যেন ঐশ্বর্যের-পদের-পদবীর-সমাজে অবস্থানের মর্যাদা রক্ষার এবং তাঁদের অস্তিত্বের ও স্থিতির জানান দেয়ার জন্যেই এ সেবায় সাহায্যে অর্থদান করেন। এ যেন কৃত্রিম কূপার প্রদর্শনী-এর সঙ্গে হার্দিক বা বিবেকী সম্পর্ক নেই। এ যেন গরু মেরে জুতা দান। কারণ তাঁরা সব বুর্জোয়াবিলাসী মানুষ। এমনি কৃপা-করুণা-দয়া-দাক্ষিণ্য দেখান ব্যবসায়ীদের ক্লাবের লায়নস ও লায়নেসরা।

সমাজের বিভিন্ন স্তরে আমরা যাদের মধ্যে বাস করি, তাদের মধ্যে প্রত্যাশিত স্তরের মনুষ্যত্বে ঋদ্ধ ব্যক্তি নিতান্ত বিরল। বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের অজ্ঞতা ও অনরক্ষরতাদুষ্ট দরিদ্র সমাজে। তাই আমরা মানব প্রজাতির প্রাণী পাই অসংখ্য, কিন্তু তাদের মধ্যে আমাদের বাঞ্ছিত মানুষ মেলে না সহজে। তাই বলে সমাজে শহরে শিক্ষিত বিদ্বানের, ধনীর, মানীর, পদস্থ ব্যক্তির, মানে-যশে-খ্যাতিতে-ক্ষমতায়-দর্পে-দাপটে-প্রভাবে-প্রতিপত্তিতে অসাধারণ-অনন্য ব্যক্তির কোন অভাব নেই। কিন্তু এ মানুষ দিয়ে সমাজে মনুষ্যত্বের, মানবিকতার, মানবতার প্রসার ঘটে না। আমাদের দরকার নীতি-নিয়ম-ন্যায্যতা সচেতন, যুক্তিবাদী বিবেকবান হৃদয়বান মননশীল মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তির— যাঁরা সমাজের অন্য মানুষের কাছে শ্রদ্ধেয়, আকর্ষণীয় ও আদর্শ হয়ে উঠবেন এবং জনগণের অনেকেই স্বেচ্ছায় তাঁদের অনুরাগী, অনুগামী ও অনুগত হয়ে হৃদয়বৃত্তির বিকাশে, যুক্তি ও বিবেকনিষ্ঠায় চেতনার, চিন্তার ও চরিত্রের উন্নয়নে মনুষ্যত্বের, মানবিক গুণের বা মানবতার প্রসার ঘটাবে। সমাজের সামগ্রিক সামূহিক ও সামষ্টিক উন্নয়নের সহায়ক হবে। কিন্তু এ জন্যে 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী' চেতনার ও মমতার উপজাত প্রতিবেশী বা স্বজাতি-স্বজন প্রীতির উন্মেষ ও বিকাশ আবশ্যিক।

জাতিক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি

চিরকালই লোকে বিস্তর ভালো কথা বলে, সত্যসন্ধও। কিন্তু বাস্তবে লাভ-লোভ-স্বার্থের অনুগত না হলে মানে না। লাভ-লোভ-স্বার্থের অনুকূল যুক্তিই নাকি বাস্তবে যথার্থ যুক্তি, যদিও এসব লোকেও ন্যায়অন্যায়, সত্যাসত্য সম্বন্ধে সূক্ষ্ম পার্থক্য নিরূপণের শক্তি রাখে। তাছাড়া ন্যায়-অন্যায়ের, ভালো-মন্দের, সত্যাসত্যের, বিচার-অবিচারের মাপকাঠি হচ্ছে প্রবলের, বিজয়ীর ও শক্তিমানের স্বার্থের অনুকূলতা ও প্রতিকূলতা। ফলে লোকে চিরকাল নিঃস্বার্থ তত্ত্বকথা হিসেবে ভালো কথা উচ্চারণ করলেও, ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ, ঔচিত্য-অনৌচিত্য সম্বন্ধে নিঃসংশয় ধারণা পোষণ করলেও বাস্তবে স্ব স্ব লাভ-ক্ষতির তৌলে ও হিসেবে ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন দলছুট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজনীতিকরা তাদের ভাষণে-বিবৃতিতে ও কর্মে-আচরণে বোল বদলায় ও ভোল পালটায় নির্লজ্জভাবে। আগে যেসব নীতিনিয়ম-আদর্শ ও কল্যাণ কর্মের কথা বলত, এখন ভিন্ন দলে যোগ দিয়ে তার উল্টো কথা বলতে হায়া-শরম-সঙ্কোচ বোধ করে না। হয়তো ঘৃণা-লজ্জা-ভয় থাকলে, কিংবা বেহায়া-বেশরম-বেদানাই না হলে, অথবা নীতি-আদর্শ ও আত্মসম্মান চেতনা থাকলে লাভে-লোভে রাজনীতিক দল বদলায় না কেউ। অবশ্য ধনী-মানী ব্যক্তিও লাভে লোভে স্বার্থে চরিত্র হারায়। আবার নিঃস্ব লোকের মধ্যেও নীতিনিষ্ঠা, আদর্শানুসরণ ও সততা দেখা যায়। সমাজে তাই ভালো-মন্দ-মাঝারি, ঘৃণ্য-শ্রদ্ধেয়-বিশ্বস্ত-পরার্থপর প্রভৃতি সব রকমের লোক মেলে, তবে উন্নত সমাজে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের দরুন মাঝারি লোকের সংখ্যাই বেশি আর তৃতীয় বিশ্বের মতো অনক্ষর-দুস্থ-দরিদ্র সমাজে নয় কেবল, উন্নত সমাজেও ভালো লোকের সংখ্যা কম, মন্দ-মাঝারি লোকেই সমাজ আকীর্ণ। সমাজে, রাষ্ট্রে ও বিশ্বে তাই সুখ নেই কোথাও। রাষ্ট্র ও রাজনীতি-কূটনীতি থেকেই দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝানো-দেখানো সহজ যে প্রবলের স্বার্থ রক্ষণই ন্যায়। দলীয় ও সাম্রাজ্যবাদীর স্বার্থেই দুই আয়ারল্যান্ড, দুই চীন, দুই কোরিয়া, দুই জার্মানী, অস্ট্রিয়া-জার্মানী বিভক্তি, দুই ভিয়েৎনাম, দুই পঞ্জাব, দুই বাঙলা, আরব উপদ্বীপে গোত্রভিত্তিক রাষ্ট্রের উদ্ভব, কালো আফ্রিকায় গৌত্রিক দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-সংঘাত। আবার একই দলীয় স্বার্থেই-প্রবলের চাপেই অভিন্ন জার্মানী, একক ভিয়েৎনাম গড়ে ওঠে। অন্যদিকে বলকান এলাকায় চেকশ্লোভাক, স্লোনিয়া, লাটভিয়া, লিথোয়ানিয়া, যুগোশ্লাভিয়া প্রভৃতিও ভেঙে বিখণ্ডিত। জনগণ মিলতে চাইলেও দলীয় স্বার্থবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী প্রতাপে প্রবলেরা তাদের মিলনে বাধা দেয়, এ সূত্রে বার্লিনের প্রাক্তন দেয়াল এবং দক্ষিণ কোরিয়ার ছাত্র-জনতাকে উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে মিলনআন্দোলনে বাধাদান স্মর্তব্য। অন্য প্রকারের দৃষ্টান্তও রয়েছে, হাইতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পদচ্যুত প্রেসিডেন্টকে সেনা সাহায্যে স্বপদে বসিয়ে গণতন্ত্রের মহান আদর্শ সমুন্নত রাখবেই, অথচ নাইজেরিয়ায় মাসুদ আবিওয়ালাকে তার জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও সেনাযোগে স্বপদে বসিয়ে সামরিক জান্তার বিলুপ্তিতে অনীহ কিংবা অংসান সুকীকে মায়ানমাতে সরকার গঠনে সেনাযোগে সাহায্যের কথা মার্কিন সরকার ভাবে না। ইরাকে শিয়া-কুর্দীর জন্যে মার্কিন দরদের অবধি নেই। অথচ কুর্দীদের স্বাধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠ করার জন্যে জাতিসঙ্ঘ কখনো আগ্রহী হয়নি। সোভিয়েত রাশিয়া ভেঙে যাওয়ায় বৈশ্বিক রাজনীতির ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেছে। পশ্চিম এশিয়ার ও আফ্রিকার মুসলিম রাষ্ট্রগুলো তৈল সম্পদে ঋদ্ধ হয়ে বিদ্যায়-বিত্তে-বৃত্তিতে ও জ্ঞানে-বিজ্ঞানে শিক্ষায় ও উচ্চাশায় উন্নত হচ্ছে, এখন তাদের ভাবী বিপদের সুপ্ত কারণরূপে ভাবছে সতর্ক-সচেতন-স্বার্থপর য়ুরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তাই ইহুদীর কাছে ঋণী ও কৃতজ্ঞ য়ুরোপ ও যুক্তরাষ্ট্র ইসরাইলের ভাবী অস্তিত্ব নিরুপদ্রব-নিরাপদ-নির্বিরোধ ও স্থায়ী করার লক্ষ্যে আরব রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে আপোসে-সমঝোতায় সহাবস্থানের ব্যবস্থায় উঠে-পড়ে লেগেছে। যথাপ্রয়োজনে যথাস্থানে যথাকালে যথাব্যবস্থা গ্রহণই হচ্ছে নীতি। উৎখাত হওয়ার আশঙ্কায় ১৮/২০ লক্ষের সাদা লোকেরাও দক্ষিণ আফ্রিকায় ক্ষমতা ছাড়ল। রুয়ান্ডায় মার্কিন তৎপরতা নেই রাজনীতিকভাবে, কিন্তু সোমালিয়ায় ছিল।

তিব্বত সর্বপ্রকারে এবং সর্বঅর্থে ও সর্বাত্মকভাবে বিচ্ছিন্ন হলেও চীন, তিব্বত ছাড়বেই না গায়ের জোরে। তেমনি বিভিন্ন রাষ্ট্রের উপজাতি, আদিবাসী, অরণ্যবাসী অনুন্নত গোত্রগুলো আধুনিক চিন্তা-চেতনায় ও শিক্ষায় পুষ্ট হয়ে যখন শোষণ-পীড়ন-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বঞ্চনা-প্রতারণামুক্ত হতে চায়, তখন কোন সভ্য-সংস্কৃতিমান স্বাধীনতাপ্রিয় স্বাধীনতাবাদী সরকার তাদের দাবির ন্যায্যতা স্বীকারই করে না। মানুষের স্বভাব হচ্ছে, সে নিজে স্বাধীন থাকতে চায়, কিন্তু অন্যকে রাখতে চায় অধীন। যা নিজের জন্যে কাম্য মনে করে, তা অন্যের জন্যে বাঞ্ছিত বা যৌক্তিক, মনে করে না। তাই ঝাড়খন্ডবাসীরা বাঙলা-বিহার-উড়িশা-ছোটনাগপুর-মধ্যপ্রদেশব্যাপী ছড়িয়ে থাকলেও স্বায়ত্তশাসনে কিংবা স্বতন্ত্র প্রদেশে বা রাজ্যে স্বাধিকারে স্বস্থ ও স্বপ্রতিষ্ঠ হতে পায় না। আদিবাসী-উপজাতি অরণ্যবাসীরা আজো সর্বত্র শোষিত-বঞ্চিত-পীড়িত প্রতারিত। অসমের বিভিন্ন অঞ্চল কখনো জম্বুদ্বীপের-ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত ছিল না, ব্রিটিশরা অরণ্য-পর্বত-দ্বীপ-সমুদ্র সব দখল করার নেশায় মেতে উঠেছিল, তাই আমাদের অজ্ঞাত বোড়ো-নাগা-খাসিয়া-জয়ন্তিয়া-গারো-কুকি প্রভৃতি মঙ্গোলগোত্রীয় উপজাতি আদিবাসীরা জাত-জন্ম-বর্ণ-ভাষা-নিবাস-বৃত্তি-বেসাত-পোশাক-সংস্কৃতিতে ও জীবন-যাপন পদ্ধতিতে ভিন্ন হলেও তাদের ভারতসরকার, যতই দ্রোহী হোক, ছাড়বে না। শুধু সরকার নয়, ব্যক্তিমানুষও বৃত্তিপ্রবৃত্তিতে প্রভুত্বকামী, ভৃত্যবাদী। দাস-বান্দা-ভৃত্য অধীনে না থাকলে হুকুম-হুমকি-হামলা চালানোর যে উত্তম্মন্য আত্মপ্রসাদ তা উপভোগ করা সম্ভব হয় না। সবাই তাই ঘরোয়া জীবনে সন্তানদের, বয়ঃকনিষ্ঠদের উপর কারণে-অকারণে আদেশ-নির্দেশ-উপদেশ-পরামর্শের বোঝা চাপায়। রাজনীতি-কূটনীতিতে ঘরোয়াজীবনের ব্যক্তিমনোবাঞ্ছার ও চরিত্রের বা স্বভাবের প্রকট বহিস্ফুরণ রূপমাত্র। ব্যক্তি সম্পদশালী হয়ে অর্থ দিয়ে সৈন্য পুষে রাজ্য-সাম্রাজ্য গড়ে রক্তক্ষয়ী-প্রাণহরা অভিযান মাধ্যমে। কাজেই দৌরাত্ম্য-পীড়ন-হুকুম চালানো মানুষের স্বভাবজ ও স্বভাবসিদ্ধ। তাই নিজে স্বাধীন হতে চায়, কিন্তু অন্যকে স্বাধীনতা দিতে নারাজ। এ মনোভাব প্রবল বলেই জাতিসঙ্ঘে কোন রাজনীতিক অধিকার আদায়ের মীমাংসা হয় না। অথচ সেবা-সাহায্য-ত্রাণ আর আইন-শৃংখলা রক্ষার জন্যে সৈন্য দানে জাতিসঙ্ঘ অকৃপণ। আর অধীনে রাখার, আয়ত্তে রাখার, জব্দ করার কুমতলবেই শক্তিধর সাম্রাজ্যবাদীরা অর্থাৎ যুদ্ধে বিজয়ীরা 'ভিটো' দেয়ার অধিকার হাতে রেখেছে নিতান্ত অন্যায্যভাবে। তবে প্রবলের প্রয়োজন মেটানোর ব্যবস্থাই তো ন্যায় ও আইন। অবিকল গাঁয়ের সমাজের মতোই বড় বাড়ির ঘটনা হলে, তা হয় পারিবারিক বা অভ্যন্তরীণ আর গরীবের হলে তা সর্দার-মাতব্বর পঞ্চায়েতের হস্তক্ষেপের, তিরস্কারের, নাকগলানোর ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। রাষ্ট্রিক জীবনেও আমরা তা-ই দেখি। যুক্তরাষ্ট্রের, যুক্তরাজ্যের, ফ্রান্সের, জার্মানীর, রাশিয়ার, জাপানের, চীনের, ভারতের হলে, তা হয় অভ্যন্তরীণ, আর তৃতীয় বিশ্বের দুর্বল রাষ্ট্রের হলে, তা হয় সর্বজনীন হস্তক্ষেপের, তিরস্কারের, বিচারের ও হুকুম-হামলার বিষয়। শক্তিমান রাষ্ট্রগুলো পারমাণবিক মারণাস্ত্র উদ্ভাবনের, তৈরির, রাখার ও বিক্রয়ের অধিকার রাখে, কিন্তু ছোট রাষ্ট্রের উচ্চাশী হওয়ার অধিকার নেই এক্ষেত্রে, তা ইরান হোক, ইরাক হোক, ভারত হোক, পাকিস্তান হোক কিংবা উত্তর কোরিয়া হোক। দুনিয়ার ছোট রাষ্ট্রগুলো ওদের খাতক বলেও বটে, আবার দুর্বল বলেও বটে, বড় রাষ্ট্রগুলোর ধমক-ধমকি-হামলায় কোন অন্যায় দেখে না। সমাজের দুস্থ-দরিদ্র-দুর্বল ব্যক্তির ক্ষেত্রে যা সত্য ও বাস্তব, ঠিক অবিকল আচরণ রাষ্ট্রের বা সরকারের ক্ষেত্রেও আমরা আফ্রো-এশিয়া-লাতিন আমেরিকায় প্রত্যক্ষ করি। নীতি-আদর্শচেতনাহীন ধূর্ত সাহসী ব্যক্তিরূপ প্রাণী যেমন যুক্তি-বিবেকবর্জিত কাজে ও হিংস্রতায় বেপরওয়া, সমাজের শান্তিপ্রিয় জনগণের নিরুপদ্রব নিরাপদ নিশ্চিন্ত জীবনযাপনের বাধা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃত্ব ও মাতব্বরীপ্রিয় স্বার্থপর ক্ষমতালোভী রাষ্ট্রগুলোও তেমনি পৃথিবীর ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর শান্তিতে সহাবস্থানে বিঘ্ন সৃষ্টি করে অস্ত্রসমেত সব পণ্যের বাণিজ্য বাজার বিস্তৃত করে। সৃষ্টি করে অনুগত খাতক ও দালাল। তবু পৃথিবী বদলাচ্ছে। আত্মসত্তা সচেতন হচ্ছে গোষ্ঠী, গোত্র, উপজাতি, জাতি, ভাষিক, আঞ্চলিক ও শাস্ত্রিক সম্প্রদায়। অবিলম্বে ফেডারেল সরকার গঠিত না হলে পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্রই গৃহযুদ্ধে বিপর্যস্ত হয়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।

মানুষের ভবিষ্যৎ কি?

বিবিসি'র খবরে প্রকাশ রুয়ান্ডার গৌত্রিক রাজনীতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতে পাঁচ লক্ষ লোক মাত্র ছয় সপ্তাহের মধ্যেই নিহত হয়েছে। হত্যাকাণ্ড চলছে সুপরিকল্পিতভাবেই। আদিম প্রাণী প্রজাতির মানব নামের প্রাণীরাই কশাইয়ের মতোই নির্বিকার চিত্তে নারী-শিশু-বালক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে গরু-ভেড়া-ছাগল-মোরগ হত্যার ছুরি দিয়েই বাড়ি বাড়ি গিয়ে সাবাইকে নির্দেশ মতো শুইয়ে পড়তে বাধ্য করছে আর 'জবেহ্' করে চলেছে চরম ও পরম উল্লাসে। রুয়ান্ডাও য়ুরোপীয় ফরাসী শাসকের উপনিবেশ ছিল। সেখানেও প্রতীচ্য শিক্ষায় শিক্ষিত এবং গণতন্ত্রে আস্থাবান লোক স্বল্প সংখ্যায় হলেও রয়েছে। সেখানেও শিক্ষিত লোক দিয়েই সরকার চলে, সেখানেও ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, উকিল, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবী নগণ্য সংখ্যায় হলেও রয়েছে। ১৯৯৫ সনে সেখানেও রয়েছে শাস্ত্রমানা, সমাজবদ্ধ, সাক্ষর, শিক্ষিত একটা আধুনিক শহুরে শিক্ষিত-ধনী-মানী লোক এমনকি রুয়ান্ডায় বিভিন্ন রাষ্ট্রের দূতাবাসও আছে। আছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও পণ্য উৎপাদন কারখানাও। আর এ রাষ্ট্র জাতিসঙ্ঘের সদস্যও। জাতিসঙ্ঘ বাহিনীর একটা ক্ষুদ্র দলও নিষ্ক্রিয় হলেও উপস্থিত আছে। তবু এ অমানবিক বীভৎস নরহত্যাকাণ্ড চলছে।

তা হলে এতোকালের শাস্ত্র, শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, আদর্শ, সভ্যতা, সংস্কৃতি মানুষকে কি দিল? শত শত মহাপুরুষ পৃথিবীতে মানুষকে হাজার হাজার মহৎ কথা শোনালেন, হাজার হাজার আপ্তবাক্যও জানা-শোনা রয়েছে সবার। ভালো হও, ভালো কর, অপরের ভালো চাও। মানুষের প্রতি, পরিবারের প্রতি, প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন কর। মানুষের সেবায় সাহায্যে এগিয়ে এস। এমন কি 'আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে আসে নাই কেহ অবনী 'পরে/সকলের তরে সকলে আমরা/ প্রত্যেক আমরা পরের তরে।' প্রভৃতি হাজার হাজার অতি মূল্যবান, গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাত্যহিক জীবনে প্রযোজ্য দেশনাও হাজার হাজার বছর ধরে আদিবাসী-উপজাতি-বুনো-বর্বর-ভব্য-সভ্য সংস্কৃতিমান-শাস্ত্রশাসিত সমাজে, আরণ্য-পার্বত্য ও সমতলবাসী মানুষের মধ্যে চালু রয়েছে। কিন্তু তবু মানুষের আদিম হিংস্র শ্বাপদ স্বভাব পরিবর্তিত ও উন্নত হল না। মানবিকগুণের প্রত্যাশিত ও প্রয়োজনীয় মাত্রায় বিকাশ হল না। আজকের যন্ত্র-নির্ভর জীবনে ও জগতেও আজকের জীবনে বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ-সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ শিক্ষিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষ, সরকার ও রাষ্ট্র এখনো নরহত্যায় উল্লাস বোধ করে, যেমন হত্যাপ্রবণ লোকেরা ছিপে মাছ ধরে, বন্দুকে দিয়ে পশু-পাখি হত্যা করে অমানবিক তৃপ্তি, তুষ্টি ও হৃষ্টি অনুভব করে। ঐহিক জীবনে নিন্দা, অপরাধ, পাপ এবং পারত্রিক জীবনে নরকাগ্নি ভীতিও তাদের অপকর্ম থেকে বিরত রাখতে আগেও কখনো পারেনি, প্রগতিশীল প্রাগ্রসর বিজ্ঞানমনস্ক মানববাদী ও মানবতাপ্রিয় মানুষের সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও মানুষের মধ্যে নানা প্রতিবেশে ও বিভিন্ন কারণে শ্বাপদ স্বভাব প্রকট হয়ে বীভৎস রূপ ধারণ করে। তা হলে আমরা যে কথায় কথায় মনুষ্যত্বের কথা বলি, সভ্যতার কথা বলি, আদর্শের কথা বলি, বিবেকের কথা বলি, সেগুলোর আমাদের জীবনে ভূমিকা কি, প্রভাব কি? ইরাকে বুশ-সরকারের হত্যাকাণ্ড, কম্বোডিয়ায়, এ্যাঙ্গোলায়, আফগানিস্তানে গৃহযুদ্ধ, বসনিয়ায় সার্বদের নির্বিচারে নরহত্যা, ইয়ামেনে-এডেনে, চেচনিয়ায় হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি কি মানুষের মনুষ্যত্বের প্রতি আস্থা হারানোর কারণ হয়ে দাঁড়ায় না? এডেনে-সোমালিয়ায় শরণার্থীরাও নির্মম হত্যার শিকার হচ্ছে। দুনিয়ার সর্বত্র গৌষ্ঠীক, গৌত্রিক, জাতিক, মতবাদী সাম্প্রদায়িক, রাষ্ট্রিক দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-রোষ চালিত হয়ে সর্দারের, রাজার, রাষ্ট্রপতির, সরকারের, রাষ্ট্রের নির্দেশে চিরকাল মানুষ নরহত্যা করেছে, করছে, করবেই যদি, তা হলে আর শাস্ত্রের, নীতিকথার, সভ্যতার, সংস্কৃতির, বিবেকের ও মানবতার গৌরব-গর্ব করার সার্থকতা কি? এ প্রশ্নের জবাব খুঁজতে হবে গোটা পৃথিবীর মানববাদী মানবিকতার প্রসারকামী, মানবিকগুণের অনুশীলনকারী মন-মগজ-মনন-মনীষাধিকারী মানবপ্রেমী বিবেকবান শিল্পী-সাহিত্যিক-দার্শনিক-ঐতিহাসিক-সমাজবিজ্ঞানী প্রমুখ সর্বশ্রেণীর মগজী মানুষকে।

শাস্ত্র, শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান, নাচ-গান-অভিনয়, রুচি, সৌন্দর্যচেতনা আমাদের কি দিল, কি দিতে পারে, কি দেবে? মানুষকে মানুষ বলে, স্বজাতি ও স্বজন বলে, আত্মীয় বলে, সৌজন্যে, সংযমে, সহিষ্ণুতায় গ্রহণে-বরণে শান্তিতে সহযোগিতায় সহাবস্থানের অঙ্গীকারে বিশ্বের মানুষ কবে স্বেচ্ছায়-বিবেকী তাড়নায় সম্মত হবে?

ন্যায্য অধিকার আদায়েও সংগ্রামের বিকল্প নেই

সুপ্রাচীনকাল থেকেই মানুষকে স্বপ্রজাতি বলে গ্রহণ-বরণ করার ঐতিহ্য ও উদারতা ভারতীয় সমাজে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তাই আজীবিক-চার্বাক-বৌদ্ধ-জৈনদ্রোহ দেব-দ্বিজ-বেদের প্রভাব বিনষ্ট তো নয়ই, হ্রাসও করতে পারেনি। যখন বৌদ্ধসমাজ তান্ত্রিকতার কবলিত হয়ে বিকৃত হল, তখন শঙ্করাচার্য বৌদ্ধ সন্ন্যাসের ও মায়াবাদের আদলে, আর বিহারের বদলে বিমূর্ত মঠ ও লয়প্রাপ্ত বৌদ্ধ-বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা ও আচার-আচরণ আর নির্বাণ সদৃশ ব্রহ্মলয়প্রাপ্তি প্রভৃতিকে তাঁর নতুন মতের উৎস ও ভিত্তি করলেন, তখন ক্রমে গোটা ভারতেই বৌদ্ধবিলুপ্তি ঘটল। বর্ণে বিন্যস্ত সমাজ নতুন করে ব্রাহ্মণের নেতৃত্ব কর্তৃত্ব ও পদাশ্রিত হল। যেহেতু ব্রহ্মার বা ব্রহ্মের আসমানী অভিপ্রায়েই ব্রাহ্মণই প্রণম্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মর্ত্যদেবতা এবং অন্যরা ব্রাহ্মণ সেবক শূদ্রমাত্র, তখন আস্তিক তথা শাস্ত্রের বিধি-নিষেধের অপৌরুষেয়তায় আস্থাবান ঈশ্বরবাদী মানুষের পক্ষে দ্রোহ করার, প্রশ্ন করার অধিকার রইল না মানসিক ও সামাজিকভাবে। এ জন্যেই ইংরেজ আমল থেকে এ কালের শিক্ষিত স্পৃশ্য কিংবা অস্পৃশ্য শূদ্রের এবং সৎশূদ্রের ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব ও দ্বিজত্ব তথা দেবত্ব অস্বীকৃতির কথা মনে ঠাঁই পায় না। তবে তারা বিদ্যায়-বিত্তে-বেসাতে এবং জীবন-জীবিকার সর্বক্ষেত্রে অধিকার দাবি করছে মাত্র। এবং সে-দাবি মানতে এ যন্ত্রযুগে সংহত বিশ্বের আন্তর্জাতিক জীবন-চেতনার প্রভাবে ব্রাহ্মণেরা ও সৎশূদ্রেরা মানতে বাধ্যও হচ্ছে, অনেক ক্ষেত্রে আন্দোলনের ও রক্তপাতের মাধ্যমে।

গোলটেবিল বৈঠকে রামজে ম্যাকডোনাল্ড যখন মুসলিমদের দাবি অনুসারে মুসলিমদের জন্যে স্বতন্ত্র নির্বাচন, চাকরির হার প্রভৃতি বিবেচনা করছিলেন, তখন তিনি হিন্দু তফসিলিদের জন্যেও একই ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা বলেছিলেন। বর্ণহিন্দুরা তা হলে গোটা ভারতেই ঊনজন হয়ে যাবে–এ আশঙ্কায় মহাত্মা গান্ধী তখন তখনই অনশনে আত্মহত্যার হুমকি উচ্চারণ করেন এবং পরে তিনি এ অনশনের জন্যে ঈশ্বর-আদিষ্ট হয়েছেন বলেও প্রচার করলেন, ব্রিটিশসরকার গান্ধীকে এবং বর্ণহিন্দুকে আসন্ন ও আপন্ন বিপদ-বিনাশ থেকে বাঁচিয়ে দিলেন। তবে গান্ধীজি 'হরিজন' তত্ত্ব ও হরিজনপ্রীতি যোগে বর্ণহিন্দুর ও ব্রাহ্মণের জন্যে বর্ণে বিন্যস্ত সমাজের সুযোগ-সুবিধে ও প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রায় চিরন্তন করে রাখলেন। ভীমরাও রামজী আম্বেদকর গান্ধীর সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করেও হরিজনদের বর্ণহিন্দুর মতো নির্বিশেষ 'মানুষ' স্তরের প্রাণীরূপে বর্ণহিন্দুর স্বীকৃতি আদায় করতে না পেরে রাজনীতিকভাবে বৌদ্ধ হলেন। ডক্টর আম্বেদকরও ব্রাহ্মণীকে পত্নী করেও মর্যাদার আসন পেলেন না। বরং চর্যাপদের ভাষায় 'আজ ব্রাহ্মণী চণ্ডালী' ভৈলি, নিস সোয়ামী চণ্ডাল লেলি।' অর্থাৎ তাঁর স্ত্রী জাত হারালেন, তিনি জাতে উঠলেন না।

গান্ধীজি এভাবে যুগ-প্রভাব, যুগের দাবি ঠেকিয়ে দিলেন। রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন কালান্তর ঘটছে, বর্ণহিন্দুর মন-মত-আচরণ বদলানো দরকার নিজেদের স্বার্থেই। তাঁর 'অপমান' কবিতা তারই প্রমাণ। তেমনি উঠতি শিক্ষিত মুসলিমদের কিছু চাকরি-বাকরি ছেড়ে দিয়ে ঊনজন বাঙালী হিন্দুদের সম্ভাব্য ও অমোঘ মুসলিম দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-সংঘাত থেকে ভাবী বিপন্মুক্ত রাখতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু নমঃশূদ্র কিংবা মুসলিম কেউই বর্ণহিন্দুর থেকে তাদের ন্যায্য হিসসা আপোসে আদায় করতে পারেনি।

ফলে ভারতে আদিবাসীরা উপজাতিরা-জনজাতিরা অচ্ছুৎরা ও মুসলিমরা এবং বাঙলাদেশেও আদিবাসীরা, উপজাতিরা ও হিন্দুরা স্বাধিকারে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও স্বপ্রতিষ্ঠ হতে পারছে না। এমনকি ঘৃণা-অবজ্ঞামুক্তিও ঘটেনি তাদের।

বর্ণে বিন্যস্ত হিন্দুসমাজ সূক্ষ্ম ও উঁচু মানের ব্রাহ্মণ্যবুদ্ধির প্রয়োগে আসমানী স্রষ্টার হুকুমে গড়ে ওঠায় আস্তিক অচ্ছুতের পক্ষে দ্রোহ বা অমান্য করা সম্ভব হচ্ছে না। এ জন্যে একে মার্কসীয় সংজ্ঞায় শ্রেণীদ্বন্দ্ব বলে ব্যাখ্যা করা যাবে না। এ হচ্ছে অপৌরুষেয় শাস্ত্রসম্মত সমাজবিন্যাস ও কর্ম-কর্তব্য বণ্টন ব্যবস্থা। আস্তিক বিদ্বান হিন্দু এ জন্যে এর উদ্ভব ও মহিমা বয়ানে মুখর। তবে আধুনিক বিকৃতি তাঁদের বিচারেও নিন্দনীয়।

মূলত এরও উৎস দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ এবং শ্রেণীস্বার্থসম্পৃক্ত। এতো কেবল হিন্দুদের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল বা আছে, তা নয়। শিখদের মধ্যেও রয়েছে তফসিলি সম্প্রদায়। চৈতন্যদেবের 'প্রেমবাদ' ভিত্তিক সাম্যের সমাজ বৈষ্ণবেও রয়েছে বৃন্দাবনী ষড়গোস্বামী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রচিত শাস্ত্রের প্রভাবে ও প্রয়োগে জাতপাতের ছোঁয়া-ছুঁইর বৈষম্য ও ঘৃণা। 'জাতবৈষ্ণব' তো মূলত বর্ণহিন্দু বৈষ্ণবদের অস্পৃশ্যই।

এ প্রভাব তুর্কী-মুঘল আমলে নিম্নবর্ণের, নিম্নবর্গের, নিম্নবিত্তের ও বিভিন্ন তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র পেশাজীবী হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম সমাজেও থেকে গিয়েছিল— সাম্যবাদী মুসলিম সমাজে আজো তার লেশ ও রেশ বিলীন হয়ে যায়নি। আতরাফ-আজলাফ-আশরাফভেদ ছিল ও আছে বাউল-ফকিরেরা, জুলাহ্‌রা, নিকেরীরা, কুমারেরা, প্রাক্তন ক্রীতদাস বংশীয়রা শুধু দরিদ্র, দুস্থ নিঃস্ব নিরন্ন ছিল না, অভিজাতদের কাছে ঘৃণ্যও ছিল। অভিজাতদের সঙ্গে তাদের কোন সামাজিক বা বৈবাহিক সম্পর্ক-সম্বন্ধ ছিল না। আজো নেই। সর্দার, মণ্ডল, মোড়ল, বিশ্বাস, সরকার, কাগজী, মুলঙ্গী, মুজারী, জুল্‌হা, কশাই, কাহার প্রভৃতি কুলবাচি বা পদবী দেশী মুসলিমদেরই পরিচায়ক। Robert orme তাঁর Historical Fragments of Mugal Empire গ্রন্থে বলেছেন : The moors of Indostan may be divided into two kinds of people differing in Every respect. Under the first reckoned the descendants of the Conquerors, The second rank of moors comprehends all the descendants of converted Gentoos (Hindus), a miserable race as none but the most miserables of the Gentoos Castes are capable of Changing their religion. কাজেই তুর্কী-মুঘল আমলেও ইসলাম বরণ করে ক্বচিৎ কেউ বিদ্যায়-বিত্তে-বেসাতে-অর্থে-সম্পদে ঋদ্ধ হতে পেরেছিল। যেমন বৌদ্ধ হয়েও অচ্ছুৎরা কোন সুবিধে-সুযোগ পাচ্ছে না সেক্যুলার ভারতে। গোপাল হালদার এ যুগেও উক্ত সব দীক্ষিত মুসলিমদের অবস্থা নিঃসংশয়ে অনুমান করতে পেরেছিলেন। কারণ এখনো তার পুরো বিলুপ্তি ঘটেনি। গোপাল হালদার বলেছেন "যতই ধর্ম ক্ষেত্রে সাধারণ মুসলমানকে সমান দেখুক, বৈষয়িক ব্যাপারে দরিদ্র মুসলমান নিম্নশ্রেণী হিন্দু নিম্নশ্রেণীর মতই নিচের তলায় পড়ে থাকত।' (মুসলমান বাঙালির কালচার, গোপাল হালদার)

অতএব লাভ-লোভ-স্বার্থের ব্যাপারে জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-নিবাসের অভিন্নতার ও আত্মীয়তার কোন গুরুত্ব নেই, স্বদেশী-স্বধর্মী-স্বভাষী চেতনাও স্বার্থবোধের কাছে তুচ্ছ।

এ যন্ত্রযুগে ও যন্ত্রজগতে জনপদ রূপ সংহত পৃথিবীতে আজো শ্রেণী-দ্বন্দ্ব প্রবল। কেননা এ প্রাণীসুলভ জিগীষা ও জিঘাংসাপ্রসূন। তাই সমাজ পরিবর্তনের জন্যে, শোষিত মানবতার মুক্তির জন্যে, গণমানবের ভোগে-উপভোগে-সম্ভোগে জন্মগত ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্যে সঙ্ঘবদ্ধ সংগ্রাম, বিপ্লব কিংবা আন্দোলন অথবা রক্তক্ষরা প্রাণহরা লড়াই আবশ্যিক ও জরুরী। এ সূত্রেও স্মর্তব্য যে সাম্প্রদায়িকতা হচ্ছে কায়েমী স্বার্থবাদীদের অবস্থা ও অবস্থান স্থিতিশীল ও স্থায়ী রাখার হাতিয়ার মাত্র। তারা তাদের স্বার্থেই কেবল বিজ্ঞান ও বাণিজ্য কাজে লাগায়। জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-নিবাসের পার্থক্যচেতনা জাগিয়ে রেখে বিভেদের দেয়াল পাকাপোক্ত রাখে। অতএব 'দুনিয়ার শোষিত-শাসিত স্বাধিকার বঞ্চিত মানুষ এক হও।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যক্তি স্বাধীনতা : এক অলীক ধারণা

সাধারণ নিঃস্ব নিরন্ন অজ্ঞ অনক্ষর দরিদ্র নির্বিশেষে মানুষ স্বদেশীর, স্বধর্মীর, স্বভাষীর ও স্বজাতির শাসন কায়েম হলেই বা থাকলেই রাষ্ট্রকে এবং নিজেদের স্বাধীন বলে জানে, বোঝে ও মানে। আসলে কিন্তু শাসক-শাসিত দু'টো আলাদাজাত বা শ্রেণী। এদের মধ্যে কোন মিত্রতার, বন্ধুত্বের, সখ্যের বন্ধন বা সম্বন্ধ-সম্পর্ক নেই। শাসিত জনমাত্রই অর্থাৎ যে-মানুষ কখনো শাহ-সামন্ত কিংবা গণতান্ত্রিক অথবা সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রক্ষমতার তথা সরকার পরিচালনার অধিকার পায় না, পাবে না, চায় না, চাইবে না, সে-মানুষ সারা জীবনই তথা জন্ম-জীবন-মৃত্যু অবধি শাসক-প্রশাসকগোষ্ঠীর হুকুম-হুমকি-হুঙ্কার-হামলার শিকার হয়েই, অন্তত আসন্ন আপন্ন সম্ভাব্য হুকুম-হামলার শঙ্কা-ত্রাসের মধ্যে জীবনযাপন করে।

কাজেই এ তাৎপর্যে আমরা যারা কখনো শাসন ক্ষমতা পাই না, পাব না, আমরা নিজেদের স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক বলে যে পরিচয় দিই— তাতে কোন সত্য নেই, কেবল আবেগের সাড়ম্বর নিছক আস্ফালন ও নির্বোধের আত্মশ্লাঘার তৃপ্তি, তুষ্টি ও হৃষ্টি থাকে মাত্র। এর উৎস ব্যক্তি সত্তার মূল্য-মর্যাদাচেতনার অনুপস্থিতি আর গোত্রিক, গৌষ্ঠীক, ভাষিক, বার্ণিক, শাস্ত্রিক, আঞ্চলিক, নৈবাসিক আত্মীয়তাবোধই।

স্ব-আয়ত্তের মধ্যে না হলে বা না থাকলে কিছুই 'স্ব'-এর অধীন হয় না। কাজেই এ তাৎপর্যে ব্যক্তি সমাজে যূথবদ্ধ জীবনের অনুগত বলে কখনো কোন ক্ষেত্রেই স্বাধীন থাকতে পারে না। একের স্বৈর বা স্বেচ্ছাচার অপরের অধিকারে হামলার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন আমার জামা-কাপড় ময়লা ও দুর্গন্ধযুক্ত হলে আমার পাশের লোকের অস্বস্তির কারণ হয়ে ওঠে। অবশ্য আমি যদি সুন্দর সুগন্ধ পোশাক সজ্জিত থাকি, তা হলে তার আরাম আনন্দেরও কারণ হতে পারি, অনুকূল সময়ে আমার সুকণ্ঠের গান অন্যের আনন্দ যোগায়, আবার আমার ঘরের উচ্চকণ্ঠ ঝগড়া হৈ চৈ প্রতিবেশীর বিরক্তির ও যন্ত্রণার কারণও হয়। তা হলে ব্যক্তির পরিব্যক্ত ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচার-আচরণ যদি চোখ-কান-নাক-মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের পক্ষে পীড়াদায়ক না হয় বরং চিত্ত সুখকর হয়, তা হলে তাতে কারুর আপত্তি থাকে না, এ অংশটুকু নির্বিরোধে-বির্বিবাদে নির্বিঘ্নে করা যায়। কেননা এসব কর্মাচরণ ক্ষতিকর নয় কারো পক্ষে। পরের সন্তানকে-রাস্তার অপরিচিত শিশুকেও চকলেট দিয়ে আদর করা চলে, কিন্তু নিজের সন্তানের প্রতিও নিষ্ঠুর হওয়া অপরাধ। অতএব, মানুষের কোন ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ সহ ও সমস্বার্থে, সংযমে, পরমত ও পরআচরণ সহিষ্ণুতায়, সামবায়িক সহযোগিতায় সৌজন্যে ও স্বার্থে স্বাধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠ থেকে নীতিনিয়মের রীতিরেওয়াজের প্রথাপদ্ধতির সীমা লঙ্ঘন না করে অপরের সঙ্গে লেনদেন করার অবাধ অধিকারকেই আমরা সাধারণ ও স্থূল অর্থে— 'ব্যক্তি স্বাধীনতা' বলে অভিহিত করতে পারি। অন্য কথায় দৈশিক, সামাজিক, শাস্ত্রিক, রাষ্ট্রিক, আচারিক, আচরণিক নীতি-রীতি-বিধি-নিষেধের আনুগত্য ও অনুগামিতাই হচ্ছে ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিসর, পরিধি ও সীমা, এর লঙ্ঘন বা ব্যতিক্রমই হচ্ছে দ্রোহ ও অপরাধ, যা শাস্ত্র, সমাজ ও সরকার শাস্তিযোগ্য বলে জানে, বোঝে ও মানে। এ কালে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু ব্যক্তির স্বাধিকারের ও স্বাধীনতার সীমান্ত বিস্তৃত হয়েছে দৈশিকভাবে না হলেও আন্তর্জাতিকভাবে। যে-কোন ব্যক্তি দেশ-কাল-শাস্ত্র-সমাজ-সংস্কৃতি বিষয়ক নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ, প্রথা-পদ্ধতি বিরোধী নতুন চেতনার, নতুন চিন্তার, নতুন মতের, নতুন পথ-পদ্ধতির, নতুন সিদ্ধান্তের, নতুন জিজ্ঞাসার, নতুন আবিষ্কারের, নতুন সত্যের উচ্চারণের, প্রকাশের, মুদ্রিত আকারে প্রচারের অধিকার তথা স্বাধীনতা জাতিসঙ্ঘ সনদ অনুসারেই মৌলমানবিক অধিকার হিসেবেই পেয়ে গেছে কাগজেপত্রে। অবশ্য বিশ্বের সর্বত্র বিশেষ করে অজ্ঞতা-অনক্ষরতাদুষ্ট রক্ষণশীল গতানুগতিক নীতি-নিয়মে, রীতি-রেওয়াজে, প্রথা-পদ্ধতিতে অভ্যস্ত তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোতে এসব অধিকার বাস্তবে প্রয়োগ আজো অসম্ভব তো বটেই, এমনকি অধিকারের দাবিও শাস্ত্রে-সমাজে নয় শুধু, সরকারের আইনেও মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ। পাকিস্তান প্রভৃতি শাস্ত্রিক বিধি-নিষেধ অনুগ আইনে শাসিত রাষ্ট্রে জাতিসঙ্ঘের মৌলমানবাধিকার সনদ গ্রাহ্য নয়। কাজেই ব্যক্তিস্বাধীনতা হচ্ছে এক অলীক ধারণা। একে বাগ্বিধি প্রয়োগে সোনার পাথর বাটিও বলা চলে।

অতএব ব্যক্তিস্বাধীনতা হচ্ছে স্বাধিকারে বিচরণ— কোন প্রকারেই কোন ক্ষেত্রেই অন্যের উপর মানসিক, শারীরিক, আর্থিক, জুলুমের কারণ না হওয়া। কেউ কোন বিষয়ে কারুর ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচার-আচরণ সম্বন্ধে আপত্তি ও অভিযোগ জানালেই বুঝতে হবে যৌথ তথা সামাজিক পারিবারিক জীবনে ব্যক্তি তার অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করেছে। এতেই বোঝা যায় যৌথ জীবনে ব্যক্তির ব্যক্তিগত বা প্রাইভেট জীবন বলে আসলে কিছু নেই।

AMARBOI.COM

সহিষ্ণুতার সংস্কৃতি

বিদ্বানেরা বলেন সংস্কৃতিমানতার পরিচয় সংযমে, পরমত—পরকর্ম ও পরআচরণ সহিষ্ণুতায়, সৌজন্যে ন্যায্যতায় ও বিবেকানুগত্যে। সংস্কৃতিমান দলবদ্ধ বা যূথবদ্ধ সামাজিক জীবনে সম ও সহস্বার্থে, সংযমে, সহিষ্ণুতায় স্বাধিকার ও অনধিকার চেতনা নিয়ে সামবায়িক সহযোগিতায় ও বিনিময়ে সহাবস্থানের দায়বদ্ধতা স্বীকার করে। অতএব সংস্কৃতির বা কালচারের প্রথম ও শেষ কথা এবং প্রথম ও প্রধান লক্ষণ হচ্ছে সংযম, সহিষ্ণুতা, সৌজন্য, যুক্তিনিষ্ঠা, ন্যায্যতা ও বিবেকবানতা।

মধ্যযুগে য়ুরোপে গির্জার পাদরীরা অত্যন্ত অসহিষ্ণু, ক্ষমতাপ্রিয়, বদ্ধচিত্তের জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-বিবেকরিক্ত নিষ্ঠুর ধর্মধ্বজী শাস্ত্রের ধারক, বাহক, প্রচারক ও রক্ষক ছিল। রাজারাও তাদের এই দোর্দণ্ড প্রতাপে ও শাস্ত্রিক দৌরাত্ম্যে থাকতেন সদা কম্পমান। কিন্তু একদিন রাজারা, সদাগরেরা আর বিদ্বানেরা হলেন দ্রোহী। চার্চের জারিজুরি শেষ হল আঠার শতকে। চার্চগুলো ধন-মান হারিয়ে হল রাজার, সরকারের ও জনগণের কৃপাজীবী। য়ুরোপে জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেকের জয় হল। জ্ঞান-প্রজ্ঞা-যুক্তি-বিবেকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলোতে আলোকিত হল শিক্ষিত সংস্কৃতিমান নতুন চেতনার, নতুন চিন্তার, মানুষের চিত্তলোক। তারা ঋদ্ধ হতে লাগল বিজ্ঞানের তত্ত্বে, তথ্যে ও সত্যে। দেশ ও সম্পদ আবিষ্কারে, নবনব যন্ত্রের ও কৌশল-প্রকৌশল উদ্ভাবনে নানা জ্ঞান-প্রজ্ঞা-চেতনাঋদ্ধ সৃষ্টিতে য়ুরোপের চারশ বছর ব্যাপী ক্রমবিকাশমান রেনেসাঁস পেল পূর্ণতা শিক্ষিতদের মনে-মগজে-মনীষায়। য়ুরোপ আবিষ্কারে-উদ্ভাবনে-সৃষ্টিতে, সংস্কৃতিতে, বিজ্ঞানে, দর্শনে, সাহিত্যে, মনুষ্যত্বে, মানবসত্তার মূল্য ও মর্যাদাবোধে গোটা পৃথিবীর আদর্শ, অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় হয়ে উঠল। য়ুরোপের কোন কোন অঞ্চলে, রাজ্যে, রাষ্ট্রে মানুষ আঠারো শতকের শেষপাদ থেকে স্ব স্ব চিন্তা, মত, মন্তব্য ও সিদ্ধান্ত প্রকাশের, মুদ্রণের ও প্রচারের অবাধ স্বাধীনতা পেল। ভলতেয়ারের উচ্চারিত 'I disapprove of what you say, but I will defend to death your right to say it'

আজ য়ুরোপ বিজ্ঞান ও দর্শন চর্চার প্রসাদে আবিষ্কারে, উদ্ভাবনে, সৃষ্টিতে, প্রকৌশলে, প্রযুক্তিতে, যন্ত্রে ও মনে-মগজে-মননে-মনীষায় অনেক অনেক এগিয়েছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানে আর মারণাস্ত্র নির্মাণে তারা অতুল্য। রোগ নিবারণে, আয়ুবৃদ্ধিতে, মৃত্যুরোধে যেমন তাদের অবদান অসামান্য, তেমনি একসঙ্গে লক্ষ-কোটি লোক হত্যার যন্ত্র-অস্ত্রও তাদের মগজী শক্তির ও অধ্যবসায়ের সাক্ষ্য। আবার 'নভ' মণ্ডলের অব্ধি-সন্ধি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা ও গবেষণা তাদের উদ্যমের-উদ্যোগের ও মহামনীষার প্রমাণ।

প্রাচীন সভ্যতার ধারক-বাহক-প্রচারকরা আজ অলস-অজ্ঞ। তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি-প্রজ্ঞা আজ বন্ধ্যা। সংস্কৃতি-সভ্যতার অগ্রগতির জন্যে সারা বিশ্ব আজ য়ুরোপীয় কয়েকটা দেশের মনীষীদের কাছে ঋণী। গোট তৃতীয় বিশ্ব য়ুরোপীয় অবদানে ঋদ্ধ হয়েই চেতনায়, চিন্তায়-বিজ্ঞানে-দর্শনে-সমাজে ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় সমকালীনতা রক্ষা করে চলছে। কিন্তু নিজেদের মন-মগজ-মনন-মনীষা অনুশীলন-পরিশীলনের অভাবে বন্ধ্যা বলে আজো মনের, রুচির, চিন্তার ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে সাড়ে তিন/তিন/ আড়াই/দুই /দেড় হাজার বছর আগেকার ভুবনে বিচরণশীল। তাই আমাদের আঙ্গিক ও ব্যবহারিক জীবনযাত্রার সঙ্গে সমতালে আমাদের মন-মনন-রুচি-সংস্কৃতি বিকাশ লাভ করেনি। মানসিক দিক দিয়ে আমরা প্রায় অর্থোডকস, জ্ঞান-প্রজ্ঞা-বুদ্ধি-যুক্তি-বিবেক-বিবেচনা প্রয়োগে অনীহ রবোট মাত্র। আমরা অঙ্গে ও ব্যবহারিক জীবনযাত্রায় আধুনিক, কিন্তু অন্তরে আমরা অলঙ্ঘ্য-দুর্লঙ্ঘ্য সুপ্রাচীন যুগের ও জগতের চেতনারও চিন্তার ধারক এবং বাসিন্দা।

লোকমুখে শুনে শুনে এবং বই-পত্রে দেখে দেখে আমরা চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা, স্বমত মুদ্রিত আকারে প্রচারের অধিকার বক্তৃতায়-বিবৃতিতে স্বীকার করি বটে, কিন্তু তাতে আমাদের অন্তরের সায় থাকে না। তাই আমরা আজো অসহিষ্ণু ও অসংযত আর অসুজন। অথচ উনিশ শতকের প্রথমপাদ থেকেই কোলকাতায় রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশব সেন যখন অমূর্ত উপাস্যবাদ প্রচার করেন, কিংবা নিরীশ্বর ডেভিড হেয়ারের আর যুক্তিবাদী যুবক ডিরোজিওর প্রভাবে হিন্দু ধর্মে অবজ্ঞা প্রকাশ করছে ছাত্ররা অথবা ম্লেচ্ছ স্পর্শদোষে সমাজে পতিত কেউ কেউ খ্রীস্টান হয়ে যাচ্ছে অক্ষয়কুমার দত্ত, বিদ্যাসাগর, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য প্রমুখ স্বধর্মাচার ত্যাগী বলে, নাস্তিক বলে, স্বসংস্কৃতির প্রতি অবজ্ঞাপরায়ণ বলে সমাজে নিন্দিত ও ধিক্কৃত হলেও কেউ তাঁদের হত্যা করার জন্যে আন্দোলন করেনি, চায়নি তাঁদের ফাঁসি। স্বধর্ম ও শাস্ত্র নিয়ে মনে-জাগা জিজ্ঞাসার উত্তর খোঁজার অধিকারও সবধর্মে সবযুগে পৃথিবীর সর্বত্র স্বীকৃত ছিল। নইলে ইহুদী, খ্রীস্টান,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলিম প্রভৃতি সমাজে বহু বহু মতবাদী সম্প্রদায় গড়ে উঠল কি করে? আমাদের দেশেই সূফী, শিয়া, বাউল, বিভিন্ন মজহাবী, মুহম্মদীয়া, পীর-দরগাহ-খানকাবাদী, কাদিয়ানী ও নানা বর্গের মতবাদী সম্প্রদায় নিয়েই আমরা বৈষয়িক জীবনে সহযোগিতায় সহাবস্থান করছি। এ-ও সত্য যে, প্রাচীন ও মধ্যযুগে কোন কোন অঞ্চলে ও সমাজে অসহিষ্ণুরা নতুন চেতনার, নতুন চিন্তার, নতুন মতের, নতুন পথের লোককে হত্যাও করেছে। যেমন সক্রেটিস, শিহাবউদ্দিন সোহরাওয়ার্দী বা আবু মুসা ইবনে মনসুর হল্লাজ, যোয়ান অব আর্ক প্রমুখ অনেকেই অসহিষ্ণুদের হাতে নিহত হয়েছেন।

এ যুগে সহিষ্ণুতা গণতন্ত্রপ্রিয়, সভ্যতর সংস্কৃতিমান লোকের মধ্যে প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু আমাদের দেশে অজ্ঞ-অনক্ষর মানুষের সংখ্যাধিক্যের দরুন তাদের স্বাধীন মত গড়ে ওঠার ও মত প্রকাশের সুযোগ না থাকায় শহুরে শিক্ষিতরাই তাদের হয়েও বিরুদ্ধ মতের লোকের বিচারে ও দণ্ডদানে অবাধ অধিকারের দাবিদার হয়। এ ক্ষেত্রে রাজনীতিক স্বার্থও জড়িত থাকে বলে তিলকে তাল করা, তালকে তিলে পরিণত করা, প্রচার-প্রচারণায় বিকৃত তথ্য পরিবেশন করা সহজ হয়। কেননা সত্য ও তথ্য যাচাই-বাছাই করার লোক দেশে দুর্লভ। প্রতীচ্য শিক্ষা গ্রহণ করেও, য়ুরোপ-আমেরিকায় বাস করেও, জীবন চর্চায় গোটা পৃথিবী ব্যাপী নানা বৈচিত্র্য দেখে শুনে জেনেও, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রসাদ ভোগ-উপভোগ করেও আমাদের মনের ও বুদ্ধির মুক্তি ঘটল না। রক্ষণশীলতার লৌহ-কঠিন খাঁচায়বদ্ধ গতানুগতিক ও উপযোগরিক্ত আচার-আচরণের বন্ধনমুক্তি সম্ভব হল না, আজো আমরা মধ্যযুগের অধিবাসী।

AMARBOI.COM

নতুন ধরনের রাজনীতিক দল চাই

আফ্রো-এশিয়া-ল্যাতিন আমেরিকার তথা তৃতীয় বিশ্বের রাজনীতি কেবল কানাগলিতে কিংবা আঁধাগলিতে পাকচক্কর খায়, কোন লক্ষ্যে বা উদ্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে না। এসব রাষ্ট্রে এক এক সময়ে এক একটা তুচ্ছ বিষয় দলীয় রেষারেষির আধিক্যে এবং নিরক্ষরতার ও সংস্কৃতহীনতার বা তার স্বল্পতার দরুন গুরুতর সমস্যা-সঙ্কট সৃষ্টি করে। ফলে গণতন্ত্রে ও সামরিক শাসনে বিশেষ কোন পার্থক্য চোখে পড়ে না। এ কারণেই রাষ্ট্রক্ষমতা জবরদখল করেও জঙ্গীনায়ক গণতান্ত্রিক শাসন চালু করে, তাই আমাদের তৃতীয় বিশ্বের লোকের মধ্যে প্রকৃত গণতন্ত্র স্বরূপে কখনো দেখা-জানা-বোঝা যায় না। আমাদের শিক্ষিত নাগরিকদেরও তাই জঙ্গীনায়কের কৃত্রিম নামসার গণতন্ত্র আর আধুনিকতম বইয়ে-পড়া গণতন্ত্র সম্বন্ধে কেতাবি একটা পার্থক্যচেতনা থাকলেও বাস্তবে তারাও লাভে লোভে স্বার্থে এবং আত্মমর্যাদাহীনতার ও ঘৃণা-লজ্জা-ভয়রিক্ততার দরুন প্রতিকারে প্রতিবাদে প্রতিরোধে এগিয়ে আসে না, যদিও গা-পা বাঁচিয়ে মাঝেমধ্যে মেঠো বক্তৃতা, কাগুজে বিবৃতি ও নিরাপদ মিছিল-মিটিং করে রাজনীতির সচেতনতার স্বাক্ষর রাখে এবং বিবেকী দায়িত্ব পালন করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিগত তিন বছরে দেখা গেল, বাঙালী হওয়া, বাঙালী থাকা ও বাঙলা ভাষা শেখা একটা আবেগ সঙ্গত ভুল সিদ্ধান্তই যেন ছিল। আর রাজাকারদ্বেষণা যে ভুল ছিল, তা মরহুম জঙ্গীনায়ক শাসক জিয়াউর রহমান স্বয়ং একজন মুক্তিযোদ্ধা হয়েও ১৯৭৬ সনেই অনুভব-উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তিনি রাজাকার নিয়েই তাদের সাহায্যে-সহযোগিতায় ও সমর্থনে রাষ্ট্র শাসন করেন মৃত্যুমুহূর্ত অবধি। তাঁর মৃত্যুর পরেও তাঁর কৃপাধন্য হোসেইন মুহম্মদ এরশাদও রাজাকারে ও মুক্তিযোদ্ধায়, মৌলবাদে ও প্রগতিবাদে কোন পার্থক্যচেতনা প্রশ্রয় দিতেন না। তাঁর নীতি ছিল স্বচ্ছ সুবিধেবাদ 'মারি অরি পারি যে কৌশলে'। স্বার্থ হাসিলই ছিল তাঁর সব ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের লক্ষ্য, তাতে দেশ-জাতি-মানুষ চেতনা ছিল না। নয় বছর রাজত্ব করার পরে স্বৈর-স্বেচ্ছাচারী বলে তাঁদের বিদায় করা হয় শোভনভাবে-বিতাড়ন বা বিনাশ ঘটানো হল না তাঁর মতের, পথের, দলের ও নীতি-রীতি-নিয়মের ও পদ্ধতির। জিয়া 'আল্লাহ' বসিয়েছিলেন সংবিধানের শিরে, এরশাদ ইসলামকে স্থিতি দিলেন সংবিধানের হৃৎ-কন্দরে। জাত জন্ম বর্ণ ধর্ম ভাষা নিবাস যোগ্যতা দক্ষতা নির্বিশেষে রাষ্ট্রবাসী মাত্রকেই কেবল মানুষ জেনে-মেনে সমনাগরিক রূপে সরকারের নীতিতে নিয়মে-কর্মে-আচরণে নিরপেক্ষ নির্বিশেষ ন্যায্যতা গ্রহণ করাই যে আধুনিকতম গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, তা বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের গর্বিত শাসকরা মানলেন না। ফলে আমাদের বাঙলাদেশে এ মুহূর্তেও কোন রাষ্ট্রিক জাতীয়তা সত্যিকার অর্থে বাস্তবে গড়ে উঠল না। এ এখনো বিভিন্ন জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-নিবাস-যোগ্যতা-দক্ষতার মানুষের উপস্থিতিবহুল একটি বাজারমাত্র হয়ে রয়েছে।

আজ তাই এখানে শিক্ষিত অর্থসম্পদশালী ব্যক্তি বা পরিবার নির্বিশেষে প্রায় সবাই সন্তানদের শৈশব থেকেই ইংরেজী মাধ্যমে শিক্ষা দিয়ে বিদেশমুখী করে তুলছে শিক্ষায়-সংস্কৃতিতে, মনে, মগজে ও স্বার্থপরতায়, অজ্ঞ-অনক্ষরদের ছেলেমেয়েদের মাদ্রাসায় পড়িয়ে মুসলিম বানিয়ে ইসলামের ও মুসলিমদের সেবার যোগ্য করে তুলছে, আর বাদবাকি লোকের সন্তানদের স্কুলে প্রশ্নোত্তর মাধ্যমে পড়া-লেখা শিখিয়ে সাক্ষর করে তোলা হচ্ছে। ওরা অবশ্য লেখাপড়া-জানা ভদ্রলোক হচ্ছে-কেজো ও বিদ্বান হচ্ছে কিনা, তা জানা-বোঝা দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। ইংরেজী মাধ্যমে শিক্ষিত তরুণ-তরুণীরা দেশে-বিদেশে মুক্ত বিহঙ্গের মতো অবাধ অর্থ অর্জনে ভোগে-উপভোগে-সম্ভোগে জীবন যাপনের সুযোগ পাচ্ছে। মাদ্রাসা শিক্ষিতরাও আপাতত চাকরি পাচ্ছে বিদ্যালয়ে ও অন্যত্র। কিন্তু প্রশ্নোত্তরে শিক্ষিতরা লাখে লাখে বেকার— এদের মধ্যে রয়েছে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ারও। কেননা প্রকৌশল কলেজে ও মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষা প্রাপ্তরা আজকাল আর পশ্চিম এশিয়ায়-আফ্রিকায়ও নিম্নমানের যোগ্যতার দরুন নাকি বিশেষ আদর-কদর পাচ্ছে না। দেশের গণতান্ত্রিক সরকার না-কি বিশ্বব্যাঙ্কের ও আন্তর্জাতিক অর্থতহবিলের কর্তৃপক্ষের পরামর্শেই চলে। কেননা ওরাইতো ঋণে-দানে-অনুদানে-ত্রাণে তৃতীয় বিশ্বের মুৎসুদ্দি সরকারগুলো টিকিয়ে রাখে। 'জি-সেভেন' নামের সপ্তধনী মহাজনদের আর্থ-বাণিজ্যিক মহাজনী স্বার্থ রক্ষার দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোর।

জঙ্গীনায়কের ও তথাকথিত গণতান্ত্রিক মুৎসুদ্দিরাষ্ট্র সরকারের এ জন্যেই স্থানীয়ভাবে সেবা-সাহায্য-সহযোগিতার নামে এন-জি-ও বা পিভিডিও সংস্থাগুলো আধুনিক আর্থ-বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থে তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোর গাঁয়েগঞ্জে দুস্থ দরিদ্র নিঃস্ব নিরন্ন মানবতার খাদ্য যুগিয়ে, চিকিৎসার ব্যবস্থা করে, তাদের সন্তানদের সাক্ষরতার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যবস্থা করে, ঝড়ঝঞ্ঝা-খরা-বন্যা পীড়িত গণমানবের সেবা করে জনগণের মন জয়ও করেছে। ফলে এন-জি-ও গুলো হয়ে উঠেছে বিপন্নের বন্ধু। এ সূত্রে সর্ব প্রকারে সুদের লক্ষ্যে নিয়োজিত পুঁজির গ্রামীণ ব্যাংকের সুনামও স্মর্তব্য। এন-জি-ও বাস্তবে তৃতীয় বিশ্বের পঙ্গু রাষ্ট্রের সেবাই করে-সুস্থ ও স্বস্থ হতে দেবে না, উন্নত হতেও দেবে না, মরতেও দেবে না। গ্রামীণ দুস্থ মানুষের সেবা-সাহায্যের ইজারা নিয়েছে NGO।

এবার আবার আগের কথায় ফিরে আসি। ১৯৬৯-৭০-৭১ সনে আমরা যে প্রেরণায় প্রণোদনায় প্রবর্তনায় বাঙালী হয়েছিলাম, স্বাধিকার সচেতন হয়েছিলাম, স্বাধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠ হবার জন্যে প্রাণপণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলাম, মা-বোনের ইজ্জত ও লক্ষ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করলাম, আজ তা যেন বাইরে নয় শুধু, অন্তরেও অনুপস্থিত। মনের ও মর্মের এ পরিবর্তন যেন মেরুর ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। এখন দেশে কেবল বিভিন্ন শাস্ত্রিক বর্গের মানুষ ও সমাজ মেলে— বাঙালী মেলে না। সংখ্যাগুরুরা এখন যেন সরকারী আশ্রয়ে, প্রশ্রয়ে ও ইঙ্গিতে পাকিস্তান ভাঙার, বাঙালী হওয়ার শোধ নেবার জন্যেই কিংবা অনুশোচনায় নতুন করে যে নিজেদের উচ্চকণ্ঠে মুসলিম বলে প্রচার করে বেড়াচ্ছে ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে, রেডিয়ো-টিভিতে, লেখায় আর রাজনীতিক মতে ও আদর্শে এবং কর্মে ও লক্ষ্যে, তা নয়, দেশ-কাল বিরোধী নীতিগ্রহণ করে ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ উপেক্ষা ও বর্জন করে সংখ্যাগুরুর হিতার্থে শাস্ত্রসম্মত শাসন চালু করার স্বপ্ন বাস্তব করার সাধ পূরণ করার জন্যেও আন্তরিক প্রয়াস চালাচ্ছে। প্রমাণ অধিকাংশ বড়-ছোট-মাঝারি প্রাক্তন এবং এখনকার ডান-বামপন্থী দলই রাজনীতিতে সেক্যুলারিজম বিরোধী, তারা সেক্যুলার বুর্জোয়া দল গঠনেও অনীহ। এখন সবাই স্ব স্ব শাস্ত্রিক পরিচয়ে চিহ্নিত হতে চায় ভোট যোগাড় লক্ষ্যে। মার্কসবাদীরা এখন আস্তিক শাস্ত্রপন্থী। অথচ কোন সেক্যুলার দল থাকলে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীস্টান পরিষদ গঠিত হত না জীবন-জীবিকা নিরুপদ্রব ও নিরাপদ রাখার দাবি উচ্চারণের জন্যে। ওরা স্বতন্ত্র নির্বাচন কিংবা সংসদে আসন রক্ষণ প্রথা প্রবর্তনের দাবি করলে নতুন সমস্যায় পড়বে রাষ্ট্র এবং সর্বপ্রকার পিছিয়ে পড়বে। আমরা যদি আগামী সংসদ নির্বাচনের আগে সাঁওতাল, গারো, চাকমা, মার্মা, ত্রিপুর, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান, মুসলিম নিয়ে একটা 'সেক্যুলার রাজনীতিক দল' গঠন করতে পারি, যার অঙ্গীকার হবে মর্ত্যজীবনের প্রয়োজনে মর্ত্যমানবের তথা নাগরিকের জীবনের জীবিকার চাহিদা মেটানোই কেবল, তা হলে যুগপৎ ও একাধারে আমরা একটা রাষ্ট্রিক জাতীয়তাবাদে জাত জন্ম বর্ণ ধর্ম ভাষা নিবাস যোগ্যতা দক্ষতা নির্বেশেষে সবাইকে একত্র, সংহত ও অভিন্ন রাষ্ট্রিক নাগরিক সমাজভুক্ত করে গড়তে পারি। স্ব স্ব শাস্ত্রে বিশ্বাস থাকবে ব্যক্তির মুখে, বুকে, মনে, মর্মে ব্যক্তিক ও পারিবারিক আচারে-পার্বণে ও উপাসনায়। আমরা যদি আমাদের প্রস্তাবিত সেক্যুলার দলটিতে ছয়জনের একটি প্রেসিডিয়াম গঠন করি, সে-প্রেসিডিয়ামে একজন সাঁওতাল, একজন গারো, একজন চাকমা/মার্মা/ত্রিপুর, একজন হিন্দু, একজন খ্রীস্টান ও একজন মুসলমান রাখি এবং প্রত্যেকে বছরে দু'মাস করে থাকবেন চেয়ারপারসন, তা হলে একটা রাষ্ট্রিক যথার্থ গণতান্ত্রিক ঐক্যবদ্ধ জাতি গড়ে উঠতে পারে। এভাবে সংখ্যালঘুরা স্বদেশে স্বঘরে স্বভিটেয় নিরুপদ্রবে নিরাপদে বাসের সুযোগ পাবে, দেশত্যাগ করবে না, তাদের অর্জিত অর্থসম্পদে-শ্রমে-মননে-মনীষায়-সেবায় দেশ হবে ঋদ্ধ। যদিও সমাজ ও রাষ্ট্র থাকবে বুর্জোয়া ও পুঁজিবাদী তখনো, কেননা বামপন্থীরা সমাজ পরিবর্তন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করার মতো প্রবল হয়ে ওঠেনি। তাই আমাদের সুদীর্ঘ মধ্যবর্তীকালীন খোলাবাজারী সমাজকে ও রাষ্ট্রকে উদার ও সহিষ্ণু এবং অধিকতর মানবিক করার জন্যে আমাদের সেক্যুলার হওয়া দরকার জাগতিক জীবনে, শাসনে ও সরকারে।

দেশ দুষ্টক্ষতে আক্রান্ত

মানুষের মূল পরিচয় মানুষ নামের প্রাণীমাত্র। প্রাণীর মানবপ্রজাতি দেহে-মনে-মগজে অন্যান্য সব প্রাণী থেকে অধিক বিকশিত হলেও মানুষমাত্রই মনুষ্যত্বের বা মানবতার অধিকারী হয় না। মনুষ্যত্ব বা মানবতা তথা মানবিকগুণ অর্জন বা আয়ত্ত করা অনুশীলন সাপেক্ষ, জন্মসূত্রে তা আয়ত্ত করা যায় না। ফলে সাধারণভাবে অধিকাংশ মানুষ মনে-মগজে বৃত্তিতে-প্রবৃত্তিতে অসংযত অসহিষ্ণু ও অমানবিক থেকে যায়। তাই 'লাখে মানুষ মিলয় এক'। অন্যরা সাধারণভাবে অর্থলিপ্সু, বিত্তলিপ্সু, ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগলিপ্সু ও ক্ষমতালিপ্সু এবং তারা লাভ-লোভ-স্বার্থসচেতন জীবন যাপন করে। এ জন্যে সাধারণভাবে মানুষের মতো স্বার্থপর, নিষ্ঠুর, হিংস্র ও প্রতিহিংসাপরায়ণ আর কোন প্রাণী সম্ভবত সমুদ্রে-অরণ্যে-পর্বতে-সমতলে বা আকাশে নেই। তাই আজ পৃথিবীর সর্বত্র লঘু-গুরুভাবে প্রত্যক্ষে কিংবা পরোক্ষে হিংসায় উন্মত্ত মানুষের দানবীয় রূপ ও কর্ম দেখতে পাচ্ছি। নইলে হাজার হাজার বছরের প্রতিবেশী এবং বর্তমানে শিক্ষিত মানুষশাসিত স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র রুয়ান্ডায় 'ভিন্নগোত্রের'-এ জন্মগত অপরাধের ও পরিচয়ের জন্যে পাঁচ/সাত লক্ষ মানুষকে মানুষ হয়ে সোৎসাহে হত্যা-উৎসবে মেতে নিহত করতে পারে? আমরা প্রত্যেকেই নিজেদের অভিজ্ঞতায় জানি, পশু-পাখি-কীট-পতঙ্গের জীবন রক্ষার জন্যে কোন কোন হৃদয়বান ব্যক্তি চেষ্টা করে। আর পৃথিবীর রাষ্ট্রশক্তিগুলো নরহত্যার নতুন নতুন অস্ত্র নির্মাণ করে যুদ্ধ-বিবাদ-বিরোধ সৃষ্টির জন্যে নতুন নতুন কারণ খুঁজে বেড়ায়। নইলে যে-অস্ত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের, ফ্রান্সের, ব্রিটিশের, রাশিয়ার, চীনের রয়েছে, সে-অস্ত্র রাখার দায়ে কিংবা আছে অনুমানে ইরাক, উত্তর কোরিয়া প্রভৃতি হুকুম, হুমকি, হুঙ্কার, হামলার কবলে পড়ে কেন?

কাজেই দেখা যাচ্ছে কোন নির্বিশেষ নৈতিক চেতনা, আদর্শ, মানবিকতা, মনুষ্যত্ব বা মানবতা নেই। প্রবলের স্বার্থ সম্পৃক্ত-নীতিনিয়ম, রীতিরেওয়াজ, প্রথাপদ্ধতিই ন্যায়ের, ন্যায্যতার, বিবেকের, যুক্তির ও আইনের নিয়ামক। পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলো আজ বিবেক-বিবেচনা-যুক্তি-ন্যায়চেতনা বর্জিত হয়ে যাচ্ছে। কেবল লাভ-লোভ-স্বার্থচেতনা তাড়িত হয়ে লেন-দেনের চুক্তি ও কূটকৌশল উদ্ভাবনে থাকে ব্যস্ত। অর্থাৎ আজকের পৃথিবীর রাষ্ট্রনীতি সঙ্কীর্ণ স্বার্থ কেন্দ্রিক। এখন পৃথিবী বিপুলা নয়, পৃথিবীর কোন অংশ সম্বন্ধে অজ্ঞতার বাধাও ঘুচে গেছে। ঘুচে গেছে অলঙ্ঘ্যতার, দুর্লঙ্ঘ্যতার ব্যবধানও, এখন ধরা বলতে গেলে আমাদের রাষ্ট্র পরিচালক ও বণিকদের কাছে প্রকৃত অর্থেই সরার মতোই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্ষুদ্র। আগে যান-বাহনের অভাবে সমুদ্র-পর্বত-অরণ্যের দুর্লঙ্ঘ্যতার অলঙ্ঘ্যতার দরুন, ব্যবধানের, বিচ্ছিন্নতার, অজ্ঞতার, অপরিচয়ের, অসম্বন্ধের দরুন যে স্বাতন্ত্র্য ও স্বয়ম্ভরতা বা স্বনির্ভরতা ছিল, তা আজ ঘুচে গেছে। এখন পৃথিবীর বড়-ছোট-মাঝারি রাষ্ট্র মাত্রই একে অপরের উপর বনজ, কলজ, খনিজ, কৃষিজ উৎপাদিত ও নির্মিত কাঁচা-পাকা পণ্যের ক্ষেত্রে নির্ভরশীল। এখন একা চলার একা থাকার দিন অপগত। ফলে এ পারস্পরিক নির্ভরশীলতাজাত ঘনিষ্ঠতার সঙ্গে ঠকাঠকির, দর কষাকষির জটিলতাও বেড়ে গেছে। সর্বত্র শেয়ানে শেয়ানে প্রতিযোগিতার ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার এবং সহযোগিতার ও সহাবস্থানের কৌশল প্রয়োগের উপায় বা পন্থা বিচিত্র ও বিভিন্ন এবং বহুধা রূপ লাভ করছে। পৃথিবী আজ বহুরূপী। তার রূপ-স্বরূপের অবধি নেই। কাজেই সে-আলোচনা নিরর্থক।

পৃথিবীর মানচিত্রে আমাদের জন্মভূমি আমাদের মাতৃভূমি বাঙলাদেশ একটি স্বীকৃত স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। এ ক্ষেত্রে এর আকারে কোন ত্রুটি নেই, প্রকারে অবশ্য খুঁত ও খাদ কেউ চেষ্টা করলে সহজেই বের করতে পারবে। আমরা এখানে সে-আলোচনাও করব না বাহুল্যবোধে। আমরা আমাদের ক্ষোভের, দুঃখের ও প্রয়োজনের এবং আবেগের কিছু কথা বলব এখানে।

আমাদের রাষ্ট্র তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্রতম রাষ্ট্রের নাকি একটি। শুনে বলছি, কেননা অন্য কোন রাষ্ট্র তো দেখিনি। আমাদের রাষ্ট্র নাকি ঋণ, দান, অনুদান, ত্রাণরূপ অর্থ-সম্পদ সম্বল করেই টিকে রয়েছে। ঋণ বাড়ছে, সুদ বাড়ছে, সুদ বছরান্তে শোধ করতে নাকি ঋণের-দানের টাকাও ব্যয় হয় কিছুটা, এসব অবশ্য শোনা কথা। শোনা কথায়, গুজবে কান দেয়া বুদ্ধিমানের লক্ষণ নয়। আমরা জানি এবং গৌরব-গর্বও বোধ করি যে আমরা জান-মাল-ইজ্জৎ দিয়ে গড়া একটা স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের মালিক। যদিও আমরা দেশ, রাষ্ট্র, মানুষ বলতে শহর-বন্দরের শিক্ষিত চাকুরে আমলা, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি, সাংসদ, মন্ত্রী এবং উকিল-ডাক্তার-শিক্ষক-সাংবাদিক-শিল্পী-সাহিত্যিকদেরই নির্দেশ করি। দেশের অজ্ঞ-অনক্ষর-নিঃস্ব-নিরন্ন-দুস্থ-দরিদ্র চাষী-মজুর ও ক্ষুদ্র-তুচ্ছ পেশাজীবী গ্রামীণ ও শহুরে কুলি-শ্রমিকদের আমরা কেজো প্রাণী বলেই জানি, মানুষ বলে আমাদের মনে-মর্মে-কাজে-আচরণে-চিন্তায়-চেতনায় মানি না। ওরা হচ্ছে আমাদের চোখে বদ্ধ জলাশয়ের কচুরিপানা, কেবলই বাড়ে ঘন ঘন হয়ে অচল অনড় হয়ে গাঁয়ে গঞ্জে ও শহরের নালা-নর্দমার ধারে ধারে মানবেতর জীবন যাপন করে খাদ্যে-পোশাকে-ঘরে-আচারে-সংস্কৃতিতে রিক্ত ও অর্থ-সম্পদের প্রাজম্মিক অভাবে ও অনটনে। ওদের মধ্যে যারা ভিখিরী তারা কৃপা-করুণা-দয়া-দাক্ষিণ্য পায় স্বর্গকামী পুণ্যার্থীদের। অন্যরা একটা দায়িত্বই পেয়েছে অধিকারের নামে না চাইতেই ধনের ও মানের মানুষদের স্বার্থে, তা হচ্ছে ভোটাধিকার। এটি ওদের ঘাড়ে চাপানো হয়েছে উচ্চাশী ক্ষমতালিপ্সু ধনী-মানীরা সাংসদ-মন্ত্রী-সদস্য-পার্ষদ হবার উপায় রূপে। ওই কচুরিপানা রূপ গ্রামীণ ছিন্নমূল ভাসমান নিঃস্ব মানুষেরা অনাহারে অর্ধাহারে পুষ্টিহীনতায়-চিকিৎসার অভাবে অকালে অপমৃত্যুবরণ করে। তাদের কাছে জীবন যন্ত্রণামাত্র, জীবন যাপন একটা সমস্যা মাত্র। ঋণগ্রস্ত পিতামাতার ঘরে এদের জন্ম এবং ঋণ রেখেই ঘটে এদের জীবনের অবসান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিদেশী-বিজাতি-বিধর্মী-বিভাষীর শাসনে যেমন ছিল তারা শোষিত বঞ্চিত অবহেলিত অজ্ঞ-অনক্ষর, আজো স্বদেশী-স্বজাতি-স্বধর্মী-স্বভাষীর শাসনেও স্বাধীন স্বরাষ্ট্রে তাদের বিদ্যায় চিত্তে অর্থে সম্পদে কোন অধিকার জন্মেনি। অবসান ঘটেনি ভিক্ষাবৃত্তির, পতিতাবৃত্তির বেকারত্বের। স্বীকৃত হয়নি তাদের বেঁচে থাকার জন্মগত অধিকার। সরকার অসমর্থকে ভাতা দিয়ে সমর্থকে কাজ দিয়ে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা আজো করেনি, করার প্রয়াসও নেই সরকারের। ব্রিটিশ বিতাড়িত হয়েছে সাতচল্লিশ বছর আগে, পাকিস্তানীরা বিতাড়িত হয়েছে তেইশ বছর আগে। কিন্তু আমাদের জীবনে-জীবিকায় প্রত্যাশিত মাত্রায় কোন উন্নতি-উৎকর্ষ ঘটেনি, বরং নীতিনিয়মহীন নির্লক্ষ্য ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ দেশে দুঃশাসন-দুর্নীতি বৃদ্ধি করেছে। নৈতিকচেতনা, ন্যায্যতাপ্রীতি, বিবেকীবিবেচনা জনসমাজে দুর্লক্ষ্য হয়ে উঠেছে। বিশৃঙ্খলা ক্যানসারের মতো ছড়িয়ে পড়েছে দেশের সর্বত্র। আইনের প্রতি অনুরাগ ও আনুগত্য বিরলতায় দুর্লক্ষ্য। ঘুষ, বখশিস, পাওন, উপহার, উপঢৌকন প্রভৃতি এখন কর-খাজনার মতোই চালু প্রথা। নৈরাজ্য চলছে সর্বত্র, জীবন এখন জাঙ্গলিক ও গাড্ডলিক। জীবন-জীবিকার নিরুপদ্রব নিরাপত্তা নেই কোথাও। ঘুষে-ভেজালে-চোরাচালানে-প্রতারণায়-দুঃশাসনে মানুষের নৈতিক জীবন বিক্ষত, নীতি-আদর্শ বিলুপ্ত।

আমাদের দেশ সাতচল্লিশ কিংবা তেইশ বছরের মধ্যে যোগ্যতায়, দক্ষতায়, জনসেবাপ্রবণতায়, দেশহিতৈষণায় উদ্বুদ্ধ কোন গড়ে-ওঠা নেতা পায়নি, শ্রদ্ধায়, আস্থায়, ভরসায় জনগণ যাঁর অনুরাগে, অনুগামিতায় ও আনুগত্যে সঙ্ঘবদ্ধ ও সংহত আর নৈতিক, আদর্শিক ও বিবেকী চেতনায় ঋদ্ধ হতে পারত। আমরা আজ অবধি বানানো নেতার নেতৃত্বে, শাসনে এবং জঙ্গীনায়কের জবরদখলের মধ্যেই জীবন যাপন করেছি কৃত্রিমভাবে। আমাদের রাজনীতিকদের অধিকাংশই ভূঁইফোঁড়-এ তাৎপর্যে যে অর্থবান হয়েই তাঁরা ধনের ও মানের মানুষ রূপে স্বীকৃতি ও সম্মান পাবার লক্ষ্যে সদস্য, পার্ষদ, সাংসদ, মন্ত্রী হতে চান, রাজনীতির প্রতি তাঁদের অনুরাগ তেমন নেই, মান-মর্যাদা-দর্প-দাপট-প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জনের প্রতিই তাঁদের আকর্ষণ।

সাময়িক বিষয়ই তাঁদের আলোচ্য। এ অবস্থায় দেশপ্রেমী, জনসেবী, মানবদরদী জাতিক, রাষ্ট্রিক আন্তঃরাষ্ট্রিক ও আন্তর্জাতিক আর্থবাণিজ্যিক-কূটনীতিক সম্পর্ক-সম্বন্ধ সচেতন বিজ্ঞ-অভিজ্ঞ, চিন্তাশীল রাজনীতিক, সাংসদ কিংবা মন্ত্রী পাওয়া সহজ হয় না। এ কারণে সম্ভবত আমরা আমাদের খনিজ, বনজ, কৃষিজ, কলজ উৎপাদিত ও নির্মিত কাঁচা-পাকা পণ্যের বাজার দেশের অভ্যন্তরে ও বিদেশে বিস্তৃত করতে পারিনি, আমাদের শিল্পকারখানাও বাঞ্ছিত সংখ্যায় ও বৈচিত্র্যে দৃঢ়মূল হয়ে গড়ে ওঠেনি। আবার গড়ে উঠলেও টেকে না, প্রতিযোগিতায় হার মানে।

আমাদের রাজনীতিক দলগুলোর আদর্শে, উদ্দেশ্যে, লক্ষ্যে, কর্মসূচীতে দূরদর্শিতার পরিচয় মেলে না, দলগুলো ক্ষমতার ও খ্যাতির আর ভোট-যোগাড়ের রাজনীতিকেই চরম ও পরম লক্ষ্য করেছে। দলে দলে কাড়াকাড়ি-মারামারি-হানাহানির কারণও নিহিত এখানেই। ক্ষমতার লিপ্সা, অর্থবিত্তের লোভ, গদী দখলের অপ্রতিরোধ্য কাঙ্ক্ষা, দর্প-দাপট, প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং মান-মর্যাদা বাড়ানোর সার্বক্ষণিক প্রয়াস প্রভৃতিই আমাদের রাজনীতিক হালচালে প্রাধান্য পাচ্ছে। তাই মিল-ফ্যাক্টরি-কারখানা বৃদ্ধি করে রফতানিপণ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৃদ্ধির প্রয়াস, আর্থিক অনটন নিরসনের উপায় আবিষ্কারের উদ্ভাবনের চেষ্টা, কিংবা সুদূর প্রসারী আর্থ-বাণিজ্যিক বিকাশ ও দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে অবক্ষয়ের অবসান কল্পে সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা গ্রহণ অথবা জনগণের মৌলবাদ-রক্ষণশীলতা-প্রগতিবিমুখতা বিদূরণ প্রয়াস প্রভৃতি কোনটাই সরকারের চেতনার-চিন্তার, কর্মের ও আচরণের অন্তর্ভুক্ত হয় না। যদিও ভাষণে, বিবৃতিতে ও আস্ফালনে নানা উন্নতি-উৎকর্ষের বয়ান নিত্য শোনা যায়। দেশ এখন ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক, আর্থিক, শৈক্ষিক, সাংস্কৃতিক, বাণিজ্যিক, প্রাশাসনিক ক্ষেত্রে অবক্ষয়গ্রস্ত। এখন বাঙলাদেশ সমস্যাজর্জরিত। নৈতিক চেতনা, আদর্শ, লক্ষ্যিকনিষ্ঠা নিয়ে রাজনীতিক দলগুলো, দেশসেবী মানবপ্রেমী লোকেরা এর প্রতিকারে প্রতিবাদে প্রতিরোধে যথাপ্রয়োজনে যথাকালে যথাস্থানে যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণে আন্তরিকভাবে প্রয়াসী না হলে সরকারী ও রাষ্ট্রিক পর্যায়ে বিভিন্ন প্রকারের বিপর্যয় ঠেকানো যাবে না।

বিপন্মুক্তির জন্যে শক্তি-সাহস চাই

লোকে বলে 'বোবার শত্রু নেই।' লোকে জানে 'লেংটিয়ার ডাকাতের ভয় নেই।' লোকে বোঝে যে চালু নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ, প্রথা-পদ্ধতি পরিবর্তনের কথা যেই উচ্চারণ করবে, সে প্রতিবাদের, প্রতিরোধের এমন কি প্রতিহিংসারও পাত্র হবে। নতুন চেতনার, নতুন চিন্তার, নতুন সত্যের প্রবক্তাকে এ ঝুঁকি নিতেই হয়। তাঁর জনপ্রিয় হওয়ার কারণ থাকে না তাঁর জীবিত কালে। মিত্রের চেয়ে শত্রুর, গুণগ্রাহীর চেয়ে দোষসন্ধানী নিন্দুকের সংখ্যা তাঁর অনেক অনেক গুণ বেশি থাকে। তবু রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'তরীখানি বাইতে গেলে মাঝে মাঝে তুফান মেলে' এবং সে-তুফানের মোকাবেলা করতেই হয় শক্তি-সাহস-কৌশল-ধৈর্য ও অধ্যবসায় যোগে। তাই জীবনে ঝুঁকি-ঝক্কি-ঝামেলা আছেই। জীবন হচ্ছে যুদ্ধবহুল। একে বলে জীবনযুদ্ধ। আজ আমাদের সমাজ, সরকার ও রাষ্ট্র নানা সঙ্কট-সমস্যার ও বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছে। অতীতমুখিতা, বিদেশমুখিতা ও নৈরাশ্যমুখিতা আমাদের ব্যক্তির, পরিবারের, সমাজের, সরকারের ও রাষ্ট্রের চিন্তা-চেতনায়, কর্মে-আচরণে অসংহতি, অসঙ্গতি ও অসহিষ্ণুতা বৃদ্ধি করেছে। নষ্ট করেছে পারস্পরিক আস্থা ও ভরসা। অজ্ঞ, নিঃস্ব, দুস্থ, দরিদ্র আমজনতা তো স্রোতের টানেই চলে, কখনো উজানে, কখনো ভাটিতে।

আজ এতোকাল পরে নতুন করে জাতির মনে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব জেগেছে নানা কারণে। আমরা কি শাস্ত্রিক বিশ্বাস ও নৈতিক চেতনাঝদ্ধ হয়ে অতীতাশ্রয়ী হয়ে স্থিতিশীল নিশ্চিন্ত জীবনে স্বস্থ হব, কিংবা বিজ্ঞানের তত্ত্বে, তথ্যে ও সত্যে আস্থাবান হয়ে বিজ্ঞানকে ও বাণিজ্যিকে পুঁজি-পাথেয় করে মর্ত্যজীবনে গুরুত্ব দিয়ে সমকালীন বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক জীবনযাপন করব? এ প্রশ্ন এখন আর কোন বিশেষ দেশে ও সম্প্রদায়ে বা গোত্রে ও জাতিতে নিবদ্ধ নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইহুদী, খ্রীস্টান, জৈন, বৌদ্ধ, জোরথুস্থীয়, মুসলিম, হিন্দু প্রভৃতি সব শাস্ত্রপন্থীর বিভিন্ন মতবাদী সম্প্রদায়ের তথা সেক্টের (Seet) কিছু লোকের মধ্যে এ প্রশ্ন প্রবলভাবে দেখা দিয়েছে। কারণ বিজ্ঞানের প্রসাদে উদ্ভাবিত, আবিষ্কৃত ও সৃষ্ট যন্ত্র, প্রকৌশল, প্রযুক্তি, যানবাহন, চিকিৎসাবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান মানুষকে গতানুগতিকভাবে আবর্তিত জীবন থেকে বৃত্তচ্যুত করেছে। স্ব স্ব বিশ্বাসে, সংস্কারে, ধারণায় চির ধরিয়েছে। এখন অনিচ্ছায় প্রাত্যহিক জীবনযাপনে নানা প্রয়োজনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন করতে বাধ্য হচ্ছে নারী-পুরুষ সবাই, সর্বত্র।

এ অবস্থায় আশৈশব শ্রুত, লব্ধ ও প্রজন্মক্রমে প্রাপ্ত বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণার, ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচার-আচরণের, পালা-পার্বণের লৌহ-কঠিন খাঁচায় নিজেকে ও সমাজকে আবদ্ধ রাখবে কিংবা সর্বপ্রকার শ্রুত-লব্ধ-প্রাপ্ত লৌকিক-অলৌকিক ও অলীক ধারণা বর্জন করে মন-মগজ-মনন মুক্ত করে যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেক-বিবেচনা যোগে সমকালীন জীবনচেতনাকে প্রাধান্য দিয়ে ব্যক্তিক, নৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক জীবনে বিজ্ঞানের ও বাণিজ্যের গুরুত্ব স্বীকার করে আধুনিক ও সমকালীন বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক জীবন গড়ে তুলবে, সে-সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় এসেছে। এ কাজ কখনো নির্বিরোধে নির্বিবাদে সর্বসম্মতিক্রমে হয় না। প্রগতির ও প্রতিক্রিয়াশীলতার দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ-সংঘাতও সৃষ্টি করে। তর্ক-বিতর্ক, হাতাহাতি, লাঠালাঠি, হানাহানি অপরিহার্য ও জরুরী করে তোলে। তাই আজ বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের বহু রাষ্ট্রে অতীতাশ্রয়ী অতীতমুখী মৌলবাদীদের সঙ্গে প্রগতি ও সমকালীন মর্ত্যজীবনবাদীদের মধ্যে দাঙ্গা-লড়াই-যুদ্ধ চলছে। তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোতে প্রতীচ্য বিজ্ঞানে, যুক্তিবাদে, পরমতে, পরকর্মে, পরআচরণে সহিষ্ণু, সংযত ও সৌজন্যে সংস্কৃতিমান শিক্ষিত নাগরিকের সংখ্যা শতে ষাট-সত্তর জনে না পৌঁছলে এ সমস্যা থেকে সমাজ বা রাষ্ট্র মুক্ত হতে পারবে না। কাজেই নাগরিকদের ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে প্রগতি-প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-সংঘাতজাত দুঃখ-যন্ত্রণা সইতেই হবে। সাহসী চিন্তক বোবা থাকতে পারে না। আবিষ্কারক, উদ্ভাবক স্রষ্টাও থাকতে পারে না নিষ্ক্রিয়, নিশ্চেষ্ট।

খাল-বিল-নদী-অরণ্য-পর্বত-সাগর আছে বলেই মানুষ তাকে অলঙ্ঘ্য কিংবা দুর্লঙ্ঘ্য ভেবে ঘরে বসে থাকতে পারে না। সাহস করে উদ্যম-উদ্যোগ-অঙ্গীকার নিয়ে এগুতে হয়। আবার রবীন্দ্র-বাণীর শরণ নিতে হচ্ছে :

'ভয়কে যারা মানে তারাই জাগিয়ে রাখে ভয়।
মৃত্যুকে যে এড়িয়ে চলে মৃত্যু তাকেই টানে।
মৃত্যু যারা বুক পেতে লয়, বাঁচতে তারাই জানে।'

অতএব সমস্যা-সঙ্কট-দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ এড়িয়ে চলা জীবনে সম্ভব হয় না। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সঙ্কট-সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসতে হয়। দাঁড়াতে হয় বিপদের মুখোমুখি। প্রকৃতিও ঝড়-ঝঞ্ঝা-খরা-বন্যা-মারী রূপে সবার ওপর আচমকা হামলা চালায়-সর্বপ্রকারের জীব-উদ্ভিদ হয় সে-প্রচণ্ড হামলার প্রাণঘাতী শিকার। প্রয়োজনে যে মরতে প্রস্তুত, বাঁচার অধিকার তারই। পয়লা কদম যার, জয় তারই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৈশ্বিক স্তরে শোষিতমানব মুক্তি আসন্ন

দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রায় সাড়ে তিনশ বছর পরে প্রভুগোষ্ঠীর চোখে শ্রমজীবী প্রাণীমাত্র কালো আফ্রিকার কালো মানুষের ও ভারতীয় শ্রমিকদের বংশধরদের মানুষরূপে নাগরিকরূপে দেশাধিকারীরূপে স্বাধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠ হওয়ার এ ঐতিহাসিক খবরে সারা বিশ্ব আজ আনন্দিত। বিশেষ করে গোটা দুনিয়ার শোষিত-পীড়িত-লাঞ্ছিত-বঞ্চিত-প্রতারিত গণমানবের মনে এ সংবাদ আশার ও আশ্বাসের বাণী বয়ে নিয়ে এসেছে। বোঝা গেল দাসের, ক্রীতদাসের, ভূমিদাসের যুগের মতো শোষণের পীড়নের অধিকারহরণের ও বঞ্চনার যুগের অবসান কাল আসন্ন। ম্যান্ডেলা আজ শ্বেতপ্রভুগোষ্ঠীর মান্য রাষ্ট্রপতি ও শাসক! দাস আজ প্রভুর আসনে। লাগাতার সাতাশ বছর কারাবন্দী থেকেও যে-মানুষ বিভিন্ন শর্তে মুক্তির প্রলোভন হেলায় প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, যিনি নীতির ও আদর্শের প্রশ্নে কখনো কারুর সঙ্গে আপোস করেননি; ধৈর্য ও অধ্যবসায় যোগে সর্বপ্রকার নির্যাতন সহ্য করেছেন দলের অনুগত সহযোগীদের সঙ্গে। ১৯৫২ সনের পরেও বর্ণবিদ্বেষের উগ্রপ্রাবল্যে শ্বেতকায় পুলিশ সৈনিকরা সরকারের নির্দেশে-আদেশে কুকুর-বেড়ালের মতো নয়, মশা-মাছি-কীট-পতঙ্গের মতো শতে শতে হাজারে হাজারে কালো মানুষ হত্যা করেছে শিশু-নারী-বৃদ্ধ-পঙ্গু-পাগল-রুগ্‌ণ নির্বিশেষে। তবু নেলসন ম্যান্ডেলা মহাত্মা গান্ধীর মতোই ধীরবুদ্ধি ও স্থিরবিশ্বাসবলে পরম উদারতায় ক্ষমা করে দিয়েছে সাড়ে তিনশ বছরের পুরোনো অত্যাচারী প্রভুগোষ্ঠীকে। বলতে ইচ্ছে হয় 'কালো বুকের তলায় দেখে যারে তোরা মনুষ্যত্বের আর্দ্রের নাচন'।

নেলসন ম্যান্ডেলা বলেছেন, 'এখন থেকে আমরা সবাই দক্ষিণ আফ্রিকার সমান নাগরিক। আমরা আজ থেকে নতুন দেশের ও সমাজের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের উন্নয়ন ও উৎকর্ষ সাধনায় আমাদের শ্রম, সময়, শক্তি ও সামর্থ্য নিয়োগ করব।' এ মহত্বের তুলনা বিরল। ডক্টর নেলসন ম্যান্ডেলার সঙ্গে তাই ভারতের গান্ধীর তুলনা করছি। এ অসূয়ামুক্ত মন জগতে কয়জনের থাকে? পৃথিবীর রাজনীতিক হাওয়া অন্যত্রও বদল হচ্ছে। বিল ক্লিনটনও তাঁর সহযোগী হিসেবে কালো আফ্রিকানদের কয়জনকে গ্রহণ করেছেন। এ উদারতা নয়, হাওয়া বদলের ফল। আজ মানুষ ব্যক্তির সত্তার মূল্য, মর্যাদা ও গুরুত্ব সচেতন, সচেতন স্ব স্ব দাবি, শক্তি ও সাহস সম্বন্ধেও। কাজেই প্রভুর প্রভুত্ব আজ পৃথিবীর সর্বত্রই টলমল, প্রভু-ভৃত্য, দাস-মালিক, বান্দা-মনিব সম্পর্ক আগের মতো নেই কোথাও। সব বান্দা-গোলাম-দাস-ভৃত্য-হুকমতামিলকার বেআদব, বেপরওয়া হয়ে উঠেছে, উঠছে, উঠবে। কাজেই বুদ্ধিমানেরা বেইজ্জত হবার আগেই, দ্রোহের আশঙ্কায় সদ্বুদ্ধি চালিত হয়ে আত্মসম্মানও আত্মশরীর রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণে লঘু-গুরুভাবে আত্মনিয়োগ করেছে, করছে ও করবে।

ভারতের সেক্যুলারিজমও এমনি এক সাম্প্রদায়িক দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-সংঘাতের আশঙ্কার ফল, আদিবাসী, উপজাতি, আরণ্য ও অচ্ছুৎদের জন্যে প্রতিনিধিত্ব, চাকরি সংরক্ষণও অনুরূপ আশঙ্কাপ্রসূন। মণ্ডল কমিশনও প্রবল দাবির মুখে ক্ষতে আপাত প্রলেপ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাগানোর প্রয়াসমাত্র। অচ্ছুৎ নারায়ণকে ভারতের উপরাষ্ট্রপতি করার সুবুদ্ধিও আত্মরক্ষার সূক্ষ্ম উপায় তথা দ্রোহ বিলম্বিত করার চালমাত্র। ভারতে তিন হাজার বছুরে অচ্ছুৎরা ব্রাহ্মণ্যবাদী বর্ণহিন্দুদের চোখে যারা কেবল কেজো প্রাণী বিশেষ, আজ গোটা ভারতেই দ্রোহী, এ মুহূর্তে ওরাই বিহার ও উত্তর প্রদেশ শাসন করছে, যা উত্তর ভারতের অর্ধাংশেরও বেশি। ডক্টর আম্বেদকরের স্বাধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠ হবার সংগ্রাম ও দেব-দ্বিজ-বেদের নামে বর্ণহিন্দুর অচ্ছু দলন-দমন-শোষণ ও শাসন প্রতিরোধী প্রয়াস আজ কাঁশীরামের নেতৃত্বে সফল হতে চলেছে। বাঙলাদেশেও কাঁশীরামের প্রভাব পৌঁছে গেছে। বাঙলাদেশের নিম্নবর্গের, নিম্নবর্ণের ও নিম্নবিত্তের, নিম্নবৃত্তির হিন্দুরা উচ্চ বর্ণের সৎশূদ্রের ও ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে যে উঠেছে ও উঠছে, তা-সে দিনকার বাবা সাহেব ডক্টর ভীমরাও রামজী আম্বেদকরের 'একশ তিনতম জন্মোৎসব' সভার বক্তাদের ভাষণে এবং শ্রোতাদের চোখেমুখে সুপরিব্যক্ত হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর বেশিদিন পরিবর্তমান বিশ্বে ইজরাইলকে বল-ভরসা দিয়ে টিকিয়ে রাখতে পারবে না বুঝেই ইজরাইল তার রাষ্ট্রিক অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে আপোস করছে আরবদের সঙ্গে।

গাঁয়ে গাঁয়েও দেখা যায়, আগের মতো শিক্ষিত বা বিত্তবান মাত্রই জনগণের মান্য নয় বা সালাম-নমস্কারের যোগ্য নয়। দিনমজুরও আজ স্বয়ম্ভর ও স্বনির্ভর, তাই সে ধনী লোকের অকারণ অনুরাগে, আনুগত্যে ও অনুগামিত্বায় নিজের হীনম্মন্যতার অভিব্যক্তি দেয় না, এখন বেআদবের ও বেআদবির যুগ। দফতরে, কারখানায়, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে যেখানেই মনিব-মালিক শোষণের বঞ্চনার এ অধিকার হরণের চেষ্টা করছে, সেখানে শ্রমিক-কর্মচারী-চাকুরে-শিক্ষক প্রভৃতি পেশা নির্বিশেষে প্রতিকার লক্ষ্যে প্রতিবাদে প্রতিরোধে এগিয়ে আসছে নিঃসঙ্কোচে নির্ভয়ে। আজ ঘরে-বাইরে জাগ্রত জনতা সর্বত্র আপন প্রাপ্যের অধিকার চায়। এবং প্রয়োজন হলে সে-অধিকার আদায়ের জন্যে, ন্যায্য দাবি আদায়ের লক্ষ্যে বুকের রক্ত দিতে রাজি।

যারা সোভিয়েত রাশিয়া ভেঙে গেছে বলে এবং চীনেও বিকৃতি দেখা দিয়েছে বলে উল্লসিত তাদেরও জানা-বোঝা ও মানা দরকার যে যুগ-লক্ষণ আজ প্রকট হয়ে উঠছে। সামন্ত-বুর্জোয়া যুগের অবসান আসন্ন। মানুষকে আর অনক্ষর রেখেও অজ্ঞ রাখা যাবে না। রেডিয়ো-টিভি-ক্যাসেট যোগে বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক জীবনচেতনা আজকাল গাঁয়ের গৃহকোণেও পৌঁছে যাচ্ছে। মানুষ এখন জানে ও বোঝে যে অদৃশ্য অলৌকিক কোন শক্তি নয়, মানুষকে তার বাঁচার অধিকার থেকে, তার ক্ষুধার অন্ন থেকে, তার তৃষ্ণার জল থেকে, তারই কর্মের অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করছে ধনে-শিক্ষায়-ধূর্ততায়-পেশীশক্তিতে ও জনবলে প্রবল শ্রেণীই। আজ গাঁয়ের অনক্ষর নারী-পুরুষ জানে ও বোঝে যে, এ সুন্দর দুনিয়ায় খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার জন্মগত অধিকার রয়েছে তার। অসহায়-অসমর্থকে ভাতা দিয়ে এবং সমর্থকে যোগ্যতানুসারে কাজ দিয়ে অন্নে বস্ত্রে শিক্ষায় স্বাস্থ্যে চিকিৎসায় ও নিবাসে নিশ্চিত ও নিশ্চিন্ত রেখে লালন-পালনের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য সরকারের তথা রাষ্ট্রের। সোভিয়েত রাশিয়ায় প্রতিটি মানুষের অশন-বসন-নিবাস-স্বাস্থ্য-শিক্ষা-চিকিৎসা ছিল সুনিশ্চিত। চীনেও এখনো সে-অবস্থা অটুট রয়েছে। ভাঙা সোভিয়েত রাষ্ট্রগুলোতে আজ নিঃস্ব, নিরন্ন, দুস্থ, দরিদ্র, বেকার, ভিক্ষাজীবী-বেশ্যা-চোর-ডাকাত-চোরাকারবারী-পুঁজিপতি প্রভৃতি সব মেলে। তাছাড়া গোত্রিক, শাস্ত্রিক, ভাষিক, আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যও স্বার্থবুদ্ধিপ্রসূত দাঙ্গা-লড়াই-দ্বেষণাও হচ্ছে প্রবল। মানুষ আগের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতোই কাড়াকাড়ি-মারামারি-হানাহানি করেই বাঁচার চেষ্টায় নিরত। এসব সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ছিল না, বা নেই।

মানুষকে আর বেশিদিন শোষিত-দলিত রাখা যাবে না— এ তথ্য, তত্ত্ব ও সত্য ক্রমেই নানা ক্ষেত্রে প্রকট হয়ে উঠছে। আমাদের অনুমান অচিরেই বৈশ্বিক স্তরে, আন্তর্জাতিক পর্যায়েই শোষিত মানুষের মুক্তি আসন্ন হয়ে উঠছে। শিগগির নতুনভাবে জনগণতান্ত্রিক সাংবিধানিক ব্যবস্থায় মার্কসবাদ গোটা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা পাবে হাঙ্গেরীর নির্বাচনে কম্যুনিস্টদের বিজয় সে-ইঙ্গিতই দিচ্ছে। কেননা নাফতা, গ্যাট, ইইসি, আশিয়ান প্রভৃতি পুঁজিবাদভিত্তিক ব্যবস্থা মানব-সমস্যা-সঙ্কট সমাধান করতে পারবে না। আমাদের ধারণা মার্কসবাদের বিকল্প এখনো বের হয়নি। অবশ্য পুঁজিবাদীরা আরো নতুন নতুন নীতি-নিয়ম-চুক্তি আশ্রিত হয়ে তৃতীয় বিশ্বের দুর্বল রাষ্ট্রগুলো শোষণ করে বাঁচার প্রাণপণ চেষ্টা অবশ্যই করবে। তবু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ও জাপানের এবং ন্যাটোজোটের অথবা সেভেন গ্রেট-এর অভ্যন্তরীণ সমস্যা-সঙ্কট ক্রমেই অসমাধ্য ও জটিল হয়ে উঠছে দেখেই আমাদের অনুমান-আন্দাজ-ধারণা যেন দৃঢ়মূল হয়ে উঠছে। অতএব সামনে আমাদের নতুন জগৎ, নতুন জীবন ও নতুন দিন রয়েছে— এ আশায়, আশ্বাসে ও বিশ্বাসে আমরা ধৈর্য ধরে প্রতীক্ষায় থাকব।

AMARBOI.COM

রাজনীতি ও এ কালের গণদাবি

তৃতীয় বিশ্বের অজ্ঞ-অনক্ষর, দুস্থ, দরিদ্র, নিঃস্ব, নিরন্নবহুল রাষ্ট্রে রাজনীতি, রাজনৈতিক দলের আদর্শ উদ্দেশ্য লক্ষ্য এবং কর্মসূচি, ভাষণ, বিবৃতি প্রভৃতির মধ্যে কোন সঙ্গতি-সামঞ্জস্য থাকে না সাধারণত। কারণ তারা ঋণ-দান-অনুদান-ত্রাণ দাতা আর্থ-বাণিজ্যিক মহাজন সাম্রাজ্যবাদীর অনুগত মুৎসুদ্দীরূপে ওদের আর্থিক সাহায্যে, পরামর্শে, ইঙ্গিতে ও স্বার্থে কাজ করতে বাধ্য হয়। আমাদের বাংলাদেশ যেমন এ মুহূর্তে একাধারে ও যুগপৎ NGO'র পক্ষে বিপক্ষে বলছে, বলছে ডান ও বাম রাজনীতির পক্ষে-বিপক্ষে এবং বলছে ইসলামী শাসনের ও সর্বাধুনিক প্রতীচ্য প্রগতিশীল অসাম্প্রদায়িক গণতন্ত্রের কথা তেমনি এ দেশেই একাধারে ও যুগপৎ চলছে অজ্ঞ-অনক্ষরদের সন্তানদের জন্যে অতীতমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা, প্রাগ্রসর ধনী ও মানী শিক্ষিত শহুরে লোকদের সন্তানদের জন্যে বিদেশমুখী শিক্ষার ব্যয়বহুল বিদ্যালয় আর সাধারণ শিক্ষিত, স্বল্প শিক্ষিত, অশিক্ষিত কিন্তু দরিদ্র আমজনতার সন্তানদের জন্যে চলছে সরকারি তত্ত্বাবধানে সরকারি নীতি-নিয়মে ও নির্ধারিত আদর্শে স্কুলে-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢিলেঢালা নির্লক্ষ্য ও দিশেভ্রষ্ট সাধারণ শিক্ষা। কাজেই জাতীয় জীবনে কোন নীতি-আদর্শ-লক্ষ্যগত মূলধারা এভাবে কখনো গড়ে উঠবে না।

ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রেও বনজ, কলজ, খনিজ, কৃষিজ উৎপাদিত ও নির্মিত পণ্যের বাজারে দেশে-বিদেশে বিস্তার ঘটিয়ে দেশকে অর্থসম্পদে ঋদ্ধ করার যথাপ্রয়োজনীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চেষ্টা নেই, নেই কল-কারখানার প্রত্যাশিত ও প্রয়োজনীয় সংখ্যার বিস্তার। শিক্ষিত অশিক্ষিত বেকারে ও ভিখারীতে দেশ আকীর্ণ। এ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রয়োগের যুগেও বিজ্ঞানে শিক্ষিত এবং ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার বেকার স্বল্পসংখ্যক নয়, অনেক, বহু। এরাও ভাত-কাপড়ের সমস্যা-সঙ্কটে ভুগছে। আর সাধারণ মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম কিন্তু নিম্নমানের উপাধিধারী বেকারের তো হিসেবও রাখে না কেউ, রাখা অসম্ভব বলে। প্রতি বছর মাধ্যমিক পাস-ফেল, উচ্চ মাধ্যমিক পাস-ফেল এবং বিএ-বিএসসি পাস-ফেল বাড়ছে প্রায় পাঁচ/ছয় লক্ষের মতো। এরা সাফকাপুড়ে ভদ্রলোক, কায়িক শ্রমে বিমুখ। দেশের সরকারের, রাজনীতিকদের এদের কাজ দেয়ার সাধ্যও নেই। তাছাড়া এদের সম্বন্ধে সরকার বা রাজনীতিক দল কিছুই ভাবে না। কেবল জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণকেই অবশ্য গুরুত্ব দেয়।

কালের দাবি, কালগত জীবনের চাহিদা অস্বীকার করার সাধ্য নেই কারো যে-কোন রাজনৈতিক দল ক্ষমতার গদী দখল করতে ও দখলে রাখতে চাইলেই সে-দলকে আমজনতার নয় কেবল, বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের আর্থিক, নৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং বিনোদনের ও আন্তর্জাতিক সমাজ-সংস্কৃতির চর্চা ও চর্যাও অপছন্দ হলেও মেনে চলতে হবে। আইয়ুব খানের আমলে আমজনতা সরকারী আইনে শাস্ত্রিক দুটো নীতি-নিয়ম, নির্দেশ বিনা প্রতিবাদে বর্জন করেছিল এবং এখনো তা কল্যাণকর বলে মনে করে সরকার ও সমাজ। একটি এতিমের পিতামহের সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার লাভ, অন্যটি স্ত্রীর অনুমতি ব্যতীত দ্বিতীয়-তৃতীয়-চতুর্থ স্ত্রী গ্রহণ শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে নিষিদ্ধকরণ।

আজকের পৃথিবীতে শিক্ষিত লোকেরা মা-বোন-স্ত্রী-কন্যাকে অফিসে চাকরি করতে দেয়— অর্থসম্পদ বৃদ্ধির গরজে। নারী-পুরুষের সহ-চাকরি, সহ-শিক্ষা, সহ-ক্রীড়া, ডাক্তার-নামের নারী-পুরুষে-অভেদে চিকিৎসা ও সেবা, নারী-পুরুষের মিশ্র আড্ডা ও সমিতি সংস্থা, নাচ-গান-বাজনা-নাটক সিনেমায় অংশগ্রহণ জীবনযাপনের আধুনিক নীতিনিয়ম, রীতিরেওয়াজ ও প্রথাপদ্ধতি বলে মানে শহুরে শিক্ষিত লোকেরা। নারীরও রাজনীতি করার, শাসন-প্রশাসন কার্যে নয় কেবল, পর পুরুষের সেবায়-শুশ্রূষায় চিকিৎসায় নার্স-ডাক্তার হিসেবে কাজ করা শুধু অর্থের জন্যে নয়, মানবিক দায়িত্ব ও কর্তব্য বলেই বিবেচনা করা হয় এবং জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-নিবাস-যোগ্যতা-দক্ষতা-স্বভাব-চরিত্র নির্বিশেষে মানুষকে শুধু 'মানুষ' রূপেই রাষ্ট্রের একজন সমান অধিকার প্রাপ্ত নাগরিকরূপে সর্বপ্রকারে যথাযোগ্য ও যথাপ্রাপ্য অধিকারে স্ব ও সুপ্রতিষ্ঠ রাখার দায়িত্ব রাষ্ট্রেরই তথা সরকারেরই। অর্থাৎ একটা অভিন্ন রাষ্ট্রিক নাগরিকত্বের ও এককরাষ্ট্রিক জাতীয়তার স্বীকৃতি একালে আবশ্যিক ও জরুরী।

প্রাচীন যুগের মতো গোত্রীয় বিচ্ছিন্নতায় ও স্বাতন্ত্র্যে বাস করার দিন অপগত। দাসত্ব, ক্রীতদাসত্ব, ভূমিদাসত্ব, চাকুরের বা ভৃত্যের প্রত্যাশিত আনুগত্যরূপ দাসত্ব এ যুগে কারো বঞ্চিত বা প্রাপ্য হতে পারে না। এখন প্রতিটি ব্যক্তিমানুষ স্বসত্তার স্বাধীনতার মূল্য, গুরুত্ব, অধিকার ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠছে। কাজেই যোগ্যতা, দক্ষতা আর্থিক অবস্থা এবং মান ও ক্ষমতাগত অবস্থান নির্বিশেষে মানুষের মনুষ্যত্বের ব্যক্তিসত্তার মূল্য-মর্যাদা স্বীকার করতেই হবে। আর স্বীকার করলেই যে-কোন ব্যক্তির দুনিয়ার যে-কোন বিষয়ে স্বমত পোষণের, পরিব্যক্ত করণের, মুদ্রিত আকারে প্রকাশের ও প্রচারের অধিকার স্বীকার করতেই হবে। কেননা, চিন্তার স্বাধীনতা, কথায় চিন্তা প্রকাশের স্বাধীনতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং রাষ্ট্রের সর্বত্র ঘুরে বেড়ানোর আর নাগরিক অধিকাররূপে প্রয়োজনে আন্দোলন চালানোর, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা গড়ে তোলার দাবি প্রয়াস-প্রযত্ন অবাধে চালিয়ে যাওয়ার ব্যক্তিগত অধিকারও মানতে হবে। উল্লেখ্য যে, মত পোষণের, মত প্রকাশের, আন্দোলনের অধিকার প্রয়োগ আর উচ্ছৃঙ্খল-বিশৃঙ্খল নির্লক্ষ্য স্বেচ্ছাচারিতা দুটো ভিন্নমুখী বিষয়। স্বাধীনতা-স্বাধিকার কখনো নির্লক্ষ্য সমাজ-সংস্কৃতি বিনাশী 'লেসে ফেয়ার' নয়। এ ক্ষেত্রে আমরা ভলতেয়ারের প্রখ্যাত উক্তি স্মরণ করতে পারি। "I disapprove of what yoy say, but I will defend to death your right to say it" এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের মালিক সরকার নয়-জনগণ—এ তথ্যও অবশ্য স্বীকার্য। সামন্ত-বুর্জোয়া সংস্কৃতিও এক প্রকারের মানবিক উদারতাপুষ্ট, বিবেকচালিত সংস্কৃতি হতে পারে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য আমাদের সামন্ত-বুর্জোয়া কোন ঐতিহ্য ছিল না। আমরা নিম্নবর্ণের, নিম্নবিত্তের, নিম্নবৃত্তির অজ্ঞ-অনক্ষর অন্ত্যজ হিন্দু-বৌদ্ধজ মুসলিমের বংশধর। ব্যতিক্রম এখানে আলোচ্য নয়। এ জন্যে আমাদের আত্মমর্যাদাবোধ, মানবিকগুণ ও বিবেকী বিবেচনাশক্তি নিতান্ত স্বল্পমাত্রায় বিদ্যমান। এ কারণেই লাভ-লোভ-স্বার্থচেতনা প্রবল হলে আমরা মুহূর্তে ঘৃণা-লজ্জা-ভয় পরিহার করে নিজেদের নিতান্ত প্রাণী পর্যায়ে নামিয়ে আনি। গুণ আমাদের এখানে প্রলুব্ধ করে না, শ্রদ্ধার গুরুত্ব এখনো আমাদের বোধগত নয়, আমরা কেবল পদাধিকারে ও অর্থসম্পদে মান ও ক্ষমতা অর্জনে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াই।

বিদ্যার ও বিজ্ঞানের বদৌলত মন-মত-মনন-মনীষা-রুচি-সাধ-স্বপ্ন-সংস্কৃতি তথা জীবনাচার দ্রুত বদলাচ্ছে গোটা পৃথিবীতে। পরিবর্তনের এ স্রোত রোধ করা যাবে না। আমাদের দেশেও রেডিয়ো-টিভি ক্যাসেট-সিনেমা-বইপত্র প্রভৃতি যোগে এবং পৃথিবীময় ঘুরে বেড়ানো লোকের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির ফলে অনেকেরই যুক্তি-বুদ্ধি-জ্ঞান-মনন-মনীষার অভাবে মনের মুক্তি না ঘটলেও বহু নতুন ভাব-ভঙ্গি আচার-আচরণ-জীবনধারণ পদ্ধতি চোখ-সহা, গা-সহা ও মন-সহা হয়ে গেছে। অতএব ব্যক্তিগত বিশ্বাস-সংস্কারধারণা-রুচি-আচার যেমন সহ্য করতে হবে, তেমনে প্রাগ্রসর ও প্রগতিপন্থী, বিজ্ঞানের তত্ত্বে, তথ্যে ও সত্যে আস্থাবান জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেকনিষ্ঠ জীবন যাপনে আগ্রহী মানুষকেও অবাধে তাঁর জীবন রচনার ও লালনের অধিকার দিতে হবে। তা হলেই কেবল রাজনৈতিক দল, মত ও কর্মসূচি কালানুগ হবে।

তা ছাড়াও কোন রক্ষণশীলতা, গ্রহণ-বিমুখতা, সংকীর্ণ চিত্ততা, বিজ্ঞানবিরোধিতা চলবে না, আমরা প্রতীচ্য চিকিৎসাবিজ্ঞান জাতীয় ঐতিহ্য চেতনাবশে বর্জন করতে পারব না। প্রতীচ্যে প্রচলিত, আবিষ্কৃত, উদ্ভাবিত ও সৃষ্ট শিল্প, সাহিত্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্র শিল্প, নাচ-গান-বাজনা অভিনয় পদ্ধতি প্রভৃতি স্বসংস্কৃতি ও স্বদেশ-স্বজাতপ্রীতি বশে বর্জন করতে পারব না। জ্ঞান-বিজ্ঞান-মনন-মনীষার প্রতীচ্য অবদান হবে আমাদেরও সম্পদ ও উত্তরাধিকার। এমনকি আমাদের স্থল-জল-বায়ু সেনাদের পোশাক, ব্যায়াম-প্রশিক্ষণ-অস্ত্রও আমরা প্রতীচ্য আদলেই পরিমার্জিত, উৎকর্ষিত ও বিবর্তিত করব। এ কালে আমরা হব, থাকব বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক। কেননা আমরা সৃষ্টিশীল নই, আবিষ্কারক নই, উদ্ভাবক নই, অনুকরণে-অনুসরণেই আমাদের কালোপযোগী জীবন-জীবিকাপদ্ধতি গ্রহণ-বরণ-রক্ষণ করতে হবে। কেননা সব প্রকৌশল-প্রযুক্তির, যন্ত্রের, জ্ঞানের, বিজ্ঞানের, রোগের নিদান ও প্রতিষেধক আবিষ্কারের-উদ্ভাবনের-চিকিৎসার, নতুন নতুন যন্ত্রের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্মাণে, মানবিকগুণেরও বিকাশে প্রতীচ্য মনন-মনীষা-দর্শন ও যুক্তিবাদ আমাদের সম্বল। কাজেই আমরাও ইংরেজীকে, স্যুটকে, য়ূরোপীয় আদব-কায়দাকে, এমনকি নতুন নতুন খাদ্য পানীয়কেই আমরা আন্তর্জাতিক জীবনে আমাদের আচারে-আচরণে বরণ করে নেব। এ যুগ বিচ্ছিন্নতার নয়— ঐক্যের ও সহযোগিতার। যানবাহন পৃথিবীকে ধনীর কাছে জনপদে পরিণত করেছে, রেডিয়ো-টিভি-ক্যাসেট-সিনেমা প্রভৃতি তার-বেতারে দূরকে করেছে নিকট বন্ধু, পরকে করেছে প্রতিবেশী, ঘরে বসে ধরাকে সরার মতোই দৃষ্টিগ্রাহ্য করা শ্রুতিগোচর করা সম্ভব হয়ে গেছে। ঘরে বসেই পৃথিবীকে দেখতে, শুনতে, জানতে ও বুঝতে হবে, বাঁচতে হবে সহযোগিতায় সহমর্মিতায় ও সহাবস্থানে। নারী-পুরুষের সমান অধিকার নয় কেবল, মানুষ নির্বিশেষের বাঁচার অধিকার সাহায্য-সহায়তা-সহযোগিতা পাওয়ার অধিকারও স্বীকার করতেই হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রগতির বাধা ও পন্থা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সত্যসন্ধ বিবেকবান মানবতাবাদী প্রখ্যাত বিশিষ্ট মনীষী
পদ্মভূষণ অন্নদা শঙ্কর রায় শ্রদ্ধাস্পদেষু
এবং
বোধে বিদ্যায় ব্যক্তিত্বে ও বাকপটুতায় পরিচিতমাত্রেরই প্রিয়
অধ্যাপক আবদুল ওয়াহেব মাহমুদ [এ ডাবলু মাহমুদ] শ্রদ্ধাস্পদেষু

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাম্প্রদায়িকতা ও জাতি বৈর

এক সময়ে পৃথিবীর পরিধি-পরিসর মানুষের অজ্ঞাত ছিল। অনুমান করাও ছিল অসম্ভব। অজ্ঞ-অসমর্থ-অসহায় কৌম-গোত্র-গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের পক্ষে অরণ্য-পর্বত-সমুদ্রসংকুল অনতিক্রম্য ভৌগোলিক ব্যবধানজাত অপরিচয় হাজার হাজার বছর ধরে মানব প্রজাতির প্রাণীদের স্থানিক বা আঞ্চলিক কৌমে, গোত্রে, গোষ্ঠীতে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন রেখেছিল। কৌম, গোত্র ও জীবনযাত্রার গরজে এবং খাদ্য সংগ্রহের সহজতার জন্যে যৌথজীবন স্থিতি পেয়েছিল অরণ্যে ও বন্ধুর আরণ্য পর্বতে। তাদের ছিল বুনো বর্বর প্রাণীর জীবন। সর্বপ্রাণবাদ, যাদু-টোটেম-ট্যাবু বিশ্বাস আর দৃশ্য-অদৃশ্য নানা শক্তিপ্রতীক ও নিয়তি-প্রতিম অরি-মিত্র শক্তিতে আস্থা-ভয়-ভক্তি-ভরসাই তাদের নিত্যকার ব্যবহারিক জীবন ও মানসজগৎ নিয়ন্ত্রিত করত। কৌমনেতা, গোত্রপতি কিংবা গোষ্ঠীসর্দারই ছিল তাদের চালক-পরিচালক-অভিভাবক যূথবদ্ধ জীবনে। নিজেদের মধ্যে কিছু নিয়ে বিবাদ তথা কাড়াকাড়ি মারামারি হানাহানি হলে ঐ নেতা গোষ্ঠীপতি-সর্দার-অভিভাবক-শ্রদ্ধা-ভক্তি-শক্তির পাত্রই তা মীমাংসা করে দিত। সেদিনও শাস্তি দিয়ে শায়েস্তা রাখতে হত দুরন্ত লিপ্সু দুষ্ট দুর্জন দুর্বৃত্তকে। রক্ষা করতে হত দুর্বলকে প্রবলের হুকুম-হুমকি-হুংকার-হামলা থেকে।

আবার জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে খাদ্যান্বেষণের ও খাদ্য সংগ্রহের গরজে অদূরবর্তী এক গোত্রের সঙ্গে অন্য গোত্রের কখনো কখনো মুখোমুখি হতে হত। কাজেই খাদ্যসামগ্রীর কিংবা অন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অধিকার নিয়ে প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা, হিংসা-ঘৃণা-সংঘর্ষ-সংঘাত আবশ্যিক ও অপরিহার্য হয়ে পড়ত। এমনিভাবে তাদের আরণ্য পার্বত্য জীবন চলছিল। দুর্গমতা থাকলেও অগম্যতা ও অপরিচয়ের বাধা অতিক্রমণে-অপসারণে আগ্রহী জ্ঞান-বুদ্ধি, শক্তি-সাহস, সংকল্পঋদ্ধ উদ্যমশীল উদ্যোগী মানুষের সংখ্যাও বাড়ছিল গোত্রে গোষ্ঠীতে বাঁচার প্রয়োজনে ও প্রেরণায়।

জনসংখ্যা আরো বৃদ্ধি পেল। সাহসী, হিতৈষী, গোত্রপতির বা গোষ্ঠীনেতার প্রেরণায়, প্রবর্তনায় ও পরিচালনায় শুরু হল আত্মোন্নয়ন লক্ষ্যে যাযাবর জীবন। এভাবে বিভিন্ন কৌম-গোত্র-গোষ্ঠীর প্রাজন্মক্রমিক অভিজ্ঞতায়, নৈপুণ্যে, কৌশলে, মননে শক্তির বৃদ্ধির ও ঋদ্ধির কারণে নেমে এল তারা সমতলে; হল পশু-পাখি পালক, হল কৃষিজীবী, প্রয়োজনীয় তরুলতা-ফলমূল উৎপাদক। এ সময়ে গোত্রিক ও গৌষ্ঠিক দ্বেষ-দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ-সংঘাত প্রায় নিত্যকার ঘটনা হয়ে উঠেছিল।

এবার জ্ঞানীগুণী-মননশীল ও চিন্তা-চেতনাঋদ্ধ মানবহিতৈষীরা সংঘর্ষ-সংঘাত কমিয়ে নিরুপদ্রব-নিরাপদ-নির্বিঘ্ন জীবনযাত্রা সম্ভব করার জন্যে মানুষে মানুষে মিলনের বাণী প্রচারে হলেন উদ্যোগী। এর জন্যে প্রয়োজন হল মানুষের শৈশব-বাল্যের বিস্ময়-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কল্পনা-বিশ্বাস-সংস্কারজাত দৃশ্য-অদৃশ্য ভয়-ভক্তি-ভরসা প্রতীক অরি-মিত্র শক্তির আসমানী ধারণা দানের। এঁরাই নবী-অবতার-শাস্ত্রী অলীক-অলৌকিক শক্তিধর মানুষ। এটি খুব কেজো হল। কেননা এ তত্ত্ব যাচাই-বাছাইয়ের উপায় সেদিনও ছিল না, আজো নেই। জন্ম-জীবন, সুখ-দুঃখ, রোগ-মৃত্যু নিয়ামক-নিয়ন্ত্রক সর্বপ্রকার নিয়তি নির্ধারক সর্বশক্তিমান অরি-মিত্র বহু ও বিবিধ দৈবশক্তি, সুরাসুর, ভূত-প্রেত, পিশাচ-দানব-রাক্ষস-ড্রাগন-জীন-পরীতে মানুষের বিশ্বাস-সংস্কার হল দৃঢ়মূল। এগুলোতে আস্থা স্থায়ী করে যৌথজীবনে ব্যক্তিমনের ষড়রিপুলিপ্সা সংযত রেখে সহ ও সমস্বার্থে সহিষ্ণুতায়। সহযোগিতায় ও সহাবস্থানের অঙ্গীকারে অনুপ্রাণিত করাই ছিল জনগণ হিতৈষীদের লক্ষ্য। এদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল; কৌম-গোত্র-গোষ্ঠী মিলে দেবতার আনুগত্যে ও অপদেবতার ভয়ে সম্প্রীতিতে একত্রে বসবাসের অঙ্গীকারে শাস্ত্রমানা তথা নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ, প্রথা-পদ্ধতি মানা একটা অখণ্ড সমাজ গড়ে উঠল এক একটা দূর বিস্তৃত অঞ্চলে। যেহেতু সব প্রয়োজনই স্থান-কাল-পাত্র-প্রতিবেশগত, সেহেতু কালান্তরে দেশান্তরে আর প্রজন্মান্তরে তা মন-মত-পথ ও সিদ্ধান্তগত বিরোধে, বিবাদে, বিচ্ছেদে বিখণ্ডিত হয়ে স্বাতন্ত্র্যের, দ্বেষণার, অবজ্ঞার, উপহাসের ও পরিহাসের এমনকি অসহিষ্ণুতার, অসহযোগের, অসহাবস্থানের কারণ হয়ে দাঁড়াল। যেহেতু বিজ্ঞানের মতো পরীক্ষণের ও পর্যবেক্ষণের কোন উপায় নেই, সেহেতু বিশ্বাস-সংস্কারের ভিত্তিই হল ভয়-ভক্তি-ভরসা, অদৃশ্য নিয়তিতে আস্থা। অবশ্য জ্ঞান-বুদ্ধির ও হাতিয়ারের বিকাশে আত্মপ্রত্যয় বৃদ্ধির ফলে মানুষের বিশ্বাস-সংস্কারও বিবর্তিত-পরিবর্তিত হয়েছে বারবার, যদিও তা লাটিমের মতোই একইভাবে ঘুরেছে, স্থানচ্যুত হয়েছে, কিন্তু বিশ্বাস-সংস্কার বিলুপ্ত হয়ে অস্তিত্ব হারায়নি। তাই ধর্মমতের ও ধর্মবিশ্বাসের বিবর্তন-পরিবর্তন হয়েছে বটে অর্থাৎ নতুন নতুন ধর্মমতের ও পথের, পাপের ও পুণ্যের ধারণায়-আচারে-আচরণে স্থানিক-কালিক পারিবেশিক ও সামাজিক পরিবর্তন কালে কালে, দেশে দেশে যদিও এসেছে, কিন্তু ভূতে-ভগবানে, তুকে-তাকে, বাণে-উচ্চাটনে, মন্ত্রে-মাদুলীতে, ঝাড়ে-ফুঁকে, তাবিজে-কবচে, পানি-চিনি-ধূলি পড়ায় কোন পরিবর্তন আজো হয়নি। কেননা, বিশ্বাস-সংস্কারের ক্ষেত্রে তথা প্রজন্মক্রমে প্রাপ্ত শাস্ত্রমানা মানুষ এক্ষেত্রে কখনো নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-বিবেক-বিবেচনাশক্তি প্রয়োগ করে না, করতে সাহস পায় না। অন্তত বার্ধক্যে মৃত্যুচিন্তা কবলিত হয়ে মেনে চলে।

মানুষের মৃত্যুভয় তো অমর আত্মার পারত্রিক শাস্তি সঞ্জাত। নিরীশ্বরের মৃত্যুতেই চৈতন্যের অবসান। তাই তাদের বাঁচা আনন্দের, কিন্তু মৃত্যু ভয়ের নয়। প্রাচীনকালে হয়তো এতে অজ্ঞ-আকীর্ণ অবিকশিত সমাজে এ বিশ্বাস-সংস্কার, এ পুণ্যলোভ ও পাপভীতি, দেবানুগ্রহলোভী, ক্ষতি-ভীরু মানুষকে সমাজে শান্তিতে সহাবস্থানে প্রবর্তনা দিয়েছে।

মধ্যযুগে স্বধর্মশাস্ত্রের ক্ষেত্রে মত-পথের পার্থক্য প্রায়ই রক্তক্ষরা ও প্রাণহরা হয়েছে সভ্য জগতের সর্বত্র। বিধর্মীর সঙ্গেও রক্তঝরা প্রাণহরা সম্পদ-কাড়া বিবাদ-বিরোধ কম ঘটেনি।

মানুষ স্বশাস্ত্রীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেক-বিবেচনা প্রয়োগ করে না বলে অর্থাৎ কৌতূহল, সন্দেহ, অবিশ্বাস, জিজ্ঞাসা নিয়ে এর সত্যাসত্য তথা বাস্তবতা-অবাস্তবতা, যুক্তিগ্রাহ্যতা যৌক্তিক-বৌদ্ধিক প্রমাণে অনুমানে যাচাই-বাছাই করে না বলেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজের শাস্ত্রের সব অবাস্তব-অসম্ভব গালগল্প বাস্তব ও সত্য বলে মেনে নেয়, কিন্তু পরধর্মে আস্থা নেই বলে পরধর্মের অবাস্তব-অসম্ভব কিসসা-কাহিনী ভৌতিক ও বানানো বলে সহজেই অনুভব-উপলব্ধি করে জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধিগ্রাহ্যতার অভাব জাত বলে। এ এক অদ্ভুত, কিম্ভূত-ভূতে বিশ্বাস। অথচ আজ অবধি মানুষে মানুষে মানসিক, ব্যবহারিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক বিচ্ছিন্নতার, স্বাতন্ত্র্যের ও বৈরিতার মূল উৎস এ ধর্মবিশ্বাসই, এ আস্তিক্যই, এ ঈশ্বরবাদই। স্বধর্মকে সবাই সত্য ও শ্রেষ্ঠ বলে জানে আর পরধর্ম সেখানে হয় মিথ্যে, ত্রুটিবহুল কিংবা বাজে। কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। আগে পরধর্মে অবজ্ঞা ছিল সুপ্ত, গুপ্ত, কিংবা নিষ্ক্রিয়। অর্থাৎ দাঙ্গা-হাঙ্গামার-হননলীলার কারণ ঘটাত না। কিন্তু ব্রিটিশ ভেদনীতি প্রয়োগে শাসনে-শোষণে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকার গরজে ভারতবর্ষের তুর্কী-মুঘল আমলের এক বিকৃত ইতিহাস খাড়া করল। তুর্কী-মুঘল রাজত্ব হল মুসলিম রাজত্ব, প্রজা হল হিন্দু-যে নাম ধর্মবিশ্বাসী হিসেবে ব্রিটিশ-পূর্ব যুগে বলতে গেলে ব্যবহৃতই হয়নি।

তুর্কী-মুঘলরা ছিল অসহিষ্ণু, মূর্তিপূজকবিদ্বেষী, দেউল-দেহারা বিনাশক, হিন্দুপীড়ক, শোষক এবং হিন্দুকে জোরে-জুলুমে মুসলিম বানিয়ে বর্বর। কাজেই ছয়শ বছর ধরে মন্দির-মূর্তি ভাঙা আর হিন্দুকে শাসনে-শোষণে-পীড়নে রাখা, তার ধর্ম কাড়াই ছিল তুর্কী-মুঘলের নিত্যকার কাজ। এতে দেশজ স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য হিন্দু-বৌদ্ধ থেকে দীক্ষিত হওয়া নিঃস্ব, দুস্থ, নিরন্ন, অজ্ঞ, অনক্ষর ভেঙে ও ক্ষুদ্র পেশাজীবী চাষী-মজুর মুসলিমরাও ভাবল তারা তুর্কী-মুঘল বাদশাহর জাত, ব্রিটিশ আমলেই ব্রিটিশ কৃপা-করুণা, দাক্ষিণ্যপুষ্ট হিন্দুরাই ব্রিটিশ অনুগ্রহযোগের সুযোগে এবং তাদের অজ্ঞতা-অনক্ষরতার বৃদ্ধির ফলে তাদের অর্থ-সম্পদ-পেশা তথা উপার্জনের সব পদ ও পথ দখল করে হিন্দুরাই তাদের শাসক, শোষক ও পীড়ক প্রভু হয়ে বসেছে শহরে বন্দরে ও গাঁয়ে-গঞ্জে। তারা তুর্কী-মুঘল আমলে বাদশার জাত ও জ্ঞাতি হিসেবে ছিল গুণে-মানে-ধনে-বিদ্যায়-বিত্তে শ্রেষ্ঠ আর হিন্দুরা ছিল তাদের প্রজা। এ মিথ্যে ধারণাই তাদের মনে উপ্ত করল দ্বেষণার বিষবৃক্ষ।

অন্যদিকে যদিও বিদেশী ইরান-গ্রীস-শক-হূন শাসিত এবং বৌদ্ধ প্রভাবিত অঞ্চল মুলতান অবধি ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের ক্ষীণতার দরুন ইসলাম তুর্কী আমল থেকেই প্রসার লাভ করতে থাকে। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য প্রভাবিত পূর্ব পঞ্জাব থেকে গোটা উত্তর-দক্ষিণ ভারতে বর্ণহিন্দু কোথাও ব্যক্তিগতভাবে কিংবা পারিবারিকভাবে দায়ে না পড়লে ইসলাম বরণ করেনি। কারণ স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য শূদ্রসেব্য বর্ণহিন্দু সমাজ ইসলামী সাম্যে আচন্ডালের কাতারে নেমে সর্বপ্রকারে কুল-মান-সেবা-সম্পদ বঞ্চিত হয়ে হারাত তাদের আড়াই হাজার বছরের শ্রেষ্ঠত্ব, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। তাই তারা ইসলাম বরণ করেনি, এজন্যেই গোটা ভারতে তুর্কী-মুঘলের রাজ্যে এবং হিন্দুরাজ শাসিত অঞ্চলে, দাক্ষিণাত্যে বা নেপালে কোথাও, রাজধানীতেও মুসলিম সংখ্যা কোনকালেই শতে ৭/৮ জনের বেশি ছিল না উনিশ শতকের গোড়ার দিকেও। হিন্দুরা জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি প্রয়োগে এর সত্যতা ও যৌক্তিকতা যাচাই করল না। ভেদনীতি প্রয়োগ লক্ষ্যে ব্রিটিশ লিখিত 'ইতিকথা' কেবল মুখস্থ করল, আক্ষরিকভাবে সত্য বলে জানল, বুঝল এবং মানল। সাক্ষ্য-প্রমাণযোগে যাচাই-বাছাইয়ের প্রয়োজনবোধ করল না। কোথায় কোন্ জনপদে-গাঁয়ে-গঞ্জে-বন্দরে-শহরে হিন্দুদের তরবারির মুখে ভয় দেখিয়ে মুসলিম বানাল, কিংবা হত্যা করল সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রমাণ-দলিল-সাক্ষ্য আজো সংগ্রহের আগ্রহ নেই কারো। তারাই যে তুর্কী-মুঘল আমলে গাঁ-গঞ্জে রাজ্যশাসন করেছে, দেওয়ান-মন্ত্রী যে তারাই ছিল, তা তারা মনে রাখেনি। ফলে হিন্দুরা জানল গাঁ-গঞ্জে বৌদ্ধ-হিন্দু-শূদ্রজ মুসলিমরাই তুর্কী-মুঘল আমলে তাদের ওপর অত্যাচার-নিপীড়ন চালিয়েছে, তাদের মন্দির-মূর্তি ভেঙেছে। কাজেই তারা চিরশত্রু। অথচ পরিত্যক্ত জীর্ণ বা ভাঙা মন্দিরের ইট-পাথর অপেক্ষাকৃত সংস্কারমুক্ত মুসলমানরা মসজিদে লাগিয়েছে বটে, কিন্তু হিন্দুপাড়ার কোন মন্দির-মূর্তি তুর্কী-মুঘলরা ভেঙেছে বলে প্রমাণ মেলে না। বিদ্রোহী সামন্ত হিন্দুদের জান-মাল-গর্দান নেয়ার সময়ে তার বাড়িঘর-মন্দির-মূর্তি অবশ্য ভেঙেছে তুর্কী-মুঘল শাসক-প্রশাসকরা, অথবা নতুন রাজ্য জয়কালেও তেমন কর্ম করতে হয়েছে। একালেও লাহোরে মসজিদে হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে মুসলিম প্রশাসক, শিখ স্বর্ণমন্দির অপবিত্র করেছে স্বধর্মী হত্যা করেছে শিখ সৈন্যরাই। ১৯৭১ সালে রমনা মন্দির-মূর্তি ভেঙেছে পাকিস্তানী সৈন্যরা, হত্যা করেছে লক্ষ মুসলিম। এই সেদিনও বাবরি-রামজন্মভূমি দ্বন্দ্ব-সংঘাতের তরঙ্গতাড়িত উত্তেজিত মুসলিমরা বাঙলাদেশে ও সিন্ধু প্রদেশে মন্দির ভেঙেছে। এমনি ইতিবৃত্ত রয়েছে এশিয়া-য়ুরোপে মসজিদ-গীর্জা-সিনাগগ ভাঙার ও দখল করার। শত্রুর প্রতি মানুষ চির নির্মম-নিষ্ঠুর। আমরা জানি মানুষ কাড়াকাড়ি, হানাহানি করেই থাকে দলবদ্ধ যৌথজীবনে। এ এড়ানো যায় না। খ্রীস্টান য়ুরোপে ভাষাভিত্তিক জাতীয় রাষ্ট্র করেও দু'দুটো মহাযুদ্ধ এড়ানো যায়নি। এর উৎসে অর্থসম্পদ-মান-ক্ষমতা-খ্যাতির অধিকার লিপ্সাই মুখ্য। তাছাড়া ঈর্ষা-হিংসা-ঘৃণাও অন্যতর কারণ। তবে এ তিনটের মূলে থাকে প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা। নগণ্য সংখ্যার দরিদ্র বিধর্মী বিভাষী, বিদেশীর প্রতি কারো তেমন দ্বেষণা দেখা যায় না কোথাও। আফ্রিকায় গোত্রদ্বেষণা, যুক্তরাষ্ট্রে গাত্রবর্ণদ্বেষণা, ভারতে জাতপাতনামে উচ্চবর্গের হিন্দুর শূদ্রদ্বেষণা, উপমহাদেশের সর্বত্র হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে পারস্পরিক দ্বেষণা (পার্সী-খ্রীস্টান-বৌদ্ধ দ্বেষণা দুর্লক্ষ্য) ছাড়াও একই ধর্মাবলম্বীর মধ্যে মতের, পথের, আচারের ও তত্ত্বের ভিন্নতাজাত দ্বেষণা চালু রয়েছে। কাজেই ধর্মমতের পার্থক্য গোত্রীয় পার্থক্য, গাত্রবর্ণের ভিন্নতা দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-সংঘাতের মূল কারণ নয়। অর্থ-বিত্ত-ক্ষমতার ক্ষেত্রে প্রতিযোগী-প্রতিদ্বন্দ্বীর বিবাদই দাঙ্গা-হাঙ্গামার উৎস। পাকিস্তানে সিন্ধি-মহাজের লড়াই, আসামে বাঙালী হত্যা ও বাঙালী বিতাড়ন, বোম্বাইয়ে ও অন্যত্র নানা ছল-ছুতোয় শূদ্র হত্যা, মণ্ডল কমিশনে অনগ্রসর উপজাতি ও সম্প্রদায় নিতান্ত কয়েকটি সরকারি চাকরি বেশি পাবে–এ সংবাদেই কিশোর-তরুণদের আত্মহত্যার হিড়িক দেখে কি মনে হয় না যে এর কোন সাধারণ ও স্থায়ী সমাধান নেই?

অর্থে-সম্পদে, বিদ্যায়-বিত্তে প্রতিযোগী ও প্রতিদ্বন্দ্বী ধার্মিক, ভাষিক, বার্ণিক-গৌত্রিক সংখ্যালঘু তথা ঊনজনমাত্রকেই অধিজন তথা সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের হাতে জান-মাল-গর্দান নিয়ে অনিশ্চিত জীবনযাপন করতেই হবে। সবচেয়ে যন্ত্রণাদায়ক হচ্ছে অধিজনেরা কথায়, কাজে ও আচরণে ঊনজনকে সর্বক্ষণ মানসিক পীড়ায় নিজেদের অজ্ঞাতেই পীড়িত রাখে। ফলে ওরা জান-মাল-গর্দানে নয় কেবল, সারাটা জীবন মানসিকভাবেও অনিশ্চিত, উপদ্রুত, বিপন্ন মনে করে আর স্বঘরে স্বদেশে পরগাছার হীনমন্যতায়, প্রবাসীর জীবনের অবমাননায় ও বেদনায় ভোগে। মনীষাঋদ্ধ য়ুরোপীয় সমাজে ইহুদী-দ্বেষণাই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এর মূল কারণ মানব প্রজাতির মানুষেরাও স্বভাবে প্রাণীই থেকে যায়, ক্বচিৎ কেউ প্রমূর্ত মনুষ্যত্ব অর্জন করে। তেমন লোক 'লাখে না মিলয়ে এক'। মানববাদী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনুষ্যত্বসম্পন্ন জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেক-বিবেচনা চালিত মানুষের সংখ্যা যেখানে অন্তত শ'তে ষাটজন হবে, সেখানেই কেবল এসব অমানবিক আচরণ দুর্লভ বা বিরল হবে। মানুষের হিংস্রতা যে কত নির্মম হতে পারে, তা যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকের এবং অপরাধীর প্রতি পুলিশের আচরণে দেখা ও বোঝা যায়।

রাজনীতিকরা ও বেণেরা, দরিদ্র-অজ্ঞ-অশিক্ষিত গুন্ডা-মস্তান-খুনী-লুটেরাদের নানাভাবে উত্তেজিত, প্ররোচিত ও প্রলুব্ধ করে দাঙ্গায়-নরহত্যায়। তার পরিণামে ফায়দা লুটে ওই ধনী-মানী-খ্যাতিসম্পন্ন বিদ্যায়, বিত্তে ও বুদ্ধিতে স্বয়ম্ভর কিন্তু মনুষ্যত্বরিক্ত লোকেরাই।

এসব কথাগুলোই এ বইয়ের বিভিন্ন প্রবন্ধে বলার চেষ্টা করেছি। তবু সার-সংক্ষেপ-এর মতো সব কথার উল্লেখ করলাম এজন্যে যে, যে পাঠক বইটি পড়ার জন্যে অর্থ, শ্রম ও সময় অপচয় করতে পারবেন না, তিনি অন্তত এ লেখায় চোখ বুলিয়ে চিন্তা-ভাবনার কিছু সূত্র পেয়েও যেতে পারবেন।

একালের গণতন্ত্র জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-নিবাস-বিদ্যা-বিত্ত, আঁধা-কানা-খোঁড়া নির্বিশেষে মানুষমাত্রেরই সমান নাগরিক অধিকার সরকারকেই স্বীকার করতে হবে। এজন্যে সরকারমাত্রকেই আক্ষরিক অর্থে সেক্যুলার তথা ধর্মবিশ্বাস নিরপেক্ষ হতেই হবে। কেননা সব মানুষ কখনোই নাস্তিকও হবে না, কম্যুনিস্টও হবে না; কাজেই ধর্ম ব্যক্তিগত বিশ্বাসে ও আচরণে থাকবে নিবদ্ধ, তা সামাজিক-রাষ্ট্রিক পালা-পার্বণরূপে স্বীকৃত হবে না। সরকারে ধর্মের ঠাঁই থাকবে না।

আজকের যন্ত্রযুগে ও যন্ত্রজগতে পৃথিবী নিতান্ত একটা অঞ্চল বা চাকলায় পরিণত হয়েছে, যেন একটা হাটবাজারের চারপাশেই বাস করছে গোটা দুনিয়ার মানুষ। একালে ধর্মীয় জাতিরাষ্ট্র ইজরাইলেও কেবল ইহুদীর বাস সম্ভব হল না, অন্যদেরও রাষ্ট্রে ঠাঁই দিতে হচ্ছে। এ যুগে কোন ভাষার ও ধর্মের মানুষ স্বাতন্ত্র্যে বাস করতে পারে না, পারবে না; বিভিন্ন রাষ্ট্রের শহরে-বন্দরে-বাজারে পৃথিবীর নানা দেশের, নানা বর্ণের, ধর্মের, ভাষার, মতের ও পথের মানুষকে ঠাঁই দিতেই হবে; সম্পর্ক-সংযোগ রাখতে হবে বিশ্বের সব রাষ্ট্রের সঙ্গে। একাল হচ্ছে লগ্নি পুঁজির, বাণিজ্য পুঁজির ও শিল্প পুঁজির আকারে বিশ্ববাজারে অর্থসম্পদ লেনদেন করবার কাল। আজ বিজ্ঞানীর আবিষ্কার-উদ্ভাবনের নিত্যনতুন উৎকর্ষে ও বৈচিত্র্যে উৎপাদনে-নির্মাণে-বন্টনে নতুন নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ, প্রথা-পদ্ধতি চালু হয়ে গেছে। কেজো যন্ত্রের বৈচিত্র্যে ও উৎকর্ষে, প্রকৌশল-প্রযুক্তির ক্রমোন্নয়নে প্রতীচ্য দেশে চিকিৎসাবিদ্যার প্রসারে, রোগ নির্ণয়ে, প্রতিষেধক ঔষধ আবিষ্কারে মানুষের বিস্ময়কর সাফল্য আর ইহজাগতিক জীবনাচারের বিকাশ, বৈচিত্র্য ও উৎকর্ষ রেডিও-টিভি-সিনেমা-ক্যাসেটযোগে এবং বিশ্বময় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ছাত্র, বেণে, চাকুরে আর পর্যটক প্রভৃতির বদৌলত আজকের সংহত ব্যবহারিক জীবনে তৈজসে-আসবাবে-খাদ্যে-পোশাকে-সাহিত্যে-শিল্পে-ভাস্কর্যে-স্থাপত্যে এবং মানসিক জীবনে চিন্তা-চেতনায় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা কারো পক্ষেই সম্ভব হবে না, হবে না গাঁয়ে-গঞ্জে অজ্ঞ-অনক্ষরদের পক্ষেও। রাজনীতি সম্পৃক্ত সাম্প্রদায়িকতা ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা-হত্যাও একটা আধি-ব্যাধি মাত্র; এ যুগে সব আধি-ব্যাধির প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হচ্ছে, ঔষধ মিলছে, এর প্রতিষেধক উদ্ভাবিত হবেই। কারণ মানুষের ব্যবহারিক জীবনের মতোই মানস উৎকর্ষও ঘটছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অদূর ভবিষ্যতে মানুষ গৌত্রিক, গৌষ্ঠিক, ভাষিক, দৈশিক, রাষ্ট্রিক; সাংস্কৃতিক এমনকি ধার্মিক স্বাতন্ত্র্য প্রীতি পরিহার করে বৈশ্বিক ও বিশ্বমানবিক চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়ে অভিন্ন মানবিক ও বৈশ্বিক সংস্কৃতির, মনীষার, মনস্বিতার ধারক-বাহক-প্রচারক হয়ে উঠবে। তখন খুব কম লোকই হয়তো প্রাণীর মানবপ্রজাতি স্তরে থাকবে। দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-প্রতারণা-ষড়যন্ত্র-হত্যা প্রভৃতিও কমবে। মানুষ সহ ও সমস্বার্থে, সংযমে, সহিষ্ণুতায়, সহযোগিতায়, সৌজন্যে, সহাবস্থানে দায়বদ্ধ হবে–এ আশায়, আশ্বাসে ও প্রত্যাশায় থাকবে ও বাঁচবে মানুষ।

সাম্প্রদায়িকতার শেকড় ও শাখা-পল্লব

আগের কালে অর্থাৎ আদি ও আদিমকালে মানুষ তাদের গৌষ্ঠিক-গৌত্রিক জীবনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছেদে-বিচ্ছিন্নতায় কালক্রমে অপরিচয়ে ও পরস্পরের অজ্ঞাতে বসবাস করতে বাধ্য হত। খাদ্যান্বেষণের প্রয়োজনে যাযাবর জীবন ছিল অপরিহার্য। তাছাড়া তখনো অজ্ঞ-অসহায় মানুষ কেবল রোদ-বৃষ্টি-শৈত্য থেকে নয়, অন্য প্রাণীর হামলা থেকে আত্মরক্ষার প্রয়োজনেও অরণ্যে-পর্বতে-গুহায় আত্মগুপ্তিতে আত্মরক্ষণের ব্যবস্থা করত। ফলে প্রতিটি দলকেই নিজেদের জ্ঞান-অভিজ্ঞতা-বুদ্ধি-প্রয়োজনানুগ জীবনই যাপন করতে হত। তাছাড়া আমরা জানি সূর্যের নৈকট্য ও দূরত্ব অনুসারেই সূর্যের তাপের ও প্রভাবের তারতম্য অনুসারেই জল-বায়ু-মাটির শৈত্য ও উষ্ণতা গুণে-মানে-মাপে-মাত্রায় ভিন্নতা বা বৈচিত্র্য পায়। তাতেই বেড়ে ওঠে প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনীর পার্থক্য। আর সে পার্থক্যই প্রাণীমাত্রেরই দেহ-প্রাণ-মন-খাদ্য অবয়বের আকার প্রকার রূপ-রঙ তৈরি বা নিয়ন্ত্রিত করে।

আবার প্রয়োজন-চেতনাই, বাঁচার গরজই, আবহাওয়াজাত তথা ঝড়ঝঞ্ঝা-খরা-বন্যা-মারীজাত নানা সংকট-সমস্যা মানুষের সর্বপ্রকার জীবন-জীবিকা প্রয়াসের উৎস। জীবন যেখানে যত সংকটবহুল, কিংবা মানুষ যেখানে জিজ্ঞাসু ও উদ্যমশীল, সেখানেই আবিষ্কারে-উদ্ভাবনে ও সৃষ্টিশীলতায় তথা মানসানুশীলনে এগিয়ে গেছে। আমরা প্রাচীন যে কয়টি সভ্যতার ইতিবৃত্তান্ত জানি ও শুনি ও অনুমান করি, তাদের সংস্কৃতি-সভ্যতার তথা আকাঙ্ক্ষা পূর্তি ও চাহিদা পূরণ লক্ষ্যে তারা যা কিছু করেছে তার পেছনে ছিল বাঁচার গরজ ও স্বপ্ন-সাধ পূরণের প্রেরণা।

সেকালে এভাবেই মানুষকে বিচ্ছিন্নতায়, স্বাতন্ত্র্যে, স্বয়ম্ভর, স্বনির্ভর হয়ে বাঁচতে হয়েছে। সব মানুষের মেধা-মগজ, কাঙ্ক্ষা, উদ্যম, জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি, রুচি ও দৃষ্টি সমান নয়। তাছাড়া মানুষ দলবদ্ধ জীবনে যতটা পরনির্ভর, পরানুগত, পরানুগামী ও গতানুগতিক জীবনাচারে, জীবনযাপন পদ্ধতিতে, নীতি-নিয়মে আশৈশব অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, স্বকীয় চিন্তা-চেতনায় কখনো ততটা চালিত হতে সাহস পায় না। ফলে বিস্ময়-কল্পনা-বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা-ভয়-ভক্তি-ভরসা তার সারাজীবন যান্ত্রিকভাবে নিয়ন্ত্রণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে। এজন্যেই আমরা শাস্ত্র-সমাজ-সর্দার-সরকার-বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণাতিরেগ জীবন কল্পনাও করি না। ব্যতিক্রম কারুর মধ্যে দেখলে তাকে আমরা দ্রোহী বলে নিন্দা-ঘৃণা করি, ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে লাঞ্ছিত ও নিহত করি।

যানবাহনের অভাবে বিচ্ছেদে-বিচ্ছিন্নতায়-অপরিচয়ে অজ্ঞাত ভৌগোলিক ব্যবধানে বাস করার ফলে মানবগোষ্ঠী গোত্রগুলোর যারা আবিষ্কারে-উদ্ভাবনে-সৃষ্টিশীলতায় অসমর্থ হয়েছে, তারা প্রায় আদি ও আদিম প্রাণীর জীবনই যাপন করছে আজো। আর যারা নিজের আবিষ্কারে-উদ্ভাবনে-সৃষ্টিতে সমর্থ নয়, অথচ অন্যদের সঙ্গে সংগ্রাম কিংবা শাসন অথবা বাণিজ্যসূত্রে পণ্য ও ভাব বিনিময়ের সুযোগ পেয়েছে, তারাও আমাদের মতোই অনুকরণে-অনুসরণে-গ্রহণে-বরণে সংস্কৃতিমনা ও সভ্য হয়েছে। অন্যদের শাস্ত্রিক, সামাজিক, প্রশাসনিক বিধিনিষেধ-নীতিনিয়ম-রীতি-রেওয়াজ, প্রথা-পদ্ধতি, খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, শিক্ষা প্রভৃতি গ্রহণ-বরণ করে তা সমকালীন অগ্রসর প্রাগ্রসর প্রগতিশীল জীবনযাপনে ধন্য ও কৃতার্থ হয়েছে।

যারা আবিষ্কার-উদ্ভাবন-সৃষ্টি করতে পারেনি, পারে না, অন্যদের অবদান গ্রহণ-বরণ করতে নারাজ, তারা আজো আদিবাসী ও উপজাতি নামে কিংবা বুনো-বর্বর-অনুন্নত-অসভ্য গোত্ররূপে ঘৃণ্য ও অবজ্ঞেয় হয়ে রয়েছে।

এরা নিজেদের Identity ও Entity হারাতে চায় না, অর্থাৎ এরা নিজেদের স্বতন্ত্র গৌষ্ঠিক, গৌত্রিক, অস্তিত্ব ও পরিচিতি বিলুপ্তির শঙ্কায় উন্নততর গোষ্ঠীর ও মানুষের সান্নিধ্য, প্রভাব, অনুকরণ, অনুসরণ নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ প্রথা-পদ্ধতি এড়িয়ে চলে। স্বাতন্ত্র্যচেতনাই তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও পরিচিতি রক্ষায় একমাত্র উপায় বলেই তারা জানে, বোঝে ও মানে। এ জন্যে কূর্মবৃত্তি ও কূর্মস্বভাবই এদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার একমাত্র উপায় বা পন্থা বলেই তারা জানে। এরাই সাংস্কৃতিক, সামাজিক, শাস্ত্রিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্যে সদা সতর্ক ও সচেতন থাকে। সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষার প্রয়াস সব অনুন্নত জাতির লক্ষণ। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এ কূর্মপ্রবৃত্তি কমবেশি পৃথিবীর সব সভ্য জাতির মধ্যেই রয়েছে। বিশেষ করে যেসব শাস্ত্রিক ও দৈশিক বা গৌত্রিক জাতি আবিষ্কারে উদ্ভাবনে সৃষ্টিশীলতায় উদ্যমশীল নয়, বন্ধ্যা ও অবক্ষয়গ্রস্ত, তারা এখন নিজেদের শাস্ত্রিক, সামাজিক, আচারিক নীতি-নিয়মের, রীতি-রেওয়াজের, প্রথা-পদ্ধতির নিগড়ে নিবদ্ধ, নিতান্ত গতানুগতিক যান্ত্রিক জীবনচেতনায় অভ্যস্ত এবং অতীত ও ঐতিহ্যগর্বী, অতীতমুখিতায় তৃপ্ত, তুষ্ট ও হৃষ্ট। তারাও এমনি আচারের-আচরণের নীতি-নিয়মের রীতি-রেওয়াজের প্রথা-পদ্ধতির, পোশাকের, খাদ্যের পরিবর্তনে চেতনার-চিন্তার সমকালীনতায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। নতুনভীতি তাদেরও এমন প্রবল যে, তারা নতুন চিন্তার মানুষকে হত্যা করতেও দ্বিধা করে না আজো। তারা মনে-মগজে-মনীষায়-জ্ঞানে-বুদ্ধিতে-যুক্তিতে-বিবেকে-বিবেচনায়-শক্তিতে বন্ধ্যা ও বদ্ধচিত্ত। তারা বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণার দুর্ভেদ্য, দুর্লঙ্ঘ্য দুর্গে বদ্ধ। নতুন চেতনা-চিন্তা-মনন সেখানে প্রবেশপথ পায় না।

এমনি মন-মনন-মেজাজ এবং আশৈশবলব্ধ বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণাচালিত মানুষ প্রকৃতিবাদী, প্রত্যক্ষবাদী, যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানের তত্ত্বে, তথ্যে ও সত্যে আস্থাবান হতেই পারে না। তারা জেনে-বুঝে নয়, প্রজন্ম পরম্পরায় নানা সূত্রে ও প্রসঙ্গে শাস্ত্রের খণ্ডভাবে যৌক্তিক পারম্পর্য ও তাৎপর্যহীন উপযোগরিক্ত নানা বিধি-নিষেধ মত ও আচার শ্রুতিস্মৃতি মাধ্যমে মগজে লালন করে আর পার্বণে আচরণেও রূপায়িত করে। কাজেই জিজ্ঞাসা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সন্দেহ ও উদ্যমহীন মানুষমাত্রই যান্ত্রিক জীবনযাপনে ও গতানুগতিক মননে অভ্যস্ত থাকে। এ তাৎপর্যে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজমাত্রই লঘু-গুরুভাবে রক্ষণশীল এবং নিশ্চিন্ত বিশ্বাসের নিশ্চিন্ত জীবনে স্বস্থ। এ কারণেই পৃথিবীর উন্নততম-প্রাগ্রসরতম সমাজেও প্রত্যাশিত মাত্রায় ও গতিতে সংস্কৃতি-সভ্যতা এগোয়নি। অতীত, ঐতিহ্য, স্বাতন্ত্র্যপ্রীতি, গতানুগতিকতা, অভ্যস্ত নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ, প্রথা-পদ্ধতি প্রভৃতি তাদের পিছু টানে। এ টান এক সূক্ষ্ম আবেগ সঞ্জাত প্রীতির টান, উপযোগচেতনাজাত যৌক্তিক-বৌদ্ধিক আকর্ষণ নয়। স্বাতন্ত্র্যচেতনার শেকড় রয়েছে এখানেই। অতএব স্বাতন্ত্র্যচেতনারই উপজাত কিংবা ফুল-ফল-ফসল হচ্ছে বিচ্ছিন্নতা-বুদ্ধি। এ সূত্রে এও উল্লেখ্য যে, সংস্কৃতি বদ্ধপুকুরের জল নয়-বহতা নদীর স্রোত, সদা নতুন চেতনার, নতুন চিন্তার, নতুন আবিষ্কারের-উদ্ভাবনের, নতুন শিল্প-সাহিত্য-স্থাপত্য-সৌন্দর্য, রুচি এবং বস্তুতে সৌকর্য ও উৎকর্ষ প্রসূ। এ তাৎপর্যে আদিবাসীর বা উপজাতির কিংবা স্বতন্ত্র গৌত্রিক ও জাতিক সংস্কৃতি বলে কিছু থাকেই না।

এবার অন্য কথায় আসি। আমরা সাধারণ অর্থে 'সম্প্রদায়' শব্দটির বহুল ব্যবহার করে থাকি প্রাত্যহিক জীবনে কথাবার্তায়। বিভিন্ন শাস্ত্রিক মতবাদী সম্প্রদায় যেমন রয়েছে, তেমনি বিভিন্ন ভাষিক, বার্ণিক, বৃত্তিক, শ্রেণিক সম্প্রদায়ও থাকে সমাজে। যেমন শাস্ত্রিক সম্প্রদায় বলতে বৈষ্ণব-শাক্ত-শৈব-সৌর-লিঙ্গায়েত, শিয়া-সুন্নী, সুফী, ওয়াহাবী, ফরায়েজী, বার্ণিক বলতে নিগ্রো, শ্বেত যেমন বুঝি, তেমন নমঃশূদ্র, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ যেমন নির্দেশ করি, তেমনি আবার আর্য, শামীয়, অস্ট্রলয়েড, দ্রাবিড়, মঙ্গোল প্রভৃতিও তালিকাভুক্ত করি। বার্ণিক শ্রেণী, ধনিক শ্রেণী, অভিজাত শ্রেণী, শিক্ষিত শ্রেণী নির্দেশ করতে আমরা বেণে সম্প্রদায়, ধনী সম্প্রদায়, শিক্ষিত সম্প্রদায়, শিক্ষক বা ছাত্র সম্প্রদায় প্রভৃতিও সার্বক্ষণিক ব্যবহারে প্রয়োগ করি। এক্ষেত্রে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে লাভ-লোভ-স্বার্থের দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম সব সময়ে এড়ানো যায় না। আবার জেলে সম্প্রদায়ের ও নিকেরি সম্প্রদায়ের আর ক্রেতা সম্প্রদায়ের স্বার্থ যেমন ভিন্ন, তেলি-তাঁতি, কামার-কুমার-মুদী-স্বর্ণকারের পেশাজীবিতারূপ সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র্যচেতনাও নিতান্ত তুচ্ছ করার মতো নয় সাংস্কৃতিক-সামাজিক জীবনে।

পেশাজীবী সম্প্রদায়গুলোর মধ্যেও অর্থ-বিত্ত-বেসাত সম্পৃক্ত স্বার্থে কিংবা জাত্যাভিমানগত তুচ্ছ কারণে মাঝে মধ্যে বিরোধ-বিবাদ, ঝগড়া-ফ্যাসাদ, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, দাঙ্গা-হাঙ্গামা বেধে থাকে। তা ঘটে সাময়িকভাবে। বিরোধ-বিবাদ মেটেও শিগগির। এসব ক্ষেত্রেও কিন্তু শ্রেণীগতভাবেই অর্থ-বিত্ত-বর্ণ-ভাষা-যোগ্যতা-শ্রেণীগত ঈর্ষা-অসূয়া-হিংসা-ঘৃণা-অবজ্ঞা-উপেক্ষা-উপহাস প্রভৃতি এক সম্প্রদায়ের প্রতি অপর সম্প্রদায়ের অন্তরের মধ্যে নিষ্ক্রিয় কিংবা অব্যক্তভাবে সুপ্ত ও গুপ্ত থাকে। অভিজাত-অনভিজাত, আশরাফ-আতরাফ-আজলাফ কিংবা বর্ণে বিন্যস্ত হিন্দু সমাজের ও স্থূল-বাহ্য দুর্লঙ্ঘ্য ভেদ-বিভেদ ছাড়াও পরিবারগত, বংশগত গৌরব-গর্ব আর স্বাতন্ত্র্য ও বিচ্ছিন্নতাবোধ জিইয়ে রাখে। তবু এগুলো সমাজে তেমন উপদ্রব, বা বিরোধে-বিবাদে দ্বন্দ্বে-সংঘর্ষে তেমন বিপর্যয় ঘটায় না বলে আমরা এগুলোকে স্বীকার করেও উপেক্ষা করে বৈষয়িক ব্যবহারিক ক্ষেত্রে শাস্ত্রিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেই জীবনযাপন করি।

আমরা শাস্ত্রিক, বার্ণিক ও গৌত্রিক সম্প্রদায়গুলোর বিরোধ-বিবাদ, হিংসা-ঘৃণা, দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা-প্রতিযোগিতা প্রভৃতিকে সাধারণভাবে রাজনৈতিক-সামাজিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিভাষায় সাম্প্রদায়িকতা বলে থাকি বটে, কিন্তু গাঢ়, গভীর ও ব্যাপক সংজ্ঞা ও সংজ্ঞার্থে এবং সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্যে মানুষের ব্যক্তিক জীবনে আশৈশব লব্ধ, শ্রুত এবং লালিত তথ্য ও সত্যরূপ অদৃশ্যে বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা-ভয়-ভক্তি-ভরসা প্রভৃতি যে-যান্ত্রিক কাঠামোর মতো মানসিক বৃত্তাবদ্ধতা তৈরি করে দেয়, যাকে একালের ভাষায় মগজধোলাই বলা চলে, তার থেকে জাগতিক, লাভ-ক্ষতির ধান্ধায় একান্তভাবে সমর্পিত মানুষের পক্ষে মুক্তির কোন যৌক্তিক-বৌদ্ধিক প্রয়াস থাকে না। ব্যক্তি নিয়েই সমষ্টি, সমাজ, সরকার ও রাষ্ট্র। কাজেই ব্যক্তির মধ্যেই খুঁজতে হবে সংকীর্ণতার, অনুদারতার, অবৌদ্ধিকতার, অযৌক্তিকতার, অনাধুনিকতার, অসংযমের, অসহিষ্ণুতার ও হিংস্রতার মূল। বদ্ধচিত্ততা, স্বার্থপরতা, গ্রহণবিমুখতা, রক্ষণশীলতা, শাস্ত্রনিষ্ঠা, গোত্রপ্রীতি, শ্রেণীস্বার্থ প্রভৃতিই তো মানুষে মানুষে মিলনের, মিশ্রণের, ঐক্যবদ্ধতার, সঙ্ঘবদ্ধতার ও সংহতির বাধা। যেমন :

১. যে লোভী, সে ন্যায়বান হতে পারে না; সুযোগ-সুবিধে মতো সে পরস্বাহরণ করবেই।

২. যে স্বশাস্ত্রনিষ্ঠ ধার্মিক, সে শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ, আচার-আচরণ আক্ষরিকভাবে মেনে চলে। এ মানুষ বদ্ধচিত্তের অনুদার ও অসহিষ্ণু না হয়ে পারে না। একজন নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ ছোঁয়াছুঁই থেকে খাদ্যাখাদ্য অবধি শাস্ত্রসম্মত সব কিছুই অত্যন্ত সচেতন সযত্ন প্রয়াসে মেনে চলে। এ মানুষ অন্যকে মানুষ হিসেবে গ্রহণ-বরণ করতেই পারে না পাপের ভয়ে। তেমনি একজন ধার্মিক লোক সুদখোরের, ঘুষখোরের, নেশাখোরের বেনামাজীর ঘরে খেতে পারে না, তাকে আন্তরিকভাবে ঘৃণা না করলে পাপী হওয়ার আশঙ্কা থাকে। মূলকে এমন নিষ্ঠার সঙ্গে আক্ষরিকভাবে ধরে আছে বলেই তো এরা মৌলবাদী। ধার্মিক লোকেরা স্বর্গপ্রাপ্তির লক্ষ্যেই ধর্মাচরণ করে, তাই তারা ইহুদী, জৈন, বৌদ্ধ, হিন্দু, খ্রীস্টান, মুসলমান থাকতে চায়-মানুষ হতে চায় না।

৩. আস্তিকমাত্রই স্বধর্মকে কিছু না-জেনে না-পড়েই কেবল শুনে শুনেই সত্য বলে জানে আশৈশব শ্রুত, লব্ধ বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা বশে। অন্যধর্মে তার থাকে অবিশ্বাস, অবজ্ঞা মিথ্যা, ভুল বা ত্রুটিপূর্ণ বলে। এ ধরনের লোক 'সকলের তরে সকলে আমরা'-এ তত্ত্বে আস্থা রাখে না, কেবল দলানুগত্যেই গুরুত্ব দেয় এবং কুকুর বিড়ালকে কোলে বসায়, মানুষকে ছোঁয় না, ঘরে ঠাঁই দেয় না। যে নিগ্রোর স্ববর্ণের লোকের প্রতি প্রীতি, দায়িত্ব ও কর্তব্যবুদ্ধি তীক্ষ্ণ-তীব্র, সে শ্বেতকায় স্বধর্মীকে ঘৃণা না করেই পারে না, অন্তরে তাকে সর্বক্ষণ এক প্রকারের সচেতন বিদ্বেষ পোষণ করে রাখতেই হয়। তেমনি একজন উত্তমন্য শ্বেতকায় স্বধর্মী প্রাক্তন কালো দাস গোষ্ঠীর প্রতি অন্তরের গভীরে অবজ্ঞা পোষণ করেই।

৪. ক্যাথলিক-অ্যাঙলিকান ভেদই তো আয়ারল্যাণ্ডকে আজো বিভক্ত রেখেছে। প্রোটেস্ট্যান্ট-ক্যাথলিক ভেদই তো জার্মানী-অস্ট্রিয়ার ভেদ-বিচ্ছিন্নতার কারণ।

৫. কালো আফ্রিকা জর্জরিত হচ্ছে মুখ্যত গৌত্রিক দ্বেষ-দ্বন্দ্বের জন্যেই।

৬. ব্রিটিশ ভারত বিখণ্ডিত হল ধর্মভেদের দরুন।

৭. একজন জাতীয়তাবাদী বিজাতিকে, বিভাষীকে, বিদেশীকে আপনজন ভাবতেই পারে না, এমনকি একটি রাজনীতিক দলের নিষ্ঠ সদস্যের বা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির ভিন্ন রাজনীতিক দলের আদর্শের, উদ্দেশ্যের ও লক্ষ্যের নিন্দায় মুখর না হলে চলে না। এজন্যে রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদের নিন্দায় মুখর ছিলেন। মার্কসবাদেও জাতীয়তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অস্বীকৃত। এককথায় যেখানেই মানুষে মানুষে জীবন-জীবিকা-সমাজ-সরকার-রাষ্ট্র ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সেখানেই উদারতা, পরমত-পরআচরণ ও পরস্বার্থ সহিষ্ণুতা স্থিতি পায় না। এ তাৎপর্যে এমনকি পরিবারেও একে অপরের প্রতিযোগী-প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রু। শ্রেণীস্বার্থে সভা, সমিতি, সংহতি বাহ্যত গড়ে উঠলেও অন্তরের গভীরে ঈর্ষা-হিংসা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘোচে না।

৮. অর্থ-বিত্ত-বেসাত-শিক্ষা-সংস্কৃতি-নিবাস প্রভৃতি ক্ষেত্রে অবস্থার ও অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে, সেজন্যে চক্রের আবর্তনবৎ উঠতি-ঝড়তি-পড়তি সূত্রে বর্গের বা শ্রেণীর অবস্থা ও অবস্থানগত স্বার্থের ও পরিচিতির পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে কেউ ধর্মান্তরিত না হলে শাস্ত্রিক মতবাদী গোষ্ঠীর বা সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রজন্ম পরম্পরায় বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা-ভয়-ভক্তি-ভরসার তেমন কোন পরিবর্তন ঘটে না, সাধারণভাবে কেবল নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ, প্রথা-পদ্ধতিই আবর্তিতই হতে থাকে। আচারে-আচরণে, অবহেলা-ঔদাসীন্য থাকতে পারে, কিন্তু মনে-মগজে-মর্মে তা সহস্র শেকড়ে দৃঢ় ও বদ্ধমূল থাকে। কাজেই হাটে-ঘাটে-মাঠে-ময়দানে দেখা আপাত উদার মানুষও মনে-মগজে-মর্মে-মননে-নিতান্ত অসহিষ্ণু বদ্ধচিত্তের মানুষ। এ কারণেই অন্যদের বিরোধ-বিবাদ সাময়িক এবং সুপ্ত, গুপ্ত এমনকি নিজের কাছেও লুপ্ত মনে হতে পারে। গত শতকেও হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান ও মুসলিম জাতি নামে অভিহিত হত। প্রতীচ্য প্রভাবে দৈশিক ও রাষ্ট্রিক জাতীয়তার ধারণা প্রসার লাভ করায় এখন এরা জাতি নয়, এক একটি সম্প্রদায়। এখন সম্প্রদায়ও 'মতবাদী' সম্প্রদায় নেই, নানা অর্থ-বিত্ত-বৃত্তি-বেসাত-প্রভৃতি পেশা সম্পৃক্ত শ্রেণী চেতনাসম্পন্ন সঙ্ঘ, সমিতি ও সম্প্রদায়।

ইহ-পরলোকে প্রসৃত অবিনশ্বর আত্মভিত্তিক অমর জীবনচেতনা ও ধারণাই শাস্ত্রিক সম্প্রদায়ের আসমানী বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণার উৎস বলেই, শাস্ত্রিক মতবাদী সম্প্রদায়ের মতবিরোধজাত বিবাদ-দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-সংঘাত, ঈর্ষা-অসূয়া, ঘৃণা-বিদ্বেষ প্রজন্ম পরম্পরাক্রমে তাজা ও প্রবল-প্রচল থাকে। ক্ষেত্রবিশেষে গৌত্রিক স্বাতন্ত্র্য চেতনাজাত দ্বেষ-দ্বন্দ্বও টিকে থাকে প্রাজন্মক্রমিক হয়ে। আজকের ভাঙা সোভিয়েট রাশিয়া ও ভাঙা যুগোস্লাভিয়া কিংবা কুর্দ, কালো আফ্রিকার বিশেষ করে দক্ষিণ আফ্রিকার জুলো প্রভৃতির দাঙ্গা-লড়াই এ সূত্রে স্মর্তব্য।

১০. আমাদের উপমহাদেশে স্মরণাতীতকাল থেকে ঐশ্বরিক তথা ব্রহ্মের ও ব্রহ্মার আসমানী দোহাই দিয়ে মানুষকে বড়-ছোট-মাঝারি ঘরানা পেশার প্রাজন্মক্রমিক নিগড়ে নিবদ্ধ রাখার স্থায়ী লক্ষ্যে বর্ণে বিন্যস্ত করেছিল ব্রাহ্মণ নামে প্রবল ব্রহ্মার এক মগজী মর্ত্য প্রতিনিধির কায়েমী স্বার্থবাদী শূদ্রসেব্য শ্রেণী। ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের ও হুকুমের বিরুদ্ধে দ্রোহ চলে না। তাই জৈন-বৌদ্ধ-চারবাকী-আজীবিকী বা আজীবকী দেব-দ্বিজ-বেদ দ্রোহিতা সত্ত্বেও, তিন তিনটে নাস্তিক্য-নিরীশ্বর দর্শন চালু থাকা সত্ত্বেও উপমহাদেশের বর্ণে বিন্যস্ত অচ্ছুৎ-ছুৎ সমাজ ভাঙেনি। অজ্ঞতা-অনক্ষরতার দরুন ঘরানা পেশাও অনেক ক্ষেত্রে রয়ে গেছে। আস্তিকেরা বর্ণাশ্রিত সমাজ ভাঙার জন্যে দ্রোহ করে না বলেই উনিশ-বিশ শতকের ইংরেজী শিক্ষিত সামন্ত-বুর্জোয়া মনের শূদ্রসেব্য উচ্চবর্ণের মনীষীরা ও রাজনীতিকরা একে বৈচিত্র্যের মধ্যে, বাহ্য পার্থক্যের ও বৈষম্যের মধ্যে মানসের ও অন্তরের এক উঁচুমানের দার্শনিক সূক্ষ্ম ঐক্যের সন্ধান পেয়েছেন। এমন অমানবিক সমাজব্যবস্থাকে যেখানে কুকুর-বিড়াল-গরু-ছাগল স্পৃশ্য ও শুচি, সেখানে মানুষের কায়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নয় কেবল, ছায়াও অশুচি বলে তিন/আড়াই হাজার বছর ধরে নির্বিঘ্নে চালিয়ে তথা স্বীকার করিয়ে ও মানিয়ে নিচ্ছে।

অমানবিকতাকেই দার্শনিক বাকচাতুর্যে বৈচিত্র্যে পার্থক্যে বৈষম্যে ঐক্য অস্পৃশ্যতায় ও ক্ষুদ্র তুচ্ছ ঘৃণ্য বৃত্তি-জীবিতায় সুকৌশলে ব্রহ্মার নামে নিবদ্ধ রাখার নাম নাকি বৈচিত্র্যে ঐক্য সন্ধান ও নির্মাণ। এ-ই নাকি ভারতের সনাতন আদর্শ ও সাধনা। রবীন্দ্রনাথও এ বাণী সগর্বে ও সগৌরবে প্রচার করতেন। এঁরা এ তত্ত্ব পেয়েছিলেন Law of Nature থেকে Law of Uniformity in diversity in nature, তত্ত্বে আগের কালে শৈবে-শাক্তে-বৈষ্ণবে দাঙ্গা বাধত, একালে অস্পৃশ্যে ও বর্ণ হিন্দুতে দাঙ্গা বাধে-আর্থিক জীবনে, শৈক্ষিক জীবনে সুযোগ-সুবিধে দেয়া-নেয়ার দাবিতে-প্রস্তাবে, আজো কুয়োর জল ছোঁয়াছুঁই নিয়ে বিবাদেও মাটি নররক্তে রাঙা হয়।

মুসলিমদের মধ্যে এ দেড় হাজার বছরের মধ্যেও পৃথিবীর কোথাও মতবাদী সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে রক্তঝরা-প্রাণহরা দাঙ্গা-লড়াইয়ের অবসান হয়নি। এমনি দাঙ্গার চিরাবসান আসন্ন বলেও মনে করার আলামত দেখা যায় না। য়ুরোপে শত বছরের, ত্রিশ বছরের যুদ্ধ প্রভৃতি মূলত দাঙ্গা। ধর্মের নামে নরহত্যা ছিল সেখানে নিত্যকার ঘটনা। য়ুরোপ উনিশ শতক থেকে নিজেদের মধ্যে পরমত ও পরাচরণ সহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। কিন্তু বিদেশী-বিধর্মী-বিজাতি-বিভাষী-বিবর্ণের মানুষের প্রতি আজো নির্মম, অবিবেচক ও হিংস্র। অতএব স্বজাতি, বিজাতি নির্বিশেষে প্রাণিজগতে জীবন-জীবিকা ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা এড়ানো অসম্ভব বলেই, জীবনমাত্রই struggle for existence, জীবন মানে resistance, জীবন কখনো compromise নয়। Compromise-এর অপর নাম পরাজয়, ভীরুতাজাত আপস। আরো একটি তত্ত্ব এই, প্রাণিজগতে প্রাণীর প্রথম ও প্রধান প্রয়াস হচ্ছে আত্মরক্ষণ। আত্মরক্ষা সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হলেই তার মনে জাগে আত্মপ্রসারের স্বপ্ন, সাধ ও প্রয়াস-প্রযত্ন। একে যদি বলি জিগীষা তাহলে জিগীষার পথে যখন বিঘ্ন ঘটে, সে-বিঘ্ন বিমোচনের জন্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। সহজ, সরল সামান্য পন্থায় যদি প্রতিদ্বন্দ্বী-প্রতিযোগীকে অতিক্রম ও অপসারিত করা চলে, তাহলে অহিংস কূটকৌশলেই কার্যসিদ্ধ হয়, কিন্তু তা সম্ভব না হলে প্রবল জেদী জিঘাংসাশ্রয়ী হয়। আগের দিনে সর্দার-শাহ-সামন্ত লেঠেল-সৈন্য-সিপাহী নামের লড়াকু নরহন্তা নিয়োগ করত অর্থের বিনিময়ে। এভাবে জয় করত, লুট করত, রাজ্যবিস্তার করত, শাসন-শোষণ করত। কাজেই ক্ষমতার গদী, রাজ্য-সাম্রাজ্য দখলের পথ চিরকালই রক্তাক্ত। শক্তি-সাহস-উদ্যম-উদ্যোগ না থাকলে এ পথে সিদ্ধি এবং স্থিতি নেই। সেদিনও ছিল না, আজো এ গণতন্ত্রের যুগেও নেই, বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বে। ক্ষমতা দখলের জন্যে আজো মস্তান-গুন্ডা-খুনী-কর্মী-গুপ্তহত্যা-মিথ্যা প্রচারে চরিত্রহনন প্রভৃতি আবশ্যিক ও জরুরী হয়ে পড়ে। এক কথায় ক্ষমতার গদী চিরকালই রক্ত পিচ্ছিল পথে গিয়েই দখল করতে হত, আজো কতকাংশে হচ্ছে। কাজেই জিগীষা পরিণামে জিঘাংসা জাগায়। জামায়াতে ইসলামী কিংবা বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বিজেপি, শিবসেনা, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ প্রভৃতি আর গোটা দুনিয়ার নানা রাষ্ট্রে গেরিলা, সন্ত্রাসী বিপ্লবীরা এ কাজকেই তাদের লক্ষ্যে পৌঁছার পন্থারূপে বরণ করে নিয়েছে। অতএব কোথাও ধর্মের নামে, কোথাও বর্ণের নামে, কোথাও গোত্রের নামে, কোথাও ভাষিক ও ভৌগোলিক স্বাতন্ত্র্যের ও স্বাধিকারের নামে, কোথাও গণমুক্তির নামে লড়াকুদের দাঙ্গা-লড়াই ঘটেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চলেছে। তাছাড়া শাসক-শাসিত, স্বধর্মী-স্বভাষী, স্বজাতি, স্বদেশী হলেও দুটো ভিন্ন স্বার্থের বিরুদ্ধ শক্তি বিদ্যুতের (Positive-Negative) ধনাত্মক-ঋণাত্মক প্রবাহের মতোই।

১১. আমরা জানি ভারতবর্ষ নামের উপমহাদেশ চিরকালই ছিল বিদেশী-বিজাতি-বিভাষী-বিধর্মী বিজিত ও শাসিত। একচ্ছত্র শাসনে কারুর ছিল না বটে, তবে এদেশের মাটির আদি ও আদিম সন্তানদের স্বশাসনে কবে কোন অঞ্চল ছিল, তার হদিস আজ ইতিহাস আর বলে দিতে পারে না। এমনকি ময়েনজোদারো-হরপ্পা-লাথাল সভ্যতার লোকগুলোই বা কারা এবং কোথাকার, তাও সুনিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না। পারসিক, গ্রীক, কুষাণ, শক, হুন, পার্থিয়ান, দ্রাবিড়, মঙ্গোল প্রভৃতি নানা গোত্রীয় লোক ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল শাসন করেছে। আমাদের পুরো ঐতিহাসিক যুগে তুর্কী-মুঘল-ব্রিটিশই ভারতবর্ষ শাসন করেছে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ১৯৪৭ সনের চৌদ্দ-পনেরো আগস্ট অবধি। ব্রিটিশ আমলে যেমন তুর্কী-মুঘল আমলেও তেমনি গোটা দেশের অধিকাংশ অংশ ছিল সামন্তশাসনে, আজকের ভারত ৭৮১টি ক্ষুদ্র-বৃহৎ সামন্ত রাজ্যের ও ব্রিটিশের প্রত্যক্ষশাসিত সাতখানা প্রদেশের সমষ্টিমাত্র। রাজত্ব তথা সার্বভৌমত্ব তুর্কী-মুঘল-ব্রিটিশ রাজাদের হলেও রাজ্য শাসনে-প্রশাসনে ছিল দেশী বর্ণহিন্দুরাই। এদের তুর্কী-মুঘল আমলে দায়িত্ব ও পদগত পদবী আজো এ সাক্ষ্য প্রমাণই দিয়ে চলেছে। তবু শাসক-শাসিত যদি দুই আলাদা জাতের বর্ণের ধর্মের ভাষার ও নিবাসের হয়, তাহলে মনের গভীরে শাসিত জাতির বা সম্প্রদায়ের একটি ক্ষোভ থেকেই যায়। কখনো কখনো অব্যক্ত নিষ্ক্রিয় থাকে মাত্র।

তুর্কী-মুঘল শাসন কেন্দ্রগুলোতে আজো হিন্দুরাই অধিজন, মুসলিম সংখ্যা শতে ৮/১২/১৫ জনের বেশি নয়। এতেই বোঝা যায় তুর্কী-মুঘল শাসকরা জোরজুলুমে বর্ণহিন্দুকে ধর্মান্তরিত করেনি। বর্ণহিন্দুরা ছিল আসমানী তথা শাস্ত্রিক বিধিসম্মতভাবে শূদ্রসেব্য। তাই শ্রেণী স্বার্থেই তারা ইসলামী সাম্যে আকৃষ্ট হয়ে জীবন-জীবিকা, সামাজিক অবস্থানগত সুযোগ-সুবিধে হারাতে চায়নি, এ যুগে যেমন গোয়েঙ্কা-বিরলা শ্রমিক সঙ্ঘের সদস্য হতে পারে না, তেমনি বর্ণহিন্দুর পক্ষে ইসলাম বরণ হত আত্মহননের ও স্বার্থ বর্জনের মতো অপকর্ম। অতএব ইসলাম বরণ করেছে নিম্নবর্ণের, নিম্নবর্গের ও নিম্নবৃত্তির লোকেরাই পূর্ব পঞ্জাব থেকে উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব ভারত অবধি। ধর্মান্তরিত হওয়ার ফলে এদের পেশান্তর ঘটেনি সে যুগের বর্ণে বিন্যস্ত সমাজ প্রতিবেশে। মুসলিম হয়েও তাদের ও সাধারণভাবে ঘরানা পেশায় নিযুক্ত থাকতে হয়েছে। নিঃস্ব, নিরন্ন, দরিদ্র অজ্ঞ অনক্ষর থেকেছে তারা, শাসিত হয়েছে বর্ণহিন্দু প্রশাসক দিয়ে, শোষিত হয়েছে বর্ণহিন্দু জমিদার, মহাজন, দোকানদার, চিকিৎসক, টাউট প্রভৃতির দ্বারা। নমঃশূদ্র ও জলচল নাপিত-ধোপা, কামার-কুমার, তাঁতী-বাগদী, চাঁড়াল, কৈবর্ত প্রভৃতিও ছিল আজকের দিনের মতোই হিন্দু-বৌদ্ধজ দেশী মুসলিমদের জ্ঞাতি এবং প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় সেবক ও সহায়।

১২. একেতো শাসক-শাসিত এমনিতেই দু'জাত। তার ওপর শাসক-শাসিতের সম্পর্ক যদি হয় বিদেশীর বিজাতির, বিধর্মীর ও বিভাষীর তাহলে তো মনস্তাত্ত্বিক কারণেই মনে-মর্মে একটা ভিন্নতার ফাঁক-ফাটল থেকেই যায়।[১] মায়ের মার নিষ্ঠুর হলেও নিন্দার কারণ মেলে না, সৎমায়ের আদরেও জাগে কৃত্রিমতার সন্দেহ। ব্রিটিশ ভারত দখল করে ভেদনীতির প্রয়োগে এ সুবিধেটা বত্রিশ আনাই নিল। প্রথমত 'হিন্দু' শব্দের একটা মনগড়া নতুন অভিধা দিয়ে যা কিছু তুর্কী-মুঘল পূর্বকালের তাকে সনাতন হিন্দুর অতীত,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঐতিহ্য ও সম্পদ বলে প্রচার-প্রচারণা চালায়, হিন্দু শাসিত, মুসলিম শাসক গোটা ভারতের, তারা কিন্তু খ্রীস্টান শাসক হল না, রইল ইংরেজ। এক্ষেত্রেও আমাদের ঐতিহ্য ভঙ্গ করল অভিসন্ধি বশে। আগে এদেশে ধর্মবিশ্বাস অনুসারে মানুষ কৃচিৎ পরিচিত হত। ইরানী, তুরানী, ফরাসী, পর্তুগীজ, দিনেমার, মারোয়ারী, মারাঠি, মদ্রাজী, বোখারী, সমরখন্দী কিংবা গোত্র নামে মৌর্য, সুঙ্গ কন্ব, গুপ্ত, আইবক, খলজি, তুঘলক প্রভৃতির রূপে অভিহিত বা নির্দেশিত হত।

ইংরেজ ঐতিহাসিকরা ভেদনীতি প্রয়োগে নিশ্চিন্তে নিরুপদ্রবে রাজত্ব করার লক্ষ্যে বানানো কিসসা হিন্দুদের 'ইতিহাস' নামের পুস্তকের মাধ্যমে জানিয়ে শুনিয়ে দিল যে মুসলিমরা এক হাতে তরবারি অন্য হাতে কোরআন নিয়ে হিন্দুদের গাঁয়ে-গঞ্জে-শহরে হত্যার ভয় দেখিয়ে জোর-জুলুমের মাধ্যমে মুসলিম বানিয়েছে। সুলতান বাদশাহরা উগ্র ও পীড়ানপ্রবণ বর্বর জাতির লোক ছিল, তারা মূর্তি-মন্দির সব ধ্বংস করেছে। এসব কথা, ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধচিত্তে হিন্দুমাত্রই আক্ষরিকভাবে বিনা প্রশ্নে বিশ্বাস করেছে। যৌক্তিক ও বৌদ্ধিক মাপে এর স্বাভাবিকতা, সম্ভাব্যতা ও সত্যতা যাচাইয়ের কোন প্রয়োজনও বোধ করেনি। রাজত্ব করেছে বিদেশাগত কিন্তু এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা তুর্কী-মুঘল। আর দেশের হিন্দু-বৌদ্ধজ মুসলিমরা হল হিন্দুর ক্ষোভের ও প্রতিহিংসার শিকার। হিন্দুর মুসলিম বিদ্বেষের ও ঘৃণার উৎস এ-ই। হিন্দুরা জানল, বুঝল ও মানল যে তুর্কী-মুঘল এবং তাদের দেশজ অজ্ঞ-অনক্ষর দরিদ্র মুসলিমগুষ্টিই ছিল হিন্দুপীড়ক, আর হিন্দুরা ছিল ছয়শ বছর ধরে পীড়িত, নির্যাতিত। আবার ১৮৭০ সনের পর থেকে ওয়াহাবী-সিপাহী পরাজয়ের পরে সিভিলিয়ান W. W. Hunter-এর মুখে উচ্চারিত হতে দেখি 'One Hundred and fifty years ago it was impossible for a Muslim to be poor- এ কোন্ শ্রেণীর মুসলিম বা কারা অর্থাৎ তুর্কী-মুঘল না যে-কোন মুসলিম তা অস্পষ্ট রাখা হল। ফলে অজ্ঞ-অনক্ষর মুসলিমরা জানল, বুঝল ও মানল যে যেহেতু তারা তুর্কী-মুঘলের জ্ঞাতি বা স্বজাতি, কাজেই তারাই ছিল ধন-মান-ক্ষমতার অধিকারী। কেবল ব্রিটিশ আমলেই হিন্দু জমিদার-মহাজন-চাকুরে-উকিল-ডাক্তার তাদের শাসন-শোষণ করে পথে বসিয়েছে। কাজেই মুসলিমদের চোখেও উপমহাদেশের মুসলিমদের দারিদ্র্যের কারণ হিন্দুর শোষণ। ফলে হিন্দু হল মুসলিমদের এক নম্বরের শত্রু স্যার সৈয়দ আহমদের কাল থেকেই ১৯৪৭ সন অবধি। অতএব, হিন্দুর কাছে মুসলিম হচ্ছে ছয়শ' বছর ধরে হিন্দুপীড়ক, আর মুসলিমদের চোখে হিন্দু হল দেড়শ' বছর ধরে মুসলিমশোষক ও বঞ্চকা রাজনীতির ভিত্তি ও নিয়ন্ত্রক হল এ তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য, যা ১৯৪৭ সনে বিখণ্ডিত ভারতে আপাত পরিণতি পেল। গোটা উপমহাদেশের নিরীহ অজ্ঞ-অনক্ষর ত্রিশ কোটি মানুষের জীবনে যা প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে অর্থ-বিত্ত-বেসাত ক্ষেত্রে নয় কেবল, জীবন-জীবিকার সর্বক্ষেত্রে লঘু-গুরু বিপর্যয় সৃষ্টি করল। যে উপদ্রব-উপপ্লব থেকে পাক-ভারত-বাঙলা আজো মুক্ত হতে পারল না। অথচ সত্য ছিল এই—শহরে তুর্কী-মুঘল ছিল প্রভু এবং বর্ণহিন্দু ছিল প্রজা ও প্রশাসক, কাজেই শহরেও পীড়ন হতে পারেনি। গাঁয়ে বর্ণহিন্দু ছিল বিদ্যায়-বিত্তে-বেসাতে প্রধান ও প্রশাসক, ফলে গ্রামেও দেশজ মুসলিমরা ছিল হিন্দুশাসিত, পীড়ক নয়। আর ইংরেজ আমলে ব্রিটিশ কৃপা-করুণা-আশ্রয়-প্রশ্রয়প্রাপ্ত ব্রিটিশ সহযোগী হিন্দুরা জমিদার, মহাজন, উকিল, বেণে, ডাক্তার ও চাকুরে প্রশাসক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিসেবে অর্থ সম্পদে ঋদ্ধ হতে থাকে। আর ১৮৪৫ সনের পর থেকে মুসলিমরা উক্ত সবক্ষেত্রে আয়ের সুযোগ বঞ্চিত থেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে কেবলই দরিদ্র হতে থাকে।

১৩. নিম্নবর্ণের ও নিম্নবিত্তের বৌদ্ধ-হিন্দু থেকে দীক্ষিত মুসলিমদের কোনকালেই শিক্ষার-লেখাপড়ার ঐতিহ্য কিংবা অধিকার ছিল না, মুসলিম হওয়ার পরেও তারা ঘরানা পেশায় নিযুক্ত ছিল। তুর্কী-মুঘল আমলে এদের লাখে একজন হয়তো লেখাপড়া করেছে বাঙলা-আরবী ফারসী-উর্দু-হিন্দিতে। কাজেই রাজ্য হারিয়ে ব্রিটিশ বিদ্বেষবশে মুসলিমরা ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করেনি, –এ ধারণায় কোন তথ্য বা সত্য নেই। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেন্ডার ও নওয়াব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী প্রমুখ উর্দুভাষীই তার প্রমাণ। ১৮২৪ সালে মুর্শিদাবাদের নওয়াব ইংরেজ কোম্পানীকে বলে তাঁর পরিবারের ও কর্মচারীদের সন্তানদের ইংরেজী শিক্ষার বিদ্যালয় স্থাপন করিয়েছিলেন। অতএব লেখাপড়ার ঐতিহ্য ছিল না বলেই দেশজ মুসলিমদের মধ্যে আরবী-ফারসীতেও ক্বচিৎ কেউ শিক্ষিত ছিল। দেশজ মুসলিমরা সাধারণভাবে নমঃশূদ্রের মতোই ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ পেশাজীবী ও সাধারণভাবে দরিদ্র ছিল। এদের দুর্দশা বাড়ে ব্রিটিশ কোম্পানীর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিস্তারের ফলেই। কারণ তখন পণ্য বিনিময়-মুখ্য গ্রামীণ অর্থনীতির বৈশ্বিক বাণিজ্য সম্পৃক্ত হওয়ায় কামার-কুমার-তাঁতী সবাই কমবেশি অর্থোপার্জনে সংকট সমস্যার সম্মুখীন হয়। শাসকের-জমিদারের-মহাজনের কাছে প্রজার কোন জাতবিচার থাকে না, শোষণই তাদের পেশা ও নেশা। কাজেই মুসলিমদের অর্থ-বিত্ত-বেসাত হিন্দুরা কাড়েনি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, আন্তর্জাতিক পণ্যের বাজার দখল, নতুন উদ্ভূত অবস্থায় ও অবস্থানে জমিদার-মহাজন-উকিল-ডাক্তার বিরল চাকরির-ব্যবসায়ের যোগ্যতাবঞ্চিত, পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকার সূত্রে বণ্টনজনিত কারণে দরিদ্রতর, ১৮৩২ থেকে ডেপুটি-মুন্সেফের চাকরি বঞ্চিত, প্রশাসনিক ভাষারূপে ইংরেজী চালু হওয়ায় ১৮৬০ সনের দিকে কাজির ও ওকালতি পেশায় মুসলিম উকিলের অনুপস্থিতি প্রভৃতিই উনিশ শতকে হিন্দু মধ্যবিত্তের ও উচ্চবিত্তের দ্রুত উত্থান এবং মুসলিমদের শহরে-বন্দরে, স্কুলে-কলেজে দফতরে অনুপস্থিতিই উনিশ শতককে দেশজ মুসলিম সমাজের জন্যে সর্বপ্রকারে অন্ধকার যুগে ও দুর্দশার কালে পরিণত করেছিল, বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলিমদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। তখন চির অনক্ষর পরিবারেও শিক্ষার আলো প্রবেশ করতে থাকে। এদের মনেই রাজনীতিক নেতারা ব্রিটিশ প্ররোচনায় হিন্দুভীতি ও হিন্দুবিদ্বেষ জাগাতে থাকে ভোট জোগাড় করার লক্ষ্যে। হিন্দুরাও অন্তরে মুসলিমদের প্রতি বিরূপ থাকে পূর্ব প্রভুত্বের ও পীড়নের ক্ষোভ-ক্রোধ-প্রতিহিংসা বশে। হিন্দু-মুসলিম বিরোধ যে দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে তার প্রধান কারণ আর্থিক তথা অর্থ-বিত্ত-বেসাত ক্ষেত্রে বৈষম্য। হিন্দু জমিদার, মুসলিম প্রজা, হিন্দু মহাজন, মুসলিম খাতক, হিন্দু বিক্রেতা, মুসলিম ক্রেতা, হিন্দু মনিব, মুসলিম মজুর। হিন্দু শিক্ষিত, মুসলিম অনক্ষর।

১৪. হিন্দু-মুসলিমের ব্রিটিশসৃষ্ট বিচ্ছিন্নতা ও শত্রুভাব শহুরে শিক্ষিত সমাজে কেবলই বৃদ্ধি পেতে থাকে। ব্রিটিশ বিতাড়িত হবার পরেও প্রকৃত ইতিহাস সম্বন্ধে অজ্ঞতা এবং বানানো কিসসার শ্রুতিস্মৃতি আজো উপমহাদেশে দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-দাঙ্গার কারণ হয়ে রয়েছে। অথচ গাঁয়ে গাঁয়ে হিন্দু-মুসলিম একই হাটে-মাঠে-ঘাটে একই রোদ-বৃষ্টি-শৈত্যে বিচরণ করেছে, পারস্পরিক সহযোগিতায় পণ্য ও শ্রম বিনিময়ে পাশাপাশি পাড়ায় বাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছে বিগত অন্তত ছয়/সাতশ' বছর ধরে। হাড়ি-ডোম-জেলে-তাঁতী-কামার-কুমার-নাপিত-ধোপা-মুচি-মেথর ছিল মুসলিমদেরও সেবক ও সহায়। মুসলিম দর্জি-সুতার-ক্ষেতমজুর, মাঝি, মুলুঙ্গী, ঘরামি, জোলা, মজুর করেছে হিন্দুর সেবা।

১৫. বিজেতা ও শাসক সমাত্মক ও সমার্থক নয়। বিজেতারা মন্দির, মসজিদ, গির্জা, মঠ, সিনাগগ ভাঙে, লুট করে। বিজেতারা হন্তা ও লুটেরা, আর শাসকরা হচ্ছে একাধারে শাসক-শোষক-পোষক-পালক-পীড়ক। শাসকরা প্রজা চটায় না, অকারণে অন্যের ধর্মহানি বা ধর্মস্থান অপবিত্র ও ধ্বংস করে না। প্রজা চটিয়ে শাসন দীর্ঘস্থায়ী করা যায়নি কোনকালেই কোথাও। পীড়ক শাসকের পতনের সাক্ষ্য-প্রমাণ ইতিহাসে অপ্রতুল নয়। তুর্কী-মুঘল শাসকরা ছিল দেশী-বিধর্মী কর্মচারীনির্ভর। তাদের মঠ-মন্দির ভাঙা কখনো কোন সুলতান-বাদশাহর লক্ষ্য হতে পারেই না, দ্রোহী প্রজার জান-মাল-গর্দান নেয়া এবং তার ঘরবাড়ি মন্দির মঠ-মসজিদ-গির্জা-সিনাগগ ভাঙার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর সর্বযুগের সব দেশের সব শাসকের ইতিহাসেই মেলে। মানুষ জাতি হিসেবে ভালোমন্দ হয় না; ব্যক্তি হিসেবে নরদানব, নরদেবতা হয়। মানুষ ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক, জীবনে বিরোধ বিবাদ দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ সংঘাত লড়াইমুক্ত হবে না কখনো। কারণ মানুষও তো ইন্দ্রিয়তাড়িত প্রাণী।

আর একটি অনুমানের কথা বলি। ইট-পাথরের মন্দির-মসজিদ-গির্জা করে ধনী লোকেরা। জীর্ণ হলে মেরামত করার মতো ধনী লোক মেলে না। ফলে জীর্ণ মন্দির-মসজিদ পরিত্যক্ত হয়। সেই পরিত্যক্ত মন্দিরের পাথর মুসলিমেরা মসজিদে লাগিয়েছে। তাই মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে বিশেষ করে চৈতন্য চরিতে ও মানসামঙ্গলে বাদশার মন্দির ভাঙার ও মসজিদ তৈরির বয়ান নেই। 'নিরঞ্জনের রুস্মায়' বিজেতার দেউল-দেহারা ভাঙার কথা আছে। যেমন আছে আলাউদ্দিন হোসেন শাহর উড়িষ্যার মন্দির ভাঙার বৃত্তান্ত। কিন্তু স্বরাজ্যে মন্দির ভাঙার বয়ান বা নিন্দা নেই। আমরা ভাঙা বৌদ্ধ বিহারের ও দুর্গের কাঠ, ইট, পাথর, স্থানীয় লোককে কাজে লাগাতে দেখি, দেখেছি।

১৬. আজ আমরা এ উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক দ্বেষ-দ্বন্দ্বের শিকার। সুখ পাচ্ছিও না, সুখ দিচ্ছিও না, জ্বলছি আর জ্বালাচ্ছি। বীরভূমের নিমড়া গাঁয়ের এক কবি আবদুর রহমান (১৯০৮-খৃঃ ১৯৯২) একটি অমোঘ সত্য কথা উচ্চারণ করেছেন। আজকের উপমহাদেশের হিন্দু-মুসলিমের অবস্থা, অবস্থান ও সম্পর্ক প্রকাশ করেছেন দুটো বাক্যে। 'তুমি হিন্দু, আমি মুসলিম/ শুধু এই জন্ম দোষে/ আমি পড়িয়াছি হিন্দুর কোপে/তুমি মুসলিম রোষে।'

প্রতিটি বিবেকবান মানুষ নিশ্চয়ই এ অবস্থার ও সম্পর্কের অবসান চায়। তবে সুনির্দিষ্ট উপায় বা পন্থা আমাদের কারুর জানা নেই। সমাধানের উপায় বা পন্থা নিয়ে আমাদের মধ্যে মতভেদ আছে। আমাদের মতে প্রথমে-

ক. উপমহাদেশের মানুষের ও শাসকদের ইতিবৃত্ত রচনা করতে হবে যোগ্য, নিরপেক্ষ, নির্মোহ সত্যসন্ধ বিদ্বান ঐতিহাসিক, নৃবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানী অর্থবিজ্ঞানীদের দিয়ে। সুপ্রাচীনকাল থেকে একাল অবধি যথাসম্ভব অকৃত্রিম তথ্যভিত্তিক ইতিহাস সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্য, বিচ্ছিন্নতা, দ্বেষ-দ্বন্দ্ব চেতনা বিদূরণের সহায়ক হবে বলে আমাদের বিশ্বাস, যোগ্য লোকের পরিষদ অনুমোদিত ইতিহাসই কেবল স্কুলে-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে অবশ্য পাঠ্য করতে হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খ. জাগতিক জীবনের চাহিদা পূরণই হবে সরকারের বা রাষ্ট্রের প্রথম প্রধান ও একমাত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য। নাগরিকমাত্রকেই জাত জন্ম বর্ণ ধর্ম ভাষা নিবাস যোগ্যতা নির্বিশেষে মানুষ ও নাগরিকরূপে গ্রহণ করতে হবে।

গ. প্রতিটি মানুষের বেঁচে থাকার জন্মগত মৌল মানবিক অধিকার রয়েছে। পিতামাতার দায়িত্ব যেমন সন্তান পালন, সমর্থকে কাজে লাগানো, অসমর্থ পঙ্গু-পাগলকে বসিয়ে খাওয়ানো, সরকারেরও তেমনি দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে সমর্থকে কাজ দেয়া, অসমর্থকে ভাতা দেয়া।

ঘ. আমরা জানি আস্তিক মানুষ বিধর্মীর প্রতি অবজ্ঞা-ঘৃণা পোষণ করে অন্তরের গভীরে। কাজেই শাস্ত্রমানা মানুষের সঙ্গে মানুষকে কেবল মানুষরূপে ভাবা, গ্রহণ, বরণ করা সম্ভব হয় না। 'স্রষ্টা মান, শাস্ত্র ছাড়'-এমন শ্লোগানের প্রভাবই কেবল নির্বিশেষ মানুষের মিলন-ময়দান তৈরি করতে পারে। অর্থাৎ আস্তিক হয়েও বৈষয়িক-ব্যবহারিক-সামাজিক-রাষ্ট্রিক তথা নাগরিক জীবনে শাস্ত্রিক দায়িত্ব-কর্তব্যকে একান্তই ব্যক্তিগত বিষয় করলেই কেবল মানুষ পরমত ও পরাচরণ সহিষ্ণু হয়ে নির্বিবাদে সহাবস্থান করতে পারে সমবায়িক সহযোগিতায়। রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য হবে মানুষের ঐহিক বা মর্ত্যজীবনের চাহিদা পূরণ।

ঙ. এক সময়ে বিভিন্ন গোত্রকে একটা বৃহৎ ও একক সমাজভুক্ত করার জন্যে সভ্যতার উন্মেষ যুগে আসমানী অদৃশ্য-অরি-মিত্র শক্তিকে ইহ-পরলোকে প্রসূত জীবনের নিয়ন্তা বলে প্রচার করতে হয়েছিল। ধর্মের উদ্ভব হয়েছে এ প্রয়োজনে। নকশালপন্থী আজিজুল হক বলেন, "ইতিহাসে এক সময় ধর্মের অস্তিত্ব ছিলো না। অথচ মানুষ ছিলো, ভবিষ্যতেও ধর্ম থাকবে না, মানুষ থাকবে। ধর্ম এসেছে একটা ঐতিহাসিক পর্যায়ে, এর সঙ্গে ব্যক্তি-সম্পত্তির সম্পর্কটা নিবিড়। ব্যক্তি-সম্পত্তির ঔরসে রাষ্ট্রের গর্ভে এর জন্ম-বৃদ্ধি-বিকাশ"। [সাম্প্রদায়িকতা একটা আতঙ্কবাদী হামলা, সুজিত সেন সম্পাদিত 'সাম্প্রদায়িকতা ঃ সমস্যা ও উত্তরণ' পৃঃ ১৪৮]

একালে আমরা যারা শহুরে ও শিক্ষিত, আমাদের জীবনে শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ লঙ ঘনে আমরা প্রত্যেকে জীবনযাত্রার রূপান্তরজনিত কারণে বাধ্য হয়েছি। বলতে গেলে ভীরু মানুষকে-আবাল্যের মগজধোলাই জাত অমর আত্মার লোকান্তরে শান্তি বিজড়িত ধারণাই বার্ধক্যে অযৌক্তিক-অবৌদ্ধিক বিশ্বাসক্লিষ্ট করে মাত্র। এ যন্ত্রযুগে ও যন্ত্রজগতে যন্ত্র ও প্রকৌশল-প্রযুক্তিনির্ভর বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক জীবনে শাস্ত্র মেনে চলা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। অযৌক্তিক ও উপযোগরিক্ত বলে শাস্ত্রিক বিধি-নিষেধে আস্থাও হয়েছে শিথিল। এ-ও বোঝা গেছে ভাঙা রাশিয়া ও পূর্ব য়ুরোপ দেখে যে সব মানুষ কখনো নাস্তিক হবে না। কারণ সবার মন-মেধা-শিক্ষা-বুদ্ধি-যুক্তি-সমমাত্রার নয়। বিশেষ করে জ্ঞানে-বুদ্ধিতে-যুক্তিতে ও সাহসে যে মানুষ আত্মপ্রত্যয়ী নয়, তার পক্ষে নাস্তিক-নিরীশ্বর হওয়া সম্ভব হবে না কখনো। দুর্বলতার প্রভাবে সে ভীরু ও অদৃশ্য নিয়তির কৃপা-করুণা-দাক্ষিণ্যাশ্রয়ী হবেই। অথচ মার্কসবাদ ধর্ম ও জাতীয়তা বিরোধী, মানবসাম্য আন্তর্জাতিকতায় আস্থাবান।

চ. একালে আমরা মৌলবাদের ত্রাসে ত্রস্ত। মৌলবাদ ইংরেজী Fundamentalism-এর বঙ্গানুবাদ। আর 'Foundation' থেকে এর উৎপত্তি ধরলে এর প্রতিশব্দ হবে ভিত্তিবাদ, পরিভাষা হবে 'ভৈত্তিকতা'। প্রোটেস্টান্ট ধর্মের পরিশীলিত যৌক্তিক সংস্কৃত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রূপান্তরকেই ১৮৯৫ সনের নায়েগ্রা সম্মেলনে 'Fundamentalism' নাম দেয়া হয়েছিল। তখন থেকেই শব্দটা প্রতীচ্য দেশে চালু হয়েছে। এর স্থিতি হচ্ছে খ্রীস্টীয় কেরামতিতে অবিচল পাঁচটি আস্থা-প্রশ্নহীন বিশ্বাস। মার্কিন স্বার্থে সেই মৌলবাদ এখন তৃতীয় বিশ্বের এক মহা শাস্ত্রিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনীতিক ও রাষ্ট্রিক সমস্যা সংকটের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মৌলবাদী বদ্ধচিত্তের এবং পরমত অসহিষ্ণু না হয়েই পারে না। কেননা, সে নিজের শাস্ত্র ব্যতীত আর সব শাস্ত্রকেই ভুল-ত্রুটিবহুল মিথ্যে বলে জানে, মিথ্যের সঙ্গে আপসে সহিষ্ণুতায় সহাবস্থান অবশ্যই পাপ।

ছ. আমরা জানি আত্মপ্রীতি পরপ্রীতির পরিপন্থী। কাজেই আস্তিক ব্যক্তি, লাভ-লোভ-স্বার্থ সচেতন ব্যক্তি, শাস্ত্রানুগ আদর্শনিষ্ঠ ব্যক্তি, জাতীয় সংস্কৃতিসচেতন ব্যক্তি কখনো উদার, যুক্তিবাদী, সহিষ্ণু আধুনিক রুচিবান সুজন হতে পারে না। যথাসময়ে যথাস্থানে যথা প্রয়োজনে যথাপাত্রে তারা স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক বিপান চন্দ্র সম্প্রতি সাম্প্রদায়িকতার একটি উপমহাদেশে প্রযোজ্য সংজ্ঞা দিয়েছেন 'খুব সহজ কথায়, সাম্প্রদায়িকতা হলো এমন এক বিশ্বাস যে, একদল মানুষ একটি বিশেষ ধর্মে বিশ্বাস করলে তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বার্থ সব একই হয়। সাম্প্রদায়িকতাবাদ হলো সেই বিশ্বাস যা অনুযায়ী ভারতে হিন্দু, মুসলিম, ক্রিশ্চান ও শিখরা বিভিন্ন ও স্বতন্ত্র সম্প্রদায়, যারা স্বাধীনভাবে এবং স্বতন্ত্রভাবে বিন্যস্ত এবং সংহত।' [সুজিত সেন উদ্ধৃত, পৃঃ ২০৭, সাম্প্রদায়িকতা ঃ সমস্যা ও উত্তরণ গ্রন্থে,]

এ সংজ্ঞাও ত্রুটিহীন নয়। কারণ আমরা পাকিস্তান ভাঙতে দেখলাম, আসমে বাঙালী-অহমীর হত্যাকাণ্ড দেখলাম, অচ্ছুৎ-সর্বহিন্দুর দাঙ্গা দেখলাম এবং রোজই দুনিয়ার সর্বত্র অর্থ-বিত্ত-বেসাত ক্ষেত্রে শ্রেণীদ্বন্দ্ব ও শ্রেণী প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা সংঘর্ষ-সংঘাতের রূপ নিতে দেখছি। শ্রমিক-কৃষক-পেশাজীবী-চাকুরে স্ব স্ব দাবি আদায়ের জন্যে আন্দোলন শুরু করলেই সরকার পিটোয়, হত্যা করে, জেলে পুরে, স্বধর্মী-স্বজাতি-স্বজন বলে খাতির করে না। মানুষের সমাজের দ্বন্দ্বটা দৃশ্যত ও অদৃশ্যত চাওয়া-পাওয়ার, কাড়াকাড়ির, দরকষাকষির জিগীষাগত প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতার। তাই শিয়া-সুন্নী-আহমদীয়ার, বিহারী-সিন্ধির, য়ুরোপের দুটো বিধ্বংসী মহাযুদ্ধের, আয়ারল্যান্ডের, কুর্দিস্তানের, আফগানিস্তানেরও যুদ্ধ দেখছি। যুদ্ধ দেখছি ভাঙা সোভিয়েত দেশগুলোর মধ্যে। তা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ দুষ্ট জনের নেতৃত্বে প্রভাবিত হয়ে মনে করে 'একই ধর্মবিশ্বাসীর সামাজিক, রাজনীতিক, সাংস্কৃতিক, আর্থিক ও রাষ্ট্রিক স্বার্থ অভিন্ন।' যদিও এ যে মিথ্যা ধারণা, তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। মানুষ আরো বহুকাল স্রষ্টা মানবে, বিজ্ঞানের তত্ত্বে, তথ্যে ও সত্যে সহজে আস্থা স্থাপন করবে না, যদিও বা বিজ্ঞানীর আবিষ্কার-উদ্ভাবন-সৃষ্টির আদর-কদর তাদের কাছেই বেশি। জাগতিক জীবনে তারা স্বাচ্ছন্দ্য-আনন্দ, আরাম, সৌকর্য প্রভৃতির প্রতি আসক্ত ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগ লিপ্সু বলেই। এরা নাস্তিক নিরীশ্বর হবে না বটে, তবে শাস্ত্রের বিধিনিষেধ বাস্তবে প্রায় সর্বক্ষণ লঙ্ঘন করবে।

ঝ. নাস্তিক নিরীশ্বর সমাজতন্ত্রই ছিল সমাধান, সম্প্রতি তার প্রতি অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাচ্ছে নানা কারণে হুজুগে অবুঝ লোকদের মধ্যে।

ঞ. বাকি থাকে কেবল আক্ষরিক অর্থে রাষ্ট্রিক তথা জাগতিক জীবনে ইহজাগতিকতাকেই স্বীকৃতি দিয়ে বুকে মুখে কাজে শুধু সেক্যুলারিজমকে বরণ করা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাত জন্ম বর্ণ ধর্ম ভাষা নিবাস যোগ্যতা নির্বিশেষে কেবল মানুষরূপে বিবেচনা করা। মনে-মগজে-মননে গুণ-মান-মাপ-মাত্রাগত অসমতা থাকবে, কিন্তু মৌল মানবিক অধিকার স্বীকৃতির ক্ষেত্রে বৈষম্য থাকবে না। সবাই যথাপ্রাপ্য পাবে, কেউ বঞ্চিত হবে না যথাদাবি বা যথাযোগ্য প্রাপ্তি থেকে।

ট. মানুষের চরিত্রে বা স্বভাবে একটা বড় দোষ রয়ে গেছে। মানুষ নিজে স্বাধীন হতে চায়, বড় হতে চায়, মান-যশ-খ্যাতি-ক্ষমতা পেতে চায়, কিন্তু অন্যকে রাখতে চায় অধীনে, আয়ত্তে, দাবিয়ে। আদি ও আদিমকাল থেকেই সমাজ এভাবে ব্যক্তিক উত্থান-পতনের বন্ধুর পথে এগিয়ে এসেছে। অজ্ঞ-অসহায়-আত্মসত্তার মূল্য-মর্যাদা-বিকাশ-বিস্তার সম্বন্ধে উদাসীন মানুষ এতকাল এ ব্যবস্থা মেনে এসেছে।

এখনকার বিজ্ঞানপুষ্ট যন্ত্রযুগে ও যন্ত্রজগতে যন্ত্রনির্ভর জীবনে মানুষ তারে-বেতারে ঘরে শুয়ে-বসে গোটা দুনিয়ার কথা কানে শোনে, চোখে দেখে, মনে জানে, মর্মে উপলব্ধি করে, অনক্ষর হয়েও সে এখন স্ব ও সুশিক্ষিত হয়ে উঠছে। বই আর পড়তে হয় না, হরফও আর শিখতে হয় না, প্রাণী-প্রজাতির মানব বুদ্ধি ও যুক্তি প্রয়োগেই সে জানতে ও বুঝতে পারে রেডিও-ক্যাসেট-সিনেমা দেখে-শুনে যে সে বঞ্চিত, শোষিত, পীড়িত। প্রজন্মক্রমে এক একটা গোষ্ঠী, গোত্র, সম্প্রদায়, জাতিসত্তা, জাতি মানুষ হিসেবে স্বাধিকারে মৌল মানবিক অধিকারে স্ব ও সুপ্রতিষ্ঠ হতে পায়নি, অজ্ঞ-অসহায় থেকে সে স্বগোষ্ঠী স্বশ্রেণীসমেত কেবল প্রতারিত, বঞ্চিত, শোষিত, দাস, বশ, অনুগামী ও অনুগতই থেকেছে গৃহপোষ্য পশু-পাখির মতো। সে জেগেছে 'ধূলিকাদা-মাখা মানুষের শিশু দলে দলে আজ করিছে ভীড়/আপন প্রাপ্য অধিকার চায়, তার লাগি দেবে লাল রুধির' [মহিউদ্দিন]। এ কারণে পৃথিবীব্যাপী আজ সব বঞ্চিত, শোষিত হৃত-অধিকার মানুষ দ্রোহী হয়ে উঠেছে। তারা স্বাধীন হতে চায়, বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বসত্তার মূল্য মর্যাদা অধিকার স্বীকৃত করাতে চায় এবং সমকক্ষ হয়ে সম ও সহস্বার্থে সংযমে, পরমত ও পরাচরণ সহিষ্ণু হয়ে, সৌজন্যে সামবায়িক সহযোগিতায় সহাবস্থান করতে চায়। কারণ তারাও জানে ও বোঝে যে একালে এ যন্ত্রনির্ভর সংহত বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক সমাজে স্বাতন্ত্র্যে ও বিচ্ছিন্নতায় বাঁচা যাবে না, পরস্পরের ওপর নির্ভর করতে হবে, লেনদেনে বাঁচতে হবে 'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলবে' নইলে 'নাহিরে পরিত্রাণ।' প্রাক্তন ন্যাটো জোট তাই স্বাধীনতার সার্বভৌমত্বের, জাতীয় গৌরব-গর্বের সবকিছু বিসর্জন দিয়ে সহযোগিতায় বাঁচার সাধনায় ও উপায় সন্ধানে নিরত। অতএব প্রথমে দ্রোহ ও স্বাধীনতা অর্জন রূপ বিচ্ছিন্নতা, পরে মন্ডলী বা সমমেল মাধ্যমে [Federation বা Confederation] সহযোগিতায় সহাবস্থান একালের দাবি, এ দাবি সবাইকে বাঁচার গরজেই, টিকে থাকার দায়েই মেনে নিতে হবে। নইলে চীন, ভারত, পাকিস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকা, একক রাষ্ট্র হিসেবে টিকে থাকতে পারবে না যুগবিরোধী ব্যবস্থা বলেই। কুর্দিরাও হবে স্বাধীন। যুগান্তর ঘটছে। ইউনিটারি সরকারের দিন শিগগির অবসিত হবে। বাঁচতে হলে ফেডারেল কিংবা কনফেডারেল সরকারের মাধ্যমে আঞ্চলিক সহযোগিতায় বাঁচতে হবে রাষ্ট্রকে। মাস্‌সযিট, 'গ্যাট' ও 'নাফ্‌তা' তারই সূচনা করছে।

একালে উপমহাদেশে কেবল হিন্দু-মুসলিমে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সীমিত থাকবে না। কেননা যেখানেই বঞ্চক-বঞ্চিত, শোষক-শোষিত, শাসক-শাসিত সম্পর্ক চালু করার চেষ্টা করবে কায়েমী সামন্ত-বুর্জোয়া মনের শক্তিমান শ্রেণী, সেখানেই বাধবে লড়াই, দাঙ্গা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মারতে গেলে মরতেও হবে। আদিবাসী, উপজাতি, ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ পেশাজীবী নিঃস্ব নিরন্নবর্গের মানুষেরাও স্বাধিকার আদায়ের জন্যে ধরবে অস্ত্র মারবে লাঠি। দেব-দ্বিজ-বেদের আসমানী দোহাই মানবে না। আফ্রো-এশিয়ার-লাতিন আমেরিকান সর্বত্র এ লড়াই লঘু-গুরুভাবে শুরু হয়ে গেছে। ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে ঝাড়খন্ডে নয় শুধু, দুনিয়ার সর্বত্র বঞ্চিত বুকের সঞ্চিত ক্ষোভ-ক্রোধের প্রকাশ ঘটছে ও ঘটবে কাজেই আজকের দিনে অধিকার-বঞ্চনার প্রয়াসই, অধিকার আদায়ের সংগ্রামই হচ্ছে দলীয়- সাম্প্রদায়িকতা বা শ্রেণী সংগ্রামের বা দ্বেষণার কারণ। এরই সামগ্রিক, সামষ্টিক ও সামূহিক নাম এখানে সাম্প্রদায়িকতা। এক বিদ্বানের ভাষায় "Communalism means to believe or to propagate that the socio-economic and political interests of one religious, caste, or an ascriptive group are dissimilar, divergent and antagonistic to those of another" এ তাৎপর্যে অর্থ বিত্ত বৃত্তি-বেসাত সুযোগ-সুবিধে বঞ্চিতের ন্যায্য প্রাপ্য দাবির আন্দোলন, অসন্তোষ, দ্রোহ, দাঙ্গা ও প্রাপ্য আদায়ের সংগ্রামই বঞ্চক-শোষক-সংখ্যাগুরুর চোখে সংখ্যালঘুর সাম্প্রদায়িক উদারতার, সহ্য শক্তির ও সংযমের অভাব, শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট করার প্রয়াস।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাটা এখানেই বলি। আধুনিক রাষ্ট্রে যদি অধিজনেরা রাষ্ট্রব্যবস্থা তাদের স্বধর্মশাস্ত্রভিত্তিক রাখে, তাহলে মনস্তাত্ত্বিক কারণেই উনজনেরা তথা সংখ্যালঘুরা স্বদেশের মাটির ও মানুষের প্রতি অনুরাগ হারায়। সমান নাগরিক অধিকার পায় না বলে রাষ্ট্রের স্বার্থে, উন্নয়নে ও রক্ষায় ভরা অকৃত্রিম আন্তরিকতায় সহযোগিতা করতেই পারে না। ফলে ঘরের মধ্যেই এই আপনজনকে-জ্ঞাতিকে পর করে প্রবাসীর মতো করে রাখা হয়। সংখ্যালঘুরা এভাবে মানসিক পীড়ায় ও অবমাননায় ভোগে। তার মানস বিকাশ ব্যাহত হয়। এমনি অবস্থায় বিভিন্ন জাত জন্ম বর্ণ ধর্ম ভাষা নিবাস যোগ্যতার লোক-অভিবাসিত আধুনিক রাষ্ট্রে একটি নিখাদ নিখুঁত অকৃত্রিম রাষ্ট্রিক জাতিচেতনা বা জাতীয়তা গড়ে উঠতেই পারে না। সে-জাতি সে-অবস্থায় কখনো অর্থে-বিত্তে-বেসাতে-সংস্কৃতিতে স্বাভাবিক বিকাশ পায় না।

অনধিকার চর্চা থেকে বিরত থাকা, অপরকে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ দেয়া, মানুষমাত্রেরই মৌল মানবিক অধিকার স্বীকার করে নেয়া প্রভৃতিতে শুধু সাম্প্রদায়িকতা, দ্রোহ, অসন্তোষ, আন্দোলন, সংগ্রাম বন্ধ হবে না। প্রতি রাষ্ট্রেই যদি ব্যক্তিজীবনে মর্যাদা, স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধিকার, সামাজিক জীবনে সমক্ষমতা, সাম্য ও স্বাধীনতা, সাংস্কৃতিক জীবনে সর্বপ্রকার শাস্ত্রিক বা অন্য প্রকার অদৃশ্য বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা-ভয়-ভক্তি-ভরসা মুক্ত-যুক্তিনিষ্ঠা ও মুক্ত মন-বুদ্ধি-মননযোগে কল্যাণকে ও সুন্দরকে গ্রহণে-বরণে আগ্রহ, আর্থিক জীবনে যোগ্যতা অনুসারে সমসুযোগ ও সুবিচার, রাষ্ট্রিক জীবনে নাগরিকমাত্রেরই সমাধিকার ও সমনাগরিকত্ব এবং ব্যক্তিরও নাগরিক হিসেবে দায়িত্বচেতনা ও অধিকারবোধ অবাধে স্বীকৃত ও সুনিশ্চিত হয় তা হলেই কেবল নির্বিরোধ সহাবস্থান সম্ভব। অতএব হয় শাস্ত্রহীন ঈশ্বরবাদী হওয়া, নাস্তিক নিরীশ্বর হওয়া, মার্কসীয় সমাজতন্ত্রী হওয়া কিংবা নিদেনপক্ষে সেক্যুলার বা জাগতিক জীবনবাদী রাষ্ট্রবাদী হওয়া প্রভৃতিতেই রয়েছে সাম্প্রদায়িকতা মুক্তির বুদ্ধি।

রাজনীতিকেরাই ভোট যোগাড়ের গরজে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে রেষারেষি, মারামারি, হানাহানি সাময়িকভাবে সৃষ্টি করে জান-মাল-গর্দান বিপন্ন ও বিনষ্ট করে। ধুনির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতো দ্বেষণাও জনগণের অন্তরে জিইয়ে রাখার নানা ফন্দিফিকিরের আশ্রয় নেয়, যাতে যথাপ্রয়োজনে যথাকালে যথাস্থানে যথালক্ষ্যে ও যথাপাত্রে তা কাজে লাগানো যায়। অন্য সাধারণ মানুষ বড়-ছোট-মাঝারি শিক্ষিত-অশিক্ষিত তাদের স্ব স্ব প্রাত্যহিক জীবন-জীবিকা ক্ষেত্রে নানা ধান্ধায় জাগ্রত মুহূর্তগুলো ব্যয় করে। ওরা কারুর জাত জন্ম ধর্ম ভাষা নিবাস যোগ্যতা চরিত্র স্বভাব অভ্যাস নিয়ে মাথা ঘামায় না। অবসর সময়ে লঘুচালে পরিচিতজনের নিন্দা-তারিফে মানসিক ব্যায়াম সেরে নেয় তারা। চন্দ্র সূর্য যেমন একক হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যেকে তাদের অখণ্ডভাবেই একান্ত নিজের করে পায়, তেমনি একজন ব্যক্তিও একাধারে ও যুগপৎ মদ্রাজী, তামিল ভাষী, ব্রাহ্মণ, হিন্দু এবং কারো ছেলে, কারো ভাই, কারো কাকা, কারো মামা, কারো বন্ধু ও কারো শত্রুরূপে সমাজে নির্বিঘ্নে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে পারে। কাজেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-লড়াই জীবনের অপরিহার্য রিপুজ কর্মাচরণ নয়।

পাদটীকা

১. Communal Ideolgy, Its basis imensions and social appeal-etc. Promod kumar. সুজিত সেন সম্পাদিত, সাম্প্রদায়িকতা, সমস্যা ও উত্তরণ গ্রন্থে পৃঃ ৭৪, উদ্বৃত।

পরিশিষ্ট

১. এজন্যেই ব্রিটিশ রাজত্ব প্রতিষ্ঠায় রামমোহন রায় থেকে ঈশ্বর গুপ্ত অবধি, প্রায় সব হিন্দুই তুর্কী-মুঘলের নিন্দক এবং ব্রিটিশের স্তাবক হয়ে উঠলেন। রামমোহন রায় বলেন : Divine Providence at last in its abundant mercy stired up the English nations to break the yoke of those Tyrants and to recieve the oppressed Natives of Bengal under its protrection ....Subjects have not viewed the English as a body of conquerors but rather as deliverers and look up to your Majesty not only as a Ruler, but also as a father and protector.

২. ঈশ্বর গুপ্তও তুর্কী-মুঘলের প্রতি বিরূপ এবং ব্রিটিশের স্তাবক স্তুতিকার। ব্রিটিশ একের পর একটি রাজ্য জয় করছে, আর ঈশ্বর গুপ্ত উল্লাসে কবিতা লিখে চলছেন। সিপাহী, ওয়াহাবী পরাজয়ে উল্লসিত ঈশ্বর গুপ্ত লিখলেন।

যবনের যত বংশ একেবারে হবে ধ্বংস
সাজিয়াছে কোম্পানীর সেনা
গরু জরু লবে কেড়ে চাপদেড়ে যত নেড়ে
এই বেলা সামাল সামাল।

কিংবা, ভারতের প্রিয়পুত্র হিন্দু সমুদয়/ মুক্ত মুখে বল সব ব্রিটিশের জয়/ অথবা, 'চিরকাল হয় যেন ব্রিটিশের জয়।

৩. এমনকি অতিক্রান্ত কৈশোর উনিশ বছরের বঙ্কিমচন্দ্রও সম্ভবত ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাবে ১৮৫৭ সনের ২২ জুন ব্রিটিশের দিল্লী দখলের পর সোল্লাসে 'সংবাদ ভাস্করে' লেখেনঃ

"হে পাঠক সকলে উর্ধ্ববাহু হইয়া পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া জয়ধ্বনি করিতে করিতে নৃত্য কর। আমাদিগের ব্রিটিশের প্রধান সেনাপতি মহাশয় সক্ষম হইয়া দিল্লী প্রবেশ করিয়াছেন। ---পাঠক সকল জয় জয় বলিয়া নৃত্য কর, হিন্দু প্রজাসকল দেবালয়ে সকলে পূজা দেও, আমাদের রাজ্যেশ্বর শত্রুজয়ী হইলেন।"-এমনি উক্তি অনেক অনেক হিন্দুর মুখে সেকালে উচ্চারিত হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসব উল্লাসে তুর্কী-মুঘলের প্রতি গাঢ়, গভীর, ব্যাপক ক্ষোভ, ক্রোধ, বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি সুতীব্র অভিব্যক্তি পেয়েছে।

৪. ১৩৩৩ সাল (১৯২৬ সনে) শরৎচন্দ্রের মতো ভালো মানুষও ক্ষোভে-ক্রোধে বিষ ছড়িয়েছেন। 'বস্তুত ঃ মুসলমান যদি কখনও বলে-হিন্দুর সহিত মিলন করিতে চাই, সে যে ছলনা ছাড়া আর কি হইতে পারে, ভাবিয়া পাওয়া কঠিন।

একদিন মুসলমান লুণ্ঠনের জন্যই ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল। রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আসে নাই। সেদিন কেবল লুট করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, মন্দির ধ্বংস করিয়াছে, প্রতিমা চূর্ণ করিয়াছে, নারীর সতিত্ব হানি করিয়াছে, বস্তুত অপরের ধর্ম ও মনুষ্যত্বের উপরে যতখানি আঘাত ও অপমান করা যায়, কোথাও কোন সংকোচ মানে নাই।.....

হিন্দুস্থান হিন্দুর দেশ। সুতরাং এ দেশকে অধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার দায়িত্ব একা হিন্দুরই। মুসলমান মুখ ফিরাইয়া আছে তুরস্ক ও আরবের দিকে, – এদেশে চিত্ত তাহার নাই। যাহা নাই তার জন্য আক্ষেপ করিয়াই বা লাভ কি এবং তাহাদের বিমুখ কর্ণের পিছু পিছু ভারতের জলবায়ু ও খানিকটা মাটির দোহাই পাড়িয়াই বা কি হইবে! আজ এই কথাটাই একান্ত করিয়া বুঝিবার প্রয়োজন হইয়াছে যে, একাজ শুধু হিন্দুর-আর কাহারও নয়। মুসলমানের সংখ্যা গণনা করিয়া চঞ্চল হইবারও আবশ্যকতা নাই। সংখ্যাটাই সংসারে পরম সত্য নয়। ইহার চেয়েও বড় সত্য রহিয়াছে যারা এক দুই তিন করিয়া মাথা গণনার হিসাবটাকে হিসাবের মধ্যে গণ্য করেন না।

[বর্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা 'হিন্দু সঙ্ঘ' ১৯ই আশ্বিন ১৩৩৩]

৫. শিবনারায়ণ রায় বলেছেন ঃ তিনি (রবীন্দ্রনাথ) কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে কিছুই চর্চা করেননি। সম্পূর্ণ অবহেলা করেছেন... রবীন্দ্রনাথের সমস্ত লেখা পড়লে কোথাও দেখা যাবে না তিনি কোরান দেখেছেন। এতবড় সংখ্যক একটা প্রতিবেশী, তাঁদের যে কি বিশ্বাস সেটা জানার কোন আগ্রহ ছিল না। [প্রতিক্ষণ, জুলাই ১৯৯৩ পৃঃ ১৭]

৬. তুর্কী-মুঘল আমলে শাসক মুসলিমরা হিন্দুর ধর্মকে ও সংস্কৃতিকে অবজ্ঞা করেছে। প্রশংসা করেছেন কেবল আলবিরুণী, আমীর খসরু, শাহজাদা দারা শিকোহ প্রমুখ কিছু বিদ্বান। ব্রিটিশ আমলে হিন্দুকে অসহ্য প্রতিপক্ষ ও শোষক বলে জেনেছিল বৌদ্ধ-হিন্দুজ দেশী দরিদ্র মুসলিমরা। [লেখক]

ভারতে-বাঙলাদেশে মৌলবাদ ও এর রূপ-স্বরূপ

মনুষ্য সমাজে বিগত পাঁচ/ছয় হাজার বছরের মধ্যে এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কিছু ধীর স্থির, মগজী যুক্তি বুদ্ধি বিবেকবান বিবেচক মানুষ জন্ম নিয়েছেন। তাঁদের নেতৃত্বে কিছু নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ, প্রথা-পদ্ধতি যৌথজীবনে শান্তির ও নিরুপদ্রবে নিরাপদে সহযোগিতায় সহাবস্থানের গরজে পড়ে মেনে চলার অঙ্গীকার করেও সুযোগ সুবিধে মতো না মানাই তাদের স্বভাব। নীতি-নিয়ম ভাঙাতেই তাদের আগ্রহ। ১৯৯৩ সনেও পৃথিবীর দিকে দিকে মানুষের, সরকারের, শাসকের, রাষ্ট্রের, সৈনিকের, নেতার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিংস্রতা দেখে মনে হয়, খাদ্য-খাদক সম্পর্ক যাদের নেই, তেমন পশু, পাখি, কীট-পতঙ্গ, উদ্ভিদ এসব সভ্য ভব্য বিদ্যাবুদ্ধি সংস্কৃতি সভ্যতাগর্বী মানুষের চেয়ে স্বভাবে চরিত্রে সংযমে সহিষ্ণুতায় ও সততায় শ্রেষ্ঠ।

পৃথিবীতে এমন শাস্ত্রও আছে কয়েকটি, যাতে মশা-মাছি-পিঁপড়ে হত্যাও পাপ। এ পাপ এড়িয়ে চলার জন্যে জৈন-বৌদ্ধ যুগে ভারতে অধিকাংশ লোক নিরামিষভোজী হয়েছিল, কেননা তখনো উদ্ভিদেরও যে প্রাণ আছে, তাজা উদ্ভিদ, শাক-সবজি-ফল, বৃক্ষ-লতা থেকে ছিন্ন করে কিংবা আমূল উৎপাটিত করে খাওয়া যে হত্যারূপ পাপ তা জানা ছিল না। দুনিয়ায় হেন কোন শাস্ত্র নেই, যাতে নরহত্যা নিরপরাধ বিবেচিত হয়। আবার কোন শাস্ত্রেই সর্দার-সামন্ত-শাহর দিগ্বিজয়, পরস্বাপহরণে ও নির্বিচার নর-হত্যার জন্যে সৈনিকরূপ হন্তাপোষা পাপ বলে ঘোষিত হয়েছে। এমন শাস্ত্র আছে, যাতে গোহত্যা পাপ এবং গোহত্যাকারী মানুষকে হত্যা পুণ্যকর্ম। বাইরে না মরে গোয়ালে গরু মরলে গরুর মতো বোবা হয়ে ভিক্ষালব্ধ অর্থে শ্রাদ্ধ করতে হয়। জীবন-জীবিকার সর্বক্ষেত্রে মানুষ পরস্পরের প্রতিযোগী ও প্রতিদ্বন্দ্বী। এজন্যে ঈর্ষা-অসূয়া হিংসা-ঘৃণা-বিরোধ-বিবাদ দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ এড়ানো যায় না। কিন্তু জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-নিবাস-যোগ্যতা-মত-পথ-পদ্ধতি অভিন্ন নয় বলেই নিরপরাধ নিরীহ মানুষকেই শত্রু ভাবতে হবে, তাকে কাড়তে, মারতে, হানতে হবে- এমন নীতির-ন্যায়ের প্রয়োগ নিশ্চয়ই মনুষ্যত্ব, মানবিকতা, মানবতা তথা প্রাণী প্রজাতির মানবের স্বভাব বা বৃত্তি-প্রবৃত্তি হতে পারে না।

আগের যুগে মানুষ অদৃশ্য অরি-মিত্র-ভূত-প্রেত-পিশাচ-জীন-দৈত্য-দানু-শীতলা-ওলা-ষষ্ঠী-ড্রাগন-রাক্ষস-পেচক-হুতোম প্রভৃতি নানা শক্তির প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ নিজের দেহ-প্রাণ-মন অর্থ-সম্পদ-রোগ-আয়ু-লাভ-ক্ষতি প্রভৃতির উপর অনুভব-উপলব্ধি করত জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধির অভাবে ও অসহায়তার দরুন। তাই অরি-মিত্র শক্তির ভয়-ভক্তি-কৃপা-করুণাই ছিল তাদের মানুষ জীবনের পুঁজি-পাথেয়। ফলে প্রকৃতিনির্ভর তথা ঝড়ঝঞ্ঝা বন্যা-খরা-মহামারী কবলিত বা আশঙ্কাকাতর জীবনে ওরা পাপ কর্মে প্রবৃত্ত হতে সহজে সাহস পেত না। প্রলোভন প্রবল ও অপ্রতিরোধ্য হলেই কেবল অপরাধ অপকর্ম করত। তাই সেকালে সাধারণ লোকেরা পারিবারিক ও সামাজিক বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা অনুগ নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ, প্রথা-পদ্ধতি মেনে চলত অদৃশ্য শক্তির রোষের ও ক্ষতির ভয়ে। এখন মানুষ সেসব বিশ্বাস সংস্কার ধারণা থেকে অনেকটা মুক্ত হয়েছে; বিশেষ করে শহর-বন্দরের লোকেরা। এখন তারাও খাদ্য-খাদক প্রাণীদের মতো স্বপ্রজাতির মধ্যেই কাড়া-মারা-হানা বাড়িয়ে দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় আজ সমুদ্র-পর্বত-অরণ্যের প্রাণীর সঙ্গে মানুষের সমাজের অকারণ হত্যাকাণ্ডের কোন পার্থক্য নেইঃ হত্যা অরণ্যের মাঝে/হত্যা লোকালয়ে/হত্যা বিহঙ্গের নীড়ে/কীটের গহ্বরে/অগাধ সাগর জলে/নির্মল আকাশে/হত্যা জীবিকার তরে/হত্যা খেলাচ্ছলে/হত্যা অকারণে/হত্যা অনিচ্ছার ফলে/এখন প্রলুব্ধ, ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হলেই ভূত-ভগবানকে উপেক্ষা করে মানুষ করে না হেন অপকর্ম নেই। বিদ্বান লোকেরা বলেছেন বটে, এক সময়ে অপরিচয়ের স্বাতন্ত্র্যে, আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতায় এবং সান্নিধ্যে বিরোধ-বিবাদরত ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠী ও গোত্রগুলোকে আসমানী অদৃশ্য স্রষ্টার, নিয়ন্তার, নিয়তির এক কথায় জীবনের লাভ-ক্ষতির, ভয়-ভরসার অরি-মিত্র শক্তির অস্তিত্বের ধারণা-বিশ্বাস-সংস্কার নির্ভরতার সূত্রে ঐক্যবদ্ধ করে অভিন্ন মূল রসুনের মতো বৃহত্তর যূথবদ্ধ সহযোগী সমাজ গড়ে তুলেছিলেন কালিক ও স্থানিক প্রয়োজনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমকালীন জ্ঞানী-গুণী যুক্তি-বুদ্ধিসম্পন্ন গণহিতৈষী সর্বজন শ্রদ্ধেয় সাহসী সজ্জনেরা কিংবা মান-যশ খ্যাতি-ক্ষমতা দর্প-দাপট প্রভাব-প্রতিপত্তি লিপ্সু পরহিতব্রতী অনন্য অসামান্য বুদ্ধির, শক্তির, সাহসের ব্যক্তিরা।

সে-যুগে এর প্রয়োজন ও উপযোগ ছিল, মানব গোষ্ঠীগুলোর পারস্পরিক পরিচিতির, অভিজ্ঞতা বিনিময়ের এবং প্রকৃতির আর্তব হামলা থেকে আর অন্য শ্বাপদ থেকে আত্মরক্ষার গরজে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস চালানোর জন্যে সহযোগিতায় সহাবস্থান সংস্কৃতি-সভ্যতার উদ্ভবের, বিকাশের ও বিস্তারের সহায়ক হয়েছিল। কিন্তু শিগগিরই বিভিন্ন আঞ্চলিক সমাজের মধ্যে আর্থ-বাণিজ্যিক, কিংবা খাদ্যসংগ্রহ ও আধিপত্যমূলক স্বার্থের প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনিবার্য হয়ে উঠল জনসংখ্যা বৃদ্ধির এবং জ্ঞান-বুদ্ধি-অভিজ্ঞতার সঞ্চয় স্ফীতির ফলে। এখন থেকেই ওই অদৃশ্য আসমানী শক্তির ধারণার পার্থক্যজনিত অপ্রীতি, অবজ্ঞা, অবিশ্বাস বিভিন্ন জাতি-উপজাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ সংঘাত অপরিহার্য করে তুলল। এবং তখন আসমানী শাস্ত্রে বিশ্বাস মানুষের সম্পদ না হয়ে কাল হয়ে দাঁড়াল। আজ গোটা পৃথিবীর প্রথম ও প্রধান রাজনীতিক, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক শত্রুতার, রক্তক্ষরা প্রাণহরা দাঙ্গা-হাঙ্গামারও লড়াইয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে জাত জন্ম বর্ণ ধর্ম ভাষা নিবাস ভেদ। শাস্ত্রিক বিশ্বাসের ভিন্নতা, গৌত্রিক ভিন্নতা, বার্ণিক ভিন্নতা, ভাষিক ভিন্নতা, নৈবাসিক ভিন্নতা প্রভৃতি নানা পার্থক্যচেতনা, স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধি, শ্রেণীস্বার্থবোধ বিজড়িত হয়ে কখনো মনস্তাত্ত্বিক, কখনো সাংস্কৃতিক, কখনো আচারিক, কখনো আর্থিক কখনো বা রাজনীতিক ক্ষমতার দ্বেষ-দ্বন্দ্বরূপে গোটা পৃথিবীতে এ মুহূর্ত অবধি লঘু-গুরুভাবে মানুষের ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক, শাস্ত্রিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক, বাণিজ্যিক, রাজনীতিক জীবনে সংকট-সমস্যা যন্ত্রণার এবং জান-মান-মাল-গর্দানের অনিশ্চিতির ও অনিরাপত্তার কারণ হয়ে বিরাজ করছে।

আশৈশব পারিবারিক ও সামাজিক সূত্রে শ্রুতলব্ধ বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা, ভয়-ভক্তি-ভরসা বশে প্রত্যেক আস্তিক মানুষ স্বশাস্ত্রকেই কেবল সত্য-সার বলে জানে ও মানে। যদিও শাস্ত্রের সব কিছু কৃচিৎ কেউ জানে। অন্যরা খণ্ডিত, বিকৃত, অসম্পূর্ণভাবে নানা প্রসঙ্গ শুনে শুনেই ধার্মিক হয়। এ মানুষই রাজনীতিকরূপে, সমাজ-সর্দাররূপে এবং বেনে রূপে দরিদ্র নিঃস্ব নিরন্ন অর্থলিপ্সু জনগণকে দাঙ্গায় লুটে হত্যায় উত্তেজনা ও উদ্দীপনা বা প্রবর্তনা দেয় ঈশ্বরের অভিপ্রায়ে ঈশ্বর-শত্রু ভিন্ন শাস্ত্রের লোকদের লুটে আগুনে রক্তে বিনাশ-বিপর্যস্ত করে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ– এ চতুর্বর্গ ফল একাধারে ও যুগপৎ অর্জনের জন্যে। পরধর্মে বা শাস্ত্রে আচারে পার্বণে অনাস্থা, অবজ্ঞা, উপহাস এমন কি বিঘ্নসৃষ্টি স্বধর্ম প্রীতির ও স্বধর্ম নিষ্ঠার আন্তর ও বাহ্য সাক্ষ্য-প্রমাণ বলেই এরা জানে, বোঝে ও মানে। এ জন্যেই ধর্মীয় মতবাদীর কোন্দল কেবল সনাতন ও সর্বজনীন নয়, আস্তিকের পক্ষে আবশ্যিক ও অপরিহার্যও বটে। প্যাগান-ইহুদীর, ইহুদী-খ্রীস্টানের, প্যাগান-খ্রীস্টানের, ইহুদী-মুসলিমের, খ্রীস্টান-মুসলিমের, কাফের-মুসলিমের, প্যাগান-মুসলিমের, ভারতে হিন্দু-মুসলিমের, জৈন-বৌদ্ধের, ব্রাহ্মণ্যবাদী-বৌদ্ধের, ব্রাহ্মণ্যবাদী-জৈনের ব্রাহ্মণ্যবাদী শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণবের, সৌর-লিঙ্গায়েতের দ্বেষ-দ্বন্দ্ব যেমন বীভৎস ঐতিহাসিক ঘটনা, তেমনি বিভিন্ন ইহুদী মতবাদীর খ্রীস্টান মতবাদী, মুসলিম মতবাদী সম্প্রদায়গুলোর রক্তঝরা প্রাণহরা বৈনাশিক লড়াইও ইতিহাসভুক্ত রয়েছে। এসব দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের তুলনায় রাজা-বাদশাহদের যুদ্ধে ও দিগ্বিজয়ে প্রাণহানি ঘটেছে নিতান্ত কম। আজকের এ মুহূর্তেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পৃথিবীর নানা স্থানে গৌত্রিক কিংবা শাস্ত্রিক পার্থক্যের দরুন শ্বাপদ ও বুনো বর্বর মানুষকেও নিষ্ঠুরতায় ও অমানবিকতায় হার মানাচ্ছে পূর্ব য়ুরোপের, আফ্রিকার, লাতিন আমেরিকার ও এশিয়ার নানা রাষ্ট্রে। আজকের অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিশ্বশক্তি, বিশ্বপ্রভু বা বিশ্বনেতা চেঙ্গিস-হালাকু-এটিলার চেয়েও অবিবেচক নিষ্ঠুর মার্কিন প্রেসিডেন্ট তার অপরাধের অবাধ দানবীয় শক্তির প্রদর্শনী খুলেছে দুনিয়ার সর্বত্র কেবল বিস্ময়কর অমোঘ মারণাস্ত্রের নয়, অকারণে গণহত্যা করে (যেমন ইরাকে) এবং করিয়ে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোকে আবার নতুন করে জাঙ্গলিক ও গাড্ডলিক করে তুলেছে, তুলছে কেবল মারণাস্ত্রের বেসাতে নয়, কূটনীতিক চাল চেলেও।

এবার উপমহাদেশের আজকের সমস্যার কথায় আসি।

ইসলাম অমুসলিমদের কখনো মুসলিম রাজ্যের বা রাষ্ট্রের নাগরিক বলে স্বীকার করে না। অমুসলিমমাত্রই জিম্মি বা আমানত। অধিকার দেয় না বটে, তবে অবিচার-অত্যাচার করে না। আর প্রিয় ভাবে না বটে, কিন্তু পেশাজীবী, কুশলী, উৎপাদক, নির্মাতা, কর্মীরূপে প্রয়োজনীয় মনেও করে। জিম্মি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সরকারের বা রাষ্ট্রের। এ-ও সত্য যে গুরুত্বপূর্ণ পদে জিম্মিদের অধিকার দেয়ার নীতি-নিয়ম শাস্ত্রসম্মত নয়। তবু মুসলিম রাজা-বাদশাহরা তা কখনো মেনে চলেননি। শের শাহের সেনাপতি ছিলেন হিন্দু। এখন যে হিন্দুবিদ্বেষী বলে নিন্দিত আওরঙ্গজের তাঁর প্রধান ছয়জন সেনানীর চারজন [জয় সিং, যশোবন্ত সিং, দিলীপ সিং, কেশব সিং] ছিলেন অমুসলিম, এখানেই শেষ নয় ডক্টর আতাহার আলির গ্রন্থের বয়ানে ও তালিকা অনুসারে আওরঙ্গজেবই তুর্কী-মুঘল শাসকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি, শতে তেত্রিশজন অমুসলিমকে তথা হিন্দুকে উপযুক্ত দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত রেখেছিলেন। আগের দিনের মতো পাকিস্তানেও ১৯৬২ সনের দিকে কাদিয়ানী বিষয়ক এক কমিশনের আহ্বানে চারজন প্রখ্যাত পাকিস্তানী সুন্নী আলেম অমুসলিমদের কোন প্রকার সরকারি ও প্রশাসনিক পদে নিয়োগের বিরুদ্ধে শরাসম্মত মত দিয়েছিলেন। ভোটাধিকার ও নাগরিক অধিকার দেয়াও ছিল তাঁদের মতে অবৈধ। মুসলিম মোল্লা বা শাস্ত্রধ্বজীদের বিধর্মীবিদ্বেষ, অসহিষ্ণুতা ও অসৌজন্য উপমহাদেশে কারুর অজানা নয়, তবু এও স্মর্তব্য যে ব্রিটিশ বিতাড়ন লক্ষ্যে জমিয়তে ওলামা বা মৌলানাদের রাজনৈতিক দলগুলো ছিল কংগ্রেস সমর্থক।

এ সূত্রে এও বলি মুসলিম লীগের রাজনীতি ব্রিটিশ সরকারের গোপন মদদ পেলেও জিন্নাহ গোড়া থেকেই কখনো বিখণ্ডিত ভারত চাননি। তার প্রথম প্রমাণ তিনি ক্রীপস্ প্রস্তাবে রাজি হননি। দ্বিতীয় প্রমাণ গ্রুপিংয়ের প্রস্তাব সাগ্রহে গ্রহণ করেছিলেন, তৃতীয় প্রমাণ পঞ্জাব ও বাঙলা অখণ্ড রাখার প্রস্তাবে তিনি নির্দ্বিধায় সম্মতি দিয়েছিলেন। কাজেই বিখণ্ডিত ব্রিটিশ ভারতের জন্যে তাঁকে দায়ী করা চলে না। আর সবাই জানে যে লর্ড মিন্টোর গোপন পরামর্শেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মুসলিম লীগ। মুসলিম লীগের প্রধান দায়িত্ব, কর্তব্য ও লক্ষ্যই ছিল মুসলিম স্বার্থ আদায় ও রক্ষণ ১৯৪৭ সন অবধি। ব্রিটিশ সরকার জিন্নাহকেই তথা মুসলিম লীগকেই অন্যায়ভাবে উপমহাদেশের মুসলিমদের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকারী বলে স্বীকার করে নেয়, যদিও গোটা উপমহাদেশের সর্বত্র মুসলিম লীগ মুসলিম জনগণের প্রিয় বা সমর্থিত দল ছিল না। আবার এ-ও স্মর্তব্য যে ওয়াহাবী-সিপাহি পরাজয়ের পরে স্যার সৈয়দ আহমদের নেতৃত্বে ব্রিটিশ বিদ্বেষী মুসলিমরা ব্রিটিশ সমর্থন, কৃপা ও করুণা প্রাপ্তি লক্ষ্যে ব্রিটিশ সরকারের নিঃশর্ত আনুগত্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বীকার করে এবং নিজেদের লাভ-লোভ-স্বার্থের ও অধিকারের প্রবল প্রতিযোগী ও প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে অধিজন হিন্দুদের প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। এর মূলে ছিল দেশীয় রাজা, জমিদার, মহাজন, ইংরেজী শিক্ষিত চাকুরে, উকিল, ব্যবসায়ী প্রভৃতি সব অর্থ-বিত্ত-বেসাত-চাকরির মালিক হিন্দুদের মুসলিম শোষণ-পীড়নভীতি ও আত্মরক্ষার অনির্দেশ্য প্রয়াস বা কাঙ্ক্ষা। কাজেই ব্রিটিশ ভারতে উনিশ শতকের শেষ পাদ থেকে বিশ শতকের প্রথমার্ধ অবধি সংখ্যালঘু অজ্ঞ-অনক্ষর নিঃস্ব, নিরন্ন চাষী-মজুরবহুল দেশজ মুসলিমদের নওয়াব, মালিক, পীর, স্যার শ্রেণীর ধনী-মানী-শিক্ষিত নেতারা ব্রিটিশ আশ্রয়ে, প্রশ্রয়ে, কৃপায় করুণায়-দাক্ষিণ্যে ধন্য ও নিরাপদ থেকে নিম্নবর্ণের, নিম্নবর্গের, নিম্নবিত্তের ও বিভিন্ন ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ স্বল্প আয়ের পেশাজীবীর শিক্ষিত সন্তানদের জন্যে সরকারি চাকরীতে কিছু সংরক্ষিত পদ এবং উনজন হিসেবে স্বতন্ত্র নির্বাচন মাধ্যমে নিজেদের জন্যে কিছু সদস্য ও মন্ত্রীপদ প্রাপ্তিই ছিল মুসলিম লীগের কার্যধারার লক্ষ্য। কংগ্রেসের মতো স্বাধীন ভারতের প্রয়োজনে কোন সুপরিকল্পিত চিন্তা-চেতনা-কর্মসূচি ছিল না ১৯৩৫ সন অবধি মুসলিম লীগের। অতএব মুসলিম লীগের স্বাতন্ত্র্যচেতনার বিচ্ছিন্নতা বুদ্ধির, সাম্প্রদায়িক দ্বেষ-দ্বন্দ্বের একটা সঙ্গত কিংবা অসঙ্গত ব্যাখ্যা মেলে। এখানেই মুসলিম রাজনীতির কথা শেষ।

ব্রিটিশ ভারতে কয়েকটি প্রদেশ ছিল ব্রিটিশ সরকারের প্রত্যক্ষ শাসনে। বাদ বাকি অংশ ছিল রাজা-জমিদারের প্রত্যক্ষ শাসনে এদের সংখ্যা ছিল প্রায় আটশ, এঁদের মধ্যে মুসলিম রাজা-নওয়াবের সংখ্যা ছিল নিতান্ত নগণ্য, যদিও হায়দারাবাদ রাজ্য ছিল বেশ বড়। লোকসংখ্যার মধ্যেও প্রায় শতে সত্তর জনেরও বেশি ছিল বর্ণে বিন্যস্ত ও বিচ্ছিন্ন হলেও হিন্দু নামের তথাকথিত ব্রাহ্মণ্যবাদী। মুসলিমের সংখ্যা ছিল কয়েকটি প্রত্যন্ত অঞ্চল ব্যতীত গড়ে শতে বারো/চোদ্দ জন মাত্র। আগেই বলেছি জনসংখ্যায়, বিদ্যায়, বিত্তে, শাসনে-প্রশাসনে বর্ণহিন্দুরাই তুর্কী-মুঘল আমলের মতোই ব্রিটিশ আমলেও বর্ণহিন্দুরাই ছিল প্রবল। কিন্তু বিত্ত-বৃত্তি-বিদ্যা-পদাধিকারগত প্রশাসনিক ক্ষমতা আয়ত্ত করেও হিন্দুর মুসলমান-বিদ্বেষ ও ভয় কেন গেল না বোঝা যায় না। জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয় আজো 'জয় করেও ভয় কেন তাদের যায় না।' এ জিজ্ঞাসার একটি সম্ভাব্য উত্তর এই ব্রিটিশ বিদ্বান বানানো ভারতের বিকৃত ইতিবৃত্তান্তই হিন্দুমনে বুনোবর্বর উগ্র অমানুষ নিষ্ঠুর এবং পর পীড়ক তুর্কী-মুঘল শাসকের হিন্দুর ধর্মকাড়ার, নারীধর্ষণের, জান-মান-মাল-গর্দান হরণের ক্ষোভ, অপমান, ক্রোধ ও প্রতিহিংসালিপ্সা বশে ব্রিটিশ ঐতিহাসিক বর্ণিত ঘটনার সম্ভাব্যতা, স্বাভাবিকতা, যৌক্তিকতা, প্রয়োজনীয়তা যাচাই করার কথা কখনো কল্পনাও করেননি উচ্চ-মধ্য শিক্ষিত হিন্দুরা, সবটাই আক্ষরিকভাবে বিশ্বাস করেছেন। ফলে হিন্দুমাত্রই তুর্কী-মুঘল শাসক গোষ্ঠীর ও দেশের নিম্নবর্ণের, নিম্নবর্গের, নিম্নবিত্তের ও নিম্নবৃত্তির বৌদ্ধ-হিন্দুজ মুসলিমদের মধ্যে যে কোন বৈবাহিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ভাষিক, আর্থিক সম্পর্ক এমন কি পরিচয়ও ছিল না- অবিকল দেশী খ্রীস্টান ও ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠীর মতোই, তা কখনো বিচার-বিবেচনা করেননি, এখনো করেন না। ফলে মুসলিমমাত্রই হিন্দুর ক্ষোভ-ক্রোধ-প্রতিহিংসার পাত্র। নইলে দৈশিক জাতীয়তাবাদে আস্থাবান উদার বুর্জোয়া হিন্দু দিয়েই গঠিত ও পরিচালিত কংগ্রেস থাকা সত্ত্বেও কেন আলাদাভাবে সাভাকার-মুঞ্জে-শ্যামাপ্রসাদরা হিন্দু মহাসভা নামে রাজনৈতিক দল গড়ে তুলবেন? আবার ভারত স্বাধীন হবার পরেও কেন শতে পঁচাশী জন হিন্দুর রাষ্ট্র ভারতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিন্দু মহাসভাকে ১৯৪৯ সনের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত কোলকাতা সম্মেলনে হিন্দু রাষ্ট্র, হিন্দু জাতি, হিন্দু কৃষ্টি, হিন্দুর উন্নতি, শক্তিবৃদ্ধি প্রভৃতির জন্যে প্রস্তাব গ্রহণ করতে হল? স্বাধীন ভারতে সাভাকাররা কেনইবা হিন্দু রাজত্ব স্থাপনে ও হিন্দুর অধিকার রক্ষায় উদ্যোগী হবেন? গোহত্যাকে অপরাধ বলে গণ্য করে গোহত্যা নিষিদ্ধ করার দাবিও ওঠে য়ুরোপে শিক্ষিত মহাসভাপন্থী হিন্দুদের থেকেই, এ-বিষয়ে কংগ্রেসপন্থী অনেকেরই নীরব সমর্থন ছিল, তাই পশ্চিমবঙ্গে ও কেরালায় ব্যতীত গোটা ভারতে গোবধ নিষিদ্ধই করল সেক্যুলার সরকার। স্বাধীন ভারতেই ১৯৬৪ সনে গঠিত হল সর্ব প্রকারের পিছিয়ে পড়া দরিদ্র-অশিক্ষিত নগণ্যসংখ্যক ভারতীয় মুসলিম সমাজবিদ্বেষী হিন্দুর 'বিশ্বহিন্দু পরিষদ'। এ প্রতিষ্ঠান উদার আন্তর্জাতিক সম্পর্ক-সম্বন্ধ প্রচারক-প্রসারক প্রতিষ্ঠান না হয়ে হল জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে হিন্দুয়ানী বৃদ্ধির প্রয়োজনে সনাতন ও শাশ্বত হিন্দু জীবনের মূল্য-মহিমা রক্ষণ বর্ধন প্রচার ও প্রসারকামী ধর্মীয় দল। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে বিরোধ-বিবাদকালে মুসলিমদের নাগরিক অধিকার ও ধর্মীয় স্বাধীনতা থেকে সাময়িকভাবে বঞ্চিত রাখার হুমকিও রয়েছে তাদের সিদ্ধান্তে।

ইসলাম ভারতোদ্ভূত নয় বলেই মুসলিমরা [হয়তো খ্রীস্টানরাও] মহাসভা ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদ পন্থীদের কাছে ভারতীয় বলে স্বীকৃত নয়, ভারতীয় জাতি বা জাতীয়তাভুক্ত নয় তাই। শিখ-জৈন-বৌদ্ধদের প্রতি তারা উদার। এমনকি শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুসারেও 'হিন্দু কেবল সে-ব্যক্তিই যে এমন এক ধর্মে আস্থা রাখে যা ভারতেই উদ্ভূত হয়েছে।' রবীন্দ্রনাথের সৃজনশীল রচনায়ও তাই মুসলিমদের ঠাঁই হয়নি। বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক চেতনা ও সহাবস্থান বিরোধী হলেও আপাতদৃষ্টিতে হিন্দুর হিন্দুত্ব প্রীতি ও হিন্দুত্ব গৌরব বর্ণ নির্বিশেষ।

আগের পাকিস্তানে এবং এখনকার বাঙলাদেশে ও পাকিস্তানে দাঙ্গা বা হিন্দু হত্যা বলতে গেলে তিন/চার বারের বেশি হয়ই-নি গত ছেচল্লিশ বছরের মধ্যে। কিন্তু ভারতে গড়ে প্রতি সপ্তাহে কোন না কোন অঞ্চলে বড়-ছোট-মাঝারি দাঙ্গা ও হত্যাকাণ্ড লেগেই আছে। লোকে বলে ভারতে নাকি এ ছেচল্লিশ বছরে প্রায় দু'হাজারের বেশি সংখ্যার ছোট-ছোট দাঙ্গা হয়েছে। মুসলিমদের জান-মাল-গর্দান হারাতেই হয় ঘন ঘন, তাদের নিরাপত্তার কোন নিশ্চিতি নেই। অথচ আজো উদার রাষ্ট্রিক জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসই কেন্দ্রে অন্তত অবিচ্ছিন্নভাবে রাজত্ব করে চলেছে, অনেক প্রদেশেও (রাজ্যে) কংগ্রেস এবং কম্যুনিস্ট সরকার চালায়। কম্যুনিস্টরা ভারতের সর্বত্র লঘু-গুরু প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে। তবু সাম্প্রদায়িক শক্তি মহাসভা, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ, শিবসেনা, ছদ্মজাতীয়তাবাদী বিজেপি ভারতে সাম্প্রদায়িক সংস্থারূপে শক্তি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করে চলেছে। গোলদেয়ালকার, বালথ্যাকার কিংবা পি. এন. ওক [দিকভ্রান্ত ইতিহাস লেখক] অথবা এমনি ভারত থেকে মুসলিম বিতাড়নে উৎসাহীরা কেন এ হীনমন্যতায় ভুগছেন? আর একটি অদ্ভুত প্রচারণা বা আশঙ্কাই বা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে কেন, প্রভাবিত করে কেন শিক্ষিত হিন্দুকে যে শতে ১২/১৩ জন মুসলমান অচিরে সংখ্যাগুরু হয়ে ভারত শাসন করবে? অথচ আদম-শুমারির তথ্য অনুসারে ভারতে হিন্দুদের প্রতি হাজার পুরুষে নারীর সংখ্যা ৯৩৩ এবং মুসলিম প্রতি হাজার পুরুষে নারীর সংখ্যা ৯৩৭। তাহলে চারটে স্ত্রীর কথা ওঠেই না, একাধিক স্ত্রী কেউ গ্রহণ করলে অন্য অনেকের একটি স্ত্রীও জোটে না। ১৯৬১-৮১ সনের মধ্যে মুসলিমদের আনুপাতিক জনসংখ্যা বেড়েছে ৭ শতাংশ। এ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তথ্যও মিলেছে যে মুসলিমদের চেয়ে বহুবিবাহের হার যথাক্রমে হিন্দু, বৌদ্ধ ও আদিবাসীদের মধ্যে বেশি। মুসলিম ৫.৭৩, হিন্দু ৫.৮০, বৌদ্ধ ৭.৯৭ এবং আদিবাসী ১৫.২৫ শতাংশ। এবং মুসলিমদের মধ্যেও গ্রামে-শহরে সর্বত্র সরকারি প্রচার-প্রচারণার ফলে জন্মহার ক্রমশ কমছে।

স্বাধীন সার্বভৌম ও পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভারতের হিন্দু মন-মগজ-মনন-মনীষা উৎকর্ষ লাভ করছে কি অবক্ষয়গ্রস্ত হচ্ছে, তা বোঝা যায় না। কেননা উনিশ শতকের রামমোহনের যুক্তিবাদিতা, বিদ্যাসাগরের মানবতা, বঙ্কিমের যৌক্তিক-বৌদ্ধিক হিন্দু জাতীয়তা, হিন্দু মনীষাগর্বী বিবেকানন্দের মানবসেবা রূপ-রামকৃষ্ণ মিশন কিংবা কংগ্রেসের বহু প্রমুখ নেতার ভারতচেতনা, অথবা গান্ধী-রবীন্দ্রনাথের গণহিতৈষণা প্রভৃতির প্রবাবমুক্ত সাম্প্রদায়িক হিন্দুত্ব শতে পঁচাশী জন হিন্দুর ভারতে কি করে হিন্দু মনে মুসলিম আতঙ্ক জাগায় আর জিগির বা শ্লোগান তৈরি হয় 'হিন্দু কা পহচান/ত্রিশূল কা নিশান/ যব হিন্দু জাগা হ্যয়/ তব দেশ সে মুসলিম ভাগা হ্যয়/ মুসলিম কো দো স্তান/ পাকিস্তান আউর কবরস্থান/ কে জানত যে গান্ধীর রামরাজত্বের স্বপ্ন স্বর্গসম ভারতে রামশিলায়, খন্তা-কুড়ালে মসজিদ ভাঙায় আর ছুরিতে নরহত্যায় বাস্তব রূপ লাভ করবে? তবু স্বীকার করতেই হবে ভারতে নাস্তিক নিরীশ্বর উদারমনস্বী অসাম্প্রদায়িক শিক্ষিত হিন্দুর সংখ্যা বাড়ছে। তবে 'একে নষ্ট করে সবে দুঃখ পায়' তত্ত্বটিও উপেক্ষা করার মতো নয়। কেননা, আমরা জানি 'গড়ন ভাঙিতে পারে আছে কত খল/ভাঙন গড়িতে পারে সে বড় বিরল।' হিন্দু মৌলবাদীরা বিধর্মী মুসলিম বিদ্বেষী ও হন্তা। আর মুসলিম মৌলবাদীরা স্বধর্মী কিন্তু ভিন্ন মতের মুসলিম হন্তা।

শাস্ত্রনিষ্ঠ ব্যক্তিরা বদ্ধচিত্তের রক্ষণশীল বা গোঁড়া বা অর্থোডক্স হয়। এরা শাস্ত্রের বিধিনিষেধ লঙ্ঘন ও লঙ্ঘনকারীকে সহ্য করতে পারে না। তারা সুদখোরের মেয়ে বিয়ে করে না, ঘুষখোরের বাড়িতে খায় না। বেনামাজীকে ঘৃণা করে। এরা অনুদার, অসহিষ্ণু, নিষ্ঠুর ও ক্ষমাহীন কিন্তু সৎ। এরা ঐহিক জীবনকে তুচ্ছ এবং পারত্রিক জীবনকেই পরম ও সত্য আর স্থায়ী বলে জানে। শাস্ত্রানুরাগী বলে এরা নতুন চিন্তা-চেতনার, আচার-আচরণের, নীতি-নিয়মের বিরোধী। এককথায় এরা পরিবর্তন-বিবর্তন বিরোধী। আবর্তিত জীবনকে এরা শ্রেয় ও প্রেয় বলেই জানে এবং চিরন্তর কল্যাণকর বলে জানে ও মানে।

অর্থোডক্স ধার্মিক মানুষের বিশ্বাস ও চরিত্র অত্যন্ত দৃঢ়। কেবল দেশ-কাল, প্রয়োজন-প্রগতি চেতনারিক্ত অসহিষ্ণু অনুদার বলেই তাদের কোন সংস্কৃতি থাকে না। আচার-আচরণ নিষ্ঠাতেই এরা নিবদ্ধ দেহে-প্রাণে-মনে-মগজে-মননে। একারণে এরা যান্ত্রিক এবং প্রাণীর জীবনই যাপন করে। মনুষ্যত্ব এদের প্রসারমান নয়, এদের মানবতাও নয় বিকাশমান। এদের চিন্তা-চেতনা, আচার-আচরণ, জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি চিরকালই আবর্তিত হতে থাকে। কিন্তু সমাজে অজ্ঞ ও সাধারণ লোকদের কাছে এদের আদর-কদর-সম্মান আছে, এদের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তিও প্রবল। একারণেই অজ্ঞ ও সাধারণ লোকের মধ্যে Orthodoxy ও Fundamentalism প্রায় অভিন্ন। Fundamentalist-দের তথা মৌলবাদীদের জনপ্রিয়তার এও এক পরোক্ষ কারণ। ফান্ডামেন্টালিস্ট বা মৌলবাদীদের সঙ্গে গোঁড়া রক্ষণশীল শাস্ত্রনিষ্ঠ অর্থোডক্সদের পার্থক্য হচ্ছে মৌলবাদীরা ঐহিক জীবনে সুবিধেবাদী রাজনীতি সচেতন এবং কোনো নীতিতে-নিয়মে-আদর্শে আন্তরিকভাবে নিষ্ঠ নয়, কেবল শাস্ত্রধ্বজী হয়ে এরা পার্থিব সুখ সুবিধে-বাঞ্ছা চালিত হয়। এদের মধ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধার্মিক এবং পারত্রিক জীবনে গুরুত্ব এবং আস্থাশীল লোকের একান্ত অভাব। এদের শাস্ত্রে সত্যে আদর্শে ও চরিত্রে নিষ্ঠা বড় কম বা প্রায় নেই-ই। এ কাপট্য হিন্দু মৌলবাদীদের মধ্যে বিশেষভাবে প্রকট। কেননা এদের মধ্যে কোন অভিন্ন উপাস্য নেই। উপাসনা-পদ্ধতি এবং শাস্ত্র-তত্ত্বও অভিন্ন নয়। সৌর-শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণব-লিঙ্গায়েত মিলে কি এক দলীয় মৌলবাদী হতে পারে?

'ফান্ডামেন্টালিজম' কথাটির উদ্ভব ফ্রান্সে। লালন ইংল্যান্ডে এবং রাজনীতিক-কূটনীতিক প্রচার-প্রয়োগ মার্কিন সরকারের। ফায়দা লুটেছে সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন সরকার, আর বিপর্যস্ত হয়েছে তৃতীয় বিশ্বের সমাজ-সংস্কৃতি-প্রগতি ও প্রাগ্রসর চিন্তক-ভাবক-শিল্প-সাহিত্যিক। ক্ষতি হয়েছে বিভিন্ন কলার ও কলাকারের।

আগে ইসলাম ও জিম্মির কথা বলেছি। এবার বাঙলাদেশের মৌলবাদীদের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য দু'চার কথায় শেষ করছি। এখানকার মৌলবাদীরা ইসলামের চেয়ে রাজনীতিকে বেশি গুরুত্ব দেয়। এরা রাজনীতিক ক্ষমতা আয়ত্তে আনার ও রাখার প্রয়াসী। এরা স্বাভাবিকভাবেই অন্তরে কাফের বিদ্বেষী ও বিধর্মীর প্রতি অবজ্ঞা-অশ্রদ্ধাপ্রবণ, বাইরে বাঙলাদেশের হিন্দুদের প্রতি উদাসীন, সহনশীল ও নীরব উপেক্ষাশীল। কিন্তু হিন্দুর আচার-ভাষা-ভঙ্গি-সংস্কৃতি-সাহিত্য বর্জনকামী। মুসলিমের হিন্দু ও হিন্দুয়ানী প্রীতি তাদের অসহ্য। বাঙলাদেশে তাদের বিঘোষিত শত্রু হচ্ছে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় যারা ইহজাগতিক নীতি নিয়ম চায়-ইসলামী শাসন ও সমর্থন করে না, তারাই। এ জন্যে এরা কাফের বা বিধর্মী হত্যায় আপাতত অনীহ, মুসলিম নামধারী অমৌলবাদী দমনে-দলনে এবং হাত-পায়ের শিরা কেটে রক্ত ঝরিয়ে কতলেই তারা উৎসাহী, কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে, শহরে-বন্দরে এদের ছাত্রযুবা অঙ্গদল ছাত্রশিবিরের একমাত্র দায়িত্ব বা কর্মসূচী হচ্ছে এ-ই। এরা জন্মলগ্নে ইসলামীর জেহাদী জঙ্গীবাহিনী। আমাদের মৌলবাদীরা প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ বিদ্বান ইসলামবেত্তা মওলানা আবুল আলা মওদুদী, অনুরাগী, অনুগামী ও অনুগত। কোরআন-হাদিস ও প্রচলিত ফেকাহ্ কেয়াজ-এজমা-ফতোয়া সম্বন্ধে তাঁর নিজের মত-মন্তব্য-সিদ্ধান্ত টীকা-ভাষ্যরূপে মৌলবাদীদের মধ্যে স্বীকৃত হয়েছে।

হিন্দুর হিন্দুত্ব প্রীতি, খ্রীস্টানের স্বধর্মগৌরব, মুসলিমের স্বশাস্ত্রনিষ্ঠা ও তার বাস্তব জীবনচেতনায়, চিন্তায় ও আচারে রূপায়ণ আপাতদৃষ্টিতে দোষের কিছু নয় বরং বাঞ্ছিত ও স্বাভাবিক বলেই তারিফযোগ্য। এদেরও জীবনে গতি আছে, সে-গতি যন্ত্রলগ্ন চাকার মতো কিংবা লাটিমের মতো আবর্তিত গতি, সম্মুখগতি নয়। নতুন চেতনা, নতুন চিন্তাই কেবল গতি, প্রগতি ও প্রাগ্রসরতা দেয়, সংস্কৃতি-সভ্যতা-রুচি-মানবিক গুণ প্রভৃতির উৎকর্ষ সাধন করে। কিন্তু এ যন্ত্রযুগে ও যন্ত্রজগতে বিজ্ঞানের তত্ত্বে, তথ্যে ও সত্যে আর বিজ্ঞানীর আবিষ্কারে-উদ্ভাবনে-সৃজনে ঋদ্ধ বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক জীবন-জীবিকা আজকের যন্ত্র-প্রকৌশল ও প্রযুক্তি নির্ভরজাত জন্ম-বর্ণ ধর্ম ভাষা নিবাস আচার-আচরণের স্বাতন্ত্র্য ও বিচ্ছিন্নতা ঘুচিয়ে দানে প্রতিদানে, পণ্য বিনিময়ে, যাতায়াতে, বসবাসে, স্থায়ী অভিবাসনে যখন বিশ্বমানবের মিশ্র সমাজ ও মিলন ময়দান গড়ে ওঠার যুগলক্ষণ সুপ্রকট, তখন এ উপযোগরিক্ত অতীত, ঐতিহ্য ও শাস্ত্রপ্রীতি আর স্বাতন্ত্র্য ও বিচ্ছিন্নতা চেতনা ও প্রয়াস অতীতমুখিতার, রক্ষণশীলতার নতুনভীতির পুরোনো প্রীতির, বিজ্ঞানের তত্ত্বে, তথ্যে ও সত্যে অনাস্থার এবং গতানুগতিক অভ্যস্ত জীবনাচারে তুষ্টি, তৃপ্তি ও হৃষ্টি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সন্ধানেরও সমকালীন জগৎ-জীবন-রাষ্ট্রব্যবস্থা, জ্ঞান-বিজ্ঞান যুক্তি ও বিবেক বিবেচনাবিমুখতার সাক্ষ্য প্রমাণই দেয়। আর এমনি মনোভাব একালে আত্মবঞ্চনার, পিছিয়ে পড়ার, দারিদ্র্য বরণের, জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রকৌশল-প্রযুক্তি-যন্ত্র এবং যন্ত্রজাত সামগ্রী বর্জনের অন্তত অনির্মাণের মতো আত্মবিনাশের প্রবণতা হিসেবে আত্মহননের নামান্তর মাত্র। এ যুগ মিলনের। কেননা পৃথিবী এখন সত্যি সরার মতোই ক্ষুদ্র। তারে-বেতারে জগৎ এখন ঘরে বসে থাকা ব্যক্তির কানে-চোখে-মনে-মর্মে ধরা দেয় ক্ষণে ক্ষণে, এখন কি ইচ্ছে করলেই যান্ত্রিক, গৌত্রিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক স্বাতন্ত্র্য ও বিচ্ছিন্নতা রক্ষা করে চলা সম্ভব? এখন গোটা পৃথিবীর বড়-ছোট-মাঝারি নির্বিশেষে রাষ্ট্রগুলো অর্থ-বৃত্তি-বিদ্যা-পণ্যের জন্যে একটি অপরটির ওপর নির্ভরশীল। একা বাঁচা এমন কি একা মরাও আজ আর সম্ভব নয়। তাই যে কোন শাস্ত্রপন্থীর বা গোত্রগর্বীর মৌলবাদ আত্মবৈনাশিক তত্ত্ব, তথ্য ও আদর্শ বলেই আশু বর্জনীয়। এ অনুভব-উপলব্ধি থেকেই আমরা মৌলবাদ বিরোধী। জীবন এখন বৈশ্বিক, আন্তর্জাতিক ও গুরুত্বে শতে নিরানব্বই অংশে ইহজাগতিক।

আপাতত আমাদের আবেদন ভারতের হিন্দু মৌলবাদীরা মুসলিম হত্যা থেকে এবং বাঙলাদেশের মুসলিম মৌলবাদীরা ভিন্ন মতের স্বধর্মী হত্যা থেকে বিরত থাকুন। সাধারণভাবে রাজনীতিক দলগুলোর প্রতিও আমাদের দাবি হত্যার রাজনীতি ছাড়ুন।

AMARBOI.COM

সাম্প্রদায়িকতার সংজ্ঞার্থ

প্রাণিজগতে বিভিন্ন প্রাণী-উদ্ভিদের মধ্যে রয়েছে খাদ্য-খাদক সম্পর্ক-সম্বন্ধ। কাজেই প্রাণীমাত্রেরই মধ্যে জ্ঞাতে অজ্ঞাতে রয়েছে এক নিষ্ঠুরতা ও হিংস্রতা আর হত্যা প্রবণতা। এ নিষ্ঠুরতা, হিংস্রতা ও হত্যা-প্রবণতায় কোন কোন ব্যক্তি অতীতেও ব্যথিত হয়েছিলেন, যেমন বর্ধমান মহাবীর, গৌতমবুদ্ধ বা যিশু খ্রীস্ট। মহাবীর মশা-মাছি-পিঁপড়েরও মানুষের মতো বাঁচার সমান অধিকার স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তখনো উদ্ভিদেও যে প্রাণ আছে জানা-বোঝা-মানা ছিল না, তাই ওঁরা নিরামিশ খাদ্যের ব্যবস্থা দিয়েছিলেন। এখন জানা গেছে যে, তাতেও নিষ্ঠুরতা, প্রাণীহত্যা ও হিংস্রতা রয়েছে। তৃণ লালশাক রূপে সমূল উৎপাটন করেই আমরা ঘরে তুলে আনি, খাই, ধানকে চাল করি, রেঁধে ভাত করি, কিন্তু ধানেও তো প্রাণ ছিল সুপ্ত।

অতএব নিষ্ঠুরতা, হিংস্রতা ও হত্যামুক্ত থেকে বাঁচার উপায় আজো আবিষ্কৃত হয়নি।

দ্বিতীয়ত আমরা যতই বাহাদুরি করি না কেন, যে মানুষ যুক্তিবাদী, মননশীল মগজী ও সৃজনে সমর্থ প্রাণী। আসলে কিন্তু অন্যপ্রাণী উদ্ভিদ যেমন, সহজাত বৃত্তি-প্রবৃত্তি তথা জীবন বা প্রাণধর্ম নিয়ে জন্ম-জীবন-মৃত্যু পরিসরে এক পরম্পরাগত গতানুগতিক অভ্যস্ত জীবনযাপন করে, আমরা মানুষেরা প্রায় মুখ্যত তেমন জীবনই যাপন করি আমাদের অজ্ঞাতেই কিংবা অবচেতনভাবে। ভেড়ারা যেমন পালে-দলে চলে এবং গা ঘেঁষাঘেঁষি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেই চলে ও থাকে, মানুষের মধ্যেও তেমন এক গড্ডল স্বভাব রয়েছে। যেমন ধরুন, চার হাজার বছর ধরে ইহুদী সন্তান ইহুদী বিশ্বাসে-সংস্কারে-ধারণায়-আচারে-আচরণে প্রজন্মক্রমে নিষ্ঠ ও অভ্যস্ত থাকছে বিনা প্রশ্নে, বিনা সন্দেহে, বিনা বিচার-বিবেচনায়। তেমনি বৌদ্ধ-হিন্দু-খ্রীস্টান প্রভৃতি সব সম্প্রদায় উপসম্প্রদায়ের লোকই প্রজন্ম পরম্পরায় বিস্ময়ে কল্পনায় ভয়ে-ভক্তিতে-ভরসায় আশ্বস্ত কিংবা শঙ্কিত থেকে গতানুগতিক বিশ্বাসে-সংস্কারে-ধারণায়-আচারে-আচরণে অভ্যস্ত ও নিষ্ঠ থেকে জন্ম-জীবন-মৃত্যুর পরিসরে দীর্ঘকালটা অতিক্রম করে বিলুপ্ত হচ্ছে নিঃশেষে। এর প্রতি তার অভ্যস্ত মমতা বশে তাকে বরং কাঠগড়ার আসামীর মতো স্বধর্মের, শাস্ত্রের, আচারের উপযোগ-মাহাত্ম্য-মহিমা প্রমাণেই নিষ্ঠ প্রয়াসী দেখা যায়। তত্ত্ব, তথ্য, সত্য যাচাই-বাছাই-বর্জন করার আগ্রহ তার মধ্যে মেলেই না। তাই শাস্ত্রমাত্রই টিকে থাকে শাস্ত্রমানা সাধারণ মানুষের মধ্যে। শাস্ত্র ছাড়াও গুরু-পীর-নেতাকে এরাও গড্ডলের মতোই অনুরাগে, অনুগামিতায়, আনুগত্যে প্রজন্মক্রমে অনুসরণ-অনুকরণ করতে থাকে। ফলে মানুষের মধ্যে গৌত্রিক ও মতবাদী সাম্প্রদায়িক একটা দৃঢ়ঐক্য ওই গড্ডলের মতোই দৃঢ় প্রত্যয়ভিত্তিক হয়ে গড়ে ওঠে। তা-ই হয় স্থায়ী সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আচারিক বন্ধন। তৃতীয়ত আমাদের মধ্যে রয়েছে আত্মরক্ষণের ও আত্মপ্রসারের প্রবৃত্তি। আত্মরক্ষার সুব্যবস্থা হলেই আমরা আত্মপ্রসারের সাধে ও স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ ও প্রবুদ্ধ হয়ে উঠি। আমাদের জিগীষা যখন প্রতিযোগিতার ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিঘ্নে বাধাগ্রস্ত হয়, তখন আমাদের উচ্চাশী শক্তিমান সাহসীরা প্রতিযোগী-প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি জিঘাংসু হয়ে ওঠে। তখন বাধে বিরোধ-বিবাদ-সংঘর্ষ। বাধা পেলে বাধে লড়াই। মারতে গেলে মরতেও হয়। কাজেই জীবনে বিবাদ-বিরোধ আছেই। তা পরিবারে, সমাজে, সরকারে, রাষ্ট্রে সর্বত্র সর্ববিষয়েই ঘটে। আমরা কেবল এসব ক্ষেত্রে সংযম ও পরিমিতিই প্রত্যাশা করি মাত্র।

ব্যক্তিক বিরোধ বিলুপ্ত হয়, সামাজিক দ্বন্দ্বও হয় সাময়িক, রাজনীতিক দ্বন্দ্বও দীর্ঘস্থায়ী হয় না, কিন্তু ইহ-পরলোকে প্রসূত বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণার ঐশ-শাস্ত্রিক মতবাদী সম্প্রদায়-উপসম্প্রদায়ের দ্বেষ-দ্বন্দ্ব, হিংসা, ঘৃণা, অবজ্ঞা যেন কোন কালেই অবসিত হয় না, কেবল অগ্নিগিরির মতো কখনো সুপ্ত থাকে, অর্থ-সম্পদ-বৃত্তি-বিত্ত-বেসাত-রাজনীতিক লাভ-লোভ-স্বার্থ প্রভৃতির প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতার কালে তা' আগ্নেয়গিরির মতোই আকস্মিকভাবে বিস্ফোরিত হয়ে বৈনাশিক বিপর্যয় ঘটায় দেশে-সমাজে-জীবনে। ক্ষতি করে জানের ও মালের। আজকের তৃতীয় বিশ্বের সবচেয়ে মারাত্মক সমস্যা হচ্ছে গৌত্রিক, শ্রেণিক, রাজনীতিক, মতবাদীর সাম্প্রদায়িক, ভাষিক ও আঞ্চলিক বিদ্বেষ-দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ ও সংঘাত, এ সাম্প্রদায়িকতা জনগণের মধ্যে নেই। আসলে প্রত্যেক মানুষই স্বধর্মকেই কেবল শৈশব থেকেই সত্য বলে জানে। অন্য ধর্মকে মিথ্যা-ভুল, ত্রুটিপূর্ণ বলে অবজ্ঞা-উপহাস করে মনে মনে। কিন্তু তাতে বিরোধ-বিবাদের-সংঘর্ষের কোন কারণ ঘটে না, যার যার ধান্ধায় লোকে হাটে-বাজারে, মাঠে-বাটে সহযোগিতায়, শ্রম ও পণ্য বিনিময়ে সহাবস্থান করে। দাঙ্গা বাধায়, রক্তঝরায়, প্রাণকাড়ায় এবং সম্পদ লুট করায় ও আগুনে পোড়ায় উচ্চাশী গদীলোভী রাজনীতিকরা, বেণেরা এবং অন্যান্য দেশী-বিদেশী কূটনীতিকরা নানা স্বার্থে ও মতলবে।

আমরা জানি উচ্চাশী ধন-মান-যশ-খ্যাতি-ক্ষমতা-দর্প-দাপট-প্রভাব-প্রতিপত্তিকামী শ্রেণীই স্বশ্রেণীর স্বার্থে জনগণের মধ্যে ভেদ-বিভেদ-বিচ্ছিন্নতার বীজ বুনে এক দলের,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমাজের, গোত্রের, জাতির, উপজাতির বিরুদ্ধে অন্য দলের, সমাজের, গোত্রের, জাতির উপজাতির কিংবা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে মতবাদের, স্বার্থের, সংস্কৃতির ভিন্নতার তত্ত্বে ও তথ্যে গুরুত্ব দিয়ে, উত্তেজনা ও উদ্দীপনা দিয়ে হুজুগ সৃষ্টি করে একের বিরুদ্ধে অপরকে বিরোধে-বিবাদে-সংঘর্ষে-লড়াইয়ে লেলিয়ে দেয়, দেয় এগিয়ে। আর এ ধন-প্রাণ বিনাশী বিপর্যয়ের সুযোগে নিজেরা হয় নেতা-গুরু-মুরুব্বী-স্বজনগণ হিতৈষী এবং নিজেদের অভীষ্ট সিদ্ধ করে এ পথেই।

আমরা এ-ও জানি মানুষের মানসিক-বৈষয়িক-ব্যবহারিক-শাস্ত্রিক-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা ও অবস্থান এমনটি থাকবে না। বিজ্ঞানের বদৌলত পৃথিবী যন্ত্রে প্রকৌশলে প্রযুক্তিতে খাদ্যে দ্রুত রূপান্তর লাভ করবে। মানুষের ব্যক্তিক ও জাতিক কিংবা সামাজিক-সাম্প্রদায়িক সম্পর্কও এরূপ থাকবে না। আমরা এ-ও জানি শ্রেণীহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজে গৌত্রিক, আঞ্চলিক, শাস্ত্রিক বা অন্য প্রকার পার্থক্যজনিত সাম্প্রদায়িক বা শ্রেণী দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-সংঘাত থাকবে না, কেননা প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক কাড়াকাড়ি, মারামারি, হানাহানির সুযোগ থাকবে না সেই আধুনিকতম নতুন জনগণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায়, যেমন ছিল না বা নেই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে। বিশ্বজগৎ গড়ে ওঠার তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য নিঃসংশয়ে উদ্ঘাটিত হলে শাস্ত্রগত বিরোধের অবসান ঘটবে।

এখন জাত জন্ম বর্ণ ধর্ম ভাষা নিবাসগত এবং আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শৈক্ষিক অবস্থা ও অবস্থানগত পার্থক্যই মানুষকে গোত্রের, বিশ্বাসের, শাস্ত্রের, মতের, রুচির, ব্যক্তির ও শ্রেণীর স্বার্থের সংগ্রামে অনুপ্রাণিত কিংবা উত্তেজনা দেয়। কাজেই গাঢ় গভীর ও ব্যাপক তাৎপর্যে জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-নিবাস-অর্থ-বিত্ত-বৃত্তি-বেসাতজাত অবস্থার-অবস্থানের পার্থক্য, লাভ-লোভ-স্বার্থের দ্বন্দ্ব, প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতাজাত বাধা-বিঘ্ন প্রভৃতি উচ্চাশী মানুষে, দলে ও শ্রেণীতে জিগীষাই পরিণামে জিঘাংসায় রূপান্তর ঘটায়। কাজেই শ্রেণীহীন সমাজতান্ত্রিক জনসমাজ ও রাষ্ট্রই একমাত্র সাম্প্রদায়িক গৌত্রিক বা অন্য সর্বপ্রকার দ্বেষ-দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাতে সমর্থ হবে।

আমাদের দেশে তা' এখনো প্রয়াসের প্রথম স্তরেই রয়ে গেছে, কাজেই ফলপ্রসূ হতে অনেক বিলম্ব হবে। এর মধ্যে অন্তর্বর্তী সুদীর্ঘ সময়ে একটা সাময়িক প্রয়াস প্রযত্ন আবশ্যিক ও জরুরী সাম্প্রদায়িক, গৌত্রিক, ভাষিক, আঞ্চলিক কিংবা রাষ্ট্রিক জিঘাংসা দমনের, দলনের, বিলুপ্তির লক্ষ্যে। আমরা নৈতিক আবেদনের মাধ্যমে, রাজনীতিকভাবে প্রতিরোধ প্রয়াসে আর যৌক্তিক-বৌদ্ধিক মগজী বিশ্লেষণ মাধ্যমে এর বৈনাশিক অমানবিক দিকটি তুলে ধরে শিক্ষিত লোকের বিবেকের কাছেও সংবেদী প্রভাব সৃষ্টির চেষ্টা করছি মাত্র।

আগেও বলেছি, আবার বলছি, সাধারণ অজ্ঞ-অনক্ষর-উদাসীন জাগতিক জীবননিষ্ঠ মানুষ মনে-মগজে-মননে গৌত্র-শাস্ত্র-শ্রেণী কিংবা জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-অঞ্চল-নিবাস-বৃত্তি নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করে না। জন্মসূত্রে প্রাপ্ত শ্রুতিস্মৃতিজাত বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা আচার-আচরণ-অভ্যাস গতানুগতিকভাবে বিনা প্রশ্নে, কৌতূহল বা জিজ্ঞাসা-শূন্যভাবে মেনে চলে প্রজন্মক্রমে। ফলে একই গোত্রের, শাস্ত্রের, জাতের, বর্ণের, ভাষার, নিবাসের, সামাজিক অবস্থার, আর্থিক অবস্থানের, শ্রেণীস্বার্থের অভিন্নতাই তাদের মধ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভিন্ন শাস্ত্রিক, রাজনীতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক আর্থিক স্বার্থচেতনা ও ঐক্যবোধ বা স্বসম্প্রদায়চেতনা ও প্রীতি জাগায়, মানসিকভাবে দায়বদ্ধ করে।

কাজেই বৃহৎ ও ব্যাপক তাৎপর্যে এবং সংজ্ঞায় ও সংজ্ঞার্থে এ যেন জাতীয়তাবোধেরই প্রতিম ও প্রতীক। এ সময়ে আমাদের বামপন্থী কথিত শোষক-শোষিত শ্রেণীচেতনা ও দ্বন্দ্ব লোপ পায়। বরং মানুষের অন্তর্নিহিত ফেরু-স্বভাব প্রবল ও প্রকট হয়ে ওঠে। গৌষ্ঠিক, গৌত্রিক, বার্ণিক, দালিক, জাতিক, উপজাতিক, শ্রেণিক, শাস্ত্রিক, ভাষিক, নৈবাসিক বা আঞ্চলিক, বৃত্তিক স্বার্থের ঐক্যচেতনা তথা অভিন্নতাবোধই 'সম্প্রদায়'-এর উৎস ও ভিত্তি। সাধারণভাবে সাম্প্রদায়িক ভিন্নতা দাঙ্গা-হাঙ্গামার কারণ ঘটায় না। সর্দার-নেতা-রাজনীতিক দল, সভা, সমিতি সঙ্ঘ কোন বিশেষ সমস্যা-সংকট-বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করার জন্যেই গৌষ্ঠিক, গৌত্রিক, বার্ণিক, জাতিক, উপজাতিক, শ্রেণীক, শাস্ত্রিক, ভাষিক, নৈবাসিক বা আঞ্চলিক বা বৃত্তিক স্বার্থের বৈপরীত্য, প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতাজাত ঈর্ষা, অসূয়া, হিংসা, ঘৃণা, অবজ্ঞাপ্রসূত শত্রুভাব জিইয়ে রাখে এবং যথাপ্রয়োজনে, যথাকালে, যথাস্থানে, যথাপাত্রে প্রয়োগ করে সাফল্য অর্জন করে। এ আসলে স্বার্থবাজদের সৃষ্ট ও জিইয়ে রাখা ভেদনীতি যা রাষ্ট্রাভ্যন্তরে মতবাদীর বা শ্রেণীর সাম্প্রদায়িকতা ও রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে শত্রুতা, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কূটনীতিরূপে পরিচিত ও অভিহিত। আজ পৃথিবীর সর্বত্র চলছে গৌত্রিক, শাস্ত্রিক, ভাষিক, শ্রেণিক ও আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের, বিচ্ছিন্নতার ও স্বার্থের রক্তক্ষয়ী-প্রাণহরা যুদ্ধ ও দাঙ্গা। এককথায় আজ র‍্যাশিয়্যাল, রিজিওন্যাল ও রিলিজিয়াস কোন্দল (Racial, Regional, Religious Conflict) গোটা পৃথিবীতে মানবতা বিকাশের পথ রুদ্ধ করে রেখেছে।

AMARBOI.COM

বিকৃত ইতিহাস প্ররোচিত সাম্প্রদায়িকতা

১৭০৭ সনে আওরঙ্গজেবের আকস্মিক মৃত্যুর পরেই চার প্রজন্মের বংশধরদের মধ্যে বাদশাহীর দাবিতে লড়াই শুরু হয়ে যায়। কেন্দ্রীয় সরকারের এ দুর্বলতার সুযোগে তিন/চার/পাঁচ বছরের জন্যে নিয়োজিত সুবাদারদের কেউ কেউ স্বাধীন এবং অন্য অনেকেই স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠেন। এভাবেই দিল্লী সরকার ধনে-মানে, শক্তিতে-সাহসে, প্রভাবে-প্রতিপত্তিতে দুর্বল হতে থাকেন। এর উপর ১৭৪০ সনে নাদির শাহর এবং ১৭৬০ সনে আহমদ শাহ আবদালীর দিল্লী লুণ্ঠন মুঘলশক্তির পতনের প্রত্যক্ষ ও শেষ কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর সময়ে তার অনুরাগী, অনুগামী, অনুগত মুরশিদ কুলি খান ছিলেন বাঙলা-বিহার-উড়িশা নিয়ে গঠিত সুবার সুবাদার। তিনিও স্বেচ্ছাচারী হয়ে আমৃত্যু নওয়াব বা সুবাদার রয়ে গেলেন দিল্লীতে সামান্য বার্ষিক রাজস্ব পাঠিয়ে। তারপরে সুবাদার হলেন তাঁর জামাতা সুজাউদ্দীন, তারপরে সুজাউদ্দীনের পুত্র সরফরাজ খান।

দুর্দিনে সুজাউদ্দীনের কাছে ঋণী ও কর্মচারী হাজী আহমদ ও আলিবর্দী ষড়যন্ত্র করে সুবাদারী কেড়ে নিলেন দুর্দিনের সহায় আত্মীয় সুজাউদ্দীনের দৌহিত্র সরফরাজ খান থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৭৩৯ সনে পলাশীর মতোই গিরিয়ার নামমাত্র যুদ্ধে সরফরাজকে নিহত করে। আবার আলিবর্দীর অভিপ্রেত উত্তরাধিকারী সিরাজুদ্দৌলাহকে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্লাইভের সৈন্য সাহায্যে পদচ্যুত ও নিহত করে মীরজাফর আলী খান নওয়াব হয়ে বসেন; আবার তাঁরই জামাতা ক্লাইভদের ঘুষ দিয়ে সুকৌশলে মীরজাফরকে কলকাতায় আটকে রেখে মীর কাসিম আলী খান হলেন সুবাদার। ইংরেজদের সঙ্গে পর পর দ্বন্দ্বে-সংঘর্ষে-যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ায় তাঁকে কেউ ঘৃণা করে না কৃতঘ্ন বিশ্বাসঘাতক বলে। কেবল মীরজাফরকেই প্রাবচনিক ঘৃণায় ও ধিক্কারে চিহ্নিত করা হয় বিশ্বাসঘাতক ও জাতীয় কলংকরূপে। যদিও শাহ-সামন্তের জয়-পরাজয়ের, রাজ্য কাড়াকাড়ির ইতিবৃত্তমাত্রই কারো না-কারো বিশ্বাসভঙ্গের ও অকৃতজ্ঞতার ইতিবৃত্তান্ত। স্বজাতির, স্বদেশীর ও স্বগোত্রের মধ্যে রাজ্যে কিংবা প্রাসাদে এ ষড়যন্ত্রের বা বিশ্বাসঘাতকতার কোন নিন্দা হয় না। কেননা শাহ-সামন্ত আমলে দুনিয়াব্যাপী কাড়াকাড়ির এ-ই ছিল নিয়মানুগ উপায় বা পন্থা।

মীরজাফর নিন্দিত হলেন বিদেশী-বিজাতি-বিধর্মী-বিভাষী ইংরেজদের সহায়তা গ্রহণ করায় এবং ক্লাইভদের চট্টগ্রাম, চব্বিশপরগনা প্রভৃতির ভূমিকর শুল্কাদি আদায়ের তথা প্রশাসনের অধিকার বিদেশী-বিজাতি-বিধর্মী-বিভাষীর হাতে ছেড়ে দেওয়াতেই। এতেও হয়তো সুবা-ই বাঙলা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাতে অত শিগগির যেত না, যদি না দিল্লীর দেউলে সম্রাট অর্থলোভে বেদখল 'বাঙ্গলা' সুবার দেওয়ানী কোম্পানীর হাতে বার্ষিক ছাব্বিশ লক্ষ টাকার বিনিময়ে তুলে দিতেন। এ অনেকটা বেদখল চর দখল করার পরোক্ষ উপায়রূপে শক্তিমান লেঠেলের কাছে বন্দোবস্ত দেয়ার মতোই ছিল। যা নগদ মেলে তাই লাভ। 'বাকির খাতায় শূন্য থাক, কেননা আজ বাদে কাল ভরসা কি!'

রাজতন্ত্রের তথা স্বৈরতান্ত্রিক শাহ-সামন্ত যুগে রাজ্য ছিল রাজার ব্যক্তিগত সম্পত্তি, সামন্তের জমিদারী। শাসক-প্রশাসকরা ছিল নায়েব-গোমস্তার মতো, দেওয়ানরা ছিল রাজস্ব আদায়ে মনোযোগী, ফৌজদার-সেনানীরা ছিল লেঠেল সর্দারের মতো। এ অনেকটা এ কালের শহুরে বাড়িঅলার ভাড়াটের মতোই। বাড়ি হাত বদল হলে, কেনা-বেচা হলে, ভাগ-বন্টন হলে টুটাফাটা ভাঙা হলে যেমন ভাড়াটের মাথা ঘামানোর, লাভ-ক্ষতির কিছু থাকে না, সেকালে স্বদেশ-স্বজাতি-স্বাধীনতা-চেতনা প্রতীচ্যপ্রভাবিত ছিল না বলেই রাজারাও 'সম্পত্তি' বুঝত, স্বদেশ বলে কিছু মানত না। স্বরাজ্য সম্পদ হিসেবেই রক্ষণের ও শাসনের আর শোষণের গুরুত্ব ও পন্থা সচেতন ছিল মাত্র। এ কারণেই য়ুরোপীয় বেণেরা যখন গোয়া-দামন-দিও-পণ্ডিচেরী-কলকাতা-চন্দননগর-বোম্বাই-মাদ্রাজ দখলে ও শাসনে রাখল, মুঘল-মারাঠা কেউ তাকে তাদের স্বাধিকারে বিদেশী-বিজাতি-বিধর্মী-বিভাষীর অনধিকার চর্চা কিংবা হস্তক্ষেপ বলে অনুভব-উপলব্ধি করেনি। সেকাল সেভাবেই কেটেছে। কাড়াকাড়িতে শক্তিমানের জয় হয়, বিজয়ীর অনুগত থেকে তার প্রাপ্য কর আদায় করেই প্রজারা গার্হস্থ্য সুখ সন্ধানে থাকত নিরত। সৈন্য চলাচলের পথে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে বাসিন্দাদের উলুখড়ের মতোই জান-মাল-গর্দানের ও নারীর ইজ্জতের হানি হত অবশ্যই।

২

এতোসব কথা বলছি, ব্রিটিশ-ভারত নামের প্রাক্তন ভারতবর্ষ নামের উপমহাদেশের সাম্প্রদায়িকতারূপ বীভৎস দুরারোগ্য স্থায়ী আধিবিক্ষত বর্তমানে পাকিস্তানে ভারতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঙলাদেশে যে সংকট-সমস্যা রাজনীতিক মত-পথ-আদর্শ ও প্রশাসনপদ্ধতিক্ষেত্রে দেখা দিয়ে উনজন বা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জীবন-জীবিকা অনিশ্চিতিকবলিত করেছে বলে।

ব্রিটিশের ভারতশাসন ও প্রতীচ্য শিক্ষা ও সহবত আমাদের জীবনে ও জগতে মধ্যযুগীয় চিন্তা-চেতনার অবসান ঘটিয়েছে। ইংরেজরা তুর্কী-মুঘল শাসিত ভারতে হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে ভেদনীতির প্রয়োগে ব্রিটিশ শাসন-শোষণ নিরুপদ্রব ও নিরাপদ ও দীর্ঘস্থায়ী করার মতলবে ইতিহাস বিকৃত করেছিল সুপরিকল্পিতভাবে। তাছাড়া সেই রাজতান্ত্রিক স্বৈরশাসনের কালে শাসকরা জাতি হিসেবে কিংবা বংশ হিসেবে ভালোমন্দ হত না, ব্যক্তিগতভাবে কেউ ভালো কেউ মন্দ, কেউ বা মাঝারি হত। কাজেই জাত তুলে গালমন্দ, নিন্দা-ঘৃণা প্রকাশ করা অসঙ্গত ও অযৌক্তিক।

১. আগে আমাদের দেশে মানুষ পরিচিত হত দৈশিক নামে— আরব, তুর্কী, সমরখন্দী, মারাঠী কিংবা গোত্রনামে রাজপুত, ব্রাহ্মণ, খলজী, তুঘলক বা পেশার নামে কামার, কুমার ইত্যাদি। এজন্যেই খ্রীস্টান নামে চিহ্নিত হয়নি পর্তুগীজ, দিনেমার, ওলন্দাজ, ফিরিঙ্গি, ইংরেজ কেউই। ইংরেজরা ভেদনীতির অমোঘ প্রয়োগে পৌত্তলিকমাত্রকেই অভিহিত করল 'হিন্দু' অভিধায় যা আগে কখনো ছিল না। যদিও 'সিন্ধু' থেকেই সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীকেই হিন্দু, হিন্দুবী নামে অভিহিত করত মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার লোকেরা। অভিধার বিস্তারে গোটা উত্তর ভারতই হল হিন্দুস্থান।

এভাবে পৌত্তলিকমাত্রই নিজেদের হিন্দু পরিচয় দিতে থাকে। বিশেষ করে আঠারো শতক থেকে এবং সে সঙ্গে বিকৃত তথ্যের প্রভাবেই ইরানী, গ্রীক, শক, হূন, কুষাণ, পার্থিয়ান, তুর্কী, মুঘল প্রভৃতি বিদেশী-বিধর্মী-বিজাতি-বিভাষীর শাসনেই ছিল ভারতবর্ষ, তাছাড়া অস্ট্রিক দ্রাবিড় আর্যরাও বিদেশাগত। কিন্তু এখানে হিন্দু নামে পরিচিত ভারতবর্ষে হিন্দুরা ব্রিটিশ প্রচারিত ও ব্রিটিশ-প্ররোচিত ধারণায় আক্ষরিকভাবে আস্থাবান হয়ে মনে করে তারাই হচ্ছে সনাতন ধর্মের ও সংস্কৃতি-সভ্যতার অবিমিশ্র ধারক, বাহক, প্রচারক ও প্রবর্তক। মহেনজোদারো-হরপ্পা-লাথাল ও আর্য সংস্কৃতি-সভ্যতা-দর্শনও তাদেরই, যেন এতে কোন রক্ত সাঙ্কর্য নেই, নেই কোন বহির্ভারতীয় অবদান। কেবল তুর্কী-মুঘলের ছয়শ' বছরের শাসনই তাদের অবিচ্ছিন্ন স্বাধীনতার, অবিমিশ্র সংস্কৃতি-সভ্যতার প্রবহমানতা নষ্ট করে। যেন কেবল হিন্দু নামের এ কালের পৌত্তলিক ঐতিহ্যধারী সম্প্রদায়েরই সম্পদ ও ঐতিহ্য ছিল প্রাচীন ভারতের যা কিছু গৌরবের ও গর্বের বিষয়। বিদেশাগত তুর্কী-মুঘলের স্থায়ী বংশধরগণও যেন আজো বিদেশী-বিজাতি-বিধর্মী শত্রু আর নিম্নবর্ণের, নিম্নবর্গের ও নিম্নবৃত্তির বৌদ্ধ-হিন্দুজ-মুসলিমরাও যেন তুর্কী-মুঘলের স্বধর্মী হিসেবে ঘৃণ্য ও শত্রু।

২. ইতিহাসে অজ্ঞ এবং উর্দুভাষীর নেতৃত্বে চালিত গাঁ-গঞ্জের মুসলিম স্বল্প কিংবা উচ্চ শিক্ষিতরাও আবার ওই ব্রিটিশ প্ররোচনাবশে চোখে দেখল জমিদার, চাকুরে, ব্যবসায়ী ও মহাজনমাত্রই হিন্দু আর কুলি-মজুর-চাষী নিঃস্ব-নিরন্ন-খাতক-অনক্ষরমাত্রই মুসলিম। আর তারা শুনল যে তারাও তুর্কী-মুঘল বাদশার জাত। অতএব তাদের দারিদ্র্যের কারণ ব্রিটিশ কৃপাপুষ্ট হিন্দুর শোষণ-লুণ্ঠন এবং ফারসীর স্থলে প্রশাসনের ভাষা ইংরজী হওয়ায় দেশজ মুসলিম পরিবার হল সম্পদভ্রষ্ট। আসলে দেশজ মুসলিমরা নিম্নবর্ণের, নিম্নবর্গের ও নিম্নবিত্তের হিন্দু-বৌদ্ধজ হওয়ায় তাদের শিক্ষার বিদ্যার বিত্তের কোন ঐতিহ্য কোনকালেই ছিল না। তারা ছিল তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র পেশাজীবী। তাদের থেকেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ষোল শতক থেকে কেউ কেউ মুনশী, মোল্লা, মৌলভী, উকিল-আমিন, কাজী-ফৌজদার হয়েছিলেন লেখাপড়া শিখে। বিভিন্ন উপায়ে সচ্ছল সম্পদশালী গৃহস্থ চাষী কিংবা তালুকদার-তরফদারও হয়েছিল, তবে উচ্চ শিক্ষিত ছিল দুর্লভ। তাদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষাও উনিশ শতকের তৃতীয়পাদ থেকে শুরু হলেও বিস্তার ঘটে উনিশ শতকের শেষ দশক থেকেই।

৩. হিন্দুরা ভুলে গেল যে, ভারতবর্ষ চিরকালই বিদেশী-বিজাতি-বিধর্মী-বিভাষী আক্রান্ত দেশ, উত্তর-পশ্চিম ভারত কিংবা দক্ষিণ ভারত শাসিত হয়েছে ভিন্ন জাতের গোত্রের লোকের হাতে। উত্তর ভারতে নাগ-মৌর্য-কম্ব, শুঙ্গ-গুপ্ত-পাল-সেনেরা শাসন করেছেন বটে, কিন্তু এঁরা আর্যভাষী হলেও আর্যভাষী গোত্রের ছিলেন কিনা জানা নেই। স্বয়ং রামচন্দ্র ছিলেন নবদূর্বাদল শ্যাম, কৃষ্ণ ছিলেন নবঘন শ্যাম, কালী দেবীতো কালোই, হিমপর্বতবাসী শিব হলেন তুষার ধবল, যদিও আদিতে চণ্ড-চণ্ডীই পরে হর-গৌরী হলেন নব রঙ, রূপ, গুণ, তত্ত্ব, তথ্য জড়িত হয়েই। যা কিছু সনাতন ও পুরাতন সবটাই একালের পৌত্তলিক হিন্দুর নয়। আজো উপমহাদেশে অভিন্ন শাস্ত্রিক, সামাজিক, আচারিক ও সাংস্কৃতিক কোন হিন্দু জাতি নেই। রাজনীতিক অর্থেই হিন্দু একটা জাতি বা দৈশিক সম্প্রদায়। হিন্দুদের কোন একক অভিন্ন উপাস্য নেই।

৪. ভারতবর্ষের সংস্কৃতি, সভ্যতা গড়ে উঠেছে মহেনজোদারো-হরপ্পা-লাথাল তথা মেসোপটেমিয়ান সভ্যতার ইরানী, গ্রীক, হূন, শক, কুষাণ, তুর্কী-মুঘল সাংস্কৃতিক সভ্যতার উপাদান-উপকরণ নিয়ে। দ্রাবিড়, অস্ট্রিক কল্পনা-বিস্ময়-অনুমানপ্রসূন পশু, পাখি, নারী, ধ্যান, মূর্তি, মন্দির, জন্মান্তরবাদ প্রভৃতি ট্যাবু-টোটেম-যাদু ও সর্বপ্রাণবাদ প্রতীক অরি-মিত্র শক্তির স্থূল-সূক্ষ্ম বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণার প্রাজন্মক্রমিক আবর্তিত-বিবর্তিত-পরিবর্তিত রূপ নিয়ে গড়ে উঠেছে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের বিচিত্র তাৎপর্যের বিভিন্ন শাস্ত্রমতবাদী সম্প্রদায়গুলো, যারা এখন রাজনীতিক সংজ্ঞায় হিন্দু সম্প্রদায় বা হিন্দু জাতি অভিধাপ্রাপ্ত হয়েছে।

৫. পৃথিবীর সবকিছুই কারণ-কার্যসূত্রে বাঁধা। পরিচিত মানুষের সমাজের, আচারের-আচরণের অভ্যাসের প্রভাব নয় শুধু, তাদের ভাব-চিন্তা-কর্মের, মনের-মননের-মগজের, মনীষার-সৃষ্টির-আবিষ্কারের-উদ্ভাবনের প্রভাবও এড়ানো যায় না। আজকের এ মুহূর্তের প্রত্যক্ষ ও অবশ্য স্বীকার্য সাক্ষ্য প্রমাণ হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ বছর আগে ইংরেজদের বিতাড়িত করেও আমরা য়ুরোপের কোন প্রভাবই এড়াতে পারিনি, চাইও না এড়াতে। কেননা আমরা সৃষ্টিতে, নতুন চেতনায়, নতুন চিন্তায়, নতুন আবিষ্কারে-উদ্ভাবনে বন্ধ্যা। তাই নিজেদের দেহ-প্রাণ-মন-মগজ-মনন-মনীষা-মনস্বিতা গড়ে তুলবার জন্যে, ভরে তুলবার জন্যে য়ুরোপকে মনে-মননে-বিদ্যায়-বিজ্ঞানে-দর্শনে অবলম্বন করেছি।

৬. স্মর্তব্য যে তুর্কী-মুঘলেরা শক-হূন-পার্থিয়ানদেরই জ্ঞাতি, বাবরও ছিলেন চেঙ্গিস খানের রক্তসম্পৃক্ত। তুর্কী-মুঘলের ছয়শ' বছরের রাজত্বকালীন আরবী-ইরানী-মিশরী ও মধ্য এশীয় সংস্কৃতি-সভ্যতার, মনন-মনীষার প্রভাব গোটা ভারতের গাঁ-গঞ্জের অধিবাসীদের মনে-মগজে-মননে, ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে আজো নানাক্ষেত্রে খাদ্যে, পোশাকে, পার্বণে, দর্শনে, চিত্রে, সঙ্গীতে, স্থাপত্যে, আচারে অভ্যাসে সুপ্রকট। এখন মিনার-মসজিদ-কেল্লা-কবর ভেঙে বিলুপ্ত করলেই কি মধ্য এশিয়ার শক-হূন-তুর্কী-মুঘল-আফগান-ইরানী-ইরাকী-আরবের প্রভুত্বের, প্রভাবের, শাসনের, সংস্কৃতির, সভ্যতার স্মৃতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও তথ্য বিলুপ্ত করা যাবে? যাবে কি পরাজয়ের গ্লানি-লজ্জা ইতিহাস থেকে মুছে ফেলা? শঙ্কর-রামানুজ-নিম্বার্ক-বল্লভ-চৈতন্য-কবির নানক-দাদু-একলব্য-রামানন্দ-রামদাস প্রভৃতির দ্রোহ ও দর্শন এবং সম্প্রদায় কি বিলুপ্ত করা যাবে? এঁরা মুসলিম প্রভাবিত প্রত্যক্ষভাবে। পৃথিবীর সব ব্যক্তির, পরিবারের, সমাজের, শাস্ত্রের, সংস্কৃতির, সভ্যতার, ক্ষমতার, খ্যাতির, প্রভুত্বের, প্রতিপত্তির প্রকাশের উঠতি-বাড়তি-পড়তি থাকেই। লজ্জার-কলঙ্কের-গ্লানির-অগৌরবের-পরাজয়ের-পলায়নের ইতিবৃত্তান্ত দুনিয়ার তাবৎ জাতির, গোত্রের ও গোষ্ঠীর জীবনে কোথাও না-কোথাও, কখনো না-কখনো ঘটে, ঘটেছে, ঘটবে। মিশর, গ্রীস, রোম, বোগদাদ কিংবা আজকের ইংল্যান্ড স্মরণ করলেই এ সত্য স্বীকার করতে হবে। তাহলে তুর্কী-মুঘল শাসনামলের কৃতী-কীর্তিরূপ মিনার-মসজিদ-কেল্লা-কবর ভেঙে নিজেদের মানস দৈন্য ও অসংস্কৃতি আর অমানবিকতা প্রকাশ করে নিন্দা-লজ্জা-গ্লানি বাড়ানো কেন? চুকেভুকে যাওয়া অতীত নিয়ে ক্ষোভ-ক্রোধ-জ্বালা অনুভব করা আত্মপ্রতারণারই নামান্তরমাত্র।

৭. তুর্কী-মুঘল তথা মুসলিম-দ্বেষণার মূল উৎস হচ্ছে ভারতের সংখ্যাগুরু হিন্দুমনে পূর্বতন শাসকগোষ্ঠীর প্রতি ক্ষোভ-ক্রোধ-ঘৃণা-প্রতিহিংসাবৃত্তি জাগিয়ে ভেদনীতির প্রয়োগে ব্রিটিশ সাফল্য সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে ভারতের তুর্কী-মুঘল শাসনামলের বিকৃত-বানানো ইতিহাস রচন, মুদ্রণ ও প্রচার। ব্রিটিশ রচিত ইতিহাস যে বিকৃত ও বানানো তার সাক্ষ্য ও যৌক্তিক-বৌদ্ধিক প্রমাণ এইঃ

ক. ১৯৪৭ অবধি গোটা ভারতের স্বল্পাংশমাত্রই দিল্লী সরকারের প্রত্যক্ষ শাসনে ছিল। মোট সাতশত একাশিখানা ছোট-বড় সামন্ত রাজ্য কিংবা জমিদারের প্রত্যক্ষ শাসিত রাজ্য বা অঞ্চল নিয়ে গঠিত হয়েছে আজকের ভারত রাষ্ট্র। পাকিস্তান রাষ্ট্রও ছিল কয়েকটা সামন্ত শাসিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চল। কাজেই তুর্কী-মুঘলরা জনগণকে শোষণ-পীড়ন-শাসন প্রত্যক্ষভাবে করতেই পারেনি। বিশেষত মুসলিমরা ছিল সর্বত্রই সংখ্যালঘু এবং নির্জিত অজ্ঞ অনক্ষর আকীর্ণ সমাজভুক্ত। কেননা শূদ্রসেব্য বর্ণহিন্দুরা ইসলাম বরণ করে অস্পৃশ্যদের সঙ্গে একাকার হতে চায়নি বলে দীক্ষিত মুসলমান সমাজে অভিজাত ছিল করগণ্য। খ. তুর্কী-মুঘলরা ইংরেজদের মতোই রাজত্ব করতে এসেছিল, ধর্মপ্রচারের জন্যে নয়, তাই রাজধানীগুলোতেও মুসলিমসংখ্যা তুর্কী-মুঘল আমলে ছিল নগণ্য। গাঁয়ে-গঞ্জেও ষোল শতকের শেষার্ধের আগে উল্লেখ্য ও দৃশ্যমান সংখ্যার বাসিন্দা অধ্যুষিত মুসলিম পাড়া গড়ে ওঠেনি। শহরে হিন্দু পীড়িত হয়নি প্রশাসনের সহায় ছিল বলে, গাঁয়ে হিন্দু পীড়িত-লাঞ্ছিত হয়নি, মুসলিমরা হরিজনদের মতোই বর্ণহিন্দুর প্রজা, খাতক, মজুর, সেবক অজ্ঞ ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ পেশাজীবী কিংবা বর্গাচাষী ছিল বলে। জোরজবরদস্তিতে যে ধর্মান্তর হয়নি, ফকির-দরবেশ-সুফীর প্রচারে, সেবায়, কৃপায়-করুণায়-দয়ায়-দাক্ষিণ্যে-মুগ্ধতায় হয়েছিল, তার প্রমাণ কোথাও কোন জনপদে বা গাঁয়ে কিংবা অঞ্চলে কেবল মুসলিম মেলে না, হিন্দুর ও মুসলিমের একই গাঁয়ে বাস হলেও পাড়ায় ছিল বিভক্ত। আর মুলতানের পরে উত্তর ভারতে এবং দক্ষিণ ভারতে সর্বত্র মুসলিম ছিল নগণ্য সংখ্যার।

তাছাড়া কেবল নিম্নবর্ণের, নিম্নবর্গের ও নিম্নবিত্তের হিন্দু-বৌদ্ধ সমাজ থেকেই যে নানা লাভে লোভে স্বার্থে এবং বর্ণে বিন্যস্ত সমাজে অপমানিত বঞ্চিত লাঞ্ছিত অবজ্ঞেয় অস্পৃশ্যরা যে মুসলিম হয়ে আর্থিক জীবনে তেমন সুবিধে না পেলেও মনুষ্যসত্তার মর্যাদা পেয়েছিল মুসলিম সমাজে, তা তো অস্বীকার করা যাবে না। যোগ্যতা ছিল না বলে এসব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেশী মুসলিমদের কেউ ভারতের কোথাও শাহ-সামন্ত দরবারে বর্ণহিন্দুর মতোই ঠাঁই পায়নি। আর বর্ণহিন্দুরা সৎশূদ্র অবধি সবাই যে শাসনে-প্রশাসনে নিযুক্ত ছিল ব্রিটিশ আমলের মতো তুর্কী-মুঘলরাজ্যেও, তার প্রমাণ বর্ণহিন্দুরা আজো প্রশাসনিক পদবীকে কুলবাচি বা কুল উপাধিরূপে বয়ে চলেছে ভারতবর্ষের সর্বত্র। বাঙলার তথা প্রাক্তন বঙ্গের প্রশাসনিক পদবী তো হিন্দুরই ছিল। মুসলিম সমাজে কাজী ব্যতীত ক্বচিৎ অন্য কোন পদবী মেলে। অতএব দেশজ মুসলিম সমাজ ছিল হিন্দুর শাসনে-শোষণে-তত্ত্বাবধানে। মুসলিম হয়েও অবশ্য তারাও হিন্দু নাপিত-ধোপা-কামার-কুমার-মুচি-মেথর-চাঁড়াল-হাঁড়ি-ডোম-বাগ্‌দীর সেবা পেয়েছে গৃহস্থ হিসেবে। আর নিঃস্ব-অজ্ঞ বলেই মুসলিমরা তাঁবে-প্রতাপে-অভিভাবকত্বে ও শাসনে-শোষণে চলেছে কায়স্থের, বৈদ্যের, ব্রাহ্মণের, জমিদারের, আমলার, মহাজনের, চিকিৎসকের ও দোকানদার-আড়তদার সাহুদের।

রাজকীয় পীড়ন-লাঞ্ছনার শিকার হয়েছে ব্যক্তি, তা কখনো ধর্মবিশ্বাসভিত্তিক হতেই পারে না। আর যুদ্ধের, সংঘর্ষের, সংঘাতের সময়ে হয়তো কখনো কখনো শাস্ত্রিক মতবাদী সম্প্রদায়ও হয়েছে রক্তক্ষরা প্রাণহরা কাড়াকাড়ির মারামারির, হানাহানির কিংবা কেবল কাড়ার-মারার ও হানার শিকার। গোটা পৃথিবীর ইতিহাসে সবযুগেই এমনি ঘটনার খবর মেলে। কাজেই এ-ও কোন বিশেষ জাত জন্ম বর্ণ ধর্ম ভাষা নিবাস সম্পৃক্ত ইতিবৃত্তান্ত নয়।

একালে ১৯৯৪ সনে সাম্প্রদায়িক চেতনামুক্ত হতে হলে চারটে বিকল্পের যে-কোন একটা ব্যক্তিগতভাবে, সম্প্রদায়গতভাবে কিংবা জাতিগতভাবে আর রাষ্ট্রিক নীতিরূপে বরণ করতে হবে। এক. 'স্রষ্টা মান শাস্ত্র ছাড়' নীতি। দুই. নাস্তিক্য-নিরীশ্বরবাদ। তিন. জাত-জন্ম-বর্ণ-ভাষা-ধর্ম-নিবাস ব্যক্তির যোগ্যতা-সামর্থ্য নির্বিশেষে কেবল মানুষরূপে এবং সমাধিকারের নাগরিকরূপে মানুষকে জেনে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন। চার, নিদেনপক্ষে যথার্থ সংজ্ঞায় ও সংজ্ঞার্থে সেক্যুলার রাষ্ট্রনীতির নিষ্ঠবাস্তবায়ন।

তুর্কী-মুঘল শাসন সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্যের কয়েকটি

এক

আলাউদ্দীন খলজীর সময়ের ঐতিহাসিক কাজী মুগিসউদ্দীন আলাউদ্দীন খলজীকে ইসলামী শাসনপদ্ধতি প্রবর্তনের কথা বললে সুলতান উত্তরে বলেন- "আমি জানি না হাশরে আল্লাহ আমার জন্য কি রেখেছেন, তবে শাসনের বা রাজত্বের স্বার্থে আমি যা ঠিক মনে করি তা-ই করি।"

দুই

তাওয়ারিখ-ই ফিরোজ শাহীতে জিয়াউদ্দীন বারনি লিখেছেন, ফিরোজ শাহ শাসনে বিচারে আল্লাহভীতিতে চালিত হতেন না, রাজত্বের, রাজ্যের, শাসনের স্বার্থে যা ভালো মনে করতেন শরাবিরোধী হলেও তা-ই প্রয়োগ করতেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিন

জিয়াউদ্দীন বারনি ঐতিহাসিকের জ্ঞান-প্রজ্ঞা দিয়ে বুঝতেন- ধর্মের অনুশাসন প্রয়োগে (বিধর্মী) প্রজা শাসন করা সম্ভব নয়।

চার

'তবকত-ই-আকবরী' গ্রন্থে নিজামুদ্দীন মন্তব্য করেছেন যে, বাদশা গিয়াসউদ্দীন বলবন রাষ্ট্রীয় বিষয়কে ধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত ভাবতেন না। দুটোকে আলাদা বলেই জানতেন।

পাঁচ

সেকালের ঐতিহাসিক কাজী মুগিসউদ্দীন সুলতানেরা রাষ্ট্রকে শরীয়তসম্মত নিয়মে শাসন করছেন না বলে ক্ষোভই প্রকাশ করেছেন।

ছয়

শাহজাহান পুত্র দারা শিকোহ [১৬১৫-৫৯] ছিলেন একাধারে সুফী ও যোগী। তাঁর পীর ছিলেন কাদেরিয়া মতের মোল্লা শাহ বদখশানী এবং গুরু ছিলেন গোঁসাই বাবালাল। দারা শিকোহ ছিলেন উপনিষদের ফারসী অনুবাদকও।

সাত

মহেনজোদারো-হরপ্পা-লাথাল সভ্যতা ছিল যাদের, তারা ছিল কালো বর্ণের মানুষ। সিন্ধুতে, শ্রীলঙ্কায় এবং উত্তর ভারতের দাক্ষিণাত্যে নাকি তাদের বংশধর নিম্নবর্ণের-বর্গের মানুষদের মধ্যে রয়েছে। একে ভারতের প্রথম সভ্যতা বলা চলে, কিন্তু একে একালের ব্রাহ্মণ্যবাদীর বা হিন্দুর সনাতন ঐতিহ্য বলে দাবী করা যাবে না।

আট

উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ্যবাদীরা [ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও সৎশূদ্র] শূদ্রসেব্য ছিল বলেই ইসলামী সাম্যে প্রলুব্ধ হয়নি। পার্থিব জীবনের সুখ সুবিধা সম্মান স্বাতন্ত্র্য-আভিজাত্য হারানোর ভয়ে। উপমা যোগে বললে কারখানামালিক যেমন শ্রমিক দলের সদস্য হতে পারে না শ্রেণীস্বার্থেই, তেমনি বর্ণহিন্দুও মুসলিম হয়নি শ্রেণীস্বার্থ নির্বিঘ্ন রাখার গরজেই।

নয়

সম্রাট আকবর প্রবল প্রতাপশালী ছিলেন বলেই দ্রোহের আশঙ্কা না করেই কোরআনের ইসলামকে উপেক্ষা করেও রাজত্ব দৃঢ়ভিত্তিক করার লক্ষ্যে ইলাহি ধর্ম প্রচারে উদ্যোগী হন।

দশ

কাসেমপুত্র মুহম্মদের বিজয়ের ফলে দক্ষিণ ভারতে শঙ্কর, মধ্ব, নিম্বার্ক, রামানুজ, বল্লভ, বাঙলার চৈতণ্যদেব প্রমুখ ব্রাহ্মণ বিচিত্র তত্ত্বঋদ্ধ অদ্বৈতবাদ প্রচার করে ব্রাহ্মণ্য সমাজকে কার্যত রক্ষা করেছিলেন। ফলে ইসলাম প্রচারের পথ হয়েছিল রুদ্ধ, তেমনি উত্তর ভারতের মুসলিম বিজয়ের ফলে নিম্নবর্ণের, নিম্নবর্গের ও নিম্নবিত্তের ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ বৃত্তিজীবীর মধ্যে দেব-দ্বিজ-বেদ দ্রোহিতা জাগে। তাদের মধ্যেই বিভিন্ন গুরুর সন্তধর্ম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রচারিত হয়। কবির, নানক, দাদূ, রামানন্দ প্রমুখ সেদিন কার্যত ব্রাহ্মণ্যপীড়ন মুক্ত করেছিল বর্ণে বিন্যস্ত সমাজের নিপীড়িত শোষিত ঘৃণ্য অস্পৃশ্যদের। এ সূত্রে বাঙলা সাহিত্যের শূন্যপূরাণ গ্রন্থের নিরঞ্জনের রুস্মা ও কলিমা জালাল স্মর্তব্য।

এগারো

টিপু সুলতানের তিন হাজার ব্রাহ্মণ হত্যা প্রভৃতি ব্রিটিশ বানানো ও প্রচারিত কিসসা আর সিরাজুদ্দৌলাহর উচ্ছৃঙ্খলতার বানানো বয়ান আজকাল আর ঐতিহাসিকরা বিশ্বাস করেন না।

বারো

গোড়া থেকেই দাক্ষিণাত্যে আরব এবং উত্তর ভারতে তুর্কী-মুঘলরা দেশ শাসনে চিরকালই দেশী অমুসলিম বর্ণহিন্দুনির্ভর ছিলেন। আজো গোটা ভারতে হিন্দুরা সেই প্রশাসনিক পদবী স্ব স্ব নামের সঙ্গে যুক্ত রেখেছে।

তেরো

জোর জুলুমে গাঁয়ের বা শহরের অমুসলিমদের দলে দলে ধর্মান্তরিত করার একটিও সাক্ষ্য প্রমাণ দলিল আজো মেলেনি। এও ব্রিটিশ বানানো শোনা কথায় আস্থা রেখে হিন্দুরা তুর্কী-মুঘলের প্রতি ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ ও প্রতিহিংসাপরায়ণ থেকেছে প্রজন্ম ক্রমে এবং একালে তাই ভিন্ন কারণে উত্তেজনা বশে প্রতিহিংসায় হিংস্র হয়ে ওঠে মাঝে মধ্যে।

AMARBOI.COM

চৌদ্দ

সম্রাজ্যবাদী মুঘল শাসনকালে বাঙলার বিশেষ করে বর্ধমান ও প্রেসিডেন্সী বিভাগের আব্রাহ্মণ চন্ডাল ও মুসলিম সবাই মন্দিরে-মসজিদে ভরসা হারিয়ে পীর-নারায়ণ সত্যের এবং তাঁর চেলা অলীক পীর-দেবতার শরণ নিয়েছিল জাগতিক জীবনের সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তা প্রাপ্তির লক্ষ্যে।

পনেরো

একালের ঐতিহাসিক অধ্যাপক মুহম্মদ হাবিব [ইরফান হাবিবের পিতা] 'মুসলমানেরা ইসলামসম্মত শাসন পদ্ধতি প্রয়োগ করলে ছয়শ' বছর ধরে শাসন টিকিয়ে রাখতে পারতেন না।'

ষোল

একালের ঐতিহাসিক আতহার আলি তাঁর 'মুঘল নোবেলিটি আন্ডার আওরঙ্গজেব' গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে আওরঙ্গজেবের আমলেই হিন্দু পদস্থ কর্মচারীর সংখ্যা ছিল শ'তে তেত্রিশজন যা আকবরের আমলেও সম্ভব হয়নি। মেবারের রাজা রাজসিংহকে লিখিত পত্রে আওরঙ্গজেব লিখেছেন, যে-রাজা ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর প্রতি অসহিষ্ণুতা দেখায় সে আল্লাহর কাছে অপরাধী। জাগতিক বিষয়ের সঙ্গে ধর্মের কি সম্পর্ক? [What have the worldly affairs to do with religion?]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সতেরো

আর একালে সবাই জেনেছে যে গোটা ভারতেরই ১৯৪৭ সন পর্যন্ত অধিকাংশ অঞ্চলই ছিল সামন্ত রাজা-জমিদার ও জায়গীরদারদের শাসনে। তুর্কী-মুঘল বাদশাহদের প্রত্যক্ষ শাসন ছিল ব্রিটিশের প্রত্যক্ষ শাসিত অঞ্চলের চেয়েও অনেক ক্ষুদ্রাংশ। এবং সামন্ত, জমিদার, দেওয়ান জায়গীরদারদের অধিকাংশ থাকত দেশজ হিন্দুরাই।

কাজেই হিন্দুপীড়ন গণধর্মান্তর আর মন্দির ধ্বংস করা সম্ভব ছিল না তুর্কী-মুঘলদের পক্ষে ধর্মীয় উত্তেজনা বশে। যুদ্ধকালে, দ্রোহকালে কিংবা অপরাধীর সন্ধানে মন্দির-মসজিদ সমভাবেই ভাঙা হয়েছে।

আঠারো

এমনকি এতোকাল হিন্দু-বিদ্বেষী বলে নিন্দিত আওরঙ্গজেব ও তাঁর এক আমীর আমিন খাঁকে লেখা পত্রে বলেছেন, জাগতিক বিষয়ের সঙ্গে ধর্মের কি সম্পর্ক, প্রশাসনের কাজে ধর্মের নাক গলানোর কি অধিকার আছে? তোমার জন্য তোমার ধর্ম, আমার জন্য আমার [বরুণ দে লিখিত প্রবন্ধ 'স্ট্যাডিজ ইন সোসিয়াল হিস্টরি অব মডার্ণ ইন্ডিয়া গ্রন্থে] পূর্বেই উক্ত হয়েছে যে আওরঙ্গজেব বিধর্মীর প্রতি অসহিষ্ণুতাকে পাপ জনক বলেই জানতেন।

উনিশ

পট্টভিসীতারামিয়া, বি এন পান্ডে, অতুলগুপ্ত, পি.এন. গুপ্ত, আতহার আলি, বিপান চন্দ্র, শামচরণ শর্মা, হরবংশ মুখিয়া, রোমিলা থাপা, ইখতেদার আলম খান, ইরফান হাবিব, সতীশচন্দ্র প্রমুখ আজকের নিরপেক্ষ সত্যসন্ধিৎসু ঐতিহাসিকরা স্বীকার করছেন যে আওরঙ্গজেব নিষ্ঠাবান মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও শাসনে বিচারে যোগ্যতার কদর দানে ও ন্যায্যতায় তাঁর অবহেলা ছিল না কখনো। আকবর রাজত্বের স্থায়িত্বের লক্ষ্যে স্বধর্মমত ত্যাগ করে ইলাহি ধর্ম প্রচার করেন অমুসলিম প্রজার প্রিয় হবার জন্যে। আদর্শ রাজা ছিলেন শেরশাহ যিনি নাকি বলতেন 'আমি জনগণের সেবকমাত্র। [I am a servant of the people] বি.এন পান্ডে তাঁর Islam and Indian Civilization' গ্রন্থে উজ্জয়িনীর মহাকালেশ্বর মন্দিরে, চিত্রকুটের বালাজি মন্দিরে, গোহাটির উমানন্দ মন্দিরে, শত্রুমুনির জৈনমন্দিরে, অনেক গুরুদ্বারে আওরঙ্গজেব অর্থ ও ভূমিদান করেছেন বলে বয়ান করেছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, পৃথিবীর সর্বত্রই রাজা-বাদশাহরা ষড়যন্ত্রের গন্ধ পেয়ে অপরাধীকে আশ্রিত জেনে, বিদ্রোহীর ঘাঁটি মনে করে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান নির্বিশেষে স্বমীর মন্দির, মসজিদ, সিনাগগ, মঠ, বিহার ভেঙেছেন নির্দ্বিধায়, এখনো ভাঙেন। লাহোর মসজিদে গুলি চালানো, শিখ স্বর্ণমন্দিরে নরহত্যা, মক্কায় হজ্বের সময়ে লড়াই প্রভৃতি একালের দৃষ্টান্ত। কামাল আতাতুর্ক পুরাতন গীর্জা সোফিয়া মসজিদকে করেছিলেন যাদুঘর। গ্রীকদের বাস্তু ত্যাগের পরে গীর্জাকে মসজিদ করা হয়েছিল। তুর্কী সুলতান ফিরোজ তুঘলক ও আওরঙ্গজেব মসজিদও ভেঙেছিলেন। এতো কাল আওরঙ্গজেব একটি অনৃত অপরাধে হিন্দুদের ক্ষোভের, ক্রোধের ও ঘৃণার পাত্র হয়েছিলেন। এখন প্রমাণিত হয়েছে যে বিশ্বনাথের মন্দির আওরঙ্গজেব ধ্বংস করেছিলেন হিন্দুদের দাবিতেই। কচ্ছে হিন্দু রানীকে মন্দিরের প্রধান পুরোহিত মন্দিরের নিচের কক্ষে ধরে নিয়ে ধর্ষণ করেছিলেন। এতেই হিন্দুরাজাদের দাবি অনুসারে তিনি ওই অপবিত্র মন্দির ভেঙে দেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্বনাথের নতুন মন্দির স্থাপিত করা হয়। পট্টভিসীতারামিয়া, বি এন পান্ডে এবং পি এন গুপ্ত প্রমুখের লেখায় এর বিস্তৃত বয়ান মেলে। দ্রষ্টব্য পট্টভিসীতারামিয়ার The Feathers and Stanes, বি.এন. পান্ডে 'Islam and Indian Civilization' গ্রন্থে আর ডক্টর পি এন গুপ্তের লেখায় দেখা যায় বাঙলার সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ উড়িষ্যা অভিযানে দেউল-দেহারা ভেঙেছিলেন। কিন্তু গৌড়ের সুলতানদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম কীর্তিমান সুশাসক চৈতন্যদেবের কালে। শাসক-শাসিত মাত্রই দুটো জাত। শাসকের কাছে স্বার্থের প্রয়োজন বড় কথা, স্বজাতি বিজাতি ভেদ তাঁরা মানেন না। প্রজা প্রজাই, রাজা রাজাই। সম্পর্কটা শাসক-শাসিতের, শোষক-শোষিতের, পালক-পালিতের, দাস-মনিবের, সুবিচার-দয়া-দাক্ষিণ্য-কৃপা-করুণা প্রভৃতির মাত্রাভেদে ব্যক্তিক মন-মগজ-মেধা-মনন-মনুষ্যত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত। রাজা কি স্বজাতি বলে কর মাফ করে দেন? কিংবা কৃপা-করুণা-দয়া-দাক্ষিণ্য প্রভৃতি শাসক-শাসিত মতবাদী সম্প্রদায়ের ভাব চিন্তা-কর্ম-আচরণের পরিমাপক হতে পারে না। এজন্যেই ভারতের ইতিহাস আধুনিক নতুন নিরপেক্ষ যৌক্তিক বৌদ্ধিক চেতনা-চিন্তা-বিচার-বিবেচনা-কারণ-করণ বিশ্লেষণ যোগে লিখিত হওয়া প্রয়োজন। উপমহাদেশে মানুষের জাত জন্ম বর্ণ ধর্ম ভাষা নিবাস যোগ্যতা নির্বিশেষে নির্বিরোধে নির্বিবাদে নিরুপদ্রবে নিরাপদে সহযোগিতায় সহাবস্থানের গরজে। আমাদের উপমহাদেশের ব্রিটিশ পূর্বকালের ইতিবৃত্ত নতুন প্রকৃত তথ্যের আলোকে পুনর্লিখিত হলে সাম্প্রদায়িক দ্বেষ-দ্বন্দ্ব হ্রাস পাবে, দাঙ্গাও হবে বিরল। এ-ই আমাদের ধারণা।

AMARBOI.COM

সাম্প্রদায়িকতা বিমুক্তির উপায় কি?

বিজাতি-বিধর্মী-বিদেশী-বিভাষী-বিমতবাদীবিদ্বেষ মুক্তির উপায় বা পন্থা কি কি আছে তা ভেবে চিন্তে, আলাপে-আলোচনায়-গবেষণায় বের করার সময় এসে গেছে। নীতিকথায়, আপ্তবাক্যে শাস্ত্রিক দেশনায় যে এর প্রতিকার, প্রতিরোধ পন্থা মিলছে না, মিলবে না, তা তো কয়েক হাজার বছরের মধ্যে দুনিয়ার সর্বত্র বারবার প্রমাণিত হয়ে গেছে। নইলে জৈন-বৌদ্ধ-ক্যাথলিক কি করে যোদ্ধা হয়, সৈনিকবৃত্তি বরণ করে? জৈন-বৌদ্ধ-খ্রীস্টান রাজা কি করে পরাক্রান্ত হয়, সাম্রাজ্যবাদী হয়, নরঘাতক হয়? মশা-মাছিরও বেঁচে থাকার, মানুষের সঙ্গে সহাবস্থানের অধিকার যেসব শাস্ত্রে স্বীকৃত, ক্ষমাই, তিতিক্ষাই যেসব শাস্ত্রে মূল দেশনা, সেসব শাস্ত্রমনা মানুষেরা নরহত্যায় উল্লাসিত হয় কি করে? শাস্ত্রীরা যেমন যাজক-শ্রমণ-ভিক্ষুরাও সৈন্যদলে ভর্তি হয় দেশরক্ষার নামে জাতির সেবার নামে নররক্তে মাটি ভেজানোর জন্যে। নিরামিষভোজী কুকুর-বিড়াল-তোতাপ্রেমী মানুষ দাঙ্গার নামে, যুদ্ধের নামে, স্বদেশ-স্বজাতির স্বার্থে নরহত্যায় মেতে ওঠে। কাজেই জাত জন্ম রক্ত বর্ণ-ধর্ম-ভাষা নিবাসের স্বাতন্ত্র্যচেতনা জাত বৈর এবং তজ্জাত দাঙ্গা-লড়াই-যুদ্ধ-বিবাদ-বিরোধ-দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-হিংসা-ঘৃণা-অবজ্ঞা-সংঘর্ষ-সংঘাত প্রশমনের, দমনের, বিলুপ্তির, বিরতির, পরিহারের সামর্থ্য কোন শাস্ত্রে নেই। শাস্ত্রের ব্যবস্থা-দেশনা আছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু তার প্রয়োগ প্রভাব নেই, আগেও কখনো কোথাও ছিল না; এ ইতিহাসের সাক্ষ্য প্রমাণে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করা যায়। শাস্ত্রী ও শাস্ত্রমানা ব্যক্তিবিশেষকে কৃচিৎ সাচ্চা মানুষ-মনুষ্যত্বসম্পন্ন মানুষ, এমনকি প্রমূর্ত মানবতা-মনুষ্যত্বরূপেও সবযুগেই দুনিয়ার সর্বত্র দেখা যায় বটে, কিন্তু তা ব্যক্তিসত্তাকে ছাড়িয়ে কোথাও কখনো সমাজসত্তারূপে রাষ্ট্র-পরিচালনার ভিত্তিরূপে, শাসন-প্রশাসনের নীতি-নিয়মরূপে বাস্তবায়িত হয়নি, হয় না, হবেও না।

'আসলে প্রবল-অবল, পণ্ডিত-মূর্খ, মোটাবুদ্ধি-সূক্ষ্মবুদ্ধি, নেকমায়েশ-বদমায়েশ, নিষ্ঠুর-হৃদয়বান নিয়ে গঠিত যৌথ জীবনে ও দলে কিংবা সমাজে মানুষের ন্যায়-নীতি-আদর্শ, ভালো-মন্দ, ঔচিত্য-অনৌচিত্যবুদ্ধি, সত্য-মিথ্য প্রভৃতি সবকিছুই আপেক্ষিক, অবস্থা ও অবস্থানগত। তাই মানুষের ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক, সরকারি কিংবা রাষ্ট্রিক-শাস্ত্রিক ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের মানদণ্ডে, দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রচারে-বিচারে কোন সামঞ্জস্য-সঙ্গতি নেই। কারুর ভালো মাত্রই অন্য কারুর মন্দ, কারুর লাভ, অপর কারুর ক্ষতি। যেমন কারুর জয়, অপর কারুর পরাজয়, কারুর গৌরব, অপর কারুর লজ্জার, কারুর গর্ব, কারুর গ্লানি। জীবনের কোনো নিরপেক্ষ-অনপেক্ষ তত্ত্ব, তথ্য, সত্য, লাভ, ক্ষতি, ভালো, মন্দ, কল্যাণ, অকল্যাণ নেই। দৃশ্য-অদৃশ্য, বোধগত-বোধাতীত, প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ একটা দ্বান্দ্বিকতা রয়েইছে। এ জন্যেই আমরা জগতের ও জীবনের কোন কূলকিনারা খুঁজে পাইনে, রহস্য থেকেই যায়, অবোধ্য তত্ত্ব মোহ জাগায়-ভাবিয়ে তোলে, ভরসা দেয় না। কবি তাই বলেন প্রথম দিনের সূর্য যেমন প্রশ্ন করেছিল 'কে তুমি? মেলেনি উত্তর,' তেমনি দিবসের শেষ সূর্যও প্রশ্ন করেছিল 'কে তুমি? পেল না উত্তর।' কবি-দার্শনিক, ভাবুক, জিজ্ঞাসু, কৌতূহলী, চিন্তক কেউ আজো বুঝে উঠতে পারেনি? জীবনটা কি? জীবনটা কেন? জীবনে দায়িত্ব কি, কর্তব্য কি? সুখ কি? কোথায়? সুখ কেমন? এবং সুখ কেন? এতে রয়েছে 'অন্ধ-হস্তী ন্যায়ের বাঁধা ও ত্রুটি।'

এ এক নির্বোধের স্বর্গবাসও হতে পারে। তাই যে যা জানে, যা বোঝে যতটা অনুভব ও উপলব্ধি করে ততটাই তার জগৎচেতনার ও জীবনভাবনার পরিসর। তার মধ্যে নিবদ্ধ তার কাঙ্ক্ষাপূর্তি-অপূর্তির জগৎও। তাতেই মানুষ তুষ্ট, তৃপ্ত, হৃষ্ট। এবং সুখ-দুখ, আনন্দ-বেদনা, লাভ-ক্ষতি সম্বন্ধে স্ব-স্ব জীবনের দার্শনিক। সুখ-দুঃখ, লাভ-লোভ-স্বার্থ, প্রাপ্তি-ক্ষতি, জয়-পরাজয়, গ্লানি-গৌরব প্রভৃতির আবর্তিত মিশ্রিত অনুভূতি-উপলব্ধির সমষ্টিই জীবন। এ সঙ্গতিরও নয়, সামঞ্জস্যতত্ত্ব সম্পৃক্তও নয়।

আসলে আগুন জ্বালে রাজনীতিকরা, সে-আগুনে পুড়ে ও পোড়ায় নিতান্ত-অজ্ঞ-অনক্ষর-নিঃস্ব-দরিদ্র-নিম্নবিত্তের জনগণ। এ তত্ত্বালোচনার পরে এখন সহজেই পষ্ট করেই বলা চলে সাম্প্রদায়িকতা বিমুক্তির কোন উপায় যে নেই, তা নয়। কিন্তু সব মানুষ একই গুণের, মানের, মাপের, মাত্রার জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-মেধা-মনীষা-রুচি-সংস্কৃতি পরিবেশ পায় না বলে, পাওয়া সম্ভব ও স্বাভাবিক নয় বলে, বিশেষ করে মানুষের মন-মত-মনন-জীবনজিজ্ঞাসা ও সিদ্ধান্ত কখনো অভিন্ন হয় না বলে, কোন একক উপায়ে বা পন্থায় ব্যক্তি মানুষ, সামাজিক মানুষ, শাস্ত্রিক মানুষ কিংবা রাষ্ট্রিক মানুষ সাম্প্রদায়িকতা বিমুক্তি চায়নি, চায় না, চাইবেও না। যেমন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ধর্মাচরণে রাষ্ট্রিক সমর্থন ছিল না বলে, সেখানে শাস্ত্রিক মতবাদী সম্প্রদায়ের অস্তিত্বই ছিল অদৃশ্য। কাজেই দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-দাঙ্গার কথাই ভাবা যায়নি। অথচ, সেই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মহান ঐতিহ্যচ্যুত ও আদর্শভ্রষ্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোভিয়েত রাষ্ট্রে ভাষিক ও গৌত্রিক দাঙ্গা-লড়াই-যুদ্ধ এবং জমিকাড়া ও জনবিতাড়ন আজকের অশান্তির ও রক্তক্ষরা প্রাণঘাতী সংগ্রামের মুখ্য কারণ। এমনকি এর মধ্যে পুরোনো শাস্ত্রিক মতবাদী সম্প্রদায় কিংবা ধর্মীয় জাতীয়তাও মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। সত্তর বছর আগেকার সেই জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-নিবাস-রক্ত-গোত্র প্রভৃতি সব স্বাতন্ত্র্যচেতনাই দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-সংঘাতের ও বিচ্ছিন্নতার প্রধান কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে পূর্ব য়ুরোপে ও মধ্য এশিয়ায়। কম্যুনিজম নয়, মার্কসবাদ সাম্প্রদায়িকতা অবদমিত রেখেছিলে রাশিয়ায় ও পূর্ব য়ুরোপে, আজো এ চেতনা চাপা রয়েছে চীনে ও ভিয়েতনামে, চাঙ্গা হয়ে উঠেছে কম্পুচিয়ায়। অতএব মানুষের গৌষ্ঠিক, গৌত্রিক, শাস্ত্রিক, ধার্মিক, বার্ণিক, আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যচেতনা ও বিচ্ছিন্নতাবুদ্ধি স্বেচ্ছায় বরণ করে নরহত্যায় তার সমাধান খুঁজছে খাস প্রাক্তন সমাজতান্ত্রিকরাই।

একটা উপায় বা পন্থা হেলায় ত্যাগ করল পৃথিবীর একটা বিরাট অংশের সরকার ও জনগণ, আর একটা উপায় হচ্ছে নিরীশ্বরবাদ। নাস্তিক্য ও নিরীশ্বরবাদ রাষ্ট্রিক দ্বেষ-দ্বন্দ্ব কিংবা বৈষয়িক লাভ-লোভ-স্বার্থের ক্ষেত্রে বিবাদ-বিরোধ-সংঘর্ষ-সংঘাত ঘোচাতে পারবে না বটে, তবে তা মিনিটের ঘণ্টার দিনের সীমায় নিবদ্ধ রাখতে পারবে, কেননা তাতে সম ও সহ শাস্ত্রিক মতবাদীর দলচেতনা বা সাম্প্রদায়িক স্বার্থবুদ্ধি থাকবে না। কিন্তু মানুষের মধ্যে জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-সাহস প্রয়োগে সত্য-মিথ্যা-উপযোগ-প্রয়োজন সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগানো সম্ভব নয় বলেই মানুষ নিরীশ্বর-নাস্তিক হবে না প্রেত্যাশিত সংখ্যায়। নিরীশ্বর-নাস্তিক হওয়ার জন্যে জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তিবাদিতার সঙ্গে সাহসের প্রয়োজন, যা ক্বচিৎ কারুর মধ্যে মেলে। এজন্যে 'স্রষ্টা মান, শাস্ত্র ছাড়'—এ জিগিরও ব্যর্থ ও বৃথা হতে বাধ্য। যদিও মানুষ কার্যত শাস্ত্র মানে না, তবু 'শাস্ত্র ছাড়, স্রষ্টা মান-আচরণ ছাড়', এ আবেদনেও সাড়া মেলে না। কাজেই আস্তিক, ঈশ্বরবাদী শাস্ত্রধর মানুষ কখনো মনে-মননে অসাম্প্রদায়িক হতে পারবেই না। রাজনীতিক দলের মতো এদেরও সম ও সহমতবাদীর দলচেতনা তথা সম্প্রদায়নিষ্ঠা ও ঐক্যবন্ধন প্রবলও থাকবে প্রতিপক্ষের তথা বিপরীত বা ভিন্নমতের সঙ্গে দ্বন্দ্বের কালে। কাজেই বিবাদ-বিরোধকালে বিরুদ্ধমতের উনজনদের নিরুপদ্রব-নিরাপদ থাকার উপায় থাকে না।

সংখ্যালঘুমাত্রেই মানসিকভাবে হীনমন্যতায়, অনিরাপত্তায়, অবমাননায় অনধিকারিতায় ভোগে। তার মন-মনন-মনীষা এমনকি শারীরিক স্বাস্থ্য ও স্বাভাবিক বিকাশ-উৎকর্ষ পায় না। তার মানসিক, শারীরিক ও আর্থিক জীবন সব সময়েই একটা অনিশ্চিতির ও অনিশ্চিন্তির উপসর্গে ভোগে। এটি বাস্তবে মানসিক-পীড়ারূপে সার্বক্ষণিক হয়ে থাকে। এ জন্যেই 'সম্প্রীতি' প্রয়াসমাত্রই হয় বিবাদপ্রসূ কিংবা বিবাদ-বিরোধ-দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-সংঘাত-দাঙ্গা-লড়াইয়ের আশঙ্কাপ্রসূ। প্রীতি হচ্ছে ভালো লাগার ও ভালোবাসার, অনুরাগের স্বাভাবিক ফুল ও ফল। প্রীতির যেখানে অভাব, সম্প্রীতিপ্রয়াস কিংবা ঘোষণা-প্রচার-প্রচারণা একটি রাজনীতিক কিংবা প্রশাসনিক গোঁজামিল মাত্র। 'সম্প্রীতি' শব্দটাই যেন একটি প্রতারক প্রত্যয় সম্ভূত তত্ত্ব। স্বপ্রজাতির মধ্যে জিগীষা ও জিঘাংসা থাকবেই। কেননা, জীবনে-জীবিকায় সমাজের-রাষ্ট্রের সর্বত্র প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছেই দৃশ্য-অদৃশ্যভাবে ঈর্ষা-হিংসা-ঘৃণা-অবজ্ঞার আকারে সুপ্ত ও গুপ্তভাবে। জীবনে লাভ-লোভ-স্বার্থ-বুদ্ধি থাকেই, কারণ জীবন কাঙ্ক্ষা পূর্তি-অপূর্তির আনন্দ-বেদনানুভূতির সমষ্টি। কাজেই প্রাপ্তিলিপ্সা মানুষকে প্রতিযোগিতায় ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুপ্রাণিত কিংবা প্ররোচিত করেই। অতএব, জিগীষা থাকেই, জিঘাংসাও ন্যূনাধিক থাকবেই কাজেই নির্বিবাদ নির্বিরোধ নিরুপদ্রব নিরাপদ নির্বিঘ্ন নিশ্চিত জীবন বলে কিছুই নেই। কারুর জীবনেই তা নেই। অবশ্য বিরাগী বিবাগ সন্ত-সন্ন্যাসী-শ্রমণ-শ্রাবক-ভিক্ষু-যাজক-রাব্বী-পীর-ফকির-দরবেশের মধ্যেই কেবল ক্বচিৎ কাউকে নির্বিকার জীবনে স্বস্থ হয়তো পাওয়া যেতে পারে।

সমাজতন্ত্র-সাম্যবাদই কেবল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা-বৈর মুক্ত রাখতে পারে মানুষকে। নিরীশ্বর নাস্তিকও অধিকাংশ মানুষ হবে না অদূর ভবিষ্যতে। অবশ্য সুদূর ভবিষ্যতে যখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গড়ে ওঠার কারণ-করণ জানা যাবে, তখন আর স্রষ্টা-শাস্ত্র থাকবেই না। তবু প্রাণীসুলভ প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণ থেকেই যাবে। তার কারণেই বিবাদ-বিরোধ থাকবে। আপাতত শান্তির-আশা বাতুলের স্বপ্নমাত্র।

সমাজবাদ, নিরীশ্বরবাদ, মানববাদ অসাম্প্রদায়িক সমাজ গড়ে তুলতে পারে, যদিও রাষ্ট্রিক স্বাতন্ত্র্য ও স্বার্থ নরহত্যা আরো বহু বহু কাল জিইয়ে রাখবে।

সমাজবাদ চালু হয়েও সম্প্রতি অচল হয়ে যাচ্ছে, অবশ্য সমাজবাদই হবে শেষ আশ্রয়। নাস্তিক নিরীশ্বরবাদের কোন সমর্থন মিলবে না কোথাও আরো অনেককাল। বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার-উদ্ভাবনও সময় সাপেক্ষ। বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণাধর শাস্ত্র মানুষের মন-মনন নিয়ন্ত্রণ করবে আরো বহুকাল।

তাহলে বাকি থাকল কেবল উদার ও গণহিতকামী রাষ্ট্রব্যবস্থার জন্যে সাম্প্রদায়িকতা নিরোধক কিংবা সাম্প্রদায়িকতার প্রতিষেধকরূপে বিশুদ্ধ সেক্যুলার সাংবিধানিক ব্যবস্থা। কাজেই সম্প্রীতি নয়, সুবিচার নয়, মানুষকে জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-নিবাস-যোগ্যতা-ভাষা নির্বিশেষে কেবল 'নাগরিক'রূপে স্বীকৃতিদানই আপাতত সাম্প্রদায়িকতা বিমুক্তির সহজে প্রযোজ্য উপায়। এখন কেবল উদার সংযত, পরমত-পথ-আচার-আচরণ সহিষ্ণু ও সহৃদয় শিক্ষিত বিবেকবান সুজন বুর্জোয়ারাই আপাতত আমাদের ভরসা। এরাই সেক্যুলারিজম চালু করতে ও রাখতে পারে।

মৌলবাদ সমর্থনযোগ্য নয় কেন

খেয়ে-পরে বেঁচে থাকায় যেমন, স্বাধীনতায়ও তেমনি মানুষমাত্রেরই রয়েছে জন্মগত অধিকার। গোটা পৃথিবীতে আজ এ মৌল মানবিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। নিজের ছাড়া অন্য কারুর আদেশে-নির্দেশে-উপদেশে-হুমকিতে না চলার অধিকারের নামই স্বাধীনতা। স্ব-এর বা নিজের অধীনে থাকার নামই স্বাধীনতা। অর্থাৎ সর্বপ্রকারের আত্মনিয়ন্ত্রণের-আত্মইচ্ছাপূরণের অবশ্য অন্যের স্বার্থে বা অধিকারে হামলা না করে চলার নাম হচ্ছে স্বাধীনতা। দেশের জনগণই যখন দেশবাসীর কল্যাণে সমবায়িক সহযোগিতায় সহাবস্থান লক্ষ্যে নির্বাচিত প্রতিনিধি মাধ্যমে স্বদেশ-স্বরাষ্ট্রবাসীর শারীরিক, বৈষয়িক, মানসিক, আর্থিক ও ব্যবহারিক জীবনের চাহিদা মেটানোর ব্যবস্থা অঙ্গীকার করে, তখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই রাষ্ট্রকে একালে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে অভিহিত করা হয়। আমাদের বাঙলাদেশ রাষ্ট্রও বাহ্যত স্বাধীন সার্বভৌম একটি রাষ্ট্র। তাই রাষ্ট্রবাসীরা স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক।

আধুনিক স্বাধীন রাষ্ট্রে জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-নিবাস-যোগ্যতা নির্বিশেষে ব্যক্তিমাত্রই সমঅধিকারপ্রাপ্ত নাগরিক। প্রত্যেক ব্যক্তিই মূর্খ-পাগল-পঙ্গু-নিঃস্ব-নিরন্ন নির্বিশেষে এক একজন 'মানুষ'। নারী-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধ-রুগন নির্বিশেষে সকলেই মানুষ। শাসক-প্রশাসক-সরকার ও রাষ্ট্র এ মানুষের সেবার জন্যে, চাহিদা পূরণের জন্যেই হয়েছে প্রয়োজনীয়। নির্জন সমুদ্রে, অরণ্যে, পর্বতে, নভে তাই রাষ্ট্র নেই, নেই শাসক, প্রশাসক ও সরকার। আগেই বলেছি, সাংবিধানিকভাবেই রাষ্ট্রসঙ্ঘের স্বীকৃতি অনুসারেই ব্যক্তির মৌল মানবিক অধিকারে হামলা করার অধিকার কারুর নেই। ব্যক্তিমাত্রই মানবের কল্যাণকর নতুন চেতনা লালনের, নতুন চিন্তা প্রকাশের ও প্রচারের, নতুন কিছু সৃষ্টির, উদ্ভাবনের ও আবিষ্কারের জন্মগত ও সাংবিধানিক অধিকার রাখে। কেননা শ্রেয়স্কর চেতনার, চিন্তার, আবিষ্কারের, উদ্ভাবনের অধিকার সবারই রয়েছে, কেবল অন্যের ক্ষতি করার, অন্যের অধিকার হামলা চালানোর অধিকার কারুর নেই। কাজেই নতুন চেতনা, নতুন সৃষ্টিশীল প্রগতিমুখী প্রাগ্রসর চিন্তা-চেতনা প্রকাশের অনুকূল পরিবেশ আবশ্যিক ও জরুরী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে।

আজ পৃথিবীর অর্থাৎ তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দরিদ্র রাষ্ট্রগুলো আর্থ-বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যবাদী মহাজন-দাতা-ত্রাতাবেশী বৃহৎ বিদেশী শক্তির খাতক-মুৎসুদ্দী সরকারের শাসনেই রয়েছে সাধারণভাবে। এই প্রচ্ছন্ন আর্থ-বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যবাদী মহাজন ত্রাতাশক্তি দরিদ্র খাতক রাষ্ট্রগুলোর সরকারকে ও জনগণকে ইহজাগতিক জীবনচেতনা থেকে বঞ্চিত রেখে অতীত-ঐতিহ্যগর্বিত ও অতীতের বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণানির্ভর জীবনযাপনে উৎসাহ দিয়ে থাকে। এর একালিক নাম মৌলবাদ। এতে পারত্রিক জীবনে মুক্তি ও সুখ সুনিশ্চিত হয় হয়তো, কিন্তু বস্তুগতভাবে পরীক্ষণে, পর্যবেক্ষণে, নিরীক্ষণে সমীক্ষণে ও যন্ত্রযোগে প্রমাণসম্ভব বিজ্ঞানে ও বৈজ্ঞানিক সত্যে আস্থা স্থাপনে মৌলবাদ বাধা হয়ে দাঁড়ায়। মৌলবাদী শাস্ত্রের সত্যতায় ও চিরন্তনতায় আস্থাবান এবং ঐহিক পারত্রিক জীবনের সর্বপ্রকার সংকট-সমস্যা-আপদ-বিপদ উত্তরণের সুনিশ্চিত ও সুনির্দিষ্ট পন্থা বলে জানে, বোঝে ও মানে। কারণ তাদের থাকে পুরোনো বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা ও গতানুগতিক আচারপ্রীতি এবং নতুন চিন্তা-চেতনা, মত ও পথ ভীতি। আজকের দিনে যন্ত্রযোগে সমুদ্রের তলায়, মাটির গভীরে, নভের বিস্তারে, অরণ্যের বৈচিত্র্যে এবং প্রাণিজগতের দেহের প্রাণের মনের মননের যে-সব রহস্য সাক্ষ্য-প্রমাণে আবিষ্কৃত হচ্ছে, সেসবে আস্থা রাখব, নাকি প্রাজন্মক্রমিক শ্রুতিস্মৃতি পরম্পরায় বিশ্বাস রেখে, তার অনুরাগী হয়ে, অনুগামী হয়ে, অনুগত থেকে অতীতমুখিতায় বন্ধ্যা গতানুগতিক জীবনে আশ্বস্ত ও তুষ্ট, তৃপ্ত ও হৃষ্ট থাকব–এ-ই হচ্ছে একালে ব্যক্তিক, সামাজিক, মানবিক ও রাষ্ট্রিক স্বার্থে বিবেচ্য।

প্রথমত, বহু বর্ণের ধর্মের ভাষার মনের মননের ও মতের মানুষের রাষ্ট্রে কোন সংখ্যাগুরু সমাজের বা সম্প্রদায়ের মৌলবাদ গ্রাহ্য হতেই পারে না কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে। কেননা ভিন্ন ধর্মের বর্ণের ও মতের মানুষ তাতে নাগরিকত্ব হারিয়ে মৌলবাদীদের জিম্মি হয়ে স্বাধীনভাবে চিন্তা-চেতনায়-সৃষ্টিতে-সংস্কৃতিতে আত্মবিকাশের অধিকার থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বঞ্চিত হয়। ১৯৭১ সনের ঘাতক দালালেরা মৌলবাদী ছিল। তাই তারা স্বাধীনতা সংগ্রামীর হত্যায় দেশদ্রোহিতায় লিপ্ত হয়। মৌলবাদীরা রক্ষণশীল পরিবর্তনবিমুখ বলেই সভ্যতা-সংস্কৃতির, নতুন মনন-মনীষার ও সৃষ্টিশীলতার শত্রু। দ্বিতীয়ত, মৌলবাদ হচ্ছে বিশ্বাসভিত্তিক মতবাদ, জ্ঞান-বিজ্ঞান-যুক্তিসিদ্ধ, বস্তুগতভাবে কিংবা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রযোগে প্রমাণ সম্ভব তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য সম্পৃক্ত নয়। কাজেই মৌলবাদ একটা তাত্ত্বিক ধারণা মাত্র, প্রমাণসাধ্য জ্ঞান নয়। এ জন্যেই মৌলবাদীর প্রভাব বাড়লে মনুষ্যত্বের বিকাশ হবে রুদ্ধ। সৃষ্টিশীলতার, নতুন চিন্তা-চেতনার অধিকার হারাবে জনগণ। তৃতীয়ত, কেবল বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণাপ্রসূত বলেই মৌলবাদ বিশ্বাসের ও ধারণার সনাতন ও চিরন্তন সত্যতায়, উপযোগে, সর্বত্র নিষ্ঠ প্রয়োগ সাফল্যে দৃঢ় আস্থা জাগায়, মানুষকে নিয়তিনির্ভর করে। নতুন চেতনার, নতুন চিন্তার, নতুন সৃষ্টির, নতুন কিছু উদ্ভাবনের আবিষ্কারের, নতুন প্রয়োজনবোধের আবশ্যকতা কিংবা গুরুত্ব মৌলবাদে স্বীকৃত নয় বলেই সন্দেহের, অবিশ্বাসের, জিজ্ঞাসার, কোন নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ, প্রথা-পদ্ধতি দেশকালের চাহিদা লক্ষ্যে পরিহারের অনুমতি দেয়া হয় না। মৌলবাদের চিরন্তন কল্যাণকর এবং সর্বার্থক ও সর্বাত্মক প্রয়োগ জীবনে সমাজে ও রাষ্ট্রে সর্বপ্রকার সংকটে-সমস্যার সমাধান দানের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা বলে দাবি করে। এ দাবি একালে অযৌক্তিক ও অবৌদ্ধিক বলেই দেহে-মনে সুস্থ যুক্তি-বুদ্ধিমানেরা মনে করে না।

অতএব মৌলবাদে রয়েছে আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সত্যে অনাস্থা, চিকিৎসাবিজ্ঞানের এতো উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও তাগা-তাবিজে-নিয়তিতে বিশ্বাস আজো তাদের দৃঢ়। যদিও ব্যবহারিক জীবনে প্রাত্যহিক প্রয়োজনে বিজ্ঞানের প্রকৌশল-প্রযুক্তির, যন্ত্রের ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের সর্ব সুবিধে ভোগে-উপভোগে-সম্ভোগে আরাম স্বাচ্ছন্দ্য সৌকর্য লাভে তাদের আগ্রহ অন্যদের মতোই প্রবল। মৌলবাদ মানুষকে মানসিকভাবে অতীত ও ঐতিহ্যমুখী রাখে, নতুন চিন্তা-চেতনায় সৃষ্টিশীল হতে দেয় না বলেই তাদের বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণায়-আচারে অভ্যস্ত গতানুগতিক একঘেয়ে জীবনযাপনের অনুরাগী, অনুগামী ও অনুগত রাখে।

আজকের এ যন্ত্রযুগে ও যন্ত্রজগতে প্রতিটি ব্যক্তির জীবন যে বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক জীবন ও সমাজ সম্পৃক্ত, তা মৌলবাদীরা অনুভব-উপলব্ধি করে না, স্বাতন্ত্র্যে ও রক্ষণশীলতায় স্বসমাজকে প্রাচীন ও মধ্যযুগের মানসিক জরায়, জড়তায় ও জীর্ণতায় নিবদ্ধ রাখতে চায়। মৌলবাদীরা যুগান্তরে, স্থানান্তরে, মতান্তরে আস্থা রাখে না। পৃথিবী যেন স্থির, মানুষের মন-মগজের, চেতনা-চিন্তার, সৃষ্টিশীলতার, নতুন রুচির, নতুন চাহিদার প্রয়োজন এরা স্বীকার করে না। কারণ এদের ধারণার ও বিশ্বাসের সত্য নিখুঁত-নিখাদ, হ্রাস-বৃদ্ধিহীন দৃঢ় ও চিরন্তন। তাই জ্ঞানবাদী, যুক্তিবাদী, বুদ্ধিবাদী, প্রত্যক্ষবাদী, বিজ্ঞানবাদী ও প্রকৃতিবাদী লোকেরা মানুষের বুদ্ধি-জ্ঞান-মনন-মনীষা যে অশেষ, মানুষ যে প্রতিদিন জ্ঞানে, শক্তিতে-সৃষ্টিতে, উদ্ভাবনে, আবিষ্ক্রিয়ায় এগিয়ে চলেছে তা জানে, বোঝে, মানে বলেই মৌলবাদকে মানবপ্রগতির, মানবমনীষার, মনুষ্যত্বের ও মানবতার অশেষ বিকাশের বাধা বলে এর উৎখাত চায় পৃথিবীর সর্বত্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজনীতির বলি-নিরীহ জনগণই

যারা লাভ-লোভ-স্বার্থকেই প্রাধান্য দেয় ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে আর যারা মান-যশ-খ্যাতি-ক্ষমতা-দর্প-দাপট-প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জনের লক্ষ্যেই নিজেদের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ নিয়োজিত রাখে, তারা নিষ্ঠুর জিগীষু এবং জিঘাংসু হয়, কিংবা জিগীষু হতে হলে তাদের জিঘাংসুও হতেই হয়। সর্দারতন্ত্রে, রাজতন্ত্রে, সামন্ততন্ত্রে শাসকের আসনে আসীন ব্যক্তিমাত্রই হন্তাও হত। এখনো এ গণতন্ত্রের যুগেও দুনিয়ার সব সরকারই বিরোধী মতের, পথের, দলের ও আচরণের মানুষকে নানা প্রয়োজনে প্রকাশ্যে ও গোপনে হত্যা করিয়ে থাকে, পুলিশের গুলিতে, আদালতী বিচারে মরতেই হয়। এসব আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মপ্রসারকামী মানুষের মনে ঈশ্বরের ও পাপের ভীতি থাকে না, এরা শাস্ত্র আওড়ায়, শাস্ত্র মানায়, কিন্তু শাস্ত্র-সমাজের নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ, প্রথা-পদ্ধতি মানে না। ওরা পৃথিবীতে মানাতে এসেছে, নিজের স্বার্থ বিরোধী কিছু মানতে আসেনি। তাই শাহ-সামন্ত-শাসক-পরাক্রান্ত বিজেতা যোদ্ধা প্রভৃতির যুদ্ধের নামে হন্তারূপ সৈন্য রাখার, জনহত্যা করার, যুদ্ধে নামে অসংখ্য নরহত্যার কোন পাপ কেতাবে লেখে না। এ শতকের হিটলার মুসলিনীর আগের সব দিগ্বিজয়ী বীরের, সাহসী যোদ্ধার অসংখ্য লোকহন্তার তারিফই ছিল বীর বলে। তাদেরই তো গৌরবকথা রচিত হয়েছে গল্পে-কাব্যে-গাথায়। হত্যায়-লুণ্ঠনে-শোষণে-পীড়নে যে যত বেশি রাজ্য দখল ও ধ্বংস করতে পারত, অতুল্য গৌরব ছিল তারই প্রাপ্য, সে-ই হতো নরকূলে ধন্য-মান্য, স্মরেণ্য ও বরেণ্য। আজো এ ধারণা একেবারে বিলুপ্ত হয়নি। লক্ষ লক্ষ জাপানীকে অ্যাটমবোমায় হত্যা করেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার আজো তৃতীয় বিশ্ববন্দ্য–কেবল সরকারি আনুগত্য পায় না জনগণেরও ত্রাতারূপেও প্রশংসা পায়।

আজো গোটা পৃথিবীব্যাপী ভিন্ন গোত্রের, গোষ্ঠীর, ভাষার, বর্ণের, শাস্ত্রের, নিবাসের, মতবাদের উনজনেরা সংখ্যালঘুরা শাসন-শোষণ-পীড়ন-বঞ্চনার, জান-মাল-গর্দান হারানোর ভয়ের শিকার। আজো বিজ্ঞানে-দর্শনে-মননে-মনীষায় বিভিন্ন সৃষ্টিশীল কলার বিস্ময়কর বিকাশে উৎকর্ষে-আবিষ্কারে-উদ্ভাবনে প্রকৌশল-প্রযুক্তিতে, যানবাহনে, নানা যান্ত্রিক ব্যবস্থার ফলে পৃথিবী যখন চোখ-কান-অনুভূতির আয়ত্তে এসেছে, তখনো মানুষের মধ্যে সঙ্গত কারণে প্রত্যাশিত জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-বিবেক-বিবেচনারূপ মানবিক গুণের বিকাশ-বিস্তার হচ্ছেই না যেন। আমাদের এখন বৈশ্বিক চেতনায় ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গুরুত্বচেতনায় উদ্বুদ্ধ ও প্রবুদ্ধ হওয়ার কথা, সম ও সহস্বার্থে সামবায়িক সহযোগিতায় বৈশ্বিক-আর্থ-বাণিজ্যিক-সাংস্কৃতিক-বৈজ্ঞানিক-প্রাযুক্তিক সম্পর্ক দৃঢ়তর করে সহাবস্থান করার দায়বদ্ধতার অঙ্গীকার করার সময় এসেছে।

কিন্তু দেখা যাচ্ছে আজো পৃথিবীর সর্বত্র মানুষ হিংসায় উন্মত্ত। দুর্বলকে দলনে-দমনে-শোষণে-পীড়নে আগ্রহী। এতো প্রাণীসুলভ আচরণ–মনুষ্যে প্রত্যাশিত গুণ নয়। সামগ্রিক, সামুহিক ও সামষ্টিকভাবে মানুষের এতো উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও আজকে জল-স্থল-আকাশ মানুষের জ্ঞানগত আয়ত্তে আনা স্বত্ত্বেও, জীবনযাপনে স্বাচ্ছন্দ্য, সাচ্ছল্য, সৌকর্য, সৌন্দর্য এমনকি রোগমুক্তি ও আয়ুবৃদ্ধি প্রভৃতির কারণ হওয়া সত্ত্বেও মানুষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজো প্রাণীসুলভ হিংস্রতা সংযত করে সহিষ্ণু সুজন হতে পারল না, এর চেয়ে ক্ষোভের ও আফসোসের বিষয় আর কি হতে পারে? এ উপমহাদেশে ব্রিটিশ রাজত্ব করার গরজে ভেদনীতির সুযোগে মাঝে মাঝে হিন্দু-মুসলিমে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ ও সংঘাত করাত রাজনীতিক মুৎসুদ্দিদের দিয়ে। দাঙ্গা নামের সেই লুণ্ঠনে ও হত্যাকাণ্ডে যোগ দিত অজ্ঞ নিঃস্ব লোকেরা অর্থ-সম্পদ যোগাড়ের সুবর্ণ সুযোগ মনে করে। প্ররোচিত করত নেতারা। সেই ট্র্যাডিশন আজো বজায় রয়েছে, দেশ ত্রিখণ্ড হওয়ার পরেও তা বিলুপ্ত হয় না। কখনো আর্থিক শ্রেণীস্বার্থে, কখনো বার্ণিক শ্রেণীচেতনা বশে, কখনো বা বৃত্তিক ক্ষতির আশঙ্কায়, কখনো বা ভাষিক ও নৈবাসিক পার্থক্যের দরুন আর সাধারণভাবে ধর্ম মতবাদের পার্থক্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলছেই। এ গণতন্ত্রের যুগেও গদী দখলের রাস্তা রক্ত পিচ্ছিল, নররক্ত না হলে তা দখল করা ও দখলে রাখা যায় না বিশেষ করে তৃতীয়বিশ্বে। যে-কোন প্রয়োজনে নরবলি আবশ্যিক ও অপরিহার্য ও জরুরী। রাজনীতিকদের কাছে ছাগবলি আর নরবলিতে কোন পার্থক্য নেই। পাখি, পশু, মাছ শিকার আর বিরোধী দলের কিছু নরশিকার তাদের চোখে Necessary evil মাত্র। বীরভূম জেলার এক অখ্যাত কবি আবদুর রহমানের (১৯০৮-৯২) একটি কবিতার দুটো চরণে এ সত্য ভাস্বর হয়ে উঠেছেঃ

'তুমি হিন্দু আমি মুসলিম, শুধু এই জন্মদোষে
আমি পড়িয়াছি হিন্দুর কোপে, তুমি মুসলিম রোষে।'

আমাদের অধিকাংশ লোক কি উচ্চ বিদ্যা-বিত্ত-বেসাতের মালিক উচ্চাশী ব্যক্তিদের স্বার্থে ও পরিচালনায় গাড্ডলিক ও জাঙ্গলিক জীবন-যাপন করতে থাকবে জান-মাল-গর্দান বিপন্ন করে!

AMARBOI.COM

বাঙালীর জ্ঞাতিত্ব বন্ধন

মানুষ তার ব্যক্তিক, পারিবারিক, গৌষ্ঠিক-গৌত্রিক জাতিক অস্তিত্ব, স্বাতন্ত্র্য ও পরিচিতি তথা Entity ও Identity অটুট রাখায়, তার ঔজ্জ্বল্য, তার কৃতি-কীর্তির গৌরব-গর্ব প্রচারে উৎসাহী। এ যেন তার আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রেরণাপ্রসূত স্বভাব। অস্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় এবং পরিচিতির প্রচারই তার স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধির ও মিলন-মিশ্রণ বিমুখতার কারণ। এই সংকীর্ণ স্বাতন্ত্র্যচেতনা তাকে রক্ষণশীল রাখে, করে প্রথাভীরু। আদিবাসী বা উপজাতি নামে যারা পরিচিত, তারা এ কারণেই সর্বপ্রকারে দীন হওয়া সত্ত্বেও, অবিকশিত থাকা সত্ত্বেও কূর্ম প্রবৃত্তির হয়। আত্মকল্যাণেও পরানুকরণে ও পরানুসরণে তারা রাজি থাকে না। তার স্থূল বুদ্ধি-মনন এবং আবিষ্কারে উদ্ভাবনে অসামর্থ্য তাকে জীবনে সর্বক্ষেত্রে প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় আজো তাই আদি ও আদিম স্তরে ধরে রেখেছে।

আমাদের ধারণায় আজকের পৃথিবীরও সভ্য সংস্কৃতিমান বলে পরিচিত অনেক শাস্ত্রমতবাদী সম্প্রদায় এবং গৌত্রিক বা রাষ্ট্রিক জাতীয়তাবাদী শহুরে শিক্ষিত লোকের মধ্যেও জাতীয় সংস্কৃতি রক্ষার ও চর্চার এবং দেশের পুরোনো সমাজের অনাবিষ্কার, অনুদ্ভাবন ও অজ্ঞতাপ্রসূত স্থূল জীবনযাত্রার ও চিন্তা-চেতনার প্রসূন অলীক-লৌকিক-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অলৌকিক বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণাকে ঐতিহ্যরূপে গুরুত্ব দিয়ে এ যন্ত্রযুগে ও যন্ত্রজগতে প্রচল রাখতে চান।

এই সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য চেতনার ও গর্বের গোড়ায় কিন্তু একটা মস্ত গলদ রয়ে গেছে। তা হচ্ছে, আগেকার দিনে যানবাহনের অভাবে অবিকশিত মানবসমাজে জীবনচেতনার বিস্তার ছিল রুদ্ধ, গতানুগতিক ও আবর্তিত। ক্ষুধার অন্ন আর তৃষ্ণার জলই এবং রোদ-বৃষ্টি-শৈত্য থেকে আত্মরক্ষার প্রয়াস পরিসরেই ছিল তাদের জীবন সীমিত। যেমন একালের একটা জেলার মধ্যেই যানবাহনের অভাবে সেকালে অপরিচয়ের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার অজ্ঞাত দ্বীপে যেন বাস করত। আজো তার রেশ আমরা দেখতে পাই ভিন্ন জেলার বা মহকুমার লোকের উপভাষীর আচার-আচরণের এবং সামগ্রিকভাবে জীবনযাত্রায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্থক্যে। এভাবেই নিতান্ত আবর্তিত এবং গতানুগতিক জীবনে অভ্যস্ত মানুষ একেই নিজেদের বৈশিষ্ট্য বা স্বাতন্ত্র্যরূপে ভাবতে, বুঝতে ও মানতে শেখে। আজো আমরা দেখতে পাই, মানুষ সাধারণভাবে জীবনের জাগ্রত মুহূর্তগুলো জীবিকার ও সমাজে আত্মপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নানা ধান্ধায় নিয়োজিত রাখে। লাখে একজনের মধ্যেই নতুন চেতনার ও চিন্তার চর্চা দেখা যায় না। আশৈশব শোনা বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণার বশে সাধারণ লোক নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করে। তাদের মগজ-মনন-মনীষা সারাজীবন সুপ্ত ও গুপ্তই থেকে যায়। দেখা যাচ্ছে তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোর মধ্যেই জাতীয় সংস্কৃতিচেতনা সঞ্চারের প্রয়াস-প্রযত্ন বেশি। এর মধ্যে একটা হীনমন্যতা আছে। এ হচ্ছে প্রবলের প্রভাব এড়ানোর চেষ্টা মাত্র। তারা নিজেদের পুরোনো শাস্ত্র, নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ, প্রথা-পদ্ধতি অনুসরণ করে চলে। মূলকে ধরে রাখার মূলের প্রতি প্রীতিরইতো একালীন নাম মৌলবাদ। এরা প্রগতি-প্রাগ্রসরতা চায় না। এরা অতীতমুখী, এরা আবর্তনে তুষ্ট, বিবর্তনে-পরিবর্তনে শঙ্কিত।

আমাদের দেশেও নিরক্ষর লোকের সংখ্যাই বেশি আর সাক্ষরতা কোন বিদ্যা নয়। এমনকি উচ্চস্তরের লেখাপড়া জানা মানুষমাত্রই মানসিকভাবে তথা অনুভব-উপলব্ধির ক্ষেত্রে স্বশিক্ষিত বা সুশিক্ষিত হয় না। জীবিকাক্ষেত্রে তারা অর্থ উপার্জনে সমর্থ ও সম্মানে ভূষিত বটে, কিন্তু জগৎ, জীবন ও সমাজ সম্বন্ধে মৌলিক চিন্তা-চেতনা বিমুখ বলেই তারাও নিরক্ষর লোকের মতোই সাড়ে তিন হাজার-তিন হাজার-আড়াই হাজার-দু'হাজার-দেড় হাজার বছর আগেকার অজ্ঞতার যুগে মানসিকভাবে বিচরণ করে। ফলে তাদের বৈষয়িক-ব্যবহারিক জীবনে সমকালীনতা থাকলেও মানসিক জীবনে তারা ঐ সাড়ে তিন হাজার থেকে দেড় হাজার বছর আগের জগতের বাসিন্দা। যদিও তারা বিজ্ঞানের তথ্য, তত্ত্ব ও সত্য মানে না কিন্তু বিজ্ঞানীর আবিষ্কৃত উদ্ভাবিত ও সৃষ্ট প্রকৌশল-প্রযুক্তি ও যন্ত্র ব্যবহারে জাগতিক জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য-সাচ্ছল্য-সৌকর্য ও উৎকর্ষ সাধনে সদা উৎসাহী।

এরা নিজেদের গৌত্রিক কিংবা জাতিক বৈশিষ্ট্য, স্বাতন্ত্র্য হারানোর শঙ্কায় কাতর। মনে ভাবে ওই নিজস্বতার মধ্যে নিহিত রয়েছে তাদের অস্তিত্বের ও পরিচিতির স্বাতন্ত্র্য। রবীন্দ্রনাথের ভাব নয়, ভাষা ভাঙিয়ে এদের মনোভাবের স্বরূপ প্রকাশ করা যায় 'উত্তম নিশ্চিন্তে চলে সকলের সাথে/তিনিই অধম যিনি চলেন তফাতে।'–জাতীয় সংস্কৃতি প্রীতির গোড়ার মধ্যেও এসব মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা রয়েছে।

আবার আমরা এ-ও জানি ব্যক্তির পূর্ণ পরিচয়ের জন্যে তিনটে প্রশ্নের উত্তর প্রয়োজন হয়। কি নাম? কি করে? কোথায় থাকে? আমরা যদি এসব প্রশ্নের উত্তরে বলতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারি যে আমরা বঙ্গজ বাঙালী, আমরা মানুষকে কেবল মানুষরূপে গ্রহণ-বরণের জন্যে অনুশীলন করি এবং আমরা আধুনিক রাষ্ট্রে নাগরিকরূপে সম ও সহস্বার্থে সংযমে, পরমতে ও আচরণে সহিষ্ণুতায় আর প্রতিবেশীর ও বিশ্বের সঙ্গে সহযোগিতায় সহাবস্থান করি–তা হলেই উত্তর সন্তোষজনক হবে।

আমাদের জ্ঞাতিত্ব চেতনার উৎস, আমাদের জাতিসত্তার ভিত্তি, আমাদের আত্মীয়তার ও অভিন্নতার বন্ধনসূত্র হচ্ছে বাঙলা ভাষা। একসময়ে এমনিভাবে সংস্কৃত ভাষাও গোটা ভারতকে একই আত্মীয়তাসূত্রে বেঁধে রেখেছিল। যদিও রাজ্যে রাজ্যে সীমাগত বিচ্ছিন্নতা ও ব্যবধান ছিল অপরিমেয়। এক লাতিন ভাষাও এমনিভাবে সমগ্র য়ুরোপকে মানসাত্মীয়তায় ঐক্যবদ্ধ করেছিল।

আমরা সবাই জানি, আমরা রক্তসঙ্কর জাতি। এতো বিচিত্র রক্তের মিশ্রণ অন্যত্র সহজে দেখা যায় না। আমাদের একালের বাঙলাভাষীদের জন্মভূমিও এককালে বঙ্গদেশ বলে অভিহিত হত না। রাঢ়, পুণ্ড্র, সুহ্ম, বঙ্গ, সমতট, হরিকেল প্রভৃতি অঞ্চলের বাসিন্দা ছিল আমাদের আদি প্রজন্মের লোকেরা এবং তারা ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের বা সামন্তরাজ্যের অধিবাসী হিসেবে বিচ্ছিন্নতায়, অপরিচয়ে এক প্রকারের অজ্ঞাত দ্বীপের বাসিন্দা। তবু লেখ্য বা লিখিত ভাষা অঙ্গীকার করে, গ্রহণ-বরণ করে আমরা অভিন্ন জাতিসত্তা চেতনায় ছিলাম মানসিকভাবে পরস্পরের জ্ঞাতি বা আত্মীয়।

যদিও নিঃসংশয় অনুমানে বলা যায় সেদিন বিভিন্ন অঞ্চলের উপভাষা আজকের মতোই ভিন্ন উপভাষী লোকের কাছে প্রায় দুর্বোধ্যই থাকত।

রাষ্ট্রিক জাতি-চেতনা একটা কেজো-ব্যবহারিক ও বৈষয়িক কিবা প্রশাসনিক ও আর্থ-বাণিজ্যিক কৃত্রিম ব্যবস্থামাত্র। যেমন রোমান জাতি ছিল, রোমান সাম্রাজ্যও ছিল কিন্তু কালে বিলুপ্ত হয়েছে। যদিও রোম ও ইতালি আজো অবিকৃত ও অবিচ্ছিন্ন অস্তিত্বে বিদ্যমান। আমরাও অর্থাৎ এই উপ-মহাদেশের জনগণ প্রজন্মক্রমে বিভিন্ন বিদেশী-বিজাতি-বিধর্মী-বিভাষীর শাসনে শোষণে ছিলাম, এতো মিশ্রণ সত্ত্বেও তবু সবাই স্ব-স্ব জাতিসত্তা বাহ্যত স্থূলভাবে এবং মানসে সূক্ষ্মভাবে লালন করে আসছি।

যে-কোন বৃহৎ ভৌগোলিক এলাকায় শাস্ত্রগত ভেদ-বিভিন্নতা ছাড়াও থাকে উপভাষাগত, আচার-আচরণগত পারিবেশিক কারণে সুলভতা-দুর্লভতার দরুন খাদ্যবস্তুগত, রান্নার রীতি-নিয়মগত এমন কি পরিধেয় বস্ত্রগত পার্থক্য। তা কেবল জেলায় জেলায় নয়, অঞ্চলে-অঞ্চলে, শাস্ত্রিক সমাজে, বার্ণিক সম্প্রদায়েও এ পার্থক্য কিংবা বৈচিত্র্য থাকে, আজো রয়েছে। যেমন স্বভাব বা অভ্যাসগত কিংবা রুচিগত ভিন্নতা থাকে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে। একই পরিবারের বিভিন্ন সদস্যের স্বভাব-চরিত্র, আচার-আচরণও থাকে বিচিত্র। কেননা মানুষ ছাঁচে তৈরি যন্ত্র নয়। পছন্দ না হলেও, শান্তিতে সহাবস্থান করার জন্যে সংযমে-সহিষ্ণুতায় ও সৌজন্যে সয়ে যেতে হয়। অতএব পার্থক্যকে গুরুত্ব দিলে বাধার ও ব্যবধানের দেয়াল উঁচুতর হয়, আর তুচ্ছ ও স্বাভাবিক বলে মানলে জানলে ও বুঝলে উল্লেখযোগ্য হয় না বা বাধ্য হয়ে দাঁড়ায় না মিলনের পথে।

কেউ কেউ বলেন, মানুষ শ্রুতিস্মৃতিধর বলে তার ক্ষোভ, ক্রোধ, প্রতিহিংসা লিপ্সা কোন কোন ক্ষেত্রে কোন কোন পরিবারের, গোত্রের, গোষ্ঠীর বা সম্প্রদায়ের প্রতি প্রাজন্মক্রমিক হয়ে দাঁড়ায়। তা ছাড়া, মানুষের মধ্যে ঈর্ষা, হিংসা, অবজ্ঞা, প্রতিযোগিতা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিদ্বন্দ্বিতা জীবন-জীবিকার নানা ক্ষেত্রে ব্যক্তিক ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণেও থাকে সুপ্ত, গুপ্ত ও প্রকট। আগেই বলেছি, সাধারণ মানুষ ব্যক্তিক জীবন-জীবিকার ধান্ধায় থাকে, জগৎ-জীবন-সমাজ-রাষ্ট্র-দর্শন-বিজ্ঞান-ইতিহাস নিয়ে তত্ত্বভাবনায় উৎসাহ নেই তাদের। তা ছাড়া মানুষের মধ্যে লাভ-লোভ-স্বার্থচেতনাই প্রবল, অন্য কোন মগজী চিন্তা-চেতনা জনগণের মধ্যে দুর্লক্ষ্য। সাধারণ মানুষের জানা-বোঝা সবই শোনাকথা নির্ভর। শাস্ত্র, কিংবা অন্য যে-কোন বিষয়ে তাদের জ্ঞান তাই খণ্ড, ক্ষুদ্র, অসঙ্গস আর তাৎপর্য চেতনারিক্ত। তবু সমাজবদ্ধ মানুষকে এসব লোক নিয়েই ত্রুটিপূর্ণ জাগতিক জীবনযাপন করতে হয়। এ অজ্ঞ, স্বল্পজ্ঞ, মননহীন লোকের সংখ্যা হচ্ছে লাখে নিরানব্বই হাজার নয়শ' নিরানব্বই। তাই আমাদের ধারণায় মানুষ ভালোও নয়, মন্দও নয়, কখনো ভালো, কখনো মন্দ, কারুর জন্যে ভালো, কারুর জন্যে মন্দ, কারুর প্রতি ভালো, কারুর প্রতি মন্দ। এ তত্ত্ব অঙ্গীকার করেই আমরা একের ওপর আস্থা হারিয়ে অপরের ওপর নতুন করে আস্থা রাখি, নির্ভর করি, ভরসা রাখি, বন্ধু শত্রু হলে নতুন বন্ধু খুঁজি। শত্রুর সঙ্গেও আপস করি, কেননা সমাজবদ্ধ মানুষ যৌথজীবনে একক জীবনযাপন করতে পারে না। আত্মীয়স্বজনের প্রবঞ্চনায় অনাদরে ক্ষুব্ধ হয়ে বলি বটে 'আপনজনের চেয়ে পর ভালো, পরের চেয়ে বন ভালো' কিন্তু এ তিক্ত অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও পরস্পর নির্ভরশীল মানুষের যৌথ বা সামাজিক জীবনে আমরা ঠকে-ঠকিয়ে, ঠোকাঠুকি করে প্রতারিত হয়ে ও প্রতারিত করে নয় শুধু, সেবায়, মমতায় পরার্থপরতায়, প্রশ্রয় দিয়ে ও নিয়ে, মানুষের সাহায্য-সহযোগিতা নিয়ে এ প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতাসংকুল জাগতিক জীবনে সুখে-দুঃখে, আনন্দে-বেদনায় ও লাভে-লোকসানে বাঁচি। জীবন হচ্ছে কাঙ্ক্ষাপূর্তি ও অপূর্তির সমষ্টি। এ-ই জীবনতত্ত্ব।

আত্মরক্ষা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হলেই, প্রাণীরা বিশেষ করে মানুষেরা স্বভাবত আত্মবিস্তারের বাঞ্ছায় চালিত হয় এবং মান-যশ-খ্যাতি-ক্ষমতা-দর্প-দাপট-প্রভাব-প্রতিপত্তি লিপ্সু হয়। এ জিগীষা বাধাপ্রাপ্ত হলেই মানুষের মনে জাগে জিঘাংসা। ফলে জিগীষুমাত্রই এক সময়ে জিঘাংসু হয়, প্রমাণ রাজা-সামন্ত-জমিদার নয় কেবল, একালের জিগীষু রাজনীতিক, রাষ্ট্রনায়ক সবাই কম-বেশি জিঘাংসু। ইতিহাসে প্রখ্যাত ও প্রশংসিত পররাজ্যলোভী আত্মপ্রত্যয়ী দিগ্বিজয়ী রাজারা বীরেরা ছিল জিঘাংসু। সৈন্যবাহিনীও প্রয়োজনে প্রযুক্ত হন্তাবাহিনীই। আগের কালে বিচিত্র বৈনাশিক অস্ত্র ছিল না বলে যুদ্ধে নরহত্যা থাকত শতে-হাজারে সীমিত। এখন যুদ্ধে নিহত হয় লক্ষে লক্ষে, ভবিষ্যতে হবে কোটিতে কোটিতে।

শাহ-সামন্তের মতো বিত্তবানেরাই এ যুগে গণতান্ত্রিক কিংবা জঙ্গী নায়কতান্ত্রিক শাসন চালায়, বিত্তবান চিত্তবান তথা চিত্তসম্পদে ঋদ্ধ না হলে মানুষকে কেজো এবং কাজে লাগানোর প্রাণীমাত্র মনে করে। তাই তারা ক্ষমতা দখলের জন্যে, ভোট যোগাড়ের জন্যে দাঙ্গা বাধায়, লড়াই বাধায়, লড়াকু তৈরি করে ও পোষে। গদী দখল লক্ষ্যে নররক্তে পৃথিবী রাঙা করে তোলে।

প্রকৃতির নিয়মের রাজত্বের মধ্যেও দেখি প্রাণীদের মধ্যে রয়েছে খাদ্য-খাদক ও অরি-মিত্র সম্পর্ক। এর মধ্যেই স্ব স্ব গা-পা বাঁচিয়ে টিকে থাকে প্রাণীরা। মানুষও পারিবারিক, সামাজিক, ব্যবহারিক, বৈষয়িক, বাণিজ্যিক, রাষ্ট্রিক জীবনে দ্বন্দ্ব-মিলনের মধ্যেই জীবনযাপন করে। মানুষও স্বশ্রেণীতে ও স্বপেশায় একে অপরের প্রতিযোগী-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিদ্বন্দ্বী। আত্মরক্ষার ও আত্মপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তারাও কাড়া-মারা-হানাসংকুল জীবনই কাটায়, নির্বিরোধ-নির্বিবাদ নিরুপদ্রব-নিরাপদ জীবন বিরলতায় দুর্লক্ষ্য। তবু এরই মধ্যে সাধারণ মানুষ জাত-জন্ম-বর্ণ-ভাষা-নিবাস-যোগ্যতার পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্য নিয়েই প্রকৃতির জগতের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের মতো নির্বিরোধে নির্বিবাদে নিরুপদ্রবে নিরাপদে সহাবস্থান করছে সহযোগিতায়, সংযমে, পরমত ও কর্ম-আচরণ সহিষ্ণুতায় ও সৌজন্যে। প্রকৃতির নিয়মের মধ্যেও দেখি আকস্মিক ও সাময়িক বিপর্যয় ঝড়-খরা-বন্যা-মারী। মানুষেরও ঘরে বাইরে এমনি সাময়িক বিবাদ বিরোধ লড়াই ঘটে। একে নিয়ম বলে মানব না, ব্যতিক্রম বলেই জানব।

জাত পাত বর্ণ ধর্ম ভাষা নিবাস যোগ্যতা নির্বিশেষে মানুষকে কেবল মানুষ বলে জেনে বুঝে মেনে এবং খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার অধিকার মানুষের জন্মগত অধিকার বলে স্বীকার করে, আর বাঁচিয়ে রাখার প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য সরকারের তথা রাষ্ট্রের– এ স্বীকৃতির ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো। ওই সব রাষ্ট্রের আর যত দোষই থাকুক একটি মারাত্মক ও সুপ্রাচীন দোষ থেকে মুক্ত ছিল সে রাষ্ট্রগুলো। বর্ণগত, রক্তগত, গোত্রগত, শাস্ত্রিক মতবাদগত স্বাতন্ত্র্যচেতনা প্রকাশ্যে পরিব্যক্ত করা যেত না বলেই সাম্প্রদায়িক ও গৌত্রিক দাঙ্গা ছিল না সোভিয়েত রাশিয়ায়-চীনে-যুগোশ্লাভিয়ায়। আজ ভাঙা রাশিয়া ও যুগোশ্লাভিয়া গৌত্রিক ও সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্যচেতনাপ্রসূত হিংস্রতায় শ্বাপদকেও অতিক্রম করেছে। ১৯৯৩ সনেও হিংসায় উন্মত্ত মানুষ জাঙ্গলিক ও গাড্ডলিক মনুষ্যত্ব নির্বাসিত, পরিত্যক্ত। পাঁচশ' কোটিরও অধিক মানুষে আজকের পৃথিবী আকীর্ণ, কিন্তু মনুষ্যত্ব 'মানবতা লাখে না মিলয় এক'। এখন মানুষের ও মানবিকতার মহাসংকট কাল।

শাস্ত্রবাণী, মহৎতত্ত্ব, আপ্তবাক্য, তত্ত্বকথা, দেশনা আজ আড্ডায়, বক্তৃতায়, বিবৃতিতে উচ্চারিত ও লেখায় উদ্ধৃত হয় বটে, কিন্তু অন্তরের সত্য হয়ে ওঠেনি বলে তার প্রভাব দেখি না বাস্তবে ব্যক্তির, দলের ও সমাজের মধ্যে। এক্ষেত্রে ব্যক্তিক ব্যতিক্রম আলোচ্য নয়। পৃথিবীর বহু বহু অঞ্চল আজ মনুষ্যরক্তে রাঙা। বহু বহু অঞ্চলে লাখে লাখে মানুষ অনাহার মৃত্যুর শিকার। মানুষের ও মানবতার এ মহাসংকট থেকে সহজে ও শিগগির মুক্তি ঘটবে বলে আশা ও আশ্বাস মিলছে না।

যানবাহনের ও বিস্ময়কর বিচিত্র সব যন্ত্রের বদৌলতে পৃথিবী আজ ছোট একটি জনপদ-প্রায় হয়ে উঠেছে। ঘরের বেড়া-চাল-ছাউনি কিছুই আজ আর খোলা আকাশবাহী ধ্বনি ও দৃশ্য আড়াল করে রাখতে পারছে না। তাই আজ 'দূরকে নিকট বন্ধু এবং পরকে ভাই' বলে বরণ করার দিন আসন্ন হয়ে উঠছে। হাট-বাজারও আজ বৈশ্বিক এবং আন্তর্জাতিক। প্রকৌশল-প্রযুক্তি-আসবাব-তৈজস জীবনযাত্রাপদ্ধতি ধনীমানীপদস্থ শিক্ষিত শহুরে লোকদের আজ অভিন্ন হয়ে উঠেছে। ইংরেজী ভাষাই আজ আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ-সম্পর্কের ভাষা, স্যুট পোশাক, খাদ্যও তাদের আজ পাঁচতারা হোটেলের মেনুসম্মত।

এ যুগ পারস্পরিক নির্ভরতার যুগ। বিচ্ছিন্নতার ও স্বাতন্ত্র্যচেতনার বিলুপ্তির যুগ। দূরে থাকার ও দূরে রাখার কালের অবসান ক্রমেই আসন্ন হয়ে উঠছে। যুগান্তলক্ষণ প্রকট হয়ে উঠছে ক্রমশ। এসব তথ্য, তত্ত্ব ও সত্য আমরা যত বেশি করে অনুভব-উপলব্ধি করব, কালের দাবিতে সাড়া দেয়া ততই সহজ হবে আমাদের পক্ষে। এখন যুক্ত হওয়ার ও যুক্ত থাকার যুগ। নিজেদেরই সহ ও সম স্বার্থে সামবায়িক সহযোগিতায় সম্প্রীতিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সহাবস্থানের যুগ। রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন ও সাধ আজ আক্ষরিকভাবে সত্য ও আবশ্যিক হয়ে উঠেছে। 'দেশে দেশে মোর দেশ আছে.../ঘরে ঘরে মোর ঘর আছে' ইত্যাদি বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে এ সত্য বাস্তব করে তুলেছে বাঙালীরাও।

কালের দাবি উপেক্ষা করা চলে না। সমকালের দাবিকে গুরুত্ব না দেয়া অবক্ষয়েরই লক্ষণ। সমকালকে গ্রহণ করতে না পারা জরার, জড়তার ও জীর্ণতারই সাক্ষ্য-প্রমাণ মাত্র।

একই ভাষিক জাতিসত্তা বা জাতি, একই শাস্ত্রিক সম্প্রদায়, একই গোত্রের মানুষ আজ জীবনের ও জীবিকার নানা প্রয়োজনে ও ধান্ধায় জগৎময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাস করছে। বিভিন্ন রাষ্ট্রেও রয়েছে বিভক্ত। য়ুরোপে আরবে যেমন, আফ্রিকায় লাতিন আমেরিকায় যেমন, তেমনি আমাদের এ উপমহাদেশেও।

ভারতবর্ষ যেমন কখনো একচ্ছত্র শাসনে ছিল না প্রত্যক্ষভাবে, বাঙলাভাষী অঞ্চলও তেমনি বিভিন্ন রাজ্যে ও সামন্ত রাজ্যে ছিল বিভক্ত। মুঘলের সুবেহ বাঙ্গালা অবশ্য ১৯০৫ সন অবধি বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী নামে একক শাসনে ছিল, তবু তার মধ্যেও ছিল সামন্ত রাজ্য, ত্রিপুরা কোচবিহার প্রভৃতি তার প্রমাণ। শুধু আরব রাষ্ট্রগুলোতে নয়, এ মুহূর্তেও দুই কোরিয়া, দুই আয়ারল্যান্ড, দুই চীন রয়েছে, কিছুকাল আগেও দুই জার্মানী, দুই ভিয়েতনাম ছিল জাত বর্ণ ধর্ম ভাষা অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও।

আমাদের উপভাষা বিভিন্ন, পরস্পরের কাছে দুর্বোধ্য। আমাদের শাস্ত্র একাধিক, আমাদের উপমতবাদীর শাস্ত্রগুলোও বিচিত্র ও বিভিন্ন। তাই আমাদের মতবাদী সম্প্রদায়ও বহু এবং বিচিত্র। আমাদের রক্তে নেই অবিমিশ্রতা, আমাদের রাষ্ট্রও বিভক্ত। আমাদের জনগণ পৃথিবীর বহু স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অভিবাসিত। তবু আমরা লেখ্য বা লিখিত বাঙলা ভাষার বন্ধনসূত্রে অভিন্নমূল রসুনের মতো মনে-মগজে-মর্মে অভিন্ন ও অবিচ্ছেদ্য। বাঙলা ভাষাই আমাদের আত্মীয়তার, জ্ঞাতিত্বের, অভিন্ন জাতিসত্তার উৎস, ভিত্তি, বন্ধনসূত্র ও স্মারক।

আমরা আশাবাদী, মনুষ্যমনীষায় এবং নতুন চেতনার ও নতুন চিন্তার প্রভাবে আমাদের আস্থা আছে। আমরা জানি প্রতি নতুন সূর্যের উদয়ে শুরু হয় নতুন দিন, পৃথিবী নতুন মানুষের চোখে চির নতুন হয়ে ধরা দেয়। পৃথিবীর কোথাও না কোথাও কারো না-কারো মনে জন্ম নেয় নতুন চেতনা, নতুন চিন্তা। জন্ম-জীবন-মৃত্যু মাধ্যমে জনস্রোত জলস্রোতের মতোই অদৃশ্যে বদলায়। প্রজন্মক্রমে কালের ও জীবনের চাহিদা বদলায়, মানুষের মনের, মতের, মননের রূপ বদলায়, রঙ বদলায়, ঢঙ বদলায়, বোল ও ভোল পাল্টায়। নতুনের ছোপ লাগে মনে ও মর্মে, সমাজও তাই প্রভাবিত হয়, উদারতা, সহনশীলতা, যুক্তিবাদিতা, প্রকৃতির নিয়মচেতনা, বিজ্ঞানের তথ্যে, তত্ত্বে ও সত্যে আস্থা বাড়তে থাকবে, বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা-অনুমানও কল্পনাজাত লৌকিক, অলৌকিক ও অলীক বলেই ক্রমে বর্জিত হবে। ঘরে বসে রেডিও-টিভি, ক্যাসেট-সিনেমা আর জাগতিক জীবনের বাস্তবতা ও গুরুত্ববোধ মানুষকে জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-বিবেকের অনুরাগী, অনুগামী ও অনুগত করতে থাকবে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর যন্ত্রপ্রভাবিত জীবনযাত্রার পদ্ধতিও নতুনতর হয়, পরিহার্য হয় বিশ্বাস-সংস্কার-শাস্ত্রজাত আচার-আচরণ ও অভ্যাস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের কারুর একক প্রয়াসে পৃথিবী প্রত্যাশিত মানে-মাপে-মাত্রায় বদলাবে না, জানি। জিগীষাপ্রসূন জিঘাংসা মানবপ্রবৃত্তিসম্পৃক্ত বলেই পরিবারে, সমাজে, রাজনীতিতে, জাতিতে রাষ্ট্রে দ্বেষ-দ্বন্দ্ব, প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বিরোধ-বিবাদ-উপদ্রব সর্বত্র লঘু-গুরুভাবে থাকবে। তবে তার মধ্যে এখনকার মতো অমানবিক বীভৎসতা থাকবে না। মানুষের রুচি-সংস্কৃতি উন্নত হবে, সূক্ষ্ম হবে, শোভন হবে– অন্তত আমরা তা-ই প্রত্যাশা করি।

এর মধ্যেই আমাদের ভাষিক Entity ও identity – সত্তার স্বাতন্ত্র্য ও আত্মপরিচিতি অক্ষুণ্ন নয় কেবল, গাঢ় গভীর ও ব্যাপক করার জন্যে লেখ্য বাঙলাভাষা আবিষ্কৃত রেখে, বাঙালীসত্তাচেতনার সচেতন সযত্ন ও সতর্ক পরিচর্যা বজায় রেখে, আমাদের বাঙালীসত্তাকে পুঁজি-পাথেয় করে প্রজন্মক্রমে এগুতে হবে। কিন্তু এর মধ্যে রক্ষণশীলতা, গ্রহণবিমুখতা, অতীত ও ঐতিহ্যমুখিতা থাকলে চলবে না। বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক চিন্তাচেতনায় ঋদ্ধ হয়ে বিজ্ঞানমনস্কতায় ও বিজ্ঞান চর্চায় প্রমাণসম্ভব ও প্রমাণিত সত্যে, তথ্যে ও তত্ত্বে আস্থা রেখে মনে-মননে-রুচিতে সমকালীন থাকতে হবে। এমনি মন-মেজাজই আমাদের মনের গৌত্রিক, মত-সাম্প্রদায়িক, রাজনীতিক সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত রাখবে আমাদের।

পৃথিবীব্যাপী আমাদের বাঙলাভাষীর সংখ্যা এখন প্রায় আঠারো-বিশ কোটি। আমরা পরস্পরের ভাষিক আত্মীয়। অভিন্নমূল রসুনের মতো জ্ঞাতি। যে-কোন বাঙালীর কৃতিতে-কীর্তিতে যে-কোন বাঙালী গৌরব-গর্ব বোধ করে। এজন্যেই রবীন্দ্র-নজরুলকে ভাগ করা যায়নি, অস্বীকার করা হয় না নানাক্ষেত্রে বাঙালীর কৃতি-কীর্তিকে।

চন্দ্র-সূর্যের মতো আমরা তাঁদের একান্ত নিজের করেই পাই, ভাগে-বন্টনে আপস করতে হয় না। সংস্কৃতিমান মানুষ জানে, ব্যক্তি যেমন একাধারে যুগপৎ কারুর বাবা, কারুর ভাই, কারুর বন্ধু, কারুর শত্রু। তেমনি আমরা ভাষা পরিচয়ে বাঙালীসত্তা বজায় রেখেই ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিক থেকেই মানব উত্তরাধিকারের দাবিদার ও সমঝদার থাকব। বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক স্তরে অভিন্ন মানবিকতায় মানবতায় আস্থা রাখব। বাক্যে-বানানে লেখ্য বাঙলাভাষাকে অবিকৃত ও সর্বজনীন রাখব।

বৈশ্বিক ঐক্যচেতনার অনুশীলনকাল সমাগত

ভাষিক পরিচিতিতে বাহ্যত বাঙালিসত্তায় আমাদের স্থিতি এবং মানসিকভাবে মানবিক গুণের অনুশীলনে মনুষ্যত্ব অর্জনই আমাদের ব্যক্তিক, সামষ্টিক, সামাজিক, শাস্ত্রিক ও রাষ্ট্রিক জীবনের লক্ষ্য হলেই কেবল আমরা বিজ্ঞানের তত্ত্বে, তথ্যে ও সত্যে আস্থাবান, যন্ত্র ও প্রযুক্তি প্রয়োগে সমকালীন বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক জীবনের যোগ্য হব, হব জ্ঞানে-প্রজ্ঞায়-যুক্তিতে-বুদ্ধিতে-মনে-মননে সমকালীন। আজকের দিনে দেশ-কালের ও সমাজের আর রাষ্ট্রের দাবি হচ্ছে ঃ মানুষ হবে বিজ্ঞানমনস্ক, প্রকৃতির নিয়মানুগ, প্রত্যক্ষবাদী,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুক্তিনিষ্ঠ বিবেকবান, পরমত ও পরআচরণ সহিষ্ণু, সংযত সুজন। বিজ্ঞানের তথ্যে তত্ত্বে ও সত্যে আস্থাবান এবং যন্ত্র-প্রকৌশল-প্রযুক্তিনির্ভর সমকালীন চিন্তা-চেতনা সচেতন মানুষই কেবল সমকালীন জীবনযাপনে মানসিকভাবে সমর্থ। সে মানুষ যদি মনে-মতে-মগজে-মননে-মেধায়-মনীষায় অনন্য গুণের, মানের, মাপের ও মাত্রার হয়, তাহলে নতুন চেতনায়, নতুন চিন্তায়, নতুন জিজ্ঞাসায়, নতুন উদ্যমে হয়ে ওঠে আবিষ্কার, উদ্ভাবন ও সৃষ্টিপ্রবণ। এমনি মানুষই, শক্তিধর ব্যক্তিই ব্যবহারিক ও মানসিকভাবে সমাজের, সংস্কৃতির ও সভ্যতার বিকাশ-বিস্তার ও উৎকর্ষ সাধন করে। আমরা থাকব সর্বকালের জন্যেই Modern বা আধুনিক এখনকার প্রতীচ্য মানুষের মতোই।

আবার Modern বা আধুনিক হতে বা থাকতে হলে অতীত ও ঐতিহ্যপ্রীতি বর্জন করতে হয়, কারণ তা পিছুটানমাত্র–যা ধরে রাখে, ভরে তোলে না, আবর্তিত রাখে, এগিয়ে দেয় না সম্মুখের দিকে। রক্ষণশীলতা হচ্ছে পুরোনোপ্রীতি যা কলের চাকার মতো, লাটিমের মতো চলন্ত হলেও একই স্থানে আবর্তনশীল, যা স্থিতিশীলতারই গতানুগতিকতারই নামান্তরমাত্র। তার সামনে এগুনোর, প্রগতির, প্রগ্রসরতার শক্তিসামর্থ্য থাকে না। সেজন্যে তা নতুন চেতনার, নতুন চিন্তার, নতুন যন্ত্রের, নতুন জগতের ও নতুন জীবনপদ্ধতির উদ্ভবের উন্মেষের সহায়ক হয় না। আমরা বাঙালি পরিচয়ে বাঙালি নামে চিহ্নিত থেকে আমাদের ব্যবহারিক entity'র ও identity'র অস্তিত্বের ও পরিচিতির স্বাতন্ত্র্য অবিলুপ্ত ও অবিমিশ্রিত রাখব বটে, কিন্তু আমাদের মধ্যে জ্ঞান-প্রজ্ঞা-বুদ্ধি-যুক্তির অনুশীলনজাত যুক্তিবাদিতা বা Rationalism এবং শ্রেয়সকে গ্রহণ করার মতো উদারতা বা Liberalism আর একই সমতলে সমকক্ষ হয়ে বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক লেনদেনে পৃথিবীর যে-কোন মানুষের সঙ্গে সামবায়িক সহযোগিতায় নিজেদের সহ ও সমস্বার্থে সহিষ্ণুতায় সংযমে সৌজন্যে সহাবস্থানে সম্মত থাকব। আমরা কূর্মপ্রবৃত্তি পরিহার করে মানুষমাত্রকেই স্বপ্রজাতির বলে মনে ও মর্মে জেনে বুঝে ও মেনে মানব-উত্তরাধিকারে আস্থা ও অধিকার রাখব। কেননা বৈশ্বিক ঐক্যচেতনার কাল সমাগত।

একাল সহযোগিতার ও সহাবস্থানের কাল। স্বাতন্ত্র্যের, বিচ্ছিন্নতার, বিভেদের, বিরোধের ও বিবাদের কালের অবসান লক্ষণ দেখা দিয়েছে প্রাক্তন ন্যাটো জোটের স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলো মধ্যে। পৃথিবীর সর্বত্র শিগগিরই সব স্বাধীন রাষ্ট্রই নাগরিকদের খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখার গরজেই এখন স্বাধীন ও বিচ্ছিন্ন হবার লড়াই শুরু করে দিয়েছে বটে, কিন্তু স্বাধীন হবার পরে বাঁচার-বাঁচানোর গরজেই নিজ নিজ স্বার্থেই সামবায়িক সহযোগিতায় সহাবস্থানের শর্তে সম্মত হয়ে আঞ্চলিক মণ্ডলী বা সঙ্ঘ তথা নাফতা ও গ্যাট-এর আদলে জোটবদ্ধ হবেই। একালের দাবি, যন্ত্র ও প্রযুক্তিনির্ভর জীবনের দাবি। একে তাই অস্বীকার করা যাবে না। এ যুগ আন্তর্জাতিক নির্ভরতার যুগ। আজ যে-কোনো রাষ্ট্রের অধিবাসী একাধারে ও যুগপৎ স্বরাষ্ট্রেরও বিশ্বের নাগরিক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানসিক বৃত্তাবদ্ধতাই প্রগতির অন্তরায়

বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা ভিত্তিক লিখিত বা অলিখিত শ্রুতিস্মৃতিমূলক শাস্ত্রসম্মত জীবনাচারে যারা মানসিকভাবে দৃঢ়প্রত্যয়ী, তারা নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ, প্রথা-পদ্ধতি গতানুগতিকভাবে প্রজন্মক্রমে অনুসরণ করে চলে বলেই তারা মনের সন্দেহ, জিজ্ঞাসা, কৌতূহল, নতুন চেতনা, নতুন চিন্তা, মনের কোণে-জাগা যুক্তি, কিংবা কোন তত্ত্বের, তথ্যের ও সত্যের উপযোগরিক্ততা গোষ্ঠী-গোত্র-সমাজের রোষের ভয়ে অন্তরে চেপে রাখে, কখনো প্রকাশ করার শক্তি সাহস পায় না। তাই পৃথিবীতে আজো আদি ও আদিম অচল অনড় বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা চালিত আরণ্যগোত্র, আদিবাসী কিংবা উপজাতি নামের জনগোষ্ঠী পাওয়া যায়। নতুন চেতনা, নতুন চিন্তা, মুক্তবুদ্ধি ও যুক্তি প্রকাশ ও প্রয়োগ তাদের কাছে পাপকর্ম বলেই বিবেচিত। তাই তারা সৃষ্টিশীল নয়, রক্ষণশীলতাকেই তারা আত্মরক্ষার বর্ম বলেই জানে, এ কূর্মস্বভাব তাদের স্বাতন্ত্র্য ও প্রাজন্মক্রমিক বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণার ও আচার-আচরণের ঐতিহ্য রক্ষার জন্যে তারা অপরিহার্য বলে জানে ও মানে। ফলে নিজেরা তো সৃষ্টিশীলতা এবং আবিষ্কার-উদ্ভাবন বিমুখ বটেই, উন্নততর নতুন ভাব-চিন্তা কিংবা জীবনযাপনে স্বাচ্ছন্দ্য, সাচ্ছল্য, সৌকর্য, সৌন্দর্য ও উৎকর্ষ সাধনের জন্যে সভ্য-ভব্য সমাজের অনুকরণ ও অনুসরণ তারা আত্মস্বাতন্ত্র্য ও আচার বিনাশী অপপন্থা বরণ বলেই জানে, বোঝে ও মানে। অথচ সেনেকা থেকে মানবেন্দ্রনাথ রায় অবধি নিরীশ্বর ও অজ্ঞেয়বাদী বিজ্ঞ ব্যক্তিরা জানেন যে, মানুষের মন-মগজ-মনন-মনীষা পরিবার ও সমাজ প্রতিবেশে শৈশব থেকেই কবলিত হয় A body of superstitions, prejudices, social Customs and irrational modes of living-এর। ফলে মন-মনন-জীবনচেতনা-জীবনযাত্রা এক অন্ধত্বের, বন্ধ্যাত্বের ও বদ্ধতার আবর্তে আন্দোলিত হতে থাকে। সমাজে বুদ্ধির সঙ্গে জ্ঞানের, আচারিকতার সঙ্গে যুক্তির ও উপযোগচেতনার, বিশ্বাসের মূল সম্বন্ধে সন্দেহভরা জিজ্ঞাসার এবং সাহসের সঙ্গে শক্তির যোগে কোন ব্যক্তি যদি দ্রোহ করার আর নতুন চেতনার, নতুন চিন্তার অভিব্যক্তি দানের জন্যে জান-মাল-গর্দান হারানোর ঝুঁকি নিয়ে এগিয়ে না আসে, তা হলে কোন রক্ষণশীল গোষ্ঠীর-গোত্রের, জাতির, সমাজের বিবর্তন, পরিবর্তন, প্রগতি, উন্নতি, মানসোৎকর্ষ কখনোই সম্ভব হয় না। নিষ্ক্রিয়তায় রীতি-রেওয়াজে অভ্যস্ত জীবনের ও আচারের আবর্তনে হাজার হাজার বছর কেটে যায়। প্রমাণ আদিবাসী, উপজাতি কিংবা আরণ্য সমাজ। সভ্যতা-সংস্কৃতির অগ্রগতি নতুন চেতনার, নতুন চিন্তার ও দ্রোহের দান। রীতি-রেওয়াজ ভেঙে ইরানীরা নয়-দশ শতক থেকে শিল্প-সাহিত্যের চর্চা শুরু করে অমুসলিমদের প্রভাবে। মধ্য এশিয়ায়ও তা ছড়িয়ে পড়ে এমন কি ভারতেও। এর সঙ্গে গুরুবাদী তান্ত্রিক বৌদ্ধ প্রভাবে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে অধ্যাত্মবাদ মধ্য এশিয়ায় ও পরে তা ভারতে প্রসার লাভ করে। স্থবির বা থেরোর [বয়সে ও অভিজ্ঞতায় প্রবীণ বৃদ্ধ, তিন মাথা যার। বুদ্ধি নেবে তার' প্রবচনও এ সূত্রে স্মর্তব্য] ফার্সী প্রতিশব্দ বা পরিভাষা হচ্ছে পীর। এ অধ্যাত্মবাদ বিভিন্ন পীরবাদী সুফী মতবাদ নামে খ্যাত। কোরআন ও সুন্নার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে বিভিন্ন সুফীমতের পার্থক্য সামান্য নয়। (দৃষ্টব্য মৎ সম্পাদিত 'বাঙলার সুফী সাহিত্য', বাঙলা একাডেমী প্রকাশিত)

বৃত্তাবদ্ধতায়, অন্ধত্বে, বন্ধ্যাত্বে, গতানুগতিক বিশ্বাসে ও আচারে যে জীবন বৃথা ও ব্যর্থ হয়, তা নয়, সে অবস্থায়ও শাস্ত্রিক-সামাজিক-আচার ব্যবস্থায় অভ্যস্ত মানুষ মানসিক ও শারীরিকভাবে অর্থ-বিত্ত-বেসাত থাকলে মন-মগজ-মননের গুণ মান মাপ মাত্রা অনুসারে সুখ, শান্তি, আনন্দ, আরাম, সৌন্দর্য ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগ করতে পারে। এজন্যেই কোন সমাজেই শ্রেয়স চেতনায় অনুপ্রাণিত মানুষ সহজে মেলে না। সমাজের নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ, প্রথা-পদ্ধতি বদলানোর গরজবোধও করে না কেউ। সমাজ পরিবর্তন বা বিপ্লব ঘটানো তাই কোথাও সহজ হয় না– নিঃস্ব-নিরন্ন-দরিদ্র-শোষিত-শাসিত-পীড়িত-বঞ্চিত মানুষের আধিক্য থাকা সত্ত্বেও তাদের সমর্থনের অভাবে। অভ্যস্ত জীবন মানুষকে অলস ও অবশ করে মানসিকভাবে। তাই অন্ধও লাঠি ঠুকে পথ চলতে জানে ও পারে প্রায় নিরাপদেই। সূর্যের পূর্ণগ্রহণ হলেও রাহুগ্রস্ত সূর্যের নিচেও চলার মতো আলো মেলে, অন্ধকারে অভ্যস্ত হলে শ্রাবণের অমাবস্যায়ও পথ চলা সম্ভব হয়।

তাই আজকের দিনেও জ্ঞানে, শিক্ষায়, অর্থে, বিত্তে, বেসাতে, সৃষ্টিশীলতায়, আবিষ্কারে-উদ্ভাবনে বঞ্চিত, অসমর্থ পিছিয়ে পড়া মানুষের সংখ্যা শতে নব্বই জন হওয়া সত্ত্বেও কোথাও দ্রোহ নেই। কাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি নেই, প্রয়াস-প্রযত্ন নেই। জীবন রেলের উপর দিয়ে চলেছেই নিয়মে। ভিক্ষাবৃত্তি, চৌর্যবৃত্তি, নিঃস্বতা, নিরন্নতা, দারিদ্র্য, কায়িক শ্রমজীবিতা, অজ্ঞতার দৈন্য কিছুই যেন কাউকে উত্তেজিত ক্ষুব্ধ-ক্রুদ্ধ করে না দ্রোহ করার জন্যে, সমাজ পরিবর্তনের জন্যে। গণমানুষকে শোষণ-পীড়ন-বঞ্চনামুক্ত করে স্বাধিকারে সুপ্রতিষ্ঠ করার জন্যে। শাসক-শোষকরা এদের জগতে খোরপোশ যোগায় না বটে, তবে পরলোকে তাদের জন্যে বেহেস্তে ঠাঁই পাবার উপায় বাতলায়।

ঔদ্ধত্যের উৎস অস্ত্র

প্রাণিজগতে সবাই শ্রম, সময় ও ঘাম ব্যয় করেই খাদ্য যোগাড় করে। মানব প্রজাতির মধ্যেও গোড়ার দিকে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই সেভাবে খাবার সংগ্রহ করতে হত। যখন তারা ছিল ফলমূল ও মৃগয়াজীবী বুনো বা আরণ্য মানব। দল বা যূথবদ্ধ হওয়ার আগে সম্ভবত প্রবলজন দুর্বলজন থেকে খাদ্য কেড়ে খেত। কিংবা পেশীর প্রয়োগে ক্ষীণকায় সঙ্গীকে গাছে চড়ে ফল পাড়তে বাধ্য করত। আর পেশীর বা বুদ্ধির মান-মাপ-মাত্রা অনুসারে এক ব্যক্তি অন্যদের ত্রস্ত করে অনুগত করে নিত। আজো বাহুবলে, বুদ্ধিবলে সাহসীরাই অন্যদের ত্রস্ত ও অনুগত রাখে। অবশ্য এ যন্ত্রযুগে ও যন্ত্রজগতে যেমন, তেমনি তীর, শেল, বর্শা নিক্ষেপে নিপুণ লোকেরাই গোড়ার দিকে সর্দার হয়েই গোষ্ঠী-গোত্রের লোকের নেতৃত্বপদ দখল করত। এখন অবশ্য ধন তথা অর্থসম্পদ-অস্ত্রশস্ত্র যার আয়ত্তে, নেতৃত্ব তারই প্রাপ্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এভাবেই প্রবলের খপ্পরে পড়ে গেল দুর্বল। দাস প্রথার উদ্ভব তো এভাবেই ঘটে। প্রথমে কাড়া-মারা-হানাতেই নিবদ্ধ থাকত প্রবলের পীড়ন-বঞ্চনা হয়তো ব্যক্তিগত পর্যায়েই। পরে তা সাহসী, শক্তিমান-বুদ্ধিমানের নেতৃত্বে দলীয়, গোত্রীয় কাড়ায়-মারায়-হানায় বৃহত্তর ও রক্তক্ষরা প্রাণহরা লড়াইয়ের বা প্রতিরোধ প্রয়াসের বৃদ্ধিতে যুদ্ধের রূপ নেয়। বৈদিক রাজা ইন্দ্রের ভিন্ন গোত্র, নগর আক্রমণ, লুণ্ঠন, নারী হরণ, পশু চুরি প্রভৃতিই এর সাক্ষ্য প্রমাণ। সম্পদ লুণ্ঠনের জন্যে দুর্বল গোষ্ঠীকে ও গোত্রকে উৎখাত উচ্ছেদ করে স্থান ও সম্পদ দখল করা ও দখলে রাখা থেকেই ফিনিশীয়-বেবীলনীয়-মিশরীয়-গ্রীক-রোমক সর্দারতন্ত্রের ও রাজতন্ত্রের উদ্ভব। যা আজ এ মুহূর্তেও চালু রয়েছে পৃথিবীর নানা আনাচে কানাচে। ব্যক্তিক জীবনে যেমন নিতান্ত কয় আঙুল পরিমিত জমির লোভে বা ভিটের বা ক্ষেতের সীমা নিয়ে প্রাণঘাতী সংঘর্ষ সংঘাত ঘটে, তেমনি অরণ্য-পর্বত-সমুদ্র-আকাশের অধিকার সীমা নিয়েও বাধে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ বিনাশী যুদ্ধ। এতে কোন জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-লাভ-ক্ষতিচেতনা-বিবেচনা কাজ করে না। ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে ক্ষোভ, ক্রোধ, ঈর্ষা-হিংসা, মদ-মর্যাদা বোধ। এতে থাকে রেষারেষির, জয়-পরাজয়ের, গ্লানি-গৌরবের, লজ্জা-গর্বের, নিন্দা-তারিফের, ইন্দ্রিয়জ আবেগের প্ররোচনা ও প্রণোদনা। সেকালের সর্দার-শাহ-সামন্তরা স্বগোত্রের লোকদের নিজেদের স্বার্থে উত্তেজিত করে যুদ্ধে এগিয়ে ও লেলিয়ে দিত। আমোদ-আনন্দ পাওয়ার জন্যে যেমন মোরগ-পায়রা-বাজ-ষাঁড়-মোষের লড়াই বাধিয়ে দেয় সুখী সচ্ছল আরামপ্রিয় লোকেরা। এভাবেই প্রবল বুদ্ধিমান-সাহসী-শক্তিমান-ক্ষমতাধারী একটি শ্রেণী গড়ে উঠল। যারা সংখ্যায় সামান্য বা নগণ্য কিন্তু প্রতাপে-প্রভাবে-প্রতিপত্তিতে-প্রতিহিংসা গ্রহণে প্রবল প্রায় স্থানীয়ভাবে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অপ্রতিযোগী। এরাই শাসক-শোষক-পীড়ক-পেষক-বঞ্চক, দলনে-দমনে-হুকুমে-হুমকিতে-হুংকারে ও হামলায় যারা লক্ষ কোটি মানুষকে অনুগামী ও অনুগত রাখে, কৃপা-করুণা-দয়া-দাক্ষিণ্যের মাধ্যমে কিছু লোককে অনুরাগী চাটুকার-স্তাবক করে তোলে। এ শ্রেণীর মধ্যেই পরশ্রমজীবী, পরান্নজীবী, পরমতজীবী, পরকর্মজীবী, পরবৃত্তিজীবী, পরবিত্তজীবী পরবিদ্যা-বুদ্ধি-সৃষ্টি-আবিষ্কার-উদ্ভাবনজীবী, উদ্যমহীন অলস, বসে খাওয়া, বয়ে যাওয়া বিলাসে ব্যসনে ভোগে উপভোগে সম্ভোগে আসক্ত পরপীড়ক, পরশোষক এক সামাজিক ও অমানবিক উপসর্গ স্বরূপ মানুষ পরিবারে পরিবারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ শ্রেণী শোষণ ও অর্থসম্পদের উত্তরাধিকার আসমানী নিয়তি বলে চালিয়ে দিয়ে গণদ্রোহের চেতনা-চিন্তার, অধিকার বঞ্চিত করার শাস্ত্রও করায় রচিত। সমাজকে ঘরানা বর্ণে, বৃত্তিতে বিন্যস্ত করে চিরকাল দাস-বশ রাখার, অনুরাগী, অনুগামী ও অনুগত রাখার দুনিয়াব্যাপী নিয়তির বা আসমানী শক্তিরই লীলা বলে চালিয়ে দিয়ে প্রতারিত করার কথা সুপ্রাচীন। উচ্চাশী সাহসী-শক্তিমান বুদ্ধিমান আজো জানে, বোঝে ও মানে যে 'জোর যার মুল্লুক তার'। অর্থসম্পদ, জনবল, পেশীবল, আত্মপ্রত্যয় ও সাহস যার আছে, হত্যার অস্ত্রও থাকে তার হাতেই। এ তাৎপর্যে মাও জে দুঙের সেই প্রখ্যাত প্রাবচনিক তত্ত্বই এ মুহূর্তেও সমাজসত্য 'বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস'। আজো শাসক-শাসিত নয় কেবল, অর্থ-সম্পদে-সাহসে-শক্তিতে প্রবল-দুর্বল নয় শুধু, সামরিক বাহিনী ও বেসামরিক সরকার আর জনগণও আলাদা জাত ও শক্তি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্রেণীতে শ্রেণীতে দৃশ্য অদৃশ্য দ্বন্দ্ব, শোষণ-পীড়ন রয়েছে সর্বত্র। তাই অভীক উদ্ধত ক্ষমতাগর্বীরা একপক্ষ, ভীত আর এস্ত দুর্বল নিরস্ত্র, নিঃস্ব দরিদ্ররা অন্যপক্ষ। আজো সমাজের ঔদ্ধত্যের উৎস অস্ত্রই। সামরিক কিংবা বেসামরিক ব্যক্তিভেদ এক্ষেত্রে প্রায় মানে মাপে মাত্রায় অভিন্ন নিতান্ত সামান্য। কাজেই ঔদ্ধত্যের উৎস অস্ত্র, শক্তির উৎস অর্থসম্পদ, ক্ষমতার উৎস পদ। সমাজে সরকারে ও রাষ্ট্রে এ ঔদ্ধত্য, এ শক্তি ও এ ক্ষমতাই সমভাবে কার্যকর। এগুলো ব্যক্তিক, গৌষ্ঠিক ও জাতিক বলেই সাময়িক। স্থায়ী শক্তি ও চিরন্তন শক্তি হচ্ছে নতুন চেতনা, নতুন চিন্তা, নতুন সৃষ্টি, নতুন উদ্ভব ও নতুন আবিষ্ক্রিয়া-যা মনন-মনীষার প্রসূন।

সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যচেতনা একটি আধিমাত্র

শাস্ত্রিক, নৈতিক, শৈক্ষিক, আর্থিক জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক-মর্যাদা প্রভৃতি সর্বপ্রকারের সর্বার্থক ও সর্বাত্মক শারীরিক, মানসিক, আর্থিক, সামাজিক বৈষম্যের ছকবাঁধা মনুষ্যজীবন যেন রেলগাড়ির প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কিংবা জনবহুল বাস, কোচ ও ট্যাক্সি বা ব্যক্তিগত গাড়ির যাত্রীর মতোই। কারো জীবন চলে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে, সাচ্ছল্যে, আরামে আনন্দে, কারো জীবন চলে নিরন্নতার, নিঃস্বতায়, অর্ধাহারের, অনাহারের যন্ত্রণায় ও নিত্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ততায়, কষ্ট-ক্লিষ্টতায়, কারো জীবন চলে নানা ব্যবহারিক, বৈষয়িক, আর্থিক সংকট সমস্যাসংকুল হয়ে। এর মধ্যেও অনন্যোপায়তার ও অভ্যস্ততার দরুন মানুষ এক প্রকারের স্বস্থ, সুস্থ বোধ করে, সুখের আনন্দের স্বাদ পায় মাঝে মধ্যে। 'মানুষ মরতে চায় না' এতে ধরে নেয়া যায়, মানুষ দুঃখ-যন্ত্রণা-অভাবের মধ্যেও বাঁচার আগ্রহ, আনন্দ, সুখকামী। ক্বচিৎ কেউ মৌহূর্তিক আবেগ-উত্তেজনা বশে আত্মহত্যা করে। ওটি নিয়ম নয়, ব্যতিক্রম। আর আত্মায় আস্থাবান অনন্ত পারত্রিক জীবনে সুখকামী আপাত নির্বোধ মহান ভীরু ব্যক্তিরা যৌবনেই সন্ত-সন্ন্যাসী-বিরাগী-বিবাগী হয়ে জাগতিক জীবনানন্দ থেকে নিজেদের স্বেচ্ছায় বঞ্চিত করে।

পৃথিবীতে সূর্যের সান্নিধ্য-নৈকট্য ও দূরত্বই হয়ে ওঠে প্রাকৃতিক নিয়মে ভৌগোলিক বৈচিত্র্যের কারণ, তা কেউ অস্বীকার করে না। প্রকৃতিই নিয়মে চলে, ঐক্যে বৈচিত্র্য কিংবা বৈচিত্র্যে ঐক্যের মূলে রয়েছে সূর্যের প্রভাবের তারতম্য। ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরৎ নিয়েই জগৎ। সূর্যের তাপের তারতম্যই, নৈকট্য-দূরত্বই, স্বল্পতা ও আধিক্যই রয়েছে এর মূলে। তাই সব জায়গায় সব রকমের জীব-উদ্ভিদ-মানুষ জন্মে না, যেসব জীব, উদ্ভিদ সর্বত্র মেলে সেগুলোও উক্ত কারণেই গুণে, রূপে, মাপে-মানে-মাত্রায় অঙ্গে ও অন্তরে অভিন্ন হয় না। সাদৃশ্যের মধ্যেও পার্থক্য থেকে যায়। আবয়বিক গঠন, রঙ, শক্তি, সামর্থ্য, বুদ্ধি প্রভৃতিরও তারতম্য ও স্বাতন্ত্র্য চোখে পড়ে। সেজন্যেই একালে সব 'বাদ' '(ism)' বাদ দিয়ে কেবল প্রকৃতিবাদে আস্থা রাখলে মূর্খতার চেয়ে বিজ্ঞতার সান্ত্বনা মেলে মনে।

মানুষ গোড়াতে আবিষ্কারে উদ্ভাবনে তেমন আগ্রহী ছিল না বলে অরণ্যে, পর্বতে, দ্বীপে, সমতলে অপরিচয়ের স্বাতন্ত্র্যে ও বিচ্ছিন্নতায় বাস করত। তবু এদের মধ্যেও পাঁচ/সাত হাজার বছর আগে থেকেই পৃথিবীর কোন কোন কৌম বা মানবগোষ্ঠী নিরন্তর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নতুন নতুন কৌতূহল, জিজ্ঞাসা, প্রয়াস, প্রযত্ন, উদ্যম, উদ্যোগ অঙ্গীকার বাস্তবায়ন লক্ষ্যে আবিষ্কারে উদ্ভাবনে জীবনধারণের উপাদান-উপকরণ-হাতিয়ার বৃদ্ধি করে সংস্কৃতি-সভ্যতায় মানসিক ও ব্যবহারিক জীবনে অনেক এগিয়ে গিয়েছিল, মিশর-ব্যাবিলন-মেসোপটেমিয়া-গ্রীস-রোম-ভারত-চীন তার প্রমাণ।

অন্য যারা সন্ধিৎসু, জিজ্ঞাসু, উদ্যমশীল ছিল না, এখনো নয়, তারা পড়ে রয়েছে মানব প্রজাতির প্রাণীর স্তরেই-প্রকৃতির কোলেই। প্রকৃতি নির্ভরতায় ও প্রকৃতি লালনে ভরসা রেখে জীবনযাপন করে তারা। তাদেরও একটা গোঁ থাকে। উন্নতদের অনুকরণে অনুসরণে তাদের কোন কোন দল আজো অজ্ঞতার যুগের মানুষের বিস্ময়-কল্পনা-অনুমানজাত বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা বাছাই-বর্জন করে আত্মোন্নয়নের চেষ্টা করে না। তাদের মৌলিকতায়-আত্মসম্মানে লাগে পরানুকৃতি।

অদৃশ্য জগতে অলীকে-লৌকিকে-অলৌকিকে আস্থা ও ভরসা রেখে বিজ্ঞানকে অবহেলা করে, উপেক্ষা করে, অবিশ্বাস করে অদৃশ্য নিয়তি ও অরি-মিত্র শক্তির ভয়-ভক্তি-ভরসা-কৃপা-করুণা-দয়া-দাক্ষিণ্যনির্ভর প্রাকৃত জীবনযাপনে আজো উৎসাহী এরা। পৃথিবীব্যাপী এদের সংখ্যাই বেশি। এরাই পরানুকরণের আদলে যন্ত্র-প্রযুক্তি-বিজ্ঞানপ্রসূত চিকিৎসা গ্রহণে আগ্রহী হয়েও অসঙ্গতভাবে মানসিক মগজী বন্ধ্যাত্বের দরুন জাতীয় সংস্কৃতির অনুরাগী। আগেকার মানুষের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার ও অপরিচয়ের ফলে স্বতন্ত্রজীবন ধারণার সৃষ্টি হয়েছে, পার্থক্য ঘটেছে প্রাকৃতিক প্রতিবেশে প্রাপ্যবস্তুর ব্যবহারে এবং অপ্রাপ্য বস্তু, প্রাণী প্রভৃতির অব্যবহারে এবং এভাবে আবহাওয়ার প্রভাবে, মাটি-তাপ-জল-বায়ুর গুণগত পার্থক্যে ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে, খাদ্যে, পোশাকে ভাষায়। এটিকে এখন সবাই স্ব স্ব সংস্কৃতি-সভ্যতার বৈশিষ্ট্য বলেই জানে, বোঝে এবং মানে। দুনিয়াব্যাপী আজকের মতো যানবাহনের প্রভাবের অজ্ঞতায় মানুষে মানুষে অপরিচয়ের, বস্তুর প্রাপ্যতা-অপ্রাপ্যতার দরুনই যে এ পার্থক্যের বা স্বাতন্ত্র্যের উদ্ভব, তা আজো অধিকাংশ মানুষের মগজগত হয়নি। তাই তাদের পশ্চাৎপদতা, অনুন্নতি, আদি ও আদিম জীবনযাপন পদ্ধতি, অবৈজ্ঞানিক ও অযৌক্তিক বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা যে অজ্ঞতাপ্রসূন, তা তাদের বোঝানো যায় না। তারা মনে করে এ-ই তাদের ঐতিহ্যের, স্বাতন্ত্র্যের, গৌরবের ভিত্তি। অনাধুনিক হলেও ত্রুটিবহুল হলেও এ তাদের গৌরবের, গর্বের ও স্বাতন্ত্র্যের-স্বাধীনতার-স্বকীয়তার সাক্ষ্য প্রমাণ। তাই তাকে সযত্ন প্রয়াসে রক্ষা করার নামান্তর হচ্ছে তাদের স্বসংস্কৃতির পরিচর্যা।

সংস্কৃতি সম্বন্ধে একটি তাত্ত্বিক পুনর্বিবেচনা

আমরা সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের, বৈচিত্র্যের, বৈশিষ্ট্যের বড়াই করি। সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্যে আন্দোলন করি। অনুকৃত সংস্কৃতির প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করি। আমাদের সংস্কৃতি যে অনন্য অর্থাৎ অন্যদের সংস্কৃতি থেকে নানা স্থূল ও সূক্ষ্মভাবে পৃথক তা ভেবে, দেখে, আলোচনা করে তুষ্ট, তৃপ্ত ও হৃষ্ট থাকি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা জানি সংস্কৃতিও মগজ, মনন ও মনীষা প্রসূন। আমরা এখানে মানসসংস্কৃতির তথা আবিষ্কার-উদ্ভাবন-সৃষ্টিশীলতাকে আলোচ্য করব না। আমরা এখানে তরল সংস্কৃতির তথা প্রাত্যহিক জীবনাচারের রূপ-স্বরূপের স্বাতন্ত্র্যের ও অনন্যতার যে সাধারণ নাম সংস্কৃতি, তা-ই আমাদের আলোচনার বিষয় করছি। একে আমরা আচারিক আচরণিক সংস্কৃতি নামে অভিহিত করতে পারি। আসলে আমাদের সাংসদ-মন্ত্রী-রাজনৈতিক দল জাতিক ও দৈশিক সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্যেই আবেদন জানান, তেমনি আমাদের আদিবাসী-উপজাতি বা প্রান্তিক ও সংখ্যালঘু অজ্ঞ-অনক্ষর-দরিদ্র-অনগ্রসর জনগোষ্ঠী তাদের জীবনযাত্রার, বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণার পরিবর্তনে, পরিমার্জনে, পরিহারে ও উন্নয়নে কিংবা স্থূলতা পরিহারে সূক্ষ্মতায়-সৌন্দর্যে-সৌকর্যে-উপযোগিতায় উৎকর্ষ সাধনে মোটেই আগ্রহী নয়। জীবনাচারকে অক্ষুণ্ন ও অবিকৃত রাখাতেই তাদের স্বস্তি। এর মধ্যেই তারা তাদের অস্তিত্বের নিরুপদ্রব নিরাপত্তা অনুভব করে। পরানুকৃতিতে আত্মসত্তার বিলুপ্তি-বিনষ্টির আশঙ্কা থাকে তাদের মনে সদ্য জাগ্রত। তাই তারা বিদেশীর বিজাতির বিভাষীর প্রতি স্পর্শকাতর এবং সবার প্রতি সন্দেহপ্রবণ ও রক্ষণশীল।

আমাদের দেশের আঞ্চলিক উপভাষাগুলোর মধ্যে যে ভিন্নতা, তেমনি পার্থক্য রয়েছে প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় আচারে আচরণে আসবাবে তৈজসে রান্নার উপকরণে। এ যেমন মুসলমানদের মধ্যে আছে, তেমনি পার্থক্য রয়েছে বিভিন্ন মতবাদী ও বার্ণিক হিন্দু সমাজে। আবার হিন্দুর ও মুসলিমের উপভাষায়ও রয়েছে কিছু শব্দগত ভিন্নতা, আর আচারে আচরণে রয়েছে শাস্ত্রিক প্রভাব, প্রভেদ। তবু লিখিত মুদ্রিত বাঙলা ভাষা অঙ্গীকার করে আমরা জাত জন্ম বর্ণ ধর্ম নিবাস যোগ্যতা নির্বিশেষে হয়েছি বাঙলাভাষী বাঙালী। যদিও আমাদের মধ্যে রয়েছে নৃবিজ্ঞানের সংজ্ঞায় ও সংজ্ঞার্থে রক্তসাঙ্কর্য। আর শাস্ত্রের ভিন্নতাপ্রসূত পার্থক্য তো রয়েছেই।

আসলে আঞ্চলিক তথা ভৌগোলিক অগম্যতাজাত অপরিচয়, যান্ত্রিক, যানবাহনের অভাবে দূরত্বের অলঙ্ঘ্যতা, বাণিজ্যিক বিনিময়ে লেনদেনে বাধা-বিঘ্ন, অজ্ঞতা, অনক্ষরতাজাত দারিদ্র্য ও উচ্চাশাহীনতা প্রভৃতি ছিল মনে-মননে, জীবনের তাৎপর্য চেতনায়, আত্মবিকাশের অসামর্থ্যে, ব্যবহারিক জীবনে, উৎপাদনে-নির্মাণে বৈচিত্র্য ও উৎকর্ষ সাধনে অক্ষমতা আর আবিষ্কারে উদ্ভাবনে-শিল্পে-সাহিত্যে অনগ্রসরতা প্রভৃতিই পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে চিন্তা-চেতনায়, বিশ্বাসে-সংস্কারে-ধারণায়, প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় পার্থক্য, বৈচিত্র্য, স্বাতন্ত্র্য ও উৎকর্ষ-অপকর্ষ দান করেছে গুণে-মানে-মাপে-মাত্রায়। তাছাড়া সূর্যের নৈকট্য ও দূরত্ব জাত আর্তব পার্থক্যও মানুষের আদি-আদিম অবস্থায় থেকে প্রাণীপ্রজাতিরূপে থাকার আর উৎকর্ষে মগজী শক্তির বিস্ময়কর পরিচয় দানের কারণ হয়েছে। উষর মরু, বরফাচ্ছন্ন ক্ষিমোদেশ কিংবা উত্তর-দক্ষিণ মেরু প্রভৃতির আবহাওয়াজাত পার্থক্য মানুষের স্বাভাবিক বিকাশের পক্ষে অলঙ্ঘ্য বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই জীবন দর্শনে, শাস্ত্রে, জীবনাচারে, খাদ্যে, পোশাক আবাসে মনে-মননে এতো বৈচিত্র্য তথা স্বাতন্ত্র্য। এখন এ পার্থক্য প্রাজন্মক্রমিক অভ্যাসের দরুন একটা গৌষ্ঠিক, গৌত্রিক, জাতিক অভিমানের, গৌরবের, গর্বের, অস্তিত্ব রক্ষার অবলম্বন হয়ে রয়েছে আজো প্রায় সবার মধ্যেই।

তবে এখানে আমরা একটা বিষয় যুক্তি প্রয়োগে বিবেচনা করার জন্যে বিদ্বানদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি ঃ এক. সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের উপকারিতা- উপযোগ কি? জাতীয় সংস্কৃতিই বা কি? তার রূপ-স্বরূপ কেমন? সংস্কৃতি কি স্থাবর সম্পদ, সংস্কৃতির কি হ্রাস-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৃদ্ধি কিংবা প্রবহমানতা নেই? সংস্কৃতি কি তরু-লতার মতো নতুন নতুন পত্রে-পুষ্পে-ফলে বেড়ে ওঠে না? সংস্কৃতি কি অচল অটল কিছু? সংস্কৃতির উৎস তো মগজী চেতনা-চিন্তা-মনীষা-আবিষ্কার-উদ্ভাবন-সৃষ্টি-বিকাশ ও বিস্তার। সংস্কৃতিমানতা তো গতির, প্রগতির, প্রাগ্রসরতার, রুচিতে সৌন্দর্যবোধে, সাচ্ছল্যে, স্বাচ্ছন্দ্যে, সৌকর্যে-উৎকর্ষে জীবনকে, জীবনানুভূতিকে সংযমের পরের মতও পরের আচরণ সহিষ্ণুতার, আর সৌজন্যের ও পরার্থপরতার প্রসাদে মণ্ডিত করে মনুষ্যত্ব দান করে, মানবিকবোধের বিস্তারে মানবতার ধারক করে তোলে। চরম ও পরম বিচারে মনুষ্যত্বই সংস্কৃতি। মনুষ্যত্ব যার ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে অভিব্যক্ত, সে-ই সংস্কৃতিমান।

কিন্তু এ অনেকের বিবেচনায় ভাববাদীর তত্ত্ব কথা বলে প্রতিভাত হবে। বস্তুবাদীরা শ্রেণী সংস্কৃতিতে আস্থা রাখে, সাধারণ বুর্জোয়ারা সংস্কৃতির, অসংস্কৃতির ও অপসংস্কৃতির পার্থক্য নিরূপণে, অসংস্কৃতির ও অপসংস্কৃতির উৎখাতে উৎসাহী। আমরা এসব বিতর্কে-বিরোধে-বিবাদে অংশ নেব না এখানে। আমরা দেখছি যে আজ পৃথিবীতে ধনী, মানী, শিক্ষিত পদস্থ ব্যক্তিদের, সাংসদ-আমলা, মন্ত্রী-বেণেদের একটা বিশ্বজনীন কিংবা আন্তর্জাতিক তথা বৈশ্বিক সংস্কৃতি আচারিক-আচরণিকভাবে দ্রুত গড়ে উঠেছে, উঠছে এবং উঠবে।

তাদের ভাব বিনিময়ের ভাষা ইংরেজি, তাদের পোশাক পুরুষের স্যুট, নারীর স্কার্ট, তাদের খাদ্য পাঁচতারা হোটেলে তৈরি ও রক্ষিত সবকিছু, তাদের রাজনীতিক, কূটনীতিক, বাণিজ্যিক আদব-কায়দা, আচার-আচরণ আন্তর্জাতিক ও বৈশ্বিক এবং তা প্রতীচ্যপ্রভাবজ। বিজ্ঞানের তথ্যে, সত্যে ও তত্ত্বে আস্থাবান, যুক্তিবাদী, প্রকৃতিবাদী, উদার মানবতাবাদী সেক্যুলার আধুনিক মানুষেরা গোটা পৃথিবীব্যাপী অভিন্নই হয়ে উঠবে। শিক্ষিত হলেই, ধনী হলেই, পদস্থ হলেই যে-কোন দেশের যেকোন মানুষ এমনি জীবনাচারের তথা ব্যবহারিক সংস্কৃতির অনুরাগী, অনুগামী ও অনুগত হবেই হচ্ছেই।

এমন দিন দূরে নয়, যখন পৃথিবীর অশিক্ষিত বা স্বল্প শিক্ষিত মানুষও রেডিও-টিভি-ভিসিআর-ক্যাসেট-সিনেমা এবং সিএনএন, বিবিসি কিংবা ডিশ অ্যান্টেনাযোগে গোটা পৃথিবীর নাগরিক হয়ে উঠবে ঘরে বসেই। জগৎচেতনায় ও জীবনভাবনায়ও হয়ে উঠবে অভিন্ন। অতএব পৃথিবীতে বাহ্যজীবনে সংস্কৃতি থাকবে একটিই। তবে মন-মনন-মগজ-মেধার ক্ষেত্রে গুণে-মানে-মাপে-মাত্রায় উন্মেষে-বিকাশে পার্থক্য থাকবে বলেই মনুষ্যত্বে, মানবিকগুণে, মানবতায় একটা প্রত্যাশিত স্তরে উঠবে কি-না বলা যাচ্ছে না। কাজেই মানসসংস্কৃতিতে শূন্যতা কিংবা স্বল্পতা থাকলে প্রাণী প্রজাতির মানবে হিংস্রতা, কাড়া-মারা-হানা, বঞ্চনা-প্রতারণা-শঠতা দুর্লভ হবে না। বিরোধ-বিবাদ-যুদ্ধ থামবে না।

সংকটের শেকড় সন্ধানে

ব্রিটিশ আমলে সরকার জনগণের মধ্যে শিক্ষারপ্রসার চায়নি। কেবল শাসন-প্রশাসন চালানোর জন্যে কিছু ইংরেজী শিক্ষিত লোক তৈরিই ছিল তাদের লক্ষ্য। ফলে ব্রিটিশ কোম্পানী সরকার কিংবা রাজসরকার সরকারি উদ্যোগে স্কুল-কলেজ স্থাপনে উৎসাহী ছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। বহু তদবিরে স্কুলের জন্যে সামান্য মাসিক সাহায্য যোগাড় করা যেত। আর বেসরকারি কলেজ করার জন্যে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হত, নইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং সরকারের স্বীকৃতি আদায় করা প্রায় অসাধ্য ব্যাপার হত।

আজ শুনতে অবিশ্বাস্য বলেই মনে হয় যে গোটা বেঙ্গল ও আসাম, ত্রিপুরা কোচবিহার মিলে ১৯৪৭ সনেই ছিল দুটো বিশ্ববিদ্যালয়। একটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বই ছিল প্রবেশিকা থেকে স্নাতকোত্তর অবধি সব পরীক্ষা গ্রহণ ও ফল ঘোষণা। আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল আবাসিক এবং একালের একটা সাধারণ কলেজের মতো আর পাসের ছাত্রসংখ্যা ছিল পাঁচ-ছয়শ' এবং অনার্সের ছাত্রসংখ্যা ছিল ১০০/১২৫ জন মাত্র।

আরো আগে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী (বাঙলা বিহার উড়িষ্যা), বার্মা (মায়ানমার), আসাম এখনকার সাত বোন এবং দেশীয় রাজ্য নিয়ে সবটাই ছিল ১৮৫৭ সনে স্থাপিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত। সরকারি কলেজ ছিল পাঁচ-ছয়টা।

একটি সরকারি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হয় কলকাতায় ১৮৩৫ সনে, আর একটি বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১৬ সনে (কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ)। গোটা প্রেসিডেন্সী প্রদেশের জন্যে অর্থাৎ বাঙলা বিহার উড়িষ্যা ও দেশী রাজ্যগুলোর জন্যে একটি মাত্র ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ শিবপুরে। ১৯৪৭ সন অবধি গোটা বাঙলা-আসামে ছিল মাত্র ছেচল্লিশটা কলেজ। আর মাধ্যমিক স্কুল ছিল ব্রিটিশ বাঙলায় মাত্র ১২৯০টি। ১৯৪৭ সনেও গোটা বাঙলায়-আসামে প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল সর্বোচ্চ মাত্র সাতচল্লিশ হাজার। কাজেই ব্রিটিশ আমলে দেশে শিক্ষিতের হার ছিল নিতান্ত কম। শিক্ষিত বলতে গেলে জনসংখ্যার তুলনায় নিতান্ত করগণ্য। এখন দুই বঙ্গে ও আসামে অর্থাৎ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বতন আওতায় ও এলাকায় প্রায় বিশটি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে প্রায় প্রতি বছর বাড়ছেও। এখন প্রবেশিকা পরীক্ষা দেয় প্রায় বারো-তেরো লাখ, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয় ৭/৮ লাখ আর স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষাও দেয় প্রায় দুই-তিন লাখ।

আগের দিনে শিক্ষার প্রসার ছিল না, মানুষ জ্ঞান ও যুক্তিবাদী ছিল না। অজ্ঞ-অনক্ষর লোক আশৈশব শোনা-জানা-বোঝা-বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা-আচার মানায় থাকত অভ্যস্ত। অদৃশ্য অরি-মিত্র বহু অপশক্তি যেমন ভূত-প্রেত-পিশাচ-জীন-দেও-দানবে এবং সৎশক্তি দেবতা-পীর-ফকির-সাধু-সন্ত-ভিক্ষু-শ্রমণ-সন্ন্যাসীতে আস্থা তাদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করত নিয়তির মতো। তারা ভয়-ভক্তি-ভরসানির্ভর অসহায় জীবনযাপন করত। তাই অবিশ্বাসের, অনাস্থার, উপেক্ষার, ঔদাসীন্যের, ঔদ্ধত্যের, দ্রোহের সাহস ছিল না তাদের। তাই তারা নীতি-নিয়মের, আচারের-অভ্যাসের, প্রথা-পদ্ধতির, রীতি-রেওয়াজের অনুরাগী, অনুগামী ও অনুগত থাকত। সমাজে এক প্রকারের নিয়ম শৃঙ্খলা ছিল। গ্রাম প্রধানেরা গাঁয়ে গাঁয়ে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার ব্যবস্থা করত, থানা-পুলিশ কম ছিল, মহকুমা-জিলা সদরও ছিল দূরে দূরে। তবু একটা অপরাধ বিরল ভীরু-ভক্ত সমাজ ছিল দেশে।

এখন লোকসংখ্যা বেড়েছে, মানুষের জীবনচেতনা ও জীবনযাত্রার মান বেড়েছে, বেড়েছে জনসংখ্যা, জমি বাড়েনি, মানুষ বেড়েছে, কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির তুলনায় লোক বেড়েছে ৬/৭ গুণ। তুচ্ছ ও উচ্চ ঘরানা পেশাজীবীর মধ্যেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্মিত বা উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা সমতা রাখতে পারেনি দেশী-বিদেশী প্রতিযোগিতায় ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায়।

বেকার সমস্যা তীব্র ও তীক্ষ্ণ হয়েছে। জীবনচেতনা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে রুচি, চাহিদা ও জীবনের মান বেড়েছে। শিক্ষার প্রসার হয়েছে, রেডিও-টিভি-ক্যাসেট-সিনেমা মানুষকে বিশ্বসচেতন ও আন্তর্জাতিক করে তুলেছে। এ অবস্থায় পূর্বের শাস্ত্র-সমাজ-সরকার সম্বন্ধে পাল্টে গেছে মানুষের ধারণা। মানুষ এখন জ্ঞানী ও যুক্তিবাদী। এখন তারা শ্রেণীসচেতন। সমাজ যে শাসক-শাসিতের, শোষক-শোষিতের, বঞ্চক-বঞ্চিতের, প্রতারক-প্রতারিতের তা আজকাল আর কাউকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হয় না। তাই আজ সমাজে বেআদব, উদ্ধত, দ্রোহী, বেপরোয়া, বেচশম, বেশরম, বেলেহাজ, বেদানাই, বেদরদ, বেঈমান, বেহায়া, বেল্লিক দুশমন-প্রতারক সংখ্যা বেশি। তাই আমরা মস্তান-গুন্ডা-খুনী পরিবেষ্টিত ও শাসিত। তাই আমরা আজ কালো জগতের চোরাবাজারের, দুই নম্বরের জগতে বাস করছি। আমাদের প্রাত্যহিক জীবন তাই বেকারত্ব, দারিদ্র্য, নিরন্নতা, নিঃস্বতা দুষ্ট। এর আধিক্যেই মানুষের মধ্যে মানবিকগুণের বিকাশ বিস্তার রুদ্ধ হচ্ছে। কোন দ্বিতীয় ব্যক্তিকেই বিশ্বাস করা মুশকিল হয়ে উঠছে দিন দিন। কোম্পানী আমলের এমনি নৈরাজ্যিক লুটপাটের সময়ে ঠকচাচা (আলালের ঘরের দুলাল) এমনি নীতিরও উপযোগ স্বীকার করেছিল "আর দুনিয়াদারি করিতে গেলে ভালা-বুরা দু-ই চাই,-দুনিয়া সাচ্চা নয়, মুই একা সাচ্চা হয়ে কি করবো।" এজন্যেই বুঝি এখন দুই নম্বরের কাল! মনুষ্যত্বের এ অবক্ষয় থেকে উদ্ধারের একমাত্র উপায় নির্মিত ও উৎপাদিত পণ্যের অভ্যন্তরীণ ও বিদেশী বাজার দখল। আমদানী কমিয়ে রফতানী বাড়ানো, কলকারখানা স্থাপন। জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ। দেশের লোকদের রোজগারের জন্যে পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়ার সব সম্ভাব্য উপায় আবিষ্কার ও গ্রহণ। "নইলে নাহিরে পরিত্রাণ!"

বিজ্ঞানবিমুখতা আত্মপ্রতারণার নামান্তর

মনুষ্যজীবনের আদি-আদিম প্রশ্ন–জীবন কী ও কেন? জগৎ ও জীবন স্রষ্টা কে? সৃষ্টিই বা হল কেন? আর অন্য এক প্রশ্ন– সুখ কী? কোথায় এর স্থিতি? এ কেমন? সুখ কিভাবে মেলে?

বিগত ছয়-সাত হাজার বছর ধরে মানুষ নানাভাবে এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছে। মনোমত অন্তত প্রবোধ পাওয়ার মতো একটা আন্দাজি আনুমানিক উত্তরও তৈরি করেছে। জ্ঞানী ধ্যানী জিজ্ঞাসু সেসব মানুষের ভিন্ন ভিন্ন বিচিত্র সব উত্তররূপ উক্তি বিভিন্ন কালে ও স্থানে বহু মানুষের মানসিক উৎকণ্ঠা-উদ্বেগ কৌতূহল-জিজ্ঞাসা মিটিয়েছে। এবং প্রজন্ম পরম্পরায় শ্রুতিস্মৃতিরূপে মানুষের মগজগত ও মর্মস্থিত হয়ে হয়ে প্রজন্মক্রমে কালান্তরে স্থানান্তরে প্রচার প্রসার লাভ করে করে বিভিন্ন কালিক ও স্থানিক জীবনাচারের প্রয়োজনে বৃক্ষের শাখা-পল্লবের মতো স্ফীতি ও বিস্তৃতি লাভ করে মনুষ্য মনে পাকাপোক্ত হয়ে বসে গেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বদলানোর, পাল্টানোর, বর্জনের, সংযোজনের প্রয়াস চলেছে সব সময়ে কিন্তু কোন কোন ঘা যেমন দাগ রেখে যায়, এ-ও তেমনি মনুষ্য মগজে কালিক ও স্থানিক আপ্তবাক্যের বাণীর দাগ রেখে গেছে। শৈশবের মগজ ধোলাইজাত বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা সাধারণ মানুষ জাগতিক জীবনের বাস্তব প্রয়োজনের ধান্ধায় জাগ্রত জীবন নিয়োজিত রাখে বলে ওসব ক্ষণ-জাগা তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার উত্তর সন্ধানের সত্যাসত্য যাচাই-বাছাই-বর্জনের তেমন অবসরও পায় না, গরজও বোধ করে না। পরের কাছে শোনা, পরের মুখে জানা তত্ত্বে, তথ্যে ও সত্যে নির্ভর ও আস্থা রেখে নিশ্চিন্তে ঐহিক জীবনযাপনের কাজে ধান্ধায় থাকে নিরত। ফলে অভিজ্ঞ ধ্যানী গণমানবহিতৈষীর, জনপ্রিয় গণনেতার বাণী শাস্ত্ররূপে পৌরুষেয় অপৌরুষেয় মূল্যে মর্যাদায় ও সত্যে স্ব ও সুপ্রতিষ্ঠ হয়ে রয়েছে প্রাজন্মক্রমিক শ্রুতিস্মৃতিজাত বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা-রূপে। সংস্কারে আস্থা দৃঢ় হলেই তা স্থির বিশ্বাসে স্থিতি পায় চিত্তলোকে, মর্মমূলে জীবনানুভূতির অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে, উপলব্ধির অপরিহার্য ভিত্তিরূপে।

ফলে উপযোগরিক্ত শাস্ত্র বর্জনের জন্যে, ভুল তত্ত্বে অনাস্থা জাগানোর লক্ষ্যে পরবর্তীকালে যেসব জ্ঞানী-ধ্যানী মানুষপ্রেমী সমাজহিতৈষী চেষ্টা করেছেন, তাঁরা কখনো নির্বিরোধ-নির্বিবাদ-নিঃসংশয় সাফল্য লাভ করতে পারেননি। এভাবে জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-বিবেক-বিবেচনা চিরকাল প্রতিহত হয়ে আসছে প্রাজন্মক্রমিক বিশ্বাসের দুর্গে ঘা দিতে গিয়ে। সেশ্বর, নিরীশ্বর, নাস্তিক, যুক্তিবাদী, প্রকৃতিবাদী, বিজ্ঞানী, দার্শনিক কেউ মানুষের বিশেষ করে অদৃশ্য বিষয়ে প্রথাসিদ্ধ বিশ্বাসে-সংস্কারে-ধারণায়-আচারে-আচরণে অভ্যস্ত প্রচল মত-পথের, নীতি-নিয়মের, রীতি-রেওয়াজের, প্রথা-পদ্ধতির অনুরাগী, অনুগামী ও অনুগত মানুষের মত টলানো-নড়ানো সম্ভব হয় না। চার-তিন-আড়াই-দুই-দেড় হাজার বছর আগের স্থানিক-কালিক-গৌত্রিক অজ্ঞতার, অনুমানের, বিশ্বাসের-সংস্কারের-ধারণার জগৎ যে নতুন অভিজ্ঞতার, চেতনা-চিন্তার, আবিষ্কার-উদ্ভাবনের, জ্ঞান-যুক্তির আলোকে যাচাই-বাছাই করে পরিবর্জন, পরিবর্তন, পরিমার্জন করা সমকালীন জাগতিক জীবনের প্রয়োজনেই যে আবশ্যিক ও জরুরী, তা কিছুতেই বোঝানো যায় না। ওরা এক বিশ্বাসে স্থির এক কথার মানুষ। আগেকার দিনের জ্ঞানীরা ছিলেন জগৎ, জীবন ও স্রষ্টালগ্ন। তাঁরাই তাই চিরসত্যের, তথ্যের ও তত্ত্বের প্রবক্তা। ওসব বাণী ও সত্য কখনো উপযোগরিক্ত হতে পারেই না। কাজেই শাস্ত্র নামের সেই বাণী ও দেশনা, বিধি ও নিষেধ মেনে চলাই হচ্ছে নিশ্চিন্ত নিঃসংশয় নিরাপদ সত্যের ও পরিণামের পথ—এ-ই ছিল সাধারণের বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা। তবু দেশ-কাল জীবনের চাহিদা-তাড়িত হয়ে কেউ কেউ সংস্কারকরূপে পুরোনো শাস্ত্রের মেরামতও গ্রহণ-বর্জন জরুরী মনে করেছেন। কেউ কেউ পিতৃপুরুষের বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণাপ্রসূন শাস্ত্র বর্জন করেছেন, প্রবর্তন করেছেন নতুন মত-পথ সংবলিত শাস্ত্র, যা দেশনারূপে সত্য, তথ্য ও তত্ত্বরূপে স্বীকৃত ও সংগৃহীত হয়ে গড়ে তুলেছে নতুন শাস্ত্র। এভাবেই দ্রোহিতা মাধ্যমে পৃথিবীর মানুষের মনের, মগজের, মননের মনীষার, যুক্তির, সংস্কৃতির, মানবিক অনুভূতির ও উপলব্ধির উন্মেষ, বিকাশ, প্রচার ও প্রসার ঘটেছে।

শাস্ত্রের বন্ধনে মানুষকে বেঁধে রাখা যায়নি, কেউ না-কেউ, কোথাও না-কোথাও নতুন চেতনার, নতুন চিন্তার, নতুন বুদ্ধির, নতুন যুক্তির, নতুন প্রয়োজনের উন্মেষে মানুষ পুরোনো বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণার বন্ধন ছিন্ন করে নতুন জীবনের নতুন তাৎপর্য যোগ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছেন, জীবনযাপন পদ্ধতি যৌথ জীবনের পক্ষে উন্নততর করে তুলেছেন। আবার নতুন চেতনা-চিন্তা-মত-পথ-পদ্ধতি যান্ত্রিক আচারে ও আচরণে পরিণত হয়েছে, তখন তা শীতকালীন বদ্ধ জলাশয়ের পচনশীল ও ক্ষয়িষ্ণু পানির মতোই জীবনের ও সমাজস্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে ওঠে। আমরা এখন দেহ-প্রাণ-মনের অন্ধি-সন্ধি-জানি, রোগ-লক্ষণ জানি, চিকিৎসার ঔষধ জানি, সমুদ্র-পর্বত-আকাশের খবর রাখি। আজকের এ আবিষ্কার-উদ্ভাবন-যন্ত্র-যান-প্রকৌশল-প্রযুক্তিঋদ্ধ যুগে শাস্ত্র মানুষের বা মনুষ্যত্বের সম্পদ নয়, দায়, বন্ধন, শৃঙ্খল। কেননা বিজ্ঞান যেসব প্রাকৃত নিয়ম-নীতির সন্ধান দিচ্ছে, সেগুলো শাস্ত্রপ্রোক্ত সত্যের, তথ্যের ও তত্ত্বের বিপরীত। যেমন বিজ্ঞান বিশ্ব সৃষ্টির কোন স্রষ্টার আভাস পাচ্ছে না, পাচ্ছে ও পেয়েছে এক আকস্মিক বিস্ফোরণ সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ড, যার মধ্যে থেকে হিলিয়াম, বিলিয়াম প্রভৃতি নিমিষে সৃষ্ট। আর ব্রহ্মাণ্ড নাকি কেবল স্ফীতই হচ্ছে নতুন গ্রহ-নক্ষত্রও ক্রমে হয় গড়ে উঠছে কিংবা আমাদের জ্ঞানগত হচ্ছে। আজকের বিজ্ঞান-প্রযুক্তিঋদ্ধ এমনি প্রতিবেশে মানুষের মন-মত-মনন আবাল্য শোনা আনুমানিক সত্যে, তথ্যে ও তত্ত্বে আস্থা রেখে বিজ্ঞানের প্রমাণিত, প্রমাণসম্ভব সত্যকে অস্বীকার করছে দেখে বিস্মিত নয়, প্রগতিবাদীরা বিক্ষুব্ধ না হয়ে পারে না। কেননা তারা মানবিক প্রগতির, মানবতার বা মনুষ্যত্বের, মনুষ্য জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-বিবেক-বিবেচনার প্রয়োগের পথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মনুষ্য সমাজের, সংস্কৃতির, জীবনের সাচ্ছল্যের, স্বাচ্ছন্দ্যের, উৎকর্ষের গতি মৃদু-মন্থর ও বিঘ্নবহুল করে তুলেছে। এখন বিজ্ঞান-আবিষ্কৃত তথ্যেই জীবনের উদ্ভব, বিবর্তন, বিকাশ, বিলোপ এবং সূর্যের নৈকট্য ও দূরত্ব অনুসারে ক্ষিতি অপ-তেজ-মরুতের মাত্রাগত বিভিন্নতায় ও বৈচিত্র্যেই যে ভৌগোলিক অবস্থানগতভাবে প্রাকৃতিক আবহাওয়ার, ঋতুর বিভিন্নতা ঘটছে, জীব-উদ্ভিদেরও আকারে প্রকারে আর স্বভাবেও যে পরিবর্তন ঘটে, তা আজ বিজ্ঞানের সাধারণ পাঠকও জানে। যতই অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিবহুল হোক আজ লোকে ডারউইনের বিবর্তনবাদে, ফ্রয়েডের মনোবিজ্ঞানে, সোরেন কিয়ের্কেগার্ড, সার্ত্র, হাইডেগার প্রমুখের অস্তিত্ববাদ, আইনস্টাইনের থিওরি অব রিলেটিবিটি জানার পরে কিংবা একটি ভূমির আকস্মিক প্রচণ্ড কম্পনে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে পাঁচ মহাদেশে স্থিতিলাভ প্রভৃতি শোনা-জানা-বোঝার পরেও আমরা সনাতন বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণাবদ্ধ জীবনযাপন করছি কোন্ শ্রেয়সের সন্ধানে? জাগতিক জীবনে এর উপযোগ কী? জন্ম-জীবন-মৃত্যুতে যে জীবনের অবসান, তা তো ভারতীয় ও বহির্ভারতীয় নিরীশ্বরবাদী দর্শনে বহুল আলোচিত বিষয়। যে-মানুষ চাঁদে যায়, যে-মানুষ তারে-বেতারে বিস্ময়কর সব যন্ত্র তৈরি করে টিভি, রেডিও, কম্পিউটার, বিমান, স্যাটেলাইট, সর্বপ্রকার রোগের ঔষধ বানায়, তাদের বিজ্ঞানের তথ্য, সত্য ও তত্ত্ব বিশ্বাস না করে অজ্ঞতার যুগের অনুমানজাত সত্যে আস্থা রাখে যারা এ যুগেও, তারা জীবন-সচেতন মানুষ নয়। তাই এ যুগেও মানসিক দিক দিয়ে আধুনিক মানুষ দুর্লভ। শাস্ত্রের অনুসারীরা সাড়ে তিন, তিন, আড়াই, দুই, দেড় হাজার বছর আগেকার অজ্ঞতার যুগকেই বিজ্ঞতার, চিরন্তন সত্য দেখার, জানার ও শোনার যুগ বলে দৃঢ়ভাবে নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করেন, জানেন, বোঝেন ও মানেন। কিম্‌আশ্চর্য অতঃপরম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আধুনিকতার অপর নাম বিজ্ঞানমনস্কতা

বিজ্ঞানীরা, নতুন যন্ত্র নির্মাতারা যাদুকর, নন, জ্ঞানী উদ্যমশীল উদ্যোগী জিজ্ঞাসু মানুষ। বিজ্ঞানীতে ও বিজ্ঞানীর আবিষ্কৃত ও উচ্চরিত তথ্যে, তত্ত্বে ও সত্যে অনাস্থা অজ্ঞতার, মূর্খতার ও বোধবুদ্ধিরিক্ততারই পরিচায়ক মাত্র।

চিকিৎসাশাস্ত্রও বিজ্ঞান, সে চিকিৎসক-গবেষক মাথা-মগজ-চোখ-মুখ-দাঁত-নাক-গলা-বুক থেকে হাত-পায়ের নখ অবধি সর্বাঙ্গের সর্বপ্রকার রোগের কারণ ও লক্ষণ আবিষ্কার করেছেন, প্রতিষেধক নিরূপণ করেছেন, আধুনিকতম যন্ত্রে ও পদ্ধতিতে হৃৎপিণ্ড অবধি অনেক কিছুই কেটে-ছেঁটে জোড়াতালি দিয়ে মেরামত করতে পারেন। আগের কালে কলেরা, বসন্ত, যক্ষ্মা, সন্নিপাত, হৃদরোগ, মস্তিষ্করোগ প্রভৃতি ছিল নিশ্চিত মৃত্যুর রোগ, সেগুলো এখন সামান্য রোগে পরিণত হয়েছে। সূতিকা, কালাজ্বর, প্লীহা, শিশুমৃত্যু প্রভৃতি এখন প্রায় অদৃশ্য। শিক্ষায় ও সম্পদে উন্নত রাষ্ট্রে শিশুমৃত্যু কিংবা প্রসূতিমৃত্যু এমনকি হৃদরোগে ও মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ রোগে, পক্ষাঘাতে, পঙ্গুত্বে মৃত্যুও প্রতিরুদ্ধ হয়ে উঠেছে। ক্যান্সার এবং এইডসও প্রাথমিক বা উন্মেষ উদ্ভব অবস্থায় জানা সম্ভব হলে এখন দুশ্চিকিৎস্য নয়।

বিজ্ঞানী চিকিৎসকের মতোই তাগা-তাবিজের, ঝাড়ফুঁকের প্রতিও আস্থা সমভাবে রাখা জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-বিবেক-বিবেচনাসম্পন্ন কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব? অথচ আমাদের লেখাপড়া জানা তথা প্রশ্নোত্তর-পদ্ধতি প্রয়োগে শিক্ষিত লোকেরা ঝাড়ফুঁক, বাণ-উচ্চাটন, মন্ত্র-মাদুলী, তাগা-তাবিজ, মন্ত্রপূত জাঁতিব ও পাথুরে আঙটিতে আজো ভরসা রাখে, আর গুরু-পীর-ফকির-সন্ত-সন্ন্যাসীর অলীক-অলৌকিক শক্তির মহিমায় মুগ্ধ।

যে মানুষ বিমান তৈরি করেছে, নভোযান পাঠিয়েছে অনন্ত আকাশে, অঙ্ক কষে গ্রহ-নক্ষত্রের দূরত্ব কাগজে-কলমে নির্ভুলভাবে নির্ণয় করেছে, চাঁদে যাওয়ার যান তৈরি করেছে, চাঁদে লোক পাঠিয়েছে, রেডিও, টিভি, ভিসিআর, ভিসিপি, তার-বেতারযোগে গোটা পৃথিবীর সর্বত্র সচিত্র সংবাদ পাঠাতে ও দেখাতে, শোনাতে, জানাতে, পৃথিবীর যে-কোনো প্রান্তের যে-কোন ব্যক্তির সঙ্গে মুহূর্তের মধ্যেই আলাপ-আলোচনা করাতে পারে, যে-কোন মারণাস্ত্র দিয়ে মুহূর্তে পৃথিবী ধ্বংস করিয়ে দিতে পারে, সে-মানুষ তো বিজ্ঞানী-জ্ঞানী-প্রকৌশলী প্রযুক্তিবিদ। বিজ্ঞানীর ভাব-চিন্তা-কথা-কাজ চোখে দেখে, কানে শুনে, নিজের জীবনে প্রত্যক্ষভাবে সাক্ষ্য প্রমাণ পেয়েও যারা আজো তিন-চার, দুই-আড়াই, এক-দেড় হাজার বছর আগের কাল্পনিক অলীক অলৌকিক লৌকিক অনুমিত বিশ্বাসে-সংস্কারে-ধারণায় আস্থা রাখে, দেব-দৈত্য-ভূত-প্রেত-পিশাচ-পরী-ড্রাগন-রাক্ষস প্রভৃতি দৃশ্য-অদৃশ্য অরি-মিত্র শক্তির উপর অটল আস্থা রাখে, তারা কি মানসিকভাবে বাঞ্ছিত মানের, মাপের, মাত্রার বুদ্ধি-যুক্তি-বিচার-বিবেচনাসম্পন্ন লোক?

যেসব বিজ্ঞানী আজকের পৃথিবীর, অশেষ নভোলোকের, সমুদ্রের তলদেশের, পর্বতের চূড়ার কিংবা ভেতরের আগুনের উৎসের কারণ-করণ জানেন-বোঝেন, যেসব বিজ্ঞানী জীবাণু থেকে, ক্ষুদ্রতম কীট থেকে, তৃণমূল থেকে হাতি, তিমি, মহীরুহ অবধি সব জীব-উদ্ভিদের তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য জানেন, সেসব বিজ্ঞানী যখন বলেন, হাজার বা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাঁচশ কোটি বছর আগে এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণে গড়ে উঠেছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, এ ক্রমশ স্ফীত হচ্ছে, পৃথিবীর স্থলভাগ একটিই ছিল পনেরো/বিশ কোটি বছর আগে প্রচণ্ড কম্পনে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে পাঁচ মহাদেশে বিভক্ত হয়ে গেছে-মাঝখানে জলপ্রবাহ ব্যবধান তৈরি করে রেখেছে, কিংবা তেমন কম্পনে পর্বত হয়েছে সাগর আর সাগর হয়েছে পর্বত, তা হলে আমরা বিশ্বাস করতে চাইনে কেন? বিজ্ঞানীর মগজীশক্তির এতোসব প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়েও বিগব্যাঙ, গ্রীন হাউজ, ব্ল্যাকহোল, ওজোন, দেহস্থজীন তত্ত্ব কেন অবিশ্বাস করব? ওঁরা যে যাদুকর নন, ভানুমতীর খেল যে ওঁরা খেলেন না, তা দেখে, শুনে, বুঝেও কেন আমরা সনাতন বিশ্বাসের সংস্কারের যুগে মানসবিচরণ করব? বিশ্বাসের, অলীকের, আলৌকিকের জগৎ ছেড়ে আমরা সমকালীন বিজ্ঞানের জগতের যোগ্য মন-মত-মনন-মনীষা সিদ্ধান্তঋদ্ধ জীবনচেতনা ও চিন্তা বাস্তব ও জাগতিক জীবনযাত্রায় সমাজে-রাষ্ট্রে প্রয়োগ করে মনুষ্যজীবন কেন সার্থক করে তুলব না?

বিজ্ঞানের প্রয়োগে আস্থা, তথ্যে অনাস্থা

মানুষ শোনা বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণায় আশৈশব অভ্যস্ত হয়ে যায় এবং সত্যাসত্য যাচাই-বাছাই করার গরজ বোধ করে না সারাজীবনেও, কেননা জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে লাভে লোভে স্বার্থে পার্থিব তথা ঐহিক বা ইহজাগতিক বাস্তব চেতনা-চিন্তা তার প্রাণ-মন-মনন আচ্ছন্ন করে রাখে তার জীবনের জাগ্রত মুহূর্তগুলোতে। এ জন্যে মানুষ যৌক্তিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয় না, মর্ত্যজীবনে জাগতিক স্বার্থে যদিও বৌদ্ধিক জীবনের চর্চাও করে একান্ত নিষ্ঠায়। ফলে সাধারণ মানুষের চেতনা-চিন্তা-ভাব-কর্ম-আচরণ প্রায়ই অসঙ্গতিপূর্ণ। যুক্তিনিষ্ঠা থাকে না বলে যৌক্তিক ন্যায্যতা থাকে না তাদের সারা জীবনের চেতনায় চিন্তায় ভাবে কর্মে আচরণে। এর প্রমাণ, পদে পদে শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন করেও মানুষ অন্তরে শাস্ত্রানুগত। প্রতিমুহূর্তে বিজ্ঞানের অবদানে এবং প্রযুক্তির ও যন্ত্রের প্রসাদে জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য, সৌকর্য, সুখ ও আরাম ভোগ-উপভোগ করেও সাধারণ শিক্ষিত মানুষ বিজ্ঞানবিমুখ, বিজ্ঞানের তত্ত্বে তথ্যে ও সত্যে আস্থাবান নয়। এমনকি বিজ্ঞানে বিদ্বান মানুষের মগজে ও অন্তরে বিজ্ঞানের তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য ঠাঁই পায় না। তাঁরাও মনে করেন এর গভীরে রয়েছে বহুশ্রুত কোন অদৃশ্য নিয়ন্তা লীলাময় শক্তির অভিপ্রায়ের প্রকাশ।

যে-মানুষ ফোন-ফ্যাক্স, রেডিও টিভি ক্যাসেট ক্যামেরা কম্পিটার এবং আকাশচারী বিমান, গ্রহগামী যন্ত্রযান তৈরি করল, যে-মানুষ সাবমেরিন বের করল, যে-মানুষ ইলেকট্রন-প্রোটন-নিউট্রন আবিষ্কার করল এবং সর্বপ্রকার রোগের নিদান ও প্রতিষেধক উদ্ভাবন করল, যে-মানুষ সমুদ্রের গভীরে, পর্বতের কন্দরে, অরণ্যের গভীরে, নভোলোকে কী কী আছে, তা যথাযথভাবে জানিয়ে দেয় এবং এ যাবৎ কোন কোন তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য অপূর্ণ থাকলেও একেবারে বানানো মিথ্যে বলে প্রমাণিত হয়নি অর্থাৎ বিজ্ঞানীরা মিথ্যেবাদী প্রতারক বলে আজো নিন্দিত বা ধিক্কৃত হওয়ার কারণ ঘটায়নি, সে-মানুষই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যখন বিগব্যাঙের, ওজোনের, ব্ল্যাকহোলের, গ্রীন হাউজের কথা বলে কিংবা আকস্মিক বিস্ফোরণে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক সেকেন্ডের একশ ভাগের এক ভাগ সময়ে গড়ে উঠেছে হিলিয়াম, বিলিয়াম, অক্সিজেনও সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভূত হয়েছে, কিংবা সূর্য থেকে খসে-পড়া অগ্নিপিণ্ড প্রথমে অগ্নিময় পরে ধূম্রময়, তারও পরে জলময় হয়ে বিরাজ করেছে এবং তার মধ্যেই একটি ভূখণ্ড গড়ে ওঠে আর তা বহু বহু কোটি বছর পরে এক প্রচণ্ড আকস্মিক কম্পনে দ্বিখণ্ডিত হয়ে পাঁচ মহাদেশে বিভক্ত হয়ে গেছে ষোল থেকে বিশ কোটি বছর আগে, অথবা জলজ জ্যালি থেকে ক্রমবিবর্তনের ধারায় প্রাণীকুলের উদ্ভব ও বিবর্তন ঘটেছে, সূর্য নিয়ন্ত্রিত জল বায়ু-মাটি-তাপের স্থানিক ও কালিক প্রভাবে,-তখন তা উপহাসে অবজ্ঞায় অনাস্থায় উড়িয়ে না দিয়ে বরং তাদের গবেষণার কোথাও ত্রুটি রয়েছে কিনা, তা নিয়ে যৌক্তিক ও বৌদ্ধিক আলোচনা ও বিতর্ক চালানোই যুক্তিবাদী শিক্ষিতের দায়িত্ব ও কর্তব্য। এবং যোগ্যতা থাকলে ও সম্ভব হলে নিজেরা পরীক্ষণ, সমীক্ষণ, নিরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ করে দেখার আগ্রহ কিংবা সন্ধিৎসা দেখানোই বাঞ্ছনীয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রিত আজকের জগতে বিজ্ঞানবিমুখতা জীবনবিমুখতারই নামান্তর। বিজ্ঞানও তথ্যও সত্য সন্ধিৎসার ফুল, ফল ও ফসল–সভ্যতার উৎস ও ভিত্তি। বিজ্ঞানীর তৈরি কাজে আমাদের ভরসা আর মুখে উচ্চারিত গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যে আমাদের অবিশ্বাস। আমাদের বিজ্ঞান-বিজ্ঞানী সম্বন্ধে আস্থা-অনাস্থার এ অসঙ্গতি অযৌক্তিক, অবৌদ্ধিক এবং অসঙ্গত। শিক্ষিত ব্যক্তিমানুষের চেতনায় চিন্তায় ভাবে কর্মে আচরণে অসঙ্গতি অবিদ্যানের, অবিবেচকের মগজী যুক্তি প্রয়োগের অসামর্থ্যের নিদর্শনমাত্র।

AMARBOI.COM

তিন 'R' -এর আধি আক্রান্ত পৃথিবী

আজকের পৃথিবীতে তিন 'R' প্রসূত সংকট-সমস্যা মানব প্রজাতির মানবতার সর্বপ্রকার বিকাশ-বিস্তার বিঘ্নিত করেছে, করছে। Race, Region, Religion- এর স্বাতন্ত্র্যচেতনা মানুষকে এমন হিংস্র করে তুলেছে যে, তারা এখন শ্বাপদকেও হার মানাচ্ছে। য়ুরোপীয় দার্শনিকদের এতো বিচিত্র তত্ত্বোপলব্ধি, বিজ্ঞানীদের এতো আবিষ্কার-উদ্ভাবন, প্রকৌশল, যন্ত্র ও প্রযুক্তির এতো উৎকর্ষ ও বৈচিত্র্য, শিল্পী-সাহিত্যিকদের এতো মহৎ সূক্ষ্ম ও বিচিত্র অনুভব-উপলব্ধি, মনুষ্যত্বের, মানবিকতার বা মানবতার ব্যক্তিগত বিস্ময়কর বিকাশ-প্রকাশ, পশু-পাখি-কীট-পতঙ্গ-সরীসৃপ প্রভৃতির প্রতিও মানবিক দায়িত্বের গুণে-মানে-মাপে-মাত্রায় প্রত্যাশাতীত উৎকর্ষ স্ফুলিঙ্গের মতো, হীরকখণ্ডের মতো নির্মোহ মানবহিতৈষীদের মনে মনুষ্যত্বের আধুনিকতম বিকাশ-বিস্তার সম্বন্ধে দু'দুটো মহাযুদ্ধ বিধ্বস্ত বিশ শতকেও আশা ও আশ্বাস জাগিয়েছিল। কেননা সরকারের ও সৈনিকের প্রয়োজনে প্রলয়ঙ্কর মারণাস্ত্র তৈরি যেমন প্রাণপণ নিষ্ঠায় বৃহৎ শক্তিগুলো চালু রেখেছিল, তেমনি তারাই আবার ব্যক্তি মানুষকে রোগমুক্ত করার ও রাখার জন্যে সমান আগ্রহে গবেষণার জন্যে গবেষকদেরও অর্থে-বিত্তে ও সম্মানে ভূষিত করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রন্থাগারে বইপত্র দেখলে, বিদ্যা ও বিত্তমান লোকদের ভাষণ শুনলে ও লেখা পড়লে মনে হয় আমরা মনুষ্যত্বে ঋদ্ধ, মানবতার সাধনায় প্রত্যাশিত স্তরে স্থিত। কিন্তু বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোর সরকারের ও সৈন্যের নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ ও প্রথা-পদ্ধতি আমাদের হতাশ করে না কেবল, মানুষও যে আজো হিংস্র, ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ রিপুতাড়িত জীবমাত্র, তাই-ই বিশ্বাস করতে প্ররোচিত করে। পঞ্চাশ বছর আগেকার হিরোশিমায়-নাগাসাকিতে নয় শুধু রুমানিয়ায়-ইরাকে মার্কিন বর্বরতা, ফকল্যান্ডে ব্রিটিশ বর্বরতা, দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গদের কৃষ্ণাঙ্গ নরহত্যা, ভাঙা সোভিয়েত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে কাড়াকাড়ি-হানাহানি লড়াই, প্রাক্তন যুগোশ্লাভিয়ায় হনন-উৎসব, আফগানিস্তানে গৃহযুদ্ধ এবং পৃথিবীর সব রাষ্ট্রাভ্যন্তরে অধিজনদের উনজনের উপর আর্থিক, বৃত্তিক, মানসিক শোষণ-পীড়ন গোটা পৃথিবীর আস্তিক মানুষের সমাজে নিত্যকার সমস্যা হয়ে রয়েছে।

'ব্রাহ্মণ' শ্রেণী আর্যভাষীদের সৃষ্টি নয়। এ অন্তত মহেনজোদারো-হরপ্পার কাল থেকেই নেহাত বিদ্যাবুদ্ধির ও ধূর্ততার সুনিপুণ প্রয়োগে আসমানী দোহাই দিয়ে এ স্বল্পসংখ্যকের শাসক-শোষক প্রভুশ্রেণী ভারত উপমহাদেশের এবং অন্তত গজনী-গান্ধার অবধি অঞ্চলের মানুষকে দাস, বশ ও ব্রাহ্মণের সেবক করে রেখেছে। শূদ্রসেব্য ব্রাহ্মণশ্রেণী পরান্নজীবী, পরপ্রণম্য ও পরসেব্য আর পরপোষ্য হয়ে শূদ্রদের ঐহিক-পারিত্রিকজীবন নিয়ন্ত্রণ করেছে, নিবদ্ধ রেখেছে ঘরানা পেশায়, রেখেছে ব্রাহ্মণের অনুরাগী, অনুগামী ও অনুগত। শূদ্রের ইহ ও পরকালের মঙ্গলামঙ্গল ব্রাহ্মণ তোষণ-রোষণেরই ছিল ফুল-ফল-ফসল। ব্রাহ্মণ যখন জনবহুল বর্ধিষ্ণু বুদ্ধির শূদ্রদের নিতান্ত তুকতাক-মন্ত্র-মাদুলী-তাবিজ-কবজ দিয়ে অনুগত রাখা সুসাধ্য হয়ে উঠছে মনে করল, ঠিক সে-সময়েই ব্রাহ্মণ্য দৌরাত্ম্যমুক্তি লক্ষ্যে জনগণের পক্ষে দেব-দ্বিজ-বেদদ্রোহী হলেন মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধ। তবু ব্রাহ্মণের দর্প-দাপট-প্রভাব খর্ব করা যায়নি।

তখনই বেদের ও দেবের বরপুষ্ট সমর্থিত মর্ত্যদেবতারূপে দ্বিজ হয়ে হুকুম-হুমকি-হুংকার-হামলা চালানোর ব্যবস্থা করল আসমানি শক্তির ব্রাহ্মণশ্রুত অদৃশ্য নির্দেশে। পরিণামে মহাভারত-রামায়ণ-গীতা-উপনিষদ প্রভৃতি দেব-দ্বিজ-বেদ প্রতিম, প্রতীক ও প্রতিভূ হয়ে রইল। এর ফলেই ভারতের পনেরো কোটি অস্পৃশ্য শূদ্র এবং আরো বিশ কোটি জলচল সৎশূদ্র-কায়স্থ-বৈদ্য-বৈশ্য-ক্ষত্রিয় প্রভৃতি উপমহাদেশের বাসিন্দারা কোন অভিন্ন একক দেবতার বা ব্রহ্মের, ব্রহ্মার, বিষ্ণুর, সূর্যের, রামের, কৃষ্ণের, কালীর, গণেশের উপাসক না হয়েও এমনকি আরব-তুর্কী-মুঘল বিজয়োত্তরকালে শঙ্করাচার্য, রামানুজ, নিম্বার্ক, মধব, বল্লভ, চৈতন্য প্রমুখ দ্রোহী ব্রাহ্মণের ভিন্ন ভিন্ন মতবাদী সম্প্রদায়গুলোর উদ্ভব সত্ত্বেও এবং উত্তর ভারতের শূদ্র রামানন্দ, রামদাস, কবীর, দাদূ, নানক, একলব্য প্রমুখ অস্পৃশ্য-স্পৃশ্য দ্রোহীদের দেব-দ্বিজ-বেদ বর্জন সত্ত্বেও আজ অবধি ব্রাহ্মণের প্রাধান্য এবং আসমানি নির্দেশে বিন্যস্ত বর্ণাশ্রম মিথ্যা বলে পরিহার করতে সাহস পায় না কেউ। কালপ্রভাবে তারা বিদ্যায়-বিত্তে-বেসাতে-পদে-সম্মানে ও ক্ষমতায় তাদের দাবি পেশ ও আদায় করে। এমনকি ডক্টর আম্বেদকরও বৌদ্ধ হলেন, হিন্দু থেকে ভেতর থেকে জনগণকে প্রবুদ্ধ, প্ররোচিত কিংবা উত্তেজিত করে বর্ণভেদ বিলোপ করাতে পারলেন না। কেননা আস্তিক মানুষ অদৃশ্য ঐশশক্তির ইচ্ছাকে সন্দেহ করতেও সাহস পায় না। শৈশবে শ্রুতলব্ধ বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা-ভয়-ভক্তি-ভরসায় আচ্ছন্ন মনে-মগজে-মননে-মর্মে দ্রোহ করার মতো জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-শক্তি-সাহস-জিজ্ঞাসা-সন্দেহ থাকে না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলেই। হিন্দু নামে অভিহিত ও পরিচিত আজকের জনগোষ্ঠীর সর্বপ্রকারে উপাস্যে, ভাষায়, রক্তে, অঞ্চলে, বর্ণে, পেশায়, আর্থিক-সামাজিক অবস্থায় ও অবস্থানে, বিদ্যায়, বেসাতে ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও বিজেপি ওই ভীরুতার ও সনাতন অদৃশ্য আসমানী বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণার সুযোগ নিয়ে 'হিন্দুত্ব' নামের এক নিঃসার-নিরবয়ব জাতিচেতনা জাগিয়ে রাজনীতিক ফায়দা ওঠানোর চেষ্টায় সাফল্য অর্জন করছে।

এ সূত্রে এ-ও উল্লেখ্য যে, প্রতীচ্য শিক্ষা গ্রহণের ফলে কোলকাতা-বোম্বাই-মাদ্রাজকেন্দ্রী হিন্দু সমাজের জাতিচেতনা জাগে। বর্ণে বিন্যস্ত ঘরানা বৃত্তিতে প্রজন্মক্রমে শৃঙ্খলিত শূদ্র সমাজের সম্ভাব্য দ্রোহ ঠেকানোর লক্ষ্যে উচ্চবৃত্তির, বিদ্যার ও বিত্তের বর্ণহিন্দুরা নম শূদ্রদের দাস, বশ ও সেবক রাখার জন্যে নতুন শেখা প্রকৃতির নিয়মকে ['Law of Nature কে] অর্থাৎ Law of Uniformity in diversity in Nature কে প্রয়োগ করল বর্ণে বিন্যস্ত কোটি কোটি মানুষকে একালেও দাস-বশ-অনুরাগী-অনুগামী ও অনুগত রাখার জন্যে। তাদের নিঃস্বতায়, নিরন্নতায়, অজ্ঞতায়, অবজ্ঞায় হীনমন্য ও দুর্বল রাখার মতলবে হিন্দু সমাজে, 'বৈচিত্র্যে ঐক্য' আবিষ্কার-উদ্ভাবন করে তার মহিমা-মাহাত্ম্য প্রচার করেছেন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষী রবীন্দ্রনাথ অবধি অনেকেই। রাজনীতিক প্রয়োজনে বহু মনের ও মগজের অবদানে বৈচিত্র্য এখন উপাস্যের, ভাষার, সংস্কৃতির, পোশাকের, আচারের, রক্তের, অবয়বের, মনের, মতের ও অঞ্চলের বৈচিত্র্যে ঐক্য সমষ্টি হয়ে উঠেছে। ভারত উদারতায় গ্রহণে-বরণে-মিলামেশে-মিলনে অনন্য সভ্যতা-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। স্বয়ং গান্ধীও ছিলেন বৈচিত্র্যবাদী। তিনি অচ্ছুৎদের প্রতি কৃপা-করুণা-দয়া-দাক্ষিণ্য কামনা করেছিলেন, সমনাগরিক বা সমকক্ষ মানুষ বলে স্বীকার করতে রাজি ছিলেন না। আম্বেদকরের সঙ্গে তাঁর বিতর্ক স্মর্তব্য। বরং এদের 'হরিজন' নাম দিয়ে মানুষকে ও মনুষ্যত্বকে অবমানিত করেছেন। আজো ভারত হচ্ছে 'বৈচিত্র্যে ঐক্য' দর্শনের ও নীতির প্রবর্তক ও ধারক– এমন মহৎ আদর্শ জগতে বিরল প্রভৃতি স্তোকবাক্য মুখে, লেখায় ও তারে-বেতারে প্রচার করে চলেছে বর্ণহিন্দুরা ও সরকার। কাজেই ধর্মবিশ্বাসের তথা শাস্ত্রের রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ-উপনিষদ-বেদ-গীতা প্রভৃতির দোহাই দিয়ে Race, Caste প্রভৃতির হীনতা ও শ্রেষ্ঠতা, পেশার তুচ্ছতা ও উচ্চতা, পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্য নির্বিরোধে নির্বিবাদে নিরুপদ্রবে নিরাপদে রক্ষা করার প্রয়াস-প্রযত্ন এ মুহূর্তেও একালের ভারতে চলছে। মানববাদ, মানবতা, মনুষ্যত্ব, জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-নিবাস নির্বিশেষে মানুষমাত্রেই যোগ্যতানুসারে আদর-কদর কবে পাবে?

আজকের ভারতে কাশ্মীরীরা মুসলিম বলে, শিখরা গুরুবাদী ভিন্ন ধর্মের বলে, দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়রা উত্তর ভারতের হিন্দু-বলয়ের ক্ষমতার প্রভাবভীরু ও হিন্দিবিদ্বেষী বলে এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের সাতটি রাষ্ট্র রক্তের, ধর্মের, ভাষার, নিবাসের [ওই অঞ্চল কখনো ভারতভুক্ত ছিল না, যদিও মহাভারতে মনিপুরের উল্লেখ আছে] ভিন্নতা ও আঞ্চলিক বিযুক্তি-বিচ্ছিন্নতার দরুন স্বাধীনতাকামী। পাকিস্তানেও আঞ্চলিক বা ভাষিক স্বাধীনতার স্বপ্ন ও সাধ জাগা শুরু হয়েছে। কুর্দরা চার রাষ্ট্রে বিভক্ত থাকায় ভাষায় তথা বুলি বা উপভাষায়ও বিভিন্ন হয়ে পড়ছে, তবু গৌত্রিক ঐক্যের টানে স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বাপ্নিক ও সংগ্রামী। শ্রীলঙ্কাকেও হতেই হবে ফেডারেল। আবিসিনিয়া-ইরিত্রিয়া-সোমালিয়া আজ বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। দক্ষিণ আফ্রিকায় নয় কেবল, আরো বহু রাষ্ট্রে গৌত্রিক পার্থক্য দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-সংঘাতের এবং বিচ্ছিন্নতা আন্দোলনের উৎস। যুগোশ্লাভিয়ায় যা ঘটছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাও স্বাতন্ত্র্য চেতনার প্রকৃষ্ট সাক্ষ্য ও প্রমাণ চেকোশ্লাভিয়া আপসেই জুদা হয়ে গেল, যেমন হয়েছিল মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুর, মায়ানমারও প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে বিচ্ছিন্নতার যুদ্ধে জড়িত ও জর্জরিত। ভিয়েতনাম-লাওস-কম্বোডিয়াও একই রূপ গৌত্রিক-আঞ্চলিক-ভাষিক পার্থক্যচেতনা প্রসূন। য়ুরোপে তো ভাষিক রাষ্ট্রই গড়ে উঠল। তবু ক্যাথলিক-প্রোটেস্ট্যান্ট দ্বন্দ্বও রয়েছে। উত্তর আয়ারল্যান্ড যে লন্ডনের শাসনে এবং জার্মানি যে অস্ট্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন, তা তো সাম্প্রদায়িক দ্বেষণার কারণেই। আজো যে ক্যাথিলিক বা কালো মানুষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি হয় না, প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদী শ্বেতাঙ্গ নয় বলে। কুইবেক আজো ইংরেজী ভাষীর শাসন মেনে নিতে নারাজ। বিচ্ছিন্নতার দাবি করেই চলেছে। ভাঙা সোভিয়েতের মতো একদিন ভাঙা চীনেও এমনি বিচ্ছিন্নতাবাদ [Racial, Religious, Regional and linguistic] পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্যভিত্তিক হয়ে গোটা দেশকে বিখণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন করবে। এ হচ্ছে ব্যক্তিসত্তার স্বাতন্ত্র্যচেতনার প্রসারে গোষ্ঠিক, গৌত্রিক, বার্ণিক, শাস্ত্রিক, ভাষিক, নৈবাসিক স্বাতন্ত্র্যচেতনা হয়ে এ বিচ্ছিন্নতার ও স্বাধীনতার স্বপ্ন ও সাধ জাগিয়ে তুলেছে। তাই এ যুগে কোথাও Unitary শাসন পদ্ধতি চালু থাকবে না, থাকবে না বহুজাতিক মিশ্রজাতিক রাষ্ট্র। তবে এ বিজ্ঞান, প্রকৌশল-যন্ত্র-প্রযুক্তিনির্ভর জগতে কেউ বা কোন রাষ্ট্র বিচ্ছিন্নতায় স্বাতন্ত্র্যে স্বয়ম্ভর-স্বনির্ভর হয়ে টিকতে পারবে না। তাই যুগের দাবি হচ্ছে Federal বা Confederal রাষ্ট্র ব্যবস্থা। ফলে বৈশ্বিক-আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে সামবায়িক সহযোগিতার ও সহাবস্থানের অঙ্গীকারে নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা গড়ে উঠবেই। আমরা জানি, বুঝি ও মানি যে, necessity knows no law এবং necessity is the mother of invention, পশ্চিম য়ুরোপের বারো জাতির 'মাস্‌সখীট' চুক্তির মাধ্যমে যৌথ আর্থ-বাণিজ্যিক অভিন্ন হওয়ার গরজবোধ এবং নাফতা ও গ্যাট এ তত্ত্বেরই প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য ও প্রমাণ।

AMARBOI.COM

মৌলবাদ ও সেক্যুলার সংস্কৃতি

ব্যুৎপত্তিগত অর্থে মৌলবাদ হচ্ছে শাস্ত্রের মূল বা মৌলিক বিধি নিষেধগুলোকে ধরে রাখা, সে-নীতি-নিয়মে নিষ্ঠ থাকা, ভাবে-চিন্তায়-কর্মে-আচারে-আচরণে শাস্ত্রকে তারক মন্ত্র ও পন্থা হিসেবে বরণ করে ঐহিক-পারত্রিক জীবন নির্বিঘ্ন নিরাপদ রাখার তত্ত্বে আস্থা। শাস্ত্রকে যদি বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করি, তাহলে সে-বৃক্ষকে ধরে থাকা আঁকড়ে থাকাই হচ্ছে মৌলবাদ। ফলে মৌলবাদ হচ্ছে বিশ্বাসে সংস্কারে ধারণায় ভয়ে ভক্তিতে ভরসায় অবিচলভাবে স্থির থাকা মানসিকভাবে ও কর্মে আচরণে। শৈশব থেকে দৃষ্ট ও শ্রুত বিশ্বাস সংস্কার ধারণা ভয় ভক্তি ভরসা আচার আচরণ প্রভৃতিই সাধারণ মানুষের দৃশ্য ও অদৃশ্য, জ্ঞাত ও অজ্ঞাত বিষয়ে জীবনচেতনার পুঁজি ও পাথেয়। কোন কৌতূহল বা জিজ্ঞাসা নিয়ে কেউ শাস্ত্রের যাচাই-বাছাই করে না। শৈশবকাল থেকে পারিবারিক, সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক পরিবেশে খণ্ড ও বিচ্ছিন্নভাবে প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক সূত্রে দেখা, শোনা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানা ও বোঝা তত্ত্বই হচ্ছে সাধারণ মানুষের আস্তিক্যের, ঈশ্বর-চেতনার, উপাস্যে, ইষ্টদেবতায় আস্থার ভিত্তি ও উৎস।

আস্তিক বা ঈশ্বরবাদী বা উপাস্যে ও ইষ্টদেবতায় নিষ্ঠ ব্যক্তিমাত্রই জানে ও মানে যে তার শাস্ত্রই নির্ভুল ও শ্রেষ্ঠ, আর সত্য তো বটেই। অন্যদের শাস্ত্র ভুল, মিথ্যা, ত্রুটিবহুল। ফলে ধার্মিকমাত্রই হয় রক্ষণশীল, আচার-আচরণনিষ্ঠ, গতানুগতিক ও আবর্তিত জীবনাচারের অনুরাগী, অনুগামী ও অনুগত। স্থানান্তরে, কালান্তরে, প্রজন্মান্তরে জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে, জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রজ্ঞার বিকাশে এ যে পরিবর্তন, বিবর্তন, যোজন, বর্জন সাপেক্ষ হতে পারে, হওয়া আবশ্যিক ও জরুরী, তা ঐশ শাস্ত্রে আস্থাবান শ্রুতিস্মৃতিনির্ভর ও প্রাজন্মক্রমিক আবর্তিত নীতি-নিয়মে রীতি-রেওয়াজে, প্রথা-পদ্ধতিতে অভ্যস্ত ও অনুগত মন-মগজ-মনন-বুদ্ধি-যুক্তি-বিবেক-বিবেচনা প্রয়োগে অনীহ ও অনভ্যস্ত সাধারণ মানুষ স্বীকার করে না, তাদের মনে-মননে তেমন প্রশ্নই জাগে না। এ কারণে তারা অর্থাৎ আস্তিক ও শাস্ত্রিক মানুষ এক প্রকার যান্ত্রিক জীবনচেতনায় ও জগৎ-ভাবনায় অভ্যস্ত হয়ে যায়। গতানুগতিকতাতেই তাদের স্বস্তি ও ভরসা, তারা তাই কোন বিবর্তন, পরিবর্তন, যোজন, বর্জন ও লঙ্ঘন সহ্য করে না। তারা তাদের শাস্ত্রের তত্ত্বে, তথ্যে ও সত্যের চিরন্তনতায় গাঢ় ও গভীরভাবে আস্থাবান। এ জন্যেই তারা শাস্ত্রবিরুদ্ধ ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ সহ্য করে না। ঈশ্বরের বিচারের জন্যে অপেক্ষা করে না, তৎক্ষণাৎ জান-মাল-গর্দান নেয়ার জন্যে হুকুম-হুমকি-হুংকার ও হামলা চালায়, ওরা অসংযত, অসহিষ্ণু ও অসুজন। যুক্তি ও বিজ্ঞান ওদের কাছে অগ্রাহ্য।

ধার্মিক মৌলবাদীরা রক্ষণশীল বা গোঁড়া অসহিষ্ণু হয়, এরাই অর্থোডকস্য নামে পরিচিত। এরা আন্তরিকভাবে শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ মানে।

ফলে মৌলবাদীদের সঙ্গে আপসে সহাবস্থান সম্ভব হয় না, ওরা উগ্র, উদ্ধত ও হত্যাপ্রবণ। ইতিহাসের সাক্ষ্য প্রমাণে নিঃসংশয়ে বলা চলে যে অজিজ্ঞাসু ও যুক্তি-বুদ্ধি প্রয়োগে শাস্ত্র বোঝায় যারা অনীহ, তারা চিরকালই পৃথিবীর সর্বত্র পরমত পরকর্ম ও পরআচরণ অসহিষ্ণু হিংস্র, মনুষ্যত্ব তাদের মধ্যে সুপ্ত, গুপ্ত কিংবা লুপ্ত থাকে, কখনো বিকাশ-প্রকাশ পায় না। তারা কূর্ম প্রবৃত্তির প্রাণী, গ্রহণশীল নয়, বর্জনশীল, পুরোনো প্রীতি ও নতুনভীতি তাদের স্বভাবে ও অভ্যাসে স্থিতি পায়। এ জন্যেই আস্তিক-শাস্ত্রিক মানুষের সংস্কৃতির মুখ্য উৎস শাস্ত্রিক বিশ্বাস সংস্কার ধারণা ভয় ভক্তি ভরসা আচার আচরণ। এ কারণেই এর বিকাশ নেই, আচারিক আবর্তন আছে মাত্র। শাস্ত্র লঙ্ঘন বা উপেক্ষা করণেই কেবল সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটে।

অবশ্য আরেক শ্রেণীর শাস্ত্রপন্থী আছে, যারা ঐহিক-পারত্রিক জীবনে আত্মমোক্ষকামী, শাস্ত্রিক জীবনযাপনে সতর্ক সযত্নপ্রয়াসী, তারা পরধর্মে আস্থাহীন হয়েও নিষ্ক্রিয় নীরব অবজ্ঞাপরায়ণ হয়েও পরমত ও পরকর্ম-আচরণ সম্বন্ধে সহিষ্ণু বা উদাসীন থাকে, তারা বিধর্মীর সঙ্গে সম ও সহ স্বার্থে সংযমে, সহিষ্ণুতায় সামবায়িক সহযোগিতায় সহাবস্থানে বাস করে। আগের দিনে কালে-ভদ্রে যে শাস্ত্রিক বিরোধ-বিবাদ-উপদ্রব-দাঙ্গা ঘটেছে, সেগুলোকে আকস্মিক সাময়িক ও ব্যতিক্রম বলে গণ্য করে, বলা চলে একালে রেডিও-টিভি, ক্যাসেট-সিনেমা আর গণতন্ত্র নামের ভোটতন্ত্র চালু হওয়ার আগে এবং শিক্ষার প্রসারে নগরে-বন্দরে রাজনীতির বিস্তারের আগে গাঁয়ে-গঞ্জে জাত, জন্ম, বর্ণ, ধর্ম, ভাষা, নিবাস, বিত্ত, বেসাত, বৃত্তিভেদ সত্ত্বেও মানুষ হাটে-বাটে-মাঠে-ঘাটে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্বিরোধে নির্বিবাদে পণ্য বিনিময়ে, শ্রম বিনিময়ে, নিজেদের জীবন-জীবিকা ক্ষেত্রে বৈষয়িক ব্যবহারিক প্রয়োজনেই সামবায়িক সহযোগিতায় পাড়ায় পাড়ায় মহল্লায় মহল্লায় গাঁয়ে গাঁয়ে সহাবস্থান করেছে। হিন্দু কামার কুমার জেলে তাঁতী-নাপিত-ধোপা নির্বিশেষ মুসলিমের কাজে লেগেছে। হিন্দু-ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ-তুর্কী-মুগল আমলে নয় কেবল, ব্রিটিশ আমলেও শাসনে-প্রশাসনে বিদ্যায় বিত্তে বেসাতে বৃত্তিতে মুসলিমের প্রাত্যহিক জীবনের অবলম্বন ছিল।

এখন অজ্ঞ-অনক্ষরেরাও জাত জন্ম বর্ণ ধর্ম ভাষা নিবাস জাতি উপজাতি আদিবাসী বৃত্তি-বেসাত নির্বিশেষে সবাই এ যন্ত্রনির্ভর জীবনে, এই যন্ত্রযুগে ও যন্ত্রজগতে ব্যক্তিসত্তার মূল্য, স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদা সচেতন হয়েছে, স্বাক্ষর না হয়েও তার-বেতার যন্ত্রের বদৌলত স্বশিক্ষিত হয়েছে। সামন্ত-বুর্জোয়া-মুৎসুদ্দীর ক্ষমতার গদী দখলের তথাকথিত গণতান্ত্রিক রাজনীতিক দলীয় প্রচারের ও প্রচারণার ফলে জাতিক, উপজাতিক, আদিবাসীক, শাস্ত্রিক মতবাদীর সাম্প্রদায়িক স্বার্থের চেতনা ও দাবি দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-সংঘাতের সার্বক্ষণিক কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ অবস্থায় এ সনাতনপন্থী পরিবর্তন বিরোধী কায়েমী স্বার্থবাজ লোকের বিদ্যা-বিত্তের প্রাবল্যের দরুন প্রত্যাশিত সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে উঠবে না, এর জন্যে কেবল মৌলবাদী বিরোধী সংগ্রাম নয়, সমাজ-পরিবর্তনের জন্যে তথা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাত জন্ম বর্ণ ধর্ম ভাষা নিবাস যোগ্যতা নির্বিশেষে সব মানুষের সম অধিকারের ও সম নাগরিকত্বেরও অধিকারে জনগণের সঙ্ঘ-সমিতির মাধ্যমে আপসহীন বিরামহীন গণআন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে আশু সাফল্য লক্ষ্যে। নাস্তিক নিরীশ্বর না হলে কোন আস্তিক শাস্ত্রিক মানুষের পক্ষেই ধর্মনিরপেক্ষ চেতনার অনুশীলন ও অর্জন কখনো সম্ভব নয়।

যুক্তিবাদী সাহসী লোক না হলে কেউ আশৈশবের বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা, ভয়-ভক্তি-ভরসা পরিহার করে নাস্তিক হতে পারবে না। কাজেই ভীরু মানুষ কখনো নাস্তিক নিরীশ্বর হবে না। যুক্তিবাদীও হবে না সব মানুষ, কম্যুনিস্ট যে সবাই হতে পারে না, তা-ও সম্প্রতি প্রমাণিত হয়ে গেছে। নিরীশ্বর হবে না, সমাজবাদী হবে না, বৈষম্যবাদীর গণতন্ত্রেও নেই মানবমুক্তি। কাজেই মন্দের ভালো হচ্ছে আপাতত রাষ্ট্রিক বা সরকারি সেক্যুলারিজম।

সংজ্ঞা দিয়ে সংস্কৃতি বোঝা-বোঝানো কঠিন। বরং অব্যক্ত অনুভব-উপলব্ধি সম্ভব ও সহজ। সংস্কৃতি হচ্ছে মন-মগজ-মনন-মনীষার প্রবহমান নতুন চেতনার ও নতুন চিন্তার ফুল, ফল ও ফসল। প্রয়োজন-চেতনা, সৌন্দর্যবুদ্ধি, সৌকর্য, উৎকর্ষ, স্বাচ্ছন্দ্য, সাচ্ছল্য সাধনের কাঙ্ক্ষা, জিজ্ঞাসা, সন্দেহ, আবিষ্কার-উদ্ভাবন-সৃজন প্রভৃতির স্পৃহারূপ মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ারই বহিঃপ্রকাশের নাম সংস্কৃতি। যা কিছু দেখতে, করতে, বলতে, শুনতে কুৎসিত, যা কিছু ন্যায়, রুচি ও সৌন্দর্যবোধ ও বিবেকবিরুদ্ধ, তা পরিহার করে চলাই সংস্কৃতিমানতা, সংস্কৃতিমান কখনো জেনে-বুঝে কারুর ক্ষতি করে না, করে না নিন্দনীয় বা গর্হিত কোন কর্ম, আত্মসম্মানচেতনা ও বিবেকই সংস্কৃতিমানের আত্মসংযমের পরমত ও পরকর্ম-আচরণ সহিষ্ণুতার এবং সৌজন্যের ভিত্তি ও উৎস।

এক কথায় বুকে-মুখে, মনে-মর্মে সততা ও নীতিচেতনাই সংস্কৃতিমানতার বাহ্য লক্ষণ। একটা অকপট সৌজন্যই সংস্কৃতির লাক্ষণিক রূপ, নাস্তিক নিরীশ্বর হয়ে মানুষকে জাত জন্ম বর্ণ ধর্ম ভাষা নিবাস যোগ্যতা অবিশেষে কেবল 'মানুষ' হিসাবে অকপটে গ্রহণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করা সম্ভব, কিন্তু তা মনুষ্যসমাজে স্বাভাবিক হতে আরো অনেক দেরি। বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও চিন্তা-চেতনা আরো গাঢ়, গভীর এবং ব্যাপক হলেই কেবল তা কোন এককালে সম্ভব হবে।

ইতোমধ্যে মানুষ কাড়াকাড়ি, মারামারি ও হানাহানি মাধ্যমে জেতার ও বাঁচার লড়াই করতে থাকাবে। আগেই বলেছি যেহেতু আস্তিক শাস্ত্রিক মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রণ করে শাস্ত্রিক বিধি-নিষেধ, সেহেতু তার আবর্তিত চিন্তা-চেতনায়, আচারে-আচরণে, কথায় ও কাজে তার শাস্ত্র প্রভাবিত বন্ধ্যা ভাব-চিন্তা-কর্ম ও আচরণই তার সংস্কৃতিরূপে প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় অভিব্যক্ত হয়। অতএব ঈশ্বর ও শাস্ত্রমানা আস্তিকের ধর্ম নিরপেক্ষ সংস্কৃতি থাকতেই পারে না। আজকাল প্রতীচ্য প্রভাবে আমরা ঘরে বাইরে চালে চলনে আচারে-আচরণে শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ যতটুকু জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে, কালের দাবি ও চাহিদা পূরণের জন্যে লঙ্ঘন বা উপেক্ষা করেছি বা করছি, আমাদের সংস্কৃতি কেবল ততটুকুই নতুনত্বে যুগোপযোগী হয়েছে মাত্র। সর্বপ্রকারে মানস মুক্তি না ঘটলে সংস্কৃতি কখনো নির্বর্ণ নিখাদ নিখুঁত মনুষ্যত্বপ্রসূ সর্বমানবিক রূপ লাভ করবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রগতির পন্থা

সংযম-সহিষ্ণুতা-সৌজন্য ও সাম্প্রদায়িকতা

গৌত্রিক দ্বেষ-দ্বন্দ্ব, কাড়াকাড়ি, মারামারি, হানাহানি সুপ্রাচীন। সংস্কৃতি-সভ্যতার ক্রমবিকাশে ও ধারায় যখন প্যাগান যুগ থেকেই জনবলে শক্তিমান রাজা নামে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করল, রাজ্য হল গৌত্রিক মানুষের অধিবাস। তখন তাদের মধ্যে সম্পর্ক-সম্বন্ধ মৈত্রীর সহযোগিতার হতেই হল সহাবস্থানের গরজে। রক্তে-বর্ণে-মনে-মতে-আচারে-লক্ষ্যে-সিদ্ধান্তে মানসিক স্বাতন্ত্র্য, পার্থক্য, বৈপরীত্য থেকে গেল বটে, তবে বৈষয়িক-ব্যবহারিক জীবনের প্রাত্যহিক প্রয়োজনে হাটে-বাটে-মাঠে এবং প্রশাসনিক নীতি-নিয়ম, প্রথা-পদ্ধতি মেনে সম ও সহস্বার্থে, সংযমে আর পরমত-পথ সহিষ্ণুতায় এবং পারস্পরিক লেনদেনে আস্থা-সৌজন্য ও বিশ্বস্ততা ছিল আবশ্যিক ও জরুরী। তবু এর মধ্যে ছিল ব্যতিক্রম। দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-সংঘাত ও ব্যক্তিক পারিবারিক, গৌষ্ঠিক, গৌত্রিক, বার্ণিক, ভাষিক, নৈবাসিক লাভ-লোভ-স্বার্থচেতনার ফলে কিংবা ধারণাগত মত-পথ-লক্ষ্য-সিদ্ধান্তের পার্থক্যভেদজনিত কারণে ছিল অপ্রতিরোধ্য। এভাবেই চলছিল জীবন, সমাজ, রাষ্ট্র, আজো এর ব্যতিক্রম দুর্লক্ষ্য। আজো বিবাদ বিরোধ দ্বেষ দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ সংঘাত অন্যান্য প্রাণীর মতো মনুষ্যজীবনেও অপরিহার্য।

স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের নানা অদৃশ্য অরি-মিত্র শক্তির দোহাই দিয়ে, নানা লৌকিক মঙ্গলামঙ্গল তত্ত্ব জানিয়ে বুঝিয়ে মানুষকে সংযত স্বভাবে ও আচরণে শান্তিপূর্ণ সহযোগিতায় সহাবস্থানের দেশনা দিয়েই চলেছেন কত নবী-অবতার-সাধু-সন্ত-ভিক্ষু-যাজক-শ্রমণ-শ্রাবক-মোল্লা-পুরোত ইহ-পরলোকের লাভ-ক্ষতির তালিকা দিয়ে। তবু পরের সম্পদ কাড়ার, পরের প্রাণ হানার, দুর্বলকে মারার প্রাণীসুলভ সহজাত বৃত্তি-প্রবৃত্তির নিবৃত্তি তো হয়ইনি, এমনকি প্রত্যাশিত মাত্রার সংযমের, সহিষ্ণুতার ও সৌজন্যের অনুশীলন হয়নি, হচ্ছে না। যদিও সংস্কৃতিমানতার ভিত্তিই হচ্ছে সংযম, সহিষ্ণুতা ও সৌজন্য।

জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-নিবাসগত স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্যচেতনা মানুষকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে রেখেছে। এসব কারণেও পৃথিবীতে প্রতি মুহূর্তে কোথাও না-কোথাও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষের রক্ত ঝরছে। মানুষ নিহত হচ্ছে, দাঙ্গা বাধছে, লড়াই চলছে, যুদ্ধ হচ্ছে। পরিবারে, পাড়ায়-মহল্লায়, হাটে-বাজারে, মাঠে-প্রান্তরে, ঘাটে-বাটে, বিবাদ-বিরোধ-সংঘর্ষ-সংঘাত, ঈর্ষা-অসূয়া-হিংসা-ঘৃণা-অবজ্ঞা-উপহাস প্রসূত বিচ্ছিন্নতার ব্যবধান সৃষ্টি হচ্ছে। একের ভিন্ন ধরনের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ অপরের মনে লাগে, মর্মে লাগে, আত্মসম্মানে লাগে। শান্তিতে সহযোগিতায় সহাবস্থানই জীবন-জীবিকা ক্ষেত্রে মানুষের বাঞ্ছিত ব্যবস্থা বলে উচ্চারিত হলেও মানুষের ব্যক্তিকে জীবনও নিরুপদ্রব-নিরাপদ থাকে না নিরবচ্ছিন্নভাবে। অবশ্য আমরা এও জানি, বুঝি ও মানি যে, স্বপ্রজাতির প্রাণীর মধ্যেও খাদ্যের অপ্রতুলতা থাকলে অর্থাৎ অঢেল অজস্র না হলে প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা জীবনের নিত্যসঙ্গী হয়ে থাকে, তখন কাড়াকাড়ি, মারামারি, ঠেলাঠেলি, হানাহানি এড়িয়ে চলা যায় না। বরং অবশ্যম্ভাবী আবশ্যিক ও জরুরী হয়ে ওঠে এবং পেশী প্রয়োগে তথা শারীরিক বলে, বুদ্ধির সূক্ষ্মতায় ও তীক্ষ্ণতায় যে বা যারা প্রবল সে বা তারা দুর্বলকে কাড়ে, মারে, তাড়ায়, হত্যা করে। পৃথিবীব্যাপী আজো এ নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ, প্রথা-পদ্ধতি লঘু-গুরুভাবে চলছেই। এ কারণেই সভ্য জনসমাজেও এ মুহূর্তেও জাতে-বর্ণে-ধর্মে-ভাষায়-নিবাসে-রক্তে-গোত্রে-গোষ্ঠীতে যারা উনজন বা সংখ্যালঘু, তারা শারীরিক, মানসিক ও আর্থিকভাবে অধিজন বা সংখ্যাগুরুদের হাতে পীড়িত, লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত হয়ই। আদর্শিক, সাংবিধানিক ও আইনগত প্রতিকার প্রতিরোধ ব্যবস্থা মুদ্রিত, উচ্চারিত ও বিঘোষিতভাবে পাশাপাশি আছে পৃথিবীর কোন কোন রাষ্ট্রে। কিন্তু মানা হয় কৃচিৎ কোথাও এবং প্রবলের দুর্বল-পীড়ন একটা প্রাবৃত্তিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং বাস্তববৈষম্য পারিবেশিক কারণগুলো অবিলুপ্ত থাকলে এ পীড়ন-শোষণ-বঞ্চনা-লাঞ্ছনা থেকে সংখ্যালঘুর মুক্তি সম্ভব হবে না, হয়নি, হচ্ছে না।

কার্লমার্কস একটা প্রতিকার-প্রতিরোধ তত্ত্ব উদ্ভাবন-আবিষ্কার করেছিলেন। সে-তত্ত্ব হচ্ছে Co-existence with Co-peration-স্বার্থে সহযোগিতায় সহাবস্থান। 'সাম্যবাদ' প্রতিষ্ঠা না পেলেও, সমাজবাদ বা সমাজতন্ত্র এর চাক্ষুষ সাক্ষ্য প্রমাণ। কম্যুনিস্টশাসিত অঞ্চলে অন্য অনেক কারণে ব্যক্তি বা দলপীড়ন ছিল। কিন্তু শাস্ত্রে-স্রষ্টায় আস্থা প্রচারে ও কর্মে-আচরণে প্রকাশ নিষিদ্ধ ছিল বলে, মানুষ নির্বিশেষের বেঁচে থাকার জন্মগত অধিকার এবং বাঁচিয়ে রাখার প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব রাষ্ট্রের বলে স্বীকৃত থাকায় আর বাস্তবে তার রূপায়ণ প্রায় আক্ষরিকভাবে প্রয়োগের প্রয়াস থাকায় জাত জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-নিবাস-যোগ্যতা নির্বিশেষে সবারই এক প্রকারের সমনাগরিক অধিকার ছিল। মানুষকে কেবল মানুষ, আবয়বিক মানুষ, মননপ্রজাতির মানুষ বলেই পঙ্গু-পাগল নির্বিশেষে তার প্রতি রাষ্ট্রিক দায়িত্ব কর্তব্য পালন ছিল বাধ্যতামূলক। ফলে এখানে অন্য ভেদচেতনা ছিল গুপ্ত, সুপ্ত কিংবা লুপ্ত। কাজেই সোভিয়েত রাশিয়ায় চীনে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা পীড়ন-শোষণ-বঞ্চনা-প্রতারণা ছিল না। নানা কারণে অবস্থার ও অবস্থানের পার্থক্য অবশ্যই ছিল। সোভিয়েত রাশিয়ার ভগ্নাংশগুলোতে তথা পূর্ব য়ুরোপে ও মধ্য এশিয়ায় আজ রক্তের, বর্ণের, গোত্রের স্বাতন্ত্র্যচেতনাজাত লড়াই বীভৎস নরহত্যার রূপ নিয়েছে। হিংস্রতা চরম আকারে যুদ্ধের ও হত্যার আর নারীলাঞ্ছনার রূপ নিয়েছে, নিয়েছে আদি ও আদিম দানবীয় রূপ। পৃথিবীর সব কয়টি মহাদেশের প্রায় সব কয়টি রাজ্যে চলছে, গুরু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছে ভিন্ন ধর্মের, ভিন্ন রক্তের, ভিন্ন রঙের, ভিন্ন অঞ্চলের, ভিন্ন ভাষার এমনকি ভিন্ন পেশার মানুষের মধ্যে রক্তক্ষরা প্রাণঘাতী সংঘর্ষ-সংঘাত, হিংসা-ঘৃণা।

কম্যুনিস্টশাসিত রাষ্ট্রে মানুষের এ স্বভাব প্রশমিত ছিল, এ হিংস্রতা গুহায়িত ছিল। আইন-মানা মানুষের জীবনে নিরুপদ্রব-নিরাপত্তা ছিল। মানুষে মানুষে সাম্য মহৎ প্রাবচনিক আপ্তবাক্যে, কেতাবী বাণীতে শাস্ত্রিক দেশনায় কিংবা মহৎ কবিতায় প্রতিষ্ঠিত হবে না। 'কালো আর ধলো বাইরে কেবল/ভিতরে সবার সমান রাঙা'/কিংবা 'চামড়ার নীচে লাল রক্ত বহমান ভাই। মানুষে মানুষে কোন ভেদ নাই'/ অথবা 'নানা বরণ গাভীরে ভাই একই বরণ দুধ/ জগৎ ভরমিয়া দেখিলাম একই মায়ের পুত।' প্রভৃতি হাজার হাজার মহৎতত্ত্ব, তথ্য ও সত্য ছড়িয়ে রয়েছে পৃথিবীর সর্বত্র। সবাই সবকথা জানে, কিন্তু মানে না। তাই সংকট-সমস্যা আদি ও আদিম পর্যায়ে রয়ে গেছে।

চারভাবে এ সমস্যার সমাধান অন্তত উপশম কিংবা বিরল করা সম্ভব বলে মনে হয়, এক. স্রষ্টামানা, শাস্ত্র না মানা আচারিক ও পার্বণিকভাবে। দুই. নিরীশ্বর হওয়া। তিন. সমাজবাদ বা সমাজতন্ত্র বরণ ও বাস্তবায়ন করা। চার. নিদেনপক্ষে আক্ষরিক অর্থে অর্থাৎ সংজ্ঞায় ও সংজ্ঞার্থে সরকার, শাসক-প্রশাসক তথা রাষ্ট্র সাংবিধানিকভাবে প্রাত্যহিক জীবনে, সমাজে ও রাষ্ট্রে সেক্যুলার থাকা। জানি প্রথম দুটো জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-প্রয়োগে অসমর্থ ও অনীহ ছাপোষা সাধারণ মানুষের আশৈশবলব্ধ-বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণার দুর্গের ফাঁকে-ফোকরেও প্রবেশপথ পাবে না। তৃতীয়টি সম্ভব ও শ্রেয়স্কর অবশ্যই, কিন্তু এ মুহূর্তে এর প্রতি অশ্রদ্ধা জনমনে প্রবল। অতএব চতুর্থ উপায় বা পন্থাটি গ্রহণ-বরণ করা আবশ্যিক মানবতার খাতিরে, মনুষ্যত্বের মর্যাদা রক্ষার প্রয়োজনে। পরিণামে অবশ্য সমাজতন্ত্রই গণমানুষ, সমাজ ও রাষ্ট্র টিকে থাকার উপায় বলে স্বীকৃত হবেই।

অবশ্য মানুষ প্রাণী হিসেবে কলহপ্রিয় থাকবেই। কেননা সেও ইন্দ্রিয়জ ষড়রিপুর তথা কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য মুক্ত হতে পারবেই না সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও। কেননা তারও থাকবে প্রতিবেশী-প্রতিদ্বন্দ্বী-প্রতিযোগী বহুল যৌথ বা সামাজিক জীবন। তবে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে-পরিবারে-পরিবারে, পাড়ায়-পাড়ায়, মহল্লায়-মহল্লায় নগণ্য উচ্চ-তুচ্ছ বিষয়ে দ্বেষ-দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ-সংঘাত, প্রতারণা-বঞ্চনাজাত রেষারেষি, জয়-পরাজয়, গ্লানি-গৌরব, লজ্জা-গর্ব, নিন্দা-তারিফ চেতনাও বিবাদ-বিরোধের কারণ হয়ে থাকবে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক কিংবা রাষ্ট্রিক দ্বেষ-দ্বন্দ্ব হচ্ছে একালে মানবিকতা, মানবতা ও মনুষ্যত্ববিরোধী বলে নিন্দিত এবং অবশ্য পরিহার্য বলে জনসমাজে বিবেচিত। একালে সরকার ও সৈনিকরা ছাড়া আর কেউ যুদ্ধের সমর্থক নয়। কাজেই আমরা জানি, বুঝি ও মানি যে, জাগতিক জীবনে ঝগড়া বিবাদের কারণ অসংখ্য এবং জগৎময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। সে-বিবাদ জীবনচেতনা থেকেই লাভ-লোভ-স্বার্থের প্ররোচনায় ঘটবেই। কিন্তু জাত জন্ম বর্ণ ধর্ম ভাষা নিবাস রক্ত আচার মতবাদ সম্পৃক্ত রাজনীতিক দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-সংঘাত, দাঙ্গা-লড়াই-যুদ্ধ একালে আমরা বুনো বর্বরতা বলেই জানি ও মানি। সংস্কৃতিমানদের এর থেকে বিরত থাকতে হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ কালের দাবি ঃ বৌদ্ধিক ও যৌক্তিক জীবন

প্রাণিজগতে বিভিন্ন প্রজাতির সম্পর্ক-সম্বন্ধ যেহেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রে খাদ্য-খাদকের কিংবা খাদ্য কাড়াকাড়ির, সেহেতু বিবাদ-বিরোধ-বিঘ্ন-ঈর্ষা-অসূয়া-হিংসা-ঘৃণা-সংঘর্ষ-সংঘাত অবশ্যই জীবন্ত প্রাণীর প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় প্রায় অপরিহার্যরূপে থাকে বিরাজমান। সব প্রাণীরই রয়েছে আহার-নিদ্রা-মৈথুনের প্রয়োজন। জীবে-উদ্ভিদে জীবনযাপনে অবশ্যই রয়েছে পদ্ধতিগত বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য। কাজেই নির্দ্বন্দ্ব-নির্বিঘ্ন-নিরুপদ্রব-নিরাপদ সহাবস্থানের জীবন এ তৎপর্যে অসম্ভব।

মানুষও তার খাদ্য সংগ্রহ করে জীব-উদ্ভিদ হত্যা করেই। তার ক্ষুধা-তৃষ্ণা রয়েছে, খাদ্য তার হাতের কাছে মেলে না, তা সংগ্রহ করতে হয়। সে-কারণেই প্রাচুর্যের অভাব ঘটলেই স্বপ্রজাতির তথা অন্য মানুষের সঙ্গে তার প্রতিযোগিতায়-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতে হয়, এভাবেই জীবন হয় কাড়াকাড়ি, মারামারি ও হানাহানি সংকুল ও বহুল। এতে তার বৃত্তি প্রবৃত্তি তথা ইন্দ্রিয়জ কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্যের প্রকাশ ও প্রয়োগ হয়ে ওঠে অপরিহার্য। আবার ভালো লাগা আর ভালোবাসা দুটোই হচ্ছে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের। ভালো লাগলেই ভালোবাসতে হয়। শত্রুকে যেমন দলন-দমন-পীড়ন-হনন করতে হয়, তেমনি ভালোলাগার ও ভালোবাসার জনকেও স্নেহে-মমতায় প্রীতিতে-প্রেমে-ত্যাগে-ক্ষমায় পালনে পোষণে তুষ্ট, তৃপ্ত, হৃষ্ট ও পুষ্ট করতে হয়। এজন্যেই দুটোতেই অরি দলনে-দমনে-হননে এবং মিত্রকে পালনে-পোষণে-আদরে আনন্দ-আরাম-সুখ পায় মানুষ।

আসলে মানুষের জীবনে জিগীষা ও জিঘাংসা– দুটোই সমভাবে প্রেরণার-প্রণোদনার প্ররোনার ও উত্তেজনার উৎস। অবস্থা ও অবস্থানগত কারণে সবসময়ে সর্বত্র তা প্রকাশ পায় না অবশ্য। যেমন রুগ্ন নিঃস্ব নিরন্ন দরিদ্র নির্বান্ধব মানুষে জিগীষাবৃত্তি থাকে সুপ্ত ও অদৃশ্য। কিন্তু অভাবগ্রস্ত বলে লাভ-লোভ-স্বার্থ প্রেরণায় তার জিঘাংসাবৃত্তিটা মাঝে মধ্যে লঘু-গুরুভাবে অদৃশ্যে কিংবা প্রকটভাবে ক্ষণকালের জন্যে হলেও জেগে ওঠে প্রায়ই নিষ্ক্রিয়ভাবে এবং কৃচিৎ সক্রিয়ভাবে।

পজিটিভ ও নেগেটিভ তারের দ্বান্দ্বিক মিলনেই যেমন তড়িৎ উৎপাদিত হয়, তেমনি জীব-উদ্ভিদ জীবনেও সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনা প্রভৃতির অনুভূতি-উপলব্ধি জাগে লাভ-লোভ-স্বার্থচেতনার প্রেরণায় প্রণোদনায় উত্তেজনায় প্ররোচনায়, ভালো লাগায়-ভালোবাসায় কিংবা দ্বেষ-দ্বন্দ্বের ক্ষোভে ক্রোধে ও প্রতিহিংসার জ্বালায়। মানুষের ক্ষুৎপিপাসা রয়েছে, রয়েছে নানা মানসিক, শারীরিক ও ব্যবহারিক চাওয়া-পাওয়া। শ্রম, সময়, প্রয়াস, প্রযত্ন এবং ক্ষেত্রবিশেষে প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা ব্যতীত কোন লোকেরই জীবনের চাহিদা মেটে না সাধারণত। কাজেই জীবনে দ্বেষ-দ্বন্দ্ব আছে, আছে প্রেম-প্রীতি-স্নেহ-ভালোবাসা। আছে শত্রু, আছে মিত্র। তাই শংকা-ত্রাস যেমন আছে, তেমনি আছে বিশ্বাসের, ভরসার ও নির্ভরতার পাত্র। এ-ই জীবন। কাজেই পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে সর্বত্রই দ্বন্দ্ব-মিলনের, লাভ-ক্ষতির, জয়-পরাজয়ের, হিংসা-প্রীতির, গ্লানি-গৌরবের, নিন্দা-তারিফের স্নিগ্ধ কিংবা বীভৎসলীলা চলছেই, চলবেই। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কখনো নিস্তরঙ্গ নিয়মের রাজত্ব হয়ে উঠবে না। কেননা মানুষ লাভ-লোভ-স্বার্থ চাহিদা মুক্ত হবে না কখনো কোথাও, কাজেই নানা কারণে ইন্দ্রিয়জ প্রেরণায় প্ররোচনায় কাড়া-মারা-হানার ঘটনা লঘু-গুরুভাবে ঘটবেই। সংস্কৃতি-সভ্যতার, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির, মনন-মনীষার আজকের স্তরের বিকাশও সবচেয়ে ধনী, মানী ও শিক্ষা-সৃষ্টি-মনন-মনীষাঋদ্ধ পরম সংস্কৃতিমান সমাজকে ও রাষ্ট্রকে আজো বুনো বর্বরযুগের ক্ষোভ-ক্রোধ-হিংসা-ক্রূরতা-জিঘাংসামুক্ত করতে পারেনি, আজো সভ্যতম ও সংস্কৃতিমান সৃষ্টিশীল মননশীল এবং মনীষা-মনস্বিতাগর্বী সমাজকে ও রাষ্ট্রকে যুদ্ধে বিরাগী ও হননে অনীহ করতে পারেনি। দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-সংঘাত-লড়াই-যুদ্ধ লেগেই আছে পৃথিবীর নানা জায়গায়। একে বলা চলে হনন-উৎসব। কেননা যে-পক্ষ যত বেশি হনন করতে পারে, সে-পক্ষই নরঘাতী বলে নিন্দিত হয় না-বিজয়ী বলে নন্দিত হয়। এ তাৎপর্যে আমরা যথার্থই প্রাণীই রয়ে গেছি। মনুষ্যত্ব-মানবতা গুণে 'মানুষ' নামের উচ্চতর প্রাণী প্রজাতি হয়ে উঠিনি।

রোগ হওয়া আর মহামারী দেখা দেয়া যেমন এক কারণের ও অভিন্ন অবস্থার নয়, তেমনি মানুষের মধ্যে দ্বেষ-দ্বন্দ্ব, প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকা, লাভ-লোভ-স্বার্থচেতনা থাকা, ষড়রিপুর প্রভাব থাকা আর আদি ও আদিম জাঙ্গলিক ও গাড্ডলিক জীবনে গতানুগতিকভাবে আবর্তিত জীবনে অভ্যস্ত থাকা এককথা নয়। মন-মনন-মনীষার অনুশীলনে-সংস্কৃতির বিকাশে অন্যায়কে অসুন্দরকে পরিহারে সৃষ্টিশীলতায়, আবিষ্কারে উদ্ভাবনে সযত্ন প্রয়াস চালিয়ে মানুষ জ্ঞানী হয়েছে, অজ্ঞতা ঘুচিয়েছে নানা ভাবে। যন্ত্রে-প্রকৌশল-প্রযুক্তিতে বিস্ময়কর উন্নতি করেছে, নতুন চেতনার ও চিন্তায় পাল্টেও দিয়েছে বিস্ময়-কল্পনা-ভয়-ভক্তি-ভরসাপ্রসূত নানা বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা। অলীক অলৌকিকতামুক্ত জীবনে এসেছে প্রমাণসিদ্ধ ও প্রমাণসম্ভব জ্ঞান এবং বিজ্ঞানলব্ধ নানা আবিষ্ক্রিয়া ও উদ্ভাবন জীবনে এনেছে সাচ্ছল্য, স্বাচ্ছন্দ্য, সৌকর্য, সৌন্দর্য। শ্রম ও সময় ব্যয়ে এনেছে পরিমিতি। বলতে গেলে ডারউইন, কার্লমার্কস, ফ্রয়েড, আইনস্টাইন প্রমুখ মানুষের মনোজগতেও ঘটিয়েছেন বিপ্লব। মানুষকে প্রবুদ্ধ ও উদ্বুদ্ধ করেছেন যৌক্তিক ও বৌদ্ধিক জীবন যাপনে। কিন্তু দুনিয়ার অধিকাংশ বলতে গেলে প্রায় হাজারে নয়শ' নিরানব্বইজন মানুষ জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি প্রয়োগে অজ্ঞতা-অনক্ষরতার দরুন অসমর্থ, আর যারা তথাকথিত লেখাপড়া জানা লোক, তারা আশৈশবলব্ধ ও লালিত বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা চালিত যান্ত্রিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত ও স্বস্থ। তাই অধিকসংখ্যক মানুষ এ সময়ে জীবিত থেকেও মননরিক্ত যুক্তিভীরু বলেই যুক্তির যুগে বাস করে না সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে। অথচ জীবিকাক্ষেত্রে মানুষ বুদ্ধিকে ধূর্ততায় পরিণত করে, মেধা-মগজ জাগ্রত মুহূর্তগুলোতে লাভ-লোভ-স্বার্থগত সাফল্যের ও উন্নতির লক্ষ্যেই নিয়োজিত রাখে। তাই আমাদের কোন সমস্যারই–গৌত্রিক-সাম্প্রদায়িক, বার্ণিক, ভাষিক, নৈবাসিক সমস্যার সমাধাণ মেলে না। শিক্ষিত ও সংস্কৃতিমান হয়ে আমরা যদি যৌক্তিক ও বৌদ্ধিক জীবন অঙ্গীকার করি, তাহলেই কেবল পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে সর্ব ব্যাপারে ও সর্বক্ষেত্রে ব্যক্তিক জীবনে একটি পরিশীলিত রুচি, ন্যায়নিষ্ঠা, সংযম, পরমতসহিষ্ণুতা, সৌজন্য, সম ও সহস্বার্থে সংযমে স্বাধিকারের সীমায় থাকা সম্ভব ও স্বাভাবিক হবে। এককথায় আমাদের আধুনিক তথা যুক্তির যুগে উন্নীত হতে হবে। তাহলেই কেবল আমাদের গোষ্ঠী, গোত্র, সম্প্রদায়, জাতি, ভাষা, নিবাস বিষয়ক স্বাতন্ত্র্যচেতনা ও চিত্তের সংকীর্ণতা ঘুচবে। তখনই কেবল আমরা মানুষকে মানুষ বলেই জানব, জাতে-জন্মে-বর্ণে-ধর্মে-ভাষায়-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিবাসে-বিদ্যায়-বিত্তে-বৃত্তিতে চিহ্নিত করে বিভেদের ব্যবধান ঘোচাতে পারব, 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।' -এ তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য অনুভব-উপলব্ধি করতে পারব।

আমরা তখনই কেবল সংস্কৃতিমান হব, সুজন হব–আমাদের উপর লোকে ভরসা করবে, নির্ভর করবে, আস্থা রাখবে, হিংস্র-স্বার্থবাজ-জিঘাংসু বলে কেউ ভয় ও ঘৃণা করবে না। জ্ঞান বুদ্ধি যুক্তি মানুষকে ন্যায়সচেতন নীতিনিষ্ঠ বিবেকবান করে-এমনি মানুষই কেবল যৌক্তিক ও বৌদ্ধিক জীবনযাপন করতে পারে, –এর নামই মনুষ্যত্ব, মানবতা কিংবা সৌজন্য। য়ুরোপে কোথাও কোথাও সমাজে এমনি মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের মধ্যে অর্থাৎ তৃতীয় বিশ্বের বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা চালিত সমাজে এমনি লোক ক্বচিৎ দেখা যায়-তাই বিরলতায় দুর্লক্ষ্য। এমনকি বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণার বন্ধনে বৃত্তাবদ্ধ বলে আমাদের সাধু-সন্ন্যাসী-সন্ত-শ্রমণ-ভিক্ষু-যাজক-ফকির-দরবেশ-মোল্লা-পুরোতরাও স্বসমাজনিষ্ঠ। উদার মানবতার মাহাত্ম্য ও আবশ্যিকতা তাঁদেরও ধারণাতীত বলেই মনে হয়। অবশ্য ব্যতিক্রম এখানে আলোচ্য নয়। জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তির অনুশীলন শিক্ষিত সজ্জনের পক্ষে মানব হিতার্থেই আবশ্যিক। পৃথিবীর বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা চালিত শাস্ত্রে আস্থাবান লোকেরা জানে ও মানে যে অতীতের জ্ঞানী-গুণী-মহাপুরুষেরা যা জানতেন, বুঝতেন ও মানতেন, তাতে কোন ভুলত্রুটি ছিল না। একালেও সবাই জানে না বুঝে না বলেই অতীতের বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণাকে অলীক-অলৌকিক বলে মনে করে না। অপৌরুষেয় বা আসমানী সত্যে একালের য়ুরোপীয় বিদ্যাপ্রভাবিত লোকে আস্থা হারায়। এ ভয়েই তৃতীয় বিশ্বের অজ্ঞ-অনক্ষর ব্যক্তিরাই নয় শুধু, শিক্ষিত শাস্ত্রানুরাগী, শাস্ত্রের অনুগামী ও শাস্ত্রের অনুগত জনগণও কম্যুনিজমকে, উদারনৈতিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে, নতুন চেতনাকে, নতুন চিন্তাকে, বিজ্ঞানীর আবিষ্কৃত প্রমাণিত, প্রমাণসম্ভব, প্রমাণযোগ্য তত্ত্বকে, তথ্যকে ও সত্যকে শাস্ত্রীয় চিরন্তন সত্যবিরোধী বলে অবজ্ঞা ও অবিশ্বাস করে। এরা বিজ্ঞানভীরু, বিজ্ঞানচর্চা বিরোধী, উদারগ্রহণশীলতার বিপক্ষে, শাস্ত্রদ্রোহী বলে সমাজবাদ বা সাম্যবাদ এদের কাছে ঘৃণ্য, বিভিন্ন বিষয়ক জ্ঞান ও দর্শন চর্চাও এদের অনভিপ্রেত। কেননা সর্বপ্রকার সংকটমুক্তির পন্থা নির্দেশক, চিরন্তন সত্যের ও জীবনযাপন পদ্ধতির অতুল্য আকর শাস্ত্র আঁকড়ে থাকলে জীবনের কোন সংকট-সমস্যা থাকতেই পারে না, –এ ধারণা এদের আজো বদ্ধমূল। তাই তৃতীয় বিশ্বে শাস্ত্রানুগত নয় তেমন জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিদ্যা-চিন্তা-চেতনা অনেকের কাছেই অসহ্য। এদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে যুক্তিবাদী, প্রত্যক্ষবাদী, প্রকৃতিবাদী কিংবা উদার পরমত সহিষ্ণু সংযত ও সুজন করার চেষ্টা করতে হবে দেশের-রাষ্ট্রের-সমাজের ও মানুষের উন্নতি ও কল্যাণ লক্ষ্যে। হতাশ হবার কিছু নেই। এরা বিজ্ঞানভীরু কিন্তু যন্ত্র ও প্রযুক্তিপ্রিয়, য়ুরোপীয় চিকিৎসা শাস্ত্র এদের বল-ভরসা যোগায়। কেবল এদের মন-মননের অর্গল খুলে যুক্তিকে প্রবেশপথ দিলে মগজে, পৃথিবীর মানুষ রক্ষণশীলতা, স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা, সাম্প্রদায়িকতা পরিহার করে বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক জীবন ও সমাজচেতনায় প্রবুদ্ধ হবে, মানুষকে জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-নিবাস নির্বিশেষে কেবল মানুষরূপে বরণ করতে পারবে। তখন বিবাদ-বিরোধ-দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ প্রভৃতি কমবে এবং ক্ষণস্থায়ী হবে। কিন্তু তার আগে ছাড়তে হবে অতীতমুখিতা, রক্ষণশীলতা, আবাল্যলব্ধ বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা। জ্ঞান-বিজ্ঞান-যন্ত্র-প্রযুক্তিপ্রীতিতে নয় কেবল, জাগতিক জীবনে গুরুত্ব দিতে হবে গ্রহণশীলতায়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৃষ্টিশীলতায়, আবিষ্কারে-উদ্ভাবনে, নতুন চেতনার, নতুন চিন্তার, নতুনতর সমাজ ব্যবস্থার আদর কদর করার জন্যে মন-মনন খোলা রাখতে হবে। জিগীষা ও জিঘাংসার সঙ্গে জিজ্ঞাসা যুক্ত করতে হবে, হতে হবে বিজ্ঞান-যন্ত্র-প্রযুক্তিমনস্ক। পুঁজি-পাথেয় হবে জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি ও বিবেক।

মডার্নিজম, র‍্যাশানালিজম, লিবারেলিজম ও সোসিয়ালিজম

এ যুগে একজন প্রত্যাশিত যোগ্যতার সমাজ-সদস্যের চারটি বিষয়ে অনুরাগ থাকা আবশ্যিক। অন্য কথায় কালোপযোগী মন-মনন-রুচি-সংস্কৃতিসম্পন্ন সুনাগরিক হতে হলে একজন ব্যক্তিকে আধুনিকতার, উদার গ্রহণশীলতার, যুক্তিবাদিতার ও সমাজবাদের অনুরাগী, অনুগামী ও অনুগত হতে হবে। একালে ব্যক্তির, পরিবারের, সমাজের ও রাষ্ট্রের কল্যাণ নিহিত রয়েছে এমনি স্বকালের, স্বদেশের, স্বজীবনের, স্বসমাজের ও স্বরাষ্ট্রের বর্তমান প্রয়োজন চেতনার ও ভবিষ্যৎ গতির অনুধ্যানের মধ্যেই। নতুন চেতনায়, নতুন চিন্তায় এবং নতুনভাবে উদ্ভূত সংকট-সমস্যার সতর্ক সযত্ন সপ্রয়াস সমাধান উপায় উদ্ভাবন যোগ্যতাই হচ্ছে একালে সচেতন মানব সমাজে সম ও সহ স্বার্থে, সংযমে, সহিষ্ণুতায়, সৌজন্যে, সামবায়িক সহযোগিতায় সহাবস্থানের পন্থা। 'Modernism' অর্থে আমরা প্রকৃতির ও বিজ্ঞানের তত্ত্বের, তথ্যের ও সত্যের প্রতি আস্থা, যত্রতত্র প্রকৌশল-প্রযুক্তি প্রিয়তা এবং যে-কোন নতুন চেতনাপ্রসূন চিন্তাকে কল্যাণকর বরে প্রগতি-প্রগ্রসরতা বলে মেনে নেয়া বুঝি।

Rationalism অর্থে আমরা জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-ন্যায়ানুগত্যই বুঝব এবং একে বাঙলায় যুক্তিবাদিতার ও যুক্তিনিষ্ঠার জীবনে বাস্তবায়ন প্রয়াস বলে মানব। Liberalism মানে যা কিছু যুক্তিগ্রাহ্য ও কল্যাণকর বলে অন্য লোকে করতে, বলতে, শুনতে চায়, তা নিজের পছন্দসই না হলেও সংযমে, সহিষ্ণুতায় ও সৌজন্যে ব্যক্তির অধিকার বলে মেনে নেয়া। আর Socialism অর্থে আমরা রাষ্ট্রবাসী মাত্রেরই খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার মতো কাজ ও ব্যবস্থাই বুঝি এবং এ দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে সরকারের তথা রাষ্ট্রের।

অতএব Modernism, Rationalism, Liberalism ও Socialism ছাড়া একালের মানব-সমাজ স্বস্থ ও সুস্থ থাকতেই পারে না। মানসিক, শারীরিক ও আর্থিক জীবনের স্বাস্থ্য, সাচ্ছল্য, স্বাচ্ছন্দ্য, সৌকর্য, উৎকর্ষ তথা সুখ-শান্তি-আনন্দ-আরাম, নির্বিরোধ, নির্বিবাদ, নির্বিঘ্ন, নিরুপদ্রব, নিরাপদ পরিবেশ উপর্যুক্ত শর্তের উপস্থিতি ব্যতীত কখনো সম্ভব হতে পারে না। বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা পরিহারে বিজ্ঞানের তত্ত্ব-তথ্য-সত্যনির্ভর হলে, জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-বিবেকনিষ্ঠ হলে, পরমত, পরপথ, পর আচার-আচরণ সহিষ্ণু হলে, বিজ্ঞানবাদে, প্রকৃতিবাদে ও যুক্তিবাদে আস্থা দৃঢ় হলে আর ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে ন্যায্যতার অনুরাগী, অনুগামী ও অনুগত থাকলে একজন মানুষ যথার্থ তাৎপর্যেই মনুষ্যত্ব সম্পন্ন হয়, হয় সাধারণ অর্থে সংস্কৃতিমান ভালোমানুষ [ভদ্র লোক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নয়। যে জেনে বুঝে লাভে লোভে স্বার্থে কখনো স্বাধিকারের সীমা লঙ্ঘন করে না। আত্মসত্তার মূল্য ও মর্যাদার গুরুত্ব বোঝে বলেই, সে নিজেকে অন্যের চোখে ছোট করতে পারেই না। সে অসহায় অসমর্থ বিপন্ন মানুষমাত্রেরই অভয় শরণ ভালো মানুষ, দুঃস্থ মানুষমাত্রই তার কাছে নিরাপদ, তার কাছে পায় আদর কদর, আশ্রয় এমনকি প্রশ্রয়ও। এক কথায় Modernism, Rationalism, Liberalism Socialism হচ্ছে সংস্কৃতির দেহ-প্রাণ-মন-মগজ। অন্য কথায় সংস্কৃতিচর্চার ও সংস্কৃতিমানতার বীজ-বৃক্ষ-ফল হচ্ছে উপর্যুক্ত চারটি তত্ত্ব। বিজ্ঞানের ও যুক্তির চর্যায় ও চর্চাতেই রয়েছে এসব গুণ আয়ত্ত করার সহজ পন্থা।

মানসমুক্তি নিহিত বিজ্ঞানের তথ্যে আস্থায় আর যুক্তিনিষ্ঠায়

একালে বিজ্ঞরা ও বিজ্ঞানীরা মানে যে বিস্ময়-কল্পনা-অনুমান-আন্দাজই হচ্ছে বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণার ভিত্তি। কোনটাই পরীক্ষণ-পর্যবেক্ষণ, নিরীক্ষণ কিংবা সমীক্ষণের ফল নয়। অধিকাংশ বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণার উৎস হচ্ছে প্রাতিভাসিক ও আনুমানিক সত্যকল্প, সাক্ষ্যনির্ভর। অনেকটা কাকতালীয় কিংবা 'অন্ধ-হস্তীন্যায়' নির্ভর। কেননা বস্তুগত প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ প্রমাণসম্ভব, প্রমাণসাধ্য এবং যান্ত্রিক-রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রমাণিত না হলে কিছুতেই কোন তত্ত্বেই, তথ্যেই, সত্যেই আস্থা রাখা নির্মোহ যুক্তিবাদীর কিংবা বিজ্ঞানীর পক্ষে সম্ভব হয় না। লৌকিক-সামাজিক যৌথজীবনে আচারে-আচরণে মেনে চললেও মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সন্দেহ-সংশয় ঘোচে না।

আগেরকালের জিজ্ঞাসুরা নানা অসুবিধে এবং যান্ত্রিক সহায়তার অভাব সত্ত্বেও জ্যোতির্বিজ্ঞানে জ্ঞানের সঞ্চয় কিছুটা বৃদ্ধি করেছিলেন, যেমন ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা 'নবগ্রহের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করেছিলেন। অণুর ধারণাও গ্রীসে-ভারতে অন্তত আড়াই হাজার বছর আগেই চালু হয়ে গিয়েছিল।

আজকের ধনী য়ুরোপীয় রাষ্ট্রে ও আমেরিকায়-রাশিয়ায় গবেষকরা জল, স্থল, নভ, জীব-উদ্ভিদ, সমুদ্র-পর্বত-অরণ্য সম্বন্ধে নানা নতুন নতুন তথ্য ও সত্য প্রায় নিত্যই আবিষ্কার করছেন। মাটির গভীরে, আকাশের বিস্তারে, সমুদ্রের গহীনে যা কিছু সুপ্ত, গুপ্ত ও লুপ্ত রয়েছে, তা আজ উদঘাটন করছেন বিজ্ঞানীরা শ্রম-সময় ব্যয় করে। জীবনের ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগ থেকে নিজেদের বঞ্চিত করে, জীবন বিপন্ন করে, সংকল্পে অটল থেকে দেহ-প্রাণ-আয়ু দান অঙ্গীকার করে আমাদের বিশ্ব জগতের তত্ত্ব, তথ্য, সত্য আবিষ্কার করছেন, উদ্ভাবন করছেন নানা যন্ত্র, নিরূপণ করছেন নানা রোগতত্ত্ব, চিকিৎসা পদ্ধতি, তৈরি করছেন প্রতিষেধক।

এখন বিজ্ঞানীরা আমাদের শোনা বিশ্বসৃষ্টি তত্ত্ব বাতিল করে দিয়েছেন। তারা বলেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গড়ে উঠেছে এক মহাবিস্ফোরণের ফলে। বিস্ফোরণের এক সেকেন্ডের একশ'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাগের এক ভাগ সময়ে তৈরি হল হাইড্রোজেন, ডিউটেরিয়াম, হিলিয়াম এবং লিথিয়াম। এবং নভ বা আকাশ বলি যাকে, তা ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে, স্ফীত হয়ে চলেছে, এ বিস্ফোরণের নাম Bigbang। তখন তাপ ছিল প্রচণ্ড, ক্রমশ তা কমেছে, কমছে। মূলে ছিল Electron Niutrino এবং Quark নামের তিন মূল উপাদান। Quark থেকে গড়ে উঠেছে Proton ও Neutron এসব কথা আমরা অজ্ঞরা ইদানীং শুনছি, সব কথা বুঝি না বিজ্ঞানে একবারে আনাড়ি অজ্ঞ বলেই। তাই বলে এঁদের আবিষ্কার অস্বীকার করব কোন যুক্তিতে, পৃথিবী থেকে পাঁচশ আলোক বছরের দূরত্বে রয়েছে এখনো অনেক তারা। বিস্মিত হই, অবাক হই, কিন্তু মনে সংশয় জাগে না, আস্থা রাখি বিজ্ঞানীর ও বিজ্ঞানের উপর। দেড়-দুই হাজার কোটি বছর আগে স্বতঃস্ফূর্ত এবং আকস্মিকভাবে বিস্ফোরণের মাধ্যমে গড়ে ওঠে এ জগৎ-বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। আর আধুনিক মানুষের প্রথম উন্মেষ হোমোইরেকটাস নামে শুরু হয় দশ/বারো লাখ বছর আগে। আর আমাদের পূর্ব প্রজন্মের প্রথম রূপ মেলে লাখ খানেক বছর আগে, যাকে আমরা বলি হোমোসেপিয়ান।

এখনতো ওজোন সমস্যা, ব্ল্যাকহোল, গ্রীনহাউজ প্রভৃতি নানা তত্ত্ব ও তথ্য নিত্য আলোচিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ষোল-সতেরো কোটি বছর আগে নাকি পৃথিবীতে ছিল একটি ভূখণ্ড মাত্র। তা-ই হঠাৎ এক প্রচণ্ড কম্পনে কিংবা প্রাকৃতিক ঝাঁকানিতে টুকরো টুকরো হয়ে এখনকার পাঁচ মহাদেশরূপে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে। তাছাড়া ডারউইন-(১৮০৯-৮২) উক্ত বিবর্তনবাদে তো আমরা যুক্তমনের বিজ্ঞানমনস্ক মানুষেরা আস্থা রাখিই। সূর্যের সঙ্গে তার গ্রহ-উপগ্রহের বস্তুবদ্ধতার মূলে রয়েছে নাকি সেই নিউটন আবিষ্কৃত এবং অ্যালবার্ট আইনস্টাইন ব্যাখ্যাত General Theory of Relativity-এর বাংলা নাম মাধ্যকর্ষণ তত্ত্ব। তাছাড়া সূর্যের নৈকট্য ও দূরত্ব অনুসারে ভৌগোলিক অবস্থা-অবস্থানগত জীব-উদ্ভিদ-তাপ-জল-বায়ু-মাটিগত পার্থক্য ও বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়। কাজেই প্রকৃতির মধ্যে চলে ব্যাখ্যা ও প্রমাণসম্ভব নিয়মের রাজত্ব। এ প্রকৃতির নিয়মে সর্বত্র তাই বৈচিত্র্যেও ঐক্য আবিষ্কার করা চলে, অর্থাৎ এতে ব্যতিক্রম দুর্লক্ষ্য। 'নিয়মে চলিছে নিখিল জগৎ/নিয়মে ফুটিছে ফুল/ঝড় শুধু আসে ক্ষণিকের তরে, সৃজনের এক ভুল।' আসলে ঝড়ও নিয়মেরই আর একরূপ। আজ মানুষ স্থলের পিঁপড়ে থেকে হাতি, জলে জ্যালি থেকে তিমি, তৃণ থেকে মহীরুহ অবধি সব জীব-উদ্ভিদের জীবনতত্ত্ব আবিষ্কার করেছে, করছে ও করবে। সন্ধিৎসু ও জিজ্ঞাসু মানুষের দৈহিক শক্তি যেমন বিচিত্র ও বিস্ময়ের, মানসিক শক্তিও তেমনি মনে হয় অশেষ। নিত্য আবিষ্কারে আমরা চমকিত। দেহস্থ 'জিন বা কোষের উন্মেষ, বিকাশ ও বিনাশ তত্ত্ব তো এ সেদিন অবধি কারুর জানা ছিল না। চিকিৎসা ছিল না যক্ষ্মা, কলেরা, বসন্ত, হৃদরোগ প্রভৃতির। আজ অস্ত্রোপচারে দেশের সর্বত্র প্রায় সব রোগের উৎস এ দেহের মেরামত, জোড়াতালি, বর্জন-সংযোজন সম্ভব হচ্ছে। এসব তো আগে ছিল স্বপ্নের ও সাধের বিষয়, আজ বাস্তবে প্রযোজ্য হয়ে উঠেছে। আমাদের বিশ্বাসের তিনটি দেবতার অপমৃত্যু ঘটেছে আমাদের চোখের সামনেই, আমাদের জীবনেই ওলাদেবীর শীতাদেবীর ও ষষ্ঠীদেবীর। আজ বিভিন্ন শাস্ত্রের অনেক অরি-মিত্র শক্তিই হাওয়া হয়ে পালিয়েছে, লুপ্ত হয়ে গেছে বিজ্ঞ-বিজ্ঞানীর ও যুক্তিবাদীর জীবন ও জগৎ থেকে। যেমন জীন-পরীর-ভূত-প্রেতের প্রভাব তাড়ানো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাবিজ-কবচ-ঝাড়ফুঁক। সূতিকা ও হিস্টিরিয়া এখন আর ভৌতিক নয়-রক্তশূন্যতা ও মানসিক ব্যাপার। আমরা বিজ্ঞানীর আবিষ্কৃত ও অনুমিত তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য যা শুনি, জানি ও বুঝি তার সবটা অবশ্য আজো পূর্ণতা পায়নি, সংশয়, সন্দেহ, জিজ্ঞাসা, সন্ধিৎসাও শেষ হয়নি। প্রকৃতি জগতের রহস্য মনে হয় অনন্ত, বিজ্ঞানীর জিজ্ঞাসাও অশেষ। ঘরে বসে কাগজে-কলমে হিসেব করেই এ মনুষ্যমগজ বলে দিতে পারে চাঁদের স্থিতি কত দূরে। মানুষের মগজী শক্তির অনুশীলনে তৈরি করতে পারে না, পারবে না হেন যন্ত্র নেই। হেন চিন্তা-চেতনা-কর্ম-অনুভব-উপলব্ধিও নেই, যা তার আয়ত্তের বাইরে থাকবে। কিন্তু যারা জ্ঞানের সঙ্গে বুদ্ধির ও প্রজ্ঞার, কারণ-কার্যের সঙ্গে যুক্তির প্রয়োগে, প্রকৃতির নিয়মের সঙ্গে সূর্যের নৈকট্য-দূরত্বজাত ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুতের ভূমিকা বিশ্লেষণে নারাজ, 'অনেকান্ত' বাদে আস্থাহীন, তারা বিজ্ঞানে বিদ্বান হয়েও যৌক্তিক-বৌদ্ধিক জীবনযাপনে, জগৎকে ও জীবনকে সামগ্রিক, সামূহিক ও সামষ্টিকভাবে প্রত্যক্ষ করতে অসমর্থ থাকে। তেমন বিজ্ঞানবিদ বিজ্ঞান পড়ে, শেখে, জানে কিন্তু বৈশ্বিক নিয়মের পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তি প্রয়োগে বুঝতে অসমর্থ। তারা আজো অজ্ঞতার যুগের শাস্ত্রে, অরি-মিত্র শক্তির প্রতীকে, ইহ-পরলোকে প্রসূত জীবনে আর আত্মার অস্তিত্বে ও পরিণামে গভীর আস্থা রাখে। ফলে জাগতিক প্রতিবেশের সীমায় মন-মগজ-মনন সীমিত রাখে না। তারা তাদের মনোজগতে লৌকিক অলৌকিক অলীক বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা দুর্ভেদ্য দুর্গে সুরক্ষিত রাখে এবং তাদের জীবন ও জীবনাচার চালিত হয় ওই অজাগতিক অলৌকিক ও অলীক শক্তির অনুরাগে, অনুগামিতায় ও আনুগত্যে, যা তারা শৈশব থেকেই পারিবারিক, সামাজিক ও শাস্ত্রিক প্রভাবেই উত্তরাধিকারসূত্রে তথা মগজধোলাই সূত্রে পেয়ে থাকে। এর ফলে বিজ্ঞান-প্রযুক্তিকুশল হয়েও যারা কেবল যন্ত্রী ও যান্ত্রিক মনেরই থেকে যায়, যৌক্তিক ও বৌদ্ধিক জীবনযাপনের জন্যে যে বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণামুক্তি আবশ্যিক, তা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা হচ্ছে অনুমানপ্রসূত। বুদ্ধির সঙ্গে জ্ঞান-প্রজ্ঞার যোগে, কার্য-কারণ তত্ত্বের সঙ্গে সচেতন যুক্তিবাদিতার প্রয়োগে, শক্তির সঙ্গে সাহসের সংযোগেই কেবল যুক্তিবাদী, প্রকৃতিবাদী জাগতিক তথা মর্ত্যজীবনবাদী মানুষের সংখ্যা সমাজে বাড়তে থাকবে। আন্দাজে অনুমানে ভয়ে-ভক্তিতে-ভরসায় বিস্ময়ে-বিশ্বাসে যে সংস্কার ও ধারণা ব্যক্তির জগৎ ও জীবনচেতনায় ও জীবনাচারে বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে, যা নানা পরিবর্তনে, পরিমার্জনে, পরিশোধনে, পরিবর্ধনে, আবর্তনে ও বিবর্তনে জগতের বিভিন্ন কালিক, স্থানিক, গৌত্রিক রূপ নিয়ে বৈচিত্র্য, বিভিন্নতা, সাদৃশ্য ও বৈপরীত্য নিয়ে 'শাস্ত্র নামে টিকে রয়েছে, তা বিজ্ঞান আবিষ্কৃত-উদ্ভাবিত তত্ত্বের, তথ্যের ও সত্যের সঙ্গে মেলে না। ফলে যে-দেশে শিক্ষার হার যত বেশি, সেদেশে শাস্ত্রের প্রভাব লোকজীবনে ততই কমে যাচ্ছে, নিরীশ্বর নাস্তিক্যের সংখ্যাও ততই বাড়ছে। অতএব এ যুগ মর্ত্যজাগতিকতার যুগ, বিজ্ঞানে আস্থা ও ভরসা রাখার যুগ, প্রকৃতিবাদিতা ও যুক্তিবাদিতার যুগ। যৌক্তিক-বৌদ্ধিক-পরমত আচার-সহিষ্ণুতার, সংযমের, স্বাধিকারে স্থির থাকার এবং সম ও সহস্বার্থে সামবায়িক সহযোগিতায়, সহাবস্থানের যুগ, 'মানুষ' নামে প্রাণীপ্রজাতিরূপে পরিচিত হবার যুগ। জীবনকে ভোগ-উপভোগ ও সম্ভোগ করার যুগ। কাড়া-মারা-হানা পরিহারের যুগ, সৃষ্টির প্রয়াস-প্রযত্নের যুগ। বিজ্ঞান যদি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুমানভিত্তিক শাস্ত্রে আস্থা বিনষ্ট করতে পারে, তাহলে বিজ্ঞান মানুষকে করবে প্রতিবাদী ও যুক্তিনিষ্ঠ। তখন মানুষের মধ্যেকার শাস্ত্রিক বৈর ব্যবধান হবে বিলুপ্ত। কেননা To know all is to pardon all. মানুষে মানুষে মিলন-ময়দান তৈরি হবে সহজেই, মানবিক গুণের, ন্যায্যতার, সহিষ্ণুতার, সংযমের, সৌজন্যের, স্বাধীনতার ও স্বাধিকারের সীমা অলঙ্ঘনের প্রবৃত্তি মাত্রায় বাড়বে। নিবৃত্তির আগ্রহও পাবে বৃদ্ধি।

'একুশে' সঞ্জাত ভাবনা

খুব জাঁকজমকের সঙ্গে, উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে শহীদ দিবস উদযাপন করা হয়েছে, যে-কোন শাস্ত্রিক পার্বণের শ্রদ্ধা-ভক্তি-নিষ্ঠার সঙ্গে। এসব ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ নির্জলা তারিফ পাওয়ার যোগ্য। আমরাও তাই শংসামুখর। তবু নির্জন-নিঃসঙ্গ অবস্থায় বেকার মনে কিছু কথা জাগে, এগুলোকে কৌতূহল, জিজ্ঞাসা কিংবা নতুন চেতনাও বলা যেতে পারে। বিয়াল্লিশ বছর আগে জাতীয় জীবনে তথা পূর্ববাঙলার বাঙালী জীবনে নতুন রাষ্ট্রে বঞ্চনার ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছিল। বাঙালীর মানসিক জীবনে বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টির এবং ব্যবহারিক বৈষয়িক জীবন-জীবিকায় বঞ্চনার লক্ষ্যে সেকালের উর্দুভাষী নেতারা পাকিস্তানের কোন অঞ্চলেরই কোথাও বোধ্য ভাষা না হওয়া সত্ত্বেও উর্দুকেই ইসলামী তমদ্দুন-তাহজীব-আদর্শ-উদ্দেশ্যপ্রতীক ভাষারূপে রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বাঙলার কথা বলতে গিয়ে নিন্দিত হন বাঙালী ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত। তাঁকে সমর্থনও করেন অপর এক বাঙালী হিন্দু। সেকালের গণপরিষদে কোন মুসলিম বাঙালী, সেদিন বাঙলার দাবি সমর্থন করেননি। তাঁদের ওপর ইসলামী বেরাদরী ভাব ও মুসলিম নেতাদের প্রভাব ছিল এমনি প্রবল। এদিকে শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী হিসেবে ফররুখ আহমদ, আবদুল হক, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও ড. মুহম্মদ এনামুল হক, আবুল মনসুর আহমদ আর তমদ্দুন মজলিশ বাঙলাকে অধিকাংশ পাকিস্তানীর কথ্য, বোধ্য, লিখিত উন্নত ভাষা হিসেবে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব হিসেবে দাবি লেখায়-বিবৃতিতে ও বক্তৃতায় পরিব্যক্ত করেন। তারপর নেতা জিন্নাহর কাছে দাবি হিসেবে অন্যতর রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাঙালীর স্বীকৃতি আদায়ে এগিয়ে আসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা। এখন ভাষা আন্দোলনের ইতিবৃত্তান্ত সবিস্তার বর্ণিত মেলে বহু গ্রন্থে। এ ক্ষেত্রে বদরউদ্দীন উমরের তিন খণ্ড তথ্যের নির্ভরযোগ্য আকররূপে স্বীকৃত ও বিদ্বান সমাজে অনুমোদিত। আর আবদুল মতিন ও আহমদ রফিক রচিত গ্রন্থটিও তথ্যের ও সত্যের আকর।

আমাদের মনে যে প্রশ্ন জেগেছে, তা এই, যে কোন বিবাদে-বিরোধে-সংঘর্ষ-সংঘাত-লড়াই-যুদ্ধ বেধে যেতেই পারে। মারতে গেলে মরার ঝুঁকিও থাকে, মরতেও হয়। দুনিয়ায় আলেকজান্ডার-চেঙ্গিস-হালাকু-এটিলা-সিজার-কাইজার-জার থেকে নেপোলিয়ান হয়ে বুশ অবধি সবাই সব পরাক্রান্ত নরবন্দ্য বীর যাঁরা অন্তরে নররক্তপিপাসু খ্যাতি-ক্ষমতালিপ্সু নরদানবই নররক্তে পৃথিবী সিক্ত করেছেন। কিন্তু নিন্দিত হননি। বিজয়ীরা বিজয়-উৎসব করেছেন, তাঁর দল, গোত্র-জাতি বিজয় গৌরবে গর্বিত হয়েছে, কিন্তু স্বজন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বসৈন্য নিহত হয়েছে বলে কি 'শোক দিবস' পালন করেছে? আর পরাজিত যারা হয়েছে, তারাও মৃত্যুশোকে কাতর হয়নি। পরাজয়ের গ্লানিতে ক্ষুব্ধ, লজ্জিত, ক্রুদ্ধ কিংবা প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়েছে। আমরা বাঙলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি করেছি। আমাদের ভাইরা প্রতিকার-প্রতিবাদ-প্রতিরোধ করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছে। রক্ত দিয়ে প্রাণ দিয়ে জাতিকে করেছে প্রাণবন্ত, বিজয়ী, গৌরবান্বিত, পরিণামে হয়েছে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রেরণা-প্রণোদনার উৎস। তাই বলছি একুশে ফেব্রুয়ারিকে কি আমরা চিরকাল কান্নার দিবস, শোক দিবস, শহীদ দিবস হিসেবেই পালন করব? 'বিজয় দিবস' হিসেবে পালন করতে গিয়ে যাদের প্রাণের বিনিময়ে রক্তের বিনিময়ে নির্ভীক সংগ্রামের বিনিময়ে আমরা শেষাবধি বিজয়ী হয়েছি-তাঁদের বীর শহীদ, আহত গাজী, জাতির ভাষাসৈনিক হিসাবে কি বিজয় উৎসবের মাধ্যমে তাঁদের প্রতি সম্মান-শ্রদ্ধা-কৃতজ্ঞতা পরিব্যক্ত করতে পারি না? বিশেষ করে যে-বিভাষী বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে ছিল আমাদের সংগ্রাম, এখন তারা বিতাড়িত। আমরা স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের মালিক। স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রকে ঘরে-বাইরে লড়াই-যুদ্ধ-সংঘর্ষ-সংঘাত করতেই হয় নানা প্রয়োজনে মাঝে মধ্যে। অন্তত সীমান্তবিবাদ-বিরোধ-যুদ্ধ-হত্যা এড়ানো যায়ই না।

আমরা কি আমাদের স্বাতন্ত্র্যবোধের, সত্তাচেতনার সূচনার ও বাস্তবায়ন দিবসরূপেই জাতিচেতনার উন্মেষ দিবসরূপে ২১শে ফেব্রুয়ারি উদযাপন করতে পারি না, পারি না জাতীয় সংগ্রামদিবসরূপে অভিহিত করতে ২১শে ফেব্রুয়ারিকে? আমরা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে বসে ও প্রজন্মক্রমে কি কেবল কান্না-শোক ধ্বনি' উচ্চারণ করেই এ বিয়াল্লিশ বছর পরেও ২১শে ফেব্রুয়ারির নিশীথ রাত্রির স্তব্ধতা চিরকাল এমনি বিদীর্ণ করতে থাকব?

অতীত-ঐতিহ্যকে স্মরণ করে শোক কিংবা সুখ, বেদনা কিংবা আনন্দ, গৌরব কিংবা গর্ব অনুভব করাই রেওয়াজ ও স্বাভাবিক। সে-সঙ্গে এ-ও মনে রাখা দরকার অতীত ও ঐতিহ্য নিয়ে আস্ফালন করা, দায়িত্ব ও কর্তব্য নিষ্ঠার পরিচয় দেয়া হল বলে ভাবা নিষ্ক্রিয় অযোগ্য অসমর্থ বংশধরের বা প্রজন্মের লক্ষণ। নতুন চেতনার, নতুন চিন্তার, নতুন কাঙ্ক্ষার জ্ঞান, বুদ্ধি, শক্তি, সাহস, অঙ্গীকার, উদ্যম, উদ্যোগসম্পন্ন ব্যক্তি বা সমাজ তার সমকালীন আর্থিক, নৈতিক, শৈক্ষিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, প্রশাসনিক, রাষ্ট্রিক দৈন্য, বিচ্যুতি, বিকৃতি, নিষ্ক্রিয়তা, অবক্ষয়, বন্ধ্যাত্ব, সংকট-সমস্যা প্রভৃতির প্রতিকারে, প্রতিবাদে ও প্রতিরোধে সংগ্রামের, আন্দোলনের প্রেরণা, প্রণোদনা পায়। অতীত, ঐতিহ্য ও ইতিহাস প্রভৃতির জ্ঞানজাত জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-বিবেক-বিবেচনা প্রয়োগে আমরা অতীতকে, ঐতিহ্যকে সমকালের জীবন-জীবিকার সঙ্গে, তার সংকট-সমস্যার সমাধানের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দেখি না। তাই স্বকালে আর্থ-সামাজিক প্রশাসনিক ও নানা দুর্নীতির, দুর্বৃত্তির, দুষ্কৃতির, দুঃশাসনের, পীড়নের, শোষণের, অন্যায়ের, অবিচারের শিকার হয়ে অসহায় এতিমের ভীত-ত্রস্ত-অনিশ্চিত জীবনযাপনে বাধ্য হই। নানাভাবে উপদ্রুত ও বিপন্ন জীবনযাপন করি।

২১শে ফেব্রুয়ারি আমাদের নতুন নতুন সংগ্রামে আন্দোলনে দীক্ষা দিক, অনুপ্রাণিত করুক। আমাদের সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবনে নতুন চেতনা ও নতুন চিন্তা সঞ্চার করুক। ভাষাই আমাদের বাঙালীসত্তার পরিচয় বাহক। ভাষাই আমাদের সংহতির স্বাজাত্যের এবং অভিন্ন লক্ষ্যের প্রতীক। ভাষাই আমাদের অসাম্প্রদায়িক চেতনার ভিত্তি। ভুললে চলবে না যে শিশু যেমন মাতৃজঠরে নাভিমূল লগ্ন নল দিয়েই দেহ-প্রাণের পুষ্টি ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খাদ্য পায়, আমরা বাঙালীরাও তেমনি ভাষা-সংগ্রাম থেকেই প্রথম আমাদের স্বাতন্ত্র্য, আমাদের সত্তার পৃথক মূল্য-মর্যাদা এবং সংগ্রামী শক্তি ও সাহস সম্বন্ধে সচেতন হই। হই আত্মপ্রত্যয়ী আর আত্মস্বার্থ ও সত্তাচেতন। কাজেই ২১শে ফেব্রুয়ারি তাৎপর্যে আমাদের নাভিমূল লগ্ন নল। 'বাঙলা একাডেমী' আমাদের জাতীয় সংগ্রামের, স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার, বিজয়ের ও স্বাতন্ত্র্যের প্রতীক, প্রতিম ও প্রতিভূ। বাঙলা একাডেমীকে তাই কেবল বই মুদ্রণে ও বই মেলায় আর বই সমালোচনায় নিয়োজিত রাখলে চলবে না একে সরকারি প্রভাব-প্রশাসন মুক্ত করে জনগণের স্বায়ত্ত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হবে। মহাপরিচালকও হবেন নির্বাচিত কর্মকর্তা ও কর্ণধার। জাতীয় স্তরের সর্বপ্রকার সংকট-সমস্যা-প্রয়োজন নিয়ে এখানে আন্দোলন নয়, আলোচনা, গবেষণা ও বৈঠক করার জন্যে জ্ঞানী-গুণী-বুদ্ধিজীবী কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সঙ্গে জড়িত নন তেমন ব্যক্তিদের বিনে পয়সায় যে-কোন সময়ে সভা বৈঠক করার অধিকার থাকা আবশ্যিক ও জরুরী। বাঙলা একাডেমী জনগণের সংগ্রামের ও বিজয়ের আর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার স্মারক জাতীয় প্রতিষ্ঠান। তাই এটিতে সরকারের প্রভাব-প্রশাসন থাকা বাঞ্ছনীয় ও যৌক্তিক নয়। কেননা এতো ছিল সরকারের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম।

AMARBOI.COM

চরৈবেতি

গতিতেই জীবন স্থিতিতে মৃত্যু। এ আপ্তবাক্যও আমাদের অজানা নয়। অচলতা প্রাণহীনতার প্রতীক। গতিশীলতা, চলমানতা, সম্মুখগতিই প্রাণবন্তের লক্ষণ। কাঙ্ক্ষাপূর্তির অবিরাম প্রয়াসই জীবন। লাটিম ঘূর্ণায়মান অবস্থায় সচল বটে, কিন্তু প্রায় স্থিরবিন্দুতে আবর্তনশীল, অগ্রগতি নেই তার। তেমনি কোন বিশ্বাসে, সংস্কারে, ধারণায়, অনুরাগে, অনুগামিতায় ও আনুগত্যে যারা অভ্যস্ত হয়ে যায়, তারা নতুন চেতনার, নতুন চিন্তার, নতুন উদ্ভাবনের, নতুন আবিষ্কারের আন্তঃপ্রেরণাই বোধ করে না। বান্দামাত্রই মনিবের হুকুমচালিত এবং নিজের রুচি, বুদ্ধি, চিন্তা, ইচ্ছা প্রয়োগে অনভ্যস্ত। ফলে সাধারণ মানুষ যান্ত্রিকভাবে আচার-পার্বণ প্রজন্মক্রমে মেনেই জীবন কাটায়, তাতে নতুন চেতনার, নতুন চিন্তার, নতুন নীতি-নিয়মের, নতুন রীতি-রেওয়াজের, নতুন প্রথা-পদ্ধতির উদ্ভব সম্ভব হয় না। তবু দ্রোহী মেলে, তাঁরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাঁদের নতুন জ্ঞান-অভিজ্ঞতা, বুদ্ধি-যুক্তি-বিবেক-বিবেচনালব্ধ তথ্য, সত্য ও তত্ত্ব মুখে উচ্চারণ করেন, প্রচার করেন। তাই মন্থরগতিতে হলেও পৃথিবীর কোথাও না-কোথাও, কেউ না-কেউ, কিছু সত্যের, কিছু উদ্ভাবনের, কিছু আবিষ্কারের সন্ধান দিয়ে মানুষের অনুভব-উপলব্ধির জগৎ গভীর ও ব্যাপক করে তুলছেন, দিচ্ছেন ব্যবহারিক জীবনে জাগতিক জীবনযাত্রায় সাচ্ছল্য, স্বাচ্ছন্দ্য, উৎকর্ষ, আরাম, আনন্দ আর সুখ ও ঋদ্ধি।

রবীন্দ্রনাথ মৌমাছিতন্ত্র পছন্দ করতেন না, তার মধ্যে বিকাশ-বৈচিত্র্য নেই বলে। তাঁর ভাষায় "লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে মৌমাছি যে চাক তৈরি করে আসছে, সেই চাক তৈরি করার একটানা ঝোঁক কিছুতেই সে কাটিয়ে উঠতে পারছে না। এতে করে তাদের চাক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিখুঁত মতো তৈরি হচ্ছে, কিন্তু তাদের অন্তঃকরণ এই চিরাভ্যাসের গণ্ডির মধ্যে বদ্ধ হয়ে আছে। সে আপনাকে নানাদিকে মেলে ধরতে পারছে না।"-শাস্ত্রকেও যদি আমরা মৌচাকের মতো নিখাদ-নিখুঁত, সুষম সুন্দর প্রয়োজনানুগ নিশ্চিতির ও নিশ্চিন্তির, শৃঙ্খলার উৎস ও উপযোগী বলে প্রজন্মক্রমে বিরাগ-বিরক্তি-সন্দেহ-সংশয়-জিজ্ঞাসাহীনভাবে মেনে চলি, তাহলে, মানুষের মন-মগজ-মনন নিষ্ক্রিয়তায় সুপ্ত, অচল ও বন্ধ্যা হয়ে থাকে। স্বাধীন চিন্তাচেতনার অনভ্যাসে মানুষ বিজ্ঞানে-দর্শনে-শিল্পে-সাহিত্যে নতুন কিছু করার প্রেরণা-প্রণোদনা পায় না। সভ্যতা-সংস্কৃতি আচারিক বিকৃতি পায় তাৎপর্য ও উপযোগরিক্ত হয়ে। অবক্ষয় তাকে দেহে-প্রাণে-মনে-মগজে-মননে-মনীষায় পঙ্গু করে রাখে, মানসিক জরা, জড়তা ও জীর্ণতার শিকার হয় তেমন গোত্র, গোষ্ঠী, সম্প্রদায় বা জাতি। শত শত বছর তাদের বন্ধ্যাজীবন পরানুকরণে, পরানুসরণে আরো অসঙ্গত অসমঞ্জস ও বিকৃত হতে থাকে, মনুষ্যত্ব, মানবতা, জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি ওই পাথুরে দুর্গাবদ্ধ শাস্ত্রানুসারী আচারিক জীবনে প্রবেশপথ না পেয়ে রুদ্ধঘরে সূর্যালোর মতো প্রতিহত হয়েই থেমে থাকে। মনুষ্যসমাজে সনাতন ও চির সত্যরূপে স্বীকৃত শাস্ত্রানুগত্যই হচ্ছে মৌমাছিতন্ত্র। জাগতিক জীবনকে প্রতিমুহূর্তে নতুন চেতনার, নতুন চিন্তার, নতুন উদ্যমের, নতুন উদ্যোগের প্রসাদে ঋদ্ধ ও প্রসারিত রাখতে হয়। আবিষ্কারের, উদ্ভাবনের ও সৃষ্টির স্বপ্নে, সাধে, প্রয়াসে ও প্রযত্নে মগজ-মনন-মনীষা নিয়োজিত রাখতে হয়। নইলে সভ্যতা মৃত-ক্ষয়িষ্ণু অতীত হয়ে যায়, সংস্কৃতি ঘুরে আবর্তিত গতানুগতিক আচার-আচরণে রীতি-রেওয়াজে, প্রথা-পদ্ধতিতে কিংবা শাস্ত্রিক যান্ত্রিক নীতিনিয়মে পর্যবসিত হয়। তখন তারা মানব প্রজাতিরূপে জীবনযাপন করে নিয়মের ও অভ্যাসের লৌহ কঠিন খাঁচার মধ্যে থেকেই এবং খাঁচাবদ্ধ পাখিও অভ্যস্ত জীবনে কোন অসুবিধে বোধ করে না। মানুষও অন্য প্রাণীর মতোই জীব। নিত্য ও সার্বক্ষণিক চর্চায় পরিচর্যায় মনুষ্যত্বের উন্মেষ ও বিকাশ ঘটাতে হয় সচেতনভাবে। এর জন্যে শিক্ষা-দীক্ষা হয় আবশ্যিক। মানবিক গুণের উন্মেষ বিকাশ-বিস্তার ঘটানোর জন্যে নিত্য অনুশীলন জরুরী। এতে আমরা অবহেলা করি বলেই, পৃথিবীর সর্বত্র মানব প্রজাতির প্রাণী আকীর্ণ হলেও অধিকাংশ মানুষই মনুষ্যত্বরিক্ত। মানবতা তথা যৌথ জীবনে জরুরী মানবিক গুণের উন্মেষ খুব কমসংখ্যক লোকের মধ্যেই দেখা যায়। সমাজ-সদস্য হিসেবে স্বাধিকারের সীমা সম্বন্ধে, প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে, লাভ-লোভ-স্বার্থ-চেতনায়ও মাত্রাবোধের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সংযম, পরমত ও পর-আচরণ সহিষ্ণুতা এবং পরার্থপরতা ও সৌজন্য যে সামবায়িক সহযোগিতায় সহাবস্থানের জন্যে আবশ্যিক, তা অনুভব-উপলব্ধিগত না হলে মনুষ্যত্ব বাঞ্ছিত মাত্রায় বিকাশ পায় না। সর্বপ্রকার অতীত বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণামুক্ত স্বাধীন চিন্তা-চেতনাই সৃষ্টি করে নতুন শিল্প-সাহিত্য-দর্শন। বিজ্ঞানের চর্চার জন্যে চাই পূর্বতন শোনা কিংবা অনুমিত তত্ত্ব, তথ্য ও সত্যে অবিশ্বাস, সন্দেহ, সংশয়, জিজ্ঞাসা, কৌতূহল। এ জন্যেই উচ্চারিত হয়েছে চরৈবেতি চরৈবেতি! এগিয়ে চল, অভিযাত্রী হও, অশেষ জিজ্ঞাসা উদ্যম, ধৈর্য, অধ্যবসায়, অশ্রান্ত শ্রম ও সময় নিয়োগে জানার ও আবিষ্কারের জন্যে নিয়োগ কর জীবনের জাগ্রত মুহূর্তগুলো। আজকের পৃথিবীতো এমনি সব মানুষের দান। মুক্ত মন বুদ্ধি মনন যুক্তি ও জ্ঞানঋদ্ধ হয়ে প্রমাণসম্ভব সত্যকে তথ্যকে ও তত্ত্বে আস্থা রাখা, বিজ্ঞানের সত্যে তথ্যে ও তত্ত্বে নির্ভর করে নয় কেবল, বিজ্ঞানের সত্যকে, তথ্যকে ও তত্ত্বকে পুঁজি-পাথেয় করে সহ ও সমস্বার্থে, সংযমে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সহিষ্ণুতায় সৌজন্যে মানবিক গুণের প্রয়োগে সামবায়িক সহযোগিতায় সহাবস্থান করতে হবে বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক নাগরিক হিসেবেও। এ যুগের দাবি, যন্ত্রযুগের ও যন্ত্রজগতের দাবি। জাগতিক জীবনের প্রয়োজনে সাড়া দিতেই হবে যন্ত্রনির্ভর এ ক্ষুদ্র ও সংহত পৃথিবীর প্রায় একক মনুষ্যসমাজে। ভৌগোলিক ব্যবধান আজ অবলুপ্ত, স্বাতন্ত্র্যচেতনা আজ বৈনাশিক, বিচ্ছিন্নতা আত্মবঞ্চনামাত্র। স্বাধিকারে স্বস্থ থেকে স্বসত্তার মূল্য, মর্যাদা ও অধিকার সচেতনতা থেকে আজ বৈশ্বিক চেতনা নিয়ে আন্তর্জাতিক জীবনযাপনের যোগ্যতা অর্জন করতেই হবে। আজ তাই আমাদের বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিবাদী, প্রকৃতিবাদী ও প্রত্যক্ষবাদী হয়ে আত্মমর্যাদা সচেতন হয়ে পরের অধিকারও মেনে নিয়ে সহাবস্থান করতে জানতেই হবে। স্বাতন্ত্র্যচেতনা, বিচ্ছিন্নতাপ্রিয়তা, রক্ষণশীলতা, অতীতমুখিতা, গ্রহণবিমুখতা, জীবনানুভূতির প্রসার বিরোধী। জীবনে ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগ তাহলে স্থূল ও জৈবিকই থেকে যাবে, মনুষ্যবাঞ্ছিত সূক্ষ্ম-সুন্দর অনুভব-উপলব্ধিঋদ্ধ হবে না কখনো। শাস্ত্রিক প্রভাবমুক্ত মানসিকভাবে স্বাধীন মানুষের মুক্তবুদ্ধি মেধানুসারে প্রগতিমুখী ও প্রাগ্রসর চিন্তা-চেতনা প্রবণ হয়। একটা সমাজ বা জাতি কিংবা সম্প্রদায় অথবা দেশ তথা রাষ্ট্র ব্যক্তিমানুষেরই সামষ্টিক, সামূহিক ও সামগ্রিক ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের সমন্বিত-সংমিশ্রিত কিংবা প্রকৃতির মতো বৈচিত্র্যে সাধারণ ঐক্যের, রূপের ও চরিত্রের লাক্ষণিক প্রতিরূপ। 'নবনব উন্মেষশালিনী' মন-মগজ-মনন-মনীষা প্রয়োগে আবিষ্কারে উদ্ভাবনে সৃষ্টিতে মানসিক ও ব্যবহারিক যান্ত্রিক সংস্কৃতিতে বৃক্ষের পত্র-পুষ্পের মতো নিত্য নতুন রূপে-রসে-বৈচিত্র্যে-উৎকর্ষে-সৌকর্যে বিকাশমান রাখাই হচ্ছে সাম্প্রদায়িক, জাতিক, গৌত্রিক, গৌঠিক কিংবা রাষ্ট্রিক জীবনে প্রগতি-প্রাগ্রসরতার পরিচায়ক। তাই আবার বলি, জীবনে-সমাজে-রাষ্ট্রে সাফল্য-সার্থকতা নিহিত রয়েছে সেই ঔপনিষদিক 'চরৈবেতি' তত্ত্বে।

AMARBOI.COM

মেঘ উবে যাবে, অন্ধকার হবে বিলুপ্ত

আবাল্য শ্রুত বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা বর্জন করার মতো জ্ঞান বুদ্ধি যুক্তি সাহস আর প্রয়োজন চেতনা সাধারণ মানুষের মনে জাগে না। এরা শাস্ত্রসম্মত নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ, প্রথা-পদ্ধতি নির্বিচারে নির্দ্বিধায় ও উপযোগচেতনারিক্ত হয়েই মেনে চলেই নিশ্চিন্তে ইহ-পারলৌকিক কল্যাণ লক্ষ্যে অভ্যস্ত জীবন প্রাজন্মক্রমিকভাবে যাপন করে। কাজেই মানুষমাত্রেই সাধারণভাবে আস্তিক, শাস্ত্রানুগত এবং নতুন চেতনা-চিন্তা-প্রশ্নহীন আবর্তিত ও গতানুগতিক বন্ধ্যা জীবনযাপন করে। তবু যেহেতু মানুষ স্বাতন্ত্র্যে, বিচ্ছিন্নতায়, অপরিচয়ের অজ্ঞতায় বাস করতে পারে না, একালে তো বটেই সেকালেও ভিন্ন অঞ্চলের, গোষ্ঠীর, গোত্রের, শাস্ত্রের, আচার-আচরণের, চিন্তা-চেতনার বিদেশীর সঙ্গে মানুষের সঙ্গে বিজেতা পর্যটক ও বাণিজ্যপ্রবণ সওদাগর আর স্বধর্ম প্রচারক কিছু অভিযাত্রীরূপী লোকের মাধ্যমে লঘু-গুরুভাবে পরিচিত হত এবং কৌতূহলী জিজ্ঞাসুরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওদের শাস্ত্র, সমাজ, সংস্কৃতি, সভ্যতা, জীবনাচার, শিল্প-সাহিত্য, আবিষ্কার-উদ্ভাবন জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রভৃতি সম্বন্ধে নানা তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য জেনে নিত, আর পছন্দ হলেই তা অনুকরণে, অনুসরণে, আত্তীকরণে, আত্মীকরণে সাঙ্গীকরণে, স্বকীয়করণে আগ্রহী ও উদ্যোগী হত, সেকারণেই প্রলুব্ধ ও জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি-সাহস ও কল্যাণ চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তিরা শাস্ত্রিক নিষেধ লঙ্ঘন করে নতুন দেখা, শোনা, জানা, বোঝা নীতি-নিয়মের, রীতি-রেওয়াজের, প্রথা-পদ্ধতির, তৈজসের, আসবাবের, পোশাকের, খাদ্যের, খেলার, বিনোদনের অনুকৃত ব্যবস্থা প্রবর্তন করত এবং আজো করে নিজেদের সমাজে। শাস্ত্রিক অনুশাসন লঙ্ঘনের ফলেই শাস্ত্রমানা মানুষ পরানুকরণে সংস্কৃতি সভ্যতায় ও হাতিয়ারে-শিল্পে-সাহিত্যে-স্থাপত্যে-ভাস্কর্যে-জ্ঞানে-বিজ্ঞানে-দর্শনে-চিত্রে এগিয়েছে। যুগোপযোগী হয়ে অন্য উন্নত সভ্যতা সংস্কৃতিমানদের সঙ্গে তাল ও সমতা রক্ষা করে চলতে জেনেছে ও পেরেছে।

আমরা সেকালের ঈশ্বরের অভিপ্রায় অনুসারে বর্ণে বিন্যস্ত ব্রাহ্মণ্য সমাজে তাই আজ ছোঁয়াছুঁইয়ের বাধা অপসৃত দেখতে পাই, অব্রাহ্মণ-চাঁড়াল-চামার একই সরকারে ও স্কুলে-কলেজে-দফতরে-বাজারে-যানবাহনে সমাধিকার ও স্বসত্তার মূল্য-মর্যাদা অক্ষুণ্ন রেখে অবাধে স্বাধিকার স্বপ্রতিষ্ঠ হচ্ছে। শূদ্ররা বেদ-উপনিষদ-গীতা পড়ছে। য়ুরোপীয় শিক্ষা-সংস্কৃতি-সভ্যতা-জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন প্রভাবে আমরা আজ য়ুরোপে আবিষ্কৃত, উদ্ভাবিত ও নির্মিত সবকিছুই শাস্ত্রবিরুদ্ধ জেনে-বুঝেই প্রাত্যহিক জীবনের চাহিদা অনুগ বলে নির্দ্বিধায় সবকিছু গ্রহণ-বরণ করেছি। যেমন শাস্ত্র বিরোধী জেনেও বিজ্ঞানের তত্ত্বে, তথ্যে ও সত্যে আস্থা রাখছি। শাস্ত্রসম্মত নয় জেনেও এখন ফটো বা ছবি হজের জন্যে প্রয়োজন হয়, মনুষ্যাকৃতি মুদ্রিত কাগজের টাকা জেবে রেখে নামাজ পড়া যায়, সিনেমা দেখায় বাধা নেই, অবগুণ্ঠন নারীর পক্ষে আর অপরিহার্য নয়, বিশ্ববিদ্যালয় স্তর অবধি সহশিক্ষা এবং দফতরে-সংসদে-মন্ত্রীসভায় নারীর চাকরি কিংবা সদস্য হওয়া জায়েজ। নারীর নাচে-গানে-বাজনায়-নাটকে-সিনেমায় অংশগ্রহণ ও অভিনয় আজ আর আপত্তিকর নয়। দোকানে-বাজারেও নারী এখন বেচা-কেনার কাজের অধিকার পেয়েছে। হিন্দু-মুসলিম সমাজে নারীর সারাজীবন অনূঢ়া থাকাও এখন নিন্দনীয় নয়। এ সবই কিন্তু শাস্ত্রমানা আস্তিক-ধার্মিক মানুষেরা মেনে নিয়েছে। য়ুরোপে-আমেরিকায়-অস্ট্রেলিয়ায় খ্রীস্টান সমাজ হলে-হোস্টেলে ছাত্র-ছাত্রীর একত্রে বাস, সমাজে শাস্ত্রসম্মত বিয়ে ছাড়াও নারী-পুরুষের ঘরবাঁধা, ব্রিটেনে সমকামিতা, অনূঢ়া নারীর সন্তান প্রভৃতি সামাজিক, পারিবারিক ও রাষ্ট্রিক স্বীকৃতি পেয়েছে। অতএব আসমানী শাস্ত্রমানা আধুনিক পৃথিবীর শিক্ষিত-সভ্য-সংস্কৃতিমান সমাজ কালের দাবি উপেক্ষা করতে পারছে না। বলেছি আগেও শাস্ত্র উপেক্ষা করেছে নতুন বিজেতা হিসেবে আগত বিদেশী-বিভাষী-বিধর্মী-বিজাতির সভ্যতা-সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, আচার-আচরণ, শিল্প-সাহিত্য-দর্শন প্রভাবিত শাসিত সমাজ। মেনেছে কালিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনের দাবি।

তবু শাস্ত্র থাকবে, আস্তিক্য থাকবে, ভীরু মানুষ, চিন্তা-চেতনাবিমুখ মানুষ, যুক্তি প্রয়োগ অনীহ মানুষ, অজিজ্ঞাসু, অননুসন্ধিৎসু মানুষ শাস্ত্রে অনড় আস্থা রাখবে। সব মানুষ নিরীশ্বরও হবে না, হবে না অদৃশ্য অলীক অলৌকিক অরি-মিত্র শক্তিতে আস্থাহীন। আত্মপ্রত্যয়ী-সাহসী, জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি ও প্রকৃতিবাদী না হলে কোন ব্যক্তিই নাস্তিক-নিরীশ্বর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হতে পারে না। তার প্রমাণ মিলছে ভাঙা সোভিয়েত রাশিয়ার তথাকথিত শাস্ত্রবর্জিত মানুষের অন্তরে গোপনে পোষা শাস্ত্রে আস্থার এখনকার প্রাজন্মক্রমিক সাক্ষ্য প্রমাণে।

অতএব মানুষমাত্রই লাভে লোভে স্বার্থে কিংবা দায়ে-সংকটে-সমস্যায় পড়ে অথবা জীবনযাত্রায় সাচ্ছল্য, স্বাচ্ছন্দ্য, সৌকর্য, উৎকর্ষ সাধনে প্রলুব্ধ হয়ে শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ চিরকালই লঙ্ঘন করেছে। রক্ষণশীলেরা অবশ্য চিরকালই নতুনভীতি ও পুরাতন-সনাতনপ্রীতি কবলিত থাকেই। যদিও তারা কখনো নতুনের প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা ঠেকাতে পারেনি। কিন্তু ইতিহাসের শিক্ষা সাধারণ মানুষ গ্রহণ করার মতো বুদ্ধি-যুক্তি বিচার-বিবেচনা শক্তি রাখে না। তাই রক্ষণশীলেরা জিগীষা নিয়ে প্রতিকারে, প্রতিবাদে ও প্রতিরোধে উগ্রভাবে এগিয়ে আসে এবং যতই প্রতিহত হয় ততই জিঘাংসু হয়ে ওঠে। রক্তে আগুনে জোরে জুলুমে নতুন নীতি-নিয়মকে উৎখাত করতে প্রয়াসী হয়, নতুন চিন্তক ও তার অনুসরীরা নিহত হয় রক্ষণশীল সর্দারের অনুগতদের হাতে, কিন্তু চিন্তার তো মৃত্যু নেই। তাই নতুন চেতনার নতুন চিন্তার উদ্ভাবক মরে। কিন্তু চিন্তা ক্রমে পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত হয়, মরে না। তাতেই পৃথিবীর মানুষ মনে-মতে-মননে-মনীষায় মুক্তবুদ্ধিতে বৌদ্ধিক ও যৌক্তিক জীবনের দিকে এগিয়ে যায়, মানসিক ও ব্যবহারিক-বৈষয়িক জীবনে উন্নতি ও উৎকর্ষ লাভ করে। অতএব মৌলবাদের মেঘও উবে যাবে, সূর্যের রশ্মির মতো বিজ্ঞানের নতুন আবিষ্কার উদ্ভাবন, মনন-মনীষার সৃষ্টি মানুষের মন-মত-মগজ-মনন-মনীষা প্রোজ্জ্বল করে তুলতেই থাকবে। কালের সঙ্গে সঙ্গতিহীন কিছুই ধরে রাখা যায় না। কিছুই টেকে না। এ তত্ত্বও মানুষ জানে। তাই শাস্ত্রীরাও ন্যায়-স্মৃতি-পাঁতি রবারের মতো, বেলুনের মতো নানা কৌশলে ও বুদ্ধি-যুক্তিযোগে প্রসারিত ব্যাপ্ত করে করে নতুন নতুন পাঁতিযোগে সব নতুনকে গ্রহণ করে নিয়ে, ফেকা-কেয়াজ-এজমা-ফতোয়াযোগে গ্রাহ্য করে শাস্ত্রকে টিকিয়ে-বাঁচিয়ে রাখে। প্রোটেস্ট্যান্ট মত, গৌড়ীয় বৈষ্ণব মত, আহমদীয়া মত, সুফী মত প্রভৃতি বিভিন্ন শাস্ত্রের মতের উদ্ভব, বৈধতা ও গ্রাহ্যতা ঘটেছে এভাবেই কালিক ও স্থানিক জীবনের প্রয়োজনেই।

পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়ম্

'গুরুমারা বিদ্যা' অবিসংবাদিতভাবে নিন্দনীয়। আজ অবধি কেউ এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করে না। কিন্তু গুরুমারা বিদ্যা গভীরতর তাৎপর্যে বাঞ্ছনীয় হওয়াই উচিত। কেননা শিষ্য গুরুর অনুরাগী, অনুগামী ও অনুগত থাকলে শিষ্যেরও মানসিক দাসত্ব শিষ্যকে চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে বন্ধ্যাই রাখে। নতুন চেতনায়, নতুন জিজ্ঞাসায়, নতুন চিন্তায় তার আগ্রহ থাকে না। তেমন শিষ্য পরম্পরাগত জ্ঞান-যুক্তির আনুগত্যের গতানুগতিক পন্থায় অভ্যস্ত আচরণ-আচরণনিষ্ঠ ও মনের-মননের-মনীষার অপ্রয়োগে অনুভব-উপলব্ধির প্রসাররিক্ত প্রাণীসুলভ বৃত্তি-প্রবৃত্তি তাড়িত জীবনই যাপন করে। আবিষ্কারে-উদ্ভাবনে-সৃষ্টিশীলতায় ঋদ্ধ যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেক-বিবেচনা চালিত জীবন থেকে নিজেকে বঞ্চিতই রাখে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আত্মবিকাশের উদ্যম উদ্যোগ থাকে না তার। নতুন চেতনায়, নতুন চিন্তায়, মুক্তবুদ্ধি ও যুক্তি প্রয়োগ নতুন জিজ্ঞাসা নিয়ে নতুন তথ্য, নতুন তত্ত্ব ও নতুন সত্য আবিষ্কারে, নতুন জীবনদর্শন উদ্ভাবনে, নতুন জীবনচেতনা লাভে, নতুন রুচি-সৌন্দর্য-সৌকর্য-স্বাচ্ছন্দ্য-উৎকর্ষ সাধনে প্রয়াস-প্রযত্ন করাতেই রয়েছে ব্যক্তিক, গৌষ্ঠিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনের, এক কথায় মানবজীবনের সার্থকতা।

যেসব বিরল মন-মেধা-মনন-মগজ-মনীষাসম্পন্ন উচ্চাশী ব্যক্তি জাগতিক জীবনে কৃতী ও কীর্তিমান হয়ে চিরকাল কিংবা দীর্ঘকাল স্মরণীয় হয়ে থাকতে চান স্বঅঞ্চলে, স্বদেশে কিংবা মানব সমাজে, অথবা বৈশ্বিক বা আন্তর্জাতিক স্তরে আত্মোন্নয়ন ও আত্মবিস্তার করতে আগ্রহী, তাঁরা নিজের নিষ্ঠ প্রয়াসে, প্রযত্নে নিজের মগজকে জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-প্রজ্ঞা দিয়ে ঋদ্ধ করেন নিজের অনুভবকে ও উপলব্ধিকে সূক্ষ্মতায়, গভীরতায়, ব্যাপকতায় এবং গুণে, মানে, মাপে, মাত্রায় অনন্য ও অসামান্য করে তোলেন। তাঁরা মনুষ্যত্বের তথা মানবিক গুণের বিকাশ-বিস্তার-উৎকর্ষ সাধনে থাকেন সদানিরত। কোন না কোন নতুন তথ্যের, তত্ত্বের, সত্যের, যন্ত্রের কিংবা বিজ্ঞানের ও প্রযুক্তির যে-কোন শাখায় নিজের কৃতি-কীর্তি রাখার প্রয়াসী হন তাঁরা।

একালে বিজ্ঞানের তথ্যে, তত্ত্বে ও সত্যে আস্থা রেখে, সুন্দরকে ও কল্যাণকে নির্দ্বিধায় গ্রহণে-বরণে-আগ্রহী থেকে কালগত, স্থানগত, প্রতিবেশগত জীবনের নিত্য বর্ধিষ্ণু দাবি বা চাহিদা মেটানোর জন্যে সদা প্রস্তুত থাকাই হচ্ছে মানসিক সাংস্কৃতিক বৈষয়িক ব্যবহারিক সমকালীনতা।

চেতনায়-চিন্তায়-বুদ্ধিতে ও যুক্তিতে সৃজনশীলতায় ও জীবনযাত্রায় উৎকর্ষ সাধনের আগ্রহই হচ্ছে প্রাণবন্ত জীবনবাদী, জাগতিক জীবননিষ্ঠ বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তির, সমাজের ও রাষ্ট্রের লক্ষণ। পুরোনোপ্রীতিতে প্রচলিত বিশ্বাসে-সংস্কারে-ধারণায় আর জ্ঞানে ও আনুগত্যে রয়েছে স্থিতি, এতে গতি নেই। কাজেই প্রগতি-প্রাগ্রসরতাও নেই। নেই নতুনত্ব, নেই আত্মবিকাশ। জীবন থাকে গতানুগতিক অভ্যাসে আচারে-চিন্তায় ও চেতনায় সীমিত। এ এক লৌহকঠিন বৈচিত্র্যহীন খাঁচাবদ্ধ জীবন। সৃষ্টির আনন্দ, উৎকর্ষের সুখ, অনুভবের, চিন্তার, উপলব্ধির চমক এতে থাকে না। এতে ব্যক্তিজীবনের সময় শ্রমে, আহারে, বিশ্রামে ও নিদ্রায় হয় অবসিত।

গুরুমারা বিদ্যার কথা বলছিলাম। একজন শিক্ষার্থী প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক, স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে যখন পড়ে, তখন সে থাকে অজ্ঞ, আর তার শিক্ষক থাকেন বিজ্ঞ। কাজেই তার শেখার, জানার, বোঝার বিষয় থাকে অশেষ। সবটা সে ধরে রাখতে পারে না, শিক্ষকের মুখে উচ্চারিত ভাবের কিংবা জ্ঞানের কথা তার আয়ত্তে আসে। সে যখন যে-স্তর উত্তীর্ণ হয়, তখনো বাকি থেকে যায় অনেক কিছু শেখার, জানার ও বোঝার। এমনিভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা অবধি সব স্তরেই শিক্ষার্থীর বিদ্যা থাকে সীমিত আর শিক্ষকের জ্ঞান তখনো শিক্ষার্থীর অনুভবে থাকে অশেষ। তবু জ্ঞান-গবেষণা-অনুশীলনে যে শিক্ষার্থী সর্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরেও নিষ্ঠ থাকে, নতুন চেতনা, নতুন চিন্তা, নতুন জীবনতত্ত্ব, নতুন জগৎভাবনা আর মগজে-অন্তরে উন্মেষিত হয়। তেমন ব্যক্তির আবিষ্কারে-উদ্ভাবনে-সৃষ্টিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানবসমাজ জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-যন্ত্র-প্রযুক্তিক্ষেত্রে এগিয়ে যায়। তেমন ব্যক্তিই হন গুরুমারা বিদ্যার অধিকারী। নতুন চেতনা, নতুন চিন্তা, নতুন সন্দেহ, নতুন সংশয়, নতুন জিজ্ঞাসা, নতুন কাঙ্ক্ষা, নতুন কৌতূহল, পুরাতনে বিরাগ, বিরক্তি, উৎকর্ষ সাধনের উদ্যম এবং কালের জীবনপদ্ধতির ও জীবনোপকরণের উন্নয়ন ও বৃদ্ধিবাঞ্ছাই মানুষকে পুরোনো অবস্থার, ব্যবস্থার, নীতি-নিয়মের, রীতি-রেওয়াজের ও প্রথা-পদ্ধতির প্রতি দ্রোহী করে তোলে, পুরোনো পরিহারে ও নতুন কিছু আবিষ্কারে-উদ্ভাবনে-সৃষ্টিতে ও প্রবর্তনে উদ্বুদ্ধ ও প্রবুদ্ধ করে। এভাবে শিক্ষার্থীরা পূর্ব প্রজন্মের মানুষ থেকে, মা-বাবা, গুরু, ওস্তাদ-শিক্ষক থেকে এগিয়ে যায় গুণে-মানে-মাপে-মাত্রায়। এমনি অবস্থায় গুরু বা পিতা এ পরাজয়ে গৌরব-গর্ববোধ করেন। অবমানিত বোধ করেন না। তাই একটা আপ্তবাক্য চালুও হয়েছে। 'সর্বত্র জয়ম ইচ্ছতে পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়ম'– গুরু শিষ্যের কৃতি-কীর্তিতে, পিতা পুত্রের যোগ্যতায়, কৃতিত্বে, সম্মানপ্রাপ্তিতে গর্ববোধ করেন। অতএব নতুন চেতনা, নতুন চিন্তা, নতুন প্রয়োজনবোধ, নতুন আকাঙ্ক্ষা, জিজ্ঞাসা, কৌতূহল, উদ্যম এবং উদ্যোগই মানব সভ্যতা-সংস্কৃতি সৃষ্টির, বিস্তারের ও উৎকর্ষের মূল। মুক্তমন, মুক্তচিন্তা, মুক্তবুদ্ধি এবং বুদ্ধির সঙ্গে জ্ঞানের যোগে, সাহসের সঙ্গে শক্তির, অঙ্গীকারের সঙ্গে উদ্যম-উদ্যোগ-আয়োজনের যোগে মনে-মগজে-মননে-মনীষায়-সংস্কৃতিতে-সভ্যতায় সৃষ্টিশীলতায় মানবিক অনুভবের সূক্ষ্মতায় ও প্রসারে ঋদ্ধ হয়েছে জগতে ও জীবনে মানুষ। বিজ্ঞানের, যুক্তিবাদিতার, উদারগ্রহণশীলতার গুরুত্বে আস্থাবান প্রাকৃতিক নিয়মের প্রভাব সম্বন্ধে সচেতন ব্যক্তিই কেবল সহজেই মনে-মননে মুক্ত থাকতে পারে। সমাজের, শাস্ত্রের, প্রথাপদ্ধতির, বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণার অনুরাগী, অনুগামী ও অনুগত জনেরা মুক্তমনের যুক্তিবাদী নয় বলে তাদের থাকে নতুন চিন্তাভীতি, তারা রক্ষণশীল। যে-কোন নীতি-নিয়মের, প্রথা-পদ্ধতির রীতি-রেওয়াজের পরিবর্তনে তারা নৈতিক, শাস্ত্রিক, সামাজিক, ব্যবহারিক জীবনের ক্ষয়-ক্ষতির আশঙ্কা করে। এদের সংখ্যাই বেশি। তাই হাজার হাজার বছরেও মনুষ্যসমাজ প্রত্যাশিত মাত্রায় বিকশিত হয়নি, আদিম ও আদি অবস্থায় ও অবস্থানে রয়েছে পৃথিবীর নানা অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষ আজো এ মুহূর্তেও। এরাই লাভে, লোভে, স্বার্থে তাগা-তাবিজ মন্ত্র-মাদুলী যোগে অদৃশ্য অরি-মিত্র শক্তিকে তথা নিয়ন্তা-নিয়ন্ত্রক শক্তি নিয়তিকে আয়ত্তে এনে আলাদিনের চেরাগের মতো কিংবা সোলেমানী অঙ্গুরীয়ের মতো অথবা বোতলে ধরে রাখা দৈত্যের মতো স্বকাজে লাগাতে সদাব্যস্ত। এরা স্বার্থবাজ, লোভী কিন্তু যুক্তি এদের মগজে ঠাঁই পায় না। এসব যে মানুষের লাভ-ক্ষতির হ্রাস-বৃদ্ধি কিংবা উদ্ভব বিলুপ্তি ঘটায় না– যুক্তি বুদ্ধি প্রয়োগে কারণ-কার্য সন্ধানে অসমর্থ বলেই। তারা দেখে, শুনে, বুঝেও মানতে চায় না যে প্রকৃতির নিয়মই বহাল থাকে। তারা অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না। তারা ভাববাদী, জ্ঞান-বিজ্ঞানে-যুক্তিবাদী নয় বলেই, ঝাড়ফুঁকে তাগাতাবিজে তারা আস্থা রাখে। তবু অবশ্য কালেরদাবি, স্থানের দাবি, প্রয়োজনের দাবি এক কথায় কালগত, স্থানগত, প্রয়োজনগত জীবনের দাবি ও চাহিদা উপেক্ষা করা চলে না, তাই নতুনের জয় হয়, রক্ষণশীলতা পরাজয় বরণ করে, জগৎ-সংসার এগিয়ে যায়। পরিবর্তন এভাবেই আসে। পুরোনো এভাবেই হয় বর্জিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শহুরে শিক্ষিত বাঙালীর সংস্কৃতি কিরূপ?

'স্বনামা পুরুষ ধন্য পিতৃনামা চ মধ্যম' বাঙলায় বলা হয় 'বাবার নামে আধা/দাদার নামে গাধা।' মানে স্বনামে খ্যাত হওয়াই পুরুষের জীবনের সার্থকতা, পিতার নামে চলা তেমন গৌরবের নয়, আর পিতামহের নামে চলা প্রায় লজ্জার বিষয়। কেননা এ অযোগ্যতারই প্রমাণ।

আমাদের ১৪০০ সালের পয়লা বৈশাখ উদযাপনে পান্তাভাত-ইলিশের গুরুত্ব দেয়া, বাতাসা-মুড়ি-মুড়কির গর্ব করা, লোকজ সংস্কৃতির মহিমা-মাহাত্ম্য প্রচারে জন্যে গ্রাম থেকে হাপুগান, গম্ভীরা, জেলে নৃত্য, সাপুড়ে নৃত্য, চাষী বউয়ের ধান চাল ভানা, লাঠি খেলা, কুস্তি খেলা, হাডুডু, দাঁড়িয়াবান্ধা খেলার প্রদর্শনী, আর হাড়ি-সরা-সানকির প্রীতি প্রভৃতিকে বলা হচ্ছে লোকজ কিংবা লোক সংস্কৃতি। এ 'লোক' হচ্ছে প্রাকৃতজন। এক কথায় আমাদের আধুনিক শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরা লোকসংস্কৃতিকে বা লোকজ সংস্কৃতিকে তথা গ্রামীণ বা গ্রাম্য জীবনাচারের কিংবা জীবনযাত্রার সামগ্রিক, সামূহিক ও সামাজিক রূপকেই বাঙালীসংস্কৃতি বাঙলার সংস্কৃতি নামে অভিহিত করে, লোকজসংস্কৃতিউৎসব করে বাঙালীত্ব প্রমাণে উৎসাহী হয়ে উঠেছেন। অর্থাৎ আমাদের অনক্ষর বাপ-দাদাকে 'লোক' নামে অপমানিত করে [গান্ধীর 'হরিজন' এ সূত্র স্মর্তব্য] আমরা বাঙালী মানুষের উৎসব করছি। কিন্তু সংস্কৃতি তো ব্যক্তির ও সমষ্টির, সমাজের, জীবনের ও জীবিকার ভাব-চিন্তা-কর্ম আচরণ লগ্ন। সংস্কৃতি তো ব্যক্তির ও সমষ্টির প্রাত্যহিক জীবনবিচ্ছিন্ন কিছু নয়। এক কথায় সংস্কৃতি বৃক্ষের মতো, বটবৃক্ষের মতো সারা জীবন বর্ধিষ্ণু ও বিকাশ বিস্তার প্রবণ। সংস্কৃতি আবিষ্কারে, উদ্ভাবনে, সৃষ্টিশীলতায় ও মনন বৈচিত্র্যে গতিশীল ও জীবন-জীবিকার, জীবনযাপন পদ্ধতির, সমাজ ও রাষ্ট্র পদ্ধতির উৎকর্ষপ্রসূন।

শুনছি আমাদের নানা দল, প্রতিষ্ঠান, সমিতি ও সঙ্ঘ সারাবছর ধরে ১৪০০ সাল উদযাপন করবে এবং বাঙালীর ও বাঙলার সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্যের আবিষ্কারে, আলোচনায়, প্রদর্শনে, বিচারে বিশ্লেষণে, ইতিবৃত্তান্ত বয়ানে নানা বৈঠক, আসর ও অনুষ্ঠান করবে।

অতীতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অবশ্য আলোচ্য, তাতে কারো দ্বিমত থাকার কথা নয়। কিন্তু আমাদের একালের তথা আধুনিক কালের শিক্ষিত শহুরে সমাজের নগর-বন্দরবাসীর বাঙালীর সংস্কৃতি বিকাশে কী কী অবদান রয়েছে, তা কোথাও আলোচ্য বিষয় হতে দেখছি না। আমাদের ক্ষোভ ও দুঃখ এখানেই। আমাদের শহর-বন্দরের শিক্ষিতদের স্বদেশী-স্বজাতি সংস্কৃতি কি, তাদের আবিষ্কার কি, তাদের উদ্ভাবন কি, তাদের নতুন সৃষ্টি কি, তাদের নতুন দর্শন কি? ১৯৪৬ সনের দাঙ্গা, ১৯৪৭ সনের ব্রিটিশ বিতাড়ন, ১৯৫২ সনের ভাষা সংগ্রাম, ১৯৫৪ সনের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়, ১৯৬২ সনের শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৯ সনের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭১ সনের মুক্তিযুদ্ধ, বিজয় ও স্বাধীনতা, ১৯৮৩ সনের শিক্ষা সংগ্রাম, ১৯৯০ সনের এরশাদ বিতাড়ন কি আমাদের সংস্কৃতির আঙ্গিক বা আন্তর পরিচয়? বুলবুল চৌধুরীর উদ্ভাবিত নৃত্যশিল্পে কিংবা আমাদের চিত্রীদের চিত্রে বাঙালী সংস্কৃতির পরিমাণের মাত্রা কতটুকু! আমাদের একালের অবদানই হবে আমাদের বড়াইয়ের, গৌরব-গর্বের বিষয়। য়ুরোপীয় আদলে যারা শারীরিক ও আবাসিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সজ্জায় সজ্জিত হয়ে খাদ্যে পুষ্ট হয়ে, বিদেশী সাহিত্য-শিল্প-যন্ত্র-প্রযুক্তি-ভাব-চিন্তানির্ভর জীবনযাপন করে, তারা পার্বণিকভাবে বাঙালী সংস্কৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞতা-বিজ্ঞতা বিমিশ্রিত আস্ফালন করে কার উপকার করছে, এরাতো একাধারে ও যুগপৎ আত্মপ্রতারণা ও পরপ্রবঞ্চণা করছে। এর মধ্যে কি স্বদেশপ্রেম ও স্বজাতিপ্রীতি আছে?

মিলে অমিলে ও অমিলে মিল

ইহুদী ধর্ম পুরোনো বাইবেল বা টেস্টামেন্ট ভিত্তিক। তবু ইহুদীদের মধ্যে রয়েছে বহু মতবাদী সম্প্রদায়, স্বয়ং যিশুও ইহুদী সন্তান। গোড়ায় খ্রীস্ট প্রচারিত মত ছিল ইহুদী সমাজেই নিবদ্ধ একটি নতুন উপমতমাত্র। পরে যিশুর মতবাদীর সংখ্যা বাড়ে এবং নতুন ও পৃথক ধর্ম শাস্ত্ররূপে চার সন্ত রচিত 'গসপেল' নিয়ে তৈরি হয় নতুন বাইবেল বা নিউ টেস্টামেন্ট। ম্যাথু, মার্ক, ল্যুক ও জনই হচ্ছেন গসপেল রচয়িতা, সৌজন্যের ভাষায় গসপেল সংকলক। তবু খ্রীস্ট শাস্ত্রীর মধ্যেও উদ্ভূত হয়েছে বিভিন্ন মতবাদী সম্প্রদায়ের। ইসলামও আদম-আব্রাহাম বংশীয়ের মাধ্যমে প্রবর্তিত অপৌরুষেয় বাণী সমষ্টি। এ তিনটে ধর্মই মোটামুটি অভিন্ন মূল-কেনান অঞ্চলের তথা একালের ইজরায়েল থেকে মিশর অবধি উষর-সংকীর্ণ পরিসরের গোত্রীয় অবদান। সব নবীই আদম-আব্রাহামের বংশজ। উপমা-উৎপ্রেক্ষাযোগে বললে ধানের-গমের ছড়ার মতো কিংবা অভিন্নমূল রসুনের কোষের মতোই একটা বিশেষ প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক পরিবেশে গড়ে ওঠা প্রাচীনতম সংস্কৃতি-সভ্যতা-মন-মনন-মনীষার অবদান হচ্ছে স্থান-কালাতীত নিরাকার স্রষ্টা বা জগৎজীবন নিয়ন্তাশক্তি সম্বন্ধে উঁচুমানের এক দার্শনিক চিন্তা-চেতনা-যা সেদিনকার জগতে অনন্য অসামান্য অতুল্য এক যৌক্তিক-বৌদ্ধিক অনুমান, অনুভব ও উপলব্ধি প্রসূন। এ তিন অপৌরুষেয় আসমানী গ্রন্থও সবাইকে তিন ভাগে সংহত রাখতে পারেনি। বিরোধে-বিবাদে-বিচ্ছিন্নতায় খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-সংঘাতের শিকার হয়ে সবাই কখনো জয়ের, কখনো পরাজয়ের আনন্দ-গ্লানি নিয়ে আজকের এ মুহূর্ত অবধি বেঁচে-বর্তে রয়েছে স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্য চেতনা, গৌরব ও গর্ব নিয়ে নিখাদ-নিখুঁত সত্যের কুক্ষিধারীর তৃপ্তি, তুষ্টি ও হৃষ্টি নিয়ে। দ্বেষ-দ্বন্দ্ব, ঘৃণা-হিংসা-অবজ্ঞা-উপহাস ও মনের গভীরে রয়েছে সুপ্ত ও গুপ্ত কিংবা সংযমে রুদ্ধ। এ তিন ধর্মের বাইরেও রয়েছে নানা প্যাগান মত-পথ। সেসব মতবাদী পথিকরাও স্ব স্ব স্থূল বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা-অনুমানকে সত্য বলে জেনে, বুঝে ও মেনে ইহ-পারলৌকিক জীবন সম্বন্ধে রয়েছে নিশ্চিন্ত ও নিশ্চিত।

আজকের ভারতে 'হিন্দু' নামে পরিচিত কিন্তু বিচিত্র, বিভিন্ন এবং বিপরীত ও স্ববিরোধী মতবাদী অসংখ্য সম্প্রদায় রয়েছে। তাদেরও মিল শুধু 'হিন্দু' নামে। আর অমিল রয়েছে অন্য প্রায় সর্বপ্রকার চেতনায়-চিন্তায়, আচারে-বিশ্বাসে-সংস্কারে-ধারণায়-অনুমানে তারাও ভাবাবেগে বলে ওঠে যে তারাও অভিন্নমূল রসুনের মতোই আপাত ভিন্ন কোষ সমষ্টিমাত্র। ফলে শাস্ত্র অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও সব শাস্ত্রপন্থীই মতবাদের পার্থক্যের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দরুণ শত শত বছর ধরে কাড়া-মারা-হানার মাধ্যমে রক্তঝরা বিবাদে মেতে থেকেছে পৃথিবীর সর্বত্র।

যানবাহনের অভাবে উনিশ শতক অবধি পৃথিবীর অনেকাংশ ছিল অজ্ঞাত। পৃথিবীর আফ্রো-এশিয়ার ও আমেরিকার এবং য়ুরোপেরও মানুষ অভ্যস্ত ছিল গৌষ্ঠিক ও গৌত্রিক জীবনে, বাস করত বিচ্ছিন্নতায় ও পরস্পরের প্রায় অজ্ঞাতে সমুদ্র-পর্বত অরণ্যের অলঙ্ঘ্য বাধার ব্যবধানে। ফলে ভাষায়, পোশাকে, তৈজসে, আসবাবে, খাদ্যে, প্রাকৃতিক প্রতিবেশজাত চিন্তায়-চেতনায়, আচারে-আচরণে ব্যক্তির নামকরণে ঘটেছে বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা। সংস্কৃতি-সভ্যতার উন্মেষে বিকাশে উৎকর্ষেও থাকেনি সমতা ও সমকালীনতা, স্বাতন্ত্র্যের ও বিচ্ছিন্নতার ছাপ রয়েছে জীবনাচারের সর্বক্ষেত্রেই। ফলে এক ভৌগোলিক অবস্থানেও এক শাস্ত্রানুসারীর মধ্যেও মিলের মধ্যে অমিলই থাকে বেশি, আবার মানুষও যেহেতু প্রাণীরই একটি প্রজাতি বিশেষ, সেহেতু সহাবস্থানগত পারিবারিক ও সামাজিক, নানা প্রকারের দায়-দায়িত্বে, কর্তব্যে ও সহযোগিতায় স্নেহে-প্রেমে-মমতায়-শ্রদ্ধায়-ভক্তিতে-হিংসায়-ঈর্ষায়-ঘৃণায় অবজ্ঞায় এবং দ্বন্দ্বে-মিলনে প্রাজাতিক আচারে-আচরণে ভাব-চিন্তা-কর্মে সাদৃশ্যও দেখা যায়। স্থানিক, কালিক, স্বল্পকালীন ও বৈষয়িক বিরোধ-বিবাদ যেমন রক্তক্ষরা প্রাণহরা বিরোধ-বিবাদ-লড়াইয়ের রূপ নিয়েছে, তেমনি নিষ্ক্রিয় ও অব্যক্ত ঘৃণা-অবজ্ঞা-উপহাস এমন কি বিদ্বেষরূপে প্রজন্মক্রমে গৌত্রানুগত ও মতবাদী মানুষের অন্তরে গভীরের স্থায়ী হয়ে রয়েছে। বুনো-বর্বর-ভব্য-সভ্য, শিক্ষিত-অশিক্ষিত ভেদে কৃচিৎ এর ব্যতিক্রম দেখা যায় মাত্র। আজকের সভ্য জগতের ও রাষ্ট্রের মধ্যেও শাস্ত্রিক, গৌত্রিক, বার্ণিক, ভাষিক আঞ্চলিক বিরোধ-বিবাদ, উনজনের উপর অধিজনের শোষণ-শাসন-নির্যাতন প্রভৃতি আদি ও আদিম জান্তব হিংস্রতায় চালু রয়েছে দেখে মানুষকে জাত, জন্ম, বর্ণ, ধর্ম, ভাষা, নিবাস, যোগ্যতা নির্বিশেষে গ্রহণ-বরণের মতো মনুষ্যত্বের বা মানবতার বিকাশ-বিস্তার মানুষের সম্ভব কি-না, সে-বিষয়ে সন্দেহ জাগে। মানবপ্রেমী ব্যক্তি চিরকালই যেন কোটিতে গুটিকই থাকবে। তবে সংস্কৃতি-সভ্যতার, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক বিকাশের ফলে ব্যক্তি মানুষের এবং জনতার মধ্যে সংযম, পরমত ও আচরণ সহিষ্ণুতা, স্বাধিকারে স্বস্থ থাকার মৌলমানব অধিকার সৌজন্য বশে সহ্য ও স্বীকার করবে-এতোটুকু আশা ও আশ্বাস কি আজো ১৯৯৪ সনেও প্রত্যাশিত কিংবা বাঞ্ছিত হয়ে উঠবে না? মিলের মধ্যে কেবল অমিল বাড়তে থাকবে? অমিলের মধ্যেও আত্মসংযমে, পরমত ও আচরণ সহিষ্ণুতায় এবং সংস্কৃতিমানের সৌজন্যে মিল-মিলন সম্ভব করে তুলবে। তার কারণ শাস্ত্রে ভিন্ন হলেও ভৌগোলিক অবস্থান এবং আর্থিক ও শ্রেণীস্বার্থ আর ভাষিক-আচারিক অভিন্নতা, পারিবেশিক ও প্রাতিবেশিক প্রয়োজনে খাদ্যে, পোশাকে, ঘরে-আসবাবে-তৈজসে অভিন্নতা, রোদ-বৃষ্টি-শৈত্যের অভিন্নতা প্রভৃতি মানুষকে পারস্পরিক স্বার্থে, সংযমে, সহিষ্ণুতায় সৌজন্যে জীবিকাক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও সহযোগিতায় সহাবস্থানে অনুপ্রাণিত করেও রাখে। কাজেই মন-মত-শাস্ত্রের অমিল সত্ত্বেও শাস্ত্রিক পালাপার্বণ, আচার-আচরণগত পার্থক্য সত্ত্বেও, ভাষায় বিশেষ বিশেষ শব্দ ব্যবহারগত ভিন্নতা বা বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও– অমিলের মধ্যেও মিলের ও মিলন-ময়দানের সন্ধান ও সুযোগ মেলে। প্রয়োজনেও মিলতে হয়। প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে, প্রতিরোধে, বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার যুদ্ধে, শোষক-শাসক-পীড়ক-বঞ্চক শ্রেণীর মধ্যে যেমন সহজেই স্বার্থে সংহতি ও ঐক্য সম্ভব হয়, তেমনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শোষিত, শাসিত, পীড়িত-প্রবঞ্চিত শ্রেণীর মধ্যেও তেমনি প্রতিরোধ প্রয়োজন ঐক্য ও সহযোগিতা সম্ভব, আবশ্যিক ও জরুরী বলে বিবেচিত হতে পারে। তাছাড়া, জাত জন্ম বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-নিবাস-যোগ্যতার বাধা কেউ কোথাও কখনো মানেনি বন্ধুত্ব-কাম-প্রেম লাভ-লোভ ও স্বার্থ সম্পৃক্ত জীবন-জীবিকা ক্ষেত্রে। হাটে-বাজারে, বেচা-কেনায় যেমন জাতিভেদ নেই, ঘুষে-সুদে-খাজনা আদায়ে যেমন জাতিভেদ নেই, তেমনি 'লোভের নিকটে যদি ফাঁদ পাতা যায়। নর-পশু-পাখি কে কোথায় এড়ায়।' আসলেই উচ্চ বিত্তের বিদ্যার ও বেসাতের মান-যশ-খ্যাতি-ক্ষমতা-দর্প-দাপট-প্রভাব-প্রতিপত্তিলিপ্সু ব্যক্তি বা শ্রেণীই মানুষে মানুষে শ্রেণীস্বার্থে ভেদ-বিরোধ-বিবাদের উন্মেষ, বিকাশ ও বিস্তার ঘটায় এবং দ্বেষ-দ্বন্দ্বের বীজ-পুতে রাখে সাধারণ সামন্তবাদী-গোত্রের গোষ্ঠীর মনে। ওদেরই স্বার্থে ওরা নররক্তে মাটি রাঙা করে মাঝে মধ্যে। শাহ-সামন্তের-সর্দারের কাল থেকে আজকে গণতন্ত্রের কালেও সেই নেতা-নায়ক-গদীলোভীরাই বাধায় গোত্রে গোত্রে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে, মতবাদী দলে দলে বিরোধ-বিবাদ লড়াই।

আরো একটি তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য এই যে, শাস্ত্রিক কর্মকাণ্ড ছাড়া একই ভৌগোলিক অবস্থানে একই ভাষিক সম্প্রদায়ের অন্য সর্বপ্রকারের থাকে অভিন্নতা। তেমনি একই শাস্ত্রপন্থীর বিশ্বাসে-সংস্কারে, ধারণায়, সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য যেমন থাকে, তেমনি স্থানিক, ভাষিক, জীবনযাত্রা পদ্ধতির, পোশাকের ও খাদ্যের পার্থক্যও থাকে সুপ্রকট, এমনকি বৈপরীত্যও থাকে। কাজেই শাস্ত্রিক স্বাজাত্য তেমনি কোন দৃঢ় ভিত্তিক বন্ধন বা সংহতি প্রসূ নয়।

AMARBOI.COM

গতিই জীবন ঃ স্থিতিই জরা-জড়তা ও জীর্ণতা

হোমোসেপিয়ন কিংবা সেপিয়নরা অজ্ঞতা বশে প্রকৃতির সবকিছুতেই গুপ্ত ও সুপ্ত শক্তি ও প্রাণ অনুমান করে ক্ষতির ভয়ে-আতঙ্কে-আশঙ্কায় সতর্ক পদচারণায় ও সভয় প্রয়াসে প্রযত্নে খাদ্য সংগ্রহ করত। এভাবেই সম্ভবত সর্বপ্রাণবাদ, যাদুবিশ্বাস ও ট্যাবু-টোটেম তত্ত্ব প্রভৃতির ঘটেছে উদ্ভব ও বিকাশ-বিস্তার। এমন সময় ছিল মানুষ যখন মাটির তৃণ থেকে আকাশের নক্ষত্র অবধি সব দৃশ্য পদার্থকে এবং অদৃশ্য কাল্পনিক-আনুমানিক অরিশক্তিকে (রোগের ও মৃত্যুর) এবং মিত্রশক্তিকে (স্বাস্থ্যের, সুখের, নিরাপত্তার ও কাঙ্ক্ষাপূর্তির) যাদুমন্ত্রে বশ করে, তোয়াজে প্রসন্ন রেখে অরিশক্তির ছোবল-কবল এড়ানোর এবং মিত্রশক্তির কৃপা-করুণা-দয়া-দাক্ষিণ্য প্রাপ্তির প্রয়াসী ছিল। অভিজ্ঞতার ও বুদ্ধির বিকাশের মান-মাপ-মাত্রা অনুসারে ক্রমে ক্রমে অরি-মিত্র শক্তির সংখ্যা কমে কমে অবশেষে কয়েকটি শক্তিতে কিংবা এক স্রষ্টা বা ঈশ্বরতত্ত্বে এসে থেমেছে। অন্যদিকে যারা জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তিবাদী ও সাহসী তারা নাস্তিক নিরীশ্বর হয়ে যৌথ জীবনের প্রয়োজনে নীতি-নিয়ম রচনা করে, তা মানার অঙ্গীকার করে জাগতিক জীবনকেই কেবল সত্য বলে জেনে, বুঝে ও মেনে নাস্তিক-নিরীশ্বরের সমাজও গড়ে তোলে। অরি-মিত্র শক্তিসাধক অদৃশ্য নিয়ন্তা, নিয়ামক স্বৈরশক্তির উপাসক সমাজে ব্যক্তি চরিত্রে যে-সব লাভ-লোভ-স্বার্থ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংক্রান্ত দোষ বা পাপ দেখা যায়, উক্ত সব নাস্তিক-নিরীশ্বর সমাজে তার থেকে বেশি কোন ব্যক্তিক-সামাজিক অপকর্ম-অপরাধ বেশি ঘটেছে বলে কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ সেকালেও মেলেনি, একালে কম্যুনিস্ট বা সমাজতান্ত্রিক সমাজেও মেলেনি, মেলে না। আর নাস্তিক-নিরীশ্বর যেসব ব্যক্তি নানা ক্ষেত্রে বিশ্রুতকীর্তি বা খ্যাতিমান তাঁদের চরিত্রেও মানবিক গুণের আধিক্যই তাঁদের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের মাধ্যমে বিশেষ অভিব্যক্তি পেয়েছে। ভারতের ষড়দর্শনের মধ্যে সংখ্যা, যোগ, বৈশেষিক দর্শন নিরীশ্বর। আর বৌদ্ধমত তৃষ্ণা-স্কন্ধ-মার ও অন্যশক্তি এবং জন্মান্তর ও প্রেতলোক স্বীকার করলেও ঈশ্বর সম্বন্ধে নির্বাক। জৈনধর্মে ঈশ্বর নিষ্ক্রিয় অস্তিত্বে টিকে আছেন বটে, তবে জৈনমত অনেকান্ত তত্ত্বভিত্তিক। অর্থাৎ কর্মমাত্রই অনেক কারণ প্রসূণ-এমনি এক যুক্তিসিদ্ধ তত্ত্ব জৈনমতের ভিত্তি। যদিও ওদের মোক্ষও পাপ-পূণ্য রূপ অদৃশ্য ও আনুমানিক শক্তিনির্ভর। এ জন্যেই বৌদ্ধ-জৈনমতকে নাস্তিক্য মত বলা চলে না, কেবল-দেব-দ্বিজ-বেদ বিরোধী মত বলে অভিহিত করাই বাঞ্ছনীয়। এদের ঈশ্বর নেই বা নিষ্ক্রিয় হলেও অন্য শক্তি এদের চেতনা, নির্বাণ ও মোক্ষ নিয়ন্ত্রণ করে। তবু বৌদ্ধ মতকে আমরা নৈরাত্ম্য-নিরীশ্বর মত বলে স্বীকার করি। কিন্তু অপশক্তি স্কন্ধও তো অদৃশ্য শক্তি বা প্রবৃত্তিবন্ধন, যা থেকে বিনা সংযমে-সাধনায় মুক্তি তথা অনস্তিত্বে বিলীন হওয়া বা নির্বাণ লাভ করা অসম্ভব। কাজেই জৈন-বৌদ্ধ মত একান্তভাবে ইহজাগতিক জীবনে সীমিত মত নয়। জন্মান্তর, প্রেতলোক প্রভৃতি এসব মতকে এবং শাস্ত্রকে ইহজাগতিক ও পরলোকে প্রসৃত রেখেছে। এগুলো প্রত্যক্ষে-পরোক্ষে তাই এক প্রকারের আস্তিক্যই। কাজেই এদেরও শাস্ত্র-পালা-পার্বণ-আচার-আচরণ-মন্ত্র-সাধ্য-সাধনা রয়েছে।

সবযুগেই কিছু জ্ঞানী-যুক্তিবাদী সাহসী লোক ছিলেন, যাঁরা জানতেন ও বুঝতেন যে, যা যুক্তিগ্রাহ্য নয়, যা জ্ঞানগত নয়, যা প্রমাণসাধ্য নয়, যা প্রত্যক্ষ নয়, তা বিস্ময়-কল্পনা-অনুমান-ভয়-ভক্তি-ভরসার আলম্বন হয়েছে ক্ষতিভীরু-প্রাপ্তিলিপ্সু অসহায় মানুষের। আশাহত, ভীরু মানুষের আজো বল-ভরসা-প্রবোধ পাওয়ার মতো কোন অদৃশ্য শক্তির কৃপা-করুণা-দাক্ষিণ্যের আশা ও আশ্বাস বুকে পুষে জীবনপথে এগুতে হয়।

রামায়ণের জাবালি ঋষি ছিলেন একজন খলপ্রবৃত্তির ও চরিত্রের লোক। পাপ-পুণ্যে তাঁর আস্থা ছিল না। তিনি যথাপ্রয়োজনে যথাস্থানে যথাকালে যথাপাত্রে বোল ও ভোল পাল্টাতেন। এমন লোক নাস্তিক না হয়েই পারে না। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এরশাদকেও তাঁর ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে কাপট্য দেখে শুনে আমার মনে হত তিনি ছিলেন নাস্তিক, ইহজাগতিক জীবনের শক্তিতে, সম্ভোগে-সম্মানে-ক্ষমতায় ছিলেন আস্থাবান। প্রয়োজনে পারতেন না, করতেন না, বলতেন না, হেন কর্ম ও কথা ছিল না। কিন্তু আমাদের প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যে কেবল এ মাটিলগ্ন মর্ত্য জীবনকেই সত্য বলে জানত এবং আর সব মিথ্যে কল্পনা বলেই মানত, তেমন লোকের সংখ্যা কম ছিল না। বরং বেশিই ছিল অজ্ঞ-অনক্ষর শাসিত-শোষিত-বঞ্চিত-পীড়িত মানুষের মধ্যে। প্রমাণ-নাস্তিক্য-নিরীশ্বর-নৈরাত্ম্য তত্ত্বকে তথা দর্শনকে সুপ্রাচীনকাল থেকেই অভিহিত করা হয় 'লোকায়ত' দর্শন নামে। 'লোক' শব্দের সংজ্ঞা বা সংজ্ঞার্থ কিংবা অভিধা যদি হয় 'ফোক' প্রাকৃতজন বা অর্জিত আচরণরিক্ত মানবাকৃতির প্রাণী প্রজাতিমাত্র। তা হলে মানতেই হবে কিছু সর্দার-শাহ-সামন্ত শ্রেণীর বর্ণহিন্দু তথা ব্রাহ্মণ্যবাদী ব্যতীত অন্যরা ছিল শূদ্র, (তখনো হয়ত সৎ ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নম-শূদ্রে বিভক্ত ছিল না) যারা ছিল 'লোক' এবং তারাই ছিল 'ব্রাত্য' দেব-দ্বিজ-বেদ মানা-সমাজ বহির্ভূত।

ব্রাহস্পত্য দর্শনের প্রবক্তা-প্রবর্তক বৃহস্পতি বলেছেন স্বর্গ নেই, আত্মা নেই, মোক্ষ নেই, পরলোক নেই, জন্মান্তর নেই, কর্মফল নেই। লোক প্রতারণায় জীবিকা অর্জনের জন্যেই বুদ্ধিহীন-পৌরুষহীন লোকেরা (বুদ্ধি-পৌরুষহীনানার জীবিকা), ত্রিবেদ যাঁরা বিন্যস্ত করেছেন তাঁরা ধূর্ত ভণ্ড নিশাচর (ত্রায়োবেদস্য কর্তারো ভণ্ড ধূর্তা নিশাচরাঃ)। এ ধারারই প্রবাদপুরুষ চার্বাক কেবল এ মর্ত্য জীবনেই আস্থা রাখতেন এবং এ জীবনের সম্ভোগসুখেও ছিল তাঁর আসক্তি। তাঁরই উক্তি ও জীবনদর্শন বলে পরিচিত ও প্রচলিত 'যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ। ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ। ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগম কুতঃ।' এ সূত্রে উমর খৈয়ামের রুবাই মনে পড়বে। 'সব বুলি মিছা, শুনহ গোপনে একটি বচন সত্যসার। যে ফুল নিশীথে পড়িছে ঝরিয়া। সে নাহি কখনো ফুটিবে আর'। ঋষি জাবালিও রামকে বলেছিলেন 'ধূর্ত লোকের রচিত শাস্ত্রের লক্ষ্যই হল অজ্ঞ জনগণকে নিজেদের স্বার্থে বশে ও শাসনে রাখা। পরলোক নেই, এ প্রত্যক্ষ মর্ত্য জীবনই আছে। এসব তত্ত্ব প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধদের মধ্যে আট/নয়শ' বছর আগে চালু ছিল। চর্যাকার ও দোঁহাকার 'সরহ' প্রমুখ তার প্রমাণ।

কেবল এদেশে নয়, প্রাচীন গ্রীসে সক্রেটিস অরাকেলে (Oracle) আস্থা রাখতেন না। গ্রীক দার্শনিকরা এ সময়ে পৃথিবীর উৎপত্তি জল, মাটি, বায়ু বা অগ্নি থেকেই হয়েছে বলে অনুমান করতেন। প্রাচীনতম সভ্যতার সৃষ্টিকারিগররূপে বর্ণিত মিশর, ব্যাবিলন, গ্রীস, মহেনজোদারো-হরপ্পা-চীন প্রভৃতি নয় কেলে, আদি ও আদিম স্তরের গোত্রগুলো স্রষ্টা ও সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে বিচিত্র অনুমাননির্ভর কাহিনী বয়ান করেছে। বিচ্ছিন্নতায় ও স্বাতন্ত্র্যে পারস্পরিক অজ্ঞতবাসের ফলে এসব অজ্ঞতা ও বুদ্ধির দৈন্য জাত গৌত্রিক বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণাপ্রসূত 'সৃষ্টি পত্তন তত্ত্বে' কেবল অবাস্তব স্থূল বুদ্ধি নয়, স্ববিরোধিতা ও বৈপরীত্যও প্রকট। এ ক্ষেত্রেও দেখা যায় যত মন, তত মত, তত পথ। বুনো-বর্বর যুগের অবসানের পরেও ভব্য-সভ্য-জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি প্রয়োগে বানানো শাস্ত্রিক বিধি-নিষেধেও অযৌক্তিক অবৌদ্ধিক অসঙ্গতি থেকেই গেছে। তাই ইহুদী, ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ-জৈন-খ্রীস্টান-মুসলিম শাস্ত্রের যৌক্তিকতা ও উপযোগ সম্বন্ধে কালে কালে স্থানে স্থানে প্রজন্মক্রমে কোন কোন জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তিবাদী সাহসী লোক প্রশ্ন তুলেছে, দ্রোহও করেছে, বর্জনও করেছে। এভাবেই ইহুদী, ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রীস্টান, মুসলিম সমাজে বহু বহু উপমত সম্প্রদায় ও অনেক বিচ্ছিন্ন ও বিভিন্ন মতবাদী দল বা সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে। এ সেদিনকার ব্রাহ্মমতেও রয়েছে তিনটে উপদল-আদি, সাধারণ ও নব বিধান। মুসলিমদের মধ্যে কেবল শিয়া-সুন্নী নয়, এর ইমামপন্থী সুন্নী সম্প্রদায়ও গড়ে উঠেছে বারোশ' বছর আগেই। কেবল মোতাজেলারা নয়; বাহাই, আহমদীয়া কিংবা কোরআনের নির্দেশ নিরপেক্ষ নানা সূফীমত ও গুরুবাদী মতও কালে কালে গড়ে উঠেছে। এতেই বোঝা যায়, সব মত-পথ-পদ্ধতির ক্ষেত্রেই দেশ-কালের-মানুষের স্বকালীন জীবনযাত্রার প্রয়োজনে অদল-বদল-বর্জন-পরিবর্তন আবশ্যিক ও জরুরী হয়ে পড়ে। এক্ষত্রে নররূপী নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের মহাভারত কাব্যের নায়ক বা শাস্ত্রগ্রন্থের শাস্ত্রবেত্তার ভূমিকা স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি সনাতন বা পূর্বতন অনেক নীতি-নিয়ম-ন্যায্যতা লঙ্ঘন করিয়েছেন পঞ্চ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাণ্ডবদের ও তাঁদের সমর্থকদের দিয়ে জরাসন্ধ, জয়দ্রথ, অভিমুন্য, কর্ণ, ভীষ্ম প্রভৃতি হত্যায়। তিনি যেসব ছল-চাতুরির আশ্রয় নেয়ার জন্যে পাণ্ডবদের প্রশ্রয় ও পরামর্শ দিয়েছেন, তাতে পূর্বেকার নীতিধর্মের ব্যত্যয় ঘটেছে অবশ্যই। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অর্জুনের কাছে স্বীকারই করেছেন সদম্ভে যে, 'আমি যা কিছু' করেছি তো তোমাদের হিতার্থেই, নইলে কি তোমরা বিজয়ী হতে পারতে? (আক্ষরিক অনুবাদ নয়।) উল্লেখ্য যে, শাস্ত্রমাত্রই প্রবল শ্রেণীর তৈরি। দার্শনিক সেনেকা তাই বলেছেনঃ সাধারণে শাস্ত্রকে সত্য বলে মানে, জ্ঞানীরা মিথ্যে বলে জানে, আর শাসকরা কেজো বলে বোঝে। উঁচু প্রবলশ্রেণীর স্বার্থেই তৈরি ও পরিবর্তিত-পরিবর্ধিত হয়েছে শাস্ত্র। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, কৌটিল্য থেকে যে-কোন কালের যে-কোন দেশের শাস্ত্রের লক্ষ্য অভিন্ন। অতএব, দেশ-কাল-সমাজ-সরকার-রাষ্ট্রের প্রয়োজনে গতানুগতিক নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ, প্রথা-প্রদ্ধতি বর্জন করে নতুন চেতনায় নতুন চিন্তায় পুষ্ট হয়ে উপযোগরিক্ত নীতি-নিয়ম পরিহার করে, বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণায় ভরসা বর্জন করে, একালে বিজ্ঞানের তথ্যে, তত্ত্বে ও সত্যে আস্থা রেখে, আবিষ্কৃত-উদ্ভাবিত-নির্মিত যন্ত্র প্রকৌশল প্রযুক্তিনির্ভর জীবন-জীবিকা গ্রহণ-বরণ করে আধুনিক, উদার, মুক্ত, যৌক্তিক, বৌদ্ধিক জ্ঞান-বিজ্ঞানসম্মত জীবন-সমাজ-সরকার ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা চালু করার জন্যে প্রয়াসী হওয়াই একালের মানবতার তথা মনুষ্যত্বের দাবি। একালে আমাদের প্রকৃতিবাদী, প্রত্যক্ষবাদী, ইহলৌকিকতাবাদী, বিজ্ঞানবাদী, যুক্তিবাদী মুক্তবুদ্ধিবাদী, জ্ঞানবাদী বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক জীবনঘনিষ্ঠ আধুনিক তথা কালসচেতন ও প্রয়োজন অনুগ মানববাদের অনুরাগী, অনুগামী ও অনুগত জাগতিক তথা মাটিলগ্ন মর্ত্যমানব হতে হবে। আমাদের মনে মগজে প্রাণিজগতের মধ্যে অভিন্ন মানব প্রজাতিচেতনা জাগ্রত করা বিশ্বশান্তির লক্ষ্যে নির্বিরোধ সহাবস্থানের প্রয়োজনে আজ আবশ্যিক ও জরুরী হয়ে উঠেছে। এ হচ্ছে যুগের দাবি। এ দাবি না মানা আত্মহননের পথ বেছে নেয়ার নামান্তর হবে মাত্র। আমরা জানি গতিতেই জীবন, স্থিতিতে, স্থবিরতায় মৃত্যু। কেননা স্থিতিতে, অনড়তায়-জরা, জড়তা ও জীর্ণতা সমভাবে গ্রাস করে ব্যক্তিকে, সমাজকে, সরকারকে ও রাষ্ট্রকে আর মানবিকতা কে বা মনুষ্যত্বকেও। এ সূত্রে এ-ও উল্লেখ্য যে, মার্কসবাদ মানুষকে নিরীশ্বর মুক্তবুদ্ধির যুক্তিবাদী ও মানববাদী করে তুলেছিল বহুলাংশে। অন্তত হুজুগে পড়ে নিজেদের নির্বিশেষে মানববাদী বলে প্রচার-প্রচারণা চালাত। এখন ওদেরই এক অংশ প্রতিক্রিয়াশীল অমানুষ হয়ে উঠেছে য়ুরোপে।

বঞ্চনায় নয়, বণ্টনে বাঁচার দিন সমাগত

প্রায় দেড়শ' বছর ধরে মার্কসবাদ সম্বন্ধে উপহাস, অবজ্ঞা, বিতর্ক, বিবাদ-বিরোধ, দমন-দলন, পীড়ন-হত্যা প্রভৃতি সামাজিক, সরকারি ও রাষ্ট্রিকভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে চলে আসছে। রক্তক্ষরা প্রাণহরা লড়াই-যুদ্ধ-আন্দোলন প্রভৃতি ছিল এ মতবাদের নিত্যসঙ্গী সেই প্যারিসকম্যুয়নের কাল থেকেই। বাধা-বিঘ্ন-দ্বেষ-দ্বন্দ্ব অতিক্রম করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিতও হয়েছিল পৃথিবীর প্রায় এক-চতুর্থাংশ জুড়ে। য়ুরোপে আপাতত বিলুপ্ত হলেও অন্যত্র আজো কোন রকমে টিকে রয়েছে। আমরা আজ কোন তর্কে বিতর্কে যাব না।

আমাদের বক্তব্যই কেবল দু'চার কথায় জানিয়ে দেব পাঠকদের, আমাদের উদ্দেশ্যে তাঁদের মনে-মগজে পুনর্বিবেচনার আবেগ জাগিয়ে দেয়া।

আদি ও আদিম এক সাম্যের সমাজ আমরা কল্পনা বা অনুমান করি। যখন হোমোসেপিয়ন বা সেপিয়ন স্তরের প্রাণী প্রজাতি অন্য প্রাণীদের মতো নিজের ক্ষুধার খাদ্য, তৃষ্ণার জল নিজেই যোগাড় করত। খাদ্য সঞ্চয়ের ও উৎপাদনের বুদ্ধি যখন তার ছিল না, ছিল না স্থায়ী নিবাস। ছিল না রোদ-বৃষ্টি-শৈত্য থেকে আত্মরক্ষার জন্যে কৃত্রিম উপায়ে ব্যবস্থা গ্রহণের আগ্রহ। উঁচু বন্ধুর বৃক্ষলতা ঝাড়-জঙ্গলবহুল পার্বত্য অঞ্চল যখন ছিল অন্য প্রাণীদের মতো তারও নিরাপদ নিরুপদ্রব অন্তত আপদ-বিপদের শঙ্কাবিরল গুহাশ্রয়ী জীবন।

কাজেই ফলমূল-মৃগয়াজীবী মানুষ যখন যূথ বা দলবদ্ধ হয়ে শিকারে কিংবা অন্যপ্রকার সহযোগিতায় খাদ্য সংগ্রহ করায় অভ্যস্ত হয়, তখনো সংগৃহীত খাদ্য সঞ্চয় করে রাখার কৌশল বা পদ্ধতি জানা ছিল না বলে, কাড়া-মারা-হানার কারণ ঘটত না নিজেদের মধ্যে সহজে। অন্য প্রাণীর মতো ক্ষুধা-তৃষ্ণা আপাতত মিটলেই মানুষও তুষ্ট, তৃপ্ত ও হৃষ্ট থাকত।

তারপরে যখন তারা আগুনের উৎপাদন ও ব্যবহার শিখল, কৃত্রিম উপায়ে আত্মরক্ষার ও শিকারের পাথুরে অস্ত্র নির্মাণে সমর্থ হল, আরো কিছু আবিষ্কারে-উদ্ভাবনে-সৃষ্টিতে ঋদ্ধ হয়ে প্রাণিজগতে অনন্য অতুল্য হয়ে কৃত্রিম জীবনযাপনে সমর্থ ও অভ্যস্ত হতে থাকল, আগুনে শেকে খাওয়া শিখল, ঘর তৈরি করা শিখল, দলবদ্ধ হয়ে 'আত্মরক্ষা করতে শিখল' খাদ্য উৎপাদন, সংগ্রহ ও মজুদ করার বুদ্ধি ও কৌশল আর পদ্ধতি আবিষ্কার-উদ্ভাবন-সৃষ্টি করল, তখনই তাদের মধ্যে প্রবলেরা হল পরস্বাপহারী, পরান্নজীবী। বাহুবল, বুদ্ধিবল ও জনবল প্রয়োগে শাসন-শোষণ-পীড়ন-দমন-দলন করে কেড়ে-মেরে-হেনে দুর্বলকে শায়েস্তা ও অনুগত রাখার সুবিধে সুখ অনুভব-উপলব্ধি করতে ও সুযোগ পেতে শিখল। মনুষ্যসমাজে কোন্দল সে-সময় থেকেই স্থায়ী সমস্যারূপে প্রকট হল। আমরা আমাদের কল্পচিত্র এখানেই শেষ করলাম। তবে আমরা সবাই জানি চিরকাল কৃপা-করুণা-দয়া-দাক্ষিণ্যপ্রবণ কিছু মানুষ ছিলেনই। তাঁরাই করুণা বশে অন্যদের একই দেশনা দিয়েছেন দেশে দেশে, গোত্রে গোত্রে, কালে কালে। বলেছেন, ক্ষুধার্তকে অন্ন দাও, তৃষ্ণার্তকে জল দাও, রোগীর শুশ্রূষা কর, রোগের চিকিৎসা কর, অসহায়ের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দাও, আত্মীয় পরিজনকে অন্নে-বস্ত্রে পোষ, প্রতিবেশীকে অন্ন-বস্ত্র দাও। কাঙাল-অনাথ-এতিম-মিসকিনকে দান কর, দানে-দয়ায়-দাক্ষিণ্যে, কৃপায়-করুণায়-প্রীতি-মৈত্রীযোগে মানুষের ভালো কর, মানুষের ভালো চাও, মানুষকে ভালোবাস, জ্ঞাতির প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন কর। এসব বহু বহু মহৎ দেশনা, আপ্তবাক্য শাস্ত্রে সমাজে নীতিকথায় চালু রয়েছে। যদিও আজো ঝড় ঝঞ্ঝা-খরা-বন্য-মারীপীড়িত মানুষের ত্রাণসামগ্রী হরণের, আত্মসাৎকরণের মানুষের অভাব নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলা বাহুল্য, এসব মহৎ কথাগুলো প্রবল শোষক-শাসক শ্রেণীর স্বার্থে গণদ্রোহ এড়ানোর লক্ষ্যে কপটোক্তি মাত্র। দুনিয়ার কোন শাস্ত্রেই দাস ও দরিদ্রবিহীন সমাজ সম্ভব বলে মানা হয়নি। শ্রেণীস্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখার গরজেই গণদাবির চেতনা রুদ্ধ রাখার লক্ষ্যেই দান-দয়া-দাক্ষিণ্য, কৃপা-করুণা-পুণ্যকর্ম বলে প্রচার করা হয়েছে। এতেই কাড়া-মারা-হানা, হুকুম-হুমকি-হামলা প্রভৃতিযোগে গণমানবকে বঞ্চিত রাখা, নিয়তিবাদী রাখা আর দমনে-দলনে কাবু রাখা আজো সম্ভব হচ্ছে। অদৃষ্ট, কপাল লিখন, নিয়তি, কর্মফল প্রভৃতি শাস্ত্রিক প্রচার-প্রচারণার অঙ্গীভূত হওয়ায় আশৈশব শ্রুতিস্মৃতিলব্ধ বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণাজাত মগজধোলাইয়ের ফলে অজ্ঞ ও জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি প্রয়োগে অসমর্থ ও অনীহ, গতানুগতিক চিন্তায়-চেতনায় বিশ্বাসে-সংস্কারে-ধারণায়-আচারে-অভ্যস্ত মানুষ দুর্দশাকে অমোঘ নিয়তি বলেই মেনে নিয়েছে। সর্বপ্রকার শোষণ-দুর্দশা-দুর্ভোগ-বঞ্চনার উৎস আসমানী শক্তি বলে জেনে বুঝে মেনে তারা আজো প্রতিকার প্রয়াসে, প্রতিবাদে ও প্রতিরোধে অনীহ। রোমান দার্শনিক সেনেকা তাই এ ফাঁকির ফাঁদ সম্বন্ধে বলেছিলেন যে, 'Religion is regarded by the people as true, by the wise as false and by the rulers as useful'. আমরা সব যুগের, সব দেশের সব শাস্ত্রে প্রবলের শ্রেণীস্বার্থে এ ফাঁকির ফাঁদ সযত্ন প্রয়াসে নির্মিত ও রক্ষিত দেখতে পাই। মনু-যাজ্ঞবল্ক্য-কৌটিল্য থেকে ম্যাকিয়াভেলি অবধি সবাই সমাজপতি ও সর্দার-শাহ-সামন্তকে এ বুদ্ধিই যুগিয়েছেন। তাই পথিবীর কোন শাস্ত্রেই মানুষের, নারী-পুরুষের সমাধিকার নেই। দাস, ভূমিদাস, নিঃস্ব নিরন্ন কাঙাল-মিসকিন ও চিরবঞ্চিতা পুরুষসম্ভোগ্যা ও পুরুষাধীন নারী আজ অবধি শাস্ত্রিক অনুমোদনে স্বাধিকার ও সমাধিকার পায়নি কোথাও। ঠকাঠকির দিন অপসৃত হচ্ছে।

যুগান্তর ঘটে যাচ্ছে দ্রুত দৃশ্যে ও অদৃশ্যে। সাক্ষর নিরক্ষর নির্বিশেষে নারী-পুরুষ শোষণ-বঞ্চনায় ক্ষুব্ধ ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠাকামী হয়ে উঠছে তারে-বেতারে যন্ত্রে-প্রকৌশলে-প্রযুক্তিতে প্রাগ্রসর পৃথিবীর মানুষের হালচাল স্বকানে শুনে ও স্বচক্ষে দেখে এবং এ-ও বুঝেছে বঞ্চনার উৎস আসমানী শক্তি নয়, অদৃশ্য অরি-মিত্র নিয়ন্তা-শক্তি নয়। প্রতিবেশী প্রবল খল শঠ দুষ্ট দুর্জন দুর্বৃত্ত দুষ্কৃতী চালবাজ ধূর্ত স্বার্থবাজ প্রবল শোষক-শাসক ও অর্থ-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণকারীরাই যে শোষণ-বঞ্চনার দমন-দলনের কর্তা, তা বুঝে ফেলেছে। কাজেই এখন ব্যক্তিমাত্রই সত্তার মূল্য, মর্যাদা, স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধিকার সচেতন হয়ে উঠেছে। এদের দাবি মেটাতেই হবে। এদের স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হতে দিতেই হবে। পৃথিবীর সমুদ্র-পর্বত-অরণ্য বাড়েনি, বাড়েনি সম্পদ, অথচ জনস্ফীতির ফলে বেড়েছে চাহিদা। কাজেই সম ও সহস্বার্থে সবাইকে সামবায়িক সহযোগিতায় নির্বিরোধে নির্বিবাদে দানে-প্রতিদানে, আপসে, সহাবস্থান করতেই হবে। বাঁচতে হবে সম্পদের যৌক্তিক বণ্টনে। বঞ্চনায় নয়, বণ্টনে বাঁচার দিন সমাগত! কেননা বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় 'না খাইয়া মরিয়া যাইবার জন্য কেহ এই পৃথিবীতে আসে নাই।' আপসে সম্পদের বণ্টনে বাঁচার অঙ্গীকারেরই অপর নাম সমাজতন্ত্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এমন মানব জমিন রইল পতিত'

স্বপ্ন দেখছিলাম শেষ রাতে। আমাদের গাঁয়ের বাড়ির দীর্ঘ ও বিস্তীর্ণ উঠোন জ্যোৎস্নাপ্লাবিত। রাত গভীর নয়, ঘরে ঘরে তখনো সবাই জেগে আছে। তবু উঠোন-ভরা জ্যোৎস্নার আকর্ষণে কেউ ঘরের বাইরে আসছে না, আমি মনে মনে বিস্ময় ও কিছুটা ক্ষোভ অনুভব করছি। ঠিক এমনি সময়ে ঘুম ভেঙে গেল, শুয়ে শুয়ে জাপানী আদলে কবিতা আওড়ালাম: আকাশে চাঁদ/মর্ত্যে জ্যোৎস্না/ঘুমুবে কে!

প্রতিদিন সূর্য ওঠে, সূর্য অস্ত যায়, তার রূপ সুদীর্ঘ জীবনে কয়জনে কয়বার সানন্দে অনুভব, উপলব্ধি ও উপভোগ করে? প্রতিমাসেই পূর্ণিমার আগে-পরে কয়রাত 'জ্যোৎস্নাপুলকিত যামিনী' নিস্তব্ধ সৌন্দর্য সাগরে ভাসে। কে কয়দিনই বা সুদীর্ঘ জীবনে তার রূপ-লাবণ্য উপভোগ করার সুখ অনুভব করে সচেতন মনে। কারই বা চিত্তলোক ভাবে-বিভাবে আলোড়িত হয় সে রূপে!

আজন্ম শহরে লালিত লোকেরা এবং শহরবাসীরা বিজুলিবাতির দৌরাত্ম্যে চাঁদের আলোর সৌন্দর্য অনুভব-উপভোগের সুযোগই পায় না। চাঁদশোভিত রাত্রি যে বিভাবরী, রাত যে শর্বরী সে-খবর কয়জনে রাখে!

প্রকৃতি বা নিসর্গও যে জানার, বোঝার, শেখার, অনুভবের, উপলব্ধির জগৎ ও বিষয়, তা আমরা কয়জনে জানি? আমাদের জীবনচেতনার উন্মেষ-বিকাশ-বিস্তারের জন্যে যে প্রকৃতিচেতনা আবশ্যিক ও জরুরী, তা আমাদের মনেও জাগে না। প্রাকৃতিক জগৎও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের মতোই মনের ও মর্মের বিকাশ-বিস্তারের জন্যে, অনুভব-উপলব্ধির জগতের প্রসার ঘটানোর জন্যে, মনোজীবনের স্বাস্থ্যের পরিচর্যার জন্যে, আমাদের সুপ্ত ও গুপ্ত বৃত্তির সুষম মানবিক গুণের অনুশীলনের জন্যে আবশ্যিক, তা আমরা কখনোই উপলব্ধি করি না। এর ফলেই আমাদের মধ্যে প্রত্যাশিত মনুষ্যত্বের, মানবিক গুণের বিকাশ-বিস্তার ও প্রকাশ ঘটে না। টবের গাছের মতো আমাদের মানবিক গুণ অবাধ বৃদ্ধির সুযোগ বঞ্চিত হয়ে টবে রুদ্ধ ও বদ্ধ থাকে। বেঁচে থাকে বাড়ে না। তাই বাঞ্ছিত মাত্রার মনুষ্যত্ব মেলে না মানুষে। মানবিক গুণে মাপে-মানে-মাত্রায় সাধারণ মানুষ ম্যালেরিয়া-কালাজ্বরে রুগ্ন-রোগা-পটকা। জরা-জড়তা-জীর্ণতাক্লিষ্ট ও খিন্ন দেহে-প্রাণে-মনে। এমনি মানুষের আধিক্যে পরিবার, শাস্ত্র, সমাজ, সরকার, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্র থাকে অবক্ষয়গ্রস্ত, গতানুগতিক আচারের ও অভ্যাসের লৌহকঠিন খাঁচায় আবদ্ধ। না বাড়ে না মরে। কেবল বেঁচে থাকে– আর ঈর্ষায়, হিংসায়, ঘৃণায় অবজ্ঞায়, রোষে, ক্ষোভে, অপূর্তবাঞ্ছার জ্বালায় ভোগে।

আমাদের মনের জমি, দেহের শক্তি প্রাণের ঐশ্বর্য সুপ্ত ও গুপ্তই থেকে যায়, পরিণামে হয় লুপ্ত। অথচ এ মনের জমি, দেহের শক্তি, প্রাণের পুঁজি সচেতন সযত্ন প্রয়াসে কাজে লাগালে আমাদের মনুষ্যত্ব-মানবিক গুণ-মানবতা পেত বিকাশ-বিস্তার। অতএব, এ মানবজন্ম, এ মানবজমি রইল পতিত/আবাদ করলে যে ফলত সোনা' তা আমরা ভেবে কখনো আফসোস করি না। যদিও জানি দেহকে ব্যায়ামে-অনুশীলনে অসামান্য শক্তির ও নৈপুণ্যের আধার করা সম্ভব, এ প্রাণ-মন অক্ষত পরিচর্যায় অন্নের ও আনন্দের এবং বুদ্ধি-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুক্তি-জ্ঞান-বিবেকের উৎস বা আকর হতে পারে। মগজ-মনন-মেধা-মনীষা যে মানুষের অশেষ শক্তির ও সামর্থ্যের আকর, তা বিজ্ঞানীর আবিষ্কারে-উদ্ভাবনে, অন্যদের শিল্প-সাহিত্য-দর্শন সৃষ্টিতে সুপ্রকাশিত।

তবু অশিক্ষাদুষ্ট আমাদের রাষ্ট্রের ও রাষ্ট্রবাসীর ব্যবহারিক, বৈষয়িক ও মানসিক উন্নতির উৎকর্ষের তেমন সাক্ষ্য-প্রমাণ-দৃষ্টিগ্রাহ্য কিংবা অনুভূত হয় না। আমরা কেবল শাস্ত্রনিষ্ঠ, গোত্রনিষ্ঠ, সম্প্রদায়লগ্ন থাকতে চাই। শাস্ত্রিক পরিচয়ে ইহুদী-খ্রীস্টান-জৈন-বৌদ্ধ, হিন্দু-মুসলিম হয়েও থাকতে চাই, নির্বিশেষে 'মানুষ' হতে, মনুষ্যত্বে ঋদ্ধ, মানবতায় সিদ্ধ হতে চাই না। অথচ এ যুগের দাবি হচ্ছে, মানুষকে কেবল মানুষরূপেই গ্রহণ-বরণ করতে হবে জাত জন্ম বর্ণ ধর্ম ভাষা নিবাস যোগ্যতা নির্বিশেষে। একাল বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক লেনদেন, সম্পর্ক-সম্বন্ধ-সমাজসম্পৃক্ত। একালে বিচ্ছিন্নতায় ও স্বাতন্ত্র্যে বাঁচা যায় না, যাবে না। আমরা বিশ্ববাসীরা আজ একই হাটের হাটুরে, যানবাহনের ও তার-বেতারের বদৌলত প্রাক্তন অজানা-অনন্ত-অলঙ্ঘ্য বৃহৎ পৃথিবী আজ এক ক্ষুদ্র জনপদে সংহত। কাজেই কালো-ধলোর, গোষ্ঠী-গোত্রের, শাস্ত্র-সমাজের ব্যবধান আজ মিলনের, সামবায়িক সহযোগিতার, উৎপাদিত ও নির্মিত পণ্যের বাজার সৃষ্টির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না, পারবে না। স্বাতন্ত্র্য, অসহযোগ ও বিচ্ছিন্নতা আজ আত্মহননের নামান্তর মাত্র। মানুষ নির্বিশেষকে জাত জন্ম বর্ণ ধর্ম ভাষা নিবাস যোগ্যতা নির্বিশেষে কেবল স্বপ্রজাতির বা জ্ঞাতি বলে বরণ করার দিন এসে গেছে। বিরোধ-বিবাদের, প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণ অবশ্যই থাকবে ঘরে-বাইরে। কিন্তু মানুষ আজ যেমন যুদ্ধবিরোধী [সরকার ও সৈন্যদল ছাড়া], তেমনি তাদের হতে হবে কাড়া-মারা-হানা বিরোধীও। আজ এসব অঙ্গীকার সরকারের, সৈন্যদলের ও রাজনীতিক দলের নেই বলেই আজকের পৃথিবীও হিংসায় উন্মত্ত। আজকের পৃথিবীও মানুষের রক্তে রাঙা। এই জন্য আমরা বুনো-বর্বর যুগ অতিক্রম করে ভব্য-ভদ্র-সভ্য-সংস্কৃতিমান হয়েছি বলে দাবি করলেও সে দাবি ইতিহাসের নির্মোহ নিরপেক্ষ বিচারে টেকে না। মানুষ আজো যথাসময়ে যথাপ্রয়োজনে যথাস্থানে ও যথাপাত্রে শ্বাপদের চেয়েও হিংস্র, এবং প্রতিহিংসাপরায়ণতায় অতুল্য। আমাদের 'মানুষ' হতে হবে। 'সবার উপর মানুষ সত্য/তাহার উপরে নাই–। এ তত্ত্বে, তথ্যে ও সত্যে আস্থা রাখলে– 'সমসুযোগের সহজ জীবন আসবে।' আর 'আত্মগ্লানির ব্যর্থতা থেকে বাঁচবে'। [বিষ্ণু দে]

সেক্যুলার রাজনৈতিক দলই অকৃত্রিম একক রাষ্ট্রিক জাতি প্রতীক

বর্তমানেও অতীতের মতো দেশে অনেক রাজনৈতিক দল হয়েছে। সব দলই গণতন্ত্রবাদী কেউ ডান, কেউ বা বাম। সব দলেই রয়েছে কর্মসূচি এবং সবার কর্মসূচিও জনগণের কল্যাণমুখী। তবু কার্যক্ষেত্রে আজ অবধি গাঁ-গঞ্জের এগারো কোটি অজ্ঞ-অনক্ষর প্রান্তিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাষী, বর্গাচাষী, ক্ষেতমজুর, কলশ্রমিক কিংবা ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ পেশাজীবী নিঃস্ব-নিরন্ন মানুষের কোন উপকার হয়নি। ভোটের সময়ে সব দলেরই শহুরে শিক্ষিত-ধনী-মানী ভদ্রলোকেরা কৃষক ভাইয়ের মজুর ভাইয়ের তোয়াজ করেন। তাদের প্রতি দরদ দেখান, তাদের সুদিনের স্বপ্ন দেখান। কিন্তু ভোট ফুরোলে নির্বাচন শেষে হারা-জেতা সব দলই দেশের এগারো কোটি দরিদ্র মানুষের সেবার কথা, প্রয়োজন পূরণের কথা, চাহিদা মেটানোর দায়বদ্ধতা বেমালুম ভুলে যান। যদিও মেঠো বক্তৃতায় তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশে কোন কার্পণ্য থাকে না তাঁদের। ফলে 'গণতন্ত্র' 'জনসেবা' গরীবের ডাল-ভাতের কথা, দরিদ্রের অবস্থা ভাতে-কাপড়ে-শিক্ষায়-স্বাস্থ্যে উন্নত করার স্লোগান ও ওয়াদা অর্থহীন বহুল উচ্চারিত ও ঘোষিত মিথ্যা স্তোকবাক্যরূপে জনসাধারণের কাছে অবিশ্বাস্য হয়ে উঠেছে। ভদ্রলোকেরা দেশবাসীর আস্থা হারিয়েছেন। প্রকৃত গণসেবী রাজনীতিক দলের প্রতি সেই আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্যেই আক্ষরিক অর্থে গ্রামের অজ্ঞ-অনক্ষর-নিঃস্ব-নিরন্ন, দরিদ্র ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ পেশাজীবীর ও দরিদ্র চাষী-মজুরের আর্থিক, নৈতিক, সামাজিক, শৈক্ষিক, আবাসিক এবং শারীরিক উন্নতি লক্ষ্যে জনসেবার সংকল্প নিয়ে একটি রাজনৈতিক দল গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে কেউ কেউ। দলছুট লোকদের আশ্রয় ও প্রশ্রয় দেয়ার জন্যে এ দল গঠন করা উচিত হবে না। প্রকৃত দেশপ্রেমী ও মানবসেবী বলে যাঁদের কিছুটা জেনেছি কেবল তাঁদের নিয়েই, আর গণমুক্তিকামী মুক্তবুদ্ধি যুক্তিবাদী জনসেবায় উৎসুক তরুণ-তরুণীদের নিয়েই গঠন করতে হবে এ দল।

আমরা জানি ১৯৪৬ সনের দাঙ্গায়, ১৯৪৭ সনের ব্রিটিশ বিতাড়নে, ১৯৫২ সনের ভাষা সংগ্রামে, ১৯৬২ সনের শিক্ষা আন্দোলনে, ১৯৬৯ সনের দ্রোহে, ১৯৭১ সনের মুক্তিযুদ্ধে ও বিজয়ে, ১৯৮৩ সনের শিক্ষা সংগ্রামে এবং ১৯৯০ সনের এরশাদ বিতাড়নে কেবল নগরবন্দরের শিক্ষিত ধনী ও বেণেরাই উপকৃত হয়েছে, দেশের গ্রামীণ অজ্ঞ-অনক্ষর নিঃস্ব নিরন্ন দরিদ্র বর্গাচাষী, মজুর কিংবা ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ পেশাজীবীর ভাগ্যের কোন উন্নতি হয়নি। বরং জনসংখ্যা ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রভৃতির ফলে আর্থ-বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যবাদী কূটনীতিক মহাজন বিদেশী শক্তির ঋণ-দান-অনুদান-ত্রাণনির্ভর মুৎসুদ্দী সরকার সমভাবে ওই অদৃশ্য প্রভুর রাষ্ট্রগুলোর হুকুম-হুমকি-মদদ-পরামর্শ মেনেই নিজেদের আর্থিক সাচ্ছল্য, সামাজিক মর্যাদা এবং খ্যাতি-যশ অর্জন করে চলেছে আজো। এখন দেশ মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িক চেতনা কবলিত। এটি জাতীয় কিংবা রাষ্ট্রিক জীবনে অবক্ষয়ের লক্ষণ। গতির, প্রগতির, অগ্রগতির পথ এবং যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেক প্রয়োগের উপায় এতে প্রতিরুদ্ধ হয়। কাজেই জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-নিবাস-বৃত্তি-বিত্ত-বেসাত নির্বিশেষে গণমানবের আর্থিক, সামাজিক, শৈক্ষিক, নৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং আবাসিক ও শারীরিক জীবনে পরিবর্তন ও উন্নয়ন লক্ষ্যে অসাম্প্রদায়িক বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিবাদী, গ্রহণশীল, সৎ ও হিতৈষী ব্যক্তিদের নিয়ে যোগ্য ব্যক্তিবর্গের নেতৃত্বে নতুন দল গঠন না করলে এবং কাজে ও লক্ষ্যে শোষিত বঞ্চিত প্রতারিত গণমানবের মুক্তির প্রমাণ দিতে না পারলে দেশের তথা রাষ্ট্রের সাধারণ মানুষের নৈতিক, আর্থিক, শৈক্ষিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানবিক গুণের অবক্ষয় রোধ করা যাবেই না। কেবল দুর্দশা-দুর্ভোগ বাড়তেই থাকবে। উল্লেখ্য যে, বুর্জোয়া উদারতা বামপন্থার বিকল্প না হলেও মন্দের ভালো অনন্যোপায়ের ক্ষেত্রে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাই আপাতত আমাদের সৎ, বুদ্ধিমান, যুক্তিনিষ্ঠ, বিবেকবান, সংযত, পরমতসহিষ্ণু, সুজন, সাহসী নেতার নেতৃত্বেই তৃপ্ত ও হৃষ্ট থাকতে হবে। আমরা চাই সামন্ত-বুর্জোয়া মুৎসুদ্দীর প্রতারণার, শোষণের, দৌরাত্ম্যের মান-মাপ-মাত্রা হ্রাস পাক। এ জন্যে রাজনীতিপ্রবণ ব্যক্তিদের উচিত এখনই একটি সেক্যুলার জাতীয় রাজনৈতিক দল গড়ে তোলা, যাতে গারো-সাঁওতাল-চাকমা-ত্রিপুরা-মার্মা-হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীস্টান-মুসলিম নির্বিশেষে সবাই এমনি রাজনৈতিক দলকে বল-ভরসার, জান-মাল-গর্দানের নিরাপত্তার শরণ মনে করবে। নিজেদের দল ভেবে, বাঙলাদেশ রাষ্ট্রের নির্বিশেষ মানুষের-নাগরিকের দল বলে তার সমর্থক ও সহযোগী হয়ে উঠবে। সেক্যুলার রাজনৈতিক দল চাই-নিখাদ, নিখুঁত সংহত একক জাতি-চেতনা নাগরিকদের মধ্যে রাষ্ট্রের স্বার্থেই গড়ে তোলার গরজে।

প্রতিক্রিয়াশীলতা প্রতিরোধের একটি বিবেচ্য প্রস্তাব

দেশের কারো কাছে আজ এ তথ্য অজানা নেই যে, আজকের বাঙলাদেশের আর্থিক, বাণিজ্যিক, নৈতিক, শৈক্ষিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনীতিক অবক্ষয় ও বিকৃতি জাতীয় ও রাষ্ট্রিক পর্যায়ে এক ভয়াবহ কিংবা মারাত্মক রূপ নিচ্ছে। পণ্য উৎপাদনে নির্মাণে ঘটেছে অবনতি, রপ্তানি পণ্যের বাজার হারাচ্ছে রাষ্ট্র। দারিদ্র্যক্লিষ্ট দেশের জনগণ ও আমরা তাই শঙ্কিত ও বিচলিত।

আমরা জানি, দেশের সাধারণ লোকেরা বাম রাজনীতি পছন্দ করে না। আওয়ামী লীগও এখন নানা কারণে এবং ভারত-ঘেঁষা বলে অপপ্রচারের শিকার হয়ে উম্মাহপ্রিয়দের কাছে অপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বিএনপি এবং অন্য সব রাজনীতিক দল লঘু-গুরুভাবে ইসলামিক রাজনীতিক দল। এ অবস্থায় হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীস্টান-মুসলিম বাঙালী এবং বিভিন্ন ভাষার ও রক্তের আদিবাসী-উপজাতি, সাঁওতাল, গারো, ত্রিপুরা, চাকমা, মার্মা প্রভৃতি অধ্যুষিত আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বাঙলাদেশে জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা নিবাস-বৃত্তি-যোগ্যতা-সংস্কৃতি নির্বিশেষে কেবল মানুষ ও নাগরিক হিসেবে সবারই সম ও সহস্বার্থে একটি অভিন্ন জাতিচেতনা বা জাতীয়তাবোধ রাষ্ট্রিক সংহতির ও সমৃদ্ধির জন্যে আবশ্যিক–যা নানা কারণে বাঙলাদেশ রাষ্ট্রে সত্যিকার অর্থে বাস্তবে গড়ে ওঠেনি–সরকারগুলোর যোগ্য নেতৃত্বের ও দূরদর্শিতার অভাবে।

এ একক জাতীয়তাবোধের অভাবেই আজ সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্যচেতনা মুখ্য সমস্যা এবং রাষ্ট্রের জনগণের জীবনের আর্থিক-নৈতিক-মানসিক-বৈষয়িক জীবনে শান্তির, স্বস্তির নিশ্চিন্ত স্থিতির ও সর্বক্ষেত্রে সর্বপ্রকারের উন্নয়নের, বিকাশের ও উৎকর্ষের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রত্যক্ষভাবে কোন রাজনীতিক দলের সঙ্গে যুক্ত নন, অথচ দেশপ্রেমী ও জনসেবী আর আর্থ-সামাজিক জীবনও রাজনীতি সচেতন এবং স্থানীয়ভাবে শ্রদ্ধেয় সজ্জন ব্যক্তিদের ঢাকায় অনুষ্ঠেয় একটি কনভেনশনে বা সম্মেলনে নিজ ব্যয়ে যোগদান করে সংকট-সমস্যা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলোচনা করার এবং একটি 'সেক্যুলার জাতীয় রাজনৈতিক দল' গঠনের প্রয়োজনীয়তা আছে কি-না বিবেচনা করে মত, মন্তব্য ও সিদ্ধান্ত পরিব্যক্ত করার জন্যে সংবাদপত্র মাধ্যমে আহ্বান জানানোর জন্যে জনগণের পক্ষে ও দেশের স্বার্থে ঢাকার যে-কোন রাজনীতিসচেতন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান বা সমিতি এ দায়িত্ব গ্রহণ করলে দেশকে আপাতত আসন্ন ও আপন্ন রাজনীতিক ও আর্থিক সমস্যা সংকট থেকে উদ্ধারের একটা উপায় কিংবা পন্থা আবিষ্কারের সহায় হতে পারে। উল্লেখ যে, এ জাতীয় সংকট-সমস্যা, ব্যক্তির নয়, শ্রেণীর নয়, গোটা রাষ্ট্রের জনগণের। কনভেনশনের বা সম্মেলনের আহ্বায়কদের মধ্যে গারো, সাঁওতাল, চাকমা, মার্মা, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান, হিন্দু, মুসলিম থাকবেন, তাঁদের সই নিতে হবে, যাতে করে গোটা দেশের জাত-ধর্ম-বর্ণ-ভাষা-নিবাস নির্বিশেষে সবাই একে নিজেদের সম্মেলন তথা জাতীয় সম্মেলন বলে গ্রহণ করতে পারে এবং এমনি সেক্যুলার রাজনীতিক সম্মেলনে গঠিত দলই হবে প্রত্যেকের জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নির্বিশেষ নাগরিকের রাজনৈতিক দল। বাস্তবে কোন প্রবীণ যোগ্য ও শ্রদ্ধেয় লোকের নেতৃত্বেও অনেক সজ্জনের সহযোগিতায় আর্থিক সহায়তায় আর বিভিন্ন বয়সের কর্মীর সক্রিয় ও স্বেচ্ছাশ্রমেই এ ধরনের সম্মেলন প্রত্যাশিত রূপ, গুরুত্ব ও সাফল্য লাভ করতে পারবে। উল্লেখ্য যে, আমাদের মধ্যে একটি অভিন্ন রাষ্ট্রিক বা দৈশিক জাতিচেতনা তথা জাতীয়তাবোধ রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রিকভাবে গড়ে না উঠলে আমাদের আর্থিক ও রাষ্ট্রিক জীবনে বিকাশ অবাধ হবে না কখনো।

সেক্যুলার জাতীয় দল গঠন করা প্রয়োজন বলে বিবেচিত হলে তার খসড়া গঠনতন্ত্রের ভিত্তি বা কাঠামো নিম্নরূপের হওয়া বাঞ্ছনীয় কি-না তাও বিবেচ্য হওয়া দরকার মনে করছি।

[দলের খসড়া গঠনতন্ত্র]

১. ছয়জনের সভাপতিমণ্ডলী হবে দলের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

২. বছরে প্রতি দু'মাস করে উক্ত ছয়জনের একজন থাকবেন চেয়ারম্যান। তিনিই তখন হবেন 'এক্সিকিউটিভ হেড'। এতে থাকবেন (১) গারো (২) সাঁওতাল (৩) পার্বত্য চট্টগ্রামের/চট্টগ্রামের বৌদ্ধ (৪) হিন্দু (৫) মুসলিম (৬) খ্রীস্টান।

৩. ছয়জনের সভায় সংখ্যাধিক্যের মতই হবে কার্যকর।

৪. সরকারের মতো বিভিন্ন বিষয়ের একজন সচিব থাকবেন। তার দুজন করে যুগ্ম-সচিব থাকবেন। দুজন করে থাকবেন সহকারী সচিব। এঁরাই সব কাজ চেয়ারম্যানের আদেশে-নির্দেশে-উপদেশে ও পরামর্শে করবেন। যেমন ঃ সভা ডাকা, মিছিল করা, বিজ্ঞাপনাদি মুদ্রণ ও বিলি করা এবং প্রয়োজনে চাঁদা তোলা।

৫. কৃষি, কারখানা বিভিন্ন বৃত্তিজীবীর স্বার্থ সম্পৃক্ত বিষয়, পণ্য উৎপাদন ও নির্মাণ সম্পৃক্ত প্রচার-প্রচারণা, শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগ থাকবে। এবং প্রত্যেক বিভাগে সচিব, যুগ্ম সচিব ও সহকারী সচিব থাকবেন মোট পাঁচজন। এঁরা ছাড়া সাধারণভাবে কেন্দ্রে আর কোন সদস্য প্রতিনিধি থাকবেন না।

৬. প্রতি জেলায় থানায়ও এমনিভাবে কমিটি গঠিত থাকবে। প্রতি দু'মাস করে ছয়জনের একজন চেয়ারম্যান থাকবেন। সচিব-যুগ্মসচিব ও সহকারী সচিব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকবেন। স্থানীয় সমস্যা-সংকটে তাঁরাই আন্দোলন চালাবেন। অবশ্য জেলার ও থানার চেয়ারম্যান কেন্দ্রীয় চেয়ারম্যানকে সব বিষয় জানাবেন এবং প্রয়োজনবোধে তাঁর নির্দেশ নেবেন। এসব ক্ষেত্রে সময় থাকলে কেন্দ্রীয় চেয়ারম্যান সভাপতিমণ্ডলীর সভা ডেকে তাঁদের মত নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন।

৭. দলের আদর্শ, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং কর্মসূচি জনগণকে জানিয়ে বুঝিয়ে দলের সদস্য ও সমর্থক সংখ্যা বৃদ্ধির দায়িত্ব ও কর্তব্য হবে সবারই সার্বক্ষণিক ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের অঙ্গ।

আর একটি কথা স্মরণ রাখা দরকার।

এখন দেশটি মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িক চেতনা কবলিত। এটি জাতীয় কিংবা রাষ্ট্রিক জীবনে অবক্ষয়ের লক্ষণ। গতি-প্রগতি-অগ্রগতির পথ এবং যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেক প্রয়োগের উপায় এতে প্রতিরুদ্ধ হয়। কাজেই জাত জন্ম বর্ণ ধর্ম ভাষা নিবাস বৃত্তি বিত্ত বেসাত নির্বিশেষে গণমানবের আর্থিক-সামাজিক-শৈক্ষিক-নৈতিক-সাংস্কৃতিক এবং আবাসিক ও শারীরিক জীবনে পরিবর্তন ও উন্নয়ন লক্ষ্যে অসাম্প্রদায়িক বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিবাদী গ্রহণশীল সৎ ও জনহিতৈষী ব্যক্তিদের নিয়ে যোগ্য ব্যক্তিবর্গের নেতৃত্বে নতুন দল গঠন না করলে এবং কাজে ও লক্ষ্যে শোষিত বঞ্চিত প্রতারিত গণমানবমুক্তির প্রমাণ দিতে না পারলে দেশের তথা রাষ্ট্রের সাধারণ মানুষের নৈতিক, আর্থিক, শৈক্ষিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানবিক গুণের অবক্ষয় রোধ করা যাবেই না, কেবল দুর্দশা-দুর্ভোগ বাড়তেই থাকবে। উল্লেখ্য যে বুর্জোয়া উদারতা সামপন্থার বিকল্প না হলেও মন্দের ভালো অনন্যোপায়ের ক্ষেত্রে।

তাই আপাতত আমাদের সৎ, বুদ্ধিমান যুক্তিনিষ্ঠ বিবেকবান সংযত, পরমতসহিষ্ণু সুজন সাহসী নেতার নেতৃত্বেই তুষ্ট ও হৃষ্ট থাকতে হবে। আমরা চাই সামন্ত-বুর্জোয়া-মুৎসুদ্দী প্রতারণার, শোষণের, দৌরাত্মের মান-মাপ-মাত্রা হ্রাস পাক। এজন্যে রাজনীতিপ্রবণ ব্যক্তিদের উচিত এখনই একটি সেক্যুলার জাতীয় রাজনৈতিক দল গড়ে তোলা, যাতে গারো-সাঁওতাল-চাকমা-ত্রিপুর-মার্মা-হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীস্টান-মুসলিম নির্বিশেষে সবাই এমনি রাজনৈতিক দলকে বল-ভরসার, জান-মাল-গর্দানের নিরাপত্তার শরণ মনে করবে। নিজেদের দল ভেবে, বাঙলাদেশ রাষ্ট্রের নির্বিশেষ মানুষের-নাগরিকের দল বলে তার সমর্থক ও সহযোগী হয়ে উঠবে। সেক্যুলার রাজনৈতিক দল চাই নিখাদ, নিখুঁত সংহত একক জাতিচেতনা নাগরিকদের মধ্যে রাষ্ট্রের স্বার্থেই গড়ে তোলার গরজে।

'রাজনীতিক সংস্কৃতি' ও 'রাজনীতিক ব্যক্তিত্ব' চাই

অনুন্নত দেশের যতসব ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচারজাত দোষ-ত্রুটি সবই আমাদের মধ্যে সুলভ নয় কেবল, নানা কারণে দিন দিন বাড়ছে। আবার উঠতি জাতির বিদ্যাজাত মানসসম্পদের এবং মানবিক গুণের বিকাশ-বিস্তার স্বপ্ন পরিমাণে হলেও একেবারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুর্লক্ষ্য নয়। আমাদের যা অভাব, তা হচ্ছে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যোগ্য নেতৃত্বের অভাব। অন্য কথায়, দোষ-গুণের মধ্যে একটা আনুপাতিক সমন্বয়, সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি রক্ষা করে প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, সহ ও সমস্বার্থে সংযমে পরমত ও পর আচরণ সহিষ্ণুতায়, ন্যূনতম নৈতিক মানবিক গুণ নিয়ে সৌজন্যে সহাবস্থান করার যে একটা 'সংস্কৃতি' জীবন-জীবিকার সর্বক্ষেত্রে দৈশিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক মানুষ হিসেবে, নাগরিক ব্যক্তিরূপে আবশ্যিক ও জরুরী, একালের বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক লেনদেন সম্পৃক্ত জাগতিক জীবনে তা অনুভব-উপলব্ধি করার দিন সমাগত। আমাদের এ সংস্কৃতি-চেতনা হয় নেইই, নয়তো নিতান্ত স্থূল। এ জন্যেই আমরা বর্ধিষ্ণু নই জাতি হিসেবে, বরং যেন মনুষ্যত্বে অবক্ষয়গ্রস্ত।

আমাদের কোন রাজনীতিক সংস্কৃতিও গড়ে, ওঠেনি। অথচ রাজনীতিক দল করতে হলে একালে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে 'আচরণ বিধি' রূপ সংস্কৃতি নয়, নৈতিক-মানবিক-আদর্শিক একটা রুচি-সংস্কৃতি, একটা উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট থাকা আবশ্যিক। এ মুহূর্তে আমাদের কোন দলেরই তা নেই। পরিবর্তিত পরিবেশে-বৈশ্বিক রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ফলে উদ্ভূত অবস্থায় ও অবস্থানে আমাদের দলগুলোর আদর্শ-উদ্দেশ্য-লক্ষ্য এবং পথপদ্ধতি নতুন করে ঘোষণা করা জরুরী হয়ে পড়েছে। অথচ সবাই পুরোনো কাসুন্দিযোগে নতুন দিনে নতুন জীবনের ও সংকট-সমস্যা-চাহিদার মোকাবেলায় আগ্রহী। একেই বলে ঘোলা জলে মাছ শিকার! অতীত কৃতি-কীর্তি-আদর্শ-সাফল্য নয়, আজকের প্রাত্যহিক প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে যা যা করা দরকার, তা করার অভিপ্রায় থাকা পথ-পদ্ধতি প্রয়োগ করাই হচ্ছে দায়িত্ব ও কর্তব্যচেতনার সমকালীনতা!

আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর আদর্শ হচ্ছে লঘু-গুরুমাত্রাভেদ সত্ত্বেও গণতান্ত্রিক। তারা গণতন্ত্রের ধারক, বাহক ও প্রচারক। তারা গণতন্ত্র দাবির, প্রতিষ্ঠার ও রক্ষণের সংগ্রামী সৈনিক। কিন্তু তাদের দলে নিয়মিত নির্বাচন হয় না দলের সাংগঠনিক প্রয়োজনে। কোটারী করা, ক্ষমতা কুক্ষিগত বা হাতে রাখা, উপদলীয় স্বার্থ কিংবা ঈর্ষা-অসূয়া-হিংসা-ঘৃণা জাগরূক রাখা প্রভৃতি তাদের স্বভাবে কিংবা অভ্যাসে স্থিতি পেয়ে গেছে।

এ জন্যেই বিশ্বাস-ভরসা-নির্ভর করার মতো, অনুরাগী, অনুগামী ও অনুগত থাকার মতো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন অনন্য নেতা-নেত্রী সুদুর্লভ। তাই রাজনীতি এগোয় না। আমাদের আর্থ-বাণিজ্যিক নীতি ফলপ্রসূ হয় না, নতুন মোড় নেয় না, কেবলই ঘুরপাক খায়। আমরা দিন দিন কেবল দরিদ্র হচ্ছি, মিস্‌কিন হচ্ছি। ভিক্ষাজীবী হচ্ছি, ঋণ-দান-অনুদান-ত্রাণজীবী হচ্ছি। কলের চাকার মতো কেবলই আবর্তিত হচ্ছি, সম্মুখগতি পাচ্ছি না। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা নীতি-নিয়ম বিরহী, আমাদের আর্থিক অবস্থা ও অবস্থান চির অনিশ্চিত। আমাদের চিকিৎসাব্যবস্থা চির অসম্পূর্ণ, আমাদের অস্ত্র ক্রয় নিরুদ্দিষ্ট, আমাদের দারিদ্র্য অমোঘ। আমাদের দারিদ্র্য, বেকারত্ব, আর্থিক অনিশ্চয়তা আর অজ্ঞতা-অনক্ষরজাত অমানবিক ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ বর্ধিষ্ণু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাকস্বাধীনতা-যুক্তিবাদিতা-বিজ্ঞানমনস্কতা

নতুন চেতনা ও নতুন চিন্তাই সব কৌতূহলের, সন্দেহের, জিজ্ঞাসার ও প্রয়োজন-প্রেরণার মূল বা ভিত্তি। তাই সব আবিষ্কার-উদ্ভাবন-সৃজনও যুক্তিবাদিতার ও বিজ্ঞানবুদ্ধির বা বিজ্ঞানমনস্কতার ফুল, ফল ও ফসল। অতএব, যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞান একালের প্রগতিশীল, প্রাগ্রসর চিন্তা-চেতনা-কর্ম-আচরণের উৎস। আজকের দিনে সাক্ষর মানুষেরা মুখে অন্তত গণতন্ত্র সমর্থক এবং সে-সঙ্গে জাতিসঙ্ঘ প্রচারিত মৌল মানবিক বা মানবাধিকারের শর্তগুলো সঙ্গত বা যৌক্তিক বলে স্বীকার করে। যদিও তৃতীয় বিশ্বে এবং য়ুরোপ-আমেরিকায়ও রক্ষণশীল ক্যাথলিক প্রভৃতি উপসম্প্রদায়গুলো অন্তরে এগুলো গ্রহণ-বরণ আজো করে না, করেনি এবং আরো কিছুকাল করবে না। যে-শিক্ষা, বোধ-বুদ্ধি এক বিশেষ স্তরের সংস্কৃতিমান করে তোলে ব্যক্তিকে, সে-শিক্ষার ও বোধবুদ্ধির পরিবেশ আজো পৃথিবীব্যাপী পরিব্যাপ্ত হয়নি। তাই আজো ব্যক্তি মানুষে প্রত্যাশিত ন্যূনতম সংযম, সহিষ্ণুতা ও সৌজন্য পৃথিবীর সর্বত্রই বিরল বা দুর্লক্ষ্য।

যুক্তিতে আস্থা রাখে না, বিজ্ঞানের তত্ত্বে, তথ্যে ও সত্যে ভরসা পায় না, মানস জীবনে আদি ও আদিমকালের বিস্ময়ে-কল্পনায়-ভয়ে-ভক্তিতে-ভরসায় মানুষ যেসব শক্তিকে অনুমান-অনুভব-উপলব্ধিগত করেছে ক্ষতিকারক অরি এবং কৃপায় করুণায় দাক্ষিণ্যে উদার মিত্ররূপে, সেসব অদৃশ্য অরি-মিত্র শক্তির বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণাই আজো নিয়তিরূপে তাদের মানসিক, শারীরিক ও ব্যবহারিক জীবন-জীবিকা-ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। তাই ব্যক্তি মানুষ সাধারণভাবে অযৌক্তিক, অবৌদ্ধিক, অসঙ্গত, অসামঞ্জস্য, স্ববিরোধিতা ও স্বৈপরীত্যবহুল মানসিক ও ব্যবহারিক জীবনযাপন করে ভাবে-চিন্তায়-কথায়-কাজে ও আচরণে। এরা যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানকে সহ্যও করতে চায় না। আর প্রত্যক্ষবাদ, প্রকৃতিবাদ, জাগতিক জীবনবাদ, নাস্তিক্য-নিরীশ্বরবাদ প্রভৃতির প্রতি অবজ্ঞা-অবিশ্বাসতো আজো আদি ও আদিম কালের মতোই রয়ে গেছে।

অথচ এ মানুষই যুক্তির ও বিজ্ঞানের অবদানরূপে আজকের যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানী ব্যক্তিরা আবিষ্কারে উদ্ভাবনে সৃজনে যন্ত্ররূপে, ব্যবহার্য সামগ্রীরূপে প্রকৌশল-প্রযুক্তিরূপে, চিকিৎসা বা রোগের লক্ষণ ও প্রতিষেধকরূপে যা কিছু তৈরি করেছে, সেগুলো বিনা প্রশ্নে, বিনা দ্বিধায় পরম সমাদরে ও চরম আগ্রহে গ্রহণ-বরণ করে জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য, সাচ্ছল্য, আনন্দ আরাম ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগ করে, যান্ত্রিক সৌকর্যে ও উৎকর্ষে জীবনে অর্থ-বিত্তমানেরা রূপকথার স্বর্গের সুখ উপভোগের গৌরব-গর্ব করে। সমাজে সংস্কৃতিমানের ও বিত্তমানের মান-যশ-খ্যাতি-ক্ষমতা-দর্প-দাপট-প্রভাব-প্রতিপত্তি সবটারই দাবিদার হয়ে ওঠে। রাজনীতি আর ক্ষমতার গদীও এদেরই হাতের মুঠোয় থাকে।

তবু এ মানুষের মধ্যে মনের মগজের মননের মনীষার বিকাশ-বিস্তার ঘটে না। জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-বিজ্ঞানমনস্কতা-কল্যাণচেতনা-সৌন্দর্যপ্রীতি যে মনুষ্যত্বেরও পরিচায়ক এবং সংযম, সহিষ্ণুতা ও সৌজন্য যে মনুষ্যত্বের পরিমাপক, তা এদের আজো শোনানো-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানানো-বোঝানো গেল না। আশৈশব শ্রুত ও লব্ধ বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা ও অদৃশ্য অরি-মিত্র নিয়তি চালিত মানুষ আজো অসংযত, পরমত পরাচরণ পরস্বার্থ অসহিষ্ণু এবং মানবিক সৌজন্যরিক্ত। তাই নতুন চেতনার, নতুন চিন্তার, নতুন কথার, নতুন কাজের, নতুন আচরণের প্রকাশ কিংবা আভাস পেলেই মারমুখো হয়ে ক্ষেপে ওঠে এরা। সেদিন তুরস্কে বই নিয়ে তা-ই পুণ্যলোভীরা মেতে উঠল রক্তের ও আগুনের হোলি খেলায়। তুরস্ক ধর্ম-নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। তাই সরকার ব্যক্তির ভাব-চিন্তা-মত প্রকাশের স্বাধীনতা স্বীকার করে এবং মৌলমানবাধিকার রক্ষার দায়বদ্ধতাও কাজে না হোক নীতিগতভাবে উচ্চারণ ও প্রচার করে। এ-ও অবশ্যই মন্দের ভালো। তৃতীয় বিশ্বে এ-ও দুর্লভতায় দুর্লক্ষ্য।

আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের সংবিধান সেক্যুলার ও গণতান্ত্রিক এবং ভারতও জাতিসঙ্ঘের 'মৌলমানবাধিকার' স্বরাষ্ট্রে বাস্তবায়নে নীতিগতভাবে দায়বদ্ধ। যদিও বাস্তবে নানা গোঁজামিল, স্ববিরোধিতা স্বৈবপরীত্য রয়েছে সরকারি নীতির প্রয়োগে। তবু সেখানকার পত্র-পত্রিকায় নির্ভয়ে ও নির্বিঘ্নে এমন কথা লেখা ও প্রচার করা চলেঃ "ধর্ম পালনের অধিকার যদি কোনো নাগরিকের থেকে থাকে, ধর্ম পালন না করার অধিকারও তেমনি তার থাকে। আস্তিক হবার অধিকার থাকলে নাস্তিক হবার অধিকারও থাকে। ধর্ম প্রচারের অধিকার যদি থাকে ধর্ম বিরোধিতার অধিকারও তা হলে থাকে বিদ্যমান। শ্রেণী সংগ্রাম গড়বার পাশাপাশি আর একটি কাজও হাতে নেয়া দরকার। সে কাজটি হল মানুষকে নাস্তিক ও যুক্তিবাদী করে তোলা। যুক্তিবাদী ও নাস্তিক মানুষদের হাতেই গড়ে উঠুক একবিংশ শতকের পৃথিবী।" (অনীক, ২৯ বর্ষ, ৮-৯ সংখ্যা ১৯৯৩)

এঙ্গেলস বলেছেন, অ্যান্টিড্যুরিঙ গ্রন্থে ধর্মবোধের স্থিতি যুক্তিবাদের তথা মার্কসবাদের বিপরীতে। রবীন্দ্রনাথও বলেছেন, অবুঝ মানুষের 'ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্র হানো। এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলো আনো।'

আমাদের রাষ্ট্রে যে এমনি কথা উচ্চারণ করবে, দু'এক ঘণ্টার মধ্যে তার জান-মাল-গর্দান লোপাট হয়ে যাবে পুণ্যার্থীর হাতে। কেননা আমাদের রাষ্ট্র হচ্ছে ধর্মরাষ্ট্র। সংবিধানের শীর্ষে রয়েছে বিসমিল্লাহ, ভেতরে রয়েছে ইসলাম। রাষ্ট্রনীতি অনুসারেই এখানে নতুন চেতনার, নতুন চিন্তার, নতুন কথার, নতুন কাজের, নতুন আচরণের, বিশ্বাস সংস্কার-ধারণা-প্রথা-পদ্ধতি বিরোধী বা বিযুক্ত কোন নতুন নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ, মত-পথ গ্রহণ ও প্রচার, কোন নতুন মন্তব্য প্রকাশ করা অবিধেয়, অবাঞ্ছিত। গতানুগতিকভাবে যান্ত্রিক আবর্তনে মনে-মগজে-মননে পুরোনো চিন্তা-চেতনা-নীতি-নিয়ম ন্যায়-সত্য মেনে চললেই, নতুন যন্ত্রে-প্রকৌশলে, প্রযুক্তিতে, সামগ্রীতে, চিকিৎসা ব্যবস্থায় জীবনে সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, সাচ্ছল্য, আনন্দ, আরাম উপভোগ করা, পুরোনো নিয়মে অভ্যস্ত পদ্ধতিতে ডাকাতি-চুরি-বঞ্চনা-প্রতারণা-জুয়া-জাল-জোচ্চুরি করা চলবে, এতে ব্যক্তির বা সমাজের আপত্তি থাকবে না, কারণ সরকার এসব দেখা-শোনার ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে রয়েছে। নীতিনিয়ম মানলে শান্তে সমাজে সংস্কৃতিতে, সরকারে ও রাষ্ট্রে শান্তি-শৃঙ্খলা থাকে। কিন্তু গতানুগতিক প্রথা-পদ্ধতি মানা আবর্তিত জীবনে ক্ষয় আছে, বৃদ্ধি নেই, চেতনা-চিন্তার বিকাশ-বিস্তার নেই, জরা-জড়তা ও জীর্ণতা আছে। নতুন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চেতনা ও নতুন চিন্তা প্রকাশের সুযোগ যে-সমাজে ও যে-রাষ্ট্রে নেই, সেখানে জীবন আবর্তিত, মন-মগজ-মনন-মনীষা বন্ধ্যা। যুক্তিবাদিতা, বিজ্ঞানমনস্কতা ও বাকস্বাধীনতাই সম্মুখগতির, প্রগতির, প্রাগসরতার, সমকালীন বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক জীবন সম্পৃক্ততার জন্যে আবশ্যিক ও জরুরী। আমাদের শান্ত্রপ্রেমী সমাজে ও রাষ্ট্রে কখনো কি মিলবে এসব অধিকার?

সংখ্যালঘুর নিরাপত্তা-সমস্যা

শহরেই থাকি। গাঁয়ে যাওয়া হয় না। অন্যদের মুখে গাঁয়ের মানুষের, আত্মীয়-স্বজনের কিছু কিছু খবর পাই। সে-খবরও গুণে মানে মাপে মাত্রায় এক রকম হয় না। শিক্ষা, মেধা, মগজ, জীবনদৃষ্টি-অজ্ঞতা-বিজ্ঞতা-অভিজ্ঞতা প্রভৃতির পার্থক্যের কারণে লঘু সংবাদ গুরু এবং গুরু খবরও লঘু হয়ে যায়। তাই জোর দিয়ে, প্রত্যয়ী হয়ে কোন বিষয়ে নিঃসংশয় মত, মন্তব্য ও সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা শোনা কথার উপর নির্ভর কোন দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন মানুষের পক্ষেই সঙ্গত হয় না।

তবু যা রটে, তার সবটা মিথ্যে না-ও হতে পারে। আবার যা ঘটে, সংখ্যাগুরুর ও সরকারের স্বার্থে তা চেপে যাওয়া কিংবা নিতান্ত লঘু করে প্রচার করার রীতি-নীতিও দুর্লভ নয়। ভণিতা না করে আসল কথায় আসি। আজকাল প্রায় সবার মুখেই শুনতে পাই গাঁয়ে-গঞ্জে সংখ্যালঘুরা নিরাপত্তার অভাবে সদাশঙ্কিত জীবনযাপন করছে। যারা পারছে তারা দেশ ত্যাগ করছে নানা ছলে, গোপন ব্যবস্থা ও অর্থ-বিত্তেরও সুব্যবস্থা হচ্ছে গোপন পথে। এক কথায়, সচ্ছল হিন্দুরা চলে যাচ্ছে, ব্যবসায়ী ও চাকুরে হিন্দুরা না-কি পরিজন তথা সন্তানাদি দেশের বাইরে রাখছে, অর্থ-সম্পদও সরাচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি। খবরগুলো দেশের তথা সরকারের, সমাজের ও রাষ্ট্রের পক্ষে উৎকণ্ঠার, উদ্বেগের ও সমস্যার-সংকটের কারণ রূপেই বিবেচিত হওয়া উচিত। কেননা, সব কারণেরই ক্রিয়া থাকে। ইতোমধ্যে আদভানি বোম্বেতে বলেছেন, 'বাঙালি মুসলিমরা নিশ্চয়ই বাঙলাদেশ থেকে ভারতে অনুপ্রবেশ করছে, কাজেই তাদের বাঙলাদেশে তাড়িয়ে দিতে হবে। অর্থাৎ পুশব্যাক ও পুশইন সংকট অচিরেই তীব্র ও অসমাধ্যভাবে প্রবল হওয়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দেয়া যাবে না।

এখান থেকে যারা ভারতে যাবে, তাদের মধ্যেও হিংস্রতা ও প্রতিহিংসাবৃত্তি প্রবল হবে। উভয় দেশেই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াজাত বিবাদ-বিরোধ-সংঘর্ষ-সংঘাত যদি জনসমাজে প্রকট হয়ে ওঠে, তাহলে জনজীবন, অর্থ-সম্পদ-বৃত্তি-বেসাত, আর জান-মাল-গর্দান বিশেষ করে বিপন্ন হবে সংখ্যালঘুদেরই। অথচ যাদের উপর এ বিপদ সংকট নেমে আসবে, তারা হবে দুস্থজনেরাই। এবং একেবারেই নিরাপরাধ নিরীহজনেরাই হারাবে জান-মাল-গর্দান ও আত্মীয়-স্বজন। রাজনীতিকদলের লোকেরা, ধনী-মানী-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিক্ষিতজনেরাও থাকবে নিরাপদ, কিন্তু মজা লুটবে, ফায়দা ওঠাবে তারাই। আমাদের শহুরে সংস্কৃতিমানেরা, আঁতেলরা, রাজনৈতিক দলের মধ্যে আওয়ামী লীগ ও বামপন্থীরা, গণতান্ত্রিক পার্টি প্রভৃতি অসাম্প্রদায়িকতার ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বুলি কপচান সভায়-মিছিলে ও বিবৃতিতে এমন কি লেখকরা লেখায়ও। কিন্তু সক্রিয়ভাবে সদুপায়ে সংখ্যালঘুদের শঙ্কামুক্ত করার জন্যে, তাদের নিরাপত্তার আশ্বাসদানে, তাদের নিরুপদ্রব নিঃশঙ্ক জীবনযাপনের ব্যবস্থা করায় এগিয়ে আসেন না কেউ। আমরা এখানে একটা বাস্তব প্রস্তাব পেশ করছি। এ প্রস্তাব বাস্তবায়নের দায়িত্ব অসাম্প্রদায়িক আওয়ামী লীগের, জাসদ, বাসদ, ওয়ার্কার্স পার্টি, গণতন্ত্রী পার্টি, বিভক্ত সিপিবি ও চীনপন্থী সব বামদলগুলোর। এ দলগুলোর দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে, হয় সমবেতভাবে কিংবা স্বতন্ত্রভাবে গাঁয়ে গাঁয়ে দুইজন হিন্দু বা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ও তিনজন সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের অর্থে বিত্তে বৃত্তি বেসাতে মানে মর্যাদায় সজ্জন লোক নিয়ে 'সংখ্যালঘু নিরাপত্তা পরিষদ' গঠন করা। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কেউ কখনো যদি সংখ্যাগুরু মস্তান-গুণ্ডা-খুনী-টাউট-সম্পদলিপ্সুর হুকম-হুমকি-হামলা কবলিত হয় বা বিপন্নবোধ করে, তখন এরাই সালিশ করে, অভয় দিয়ে ওদের রক্ষা করার ব্যবস্থা করবে। এ ব্যবস্থা অবিলম্বে চালু করা আবশ্যিক ও জরুরী। আর সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে, সৈন্যবাহিনীতে কয়েক হাজার সংখ্যালঘুকে নিয়োগ করে, পুলিশবাহিনীতে শতে বিশ/পঁচিশজন করে দারোগা-সিপাহী রেখে, আর পাঁচ/সাতজন উপমন্ত্রী, স্টেটমন্ত্রী ও মন্ত্রী রেখে সংখ্যালঘুদের মনে বল-ভরসা ও নিরাপত্তাবোধ জাগিয়ে এদেশী জাতীয়তার ও নাগরিকতায় তাদের মনে নিঃসংশয় সমাধিকারের ধারণা সৃষ্টি করা, সরকারের প্রতি আস্থা ও রাষ্ট্রের প্রতি অনুরাগ ও আনুগত্য নিশ্চিত করা। নইলে সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধানও মিলবে না, রাষ্ট্রে নির্বিশেষ 'মানুষ' সংজ্ঞার ও সংজ্ঞার্থের নাগরিক তৈরি হবে না, রাষ্ট্রিক জাতীয়তাও কখনো নিখুঁত-নিখাদভাবে গড়ে উঠবে না। স্মর্তব্য যে কেলে আঙুলের ডগার ক্ষতের যন্ত্রণাও সর্বপ্রকার শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক সুখ, শান্তি, আনন্দ, আরাম নষ্ট করে দিতে পারে, যেমন পারে একটা মাছি দিবানিদ্রার সুখ নষ্ট করতে, একটা মশা পারে মশারির ভেতরকার একজনের রাত্রির নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটাতে। কথায় বলে ঋণের লেশ, শত্রুতার রেশ আর আগুনের শেষ রাখতে নেই। বড়-ছোট-মাঝারি কোন সমস্যা-সংকটই জিইয়ে রাখতে নেই।

আর একটি কথা, সব সংখ্যালঘু নানা কারণে কখনো যাবে না, যেতে পারবে না, ভিন্ন রাষ্ট্রও নেবে না। নিলে, সবাই চলে গেলে রাষ্ট্রই টিকবে না। কেন না ওরাই যুদ্ধ বাধাবে, মারবে ও মরবে।

কাজেই ভীরু স্বার্থপর চালাকরা দেশ ত্যাগ করে কেবল স্বসম্প্রদায়ের লোককে দেহে প্রাণে মনে ধনে বলে ভরসায় দুর্বল, শঙ্কিত ও মানসিকভাবে আধিগ্রস্ত করে দিচ্ছে মাত্র। আপাতদৃষ্টিতে নয় কেবল, গভীর তাৎপর্যেও সংখ্যালঘু স্বার্থপর সুবিধেবাদীরাই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ক্ষতি করেছে সবচেয়ে বেশি এবং সর্বপ্রকারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি রাষ্ট্রনীতিক চিন্তা

আগের কালে সাধারণ মানুষ নানা আধিভৌতিক, আধিদৈবিক বিশ্বাসে-সংস্কারে-ধারণায়-ভয়ে-ভক্তিতে-ভরসায় জীবনযাপন করত। মানুষ তখন জানত যে কিছুই তাদের আয়ত্তে বা নিয়ন্ত্রণে নেই। সবটাই অদৃশ্য অরি-মিত্র শক্তির নিয়তির খেয়ালি লীলা। মানুষ অদৃশ্য অরি-মিত্র শক্তির ক্রীড়ণক মাত্র। এ ধারণা তাদের কখনো জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-শক্তি-সাহস প্রয়োগে আত্মপ্রত্যয়ী হতে দেয়নি। তাদের জন্ম-জীবন-মৃত্যু, জীবনের সুখ-দুঃখ-লাভ-ক্ষতি সবটাই ছিল দৈব নিয়ন্ত্রিত।

এ জন্যেই মর্ত্য জীবনে বলবান, বুদ্ধিমান, জ্ঞানবান, গুণবান, সাহসী লোকের অনুরাগী, অনুগামী ও অনুগত থাকত সাধারণ মানুষ। আজো সে-শ্রেণীর মানুষ ন্যায্য দাবি পেশ করতে সাহস পায় না। শক্তি পায় না দ্রোহী হতে। এ কারণেই এক রাজা লক্ষ কোটি মানুষের ভয়-ভক্তি-ভরসার অবলম্বন ছিল। এক সর্দার সারা গোষ্ঠী-গোত্রের অবিসংবাদিত নেতা থাকত। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারে, যন্ত্র-প্রকৌশল-প্রযুক্তির বিচিত্র প্রয়োগে মানুষের কেবল ব্যবহারিক বৈষয়িক জীবনে নয়, মানসিক চেতনায়-চিন্তায়-মগজে-মননেও এসেছে গতানুগতিকতাবিমুক্তি। এখন ব্যক্তিসত্তার মূল্য-মর্যাদা-গুরুত্বচেতনা ব্যক্তিকে দিয়েছে স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধি, করেছে আত্মপ্রত্যয়ী, করেছে স্বাধিকার সচেতন। ফলে গোষ্ঠীপতি, গোত্রপতি, সমাজসর্দার, শাস্ত্রী, শাসক, প্রশাসক প্রভৃতি কেউ আজ আর তার স্বতো আনুগত্য পায় না। দিনমজুরও এখন দেহে প্রাণে মনে মননে স্বাধীন। একান্ত একক ও নিঃসঙ্গ অবসর জীবনে স্বেচ্ছা ও স্বৈরাচারী শাস্ত্র আর সমাজ, সরকার ও শাসক তাকে আগের মতো ন্যায্য-অন্যায্য হুকুম-হুমকি-হুংকার-হামলার ত্রাসে সদাত্রস্ত রাখতে পারে না।

এ কারণে আজ জাতিকে উপজাতিকে আদিবাসীকে কিংবা ভিন্ন জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম ভাষা-নিবাসের লোককে আজকাল কোন প্রতাপে প্রবল রাষ্ট্র বা সরকার একক শাসনের অনুরাগী, অনুগামী ও অনুগত রাখতে পারছে না। সবাই স্বাতন্ত্র্যে স্বাধীন ও বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে চাইছে আফ্রো-এশিয়া-লাতিন আমেরিকার সর্বত্র। সংখ্যালঘু দুর্বল স্বায়ত্তশাসন চায়, সংখ্যায় প্রবলেরা স্বাধীনতা দাবি করছে।

অতএব একালে দুনিয়ার কোথাও একক Unitary শাসনে ভিন্ন রক্তের, গোত্রের, ভাষার, শাস্ত্রের, বর্ণের, অঞ্চলের লোককে রাখা যাবেই না। গোত্রীয় ও ভাষিক, শাস্ত্রিক ও আঞ্চলিক, বার্ণিক ও শ্রেণিক দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-সংঘাত তো পৃথিবীর সব রাষ্ট্রে নানা আকারে-প্রকারে লঘু-গুরুভাবে চলেইছে। কাজেই আলামত সুপ্রকট। এর একমাত্র নিদান হচ্ছে ফেডারেল বা কনফেডারেল রাষ্ট্র গঠন। মণ্ডলী কিংবা সমমেল পদ্ধতিতেই কেবল এ দ্বেষের, দ্বন্দ্বের অবসান, স্বাধিকারের ও স্বাধীনতার স্পৃহার পূর্তি সম্ভব। পাকিস্তান, ভারত, পশ্চিম-উত্তর এশিয়ার শিয়া-সুন্নী-কুর্দ-ইহুদী-খ্রীস্টান অধ্যুষিত রাষ্ট্র, কালো আফ্রিকার গোত্র-দ্বেষণাদুষ্ট রাষ্ট্র মায়ানমার, শ্রীলঙ্কা, জর্জিয়া, আরমানিয়া, গ্রেটব্রিটেন, কানাডা প্রভৃতি পৃথিবীর যাবতীয় রাষ্ট্রে, যেখানেই ভিন্ন গোত্রের রক্তের, ভাষার, বর্ণের, শাস্ত্রের, অঞ্চলের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোকের মিশ্রবাস, সেখানেই একক রাষ্ট্রমাত্রই অস্তিত্ব হারাবে কয়েক বছরের মধ্যেই। লড়াই চলবে স্বায়ত্তশাসনের, স্বাধীনতার, বিচ্ছিন্নতার, পরে নিষ্পত্তি হবে ফেডারেল সরকার গঠনে। কারণ এ যন্ত্রযুগে যন্ত্রজগতে যন্ত্রনির্ভর জীবনে বিচ্ছিন্নতায় স্বাতন্ত্র্যে স্বাবলম্বী স্বনির্ভর হয়ে কেউ আর বাঁচতে পারবে না।

কালের দাবি, জীবনের চাহিদা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

শাস্ত্রিক পরিচিতি অনুসারে আজকের পৃথিবীতে মুসলিম প্রধান বা মুসলিম শাসিত ছোট-বড়-মাঝারি রাষ্ট্রের সংখ্যা বায়ান্নটি। এদের মধ্যে জনসংখ্যার দিক দিয়ে বৃহত্তম হচ্ছে ইন্দোনেশিয়া, বৃহত্তর হচ্ছে জনসংখ্যায় বাঙলাদেশ। তেলঋদ্ধ রাষ্ট্রের সংখ্যাও সাত-আটটি। তবে এগুলোর কোথাও সমাজতন্ত্র নেই বলে নাগরিকদের মধ্যে দারিদ্র্য রয়েই গেছে। ভাত-কাপড় জোটে বটে, কিন্তু ভোগে-উপভোগে-সম্ভোগে সবার জীবনে সাচ্ছল্য স্বাচ্ছন্দ্য আনন্দ আরাম তেমন নেই। সবচেয়ে বড় কথা এ বায়ান্নটি মুসলিম শাসিত রাষ্ট্রে সাক্ষরতায় এগিয়ে আছে মাত্র ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, তুরস্ক প্রভৃতি কয়েকটি রাষ্ট্র। অন্যত্র সাক্ষরতার হার এ যুগের মাপে লজ্জাকরভাবে কম। ভাঙা রাশিয়ার ও আলবেনিয়ার মুসলিম প্রধান রাষ্ট্রের রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ-প্রতিবেশ মার্কসীয় মতবাদসম্মত হওয়া সত্ত্বেও তাদের মানসমুক্তি তথা মনে-মননে যুক্তি-বুদ্ধি প্রাধান্য পেয়েছে বলে মনে হচ্ছে না– অন্তত প্রত্যাশিত মানে-মাপে-মাত্রায় মিলছে না।

উক্ত বায়ান্নটি রাষ্ট্রের কোনটারই গৌরব-গর্ব করার কিছু সহজে চোখে পড়ে না। মিশরে যিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন, তাঁকেও তেমন উঁচু মন-মনন-মনীষার লেখক বলে মনে হয় না। অধ্যাপক আবদুস সালামও নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন কিন্তু তিনি আহমদীয়া মতবাদী বলে অনেক মুসলমান তাঁকে মুসলিম বলেই স্বীকার করে না।

তেলঋদ্ধ বলে পশ্চিম এশিয়ার আরব রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে এবং ইরানের সঙ্গেও পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্র সুসম্পর্ক বজায় রাখতে আগ্রহী। সে কারণেই বাহ্যত ইজরাইলের প্রতি বিরূপতা দেখাতে সদাপ্রস্তুত। ভারত দায়ে ঠেকে মার্কিন সরকারের চাপে পড়ে ইজরাইলকে কিছুকাল আগে স্বীকৃতি দিল। আর সবাই জানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই ইজরাইলের পালক ও পোষক, আশ্রয় ও প্রশ্রয়দাতা, ইজরায়েলের ঔদ্ধত্যেরও লালক। বলতে গেলে আজকের পৃথিবীতে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর এক নম্বরের শত্রু হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। অথচ মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর কয়েকটির আর্থিক ঋদ্ধি থাকা সত্ত্বেও বিজ্ঞানে-প্রযুক্তিতে, সামরিক অস্ত্রে, জলযানে, বায়ুযানে, য়ুরোপীয় ও মার্কিন রাষ্ট্রের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল বলেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কথা বলে না বিশ্বের কোন মুসলিম রাষ্ট্রের সরকার। বরং তোয়াজে-তোষামোদে তুষ্ট রাখার চেষ্টায়, আনুগত্যে, অনুগামিতায় ও অনুরাগে মুসলিম মুৎসুদ্দী সরকারগুলো একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নিরত বলেই প্রতীয়মান হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুসলিমরা শাস্ত্রানুগত আচারিক ও গতানুগতিক প্রথা-পদ্ধতির অনুরাগী ও অনুসারী। তারা শাস্ত্রানুগত্যে ইহপরলোকে প্রসৃত জীবনের কল্যাণচেতনায় নিশ্চিন্ত ও নিশ্চিত থাকতে আগ্রহী। ফলে দেশ-কালের দাবি তারা মানসিকভাবে জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেক দিয়ে অনুভব উপলব্ধি করতে চায় না। যদিও ব্যবহারিক বৈষয়িক জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য, সাচ্ছল্য, স্বাস্থ্য, রোগমুক্তি, অর্থ-বিত্ত-বৃত্তি-বেসাত প্রভৃতি যন্ত্রপ্রকৌশল-প্রযুক্তি প্রয়োগে সম্ভব হতে দেখে তা গ্রহণে-বরণে-প্রয়োগে কারুর চেয়ে কম আগ্রহী নয়। কিন্তু সাধারণভাবে মুসলিমপ্রধান রাষ্ট্রগুলো অশিক্ষার বাধা-বিঘ্ন বিলোপে উদাসীন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিই যে পৃথিবীর মানুষের মানসিক ও শারীরিক প্রাত্যহিক প্রয়োজন মোটাচ্ছে, তা জেনে, বুঝে ও মেনেও মুসলিমরা শাস্ত্রানুগত্য বশে বিজ্ঞানের তত্ত্বে, তথ্যে ও সত্যে আস্থা স্থাপনে অনীহ। তাই আজো বিজ্ঞানে, প্রযুক্তিতে, রোগ-প্রতিষেধক যন্ত্র ও ওষুধ আবিষ্কার ও উদ্ভাবনে কিংবা সামরিক অস্ত্রশস্ত্র বা স্থলযান, জলযান ও বায়ুযান নির্মাণে অথবা প্রাত্যহিক জীবনে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন প্রকারের প্রয়োজনীয় যন্ত্র ও সামগ্রী নির্মাণে তাদের কৃতিত্ব চোখে পড়ে না।

স্বকালের, স্বদেশের, স্বসমাজের, স্বরাষ্ট্রের কালের দাবি, মানুষের জীবনের চাহিদা মেটানোর প্রতি গুরুত্ব দেয়া বাঁচার গরজেই আবশ্যিক ও জরুরী মনে করলে বিজ্ঞানমনস্ক হলেই চলবে না, বিজ্ঞানচর্চায় আবিষ্কারে উদ্ভাবনে, নির্মাণে আর বিজ্ঞানের তত্ত্বে, তথ্যে ও সত্যে আস্থা স্থাপনে আগ্রহী হতেই হবে। একাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভরতার কাল। শাস্ত্রানুগত্য বিশ্বাসীর মনে বল-ভরসা যোগায় বটে, কিন্তু জাগতিক জীবনে অভাব-অনটন ঘোচায় না। প্রাত্যহিক জীবনে দেহ-প্রাণের প্রয়োজন মেটায় না, পূরণ করে না যন্ত্রের, রোগের চিকিৎসার, প্রকৌশল-প্রযুক্তির যন্ত্রের, রেডিও-টিভি-কম্পিউটারের ও তার-বেতারের অভাব। মুসলিম প্রধান রাষ্ট্রে বিজ্ঞান, আধুনিক যুক্তিবাদ, নির্মোহ উদারতা তথা মুক্তবুদ্ধি এবং মানুষ নির্বিশেষকে 'মানুষ'রূপে গ্রহণ বরণের মতো ইহজাগতিক চেতনা আজো গুরুত্ব পাচ্ছে না। অথচ ভিন্ন শাস্ত্রপন্থীরা দুনিয়ার সর্বত্র রক্ষণশীলতা দ্রুত পরিহার করে বিজ্ঞানে-প্রকৌশলে-প্রযুক্তিতে ও চিকিৎসাবিজ্ঞানে এগিয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীতে যুগান্তর ঘটাচ্ছে, দুনিয়ার চেহারা বদলে দিচ্ছে।

মধ্যযুগের খ্রীস্টান য়ুরোপের মতো আজকের মুসলিম জগৎ অতি বেশি শাস্ত্রানুগত, রক্ষণশীল, নতুন চেতনা-চিন্তাভীরু, অসহিষ্ণু। বিজ্ঞানের নতুন তথ্য ও সত্য গ্রহণে বিমুখ এবং বৈশ্বিক আন্তর্জাতিক পরিবেষ্টনী অসচেতন। ফলে তাদের মন-মগজে-মননে সমকালীন জগৎ-চেতনা ও জীবন-জিজ্ঞাসা নেই। উদ্যম-উদ্যোগ-প্রয়াস-প্রযত্ন নেই প্রগতিশীল প্রাগ্রসর রাষ্ট্র বা জাতিগুলোর সমকক্ষ হওয়ার জ্ঞানে-বিজ্ঞানে-যন্ত্রে প্রকৌশলে-প্রযুক্তিতে আবিষ্কারে, উদ্ভাবনে আর সৃষ্টিতে। আজকের মুসলিম জগৎ তাই সবার পিছে, সবার নিচে এবং অজ্ঞতায়-নিরক্ষরতায় আর অনেক রাষ্ট্রেই নিঃস্বতায় ও নিরন্নতায় সর্বহারাদের পাশে ও কাছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেক্যুলারিজমের বিকল্প নেই

অনেককাল থেকেই আমরা কেউ কেউ বলে চলেছি যে, আমাদের দৈহিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনে স্বস্তি-শান্তি-নিরুপদ্রব-নিরাপত্তার জন্যে সেক্যুলার রাজনৈতিক দল ও সেক্যুলার সংবিধান আবশ্যিক। বিভিন্ন কারণে ১৯৭২ সনের সেক্যুলার সংবিধান বর্জিত হয়েছে, সে-কাসুন্দি ঘেঁটে লাভ নেই। আস্তিকেরা নাস্তিক্য সহ্য করে না, সেজন্যে বামপন্থা এখানে জনসাধারণের শ্রদ্ধা-সমর্থন পায় না। কাজেই আমাদের আপাতত সেক্যুলার উদার সহিষ্ণু বুর্জোয়া মানবতাবাদী হয়েই রাষ্ট্রিক জীবনযাপন করতে হবে, কেননা সমাজ পরিবর্তনের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা অদূর ভবিষ্যতে সম্ভব হবার আলামত দৃষ্টিসীমার মধ্যে নেই।

ইদানীং আরো কেউ কেউ সেক্যুলার রাষ্ট্র কামনা করছেন। কেননা তাঁরা এখন মর্মে মর্মে অনুভব করেছেন, মগজ প্রয়োগে উপলব্ধি করেছেন যে বিভিন্ন শাস্ত্রানুসারী মানুষও সম্প্রদায় অধ্যুষিত রাষ্ট্রে সংখ্যাগুরুর শাস্ত্র, সংস্কৃতি, আচার-আচরণ ও জীবনদৃষ্টি সংখ্যালঘু বিভিন্ন উনজনদের ওপর চাপানো তাদের নাগরিক অধিকার হরণের, তাদের সত্তার অবমাননার ও তাদের স্বদেশে স্বঘরে স্বভূমিতে প্রবাসীর মতো করে রাখার এবং তাদের দেহ-প্রাণ-মন-মননের উপর পীড়নেরই নামান্তর মাত্র।

সেক্যুলার সংবিধান 'মানুষ' মাত্রেরই ইহজাগতিক জীবনে সমান নাগরিক অধিকার সুনিশ্চিত করে। তখন প্রত্যেক মানুষ স্ব স্ব যোগ্যতানুসারেই কেবল চাওয়া-পাওয়ার ক্ষেত্রে সুযোগ, সুবিধে ও সুবিচার পেয়ে থাকে। ব্যতিক্রম হচ্ছে দুষ্ট দুর্জনের দুর্নীতিমাত্র।

সেক্যুলার রাষ্ট্র মানুষের মর্ত্যজীবনের চাহিদা মেটায়, তাকে স্বর্গে প্রেরণের দায়িত্ব বা অভিভাবকত্ব নেয় না। জাত জন্ম বর্ণ ধর্ম ভাষা অঞ্চল নিবাস যোগ্যতা নির্বিশেষে মানুষকে কেবল মানুষ হিসেবে জানা এবং গ্রহণ-বরণ করাই মানবতা, উদারতা, যুক্তিমানতা, সহিষ্ণুতা ও সৌজন্য। সেক্যুলারিজম নাগরিকদের এসব গুণের বিকাশের সহায়ক। আধুনিকতম গণতন্ত্রমাত্রকেই সেক্যুলার হতেই হবে, নইলে রাষ্ট্রিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৈতিক ও আইন-শৃঙ্খলাগত সমস্যা-সংকটমুক্ত হওয়া যাবে না। সুখের বিষয় ঢাকা শহরে এখন কেউ কেউ সেক্যুলার সংবিধানের কথা বলতে শুরু করেছেন। ১৯৭২ সনের সংবিধান ছিল সেক্যুলার। বুর্জোয়ারা সমাজতন্ত্র পছন্দ করে না, কাজেই ওই অংশটুকু বাদ দিয়ে ১৯৭২ সনের সংবিধান আবার চালু করাই কল্যাণকর।

তাহলেই কেবল মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্যচেতনা, মানস সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা, ভিন্ন ধর্মের, বর্ণের, ভাষার, অঞ্চলের, সংস্কৃতির, আচারের মানুষের প্রতি দ্বেষণা বিলোপ করা, অন্তত নিষ্ক্রিয় রাখা সম্ভব হবে। বহু ব্যবহারে এবং বিকৃত প্রয়োগে 'গণতন্ত্র' কথাটিই তাৎপর্য হারিয়েছে, হারিয়েছে জনগণের আস্থা। এখন ঢাকা শহরে বিভিন্ন দল মিলেমিশে গণতান্ত্রিক দল গঠনে প্রয়াসী হয়েছে নানা নামে। ভাঙা সিপিবি দল দুটোও এখন স্থির ও স্বতন্ত্র থাকতে ভরসা পাচ্ছে না। সম্ভবত অস্তিত্ব রক্ষার গরজেই অন্যদলের সঙ্গে সংহতির চেষ্টা করছে। ন্যাপ ও গণতন্ত্রী দলও আর স্বয়ম্ভর স্বতন্ত্র থাকা বাঞ্ছনীয় মনে করছে না, সম ও সহমনা অন্য দলের বা দলগুলোর সঙ্গে সংলাপ শুরু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছে ফ্রন্ট, মোর্চা কিংবা নতুন নামে দল সংগঠনের লক্ষ্যে। আর বছরাধিক কাল গড়িমসি করে, দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগে ডক্টর কামাল হোসেনও এবার নতুন দল করার জন্যে প্রচার প্রচারণার গরজে মাঠে নেমেছেন, ঘুরে বেড়াচ্ছেন জেলায়, থানায়। গড়ে তুলছেন দল।

আমরা নিরীহ কিন্তু দেশ, জাতি, মানুষ রাষ্ট্রসচেতন নাগরিক হিসেবে আমাদের চিন্তা-চেতনার অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও গণমানবের ও রাষ্ট্রে হিতৈষণাবশে আমাদের মনের কথা, মর্মের কথা বুকের কথা, মুখে উচ্চারণ করতে চাই। নাগরিকের মধ্যে অকৃত্রিম রাষ্ট্রিক জাতীয়তাবোধ বা অভিন্ন জাতিচেতনা একটা রাষ্ট্রের স্থিতির ও ঋদ্ধির জন্যে অত্যন্ত জরুরী বা আবশ্যিক। বিভিন্ন ও বিপরীত মন, মত, শাস্ত্র, জীবনদর্শনসম্পন্ন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় অভিবাসিত একটা রাষ্ট্রে দৈশিক, ভাষিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রিক জাতীয়তা গাঢ়, গভীর ও দৃঢ় করতে ও রাখতে হলে সেক্যুলার সংবিধান নয় কেবল, জাগতিক জীবনচেতনায়ও কেবলই মানুষ স্বীকৃত হওয়া ও থাকা আবশ্যিক ও জরুরী।

আসলে জাত, জন্ম, বর্ণ, ভাষা, বিবাস যোগ্যতা, সংস্কৃতি-আচার নিরপেক্ষতা প্রাণীপ্রজাতির মানবাকৃতির প্রাণীমাত্রকেই স্বজাতি স্বজন ভাবার জন্যে নিরীশ্বর নাস্তিকতা কেজো হলেও, তা কখনো অন্তত আরো বহুকাল বাস্তবে মিলবে না। 'স্রষ্টা মানব, শাস্ত্র ছাড়ব' এমন নীতি বা সিদ্ধান্তও সাম্প্রদায়িকতা, কিংবা গৌত্রিক স্বাতন্ত্র্যচেতনা অথবা আঞ্চলিক ভাষিক বিচ্ছিন্নতাবুদ্ধি কমাতে পারত। তা'ও আস্তিক মানুষ কখনো কল্যাণকর বলে গ্রহণ করবে না। আর সমাজতন্ত্রে তিনটে মানবিক আধি সুপ্ত, গুপ্ত ও লুপ্ত ছিল–সে চারটে হচ্ছে গৌত্রিক, শাস্ত্রিক, ভাষিক, আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যচেতনা ও দ্বেষণা। এখনো ভাঙা কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রগুলোতে চারটেই বাসন্তী হওয়ায় ওষধির জাগরণের মতেই এমন প্রবলভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে যে শিক্ষিত সভ্য সংস্কৃতিমান বিজ্ঞানমনস্ক মানুষকেও হিংস্র শ্বাপদের চেয়েও হিংস্র করে তুলেছে–মনুষ্যত্ব হয়েছে বর্জিত। কাজেই কম্যুনিজম আবার কখন ফিরে আসবে বলা যাচ্ছে না। ক্ষণে ক্ষণে প্রয়োজনে, ক্ষোভে, ক্রোধে, লাভে লোভে মানুষমাত্রই যেন ইতর হিংস্র প্রাণী হয়ে ওঠে, তার প্রাণিত্ব প্রবল হলে সে জীবমাত্র হয়, মানুষ থাকে না। মনুষ্যত্ব মানবতা বলে কিছু স্মরণও করতে পারে না।

অতএব আমাদের হাতে আজ আর কোন বিকল্প নেই সেক্যুলারিজমের। তাই রাজনীতিক দলগুলোর কাছে আবেদন আমাদের অজ্ঞ-অনক্ষর জনগণের পক্ষে শুধু গণতান্ত্রিক নয়, সেক্যুলার হোন। আমাদের ব্যবহারিক বৈষয়িক মানসিক আর্থ-বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি নিহিত হয়েছে ওই সেক্যুলারিজমেই। এটি সহজেই লোকগ্রাহ্যও হবে। গারো, সাঁওতাল, ত্রিপুর, চাকমা, মার্মা, বৌদ্ধ, হিন্দু, খ্রীস্টান, মুসলমান নিয়ে রাজনৈতিক দল গঠন করুন। প্রেসিডিয়ামে প্রতি গোত্রের ও সম্প্রদায়ের লোক রাখুন।

শাস্ত্র-স্বাতন্ত্র্য ও সমকালীন জীবনের দাবি

কাল প্রবহমান, কাজেই প্রবাহ নতুন নতুন বাঁক অতিক্রম করে। নতুন নতুন প্রভাব বিস্তার করে। কালই প্রজন্মক্রমে মানুষের অজ্ঞতা ঘোচায়, জ্ঞান-অভিজ্ঞতা বাড়ায়, মন-মনন-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বদলায়। ফলে জীবনযাপন প্রথায়-পদ্ধতিতে আসে পরিবর্তন, ঘটে উৎকর্ষ, আনে সৌকর্য। এ কারণেই ছয় হাজার বছর থেকে দেড় হাজার বছর অবধি পূর্বকালের অজ্ঞতাজাত, অনভিজ্ঞতাজাত অজ্ঞানতাজাত, অসহায়তাজাত, অবুদ্ধিজাত, পৃথিবীর পরিধি সম্বন্ধে ধারণার অভাবজাত, বিচিত্র রঙের ও অবয়বের মানুষের স্থিতি সম্বন্ধে অজ্ঞানতাজাত, এক কথায় বিচ্ছিন্নতার, অপরিচয়ের ও অজ্ঞতার দরুন মানুষের মধ্যে মানসিক, ব্যবহারিক, বৈষয়িক, নীতি-নিয়মের, রীতি, রীতি-রেওয়াজের, প্রথা-পদ্ধতির পার্থক্য ঘটেছে গুণে, মানে, মাপে ও মাত্রায়। একে আমরা একালে বলছি স্বাতন্ত্র্য। জাতীয়, উপজাতীয় সাংস্কৃতিক, আচারিক, শাস্ত্রিক, নৈতিক প্রভৃতি বিশেষণে এ স্বাতন্ত্র্যকে আমরা গৌষ্ঠিক, গৌত্রিক, বর্ণিক, শাস্ত্রিক, ভাবিক, আঞ্চলিক, জাতিক স্বাতন্ত্র্য বলে অভিহিত করি। এবং অস্তিত্ব ও পার্থক্য সম্পৃক্ত এ স্বাতন্ত্র্যের এক প্রকারের মমতাবোধ রয়েছে, যদিও গৌরব-গর্ব করার মতো কোন যৌক্তিক-বৌদ্ধিক উৎকর্ষ এ স্বাতন্ত্র্যে দুর্লক্ষ্য। য়ুরোপীয়রা এ যুগে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে-সংস্কৃতিতে-রুচিতে এগিয়ে গেছে। তাই তারা স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় ব্যস্ত নয়। কেননা তারা তাদের উৎকৃষ্ট সংস্কৃতি-মনন-মনীষা-জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রকৌশল-যন্ত্র-প্রযুক্তি দিয়ে গোটা পৃথিবীর অনুন্নত রাষ্ট্রগুলোকে প্রভাবিত করছে। দুর্বলই আত্মরক্ষার তথা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষার গরজে সদা সতর্কভাবে য়ুরোপীয় প্রভাব মুক্ত থাকতে চায়। য়ুরোপীয়রা উত্তম তাই তারা 'নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে'। কিন্তু আমরা অধম বলেই থাকতে চাই তফাতে। আরো একটি তত্ত্ব আছে। ছাগলকে তার পরিচিত চৌহদ্দি থেকে অন্যত্র নিতে গেলে সামনে একজনকে দড়ি ধরে টানতে হয়, অন্য একজনকে পেছন থেকে ঠেলতে হয়। মানুষেরও রয়েছে সেই ছাগ-স্বভাব। কিছুতেই অভ্যস্ত মত-পথ ছাড়তে চায় না প্রকৃতির নিয়মেই পৃথিবী নিয়ন্ত্রিত ও চালিত। সূর্যের নৈকট্য ও দূরত্ব ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুতে পার্থক্য সৃষ্টি করেছে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে। ঝড়ঝঞ্ঝা-খরা-উষ্ণতা-শৈত্য, তুষার ও মরু প্রভৃতির বৈচিত্র্যের মূলে রয়েছে অঞ্চলের স্থিতিজনিত পার্থক্য। যানবাহনের অভাবে, গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনে আরণ্য সংস্থিতির ও সংহতির কারণে জনসংখ্যারও স্বল্পতার দরুন মধ্যেকার জঙ্গল কিংবা নদী অথবা পর্বত অতিক্রম করে অন্য মানুষের সমাজের সন্ধান নেয়ার গরজটাও ছিল না। তাই বহু বহু কাল স্থানিক, গৌষ্ঠিক কিংবা গৌত্রিকভাবে জিজ্ঞাসু মগজী মানুষের মন-মনন-মনীষা প্রয়োগে নতুন নতুন উদ্ভাবন-আবিষ্কার ও সৃষ্টি আসবাবে, তৈজসে, পোশাকে, ঘরে, চিকিৎসায়, খাদ্যে সম্ভব হলেও তা সর্বস্থানের সর্বমানবে প্রচার ও প্রসার লাভ করতে পারেনি। একালের মতো একের আবিষ্কার-উদ্ভাবন-সৃষ্টি বিশ্বমানবের সম্পদ হওয়ার উপায় ছিল না। তথাকথিত সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের উৎসের ও উদ্ভাববের তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য এ-ই।

আজ পৃথিবী যথার্থই সরার মতোই ক্ষুদ্র হয়ে ব্যক্তিমানুষের চোখ-কান-মনের আয়ত্তে এসেছে। ঘরে বসেই দুনিয়ার ও আকাশের খবর দেখা, শোনা, জানা ও বোঝা যায়। এর ফলেই অর্থাৎ বিজ্ঞানের বিচিত্র প্রয়োগে বিস্ময়কর সব শক্তির আবিষ্কারে যন্ত্রের উদ্ভাবনে এবং প্রকৌশল-প্রযুক্তির ব্যবহারে জীবনযাত্রার ধরন-ধারণ বদলে ফেলেছে। এখন আর সেই অবজ্ঞার ও অসামর্থ্যের যুগের শাস্ত্র, নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ, প্রথা-পদ্ধতি মেনে চলা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। নানাভাবে লঙ্ঘন করতেই হচ্ছে। যেমন একজন বর্ণহিন্দু মেয়েকে ৮-৯-১২ বছরের মধ্যেই বিয়ে দেয়া শাস্ত্রিক বিধি। আজকাল ওই বয়সে বিয়ে তো নেইই, তাছাড়া ঘরে ঘরে চির অনূঢ়াও মেলে, ভারতের নারীর অধিকার বিষয়ক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আইনের প্রত্যেকটি ধারা শাস্ত্রবিরোধী। একজন ব্রাহ্মণকে ছোঁয়াছুঁই থেকে গা-পা বাঁচিয়ে চলতেই হয় শাস্ত্রের বিধি অনুসারে। এখন সে রোজ আচণ্ডাল আর অস্পৃশ্য ম্লেচ্ছের সঙ্গে সারাদিন সর্বত্র ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে চলছে, তাকে চলতে হচ্ছে, শাস্ত্রমানা, শারীরিক পবিত্রতা রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না কিছুতেই। শনি-মঙ্গলবার কিংবা তিথি-লগ্ন-দিন-ক্ষণের শুভাশুভও মানাও এখন অসম্ভব স্কুলে-কলেজে দফতরে-আদালতে। শুধু হিন্দুর বেলায় নয়, দুনিয়ার যাবতীয় শাস্ত্রপন্থীরই এখন শাস্ত্র লঙ্ঘন না করে চলা অসম্ভব। নাটকে-সিনেমায় নয় কেবল, হাসপাতালে রোগীর চিকিৎসার ক্ষেত্রেও ডাক্তার-নার্স হিসেবে নারী-পুরুষের সংস্পর্শ বাঁচিয়ে চলা কল্পনাতীত। তাছাড়া স্কুলে-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে-দফতরে সহশিক্ষা ও সহ-চাকরি যেমন একালে অপরিহার্য, তেমনি হাটে-বাজারে দোকানে-সংসদে রাজনীতিতেও নারী ও পুরুষে আজকাল আর বিচ্ছিন্নতায় বাস করতে পারছে না। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে তো বটেই, দ্বিতীয়ার্ধেও নারীরা অফিসে-কারখানায় চাকরি করতো না য়ুরোপেও, শিক্ষিতাও ছিল কম। পোশাকে ও সামাজিক সম্পর্কে নারী কিছু অক্র ও দূরত্ব বজায় রেখে চলত। বিশ শতকের প্রথম মহাযুদ্ধের বিপর্যয়ের ফলে এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিণামে য়ুরোপীয় নারীরা পোশাকে, আচরণে, পেশা নির্বাচনে, প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় শাস্ত্রকে বলতে গেলে অনেকটা উপেক্ষা বা বর্জন করেই চলেছে। যেমন আমাদের তৃতীয় বিশ্বেও শিক্ষিত শহুরে সমাজে তো বটেই, অশিক্ষিত গ্রামীণ সমাজেও নারী-পুরুষের পেশায়, আচরণে, পর্দায়, মেলামেশায়, অবগুণ্ঠনে আগেকার বিচ্ছিন্নতা ও স্বাতন্ত্র্য নেই। বলতে গেলে শহুরে শিক্ষিত পরিবারের নারী-পুরুষের জীবনে শাস্ত্রিক বিধি-নিষেধ প্রায় বর্জিত কিংবা পাপভয় উপেক্ষিত হচ্ছে দৈনন্দিন জীবনে এসব দেখে শুনে-জেনে বুঝেও আস্তিক মানুষেরা শাস্ত্র লঙ্ঘন করেও শাস্ত্রের প্রতি একটা অনুরাগ, একটা আনুগত্য রাজনীতিক্ষেত্রে সময়ে-অসময়ে ভোট যোগাড়ের গরজে দেখায়। অজ্ঞ-অনক্ষর লোকের কাছে প্রচার-প্রচারণা মাধ্যমে নিজেদের শাস্ত্রের আক্ষরিকভাবে অনুরাগী অনুগামী ও অনুগত বলে দাবি করে। যেন তারা ধর্মপ্রাণ সজ্জন। ধর্ম রক্ষার জন্যে প্রাণ উৎসর্গ করতে সদা প্রস্তুত। এরাই এখন মৌলবাদী গোটা দুনিয়া। এবং উল্লেখ্য যে, মৌলবাদী মাত্রই শিক্ষিত এবং দুনিয়ার চালচিত্র সম্বন্ধে ওয়াকেবহাল। এদের ধর্মপ্রীতি হচ্ছে রাজনীতিক মতলবপ্রসূন, নিতান্ত কৃত্রিম। এরা আধুনিক বিজ্ঞানের, প্রকৌশলের, যন্ত্রের, প্রযুক্তির সব অবদানে স্ব স্ব ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য, সৌকর্য, আরাম ভোগ-উপভোগ করে, অথচ অজ্ঞ লোকদের বিজ্ঞানবিমুখ করে তুলবার জন্যে অথবা বিজ্ঞানবিরাগী করে রাখার জন্যে সদা প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে থাকে। এরা নিজেদের জীবনে শাস্ত্র লঙ্ঘন করে নানাভাবে, কিন্তু অন্যদের সেই অতীতকালের অজ্ঞতার যুগের নীতি-নিয়ম, রীতি- রেওয়াজ, প্রথা-পদ্ধতি ধরে থাকার জন্যে উপদেশ দিয়ে থাকে। মানুষকে বিপথগামী করে, অজ্ঞ রেখে, প্রগতিপথ রুদ্ধ করে, উদারতার, যুক্তিবাদের, আধুনিকতার, সেক্যুলারিজমের বিরোধিতা করে Racial, Religious ও Regional এবং ভাষিক, বার্ণিক বিরোধ-বিবাদ-সংঘর্ষ-সংঘাত জিইয়ে রেখে এরা রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে চায়। এ তাৎপর্যে এদের মধ্যে মনুষ্যত্বের নিতান্ত অভাব। এরা শিক্ষিত ও বিত্তবান, কিন্তু চিত্ত সম্পদে ঋদ্ধ সজ্জন নয়। বিত্তবানও চিত্তবান না হলে অমানুষই নয়। একালের লোকেরা যেমন প্রাত্যহিক জীবনযাপন পদ্ধতিতে শাস্ত্রকে উপেক্ষা বা অবহেলা করতে বাধ্য হচ্ছে, তেমনি শাস্ত্রী-রাব্বী-মোল্লা-পুরোত-পাদরী-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্রমণরা শাস্ত্রনিষ্ঠা বশে বিজ্ঞানকে কেবল অবহেলা নয়, বিজ্ঞানের তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য অস্বীকারও করেন। উল্লেখ্য যে, শাস্ত্রগুলো স্বকালে অর্থাৎ এদের উদ্ভব ও প্রচারকালে দেশ-কাল ও মানুষের প্রয়োজন মিটিয়েছে সুষ্ঠুভাবেই। কিন্তু কালান্তরে স্থানান্তরে ও প্রজন্মান্তরে শিক্ষা-জ্ঞান-বিজ্ঞান-অভিজ্ঞতার প্রয়োজনের আর মন-মনন-মনীষা-রুচির পরিবর্তনে উপযোগরিক্ত হয়ে গেছে, বাইবেল-গীতা-ত্রিপিটক, উপনিষদ-পুরাণ-মহাভারত-রামায়ণ-জ্যোতিষ প্রভৃতি সব শাস্ত্রই এখন মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের কালিক দাবি মেটাতে অসমর্থ। প্রমাণ হয়ে গেছে যে, কুষ্ঠরোগ পাপের ফল নয়, ওলাউঠার, বসন্তের কোন ওলা-শীতলাদেবী নেই, বুদ্ধিমতী শক্তিমতী সাহসী নারী হলেই ডাইনী হয় না। মহাবীর বুদ্ধ, যিশুর নির্দেশ না মেনেও অন্য শাস্ত্রীপন্থীরা মোক্ষ পাবার আশা রাখে। দরগাহবিহীন দেশেও মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখের হ্রাস-বৃদ্ধি আছে। অমুসলিমও স্বর্গে ঠাঁই পাবে বলে দৃঢ় আস্থা রাখে। লক্ষ্মী-সরস্বতীর পূজো না করেও বিদ্যা-বিত্ত অর্জন করা সম্ভব। আজ আমরা যদি যুক্তি প্রয়োগে বলি যে শাস্ত্র ছিল তার স্বকালে দেশ-কাল-মানুষের জন্যে সর্বপ্রকার চাহিদা পূরণের ও নিরাপদ নিবাসের দৃঢ় অট্টালিকা। সে-অট্টালিকা কালিক প্রভাবে জরা-জড়তা-জীর্ণতা পেয়েছে। কেননা, কাল ঘসতি ভূতান। ধ্বংস-উন্মুক্ত অট্টালিকায় বাস বিপজ্জনক। আজ তেমনি শাস্ত্রানুগ জীবনও প্রগতির পথে বিঘ্নস্বরূপ, পতনোন্মুখ ইমারত ছাড়তেই হয় বাঁচার গরজে, তেমনি কালিক জীবনের প্রসাদ লাভের জন্যে ছাড়তে হবে শাস্ত্র।

AMARBOI.COM

শিষ্টাচার

শিষ্টাচার সংস্কৃতিপ্রসূন, কিংবা শিষ্টাচারই সংস্কৃতি। অথবা শিষ্টাচার সংস্কৃতিমানতার প্রতীক, প্রতিম ও প্রতিভূ। এজন্যেই বেআদবি, ঔদ্ধত্য, অবিনয়, নির্লজ্জতা, মস্তানী, গুণ্ডামী প্রভৃতি অশিষ্টাচার। যা করতে, দেখতে, বলতে, শুনতে, কুৎসিত বা অনভিপ্রেত কিংবা মন্দ বা অশোভন তা-ই অশিষ্ট কর্ম বা আচরণ নামে অভিহিত। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, গ্রামীণ কিংবা শহুরে সব মানুষে শিষ্টাচার প্রত্যাশিত। কারণ এটা যৌথজীবনে তথা সামাজিক জীবনে আবশ্যিক। যে-কোন দু'জনের ঘরে-বাইরে আত্মীয়-অনাত্মীয় নির্বিশেষে পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে ভাব-চিন্তা-কথা-অর্থ-সামগ্রী-সাহায্য-সহযোগিতা বিনিময়ের মধ্যে শিষ্টাচার থাকা আবশ্যিক। শিষ্টাচার হচ্ছে কথার ব্যবহারের সৌন্দর্য। এ জন্যেই শিষ্টাচারের অপর নাম সৌজন্য বা সজ্জনতাও হতে পারে।

শিষ্টাচার সম্বন্ধে আমাদের কারো কারো ব্যক্তিগত ধারণা পষ্ট নয়, এ জন্য দৃষ্টান্ত যোগে শিষ্টাচার আলোচনা বাঞ্ছনীয়।

১. যে লোক আড্ডায় বসে, স্বাভাবিক কণ্ঠে তর্ক বা প্রতিবাদ করতে পারে না, উত্তেজিত হয়ে যায়, ক্ষুব্ধ কিংবা ক্রুদ্ধ হয়ে গালাগালি, হাতাহাতি, মারামারি করতে উদ্যত হয়, সে আড্ডাবাজ হবার যোগ্য নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২. জনপ্রতিনিধি হয়ে যাঁরা পর্ষদে, পরিষদে সঙ্ঘে, সংসদে বসেন, তাঁদের মধ্যেও দেখা যায় পরমত, পরআচরণ সহ্য করার ধৈর্য থাকে না, উত্তেজিত হয়ে উচ্চকণ্ঠে তর্জন-গর্জন করতে থাকেন। ভুলে যান যে তাঁদের কাজই হচ্ছে বিরুদ্ধ দলের, মনের, মতের, পথের, আদর্শের লোকের সঙ্গেই তাঁদের সার্বক্ষণিক সম্পর্ক। তর্কে-বিতর্কে আলোচনায়-কথায় ও কাজে ঠাণ্ডা মেজাজে বিরোধিতা করা তাঁদের দায়িত্বের ও কর্তব্যের প্রথম ও প্রধান লক্ষণ। সরকারি দল বিরোধী দলগুলোর এবং বিরোধী দলগুলো সরকারি দলের বিরোধিতা করাই সংসদে, পর্ষদে, পরিষদে, সঙ্ঘে, সমিতিতে সর্বত্রই রয়েছে এ নিত্যকার রেওয়াজ। গালাগাল, উত্তেজনা, উচ্চকণ্ঠে আস্ফালন প্রভৃতি শিষ্টাচার বিরুদ্ধ। সংযম, পরমত ও পরআচরণ, সহিষ্ণুতা এবং ধৈর্যও ও সৌজন্যই শিষ্টাচারের নয় কেবল, সংস্কৃতিমানতার, উদারতার, বিবেকবানতার, সদাচারের লক্ষণ। উত্তেজিত কণ্ঠের গর্জন মাত্রই কিংবা হাতাহাতির লক্ষ্যে দাপাদাপিমাত্রই দুর্বল মন-মগজ-মনন-মনীষার পরিচায়ক।

৩. এমনিভাবে হাটে-বাজারে-দোকানে-রাস্তাঘাটে-যানবাহনে আমরা দরকষাকষির ক্ষেত্রেও অনেক সময়ে মেজাজ হারিয়ে অসংযত অসহিষ্ণু অভদ্র আচরণ করি। এ-ও সংস্কৃতি ও শিষ্টাচার বিরোধী।

অজ্ঞতার-অনক্ষরতার যুগেও সমাজে শিষ্টাচারের গুরুত্ব সর্বজন স্বীকৃত ও মান্য ছিল। আজ গাঁয়ে-গঞ্জে-শহরে-বন্দরে, স্কুলে-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে দফতরে-আদালতে হাটে-বাজারে হলে-হোস্টেলে পর্ষদে-পরিষদে সঙ্ঘে-সমিতিতে, রাজনৈতিক দলে, কর্মে, ভাষণে আচরণে কোথাও যেন কেউ শিষ্টাচারের অস্তিত্বই, তার প্রয়োজনীয়তাই স্বীকার করে না। অথচ শিষ্টাচার একাধারে ও যুগপৎ মনুষ্যত্বের, সংস্কৃতির সংযমের, সহিষ্ণুতার, সৌজন্যের, সভ্যতার বীজ-বৃক্ষ-ফল। শিষ্টাচার এখন বাঙলাদেশে অজ্ঞাত বা বর্জিত বলেই শিক্ষক ছাত্রের হাতে মার খান, পথেঘাটে, ত্রাস-সন্ত্রাস-ধর্ষণ-খুন-রাহাজানি চলে। শিষ্টাচার নেই বলেই মানুষ আজ বেচশম, বেশরম, বেহায়া, বেআদব, বেলেহাজ, বেদানাই, বেল্লিক, বেআক্কেল, বেইজ্জত। ঘুষ চাইতে-নিতে সংকোচ বোধ করে না। চুরি করার সময়ে আত্মমর্যাদার কথা ভাবে না, চোরাকারবারের লজ্জাবোধ করে না। সমাজের পরিচিত লোকে তাকে যে ঘুষখোর, চোর, দুর্নীতিবাজ বলে ঘৃণা-নিন্দা-অবজ্ঞা করে, তা অনুমান করেও লজ্জাবোধ করে না, বেপরোয়াভাবে বুক ফুলিয়ে বিচরণ করে। ভাবে টাকা যার, সেই অপব্যবহারে অপকর্মে সিদ্ধি ও সম্মান অর্জন করে। এরূপ নৈতিকচেতনা বিকৃতি আজ গোটা বাঙলাদেশে বিস্তৃতি পেয়েছে। আজ তাই কারো জান-মাল-গর্দান নিরাপদ নিরুপদ্রব নয়। এখানে 'ন্যায়বোধ' অস্তিত্ব হারিয়েছে। এখানে দুর্বলের ক্ষেত্রে 'বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে 'কাঁদে'। এখানে মানুষের প্রতি মানুষ আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। এখানে প্রতি দ্বিতীয় ব্যক্তি সন্দেহের পাত্র। এখানে জীবন তাই জাঙ্গলিক ও গাড্ডলিক। এখানে প্রত্যাশিত মানের, মাপের, মাত্রার সংস্কৃতি গড়ে উঠতে পারে না। এখানে এখন আমরা এক কালোজগতে কালোবাজারের বাসিন্দা। আমরা এক অমানবিক জৈব জীবন-যাপনে ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। তাই এ অমানবিক বিকৃত জৈব জীবনধারার অবক্ষয়, গ্লানি আর মারাত্মক পরিণতির রূপ-স্বরূপও আমাদের চেতনায়-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিন্তায় ধরা দেয় না। আমাদের মগজী সজ্জনদেরও বিচলিত করে না, বরং UNDP ও NGO সম্পৃক্ত হয়ে রোজগারে উৎসাহিত করে। এ জাতির ত্রাতারূপে নেতার আবির্ভাব ঘটবে কবে?

নতুন কালের নয়া দুনিয়া

নয়া দুনিয়া নামটি সুন্দর, তবে নতুন নয়, তবু তাৎপর্যে অবশ্যই নতুন ও চমকপ্রদ। বিজ্ঞানের তত্ত্বে, তথ্যে ও সত্যে আস্থা রাখলে স্বীকার করতেই হবে যে দুনিয়া নতুন নয়, দুনিয়া নতুনও হয় না। কেবল বিবর্তিত হচ্ছে, আর রূপ পরিবর্তন করছে। বৃক্ষের মতো পুরোনো পাতা ঝরাচ্ছে ও নতুন পাতা-ফুল-ফল গজাচ্ছে, এভাবেই পৃথিবী এগুচ্ছে, তার বয়স বাড়ছে। ধ্বংসে ও সৃষ্টিতেই জীবে-উদ্ভিদে প্রাজন্মক্রমিক আবর্তন, বিবর্তন ও পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। কাজেই দুনিয়া নয়া নয়, চির পুরাতন ও চির নতুন মাত্র। প্রতিটি নতুন জীবে-উদ্ভিদের কাছে পৃথিবী নতুন। নতুন চোখে নতুন। নতুন সূর্যের উদয়ও নতুন। নতুন চোখে নতুন, অভ্যস্ত চোখে পুরোনো এ পৃথিবী।

দুনিয়া স্থিতিশীল নয়, গতিময়। তাই রূপান্তর ঘটছে, যুগান্তর ঘটছে। আর মানুষ নামে প্রাণীপ্রজাতি জ্ঞান-বুদ্ধি, সাহস-শক্তি, সন্দেহ, জিজ্ঞাসা, উদ্যম, অঙ্গীকার, উদ্যোগ প্রয়োগে প্রকৃতির নীতি-নিয়ম জেনে-বুঝে মেনে প্রকৃতিকে কখনো বশ, কখনো দাস, কখনো আপসে নিয়ন্তারূপে বরণ করে কেবল রোদ-বৃষ্টি-শৈত্য থেকে আত্মরক্ষা করে নয়, প্রায় সর্বপ্রকারে স্বরচিত কৃত্রিম জীবনযাপনে সমর্থ হয়েছে।

আজ পৃথিবীতে অর্থে বিত্তে বিদ্যায় বেসাতে প্রাগ্রসর সমাজ ও রাষ্ট্র বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জ্ঞানে ঋদ্ধ হয়ে যন্ত্রজগতে যন্ত্র-প্রকৌশল-প্রযুক্তিনির্ভর জীবনে উৎকর্ষে ও সৌকর্যে অসামান্য স্বচ্ছন্দ, স্বচ্ছল, সুচিকিৎসায় প্রায় রোগজিৎ সুদীর্ঘ জীবন যাপন করছে।

যেহেতু একসময়ে মানুষ অজ্ঞ অসহায় ছিল, সেহেতু প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত প্রাকৃতজীবনে জনসংখ্যা সহজে বৃদ্ধি পেত না। সমুদ্র-পর্বত-অরণ্যের বাধা ছিল অলঙ্ঘ্য ও দুর্লঙ্ঘ্য। তাই প্রায় কাছাকাছি বাস করেও এক গোষ্ঠী-গোত্রের মানুষ অন্য গোষ্ঠী-গোত্রের সন্ধান জানত না। যানবাহনের অভাবে অপরিচয়ের ও অজানার বাধা অতিক্রম করা সম্ভব ছিল না। তবু সাহসী উচ্চাশী কোন গোত্র আত্মবিস্তারে অপরিচয়ের বাধা অতিক্রমণে আগ্রহী হয়েছিল আট/দশ হাজার বছর আগেও। কিন্তু সব গোত্রের লোকের মন-মগজ-জ্ঞান-শক্তি-সাহস-উদ্যম-উদ্যোগ গুণে মানে মাপে মাত্রায় সমভাবে বিকাশ-বিস্তার লাভ করেনি বলে, আজও কোন কোন গোত্র আদি ও আদিম প্রাণীর জীবনযাপন করে।

এখনকার তারে-বেতারে যানে-বাহনে বিস্ময়কর উন্নতির ফলে পৃথিবী একটা প্রায় ক্ষুদ্র জনপদে পরিণত হয়েছে। আগেকার দিনে গাঁয়ের হাটে যেমন চারদিককার জনগণের দেখা-সাক্ষাৎ ঘটত, সংবাদ বিনিময় ঘটত, পণ্য বিনিময়ের মতোই, এখনকার জগতে ও জীবনে তেমনি সব বিষয়েই মানুষ বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক পণ্য ও ভাব-চিন্তা-কর্ম-বিজ্ঞান-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিকিৎসা-প্রকৌশল-প্রযুক্তি বিনিময়েই বাঁচে। ব্যবহারিক ও বৈষয়িক জীবনে বিনা আপত্তিতে জীবনযাপনের সাচ্ছল্য ও স্বাচ্ছন্দ্য, উৎকর্ষ ও সৌকর্যবাহী সবকিছু বিনা দ্বিধায় সবাই সাধারণভাবে গ্রহণ করে। কিন্তু পিছিয়ে-পড়া গোষ্ঠী, গোত্র, শাস্ত্রিক সম্প্রদায়, আঞ্চলিক মানুষ আত্মস্বাতন্ত্র্য ও আত্মঅস্তিত্ব বিলোপের তথা সনাতন ও সুপ্রাচীন পরিচিতি হারাবার ভয়ে স্ব স্ব সংস্কৃতি রক্ষার নামে তাদের গৌত্রিক, আঞ্চলিক, ভাষিক, শাস্ত্রিক, আচারিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার তথা স্বাতন্ত্র্যের নামে বিচ্ছিন্নতার ব্যবধান সচেতন সযত্ন প্রয়াসে রক্ষার সংগ্রামে নেমেছে গোটা পৃথিবীব্যাপী। আজকের পাঁচটি মহাদেশেই প্রায় সব রাষ্ট্রেই র‍্যাশিয়াল, রিজিওনাল, লিঙ্গুইস্টিক ও শাস্ত্রিক-আচারিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষার নামে স্বাধীনতার, স্বাতন্ত্র্যের ও বিচ্ছিন্নতার সংগ্রাম করে চলছে বিভিন্ন গোত্রের, ভাষার, অঞ্চলের ও ধর্মমতের মানুষ। যারা যত বেশি ঐতিহ্যহীন ও আত্মশক্তি সম্বন্ধে প্রত্যয়হীন, তারাই ততবেশি স্বাতন্ত্র্য ও স্বয়ংসংস্কৃতি সচেতন। বিচ্ছিন্নতার আগ্রহও তাদেরই বেশি। এ হচ্ছে অস্তিত্ব হারানোর মনস্তাত্ত্বিক শঙ্কার অভিব্যক্তি।

শিক্ষার বিস্তারে, মন-মগজ-মননের প্রসারে, আর্থ-বাণিজ্যিক-প্রাশাসনিক স্বার্থে ব্যক্তি মানুষের মধ্যেও স্বসত্তার মূল্য, মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠাচেতনা প্রবল তথা তীক্ষ্ণ-তীব্র হয়েছে। তা-ই এখন সামষ্টিক, সামূহিক ও সামগ্রিক রূপ নিয়ে পৃথিবীর সর্বত্র লঘু-গুরুভাবে স্বতন্ত্র গৌত্রিক, জাতিক, সাম্প্রদায়িক, ভাষিক, আঞ্চলিক, আচারিক সংস্কৃতি রক্ষার যুক্তিরূপে বিচ্ছিন্নতার ও স্বাধীনতার দাবি ও সংগ্রাম হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। ছোট বড় মাঝারি সব রাষ্ট্রেই এ সংগ্রাম চলছে লঘু-গুরুভাবে। এ দাবি ও এ সংগ্রাম অপ্রতিরোধ্য। তাই মনে হয় আগামী দশ বছরের মধ্যেই গোটা পৃথিবী থেকেই বহু জাতিসত্তা, বহুভাষী লোক অধ্যুষিত 'একক রাষ্ট্র' বিলুপ্ত হয়ে যাবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৌত্রিক, ভাষিক, আঞ্চলিক ও শাস্ত্রিক মতবাদী সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র গড়ে উঠবে। কিন্তু এ যন্ত্রযুগে ও যন্ত্রজগতে বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক-সহযোগিতা-নির্ভরতা, পণ্য বিনিময় ও ভাব-চিন্তা-বিজ্ঞানের তত্ত্ব তথ্য সত্য প্রকৌশল-প্রযুক্তি, চিকিৎসা প্রভৃতির গ্রহণ-বরণ ব্যতীত কারুর স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্নভাবে বাঁচার উপায় নেই। তাই তারা বিচ্ছিন্ন হয়েও নিজেদের স্বার্থেই সামবায়িক সহযোগিতায় সহাবস্থান করতে বাধ্য হবে মণ্ডলী বা ফেডারেশন বা কনফেডারেশন করে। বাঁচার গরজেই যেমন আজের ন্যাটো জোট স্ব স্ব জাতীয় গৌরব-গর্ব-স্বাতন্ত্র্য পরিহার করে আর্থ-বাণিজ্যিক প্রয়োজনে যৌথভাবে পণ্য উৎপাদনে নির্মাণে বিপণনে এবং অভিন্ন মুদ্রা গ্রহণে সম্মত হয়েছে। পৃথিবীতে দশ বছরের মধ্যেই সব ইউনিটারি সরকার লুপ্ত হয়ে যাবে, ফেডালের ও কনফেডারেল সরকারই গঠিত হবে। নাফতা ও গ্যাট তারই সূচনা করছে। তবে তাতেও পৃথিবীতে ব্যক্তিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনে মানুষের হিংস্রতা, নিষ্ঠুরতা, কাড়াকাড়ি-মারামারি-হানাহানি কতটুকু হ্রাস পাবে, তা এখনই বলা যাবে না। তবু যুগান্তর যখন ঘটেছে, তখন তাকে নয়া দুনিয়া, নয়া সমাজ, নয়া ব্যবস্থা বলে অবশ্যই অভিহিত করা যাবে। যদিও এখনই বলা যাবে না যে তখনো আর্থ-বাণিজ্যিক-মহাজনী সাম্রাজ্যবাদ বিলুপ্ত হবে কি-না, মানবতার বিকাশ-বিস্তার হবে কি-না, বহু প্রত্যাশিত শোষণ-পীড়নমুক্ত সমাজ গড়ে উঠবে কি-না, সামন্ত-বুর্জোয়া মন-মনন অবসিত হবে কি-না, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় জনগণের আগ্রহ বাড়বে কি-না। দুনিয়ার সব শাস্ত্রেই যেহেতু পুরুষকে নারীর অভিভাবক, তত্ত্বাবধায়ক ও পোষ্য করে দেয়া হয়েছে, শাস্ত্রমানা মানুষ পৃথিবীর সর্বত্র নারীকে পুরুষের সমান অধিকার দেবে কি-না. বিজ্ঞানমনস্কতার ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিজ্ঞানের তত্ত্বের, তথ্যের ও সত্যের প্রচারের ফলে শাস্ত্র লঙ্ঘিত কিংবা উপেক্ষিত হবে কি-না, মানুষ কেবল জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি বিবেক চালিত জীবননীতি সামাজিক ও রাষ্ট্রিকভবে মেনে নেবে কি-না। বিজ্ঞানে এবং প্রাকৃতিক নিয়মে আস্থাবান হয়ে মানুষ বৌদ্ধিক ও যৌক্তিক জীবনের অনুরাগী অনুগামী ও অনুগত হলেই কেবল মনুষ্যত্বের, মানবতার প্রসার দ্রুততর হবে। আমাদের বাঞ্ছিত জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্র এখনো সুদূরের কিংবা অদূরের স্বপ্ন ও সাধ কি-না তা-ও এখনই বলা যাবে না।

কলা ও কলাকার

প্রাণী প্রজাতির মানুষ যৌথ জীবনযাপনের এবং খাদ্য সংগ্রহে, আবাস নির্মাণে, আত্মরক্ষায় পারস্পরিক সহযোগিতার গরজে গোড়া থেকেই ভাষা সৃষ্টি করেছে। এবং যেদিন থেকে কথা বলার জন্যে ভাষা সৃষ্টি করেছে, সেদিন থেকেই তার নানা ভাব-চিন্তা, অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও ঘটনা বয়ানের তাগিদও অনুভব-উপলব্ধি করেছে। এভাবেই ব্যবহারিক-বৈষয়িক জীবনের অন্যান্য প্রয়োজনীয় কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে গল্প বয়ানের আগ্রহও জেগেছে তার মনে।

অতএব সাহিত্য মৌখিকভাবে শুরু হয়েছে মানুষের কথা বলার ভাষা সৃষ্টির দিন থেকেই। মৌখিক সাহিত্য শ্রুতিস্মৃতির এবং নতুন সৃষ্টিরূপে আজো চালু রয়েছে পৃথিবীব্যাপী নানা জনগোষ্ঠীর মধ্যে।

সাহিত্য জীবন-নিরপেক্ষ হতেই পারে না, সাহিত্য জীবনানুভূতি থেকেই উৎসারিত। জীবনকে নিয়েই, জীবনের কথা নিয়েই তৈরি হয় সাহিত্য। অর্থাৎ শৈশব থেকে শোনা-জানা-বোঝা বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা, জ্ঞান-অভিজ্ঞতা, স্বপ্ন, সাধ, অনুভব, উপলব্ধি, আশা, আকাঙ্খাপুষ্ট মনের মননের অভিব্যক্তি গুছিয়ে সুন্দর সুষম প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপনই হচ্ছে সাহিত্য। এ হিসেবে বাঁধা হেঁয়ালি-প্রহেলিকা-গান-গাথা-রূপকথা-উপকথা কিংবদন্তী প্রভৃতি সবটাই 'সাহিত্য'-এরই বিভিন্ন লঘু-গুরু-অপূর্ণ-সম্পূর্ণরূপ মাত্র।

সব মানুষের মনের-মগজের-মননের বিশ্বাসের-সংস্কারের-ধারণার, রুচির, বুদ্ধির, জ্ঞানের, যুক্তির, বিচারের ও বিবেকের গুণ, মান, মাপ, মাত্রা সমান নয়। ফলে শক্তিও সমান নয়। তাছাড়া দেশ-কাল-সামাজিক পরিবেষ্টনী, আচার-আচরণের নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ, প্রথা-পদ্ধতিও গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে, গোত্রে গোত্রে, অঞ্চলে অঞ্চলে বিভিন্ন। সেজন্যে রচিত সাহিত্যে রচকের রুচি-চিন্তা-ভাষা-ভঙ্গিগত ভেদ যেমন থাকে প্রকট, তেমনি কালভেদে, দেশভেদে, বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা চিন্তা-বুদ্ধিভেদে আদর্শ-উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ভেদও থাকে দৃশ্যমান বিভিন্ন মতবাদী সম্প্রদায়ের সাহিত্যে।

আমাদের বাঙলা সাহিত্যেও মধ্যযুগে হিন্দুর রচিত সাহিত্যের বিষয়ের ও লক্ষ্যের সঙ্গে মুসলিম রচিত সাহিত্যের বিষয়ের ও লক্ষ্যে পার্থক্য ছিল। এমনকি গানে-গাথায়ও সে-পার্থক্য সুপ্রকট। ইংরেজ আমলে ইংরেজী শিক্ষিত হিন্দু-মুসলিমরা গীতিকবিতার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্ষেত্রে কিছু অভিন্ন আবেগ-অনুভব-উপলব্ধির পরিচয় দিয়ে থাকলেও গল্পে-উপন্যাসে বর্ণনামূলক কাব্যে-মহাকাব্যে-উপাখ্যানে স্ব স্ব সম্প্রদায়ের বা জাতির ঐতিহ্য নিয়েই রচনা করেছেন সাহিত্য। এক্ষেত্রে প্রথম ব্যতিক্রম সৃষ্টি করেন কম্যুনিস্ট লেখকরা নাটকে-গল্পে-উপন্যাসে, তাও সংখ্যায় আজো নগণ্য।

কাজেই শাস্ত্রিক বিশ্বাস কমবেশি পৃথিবীর সব সাহিত্যিকের মন-মগজ-মনন-মনীষা প্রভাবিত করেছে। নির্মোহ দৃষ্টিতে, নিরপেক্ষ চেতনায় জীবনকে-জীবনের তাৎপর্যকে বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়নি সাধারণভাবে। সব সাহিত্যিকের লেখায় দেশ-কাল-সামাজিক মূল্যবোধ, শাস্ত্রিক তত্ত্বচেতনা সহজেই প্রত্যক্ষ করা যায়। পৃথিবীতে বিগত আড়াই হাজার বছর ধরে যেসব কবি-নাট্যকার-ঔপন্যাসিককে আমরা মানবপ্রজাতির গৌরব-গর্ব বলে তারিফ করে থাকি, যাঁদের মনীসার অসামান্যতা-অনন্যতা আমাদের বিস্মিত করে, তাঁদের রচনাও বিশ্বাসের, সংস্কারের, দেশ-কালের, শাস্ত্রের, আঞ্চলিক-সাম্প্রদায়িক নৈতিক চেতনার ঊর্ধ্বে নয়। তবে যেহেতু 'সাহিত্য জীবনানুভূতির অভিব্যক্তি এবং জীবনাভূতিতে মানুষমাত্রেরই কিছু সর্বজনীন আবেগ-অনুভূতি-উপলব্ধি-অভিজ্ঞতা থাকেই, সেজন্যেই যে-কোন যুগের, যে-কোন গোষ্ঠীর যে কোন গোত্রের, যে কোন শাস্ত্রিক সম্প্রদায়ের ও যে-কোন ভাষার ও অঞ্চলের সাহিত্য যে-কোন পাঠকের উপভোগ্য হতে পারে।

আগেই বলেছি, মানুষের বিদ্যাবুদ্ধি, স্মৃতিশক্তি, বোধশক্তি, রুচি, সংস্কৃতি গুণে-মানে-মাপে-মাত্রায় কখনো সমভাবে বিকাশ পায় না। অধিকাংশ মানুষ অনীহ-উদাসীন বলে আত্ম-অনুশীলনে বিমুখ বলেই লেখক হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যাশিত মানের লেখা লিখতে অসমর্থ। ফলে দুনিয়ায় শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে তাল রেখে দুনিয়ার অসংখ্য আঁকিয়ে লিখিয়ে-গাইয়ে-বাজিয়ে স্ব স্ব অবদানে সমাজক্ষেত্রে লোকস্মৃতিতে স্বপ্রতিষ্ঠ ও অমর হওয়ার স্বপ্ন দেখেন, কিন্তু সবার সব লেখা টেকে না। কিন্তু সব শিল্পী-সাহিত্যিক পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় উপভোগ্য সুন্দর শব্দের মালায় ভাবের কথা, আবেগের কথা, জীবনের কথা, অনুভূতির কথা চিত্রে গদ্যে পদ্যে প্রকাশ করে গেছেন, লক্ষ্য কোন পাঠক শ্রোতা যদি দেখে-শুনে-পড়ে মুগ্ধ হয়, অভিভূত হয়, সৃষ্টার শংসায় মুখর হয়। যদি মর্ত্যজীবনের অবসানের পরেও মানুষের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকা যায়-বাঞ্ছা এটুকুই।

কিন্তু এ বাঞ্ছা পূর্ণ হয় ক্বচিৎ কারো। আজ অবধি অমর আঁকিয়ে-লিখিয়ে-গাইয়ে-বাজিয়ে-নাচিয়ে লোক বলতে গেলে পৃথিবীর নতুন পুরোনো সব ভাষাতেই সব দেশেই করগণ্য। আমের মুকুল থাকে অজস্র। আম ফল হয়ে ওঠে মাত্র কয়েকশ। তেমনি কলাচর্চার ক্ষেত্রে কলা ও কলাকার থাকে মাত্র নগণ্য সংখ্যায়। এতো কথা বলছি এজন্যে যে, আমাদের দেশেও কবির, চিত্রশিল্পীর ও ভাস্করের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অথচ ওঁদের কবিতা, চিত্র, ভাস্কর্য, পড়ার-বোঝার-দেখার-শোনার লোক শিক্ষিত সমাজে আনুপাতিক হারে বাড়ছে না। প্রথমত মানুষ কিছু জানা-বোঝার অনুশীলনে সাধারণভাবে অনীহ, তবু শুনতে-দেখতে যত আগ্রহী, পড়তে-বুঝতে সে পরিমাণে উদাসীন। তাছাড়া এখন টিভি, রেডিও-ক্যাসেট সিনেমা মানুষের অনুশীলনের স্পৃহা কমিয়ে দিয়েছে।

ফলে শিল্প-সাহিত্যের প্রকৃত সমঝদার, অকৃত্রিম বোদ্ধা, মনে-মগজে-মর্মে দুর্লৎ। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা যে আমাদের মনুষ্যত্ব বা মানবিক গুণ বিকাশের জন্যে আবশ্যিক, তা জানানোর বোঝানোর লোকেরও অভাব ঘটছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবু আশার কথা গুণ-মান যাই হোক, দেদার লেখা ও আঁকা হচ্ছে। নৃত্য-গীত-বাদ্যচর্চাও বাড়ছে। বাড়ছে মুসলিম সমাজে ফুলের, চিত্রের ও নাটকের আদর-কদর। আমরা যে এতো প্রতিকূলতার মধ্যেও অগ্রসর হচ্ছি, এ-ই তার প্রমাণ। অতএব 'মা ভৈ'।

বিপন্ন আঞ্চলিক সংস্কৃতি

রবীন্দ্রনাথ কল্পিত 'তাসের দেশ' আজ আর দুনিয়ার কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। অথবা মরণের ঝুঁকি নিয়ে কাউকেও আজকাল অজ্ঞাত দেশে বাণিজ্যে যাওয়ার সংকল্পও গ্রহণ করতে হয় না। বলতে গেলে পৃথিবী এখন হাতের তালুর উপরই উঠে এসেছে। এখন পৃথিবী চোখে দেখা যায়, কানে শোনা যায় পৃথিবীর যে-কোন কোণের যে-কোন ধ্বনি। কথা বলা যায় যে কোন কারুর সঙ্গে। তারে-বেতারে চিঠিপত্রে যোগাযোগ, লেনদেন, পণ্য বিনিময়ের ব্যবস্থা, অর্থ আদান-প্রদান সব করা সম্ভব। এ জন্যে আলাদিনের যাদুই চেরাগ কিংবা আসমানী অদৃশ্য দৈবশক্তির মন্ত্র-মাদুলী, তাবিজ-কবজ-যাদু-টোনা-ঝাড়-ফুঁক প্রয়োজন হয় না একালে।

একাল কায়িক-মানসিক-আর্থিক বন্ধনের কাল নয়, মুক্তির যুগ। যাঁরা স্বসম্প্রদায়ের লোকদের স্ব স্ব শাস্ত্রিক বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা-ভয়-ভক্তি-ভরসা-আচার-আচরণের মধ্যে আগের মতোই সামাজিক-সাংস্কৃতিক সতানুগতিকতা, অনুরাগ, অনুগামিতা ও আনুগত্য বজায় রাখার স্বপ্ন-সাধ বশে প্রয়াস-প্রযত্ন চালিয়ে যাচ্ছেন নিষ্ঠার সঙ্গে, তাঁরা সম্ভবত উজান স্রোতে শ্রম ও সময় ব্যয় করছেন। কারণ পুরোনো নীতি-নিয়মে, রীতি-রেওয়াজে, প্রথা-পদ্ধতিতে যাঁরা চিরন্তন কল্যাণ প্রত্যক্ষ করছেন মানসচক্ষে, যাঁরা বিজ্ঞানের তত্ত্বে, তথ্যে ও সত্যে আস্থা না রাখলেও বিজ্ঞানী আবিষ্কৃত-উদ্ভাবিত, নির্মিত যন্ত্র, প্রকৌশল, প্রযুক্তি ও নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রী ও চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রহণে স্ব স্ব জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য, সাচ্ছল্য, উৎকর্ষ, সৌকর্য ও আরাম-আনন্দ বৃদ্ধিতে এবং জীবন ভোগে-উপভোগে-সম্ভোগে-আগ্রহী, তাঁরা এখন জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে বুঝে না-বুঝে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় শাস্ত্রিক বিধি-নিষেধ প্রাত্যহিক জীবনে ঘরে-বাইরে লঙ্ঘন করতে বাধ্য হচ্ছেন। এ কালের দাবি, এ যন্ত্রের দাবি, এ বিজ্ঞানের দাবি, ফলে এ এখন জীবনের দাবি ও প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য এখন হামলাগ্রস্ত। এটি প্রকারান্তরে কূর্মস্বভাবের ও রক্ষণশীলতার অবসান ঘটিয়ে প্রগতির পথ উন্মুক্ত করবে। ইহুদী-খ্রীস্টান-বৌদ্ধ-হিন্দু কেউই এখন শাস্ত্র লঙ্ঘন না করে দৈনন্দিন জীবনযাপন করতে পারছে না। গৌষ্ঠিক, গৌত্রিক, জাতিক, শাস্ত্রিক, মতবাদীর সাম্প্রদায়িক সংস্কৃতির উপর নানাভাবে নানা ক্ষেত্রে হামলা বা প্রভাব অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে। আগের দিনে যানবাহনের, তারে-বেতারে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের অভাবে পৃথিবীতে মানুষ অজ্ঞাত-অপরিচিতি স্বতন্ত্র বিচ্ছিন্ন জীবনযাপন করতে গৌষ্ঠিক, গৌত্রিক, আঞ্চলিক দল হিসেবে। অজ্ঞতা-অসহায়তা ছিল পর্বতপ্রমাণ, ঝড়-ঝঞ্ঝা-খরা-বন্যা-মহামারী তাদের জীবনে জীবিকায় আনত বিপর্যয়-বিনাশ। সে সময়ে সে প্রবোধ পেত তার কল্পিত অদৃশ্য অরি-মিত্র দেবতা-উপদেবতা-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপদেবতা-ভূত-প্রেত-পিশাচ ও নানান ট্যাবু ও টোটেম প্রভৃতির অপ্রতিরোধ্য উপদ্রবে ও উপশমে, রোষে ও কৃপা-করুণায়। আজো 'সংস্কৃতি' অর্থে বিভিন্ন গোষ্ঠী, গোত্র, সম্প্রদায় এ বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণার, আচার-আচরণের স্বাতন্ত্র্যই বোঝেন। যেহেতু সাধারণ মানুষ আজো জগৎ জীবনরহস্য সম্বন্ধে মগজ-মনন প্রয়োগে অনীহ, সেহেতু এসব বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা-ভয়-ভক্তি-ভরসার রেশ ও লেশ আজো পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের মনে ঠাঁই করে নিয়েছে। শৈশবে-বাল্যে পারিবারিক, শাস্ত্রিক ও সামাজিক পরিবেষ্টনীর প্রভাব তার সারাজীবন প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে ইদানীংপূর্বকালে পুরোপুরিই নিয়ন্ত্রণ করত। তার জীবনে এ প্রভাব ছিল গাঢ়, গভীর ও ব্যাপক। এখন পৃথিবীতে সম্ভবত হেন গাঁ নেই, যে গাঁয়ের কোন-না কোন নারী বা পুরুষ বিদেশে ভিন্ন মহাদেশে যাওয়া-আসা করে না। হেন লোক পৃথিবীতে আজ সত্যই দুর্লভ কিংবা দুর্লক্ষ্য যে রেডিও-টিভি, ক্যাসেট, সিনেমা দেখে না। ডিস অ্যান্টেনাযোগে দুনিয়ার তাবৎ দেশের, জাতির, গোত্রের, সম্প্রদায়ের আচার-আচরণ, জীবনযাপন পদ্ধতি, পোশাক-পরিচ্ছদ দেখছে না। ভিন্ন ভাষার সিনেমায়, সিএনএন বা বিবিসির স্টারযোগেও দেখছে পৃথিবীর মানুষের বিচিত্র ঢঙের ও বিবিধ রঙের এবং চোখে মনে ও মর্মে লাগে তেমন জীবনযাত্রার ও জীবনচেতনার চিত্র। 'ফ্যাকস'-ও দুনিয়াকে ঘনিষ্ঠ করেছে। মানস-প্রবণতা অনুসারে আমরাও বিশেষ করে আমাদের বালক-বালিকা, কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতীরা এবং মুক্ত চিন্তা-চেতনার বিভিন্ন বয়সী লোকেরা জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে প্রভাবিত হচ্ছেই। এ অবস্থায় আমাদের সনাতন শাস্ত্রিক তথা জাতীয় সংস্কৃতি অবিকৃত, অবিমিশ্রিত রাখা সম্ভব হবে কি? আমরা একালের নাটকে-সিনেমায় নারী-পুরুষের অভিনয় অনুমোদন করেছি। কোনো নারীর নাচ-গান-বাজনা শোনার ও দেখার মধ্যে আমাদের পুরোনো সংস্কৃতির অবক্ষয় প্রত্যক্ষ করি না। আমরা স্কুলে-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে সহশিক্ষা মেনে নিয়েছি, আমরা দোকানে-বাজারে, হাটে-মাঠে-ঘাটে, বাসে-ট্রেনে-প্লেনে সহযাত্রায় দোষ দেখি না, আমরা রাজনীতিতে সভায়, সঙ্ঘে, সমিতিতে, কমিটিতে, আন্তর্জাতিক সেমিনারে নারী-পুরুষের সমাধিকারও মেনে নিয়েছি। পৃথিবীর কোন শাস্ত্রই পুরুষের তত্ত্বাবধান ও অভিভাবকত্বহীন নারী স্বাধীনতা অনুমোদন করে না। কাজেই আজ পাঁচ মহাদেশব্যাপী সব গোষ্ঠীর, গোত্রের, মতবাদী সম্প্রদায়ের, শাস্ত্রিক বা জাতিক 'সংস্কৃতি' সর্বত্রই বিপন্ন, বিকৃত, বিমিশ্রিত হয়ে গেছে, যাচ্ছে, যাবে। দুনিয়াতে ও জীবনে নির্বিঘ্ন লাভের ব্যবসা নেই, ক্ষতি এড়ানো যায় না, যাকে বলে 'নো রিস্ক নো গেইন।' এ-ও হচ্ছে সে রকম।

বিজ্ঞানের প্রসাদ ভোগ করব, বিজ্ঞান যে কালের, স্থানের, স্বাতন্ত্র্যের, বিচ্ছিন্নতার অজ্ঞানের-অপরিচয়ের বাধা অপসারিত করে দিচ্ছে, আমাদের স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্যচেতনা ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য-ঐতিহ্য-আচার পরিহারে প্ররোচিত করছে, তা সহ্য করব না, এমন আবদার একালের বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী এবং যন্ত্রনির্ভর জগৎ ও জীবন মানবে না। CNN বা Star-এর প্রভাব এড়াব কি করে, কি করে এবাড় ডিস অ্যান্টেনার বদৌলত দেখা ও শোনা নানা ছবির ও কথার প্রভাব? সব মহাদেশের সমাজগুলো বিশেষ করে আফ্রো-এশিয়ার রক্ষণশীল সনাতনের পুরাতনের অনুরাগী, অনুগামী ও অনুগত মানুষগুলো আজ সমস্যায় পড়েছে। বিজ্ঞানের প্রসাদ বর্জন করা সম্ভব হচ্ছে না, আবার বিজ্ঞানের তত্ত্বে, তথ্যে ও সত্যে আস্থা স্থাপনেও বাধা রয়েছে। আশৈশব শ্রুত ও শ্রুতিস্মৃতিরূপে মনে-মগজে-মর্মে সারা জীবন ধরে লালিত বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা যুক্তি-বুদ্ধি প্রয়োগে-পরিহারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অসামর্থ্যই এ বাধার কারণ। তবু এ তো নিতান্ত মানসসমস্যা। ভাত-কাপড়ের সমস্যা, বেকারত্বের সমস্যা, রোগের সমস্যা, মামলার সমস্যা, পারিবারিক অশান্তির সমস্যা কি এর চেয়ে বেশি ও প্রত্যক্ষ? জাতীয় সংস্কৃতি-আচার বিপন্ন হলেও গড়ে উঠছে বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি। সে সংস্কৃতিই কাম্য ও অপ্রতিরোধ্য।

সম্প্রীতি নয়, সেক্যুলারিজমই সমাধান

বিভিন্ন ধর্মমতবাদী সম্প্রদায়, জাতিসত্তা, ভাষিকগোষ্ঠী, রক্তে বর্ণে আচারে স্বাতন্ত্র্য আদিবাসী, উপজাতি প্রভৃতি অধ্যুষিত আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শ্রেণী, বর্ণ, জাত, জন্ম, ধর্ম, ভাষা, নিবাস এবং জাতিসত্তাগত পার্থক্যজাত হিংসা, ঈর্ষা, অসূয়া, ঘৃণা, অবজ্ঞা, উপহাস, তাচ্ছিল্য, অনৈক্য, অনাত্মীয়তা, বৈরিতা প্রভৃতি লাভ-লোভ-স্বার্থ, প্রভাব-প্রতাপ, দর্প-দাপট, গৌরব-গর্ব, নিন্দা-গ্লানি আর বৃত্তি-বিত্ত-বেসাত সম্পৃক্ত নানা বৈষয়িক ব্যবহারিক ও মনস্তাত্ত্বিক কারণ যুক্ত হয়ে ঘন ঘন সংঘর্ষ-সংঘাতের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। একে আমরা সাধারণভাবে সাম্প্রদায়িক দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-অনৈক্য-বিবাদ-বিরোধ-দাঙ্গা নামে অভিহিত করি বিশ শতকে। তার আগে জাতিসংজ্ঞায় ও সংজ্ঞার্থে আমরা একে জাতিগত দ্বেষণা ও লড়াই বলে চিহ্নিত করতাম, তখন এক ধর্মমতবাদীর মধ্যেই মতানৈক্যে বিভিন্ন সম্প্রদায় তথা দল গড়ে উঠত। একালে আমরা রাজনীতিকভাবে রাজ্যিক, রাষ্ট্রিক তথা দৈশিক জাতীয়তা অঙ্গীকার করেছি। দৈশিক জাতীয়তায় অন্তত মৌখিক আস্থা প্রকাশ করি। সৌজন্য বশে জাত, জন্ম, বর্ণ, ধর্ম, ভাষা, নিবাস, মত, পথ-বিদ্যা-বৃত্তি-বিত্ত-বেসাত নির্বিশেষে রাষ্ট্রের নাগরিকমাত্রকেই মানুষ এবং সমান অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তি বলে স্বীকার করি।

পৃথিবী মানুষে অর্থাৎ মানবপ্রজাতির প্রাণীতে আকীর্ণ বটে, তবে মনুষ্যত্বে প্রায় অধিকাংশ মানুষ রিক্ত। তারা প্রাণীসুলভ বৃত্তি-প্রবৃত্তি চালিত। তাই গোটা দুনিয়ায় দুর্বল ও সংখ্যালঘুমাত্রই প্রবলের ও সংখ্যাগুরুর শোষণের, শাসনের, পীড়নের, লুণ্ঠনের, হত্যার শিকার। এসব শোষণ-পীড়ন-দলন-দমন পদ্ধতির মধ্যে সভ্যতা-সংস্কৃতির বিকাশের স্তরানুসারে মানে মাপে মাত্রায় লঘু ও গুরু; দৃশ্য ও অদৃশ্য, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ স্থূল ও সূক্ষ্ম প্রভৃতি ভেদ রয়েছেই।

ভালো হও, ভালো কর, ভালো থাক, ভালো রাখ, ভালোবাস বিবাদ-বিরোধ-দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-সংঘাত থামানোর জন্যে আদিম ও আদিকাল থেকে শ্রেয়োবুদ্ধির জনগুভৈষীমাত্রই এমনি দেশনা প্রচার করেছেন। কিন্তু বাস্তবে আজ অবধি কোন নীতি-উপদেশই কোন হিতকথাই, কোন যৌক্তিক-বৌদ্ধিক মত-পথ-সিদ্ধান্তই কাজে লাগেনি। কারণ ইন্দ্রিয়জ আবেগ তথা ষড়রিপুই সাধারণ মানুষকে চালিত বা তাড়িত করে।

আজ এ উপমহাদেশের ক্ষমতালোভী বুর্জোয়া রাজনীতিকরা গদী দখল লক্ষ্যে এবং দখলে রাখার গরজে যে রাজনীতিক উত্তেজনা-প্ররোচনা-প্রণোদনার আগুন ছড়িয়ে চলেছে মন্দির-মসজিদের ইট-পাথর ভাঙাজাত রেষারেষির, জয়-পরাজয়ের, মান-অপমানের,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইজ্জত-শরমের, লজ্জা-গৌরবের, গ্লানি-গর্বের, নিন্দা-প্রশংসার, ক্ষোভ-তৃপ্তির, ক্রোধ-তুষ্টির, আনন্দ-বেদনার আবেগী হুজুগ সৃষ্টি করে নিঃস্ব, অজ্ঞ লোকদের অর্থ-সম্পদ লুণ্ঠনের ও নরহত্যার কাজে লেলিয়ে দিয়েছে, তারা কি মানুষকে মানুষ বলে জানে, মানে? বীরভূমের সেই অখ্যাত কবি আবদুর রহমানের উচ্চারিত তত্ত্বটি কাদের জীবনে রাজনীতিকদের স্বার্থে অমোঘ সত্য হয়ে ওঠে। 'তুমি হিন্দু, আমি মুসলিম জন্ম দোষে/ আমি পড়িয়াছি হিন্দুর কোপে, তুমি মুসলিম রোষে।' ভালো লাগলেই ভালোবাসে, প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

আর বিবাদ-বিরোধ-দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ ঘটে গেলে কিংবা ঘটার উপক্রম হলে বা আশঙ্কা দেখা দিলে তা মীমাংসার কিংবা প্রতিরোধের তথা এড়ানোর জন্যেই প্রয়োজন হয় সম্প্রীতি স্থাপনের। আধুনিক রাষ্ট্রে সম্প্রীতি তাই একটা গোঁজামিল দেয়া আপ্তবাক্যমাত্র, এর কোন বাস্তব উপযোগ নেই। প্রয়োগসাফল্য নেই বলেই একালে সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘু চেতনা বিলোপের উপায় হচ্ছে তিনটে। এক. নাস্তিকতা, যা ব্যক্তিবিশেষ ছাড়া কেউ কখনো বরণ করবে না, কাজেই এ উপায় অবান্তর, অসম্ভব। দ্বিতীয় উপায় কম্যুনিজম, যা অধিকাংশ আস্তিক মানুষের কাছে চরম ঘৃণ্য ও পরিহার্য। ফলে সমাজতন্ত্র বা সাম্যতন্ত্র বাস্তবে সর্বত্র প্রতিষ্ঠা করা হয়তো শতবছরের মধ্যেও সম্ভব হবে না। যদিও পরিণামে সবাইকেই সমাজ পরিবর্তনে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতেই হবে বাঁচার ও মানুষকে বাঁচানোর গরজে। তৃতীয় উপায় হচ্ছে সাংবিধানিকভাবে রাজনৈতিক দলের, সরকারের, প্রশাসনের ও রাষ্ট্রের আক্ষরিকভাবে [এনসাইক্লোপিডিয়ায় উক্ত সংজ্ঞায় ও সংজ্ঞার্থে] সেক্যুলারিজম বুকে-মুখে নয় কেবল, কার্যেও গ্রহণ ও প্রয়োগ। অজ্ঞ-অনক্ষর নিঃস্ব নিরন্ন ছাপোষা দরিদ্ররা তো এসব বিষয় ভাবারও সময় পায় না জাগ্রত জীবনে। কেননা তাদের শ্রম, সময় ও ঘাম দিনে এবং রাতের কিছু অংশ ব্যয় হয় জীবিকা অর্জনে, জীবিকা সন্ধানে ও জীবিকার অনিশ্চয়তার দুশ্চিন্তায়। এ তাৎপর্যে এরা কার্যত ষোল আনাই সেক্যুলার। তাদের অভাবের ও দারিদ্র্যের কারণেই তাদের মনে অর্থ-সম্পদ লুণ্ঠনলিপ্সা জাগিয়ে দিয়ে তাদেরকে নরহত্যায় উত্তেজনা প্ররোচনা দেয়া হয়। অতএব শহুরে শিক্ষিত রাজনীতিক, সাংবাদিক, শিক্ষক, উকিল, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আমলা, ব্যবসায়ী, সাংসদ প্রভৃতি সব পেশার ও নেশার লোকদের সেক্যুলার মন তৈরির ও ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে প্রকাশের জন্যে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে আঁকিয়ে-লিখিয়ে-গাইয়ে-বাজিয়ে প্রভৃতি সব বুদ্ধিজীবী-কলা অনুশীলকদেরই। ঈশ্বরবাদীরা যদি কেবল স্রষ্টা মানত, বাস্তবে প্রাত্যহিক আচরণে না হলেও শৈশবকাল থেকে মগজধোলাইজাত বিশেষ শাস্ত্রের প্রতি অন্তরের গভীরে প্রোথিত বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণাপ্রসূত ভয়-ভক্তি-ভরসা পরিহার করতে পারত, তা হলে ধর্মমতবাদজনিত বিবাদ-বিরোধ-দাঙ্গা এড়ানো সম্ভব হত। কিন্তু তা হলেও দাঙ্গা টিকে থাকত বিভিন্ন দলের বা সম্প্রদায়ের মধ্যে। কেননা মনস্তাত্ত্বিকভাবেই এটা জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-নিবাস-শ্রেণী-পেশাগত ঐক্যবোধে নৈকট্য ও আত্মীয়তা চেতনা জাগায়। তার ফলেই গোষ্ঠীক, গৌত্রিক, বার্ণিক, ধার্মিক, ভাষিক, নৈবাসিক, শ্রেণিক, বৃত্তিক স্বাতন্ত্র্যভিত্তিক বিচ্ছিন্নতা, অনাত্মীয়তা, নিঃসম্পর্কতা ও বৈরিতা মনের গভীরে সুপ্ত ও গুপ্ত থাকে। আগেকার দিনে সর্দারেরা, শাহ-সামন্তরা মানুষের এ আবেগ উসকিয়ে দিয়ে লড়াকু করে তুলত, আর হানাহানির ফায়দা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লুটত। একালে পৃথিবীর অনগ্রসর রাষ্ট্রগুলোতে তথাকথিত গণতন্ত্রমনস্ক, গণতন্ত্রকামী রাজনৈতিক নেতারা গদী দখল লক্ষ্যে মানুষের জান-মাল-গর্দান বিনাশের খেলায় নামে। এ যেন তাদের কাছে মোরগ-পারাবত-ষাঁড়-মোষের লড়াই মাত্র। ক্ষতির বেদনা নেই, প্রভাব অনুভবের আনন্দ আছে এমনি দাঙ্গা বাধিয়ে।

একালে নানা জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম, ভাষা-নিবাসের, পেশা-সংস্কৃতি-জীবনচেতনার ও জগৎভাবনার লোক বাস করে এক একটি রাষ্ট্রে। কাজেই একালে এ যন্ত্রনির্ভর জীবনে ও যন্ত্রচালিত জগতে মানুষের বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক-সম্বন্ধ নিরপেক্ষ বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র জীবনযাপন অসম্ভব। তাই ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে ব্যক্তির, সমাজের ও রাষ্ট্রের সেক্যুলার হতেই হবে। নান্যপন্থা। অতএব আমাদের রাষ্ট্রিকজীবনে দ্বেষ-দ্বন্দ্বের সমাধান মিলবে কেবল সেক্যুলার চিন্তায় ও চেতনায়। এখনই সব ধর্মমতের ও জাতিসত্তার লোক নিয়ে সেক্যুলার জাতীয় দল নামে একটি সর্বজনীন রাজনৈতিক দল গঠন করা প্রয়োজন, বলা চলে আবশ্যিক ও জরুরী। আর আমাদের প্রথম ও প্রধান আন্দোলন হবে আপাতত বুর্জোয়া রাজনীতি ও বুর্জোয়া রাষ্ট্র অঙ্গীকার করে একটি নির্ভেজাল সেক্যুলার সংবিধান তৈরির জন্যে আন্দোলন শুরু করা। এসব ব্যবস্থাগ্রহণ সম্ভব হলেই একটা অভিন্ন অকৃত্রিম রাষ্ট্রিক জাতি গড়ে উঠবে। কেননা, সেক্যুলার রাষ্ট্রে কেবল নির্বর্ণ নাগরিক বাস করে। প্রত্যেকেই যোগ্যতা নির্বিশেষে কেবল মানুষরূপে স্বীকৃত থাকে, অধিজন-উনজনের পার্থক্য থাকে না। উল্লেখ্য যে সমাজতান্ত্রিক দেশে এমনি গৌত্রিক, গৌষ্ঠিক, সাম্প্রদায়িক বিবাদ-বিরোধ হওয়া সম্ভব হত না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সময়-সমাজ-মানুষ

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

আমার অন্তরে ও অন্দরে সুদীর্ঘকাল ধরে যাঁর স্থিতি,
সেই জীবনসঙ্গিনী সালেহাকে শেষ সওগাত।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঙলাদেশের শতবর্ষের ইতিবৃত্তান্ত

প্রকৃতির জগতে সময়ই জাগতিক সবকিছুর অন্যতম মুখ্য নিয়ন্ত্রক। জন্ম-জীবন-মৃত্যু চলে সময়ের মাপে। কালই সৃষ্টি করে এবং ধ্বংস করে। এ এক আবর্তন ধারা, অন্য নানা কারণে, যেমন সূর্যের নৈকট্যের ও দূরত্বের কারণে বিবর্তনও প্রকৃতির নিয়মেরই অধীন। আমরা অনন্তকাল প্রবাহকে আমাদের মানসিক ও ব্যবহারিক জীবনের অনুগত করেই জীবনে ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগ করছি। আমাদের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ সবকিছুই কালানুগ। অনন্তকাল প্রবাহকে আমরা আমাদের অনুভবের ও প্রয়োজনের ছাঁচে পরিমাপ করতে না পারলে আমাদের জীবনানুভূতি সম্ভবই হত না। খেচর ও স্থলচর অন্য প্রাণীরা আলো-আঁধারের মাপে অর্থাৎ দিবা-রাত্রির মাপে কালপ্রবাহকে জীবনযাপনের কাজে লাগিয়েছে। আমরা আর্তব আবর্তনের মাপে কালকে অনুভবের ও হিসেবের আয়ত্তে এনেছি।

মানুষও প্রাণী বটে, তবে সে-প্রকৃতির অনুগত থাকেনি। দ্রোহ করে প্রকৃতিকে কখনো দাস, কখনো বশ, কখনো বা আপোসে তার আনুগত্য স্বীকার করে কৃত্রিমভাবে রচনা করেছে জীবনযাপন পদ্ধতি। রোদ-বৃষ্টি-শৈত্য এবং খাদকশত্রু প্রাণী থেকে একসময়ে আত্মরক্ষায় অসমর্থ অসহায় প্রাণী হিসেবে প্রকৃতিলালিত পার্বত্য ও আরণ্য গুহাবাসী ছিল মানুষ। ঋজু মেরুদণ্ডের ও দুহাতের দৈহিক সুবিধে পেয়ে সে মন-মগজ-মনন প্রয়োগে রোদ-বৃষ্টি-শৈত্য ও শত্রু থেকে যেমন আত্মরক্ষার উপায় আবিষ্কার-উদ্ভাবন ও সৃষ্টি করল, তেমনি যৌথ প্রয়াসে ও পারস্পরিক সহযোগিতায় খাদ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সঞ্চয় করাও শিখল। এভাবে প্রাণীর মানবপ্রজাতি আর প্রাণীমাত্র রইল না, হল মননশীল, সৃষ্টিশীল, আবিষ্কারক ও উদ্ভাবক। ক্রমে তার কৃত্রিম জীবনের ও জীবিকার অবলম্বন হাতিয়ার এবং চেতনা-চিন্তা-রুচি-সংস্কৃতি সার্বত্রিক ও সার্বজনিক না হলেও গৌষ্ঠিক, গৌত্রিক ও আঞ্চলিকভাবে উৎকর্ষ লাভ করতে থাকে। কেননা সেকালে ঝড়-ঝঞ্ঝা-বন্যা-খরা-মারী কবলিত অজ্ঞ অসহায় সর্বপ্রাণবাদী, যাদুবিশ্বাসী, ট্যাবু-টোটেমে বিশ্বাসী মানুষ ছিল প্রায় সর্ব প্রকারে অজ্ঞ। অলীক-অলৌকিক ও লৌকিক অদৃশ্য কাল্পনিক ভূত-প্রেত-পিশাচ-রাক্ষস-ড্রাগন-দেব-দৈত্য প্রভৃতি নানা জীবন-জীবিকা নিয়ন্ত্রী অরি-মিত্র শক্তিতে আস্থা রাখত।

যানবাহনের অভাবে অরণ্য-পর্বত-হাউর-নদী-সমুদ্রের অর্লঙ্ঘ্য-দুর্লঙ্ঘ্য বাধা ও ব্যবধান অতিক্রম করা অসম্ভব ছিল বলেই বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা গোত্রগুলোর মধ্যে আঠারো শতক অবধি অজানার, অপরিচয়ের বাধা ও বিচ্ছিন্নতা ছিল। পৃথিবীর পরিধিও ছিল অজানা। ক্যাপ্টেন কুক কিংবা লিভিঙস্টোনই পৃথিবীর জ্ঞানে প্রায় পূর্ণতা দান করেন। অলঙ্ঘ্যতা-দুর্লঙ্ঘ্যতাজাত এ অজানার, অপরিচয়ের ও বিচ্ছিন্নতার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দরুন সব গোষ্ঠীর মানুষের মানস কিংবা ব্যবহারিক জীবনে সভ্যতা-সংস্কৃতি বিকাশ সমপরিমাণে হয়নি। কোন কোন বিচ্ছিন্ন গোত্র বা অঞ্চল— যেমন কালো আফ্রিকা একেবারে আদি ও আদিম অবস্থায় থেকে গেছিল, যেমন অন্য অনেক দেশেই আদিবাসী বা উপজাতি নামে পরিচিত আরণ্য-পার্বত্য গোত্রগুলো ছিল সর্বপ্রকারে অনুন্নত। এভাবেই স্ব স্ব অস্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য-অভিমান রক্ষার জন্যেই ওরা এবং আমরাও সাংস্কৃতিক, আচারিক নয় কেবল, বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণারও স্বাতন্ত্র্য বর্জনে অনীহ। গৌত্রিক, আঞ্চলিক ও শাস্ত্রিক স্বাতন্ত্র্যচেতনার ও স্বাতন্ত্র্যরক্ষার এ মনস্তাত্ত্বিক কারণই মানুষকে জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-নিবাস-বিদ্যা-বিত্ত-বেসাত ও বৃত্তিভেদে বিভক্ত ও দ্বেষে-দ্বন্দ্বে শত্রু করে রেখেছে।

কিন্তু কালপ্রবাহকে জীবনযাপনের প্রয়োজনেই এরাই সাধ্যমতো ঋতুর কিংবা চাঁদের মাসিক আবর্তনের ভিত্তিতে জীবনকে ঋতুর বা সময়ের অনুগত করে ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে ভোগ-উপভোগ ও সম্ভোগ করার চেষ্টা করেছে। মোটামুটিভাবে কোথাও কোথাও ঋতুর আবর্তন এবং চন্দ্রের মাসিক আবর্তনই ছিল, সময়কে জীবনের প্রয়োজনে অনুভবের সংকীর্ণ সীমায় ধরে রাখার প্রয়াসের দিশারী। কিন্তু চান্দ্রমাসের হিসেবে প্রতিবছরে এগারোদিন কম পড়ে। তাই প্রতি ছত্রিশ বছরে এক বছর বেড়ে যায়। আর কোন পালা-পার্বণের, জন্ম-মৃত্যু দিনের স্মারক দিন ও নির্দিষ্ট দিনে আবর্তিত হয় না। প্রতি তিন বছর অন্তর তেত্রিশ দিন বাদ দিলে কিংবা প্রতিবছরান্তে এগারোদিন যোগ করলে চান্দ্রমাসও সুনির্দিষ্ট আবর্তন পেত। তা করা হয়নি বলে যে-রমজানের চাঁদে কুরআন নাজেল শুরু হয়, সে-বছর সৌর যে-মাস ছিল, তা আর বার্ষিক আবর্তনে সুনির্দিষ্ট থাকেনি। বৌদ্ধরা, বৈশাখী, আষাঢ়ী, মাঘী প্রভৃতি পূর্ণিমাকে বুদ্ধ-সম্পৃক্ত পুণ্যদিন বলে জানে, কিন্তু সৌর মাসটাকেও গুরুত্ব দেয়, ফলে বৈশাখ মাসের পরিসরে যে পূর্ণিমা মেলে [তা ১লা কিংবা ৩০শে বৈশাখেও হতে পারে] তাকে বৈশাখী পূর্ণিমারূপে পালন করে। এভাবে হিন্দুদেরও শাস্ত্রিক সব কিছুই চাঁদও গ্রহ-নক্ষত্র সম্পৃক্ত ক্ষণ-তিথি-লগ্নভিত্তিক হওয়া সত্ত্বেও সৌর মাসকে গুরুত্ব দেয়ার ফলে সুনির্দিষ্ট দিনে তা আবর্তিত হয়। যদিও ৩৬৫ দিন ছয় ঘণ্টার অনুপুঙ্খ হিসেব জানা ছিল না বলে, তারা সৌর আবর্তনজাত ঋতুর হিসেবে কয় বছর অন্তর লিপ-ইয়ারের মতোই 'মলমাস' যোগ করে নেয়। এমনি পৃথিবীর অনেক গোত্রের, জাতির বা অঞ্চলের সময় নিরূপণে নানা প্রকার গোঁজামিলের ব্যবস্থা ছিল। যদিও চন্দ্র ও ঋতুর আবর্তনই ছিল জীবন ও জীবিকা নিয়ন্ত্রক। শোনা যায়, আমাদের দেশে ফসল তোলার মাস অগ্রহায়ণই ছিল নববর্ষের প্রথম মাস। আবার অন্য সময়ে বীজবোনার মাস আষাঢ় দিয়েই শুরু হয় নববর্ষ। এখন পয়লা বৈশাখই আমাদের নববর্ষের প্রথম দিন।

যন্ত্রের অভাবে সেকালে জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জন সহজ ছিল না। ইরানের কবি উমর খৈয়ামও জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিলেন। তিনিও ইরানে সৌরমাস বিশুদ্ধভাবে গণনার চেষ্টা করেন। ব্রিটিশ প্রজা হিসেবে সতেরো শতকের শেষের দিকে তৈরি গ্রেগরীয়ান ক্যালেন্ডারই আমাদের শহুরে মানুষের অবলম্বন হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, অঞ্চলে, গোত্রে ও জাতিতে আজো ক্যালেন্ডার অভিন্ন নয়, আমাদের দেশেও নয়। আমাদের বাঙলাভাষী-অঞ্চলেই প্রাক্তন আরাকান রাজ্যভুক্ত চট্টগ্রামে মঘীসন, ত্রিপুরায় ত্রিপুরাসন, সিলেটে পরগনাতিসন আজো চলে। ভারতীয় সরকার শকাব্দ গ্রহণ করেছে, তবু সেখানেও দৈশিক ও আঞ্চলিক সনগুলোও স্থানীয়ভাবে চালু রয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২.

আমাদের আজকের স্মরেণ্য ও আলোচ্য হচ্ছে দিল্লীর সম্রাট আকবরের হিজরীসনকে ফসলীসনে রূপান্তর জাত বাঙলাসন। প্রচলিত মতে ৯৩৬ হিজরীসনই ফসলীসনে রূপান্তরিত হয়। তবে এ সন এখন ভারতের আর কোথাও চলে না বলে একে বাঙলাসন বলেও মনে করা চলে। আকবর ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারির দিকে দাউদ খান কররানীকে বিতাড়িত করে বাঙলা জয় করেন বটে, কিন্তু 'বার ভূঁইয়া' নামে খ্যাত বিভিন্ন সামন্তরা মুঘলের আনুগত্য স্বীকার না করায়, গোটা বাঙলাদেশে মুঘলের নিরঙ্কুশ শাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় জাহাঙ্গীরের আমলে ১৬১৭ খ্রীঃ থেকেই। অতএব ১৬১৭ খ্রীঃ থেকেই ফসলীসন 'বাঙলাসন' নামে চালু হয় গোটা বাঙলাদেশে। আমরা এ বঙ্গাব্দকে নিজেদের 'জাতীয়সন' রূপে আমাদের মানসজীবনে ও ব্যবহারিক জীবনে বরণ করে নিয়েছি। স্থানীয়ভাবে যদিও মঘীসন, ত্রিপুরাসন, সম্বৎ, মল্লাব্দ, হিজরী প্রভৃতি অব্দ বিকল্প হিসেবে চালু রয়েছে, তবু আমাদের সর্বজন স্বীকৃত সৌরসন হিসেবে বঙ্গাব্দ বা বাঙলাসনই বাঙলাভাষীর জাতীয় পর্যায়ে স্বীকৃত অব্দ। পয়লা বৈশাখ এখন আমাদের বাঙালীসত্তার উদ্দীপক।

হিন্দুদের মধ্যে বর্ষশেষের শেষদিনের ও নববর্ষের প্রথমদিনের চেতনা ও পুলক ছিল তীক্ষ্ণ এবং পার্বণিক উৎসব সম্পৃক্ত। চৈত্র-সংক্রান্তিতে শিবের চরক পূজো হয়, শিবের গাজন গীতি উৎসব হয় এবং পূর্বকালের মানুষের মেরুদণ্ডে বর্শি গেঁথে বাঁশের বা গাছের ডগায় বন্ বন্ করে ঘোরানো হত। প্রায়ই লোকটা মারা যেত ক্লান্তিতে কিংবা বিষাক্ত ক্ষতের দরুন। আজো চৈত্র-সংক্রান্তিতে মেলা বসে। আর পয়লা বৈশাখে আচার্য ব্রাহ্মণেরা তথা গণকরা হাত ও কপাল দেখে বছুরে ভাগ্য [সরকারী বাজেটের মতো] গণনা করে বেড়াত হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষের দ্বারে দ্বারে সামান্য চাল বা কয়েক আনা পয়সা রোজগারের জন্যে। এ ছাড়া চৈত্রমাসের শেষদিনের মধ্যে প্রজাদের ভূমিকর বা রাজস্ব আদায় করতে হত, মেটাতে হত দোকানদার প্রভৃতি পাওনাদারের বাকি-বকেয়া। মুসলিম সমাজে প্রজা হিসেবে চৈত্র-সংক্রান্তি ঋণ ও কর শোধের জন্যে ছিল স্মরণীয় ও চেতনায় অর্থ সংগ্রহের দুশ্চিন্তা-প্রতীক। আর পয়লা বৈশাখে মুসলিমদেরও নববর্ষ শুরু হত বটে, তবে কোন শাস্ত্রিক পার্বণ না থাকায় ঘর-গোয়াল-পরিষ্কার করায়, গরু স্নান করায়, গরু-মোষের লড়াই দেখে কিংবা মেলায় বেড়িয়ে কেনাকাটা করে উৎসবের আমেজ অনুভব করত। আজো গাঁয়ের লোকের কাছে পয়লা বৈশাখ দিয়েই নববর্ষের অনুভব বজায় রয়েছে। শহুরেদের খ্রীস্টাব্দ-অনুভবে পয়লা জানুয়ারিতেই আসে নববর্ষের আমেজ সরকারী ছুটি না থাকা সত্ত্বেও। কারণ তারা খ্রীস্টাব্দকেই সব ঘরোয়া ও দফতরের কাজে অবলম্বন করেছে।

আজ চৌদ্দ শতকের অবসানে পনেরো শতকের প্রথম বছর শুরু। একে আমরা জাতীয় জীবনের মাইল ফলক রূপে নতুন শতকের নতুন চেতনার ও নতুন জীবনের বাঞ্ছিত শুভ সূচনা কাল বলেই পার্বণিকভাবে অন্তরে গ্রহণ করছি, বরণ করছি সানন্দ উৎসবের উল্লাসে। বাঙলাদেশের বাঙালী মুসলিমরাও পয়লা বৈশাখের চেতনায় তার বাঙালীসত্তার, মাটিলগ্ন জীবনের আনন্দ অনুভব করে। কিন্তু আমাদের বাঙালীর ইতিহাস চৌদ্দশ বছরের নয়। আমরাও অনেক পুরোনো এক রক্তসঙ্কর জাতি। আমাদেরও অতীত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল, রয়েছে সদা বিলীয়মান বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ। আজ এ মুহূর্তে আমরা আমাদের অতীতকে ঐতিহ্যকে ইতিহাসসম্মত ধারায় স্মরণ করব।

৩.

রবীন্দ্রনাথের গানের তথা কবিতার দুটো কলি স্মরণ করছি। কারণ এ দুটো আমাদের জাতীয় জীবনেও সত্য এবং তাৎপর্যপূর্ণ। 'আমার এ ধূপ না পোড়ালে গন্ধ কিছু নাহি ঢালে/আমার এ দীপ না জ্বালালে দেয় না কিছু আলো।'

আমরা চিরকাল আঘাতে আঘাতে জেগেছি, চিরকাল অভাবে অভাবে পোড় খেয়ে টিকেছি। সুপ্রাচীন কাল থেকেই বাঙলাদেশে নতুন চিন্তা-চেতনার উদ্ভব ঘটেছে পরাজয়ের, উপদ্রুতের গ্লানি ও ক্ষোভ থেকেই, বিদেশী বিজাতি বিভাষী বিধর্মীর আকস্মিক আবির্ভাবজাত উপদ্রব থেকেই, শোষণের-শাসনের-পেষণের-পীড়নের অভিঘাত থেকেই। গোড়া থেকেই আমাদের জাগরণ, আমাদের নতুন চেতনার উন্মেষ, নতুন চিন্তার উদ্ভব, নতুন অঙ্গীকারের, নতুন উদ্যমের, নতুন উদ্যোগের মূলে উঠতির, উচ্চাশীর উদ্যম-উদ্যোগ নয়, আমাদের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের উৎস ও ভিত্তি হচ্ছে আত্মরক্ষার সচেতন, অবচেতন প্রয়াস ও প্রযত্ন। এর সঙ্গে মধ্যরাত্রের সুখ-স্বপ্ন থেকে অভাবিত অনভিপ্রেত অভিঘাতে আর্তচিৎকারে ত্রস্তমানুষের কাঁচা ঘুমে আকস্মিক জাগরণের তুলনা করা চলে।

'সুদূরের বাণী, কোথায় লুকায়ে থাকে... যুগান্তরের ব্যথা প্রত্যহের ব্যথার মাঝারে' [অতীতকাল, রবীন্দ্রনাথ] 'প্রাচীন শতাব্দীগুলি শান্ত-চিত্ত দহন-বেদনা মাণিক্যের কণা' [অতীতের ছায়া, রবীন্দ্রনাথ]। বলেছি, আমরা অস্ট্রিক-দ্রাবিড় মেঙ্গাল-নেগ্রিটো আর্যভাষী আলপাইনীয় প্রভৃতির রক্তসঙ্কর মানুষ। আমরা বিদেশীর বিজাতির বিভাষীর বিধর্মীর প্রভাব স্বীকার করে নিয়েছি অকাতরে। আমাদের শাস্ত্র, প্রশাসনব্যবস্থা, ভাষা, বিভিন্ন অদৃশ্য অলীক, অলৌকিক, লৌকিক বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা, দেবতা-উপদেবতা-অপদেবতা প্রভৃতি আমাদের মন-বুদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করত, আজো করে।

আমরা চিরকাল সাধারণভাবে বিদেশী-বিজাতি-বিভাষী-বিধর্মী শাসিত ছিলাম ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দেরও সাড়ে সাত মাস অবধি। আমরা অনুকরণে অনুসরণে ব্যবহারিক জীবনাচরণে সমকালীনতাও চিরকাল বজায় রেখেছি ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে। বাহ্যত অঙ্গে ও আচরণে আমরা আপাতদৃষ্টে পরানুকারী ও পরানুসারী বটে, কিন্তু অন্তরে পুষে রেখেছি আমাদের আদি ও আদিম গৌত্রিক বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা এবং আংশিকভাবে আমাদের চারিত্রিক ও মনন বৈশিষ্ট্য।

এর ফলেই জৈন ধর্ম এখানে টেকেনি, বৌদ্ধধর্ম হয়েছিল তান্ত্রিকতায় ও অন্য স্থানিক আদি ও আদিম বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণার প্রভাবে বিকৃত। ব্রাহ্মণ্যমত পেয়েছিল রূপান্তর এবং তা আজো পঞ্চোপাসক (বহু দেবতার পূজক) হিন্দু সমাজে রয়েছে স্থিত। এমনকি ইসলামও স্থানীয় অলীক-অলৌকিক-লৌকিক বিশ্বাসে-সংস্কারে-ধারণায় ও আচরণে হয়েছিল আচ্ছন্ন। আজো তা সেই গাঢ় ও গভীর প্রভাব মুক্ত নয়। কাজেই বাঙালীর চেতনার, চিন্তার ও আচার-আচরণের কালিক ও স্থানিক বিবর্তন ধারার ইতিবৃত্ত হচ্ছে একাধারে ও যুগপৎ আরোপিত, স্বীকৃত, আত্তীকৃত, স্বাঙ্গীকৃত, নিয়ম-নীতির, রীতি-রেওয়াজের, প্রথা-পদ্ধতির প্রতি আনুগত্যের ও দ্রোহের বৃত্তান্ত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়ের ভাষায়, 'বাঙালীর বৃত্তি যথার্থত বৈতসী। যে আদর্শ যেভাব-স্রোতের আলোড়ন, ঘটনার যে তরঙ্গ যখন লাগিয়াছে, বাঙলাদেশ তখন বেতস লতার মত নুইয়া পড়িয়া অনিবার্যবোধে তাহাকে মানিয়া লইয়াছে এবং ক্রমে নিজের মত করিয়া তাহাকে গড়িয়া লইয়া নিজের ভাব ও রূপ দেহের মধ্যে তাহাকে সমন্বিত ও সমীকৃত করিয়া লইয়া আবার বেতস লতার মতই সোজা হইয়া স্ব-রূপে দাঁড়াইয়াছে। যে দুর্মর অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি বেতস গাছের সেই দুর্মর প্রাণশক্তিই বাঙালীকে বারবার বাঁচাইয়াছে। [বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব]।

আবার এও সত্য যে বাঙালীরা মুখে আদর্শবাদী ও বৈরাগ্যধর্মী। কিন্তু প্রবৃত্তিতে তারা একান্তভাবে অধ্যাত্মবাদীর ভাষায় বস্তুবাদী, গণভাষায় জীবনবাদী, নীতিবিদের ভাষায় ভোগবাদী। হিন্দুরা গয়া-গঙ্গা-গুরু-গরুর পূজক, কাবা-আবে-জমজম-পীর-দরগাহর ভক্ত মুসলমান। আবার সবারই তুক-তাক, ঝাড়-ফুঁক, বাণ-উচ্চাটন, তাবিজ-কবচ, মন্ত্র-মাদুলী, পাথুরে কিংবা ধাতব আঙটি, মন্ত্রপূত ধূলি-পানি-তাগাই পুঁজি-পাথেয়, তাদের সম্বল ও নির্ভর তাদের আশাপূর্তির ও সঙ্কট-সমস্যা-বিপদ মুক্তির জন্যে। এখানেই এ বগুড়া অঞ্চলেই [বঙ+উয়ারি] মহাশক্তিধর সাম্রাজ্যশাসক পালরাজের আধিপত্য অস্বীকার করে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বঙ্গগৌরব কৈবর্ত দিব্যক, তাঁর ভাই রুদ্রক ও তাঁর পুত্র মহাপরাক্রমশালী ভীম। বাঙালীর সমর্থনে, সহায়তায় ও সহযোগিতায় দু'শ বছর ধরে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করা সম্ভব হয়েছিল তুর্কী সুলতানদের [১৩৩৯-১৫৩৮ খ্রীঃ]। বার ভূঁইয়ার দ্রোহের সহায়ও ছিল এ অঞ্চলের দ্রোহী ও স্বাধীনতা-প্রিয় বাঙালীরাই।

বাঙালী অঙ্গে অনুগত, কিন্তু অন্তরে দ্রোহী চিরকালই। তাই সাত শতকেই সম্ভব হয়েছিল শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্তের পক্ষে বাঙালীর সমর্থনে-সহায়তায় ও সহযোগিতায় বল-বীর্য প্রদর্শন। তারও আগে সগৌরব স্মরণীয় হচ্ছে আলেকজান্ডারের সময়ে ময়ূর টোটেম-এর অনুগত চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের কালে 'গঙ্গা হৃদি' বা গঙ্গা হৃদয় রাজ্যের শক্তি-সম্পদের কাহিনী।

আমরা দেখেছি বাঙালীর স্বার্থে বল্লালসেনী সমাজ-সংস্কার লক্ষ্যে রচিত স্মার্ত জীমূতবাহনের মনুসংহিতার ভাষ্য। আমাদের এ বাঙলাদেশেই স্মার্ত ও নৈয়ায়িকরা ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রের নতুন টীকা-ভাষ্য-ব্যাখায় ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রকে যুগোপযোগী করে তুলেছিলেন। এখানেই চৈতন্যদেব সুফী মতবাদের অনুসরণে দেব-দ্বিজ-বেদ বিরোধী জীবাত্ম-পরমাত্মার প্রেমধর্ম প্রচার করেছিলেন রাধা-কৃষ্ণ-প্রেমের রূপকে। সে-ধর্ম প্রচারিতও হয়েছিল মাতৃভাষা বাঙলাভাষার মাধ্যমে।

এই সেদিনও দেখেছি, প্রচলিত বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা, নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ ও প্রথা-পদ্ধতি উপেক্ষা করে অনক্ষর তীতুমীরকে ওয়াহাবপুত্র মুহম্মদ প্রচারিত বিশুদ্ধ ইসলামে দীক্ষিত হতে এবং ইমানের শক্তিকে পুঁজি ও পাথেয় করে অত্যাচারী শোষক জমিদারের ও জমিদারের রক্ষক ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে নিশ্চিত পরাজয়ের ঝুঁকি নিয়ে অভীক চিত্তে লড়তে।

হাজী শরীয়তউল্লাহ হাদিস বর্জন করে কেবল কুরআনভিত্তিক ইসলাম প্রচার করার মতো মন-মগজ-মনন-মনীষার ও সাহসের অধিকারী ছিলেন। কেবল ফরজ মানেন বলেই তাঁর মতবাদীরা 'ফরায়েজী' নামে আখ্যাত হন। বিদ্রোহ এখানেই এবং এক্ষেত্রেই সীমিত থাকেনি। চাষী, কৈবর্ত, সাঁওতাল প্রভৃতি আদিবাসী উপজাতি এবং অন্যান্য বৃত্তিজীবীরাও অসহ্য পীড়নে মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে বারবার নানা স্থানে দ্রোহী হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উনিশ শতকে রামমোহনও ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রদ্রোহী হয়ে ব্রাহ্মমত প্রচার করে খ্রীস্ট মতের প্রসার-পথ-রুদ্ধ করেন। যেমন চৈতন্যমত রুদ্ধ করেছিল ইসলামের প্রসার, যেমন রামকৃষ্ণের মত প্রতিরোধ করেছিল ব্রাহ্মমতের বিস্তার।

বাঙালী এভাবে পুরোনো ধর্মশাস্ত্র বারবার বর্জন কিংবা সংস্কার করে করে দেশ-কাল মানুষের দাবি মিটিয়েছে। য়ুরোপের গ্রীক, রোমান বা রেনেসাঁসের অবদান যেমন ব্যক্তিক মনীষার প্রসূন, আমাদেরও প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় নতুন চেতনার, নতুন চিন্তার, মুক্তবুদ্ধির এবং যৌক্তিক ও বৌদ্ধিক অবদানও সমাজ-উদ্ভূত নয়, ব্যক্তির মনীষা প্রসূত। বাঙলাদেশেই চিরকাল নতুন চেতনা-চিন্তার উদ্ভব ঘটেছে। বৌদ্ধ বজ্রযান, সহজযান, কালচক্রযান, কায়াবাদ, ব্রাহ্মণ্য নবন্যায়, নবস্মৃতি, নবপ্রেমবাদ, ব্রাহ্মমত, রামকৃষ্ণের নবমাতৃবাদ, মুসলিম সমাজের ওয়াহাবী-ফরায়েজী মতবাদ, আমাদের বাঙালীর দ্রোহের ও নতুন চিন্তার ফুল-ফল ও ফসল। আমাদের গৌরব মীননাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়িপা, কানুপা, সরহ, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ, শীলভদ্র, জীমূতবাহন, হলায়ুধ মিশ্র, গোবর্ধন আচার্য, জয়দেব, রামনাথ, রঘুনাথ, চৈতন্যদেব। আমাদের গৌরব সাহিত্যে শাহ মুহম্মদ সগীর কৃত্তিবাস, বড়ুচণ্ডীদাস, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, মুকুন্দরাম, ঘনরাম, ভারতচন্দ্র, কাশীরামদাস, দৌলত উজির বাহরাম খান, আলাউল, কাজী দৌলত প্রমুখ কবি। ব্রাহ্মণ্য বঞ্চনার দরুন, আমাদের গৌরব-গর্বের ঐতিহ্যমাত্রই সাধারণভাবে বর্ণহিন্দুর ও পরবর্তীকালের বৌদ্ধ-হিন্দুজ মুসলিমের।

ডক্টর নীহারঞ্জন রায়ের গ্রন্থে বর্ণিত বাঙালীর ইতিহাস স্বরূপে বর্ণহিন্দুরই, ব্রাহ্মণ্য সমাজেরই কৃতি-কীর্তির ইতিবৃত্ত, অবশ্য কিছু বৌদ্ধ অবদানও ঠাঁই পেয়েছে। কেননা বৌদ্ধ-বিলুপ্তির পরেও বৌদ্ধ দর্শন, আচার, পার্বণ, দেবতা ও সম্প্রদায় স্বনামে কিংবা ছদ্মনামে থেকে যায়। যেমন থেকে যায় মায়াবাদ, সন্ন্যাস, ধর্মঠাকুর, নাথসিদ্ধা, আর চন্দ্রনাথ, আদিনাথ, তারা, বৎসলা, ক্ষেত্রপাল প্রভৃতি নানা দেবতাও নতুন ব্রাহ্মণ্য সমাজে ঠাঁই পান। একালেও আমরা বীর বাঙালীর গৌরব-গর্বে বুক ফুলিয়ে মাথা উঁচু করে চলি। যদিও ব্রিটিশের কৃপা-করুণা-দয়া-দাক্ষিণ্যপুষ্ট কোলকাতার হিন্দুরা ওয়াহাবী-সিপাহির বিপ্লবে বা স্বাধীনতা যুদ্ধে ব্রিটিশ সমর্থক ও সহযোগী ছিল, কিন্তু দশ বছর পরেই ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দের হিন্দুমেলার সময় থেকেই তারা বাঙালীসত্তা সচেতন আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন স্বাধীনতাপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে। আমরা আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলার কাল থেকে কিংবা ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের প্রমথ মিত্রের অনুশীলন সমিতির ও যুগান্তর দলের কাল থেকে অসংখ্য বাঙালী বীরের কথা জানি—অরবিন্দ ঘোষ, বারীন ঘোষ, প্রফুল্ল চাকী, ক্ষুদিরাম, বাঘা যতীন, সূর্যসেন, প্রীতিলতা, কল্পনাদত্ত, অনন্ত সিংহ, অম্বিকাচক্রবর্তী, লোকনাথ বল প্রভৃতি অসংখ্য নামের সঙ্গে সুভাষ বসুর ও শেখ মুজিবুর রহমানের নাম সগৌরব-গর্বে স্ফীতবুকে উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণের অধিকারী সব শহীদেরই আমাদের স্মরণে রাখা কর্তব্য—স্কুল-কলেজ-রাস্তা-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির সঙ্গে এঁদের নাম জড়িত ও অঙ্কিত রেখে। অন্তত প্রধান শতোর্ধ্ব নাম বিস্মৃত হওয়া অকৃতজ্ঞতার গুণগ্রাহিতারিক্ততারই সাক্ষ্যপ্রমাণ মাত্র। আমরা লিখিয়েদের নামই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণে রাখি, অন্যক্ষেত্রে অসাধারণ, অসামান্য ও অনন্য নামেও উপেক্ষা করি। এ আমাদের মূল্যবোধের অভাবলক্ষণ মাত্র।

বলেছি, আমরা বর্ণ ও রক্ত সঙ্কর মানুষ। রাঢ়া, পুন্ড্রা, সুহ্মা, বঙ্গা গোষ্ঠীর লোকই ছিল সমতলে মুখ্য ও সংখ্যাগুরু। এরা যদি অস্ট্রিক-ভেড্ডিড-আলপাইনীয় হয়, তাহলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঙলার গাঁয়ের প্রান্তে বা অন্ত্যেবাসীরা একালেও যারা নিম্নবর্ণের, নিম্নবর্গের ও নিম্নবিত্তের ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ বৃত্তিজীবী তারা এবং বাঙলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের আরণ্য নিষাদ, কোল, ভীর, মুণ্ডা, সাঁওতাল, শবর, পুলিন্দ, ওঁরাও, মালপাহাড়ী প্রভৃতি স্বল্পসঙ্কর আদি অস্ট্রাল বা অস্ট্রেলীয় বা ভেড্ডিড। আর অন্যদিকে মঙ্গোল গৌত্রিক, কিরাত, রাজবংশী, কিন্নর, গন্ধর্ব, নাগা, গারো, কোচ, মেচ, মিজো, কুকি, ত্রিপুরা, চাকমা, মারমা, আরাকানী বিভিন্ন গোত্রের সঙ্গে ও হিমালয়ের তিব্বত ও লুসাই পর্বতলগ্ন অঞ্চলে আমাদের রক্তসাঙ্কর্য এড়ানো সম্ভব হয়নি। আর শ্বেত আর্যভাষী, ইরানী, গ্রীক, কুষাণ, শক, হূন, আরবী, ইরাকী ও য়ুরোপীয় প্রভৃতির রক্তেরও ছিটে-ফোঁটা মিলবে আমাদের কারুর কারুর রক্তে। এ জন্যেই কালো ব্রাহ্মণ, বেঁটে তুর্কী-আফগান-পাঠান-মুঘল এবং কটা শূদ্র সুলভ। বৌদ্ধ বিলুপ্তির পরে ডক্টর সুকুমার সেনও স্বীকার করেছেন যে [১১-১২ শতকে] 'পরবর্তী দু'তিন শতাব্দীর মধ্যে এ দেশের ব্রাহ্মণ্যশাসনের আওতায় ব্রাহ্মণ জাতিবর্গের শ্রেণী বিভাগ ও তদানুযায়ী সামঞ্জস্য গড়ে উঠতে থাকে।' [বঙ্গভূমিকা], লক্ষণীয় যে তিনি ব্রাহ্মণকে রক্তমিশ্রণের লজ্জা থেকে বাদ দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে আমরা নুলুপঞ্চাননকে, দৈবকীনন্দনকে, ধ্রুবানন্দকে যেমন স্মরণে রাখব, তেমনি কৃত্রিম মেল-পটি-গাঁই বিন্যাসে গোঁজামিলকেও ভেজালকেও স্বীকার করব। জীমূতবাহন, রাজা বল্লালসেন, স্মার্ত হলায়ুধ মিশ্র প্রমুখের ভূমিকাকে গুরুত্ব দিতে হবে আমাদের। আমাদের ভাষাভিত্তিক বাঙালীসত্তার অভিন্নতায় ফাটল ধরানোর প্রয়াস ছিল বর্ণে বিন্যস্ত ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রে ও সমাজে। উল্লেখ্য যে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ছোটনাগপুর-মধ্যপ্রদেশ জুড়ে যে আদিবাসীরা বাস করে, যারা ঝাড়খণ্ড প্রদেশের দাবিদার, তারা আমাদেরই জ্ঞাতি। সমতলেও ছুৎ-অচ্ছুৎ নিম্নবর্ণের, নিম্নবর্গের ও নিম্নবৃত্তির হাড়ি-ডোম-মুচি-মেথর-জালী-চামার-চাঁড়াল-কামার-কুমার-বাগদী-মালো-তাঁতী-তেলী-নাপিত-ধোপা-কৈবর্ত-নিকারী-মুলঙ্গী সবাই আমাদের জ্ঞাতি। ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রের প্রাবল্যে ও ব্রাহ্মণের আসমানী প্রতিনিধিত্বের দাবির দাপটের তোড়ে জৈন-বৌদ্ধ ও লোকায়তিক আজীবিক প্রমুখের প্রতিরোধও টেকেনি। তাই ওরা অবজ্ঞেয় অস্পৃশ্য দুস্থ দরিদ্র নিঃস্ব নিরন্ন দাস-মজুর-সেবক হয়েই রইল এতোকাল অবধি। আজকের মানববাদী-মানবতাবাদী-প্রগতিবাদী বিবেকী ও আধুনিকতম গণতন্ত্রবাদী কম্যুনিস্ট প্রভৃতি সবার উচিত ওদের কৃপার-করুণার হরিজনরূপে নয়, ভাইবোনরূপে জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-নিবাস-বৃত্তি-যোগ্যতা নির্বিশেষে সমশ্রেণীর মানুষ ও নাগরিকরূপে গ্রহণ করা।

আমাদের অলীক, অলৌকিক, লৌকিক এবং শাস্ত্রসম্মত অনেক বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণাও এসেছে অস্ট্রিক-দ্রাবিড় থেকে, যেমন জন্মান্তরবাদ, অবতারবাদ, প্রতিমাপূজা, নারী, পশু ও বৃক্ষদেবতার ধারণা, মন্দির উপাসনা, ধ্যান এবং অসংখ্য লৌকিক দেবতার, উপদেবতার ও অপদেবতার অস্তিত্বে আস্থা প্রভৃতি অস্ট্রিক-দ্রাবিড়ের দান। বাঙলার সূফী মতও বজ্রযানী বৌদ্ধ-হিন্দুতন্ত্র প্রভাবজ।

আমাদের জনসাধারণের নামও ছিল নিতান্তই শাস্ত্র নিরপেক্ষ দেশী। এতে হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধভেদ ছিল না, যেমন ইধা, বুধা, কালা, ফেলা, পরান, বানু পাঁচু, লাল, দুদ্দু, কানাই, দোনা, ভেলা, চাঁদ, সুরুজ, সোনা, মনা, তোতা, বগা, বাছা, মিছরী, জলসোনা, ভেলুয়া, মহুয়া, আয়না, মলুয়া, খেঁদি, আকাশী, বাতাসী, চোখধন, মানিকধন প্রভৃতি।

আমাদের সর্বপ্রাণবাদের, যাদুবিশ্বাসের প্রতীক-প্রতিম-প্রতিভূ যেসব সামগ্রী আমাদের সর্বপ্রকার বিপদ-তাড়নে ও মঙ্গলকর্মে ব্যবহৃত সেগুলো: যেমন ধান, দূর্বা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কলাগাছ, কলা, হলুদ, পানসুপারি, নারিকেল, অম্রসার, কুলা, ঘট, কড়ি, দই, মাছ প্রভৃতিও অস্ট্রিক-দ্রাবিড়ের দান।

সতেরো-আঠারো শতকে সাম্রাজ্যবাদী মুঘল শাসন-শোষণকালে পশ্চিম ও দক্ষিণবঙ্গে দুস্থ-দরিদ্র অজ্ঞ-অসহায় মানুষের মধ্যে কাল্পনিক পীর-নারায়ণ 'সত্য'কে অবলম্বন করে হিন্দু-মুসলিমের শাস্ত্রিক ও সাংস্কৃতিক মিলন ময়দান তৈরি হয়েছিল। এজন্যে প্রায় ১১৪ জন কবি পীর-নারায়ণ সত্যের ও তাঁর চেলা দেবতাদের ও কাল্পনিক পীরদের মহিমাকীর্তন করে কাব্য রচনা করেছেন।

হিন্দুর দেবতা হৈল মুসলমানের পীর
দুই কুলে সেবা লয় হৈয়া জাহির।

আত্মপরিচয়ে পীর-নারায়ণ সত্য বলছেন

মক্কার রহিম আমি অযোধ্যার রাম,
ফকির হয়ে ভ্রমি আমি তোমার কারণ
কলিতে সম্প্রতি আমি সত্য নারায়ণ।

এসময়ে নবী-কৃষ্ণেরও সমন্বিত রূপকল্পিত হয়েছিল:

অর্ধেক মাথায় কালা
একভাগে চূড়া টানা
বনমালা ছিলিমিলি তাতে
ধবল অর্ধেককায়
অর্ধনীল মেঘপ্রায়
কোরান-পুরাণ দুই হাতে। [রামমঙ্গল: কৃষ্ণরাম দাস]

এই পীর-নারায়ণের হিন্দু-মুসলিম চেলা দেবতা হচ্ছেন, কালুরায়-কালুগাজী, বনদেবী-বনবিবি, দক্ষিণের রায়-বড়গাজী খান, ওলাবিবি-ওলাদেবী, কামরূপ-কামাখ্যার ডাকিনী-যোগিনী প্রমুখ কুমীর-বাঘ-ওলা-শীতলা সবাই হল হিন্দু-মুসলিমের শরণ, মঠ-মন্দির-মসজিদ রইল দূরে, আশুফল দানে অসমর্থ বলে উপেক্ষিত ও অবহেলিত।

আঠারো শতক অবধি কোথায় ছিল হিন্দু-মুসলিমের সাম্প্রদায়িকতা বাঙলাদেশে! শাস্ত্রী ব্রাহ্মণের এবং মুসলিম শাসকগোষ্ঠীর শাস্ত্রবেত্তা মুসলিমের মধ্যে ছিল পরস্পরের শাস্ত্রের প্রতি অনাস্থা ও অবজ্ঞা। তাই জয়ানন্দ বলেছেন: 'ব্রাহ্মণে যবনে বাদ যুগে যুগে আছে।' অর্থাৎ তর্ক আছে, দাঙ্গা নেই, এ তর্কের সঙ্গে সাধারণ সামাজিক মানুষের প্রাত্যহিক জীবন-জীবিকার, চিন্তা-ভাবনার কোন সম্পর্ক ছিল না।

আমরা জানি, উনিশ শতকের আগে এ পীর-নারায়ণ সত্যই কেবল সাহিত্যক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলিম কবির অভিন্ন বিষয় ছিল। অবশ্য তার আগে চৈতন্যদেবের প্রেমবাদের প্রভাবে যখন প্রায় ষাট বছর ধরে [আনুঃ ১৫১৯-৮০ খ্রী: অবধি] বাঙলাদেশে 'কানু ছাড়া গীত নাই, রাধা ছাড়া সাধা নাই' অবস্থা চলছিল অর্থাৎ চৈতন্যের প্রেমধর্মের প্রভাবে 'শান্তিপুর ডুবো ডুবো নদে ভেসে যায়' তখন মুসলিমরাও তাদের অধ্যাত্মসঙ্গীতে এবং লৌকিক প্রেমগীতিতে যথাক্রমে রাধা-কৃষ্ণকে এবং 'কালা-রাই' কে রূপক হিসেবে গ্রহণ-বরণ করেছিলেন। এ দুই ক্ষেত্রে ব্যতীত সাহিত্যেও হিন্দু-মুসলিমের রচনার বিষয় ছিল পৃথক। এমনকি গীতিকবিতা ব্যতীত গল্পে-উপন্যাসে-নাটকেও বিষয়ের পার্থক্য সাধারণভাবে বজায় ছিল ও আছে। ব্যতিক্রম ক্বচিৎ দেখা গেছে অবশ্য। বিশেষ করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কম্যুনিস্টরাই এ বাধা-ব্যবধান ঘোচানোর চেষ্টা করেছেন। আবার প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ বৈষ্ণব সহজিয়া ও সহজিয়া বাউলদের মধ্যে গুরু-শিষ্যে কোন জাতিভেদ ছিল না। হিন্দু গুরুর মুসলমান শিষ্য, মুসলিম গুরুর হিন্দু শিষ্য আজো সুলভ। চৈতন্য পূর্বকালে কিংবা চৈতন্য সমকালেও সাহিত্যে সাম্প্রদায়িক বা বিধর্মী-বিজাতি-বিভাষী-বিদেশী দ্বেষণা ছিল না। প্রমাণ, সাধারণের জীবনে শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ চালুই ছিল না। লোকে লৌকিক বিশ্বাসে-সংস্কারে-ধারণায় ও আচারে-পার্বণে ছিল অভ্যস্ত ও নিষ্ঠ। ১৭৫৩ খ্রীস্টাব্দে রচিত খোন্দকার নসরুল্লাহর শরীয়ত নামায় মুসলিমদের প্রাত্যহিক জীবনাচারে হিন্দু-বৌদ্ধ আচার-আচরণের বয়ান দিয়েছেন। তাদের জীবনে শরীয়ার প্রভাব ছিল প্রায় দুর্লক্ষ্য।

ধর্ম কর্ম লোক সভে এইমাত্র জানে
মঙ্গলচন্ডীর গীত করে জাগরণে।
দম্ভ করি বিষহরী পূজে কোনজন
পুত্তলি করএ কেহো দিয়া বহুধন।
ধন নষ্ট করে পুত্র-কন্যার বিভায়
এইমত জগতের ব্যর্থ কাল যায়–
সকল সংসার মত্ত ব্যবহার রসে
কৃষ্ণপূজা বিষ্ণুভক্তি কারো নাহি বাসে।
বাসুলী পূজএ কেহো নানা উপচারে
মদ্য মাংস দিয়া কেহো যক্ষ পূজা করে।
নিরবধি নৃত্যগীত বাদ্য কোলাহল
না শুনি কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গল। [বৃন্দাবন দাস]

আজো বাউলদের ও বৈষ্ণব সহজিয়াদের মধ্যে, ধর্মঠাকুরের পূজারীদের মধ্যে হিন্দু বা মুসলিম শাস্ত্রের প্রভাব দুর্লভ।

ঐতিহাসিক তথ্যের সাক্ষ্যেও বলা যায় যে ব্রিটিশ আমলেই প্রতীচ্য শিক্ষাপ্রাপ্ত হিন্দুদের মধ্যে রামায়ণ-মহাভারত প্রভাবিত হিন্দুত্বচেতনা এবং মুসলিম সমাজে কুরআন-হাদিস সম্মত বিশুদ্ধ ইসলাম অনুসরণের জাতিক বা সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্যচেতনা প্রবল হতে থাকে। এ চেতনার প্রবল প্রভাবেই বিশ শতকের রাজনীতিক চিন্তা-চেতনা-আদর্শ ও লক্ষ্য নির্ণীত ও নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। সাম্প্রদায়িক দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-সংঘাতের উৎস হল শিক্ষিতদের এ নতুন চেতনাই। এ চেতনা রাজনীতিক স্বার্থ সম্পৃক্ত।

২. চৌদ্দ শতকের রাজনীতিক ঘটনাবলীর রূপরেখা

মোটামুটি ১৮৭৫ খ্রী. থেকে সুবৃহৎ বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি ও আসাম শাসনে অসুবিধের কথা ভেবে প্রদেশটিকে প্রাশাসনিক কারণে বিভক্ত করার কথা ভাবা হচ্ছিল বটে, কিন্তু তা সক্রিয় বিবেচনা বা গুরুত্ব পায়নি।

যদিও ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে বাঙালী-হিন্দুরা ওয়াহাবী সিপাহি বিপ্লব বা স্বাধীনতা যুদ্ধে ব্রিটিশ সমর্থকই ছিল, তবু দশ বছর পরে ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজী শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধির এবং ব্রিটিশের মুসলিম-তোষণনীতি গ্রহণের ফলে ব্রিটিশ কৃপা ও চাকরি বঞ্চিত হিন্দুমনে স্বাজাত্যভিমান জাগতে থাকে, তা ক্রমে ব্রিটিশবিদ্বেষের রূপ গ্রহণ করে। অরবিন্দ ঘোষ আই সি এস পাশ করেও ঘৃণাভরে নিয়োগপত্র প্রত্যাখ্যান করেন। পরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুভাষচন্দ্র বসুও এ দুর্লভ মহাসম্মানের চাকরি গ্রহণে হন অনীহ। আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা থেকেই হিন্দুরা স্বাধীনতার লক্ষ্যে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করে। ভাইসরয় ও গভর্নর জেনারেল লর্ড কার্জন প্রাশাসনিক প্রয়োজনের যুক্তিতে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি ১৩১২ (১৯০৫ খ্রি:] সনে এমনভাবে বিভক্ত করলেন যার ফলে বাঙালী হিন্দুরা পূর্ববঙ্গে, আসামে, বিহারে, উড়িশায় সর্বত্র চিরকালের জন্যে, সংখ্যালঘু হয়ে গেল। এভাবে ভারতে ইংরেজী শিক্ষিত প্রাগ্রসর বর্ণহিন্দুর নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব এবং রাজনীতিক অস্তিত্ব চিরকালের জন্যে বিলুপ্ত হয়ে গেল। তাই বাঙালী-হিন্দুরা মরিয়া হয়ে আন্দোলনে এবং সন্ত্রাসী সংগ্রামে নামল।

ব্যারিস্টার প্রমথ মিত্র ১৩১২ [১৯০৫ খ্রীঃ] সনে অনুশীলন সমিতি পরে অন্যরা যুগান্তর সমিতি মাধ্যমে আইরিশ বিপ্লবীদের মতো সন্ত্রাসের ও ব্রিটিশ রাজপুরুষ হত্যার নীতি গ্রহণ করে। প্রফুল্লচাকীর আত্মহত্যা, ক্ষুদিরামের ফাঁসি (১৩১৫ সনে) প্রভৃতি স্মর্তব্য এবং বাঘা যতীনের নেতৃত্বে বালেশ্বরে, সূর্যসেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের নানাস্থানে, মানিকতলা-মেদিনীপুর-ঢাকা প্রভৃতি নানা অঞ্চলে বাঙালীর সন্ত্রাসী তৎপরতা ছড়িয়ে পড়ে। এদিকে কংগ্রেস এবং বর্ণ হিন্দু মাত্রই প্রতিবাদে হল মুখর, প্রতিরোধের সংকল্পে হল অটল। ১৩১৮ [১৯১১ খ্রি.] সনে 'বঙ্গভঙ্গ' রদ হয়ে গেল। এবার মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর নেতৃত্বে ব্রিটিশ ভারতে দৈশিক বা রাষ্ট্রিক জাতীয়তা গড়ে তোলার প্রয়াস চালাচ্ছিল কংগ্রেস। তাই অতীতমুখী মুসলিমদের প্রতিক্রিয়াশীল খেলাফত আন্দোলন সমর্থন করে হিন্দু-মুসলিম সংহতি দৃঢ় করতে চাইলেন অসহযোগ আন্দোলন করে। কিন্তু আগে থেকে বিচলিত ব্রিটিশ সরকার ভেদনীতির প্রয়োগ তীব্রতর ও তীক্ষ্ণতর করে তোলে। ফলে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা বাধে ময়মনসিংহে ১৩১৩-১৪ সনে, কোলকাতায়-পাবনায়-ঢাকায় দাঙ্গা বাধে ১৩২৫-১৩৩৩ সনের পরিসরে, পটুয়াখালিতে, পোনাবালিয়াতে, ঢাকাতে, কিশোরগঞ্জে, চট্টগ্রামে দাঙ্গা বাধে ১৩৩৪-৩৮ সনের মধ্যেকার বিভিন্ন সময়ে, ঢাকার দাঙ্গা ১৩৪৮ থেকে চলতেই থাকে নওয়াবপুরে-ইসলামপুরে লঘু-গুরু মাত্রায়। এগুলোর মধ্যে ১৩৩৩ [১৯২৬ খ্রীঃ] সনের ও ১৩৫৩ সনের কোলকাতার দাঙ্গা ছিল রাজনীতিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমটির ফলে ১৩২৩ [১৯১৬ খ্রী:] সনের লখনোচুক্তি, চিত্তরঞ্জন দাশের 'বেঙ্গল প্যাক্ট' বৃথা ও ব্যর্থ হয়ে যায়। আর ১৩৫৩ [১৯৪৬ খ্রী:] সনের দাঙ্গা আরও স্বাধীনতা প্রাপ্তির ও ভারত বিভাগের প্রায় প্রত্যক্ষ কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কেননা ওই দাঙ্গা নোয়াখালিতে-বিহারে ও অন্যত্র দাঙ্গা বাধার কারণ ঘটায়, ১৩৫৩ সনে কোলকাতায় ডাইরেক্ট অ্যাকশন জাত দাঙ্গা না বাধলে হয়তো স্বাধীনতা প্রাপ্তিলগ্নে গোটা উপমহাদেশব্যাপী ছয় লক্ষ লোকের মৃত্যু এবং অসংখ্য দেশত্যাগীর জীবনে এমন বিপর্যয় ঘটত না, ভারত বিভাগের ফলে শেষাবধি লাভবান হয়েছে পূর্ববঙ্গের ও পশ্চিম পাঞ্জাবের মুসলিমরা আর উত্তর প্রদেশের এবং আংশিকভাবে মধ্য প্রদেশের ও বিহারের হিন্দুরা। উপমহাদেশের সুবৃহৎ বাকি অংশের সংখ্যালঘু জনজীবনে নেমে এসেছে জান-মাল-গর্দানের অনিশ্চয়তা, আর সংখ্যাগুরুর সমাজও বাস্তুত্যাগীর আগমনে স্ফীত তথা জনবহুল যারা ব্যবহার্যবস্তুর ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী-প্রতিযোগী হয়ে ভাগীদার হয়ে ওদের বিদ্যা-বিত্ত-বৃত্তি ক্ষেত্রে সমস্যা-সঙ্কট সৃষ্টি করে জীবন-সংগ্রাম করেছে তীব্র।

আবার পূর্ব কথায় ফিরে যাই। ১৩১৬ [১৯০৯ খ্রীঃ] সনের দিকে মর্লি-মিন্টো এবং ১৩২৫-২৮ [১৯১৮-২১ খ্রীঃ] অবধি মন্টোগো-চ্যামসফোর্ড শাসন-সংস্কারের সুপারিশ নিয়ে রাজনীতিক দরকষাকষি চলতে থাকে। ইতোমধ্যে হিন্দু-মুসলিম বিরোধ বাড়ছিলই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেবল। ১৩৩৭-৩৯ সনের গোলটেবিল বৈঠকে সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ তথা পৃথক নির্বাচন, চাকরির পৃথক কোটা, সংসদে তফসিলী ও মুসলিমদের জন্যে কোথাও কোথাও সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থাদি নানা সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, সর্বোপরি ১৩৪২ [১৯৩৫ খ্রীঃ] সনের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন আইন পাশ হল এবং ১৩৪৪ [১৯৩৭ খ্রীঃ] সন থেকে বাঙলার বঞ্চিত দরিদ্র মুসলিমরা শাসন ক্ষমতার স্বাদ ও সুবিধে পেল প্রায় ১৩৫৪ [১৯৪৭ খ্রীঃ] সন অবধি। যদিও জাপানের ভারত বিজয়ের আশঙ্কা-ভীরু সরকার 'পোড়ামাটি' নীতি গ্রহণ করে যানবাহন নষ্ট করে দিয়ে এবং চাউলও অন্যত্র চালান দিয়ে ও সরিয়ে নিয়ে ১৩৫০ সনে বাঙলায় মন্বন্তর ঘটায়। এতে প্রায় পঁয়ত্রিশ লক্ষ নিঃস্ব মুসলিম ও নমশূদ্রই খাদ্যাভাবে প্রাণ হারাল। এর পূর্বে ১৩৪৭ [১৯৪০ খ্রীঃ] সনে লীগের লাহোর অধিবেশনে মুসলিম সংখ্যাগুরু অঞ্চলে স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এটি পাকিস্তান প্রস্তাব নামে পরিচিত। এটি ছিল গোড়ায় সুবিধে ও দাবি আদায়ের চালমাত্র। প্রমাণ লীগনেতা মুহম্মদ আলী জিন্নাহ বিখণ্ডিত ভারত চাননি বলেই দুর্বল কেন্দ্রের অধীনে তিনবর্গে বিন্যস্ত অখণ্ড ভারত চেয়েছিলেন এবং তাঁর দাবি ব্রিটিশ সরকারও মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু জওহরলাল, প্যাটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রভৃতি শক্ত লাগামে সাম্রাজ্যবাদীর মতোই প্রদেশগুলোকে কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ত্তে ও শাসনে রাখতে চাইলেন বলেই কংগ্রেস সভাপতি জওহরলাল নেহেরু সংশোধনের অধিকার প্রয়োগ করার হুমকি দিলে জিন্নাহ মূল প্রস্তাবটি সেভয়ে প্রত্যাখ্যান করলেন। কাজেই ভারত বিভাগের জন্যে জিন্নাহকে দায়ী করা চলে না। কংগ্রেস, মহাসভা ও কম্যুনিস্টরা এর জন্যে দায়ী। প্রমাণ, জিন্নাহ বাঙলা ও পাঞ্জাব অবিভক্ত রাখার প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছিলেন, বরং গান্ধী প্রমুখ কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা নেতারাই এ দুটো প্রদেশ বিভক্তির জন্যে দায়ী। দিল্লী কনভেনশনে জিন্নাহ লাহোরে গৃহীত মূল প্রস্তাবের 'স্টেটস'-এর 'স' বাদ দিয়ে একটি পাকিস্তান বানালেন দেড় হাজার মাইলের ব্যবধান ও জনগণের মধ্যে ভাষিক, গৌত্রিক, সাংস্কৃতিক, আর্থিক, শৈক্ষিক পার্থক্য ও বিচ্ছিন্নতা থাকা সত্ত্বেও। ১৩৫৩ [১৯৪৬ খ্রীঃ] সনের নির্বাচনে মুসলিম লীগের বিজয় সম্ভব হল বাঙালীর সমর্থনে ও উৎসাহে আর উর্দুভাষী বাঙলাদেশীর ও উত্তরভারতীয় নেতাদের পরিচালনায়, তাদের স্বার্থেই সিন্ধি, বালুচ, সারাওগী, গুজরাটি, পশতু ভাষার রাষ্ট্রভাষা হওয়ার মতো উন্নত না হওয়ার দরুন উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব সমর্থন পেল পশ্চিম পাকিস্তানে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বাঙলা ভাষার উৎকর্ষ ছিল গোটা উপমহাদেশে অতুল্য। তাছাড়া প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বাঙালীরা বিহারী ও উত্তরভারতের উর্দুভাষীর কাছে হার মানত। আত্মমর্যাদার, স্বাধিকার চেতনার প্রেরণা-প্রণোদনা ছাড়াও রুজি-রোজগারের প্রেরণাও ছিল বাঙালী মনে। তাই কোলকাতায় আবদুল হক, ফররুখ আহমদ, ঢাকার তমদ্দুন মজলিস বাঙলাভাষাকে একমাত্র নয়, অন্যতর রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান, ইসলামি তমদ্দুনের, বাঙলা ভাষার ও উর্দুভাষীর দাবির মধ্যে আপোস-রফা করার জন্যে।

হিন্দু-বৌদ্ধজ দেশজ অনক্ষর-সাক্ষর মুসলিমরা তুর্কী-মুঘল আমলে বিদেশাগত মুসলিমদের উর্দুভাষী নেতাদের নেতৃত্বে চির-চালিত হওয়ার ফলে তারা ছিল দেশ-কাল-ভাষা-সংস্কৃতি-আচার-আচরণ ও আর্থিক জীবন চেতনায় রিক্ত, ভৌগোলিক অবস্থান ও অবস্থা অভেদে বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্ববাদীও ছিল, আজো যেমন নতুন করে তারা উম্মাহবাদী হয়ে উঠছে। তাই স্টেটস-এর 'স' বাদ দেয়ার প্রথম প্রতারণা বাঙালীর মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি। দেড় হাজার মাইল দূরের আকৃতিতে প্রকৃতিতে, গাত্রবর্ণে, পোশাকে, আবহাওয়ায়, খাদ্যে, ভাষায়, আচার-আচরণে, অতীত ও ঐতিহ্যচেতনায় স্বতন্ত্র কেবল ধর্ম বিশ্বাসে ঐক্য ও সাদৃশ্য [শিয়া, সূফী, আহমদীয়া, বিভিন্ন ইসলামপন্থী ও পীরবাদী] ভিত্তিক, রাষ্ট্রগঠনের হুজুগে সিদ্ধান্ত পরিণামে রক্ত-ক্ষরা ও প্রাণ-হরা সংগ্রামে মাতৃভাষার ও মাতৃভূমির মুক্তি সম্ভব করল। রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে বাঙালীসত্তার জাতিক আত্মসম্মানবোধের বীজ উপ্ত হল, যা ১৩৫৮ [১৯৫২ খ্রীঃ] সনের ফালগুনে রক্তক্ষরা-প্রাণহরা সংগ্রামের রূপ নেয়। এ-ও স্বীকার করতে হবে যে আমাদের আবেগ বশে 'স্টেটস'-এর 'এস' বাদ দেয়ার সম্মতি দানের ফলেই আমাদের ভাষা-সংগ্রামের ও মুক্তি-সংগ্রামের প্রয়োজন দেখা দেয়। এ বিজয় নিয়ে আমরা গৌরব করি বটে, আসলে এ হচ্ছে আমাদের ভুলের মাসুল দেয়া মাত্র। বাঙালীজীবনে এভাবে আসে নতুন জীবনচেতনার বসন্তও। বাঙালী মুসলিম মনে এভাবে জাগে মাটিলগ্ন জীবনের ও জীবিকার গুরুত্বচেতনা, বাঙালীসত্তার স্বাতন্ত্র্যচেতনা, বিদ্যার ও বিত্তের দ্রুত প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে উঠতি বাঙালীচিত্তে আশা-আকাঙ্ক্ষারও বিস্তার ঘটতে থাকে। এ শতকের একটি স্মরেণ্য ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ। আদি ও আদিম কাল থেকেই দাসকে ক্রীতদাসকে ভূমিদাসকে মালিক-মনিবেরা মানুষ বলে জানত না। তুচ্ছ প্রাণী বলেই মানত। জমিদারী উচ্ছেদের ফলে মানুষমাত্রেই স্বসত্ত্বার স্বাতন্ত্র্যের, মূল্যের, মর্যাদার ও স্বাধীনতার অধিকারী হল। উচ্চবর্ণের ও উচ্চবিত্তের লোকের কাছেও ওরা ছিল অবজ্ঞেয়। এখন বিদ্যা ও বিত্তযোগে এবং সর্বপ্রকার বৃত্তিগ্রহণের অধিকার পেয়ে ওরা সমাজে সদস্য রূপে বিবেচিত হচ্ছে। স্বীকৃতি পাচ্ছে নাগরিকরূপে। এদিকে উত্তরভারতের বাস্তুত্যাগী উর্দুভাষী বড় চাকুরে নওয়াবজাদা-জমিদার ও ধনী বেণেরাই পাকিস্তানের শাসক-শোষক-নিয়ন্ত্রক হয়ে বসে। তারা ছিন্নমূল ছিল বলেই নির্বাচনে ক্ষমতা হারাবে জেনেই পুরো দশ বছর কোন সংবিধান তৈরি করেনি। যখন করল, তখন পশতুভাষী জঙ্গী-নায়ক আইয়ুব খান ক্যু করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে। পূর্ববঙ্গে একটা নির্বাচন হল বটে ১৩৬০ [১৯৫৪ খ্রী:] সনে কিন্তু দলীয় কোন্দলে ও কেন্দ্রীয় স্বার্থে তা অচল করে দেয়া হল। আবার মুৎসুদ্দী দলের শাসন শুরু হতেই আইয়ুবের জঙ্গী-নায়ক সরকার তা বাতিল করে দিল। কিন্তু বাঙালীর সেই যে আত্মসম্বিৎ জাগল এবং স্বদেশের মানুষের মাটিলগ্ন জীবনের গুরুত্ব চেতনা বাড়ল। তার ফলেই সামরিক শাসনেও তাদের দ্রোহ ও দাবি দমন করা সম্ভব হল না। ১৩৬৯ [১৯৬২ খ্রীঃ] সনে শিক্ষা কমিশনের সুপারিশের প্রয়োগ বাতিলের সংগ্রাম শুরু করল ছাত্ররা। সে দাবি মানতে বাধ্য হল সরকার। রবীন্দ্র-প্রভাব বিলুপ্তির প্রয়াসও হল ব্যর্থ। আর আওয়ামী লীগের 'ছ দফা' বাঙালীচেতনার প্রসূন রূপে স্বায়ত্তশাসনের দাবি হিসাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে। ১৩৬৩ [১৯৫৫-৫৬ খ্রীঃ] সনের মধ্যেই বুলবুল একাডেমী অব ফাইন আর্টস, পরে ছায়ানট, উদীচী প্রভৃতি নাচ-গান-বাজনা-অভিনয়-আবৃত্তি শিক্ষার জন্যে শহুরে মুসলিম সমাজে সাংস্কৃতিক পরিবেশ সৃষ্টির ও উৎসর্গ সাধনের লক্ষ্যে গড়ে ওঠে। এখানে উল্লেখ্য যে পয়লা বৈশাখ অবলম্বনে বাঙালীর সত্তার ও সংস্কৃতির চেতনা জাগানোর বিশেষ কৃতিত্ব ছায়ানটেরই প্রাপ্য। অবশেষে বাঙলাভাষার দাবি স্বীকৃতি পেল পূর্ববঙ্গে। ১৩৬২ সনেই সেকালের মুখ্যমন্ত্রীর আবাস বর্ধমান হাউজেই প্রতিষ্ঠা পেল বাঙলা একাডেমী। জয় হল বাঙালীর দ্রোহের, দাবির ও সংগ্রামের। কিন্তু ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ কেন্দ্রীয় সরকার শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে রাষ্ট্রবিরোধী এক ষড়যন্ত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মামলা খাড়া করল। এতে বাঙালী মাত্রেরই প্রিয় হয়ে শেখ মুজিব হয়ে উঠলেন বাঙালীর অবিসংবাদিত নেতা।

এল ১৩৭৬ [১৯৬৯ খ্রীঃ] সনে পশ্চিম পাকিস্তানে উদ্ভূত সরকারদ্রোহিতার ঢেউ ঢাকায়—পূর্ব বাঙলায়। ১৩৭৬-৭৭ সনে আইয়ুবের পতনে জঙ্গী-নায়ক ইয়াহিয়া খানের প্রস্তাবক্রমে ১৩৭৭ [১৯৭০ খ্রীঃ] সনে হল নির্বাচন এক বিশেষ নীতি নিয়মে যার ইংরেজী নাম ইলেকশন আন্ডার লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক। সব আসন পেল আওয়ামী লীগ। উচ্চাশী জুলফিকার আলী ভুট্টো পাকিস্তান শাসনের অধিকার বাঙালীকে দিতে চাইলেন না। ইয়াহিয়ার তথা সামরিক শক্তির সমর্থনে ভুট্টো ও ইয়াহিয়া সব বানচাল করে দিলেন, ভুট্টোর প্রস্তাব হল পূর্ব পাকিস্তানে প্রধানমন্ত্রী হবেন শেখ মুজিব, আর পশ্চিম পাকিস্তানে প্রধানমন্ত্রিত্ব করবেন ভুট্টো। অতএব পাকিস্তান দ্বিখণ্ডিত করার কার্যত প্রস্তাব এল ভুট্টো থেকেই। এবার বীর বাঙালী অস্ত্র ধরল, ঘোষণা করল স্বাধীনতা, নয় মাসের লড়াইয়ে কয়েক লক্ষ লোকের প্রাণহানির ও নারীর ইজ্জত হারানোর বিনিময়ে এবং রাশিয়ার পরোক্ষ ও ভারতের প্রত্যক্ষ সহায়তায় মিলে গেল স্বাধীনতা। প্রতিষ্ঠিত হল স্বাধীন সার্বভৌম বাঙলাদেশ রাষ্ট্র।

নানা কারণে স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রেরণা-প্রণোদনা প্রবর্তনার উৎস ও অনন্য জনপ্রিয় নেতার শাসনকাল অস্থিরতায়, দুর্ভিক্ষে, বিশৃঙ্খলতায় এককথায় ধীর-বুদ্ধির ও স্থির আদর্শের অভাবে অচিরে জনপ্রিয়তা হারায় এবং পরাশক্তির প্ররোচনায় এক সামরিক জোট তাঁকে সপরিবার-পরিজন হত্যা করে। এর পরে মুৎসুদ্দী খোন্দকার মুস্তাক আহমদ গদি দখল করেন। তিন মাসের মধ্যেই ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের চেষ্টায় ব্যর্থ হন সামরিক বাহিনীর সমর্থনের অভাবে। কিন্তু সেই স্বল্প সময়ের মধ্যেই খোন্দকার মুস্তাকের নির্দেশে জেলখানায় রাত্রির অন্ধকারে চার আওয়ামী নেতাকে নীতি-নিয়ম লঙ্ঘন করে হত্যা করা হল। সপ্তাহকালের মধ্যেই অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক কিন্তু জনপ্রিয় মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল আবু তাহেরের নেতৃত্বে সিপাহিদ্রোহের মাধ্যমে সিপাহিজনতার নেতা তাহের গৃহবন্দী জেনারেল জিয়াউর রহমানকে শাসন ক্ষমতা দান করেন। জিয়াউর রহমানও ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা, তাঁর ছিল ইসলাম ও পাকিস্তানপ্রীতি, পশ্চিম পাকিস্তানী সেনারা বাঙালী বলে তাঁকে হত্যা করবে আশঙ্কায় তিনি মুক্তিযোদ্ধা হন এবং প্রথমে নিজের নামে, পরে শেখ মুজিবুর রহমানের নামে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন চট্টগ্রামের কালুর ঘাট এলাকায় তৈরি বেতার যন্ত্র মাধ্যমে। তাঁর ইসলামপ্রীতির ও অখণ্ড পাকিস্তানপ্রীতির সাক্ষ্য-প্রমাণ হচ্ছে চারনীতিভিত্তিক সেক্যুলার সংবিধানকে তিনি করলেন বিসমিল্লাহ জড়িত এবং পাকিস্তানপন্থী ইসলাম-পছন্দ রাজাকারদের করলেন তাঁর শাসন-প্রশাসনের সহযোগী ও বিশ্বস্ত সহচর। শোনা যায় তাঁর উপর সেনাবাহিনী প্রসন্ন ছিল না, বাইশবার তাঁকে পদচ্যুত করার চেষ্টা হয়েছিল, অবশেষে ১৩৮৯ [১৯৮১ খ্রী:] সনে তিনি সেনাদের হাতে চট্টগ্রামে নিহত হন। শেখ মুজিব নিহত হয়েছিলেন ঢাকায়, তাই তাঁর সরকারের পতন হয়েছিল, জিয়া নিহত হন চট্টগ্রামে, ফলে ঢাকায় তাঁর সরকার চালু থাকে। এমনকি রাষ্ট্রপতির নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু পরাশক্তির মদদে পরামর্শে উচ্চাশী হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ক্যু করে ক্ষমতার গদি দখল করেন।

এরশাদ ছিলেন অত্যন্ত উচ্চাশী ভোগবাদী সূক্ষ্মবুদ্ধির অতি ধূর্ত এবং মর্ত্যজীবনবাদী এবং বিবেকহীন ব্যক্তি। খেলতে ও খেলাতে অসামান্য পটু ছিলেন তিনি। তাই তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একাধারে ও যুগপৎ সেনাবাহিনীকে, মার্কিন আদি ঋণ-দান-অনুদান-ত্রাণদাতা বিদেশী অধিকর্তাদের এবং নানা মনের, মতের ও পথের আর পেশাভিত্তিক শ্রেণীর মন যুগিয়ে চলার পন্থানির্বাচনের দক্ষতা ও বাকপটুতা আয়ত্ত করেছিলেন। ফলে ন'বছর ধরে সর্বপ্রকার অপকর্ম প্রায়-প্রকাশ্যে করে ও করিয়েও তিনি টিকে ছিলেন। একত্রিশজন বুদ্ধিজীবীর এক বিবৃতি তাঁকে সামান্যই বিব্রত করেছিল। ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করে অনক্ষর-সাক্ষর মুসলিমদের কাছে প্রিয় হলেন বটে, কিন্তু নিজের আস্থা ছিল না বলে ইসলামী আচার-আচরণের বাস্তবায়নে তাঁর প্রয়াস ছিল না, প্রতীচ্য আদলে জীবন যাপন করতেন, তবু নির্বোধ নাগরিকদের খুশি করার জন্যে ইসলামী সংস্কৃতির রূপরেখা তৈরির জন্যে সংস্কৃতি কমিশন গঠন করলেন। এভাবে চলছিল। 'জেহাদ' হত্যায় ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ ঢাকার ছাত্ররা এরশাদ বিতাড়ন লক্ষ্যে আন্দোলন শুরু করলে মার্কিন রাষ্ট্র ও সেনাদল বিবেকহীন প্রতারণাপ্রিয় এরশাদকে সমর্থনে অনীহ হওয়ায় তিনি ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হন। সাধারণত জঙ্গী-নায়ক নিহত হন। ইনি জীবিত থাকার সুযোগ পেলেন। তারপর নিরপেক্ষ অস্থায়ী সরকারের পরিচালনায় নির্বাচন মাধ্যমে অজ্ঞ-অনক্ষর লোকের ভোটে গণতান্ত্রিক সরকার গত তিন বছর ধরে দেশের ক্ষমতার তথা শাসন-প্রশাসন-সেবার গদিতে আসীন রয়েছে। তৃতীয় বিশ্বের গণতান্ত্রিক সরকারও জনগণের দুস্থতার, দারিদ্র্যের, নিঃস্বতার, নিরন্নতার এবং অজ্ঞতার ও অনক্ষরতার দরুন গণপ্রতিনিধি থাকেন না, স্বেচ্ছা ও স্বৈরাচারী প্রভু হয়ে বসেন সাংসদ, মন্ত্রী, আমলা সবাই। আমাদের বিরোধীদলগুলো সরকারের নিন্দায় এবং সরকার সমর্থকরা সরকারের প্রশংসায় মুখর।

বুর্জোয়া সরকারের শাসনে গণমানুষের জীবনে শোষণমুক্তি ঘটে না, এজন্যে সমাজতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি প্রয়োজন, তার জন্যে সমাজ বিপ্লব হয় আবশ্যিক ও জরুরী। আমাদের দেশে বিগত ১৩২৮ বা ১৩৩৩ [১৯২১ বা ১৯২৬ খ্রীঃ] সন থেকেই মার্কসবাদী মতাদর্শ চালু রয়েছে, কিন্তু বিকাশ-বিস্তার আজো সীমিত বলেই জনগণ শাহ-সামন্তযুগের নীতি-নিয়মে শোষিত হয়ে আসছে। জনসংখ্যাবৃদ্ধির এবং মুদ্রাস্ফীতির ফলে বাস্তবে মধ্যযুগের, ব্রিটিশ আমলের, পাকিস্তান আমলের আর্থিক জীবনের ক্রমাবনতিই ঘটেছে জনগণ জীবনে।

২.

তবে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে নিম্নবর্ণের নিম্নবর্গের ও নিম্নবিত্তের হিন্দু বৌদ্ধজ-মুসলিমরা [সামান্য ব্যতিক্রম বাদ দিলে] বিগত দু'হাজার বছর ধরে ছিল ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ ঘরানা পেশাজীবী, প্রান্তিক কিংবা বর্গাচাষী এবং বিত্তবান বহুজমির মালিক হাওলাদার, তালুকদার, তরফদার, ভুঁইয়া শ্রেণীর পরিবারও প্রজন্মক্রমে জমি সন্তানদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারার ফলে দারিদ্র্য কবলিত হত।

তবু শিক্ষার প্রসারে, স্বাধীনতার প্রসাদে একশ্রেণীর উদ্যমশীল কিন্তু দুর্নীতিবাজ মানুষ বিদ্যার-বিত্তের-বেসাতের এবং নগর-বন্দরের অর্থসম্পদ, বাড়িঘর এবং দফতরের চাকুরির মালিক হয়ে নতুন এক উঠতি বুর্জোয়া সমাজরূপে দ্রুত গড়ে উঠল। এখন নারায়ণগঞ্জ থেকে উত্তরা অবধি সর্বসম্পদই অধিজন কিন্তু দু'হাজার বছরের দরিদ্র-ভুঁইফোড় মুসলমানেরই সম্পদ। এটি স্বাধীনতার অবদান। শরীরের একাংশ ক্ষীত হওয়া যেমন স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়, তেমনি এ অবস্থা রাষ্ট্রের অর্থ-সম্পদে কিংবা মানবিক-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাংস্কৃতিক গুণে উন্নতির লক্ষণ নয়। ধনীদের অর্থসম্পদও আসলে ঋণ-দান-অনুদান ত্রাণেরই অংশ। ঋণ-দানদাতা আর্থ-বাণিজ্যিক ও মহাজনী সাম্রাজ্যবাদীর পরোক্ষ ও অদৃশ্য চালবাজির ও প্রতারণার প্রসূন। তাই স্বাধীনতার স্বাদ, মুক্তিযুদ্ধে সাফল্যের ফল জনগণের অবস্থায় ও অবস্থানে কোন পরিবর্তন আনেনি। ওরা আজো রবীন্দ্রনাথের ভাষায় :

শুধু দিন যাপনের, শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানি,
শরমের ডালি,
নিশি নিশি রুদ্ধঘরে ক্ষুদ্রশিখা স্তিমিত দীপের
ধূমাঙ্কিত কালী নিয়ে
আর অজ্ঞতার, নিঃস্বতার, নিরন্নতার, রোগের শিকার হয়ে অকালে মরে।

বিশ শতকের এ সাত বছরেও আর কিছু হবে, আশা করা বৃথা। কেননা আজো অধিকাংশ নরাকৃতির প্রাণীই আমাদের সমাজে বিচরণ করছে। আশা করি, একুশ শতকের প্রথমপাদে লোক লেখাপড়া শিখবে না কেবল, স্ব ও সুশিক্ষিতও হবে। তখন হয়তো ভদ্রলোকের মধ্যে বিবেকবান যুক্তিবাদী ন্যায্যতা সচেতন ভালোমানুষও বাড়বে। মিলবে মনুষ্যত্বের গুরুত্বচেতনাসম্পন্ন সর্বজনীন হিতবাদী মানুষ। তখন হয়তো জল-স্থল-বায়ু সেনারূপ হন্তা না পুষে, মারণাস্ত্রে শ্রম, সময় ও অর্থব্যয় না করে ক্ষুধা নিবারক খাদ্য আবিষ্কারে, ফসলবৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবনে, বিচিত্র জটিল ও নতুন নতুন রোগের নিদান ও প্রতিষেধক নিরূপণে প্রতিটি রাষ্ট্রে বিজ্ঞানীদের, প্রযুক্তিবিদদের ও প্রকৌশলীদের গবেষণা কার্যে অর্থ, সুযোগ, সুবিধেও প্রেরণা-প্রণোদনা-প্রবর্তনা দিয়ে নতুন নতুন মানবিক, সামাজিক, আর্থিক, নৈতিক, শৈল্পিক, প্রশাসনিক ও রাষ্ট্রিক সমস্যার সমাধানে এবং জীবনযাপন পদ্ধতির উৎকর্ষ সাধনে গবেষক, চিন্তক, শিক্ষক, সমাজবিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানীদের নিয়োজিত রাখা হবে। গোটা পৃথিবীর সর্বত্র মানুষের মেধা-মনন-মনীষা-শ্রম ও সময় প্রয়োগে লভ্য ও লব্ধ তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য মানবজীবনের কল্যাণে জীবিকার প্রসারে নিশ্চয়ই সহায়ক হবে। একুশ শতকের প্রথমপাদেই পৃথিবীর রক্তঝরা ও প্রাণহরা জাঙ্গলিক ও বিশ্বাস-সংস্কারধারণা-চালিত গাড্ডলিক রূপ বিবর্তিত ও পরিবর্তিত হবে, এমন কি পুরো বর্জিত না হলেও হ্রাস পাবে অনেকাংশে। ইহুদী-খ্রীস্টান-বৌদ্ধ-জৈন-হিন্দু-মুসলমান রূপে নয়, 'মানুষ' নামে পরিচিত হবার আগ্রহ ও সংস্কৃতি অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে।

খ্রীস্টীয় একুশ শতকে বা বাঙলাসনের পনেরো শতকে বিজ্ঞান ও বাণিজ্যই বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক জীবন-জীবিকা নিয়ন্ত্রণ করবে। তার প্রমাণ ই.ই.সি. নাফতা, গ্যাট, ম্যাস্‌সখীটি, আশিয়ান, সার্ক এবং জি. সেভেন প্রভৃতি আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বনেতৃত্বের ও কর্তৃত্বের অপ্রতিরোধ্য অনধিকার চর্চা তথা ধনীর ও শক্তিমানের দুর্বলের উপর হামলার রাজনীতি।

৩. পনেরো শতকে অবশ্য সমাধ্য সঙ্কট ও সমস্যা

বিজ্ঞানীর বদৌলত যানবাহনের ও তার-বেতারের প্রসারে, প্রকৌশল-প্রযুক্তির বিস্ময়কর বৈচিত্র্যে ও উৎকর্ষে পৃথিবী আজ একটি জনপদে পরিণত হয়েছে। জন্ম জীবন-মৃত্যু সম্বন্ধে মানুষের যেসব বিস্ময় কল্পনা সঞ্জাত বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা এতোকালে গৌত্রিক,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাতিক, স্থানিক ও কালিকভাবে মানুষের ব্যক্তিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ঐহিক, পারত্রিক, জীবনচেতনার উৎস ও ভিত্তি ছিল, তা আজ হারাচ্ছে। এখন জগৎ, জীবন, সমুদ্র, অরণ্য, পর্বত, নভ এমনকি জন্ম-জীবন-মৃত্যু সম্বন্ধেও মানুষের ধারণা পালটে যাচ্ছে। জীবন কি ঈশ্বর নিয়ন্ত্রিত? জীবন কি গ্রহ নক্ষত্র নিয়ন্ত্রিত? ঈশ্বর নিয়ন্ত্রিত হলে ঈশ্বর লীলাময় বলে নীতি-নিয়মের শৃঙ্খলায় গুরুত্ব দেন না, তাই বিনাদোষে মানুষ জন্মান্ধ কিংবা পঙ্গু হয়ে কিংবা নিঃস্বঘরে জন্ম নেয়। ঈশ্বর নন রাশিচক্রই যদি মানুষের জীবন-জীবিকা নিয়ন্ত্রণ করে, তা হলেও তার মধ্যে স্বেচ্ছাচার রয়েছে— কোন নীতি-নিয়ম নেই। ঈশ্বর যদি সব নিয়ন্ত্রণ করেন, তা হলে রাশির কোন ভূমিকা থাকতেই পারে না। আর রাশিই যদি ঈশ্বরের দেওয়ান হিসেবে ঈশ্বরের প্রতিশরীরের কাজ করে, তা হলে ঈশ্বর একালের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নিষ্ক্রিয় প্রভাবহীন রাজা মাত্র। একালের যুক্তিবাদী নাস্তিক, নিরীশ্বর বিদ্বানরা এসব প্রশ্নের উত্তর চাইছেন মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঘুচিয়ে আবার আস্তিক জ্ঞাতির সমাজভুক্ত হবার জন্যে। এখন পৃথিবীর রূপস্বরূপও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব সম্বন্ধে গবেষণা চলছে— বিস্ফোরণতত্ত্ব, কৃষ্ণগহ্বর, গ্রীনহাউজ, ওজোন, নভের প্রসারমানতা, সংকোচনের আশঙ্কা প্রভৃতি একালের বিজ্ঞানীর গবেষণার ও আলোচনার বিষয়। কাজেই একালে বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা বদলাচ্ছে, জ্ঞান পূর্ণতার দিকে এগুচ্ছে। জীবন-জীবিকা পদ্ধতি পাল্টাচ্ছে, সমাজ-সংস্কৃতি-পাপ-পুণ্যবোধও অস্থির জিজ্ঞাসার ও পরিবর্তনের বিষয় হয়ে উঠেছে। ফলে এখন জীবন শঙ্কার, যন্ত্রণার, সঙ্কটের, সমস্যার কবলেও পড়ছে। আগের কালে অজ্ঞতা ছিল আশীর্বাদস্বরূপ। আশৈশব শ্রুত, লব্ধ, অভ্যস্ত বিশ্বাসে-সংস্কারে-ধারণায় জীবন চলত। ঈশ্বরের লীলাময়তায় আস্থা রাখলে লাভ-ক্ষতির, জন্ম-মৃত্যুর, ধনের-নির্ধনতার প্রশ্নের উত্তর খোঁজার দরকার হত না। নিয়তি, কপাল, অদৃষ্ট, পূর্বজন্মের কর্মফল বলে মনে প্রবোধ মিলত। সবটাই ঈশ্বরের লীলা এবং ব্যক্তির উঠতি-ঝরতি-পড়তি-ঝাড়াই-বাছাই-যাচাই সবটাই তার ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ পরীক্ষার লক্ষ্যেই ঘটান ঈশ্বর। এ বিশ্বাসে মানুষ ঈশ্বরে অদৃষ্টে-নিয়তিতে-কর্মফলে সমর্পিত জীবনযাপন করত নিশ্চিত ও নির্বিকার মনে।

এখন সেদিন নেই। আজ অজ্ঞ-অনক্ষর মানুষও যন্ত্রের প্রসাদ ও প্রভাবপুষ্ট জীবনে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে। আগে সব দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল ঈশ্বরের, দিন-ক্ষণ-তিথি-নক্ষত্র-রাশির। এখন সব দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে মানুষের উপর। সব রাষ্ট্রগুলো সীমান্ত অক্ষুণ্ন রেখেও সামবায়িক ভিত্তিতে সহযোগিতায় সহাবস্থান করতে বাধ্য হবে। আর Unitary সরকার টিকবে না কোথাও, ফেডারেল রাষ্ট্রই প্রয়োজন।

১. এখন মানুষকেই করতে হবে বিশ্ববিধ্বংসী মারণাস্ত্রের নিয়ন্ত্রণ কিংবা নির্মাণ নিষিদ্ধ আপোসে।

২. এখন মানুষকেই উপায় বের করতে হবে পরিবেশ দূষণমুক্ত বাঁচার গরজেই এ পৃথিবীতে।

৩. এখন মানুষকেই বঞ্চক-বঞ্চিত, শোষক-শোষিত, পীড়ক-পীড়িত, শাসক-শাসিত মুক্ত করতে হবে মানুষের সমাজকে, সরকারকে ও রাষ্ট্রকে।

৪. এখন নারী-পুরুষের সমাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে পৃথিবীর সর্বত্র।

৫. এখন সর্বপ্রকার বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণামুক্ত করে মানুষকে যুক্তিবাদী, প্রকৃতিবাদী ও বিবেকী করে গড়ে তুলতে হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬. এখন গোটা পৃথিবীর সর্বত্র সব রাষ্ট্রে নতুন নতুন রোগ প্রতিরোধের, কিংবা আরোগ্যের জন্যে চিকিৎসাবিজ্ঞানের গবেষণার ও প্রতিষেধক আবিষ্কারের, উদ্ভাবনের ও সৃষ্টির জন্যে ব্যবস্থা করতে হবে সাধ্যমতো। তথ্য ও উপকরণ বিনিময় মাধ্যমে গবেষণা-কর্ম দ্রুত সাফল্য লাভ করবে। অনুশীলনে প্রাণীমাত্রেরই যে দৈহিক ও মানসিক শক্তি উৎকর্ষ লাভ করে, সে-বিষয়ে কারুরে কোন সন্দেহ নেই। মানুষের মগজের, মননের ও মনীষার শক্তিও মনে হয় অশেষ। এ শক্তির উন্মেষের, বিকাশের ও উৎকর্ষের জন্যে নিত্য অনুশীলন আবশ্যিক।

৭. পৃথিবীর মানুষের জন্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ আবশ্যিক কিংবা শরীরের ক্ষুধা নিবারণের জন্যে ও পুষ্টিবৃদ্ধির জন্যে স্বল্প পরিমাণের ভিন্ন কোন খাদ্য আবিষ্কার-উদ্ভাবন সম্ভব কিনা, ভেবে দেখার সময় এসেছে।

৮. আপোসে পাঁচ মহাদেশে চীন-ভারত-বাঙলাদেশ প্রভৃতি জনবহুল রাষ্ট্রের লোকের অভিবাসন সম্ভব হলে আজো লোকসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ আবশ্যিক ও জরুরী বিবেচিত না হওয়ারই কথা।

খ্রীস্টীয় বিশ বা বাঙলা পনেরো শতকের মানুষের পক্ষে উপর্যুক্ত দায়িত্ব-কর্তব্য, সঙ্কট ও সমস্যা সম্বন্ধে উদাসীন থাকা সম্ভব হবে না। এ পুরোনো পৃথিবীতে বেঁচে বর্তে থাকতে হলে তাঁদের এসব সমস্যা-সঙ্কটের সমাধানের উপায় বের করতেই হবে। এবং তাদেরও সময়ের স্রোতে ভাসমান জীবনে নতুন বাঁকে বাঁকে যেসব নতুন সঙ্কট-সমস্যা জীবনযাত্রার বিঘ্ন হয়ে দাঁড়াবে, সেগুলো তারা উপেক্ষা করতে পারবে না। তবে বিজ্ঞানের তথ্য ও বিজ্ঞানীর আবিষ্কার-উদ্ভাবন এবং সৃষ্টিই জনজীবনের বল ও ভরসা। এ যুগ বিজ্ঞানের ও বাণিজ্যের— এ জীবন বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক।

৪. স্বাগত পনেরো শতক

নিরবধিকাল প্রবাহকে মানুষ সৌরমণ্ডলের আর্তব আবর্তনকে অবলম্বন ও ভিত্তি করে এক এক ঋতুকে লাক্ষণিক বৈশিষ্ট্যে ও বৈচিত্র্যে চিহ্নিত করে সময়কে খণ্ড ও ক্ষুদ্র করে, অন্তরের অনুগত করে, জীবনযাত্রার প্রয়োজনে কাজে লাগায়। এভাবে অনন্তকে মানুষ মনের আয়ত্তে এনে বরণ করে অঙ্গে, ধারণ করে অন্তরে। অসীমকে ধরে রাখে সংকীর্ণ সীমার মধ্যে, অশেষকে খণ্ডিত ও ক্ষুদ্র করে রূপায়িত করে মানসিক ও ব্যবহারিক জীবনে। ফলে কাল আর তার অনুভবে নিরবধি থাকেন না। মৃত্যুক্ষণ অজ্ঞাত বলেই মানুষ অজরামরবৎ এমন প্রাপ্তি লিপ্সু, এমন ভোগাসক্ত, এমন শক্তিমান, এমন সাহসী, এমন উদ্যমশীল, এমন উদ্যোগী। তাই 'জীবন অমৃত করে দান'। সময়কে জীবনের অনুগত করে অনুভব করাতেই জীবন কাণ্ডারীবিহীন নৌকার মতো সময়সমুদ্রে দিশেহারা হয়ে হারিয়ে যায় না।

বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা যেমন বার্ষিক পরীক্ষার পরে উচ্চতর শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়ে অন্তরে সাফল্যের একপ্রকার উল্লাস অনুভব করে, তেমনি নতুন দিন নতুন বছর ব্যক্তি মানুষের মনে বার বার নতুন আশা, আশ্বাস ও প্রত্যাশা জাগায়, প্রেরণা ও প্রণোদনা-প্রবর্তনা দেয় নতুন অঙ্গীকারে-সংকল্পে উদ্দীপ্ত হয়ে নতুন শক্তি-সাহস-উদ্যম-উদ্যোগ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রয়োগে নতুনভাবে উন্নততর জীবন গড়ার জন্যে। অতীতের ভুল, ব্যর্থতা, গ্লানি, হতাশা মন থেকে মুছে ফেলে জীবনকে সার্থক করার জন্যে নতুন উদ্যমে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে আগ্রহী হয় ব্যক্তি। আমরা জানি জীবন হচ্ছে আত্মরক্ষার, আত্মপ্রতিষ্ঠার ও আত্মবিস্তারের কাজের ও সংগ্রামের এবং কাঙ্ক্ষাপূর্তি-অপূর্তির সমষ্টি। সেই Veni, Vidi, Vici,-ই হচ্ছে জীবনতত্ত্ব। এ কারুর মধ্যে সুপ্ত, গুপ্ত থেকে যায়, আর কারুর জীবনে অনেকটা রূপায়িত বা বাস্তবায়িত হয়। মৃত্যু সুনিশ্চিত হলেও তার লগ্ন অজ্ঞাত বলেই মানুষ এ মর্ত্যজীবনকে ভালোবাসে, এ জীবনে ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগ তার কাম্য। আর মর্ত্যজীবনকে ভালোবাসে বলেই দৈহিক মৃত্যুর পরেও লোকস্মৃতিতে বেঁচে থাকার তার সে কি ব্যাকুলতা ও আকুতি! ভাস্কর মূর্তি হয়ে পাথুরে বাঁচা, ছবি হয়ে কাগুজে বাঁচা, স্কুল-কলেজ, হাট-বাজার, রাস্তা-ঘাট, দীঘি-সেতু, মন্দির-মসজিদ সম্পৃক্ত হয়ে নামে বাঁচা, সাহিত্য-শিল্প-দর্শন-বিজ্ঞান-ইতিহাস সৃষ্টি করে রচনার মধ্যে বাঁচা, সন্ত-দরবেশ হয়ে জনসেবায়, দেশপ্রেমে, দানে-দক্ষিণায়, কৃপায়-করুণায় খ্যাত হয়ে, শহীদ হয়ে, গাজী হয়ে বাঁচা। বাঞ্ছা কেবল লোকস্মৃতিতে, লোকমুখে কাহিনী হয়ে বাঁচা বাঁচা আর বাঁচা। তবু বাঁচতে জানেই বা কয়জনে, বাঁচেই বা কয়জন। আজ অবধি এমনি অমর মানুষ পৃথিবীতে প্রায় করগণ্যই। শাহ-সামন্ত থেকে অন্য সব মানুষই বিস্মৃতির ও অনস্তিত্বের শূন্যতায় বিলীন হয়ই।

সবাই নববর্ষের পুলক অনুভব করে। কিন্তু নতুন শতাব্দ বরণের বিরল সুযোগ ঘটে না সবার জীবনে, আমরা সে-সুযোগ পেয়ে ধন্য। কেননা আমরা এর মধ্যে যুগান্তরের উল্লাস অনুভব করছি। এমনিতেই প্রবুদ্ধ মানুষের জাগ্রতজীবন প্রতি নববর্ষে নবজীবনের দ্বার উন্মুক্ত করে। বিগত দিনের, মাসের ও বছরের ভ্রান্তি, গ্লানি, হতাশা দেহের ধুলোর মতো ঝেড়ে মুছে ফেলে নববর্ষে নতুন করে জীবন রচনার অঙ্গীকার করে আত্মোন্নয়ন লক্ষ্যেই । আমরা জানি, সুখ, তৃপ্তি ও পিতৃধন বন্ধ্যা। মানুষকে এগুলো কর্মোদ্যম যোগায় না। দুঃখ ও আর্তিই কেবল সৃষ্টিশীল। সুখ-তৃপ্তি প্রাপ্তি লক্ষ্যেই দুস্থ ও দুঃখী মানুষ অভাব ঘোচানোর জন্যে, জীবনের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে ভোগে উপভোগে-সম্ভোগে-সাচ্ছল্যে-স্বাচ্ছন্দ্যে-সানন্দ জীবনযাপন করার বাঞ্ছাবশে মানুষ কাঙ্ক্ষাপূর্তি লক্ষ্যে জীবন-সংগ্রামে আগ্রহী হয়। জিগীষা তাকে শক্তি সাহস-উদ্যম যোগায়। নববর্ষের নতুন সূর্য জাগ্রত ও উচ্চাশী উদ্যমশীল মানুষের মনে নতুন নতুন আশা-আশ্বাস জাগায়।

আমরা নতুন শতাব্দকে বরণ করছি সানন্দে নতুন করে ব্যক্তিক, সামাজিক, জাতিক ও রাষ্ট্রিক জীবন রচনার স্বপ্ন, সাধ, সঙ্কল্প, অঙ্গীকার ও দায়বদ্ধতা নিয়ে, এ সুযোগ আমরা হেলায় হারাতে পারি না জাতীয় জীবনে, রাষ্ট্রিক জীবনে। কেননা আমাদের ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক, নৈতিক, শৈক্ষিক, আর্থিক, নাগরিক ও রাষ্ট্রিক জীবন সঙ্কট-সমস্যাসঙ্কুল। দুস্থ, দরিদ্র, নিঃস্ব, নিরন্ন মানুষের এবং স্বল্পযোগ্যতার বেকার ব্যক্তির সংখ্যা শতে সত্তর ভাগে পৌঁছে গেছে। আমরা জানি এবং স্বীকারও করি যে খেয়ে পরে বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে পঙ্গু-পাগল-রুগ্ন-বৃদ্ধ-শিশু নির্বিশেষে সব যোগ্য-অযোগ্য মানুষেরই। যারা সমর্থ তাদের কাজ দিয়ে, যারা অসমর্থ তাদের ভাতা দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব সরকারেরই তথা রাষ্ট্রেরই। এই নতুন পনেরো শতকের পনেরো বছরের মধ্যেই আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে উদ্ভূত অশনের, বসনের, শিক্ষার, চিকিৎসার,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিবাসের যে সমস্যা-সঙ্কট অসমাধ্য রূপে বেড়ে চলেছে, তার সমাধান-পন্থা আবিষ্কার আবশ্যিক ও জরুরী। আমাদের ধারণা বানানো নেতার নেতৃত্বে নয়, যোগ্যতায় ও ব্যক্তিত্বে গড়ে ওঠা জননেতার উঁচু মানের মনন-মগজ-মনীষা প্রয়োগে এবং নীত জনের সমর্থনে, সহায়তায় ও সহযোগিতায় এবং বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক তীব্র প্রতিযোগিতার ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার কালেও আমাদের বনজ, খনিজ ও কৃষিজ উৎপাদিত এবং নির্মিত পণ্যের দেশী-বিদেশী বাজার আয়ত্তে আনার জন্যে প্রয়াস-প্রযত্ন চালাতে হবে। পণ্যের বৃদ্ধি ও উৎকর্ষ বাজার প্রাপ্তির সহায়ক হবে অবশ্যই।

আমাদের পনেরো শতকের এ প্রথম দিন নতুন শতকের নববর্ষের এ নতুন দিন আমাদের কাছে তাই নবজীবনের নকীব। এ নব শতাব্দের নববর্ষের নতুন সূর্যকে স্বাগত জানিয়ে আমরা আমাদের চেতনাকে ঢালাই করবার, চিন্তাকে উপযোগমুখী ঝালাই করবার এবং ত্রুটি ও চরিত্র শোধনের, ভ্রান্তিনিরসনের, মুক্তিবুদ্ধি, যুক্তি, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞতাযোগে নতুনভাবে ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক, নাগরিক কর্তব্যসচেতন হয়ে নব শতককে এবং নববর্ষকে সাদর, সাগ্রহ প্রত্যাশাঋদ্ধ অন্তরে বরণ করে নিচ্ছি। আমাদের এ নতুন শতক, নতুন বছর বাসন্তী হাওয়ায় উজ্জীবিত ঔষধির মতো, বৃক্ষের নবপল্লবের মতো, আমাদের চেতনার কিশলয় রূপে, চিন্তার প্রসূন রূপে, যৌক্তিক-বৌদ্ধিক জীবনের প্রেরণা-প্রণোদনা-প্রবর্তনার উৎস রূপে আমাদের অন্তরে মানবিকগুণের বিকাশ সাধন করুক।

প্রাণী মাত্রেরই জীবন এগিয়ে যায় বিরুদ্ধ প্রাকৃতিক ও সামাজিক প্রতিবেশের মধ্যে দিয়ে। জীবন প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতাবহুল। তাই মনুষ্যসমাজের সর্বত্র দৃশ্য ও অদৃশ্যভাবে, প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে, সচেতন ও অবচেতনভাবে সংগ্রাম চলছে পরাধীনতার বিরুদ্ধে, সংগ্রাম চলছে স্বাধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠ হওয়ার জন্য পীড়ন-শোষণের বিরুদ্ধে, অজ্ঞতার ও অনক্ষরতার বিরুদ্ধে, দারিদ্র্য ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে, সংগ্রাম চলছে বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণার বিরুদ্ধে মনের ও বুদ্ধির মুক্তির লক্ষ্যে এবং যুক্তিবাদ, মানববাদ ও বিবেকী ন্যায্যতা স্বীকৃত করার জন্যে। সংগ্রাম শুরু হয়েছে প্রাকৃতিক ঝড়-ঝঞ্ঝা-খরা-বন্যা থেকে, রোগ-অনাহার থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্যে, পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধের সংগ্রামও চলছে। সংগ্রাম চলছে আমাদের দেশেও। অজ্ঞ-অনক্ষর নিঃস্ব নিরন্ন মানুষের আধিক্যের দরুন আমাদের সংগ্রাম পায়নি পূর্ণতা, সিদ্ধি রয়েছে অনায়ত্ত। গণমানবের স্বাধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠ হয়ে সুখ-স্বস্তি-স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগের ব্যবস্থা এখনো স্বপ্নের ও সাধের পর্যায়ে রয়ে গেছে।

নববর্ষের প্রথম সূর্যের আলোয় আশা, আকাঙ্ক্ষা, সঙ্কল্প ও উদ্যম ঝালাই করবার, দৃঢ়তর করবার সুযোগ আসে, প্রেরণা জাগে বছরান্তে একবার। নববর্ষের পলাশলাল সূর্য মন ও মাটি রাঙিয়ে, পাতায় পাতায় আলোর নাচন জাগিয়ে নবজীবনের ইঙ্গিত ও আশ্বাস দিয়ে যায়।

প্রতি নববর্ষই ক্লান্তি-শ্রান্তি-গ্লানি-হতাশা মুক্তির প্রতীক।

পনেরো শতকের প্রথমদিনের পলাশলাল সূর্য বিশ্বমানবের জন্যে বয়ে আনুক মুক্তির বাণী। মানবমুক্তি সংগ্রামে, মানবকল্যাণে আমাদের দেহ-মন-প্রাণ-চেতনা নিয়োজিত হোক, সমর্পিত হোক-নতুন শতকের প্রথম প্রভাতে— এ দৃপ্ত শপথ অন্তরে গ্রহণ করেই শুরু হোক এ বছরের জীবন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চৌদ্দ শতকের দিনগুলো যেমন ছিল পৃথিবীতে দুটো জীবন ও সম্পদ বিধ্বংসী যুদ্ধের কাল, তেমনি ছিল আফ্রো-এশিয়া-লাতিন আমেরিকার শোষিত মানুষের ঔপনিবেশিক শোষণ-পীড়ন মুক্তির যুগও। গণমানব আজ শোষণ-পীড়ন-বঞ্চনামুক্তির আশায় ও আশ্বাসে দ্রোহী, সংগ্রামী ও আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে উঠছে। বন্দীর বেদনা ও শোষিতের ক্ষোভ ঝড় ও বিপ্লব হয়ে দেখা দেয়। কবির চোখে এ দ্রোহ, এ বিপ্লব স্বাধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠ হওয়ার প্রয়াসপ্রসূন মাত্র। তাই কবি বলেন :

ঐ নতুনের কেতন ওড়ে কালবৈশাখীর ঝড়
ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর, প্রলয় নতুন সৃজন বেদন
আসছে নবীন জীবনহারা অসুন্দরে করতে ছেদন।
তাই 'তোরা সব জয়ধ্বনি কর।'

অতএব, পনেরো শতককে মানবমুক্তির নকীব হিসেবে স্বাগত জানাই। জয় হোক বাঙালীর, জয় হোক বাঙলাদেশ নামের রাষ্ট্রের সব নাগরিকের, সব বাঙলাদেশীর।

৫. সংস্কৃতির বিকাশ-বিস্তার

তেরো শতকের শেষপাদ [১৮৭০ খ্রীঃ] থেকে প্রতীচ্য জগতে বিজ্ঞানের চর্চা বিশেষ গুরুত্ব পায়। ফলে বিজ্ঞানের তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য যেমন মানুষের আয়ত্তে আসতে থাকে, তেমনি আবিষ্কারে উদ্ভাবনে ও যন্ত্রনির্মাণে বিজ্ঞানীরা জগতে যুগান্তর ঘটান। আজকের এ মুহূর্তে আমরা যন্ত্রযুগে, যন্ত্রজগতে এবং যন্ত্রনির্ভর জীবনই যাপন করছি। এর প্রভাব পড়েছে আমাদের অঙ্গে ও অন্তরে, আমাদের পূর্বেকার অনেক বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা মিথ্যা এবং উপযোগরিক্ত বলেই প্রমাণিত হয়েছে, বিদ্বান ও বুদ্ধিমান মানুষ জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি ও বিবেক-বিবেচনা প্রভৃতির গুরুত্ব স্বীকার করে জাগতিক তথা মর্ত্যজীবনমুখী হয়েছে। ফলে সাক্ষরতাপুষ্ট-প্রতীচ্য জগতে সাড়ে তিন আড়াই দুই ও দেড় হাজার বছরের পুরোনো শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন করেই আধুনিক বিজ্ঞানের প্রকৌশল-প্রযুক্তির প্রসাদ মানুষ প্রাত্যহিক জীবন-জীবিকায় ভোগ-উপভোগ করছে। জল-স্থল ও বায়ু যানের বাহনের বদৌলত এবং তার-বেতার যন্ত্রের বিস্ময়কর প্রয়োগে পূর্বেকার অজানা, অপরিচিত অগম্য পৃথিবী আজ একটা জনপদে কিংবা একটা বাজারকেন্দ্রী ক্ষুদ্রতায় পরিণত হয়েছে। বলতে গেলে 'ধরা' এখন অন্তত ধনীদের পক্ষে 'সরায়' পরিণত হয়েছে। আজ পৃথিবীর সর্বত্র জনজীবন নিয়ন্ত্রণ করছে বিজ্ঞান ও বাণিজ্য এবং দুটোই পরস্পর সম্পৃক্ত। একালে মনে-মগজে-মননে বিজ্ঞানকে গুরুত্ব না দিলে, বিজ্ঞানে আস্থা না রাখলে আধুনিক মানুষ হওয়া চলে না। বিজ্ঞানের অবদানে-প্রযুক্তিতে-প্রকৌশলে-যন্ত্রে ও উৎপাদিত-নির্মিত সামগ্রীতে আস্থা রাখব, জীবনে অপরিহার্য মনে করব অথচ বিজ্ঞানের তত্ত্বে-তথ্যে ও সত্যে অবহেলা করব, এমন মনোভাব বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণাচালিত অতীত ও ঐতিহ্যপ্রিয় কিন্তু যৌক্তিক ও বৌদ্ধিক জীবনবিমুখ বাস্তব জাগতিক জীবনের গতি-প্রকৃতি অচেতন মানুষের লভ্য। আজ কেউ, কোন জাতি, গোত্র কিংবা রাষ্ট্র স্বাতন্ত্র্যে ও বিচ্ছিন্নতায় বাঁচতে পারে না। বিজ্ঞানীর আবিষ্কার-উদ্ভাবন ও সৃষ্ট যন্ত্র মানুষের জীবনে বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সম্বন্ধ জীবনযাপনের— বেঁচে বর্তে থাকার গরজেই অপরিহার্য ও আবশ্যিক করে তুলেছে। আজ আর দেশের সম্পদে, দেশের পণ্যে জীবনের প্রয়োজন মেটে না। এ জন্যেই খনিজ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কৃষিজ উৎপাদিত ও নির্মিত পণ্যের আদানে-প্রদানে-আমদানীতে-রফতানীতে ব্যক্তির ও রাষ্ট্রের আর্থিক ও ব্যবহারিক জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই বিজ্ঞান ও বাণিজ্য একালে ব্যক্তির ও রাষ্ট্রের কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের নয় কেবল, বিশ্বমানবের জীবন এখন বিজ্ঞান ও বাণিজ্যলগ্ন। দুটোই দেহ-প্রাণ-মনের শুদ্ধ পরিচর্যার জন্যে আবশ্যিক ও জরুরী। শাস্ত্রের সায় নেই জেনেও শাস্ত্রের বিধিনিষেধ উপেক্ষা করেই আমাদের দেশে ও সমাজে নাচ-গান-বাজনা-নাটক-চলচ্চিত্র চালু হয়েছে। মুসলিম সমাজে কালোপযোগী প্রতীচ্য আচার-আচরণ-পোশাক-খাদ্য-আসবাব-তৈজস এবং স্থাপত্য-ভাস্কর্য এবং জীবনের প্রয়োজনীয় সব সামগ্রী এখন স্বাতন্ত্র্যপ্রতীক নয়, আন্তর্জাতিক। আমাদের ধনী ও শহুরে শিক্ষিত ঘরে স্বদেশী কিংবা ঐতিহ্যগত কোন কিছুই মেলে না। এমনকি আমাদের আয়ুর্বেদীয় ও ইউনানী চিকিৎসা পদ্ধতিতে আমাদের আস্থা অপগত, এবং আমরা প্রতীচ্য চিকিৎসাবিজ্ঞানে আস্থাবন। প্রতীচ্য শিক্ষার, বিজ্ঞানমনস্কতার ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও রাজনীতিক সম্পর্ক-সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হওয়ার ফলে আমাদের রুচি-সংস্কৃতির উৎকর্ষ ঘটেছে, আমাদের মধ্যে উদারতা, গ্রহণশীলতা, মানবতা ও মানববাদ বৃদ্ধি পেয়েছে। নাস্তিক নিরীশ্বর মার্কসবাদী তরুণ-তরুণীর সংখ্যাও বাড়ছে। এরা সংস্কারমুক্ত মন-বুদ্ধির মানুষ, মানববাদী এবং শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠাকামী। কয় বছর আগেও মুসলিম সমাজে যা যা অলভ্য কিংবা বিরল বা দুর্লভ ছিল, তা-ই আজ জীবনের জরুরী ও আবশ্যিক অবলম্বন হয়েছে, যেমন নাচ-গান-বাজনা-অভিনয়-আবৃত্তি-চিত্রশিল্প-চলচ্চিত্র, নারীশিক্ষা, অবরোধপ্রথার ও অবগুণ্ঠনের বিলুপ্তি, সহশিক্ষা, দফতরে সহ-চাকরি, রেলে-বাসে-বিমানে পুরুষের সহযাত্রীরূপে নির্বিঘ্নে, নির্ভয়ে পৃথিবী পর্যটন, ভিন্নদেশে অনাত্মীয়ের মধ্যে একা বাস করা প্রভৃতি একালে আমাদের নিত্যদিনের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার অন্তর্গত হয়েছে। একসময়ে মুসলিম পাড়ায়-মহল্লায় ফুল মিলত না, আজ মুসলিম সমাজে ফুলের আদর-কদর যে-কোন সৌন্দর্যপ্রিয় সংস্কৃতিমান সমাজের মতোই বেড়েছে। ফুল উপহার দেয়া, ফুল দিয়ে বরণ করা, ফুলের তোড়া দিয়ে সম্মান-শ্রদ্ধা-অভিনন্দন জানানো আমাদেরও কালের দাবি অনুগ উদারতার সুরুচির ও সংস্কৃতির পরিচায়ক।

উল্লেখ্য যে আমাদের এ উদারতা ও গ্রহণশীলতা প্রতীচ্যবিদ্যা আয়ত্ত করারই ফল। টোল-মাদ্রাসা শিক্ষা আমাদের গ্রহণবিমুখ করে, নতুনভীতি ও পুরোনোপ্রীতি জাগায় আমাদের মনে। টোল-মাদ্রাসার শিক্ষা সেকেলে বলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে যারা সজ্জন, তাদের করে গোঁড়া রক্ষণশীল ও আক্ষরিকভাবে শাস্ত্রের বিধিনিষেধের অনুগত, তারা হয় অর্থোডক্স, আর যারা ধর্মধ্বজী-মতলববাজ তাদের করে মৌলবাদী। কাজেই এ দু'দলের রক্ষণশীলতার ও গ্রহণবিমুখতার মধ্যে মৌলিক ও উদ্দেশ্যগত পার্থক্য রয়েছে।

চৌদ্দ শতকের পয়লা বৈশাখে সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু হয়। ১৪ ই এপ্রিল ১৮৯৪-এ বিবেকানন্দেরও ১৩০৯ সনে মৃত্যু ঘটে, ১৩০১ সনেই বাঙলাভাষার মাধ্যমে সর্বপ্রকার ও সর্ববিষয়ে গবেষণার জন্যে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' নামে এশিয়াটিক সোসাইটির আদলে কোলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি বাঙালীসত্তার মূল্য ও মর্যাদা চেতনার এবং বাঙলাভাষা প্রীতির এক উজ্জ্বল প্রাতিষ্ঠানিক নিদর্শন। এ প্রতিষ্ঠানের গবেষণা পত্রিকা 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা' আজো অবিলুপ্ত। এই চৌদ্দ শতকেই বাঙালী মুসলিম সমাজে নারী-মুক্তির জন্যে, নারী শিক্ষার প্রসারের জন্যে, নারীকে আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হয়ে অর্থ উপার্জনে সমর্থ করার পন্থা নিরূপণ লক্ষ্যে উর্দুভাষী কিন্তু বাঙলাভাষায় ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইংরেজীভাষায় গ্রন্থ রচনা করেন দ্রোহিণী রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন [১৮৮০-১৯৩২ খ্রীঃ] তাঁর কোলকাতার বিদ্যালয়ে উর্দুভাষী ছাত্রীরাই পড়ত। ১৩৩৪ সনের দিকে দুজন বাঙালী ছাত্রীও ছিল বটে, কিন্তু তাদের জন্যে বাঙলা সাহিত্য পড়ানোর ব্যবস্থা ছিল কি-না, নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। রোকেয়ার স্বকালে মুসলিম সমাজে পাঠক সংখ্যা ছিল নগণ্য। তাই তখন তাঁর প্রভাব মুসলিম সমাজে বিশেষ অনুভূত হয়নি। একালেই বেগম রোকেয়া মুসলিম শিক্ষিত সমাজের গৌরব-গর্বের অবলম্বন হয়েছেন। তিনি ছিলেন উদার, বাস্তব-জীবনসচেতন সমাজ-মানস পরিবর্তনে আগ্রহী ও উৎসর্গিত প্রাণ। নারীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি তিনিই প্রথম বাঙলাদেশে হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করেন, শাস্ত্রের ও শাস্ত্রীর বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন ও উপেক্ষা করার সাহস ছিল তাঁর। এখানে আজকের তসলিমা নাসরিনের অভীকতা ও যুক্তিবাদিতাও নারীমুক্তি সংগ্রাম প্রাসঙ্গিক বলে স্মর্তব্য।

১৩৩৩ [১৯২৬ খ্রীঃ] সনে 'ঢাকায় মুসলিম সাহিত্য' সমাজ নামে একটি সমিতি গড়ে ওঠে মুখ্যত সৈয়দ আবুল হোসেনের উদ্যোগে। পাঁচ বছর টিকে ছিল এ সমিতি এবং এর বার্ষিক পত্রিকা 'শিখা'রও বের হয়েছিল পাঁচটি সংখ্যাই। অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন কাজী আবদুল ওদুদ, কাজী মোতাহার হোসেন, আনওয়ারুল কাদির, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, আর ছাত্রসহযোগী ছিলেন শামসুল হুদা, আবদুল কাদির ও আবুল ফজল। এঁরা রামমোহনী কায়দায় ও আদর্শে ব্রাহ্ম সমাজের মতো উদার ও গ্রহণশীল কালোপযোগী যুক্তিবাদী একটা শিক্ষিত মুসলিম সমাজ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের প্রভাব পড়েনি তখন ইংরেজী শিক্ষিত মুসলিমদের সংখ্যাস্বল্পতার দরুন, বরং ঢাকার প্রতিক্রিয়াশীলেরা এবং কোলকাতার মোহাম্মদী সম্পাদক মৌলানা আকরম খান প্রভৃতি প্রতিবাদী প্রতিক্রিয়াশীলেরা তাঁদের প্রয়াস ও কণ্ঠ স্তব্ধ করে দেন জান-মাল-গর্দান নেবার ভয় দেখিয়ে। পরে যখন ১৩৪০ সনের দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বদৌলত মুসলিম সমাজে রাজনীতিক চেতনা ও প্রতীচ্যবিদ্যার প্রসার ঘটে, তখন রাজনীতিক হাওয়া ভিন্নপথে প্রবলভাবে বইতে থাকে। যেমন ১৩৩৩ [১৯২৬ খ্রীঃ] সনের কোলকাতার হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা, চিত্তরঞ্জন দাশের [১৯২৫ খ্রীঃ] মৃত্যুতে হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট বা চুক্তির বিলুপ্তি, ১৩৩৭-৩৯ [১৯৩০-৩২ খ্রীঃ] সনের গোলটেবিল বৈঠকে সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ, পৃথক নির্বাচনপ্রথা, চাকরির ভাগ এবং সংরক্ষণ ব্যবস্থা, ১৩৪২ [১৯৩৫ খ্রীঃ] সনের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন আইন ও দু'বছর পরে তার বাস্তবায়ন আর পাকিস্তান প্রস্তাব বাঙালী মুসলিম মনে তখন উদারতার পরিবর্তে, সমাজ সংস্কারের গুরুত্বচেতনার বদলে হিন্দুর ও ব্রিটিশের থেকে মুসলিম স্বার্থ আদায়ের প্রয়াস-প্রযত্ন দ্বেষ-দ্বন্দ্বের আন্দোলনের আকারে আত্মপ্রকাশ করল। ফলে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন তখন উপযোগ হারিয়ে ফেলেছে। ফলের 'শিখা'র শেখরস্থ সেই মটো 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।' আজ বাঙলাদেশী মুসলিম সমাজে সে-অসম্ভবতা আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে জিয়ার-এরশাদের শাসনামল থেকে। বর্তমান গণতান্ত্রিক শাসনামলে সরকারী আশ্রয়ে, প্রশ্রয়ে, গোপন মদদে ও ইঙ্গিতে দেশে সরকারের সমান্তরাল একটা অসহিষ্ণু অর্থোডক্স ও মৌলবাদী মোল্লা শাসনও চলছে, যার ফলে ১৩৫৮ [১৯৫২ খ্রীঃ] সনের ভাষা-সংগ্রামের কাল থেকে বিশেষ করে ১৩৬৫ [১৯৫৮ খ্রীঃ] সনের কাগমারী সম্মেলনের পর থেকে সংস্কৃতি ক্ষেত্রে অধিকাংশ বুদ্ধিজীবীর সমর্থনে ও আগ্রহে আঁকিয়ে-লিখিয়ে-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গাইয়ে-বাজিয়ে-নাচিয়ে-নাটুকে যে ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের ও মত প্রকাশের ও মুদ্রণের স্বাধীনতা ভোগ করত এবং জিয়ার ও এরশাদের আমলে সংবিধান বিসমিল্লাহ ও ইসলাম সম্পৃক্ত হওয়া সত্ত্বেও মোল্লারা তখন সরকারের প্রত্যক্ষ প্রশ্রয়ের অভাবে প্রতিবাদে বা প্রতিক্রিয়া প্রকাশে সাহস পেত না। বিএনপি জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে আঁতাতে তথাকথিত গণতান্ত্রিক সরকার গঠন করার সঙ্গে সঙ্গেই ১৩৯৮ [১৯৯১ খ্রীঃ] সন থেকে উদার-অসাম্প্রদায়িক, শাস্ত্রনিরপেক্ষ, বিজ্ঞানসম্মত, দেশকালের চাহিদা অনুগ মত-মন্তব্য মুখে বা লেখায় প্রকাশ করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। রক্ষণশীল অতীত ও ঐতিহ্যমুখী মোল্লারা ও জামায়াতে ইসলামীর মতো মৌলবাদীরা মারমুখো হয়ে ওঠে লেখক কিংবা বক্তার প্রতি। সরকার থাকে নিরপেক্ষ-নীরব নিষ্ক্রিয় দর্শক।

একালে নিরপেক্ষ সাহাবুদ্দীন সরকারের আমল থেকে সংবাদ ও সাময়িক পত্রগুলো সংবাদ মুদ্রণের ও মত প্রকাশের অধিকার পেয়েছে বটে, কিন্তু গণতান্ত্রিক সরকারের কাছে জনমতের, গণদাবির, পত্র-পত্রিকার আলোচনা-সমালোচনা কোন কেজো গুরুত্ব পায় না। ফলে স্বাধীনতা সমাজের উপকারে আসে না।

চৌদ্দ শতকে অর্ধশতাব্দীকাল আমরা সাহিত্যক্ষেত্রে মধ্যাহ্নের সূর্যের মতো রবীন্দ্রনাথকেও পেয়েছি। প্রতীচ্য আদলে সাহিত্য সমালোচনার যথার্থ প্রবর্তক শশাঙ্কমোহন সেন, মোহিতলাল মজুমদার, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত চক্রবর্তী, সুবোধ সেনগুপ্ত প্রমুখকে পেয়েছি। মীর মুশাররফ হোসেন, কায়কোবাদ, নবীন সেন, হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ চৌদ্দ শতকেও বেঁচে ছিলেন। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, দীনেশচন্দ্র সেন, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন প্রমুখও চৌদ্দ শতকের বিদ্বান গবেষক। রবীন্দ্র-নজরুল-জসীমউদ্দীনের কাব্যধারা গুণে-মানে-মাপে-মাত্রায় তুলনীয় নয় বটে, কিন্তু ধারার ভিন্নতা ও গুরুত্ব অবশ্য স্বীকার্য। স্বাদও আলাদা। তারপর কাব্যে ত্রিশের কবি বলে খ্যাত জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত সর্বোপরি বুদ্ধদেব বসু বাঙালীকাব্য ক্ষেত্রে রবীন্দ্রোত্তর যুগস্রষ্টা রূপে প্রখ্যাত। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সমর সেন, সুকান্ত ভট্টাচার্য ও গোড়ার দিককার সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও বিশেষ ধারার উল্লেখ্য কবি। এ ক্ষেত্রে প্রগতি, কালি-কলম, কল্লোল, পরিচয় পত্রিকার অবদানও অবশ্য স্বীকার্য। শরৎচন্দ্র, অন্নদাশঙ্কর রায়, গোপাল হালদার, নরেশ সেনগুপ্ত, তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু প্রভৃতি গল্প-উপন্যাস ক্ষেত্রে রবীন্দ্রোত্তর যুগস্রষ্টা।

সঙ্গীতের উস্তাদ আলাউদ্দিন পরিবার, উদয়শঙ্কর-রবিশঙ্কর এবং অন্যান্য প্রখ্যাত সঙ্গীতবিদরা আমাদের গৌরব। অবনঠাকুর, নন্দলাল, যামিনী রায় যেমন চিত্রশিল্পে এক সময়ে প্রধান ও অনুকরণীয় ছিলেন, পরবর্তীকালে আমাদের দেশে জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান প্রমুখও অসংখ্য চিত্তে চিত্রশিল্পের অনুরাগ জাগিয়েছেন, তৈরি করেছেন অনেক চিত্রকর, ভাস্কর। তাঁদের সমকালেই আমিনুল ইসলাম, এস.এম. সুলতান প্রমুখ বিভিন্ন শিল্পী খ্যাতিমান হয়েছেন। চলচ্চিত্র ক্ষেত্রেও আমাদের বাঙলাদেশীরা ক্রমোৎকর্ষের দিকে এগুচ্ছেন। এখন গণজাগরণ-লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ফিল্ম তৈরি হচ্ছে। এঁদের আদর্শ সত্যজিৎ রায় যিনি কৃতিত্বে বিশ্বজিৎ ও বাঙালীর গৌরব। ভাস্কর রামকিঙ্করও অবশ্য স্মরেণ্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাট্যকারের মধ্যে ক্ষীরোদ প্রসাদ, গিরীশঘোষ, ডিএল রায় প্রমুখ রবীন্দ্রনাথের মতো উঁচুমানের তাত্ত্বিক নাট্যকার না হলেও বাঙলা নাট্য সাহিত্যকে এবং নাট্য মঞ্চকে এঁরাই ঋদ্ধ করেছিলেন। বিজন ভট্টাচার্য, তুলসী লাহিড়ী, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন, উৎপল দত্তের অবদান জনজাগরণের ক্ষেত্রে অবশ্য স্বীকার্য। এঁরা আমাদের এখানেও প্রেরণার উৎস। আমাদের মধ্যে একালে কয়েকজন ভালো নাট্যকারের আবির্ভাব ঘটেছে আবদুল্লাহ আলমামুন, মামুনুর রশীদ, সেলিম আলদীন প্রমুখ কয়েকজনের খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা দেখে মনে হয় এঁরা দর্শক-শ্রোতার মনোরঞ্জনে সফল হয়েছেন। সবচেয়ে বড় কথা এঁরা গ্রুপ থিয়েটারের স্রষ্টা। এক্ষেত্রে রয়েছে অনেক নাট্যকার অভিনেতাদের সক্রিয় উদ্যোগ ও অবদান। হিন্দুসমাজে যেমন প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বসুমতী সাধারণ পাঠকের প্রয়োজন মিটিয়েছে, তেমনি মুসলিম সমাজেও মুসলিম ভারত, কোহিনুর, নবনুর আল-ইসলাম, সওগাত, মোহাম্মদী, ছায়াবীথি, বুলবুল, সমকাল প্রভৃতি মুসলিম পাঠকের চাহিদা মিটিয়েছে।

রাজনীতি ক্ষেত্রে বিপিনপাল, চিত্তরঞ্জন দাশ, সুভাষ বসু, যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত, এ.কে. ফজলুল হক, স্যার সলিমুল্লাহ, শহীদ সোহরাওয়ার্দী, খাজা নাজিমউদ্দীন, পরে আমাদের রাষ্ট্রে ভাসানী, মণি সিংহ, মোহাম্মদ তোয়াহা, শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ জনমত নিয়ন্ত্রিত করেছেন। এখানে উল্লেখ্য যে জনপ্রিয়তায় সুভাষচন্দ্র বসু ও শেখ মুজিবুর রহমান রাজনীতি ক্ষেত্রে এ শতকের শ্রেষ্ঠ বাঙালী, ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও তাঁরা আক্ষরিক অর্থেই বঙ্গগৌরব।

শিক্ষার প্রসার দ্রুততর হয়েছে। ব্রিটিশ আমলে ছিল একটি মেডিক্যাল কলেজ ও একটি প্রকৌশল কলেজ। এখন আমাদের রাষ্ট্রেই নয়/দশখানা বিশ্ববিদ্যালয়, অনেক মেডিক্যাল কলেজ ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ললিতকলার ও চিত্রকলার, নাট্যকলার স্কুল কলেজ হয়েছে ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে পঠন-পাঠনেরও রয়েছে ব্যবস্থা।

আমাদের ইতিহাস, দর্শন, সমাজবিজ্ঞান, অর্থবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিদ্বান-অধ্যাপক লিখিয়ে রয়েছেন। আর সাহিত্য ক্ষেত্রে চার শতের মতো কবি, শতোর্ধ্ব গল্পকার, অর্ধশত ঔপন্যাসিক, ত্রিশ-চল্লিশজন খ্যাত-অখ্যাত নাট্যকার । বহু প্রবন্ধকার ও কলাম লেখক। ছড়াকারও আছেন, রম্য-রচনাকার বিরল। গবেষকদের অধিকাংশই অধ্যাপক। এ গবেষণা-প্রবণতা নয়, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পি.টি. মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিটি যেমন আবশ্যিক, তেমনি কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ-ডি দরকার পদোন্নতির জন্যে। কেননা অভিসন্দর্ভ রচনার পরে বিজ্ঞানে কিংবা অন্য বিষয়ে নিরন্তর গবেষণায় রত বিদ্বান দেশে বিরল। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিদ্বান আমাদের দেশে এখনো বিরলতায় দুর্লক্ষ্য। তবু ইতিহাসের ক্ষেত্রে ও সাহিত্য ক্ষেত্রে দু'চারজনের রচনা দেশের বাইরে মূল্যবান বলে স্বীকৃত হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ে বিদ্বান বলে যাঁদের খ্যাতি রয়েছে আমরা অজ্ঞ বলে তাঁদের কৃতির খবর জানি না। তাই সাহিত্য ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে যাঁরা দেশের বাইরেও কৃতী বলে সুপরিচিত, তাঁদের নামও উচ্চারণ করলাম না। উল্লেখ্য যে কেবল ঘন ঘন বিদেশী সেমিনারে নিমন্ত্রিত হলেই বিদ্বান বলে খ্যাতি ছড়ায় না। ব্যক্তিক পরিচিতি বাড়ে বটে।

আমাদের অতীত যেমন উজ্জ্বল নয়, বর্তমানও নয় গৌরব-গর্বের। কিন্তু আমাদের ভবিষ্যৎ বিদ্যায় ও বিত্তে অবশ্যই বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বাধিকারে গৌরবের ও গর্বের, সম্মানের ও শংসার দাবিদার হবে। আমরা বাঙলাদেশ অঞ্চলের বাঙালীরা প্রায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবক্ষেত্রেই নতুন শিক্ষা-সম্পদ প্রাপ্ত ভুঁইফোড় লুম্পেন বুর্জোয়া। আমাদের পর প্রজন্মের বাঙলাদেশ রাষ্ট্রের বাঙালীরা মনে-মগজে-মননে-মনীষায় উৎকর্ষ লাভ করবে এবং জ্ঞানের, বিজ্ঞানের, অর্থের, বাণিজ্যের এবং গবেষণার, দার্শনিক চিন্তা-চেতনার ও সাহিত্যের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পনেরো শতকে তাঁদের কৃতিতে ও কীর্তিতে নিজেদের ও দেশকে ধন্য ও খ্যাতিমান করবেন।

কেননা বাঙালীরা সাধারণভাবে মগজী বলে স্বীকৃত। তাই পনেরো শতকে আমাদের অনেক ভরসা। বিজ্ঞানচর্চা ও বিজ্ঞানমনস্কতা আমাদের মনের ও বুদ্ধির মুক্তি ঘটাবে আমাদের মধ্যে যৌক্তিক ও বৌদ্ধিক জীবনপ্রীতি জাগাবে। আর দারিদ্র্য যেহেতু মানবিক গুণের বিনাশ ঘটায়, সেহেতু আমাদের বাণিজ্যে ধনী হতে হবে। বিজ্ঞান ও বাণিজ্য হবে আমাদের পুঁজি ও পাথেয়।

সংস্কৃতি হচ্ছে বৃক্ষপত্রের মতো নিত্যনতুন কিশলয় হয়ে দেখা দেয়। সংস্কৃতি নতুন চেতনার, নতুন চিন্তার এবং মানস ও ব্যবহারিক জীবনের স্থান-কালের প্রয়োজনবোধের সৃষ্টি। সংস্কৃতি এককথায় চলতি দিনের মতো, বহমান সময়ের মতো, বর্ধিষ্ণু বয়সের মতো, প্রবহমান জলের স্রোতের মতো জীবন-জীবিকার এককথায় জীবনধারারই আনুষঙ্গিক ফুল, ফল ও ফসল। এ অর্থে জীবন চেতনার ও জীবনযাত্রার গুণে-মানে-মাপে-মাত্রায় উৎকর্ষ, সৌকর্য, স্বাচ্ছন্দ্য, সাচ্ছল্য, সৌন্দর্য প্রভৃতির বিকাশ ও বিস্তারশীলতাই সংস্কৃতি। এ সংস্কৃতি একের মনীষাপ্রসূন এবং অন্যদের আচারে আচরণে ব্যবহারে রূপায়ণ-বাস্তবায়ন মাধ্যমে প্রকটিত। আবিষ্কারে-উদ্ভাবনে-সৃষ্টি-নির্মাণে যিনি বা যাঁরা সমর্থ তাঁরাই সংস্কৃতির জনক বটে, কিন্তু সংস্কৃতিতে যেহেতু রয়েছে মানব-উত্তরাধিকার, সেহেতু অন্যরা তা অনুকরণে অনুসরণে গ্রহণে বরণে সে-সংস্কৃতি আত্তীকৃত, সাঙ্গীকৃত বা আত্মীকৃত করে সংস্কৃতিকে নিজের করে নেয়। এ জন্যে পৃথিবীর কোন সভ্য জাতিরই অবিমিশ্র স্বসৃষ্ট কোন সংস্কৃতি নেই। কেবল অস্তিত্ব হারাবার ভয়ে প্রাণীর স্তরের অনুন্নত গোত্র, গোষ্ঠী, উপজাতি, আদিবাসীরাই গ্রহণবিমুখ থেকে আদি ও আদিম স্তরে থাকাটাই শ্রেয়স বলে মানে এবং নিজেদের বিজ্ঞানের, সভ্যতার, সংস্কৃতির মানস ও ব্যবহারিক ভোগ-উপভোগ ও সম্ভোগ থেকে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত রাখে। সংস্কৃতিমান উদার, যুক্তিনিষ্ঠ, বিবেকী-সংযমী সহিষ্ণু সজ্জন হয়। ভারতবর্ষের তথা বাঙলারও সংস্কৃতিতে সভ্যতায় সুপ্রাচীনকাল থেকে ইরানীর, গ্রীকের শক-হূন-কুষাণের, তুর্কী-মুঘলের ও য়ুরোপীয় নানা জাতির বিশেষ করে ইংরেজের প্রভাবের লেশ ও রেশ আজো বিলীন হয়নি। এখনতো শিক্ষিত লোকের সংস্কৃতি ও ব্যবহারিক জীবনযাপন য়ুরোপীয় আদলে গড়ে উঠছে।

আমরা বাঙালীরা উদ্ভাবনে নয়, গ্রহণে-বরণে, অনুকরণে-অনুসরণেই রয়েছি সমকালীন সংস্কৃতি-সভ্যতার সঙ্গে সংযুক্ত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে একালেই বহির্বিশ্বে ঘটেছে দুটো বিশ্বগ্রাসী মহাযুদ্ধ। ১৩২৪ সনে মানবমুক্তির নিশান ওড়ে সোভিয়েট রাশিয়ায়। আবার এর বিলুপ্তি ঘটে চৌদ্দ শতকের প্রান্ত পর্বে। বিজ্ঞানের ও প্রযুক্তির বদৌলত আমাদের দেহ-প্রাণ-মন-মনন, জীবন-যাপন পদ্ধতি পেয়েছে নিরাপত্তার ও স্বাচ্ছন্দ্যের নতুন আশ্বাস। আমাদের শাস্ত্র, সমাজ, ভাষা, জীবনচেতনা অন্যদের থেকে পাওয়া। তবু এর মধ্যেই আমাদের স্থানীয় ও জাতীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে আমাদের ভৌগোলিক অবস্থানের ও পরিবেষ্টনীর কারণে। যেমন আমাদের ঢেঁকি এ সেদিনও গোটা উপমহাদেশে ছিল অতুল্য। আমাদের চরকা, ধুনন যন্ত্র, রেশমচাষ, বয়নশিল্প, মসলিন বস্ত্র, চট্টগ্রাম বন্দরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্বের বহুদেশের জন্যে জাহাজ নির্মাণ শিল্প প্রখ্যাত ছিল। কাগজ তৈরির জন্যে ব্যবহৃত উপকরণ ও তৈরির পদ্ধতি, আমাদের টেরাকোটা শিল্প, আমাদের বাঁশ-বেতযোগে তৈরি দারু শিল্প, হাতী ধরার, হাতীর চিকিৎসার ও প্রশিক্ষণের কৌশল, আমাদের শঙ্খ নিয়ে শাঁখা তৈরির নৈপুণ্য, আমাদের লবণ ও চুন তৈরির কৌশল আমাদের বাঙালীর নিজেদের মৌলিক অবদানের সাক্ষ্য সংস্কৃতি-সভ্যতার ক্ষেত্রে। বাঙলাভাষী মাত্রই অর্থাৎ যে-কেউ বাঙলাকে স্বদেশে বিদেশে মাতৃভাষারূপে বরণ করবে, সে-ই বাঙালী এবং আমাদের জাতি। ভাষার বন্ধনে আমরা পরস্পরের আত্মীয়, রাজা বদলায়, রাজ্যসীমার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। রাষ্ট্রের নামও পালটায়, কিন্তু জাতির নাম ও সত্তা অটুট থাকে। আমরা বাঙালী ছিলাম, আছি, থাকব। আমাদের ঢাকার সাংস্কৃতিক আচারের ও রুচির উৎকর্ষের ও বিকাশের নিদর্শন হচ্ছে সাহিত্যে, ফুলে, নাচে, গানে, অভিনয়ে, চিত্রে এবং কল্যাণকর যন্ত্রের ও প্রযুক্তির প্রকৌশলের আর নতুন চেতনার-চিন্তার আদরে কদরে আমাদের আকর্ষণ।

[বাংলা একাডেমী পনেরো শতকের নববর্ষের প্রথমদিনে যে-ভাষণ পড়তে দেয়নি, এটি সেই লেখা।]

AMARBOI.COM

জীবন

'আমি আছি, বিশ্ব আছে। রক্তে রক্তে জীবন নাচে। মৃত্যু কোথা বল?' এমনি মনোবল নিয়ে জীবনকে মহামূল্য সম্পদ হিসেবে বরণ করে নিতে হয়। এ-ও জানতে হয় যে, জীবনকেও শিল্পকর্মের মতোই সুন্দর শোভন সুষম সুডৌল ও কেজো করে বুনতে হয় সযত্ন প্রয়াসে সচেতনভাবে। জীবনের একটা শিল্পসম উপযোগ আছে। কাজেই জীবনের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচার-আচরণ-বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা, ভয়-ভক্তি-ভরসা যুক্তিযোগে বাছাই বর্জন অর্জন প্রভৃতি সবকিছু ধীরবুদ্ধি, স্থিরসিদ্ধান্ত, সংযম, সহিষ্ণুতা ও সৌজন্য দাবি করে। জীবনে ঘরে বাইরে সর্বত্র অধিকারের, দায়িত্বের ও কর্তব্যের সীমা লঙ্ঘন উপেক্ষা করতে নেই। যে লোক স্বাধিকারে সুস্থির থাকে, দায়িত্ব ও কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে সাধ্যমতো পালন করে, তাকে স্ত্রী-সন্তানরা পরিবার-পরিজনেরা ও প্রতিবেশীরাও গুরু-পীরের মতো ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। যারা যৌথজীবনের দায়িত্ব, কর্তব্য, অধিকার এবং উপযোগ সম্বন্ধে সচেতন নয়, তাদের প্রতি তাদের পড়শীর নয় কেবল, দারা-পরিবারেরও থাকে বিরক্তি-বিরূপতা, উপেক্ষা-অবজ্ঞা-অবাধ্যতা। এমনি মানুষের পারিবারিক কিংবা সামাজিক মূল্য-মর্যাদা নেই। তাকে অন্যরা প্রাণী বলে মানে, মানুষ বলে জানে না। পরিচিতদের প্রিয় থেকে অখ্যাত হয়ে মরা ভালো কুখ্যাত হয়ে স্মরেণ্য হওয়ার চেয়ে। এ ধরনের মানুষ সমাজের দায়, পরিবারেরও সম্পদ নয়, জীবনকে শিল্পের রসের মতো, শিল্পের রূপের মতো, শিল্পের অনুভব-উপলব্ধির মতো ভোগ, উপভোগ ও সম্ভোগ করতে হয়, জানতে হয়। জীবনও অনুশীলন সাপেক্ষ অনায়াস লভ্য ও লব্ধ নয়। জীবন অন্যপ্রাণীর মতো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বার্থে ব্যয় করা চলে না। পরার্থেও ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ নিয়োগ করতে হয়। সম ও সহ স্বার্থে-বৈরাগ্যে নয়— স্বাধিকারে সংযমে সামাজিক জীবনে পরমত, পরকর্ম ও পর আচরণ সহিষ্ণুতায় ও সৌজন্যে সামবায়িক সহযোগিতায় এবং চাহিদার বিনিময় মাধ্যমে সহাবস্থানের অঙ্গীকার নয় শুধু, আক্ষরিকভাবে অঙ্গীকার পালনে সদাপ্রস্তুত থাকাতেই গড়ে ওঠে মনুষ্যত্বের প্রভাব ও প্রভাবপ্রসূ আদর্শ ও প্রত্যাশিত নির্বিরোধ-নির্বিবাদ-নিরুপদ্রব-নিরাপদ সুজন-সজ্জন অধ্যুষিত মনুষ্যসমাজ। মানুষ এ সমাজেরই স্বপ্ন দেখে, এমনি সমাজে বাসের জন্যে তার সাধ জাগে। এমনি সমাজ গড়ার জন্যে চিন্তক-গণহিতৈষী হৃদয়বান ব্যক্তি আশা রাখে। এমনি ধরনের কাঙ্ক্ষা উচ্চারণে গণমানবের মনে প্রত্যাশা জাগে, ভবিষ্যতের জন্যে আশ্বস্ত থাকে গণমানব। এমনি সমাজই জনগণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক সমাজ। নিরূপায় মানুষ ঘন ঘন বিপরীত আচরণে হতাশ নিরাশ হয়। কিন্তু তাকে আশা নিয়ে বিশ্বাস করে, ভরসা রেখে বাঁচতেই হয়, তাই একজনের কাপট্যে প্রতারিত হয়ে, নতুন করে নতুন বিশ্বাসে ভরসায় অন্যের উপর আস্থা স্থাপন করে। কেননা, মানুষ যৌথজীবনে সামাজিকভাবে পরস্পর নির্ভরশীলতার কারণে ও গরজে নিঃসঙ্গ নিরপেক্ষভাবে বাঁচতেই পারে না। কাজেই বারবার ঠকে ঠকেও বারবার ঠেকে ঠেকেই তাকে কারুর না কারুর সাহায্য-সহায়তা-সহৃদয়তা-সৌজন্যের ও সখ্যের উপর ভরসা করতেই হয়। এভাবেই চলতি উঠতি পড়তি ঝরতি সঙ্কুল পীড়ন-দুঃখ-বেদনা-প্রতারণা ও সুখ আনন্দ শান্তি স্বস্তি জড়িত আবর্তিত থাকে মনুষ্যজীবন। এটি কেবল ব্যক্তি জীবনে নয়, পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, প্রাশাসনিক, আর্থিক, রাষ্ট্রিক জীবনেও, আবিষ্কার-উদ্ভাবন-সৃষ্টির ক্ষেত্রেও জীবনতত্ত্ব তথ্য ও সত্য। সুষ্ঠু সুন্দর জীবন একাধারে ও যুগপৎ অভিন্নাত্মক মনুষ্যত্বের প্রতীক, প্রতিম ও প্রতিভূ। তবু জীবন নির্বিরোধ-নির্বিঘ্ন নয়। প্রবৃত্তিচালিত মানবাকৃতির প্রাণীকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ক্ষমায় বশ করা সম্ভব নয় বলে তার বিরুদ্ধে লড়াই করে সমাজে মনুষ্যত্বের প্রসার ঘটাতে হয়।

মানস-অরণ্যে যুক্তিবাদই সূর্যালোক

আমাদের ঢাকা শহরে মুমীনেরা 'সোবেহ সাদেক'-এ আজানের ধ্বনিতে জাগে। আমাদের ঘুম ভাঙে কাকের অসহ্য কর্কশ ডাকে। শহরে মোরগের 'বাঙ' শোনা যায় না। গাঁয়ে গাঁয়ে তা রমজানে শহুরে সাইরেনের ভূমিকা পালন করে। পৃথিবীতে হাজারো প্রজাতির পাখি আছে। সব প্রজাতির পাখি অবশ্য পৃথিবীর সর্বত্র মেলে না। অরণ্যে, পর্বতে, সমুদ্রে, মরুতে একই প্রকারের প্রাণী নয় কেবল, খনিজ পদার্থও মেলে না। আমাদের ঢাকা শহরে রমনায় শকুন বাস করত, পুরোনো শহরে মিলত অসংখ্য বানর। এখন শকুন-বানর দেখা যায় না। শহরে মানুষ মরার আগে হুতোম ডাকে না, যমদূতরূপে পেচক আসে না। আশ্চর্য, তবু ঘরে ঘরে, পথে এবং হাসপাতালে রোজ অসংখ্য লোক মরে দিনে-রাতে। শহরে কবরস্থানে রাত্রে শ্বেত পোশাকের ফেরেস্তা কিংবা শ্মশানে 'কাটামাথা' প্রেতও কেউ দেখে না। যেমন পার্কে কিংবা বলদা গার্ডেনে অথবা বর্ধিষ্ণু বোটানিক্যাল গার্ডেনে কেউ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখে না কোন জীন-পরী-ভূত কিংবা প্রেত-পিশাচ। ঢাকা শহরে কোন নারীকে সম্ভবত জীনের খপ্পরেও পড়তে হয় না, কোন হিন্দু-বৌদ্ধ নারীর উপর ভর করে না কোন অতৃপ্ত রুষ্ট হিংস্র প্রেতাত্মা। নারীর মধ্যে আজকাল গাঁয়ে-গঞ্জে-শহরে কোথাও কোন 'ডাইনী'ও মেলে না বোধ হয়। স্রষ্টা, সৃষ্টি এবং সেই পুরোনো পৃথিবী সব থাকা সত্ত্বেও, জল-স্থল-বায়ু স্তরে দৃশ্য-অদৃশ্য সব প্রাণীর প্রজন্মান্তর প্রবাহ থাকা সত্ত্বেও ভূত-প্রেত, দেও-দানু, জীন-পরী ও ডান-ডাইনী সব কোথায় পালাল কিংবা কি করে সবংশ বিলুপ্ত হল!

অবশ্য আজো বুনো-বর্বর পার্বত্য আরণ্য মানবসমাজে যাদের আমরা পৃথিবীর পিছিয়ে-পড়া উপজাতি; জনজাতি বা আদিবাসী গোত্র বলে জানি বা অভিহিত করি, তাদের মধ্যে উক্ত সব ভূত-প্রেত-পিশাচ, দেও-দৈত্য-দানব, জীন-পরী-ডাইনী রয়েই গেছে প্রমূর্ত হয়ে। ওদের কেউ কেউ নির্জন নিঃসঙ্গ বিচরণকালে আঁধার কিংবা জ্যোৎস্না পুলকিত গভীর নিস্তব্ধ নিশীথ রাতে দেখে এসব অপদেবতা-উপ ও অরিদেবতাদের। দিনদুপুরে প্রত্যক্ষদর্শীরা এসব বয়ান করে গোত্রের-সমাজের অন্যদের কাছে। ওরা আক্ষরিকভাবে সব বিশ্বাস করে এবং মন্ত্র-মাদুলী, তুক-তাক, ঝাড়-ফুঁক, তাগা-তাবিজ, ধূলিপড়া, পানিপড়, তেলপড়া তথা মন্ত্রপূত ধূলি-পানি-তেলযোগে অপদেবতা আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসাও হয়। আমাদের দেশে এগুলো আজকাল আর মূর্তি ধরে, গাঁয়ে-শহরে কোথাও বিচরণ করে না। তবু শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে প্রায় সব আস্তিকের মানস-অরণ্যে ওদের স্থিতি প্রায় স্থায়ী হয়েই রয়েছে। তাই আমাদেরও গাঁয়ে-গঞ্জে নয় শুধু, শহুরে শিক্ষিত-ধনী-মানী-বেণে-আমলা-বিদ্বান-ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার-উকিল-শিক্ষক-সাংবাদিক-ব্যবসায়ী-রাজনীতিক-বুদ্ধিজীবী-চাকুরেরাও কিন্তু বিপদমুক্তির জন্যে, রোগমুক্তির জন্যে, জীবনে উন্নতির লক্ষ্যে, বাঞ্ছাসিদ্ধির লক্ষ্যে রাশির প্রভাব হ্রাস-বৃদ্ধি-বিলুপ্তি লক্ষ্যে অষ্টধাতুর আঙটি, মন্ত্রপূত ধূলি-পানি-তেলপড়া, তাবিজ-কবজ, তুক-তাক-ঝাড়-ফুঁক আশ্রিত হয়। গণক-নজুম-জ্যোতিষী প্রভৃতির কাছে গিয়ে বহু অর্থ ব্যয়ে ভবিষ্যতের বিপদ ঠেকাতে এবং উন্নতির পথ নির্বিঘ্ন করতে নানা ধাতুর শৃঙ্খল বাহুতে, আঙুলে, গলায় ও কোমরে ধারণ করে। যদিও শহুরে সশরীর ভূত-প্রেত-পিশাচ-দেও-দানু-দৈত্য-জীন-পরী-শনির স্থিতি কেউ একালে কোথাও প্রত্যক্ষ করে না।

পাসপোর্ট-ভিসা সহজে পাবার জন্যে যেমন অর্থের বিনিময়ে মধ্যস্থ করার জন্যে দফতরের লোকদের বিশ্বস্ত মুৎসুদ্দী ধরতে হয়, তেমনি সুপারিশে দোয়ায় আল্লাহর কৃপা-করুণা-দয়া-দাক্ষিণ্য-ক্ষমা পেয়ে বাঞ্ছাসিদ্ধি ত্বরান্বিত করার জন্যে মুমীনেরা জীবন্ত পীরের-দরবেশের কাছে নয় কেবল, দরগাহেও ধর্ণা দেয়। এরশাদের সময়ে এরশাদের আগ্রহে ও নেতৃত্বে পীরের-দরগাহর রমরমা বিস্ময়করভাবে বেড়ে গিয়েছিল। এদিক দিয়ে বিচার করলে এরশাদ শাসনামল কেবল অসততার-প্রতারণার-কাপট্যের-স্বৈর-স্বেচ্ছাচারের ছিল না; পীর-দরবেশ-দরগাহবাদের উজ্জীবনকালও ছিল। যতসব দুর্নীতিবাজ, ঘুষখোর, চোরাকারবারী লোক বিপদ-মুক্তির জন্যে ও চাকুরে সাময়িকভাবে বরখাস্ত হলে পীর-দরবেশ-দরগাহ ও তাবিজ-কবচ, মন্ত্র-মাদুলী, মন্ত্রপূত ধূলি-পানি-তেলপড়া, নানা ধাতুর ও পাথরের অঙ্গুরী আশ্রিত হয়, দেখা যায়, এবং এরা সবাই পরীক্ষা পাশের মাপে-মাত্রায় উচ্চ শিক্ষিত কিন্তু তাদের মনে-মগজে-মননে যুক্তিবাদের ঠাঁই নেই। যদিও মনোভূমের অন্ধকার অরণ্যে যুক্তিচেতনাই সূর্যালোক। শৈশব থেকে শ্রুত-লব্ধ বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা-চালিত গতানুগতিক জীবনাচারে, পালায়-পার্বণে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আচারে-আচরণে অভ্যস্ত এবং শাস্ত্রের প্রসঙ্গ ও তাৎপর্যবিযুক্ত টুকরো টুকরো বিচ্ছিন্ন বিধি-নিষেধ নিয়ন্ত্রিত জীবনে তাদের তাই ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে কোন সঙ্গতি সামঞ্জস্য থাকে না। তারা যুক্তিচালিত নয়, বিশ্বাস ও লাভ-লোভ-স্বার্থচালিত জীবনযাপন করে। তাই মানবজীবন, মানবসভ্যতা, মানববিবেক, মানবমনীষা ও মানবসংস্কৃতি যতটা যৌক্তিক ও বৌদ্ধিক বিকাশে-বিস্তারে-উৎকর্ষে উপযোগঋদ্ধ হতে পারত, তা হয়নি। বিজ্ঞানীর আবিষ্কৃত তত্ত্ব, তথ্য, সত্য ও যন্ত্রে-প্রকৌশলে-প্রযুক্তিতে, চিকিৎসাবিজ্ঞানে আধুনিকতম অবদান মানুষের মনে-মননে-মর্মে যে প্রভাব বিস্তার করতে পারত, তা পারেনি। যুক্তিভীরু বদ্ধচিত্তের বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণার কাঁটাল লোহার খাঁচায় আবদ্ধ গতানুগতিক প্রাত্যহিক জীবনাচারে অভ্যস্ত মানুষের সংখ্যা লাখে নিরেনব্বই হাজার নয়শ নিরেনব্বই জন বলেই। বিদ্যালয়ের বিদ্যা তাই অপচিত হয়েছে, প্রভাবে-প্রয়োগে সার্থক হয়নি, হচ্ছে না। এসব মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রণ করে হাঁচি-কাশি-হুছোট-টিকটিকি, শূন্য কলস, শনি-মঙ্গলবার, তিথি-ক্ষণ-লগ্ন, আর রাশিচক্র। ঈশ্বর-নির্ভর নয় তারা, ঈশ্বর-নিয়ন্ত্রিত নয় যেন তাদের জীবন। তাই তাবিজে কবচে, তুকে তাকে, ঝাড়ে ফুঁকে, পীরে-দরবেশে-সন্তে-দেবতায়-সন্ন্যাসীতে, স্বপ্নে পাওয়া ঔষধে ও দরগায়-তীর্থে তাদের বিশ্বাস-ভরসা।

AMARBOI.COM

দ্বান্দ্বিক অবস্থানে বিজ্ঞান ও বিশ্বাস : যুক্তি ও ভক্তি

ভক্তি ও যুক্তি দুটো দুই ভিন্ন মেরুর প্রসূন। ভক্তির উন্মেষ ও স্থিতি বিশ্বাসে আর যুক্তির উৎপত্তি কারণ-কার্য জিজ্ঞাসায়। কাজেই ভক্তির ও যুক্তির স্থিতি নির্বিরোধ সমন্বয়ের ও সহাবস্থানের হতে পারে না। একাধারে ও যুগপৎ ভক্তির ও যুক্তির সমন্বয়ে ও সহাবস্থানে যারা আস্থা রাখে, তারা ভেজালে-গোঁজামিলে আপোসে কার্যসিদ্ধির কামী। কারণ বিশ্বাসে জাগে ভক্তি, ঘৃণার জন্ম অবিশ্বাসে। বিজ্ঞান কারণ-কার্য জ্ঞান দানে মানুষকে যুক্তিবাদী করে। বিশ্বাসকে যুক্তি দিয়ে সত্য করে তোলার প্রয়াস মাত্রই পুতুলে হাত-পা-চোখ-মুখ-নাক-কান বসিয়ে জীবন্ত ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করার নামান্তর মাত্র। কেননা বিশ্বাসকে পরীক্ষণে-নিরীক্ষণে, পর্যবেক্ষণে-সমীক্ষণে প্রমাণ সম্ভব নয়। বিশ্বাসকে যারা যুক্তিসিদ্ধ করার জন্যে বিজ্ঞানের তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য অনুগ বলে প্রমাণ করার জন্যে তর্কবিতর্ক করে, তারা নিজেদের বিজ্ঞ ও আত্মপ্রত্যয়ী বলে জানে বটে, কিন্তু প্রতিপক্ষের চোখে তারা আশৈশব শ্রুত ও লব্ধ বিশ্বাসের সংস্কারের ধারণার দুর্ভেদ্য দুর্গে বাস করে মাত্র, যেখানে প্রকৃতির নিয়মচেতনা, কারণ-কার্য জিজ্ঞাসা কখনো প্রবেশ পথ পায় না। বিশ্বাসে ক্ষয়ে-ক্ষতিতে-পীড়নে-রোগে-শোকে সহ্য করার মতো প্রবোধ মেলে। বিজ্ঞানে কিন্তু সমাধানের নানা ব্যবস্থা রয়েছে। লীলাময়ের লীলায় নয়, কারণের কার্যেই জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়। বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণার, আন্দাজের, অনুমানের, শ্রুতি-স্মৃতির যুগ অবসিত হচ্ছে বিজ্ঞানের তত্ত্ব, তথ্য, সত্য জানার ফলে এবং নিত্য আবিষ্কৃত, উদ্ভাবিত ও নির্মিত বিস্ময়কর সব যন্ত্রের, প্রকৌশলের, প্রযুক্তির, চিকিৎসা বিজ্ঞানের উৎকর্ষের ও বৈচিত্র্যের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনের উপর প্রভাবের দরুন। যেমন কলেরা-বসন্ত-শিশুমৃত্যুর ওলা-শীতল-ষষ্ঠী দেবতা এখন অস্তিত্ব হারিয়েছে। যক্ষ্মা, সন্নিপাত, হৃদরোগ, ক্যান্সার প্রভৃতির চিকিৎসা সম্ভব হয়েছে। বিশ্বাস তবু বিজ্ঞানবিরোধী। ভক্তিও মানুষকে রাখে আবেগাভিভূত। এসব মানুষের জগৎ ও জীবন সম্বন্ধীয় মত-পথ-সিদ্ধান্ত বিজ্ঞানের, প্রকৃতির, যুক্তির, কার্য-কারণ জিজ্ঞাসাতত্ত্বের বিরোধী বা বিপরীত। বিশ্বাসে সুখে-দুঃখে, আনন্দে-বেদনায়, রোগে-বিপদে প্রবোধ মেলে। কিন্তু যুক্তির প্রয়োগে এবং বিজ্ঞান-উদ্ভাবিত উপায়ে রোগের চিকিৎসাদি নানা সমাধান মেলে। বিশ্বাস আস্তিক্যেরও উৎস ও ভিত্তি। বিশ্বাস যে যুক্তিবিরোধী ও আবেগনির্ভর তার একটা সামান্য প্রমাণ আমাদের সামাজিক জীবন থেকেও দেয়া যায়। আমরা মনে জানি ও বুঝি যে দুনিয়াতে লাভ-লোভ-স্বার্থচেতনা ভাইকেও বিয়ের পরে অর্থাৎ এক বিশেষ বয়সের পর স্বতন্ত্র বা বিচ্ছিন্ন ও স্বার্থপর করে তোলে। ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই বাস করে এবং আমরা বাস্তব অভিজ্ঞতা যোগে জানি যে অর্থ-সম্পদ দিয়ে নিরন্ন-বিপন্ন আত্মীয়কে সাহায্য-সহায়তা করার জন্যে যথাকালে যথাস্থানে যথাপ্রয়োজনে চাচা-মামা-মেসো মেলে না। আমরা আরো জানি ও বুঝি যে শাসক-শাসিত, ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত-মূর্খ, খাতক-মহাজন, প্রভু-ভৃত্য, স্বদেশী, স্বজাতি, স্বধর্মী, স্বভাষী, স্বপ্রতিবেশী হলেও আলাদা জাত। আমাদের আত্মীয়স্বজনের অপ্রত্যাশিত অনাত্মীয়সুলভ কর্মের, আচরণের তিক্ত অভিজ্ঞতা আমাদেরই শিখিয়েছে যে, 'আপন থেকে পর ভালো, পর থেকে বন ভালো'। এ তো আমরা জানি, 'নিজে ভালো তো জগৎ ভালো। আপ ভালা তো জগৎ ভালা।' এসব সত্ত্বেও আমরা ওই শাস্ত্রিক বিশ্বাসের ঐক্যে বা সাদৃশ্যে বা অভিন্নতায় উত্তেজনা-প্ররোচনা কিংবা প্রণোদনা-প্রবর্তনা বশে সব ভেদভিন্নতা ভুলে দ্বেষ-দ্বন্দ্ব, ঈর্ষা-অসূয়া-ঘৃণা-অবজ্ঞায় সঞ্চারিত আবেগে হঠাৎ কেবল ইহুদী, কেবল খ্রীস্টান, শুধু হিন্দু [বর্ণভেদ ও উপাস্যের বিভিন্নতা সত্ত্বেও], শুধু বৌদ্ধ, শুধু জৈন, শুধু মুসলিম হয়ে যাই। বিশ্বাসের ভিত্তিতে আকস্মিকভাবে একক ভ্রাতৃত্ব বোধে এককাট্টা হয়ে যাই, যদিও নিজেদের মধ্যে ভেদ-বিরোধ-বিবাদের, দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-সংঘাত-মামলার অন্ত নেই।

সাম্প্রদায়িক দ্বেষ-দ্বন্দ্বের দাঙ্গার ক্ষেত্রে অভিন্ন নামের শাস্ত্রে বিশ্বাসীর এ আকস্মিক সংহতি এবং জোট বেঁধে ভিন্নশাস্ত্রে বিশ্বাসী সম্প্রদায়কে নির্বিচারে হত্যায়, লুণ্ঠনে ও জ্বালানো-পোড়ানোর বিজয়ের-উৎসবের উল্লাস বোধ করার এ আবেগকেই বলে সাম্প্রদায়িকতা বা বিজাতি-বিধর্মী-বিভাষী-বিদেশী বিদ্বেষ। প্রখ্যাত মনস্বী ঐতিহাসিক বিপান চন্দ্র প্রদত্ত সংজ্ঞায় সাম্প্রদায়িকতা হচ্ছে 'খুব সহজ কথায় সাম্প্রদায়িকতাবাদ হলো এমন এক বিশ্বাস যে একদল মানুষ একটি বিশেষ ধর্মে বিশ্বাস করলে তাঁদের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক স্বার্থ সব একই হয়।' যদিও অন্য সময়ে প্রত্যেকেরই থাকে ব্যক্তিক স্বার্থ চেতনা এবং ভাব-চিন্তা-কর্ম, আচরণ থাকে স্ব স্ব ব্যক্তিক ধাঙ্কা অনুগ।

বিপান চন্দ্র আরো বলেন, সাম্প্রদায়িকতা হলো সেই বিশ্বাস যা অনুযায়ী ভারতে হিন্দু, মুসলিম, ক্রিশ্চান ও শিকরা বিভিন্ন ও স্বতন্ত্র সম্প্রদায়। যারা স্বাধীনভাবে এবং স্বতন্ত্রভাবে বিন্যস্ত এবং সংহত। [বিপান চন্দ্র আধুনিক ভারত ও সাম্প্রদায়িকতা, কে. পি. বাগচী এ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা-১২, ১৯৮৯, পৃ: ১] অতএব, শাস্ত্রে বিশ্বাসী আস্তিক মানুষ কোন অবস্থাতেই মানুষকে মানুষ রূপে, ব্যক্তি হিসেবে গ্রহণ করতে পারে না—কেবল ভিন্ন গোত্রের, দলের, মতের, আচারের, ভাষার, নিবাসের লোক হিসেবেই অন্তরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গভীরে পর ও সম্ভাব্য শত্রুরূপে জানে ও মানে। কাজেই আস্তিক মানুষ সাধারণভাবে দল বা সম্প্রদায় সচেতন, ক্বচিৎ কেউ পরম উদারতায় সংযমে, সহিষ্ণুতায়, সৌজন্যে, হৃদয়বানতায় সুজন ও সজ্জন। আমাদের জীবনে বিজ্ঞানের ও বিশ্বাসের এবং যুক্তির ও ভক্তির দ্বান্দ্বিক অবস্থান প্রগতির বাধা। বোঝা যাচ্ছে— মানব জীবনে ও সমাজে বাঞ্ছিত পরিবেশ ও প্রতিবেশী তৈরি করতে হবে, আমাদের বিজ্ঞান-নির্ভর ও যুক্তিনিষ্ঠ হতে হবে এবং পরিহার করতে হবে অবৌদ্ধিক-অযৌক্তিক বিশ্বাস ও ভক্তি। মানুষের সামাজিক-সাংস্কৃতিক-বৈষয়িক-রাষ্ট্রিক জীবনে শ্রেয়স নিহিত রয়েছে— নতুন চেতনায়, নতুন চিন্তায়, মুক্ত বুদ্ধিতে ও মুক্ত মননে। বিজ্ঞান মানুষকে করে বিজ্ঞ, বিশ্বাস রাখে মুগ্ধ।

আমাদের আধুনিক হতে হবে সর্বপ্রকারে

যে কোন দেশের বা গোত্রের, সমাজের, সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি-সভ্যতার বিবর্তন ধারা লক্ষ করলেই যা অনুভূত ও উপলব্ধ হয়, তা হচ্ছে স্থানিক ও কালিক জীবনের প্রয়োজন-চেতনার গুরুত্বই ব্যক্তির ও সমাজের ভাব-চিন্তা-কর্ম প্রভাবিত করে। আমরা যদি প্রাচীন মিশর থেকে গ্রেকো-রোমান কিংবা মেসোপোটেমিয়ান থেকে ভারতের অথবা চীনের থেকে ইন্দোনেশিয়ান জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে বিশ্বাস-সংস্কার ধারণার বিবর্তন ধারার সঙ্গে তাদের শিল্প-স্থাপত্য-ভাস্কর্য চিত্র এবং সাহিত্য-সঙ্গীত, শাস্ত্রিক ও সামাজিক নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ, প্রথা-পদ্ধতি-প্রভৃতির বিবর্তন ধারা তুলনা করি, তা হলে সাদৃশ্য খুঁজে পাবই।

এককালে মানুষ ভূতে-ভগবানে, প্রেতে-পিশাচে, দেবতা-উপদেবতা-অপদেবতাতে, নিয়তি নামে শক্তিতে, জীবনের অরি-মিত্র অদৃশ্য-অলৌকিক-অলীক শক্তিতে আস্থা রাখত। এগুলোকেই জীবন-জীবিকা ক্ষেত্রে নিয়ামক-নিয়ন্ত্রক শক্তি বলেই জানত। আত্মশক্তিতে কোন আস্থাই সে-দিনকার মানুষের ছিল না। অজ্ঞ-অসমর্থ মানুষ রোগের প্রতিষেধক খুঁজে পায়নি, লাভ-ক্ষতির কারণ ছিল অজ্ঞাত। কাজেই স্তবে-স্তুতিতে, তোয়াজে-তোষামোদে অদৃশ্য অরি-মিত্র শক্তিকে বশে রেখে তাদের রোষমুক্তির ও কৃপাপ্রাপ্তির প্রয়াসী ছিল। এভাবেই শিল্পে-সাহিত্যে জীবনাচারে-আচরণে, মনে-মগজে-মননে অজ্ঞেয় বিস্ময়-কল্পনা-বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা এবং স্থানিক ও কালিক পরিবেশে জীবন রক্ষণের, লালনের ও আত্মশক্তির বিস্তারের প্রয়োজন শিল্পে-সাহিত্যে অভিব্যক্তি পেয়েছে। অতএব, কেবল আসবাব-তৈজস, ঘর-বাড়ি অন্ন-বস্ত্র নয়, মানসিক চাহিদা পূরণের প্রয়োজনও মানুষকে রুচি, সৌন্দর্য, আনন্দ চর্চায় অনুপ্রাণিত করেছে। সংস্কৃতির অতীত ও স্থিতরূপই যদি সভ্যতা হয়, যেমন রাজনীতি কালান্তরে হয় ইতিহাস, তা হলে মানতেই হবে যে সভ্যতা-সংস্কৃতি প্রবহমানতা রয়েছে, রয়েছে তার বিবর্তনের পরিবর্তনের ধারাবাহিকতা। শাস্ত্র, সমাজ, সংস্কৃতিও তাই অজ্ঞের আবর্তনপ্রিয়তা, রক্ষণশীলতা, অভ্যস্ত গতানুগতিকতাপ্রীতি সত্ত্বেও সৃষ্টিশীল জিজ্ঞাসু কৌতূহলী আবিষ্কারক উদ্ভাবক নতুন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিন্তায় প্রবুদ্ধ হয়ে নতুন সৃষ্টিতে, নতুন রুচিতে, নূতন সৌন্দর্যে, সৌকর্যে, উৎকর্ষে জীবনাচারকে জীবনযাত্রার রীতি-রেওয়াজকে উন্নততর করে তোলে।

ফলে পুরোনো শাস্ত্র পরিত্যক্ত, কিংবা পরিবর্তিত অথবা পরিমার্জিত হয়, পুরোনো আচার-আচরণ পরিহার্য হয়, কিংবা সংস্কারে-সংশোধনে রূপান্তরিত হয়, তেমনি বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা ও জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তির প্রভাবে ও প্রয়োগে পরিবর্তিত হয়, নতুন চেতনার ফুল-ফল-ফসলরূপে জীবনযাপন পদ্ধতি নব ও উৎকৃষ্ট ধারায় প্রচলন হয়। এভাবে সভ্যতা এগিয়েছে। পুরোনো সভ্যতা-সংস্কৃতির উদ্ভবক্ষেত্রে যখন ব্যক্তি ও সমাজ নিষ্ক্রিয়তায় স্বেচ্ছায় রক্ষণশীল হয়ে বদ্ধচিত্ততায় আত্মপ্রসাদ লাভে অর্থাৎ পিতৃধন নির্ভর অলস জীবনে তুষ্ট ও তৃপ্ত থেকেছে, তখনই অবক্ষয় শুরু হয়েছে সে দেশের ব্যক্তির ও সমাজের সংস্কৃতি-সভ্যতার। তখন থেকে ওইসব অযোগ্য, অলস, অসমর্থ, জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধিরিক্ত লোকেরা তথা জাতি অতীতের ঐতিহ্যের আস্ফালনে বিদ্যমান দুরবস্থান আর্তনাদ ও গ্লানি ঢাকবার চেষ্টা করে উচ্চকণ্ঠে। বর্তমান তার বন্ধ্যা ও রিক্ততায় বিকৃত, ভবিষ্যৎ তার স্বপ্নহীন, কাজেই অতীতের ও ঐতিহ্যের গৌরব-গর্বের আস্ফালন, স্মরণ ও রোমন্থনই তাঁর বাঁচার পুঁজি।

যে যোগ্য, জ্ঞানে যারা বুদ্ধিপুষ্ট, যুক্তি নিষ্ঠায় যে ঋদ্ধ, সৃষ্টিতে যার আগ্রহ প্রবল, আবিষ্কারে-উদ্ভাবনে যে উদ্যমশীল ও উদ্যোগী সে স্বকালে স্বদেশে স্বনামে চলে আত্মপ্রত্যয়ী উন্নতশির ব্যক্তি হিসেবে। তার যেমন পিতা-পিতামহের নামে চলার প্রয়োজন হয় না, নিজেই স্বমানে স্বগর্বে চলতে পারে, তেমনি বিজ্ঞানে-বাণিজ্যে অগ্রসর এ কালের কোন দেশ বা জাতি বারোমাস অতীত ও ঐতিহ্য স্মরণে-রোমন্থনে সময় নষ্ট করে না। তারা জানে এক কালের যা সম্পদ কালান্তরে স্থানান্তরে তা উপযোগ হারায়। এ জন্যেই তারা স্বসংস্কৃতির, স্বশাস্ত্রের, স্বআচারের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্যে আত্মঅস্তিত্ব ও পরিচিতি অক্ষুণ্ন রাখার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে না। এ যুগে এটা হীনম্মন্যতার ও বন্ধ্যাত্বের আর সমকালীন জীবনচেতনার এবং কালের ও জীবনের দাবি সম্বন্ধে অসচেতনতার লক্ষণ মাত্র। আমাদের জীবনমুখী, স্বদেশের স্বপ্রজন্মের মানুষের দেহ-প্রাণ-মনের ও মননের দাবি মেটানোর প্রয়াসী হতেই হবে। বিজ্ঞানে-বাণিজ্যে গুরুত্ব দিতে হবে। বৈশ্বিক স্তরে আন্তর্জাতিক জীবনযাত্রার সঙ্গে সমতা রক্ষা করে চলতে হবে। আমাদের চেতনায়-চিন্তায়-কর্মে-আচরণে, উদ্যমে-উদ্যোগে-আয়োজনে সভ্য জীবনবাদী হতে হবে। জাগতিক জীবনের শ্রেয়স ও প্রেয়স চেতনাই হবে আমাদের ভাব-চিন্তা-প্রয়াসের দিশারী। আমরা কালের প্রভাব স্বীকার করব, আমরা আধুনিক হব, আমরা কল্যাণকর ভাব-চিন্তা-প্রকৌশল-প্রযুক্তি, যন্ত্র ও চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রভৃতিকে মানব-উত্তরাধিকার হিসেবে নির্দ্বিধায় নিঃসংকোচে গ্রহণ-বরণ করব।

তা হলেই আমরা যুগোপযোগী জীবনযাপনে সমর্থ হব। এবং আমাদের দুস্থ দরিদ্র নিঃস্ব নিরন্ন মানুষেরা বাঞ্ছিত স্তরের জীবনযাপনে হবে সমর্থ। আমরা আধুনিক হব সর্ব প্রকারে শোষিত-বঞ্চিত-পীড়িত গণমানবমুক্তির লক্ষ্যে।

তা হলেই আমরা যে মনুষ্যত্বসম্পন্ন মানবিকগুণে ঋদ্ধ মানুষ, তা জগৎ-সভায় প্রমাণ করতে পারব। স্বীকৃত হব এ কালের শিক্ষিত সম্মানিত স্ব স্ব স্বনির্ভর রাষ্ট্রবাসী রূপে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উল্লেখ্য যে; মানুষের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ জীবনের প্রয়োজন, জীবনের চাহিদা-ভাবনা থেকেই উৎসারিত ও জীবন থেকেই উদ্ভূত। Nessecity is the mother of Invension. কাজেই স্থান ও কাল নিয়ন্ত্রিত জীবনে স্থানের ও কালের দাবি উপেক্ষা করা চলে না। মানুষের প্রাজন্মক্রমিক বিবর্তিত জীবনের দান-অবদান হচ্ছে সভ্যতার ও সংস্কৃতির সব সৃষ্টি। গতিতে জীবন, স্থিতিতে জরা, জড়তা ও জীর্ণতা। এজন্যেই উপনিষদে জীবনের, প্রাণের পরিচর্যার প্রয়োজনেই উচ্চারিত হয়েছে 'চরৈবেতি।'

পরমত, পরকর্ম ও পরআচরণ সহিষ্ণুতা

আমরা পরিবারে, সমাজে ও কর্মস্থলে আত্মীয়-স্বজন ও পরিচিতজন নিয়েই আমাদের জীবনের জাগ্রত মুহূর্তগুলো কাটাই। কিন্তু এদের মধ্যে কয়জনই বা আমাদের ব্যক্তিগত পছন্দের লোক, কয়জনই বা আমাদের প্রিয়, কয়জনই বা আমাদের ব্যক্তিগতভাবে আস্থাভাজন, কয়জনই বা আমরা আপদে-বিপদে সহায় বলে ভাবি, কয়জনকেই বা সজ্জন ও সুজন বলে জানি? আমরা বিভিন্ন ব্যক্তি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা ও মত, আমাদের পছন্দ-অপছন্দ, আমাদের আস্থা-অনাস্থা, আমাদের ঘৃণা-অবজ্ঞা-উপহাস সাধারণত অন্তরে গোপনেই পোষণ করি, অকারণে অনর্থক মত-মন্তব্য প্রকাশ করে অন্যের অপ্রিয় হই না, শত্রুর সংখ্যা বাড়াই না।

আসল কথা আমরা ব্যক্তিগতভাবে খুব কম লোকেরই ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচার-আচরণ পছন্দ করি। কিন্তু তাই বলে তাদের প্রতি আমরা অসহিষ্ণু হই না। কেননা তারা আমাদের খায়-পরে না, আমাদের ধার ধারে না। কাজেই আমাদের সংযত, সহিষ্ণু ও তাদের সঙ্গে কথাবার্তায় সুজন থাকতেই হয়। এ সহিষ্ণুতাই, এ শোভন আচরণই হচ্ছে পরিবারে, সমাজে, রাস্তা-ঘাটে, হাটে-মাঠে এবং কর্মস্থলে সহযোগিতায় নির্বিরোধে নির্বিবাদে সহাবস্থানের জন্যে আবশ্যিক ও জরুরী। প্রতিটি মানুষই ভিন্ন ভিন্ন পারিবারিক, সামাজিক, আঞ্চলিক, শাস্ত্রিক, শৈক্ষিক, নৈতিক, সাংস্কৃতিক, আর্থিক অবস্থায় ও অবস্থানে গড়ে ওঠে, কাজেই ব্যক্তিক বৈশিষ্ট্যজাত পার্থক্য ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ভাবে ভাষায় রুচিতে আচারে-আচরণে থাকেই, থাকবেই। এসব তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য স্বীকার করেই আমরা পরের অধীনে, পরের সঙ্গে, পরকে নিয়ে জীবন-জীবিকার সর্বক্ষেত্রে লেন-দেনে, সহযোগিতায় সহাবস্থান করি ঘরে-বাইরে। কাজেই পরমত, পরকর্ম, পরআচরণ, পররুচি, পরচরিত্র অপছন্দ হলেও, গ্রাহ্য করা সম্ভব না হলেও জীবনযাত্রার গরজে সহ্য করে, মেনে নিয়ে বা নিজেকে মানিয়ে নিয়ে চলতেই হয়। নইলে যৌথজীবন সামাজিক-শাস্ত্রিক-নৈতিক-আর্থিক-সাংস্কৃতিক জীবন অচল হয়ে যেত। যে পারে না তাকে সমাজচ্যুত হয়েই থাকতে হয়। নির্বান্ধব নিঃসঙ্গ জীবন-যাপন সম্ভবই নয়। এসব নানা কারণে কোন ব্যক্তি-মানুষেরই বন্ধুসংখ্যা বেশি নয়। এতেই কাজ চলে, মনের স্বাস্থ্য রক্ষা করা চলে, নিঃসঙ্গতা দুঃসহ যন্ত্রণা থাকে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যক্তির বাস্তব জীবনের চিত্র যদি এ-ই হয়, তা হলে এবার মতবাদী সম্প্রদায়ের বা দলের জীবনকেও এই ছাঁচে সাজিয়ে যদি বিচার-বিশ্লেষণ করি, তা হলে একই অবস্থা ও অবস্থান দেখতে পাই। শাস্ত্রিক কিংবা রাজনীতিক কিংবা ব্যক্তিক জীবনদর্শনগত সাম্প্রদায়িক বা দলীয় চিন্তা-চেতনা-কর্ম-আচরণ-লক্ষ্য ভিন্ন ভিন্ন হয়ই। ব্যক্তি-মানুষ তার শাস্ত্র ছাড়া অন্যদের শাস্ত্রগুলোকে ভুল, মিথ্যা, ত্রুটিপূর্ণ বলেই অন্তরে জানে ও মানে, রাজনীতিকও তার দলের মত-পথ-কর্মসূচি ও লক্ষ্যকেই নির্ভুল ও কেজো বলে জানে ও বোঝে। জন্ম-মৃত্যুর পরিসরে সীমিত পার্থিব বা মর্ত্যজীবন সম্বন্ধেও বিভিন্ন দার্শনিকের-কবির-সাহিত্যিকের, বিজ্ঞানীর মত-মন্তব্য ও সিদ্ধান্ত বিভিন্ন ও বিচিত্র। মানুষ তো যন্ত্র নয়, যন্ত্রজাতও নয়, কাজেই সব মানুষ একভাবে ভাবিত হবে না, একরূপ আচরণ করবে না, একই রুচির, বুদ্ধির, যুক্তির, জ্ঞানের, প্রজ্ঞার, সহিষ্ণুতার, সংযমের, সৌজন্যের পরিচয়ও দেবে না। প্রতিটি মানুষ তার বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞান-যুক্তি-বিবেক-বিবেচনা অনুগ মত-পথ-সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জীবনের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ চালিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। এ তথ্য ও সত্য যদি আমরা স্বীকার করি, তা হলে প্রত্যেক মানুষের যে কোন বিষয়ে মত ও অনুভব-উপলব্ধি প্রকাশের অধিকার স্বাভাবিক বলে স্বীকার করে নিতে আপত্তি থাকার কথা নয়। স্রষ্টা, সৃষ্টি, জগৎ, জীবন, শাস্ত্র, বিজ্ঞান, দর্শন, কাব্য, শিল্প, শিক্ষা, ক্রীড়া, ন্যায় প্রভৃতি যে-কোন বিষয়ে ব্যক্তির নিজের বিশিষ্ট তথা ব্যক্তিগত নতুন চেতনার, নতুন চিন্তার ফুল-ফল-ফসল রূপে নতুন তত্ত্ব, নতুন তথ্য ও নতুন সত্য আবিষ্কারের, উদ্ভাবনের, সৃষ্টির, প্রকাশের, প্রচারের এবং মুদ্রিত আকারে প্রচারণার স্বাধীনতা বা অধিকার থাকা আবশ্যিক ও জরুরী। উল্লেখ্য যে পৃথিবীর বিভিন্ন শাস্ত্রগুলোও যাঁরা তৈরি ও প্রচার করেছেন, তাঁরা সবাই পিতৃপুরুষের শাস্ত্র, সমাজ, আচার, নীতি-রীতি, নিয়ম-রেওয়াজ, প্রথা-পদ্ধতি-দ্রোহী। যে-কেউ নতুন কথা বললেই গতানুগতিক চিন্তায়-চেতনায়-আচারে-আচরণে প্রাত্যহিক জীবনে অভ্যস্ত, বাছাই-বর্জন-অর্জনে বিমুখ ব্যক্তিরা তথা সমাজের লোকেরা কাকের মতোই আকস্মিকভাবে হৈ চৈ করে, হামলা করে নতুন কথার প্রবক্তার উপর, নতুন চিন্তার অভিব্যক্তি দানের অপরাধে তার জান-মাল-গর্দান হয় বিপন্ন। অনেককে পালাতে ও প্রাণ দিতেও হয়েছে, এখনো এতো কাল পরেও, সংস্কৃতি-সভ্যতার-বিজ্ঞানের ও জ্ঞানের, প্রজ্ঞার ও যুক্তিবাদের এবং সাংবিধানিক নানা স্বীকৃতির ও নীতি-নিয়মের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও অসংযত, পরমত, পরকর্ম ও পরআচরণ অসহিষ্ণু যুক্তি-বুদ্ধি-জ্ঞান-বিবেকে গুরুত্ব দিতে অস্বীকৃত অবিবেচক গোঁড়া লোকেরা বাক-স্বাধীনতা সহ্য করে না। ব্যক্তিসত্তার স্বাতন্ত্র্য, ব্যক্তির চিন্তার, কর্মের, আচরণের স্বাধিকার স্বীকার করে না। প্রমাণ লাঞ্ছিতা নূরজাহানরা, তসলিমারা! অনির্বাণ শিখা রাখা, ছবিতে বা সমাধিতে, স্মৃতিসৌধে মালা দেয়ার ক্ষেত্রে শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে আপত্তি উত্থাপন। অথচ হজের সময়ে সৌদি রাজ্যে যেতে পাসপোর্টে বারো খানা ছবি প্রয়োজন হয়, মুমীন বাদশাহর দাবিক্রমে। কিংবা মৌলানারা নিজেদের ছবিও ঘরে রাখেন, কাগজে ছাপেন, জীবন-মানুষের ছবি মুদ্রিত থাকে টাকার নোটে। সে নোট বুক পকেটে রেখে নামাজ পড়েন, টিভিও রয়েছে ঘরে ঘরে। সহশিক্ষা, সহ-চাকরি করছে নারী-পুরুষে, দোকানে-বাজারে যাচ্ছে নারী, সিনেমা-নাটক করছে নারী এগুলোতে শাস্ত্রীদের ঘোর আপত্তি রয়েছে। অথচ 'উজ্জীবন' ও 'জীবনের আলো' অনুষ্ঠানে অকারণে সোমত্ত মেয়ে আনা হয়, শবে বরাতে, শবে কদরে, ফাতেহা দোয়াজদমে, ঈদে যুবতী নারী দিয়ে হামদ, নাত, গজল গাওয়ানো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয় রেডিও-টিভিতে। শাস্ত্রীদের এ সম্বন্ধে কোন আপত্তি শোনা যায়নি আজ অবধি। সংসদে নারী সাংসদ নেয়া না-জায়েজ বলেননি কোন শাস্ত্রী মুমীন। আমরা মতের, পথের, কর্মের ও আচরণের সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য কামনা করি মাত্র। সুবিধে মতো জায়েজ, না-জায়েজ বলা ধার্মিকতার-শাস্ত্রনিষ্ঠার পরিচায়ন নয়। ফতোয়াবাজিতে মতলববাজিই প্রকট হয় মাত্র।

সে-ই ধন্য নরকুলে

সে-ই ধন্য নরকুলে/লোকে যারে নাহি ভুলে/—ঘৃণার সঙ্গে নয়, শ্রদ্ধার ও সম্মানের সঙ্গে। মীরজাফরের মতো ঘৃণ্য হয়ে স্মরণীয় হওয়া নিশ্চয়ই কারুর অভিপ্রেত হতে পারে না। কিন্তু আমাদের সমাজে আজ শ্রদ্ধেয়-সম্মানিত হয়ে গুণের মানুষ হিসেবে স্মরেণ্য-বরেণ্য হওয়ার লোক যেন কমে যাচ্ছে দিন দিন। দুষ্ট-দুর্জন-দুর্বৃত্ত-দুষ্কৃতি মানুষের সংখ্যাই শহরে-বন্দরে গাঁয়ে-গঞ্জে পাড়ায়-মহল্লায় যেন বেড়েই চলেছে। এ জন্যে অবশ্য সাধারণভাবে নিঃস্বতা, নিরন্নতা, জীবন-জীবিকাক্ষেত্রে আর্থিক অনিশ্চিতি, বেকারত্ব, ব্যবসা-বাণিজ্যে সরকারে অস্থিতিশীলতা, জান-মাল-গর্দানের অনিরাপত্তা, প্রাশাসনিক শৈথিল্য, অমুসলিমদের নাগরিক অধিকারে সুনিশ্চিতি দানে সরকারী ঔদাসীন্য, ধনী-আমলা-বেণেদের এবং সংখ্যালঘুদের বিদেশে অর্থ-পাচার প্রভৃতি কারণে দেশপ্রেমীর, মানবসেবীর এবং শান্তি-স্বস্তিকামী সজ্জন অথচ দুর্বল নাগরিকের 'সহসা চমক লাগে চিত্তে/দুর্জয় হল প্রতিপক্ষ।' এ ছাড়াও অন্যান্য অনেক বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক প্রভাবজাত কারণও রয়েছে। কোন একক কারণে কিছু ঘটে না।

উনিশ শতকের শেষপাদ থেকে বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া-উদ্ভাবন এবং যন্ত্রসৃষ্টি দ্রুত হতে থাকে। তাতে ঐহিক জীবনে আসে বিস্ময়কর ও আকস্মিক পরিবর্তন। প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার উপকরণে-উপাদানে আসে যান্ত্রিক উৎকর্ষ ও সৌকর্য। ফলে চিন্তা-চেতনার, ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগের ধরন-ধারণ বদলে যায়। জীবিকাক্ষেত্রে এবং সামাজিক লৌকিকতার, আচারের, আচরণের, সাহায্যের, সহায়তার, সহযোগিতার ক্ষেত্রেও ঘটে আমূল পরিবর্তন, নারী-পুরুষের বৈষম্য ও স্বাতন্ত্র্যের ব্যবধানও ঘুচে যায়। য়ুরোপে মধ্যযুগীয় বর্বরতার অবসানে ঘড়ির পেন্ডুলামের মতো আধুনিকতার পরম প্রসাদ রূপে নারী-পুরুষের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে স্বাতন্ত্র্যের, বৈষম্যের, অপরিচয়ের সংকোচের দেয়াল ভেঙে যায়। নারীও পায় পূর্ণ মানুষের মূল্য ও মর্যাদা। নারী-পুরুষের তথাকথিত মগজী পার্থক্যের তত্ত্বে, তথ্যে ও সত্যে আস্থা হারায় নারী-পুরুষ সবাই। সেকেলে শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ য়ুরোপীয় সমাজ অনিচ্ছায় লঙ্ঘন করতে বাধ্য হয় বিজ্ঞানের অবদান প্রকৌশল-প্রযুক্তি-যন্ত্রনির্ভরতার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম পরিণতি হিসেবেই। শাস্ত্রের ও বিজ্ঞানের তত্ত্বে, তথ্যে ও সত্যে বিরোধ বৈপরীত্য দেখা দেয়। শাস্ত্রের সত্যের উৎস ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভিত্তি বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা-ভয়-ভক্তি-ভরসা। আর বিজ্ঞানের তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য অনেক ক্ষেত্রে আজো অপূর্ণ-অশেষ হলেও যতটুকু জানা-বোঝা-মানা গেছে তাতে কোন খাদ নেই। কেননা, তা পরীক্ষায়, নিরীক্ষায়, সমীক্ষায় ও পর্যবেক্ষণে প্রমাণিত। এর ফলে শাস্ত্রোক্ত Morality ও Immorality সম্বন্ধেও যৌক্তিক, বৌদ্ধিক, প্রায়োজনিক ও প্রায়োগিক ধারণা বিবর্তিত ও পরিবর্তিত হতে থাকে, আগের মতো আবর্তিত থাকল না প্রাজন্মক্রমিকভাবে। এমন কি একালে moral ও immoral-এর বিলোপে a-moral পন্থাকেই মুক্তবুদ্ধির ও মর্ত্যজীবনবাদীর মুক্তজীবনপ্রতীক রূপে অনেকের কাছে প্রিয় হয়ে উঠছে য়ুরোপে-আমেরিকায়। তা ক্রমশ প্রতীচ্য চিন্তা-জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রকৌশল-প্রযুক্তি এবং জীবনযাত্রা পদ্ধতি প্রভাবিত তৃতীয় বিশ্বের শিক্ষিত শহুরে মানুষের নারী-পুরুষের জীবনধারণাকে জীবনযাপন পদ্ধতিকে প্রতীচ্য আদলে গড়ে তোলায় অনুপ্রাণিত করেছে ও করছে। নতুন ঘর তৈরির জন্যে যখন পুরোনো ঘর ভাঙা হয়, তখন একটা ধ্বংসাত্মক বিপর্যয় আবশ্যিক হয়। তবু তা নতুনের ও উৎকর্ষের পরিকল্পনাপ্রসূত বলে যারা ভাঙে তাদের কাছে তা আনন্দের ও গর্বের। কারণ তা সাধের ও স্বপ্নের বাস্তবায়ন সূচক। কাজেই এ তাৎপর্যে যে কোন যুগসংক্রান্তি বা যুগসন্ধিক্ষণে নতুন চেতনা-চিন্তাহীন গতানুগতিক জীবনে অভ্যস্ত ও স্থিতিশীলতায় স্বস্থ মানুষের কাছে তা বিধ্বংসী বৈনাশিক বিপর্যয় মাত্র। তাই তারা উদ্বিগ্ন, হতাশ এবং অসহিষ্ণু।

বাস্তবে আমাদের অজ্ঞ-অনক্ষরবহুল দেশে শিক্ষার প্রসারে এবং প্রকৌশল-প্রযুক্তির প্রয়োগে, রেডিও-টিভি-ক্যাসেট-সিনেমা প্রভৃতির বহুল প্রভাবে দ্রুত বিশ্বাসে-সংস্কারে-ধারণায়-আচার-আচরণেও ভয়-ভক্তি-ভরসার অদৃশ্য-অলীক-অলৌকিক অবলম্বন উপযোগ ও আস্থা হারাচ্ছে। ফলে শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন নিত্যকার ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে প্রকট হয়ে উঠেছে, উঠছে। এমন যুগান্তর কালে স্ববিরোধ, বৈপরীত্য, উদারতা, গ্রহণশীলতা, পুরোনো নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজদ্রোহিতা এবং রক্ষণশীলতা, নতুন মত-পথ-পদ্ধতির প্রতি অসহিষ্ণুতা সমাজ-মানসকে অস্থির বিরোধ-বিবাদসঙ্কুল করে তোলে। আমাদের মধ্যেও আজ লেখাপড়া-জানা তথাকথিত শিক্ষিতরাও শ্রুতিস্মৃতি প্রভাবে ও অভ্যাসবশে বৃত্তাবদ্ধ জীবনে স্বস্থ থাকতে চায়। যুক্তি-বুদ্ধি প্রয়োগে এ যন্ত্রযুগে বিজ্ঞানীর আবিষ্কার-উদ্ভাবন-সৃষ্টিঋদ্ধ জগতে আগের বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা-ভয়-ভক্তি-ভরসা প্রভৃতির প্রয়োজন ও উপযোগ আছে কি নেই যাচাই করে না। বিজ্ঞানের প্রসাদ ভোগী হয়েও আজো আমাদের শিক্ষিতরা বিজ্ঞানমনস্ক হয়নি, বিজ্ঞানের তত্ত্বে, তথ্যে, সত্যে আস্থা রাখে না। এমন কি অধিকাংশ বিজ্ঞানবিদ, প্রকৌশলী, চিকিৎসকও কার্য-কারণকে নিতান্ত প্রাকৃতিক নিয়মজাত বলে মনে করে না, কোন অনন্য, অসামান্য, অসাধারণ অজ্ঞেয় নিয়ন্তার বিস্ময়কর অশেষ গুপ্তলীলারই প্রকাশ এবং আবিষ্কার বলে জানে, বোঝে ও মানে। যদিও ভূতে-প্রেতে-মন্ত্রে মাদুলীতে-তাবিজে-কবচে-তুকতাকে মানুষের আস্থা কমে যাচ্ছে। এমনকি আয়ুর্বেদিক ও তিব্বতীয়া চিকিৎসায়ও মানুষ আস্থা হারিয়েছে—এখন ডাক্তারই ভরসা। তাই আমাদের স্থিতি হচ্ছে পুরোনোর ক্রান্তি ও নতুনের সূচনালগ্নে। ফলে আমাদের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে অসঙ্গতি, অসামঞ্জস্য, অবুদ্ধি, অযুক্তি, আবেগ-বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা, ভয়-ভক্তি-ভরসা আর অনিশ্চয়তার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সুপ্রকট। এমনি অবস্থায় ব্যক্তির সমষ্টিতে গড়ে ওঠা সমাজ, সরকার, রাষ্ট্র সুস্থ ও স্বস্থ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকে না, থাকতে পারে না। এ জন্যেই আমাদের সাধারণ চোখে আমরা জীবনের, সমাজের, শাস্ত্রের, সরকারের, প্রশাসনের মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলেছি বলেই ধরা পড়ে। গত শতকে এমনি অবস্থায় দার্শনিক নিটসে সমাজকে পুরোনো মূল্যবোধ পরিহার করে নতুন মূল্যবোধের অনুশীলনের পরামর্শ দিয়েছিলেন। আমাদেরও নতুন মূল্য চেতনার অনুশীলন করতে হবে। বুঝতে হবে যৌথজীবনে পারস্পরিক সহযোগিতায় লেন-দেনে সহাবস্থান করার জন্যে কিছু 'লৌকিকতা'র বা 'আচরণের নীতি-নিয়ম' আবশ্যিক ও জরুরী। কোন প্রকারের অলিখিত সামাজিক চুক্তির বা 'ব্যবহার বিধি-নিষেধের অলঙ্ঘ্যতা সীমা' অঙ্গীকার না করলে নির্বিরোধ নির্বিবাদ নিরুপদ্রব-নিরাপদ সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শাস্ত্রিক, নাগরিক, প্রাশাসনিক ও রাষ্ট্রিক জীবনযাপন কখনো সম্ভব হবে না। দেশ-কালের পরিবেশের দাবি অনুসারে জীবনের, সমাজের নতুন বিন্যাস ও নীতিচেতনা জাগেনি বলেই আমরা আমাদের চারদিকে কেবল ধন ও মানলোভী দুষ্ট-দুর্জন-দুর্বৃত্ত-দুষ্কৃতী লোকই দেখতে পাই। কিন্তু গুণবান হবার জন্যে নীতিমান মানুষ হওয়ার আগ্রহ বিরলতায় দুর্লক্ষ্য ও দুর্লভ হয়ে পড়েছে। ধন কিংবা মান কোন ব্যক্তিকেই শ্রদ্ধেয় ও স্মরণীয় করে তোলে না। ধনী ভোগে-উপভোগে-সম্ভোগে আত্মতৃপ্ত, তুষ্ট ও হৃষ্ট এবং পুষ্ট হলেও শ্রদ্ধেয় নয় বলে মরার সঙ্গে সঙ্গেই বিস্মৃতির সাগরে বিলুপ্ত হয়ে যায়, এমনকি তার নামে স্কুল-কলেজ-দীঘি-হাট-বাট-ঘাট থাকলেও। মানী লোকেরাও পদহৃত ও ক্ষমতাচ্যুত হলেই সাধারণের স্তরে নেমে আসে এবং মরার আগেই বিস্মৃতনাম হয়ে যায়। সাবেক মন্ত্রী-সাংসদ প্রভৃতি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কেননা এঁরা সবাই— সব দলের নেতা-উপনেতাই বানানো নেতা, কেউ যোগ্যতায় ব্যক্তিত্বে গড়ে ওঠা নেতা-নেত্রী নন। কেবল গুণবান মানুষই শ্রদ্ধেয় হয়ে টিকে থাকে। মনুষ্যত্বে, মানবিকতায়, পরার্থপরতায়, মানবপ্রেমে, চরিত্রমাহাত্ম্যে, আদর্শনিষ্ঠায়-নীতিমানতায় তথা নৈতিকচেতনায়, আবিষ্কারে-উদ্ভাবনে-সৃষ্টিতে রোগের প্রতিষেধক উদ্ভাবনে এবং মানুষের শোষণ-পেষণ-পীড়ন মুক্তির জন্যে যে-মানুষ প্রতিবেশীর, মানুষের, সমাজের, দেশের, রাষ্ট্রের, বিশ্বমানবতার প্রত্যক্ষে কিংবা পরোক্ষে কোন উপকার করে, করেছে, কিংবা চারু-কারু-দারু ললিতকলায় মানুষের মানসিক বিকাশে সহায়তা করে, করেছে, সংস্কৃতি সভ্যতা এগিয়ে নেয়, নিয়েছে, তারাই স্মরেণ্য গুণের মানুষ। এবং সেই গুণের মানুষই ধন্য 'নরকুলে-লোকে যারে নাহি ভুলে।' যে সমাজে গুণের মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধি পায়, সেই সমাজ ও রাষ্ট্র উন্নত হয়। সুরুচি, সংস্কৃতি, সৌন্দর্য, বিভিন্ন শিল্পসাহিত্য, নীতিমানতা বা নৈতিকচেতনা, মানুষের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যবুদ্ধি, হিতৈষণা ও সততামূলক আদর্শনিষ্ঠা এমনি গুণী মানুষেই পাওয়া ও দেখা সম্ভব। এমনি মানুষের প্রভাবেই 'কয়লাহৃদয় গলি হীরা হয়, তস্করও হয় সাধু।' কাজেই সমাজে বাল্যে, কৈশোরে, যৌবনে আদর্শ হিসেবে জানার বোঝার দেখার এবং অনুসরণের জন্যে আমাদের নতুন প্রজন্মের সন্তানদের জন্যে গুণে ঋদ্ধ, চরিত্রে অটল, আদর্শনিষ্ঠ, সাহসে ও সংকল্পে দৃঢ় ব্যক্তিত্ব চাই, কেবল ব্যক্তিগতভাবে আত্তোকর্ষের জন্যে নয়, জাতীয় জীবনেও উন্নয়নের জন্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবক্ষয়-সচেতন হোন

অবক্ষয় পৃথিবীর কোন দেশেই কোন কালেই নতুন কিছু নয়। সুখ-দুঃখ যেমন 'শকটচক্রবৎ' আবর্তিত হয় ব্যক্তিক ও পারিবারিক জীবনে নানা কারণে, তেমনি জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় জীবনেও আসে উঠতি-পড়তি-ঝরতির আবর্তিতকাল। উন্নতি, উৎকর্ষ উঠতি হচ্ছে কাম্য, তাই আনন্দের ও নিশ্চিন্ত নিশ্চিতির কাল হচ্ছে অর্থ-সম্পদের বৃদ্ধির, উৎকর্ষের, বিকাশের এবং বিস্তারের সময়পরিসরটিই। আর দুস্থতার, দারিদ্র্যের, বিপর্যয়ের, বিপদের, অনটনের, হতাশার ও অবক্ষয়ের কাল হচ্ছে শুধু অর্থ-সম্পদের ক্ষেত্রে নয়, যদিও এর স্থিতির ও প্রাপ্তির অনিশ্চিতির দরুনই যখন ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক, নৈতিক, আদর্শিক, সাংস্কৃতিক এবং চারিত্রিক জীবনে ঘটে বিকৃতি ও অপকর্ষ। তখন জাতীয় জীবনে নেমে আসে দুর্যোগ দুর্দিন।

মানুষ চোখে দেখে, কানে শোনে কিন্তু যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেক প্রয়োগে ঘটনার, অবস্থার, অবস্থানের তাৎপর্য বোঝার চেষ্টা করে না বলেই ঘটনার, কথার, কাজের, আচরণের প্রভাব ও পরিণামচেতনা মনে, মগজে ও মর্মে জাগে না। কোন উন্নত শিক্ষিত সংস্কৃতিমনা সমাজে অনেকের মনে তাৎক্ষণিকভাবে তাৎপর্য ও পরিণাম চেতনা জাগলে অর্থাৎ কারণ-কার্যের পরিণামচেতনা মনে জাগলে সমাজের স্বাস্থ্য সহজে ক্ষুণ্ন হতে দেয়া হয় না।

ধর্মমোহ বা শাস্ত্রপ্রীতি বা শাস্ত্রনিষ্ঠা যে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-বিবেকসম্মত না হলে ক্ষতির এবং অবক্ষয়ের কারণ হয়, উন্নতির ও মনুষ্যত্ববিকাশের সহায় হয় না, তা 'পরিশেষ' কাব্যের 'ধর্মমোহ' কবিতায় স্পষ্টভাবে পরিব্যক্ত করেছেন রবীন্দ্রনাথ :

নাস্তিক সেও পায় বিধাতার বর
ধার্মিকতার করে না আড়ম্বর
শ্রদ্ধা করিয়া জ্বালে বুদ্ধির আলো
শাস্ত্র মানে না, মানে মানুষের ভালো। .....
ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে
অন্ধ সে জন মারে আর মরে। ....
তাই ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্রহানো
এ অভাগাদেশে জ্ঞানের আলোক আনো।

আজ মৌলবাদ নামে আখ্যাত এক প্রকারের রাজনীতিকচাল রূপ ধর্মভাব পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্রে প্রসার ও প্রতিষ্ঠা লাভ করছে। এ নিশ্চিতই অবক্ষয়ের লক্ষণ, কেননা বিজ্ঞানের তত্ত্ব, তথ্য ও সত্যবিমুখতা, মনের-মতের-মননের-মগজের সঙ্কীর্ণতা, বিধর্মী-বিজাতি-বিভাষী-বিদেশীদ্বেষণা, শ্রেয়সচেতনতার বিলুপ্তি ও ব্যক্তির শ্রেয়সচেতনার প্রসার তথা লাভ-লোভ-স্বার্থবুদ্ধি প্রসূত আবেগচালিত অযৌক্তিক ও অবৌদ্ধিক মর্ত্যজীবন চেতনা আর শোষণ-বঞ্চনা-প্রতারণার প্রবণতা প্রভৃতিই অবক্ষয়ের লাক্ষণিক রূপ। আর্থ-বাণিজ্যিক বিপর্যয় ও অনিশ্চিতি মানুষের নীতিনিষ্ঠা, চারিত্রিক দার্ঢ্য, আদর্শিক জীবনচেতনা, আত্মমর্যাদাবোধ, সত্তার মূল্যচেতনা নষ্ট করে। আবার কালিক ও পরিবেষ্টনীগত কারণে অলীক-অলৌকিক-আধ্যাত্মিক এবং লৌকিক বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণার অবলুপ্তিও মানুষকে দৈবক্ষতির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আশঙ্কামুক্ত করে নৈতিকচেতনাচ্যুত, চরিত্রভ্রষ্ট, আদর্শ বিচ্যুত ন্যায়-অন্যায় বোধহীন করে তোলে। এভাবে নৈতিক বন্ধনমুক্ত হয়ে লাভ-লোভ-স্বার্থ বুদ্ধির প্ররোচনায় ব্যক্তি-মানুষ বিদ্যা-বুদ্ধি-অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও পদপ্রাপ্তির জন্যে, ক্ষমতার আসন লাভের জন্যে, আর্থিক সুবিধে পাওয়ার লোভে বেচশম, বেশরম, বেহায়া, বেদানাই, বেআক্কেল, বেদরদ, বেআদব, বেদেরগ, বেল্লিক প্রভৃতি সর্বপ্রকার দোষে দুষ্ট হতে দ্বিধা করে না।

আমরা যেসব তরুণকে আদর্শবাদী, গণমুক্তিকামী, সমাজসেবী, দেশপ্রেমী নীতিনিষ্ঠ ত্যাগপ্রবণ দেখেছি, তারা আজ উঁচুপদ ও ক্ষমতা-খ্যাতি লোভে চারিত্রিক খোল-নলচে বদলে হায়া-শরম-সংকোচ ও লোকনিন্দার, গণধিক্কারের ভয়-লজ্জা পরিহার করে দিব্যি রেডিও-টিভি-সভায় সপ্রতিভ ভাষায়-ভঙ্গিতে দেদার চাটুকারিতায়, স্তাবকতায় ও মিথ্যা ভাষণে মুখর হয়ে উঠেছে। এদের মধ্যে সাংবাদিক, আইনজীবী, শিক্ষক, ডাক্তার, সাহিত্যিক এবং সর্বশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী রয়েছে। লোম বাছতে কম্বল উজাড়। কাজেই আলাদা করে নিন্দা করব কার, ধিক্কার দেব কাকে! দেশটা যে আর্থ-বাণিজ্যিক মহাজন সাম্রাজ্যবাদীর এজেন্ট ছদ্মমানবসেবী NGO বা PVDO-র কবলিত, সরকার যে বিশ্বব্যাংকের ও আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের অনুগত, সেভেন গ্যাট যে আমাদের রাষ্ট্রেরও দরদী অভিভাবক, আমাদের সার্বভৌমত্ব যে কোথায় কোন্ কাসক্যাটে সযত্ন রক্ষিত রয়েছে, তা আমরা অনুভবও করতে পারি না। সেদিন এক অধ্যাপক বলছিলেন, আমরা এখন যেন কার্যত মীরজাফর সন্তানদের রাজত্বেই [১৭৬৫-৭০ খ্রি.] বাস করছি। নামে স্বাধীন, কাজে অপরের তত্ত্বাবধানে। আমাদের শিক্ষিতরা বুদ্ধিজীবী ও বিদ্বান বলে খ্যাতরা নাকি NGO ও জাতিসঙ্ঘের নানা প্রতিষ্ঠানে ৩০/৪০/৫০/৬০/৭০/৮০ ও লক্ষ টাকার মাসিক বেতনে প্রোজেক্ট নামের চাকরিতে রত। আজ সমাজ এমন হয়েছে যে অজ্ঞ-অনক্ষর নিঃস্ব-নিরন্নরা অস্ত্রের অভাবে চুরি-ডাকাতি-রাহজানি ছেড়েছে। এ কাজ এখন গ্রহণ করেছে ঠগ-পিন্ডারীদের মতোই বেকার অযোগ্য অদক্ষ শিক্ষিত তরুণরা, ভাত-কাপড় যোগাড়ের পন্থা হিসেবেই তারা আজ ছিনতাই-রাহাজানিকে তথা কাড়া-মারা-হানাকেই পেশা হিসেবে বরণ করে নিয়েছে অনন্যোপায় হয়ে। আর একদল বলা চলে দফতরে, সংস্থায়, সমিতিতে দুর্নীতিবাজ, ব্যবসায়-বাণিজ্যে-কারখানায় ভেজালের নীতিতে আস্থাবন হয়ে উঠছে। বেণেরা অর্থাৎ খনিজ-কৃষিজ উত্তোলিত, উৎপাদিত, নির্মিত পণ্যে খাদ রাখা, খুঁত রাখা, মিশেলে ভেজালে আয়বৃদ্ধি করা প্রভৃতিকেই নীতি-নিয়ম রূপে গ্রহণ করেছে। আর একদল জাতিক-আন্তর্জাতিক কালোবাজারে, চোরাচালানে আস্থাবান। আর দেশের মানুষ এখন 'সিএনএন' ও 'বিবিসি'র প্রভাবে অভিভূত। স্কুলে-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা চালু রয়েছে— অতীতমুখী, বিদেশমুখী এবং প্রশ্নোত্তরমুখী।

শাসনে-প্রশাসনে সরকারী ও রাষ্ট্রক্ষমতায় আর ব্যবসায়-বাণিজ্যে যারা রয়েছেন, তাঁরা সন্তানদের শৈশব থেকেই ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষিত করে ভূস্বর্গ যুক্তরাষ্ট্রে, যুক্তরাজ্যে, কানাডায়, অস্ট্রেলিয়ায়-নরওয়ে-সুইডেনে পাঠাচ্ছে। অন্যরা বাঁচার তাগিদে নীতি-নিয়ম আদর্শ-আত্মমর্যাদা ও বিবেকবর্জিত জীবনযাপনে হচ্ছে বাধ্য। এখন কাড়ি-মাড়ি-হানি 'অরি পারি যে কৌশলে' নীতিই সাধারণভাবে অনুসৃত। ফলে বিবেককে বন্দী রেখে, দেশের ও মানুষের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য মুলতবি রেখে, হায়া শরম সংকোচ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিহার করে, ঘৃণা-লজ্জা-ভয় ত্যাগ করে সবাই সহজ রোজগারের পথে ঠেলাঠেলি করে চলছে। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে গিয়ে ভিড়ের মধ্যে কেউ কেউ পিষ্ট হচ্ছে, পড়ে গিয়ে প্রাণও হারাচ্ছে, প্রতিযোগিতায়-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হার মেনে পিছু হটছে, দুঃখে-দারিদ্র্যে কষ্টে ক্লিষ্টজীবন যাপন করছে। এখন কেউ যেন 'সকলের তরে সকলে আমরা/প্রত্যেকে আমরা পরের তরে' নীতিতে বিশ্বাস করে না। শহুরে উপযোগরিক্ত বলে পরিত্যক্ত এ নীতি। আর রাজনীতিকদলগুলো, বেণেরা, আমলারা, সাংসদরা, শিক্ষকরা নিজেদের সন্তানদের সাবধানে রাজনীতিক আন্দোলন থেকে দূরে রাখেন, মফস্বল থেকে আসা এবং দরিদ্র ঘরের সন্তানরা রাজনীতিকদলের অঙ্গদল নামে পরিচিত ছাত্র-যুবা দলে যোগ দেয়— হয় নাম-মান-ক্ষমতা-খ্যাতির লোভে কিংবা ভাবী জীবনে চাকরি-ব্যবসা বাগানোর লক্ষ্যে অথবা কেবল নকল করে পাশ করার আপাত লোভে। এরা দলের হয়ে মারামারি-হানাহানিতে প্রাণ দেয় ও প্রাণ নেয়। এরই নাম শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস। এরাই সন্ত্রাসী। ফলে সারাদেশে এখন কেউ কারো উপর আস্থা রাখে না। প্রতি দ্বিতীয় ব্যক্তিই যেন সন্দেহভাজন এবং বেকারেরা গাঁয়ে-গঞ্জে-বন্দরে-নগরে সর্বত্র মস্তান-গুণ্ডা-খুনী হিসেবে দেশের মানুষের জীবন-জীবিকার প্রকৃত নিয়ন্তা হয়ে উঠেছে।

তবু আজো সুজন সজ্জন নীতিনিষ্ঠ আদর্শবান বিদ্বান বুদ্ধিমান বিবেকবান লোক যে দেশে নেই, তা নয়, তবে তারা সংখ্যায় স্বল্প, প্রভাবে নগণ্য, শক্তিতে সাহসে রিক্ত। সরকারের প্রয়োজনে সৈনিক ও পুলিশ নরহত্যা করে। আর অন্য প্রকারের প্রয়োজনে মস্তান-গুণ্ডা-খুনীরা কাড়ে-মারে-হানে যে কোন সামান্য কারণে ও অর্থলোভে। ফলে আজ সমাজ, সংস্কৃতি, সরকার, রাষ্ট্র যে নীতি-নিয়মে চলছে, তা উন্নতির উৎকর্ষসাধনের পন্থা বিরুদ্ধ। কবির ভাষায় আমাদের আজকের অবস্থা সম্ভবত এরূপঃ

অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ,
যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি, আজ চোখে দেখে তারা,
যাদের হৃদয়ে কোন প্রেম নেই, প্রীতি নেই, করুণার আলোড়ন নেই
পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।

নৈতিক চৈতন্যহীন আদর্শচ্যুত, চরিত্রভ্রষ্ট মতবলবাজ স্বার্থ-সর্বস্ব মানবিক গুণরিক্ত মানুষে নানা কারণে মুখ্যত অর্থবিত্তবিদ্যার, বিবেকের অভাবে দেশ ভরে উঠছে। কিন্তু বিবেকবান মগজ-মনন-মনীষা সম্পন্ন ব্যক্তিরা এমনি অবস্থায় নীরব নিষ্ক্রিয় থাকতে পারেন না। কারণ তাতে দায়িত্ব ও কর্তব্য এড়ানোর অপরাধ হবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ। পাপ-পুণ্যের কথা না ভেবেও যৌক্তিক ও বৌদ্ধিক বিবেচনায় বলা চলে দলবদ্ধ তথা যৌথ বা সমাজ জীবনে মানুষের উপর আস্থা না রেখে মর্ত্যজীবনযাপন করা চলে না, একজনের বিশ্বাস ভঙ্গে আস্থা হারিয়েও, ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হয়েও, হতাশ হয়েও নতুন কারো না কারো উপর নতুন করে আস্থা স্থাপন করতে হয়, সুজন সজ্জন বন্ধু হিসেবে বরণ করতে হয়, কেননা, সমাজে নিঃসঙ্গ, অনপেক্ষ হয়ে স্বনির্ভর স্বয়ম্ভর হয়ে বাঁচা যায় না, পারস্পরিক সহযোগিতায়, শ্রম ও পণ্য বিনিময়ের সম্পর্ক রেখে সহাবস্থান করতে হয়। অবক্ষয় আসে যখন ব্যক্তি মানুষ শ্রেয়সচেতনারিক্ত হয়ে কেবল প্রেয়স চিন্তায় ও সন্ধানে আত্মনিয়োগ করে। অবক্ষয় আসে যখন ব্যক্তি, পরিবার ও জাতি সম্মুখদৃষ্টি হারিয়ে অতীতে ও ঐতিহ্যে বল-ভরসা ও জীবনের দিশা খুঁজে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেড়ায়। এ জন্যে পুনর্জাগরণবাদে তথা Revivalism-এ শ্রেয়স নেই। উন্নতির, উৎকর্ষের, আত্মবিকাশের ও আত্মবিস্তারের জন্যে প্রয়োজন নতুন চেতনা, নতুন চিন্তা, নতুন আবিষ্কার, নতুন উদ্ভাবন ও নতুন সৃষ্টি জীবনের মানসিক ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে। এরই নাম রেনেসাঁস। এবং না বললেও চলে রেনেসাঁস অনন্য অসামান্য অসাধারণ মনন-মনীষার ও বিদ্যা-বুদ্ধির দান, আমাদের অবশ্যই মুক্তবুদ্ধির, মুক্তচিন্তার, উদারতার, বিজ্ঞানমনস্কতার যুক্তিবাদের অনুশীলন করতেই হবে। আর মানববাদী হতেই হবে। কৃপা-করুণা-দয়া-দাক্ষিণ্যের মানবতা একালে উপযোগরিক্ত।

আমাদের মধ্যে চরিত্রে, আদর্শে, ব্যক্তিত্বে, যোগ্যতায়, শ্রদ্ধেয়তায় বিশিষ্ট ব্যক্তি বিরলতায় দুর্লভ। দেশের কল্যাণ লক্ষ্যে তবু আমাদের কারো না কারো মধ্যে বুদ্ধির সঙ্গে জ্ঞানের, অঙ্গীকারের সঙ্গে উদ্যমের, সাহসের সঙ্গে শক্তির, উদ্যোগের সঙ্গে আয়োজনের, সর্বোপরি, যুক্তি, বুদ্ধি ও বিবেকসম্মত দেশ ও মানবপ্রেমের সঙ্গতি-সমন্বয় সাধন করতে হবে অভীকচিত্তে। সেই মানুষই কেবল সমাজকে, মানুষকে বাঁচার দিশা ও প্রেরণা দিতে পারেন। এ মানুষ সাধারণত নন্দিত হন না, নিন্দিত, ধিক্কৃত ও লাঞ্ছিত হন, প্রাণও হারান। তবু কাউকে না-কাউকে মানবকল্যাণে অভীক হয়ে প্রাণ হারানোর ঝুঁকি নিয়ে উচ্চকণ্ঠে প্রতিকারে, প্রতিবাদে, প্রতিরোধে ও সত্য উচ্চারণে এগিয়ে আসতে হবে। এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের বাণী স্মরণ করে উদ্বুদ্ধ ও প্রবুদ্ধ হওয়া হবেঃ

ভয়কে যারা মানে তারাই জাগিয়ে রাখে ভয়
মৃত্যুকে যে এড়িয়ে চলে মৃত্যু তারেই টানে
মৃত্যু যারা বুক পেতে লয়, বাঁচতে তারাই জানে।

অবক্ষয় রোধ করা এমনি বিজ্ঞ বিদ্বান মগজী মননশীল মনীষীর নির্ভীকতাতেই সম্ভব। দেশকে, জাতিকে, মানুষকে এঁরাই প্রগতির পথে, প্রাগ্রসরতার পথে বিবর্তনের ধারায় এগিয়ে দেন, সভ্যতা-সংস্কৃতি-মনুষ্যত্ব বিকাশ ও উৎকর্ষ পায় এভাবেই।

গণসাক্ষরতার একটি বিকল্প উপায়

আমাদের দেশে মুসলিম সমাজে বিগত অন্তত ছয়-সাতশ বছর ধরে একটা শিক্ষারীতি চালু হয়েছে। সে রীতিকে বলে 'নাজিরি' পাঠরীতি। অর্থাৎ চোখে দেখে কেবল আরবী হরফ চিনে 'মতন' বা কুরআন পাঠ করা শেখা ও শেখানো। এদের আরবী হরফ লেখানো হয় না এবং আরবীভাষাও শব্দার্থ বা বাক্যার্থসহ পড়ানো হয় না। কেবল হরফ চিনে নিয়ে প্রশিক্ষকের সাহায্যে বিশুদ্ধ উচ্চারণে কুরআন তেলাওত শেখাই এদের লক্ষ্য। এ প্রথা আজো শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে গাঁয়ে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে চালু রয়েছে। আরবীভাষা না-জেনে না-বুঝেও কেবল চোখে দেখে মুখে সশব্দ উচ্চারণেই সওয়াব বা পুণ্য মেলে—এই হচ্ছে এদের ধারণা। তা ছাড়া সুরার বা আয়াতের অর্থ না বুঝেও নামাজ পড়ার জন্যে জানাজা পড়ার জন্যে, কবর-মাজার-দরগাহ জিয়ারতের জন্যে কুরআনের সুরা, আয়াত ও দোয়া-মুনাজাত মুখে উচ্চারণ আবশ্যিক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরবীভাষায় স্বরবর্ণ নেই। অ-আরবের সুবিধের জন্যেই আরব সাম্রাজ্যে ও অন্যত্র অ-আরব মুসলিম ও বিধর্মীপ্রজা সমাজে আরবী উচ্চরণ নির্দেশের জন্যেই জের, জবর, পেস্ জজম প্রভৃতি স্বর-প্রতীক চিহ্ন উদ্ভাবিত ও প্রযুক্ত হয়েছে– ইসলামের উন্মেষ ও রাজ্যবিস্তার যুগে।

আমাদের বাঙলা হরফ ব্রাহ্মীলিপিরই বিবর্তিত রূপ। এবং বর্ণমালা হচ্ছে ধ্বনি-প্রতীক। কেবল ব্যতিক্রম আছে একটা যুক্তবর্ণে— জ + ঞ = জ্ঞ হয়।

আমরা জানি, জিহ্বার আড়ষ্টতার কারণে, শারীরিক অসুস্থতার দরুন, আবহাওয়ার প্রভাবের ফলে, অন্য প্রতিবেশীভাষার সাদৃশ্যে, দাঁত থাকা না-থাকার কারণে সর্বোপরি আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতার দরুন বর্ণমালা ও ভাষা অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও একই ভাষা প্রজন্মক্রমে এমনকি ব্যক্তিভেদে বিকৃত বা বিবর্তিত হয়ে বিভিন্ন, বিচিত্র ও দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে। যেমন মালদহ-রঙপুর-সিলেট-নোয়াখালী-চট্টগ্রামের আঞ্চলিক কথ্য ভাষায় উচ্চারণ বিকৃতিজাত যে পার্থক্য ঘটেছে, লিখিত উড়িয়া-অসমী-বাঙলাভাষায়ও সে পার্থক্য দুর্লক্ষ্য। কিন্তু আমাদের লেখ্য বাঙলার রূপ অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও আঞ্চলিক উচ্চারণে সামান্য পার্থক্য ঘটেই। তাতে তেমন কিছু অসুবিধে হয় না কথা বুঝে নিতে। কিন্তু গণশিক্ষার জন্যে আমাদের বাঙলা বর্ণমালার উপযোগ অসামান্য। কেননা, আমরা ওই আরবীর মতোই বাঙলা বর্ণমালা লেখানোর চেষ্টায় না করে কেবল 'আজিরি' পদ্ধতিতে বর্ণমালা শেখানোর চেষ্টা করলে বয়স্ক [কিশোর থেকে পঞ্চাশ বছরের প্রৌঢ় অবধি সবাই] লোকেরা নিজেরাই মাতৃভাষা সহজে লিখে-বুঝে-জেনে নেবে। যেমন ক + ল + ম = কলম, এ+ ক, এক অবশ্য যুক্তাক্ষর আপাতদৃষ্টিতে জটিল ও শেখানো কঠিন বলে মনে হতে পারে বটে, তবে ক + ষ = ক্ষ, ম+উ+ক +ত = মুক্ত— এভাবে ভেঙে ভেঙে শেখালে-বোঝালে বয়স্ক লোক নিজের বুদ্ধি প্রয়োগেই [যেহেতু ভাষা তার জানা] তার আঞ্চলিক উচ্চারণে তা আয়ত্ত করতে পারবে।

আর এ প্রস্তাব নিতান্ত বাতুলের মানসপ্রসূন বলে অগ্রাহ্য না করে, একে গুরুত্ব দিলে সাক্ষর কৌতূহলী ব্যক্তি নিজে নিজেই বর্ণলেখায় আগ্রহী হবে। এজন্যে দরকার কেবল স্বরবর্ণের ও কারের এবং ব্যঞ্জনবর্ণের ও ফলার আর কয়েকটি দুই, তিন, চারবর্ণের যুক্তাক্ষর গঠন পদ্ধতির নমুনা সমেত একটি বর্ণমালার বই। যেহেতু শিক্ষার্থীরা শিশু নয়, সেজন্যে বাক্যের নমুনা দেয়া বা পাঠদানের ব্যবস্থা রাখা হবে বাহুল্যমাত্র।

আমাদের ধারণা চতুর্থ-পঞ্চমশ্রেণী অবধি পড়েছে, তেমন সাক্ষর প্রশিক্ষক তথা সাহায্যকারী দিয়েই একপক্ষকালের মধ্যেই আগ্রহী নিষ্ঠ বয়স্ক শিক্ষার্থীদের পত্রিকা পাঠ করার মতো বর্ণজ্ঞান দান সম্ভব। কেননা তারা রাজনীতিকদের চলতি ভাষায় দেয়া ভাষণ-বক্তৃতা বোঝে, অর্থাৎ তাদের শুদ্ধ বাক্যবোধ রয়েইছে।

সরকার কিংবা কোন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা কিংবা কোন গ্রাম উন্নয়ন সমিতি এ পদ্ধতি প্রয়োগের সম্ভাব্যতা বা ফলপ্রসূতা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। এতে যে-কোন প্রাথমিক বিদ্যাসম্পন্ন লোককে নিয়োগ করা সম্ভব বলেই স্বল্প অর্থব্যয়ে এক পক্ষের কিংবা এক মাসের সময় পরিসরে কি ফল পাওয়া যাবে তা-ও পরীক্ষণ-সমীক্ষণ করা সম্ভব হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংখ্যালঘুকে নাগরিক অধিকারে নিশ্চিতি দানের দায়িত্ব রাষ্ট্রের

কথায় বলে জগতে বৈচিত্র্যের সীমা শেষ নেই। রামকৃষ্ণ পরমহংস বলতেন, যত মত তত পথ। আসলে যত মন, তত মত, তত পথ এবং তত জীবনচেতনা, তত জগৎচেতনা ও তত আদর্শ, উদ্দেশ্য, সিদ্ধান্ত আর লক্ষ্য। কেননা কোন দুটো মানুষেরই জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-বিবেক বিবেচনা ও মেধা গুণে মানে মাপে মাত্রায় সমান নয়। কাজেই প্রতিটি মানুষই এ তাৎপর্যে জীবনচেতনায়, বিশ্বাসে-সংস্কারে-ধারণায়-ভয়-ভক্তি-ভরসায়, রুচিতে-সংস্কৃতিতে, ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে ভিন্ন বিচিত্র। এটি ব্যক্তিক, পারিবারিক, গৌত্রিক, গৌষ্ঠীক এবং মতবাদী সাম্প্রদায়িক কিংবা আঞ্চলিক, ভাষিক, বার্ণিক, ধার্মিক, নৈবাসিক জীবনেও সত্য। অবয়বে স্বভাবে অভ্যাসে আচারে আচরণে অভিন্নতা আসলে নেই-ই।

অথচ প্রাণী প্রজাতির মধ্যে যৌথজীবন প্রাকৃতিক নিয়মেই আবশ্যিক ও জরুরী। আবয়বিক অনন্যতার দরুন অর্থাৎ ঋজু মেরুদণ্ডের ও দুটো হাতের বদৌলত মানুষ প্রকৃতিকে দাস ও বশ করে, প্রকৃতির সঙ্গে আপোস করে, প্রকৃতির আক্রমণ সম্বন্ধে সতর্ক থেকে, রোদ-বৃষ্টি-শৈত্য থেকে আত্মরক্ষার কৃত্রিম উপায় আবিষ্কার-উদ্ভাবন-সৃষ্টি করে স্বনির্ভর ও স্বয়ম্ভর হতে চির প্রয়াসী রয়েছে। এর নামই সংস্কৃতিচর্চা ও সভ্যতা।

সূর্যের নৈকট্য ও দূরত্ব প্রকৃতির জগতে সর্বপ্রকার বৈচিত্র্যের কারণ। ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুতের গুণগত মান-মাপ-মাত্রা ভেদেই প্রাকৃতিক পরিবেশের আঞ্চলিক বিভেদের কারণ হয়েছে। ঝড়-ঝঞ্ঝা-খরা-বন্যা-মরু আর সমুদ্র পর্বত অরণ্য মরু ও মেরু প্রাকৃতিক নিয়মেই গড়ে উঠেছে। আমরা আজো অজ্ঞানসমুদ্রে জ্ঞানের ভেলায় বাস করছি। জানবার বিষয় এখনো অনন্ত। আমরা কে, কি, কেন, কেমন কোথায় প্রশ্নের নিখাদ নিখুঁত পূর্ণ জবাব পাইনি এখনো, কিছুটা প্রমাণে, কিছুটা অনুমানে, বিশ্বাসে ভয়ে ভক্তিতে ভরসায় ধারণায় জ্ঞান নামের জানা-বোঝার গর্বে গর্বিত মাত্র। নিতান্ত ক্ষীণ লতায় লাউ কুমড়ো-তরমুজ ফুটি কেন জন্মে, আর বট অশ্বত্থ গাছে কেন অত অকেজো ক্ষুদ্র ফল ফলে, তার জবাব কি আমরা পেয়েছি? একই অঞ্চলে স্থলে কেন হাতী, আর অনুবৎ কীট পতঙ্গ জন্মে, জলে কেন তিমি আর কীটবৎ মাছ মেলে কিংবা আফ্রিকায় যেসব জীব জন্মে, এশিয়ায় কেন তা মেলে না, উট-জেব্রা-জিরাফ-হাতী-ঘোড়া কেন সর্বত্র জন্মে না— এসবের উত্তর কি আমরা সাধারণ লোকেরা জানি?

অরণ্য পর্বত-সমুদ্রের বাধা দুর্লঙ্ঘ্য ছিল বলে বিভিন্ন অঞ্চলে আবদ্ধ মানুষের মধ্যে পরিচয় তথা যোগাযোগ এককালে সম্ভব ছিল না। প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনীতে তথা ভৌগোলিক অবস্থানে জল-বায়ু-মাটি-তাপ অনুসারে রোদ-বৃষ্টি-শৈত্যের সুলভতা ও দুর্লভতা অনুযায়ী জীবন-জীবিকার উপাদান-উপকরণ ছিল বিচিত্র ও বিভিন্ন। আকাশ-মাটি-প্রকৃতি সম্বন্ধে নয় কেবল, সৃষ্টি-স্রষ্টা সম্বন্ধে, জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে তাদের ধারণা ও স্থান-কালভেদে বিচিত্র ও বিভিন্ন হয়েছে। সে পার্থক্য, স্বাতন্ত্র্য, আচার, অভ্যাস স্বীকার ও সহ্য করে সহযোগিতায় সহাবস্থান করাই হচ্ছে সংস্কৃতি, সৌজন্য ও সভ্যতা। মিশরে, গ্রীসে, ইরাকে, কেনানে, ভারতে, চীনে, আফ্রিকার কালো মানুষের মধ্যে স্রষ্টা-সৃষ্টি, দেবতা-উপদেবতা-অপদেবতা প্রভৃতি অদৃশ্য অরি-মিত্র শক্তি সম্বন্ধে যে-সব সুপ্রাচীন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধারণা ছিল, সে-সব প্যাগান ধারণার রেশ ও লেশ আজো আমাদের বিশ্বাসে সংস্কারে ধারণায়, ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে রয়ে গেছে। এ কারণেই আমরা আজো জ্ঞান-বিজ্ঞান বুদ্ধি-যুক্তি-বিবেক-বিবেচনা প্রয়োগে ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় সহজে অনুভব-উপলব্ধি করতে পারি না। তাই আমরা স্ব স্ব বিশ্বাসের সংস্কারের ধারণার শাস্ত্রের আচারের আচরণের স্বাতন্ত্র্যকেই সত্য বলে, প্রয়োজনীয় বলে, অস্তিত্বের ও পরিচিতির স্বাতন্ত্র্যরক্ষার জন্যে আবশ্যিক বলে জানি ও মানি। যদিও আমাদের আজকের যন্ত্রযুগে ও যন্ত্রজগতে আমরা শাস্ত্রের বিধিনিষেধ নানাভাবে প্রাত্যহিক জীবনে জীবনযাত্রায় সমকালীনতা রক্ষার গরজেই লঙ্ঘন করতে বাধ্য হয়েছি, হচ্ছি। এর ফলেই হয়তো আমরা প্রাণী জগতে শ্রেষ্ঠ মানব প্রজাতি বলে দাবি করলেও শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সভ্য-অসভ্য অবিশেষে আজো রিপুর প্রভাবমুক্ত হতে পারিনি, সময়ে সময়ে ষড়রিপুর প্রভাবে হিংস্র শ্বাপদের মতোই আচরণ করি। ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনে, লাভে লোভে স্বার্থে প্রলুব্ধ মানুষ পারে না, করে না হেন অপকর্ম নেই। তাই পৃথিবীতে কোথাও মানুষকে স্বপ্রজাতির প্রাণী হিসাবে মমতার সঙ্গে সম ও সহ স্বার্থে সংযমে, পরমত ও আচরণ সহিষ্ণুতায়ও সৌজন্যে সহযোগিতায় সহাবস্থানের স্বীকৃতির ভিত্তিতে বা চুক্তিতে গ্রহণ করতে পারেনি কোন সমাজই। জাত জন্ম বর্ণ ধর্ম ভাষা নিবাস যোগ্যতা নির্বিশেষে মানুষকে কেবল 'মানুষ' হিসাবে বরণ করা সম্ভব হচ্ছে না আজো, বদ্ধ ও বন্ধ্যা মনে মগজে মননে আমাদের মধ্যে কেবল গৌত্রিক, গৌষ্ঠীক, শাস্ত্রিক, আঞ্চলিক ও ভাষিক আর শ্রেণীক চেতনাই আদি ও আদিম কালের মতোই রয়ে গেছে। এতো বিদ্যা-বুদ্ধি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন-নীতিশাস্ত্র আমাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের, মানবিকগুণের অবাধ বিকাশ ঘটাতে পারেনি। তাই গোটা পৃথিবীব্যাপী আজো তিন 'R' এর দ্বেষ-দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ-সংঘাত মানুষের মানবতার অপ্রতিরোধ্য অসমাধ্য সঙ্কট-সমস্যা হয়ে রয়েছে। আজ Racial, Religious ও Regional— দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-লড়াই চলছে বৈনাশিক নরহত্যার আকারে।

আমাদের বাঙলাদেশ রাষ্ট্রের বয়স বাইশ বছর হল। আমরা জাত-জন্ম বর্ণ-ধর্ম, ভাষা-নিবাস যোগ্যতা নির্বিশেষে বাঙলাভাষী মাত্রেরই বাঙালীসত্তা অঙ্গীকার করে এবং আদিবাসী উপজাতিদের বাঙলাদেশী রাষ্ট্রের সম অধিকার প্রাপ্ত নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে লক্ষ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে মুক্তিযুদ্ধে জয়ী হয়ে এই স্বাধীন সার্বভৌম বাঙলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছি। বেদনার কথা এই পাকিস্তান আমলে সংখ্যালঘুদের যত সুযোগ-সুবিধে ও জান-মালের নিরাপত্তা দেয়া হয়েছিল, কিন্তু আজ সংখ্যালঘুরা তত নিরুপদ্রব নিরাপদ নিশ্চিত জীবনের স্বস্তি পাচ্ছে না, লাভ-লোভ-স্বার্থ বশে গাঁয়ের প্রবল প্রলুব্ধ দুষ্ট দুর্জন দুর্বৃত্ত-দুষ্কৃতকারীরা নাকি তাদের যে কেবল অবজ্ঞা-উপেক্ষা-অপমানিত করে, তা নয়, ত্রুটি-বিচ্যুতির অজুহাত পেলেই হুকুম-হুমকি-হুঙ্কার-হামলা প্রয়োগে দ্বিধা করে না। স্বদেশে, স্বভিটেয়, স্বঘরে তাদের নিরুপদ্রব-নিরাপত্তা বিশেষভাবে অনিশ্চিত হয়ে উঠেছে— এরশাদ আমলে সরকারী প্রশ্রয়ে ও আশ্রয়ে মন্দির ভাঙার ও হিন্দুর অর্থ-সম্পদ লুট করার সময় থেকে বাবরী মসজিদ ভাঙার পরবর্তীকালে নতুন করে এবং দেশ ব্যাপী মন্দির ভাঙার, বাড়ি পোড়ানোর, অর্থ-সম্পদ লুটের পর থেকে। উটের পিঠে শেষ কুঁটোর মতো হিন্দুরা ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ ও প্রতিবাদী হয়ে ওঠে ঢাকায় জন্মাষ্টমীর মিছিলের উপর আকস্মিক হামলার পরে। এ হামলার পরে কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। ক্ষুব্ধ হিন্দুরা তাই এবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠিক করেছে প্রতিবাদ প্রতীক হিসেবে তারা এবার সমূর্তি দুর্গাপূজা করবে না, করবে ঘটপূজা। সরকার বহির্বিশ্বে নিন্দা ছড়াবে আশঙ্কায় তাদের নিরুপদ্রব পূজার আশ্বাস দিচ্ছে। আমরা চাই বাঙলাদেশের নাগরিক রূপে সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধে যোগ্যতানুসারে পাক, আর স্ব স্ব চিন্তা-চেতনা-মত প্রকাশের ও আচার-আচরণের স্বাধীনতা লাভ করুক এ হচ্ছে কালের দাবি, মানুষের ও মনুষ্যত্বের দাবি, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের চাহিদা।

উল্লেখ্য যে সেক্যুলার রাষ্ট্র ছাড়া বিভিন্ন গৌত্রিক, শাস্ত্রিক, ভাষিক, আঞ্চলিক মানুষ কখনো সুবিচার পায় না, আমরা তাই সেক্যুলার গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রাপ্তির দাবিদার। এতেই দৈশিক বা রাষ্ট্রিক একক অভিন্ন জাতি-চেতনা গড়ে উঠবে, নইলে সংখ্যালঘুরা সুবিধে মতো জীবন-জীবিকার, অর্থ-সম্পদের নিরাপত্তার নিশ্চিতির অভাবে দেশ ত্যাগ করে ও করবে, দেশের অর্থ-সম্পদও পাচার করে ও করবে। এতে রাষ্ট্রেরই ক্ষতি হয় ও হবে সবচেয়ে বেশি। সংখ্যালঘুকে আশ্রয়-প্রশ্রয়, বল-ভরসা দেয়ার কেবল সংখ্যাগুরু সজ্জন প্রতিবেশীর নয়, পূর্ণ নাগরিক অধিকারের নিশ্চিতি দেয়ার দায়বদ্ধতা সরকারের তথা রাষ্ট্রের।

আইন প্রয়োগে হেরফের : অর্পিত সম্পত্তি

AMARBOI.COM

শোনা যাচ্ছে সরকার দারিদ্র্য মোচনের লক্ষ্যে পূর্বেকার 'শত্রু সম্পত্তি' এখনকার নামের 'অর্পিত সম্পত্তি' বিক্রয় করে অর্থভাণ্ডার চাঙ্গা বা পূর্ণ করতে মনস্থ করেছে। স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি উত্তরাধিকার সন্তানদের। সন্তানের অভাবে ভাই, ভাইপো, ভাগনে, জ্ঞাতিরা পেয়ে থাকে। সব শাস্ত্রে এবং সব জাতি-উপজাতির আদিবাসীর অরণ্যবাসীর মধ্যে এ বিষয়ে সর্বজন স্বীকৃত, গ্রাহ্য ও মান্য নীতি-নিয়ম রয়েছে। এককালে ভূ-সম্পদই ছিল শ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী সম্পদ। ভূমি রাজস্বই ছিল রাজার, সামন্তের, জমিদারের, জায়গীরদারের আয়ের মুখ্য উৎস। বিজ্ঞানের বদৌলত, সংস্কৃতি সভ্যতার তথা মনন-মনীষার প্রসূন নানা বিচিত্র বিকল্প ব্যবস্থায় মানুষের সম্পদ প্রতীক আর্থিক জীবনও বৈচিত্র্য লাভ করেছে। এখন ব্যাংকে জমা-রাখা কাগুজে অর্থের প্রতীক চেক বই-ই সম্পদ। ওই চেক বই সঙ্গে থাকলে পৃথিবী পরিক্রমা করা যায় স্বনির্ভর হয়ে নিশ্চিন্তে।

আমাদের বাঙলাদেশ রাষ্ট্রের মুসলমান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, কানাডায়, ব্রিটেনে, অস্ট্রেলিয়ায় নাগরিকত্ব নিয়েও বাঙলাদেশের নাগরিকত্ব হারায় না, হারায় না পৈতৃক বা নিজের স্বদেশস্থ অর্থ-সম্পদের অধিকার ও উত্তরাধিকার। কিন্তু সংখ্যালঘুরা ভারতে আশ্রিত বা অভিবাসিত হলে পাকিস্তান আমলে শত্রু বলে পরিগণিত হত, বাঙলাদেশ রাষ্ট্রে 'শত্রু'র ব্যবহার পরিহার করা হয়েছে, কিন্তু কূটকৌশলে 'শত্রু সম্পত্তি' এখন 'অর্পিত সম্পত্তি রূপে' সরকারের আয়ত্তে ও তত্ত্বাবধানে রয়ে গেছে।

'বাঙালীসত্তা' অঙ্গীকার করে মুক্তিযুদ্ধে ভারতেরও সমর্থন, সহায়তা, সাহায্য পেয়ে নয় মাসে আমরা 'বাঙলাদেশ' নামের স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করে তৃপ্ত, তুষ্ট, হৃষ্ট ও ধন্য হয়েছি। আমাদের প্রথম সংবিধানে নাগরিক মাত্রই 'চার নীতির' বদৌলত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমঅধিকার লাভ করেছিল। জাত, জন্ম, বর্ণ, ধর্ম, ভাষা, নিবাস নির্বিশেষে অভেদে বাঙালী বা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্বাধীন ও সমান নাগরিক ছিল। কাজেই সে সময়েই ভারতে যে অভিবাসিত হয়েছে, তার বাঙলাদেশী নাগরিকত্ব বিলুপ্ত হওয়ার কথা নয়, কেননা, যুক্তরাষ্ট্রের, যুক্তরাজ্যের, কানাডার নাগরিক মুসলিম বাঙালীর বা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের লোকের নাগরিকত্ব অটুট থাকছে। তাহলে হিন্দুরই বা নাগরিকত্ব যাবে কেন? তা ছাড়া কথায় বলে নড়া ও মরা সমান, যে দেশত্যাগ করে ভারতে গেল, তাকে 'মরা' বা মৃত বলে ধরে নিয়ে তার পৈতৃক বা নিজের পরিত্যক্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির মালিক হিন্দুর শাস্ত্রিক উত্তরাধিকার আইন অনুসারে ভাই, ভাইপো, ভাগনে, জ্ঞাতিরাই তো হওয়ার কথা। অধিকারী বা হকদারকে বঞ্চিত করে সরকার শত্রু সম্পত্তি, অর্পিত সম্পত্তি প্রভৃতি নানা অযৌক্তিক ও অবিবেকী অজুহাতে তা বিক্রি করে অর্থ সংগ্রহের অপচেষ্টা করছে বলেই আমাদের ধারণা, রাষ্ট্রের এক শ্রেণীর বা শাস্ত্রিক সম্প্রদায়ের লোককে এভাবে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে পর করে রাখা, ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ, অসন্তুষ্ট করে রাখা জাতীয়তাবোধ বা অকৃত্রিম রাষ্ট্রিক আনুগত্য গড়ে ওঠার পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাতে রাষ্ট্রের দুর্বলতা ঘোচে না। সে-দুর্বলতা আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, সামষ্টিক শক্তির ও জাতীয় সংহতি চেতনার দুর্বলতা।

সংখ্যালঘুরা রাষ্ট্রের বা সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের 'দায়' কি 'সম্পদ' সে-বিতর্কে যাব না। কিন্তু আড়াই কোটি মানুষকে আমরা এড়িয়ে চলতে পারব না, বিতাড়িত করতে পারব না, হননে বিলোপ করতে পারব না; পীড়নে-শোষণে দমনে-দলনেও ধ্বংস করতে পারব না। কাজেই যাকে ছেড়ে চলা যাবে না, যাকে খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে, যার প্রতি কোন রাষ্ট্রিক-প্রাশাসনিক দায়িত্ব-কর্তব্য এড়াতে পারব না, যার নিঃস্বতার, নিরন্নতার প্রতি উদাসীন থাকা সম্ভব হবে না, তাকে বিক্ষুব্ধ রুষ্ট শত্রু করে রাখা বুদ্ধিমানের কাজ নয়, সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের রাষ্ট্রের তথা সরকারের নীতি হওয়া উচিত তাদের আপন করে নেয়া, আত্মীয়সম সমাদরে বশ ও বন্ধু করে নেয়া, যাতে সে তার স্বদেশে স্বভিটেয় স্বঘরে মৌরসী অধিকারে নিরুপদ্রবে, নিরাপদে, নির্বিরোধে, নির্বিবাদে, নির্বিঘ্নে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের নাগরিকের মতো নিশ্চিন্তে তার জীবন-জীবিকার সাধ্যমত ব্যবস্থা করতে পারে। এ মাটি, এ মানুষ, এ রাষ্ট্র যে তারই, তা যেন সে অনুভব-উপলব্ধি করে গৌরব-গর্ববোধ করে। দেশের মানুষের রাষ্ট্রের প্রয়োজনে আত্মত্যাগ করতে অন্তরোথিত আবেগে-সংকল্পে এগিয়ে আসতে পারে।

'অর্পিত সম্পত্তি' সম্বন্ধে সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণকালে আশা করি এ তথ্যটি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচ্য হবে যে, কারো কারো দালান, মাটির ঘর, উঠান, পুকুর, ঘাট, বাড়ির প্রবেশদ্বার প্রভৃতি এজমালি সম্পত্তি অর্থাৎ পরিবারের সবারই সাধারণ ব্যবহারের অধিকারভুক্ত। তেমন স্বত্ব বেচা-কেনা করার পরিণাম হচ্ছে দুই আড়াই কোটি মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে বিপর্যয়জাত দুঃসহ যন্ত্রণা সৃষ্টি করা। আমরা তাই হিন্দু উত্তরাধিকার আইন প্রয়োগে আত্মীয়দেরই পরিত্যক্ত সম্পত্তি ভোগ-দখল করতে দেয়ার জন্যে সরকারের কাছে সুপারিশ করছি। এ সুপারিশ নিশ্চয়ই বেআইনীও নয়, অসঙ্গত-অযৌক্তিক আবদারও নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেক্যুলার সংবিধানই সাম্প্রদায়িকতার প্রতিষেধক

মানুষ ও প্রাণী। সচেতন অনুশীলনে সংযম, সহিষ্ণুতা, সৌজন্য, প্রীতি, ত্যাগ, পরার্থপরতা, ক্ষমা, ন্যায্যতা প্রভৃতির গুরুত্ব, আবশ্যিকতা, প্রয়োজনীয়তা, অনুভব-উপলব্ধি না করলে কেউ কখনো মানবিক গুণে তথা মনুষ্যত্বে বা মানবতায় প্রাণীসুলভ বৃত্তি-প্রবৃত্তির উর্ধ্বে উঠতে পারে না। মানুষ্যত্বের সচেতন অনুশীলন করে খুব কম লোকই। ফলে আমাদের চারদিককার লোক চালিত হয় লাভে, লোভে ও স্বার্থে। অবশ্য প্রেম-প্রীতি-স্নেহ-মমতায়ও মানুষ আবেগপ্রবণ হয় এবং আবেগতাড়িত মানুষ ত্যাগ স্বীকারে সম্মত থাকে। কাম-প্রেম লাভ-লোভ-স্বার্থবশে মানুষ জাত জন্ম বর্ণ ধর্ম ভাষা নিবাস যোগ্যতা ভেদ করে না, মানে না। এসব মানসিক দোষ-গুণ ব্যক্তি বিশেষের— গৌত্রিক সাম্প্রদায়িক কিংবা জাতিক নয়।

এ কারণেই সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শৈক্ষিক, নৈতিক পরিবেশ-প্রতিবেশ যেসব দেশে বাহ্যত উন্নত বলেই আমরা জানি ও মানি, সেসব দেশেও প্রাণী-প্রবৃত্তি চালিত মানব প্রজাতির মানুষের সংখ্যা বাস্তবে অনেক বেশি। রাষ্ট্র বিপ্লবে, গৃহযুদ্ধে, দাঙ্গায়, যুদ্ধে, বিদেশী-বিজাতি-বিধর্মী-বিশ্রেণী বিদ্বেষে তা বীভৎসভাবে পরিব্যক্ত হয়। তখনই জানা, দেখা ও বোঝা যায় যে মানুষের মতো হিংস্র প্রাণী জগতে নেই। এরা বিদ্বেষ, প্রতিশোধবাঞ্ছা, জিঘাংসা চিত্তের গভীরে প্রজন্মক্রমে পুষে রাখে, ভোলে না কখনো।

কাজেই জাত জন্ম বর্ণ ধর্ম ভাষা নিবাস লাভ-লোভ-স্বার্থ প্রভৃতি মানুষে মানুষে বিরোধ-বিবাদ-দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-সংঘাত স্পৃহা জিইয়ে রাখবে লঘু-গুরুভাবে। প্রমাণ ভাঙা সোভিয়েত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যেকার মানুষের মধ্যে জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা নিবাস-অঞ্চলে দ্বেষণা সত্তর বছর কালের অভিন্ন শিক্ষা-দীক্ষা নীতি-নিয়ম আচার-আচরণ বিলুপ্ত করতে পারেনি। স্বাধীনতা-স্বাতন্ত্র্য-বিচ্ছিন্নতার সঙ্গে সঙ্গেই বাসন্তী হাওয়ায় যেন শীতকালীন আপাতমৃত ঔষধির মতো প্রাণ পেয়ে শির উঁচু করে জেগে উঠেছে দ্বেষণা-দ্বন্দ্ব। সে-সব অঞ্চল আজো সেই বুনো বর্বর যুগের মতোই কাড়া-মারা-হানায় আস্থা রাখে। প্রতিযোগী-প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রুরূপী নর হত্যায় আজো উল্লাসবোধ করে, জিগীষুর আত্মপ্রসাদ লাভ করে। পৃথিবী আজো তাই সর্বত্র নররক্তস্নাত।

যেহেতু সব মানুষ যখন সংযমে, পরমত ও আচরণ সহিষ্ণুতায়, সততায়, ন্যায় চেতনায় সুজন ও সজ্জন হবে না কখনো এবং যেহেতু 'একে নষ্ট করে সবে দুঃখ পায়', আর যেহেতু 'গড়ন ভাঙিতে আছে কত খল/ভাঙন গড়িতে পারে সে বড় বিরল' সেহেতু মানুষের মধ্যে লাভ-লোভ-স্বার্থ চেতনার অদম্যতা রোধ করতে, মানুষের মনের সর্বপ্রকার 'কালি' ঘোচাতে তথা জাতি-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-নিবাস-শ্রেণী বিদ্বেষ, স্বাতন্ত্র্য ও বিচ্ছিন্নতাবাদ সুপ্ত, লুপ্ত, নিষ্ক্রিয় রাখতে নির্মোহ নিরপেক্ষ সেক্যুলার সরকার বা রাষ্ট্রাদর্শ আবশ্যিক ও জরুরি— যেমনটা ছিল বা আছে কম্যুনিস্ট শাসিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শাসন-প্রশাসন ব্যবস্থায়। নইলে গৌত্রিক, শাস্ত্রিক, ভাষিক ও আঞ্চলিক স্বার্থ, স্বাতন্ত্র্য ও বিদ্বেষ চেতনা জ্ঞান-যুক্তি-বিবেক-বিবেচনা প্রভাবিত হয়ে প্রশমিত হবে না। মনুষ্যবয়বে মানুষ প্রাণী বলেই গোটা পৃথিবীতে চিরকালই গৌত্রিক, গৌষ্ঠীক, মতবাদী সাম্প্রদায়িক,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বার্ণিক, ভাষিক, আঞ্চলিক অধিজনেরা উনজনদের-শাসনে-শোষণে-পীড়নে-হত্যায় স্বাভাবিক মানস স্বাস্থ্যে তাদের কখনো আত্মবিকাশের, আত্মোন্নয়নের, আত্মোৎকর্ষের সুযোগ-সুবিধে দেয়নি। আজো দেয় না, জাতিসঙ্ঘের সনদে-শ্লোগানে তত্ত্বাবধানে-অভিভাবকত্বেও কোন কাজ হয় না, হয়নি। উত্তর আয়ারল্যান্ড কিংবা ফকল্যান্ড যেমন তিব্বত, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম, কাশ্মীর, পাঞ্জাব যেমন, কুইবেক যেমন, কারেন যেমন, তেমনি আরো অসংখ্য উনজন বা দুর্বল জাতি, উপজাতি, আদিবাসী কিংবা ভিন্ন রঙের, রূপের, ধর্মের, ভাষার, শাস্ত্রের, আচারের মানুষ স্বাধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠ থেকে নিরাপদে নিরুপদ্রবে নিশ্চিত নির্বিঘ্ন জীবনযাপন করতে পারছে না এ মুহূর্তেও এই ১৯৯৪ সনের শেষেও।

আমাদের দেশেও রয়েছে সংখ্যালঘুর নানা বঞ্চনার অভিমান-অনুযোগ-অভিযোগ, নানা মানসিক ও বৈষয়িক নির্যাতনের অভিযোগ, অনিশ্চয়তার ও উপদ্রবের আশঙ্কার অস্বস্তির কারণ। এগুলোর উপশম-বিলোপ-প্রতিরোধ কেবল সরকারের পক্ষেই সম্ভব। সাধারণ সামাজিক মানুষের কেউ কেউ হৃদয়বান হিসেবে গা-পা বাঁচিয়ে সহানুভূতিশীল হতে পারে মাত্র, কিন্তু সক্রিয় সাহায্যে এগিয়ে আসা সম্ভব হয় না। সঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াসও সব সময়ে কেজো হয় না।

তাই বলছি সরকার যদি সেক্যুলার হয়, অর্থাৎ সংবিধান যদি শাসন-প্রশাসনের ক্ষেত্রে কোন শাস্ত্রের অস্তিত্ব অস্বীকার করে চলে, জাতি-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-অঞ্চল-নিবাস-যোগ্যতা-নির্বিশেষে মানুষকে কেবল নাগরিক হিসেবেই দেখে নীতি-নিয়ম ও আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে, তা হলেই কেবল সাম্প্রদায়িকতা সুপ্ত, গুপ্ত ও নিষ্ক্রিয় থাকবে। সংখ্যালঘুও নিশ্চিন্তে নির্বিঘ্নে নির্বিরোধে নিরাপদে নিশ্চিন্তে স্বদেশে, স্বভিটেতে স্বনির্ভর হয়ে স্বাধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠ থেকে আত্মবিকাশের সুযোগ পাবে, তার মানসিক স্বাস্থ্যও থাকবে অটুট। তেমন অবস্থায় সংখ্যালঘুদেরও দেশপ্রেম থাকবে সংশয়াতীত।

সরকার যদি অসাম্প্রদায়িক নির্মোহ দৃষ্টিতে সংখ্যালঘু সমস্যা-সঙ্কট বুঝতে ও দেখতে চাইত, তাহলে 'গ্লানি', কিংবা 'বাঙলাদেশে সাম্প্রদায়িক বৈষম্য' গ্রন্থ দুটোতে মুদ্রিত তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে কিছু অপরাধের তদন্ত এবং অপরাধীকে বিচারের ব্যবস্থা করে সংখ্যালঘুর বল-ভরসা বৃদ্ধি করতে পারত। হতে পারত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোর আস্থাভাজন — সে-চেষ্টা সরকার করেনি, করে না। কাজেই সাম্প্রদায়িকতা বাড়ছে, কমছে না।

মানব-উত্তরাধিকার

'জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে। সে জাতির নাম মানুষ জাতি।' অন্য প্রাণীদের জন্ম-মৃত্যুর, উদ্ভব-বিনাশের অঞ্চলভেদ আছে। কেবল মানুষেরই নেই। মানুষ অরণ্যে, পর্বতে, সমুদ্রদ্বীপে, সমতলে, উষর মরুতে, বরফ-আচ্ছাদিত অঞ্চলে, সুদীর্ঘকাল স্থায়ী সূর্যালোকে কিংবা দীর্ঘকালব্যাপী অন্ধকারে বাস করতে জানে ও পারে। এ জন্যে মানুষই পৃথিবীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মালিক। এক মানুষের আবিষ্কারে উদ্ভাবনে, সৃষ্টিতে জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-নিবাস-অঞ্চল-যোগ্যতা ও কাল নির্বিশেষে যে-কোন মানুষের উত্তরাধিকার রয়েছে। কারণ আকার-প্রকার-রঙ-রূপ ভেদ থাকা সত্ত্বেও মানুষ মাত্রই স্বজাতি অর্থাৎ প্রাণীর মধ্যে মানব প্রজাতি। অতএব, যা কিছু সাহিত্যে-বিজ্ঞানে-দর্শনে ইতিহাসে-সমাজবিজ্ঞানে-চিকিৎসাবিজ্ঞানে-প্রকৌশলে-প্রযুক্তিতে মানুষের পক্ষে কল্যাণকর, তা-ই দেশ-কাল-জাতি-জন্ম-ভাষা-বর্ণ-ধর্ম-অঞ্চল নির্বিশেষে যে-কারুর থেকে অনুকরণে অনুসরণে গ্রহণ বরণ করা কিংবা আদানে-প্রদানে, পণ্যরূপে ক্রয়ে-বিক্রয়ে, ঋণে-দানে-অনুদানে অথবা বিনিময়ে লেন-দেন করা কেবল বাঞ্ছনীয় নয়, আত্মোন্নয়নের জন্যেই, আত্মবিকাশের জন্যেই জীবনে-জীবিকায় স্বাচ্ছন্দ্য, সাচ্ছল্য, উৎকর্ষ, সৌকর্য, সৌন্দর্য সাধনের জন্যেই আবশ্যিক ও জরুরী। এ কথাটি একালের শহুরে শিক্ষিত লোকও যদি না বোঝেন, তা হলে সে জাতির, গোত্রের, সম্প্রদায়ের বা রাষ্ট্রের দুর্দশা, দুর্ভোগ, দুর্দিন সহজে ও শিগগির ঘুচবে না— এ নিঃসংশয় নিশ্চিতভাবে উচ্চারণ করা চলে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভালো বই, ভালো চিত্র, ভালো কারু-দারু-চারু-ললিত শিল্প, ভালো ওষুধ, ভালো চিকিৎসক, ভালো যন্ত্রী, ভালো প্রকৌশলী ও ভালো প্রযুক্তিবিদ অবশ্যই নিঃসংকোচে নির্দ্বিধায় অত্যুৎসাহে সাধমতো স্বদেশী মানুষের কল্যাণ সাধনের জন্যে, শিক্ষার জন্যে আনা শুধু বাঞ্ছনীয় নয়, অতি আবশ্যক, আবশ্যিক ও জরুরী। শুধু য়ুরোপে আমেরিকায় নয়, লোককল্যাণ লক্ষ্যে সিঙ্গাপুরে, ব্যাংককে, ভেলোরে, কোলকাতায়, দিল্লিতে, বোম্বাইয়ে আধুনিকতম যন্ত্রপাতি ও ওষুধযোগে সর্বপ্রকার কঠিন ও জটিল রোগের চিকিৎসার ও চিকিৎসকের ব্যবস্থা রয়েছে। কেবল আমাদের স্বাধীন সার্বভৌম বাঙলাদেশ রাষ্ট্রে সুইমিংপুল, স্টেডিয়াম, উদ্যান, রাস্তা ও সেতু, মিলনায়তন, প্রেক্ষাগৃহ তৈরিতে সরকারের যত উৎসাহ প্রকৌশল-চিকিৎসাবিদ্যার কলেজ স্থাপনে যত আগ্রহ, দুস্থ রুগ্ন সাধারণ মানুষের চিকিৎসার সুব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে সরকারের ঔদাসীন্যের ও গুরুত্বচেতনার অভাব তার থেকে অনেক বেশি। অথচ রোগ হচ্ছে মানুষের জীবন মৃত্যুর লড়াই, সরকার কিংবা ধনী লোকেরা সাধারণ মানুষের জীবনের কোন মূল্য দেয় না। বুনো পশু-পাখির জীবন-মৃত্যুর মতোই নিঃস্ব নিরন্ন দুস্থ দরিদ্র অজ্ঞ অনক্ষর মানুষের জীবন-মৃত্যু তাদের কাছে আলোচ্য বিবেচ্য কিংবা দৃষ্টিগ্রাহ্য নয়। তাই আজো দু'চার কোটি টাকা ব্যয় করে আধুনিক যন্ত্র ও যন্ত্র-চালক, যন্ত্র-বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তৈরির বা আমদানীর কোন ব্যবস্থা নেই, হয়নি, হয় না। কারণ ধনীরা বিদেশে নিজেদের পরিবারের চিকিৎসা করায়।

তেমনি কৃষি-শিল্প উৎপাদন নির্মাণ ক্ষেত্রেও আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহারের প্রয়োজন-চেতনা সরকারের মধ্যে সহজে দেখা যায় না। সরকার আশা জাগানোতে, আশ্বাস দানে— সুদিনের চিত্রাঙ্কনে যত পটু, লোকোপকারে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে তত উৎসাহী নয়। তাই বিদেশে তথা য়ুরোপে-আমেরিকায়-জাপানে পণ্য উৎপাদনে-নির্মাণে এ-যন্ত্র, সে-যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, বিস্ময়করভাবে দ্রুত, স্বল্প শ্রমে ও সময়ে এ-হয়, সে-হয়, ব্যক্তি মানুষের ঘরোয়া জীবনেও এ-যন্ত্রের ও সে-যন্ত্রের প্রয়োগে স্বাচ্ছন্দ্য, সৌকর্য, উৎকর্ষ, আরাম, আনন্দ আনয়ন সম্ভব হয়েছে, যা আমাদের সাধারণ সচ্ছল মানুষের জীবনেও আজো স্বপ্ন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা এখন যে-কোন পণ্যসামগ্রী জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে গ্রহণ-বরণ করি, ব্যক্তিক ও পারিবারিক জীবনে। কিন্তু আমাদের সামাজিক, রাষ্ট্রিক জীবনে সবার জন্যে তা কামনা করি না। এ আমাদের মানস-ঔদার্যের, মানবতার অভাবের লক্ষণ। আমরা যদি বিজ্ঞানমনস্ক হই, বিজ্ঞানের তত্ত্বে, তথ্যে ও সত্যে বিজ্ঞানীর আবিষ্কৃত-উদ্ভাবিত ও সৃষ্ট প্রকৌশল-প্রযুক্তিজাত সামগ্রীর মতো, চিকিৎসার ও ওষুধের মতো আস্থা রাখি, তার আদর-কদর করি, বিজ্ঞানের চর্চা করি, সেকেলে বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণাকে অলীক-অলৌকিক-লৌকিক বলে বর্জন করি, তা হলে আমাদের উন্নতি বাঞ্ছিত মাত্রায় হবে বলে আমাদের ধারণা। মানুষকে 'মানুষ' বলে জেনে, বুঝে ও মেনে মানুষের কল্যাণ চেতনায় প্রবুদ্ধ হলেই আমরা জ্ঞান, বুদ্ধি, শক্তি, সাহস, অঙ্গীকার, উদ্যম-উদ্যোগ-আয়োজন নিয়ে মর্ত্যজীবনে দ্রুত উন্নতি সাধন করতে পারব।

বাঁচার উপায় : বিজ্ঞান ও বাণিজ্য

কথায় বলে বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস। চিরকালই অর্থসম্পদের গুরুত্ব স্বীকৃত হয়ে আসছে মানুষের জীবনে। এ জন্যেই সব দেশেই, সব রূপকথাতেই আমরা রাজার পরেই সওদাগরের স্থান, তথা মানমর্যাদা ও ক্ষমতা দেখতে পাই। পরাশক্তিরূপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দাপট, প্রাক্তন সোভিয়েত রাশিয়ার দর্প কিংবা চীনের আস্ফালন তো ছিল এ অর্থসম্পদজাত শক্তির, অর্থব্যয়ে তৈরি অস্ত্রের দরুনই। দরিদ্র মাত্রই এ কারণেই বাহুবল থাকলেও দুর্বল শাসিত, শোষিত এবং হুকুম-হুমকি-হুঙ্কার-হামলার শিকার দুনিয়ার সর্বত্র। আজকের জগতে বাণিজ্যপ্রথা আগের যুগের মতো নেই। বিজ্ঞান বাণিজ্যক্ষেত্রে বৈপ্লবিক নানা যানবাহন ও যন্ত্র নির্মাণে-উৎপাদনে-বিপণনে বিস্ময়কর সব পদ্ধতির উদ্ভব ঘটিয়েছে। বিজ্ঞানজাত প্রকৌশল-প্রযুক্তি আর বৈশ্বিক-আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আজকের দিনে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের মানবিক সমস্যার উৎপত্তি ও বিনাশ এর সঙ্গেই যুক্ত। নাফতা ও গ্যাট জরুরী হয়ে উঠেছে এ কারণেই। বিজ্ঞানের অবদান প্রকৌশল ও প্রযুক্তিযন্ত্র যাদের অধিকারে নেই, যন্ত্র ক্রয়ে নির্মাণে প্রয়োগে যারা অক্ষম অসমর্থ, পণ্য উৎপাদন-নির্মাণ আর বাজার দখল তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। অভ্যন্তরীণ ও বিদেশী বাজার দখল করার জন্যে চাই স্বল্পব্যয়ে ক্রেতার মন ও নজর আকর্ষণ। একালে জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিজ্ঞতা-অভিজ্ঞতা-প্রকৌশল-প্রযুক্তিবিদ্যা ব্যতীত বাণিজ্য করা, কলকারখানায় পণ্য উৎপাদনে দক্ষতা দেখানো কিংবা সাফল্য অর্জন সম্ভব নয়। বাণিজ্যেও তাই বিজ্ঞানের তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য প্রয়োগ, বিজ্ঞানী আবিষ্কৃত, উদ্ভাবিত ও সৃষ্ট যন্ত্র, নীতি-নিয়ম, প্রথা-পদ্ধতি মেনে চলা আবশ্যিক ও জরুরী।

আমাদের বাঙলাদেশ রাষ্ট্র নিরক্ষরতাদুষ্ট তথা অজ্ঞতার অন্ধকারে না হোক, কুয়াশায় আচ্ছন্ন। তাই তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে আমাদের জনবহুল ক্ষুদ্র রাষ্ট্র নিতান্ত দরিদ্র, বলা চলে দারিদ্র্যের দরুন সবার পিছে ও সবার নিচে এর স্থান। এ দারিদ্র্য থেকে মুক্ত হতে হলে আমাদের পণ্য উৎপাদক, পণ্যনির্মাতা ও পণ্যবিক্রেতা ব্যবসায়ী হতে হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদেরও সঙ্কল্প করতে হবে আমরা বাণিজ্যেতে যাবই, লাভ যদি করতে প্রথম দিকে না-ও পারি, লোকসান দিয়ে দিয়ে অন্তত ব্যবসায়ী হবার যোগ্যতা অর্জন করব। অভিজ্ঞতার ও জ্ঞানের পুঁজি হবে অর্জিত। তারপরে চলবে কেবল লাভের ব্যবসা দেশের বিদেশের বাজারে। এতো কথা বললাম একটি কথা শিক্ষিত শহুরে ও শিক্ষা বিভাগের আর মন্ত্রণালয়ের লোকের কানে তোলার জন্যে, নজরে আনার জন্যে, তাঁদের মনে ধরানোর জন্যে, মর্মে পৌছানোর জন্যে। সেটি হচ্ছে আমাদের দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থায় কেবল ডাক্তারি-ইঞ্জিনিয়ারিং নয়, বিভিন্ন শাখার বিজ্ঞান এবং বাণিজ্যপদ্ধতি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান দানের, প্রশিক্ষণ দানের জন্যে বিশেষভাবে বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় ও বাণিজ্য বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন আবশ্যিক ও জরুরী। বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ে কেবল প্রশ্নোত্তরে পড়ানো লেখানো শেখানো নয়, গবেষণা করানোর বিশেষ ব্যবস্থা করানো। আর বাণিজ্য বিশ্ববিদ্যালয়েও অর্থবিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা, ব্যবসা পরিচালনা, পুঁজিবিনিয়োগ, হিসাববিজ্ঞান, বিপণন কৌশল, ব্যাংকিং প্রভৃতি সম্বন্ধে পড়ানো শেখানো ও গবেষণা করানো দেশের মানুষের দারিদ্র্য ঘোচানোর জন্যে, ব্যবসায় তাদের প্রেরণা, প্রণোদনা, প্রবর্তনা দানের জন্যে আবশ্যিক। তবে বিজ্ঞানের ও বাণিজ্যের শিক্ষার্থীদের মধ্যে মনুষ্যত্বের সুপ্ত ও গুপ্ত বীজ উপ্ত করানোর জন্যে সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন কিংবা সমাজবিজ্ঞান-এর একটি বিষয়ে সর্বস্তরে অবশ্য পাঠ রাখা আবশ্যিক। কেননা মানবতা ও মনুষ্যত্বহীন বিত্তবান সমাজের দায়— সম্পদ নয়। বিত্তবানকে চিত্তবান হতেই হবে মানবিক গুণের বিকাশ-বিস্তারের প্রয়োজনে।

AMARBOI.COM

অযৌক্তিক আকর্ষণের নাম মোহ

ইসলাম মক্কা-মদিনা অঞ্চলের গৌত্রিক হিংস্রতা ও বিরোধ-বিবাদ-প্রতিহিংসা পরায়ণতা ঘুচিয়ে আল্লাহর একত্বের ও প্রভুত্বের এবং মানুষের দাসত্বের (আবদ) ও আনুগত্যের স্বীকৃতিতে এক সংহত, সংযত, সহযোগী সহাবস্থানে অঙ্গীকারবদ্ধ ভ্রাতৃ সমাজের পত্তন ঘটাল। আল্লাহই জন্ম-জীবন-মৃত্যুর নিয়ামক-নিয়ন্ত্রক। তাঁকে ইচ্ছার, কৃপার, করুণার, দয়ার, দাক্ষিণ্যের, শাসনের, শাস্তির, পুরস্কারের, তিরস্কারের মালিক বলে জেনে ও মেনে তাঁর কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণে জীবন-জীবিকার ও মৃত্যুর পরে স্বর্গসুখের আশায়-আশ্বাসে নিশ্চিন্ত ও স্বস্থ থাকার নামই ঈমান। এতে নিঃসংশয় আস্থাবানই খাঁটি মুমীন বা বিশ্বাসী। এভাবে মক্কায় মদিনায় ও যাযাবর বেদুইনদের মধ্যে শান্তি স্থাপনের উৎস ও ভিত্তি বলেই এ মতবাদের নাম ইসলাম বা শান্তিবাদ। জন্ম-জীবন-মৃত্যুর মালিক সর্বশক্তিমান স্রষ্টা আল্লাহর উপর এ দৃঢ় আস্থাই তাদের পার্থিব জীবনে করেছিল অভীক শত্রুজিৎ, অর্থে সম্পদে ঋদ্ধ, খ্যাতি-ক্ষমতায়-মানে-মর্যাদায় তৃপ্ত, তুষ্ট ও হৃষ্ট এবং আল্লাহর ইচ্ছা ও মঙ্গলময়তা যে অমোঘ— এ বিশ্বাসে ওরা ছিল পুষ্ট। ফলে জগতে-জীবনে যা কিছু ঘটে, সবটাই আল্লাহর ইচ্ছায় ও হুকুমে ঘটে এবং আমাদের চোখে যা ভালো-মন্দ বলে ঠেকে তা-ও প্রাতিভাসিক মাত্র। কারণ আল্লাহ মঙ্গলময় ও করুণাময়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং ক্ষমাশীল। কাজেই সব ভালোর উৎস আল্লাহই। একে বীজ-বৃক্ষ-ফলের মতো অবিচ্ছেদ্য কারণ-কার্যরূপে উন্মেষযুগের মুসলিমরা জেনেছিল, বুঝেছিল ও মেনেছিল। ইসলাম বিবদমান গোত্রগুলোকে আল্লাহর প্রতি আনুগত্যে, ইব্রাহিমকে সবগোত্রেরই আদিপুরুষরূপে স্বীকৃতিতে এবং মুসলিম মাত্রেরই পারস্পরিক আত্মীয়তার ও বন্ধুত্বের ভিত্তিতে গড়ে উঠল আরবদের আত্মীয়সমাজ। যা এক অপরাজেয় অমোঘ শক্তিতে পরাক্রান্ত সামরিক ও রাষ্ট্রিক শক্তিরূপে অসামান্য ও অনন্য হয়ে স্বল্পকালের মধ্যেই উত্তর আফ্রিকা হয়ে স্পেনে, গোটা আরব উপদ্বীপ হয়ে ইরাকে-ইরানে যানবাহন ও বিচিত্র অস্ত্র বিরল সে-যুগে বিস্ময়কর সাফল্যে-জগদ্বাসীকে চমকে দিল। সব মুসলিম জানে ও মানে যে ইসলাম আল্লাহর সর্বশেষ এবং চিরকাল প্রযোজ্য জীবনবিধি। কাজেই তাদের দৃঢ়ধারণা হল ব্যক্তি যদি মুমীন হয় ও মুমীনের সমাজ যদি কোরআন-সুন্না মেনে চলে, তা হলে ইসলামের উন্মেষযুগের আরবদের মতো তাদের পার্থিব জীবনে কোন সঙ্কট-সমস্যা উদ্ভূত হতেই পারে না। এ প্রত্যয়ই বিশ্বব্যাপী মুমীনদের সৃষ্টির, আবিষ্কারের ও উদ্ভাবনের উদ্যম সুপ্ত রেখেছে। করেছে বন্ধ্যা যান্ত্রিক অভ্যস্ত রক্ষণশীল জীবনযাপনে স্বস্থ। নতুন চেতনা-চিন্তা হয়েছে শাস্ত্র বিরোধী বলেই অনভিপ্রেত। তারা মগজ রাখে নিষ্ক্রিয়, ভরসা রাখে কেবল মুনাজাতে। এর নাম অর্থোডকসি বা গোঁড়ামি নয় মুমীনের শাস্ত্রানুগত্য মাত্র। এমন নিষ্ঠা ও আনুগত্য মানুষ চিন্তা-চেতনাহীন রোবটকে প্রায় করে তোলে।

অথচ মক্কা-মদিনার বাইরের সব গোত্র, ধর্মসম্প্রদায়, ইসলাম বরণ করে স্বাধীন রাজ্য হারাল, হারাল নিজেদের গৌত্রিক, ভাষিক, আঞ্চলিক, দৈশিক, রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য। কেবল পারলৌকিক স্বর্গসুখ প্রাপ্তির নিঃসংশয় আশায়, আশ্বাসে ও নিশ্চয়তায় স্বস্তি সুখ পেল মাত্র। পার্থিব জীবনে গোটা আরব সাম্রাজ্যে সবাই আরবীকে মাতৃভাষারূপে বরণ করতে বাধ্য হল। কেবল ইরানীরা ও স্পেনীয়রাই গোড়ার দিকে নিজেদের ভাষাও ধরে রাখতে পেরেছিল। রাজত্ব করল কোরেশ বংশের উপ 'শাখা' উমাইয়ারা ও হাসেমীয় উপশাখার আব্বাসীয়রা প্রায় বারো শতক অবধি। অন্যরা ইসলাম বরণ করে পার্থিব জীবনে ধন-মান-যশের মালিক হয়নি, গোত্রীয় স্বাতন্ত্র্য হারিয়েছে, মাতৃভাষা আরামীয়া, হিব্রু, কপ্ট প্রভৃতি ভাষা বিলুপ্ত হয়েছে। আর তাদের আঞ্চলিক, গৌত্রিক, ভাষিক, আচারিক, সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যও লোপ পেল। ধর্মের ভাষায় ও শাস্ত্রে বিধিনিষেধ নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণের অনুকরণের ফলে।

আজো গোটা পৃথিবীর মানুষ যুক্তি-বুদ্ধি-বিদ্যা-প্রজ্ঞা প্রয়োগে যাচাই-বাছাই করতে রাজি নয় যে আরবে ইসলামের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে জীবননিয়ন্তা হিসেবে আল্লাহর অস্তিত্বে ও শক্তিতে আস্থা আরবদের মন যে বলে-ভরসায় ও নির্ভীকতায় উদ্দীপ্ত, অনুপ্রাণিত করেছিল এবং তাদের অর্থসম্পদ ও রাজ্য যে ঈমান-প্রসূন এ ধারণার মধ্যে কোন কারণ-কার্য সম্বন্ধ নেই। এ হচ্ছে কাকতালীয় আকস্মিকতাজাত অযৌক্তিক ধারা মাত্র। কারণ ইসলাম গ্রহণ-বরণ করে বিজিত অ-আরব এ শক্তি ও ঋদ্ধি পায়নি।

তাই আজো গোটা পৃথিবীর আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত শহুরে অথচ যুক্তিবাদে আস্থাহীন কিন্তু আশৈশব শ্রুত ও লব্ধ বিশ্বাসে-সংস্কারে-ধারণায় ও কিসসায় দৃঢ় প্রত্যয়ী মুসলিম মাত্রই মনে করে 'ঈমান' যদি দৃঢ় রাখা যায়, তাহলে পার্থিব জীবনেও মুসলিমরা হতে পারে জগজ্জয়ী ও অর্থসম্পদে ঋদ্ধ এবং আল্লাহর কৃপা-করুণা-দয়া-দাক্ষিণ্য-ক্ষমাপ্রাপ্ত-সুখী ও আদর্শ মানুষ। গড়তে পারে অভাবমুক্ত আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একালেও তাদের এ বিশ্বাসের জগতে বিচরণের ফলে গোটা দুনিয়ার মুসলিমদের পার্থিব প্রয়োজন চেতনা আবিষ্কারে-উদ্ভাবনে-সৃষ্টিতে অনুপ্রাণিত করে না, শাস্ত্রিক বিধিনিষেধের লৌহকঠিন খাঁচায় নিরাপদ ও যান্ত্রিক গতানুগতিক জীবনে অভ্যস্ত রাখে। এতেই তাদের স্বস্তি। কারণ তারা স্বল্পকালীন পার্থিব জীবনে তেমন গুরুত্ব দেয় না, অনন্তকালের আত্মিকজীবনে ভরসা রাখে।

পৃথিবীর সব মুসলমানের আজ জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি-প্রজ্ঞা প্রয়োগে জানতে বুঝতে হবে যে ঈমানের সঙ্গে অর্থ প্রাপ্তির, রাজ্য প্রাপ্তির, পণ্য উৎপাদনের-নির্মাণের-বিপণনের কোন কারণ-কার্য সম্পর্ক-সম্বন্ধ নেই। ইসলামের উন্মেষযুগে কলহে বিচ্ছিন্ন ও উপদ্রুত আরবেরাই কেবল নতুন প্রাণশক্তি নিয়ে নতুন জাতি হিসেবে বাঁচার গরজেই আত্মোন্নয়নের জন্যে রাজ্য বিস্তারে প্রাণপণে জীবন-মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করেছিল। এ প্রেরণা অ-আরব দীক্ষিত মুসলিমে কখনো ছিল না। তারা ইসলাম বরণ করে কেবল পারত্রিক সুখের স্বপ্ন সফল করতে চেয়েছে— এর জন্যে ত্যাগ করেছে স্বধর্ম, স্বভাষা, স্বঐতিহ্য, স্বসংস্কৃতি ও স্বাধীনতা। আরবে উদ্ভূত ধর্ম বরণ করে কেবল পরাধীনই হয়েছে, হয়েছে শাসিত ও শোষিত। ইরানী-তুর্কী-মুঘল রাজ্য-সাম্রাজ্য কিন্তু ইসলামি জোসের বা প্রেরণার ফল নয়। যেমন নেপোলিয়নের বা ব্রিটিশের সাম্রাজ্য বিস্তার খ্রীস্টধর্মের প্রেরণা-প্রসূন নয়। জেহাদ-ক্রুসেড সমকালীন রাজনীতিতে শাসকগোষ্ঠীর ধর্মের অপব্যবহার মাত্র। অজ্ঞ-অনক্ষর জনগণকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়ার অপকৌশল প্রয়োগ মাত্র। কাজেই পার্থিব ও প্রাত্যহিক জীবনের লাভ-ক্ষতির সঙ্গে, রজনীতির সঙ্গে, ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে, যুদ্ধ-লড়াই-দাঙ্গার সঙ্গে, বিজ্ঞানচর্চার সঙ্গে ধর্মের, ধর্মমতবাদী সম্প্রদায়ের কোন কারণ-কার্য সম্বন্ধসূত্র নেই।

AMARBOI.COM

ভদ্রলোক বাড়ছে, ভালোমানুষ কমছে

আমাদের দেশে বা রাষ্ট্রে সাফকাপুড়ে [White Collar] ধনী-নির্ধন ভদ্রলোকের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে— এদের মধ্যে স্বাক্ষর, স্বল্পশিক্ষার ও উচ্চশিক্ষার লোক রয়েছে। লেখাপড়া জানা লোক হলেই কিন্তু বিদ্বান-জ্ঞানী লোক হয় না। কিন্তু শিক্ষিত ও ভদ্রলোক বলে তাদের স্বীকার ও সম্মান করতেই হয়। কিন্তু ভদ্রলোকের সংখ্যা যেমন দ্রুত বাড়ছে, ভালোমানুষের সংখ্যা তেমনি দ্রুত কমছে। বলতে গেলে ভালোমানুষ বিরলতায় দুর্লভ ও দুর্লক্ষ্য হয়ে উঠেছে। অথচ এর কারণ অনুসন্ধানের, নিরূপণের ব্যবস্থা নেই, প্রয়াস-প্রযত্ন নেই, এমন কি সরকারী স্তরে কিংবা বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অথবা রাজনীতিকদের মধ্যে এ বিষয়ে চেতনা-চিন্তারও তেমন আভাস মেলে না। ফলে ভদ্রলোক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মস্তান-গুন্ডা-খুনী-বদমায়েশ-আদর্শহীন চরিত্রভ্রষ্ট লোকের সংখ্যা গাঁয়ে-গঞ্জে-বন্দরে-শহরে সব শ্রেণীর মধ্যেই বেড়ে চলেছে। এদের এখন কালো জগতের কালো সমাজের লোকেরা সগর্বে 'দুই নম্বরী' বলে অভিহিত করে-ওদের যোগ্যতা, সাহস ও শক্তি এবং কাজে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাফল্য দেখে। স্বকার্য সাধনে তাদের সাহায্য নিতে এখন কোন ভদ্রলোকের মনে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই। কেননা যুগটা হচ্ছে 'ফেল কড়ি মাখ তেল'-এর। আপোসে নীরবে-নির্বিরোধে-নির্বিবাদে-নিরুপদ্রবে নিরাপদে যদি সৎ-অসৎ, ন্যায়-অন্যায়, আইনী-বেআইনী কর্ম করতে চাও, তা হলে চুক্তিবদ্ধ হও। লেন-দেনে কোন ত্রুটি থাকা চলবে না। এদিক দিয়ে আমাদের দেশে প্রাত্যহিক জীবনের ব্যবসায়-বাণিজ্যে, চোরাচালানে, কালোবাজারে, সরকারী-আধা সরকারী দফতরে, কলে-কারখানায় ঔষধাদি সব পণ্যের ভেজাল উৎপাদনে-নির্মাণে কোথাও কোন বাধা-বিঘ্ন-বিপদ-ক্ষতির আশঙ্কামাত্র থাকবে না। আমাদের সবকিছু চলছে আপোসে ও চোরা-গোপ্তা পথে। এ-ই নীতি-নিয়মে, রীতি-রেওয়াজে, প্রথা পদ্ধতিতে পরিণত হয়েছে, গ্রাহ্য হয়েছে লোকসমাজে। সমাজ শাস্ত্রনিষ্ঠ আস্তিকের হলেও এগুলোতে কেউ অন্যায়, পাপ, বিবেক-সততা-ন্যায্যতা-আদর্শহীনতা দেখতে পায় না, সবটা চোখসহা, মনসহা, সমাজসহা স্বাভাবিকতা ও অভ্যস্ততা বলে গ্রাহ্য হয়ে গেছে।

এসব কেন হয় কেউ ভাবে না। আর্থিক ন্যায়; সামাজিক ন্যায়, রাষ্ট্রিক ন্যায় কিরূপ হওয়া উচিত, শাসিত জনের-নাগরিকের কি কি অভাব, কোন কোন্ কাঙ্ক্ষা, কত প্রকারের চাহিদা পূরণ কেবল সরকারেরই প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব, তা আজো জনগণকে জানানো হয় না, হয়নি। খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার অধিকার হচ্ছে প্রাণীপ্রজাতির প্রত্যেক মানুষের জাত জন্ম বর্ণ ধর্ম ভাষা নিবাস যোগ্যতা অবিশেষে রাষ্ট্রবাসী প্রত্যেক নাগরিকের জন্মগত ন্যায্য অধিকার। যারা কাজের যোগ্য তাদের কাজ দিয়ে যোগ্যতানুসারে কাজে লাগিয়ে জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা করে দেয়া এবং যারা পঙ্গু-পাগল-রুগ্ন-বৃদ্ধ-অসহায় অনাথ শিশু তাদের ভাতা দিয়ে পালন সরকারের তথা রাষ্ট্রের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য। সরকার মানে শাসক নয় আধুনিক গণতন্ত্রে, সরকার হচ্ছে সমবায় সংস্থার কার্যনির্বাহী-পরিষদ জনপ্রতিনিধি পরিষদ।

আমাদের আর একটি ভুল ধারণাও আমাদের দুর্দশার কারণ। আগের কালে সাক্ষরলোক-শিক্ষিতলোক স্বল্পসংখ্যক শাস্ত্রী ও চিকিৎসক ব্যতীত অর্থাৎ মোল্লা-পুরোত-শ্রমণ-আলিম এবং কিছু শতকিয়া, পণকিয়া, কাঠকালি প্রভৃতি জানা স্বল্পশিক্ষার কায়স্থ ব্যতীত লাখে একজনও ছিল না। চাকরিও ছিল সংখ্যায় অনেক কম। ব্রিটিশ আমলে অফিসে কাজের নীতি-নিয়ম-পদ্ধতি ভিন্ন রূপ নিল। আগে যে-সব কাজের জন্যে ফারসী জানা আবশ্যিক ছিল, এখন ইংরেজী জানা হল সেগুলোর জন্যে জরুরী। দেখে শুনে আমাদের ধারণা হয়ে গেছে যে, পড়ালেখা মানে দফতরে চাকরি পাওয়া ও করা। একালে গণশিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে, সাক্ষরতা হয়েছে সর্বজনীন, উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে সর্বত্র। শিক্ষণীয় বিষয়ও হয়েছে বহু ও বিচিত্র। কিন্তু চাকরি তো সে হারে বাড়েনি, বাড়ানো সম্ভব নয়। কাজেই জীবিকার বিচিত্র ব্যবস্থা থাকা চাই শিক্ষিত লোকের জন্যে। সে-ব্যবস্থার মুখ্যরূপ হচ্ছে পণ্য উৎপাদন ও পণ্য নির্মাণ। কৃষি-শিল্প ক্ষেত্রে আধুনিক প্রকৌশল-প্রযুক্তি প্রয়োগে দেশে ও বিদেশে উৎকৃষ্ট ও বিচিত্র পণ্য তৈরি করে বাজারজাত করা কিংবা নানা সামগ্রী নির্মাণের উপকরণ-উপাদান উৎপাদনে, নির্মাণে যোগানো, এক কথায় এ যুগ হচ্ছে বিজ্ঞানের ও বাণিজ্যের। এ দুটোতে দক্ষতা, প্রশিক্ষণ এবং প্রবণতা না থাকলে এ কালে জীবিকার্জন অসম্ভব। আমাদের দেশে জনগণ, বুদ্ধিজীবীরা কিংবা সরকার এসব কার্যকরভাবে গুরুত্ব দিয়ে ভাবনা-চিন্তার-প্রয়াসের-প্রযত্নের বিষয় করে তোলেনি। ফলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নকলে পাস, প্রশ্নোত্তরে পাস পড়ালেখা জানা অযোগ্য-অদক্ষ তরুণেরা কিছু করে উপার্জনের পথ খুঁজে পায় না। কিন্তু বেঁচে থাকার প্রয়োজনে রাজনীতিক দলের দালাল-মস্তান-গুণ্ডা-খুনী হচ্ছে, হচ্ছে চোরাকারবারী, চাঁদাবাজ, প্রতারক, ডাকাত। হচ্ছে নির্বিচারে নরহন্তা—সবটাই বাঁচার গরজে। অনন্যোপায় হয়েই ওরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বেপরোয়া হয়ে গোটা দেশে আঞ্চলিকভাবে গড়ে উঠেছে। ওরা নিজেরাও সুখ-শান্তি-স্বস্তি পাচ্ছে না, দেশের শান্তিপ্রিয় গৃহস্থদেরও নিশ্চিত নিরুপ্রদ্রব-নিরাপদ জীবনযাপনের সুযোগ দিচ্ছে না, সবাই সন্ত্রস্ত, সবাই বিপন্ন, সন্ত্রাসী ও সন্ত্রস্ত দু'পক্ষই বাস্তবে ব্যবহারিক ও মানসিকভাবে বিকৃত অসুস্থ অস্বস্থ জীবনযাপনে বাধ্য হচ্ছে। শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক ক্ষেত্রে দরিদ্র তৃতীয় বিশ্বের সব রাষ্ট্রেই, পূর্বতন ধনী রাষ্ট্রেও জনগণের সদ্ভাবে জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হলেই সেখানেও মস্তান-গুণ্ডা-খুনী-চোর-ডাকাত-প্রতারক নরহত্যা বাড়বে। বাড়বে রাজনীতিক অস্থিতি ও বিপর্যয়। আমরা সবাই জানি আদি ও আদিম খাদ্য প্রতীক কিংবা মানুষের সংস্কৃতি-সভ্যতার, চিন্তা-চেতনার, রুচির, স্বাচ্ছন্দ্যবুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে জীবনে চাহিদা পূরণের উৎস ও ভিত্তি যে-অর্থ, সে-অর্থ ব্যাঙ্কের চেকরূপে সম্পদ প্রতীক হয়ে স্থিতি পেয়েছে। কাজেই অর্থ মানে খাদ্য, অর্থ মানে জীবনের সর্ব প্রকার প্রাত্যহিক চাহিদা পূরণের কুঞ্জি।

সরকার শিক্ষিত তথা পড়ালেখা জানা সাফকাপুতে মানুষের মধ্যে যারা কায়িক শ্রমে অর্থ উপার্জনে অনীহ, তাদের কলে-কারখানায়-কৃষি ক্ষেত্রে পণ্য উৎপাদনের ও নির্মাণের মাধ্যমে রফতানী বাণিজ্যে কিংবা পণ্য বিনিময়ের ব্যবসায়ে জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা করেই দিতে হবে, অথবা বিভিন্ন দেশে খেটে রোজগার করার সুযোগ করে দিতে হবে— সবটাই সরকারের, রাষ্ট্রের দায়িত্ব এমন কি রাজনীতিক দলগুলোরও চিন্তাভাবনার বিষয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করাও সরকারের, জনগণের ও রাজনীতিক দলগুলোর যৌথ দায়িত্ব। নইলে এ সমস্যা থেকে, এ সঙ্কট থেকে, এ বিপদ থেকে 'নাহিরে পরিত্রাণ'।

আগের কালে সংবাদপত্র ছিল না, যানবাহন ছিল না, রাজ্যের সাম্রাজ্যের কোথাও না কোথাও ঝড়-ঝঞ্ঝা খরা বন্যা-মারী দুর্ভিক্ষে স্থানিকভাবে প্রতি বছরই হাজার হাজার লোক মরত। সে-সংবাদ স্থানান্তরে পৌঁছত না। রবীন্দ্রনাথের কবিতার ভাষায় বলা চলে ওরা ছিল 'নতশির মূক সবে/ম্লান মুখে তাদের লেখা শুধু, শত শতাব্দীর বেদনার করুণ কাহিনী। [তারা] নাহি ভর্ৎসে অদৃষ্টেরে, নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি/মানবেরে নাহি দেয় দোষ। নাহি জানে অভিমান/শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোনোমতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ রেখে দেয় বাঁচাইয়া'।

আজ সেদিন আর নেই। বিদ্যার, বিজ্ঞানের ও প্রযুক্তির প্রয়োগে ও প্রসারে তারে-বেতারে সংহত পৃথিবী আজ একটি জনপদ হয়ে উঠেছে। এখন তাই পৃথিবীর যে-কোন প্রান্তের গ্রামীণ নিঃস্ব নিরন্ন-নিরক্ষর মানুষও স্বশিক্ষিত হয়ে উঠেছে, আপন সত্তার স্বাতন্ত্র্য, মূল্য-মর্যাদা জন্মগত অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠছে। তারা এখন স্বাধিকার প্রমত্ত। আপন প্রাপ্য অধিকার চায় এবং তার জন্যে রক্তক্ষরা-প্রাণহরা লড়াইয়ে এগুতে প্রস্তুত। ভূতে-ভগবানে প্রেতে-পিশাচে-জীনে-পরীতে-মিত্র দেবতা-অপদেবতা-উপদেবতাতেও আস্থা একালে নিতান্ত শিথিল। তাই তারা স্বাধিকার স্বয়ং সংগ্রাম করে আদায় করতে তৈরি হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে পৃথিবীর সব রাষ্ট্রেই। নিয়তি নির্ভরতায় তাই আজ আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারুর প্রবোধ মেলে না। তাই আজকাল জনগণ ক্ষুব্ধ, রুষ্ট ও দ্রোহী সংগ্রামী। কাজেই রাষ্ট্রবাসী সবার অন্ন-আনন্দ যোগাতেই হবে রাষ্ট্রকে তথা সরকারকে। রাষ্ট্রের শক্তি তার অর্থ-সম্পদে। যাকে আমরা জাতীয় সম্পদ বলি, তা যদি না থাকে, তাহলে কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রে তথা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রতিটি মানুষের অন্ন-বস্ত্র যোগানো সরকারের তথা রাষ্ট্রের পক্ষে হবে অসম্ভব। যেমন নিঃস্ব দিনমজুর কাজ না পেলে প্রাণপ্রিয় স্ত্রী-সন্তানদেরও মুখে অন্ন যোগাতে পারে না, গাঢ়-গভীর যন্ত্রণায় নিবিড় বেদনায় ভোগে, কিন্তু অসহায় বলে সহ্য করতে হয়। রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও তাই ঘটবে। রাষ্ট্র যদি দরিদ্র হয়, অর্থ-সম্পদে দীন হয়, তাহলে সমাজতান্ত্রিক হয়েও লোকের অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থা করতে পারবে না। সে অবস্থায় অন্ন-বস্ত্রের অভাবে অনাহারে অপুষ্টিতে, অচিকিৎসায়-মারীতে লোক মরবে অকালে। খাদ্য লুটের, কাড়াকাড়ির, মারামারির ও হানাহানির দরুন রাষ্ট্রে কোন আইন-শৃঙ্খলা, মানুষের মধ্যে কোন নীতি-নিয়ম-আদর্শ কিংবা মনুষ্যত্ব চেতনা কার্যকর থাকবে না। তখন রাষ্ট্র ও সমাজ হবে অরণ্যতুল্য। সেই নৈরাজ্যে চলবে জাঙ্গলিক ও গাড্ডলিক নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ ও প্রথা-পদ্ধতি। আমরা মানুষেরা সব প্রাণী হয়ে উঠব। অবয়বে মানব প্রজাতি থাকব বটে, তবে মানবতা হবে দুর্লভ। প্রাণ থাকলেই প্রাণী হয়, কিন্তু বিবেক না থাকলে মানুষ হয় না। আর ন্যূনতম মানবিক গুণ বজায় রাখার জন্যে নিম্নতম হারে অশন-বসন-নিবাস-আনন্দ-শিক্ষা-স্বাস্থ্য-চিকিৎসার ব্যবস্থা রাখা একালে আবশ্যিক ও জরুরী। অতএব সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বন্টনে বাঁচার জন্যে চাই পণ্য উৎপাদনে নির্মাণে ব্যবসায়-বাণিজ্যে, দেশে-বিদেশে বাজার দখলের ও বিস্তারের প্রয়োজন চেতনা ও উদ্যোগ-আয়োজন। একালে বোধে-বিদ্যায়-ব্যক্তিত্বে প্রয়োজনে নতুন নতুন উপায় চিন্তার উদ্ভাবনের আবিষ্কারের মগজী যোগ্যতাসম্পন্ন যোগ্য জাতীয় নেতার তথা সরকার প্রধানের প্রয়োজন। আমরা যদিও জানি, নেতা গড়ে ওঠে, বানানো নেতা পুতুলবৎ, তবু নেতা জন্মানোর জন্যে অপেক্ষা করা চলে না, একালে নেতার প্রতীক্ষায় থাকা চলে না। যৌথভাবে মগজী অনুশীলনে অন্যদের অনুকরণে-অনুসরণে সাহায্যে-পরামর্শে স্বকীয় জ্ঞান-বুদ্ধি, সাহস-শক্তি, উদ্যম-উদ্যোগ প্রভৃতিকে যৌথভাবে পুঁজি-পাথেয় করে আমাদের সমকালীন জগতের সঙ্গে সর্বপ্রকারে সর্বক্ষেত্রে তাল রেখে সামাজিক ও ব্যক্তিকভাবে এবং রাষ্ট্রিক স্তরে জীবনপথে এগুতেই হবে। নইলে 'নাহিরে পরিত্রাণ'। আমাদের বাঙলাদেশ রাষ্ট্রে বিদ্বানের, চরিত্রবানের, আদর্শনিষ্ঠ, নৈতিক জীবনপ্রিয় নির্লোভ সংযত সহিষ্ণু সজ্জন ও সুজন মানুষের নিতান্ত অভাব। এর কারণ অনুসন্ধান ও নিরূপণ করে তার প্রতিকার ও প্রতিরোধব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে জরুরী ভিত্তিতে। এ দায়িত্ব মুখ্যত রাজনীতিক দলগুলোর এবং গৌণত বুদ্ধিজীবীদের। অভাবের সংসারে ভদ্রলোক ভালো মানুষ থাকে না, থাকতে পারে না। ভদ্র ঘরের শিক্ষিত সন্তানেরা কেন মস্তান-গুণ্ডা-খুনী-প্রতারক, চোরাকারবারী-দুইনম্বরী নীতিপ্রিয়, তা বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যাবে রাষ্ট্রের আর্থ-বাণিজ্যিক নয় কেবল, কৃষি-শিক্ষাক্ষেত্রে পণ্য উৎপাদন-নির্মাণ-নীতিপদ্ধতি উৎকর্ষ লাভ না করলে ভালো মানুষের সংখ্যা কমবেই, বাড়বে না। ভালোমানুষ থাকার জন্যে অর্থাৎ মানবিক গুণের, মানবতার রক্ষণের ও লালনের জন্যে অন্ন-বস্ত্রের অভাব মুক্ত নিশ্চিত জীবন আবশ্যিক ও জরুরী। জীবন-জীবিকার নিরুপদ্রব-নিরাপত্তাই সব ভালোর উৎস ও ভিত্তি। অতএব ভদ্রলোক ও ভালোমানুষ অভিন্নার্থক ও অভিন্নাত্মক নয়। ভালো মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি করতেই হবে সমাজকে ও রাষ্ট্রকে বাঁচানোর গরজেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ সূত্রে এও উল্লেখ করা দরকার যে অর্থোডক্সরা তথা শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ মানা গোঁড়া রক্ষণশীলরা কিংবা রাজনীতিসচেতন ফান্ডামেন্টালিস্টরা বা মৌলবাদীরা অতীত ও ঐতিহ্যমুখী, গ্রহণবিমুখ, বিজ্ঞানের তত্ত্বে, তথ্যে ও সত্যে আস্থাহীন বলে তাদের চিত্তলোকে যুক্তিবাদের, উদারনীতির, সহিষ্ণুতার ও সমকালীন জীবনের চাহিদা-চেতনা থাকে না, তাই তারা সৎ হলেও প্রগতিশীল ভালো মানুষ নয় আমাদের বাঞ্ছিত সংজ্ঞার্থে। কারণ তাদের মত-পথ অনুসরণে সমাজ উপকৃত হয় না, উন্নতির পথের সন্ধান পায় না।

ভাষা সংস্কারের নামে বাঙালী সত্তায় চির ধরানোর প্রয়াস

জন্ম-জীবন-মৃত্যু— এ কাল-পরিসরে মানুষের জীবন— তা ব্যক্তিক, সামাজিক, আর্থিক, শৈক্ষিক, নৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, দৈহিক, মানসিক প্রভৃতি যে-কোন প্রকারের হোক না কেন— সঙ্কট-সমস্যা থেকে লাগাতার বা একটানা মুক্ত থাকতে পারে না। কোন-না-কোন বিষয়ে বা ক্ষেত্রে লঘু-গুরু কিছু সঙ্কট-সমস্যা থাকেই। লাভ-লোভ-স্বার্থের ক্ষেত্রে নয় কেবল, প্রাকৃতিক ঝড়-ঝঞ্ঝা বন্যা-খরা-শৈত্য-উষ্ণতা উষরতা-উর্বরতা-মারী প্রভৃতি সম্পৃক্ত বিপদ-বিপর্যয়ও মানুষের ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক জীবনে কম ঘটে না। অতএব জীবিত মানুষের বাস সঙ্কট-সমস্যার মধ্যেই সীমিত। সন্ত-সন্ন্যাসী-বিরাগী-বিবাগী ঘরছাড়া মানুষের জীবন ও মন স্বাভাবিক নয়। কাজেই তাদের বিষয় আলোচ্য নয়। তারা আধিগ্রস্ত ব্যতিক্রম মাত্র। অতএব মৃত্যুতেই কেবল সঙ্কট-সমস্যার অবসান বা বিলুপ্তি সম্ভব, তার এক মুহূর্ত আগেও নয়।

তবু কথা থেকে যায়। সংকট-সমস্যা দু' প্রকার— পরিহার্য ও অপরিহার্য, অমোঘ এবং কৃত্রিমভাবে আরোপিত। আমাদের আলোচ্য হচ্ছে পরিহার্য, বানানো, অসদুদ্দেশ্যে তৈরি রাজনীতিক, আর্থিক, সামাজিক মান-যশ-খ্যাতি-ক্ষমতা-দর্প-দাপট প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জনের লক্ষ্যে নিতান্ত অজ্ঞ-অনক্ষর-উদাসীন লোককে প্রেরণা-প্রণোদনা-প্ররোচনা-উত্তেজনা-উদ্দীপনা বা উসকানি দিয়ে ব্যক্তিক বা দলীয় স্বার্থ বা প্রতিষ্ঠা অর্জন করার মতো অমানবিক প্রচারে প্রচারণায় মিথ্যাকে তথ্য ও ঘটনারূপে চালু করার মতো অপকর্ম অপরাধ। বাঙলাভাষার প্রচ্ছন্নশত্রু, বাঙালীসত্তার অভিন্নতা বিনাশে প্রয়াসী প্রচ্ছন্ন প্রবল শত্রু আজো রয়ে গেছে। মা জন্ম দেয়, ভূমি জন্মমুহূর্ত থেকেই কোল দেয়, লালন করে জন্ম-জীবন-মৃত্যু আশ্রয় ধাত্রী-ধরিত্রীতে-এর কোলই। তাই মাটি জন্মভূমি নয় শুধু, মায়ের বাড়া মাতৃভূমিই, মায়ের প্রয়োজন ফুরোয়, মাতৃভূমি মৃত্যুর পরেও দরকার হয়।

আজ আমরা তাই কেবল বাঙলাভাষার কথাই বলব। আঠারো শতকের শেষপাদ থেকে বিশ শতকের প্রথমপাদ অবধি বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির উর্দুভাষী মুসলিম নেতাদের স্বার্থবুদ্ধিপ্ররোচিত প্রচার-প্রচারণার ফলে দেশের বৌদ্ধ-হিন্দুজ নিম্নবর্ণের, নিম্নবর্গের, নিম্নবিত্তের আর ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ ঘরানা পেশাজীবী অজ্ঞ-অনক্ষর-স্বল্পশিক্ষিত মুসলিম সমাজে একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যাচ্ছিল যে বাঙালী দুস্থ দরিদ্র নিঃস্ব নিরন্ন গ্রামীণ মুসলিমরাও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুর্কী-মুঘল শাসকগোষ্ঠীর কেবল স্বজাতি নয়, জ্ঞাতিও এবং তারা ব্রিটিশপূর্বযুগে ধনী-মানী-শিক্ষিত ও সংস্কৃতিমান ছিল। ব্রিটিশ সরকার, পাদ্রী ও ব্রিটিশ সহকারী ও সহযোগী হিন্দুরাই হিন্দুর ভাষা বাঙলা মুসলিমদের উপর উনিশ শতকে চাপিয়ে দিয়েছে, রাজ্যচ্যুত শিক্ষিত মুসলিমরাও চাকরিচ্যুত হয়ে, জায়গীর, ওয়াকফ সম্পত্তি ও আয়মা সম্পত্তি হৃত হয়ে, কাজির পদ হারিয়ে, ইংরেজীকে প্রাশাসনিক ভাষা করায় ফারসী-জানা উকিলরা পেশাচ্যুত হয়ে অজ্ঞ অনক্ষর দরিদ্র হয়ে যায়। এবং প্রজন্মক্রমে এভাবে উপার্জনে বঞ্চিত এবং পিতৃসম্পত্তি বণ্টনে দরিদ্রতর হয়ে হয়ে বাঙলার মুসলিম সমাজ অজ্ঞ-অনক্ষর-হৃতসম্পদ ঐতিহ্যবিস্মৃত দুস্থ-দরিদ্র নিঃস্ব-নিরন্ন কুলি-মজুর-বর্গাচাষীতে পরিণত হয়েছে, আর প্রতিবেশী হিন্দুরা ব্রিটিশ কৃপায়-করুণায়-দয়ায়-দক্ষিণ্যে আশ্রয়ে-প্রশ্রয়ে-পোষণে ও সহযোগিতায় অর্থসম্পদের মালিক হয়ে মুসলিমদের মালিক-মনিব-প্রভু-শাসক-শোষক হয়ে দাঁড়িয়েছে শহরে বন্দরে নয় কেবল, গাঁয়ে-গঞ্জেও।

এসব মিথ্যার জাল একালে ঐতিহাসিক তথ্য-প্রমাণ দিয়ে ছিন্ন করেছেন অনেকেই অনেক লেখায়। এখানে এসবের পুনরুক্তি সম্ভব নয়। তবে কয়েকটি কথা সূত্র হিসেবে আমাদের মনে রাখা দরকার।

১. ইতিহাস বলে তুর্কী-মুঘল আমলেও দেশজ-মুসলিমরা নিম্নবর্ণের, নিম্নবর্গের, নিম্নবিত্তের ঘরানা বৃত্তিজীবীই ছিল । তারা বর্ণহিন্দুর শাসনে-প্রশাসনেই ছিল। বর্ণহিন্দুরাই ইংরেজ আমলের মতো তখনো ছিল শিক্ষিত প্রশাসক চাকুরে মহাজন ভৌমিক অর্থ-সম্পদ ও ক্ষমতার অধিকারী।

২. পৃথিবীর কোথাও এ শতকের আগে শিক্ষিত শতে শতে মিলত না, বাঙালী মুসলিমদের এবং তাদের জ্ঞাতি শূদ্রদের মধ্যেও শিক্ষার ঐতিহ্য ছিল না।

৩. তাই রাজ্যহারানোর অভিমান ও ব্রিটিশবিদ্বেষবশে মুসলিমরা ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করেনি— এ তথ্যে কোন সত্য নেই, বরং উর্দুভাষী শাসকগোষ্ঠীই ইংরেজীশিক্ষা গ্রহণ শুরু করে ইংরেজী রাষ্ট্রভাষারূপে চালু করার পরিকল্পনা গ্রহণের আগেই। নওয়াব আবদুল লতিফ প্রমুখের ইংরেজী শেখা নয় কেবল, মুর্শিদাবাদের নওয়াবের ১৮২৪ সনে ইংরেজী স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্যে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আবেদনও তার প্রমাণ, আরও একটি সাক্ষ্য এই ১৮৫৭ সনে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে ১৮৬০ সন থেকে উর্দুভাষী প্রশাসকগোষ্ঠীর লোকেরাই ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকে। প্রমাণ কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেন্ডার।

ব্রিটিশ বিদ্বেষ বশে ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণে বাধা থাকলে আরবী-ফারসী শেখার জন্যে কোলকাতা মাদ্রাসায় ও হুগলী কলেজে বা অন্যত্র বাঙালী মুসলিম শিক্ষার্থী আবেদনে নিবেদনে মিলল না কেন? হিন্দুবৌদ্ধজ মুসলিম সমাজে বাঙলা আরবী-ফারসী শিক্ষিতের সংখ্যা বাড়েনি কখনো দরিদ্র ছিল বলে এবং শিক্ষার ঐতিহ্য ছিল না বলে খুব কম লোকই সাক্ষর ও শিক্ষিত ছিল তুর্কী-মুঘল আমলে।

৪. আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মধ্যযুগে মুসলিম লিখিত কাব্যের ও ধর্মসাহিত্যের হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি বা পুঁথি সংগ্রহ করে ও পরিচিতি লিখে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন যে দেশজ মুসলিমরা পনেরো-ষোল শতক থেকে বাঙলায় সাহিত্য চর্চা করেছেন বিশুদ্ধ বাঙলায় হিন্দুর মতোই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুধু তা নয়, মহাভারত ও রামায়ণ থেকেই উপমাদি অলঙ্কারও যোগাড় করেছেন তাঁরা। চৌদ্দ-পনেরো শতকের শাহ মুহম্মদ সগীর, ষোল শতকের নবীবংশ রচয়িতা সৈয়দ সুলতান কিংবা সতেরো শতকের আলাউল, দৌলতউজির বাহরাম খান, কাজী দৌলত প্রভৃতি সব কবিই একালের বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের মতো ভাষাই প্রয়োগ করেছেন তাঁদের রচনায়। কাজেই ব্রাহ্মণ-পাদ্রীরা বাঙলা গদ্য তৈরি করেছিল মাত্র। বাঙলাভাষার মূল চরিত্র ও ধারা বিকৃত করতে পারেনি। বাঙলাভাষা যে হিন্দুর ভাষা নয়, তা আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ ১৯০৩ সনেই আল ইসলাম পত্রিকায় সাক্ষ্য প্রমাণ যোগে উচ্চ কণ্ঠে ও নিঃসংশয়ে ঘোষণা করেছিলেন। তিনি সে-প্রবন্ধে বলেছিলেন যে বাঙলাভাষা মুসলিমের শুধু মাতৃভাষাই নয়, জাতীয় ভাষাও। আবার একই কথা ১৯১৮ সনেও তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে উচ্চারণ করেছিলেন।

৫. যারা বলে বাঙলা একসময়ে আরবী ভাষায় লিখিত হত, তারাও অজ্ঞতারই পরিচয় দেয়। একসময়ে প্রায় ১৯৩০ সন অবধি মাদ্রাসায় বাঙলার প্রবেশাধিকার ছিল না। আরবীর ব্যাখ্যা-টীকাটিপ্পনী লেখা হত ফারসীতে কেতাবে হাশিয়ায় (মার্জিনে) এবং শিক্ষকরা তা শিক্ষার্থীদের তর্জমা করে দিতেন উর্দুভাষায়। বঙ্গাক্ষরে অজ্ঞ কৌতূহলী মৌলবীর জন্যে বাঙলা বাক্য ও ধর্মগ্রন্থ ক্বচিৎ কেউ ফারসী হরফে লিপ্যন্তর করেছেন মাত্র। প্রমাণ :

চট্টগ্রামের কবি মুহম্মদ জান তাঁর 'নামাজ-মাহাত্ম্য' পুঁথিতে লিখেছেন (১৮৫২ সনে) :

(ক) 'আরবী আঙুলে যদি বাঙলা লিখন। সত্তর নবীর বধ তাহার উপর।'

(খ) আঠারো শতকের প্রথমপাদের কবি নসরুল্লাহ খোন্দকারের 'শরীয়তনামা'র লিপিকার বলেছেন: কন্ (কোন্) হরফে কন্ (কোন্) লফজ ন বুঝি অর্থ/বাঙ্গালা অক্ষর হেরি আরবীর পুস্ত। (লিপিকার আলিজান)

(গ) হীন আফতাবুদ্দিন কহে আল্লা নবী/পূর্বের বাঙ্গালা অক্ষর আমি করিলাম আরবী। (সৈয়দ সুলতান রচিত রসুল চরিত্রের লিপিকার)

উক্ত 'আল ইসলাম' পত্রিকায় ১৯০৩ সনেই পাদটীকায় আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ বলেছিলেন যে 'দোভাষী বাঙ্গালা শিক্ষিত লোকের ভাষা নহে।' ইত্যাদি কাজেই বাঙলাভাষা চিরকালই দেশজ বাঙালী নির্বিশেষের ভাষা। হিন্দুরও নয়, মুসলিমেরও নয়। বাঙলাভাষা কোলকাতার ও ঢাকার ভদ্রলোকের-শিক্ষিত লোকের লিখিত বাঙলাভাষা তেরো-চৌদ্দ-পনেরো শতক থেকেই অভিন্ন।

৬. আরবী ফারসী উর্দুভাষা ও মুসলমানের ভাষা নয়। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই ইব্রীয়দের হিব্রুর ও আরবীর হিন্দি-বাঙলার মতে অভিন্ন উৎস ও ভিত্তি। আরবীভাষা প্যাগান, কাফের, ইহুদী, খ্রীস্টান নির্বিশেষের মাতৃভাষা ছিল ও আছে, ফারসীও তাই। ভারতে উর্দুও তাই। এ জন্যেই ইসলাম পূর্বকালেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা আমিনা, খাদিজা, মুহম্মদ, আবু তালেব, আবদুল্লাহ, আবদুল মুত্তালেব প্রভৃতি নাম চালু ছিল, দেখতে পাই। ফারসী নামগুলোও অমুসলিম-মুসলিম নির্বিশেষের মধ্যে চালু রয়েছে। কাজেই মুসলমানি বাঙলা বলে কিছু ছিল না, নেই বরং ভবিষ্যতেও থাকবে না।

৭. সাধারণ অজ্ঞলোকেরা মনে করে শাস্ত্রিক সামাজিক আচার-আচরণ, নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ, প্রথা-পদ্ধতি শাস্ত্রিকভাবে মেনে চলাই জীবনের রূপায়ণই জাতীয় বা সাম্প্রদায়িক বা আঞ্চলিক সংস্কৃতি। অথচ সংস্কৃতিমানতা হচ্ছে নতুন চেতনায়, নতুন চিন্তায়, নতুন উদ্যমে, নতুন সৃষ্টিতে, নির্মাণে, জীবনযাত্রার সর্বক্ষেত্রে বস্তুগত ও জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তিগত উৎকর্ষে ও প্রগতিতে অগ্রগতিতে আর আবিষ্কারে উদ্ভাবনে সৃজনে নির্মাণে নবপল্লবের মাধ্যমে যেমন বেড়ে ওঠে বৃক্ষ, তেমনি বস্তুগত ও মানস সম্পদগত উৎকর্ষে বিবর্তনধারা প্রবহমান জলস্রোতের মতো চেতনাচঞ্চল ও গতিশীল রাখা। অতএব সংস্কৃতি স্থির ও স্থায়ী রূপের কিছু নয়। এ অর্থে স্থানিক ও জাতীয়ও নয়, সকল সংস্কৃতি মানবিক গুণেরই বিচিত্র বিকাশ।

৮. আর আঞ্চলিক, সাম্প্রদায়িক বা রাষ্ট্রিকভাবে কেউ যদি হরফ বদলাতে, বানান বদলাতে, শব্দ বদলাতে, বাগ্বিধি বদলাতে চায় কোন রাজনীতিক বা সাম্প্রদায়িক বদ-উদ্দেশ্যে, তা হলে তা হবে বাঙালীসত্তার, বাঙালী চেতনার বিকৃতি ও বিলুপ্তি ঘটানোর নামান্তর। মনে রাখতে হবে একালের বাঙলাভাষী অঞ্চল কখনো কারুর একক ও প্রত্যক্ষশাসনে ছিল না কখনো। তবু আমাদের রক্তসাঙ্কর্য, বর্ণভেদ ও শ্রেণিভেদ সত্ত্বেও আমরা রক্তের মতো অভিন্ন মূল এক সংহত ভাষিক জাতি।

AMARBOI.COM

বিশ্বজুড়ে চলবে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন

আস্তিক মানুষ মাত্রই স্বধর্মকে সত্য ও শ্রেষ্ঠ বলে জানে ও মানে। আর অন্যের যে-কোন ধর্মকে ভুল ত্রুটিপূর্ণ অসম্পূর্ণ অথবা মিথ্যে বলে মনে করে। সে-কারণে স্বধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের অহঙ্কার এবং পরধর্মের অপকর্ষের দরুন বিধর্মের ও বিধর্মীর প্রতি ঘৃণা, অবজ্ঞা এবং অবিশ্বাস মনের মধ্যে কখনো জাগ্রত, কখনো সুপ্ত, কখনো বা গুপ্ত থাকে। যেমন আমার চেয়ে যে বিদ্যায়-বুদ্ধিতে ধনে-মানে-শিক্ষায় হীন, তার প্রতি আমার মনের গভীরে একটা তাচ্ছিল্য থাকে। কিন্তু এই জন্যে তার প্রতি আমরা কখনো ঝগড়া-বিবাদ না হলে ঘৃণা-অবজ্ঞা-অশ্রদ্ধা কিংবা নিন্দা প্রকাশ করি না, তেমনি ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রেও কোন বিশেষ কারণে বিশেষ স্থানে ধর্মসম্পৃক্ত কোন বিবাদ প্রাচীন ও মধ্যযুগে ঘটে থাকলেও তা ঘরোয়া জীবনে সংঘটিত ঝগড়া-বিবাদের মতোই স্বল্পক্ষণের মধ্যেই মিটে যেত, কখনো দীর্ঘস্থায়ী বা দুই ধর্মমতবাদীর মধ্যে বিস্তারলাভ করত না। তখন নিরক্ষরতার বাহুল্য ছিল, সংবাদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছড়াত না। রেডিও-টিভি-সংবাদপত্র ছিল না, তাছাড়া মুসলিমরা সংখ্যালঘু হলেও ছিল শাসকগোষ্ঠী, হিন্দুরা সংখ্যাগুরু হলেও ছিল শাসিতপ্রজা।

উনিশ শতকের গোড়া থেকেই ব্রিটিশ যখন স্থির করল যে তারা এদেশ শাসনও করবে, শোষণও করবে এবং বাণিজ্যও করবে, তখন তারা ভেদনীতির আশ্রয় নিয়ে হিন্দুস্তানী সব অমুসলমানকে হিন্দু এবং তুর্কী-মুঘল ও দেশজ মুসলিমকে মুসলিম নামে আখ্যাত করে বিকৃত ইতিহাস রচনার ও প্রচারণার মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক চেতনার বিষ নিষ্ঠার সঙ্গে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিতে থাকে। অথচ তারা খ্রীস্টান হল না, ব্রিটিশই রইল। এই সাম্প্রদায়িকতা ছড়ানো যে ব্রিটিশেরই দান তার প্রমাণ— আগে মানুষ নিবাসের নামেই ছিল পরিচিত। যেমন মারাঠি, মদ্রাজী, গুজরাটি, দেহলভী, সমরখন্দি, বুখারি, পার্সী, ইংরেজ, দিনেমার, ওলন্দাজ, ফিরিঙ্গী কিংবা গোত্রীয় নামে খলজী, তুঘলুক, লোদী, সৈয়দ প্রভৃতি নামে পরিচিত হত। কাজেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ব্রিটিশ শাসকের ভেদনীতির প্রত্যক্ষ অবদান। তাদের রোপা বৃক্ষের ফল, ব্রিটিশভারত বিখণ্ডিত হওয়ার ফলে আরও গভীর এবং ব্যাপকভাবে দেশের আবহাওয়া আরও বিষাক্ত এবং মানবিক সম্পর্ক আরও তিক্ত হয়ে উঠছে। সব মানুষ কখনো নাস্তিক হবে না। এ সাম্প্রদায়িকতা বিলুপ্তির তিনটি পথ— এক, যথার্থ সেক্যুলার রাষ্ট্র গঠন; দুই, সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এবং তিন, অঞ্চলভিত্তিক অর্থ-সম্পদে ঋদ্ধ হওয়ার লক্ষ্যে জাত-ধর্ম-ভাষা নির্বিশেষে আঞ্চলিক কনফেডারেশন গঠন।

AMARBOI.COM

প্রসঙ্গ মৌলবাদ

উনিশ শতকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদারপন্থীরা যখন বাইবেলে অনাস্থা প্রকাশ করতে থাকে তখন প্রোটেস্টানরা বাইবেলে আক্ষরিক ও সামগ্রিক সত্যতায় আস্থা প্রকাশ করতে থাকে। এবং তারা নিজেদের মৌলবাদী বলে প্রচার করে। অন্যরাও অবজ্ঞায় এদের মৌলবাদী বলে আখ্যাত করে। ১৮৯৪ সনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মৌলবাদীদের একটা সম্মেলন হয়। কিন্তু ধর্মধ্বজীদের জীবনে ধর্মের রাজনীতিক ব্যবহারে আগ্রহশীলদের মৌলবাদী বলা শুরু হয় সম্ভবত ফ্রান্সে, লালন পায় ইংল্যান্ডে এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে প্রয়োগ করে ফায়দা লুটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একালে। শব্দটি আক্ষরিক অর্থে ভালোই। শাস্ত্রের মূল শিক্ষার বা বাণীর বা ঘোষণার অনুগত থাকাই হচ্ছে মৌলবাদ। এখন রাজনীতিক কারণে মৌলবাদ ধর্মান্ধতা, পরমত অসহিষ্ণুতা, সাম্প্রদায়িকতা এবং প্রতিক্রিয়াশীলতা নির্দেশক হয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ শব্দ এখন নিন্দা, ঘৃণা ও ধিক্কারব্যঞ্জক। শব্দটির উৎপত্তি যুক্তরাষ্ট্রে খ্রীস্টধর্ম বিষয়ক হলেও কূটনীতির কাজে লাগিয়েছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। এশিয়ায় ও আফ্রিকায় তার রাজনীতিক প্রভাব সুষ্ঠু ও দৃঢ় রাখার মতলবে বিভিন্ন ধর্মীয় দলকে ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-সংঘাতে বিভক্ত রাখাই এর লক্ষ্য এবং তাতে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন দেশে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সফলও হচ্ছে। কাজেই মৌলবাদ এখন প্রকৃত অর্থে ধর্মসম্পৃক্ত নয়, রাজনৈতিক প্ররোচনা উদ্ভূত। সোভিয়েত রাশিয়া ভাঙার পরে যুক্তরাষ্ট্র এখন আর মৌলবাদ প্রসারে তেমন আগ্রহী নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রসঙ্গ বিচ্ছিন্নতাবাদ

এ যুগে অতি দ্রুত বিভিন্ন প্রয়োজনীয় যন্ত্রের উদ্ভাবনের আবিষ্কারের ও নির্মাণের ফলে জীবনযাত্রায় আমূল পরিবর্তন ঘটে। বিশেষ করে তার-বেতার যন্ত্রের মাধ্যমে খোলা আকাশের বায়ুবাহী হয়ে পৃথিবীর সর্বপ্রকার চিন্তা-চেতনা এবং ঘটনা ঘরে-বসা মানুষের চোখে-কানে-মনে জাগ্রত মুহূর্তে ক্ষণে ক্ষণে ধরা দিচ্ছে। ফলে দাসত্বে ও আনুগত্যে চির অভ্যস্ত পৃথিবীর অজ্ঞ-অনক্ষর মানুষেরা আকস্মিকভাবে এই যন্ত্রনির্ভর জীবনে ক্রমে আত্মসচেতন হয়ে উঠেছে, উঠছে। তাদের জেগেছে স্ব-সত্তার মূল্য ও মর্যাদাবোধ। ফলে গোষ্ঠীক, গৌত্রিক, ভাষিক, আঞ্চলিক এবং বার্ণিক স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধিকার চেতনা তাদের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছে। এ জন্যেই তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীনতার স্বাদ পেতে চায়। এ কারণেই আমার ধারণা রাশিয়ার মতো, ইরাকে, তুরস্কে, ভারতে, চীনে, পাকিস্তানে, যুগোস্লাভিয়ায়, মায়ানমার এবং পৃথিবীর ভিন্নদেশে এরূপ গৌষ্ঠীক, গৌত্রিক, ধার্মিক এবং বার্ণিক সম্প্রদায়ের বিচ্ছিন্নতা সংগ্রাম প্রতিরোধ করা যাবে না।

অবশ্য এও জানি যে একালে অর্থাৎ যন্ত্র যখন পৃথিবীকে একটা বাজারকেন্দ্রী জনপদে পরিণত করেছে, একই বাজারে ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে পণ্য-বিনিময় আবশ্যিক ও জরুরী করে তুলেছে, তখন স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোর বিচ্ছিন্নতায় ও স্বাতন্ত্র্যে বাঁচা কোনো রাষ্ট্রের পক্ষেই একালে সম্ভব হচ্ছে না, হবে না। তাই আঞ্চলিক কনফেডারেশন তৈরি করে বহু রাষ্ট্রের একত্রে সহযোগিতায় সহাবস্থান করতেই হবে। অতএব প্রথমে বিচ্ছিন্নতা ও স্বাধীনতা এবং পরিণামে গরজে পড়েই বিভিন্ন সমকক্ষ রাষ্ট্রের সহযোগিতামূলক শিথিল কনফেডারেশন গড়ে উঠবে বলে আমার ধারণা। পৃথিবীতে একালে মিশরের গামেল আবদুল নাসেরই এরূপ আরব রাষ্ট্রের সংহতির স্বপ্ন দেখতেন। এখন যেমন ইউরোপীয় কমন মার্কেট গড়ে উঠেছে এবং বিস্তৃতি লাভ করছে বাঁচার তাগিদেই মাস্‌সখীট, নাফতা, গ্যাট, সার্ক প্রভৃতি রূপে।

প্রসঙ্গ জাত-পাত

আমি জাত, জন্ম, বর্ণ, ধর্ম, নিবাস, ভাষা প্রভৃতি কোন কিছুর মূল্য ও পরিচিতি প্রভৃতি স্বীকার করি না। এবং আমি মনে করি জাত-পাত প্রভৃতির উর্ধ্বে উঠে বৈশ্বিক মানবচেতনা অর্জনের ও দানের জন্যে মানুষকে কেবল নির্বিশেষ মানুষ হিসেবে ভাবতে হবে। তার প্রথম পরিচয় মানুষ, তার শেষ পরিচয়ও মানুষ। ইহুদী, খ্রীস্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান থাকা মানুষের লক্ষ্য হতে পারে না। মানুষ হওয়াই তার লক্ষ্য বলে আমি মনে করি এবং এজন্যে আজ অবধি আমি তিনটে পন্থার যে কোন একটি গ্রহণীয় বলে মনে করি— ১. স্রষ্টা স্বীকার করেও শাস্ত্র না মানা ; ২. নাস্তিক হওয়া এবং ৩. কম্যুনিস্ট বা সাম্যবাদী কিংবা ইহজাগতিক সর্বপ্রকার পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে সেক্যুলার হওয়া। ধর্মবিশ্বাস মনে ও মর্মে পোষণ করা আর ব্যক্তিগতভাবে আচারে-আচরণে মেনে চলা।

মানুষের সেবা করতে হলে মানুষকে ভালোবাসতে হয়। যারা মানবপ্রেমী নয়, অথচ মান-যশ-অর্থ-সম্পদ-খ্যাতি-ক্ষমতার জন্যে দেশসেবী রাজনীতিক হয়, তারা সব সময়ে নিজ নিজ স্বার্থেই ভোট যোগাড়ের লক্ষ্যে অধিকাংশ ভোটারের মন যোগানোর মতলবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকে। তারাই জাত-পাত ও সাম্প্রদায়িক দ্বেষ জাগিয়ে সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করে ফায়দা লোটে এবং দাঙ্গা বাধায়।

প্রসঙ্গ সেক্যুলারিজম

এ যন্ত্রযুগে ও যন্ত্রনির্ভর জীবনে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের রাষ্ট্রের ভৌগোলিক ব্যবধান একেবারেই ঘুঁচে গেছে। ফলে পৃথিবীতে হেন রাষ্ট্র পাওয়া যাবে না যেখানে বিভিন্ন ধর্মের, রক্তের, গোত্রের, গোষ্ঠীর স্বার্থের ও শ্রেণীর মানুষ কম-বেশি বাস করে না। শাহ-সামন্ততন্ত্রের যুগে শাসকের বা সরকারের সঙ্গে প্রজার সম্পর্ক ছিল কেবল লেন-দেনের, শাসক-শাসিতের, শোষক-শোষিতের, দাসের ও প্রভুর। সেখানে রাজধর্মই প্রাধান্য পেত। প্রজার মন-মতের কিংবা তার আর্থিক বা মানসিক দুঃখ-যন্ত্রণা-বেদনার সঙ্গে রাজার যোগ ছিল না। আধুনিককালে প্রতিটি মানুষই স্ব-সত্তার স্বাতন্ত্র্য, মূল্য ও মর্যাদা সচেতন। এ-যুগে প্রবলের বা সংখ্যাগুরুর কিংবা শাসকের-মত-পথ সংস্কৃতি ও শাস্ত্রিক আচার ভিন্ন মতের-পথের মানুষের ওপর জোর করে চালিয়ে দেওয়া চলে না। সে-জন্যেই আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সেক্যুলার বা জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা, অঞ্চল নির্বিশেষে মানুষকে যোগ্যতা নিরপেক্ষভাবে সমান নাগরিক রূপে স্বীকার করে শাসন ব্যবস্থা চালু রাখা আবশ্যিক ও জরুরী।

সেক্যুলারিজমের তাৎপর্য হচ্ছে এই, আস্তিক বা বিশেষ ধর্মমতের লোকের দ্বারা গঠিত হলেও কোনো ধর্মের অস্তিত্ব সরকার কথায় ও কাজে এবং আচরণে স্বীকারই করবেন না। ধর্ম আছে কি নেই সে-বিষয়ে কোন মত ও মন্তব্য প্রকাশই করবেন না। সরকার যে-কোন ধর্মবিশ্বাসেরই ধর্মীয় পালা-পার্বণ সম্পর্কে থাকবেন উদাসীন, নিরপেক্ষ। এবং সে-কারণেই সরকারি লোকেরা ধর্মীয়-সামাজিক পালা-পার্বণে যোগ দেবেন না। রাষ্ট্র, সরকার এবং প্রশাসক আঁধা-কানা-খোঁড়া, পণ্ডিত-মূর্খ, ধনী-নির্ধন, জাত, জন্ম, বর্ণ, ধর্ম, ভাষা, নিবাস নির্বিশেষে মানুষকে কেবল মানুষ হিসেবে জানবে, বুঝবে এবং মানবে। তার যোগ্যতা হিসেবে তাকে কাজ দেবে, অথবা কাজে অসমর্থ হলে তাকে ভাতা দেবে, সব মানুষকে সমান নাগরিকের মর্যাদা দেবে।

প্রসঙ্গ ধর্ম

নৃবিজ্ঞানীরা এবং দার্শনিকেরা বলেন, ভয় থেকেই ভগবানের উৎপত্তি। আত্মরক্ষার প্রয়াসে অজ্ঞ-অসহায় মানুষের বিস্ময়-কল্পনা-ভয়-ভরসাজাত বিশ্বাস-সংস্কার থেকেই ভূত, প্রেত, পিশাচ, যক্ষ, রক্ষ, ড্রাগন মিত্র ও অরি দেবতা প্রভৃতি শক্তির উদ্ভব। এইজন্যে মন্দ এবং সৎশক্তির প্রতীক রূপে অরি ও মিত্র দেবতার উদ্ভব। আদি ও আদিম মানবে সর্বপ্রাণবাদ, যাদুবিশ্বাস, টোটেম-ট্যাবু সংস্কার প্রভৃতির ক্রমবিকাশে মনন-মনীষার উৎকর্ষের ফলে মানুষ একেশ্বরবাদী এবং নাস্তিক হয়েছে এবং সমাজে মানুষকে দেশনা দানের, বিধিনিষেধ নির্দেশ করার নিয়ম-নীতির, রীতি-রেওয়াজের অলিখিত সমষ্টির নাম হল শাস্ত্র। পরে সেগুলোর লিখিতরূপ পাওয়া যায়।

জন্মমুহূর্তে থেকে পারিবারিক এবং সামাজিক প্রতিবেশে মগজধোলাই হয় বলেই বিশেষ করে আত্মার অস্তিত্বে এবং অমরত্বে আস্থাবান মানুষের পরলোকে প্রসৃত জীবনচেতনাই মানুষকে সারা জীবন আস্তিক রাখে। আসলে আজ অবধি কোন মানুষ সৃষ্টি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্রষ্টা, আত্মা সম্পর্কে কিছু জানেও না, বোঝেও না, কেবল অনুমানে এবং আন্দাজে এসবের অস্তিত্বে আস্থা রাখে। প্রমাণ ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার, নারী কি পুরুষ, তার স্থিতি কোথায়, তার সৃষ্টির আদর্শ-উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি? এ সম্পর্কে পৃথিবীর কোন দুটি শাস্ত্রের, কোন দু'জন মনীষীর বা দার্শনিকের মধ্যে ঐক্য নেই। বরং মতের ও সিদ্ধান্তের মধ্যে পার্থক্য ও বৈপরীত্যই বেশি। এ-কারণেই চিরকাল ধর্মমতের দেশে-দেশে, কালে-কালে জন্ম-মৃত্যু বা উদ্ভব এবং বিলুপ্তি ঘটেছে। এবং বারবার পরিবর্তিত ও সংশোধিত হয়েছে— মতৈক্য মেলেনি কোথাও। এতেই বোঝা যায় স্রষ্টা, সৃষ্টি ও শাস্ত্রতত্ত্ব দেশে-দেশে কালে-কালে সামাজিক প্রয়োজনে বা যৌথজীবনে সহযোগিতায় ও নির্বিরোধ, নির্বিবাদ, নিরুপদ্রব, নির্বিঘ্ন, নিরাপদ সহাবস্থানের গরজে মানব-হিতৈষী মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তিরা দেশে দেশে, কালে কালে, দেশকালের প্রয়োজনে আসমানী দোহাই যোগে প্রচার করেছেন। অজ্ঞেয় শক্তিতে বিশ্বাসই এর ভিত্তি ও পুঁজি।

প্রসঙ্গ মার্কসবাদ

পৃথিবীতে প্রাগ্রসরতম চিন্তা-চেতনার ফসল হচ্ছে মার্কসবাদ। এর থেকে উৎকৃষ্ট কোন মতবাদ বা পদ্ধতি তো উদ্ভাবিত হয়নি। মার্কসবাদের সমান বিকল্পও এ-মুহূর্তে কল্পনাতীত। সেজন্যে ত্রুটি মার্কসবাদের নয়, মার্কসবাদীদের প্রাশাসনিক অযোগ্যতা, চরিত্রের এবং বিভিন্ন রকমের দুর্নীতির, অব্যবস্থার, বিশেষ করে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র হয়েও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এমন কি শুধু অস্ত্রে নয়, আকাশ প্রতিযোগিতায়ও অবতীর্ণ হওয়ার ফলে বঞ্চিত জনগণের দ্রোহ মার্কিন ও তার চেলা রাষ্ট্রগুলোর প্ররোচনায় ত্বরান্বিত হল পূর্ব য়ুরোপের ওয়ার্সচুক্তিভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর ও সোভিয়েত রাশিয়ার ভাঙন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীন ভাঙারও পাঁয়তারা করছে বিগত কয়েক বছর ধরে।

আমি মনে করি, শাহ, সামন্ত, বেণে শাসনে কোন মানুষেরই বেঁচে থাকার, কাজ পাওয়ার, অসমর্থের ভাতা পাওয়ার জন্মগত অধিকার স্বীকৃত নয়। কাজেই পূর্ব য়ুরোপ, রাশিয়ায় আবার ভিখিরী নিঃস্ব নিরন্ন বেকার দুষ্ট দুর্জন দুর্বৃত্ত চোরাকারবারী মৌজুদদার দুর্নীতিবাজ প্রভৃতি পূর্বের মতোই সমাজস্বাস্থ্যকে বিনষ্ট করবে। ওই সব দেশও সর্বপ্রকারে আমাদের দেশের মতোই হয়ে পড়বে। এককথায় মার্কসবাদের নতুনত্ব ও গুরুত্ব এই যে, মা-বাপের যেমন সন্তান লালন-পালন অবশ্য দায়িত্ব ও কর্তব্য, তেমনি রাষ্ট্রবাসী সক্ষম জনগণকে জীবিকা অর্জনের সুযোগ করে দেয়া এবং অক্ষমদের ভাতা দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব হচ্ছে রাষ্ট্রের ও সরকারের। বাঁচার অধিকার হচ্ছে জন্মগত অধিকার। রাষ্ট্রের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে জনগণকে ভাতে-কাপড়ে বাঁচিয়ে রাখা। আড়াই হাজার বছর আগে একবার বর্ধমান মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধ মশা-মাছি-কীট-পতঙ্গ থেকে তিমি-হাতির সহাবস্থানের অধিকার স্বীকার করেছিলেন। আর কার্ল মার্কস মানুষ নির্বিশেষের বাঁচার জন্মগত অধিকার ঘোষণা করেছিলেন গত শতকে। আমার যুক্তি এবং বুদ্ধি অনুসারে সমাজতন্ত্র পৃথিবীর সর্বত্র চালু করার আন্দোলনে নামবে মানুষ অদূর ভবিষ্যতে। কেন না, বাঁচার এবং বাঁচানোর জন্যেই আর্থিক সুবিচারের ব্যবস্থা রাখতেই হবে এবং সে-সুবিচার সম্ভব কেবল পণ্যের উৎপাদনে-নির্মাণে-বণ্টনে দেশী এবং বিদেশী বাজারে চালানোর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপরেই নির্ভর করবে এ যন্ত্রযুগে। এবং সমবেতভাবে প্রতি রাষ্ট্রেরই জাতীয় স্তরে সম্পদ বৃদ্ধির অনবরত প্রয়াস চালাতে হবে।

[সম্প্রতি ঢাকায় ডঃ আহমদ শরীফের ধানমন্ডীস্থ বাসভবনে কলকাতার বিদ্যাসাগর মহিলা কলেজের অধ্যাপক ডঃ প্রথমা রায়মণ্ডল যে দীর্ঘ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন তার অংশবিশেষের ভিত্তিতে তিনি এই রচনাটি তৈরি করে দিয়েছেন। কলিকাতার দৈনিক বসুমতী, রবিবার, ১২ জানুয়ারি ১৯৯২ সন।]

কাজী আব্দুল ওদুদ

কাজী আবদুল ওদুদের জন্ম ১৮৯৪ সালে ২৬ এপ্রিল, ফরিদপুর জেলার পাংশা থানার অন্তর্গত বাগমারা গ্রামে এবং মৃত্যু ১৯৭০ খ্রীস্টাব্দের ১৯ মে কোলকাতায় প্রায় ছিয়াত্তর বছর বয়সে। কাজেই সাধারণভাবে বলা চলে তিনি দীর্ঘজীবী ছিলেন। এ রকম সুদীর্ঘ জীবনের চিন্তা-চেতনার, রুচির, মতের ও পথের বিবর্তন ঘটেই। জ্ঞান, বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞার সঞ্চয়ের ও প্রভাবের ফলে এমনি অবস্থায় — যতবড় বিদ্বান যুক্তিবাদী মনীষীই হোন না কেন— স্ববিরোধ এবং বৈপরীত্য থাকেই মননের-মতের লঘু গুরুভাবে। কাজী আবদুল ওদুদেরও চিন্তায় ও চেতনায় স্ববিরোধিতা ও বৈপরীত্য দুর্লভ নয়। অল্প বয়সেই অর্থৎ পঁচিশ-তিরিশ বছর বয়সের মধ্যেই তিনি গল্প উপন্যাস রচনা করেছিলেন।

সৌজন্যবশত রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাস নদীবক্ষের মুসলিম গৃহস্থ পরিবারের ও সমাজের নিষ্ঠচিত্র বলে তারিফ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সৃষ্টিশীলতা উঁচুমানের ছিল না— তা স্বীকার করতেই হবে।

তিনি একজন আদর্শবাদী মনীষাসম্পন্ন প্রবন্ধকার ছিলেন। মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্বের বিকাশ এবং উদারতা তাঁর কাম্য ছিল। 'আমরা শুধু হিন্দু ও মুসলমান নই-আমরা মানুষ' [মিলনের কথা, শাশ্বতবঙ্গ পৃ: ৩২১]। তাঁর ছাব্বিশ বছর বয়সের রচনা সাহিত্যিকের সাধনা প্রবন্ধে তিনি মনুষ্যত্বের ও আত্মার বিকাশজাত সত্য ও মঙ্গল উপলব্ধিই সাহিত্যিকের লক্ষ্য বলে উপলব্ধি করেছিলেন। তা সত্ত্বেও তাঁর ধারণা মুসলমানের সামগ্রিক উন্নতির জন্যে 'পুনরায় মসজিদের কর্মপদ্ধতি সুবিস্তৃত করার, ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করার' প্রয়োজন অনুভব করেছেন। বলেছেন 'নহিলে মুসলমানের কোন মঙ্গল নাই। জগতের জন্য ইসলামের প্রয়োজন শেষ হয়ে যায়নি। বরং ইসলামের যে একান্ত ঈশ্বরপরায়ণতা, সাম্য ও মৈত্রীর বীর্যবত্ত সাধনা, জগতের জন্য আজো সেই সমস্তেরই দারুণতম প্রয়োজন।' [সম্মোহিত মুসলমান, শাশ্বতবঙ্গ পৃ: ৩১৮/১৩৩৩/১৯২৬] এতেই বোঝা যায় ধর্মের ডিকদড়ি-পরা মানুষের মনন-মনীষা একটা সীমা মানে। সে সীমা খাঁচার সীমা।

তিনি এমন কথাও বলেছেন 'ধর্ম বাদ দিয়া যে মানুষের মিলন, অর্থাৎ নানা প্রয়োজনতাড়িত সাধারণ স্তরের মানুষের স্বার্থের বন্ধন,..... তাহা স্থায়ী ও সুশোভনও হইতে পারে না।' আবার যুক্তিনিষ্ঠাও ছিল তাঁর। তাই স্যার সৈয়দ আহমদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতো তিনিও বিশ্বাস করতেন 'যা সত্য নয়, তা ইসলাম নয়। যে কোন ধর্ম বা আদর্শ সম্বন্ধে এ সার কথা' [ইসলাম রাষ্ট্রের ভিত্তি পৃ: ৩৪] এ ব্যক্তিই আবার 'সম্মোহিত মুসলমান' প্রবন্ধ লিখে বহু মুসলমানের বিরাগভাজন হয়েছিলেন।

ইনিই আবার শরৎচন্দ্রের 'শিক্ষার বিরোধ' প্রবন্ধের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন 'বিজ্ঞানই হচ্ছে চিন্তার পরশমণি। এর অভাবে ব্রহ্মবিদ্যাও যাদুবিদ্যায় পরিণত হতে পারে।' আগেই অন্য লেখায় বলেছি কাজী আবদুল ওদুদ মহতের ও মহত্ত্বের অনুরাগী ছিলেন। সে জন্যেই রঁম্যা রঁল্যার 'জ্যাঁ ক্রিস্তভের' অনুকরণে ও অনুসরণে চার খণ্ডে 'আজাদ' নামের উপন্যাস শুরু করেছিলেন যৌবনে। কিন্তু পরে আর তাঁর সেই উৎসাহ থাকেনি। হয়তো পরে নিজের এ ক্ষেত্রে সীমিত শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়েছিলেন।

'বাংলার জাগরণ' সম্বন্ধে হুমায়ুন কবির বলেছিলেন 'কাজী সাহেবের বুদ্ধি স্বচ্ছ, দৃষ্টি ও চিত্ত নির্ভীক।' তাঁর 'নবপর্যায়' প্রথম খণ্ডে সংকলিত প্রবন্ধাবলীতে 'তাঁর মনের জোর, বুদ্ধির জোর, কলমের জোর এক সঙ্গে মিশেছে' বলে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন। 'সম্মোহিত মুসলমান' প্রবন্ধটি মুসলিম সাহিত্য সমাজের তৃতীয় সাধারণ অধিবেশনে পঠিত হয়। এই প্রথম কাজী আবদুল ওদুদ প্রায় নির্মোহ, যুক্তিবাদীর দৃষ্টিতে জগৎ ও জীবনকে মর্ত্যজীবনের গুরুত্ব দিয়ে উপলব্ধি করেন। 'বাস্তবিক মহাপুরুষ যে ..... জীবন-সংগ্রামে একজন বড় বন্ধুমাত্র, তাঁর কথা ও চিন্তার ধারা চিরকালের জন্য মানুষের পথকে নিয়ন্ত্রিত করে দিয়েছে এ কথা বিশ্বাস করলে মানুষরূপে তাঁর সাধনাকে যে চরম অপমানে অপমানিত করা হয়, কেননা সমস্ত সাধনার যা লক্ষ্য সেই আল্লাহর উপলব্ধি মানুষের দৃষ্টিপথ থেকে রুদ্ধ হয়ে যায়, যে আল্লাহ চির জাগ্রত চির বিচিত্র— বিশ্বজগতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যুগে যুগে মানুষের অন্তহীন শুভ চেষ্টায় যাঁর মহিমা প্রকটিত, হযরত মোহাম্মদের অনুবর্তীরা সেই প্রাণপ্রদ সদাস্মর্তব্য কথা অদ্ভুতভাবেই মন থেকে দূর করে দিয়েছেন; হয়তো তার ফলেই অন্যান্য ছোট খাটো প্রতিমার সামনে নতজানু হওয়ার দায় থেকে কিছু নিষ্কৃতি পেলেও প্রেরিত পুরুষত্ব-রূপ এক প্রকাণ্ড প্রতিমার সামনে নতদৃষ্টি হয়ে তাঁর যে জীবনপাত করেছেন আধ্যাত্মিকতা নৈতিকতা সাংসারিকতা সবদিক থেকেই তা শোচনীয়রূপে দুঃস্থ ও বিভ্রান্ত।' [শাশ্বতবঙ্গ পৃঃ ৩৯৫, সম্মোহিত মুসলমান]

তিনি বিশ্বাস করতেন —জগতের জন্য ইসলামের প্রয়োজন শেষ হয়ে যায়নি। বরং ইসলামের যে একান্ত ঈশ্বরপরায়ণতা, সাম্য ও মৈত্রীর বীর্যবন্ত সাধনা, জগতের জন্য আজো সেই সমস্তের দারুণতম প্রয়োজন। কিন্তু যে 'আলেম' বলে নিজের পরিচয় দেয়, কিন্তু হৃদয়ের দ্বার যার সাংঘাতিক ভাবে বন্ধ। [সম্মোহিত মুসলমান] সে তা বুঝতে, বোঝাতে পারবে না।

তাঁর মতে, যুগধর্ম বাদ দিয়ে চিরন্তন ধর্ম হয় না। তিনি এ-ও জানতেন 'জ্ঞান সাধনার ভিতরে মানুষের জন্যে অনন্ত কল্যাণ নিহিত রয়েছে।' এ তত্ত্বে ও তথ্যে তিনি আন্তরিকভাবে আস্থা রাখতেন। তাই সারাজীবন তিনি মহৎ মানুষের চরিত্র ও মনীষা থেকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা পেতে চেয়েছেন। হযরত মুহম্মদ, গ্যয়টে, রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সম্বন্ধে তাঁর জিজ্ঞাসা ও তাঁদের জীবন ও সৃষ্টি সম্পর্কে অনুশীলন তারই প্রমাণ। কাজী আবদুল ওদুদ শিখাতে 'সাহিত্য সমস্যা', 'বাঙলার জাগরণ', 'বাঙলা সাহিত্যের চর্চা', 'গ্যয়টে'— এ কয়টি প্রবন্ধই লিখেছিলেন পাঁচ বছরে। তবে বার্ষিক সভায় 'সম্মোহিত মুসলমান' প্রভৃতি প্রবন্ধ পাঠ করলেও ছাপা হয়েছিল অন্যান্য পত্রিকায়। কাজেই লেখক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিসেবে তাঁকে মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রভাবিত বা আদর্শে অনুপ্রাণিত লেখক বলা যাবে না। কাজী আবদুল ওদুদ এ-ও বলেছেন 'এ-কালের ধর্ম বলতে জ্ঞান ও মনুষ্যত্ব সাধনই মুখ্যভাবে বুঝতে হবে।' এজন্যই 'কুরআনই রসুল চরিত্র' হযরত আয়েশার উক্তিতে আক্ষরিকভাবে আস্থা রাখতেন। তিনি যে বলেছেন 'যুক্তিবিচারের অনুবর্তিতা ও কুরআনের অনুবর্তিতা—এ দুটি পৃথক করে দেখা অসঙ্গত' এটি মুমীনের প্রত্যয়জাত উক্তি বটে, কিন্তু যৌক্তিক ও বৌদ্ধিক অনুশীলন জাত সিদ্ধান্ত বলে মনে হয় না।

রবীন্দ্রনাথ আধুনিককালে রাজনীতি ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলিমের তিক্ত সম্পর্কের পরিণাম সম্বন্ধে বিচলিত হয়ে এর কারণ সন্ধিৎসু একজন বিদ্বান, উদার, সত্যভাষী মনীষা সম্পন্ন মুসলমান খুঁজছিলেন। তিনি ঢাকা কলেজের অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদের মধ্যেই সে-মনুষ্যত্বকে খুঁজে পেয়েছিলেন। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, আবদুল কাদিরের ভাষায় কাজী আবদুল ওদুদ যে, 'বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম ভাবুক ও চিন্তাবিদ' সে-সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ ছিলেন। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এ-ও স্বীকার করতেন যে 'গ্যয়টের সম্বন্ধে তিনি যে বড় বইখানি লিখিয়া গিয়াছেন, ভারতীয় সাহিত্যে তাহার তুলনা হয় না।' [আবদুল কাদির রচিত 'কাজী আবদুল ওদুদ' বইয়ের ভূমিকা]

অন্নদাশঙ্কর রায়ের মতে 'কাজী আবদুল ওদুদের স্বরূপটা ছিল ক্রিটিকের .....তবে ক্রিটিক হলেও তিনি ক্রিয়েটিভ।..... কবিগুরু গ্যয়টে এবং শাশ্বতবঙ্গের বেশি ভাগই টিকে থাকবেই। পবিত্র কোরান এমন চমৎকার ভাষায় লেখা হয়েছে যে ভাষার গুণেই থেকে যেতে পারে।'

অন্নদাশঙ্করের শেষ মন্তব্য ছিল এরকম। 'কাজী সাহেব শেরওয়ানী চুড়িদার পরে দৃপ্তভাবেই চলাফেরা করতেন। তিনি সবাইকেই জানিয়ে দিতেন যে তিনি মুসলমান। .....কাজী আবদুল ওদুদ জাতিতে ভারতীয়, ভাষায় বাঙালী, ধর্মে মুসলমান, জীবনদর্শনে মানবিকবাদী, মতবাদে রামমোহনপন্থী, সাহিত্যে গ্যয়টে ও রবীন্দ্রপন্থী, রাজনীতিতে গান্ধী ও নেহেরুপন্থী, অর্থনৈতিক শ্রেণী বিচারে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক। সামাজিক ধ্যান ধারণায় ভিক্টোরিয়ান লিবারেল।' [আবদুল কাদির রচিত 'কাজী আবদুল ওদুদ' গ্রন্থের পরিশিষ্ট]

ভক্তি ও যুক্তি এ দুটো দুই মেরুর ফসল। ভক্তির জন্ম ও স্থিতি বিশ্বাসে। যুক্তির উৎস কারণ-কার্য-জিজ্ঞাসা। কাজেই এ দুটো কখনো সমন্বিত হয়ে সহাবস্থান করতে পারে না। বঙ্কিমচন্দ্র প্রতীচ্য দর্শনের প্রভাবে একাধারে ও যুগপৎ ভক্তিকে ও যুক্তিকে সমন্বিত করতে চেয়েছিলেন শেষ বয়সে। কাজী আবদুল ওদুদও যুক্তিপ্রবণ কিন্তু মুমীন, ফলে তাঁর হযরত মুহম্মদ ও ইসলাম বিষয়ক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে কোথাও কোথাও ভক্তির ও যুক্তির দ্বন্দ্ব ঘোচেনি। একে নির্মোহ উদার জীবনদৃষ্টি বলে চিহ্নিত করা যাবে না। স্ববিরোধিতা বলেই অভিহিত করতে হবে।

কাজী আবদুল ওদুদ ধীর বুদ্ধির, স্থির বিশ্বাসের লোক ছিলেন। স্বশাস্ত্রে আস্থাবান থাকা সত্ত্বেও যুক্তিবাদের প্রতি তাঁর একটা অনুরাগ ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র যখন গীতাভক্ত হিন্দু তখনও তাঁর প্রিয় দার্শনিকদের যুক্তিবাদের প্রভাব এড়াতে পারেননি। কাজী আবদুল ওদুদও কুরআনের, ইসলামের এবং হযরত মুহম্মদের ব্যাখ্যায় যুক্তিপ্রবণতা দেখিয়েছেন। কিন্তু সে-সব যুক্তিপ্রয়োগের যাথার্থ্য হয়তো সর্বক্ষেত্রে অনেকেরই মনঃপূত হয় না। মানুষের চিন্তা-চেতনায় স্ববিরোধিতা ও বৈপরীত্য যেমন থাকে তেমনি থাকে কোন কোন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিষয়ে অনুদার সীমাবদ্ধতা ও অপছন্দের বিরূপতা। যেমন তাঁর নিম্ন উদ্ধৃত মত অনেকেরই গ্রাহ্য হবে না—

'একালে দেখা যাচ্ছে বাংলার বুদ্ধিজীবীদের চোখে যথেষ্ট মর্যাদা নিয়ে দাঁড়িয়েছে ফ্রয়েড দর্শন আর কার্ল মার্কসের দর্শন, আর সর্ব সাধারণের চিত্ত নতুন করে আকৃষ্ট হয়েছে পরমহংস রামকৃষ্ণের ও তাঁর সগোত্র সাধকদের আত্মসম্পূর্ণ মরমী সাধনার প্রতি। এসব থেকে অবশ্য কোন সুফল লাভ হয়নি। না হওয়াই স্বাভাবিক—এ সবের অসম্পূর্ণতা অতিশয় স্পষ্ট, বিশেষ করে বাংলার জাগরণের শ্রেষ্ঠ নেতাদের উদার জ্ঞান ও প্রেমের সাধনার সঙ্গে তুলনায়।' তিনি আরো বলেন—'মানুষের বিচিত্র প্রবণতা ও প্রচেষ্টার ভিতর দিয়ে বার বার এটিও প্রমাণিত হয়েছে যে, মানুষ প্রকৃতভাবে সৃষ্টিধর্মী হতে পারে তখন যখন তার শ্রেষ্ঠ সম্পদ অর্থাৎ ধর্মসম্পদ যার অন্য নাম অকপট সত্যাশ্রিয়তা আর জগতের সঙ্গে নিবিড় প্রেমের যোগ—তাকে প্রেরণা দেয়, শুধু দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের, প্রবল জাতীয় চেতনার, বৃহৎ ঐতিহাসিক ঘটনার অথবা অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সেই প্রেরণা দেবার শক্তি প্রকৃতই নেই। Only religious men can be creative. — যাঁরা ধর্মপ্রাণ সৃষ্টিধর্মী হতে পারেন কেবল তাঁরা.....শোনা কথায় আস্থার নামই আস্তিক্য। প্রত্যক্ষদর্শীর মতো দৃঢ়প্রত্যয়ে আস্তিকরা শাস্ত্রকে অমোঘ মঙ্গল বলে জানে। কাজী আবদুল ওদুদ আস্তিক ছিলেন বলেও এবং সমাজ সাধারণ ভাবে আস্তিক মানুষ নিয়েই চালু থাকবে বলেও হয়তো সংস্কৃতির কথা বলতে গিয়ে ধর্মবোধকে সমাজপ্রগতির পথেও অপরিহার্য মনে করেছেন। তাই তাঁর ধারণায়—

'ভারতবর্ষের একালের সাংস্কৃতিক চিন্তার ইতিহাসে দুইজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য— একজন বাংলার বঙ্কিমচন্দ্র অপরজন পঞ্জাবের ইকবাল। এঁদের চাইতে শ্রেষ্ঠতর চিন্তাশীলের জন্ম একালের ভারতবর্ষে হয়েছে, কিন্তু চিন্তানায়ক হিসেবে এঁদের মতো জনপ্রিয়তা অর্জন করতে আর কেউ পারেননি। এঁরা দুজনেই চেয়েছেন প্রাচীন ধর্মের নতুন ব্যাখ্যা দিতে, সঙ্গে সঙ্গে শক্তিশালী রাষ্ট্রজীবন গঠন বলতে যা বোঝায় তারও স্পষ্ট ইঙ্গিত এঁদের বাণীতে রয়েছে।' [সংস্কৃতির কথা]

তিনি এও বুঝেছিলেন, 'হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত জীবন ভিন্ন আর কিছু যদি এদেশে সম্ভবপর না হয় তবে হিন্দু সংস্কৃতি, মুসলমান সংস্কৃতি, আর্য সংস্কৃতি, সেমীয় সংস্কৃতি— এসব কথা হয়ে পড়ে দায়িত্বহীন....।' .....আজকের অসার্থক সংস্কৃতি-চিন্তার স্তর থেকে সার্থক সংস্কৃতি চিন্তার স্তরে উপনীত হতে হলে যেসব ধাপ আমাদের অতিক্রম করতে হবে তার কিছু নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে এইভাবে—

১. দেশে অভুক্ত ও কর্মহীন কেউ থাকবে না।
২. একান্ত বীভৎস না হলে কোন সমাজেরই ধর্মাচার অশ্রদ্ধেয় বিবেচিত হবে না। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে হবে যে— যা প্রাচীন তা প্রাচীন বলেই বরণীয় নয়। বরণীয় তার বর্তমান কার্যকারিতার জন্যে।
৩. হিন্দু-মুসলমানের পোশাক ও নামের ব্যবধান থাকবে না অথবা অস্বীকার করা হবে।
৪. সামাজিক আদান-প্রদান-বিবাহাদি সমেত সর্বত্র সহজ হবে।
৫. আইন সমস্ত দেশের জন্য এক হবে। [সংস্কৃতির কথা]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাজী আবদুল ওদুদের এ স্বপ্ন ও সাধ পুরো বাস্তবায়িত হয়নি, অবাধ ও নির্বিঘ্ন হতে আরো সময় লাগবে বটে, তবে বহুজনমনে এবং চেতনায়-চিন্তায় কর্মে-আচরণে এসবের বাস্তবায়ন প্রয়াস সাফল্যমুখী হয়ে উঠেছে।

কিন্তু এখানে কাজী আবদুল ওদুদের চিন্তায় স্ববিরোধিতার ও বৈপরীত্যের সাক্ষ্য প্রমাণও মিলেছে। শাস্ত্রমানা মানুষ হচ্ছে কাঁটাল লোহার খাঁচায় বদ্ধ সম্প্রদায় ও স্বাতন্ত্র্যসচেতন বিচ্ছিন্নতাপ্রিয় ব্যক্তি ও সমাজ। তাই আস্তিক মানুষ নির্মোহ উদার নির্বিশেষ মানুষ, সমাজ ও মতবাদী হতে পারেই না। এজন্য কম্যুনিস্ট বা সোসিয়েলিস্ট হতে হয়। কাজী আবদুল ওদুদ সমাজ দরদী ও সমাজহিতৈষী হলেও তাঁর ইসলাম ও মুসলিম বিষয়ক রচনা বেশি নয়। ১. ইসলামে রাষ্ট্রের ভিত্তি (১৯৪৮ সন), ২. কোরআনের আল্লাহ (১৩৪৯/১৯৪২), ৩. সৈয়দ জামালুদ্দিন আল আফগানী (১৩৪৫/১৯৩৮), ৪. গৃহযুদ্ধের প্রাক্কাল (১৯৪৬), ৫. সংস্কৃতির কথা (১৩৪৮/১৯৪১), ৬. বাংলার মুসলমানের কথা (১৩৪৪/১৯৩৭), ৭. একটি ঐতিহাসিক চরিত্র (১৩৪৭/১৯৪০), ৮. ব্যর্থতার প্রতিকার [হিন্দু-মুসলমান বিরোধ বক্তৃতার অংশ] (১৯৩৫), ৯. পথ ও পাথেয় (১৩৩৮/১৯৩১), ১০. আমাদের কথা (১৩৩৭/১৯৩০), ১১. বাংলা সাহিত্যের মুসলিমধারা (১৯৩১), ১২. বাঙালী মুসলমানের সাহিত্য-সমস্যা [মুসলিম সাহিত্য সমাজের, ১ম বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত (১৩৩৩/১৯২৬), ১৩. অভিভাষণ (১৯২৭), ১৪. সম্মোহিত মুসলমান (১৩৩৩/১৯২৬), ১৫. বাদ্-প্রতিবাদ (১৯২৮)।

এই পনেরোটি ছোট ও মাঝারি প্রবন্ধ এবং 'হযরত মোহাম্মদ ও ইসলাম' (১৩৭৩/১৯৬৬) গ্রন্থটি এবং কোরআনের অনুবাদই হচ্ছে কাজী আবদুল ওদুদের জীবনব্যাপী ইসলাম বিষয়ক চিন্তা-ভাবনার ফুল, ফল ও ফসল।

শিক্ষিত মুসলিমদের শিক্ষিত হিন্দুদের সমকক্ষ করে তোলাই তথা মুসলিম সমাজকে আধুনিক জীবনের দাবি পূরণের যোগ্য করে তোলাই ছিল উদ্দেশ্য। আদর্শ ছিল রামমোহনের ব্রাহ্মসমাজ। মুসলিম সাহিত্য সমাজের ও 'শিখা'র লক্ষ্য ছিল ইংরেজী শিক্ষিত মুসলিম সাহিত্যিক সমাজকে আধুনিক জীবন ও পরিবেষ্টনী সম্বন্ধে চেতনা দান। তাঁরা জ্ঞান ও যুক্তি প্রয়োগে আশৈশব শ্রুত ও লব্ধ বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা-আচার যাচাই-বাছাই-বর্জন করার জন্যে প্রণোদনা ও প্রবর্তনা দিতে চেয়েছিলেন শিক্ষিত মুসলিমদের। এতে তাঁদের আবেদন ছিল— শিক্ষিত মুসলিমদের মন-মগজ-মননের প্রতি। নিঃস্বতা নিরন্নতা নিরক্ষরতা দুস্থতা ও দারিদ্র্যদুষ্ট মুসলিম সমাজের শাস্ত্রিক, আর্থিক, নৈতিক, বৈষয়িক সমস্যার সঙ্কট মোচন ও উন্নতি রাজনীতিক সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। কিন্তু সক্রিয় রাজনীতিতে তাঁদের আগ্রহ ছিল না।

আবুল হুসেন ও আবদুল কাদির কৃষকের সমস্যার কথা লিখেছিলেন। আবুল হুসেন তাঁর 'কৃষি বিপ্লবের সূচনা' প্রবন্ধে বলেছেন—'ভারতের কৃষকদের মধ্যে যদি কোন দিন বিপ্লব (বোলশেভিজম) উপস্থিত হয়, তজ্জন্য জমিদার সম্প্রদায় সম্পূর্ণ দায়ী হইবে। তাহারাই কৃষক প্রজাকে তাহার স্বার্থ, অধিকার স্বত্ব, স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করিয়া বিপ্লবের সূচনা করিতেছে.....।' [বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য পত্রিকা, ৪র্থ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৩২৮]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুল কাদিরও তাঁর 'বাঙ্গালার ভূমিব্যবস্থা' প্রবন্ধে কম্যুনিস্টদের মতোই কৃষকদের সর্বপ্রকার শোষণ-পীড়ন-বঞ্চনা-প্রতারণা থেকে মুক্তি দাবি করেছিলেন—শুধু কর সেস-সুদ মওকুব নয়, বেকারের কর্মব্যবস্থা বাধ্যতামূলক, অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন, চিকিৎসার জন্যে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ছিল তাঁর দাবির অন্তর্গত। 'সর্বাধিক সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও আর্থিক শোষণ হইতে জনগণের মুক্তি হইতেছে কৃষক আন্দোলনের চরম উদ্দেশ্য।' [বুলবুল, ৪র্থ বর্ষ ৯ম সংখ্যা, ১৩৪৪ সন]

কাজী আবদুল ওদুদও হিন্দু-মুসলিমের রাজনীতিক ক্ষেত্রে সম্প্রীতিতে ও সাংস্কৃতিক সমন্বয়ে অভিন্ন বাঙালীজাতি হিসেবে সহাবস্থানের পন্থা উদ্ভাবন করেছিলেন। পূর্বেও এগুলো উদ্ধৃত হলেও আবার স্মরণ করছি।

১. দেশে অভুক্ত ও কর্মহীন কেউ থাকবে না।
২. একান্ত বীভৎস না হলে কোন সমাজেরই ধর্মাচার অশ্রদ্ধেয় বিবেচিত হবে না।...
৩. হিন্দু-মুসলমানের পোশাক ও নামের ব্যবধান থাকবে না।
৪. সামাজিক আদান প্রদান বিবাহাদি সমেত সর্বত্র সহজ হবে।
৫. আইন সমস্ত দেশের জন্য এক হবে।

উপর্যুক্ত ২, ৩, ৪ সংখ্যক প্রস্তাব একজন স্বধর্মে আস্থাবান ব্যক্তির চেতনা চিন্তাপ্রসূন হতেই পারে না। এ কেবল ক্ষণিক আবেগজাত উচ্চারণ এবং অবাস্তব প্রস্তাব বলেই মানতে হবে। যা হোক, সে-সময় এসব প্রস্তাব বিবেচনা করার মতো স্বস্থ ও সুস্থ ব্যক্তি এবং রাজনীতিক আবহাওয়া বাঙলায় ভারতে দুর্লভ ছিল। স্বয়ং কম্যুনিস্টরাই নন্দিত ছিল না কোথাও নিন্দিতই ছিল।

কাজী আবদুল ওদুদ মনুষ্যত্বের পরম ও চরম আদর্শ খুঁজেছেন গ্যয়টের রচনায়, হৃদয়বৃত্তির বিচিত্র প্রকাশে ও বিকাশে শ্রেয়োচেতনার মহিমা প্রত্যক্ষ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে, রামমোহনে পেয়েছেন যুক্তিবাদের প্রয়োগ, সমাজ সংস্কারের প্রেরণা। হযরত মুহম্মদে পেয়েছেন ইহ-পরলোকে প্রসৃত জীবনে ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের সুষম সঙ্গতি এবং যেহেতু তিনি হযরত আয়েশার 'কোরআনই রসুল চরিত্র' অর্থাৎ কোরআনের বাস্তব রূপায়নের প্রতিরূপ হচ্ছে মুহম্মদের কর্ম ও আচরণ— এ উক্তিতে গভীরভাবে আস্থাবান ছিলেন, সেহেতু কোরআনেও ছিল তাঁর অনুরাগ এবং রসুলচরিত্র জানা-বোঝার লক্ষ্যেই তিনি আরবীতে ব্যুৎপন্ন না হয়েও কোরআনের কাব্যিক ভাষায় অনুবাদ করেন ইংরেজী তর্জমা অবলম্বনে। আর দেশের স্বাধীনতা ছিল তাঁর কাম্য। তাই সহপাঠী সাহসী স্বাধীনতা সংগ্রামে উৎসর্গিত প্রাণ সুভাষচন্দ্র বসুই ছিলেন তাঁর আদর্শবীর। যেমন তিনি স্ব স্ব ধর্মসম্প্রদায়ের চিন্তানায়ক রূপে চিহ্নিত করেছেন বঙ্কিমচন্দ্রকে ও ইকবালকে।

লক্ষণীয় যে, আদর্শবাদী কাজী আবদুল ওদুদ ব্যক্তির জীবনে-মননে-মনীষায় কর্মে আচরণে আদর্শের রূপায়ণ সন্ধান করেই উক্ত সব ব্যক্তিকে স্ব স্ব ক্ষেত্রে আদর্শ পুরুষ রূপে বরণ ও স্মরণ করেছেন। এঁদের প্রতি ছিল তাঁর মানস অনুরাগ, অনুগামিতা ও আনুগত্য। এ তাৎপর্যে তিনি ছিলেন কারলাইলের মতোই বীর-স্তাবক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফলে কাজী আবদুল ওদুদ ছিলেন একজন প্রমূর্ত উদারতা, সহিষ্ণুতা, শ্রেয়স, আদর্শ ও ভেদবুদ্ধিহীন বাঙালী, ভারতীয় এবং সর্বোপরি কেবল মনুষ্যত্ব সাধক হিতবাদী যুক্তিবাদী বিবেকবান মানুষ, যদিও তাঁরও সুদীর্ঘজীবনের চেতনায় চিন্তায় স্বাভাবিক কারণেই ছিল কিছু স্ববিরোধিতা ও বৈপরীত্য। এর প্রধান কারণ, তিনি একাধারে ও যুগপৎ মুসলিম ও মানুষ থাকতে চেয়েছেন সারাজীবন। আস্তিক মানুষের উদারতার ও মানবতার এককথায় মনুষ্যত্বের একটা সীমিত পরিসর থাকেই। স্বধর্মনিষ্ঠ হয়েও ওদুদ পরম উদারতায় হিন্দু-মুসলিমের সহাবস্থানের গরজচেতনা বশে হিন্দু-মুসলিম আচারের, সংস্কৃতির সমীকরণে ও সমন্বয়ে আস্থাবান ছিলেন। তাই অভিন্ন নাম, পোশাক ও অবাধ বিয়ে যেমন তিনি সমর্থন করেন, তেমনি সুপারিশ করেন যে 'ভারত ইসলাম প্রভাবে প্রভাবিত হবে, আর ইসলাম ভারতের জন্য ভারতের ছাঁচে ঢালাই হবে।' [রচনাবলী ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮০]

অবশ্য দশ শতক থেকেই এ আচার-সংস্কৃতির মিশ্রণ শুরু হয়ে গিয়েছিল। এস্ ওয়াজেদ আলিও বাঙালীসত্তায় গুরুত্ব দিতেন, স্বধর্মে সুস্থির থেকেও ভিন্নধর্মাবলম্বীর সঙ্গে সম্প্রীতিতে সহাবস্থানের প্রয়োজনে। দেশ-কাল-প্রতিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে কাজী আবদুল ওদুদ, এস্ ওয়াজেদ আলি ও আবু সায়ীদ আইয়ুব ভাষাশৈলীতে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নির্মোহ স্বচ্ছ চেতনা-চিন্তার অভিব্যক্তি দানে বাংলার প্রথম শ্রেণীর ও সারির লেখকরূপে নন্দিত হওয়ার দাবিদার।

এবার আর একটি কথা বলি, 'মুসলিম সাহিত্য সমাজের' চিন্তকেরা যখন তাঁদের মুক্তচিন্তা ও বুদ্ধি-যুক্তি প্রচারে উদ্যোগী হয়েছিলেন, তখন মুসলিম সমাজে ইংরেজী শিক্ষিতের সংখ্যা বেশি ছিল না, ফলে তাঁদের প্রভাব এড়িয়ে চলার চেষ্টাই ছিল রক্ষণশীলদের। তারপর মুসলিম সমাজে দ্রুত শিক্ষার প্রসার ঘটে বটে, কিন্তু তখন গোলটেবিল বৈঠক, জিন্নাহর চৌদ্দদফা, ১৯৩৫ সনের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন আইন, ১৯৩৭ সনে মুসলিম-প্রধান শাসন ব্যবস্থায় নতুন কাক্ষার ও স্বাধিকার চেতনার প্রসার, সে-সঙ্গে হিন্দুদের প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধি, প্রতিদ্বন্দ্বিতার তীব্রতাপ্রসূন পাকিস্তানপ্রস্তাব মুসলিম মনে নতুন ও ভিন্ন চেতনা-চিন্তা-লক্ষ্য জাগিয়েছে। কাজেই শিখাগোষ্ঠীর প্রভাব কালগত কারণে মুসলিম মনে সম্ভবত ক্ষণপ্রভাও সৃষ্টি করেনি।

ভিন্ন দৃষ্টিতে কাজী আবদুল ওদুদ

কাজী আবদুল ওদুদ [১৮৯৪-১৯৭০] ছিলেন মনীষার সমঝদার, যুক্তির অনুরাগী, অনুগামী ও অনুগত আর মহতের ভক্ত ও অনুসারী। তাঁর কাছে গ্যয়টে, রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষবসু ছিলেন অনন্য, অসামান্য অসাধারণ পুরুষ আর হযরত মুহম্মদ ছিলেন আল্লাহর রসুল মহামানব। এঁদের সবার সম্বন্ধেই তিনি লিখেছেন, গ্যয়টে সম্বন্ধে তাঁর মুগ্ধতা বা অভিভূতির পরিচয় মেলে জীবনের শ্রেষ্ঠাংশে তাঁর শ্রম ও সময় এবং মন-মনীষা নিয়োগে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাজী আবদুল ওদুদ কেবল আস্তিক ছিলেন না, মুমীন ছিলেন মানসিকভাবে এবং অধ্যাত্মশক্তিতে ও ওহিতে আর অতিপ্রাকৃতে, অপৌরুষেয়তায় ও অলৌকিকতায় তাঁর আস্থা ছিল গাঢ়, গভীর ও ব্যাপক। তিনি কুরআন অনুবাদ করেছিলেন, কাজেই আবদুল ওদুদ 'বুদ্ধির মুক্তি' দলের অন্যতম মুখ্য ব্যক্তি হলেও, মূলত আবাল্য শোনা, দেখা, জানা, বোঝা বিশ্বাসের, সংস্কারের, ধারণার পরিসরেই ছিল তাঁর চেতনা-চিন্তার পরিক্রমা সীমিত।

ফলে কাজী আবদুল ওদুদরা ছিলেন রামমোহনী কায়দায় শিক্ষিত মুসলিম সমাজে সংস্কারবাদী তথা মেরামতপন্থী। মনের মধ্যে শাস্ত্রের মৌল ভিত্তি বা উৎস সম্বন্ধে তাঁদের কোন সন্দেহ বা জিজ্ঞাসা ছিল না। তার যৌক্তিক ও বৌদ্ধিক যাথার্থ্য বিষয়েও কখনো কোন প্রশ্ন জাগেনি। তাঁদের কাছে বিশ্বাসের, সংস্কারের ও ধারণার দুই রূপ: পবিত্র ও সত্যবিশ্বাস, ভালো বা সুসংস্কার ও সত্য এবং কল্যাণকর ধারণা আর অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার ও মিথ্যা বা অলীক ধারণা।

বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা যে কেবল বিস্ময়-ভয়-ভক্তি-লাভ-ক্ষতি সম্পৃক্ত অদৃশ্য কল্পিত অরি-মিত্র শক্তিতে অনুভূত ও অনুমিত আস্থাভিত্তিক–এর কোন প্রমাণ সম্ভব অস্তিত্ব বা বাস্তবতা নেই, এবং বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা শাস্ত্রিক হোক, লৌকিক হোক, অলৌকিক হোক, অলীক হোক তা যে জ্ঞান নয়, সে-প্রশ্নও তাঁদের মনে কখনো জাগেনি।

কাজী আবদুল ওদুদরা কালানুগ প্রগতির পরিপন্থী কিছু স্থানিক, কালিক ও ভিন্ন শাস্ত্রিক প্রভাবজাত আচার-আচরণ-বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণার পরিহার চেয়েছিলেন মাত্র। যেমন তাঁদের সমকালে ওয়াহাবীরা-ফরায়েজীরাও এমনি কুসংস্কার, কুবিশ্বাস, কুধারণা মুক্ত কু-আচার ও কু-আচরণমুক্ত করতে চেয়েছিলেন সমাজকে, ওঁদের মতেও সে-সব বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা-আচার-আচরণ-পালা-পার্বণ বর্জন করলেই উন্মেষযুগের ইসলাম ও ইসলামি জোস আর অপরাজেয় নির্ভীক শক্তির, উন্নতির ও ঐশ্বর্যের অধিকারী হওয়া তখনো সম্ভব ও স্বাভাবিক বলেই ওঁরা মনে করতেন। ভারতে মুঘলশক্তির পতন এবং তুর্কীসাম্রাজ্যের অবক্ষয় নতুন নতুন অশাস্ত্রিক নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ, প্রথা-পদ্ধতি প্রভৃতি 'বেদাৎ'-এর অনুপ্রবেশের পরিণাম বলেই ওঁরা মনে করতেন। এ জন্যেই হাজী শরীয়তুল্লাহ বিভ্রান্তি এড়ানোর লক্ষ্যে কেবল কুরআন নির্ভর ও কুরআন-অনুগ জীবনযাপনের রাজপথের সন্ধান দিতে থাকেন তাঁর অনুরাগী, অনুগামী ও অনুগত শিষ্যদের। ফরজ-নির্ভর বলেই তাঁরা ফরায়েজী নামে অভিহিত। অন্যরা সহি ও বানানো-বাতেল হাদিসের চুলচেরা যাচাই-বাছাই করে সহি হাদিস-অনুগ জীবন-যাপনের অঙ্গীকার করেন, তাঁরাই হলেন আহলে হাদিস বা মুহম্মদীয়া [আরবের ওয়াহাব পুত্র মুহম্মদের অনুসারী] নামে কিংবা বহুল প্রচলিত 'ওয়াহাবী' নামে পরিচিত।

এদিক দিয়ে 'বুদ্ধির মুক্তি' দলের মুখপাত্র 'শিখা'য় প্রকাশিত কিছু কিছু প্রবন্ধকে সংস্কার-প্রয়াস প্রসূন বলেই সহজেই চিহ্নিত করা চলে। শিখাগোষ্ঠীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন কাজী ইমদাদুল হক, এঁর রচিত 'আবদুল্লাহ' উপন্যাস-এ কুবিশ্বাস, কুসংস্কার ও কু-ধারণারই আলেখ্য। 'বুদ্ধির মুক্তি' দলের উদ্দেশ্যও ছিল এমনিভাবে সমাজ-মনের শুদ্ধি আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া। রামমোহন ছিলেন যুক্তিবাদী তথা র‍্যাশানাল। তাঁর প্রথম গ্রন্থ ফারসী 'তোহফাতুল মুয়াহিদীন' মাধ্যমেই তিনি যুক্তিবাদের ধারক, বাহক ও প্রচারকরূপেই আত্মপ্রকাশ করেন, বেদের অনুবাদে সেই যৌক্তিক বৌদ্ধিক জীবনবোধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাগানোই ছিল তাঁর লক্ষ্য। রামমোহনে কোন বিশেষ বিশ্বাসের বন্ধন শৃঙ্খল ছিল না। কাজী আবদুল ওদুদ ইসলাম বা কুরআন-অনুগ বিশ্বাসে দৃঢ়প্রত্যয়ী ছিলেন। কাজেই রামমোহনে ছিল নতুন চেতনার, নতুন চিন্তার, নতুন আবিষ্কারের, নতুন উদ্ভাবনের ও নতুন সৃষ্টির আবেগ ও আগ্রহ। কিন্তু 'শিখা' দলের মুক্তবুদ্ধি কিংবা 'বুদ্ধির মুক্তি' এ তাৎপর্যে মোটেই মুক্ত ছিল না— তাঁরা বিশ্বাসের খাঁচাটার বিস্তৃতি ও স্বাচ্ছন্দ্য কামনা করেছিলেন মাত্র। তার প্রমাণ তরুণ 'বুদ্ধির মুক্তি' বাদী আবদুল কাদির রসুল প্রশস্তি ফাতেহা দোয়াজদিহম লেখেন, আবুল ফজল কুরআনের শ্রেষ্ঠবাণী, হাদিসের বাণী সংগ্রহ ও মুদ্রিত আকারে প্রচার করেন, কাজী মোতাহার হোসেনও জীবনের প্রান্তপর্বে হাজী হয়ে মুমীনরূপে প্রয়াত হন, এমন দ্রোহী শামসুল হুদাও জীবনে আর কখনো কোন প্রগতিশীলতা দেখাননি, উচ্চারণ করেননি প্রচলিত শাস্ত্রাচারবিরোধী কোন কথা। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এঁদের প্রতি বিরূপ ছিলেন না, কিন্তু শহীদুল্লাহর রচনায় পঞ্চাশাধিক শতাংশই ইসলাম ও মুসলমান বিষয়ক। আমাদের ধারণা সৈয়দ আবুল হোসেনের শাস্ত্রে তেমন আস্থা বা নিষ্ঠা ছিল না। তবে পরিবেষ্টনী প্রতিকূল ছিল বলে তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গেই কিছু সাহসিকতার স্বাক্ষর তাঁর অনাকর্ষণীয় ভাষাশৈলীর রচনায় রেখে গেছেন। কাজেই কাজী ওদুদরা তথা 'বুদ্ধির মুক্তি' দল বা শিখাগোষ্ঠী ছিলেন পুনরুজ্জীবনবাদী বা পুনর্জাগরণবাদী— Ravivalist। নতুন চেতনা, নতুন চিন্তা, নতুন সৃষ্টিবাদী বা রেনেসাঁসবাদী ছিলেন না। Ravivalist রা আসলে রক্ষণশীল, পুরোনোপ্রীতি তাদের পিছু টানে, সমুখে এগিয়ে দেয় না, মেরামতে স্বকালোপযোগী হতে অনুপ্রাণিত করে মাত্র।

কাজী আবদুল ওদুদ পড়েছিলেন সেকালের Politico-Economics. কিন্তু ঢাকা কলেজে পড়াতেন বাঙলা সাহিত্য, লিখতেন সাধারণত বাঙলা ভাষায় প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস। কুরআনের অনুবাদও কাব্যধর্মী ভাষায় করেছেন তিনি। তিনি যে বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ছিলেন তা অবশ্যই স্বীকার্য। সবেচেয়ে বড় কথা তাঁর ভাষাশৈলী ছিল সুন্দর, প্রাঞ্জল ও বিশিষ্ট। তাঁর আগে এমন ভাষাশৈলীতে অবলীলায় উঁচুমানের মননশীল মনীষাদীপ্ত প্রবন্ধ কোন মুসলিম লেখক লিখেছেন কিনা সন্দেহ। তবে তাঁর সমকালে কাজী মোতাহার হোসেনকে এবং অনেকটা কাছাকাছি মানের লেখকরূপে পাই মোহাম্মদ বরকতউল্লাহ্‌কে।

তবু কাজী আবদুল ওদুদ মননশীলতায় মনীষায় তাঁর যে যোগ্যতার ও সামর্থ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন, তাতে একালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গদ্যলেখকরূপে উচ্চারিত হওয়ার দাবিদার হয়েছেন। কিন্তু সৃষ্টিশীল লেখক হিসেবে গল্পে-উপন্যাসে সে-কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। আজাদ, মীর পরিবার, নদীবক্ষে পড়ে তেমন তৃপ্তি মেলে না। যৌক্তিক ও শৈল্পিক ত্রুটি রুচিবান-বুদ্ধিমান পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না।

তাঁর 'বাঙলার জাগরণ' রামমোহন রায়েরই প্রভাব-প্রসূন। 'রবীন্দ্রনাথ'ও ভক্তের অর্ঘ্য। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে বিশ্বভারতীতে তিনি 'হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক' সম্বন্ধে যে তথ্যগর্ভ ও বিশ্লেষণ দীপ্ত ভাষণ দিয়েছিলেন, তা সে-সময়ে সত্য ও গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হলেও আজকের দিনে তাঁর বেশ কয়েকটা 'প্রত্যয়' ইতিহাসের নব আবিষ্কৃত তথ্যের নিরিখে অপ্রযোজ্য বলেই মনে হবে পাঠকের। 'নজরুল প্রতিভা'ও তিনি পরিমাপ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছেন। তাঁর সমকালীন উপন্যাস ও ঔপন্যাসিকদের জরিপ করেছেন কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত 'শরৎচন্দ্র ও তারপরে' নামের বক্তৃতা সমষ্টিতে।

'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলন যখন শুরু হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্র ও মুসলিম শিক্ষকদের নিয়ে, তখন গাঁয়ে গাঁয়ে মুসলিম পাড়ায় ও সমাজে ইংরেজী শিক্ষা প্রবেশ করেছে। শিক্ষার মাধ্যম ছিল ইংরেজী। তাই প্রবেশিকা পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণরাও শুদ্ধ ইংরেজীবাক্য রচনা করতে পারত এবং সেকালের চালু প্রবণতার ফলে idioms and phrases-ও তারা জানত-বুঝত। একাল ছিল খেলাফত আন্দোলনের ব্যর্থতার কাল। খেলাফত আন্দোলনকালের ঐক্য এবং চিত্তরঞ্জন দাসের বেঙ্গল প্যাক্টও ১৯২৬ সনের কোলকাতার দাঙ্গা রোধ করতে পারেনি। এ সময়ে ইংরেজী শিক্ষিতদের মনে পরোক্ষ ব্রিটিশ প্ররোচনায় আর ইতিহাস ও সামন্ত সমাজের নিয়ম-রীতি সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাবে এসব মুসলিমরা শুনল, জানল ও ঝুঝল যে হিন্দু জমিদার-মহাজন-উকিল-ডাক্তার-চাকুরে-দোকানীরাই তাদের অর্থ-সম্পদ বিবিধ উপায়ে আত্মসাৎ করে তাদের অজ্ঞ-অনক্ষর-নিঃস্ব-নিরন্ন দরিদ্র করেছে, নইলে বাদশাহর জাতের কি এ দুরবস্থা হতে পারে? W.W Hunter-কে দিয়ে ব্রিটিশ সরকার ১৮৭৩ সালে Indian Musalman নামের বিষবৃক্ষের বিদ্বেষফল বিলাতে থাকে। কাজেই তখন বিশ্বমুসলিমের হৃত অতীতের গৌরবগর্বই মুসলিমদের স্মৃতিরোমন্থনে প্রাপ্ত পুঁজি পাথেয়। গর্ব যতটা অনুপ্রাণিত করেছে, সে-পরিমাণে হিন্দু-বিদ্বেষ ও ব্রিটিশ নির্ভরতা বাড়িয়েছে। এজন্যেই 'বুদ্ধির মুক্তি' দলের সমাজ-উন্নয়ন স্পৃহা জেগেছে, স্বাধীনতাপ্রাপ্তির গরজ চেতনা জাগেনি। ফলে কিছুকালের মধ্যেই সর্বভারতীয় ভিত্তিতে মুসলিম কওম সংসদে প্রতিনিধিত্ব এবং চাকরিতে প্রাপ্য অংশ সুনিশ্চিত করার রাজনীতিই জোরালো করে। গোলটেবিল বৈঠক ও তার ব্যর্থতার কারণই হলো অচ্ছুৎ শূদ্র, মুসলিম ও হিন্দু স্বার্থের স্বাতন্ত্র্যচেতনা। এরপরে স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথার বদৌলত মুসলিম লীগ প্রবল হতে থাকে, হিন্দু-মুসলিমের পৃথক জাতিচেতনা ও বিজাতিদ্বেষণা বাড়তে থাকে, পরিণামে উপমহাদেশ বিখণ্ডিতই হল মুসলিমদের অর্থ-সম্পদের নিরাপত্তা, স্বাধীন আত্মবিকাশের নিশ্চিতি প্রভৃতির প্রয়োজনে নৈবাসিক রাষ্ট্র তৈরি জরুরী বলে বিবেচিত হল।

'বুদ্ধির মুক্তি' সমর্থকরা যে সংস্কারকই ছিলেন, কাজী মোতাহার হোসেনের রচনা থেকেও তার সাক্ষ্য-প্রমাণ মেলে। তিনি বলেছেন 'আমরা কল্পনা ও ভক্তির মোহ আবরণে সত্যকে ঢাকিয়া রাখিতে চাহি না। আমরা চাই জ্ঞান-শিক্ষা দ্বারা অসার কুসংস্কারকে ভস্মীভূত করিতে এবং সনাতন সত্যকে কুহেলিকামুক্ত করিয়া ভাস্বর দীপ্তিময় করিতে।' [ওদুদ চর্চা, সাঈদ-উর রহমান সম্পাদিত, পৃঃ ৫৭]

'বুদ্ধির মুক্তি'র তাৎপর্য হচ্ছে যুক্তি-বুদ্ধি প্রয়োগে কুবিশ্বাস, কুসংস্কার ও কুধারণা বর্জন। অধ্যাত্ম ও অলৌকিক অদৃশ্য আসমানী বিশ্বাসকে বিশুদ্ধ ও অবিকৃত রাখাই এঁদের লক্ষ্য। কাজেই এঁরা সংস্কারক Reformer ও Revivalist, নতুন চেতনার ও চিন্তার চাষ এঁদের লক্ষ্য নয়। তাছাড়া 'জ্ঞান সেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব'-এর মধ্যে 'জ্ঞানের ও বুদ্ধির চর্চা' নিতান্ত সীমিত তাৎপর্যে ব্যবহৃত। মুক্তবুদ্ধি এ নয়, ডিগদড়ি দেয়ায় বিশ্বাসের পরিসর স্বচ্ছ ও কল্যাণকর করাই এ জ্ঞান-বুদ্ধি অর্জনের ও প্রয়োগের লক্ষ্য। এরও সাক্ষ্য-প্রমাণ রয়েছে কবি আবদুল কাদিরের কথায় 'আবুল হোসেন প্রভাবিত মুসলিম সাহিত্য সমাজের ও 'শিখা'র মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল স্বাধীন চিন্তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চর্চা; পরে অন্যদের পরিচালনাকালে তা সত্যপ্রীতি ও সাহিত্যচর্চা হয়ে উঠলো।' তাছাড়া মুসলিম সাহিত্য সমাজ ও শিখা দু-ই স্বল্পসময়ে অস্তিত্ব হারিয়েছিল অঙ্গে ও অন্তরে।

কাজী আবদুল ওদুদ 'শিখা'য় বেশি লেখেননি, তাছাড়া তাঁর সাহিত্যকর্মের বেশির ভাগই 'মুসলিম সাহিত্য সমাজের' লক্ষ্যের আওতায় পড়ে না। অতএব, তাঁর লেখক পরিচিতি শিখাগোষ্ঠীর একজন হিসেবে কোন মতেই সীমিত থাকেনি। কাজী আবদুল ওদুদ বাঙলাভাষার ও বাঙালীর প্রথমশ্রেণীর একজন মননশীল লেখক হিসেবেই স্মরেণ্য ও বরেণ্য।

'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের ও শিখার লেখাগুলোর প্রত্যাশিত প্রভাব অনুকূল প্রতিবেশের অনুপস্থিতির দরুন মুসলিম সমাজে ছড়ায়নি। ছড়াতে পারেওনি সেকালের মুসলিম সমাজে সবচেয়ে প্রভাবশালী 'মাসিক মোহাম্মদী'র সম্পাদক মৌলানা আকরম খানের ও তাঁর অনুরাগী-অনুগামী ও অনুগতদের বিরূপতায় ও প্রতিবাদী ভূমিকা গ্রহণে। কাজেই কাজী আবদুল ওদুদের প্রতিষ্ঠা একজন মননশীল সুন্দর শৈলীর মুক্তবুদ্ধি যুক্তিপ্রবণ লেখক হিসেবেই, শিখাগোষ্ঠীর প্রধান হিসেবে নয়। বস্তুত 'বুদ্ধির মুক্তি' ও 'শিখা' সৈয়দ আবুল হোসেনেরই মানস প্রসূন। কাজী আবদুল ওদুদ আমাদের কাছে একজন উদার, পরমত ও আচরণ সহিষ্ণু, গুণগ্রাহী, চরিত্র ও মনীষামুগ্ধ যুক্তিবাদী সত্যসন্ধ সংস্কৃতিমান সুজন ও সজ্জন।

উল্লেখ্য যে মুসলিম সাহিত্য সমাজীদের ও শিখার প্রকাশিত রচনার প্রভাবে মুক্তবুদ্ধির তরুণ মুসলিমসমাজে অন্যকারণেও সুলভ হতে পারেনি। ১৯৩০-৩২ সনের গোলটেবিল বৈঠক, জিন্নাহর চৌদ্দদফা, ১৯৩৫ সনের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন আইন, ১৯৩৭ সনে বাঙলায় মুসলিম লীগ শাসন প্রতিষ্ঠা, বাঙলার মুসলিম চেতনায় স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার কাঙ্ক্ষা ও হিন্দুকে প্রতিপক্ষরূপে প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রু রূপে গ্রহণ এবং পরিণামে পাকিস্তান প্রস্তাবের প্রভাব স্বীকারের কারণে 'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন' মুসলিম মনে কোনই প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলতে পারেনি।

আমার চোখে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিভূতিভূষণ 'আমার লেখা' প্রবন্ধে তাঁর লেখক হয়ে ওঠার বৃত্তান্ত বয়ান করেছেন। তিনি তাঁর উপন্যাসে ১২৩৭ থেকে ১৩৫০ সাল অবধি শতোর্ধ্ব বছরের বাঙলার গ্রামীণ হিন্দুর জীবনের, সমাজের, চরিত্রের, ভাব-চিন্তা-কর্ম আচরণের আলেখ্য দান করেছেন তার গল্পে-উপন্যাসে, বিশেষ করে উপন্যাসে। এ চিত্রাঙ্কনে তাঁর দৃষ্টি অর্থনীতিবিদের, সমাজতাত্ত্বিকের কিংবা সমাজবাদীর ছিল না। এ আলেখ্য অনেকটা 'যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং' গোছের। সময়ের সঙ্গে সমাজের বিবর্তনধারা সম্বন্ধে প্রত্যাশিত কোন মত, মন্তব্য কিংবা সিদ্ধান্ত পরিত্যক্ত করেননি। কবি জসীমউদ্‌দীনের মতো তিনি কেবল বয়ান করেছেন। অথচ গল্পে-উপন্যাসে লেখক কেবল জীবন, শাস্ত্র সমাজ, চরিত্র, আচার-আচরণ প্রভৃতি চিত্রিত করেন না, যা বাঞ্ছিত, যা হওয়া কল্যাণকর সে-সম্বন্ধেও মত-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মন্তব্য-সিদ্ধান্ত পরিব্যক্ত করেন। বিভূতিভূষণ মত, মন্তব্য, সিদ্ধান্ত প্রকাশের কিংবা যথাপ্রয়োজনে যথাসময়ে যথাস্থানে যথাপাত্রে সংস্কার ও সংস্করণ পন্থা গ্রহণের দায়িত্ব পাঠকের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন।

আমরা সবাই জানি বিভূতিভূষণের অনুভবের জগৎটাই ছিল প্রকৃতি-সম্পৃক্ত। অন্যকথায় তাঁর দেহে-প্রাণে-মনে-মগজে-মননে ছিল প্রকৃতির প্রভাব। তাঁর জীবনানুভূতির ভিত্তিই ছিল প্রকৃতি। অতএব, বিভূতিভূষণের জীবন, মানুষ ও সমাজ সম্পৃক্ত চিন্তা-চেতনার সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্কটাই ছিল অঙ্গাঙ্গীর। প্রকৃতি কোথাও কোথাও দার্শনিক চেতনার আভাস দেয়। বিভূতিভূষণের দেখার চোখ, শোনার কান, শোঁকার নাক, স্পর্শকাতর ত্বক, এবং বোঝার মগজ, অনুভবের মন, উপলব্ধির মনন ছিল। কিন্তু মত, মন্তব্য কিংবা সিদ্ধান্ত জানাবার আগ্রহ ছিল না কখনো। তিনি জানতেন ও বুঝতেন সবকিছুই। তাই তো ১২৩৭ থেকে ১৩৫০ সালের বাঙলার ও বাঙালী হিন্দুর গ্রামীণ জীবনের বিবর্তন ধারা ঐতিহাসিকের মতোই তাঁর পথের পাঁচালী থেকে অশনিসংকেত অবধি উপন্যাসগুলোতে নির্মোহ নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিয়ে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য প্রচ্ছন্ন রেখে বয়ান করেছেন। নিজেকে এবং নিজের উদ্দেশ্যকে প্রচ্ছন্ন রাখতেন বলেই তিনি লেখা ও রেখাচিত্র আঁকতেন। দেখাতেন, শোনাতেন, শোঁকাতেন, অনুভব করাতেন, উপলব্ধি করাতেন। তাঁর রচনার সমকালীন শোষণ-শাসন-নির্যাতন, জমিদার, নীলকর, মহাজন, দারিদ্র্য, নিঃস্বতা, নিরন্নতা, দুর্ভিক্ষ, নদী, অরণ্য, পর্বত সবই রয়েছে। কিন্তু মত-মন্তব্য-সিদ্ধান্ত প্রকাশ করে সঙ্কট-সমস্যা, শোষণ-পীড়ন বিমোচনপন্থা জানাতে-বোঝাতে চেষ্টা করতেন না। কবি জসীমউদ্‌দীনও এমনি গ্রামীণ জীবনে সুখ-দুঃখের, আনন্দ-বেদনার, বিরোধ-বিবাদের, দ্বেষ-দ্বন্দ্বের, সংঘর্ষ-সংঘাতের, প্রেম-বিচ্ছেদ-বিরহের, পীড়নের, হারানোর চিত্র এঁকেছেন, কিন্তু প্রতিকারপন্থা বাতলাননি কখনো।

আগেই বলেছি, বিভূতিভূষণ তাঁর উপন্যাসে শতোর্ধ্ব বছরের বাঙলার ও বাঙালীর জীবন ও সমাজচিত্র সুপরিকল্পিতভাবে অঙ্কিত করেছেন। গল্পে চিত্রিত করেছেন জীবনের আপাত তুচ্ছ প্রাত্যহিকতার মধ্যেও ঘটে যাওয়া ট্র্যাজেডির, কমেডির, সুখের ও বেদনার, প্রণয়ের ও যন্ত্রণার সূক্ষ্ম অনুভব, যা মনে লাগে, মর্মে লাগে, হৃদয় অজানতেই বিক্ষত করে, ব্যথিত করে, আবেগাকুল করে।

বিভূতিভূষণ বাঙলাসাহিত্যের উজ্জ্বল নক্ষত্রবৎ প্রখ্যাত লেখকদের একজন, এরূপ বহুল-আলোচিত ব্যক্তির রচনা সম্বন্ধে নতুন কথা বলা অসাধ্য বা দুঃসাধ্য কর্ম। যে-কোন আলোচনায় অন্যের মতের ও মন্তব্যে প্রভাব জ্ঞাতে অজ্ঞাতে এসে যায়। ফলে কথাগুলো নকলের মতো ঠেকে পাঠকের চোখে।

বিভূতিভূষণ রোজনামচা বা দিনলিপি লিখতেন। বিভিন্ন নামে যথা অভিযাত্রিক, স্মৃতির রেখা, তৃণাঙ্কুর, উর্মিমুখর, বনে পাহাড়ে, উৎকর্ণ, হে অরণ্য কথা কও প্রভৃতি পৃথক পৃথক বইরূপে বাজারে চালুও রয়েছে। এগুলোর মধ্যেই জীবন্ত মানুষ-ব্যক্তিপুরুষ বিভূতিভূষণের ব্যক্তিক রুচি, চিন্তা-চেতনা, চাওয়া-পাওয়া, তাঁর মনের গতি-প্রকৃতি বোঝা যায়।

বিভূতিভূষণ কিশোর-কিশোরীদেরও তাঁর অবদান থেকে বঞ্চিত করেননি। আমরা সবাই জানি, ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসিত সমাজে ব্রাহ্মণই শূদ্রসেব্য। তাই শাস্ত্রে-সমাজে-রাষ্ট্রে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেমন ব্রাহ্মণের প্রাধান্য, তেমনি বিদ্যার সৃজনে ও বিতরণেও ছিল সুপ্রাচীনকাল থেকে ব্রাহ্মণের একাধিপত্য, তাই শাস্ত্রে-সাহিত্যে-দর্শনে তাদের কৃতি-কীর্তিই বেশি। আজো আমরা একালেও অর্থাৎ আধুনিক প্রতীচ্যবিদ্যাপ্রভাবিত সমাজেও মনন-মনীষাক্ষেত্রে ব্রাহ্মণেরই প্রাধান্য লক্ষ করি। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-বিভূতিভূষণ-তারাশঙ্কর-মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ী নন কেবল, আজকের লেখকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠদের অনেকেই ব্রাহ্মণ। এঁদের পরেই কায়স্থ ও বৈদ্যের স্থান। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও সেই শূদ্রসেব্য ব্রাহ্মণদের একজন মতে ও পথে। তাঁরও জীবনচেতনা ও জগৎভাবনা উদার বুর্জোয়ার। সাহিত্য যে গণসাহিত্য হয়ে উঠতে বিলম্ব হচ্ছে, এ-ও তার অন্যতম কারণ। অবশ্য একালে অনেক ব্রাহ্মণকেই আমরা সমাজবাদী বা মার্কসবাদী হিসেবে পেয়েছি।

একজন বহু ও বিচিত্র গ্রন্থপ্রণেতার মধ্যে লেখককে স্বরূপে আবিষ্কার করা, তাঁর সম্বন্ধে একটা নিখাদ নিখুঁত পূর্ণাঙ্গ পষ্ট ধারণা পাওয়া সম্ভব হয় না সাধারণের পক্ষে। অনেকটা 'অন্ধ-হস্তী ন্যায়'ই বিচারের ও ধারণার উৎস ও ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়। তা ছাড়া, যে-কোন মানুষের জীবনে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান-প্রজ্ঞা-অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির ফলে পূর্বাপর সঙ্গতি থাকে না চিন্তা-চেতনার, ধারণার, মনের, মননের, মতের, মন্তব্যের ও সিদ্ধান্তের। কাজেই স্ববিরোধিতার ও বৈপরীত্যের সন্ধানও মেলে রচনায়। বিভূতিভূষণ মহৎ জীবনশিল্পী নন, কিন্তু অবশ্যই বিশিষ্ট। তাঁর জীবনানুভূতি ও জগৎ-উপলব্ধি প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনী দিয়ে যেমন গাঢ়, গভীর ও ব্যাপকভাবে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল, তেমনি সামাজিক পরিবেশও তাঁর মন-মননে অনেকটা মাটিলগ্ন বাস্তব জীবনানুগ করে তুলেছিল। এ জন্যেই তাঁর প্রায় সব রচনায় প্রকৃতিকে ও মানুষকে প্রায় সমভাবে পাওয়া যায়। কোথাও তাই আকাশচারিতা সুলভ নয় তাঁর রচনায়, যদিও স্বাভাবিকতা কোথাও কোথাও বিঘ্নিত হলেও, সম্ভাব্যতা রয়েছে প্রশ্নাতীত। তাঁর রচনার বিষয় তথা মানস-বিচরণের ক্ষেত্র ছিল সমকালীন ও নিকট অতীতের সমাজ, পরিবর্তমান গ্রামীণ ও শহর প্রভাবিত মানুষের জীবনালেখ্য দানই ছিল তাঁর লক্ষ্য। যদিও তিনি যতটা ভাবাবেগের অনুগত, যুক্তিবুদ্ধির অনুরাগী নন ততটা। তবে স্বীকার করতেই হবে যে বিভূতিভূষণ শ্রম ও সময় ব্যয়ে অকৃপণ ধৈর্যশীল, আন্তরিক নিষ্ঠাবান লেখক। হৃদয়বান সংবেদী, দরদী লেখক, জীবনের ও প্রকৃতির অনুপুঙ্খ রূপকার। গ্রামীণ জীবন তাই প্রাণ পেয়েছে তাঁর লেখায়। এ জন্যেই তিনি পাঠকপ্রিয় বাঙলার ও বাঙালীর লেখক। ভূপ্রকৃতি ও দুস্থ মানুষ তাঁর কলমের আঁচড়ে বাস্তব ও জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর বিষাদচেতনা ও কৌতুকপ্রিয়তা—দুটোই অতি সূক্ষ্মভাবে অব্যক্ত ভাষায় অভিব্যক্তি পেয়েছে তাঁর রচনায়। বেদনার রেশ ও দীর্ঘশ্বাস এড়াতে পারে না তাঁর লেখার পাঠক। তাঁর গল্পেও ছড়িয়ে রয়েছে করুণ-মধুর অনুভবের হীরক খণ্ড। তবু বলাই বাহুল্য, তিনি বিশিষ্ট ও অনন্য হলেও অসাধারণ অসামান্য শক্তিধর নন, ত্রুটি তাঁর গল্প-উপন্যাসে দুর্লক্ষ্য নয়। মানুষে পরিপূর্ণতা মেলে না। এ তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য স্বীকার করে নিলেই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও অকৃত্রিম শংসায় ভূষিত লেখক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের মানস-মুক্তির দিশারী যুক্তিবাদী আরজ আলী মাতুব্বর

নদী শুধু পথ বদল করে না, গতিও হারায়। কাজেই নদী একূল ভাঙে ওকূল যেমন গড়ে তেমনি এক সময় প্রবাহহীন হয়ে মরা নদী হয়ে লোক স্মৃতির সঞ্চয় হয়েই থাকে। মানুষের সমাজে ও মননে তেমনি মতের পথের পরিবর্তন ঘটে, অদৃশ্য নানা দৈশিক-কালিক ও প্রাকৃতিক কারণে মানুষও এক সময়ে ব্যক্তিগত জীবনে যেমন আকস্মিকভাবে অনুভব করে যে চুল বেড়ে গেছে, কাটাতে হবে, তেমনি অনুভব উপলব্ধি করে যে উপযোগরিক্ত নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ ও প্রথা-পদ্ধতি এবং শাস্ত্রিক বিধি-নিষেধ পরিমার্জন কিংবা পরিবর্তন করা আবশ্যিক অথবা পুরোনো শাস্ত্র বর্জন করেই নতুন চেতনা, নতুন চিন্তা সম্বল করে দেশ-কালের উপযোগী মানবিক, সামাজিক, ব্যবহারিক, সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রিক নতুন নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ, প্রথা-পদ্ধতি প্রবর্তন আবশ্যিক। সাধারণ মানুষ গতানুগতিক ও যান্ত্রিক আচারে-আচরণে অভ্যস্ত জীবনযাপনে থাকে নিষ্ঠ, তুষ্ট, তৃপ্ত ও হৃষ্ট। যুক্তি-বুদ্ধি, জ্ঞান-প্রজ্ঞা প্রয়োগে উপযোগের নিরিখে যাচাই-ঝাড়াই-বাছাই করে না। কৃচিৎ কোন ব্যক্তি-মনে কেবল জাগে বন্ধ্যাত্ব, অবক্ষয়, যান্ত্রিকতা, মনুষ্যত্বে জরা, জড়তা ও জীর্ণতা সমাজদেহ নষ্ট করে দিচ্ছে, ব্যক্তিক-পারিবারিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রিক জীবনচেতনা মরা নদীর মতোই পথভ্রষ্ট হয়ে গতি হারাচ্ছে। এসব লোকের মধ্যে স্বল্প মেধা-মনন-মনীষার লোকেরা হন মেরামতপন্থী সংস্কারক। আর মুক্তবুদ্ধির লোকেরা নতুন চেতনায়-চিন্তায় ঋদ্ধ হয়ে উচ্চারণ করেন নতুন কথা, আবিষ্কার করেন জীবনযাত্রার নতুন পন্থা, উদ্ভব করেন নতুন নীতি-নিয়ম, সৃষ্টি করেন জীবনে মানবিক গুণের তথা মনুষ্যত্ব বিকাশের ও উৎকর্ষের উপায়, উপলব্ধি করেন জীবনের ও জগতের নতুন মহিমা, খুঁজে পান নতুন রুচির ও সূক্ষ্ম সৌন্দর্যের তাৎপর্য। তখন সংস্কৃতি হয় সৃষ্টিবহুল বীজ-বৃক্ষ-ফুল-ফলের মতোই। মানুষের সমাজের গতি, প্রগতি, প্রাগ্রসরতা বজায় থাকে এভাবেই। সংস্কৃতি বর্ধিষ্ণু থাকে মনীষার প্রয়োগে জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে মানসিক ও ব্যবহারিক প্রয়াসে উৎকর্ষ সাধনে।

ইতিহাসের সাক্ষ্যে প্রমাণে বোঝা যায় সাধারণ মানুষ অজ্ঞ-উদাসীন এবং চাহিদা-অচেতন হলেও প্রাকৃতিক নিয়মের মতো এক অদৃশ্য অব্যক্ত-অবচেতন অনুভবের ও প্রয়োজনের আবেগে ও প্রেষণায় পুরোনো মতের, পথের, নীতির, নিয়মের, রীতির, রেওয়াজের, প্রথার ও পদ্ধতির উপযোগরিক্ততা অবশ্য পরিহার্য হয়ে ওঠে। তখন জ্ঞান-প্রজ্ঞা-যুক্তি-বুদ্ধিসম্পন্ন কেউ না-কেউ জান-মাল-গর্দান হারানোর ঝুঁকি নিয়ে অভীক চিত্তে উচ্চকণ্ঠে দ্রোহ ঘোষণা করে। এভাবেই একদিন ব্রাহ্মণ্য দাপট খর্ব করতে চেয়েছিলেন মহাবীর, গৌতমবুদ্ধ কিংবা লোকায়তিকরা। এভাবেই বিদেশী বিজেতার সংস্পর্শে আসার ফলে দেশে দেশে বিভিন্ন শাস্ত্রিক সমাজে এসেছে পরিবর্তন, ঘটেছে বিবর্তন। যেমন ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রে ও সমাজে শঙ্কর, রামানুজ, মধ্ব, নিম্বার্ক, বল্লভ, চৈতন্য কিংবা রামানন্দ, রামদাস, কবীর, দাদু, নানক, একলব্য প্রমুখ অনেক সন্ত স্ব স্ব মতে ও পথে চালিত করেছেন অনুরাগী, অনুগামী ও অনুগতদের। উনিশ শতকে রামমোহন বিমূর্ত ব্রহ্মের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপাসনা প্রবর্তন করলেন, তার প্রসার রোধকল্পেই যেন সৃষ্ট হল রামকৃষ্ণের মাতৃতত্ত্ব। ঔপনিষদিক অদ্বৈতব্রহ্মতত্ত্বের, আত্মাতত্ত্বের সূক্ষ্মদর্শনের প্রচার ও প্রসার এবং স্থিতি সত্ত্বেও বিবেকানন্দ-রামকৃষ্ণের নামে কালোপযোগী সেবাধর্মের মহিমা ও প্রয়োজন-চেতনা জাগিয়ে বিমূর্ত অদ্বৈতব্রহ্মতত্ত্বের চেয়ে মাতৃতত্ত্বকে বেশি জনপ্রিয় করে তুললেন। ব্রাহ্মমত ত্রিধা বিভক্ত হয়ে অল্পকালের মধ্যেই যেন মরু পথে হারাল প্রগতির নয় শুধু, দিশাও, ফলে নিষ্ক্রিয়তায় জরা-জড়তা ও জীর্ণতাগ্রস্ত হল। উদার ও সহিষ্ণু আর প্রসারমান আধুনিক হিন্দু সমাজ গড়ে তুলতে পারল না এ মতবাদ। পৃথিবীতে চিরকালই ধর্মবোধের ও শাস্ত্রের পরিবর্তন হয়েছে, হয়েছে পরিবর্জনও।

এভাবে অনেক ধর্মের বা প্যাগান সর্বপ্রাণবাদ, যাদুবিশ্বাস, ট্যাবু-টোটেম তত্ত্ব, ঈশ্বরবাদ বিবর্তিত বিবর্জিত হয়েছে দেশে দেশে। নতুন নতুন চেতনার ও চিন্তার প্রসূনরূপে দেশের ও কালের মানুষের চাহিদা পূরণ করেছে নতুন নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ, প্রথা-পদ্ধতি রূপ অলিখিত বা লিখিত শাস্ত্র। শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির ও ব্যক্তিত্বের উচ্চারিত বাণীই শ্রুতি-স্মৃতিরূপে চালু থেকেছে, বিকৃতিও পেয়েছে স্বাভাবিক কারণে। তারপরে একশ' দু'শ' তিনশ' বছর পরে গুণী-জ্ঞানী জনরূপে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের নেতৃত্বে, কর্তৃত্বে ও সম্মতি-সমর্থনক্রমে লিপিবদ্ধ সর্বজনমান্য বিধি-নিষেধরূপ শাস্ত্র তৈরি হত। তাই দুনিয়ার তাবৎ শাস্ত্রের ব্যাখ্যায়-বিশ্লেষণে, টীকায়-ভাষ্যে মত-পথগত পার্থক্য সৃষ্ট হয়েছে। তৈরি হয়েছে অনেকতায় বহু বহু মতবাদী সম্প্রদায়— শাস্ত্রগ্রন্থ অভিন্ন থাকা সত্ত্বেও। উনিশ শতকের ভারতে-বাঙলায় ওয়াহাবী-ফরায়েজী মত চালু হয়েছিল— পীর-দরগাহ-সূফী বা মারফত ও বাউল মতবাদীদের কুরআনানুগ পন্থায় ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে।

আমাদের একালে এই বাঙলাদেশেই বরিশালের অজপাড়াগাঁয়ে একজন গোড়ায় সাক্ষর এবং অশিক্ষিত দুস্থ-দুঃখী মানুষ লোকচক্ষুর অন্তরালে আকস্মিকভাবে এক বিস্ময়কর ভূমিকা সার্থকভাবে পালন করে গেলেন, যাঁর বাণীর ও রচনার প্রভাব প্রসৃত হয়ে হয়ে সুদূরপ্রসারী যুগান্তকারী প্রভাব ফেলবে বাঙালী মুসলিম সমাজে। এ শতকের গোড়ার দিকে গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর মতোই এর রচনাবলী সাক্ষর-অনক্ষর ও শিক্ষিত নির্বিশেষকে যুক্তিবাদী ও উপযোগবাদী মর্ত্যজীবনবাদী করে তুলবে— যাঁরা তাঁর বইগুলো পড়বেন, যাঁরা তাঁর বাণী ও যুক্তি নানা প্রসঙ্গে মুখে মুখে উচ্চারণ করে করে কানে কানে পৌঁছাবেন তাঁরাও তাঁর বাণী জনগণের মধ্যে প্রচারের-প্রচারণার ও প্রভাবের সহায়ক হবেন— এ আমাদের দৃঢ় ধারণা। এমন কি আরজ আলী মাতুব্বরের বইয়ের পাতা উলটালেও জিজ্ঞাসা ও পড়ার কৌতূহল জাগবে, ঘুচবে অনেক অজ্ঞতা। আর্থ-বাণিজ্যিক, খাতকী-মহাজনী ও সেবক-সহায়ক সাম্রাজ্যবাদ এবং মৌলবাদ কবলিত তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোর মুক্তির একমাত্র পথ হচ্ছে যুক্তিবাদের প্রসার এবং বিজ্ঞানের তত্ত্বে, তথ্যে ও সত্যে নিঃসংশয় আস্থা। আরজ আলী মাতুব্বর আমাদের একালের একজন অনন্য ও অসাধারণ মানুষ, যিনি আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে আমাদের মানসিক ও বৌদ্ধিক অন্ধতা ও বদ্ধতা ঘোচানোর লক্ষ্যে অনেকগুলো বিজ্ঞান ও যুক্তিনির্ভর গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। এক হিসেবে তিনি আমাদের মধ্যে সত্যিকার মনীষাসম্পন্ন যুগপুরুষ যিনি আমাদের মানসিক ও ব্যবহারিক জীবনকে যৌক্তিক-বৌদ্ধিক ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপর স্থিতি দান করে আমাদের মর্ত্যজীবনের ও চেতনার-চিন্তার সর্বক্ষেত্রে আমাদের নব জীবন লাভের সহায়ক হয়েছেন। বিজ্ঞানে আস্থাবান যুক্তিবাদী আরজ আলী মাতুব্বরই হবেন বাঙলার জনগণের মানসমুক্তির সহায়।

ডান ও বাম নির্বিশেষে যাঁরা নিজেদের প্রগতিবাদী এবং মুক্ত মন-বুদ্ধির ও যুক্তির অনুগত বলে দাবি করেন, তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে আরজ আলী মাতুব্বরের গ্রন্থাবলী পাঠ করা, পাঠ করানো, পাঠ করে অনক্ষরদের শোনানো এবং তার 'জন্ম-মৃত্যু দিবস' পালনে উৎসাহী হওয়া। তাঁর গ্রন্থাবলীর অনেকগুলোই এখন বাজারে পাওয়া যায়। আমাদের নিজেদের মানস মুক্তির জন্যে, বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণার লৌহ-কঠিন খাঁচার দ্বার উন্মুক্ত করার লক্ষ্যেই আমাদের আজ জনগণের একজন আরজ আলী মাতুব্বরের সহজ ভাষায় পরিব্যক্ত সহজ যুক্তি গ্রহণ-বরণ আবশ্যিক ও জরুরী।

বাঙলার স্বাধীনতার পতাকা উড্ডয়নে পথিকৃৎ সূর্যসেন

স্বাধীনতা সংগ্রাম ব্রিটিশ ভারতে শুরু হয়েছিল ওয়াহাবী-সিপাহিদ্রোহের ও যুদ্ধের মাধ্যমে। ১৮৫৭ সালে ওয়াহাবী-সিপাহি পরাজয়ে দিল্লীর বাদশাহর পদচ্যুতিতে তার অবসান হয়নি। বোম্বাইয়ে পাঞ্জাবে বাঙলায় উড়িশায় বিহারে লঘু-গুরুভাবে বহু দেশপ্রেমিক স্বাধীনতা সংগ্রামীর প্রাণদানে কারাবরণে তা চালু ছিল। এ সূত্রে ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্রের অনুশীলন ও যুগান্তর (১৮৯৯-১৯০১) এ দুই গুপ্তদলের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। বাঙলা দেশে বলতে গেলে স্বদেশপ্রেমের ও স্বাধীনতাচেতনার ঐতিহাসিক উদ্ভবকাল হচ্ছে ১৮৬৭ সালের কোলকাতায় অনুষ্ঠিত হিন্দু মেলায়। যদিও দশ বছর আগেও ওয়াহাবী-সিপাহি বিপ্লব কোন বাঙালী হিন্দুরই সমর্থন পায়নি। বরং বিপন্ন ব্রিটিশের প্রতি ছিল আন্তরিক সমর্থন ও সহযোগিতা।

বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। মোটামুটিভাবে আমরা বিশ শতকেই ব্রিটিশ ও দেশী প্রশাসক হত্যার মাধ্যমেই স্বাধীনতা সংগ্রামের শুরু দেখতে পাই। ক্ষুদিরাম, প্রফুল্লচাকী প্রমুখ এক্ষেত্রে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। ভারতের বিভিন্ন স্থানে রক্তঝরা বিপ্লব মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে বহু বহু তরুণ-তরুণী তৈরি হতে থাকে। এদের সেকালের ভাষায় বলা হত সন্ত্রাসবাদী স্বরাজী। অরবিন্দ ঘোষ, বারীণ ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলায় ধরা পড়ে জেল খাটেন। ১৯০৭ সালের পরে আমাদের চট্টলগৌরব বাঙালী বীর সূর্যসেনের ব্যক্তিত্ব প্রভাবে ও নেতৃত্বে চট্টগ্রামেও গড়ে ওঠে প্রাণ দানে ও গ্রহণে সদাপ্রস্তুত একটি অভীক সন্ত্রাসী-বিপ্লবী দল, এ দলে যাঁরা প্রধান ছিলেন তাঁরা হলেন অম্বিকা চক্রবর্তী, লোকনাথ বল, অনন্তসিং, কল্পনাদত্ত, প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার, গণেশ ঘোষ, অর্ধেন্দু, হেমেন্দু, তারেকশ্বর, পূর্ণেন্দু, শরদিন্দু দস্তিদার পরিবার, উপেন বিশ্বাস; বিনোদ চৌধুরী, নির্মল সেন, বিনোদ চক্রবর্তী, হরিপদ ভট্টাচার্য, রামকৃষ্ণ বিশ্বাস, অমরেন্দ্র নন্দী, সাবিত্রী দেবী, সুহাসিনী গাঙ্গুলী, ইন্দুমতী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিংহ, প্রমোদ রঞ্জন চৌধুরী, কৃষ্ণা চৌধুরী, হরেন ভট্টাচার্য, হিমাংশু চক্রবর্তী, দেব প্রসাদ গুপ্ত, আনন্দ গুপ্ত, মাখন ঘোষাল, অপূর্ব সেন, প্রভাস বল, রজত সেন, মনোরঞ্জন সেন, নরেণ রায় প্রমুখ অনেকেই। সবমিলে সক্রিয় সদস্য একশ' জনও ছিলেন না। কালার পুলে, ধোরলায়, ধলঘাটে, গহিরায়, গৈরলায় ফেনীতে ছোট ছোট যুদ্ধ হয়েছে অনেক। সবচেয়ে বড় এবং গৌরবজনক যুদ্ধ হয়েছিল জালালাবাদ পাহাড়ে। জয়ী হয়েছিলেন বিপ্লবীরাই। ক্ষুধায়তৃষ্ণায় কাতর ও নিতান্ত ক্লান্ত থাকা সত্ত্বেও ক্ষুদিরাম-বাঘা যতীন-কানাই লালের অভীকতায়, বীরত্বের অঙ্গীকারে উদ্বুদ্ধ ও প্রবুদ্ধ মোট তেষট্টিজন জালালাবাদ যুদ্ধে ব্রিটিশ সৈন্যদের সম্মুখ যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন, এ যুদ্ধে শহীদ হন মোট তেরোজন। তাঁদের নাম জীতেন্দ্রলাল দাশগুপ্ত, মধুদত্ত, পুলিন ঘোষ, নরেশ রায়, ত্রিপুরা সেন, বিধু ভট্টাচার্য, হরিগোপাল বল, ওর্ফে টেগরা, মতি কানুনগো, প্রভাস বল, শশাঙ্ক দত্ত, নির্মল লালা প্রমুখ। আর এ বিপ্লবে চট্টগ্রামের নানা যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন সূর্যসেনসহ মোট ছাপ্পান্নজন। ব্রিটিশ সরকার চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন স্থানে জাঠ, নিজামের বাহিনী ও গোর্খা সৈন্যের ঘাঁটি বসিয়ে রেখেছিলেন কয়েক বছর যাবত। এমনি ভয় পেয়েছিল ও গুরুত্ব দিয়েছিল সূর্যসেনের দলের বিপ্লবীদের। উল্লেখ্য যে অজ্ঞ অনক্ষর ও দরিদ্রবহুল মুসলিম সমাজে সন্ত্রাসী বিপ্লবী ছিল না বটে, কেননা, তখন মুসলিম সমাজে শিক্ষিত বেকার ছিল না। কিন্তু সর্বস্তরের মুসলিমরা মাঝি-মজুর-চাষী গৃহস্থ এবং সাক্ষর ও শিক্ষিত মুসলিমরা গোটা চট্টগ্রামেই এঁদের বিনা শর্তে সাগ্রহে গোপনে সাহায্য-সহায়তা ও আশ্রয় দিয়েছিল। জালালাবাদ যুদ্ধে মৃতপ্রায় অম্বিকা চক্রবর্তী তো আমজাদ আলীর বাড়িতেই চিকিৎসায় ও শুশ্রূষায় বেঁচে ওঠেন। ফয়েজুন্নিসার কিশোর ছেলেই তো জালালাবাদ পাহাড়ে কুড়িয়ে পাওয়া বিপ্লবীদের ফয়েজুন্নিসার বাড়িতে আশ্রিত অম্বিকা চক্রবর্তীকে এনে দেয়। এ জন্যে কিছু অর্থ দিতে চাইলে অম্বিকা চক্রবর্তীকে বৃদ্ধা বিধবা বলেন, 'এইটি দিয়ে একটা সাহেব মারলে আমি বেশি খুশি হব।' জালালাবাদ যুদ্ধে আহত দীর্ঘজীবী বিনোদ বিহারী চৌধুরী আজো আমাদের মধ্যে রয়েছেন, এমনি অন্যদের অনেকও আজো বেঁচে আছেন।

এঁদের স্বাধীনতার স্পৃহা ও আবেগ এবং অভীকতা এতো দুর্বার হয়ে উঠেছিল যে ব্রিটিশ ভারতের পূর্বদক্ষিণ প্রান্তে এঁরা বিচ্ছিন্নভাবে শুরু করে দেন সংগ্রাম। যে সময়ে অস্ত্র, জনশক্তি, অর্থবল কোনটাই বলতে গেলে ছিলই না, দু'চারটি ডাকাতিতেও অর্থসংগ্রহ হয়নি প্রয়োজনানুরূপ। তবু এঁদের ব্রিটিশ বিদ্বেষ ও স্বাধীনতার পতাকাপ্রীতি এতোই অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছিল যে, জয়টা ক্ষণপ্রভা জেনে ও পরিণামে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী বুঝেও এঁরা নিরস্ত্র হননি প্রাণের ভয়ে। কারণ তাঁরা জানতেন এবং বিশ্বাস করতেন যে যথাপ্রয়োজনে যথাকালে যথাস্থানে যথাকাজে যাঁরা মরতে প্রস্তুত, বাঁচবার স্বাধীন হবার যোগ্যতা ও অধিকার তাঁদেরই। সূর্যসেনের দল যেন আক্ষরিকভাবেই রবীন্দ্রনাথের গানে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন : যদি সবাই ফিরে যায়..... যদি গহনপথে যাবারকালে কেউ ফিরে না চায়/ তবে পথের কাঁটা ও তুই রক্তমাখা চরণতলে একলা দলোরে। ..... আপন বুকের পাঁজর জ্বলিয়ে নিয়ে একলা জ্বলোরে!

রক্তবীজের মতো এক বীরের প্রাণদান ও দেহ নিঃসৃত রক্ত দেশের লক্ষ লক্ষ তরুণ-তরুণীকে দেশ স্বাধীন করার জন্যে ব্রিটিশ বিতাড়নের জন্যে স্বেচ্ছায় প্রাণপণ সংগ্রামে নামার প্রেরণা প্রণোদনা-প্রবর্তনা দান করবে। রক্তবীজের প্রতি বিন্দু রক্ত অসংখ্য অশেষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবিনাশী রক্তবীজের জন্ম দেবে। ব্রিটিশ বিতাড়ন তা হলেই সম্ভব হবে। দেশবাসীকে রক্তদানে, প্রাণদানে, সংগ্রামে, বিপ্লবে অনুপ্রাণিত করবার জন্যেই স্বল্প সংখ্যক সহচর-সহকর্মী নিয়ে সূর্যসেন চট্টগ্রামস্থ য়ুরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করান, এই উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যে নিশ্চিত পরাজয় জেনেও জালালাবাদ পাহাড়ে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হন তাঁরা। তাঁরা মরে অন্যদের স্বাধীন দেশে স্বাধীন মানুষ ও জাতি হিসেবে স্বাধীন সত্তায় বাঁচার অধিকার-চেতনা দান করে গেছেন। তাঁদের কৃতিত্ব ও সংগ্রামের সার্থকতা এখানেই। গোটা ভারতের ওই প্রত্যন্ত অঞ্চল চট্টগ্রামে সেদিন সূর্য সৈনিকরা কিছুকালের জন্যে অন্তত স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করেছিলেন। এদিক দিয়ে তাঁরা ভারতে পথিকৃতের মর্যাদা ও গৌরব লাভ করেছেন ইতিহাসের পৃষ্ঠায়। পলাশীর পরাজয়ের লজ্জাও ঘুচালেন বাঙালীরাই।

মাস্টার দা সূর্যসেন অমর, এজন্যেই তিনি এবং তাঁর দলের সহকর্মীরা শ্রদ্ধার সঙ্গে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

আমরা আজ স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক বটে, কিন্তু আমরা আজো গণমানবকে শোষণ-পীড়ন-অজ্ঞতা-অনক্ষরতা মুক্ত করে স্বাধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠ করতে পারিনি। ফলে স্বদেশী-স্বজাতি-স্বভাষী সরকারেরও আমরা স্বাধিকার বঞ্চিত শাসনপাত্র মাত্র। আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম তাই শেষ হয়নি। আমাদের শোষণমুক্ত গণমানবের সমাজ গড়ার সংগ্রাম চলবেই। সূর্যসেন থেকেই আমরা এ প্রেরণা পেয়েছি বলেই আজ তাঁর জন্মশত-বার্ষিকীতে আমাদের প্রেরণার-প্রণোদনার-স্থৈর্যের ও শক্তির-সংকল্পের-অঙ্গীকারের প্রমূর্ত উৎস হিসেবে তাঁকেই স্মরণ করছি। সূর্যসেন বাঙলার ও বাঙালীর চিরন্তন গৌরবের ও গর্বের অবলম্বন। সূর্যসেনের জন্মস্থান চট্টগ্রাম। তাই ধন্য আজ গণমানব মুক্তির সংগ্রামীদের স্মরেণ্য ভূমি চট্টগ্রামও। চট্টলবাসীরাও তাঁর জাতিত্ব গৌরবে ধন্য।

ইতিহাস, এ ইতিবৃত্তান্ত আজ
আমাদের স্নায়ুতে স্নায়ুতে
বিদ্যুৎ প্রবাহ আনে, আনে চেতনার দিন।
চট্টগ্রাম, বীর চট্টগ্রাম। (সুকান্ত ভট্টাচার্য)

আজকের কবিও জালালাবাদ সংগ্রাম স্মরণে অনুপ্রাণিত :

এইখানে ওরা সূর্যসেনারা প্রাণপণে একদিন/ আমাদের তরে মুঠো মুঠো ভরে রেখে গেছে কিছু ঋণ/যে-ঋণের দায় চুনীর আভায় রক্তে উঠেছে জ্বলে/ নিভেনি কখনো সে-প্রাণের শিখা বাইরের কোলাহলে। [মাহবুব আরম চৌধুরী]

আজকের এ মুহূর্তেও আমাদের বাঁচার সংগ্রাম, শোষণমুক্তির সংগ্রাম, স্বাধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠ হওয়ার সংগ্রাম শেষ হয়নি। তাই কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের ভাষায় বলি,

বিদ্রোহ আজ—বিদ্রোহ চারিদিকে
আমি যাই তার দিন পঞ্জিকা লিখে
এত বিদ্রোহ কখনো দেখেনি কেউ।
(আজ) দিকে দিকে ওঠে অবাধ্যতার ঢেউ।

সূর্যসেন আমাদের সংগ্রামী বিপ্লবী প্রেরণার চিরন্তন উৎস। জয়তু সূর্যসেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঙলাসাহিত্যে চৈতন্যদেবের অবদান

সক্রেটিস থেকে লাল সাঁই অবধি মনীষী মনস্বীরা এবং নতুন মত-পথ-সম্প্রদায় প্রবর্তকরা সাধারণ 'বদং শত/মা লিখ' তত্ত্বেই আস্থাবান। তাই তাঁদের লিখিত বাণী মেলে না। উচ্চারিত বাণী-দেশনাই আমাদের কাছে শ্রুতি-স্মৃতি ভাণ্ডার। তার থেকে লোকমুখে উচ্চারিত ও লোককানে শ্রুত বাণী-দেশনা-আপ্তবাক্য-প্রবচনরূপে আমাদের সাধারণ মানুষের বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা নিয়ন্ত্রণ করে, নীতি-নিয়মের বাঁধনে আমাদের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণও নিয়ন্ত্রণ করে ওইসব বাণী-দেশনা-শাস্ত্র কিংবা লোকঐতিহ্য অথবা লৌকিক রীতি-রেওয়াজ প্রথা-পদ্ধতি হিসেবে। উনিশ শতকে মতবাদী সম্প্রদায়ের দুই বাঙালী গুরু লালন সাঁই ও রামকৃষ্ণ পরমহংস মুখে মুখেই তত্ত্ব-দর্শন প্রচার করেছেন, একজন সুর-তাল-লয়যোগে, অন্যজন উপমাদি অলঙ্কার ও দৃষ্টান্তযোগে।

শ্রীচৈতন্যদেবও ছিলেন গুরু-পণ্ডিত-শিক্ষক-ব্রাহ্মণ, তবু তিনি তাঁর 'শিক্ষাষ্টক' মুখে মুখে না লিখিতভাবে রচনা করেছিলেন, তা নিঃসংশয়ে বলা যাবে না। এবং 'শিক্ষাষ্টক' সংস্কৃতিভাষায় রচিত, বাঙলাভাষায় নয়। অতএব বাঙলাভাষায় মাতৃভাষায় তাঁর কোন লিখিত অবদান নেই। অথচ তাঁর ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচার-আচরণ আর চরিত্র ও বাণী বা দেশনা লক্ষ কোটি মানুষকে তাঁর জীবৎকালেই করেছিল বিবাগী ভক্ত, তাঁর অনুরাগী, অনুগামী ও অনুগত। চৈতন্যদেবে অসামান্য রূপের ও অনন্য গুণের সমাবেশ ঘটেছিল। বলা চলে 'এক অঙ্গে ও অন্তরে এতো রূপ-গুণ নয়নে নাহেরি।' ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন চৈতন্যদেবকে প্রমূর্ত প্রেম বলেই জানতেন। তাই বলেছেন, 'প্রেম একবার মাত্র এই পৃথিবীতে রূপপরিগ্রহ করিয়াছিল, সে বঙ্গদেশে।' কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন, 'বাঙালীর হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া।'

চৈতন্যদব যদিও বলেছেন, 'এ হেন মহাঠাকুরাণীভাব যার মনে উপজয়, বেদধর্ম তেজি সেই কৃষ্ণকে ভজয়।' তবু আজকের বিচারে চৈতন্যদেব পরোক্ষে হিন্দুর শাস্ত্র সমাজরক্ষাই করেছিলেন ভাঙনের মুখে। কেননা নিম্নবর্ণের, নিম্নবর্গের ও নিম্নবিত্তের স্পৃশ্য অস্পৃশ্য ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ পেশাজীবীরা নইলে মুসলমান হয়েই যেত। আজকের রাজনীতিক-সামাজিক ইতিহাস এ তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য অবশ্য স্বীকার করে। যেমন রামমোহন রায় ব্রাহ্মমত প্রচার না করলে ম্লেচ্ছ ইংরেজ-স্পর্শদুষ্ট হিন্দুরা হয়ে যেত খ্রীস্টান। যদিও বাঙলাসাহিত্যে চৈতন্যদেবের কোন প্রত্যক্ষদান নেই, তবু স্বীকার করতেই হবে বাঙলাসাহিত্য সেই পাঁচশ বছর আগে আকস্মিকভাবে চৈতন্যের প্রেমধর্মের প্রভাবে সর্বপ্রকার গ্রাম্যতামুক্ত হয়ে মনের, মগজের ও মর্মের গাঢ়-গভীর ও সূক্ষ্ম অনুভব-উপলব্ধি পরম ও চরম সুষমায় ভঙ্গিতে সুর-তাল-লয়ে গানের মাধ্যমে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের গীতিকবিতার পর্যায়ে উন্নীত হয়ে গেল। অবশ্য অধ্যাত্ম সাধনার রূপক রূপে রাধা-কৃষ্ণ প্রণয়পদ রচিত বলে তার মধ্যে আধুনিক গীতিকবিতার বৈচিত্র্য নেই বটে, তবে প্রেমের অনুভূতি যত প্রকারের হতে পারে, যত বিচিত্র রূপ পেতে পারে, যত সূক্ষ্ম চিত্তসম্পদ হতে পারে, তার পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে বৈষ্ণবপদাবলীতে। প্রণয়ানুভূতির এমন সূক্ষ্ম বিবিধ ও বিচিত্র মর্মচেরা অভিব্যক্তি গোটাজগতে দুর্লভ। বাঙলাসাহিত্যে কেবল রবীন্দ্রনাথেই এমনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূক্ষ্মতার সন্ধান মেলে প্রেমকথায়। বৈষ্ণবপদাবলী আজো আমাদের বাঙলাভাষার গৌরব-গর্বের সম্পদ। এমনি সম্পদের ঐতিহ্যপুষ্ট ছিল বলেই রবীন্দ্রনাথ হয়ে আজো আমাদের শিক্ষিত লোকের শহুরে সাহিত্যে এবং লালন সাঁই হয়ে লোকসাহিত্যে গীতিকবিতা আমাদের প্রধান ও শ্রেষ্ঠধারা রূপে প্রবহমান। এদেশেই চৈতন্য-প্রভাবে 'রাধা ছাড়া সাধা ছিল না, কানু ছাড়া ছিল না গান।' হাজার দশের মতো সংগৃহীত ও সংরক্ষিত পদাবলীর মধ্যে প্রায় তিনশতাধিক পদ বা গান অতুল্য। 'রূপের পাথারে আঁখি ডুবিয়া রহিল' কিংবা 'রূপ লাগ আঁখি ঝুরে' অথবা 'সোই অনুরাগ বাখানিতে তিলে তিলে নোতুন হোই'— এসবের তুলনা নেই ভাবের উচ্চতায় ও সূক্ষ্মতায় আর হৃদয়ানুভূতির গভীরতায়। প্রেম মানুষকে হৃদয়বান, বিবেকবান ও মানবিক গুণে ঋদ্ধ করে। কাম করে নিষ্ঠুর হন্তা। জবিন্ত মানুষের চরিতরচনার শুরু হয় বাঙলাভাষায় চৈতন্যদেবকে অবলম্বন করেই।

চৈতন্যদেবই ভক্ত-ভগবানের, সেবক-সেবিতের, প্রভু-ভৃত্যের, উপাসক-উপাস্যের চিরন্তন শাস্ত্রিক চেতনাকে স্রষ্টা-সৃষ্টির প্রণয় সম্পর্কে রূপান্তরিত করেন এ দেশে। নবগৌড়ীয় বৈষ্ণবমতের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে এ প্রেমবাদ— এতে সূফীপ্রভাব আছে বটে, কিন্তু 'অচিন্ত্য দ্বৈতাদ্বৈতবাদ' অঙ্গীকার করার ফলে এটি এদেশের অদ্বৈতবাদের তথা ব্রহ্মবাদের সঙ্গে নতুন তত্ত্বজড়িত হয়ে আত্তীকৃত, আত্মীকৃত এবং সাঙ্গীকৃত হয়েছে। বলতে গেলে শঙ্করাচার্য থেকে (৭২২ খ্রীস্টাব্দ) রামানুজ, নিম্বার্ক, মধ্ব, বল্লভ কিংবা উত্তরভারতের নিম্নবর্ণের সন্তদের প্রচারিত মতবাদের থেকে চৈতন্যের প্রেমধর্মের পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য কারুর দৃষ্টি এড়ায় না। শ্রীচৈতন্যের এ প্রেমবাদই আমাদের বৈষ্ণবসাহিত্যের উৎস ও ভিত্তি। এ প্রেমবাদই মধ্যযুগের সাহিত্যের ভাব-ভাষা-ভঙ্গি-বিষয়ের গতানুগতিকতামুক্ত গীতিকবিতা রচনা সম্ভব করেছিল। অতএব, চৈতন্যদেবের কাছে বাঙলাভাষা, বাঙলাসাহিত্য, বাঙালীসংস্কৃতির বিস্ময়ধর্মী চরিত্র, বাঙালীচিত্তের উৎকর্ষ, পরমত ও আচরণ সহিষ্ণুতা, জাতবৈষ্ণব, সহজিয়াবৈষ্ণব, সহজিয়া বাউল মত এবং রাধা-কৃষ্ণরূপকে হিন্দু-মুসলিম কবির অধ্যাত্মচেতনার অভিব্যক্তি প্রভৃতির জন্যে বাঙালীমাত্রই ঋণী। বৈষ্ণবমতের বিস্তার ঘটেনি, কিন্তু চৈতন্যদেবের বাণীর, আচরণের ও দেশনার আর রাধা-কৃষ্ণরূপকে প্রেমানুভূতির বিকাশের, বিস্তারের ও উৎকর্ষের ব্যাপকতায় প্রভাব পড়েছিল জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-নিবাস-বৃত্তি নির্বিশেষে সব মানুষের উপর। এবং ষোল-সতেরো শতকে সে প্রভাব ছিল ব্যাপকতায় ও গভীরতায় প্রায় সর্বগ্রাসী। শ্রীচৈতন্যদেব ষোল শতকে এবং রামমোহন রায় উনিশ শতকে একালে হিন্দু নামে পরিচিত সম্প্রদায়কে যথাসময়ে ভাঙনের হাত থেকে রক্ষা করেছেন।

বাঙলাসাহিত্য চর্চায় সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্য ও বিচ্ছিন্নতা

জীবনের প্রয়োজনে জীবন নিয়েই জীবন-চেতনা থেকেই সাহিত্য উৎসারিত। কাজেই জীবন-নিরপেক্ষ কোন সাহিত্য নেই। জীবন আবার দেশ-কাল-অঞ্চল ভয়-ভরসা-বিস্ময়-বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা নিরপেক্ষ নয়। কাজেই আদি ও আদিমকাল থেকেই প্রাকৃতিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিবেষ্টনী সম্ভূত জীবন-জীবিকাপদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত জীবনও তাই স্থান-কাল এবং জীবনোপকরণ সম্পৃক্ত ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে অভিব্যক্ত। তবু যেহেতু মানুষ প্রাণীরই এক প্রজাতিমাত্র এবং ঋজু মেরুদণ্ড ও দুটো হাত তার শক্তির, অনন্যতার ও অসামান্যতার পুঁজি-পাথেয়, সেহেতু তাদের স্বভাবে কিছু কিছু সাদৃশ্য অবশ্যই রয়েছে। উল্লেখ্য যে স্রষ্টা-সৃষ্টি সম্বন্ধে বিস্ময় ও জিজ্ঞাসা কারণ-কার্যসম্বন্ধে অজ্ঞতারই প্রসূন। অজ্ঞতার অসহায়তা থেকেই ভয়-বল-ভরসার অবলম্বন অদৃশ্য অরি-মিত্র শক্তির কাল্পনিক উদ্ভব।

তবে গোড়ার দিকে রোগের প্রতিষেধক উদ্ভাবনে অসমর্থ অজ্ঞ অসহায় মানুষ সংখ্যায় সহজে বাড়ত না, জনসংখ্যার স্বল্পতার দরুন গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাপনে অভ্যস্ত আদি ও আদিম স্তরের মানুষের আহার-নিদ্রা-মৈথুনেই ছিল সাধারণভাবে জীবন-চেতনা ও জীবনের চাহিদা সীমিত। যারা এতেই তুষ্ট, তৃপ্ত ও হৃষ্ট ছিল, জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য, সাচ্ছল্য উৎকর্ষ সাধনে ছিল অনীহ, তারা আজো সেই স্তরে রয়ে গেছে পৃথিবীর নানা অঞ্চলে। সেকালে যানবাহনের যেমন অভাব ছিল, তেমনি ছিল অরণ্য-পর্বত-সমুদ্রের বাধা, আর জনসংখ্যার স্বল্পতার ও কাক্ষাহীনতার দরুন অলঙ্ঘ্য-দুর্লঙ্ঘ্য অরণ্য-পর্বত-সমুদ্রের বাধা অতিক্রম করে 'দেখব এবার জগৎটাকে' ধরনের কৌতূহল ও সাহস নিয়ে পনেরো শতকের আগে কৃচিৎ কোথাও কেউ অজানার পথে মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে অভিযাত্রী বা পর্যটক হয়েছেন।

সুপ্রাচীনকালে যে-সব গোত্রের মধ্যে জিজ্ঞাসু, জিগীষু বুদ্ধিমান, শক্তিমান ও সাহসী লোকের আবির্ভাব ঘটেছে, যাদের মধ্যে আবিষ্কারে উদ্ভাবনে সৃজনে জীবন-জীবিকা ক্ষেত্রে স্বাচ্ছন্দ্য, সাচ্ছল্য ও উৎকর্ষসাধনবাঞ্ছা জেগেছিল, তারা মনের-মগজের ও মননের অনুশীলন করেছিল, তারা মানসিক জীবনের চেতনার, অনুভবের ও উপলব্ধির প্রসার ঘটিয়েছিল, তেমনি ব্যবহারিক জীবনেও নানা যন্ত্রের, হাতিরয়ারে বিচিত্র ব্যবহার্য সামগ্রীর ও খাদ্যবস্তুর আবিষ্কার-উদ্ভাবন-নির্মাণ সম্ভব করেছিল। এভাবেই প্রাচীন ও মধ্যযুগে এবং আধুনিককালেও দৈশিক, ভাষিক কিংবা রাষ্ট্রিকভাবে নতুন নতুন সংস্কৃতি-সভ্যতার উন্মেষ ও বিকাশ-বিস্তার ঘটেছে, ঘটছে। এ-ও সত্য যে সব নতুন চেতনার, নতুন চিন্তার, নতুন আবিষ্কারের, নতুন উদ্ভাবনের, নতুন নির্মাণের ও নতুন সৃষ্টির উৎস ব্যক্তির মনীষা, গৌত্রিক, গৌষ্ঠীক বা সামষ্টিক নয়। যেমন রবীন্দ্রনাথের রচনা আমাদের অনুকৃত, অনুসৃত, আত্তীকৃত মানসসম্পদ। মিশর-ব্যবিলোন-গ্রীস-রোম-চীন-মাইসিরীয়-মহেনজোদাড়ো-হরপ্পা-ভারতীয় বা য়ুরোপীয় সংস্কৃতি-সভ্যতার যারা অনুকরণে অনুসরণে গ্রহণে বরণে আত্মোন্নয়ন করেছে, তারাও স্বকালে, স্বসমাজে ও স্বদেশে সংস্কৃতিমান ও সভ্যরূপে আত্মপরিচয়ে ধন্য হয়েছে। আর যারা অস্তিত্বের স্বাতন্ত্র্যে আত্মরক্ষণকেই গুরুত্ব দিয়েছে বা দেয়, তারা গ্রহণ-বরণ বিমুখ, তারা আদি ও আদিম স্তরেই রয়ে গেছে, এবং তারা ও সর্বপ্রকারে জীবনের সহজলভ্য প্রসাদ থেকে নিজেদের স্বেচ্ছায় বঞ্চিত রেখেই অস্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য গৌরবে গর্বিত। এ মুহূর্তেও তারা তাদের তথাকথিত সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় সতর্ক।

এদের আমরা আদিবাসী উপজাতি এবং বুনো বর্বর আরণ্য-পার্বত্য গোত্র নামে অভিহিত করে থাকি। এভাবেই পৃথিবীর সর্বত্র অসম বিকাশের ফলে তথাকথিত সাংস্কৃতিক, আচরিক পার্থক্য ও বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছে। এবং অস্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনস্তাত্ত্বিক আবেগচালিত মানুষ নিজেদের সাংস্কৃতিক দৈন্য জেনে-বুঝেও তা ছাড়তে নারাজ। তাই সভ্যজগতেও শাস্ত্রিক, দৈশিক, রাষ্ট্রিক, ভাষিক সংস্কৃতির গৌরবগর্বী ধারক, বাহক ও রক্ষক কোথাও দুর্লভ নয়। যারা যত বেশি পরানুকারী, অর্থাৎ যারা আবিষ্কারে উদ্ভাবনে নির্মাণে ও সৃষ্টিতে অসমর্থ ও উদ্যমহীন, বন্ধ্যাজীবনে অভ্যস্ত তাদের মধ্যেই স্বসংস্কৃতির অভিমান ও রক্ষণাকাঙ্ক্ষা তত বেশি। এটা স্বরূপে হীনম্মন্যতা মাত্র। অযোগ্য সন্তান যেমন পিতৃধনেই ধনী থাকতে চায়। আমাদের মধ্যে এ হীনম্মন্যতা অতীত ও ঐতিহ্যপ্রীতিরূপে অভিব্যক্তি পায়।

'ঐতিহ্য'-এর সংজ্ঞায় ও সংজ্ঞার্থে একটা ফাঁকির ফাঁক আছে। পরিবারের, বংশের, গোষ্ঠীর, গোত্রের, শাস্ত্রিক জাতির বা সম্প্রদায়ের দৈশিক বা ভাষিক সম্প্রদায়ের বা জাতির পূর্ব প্রজন্মের ব্যক্তিদের যা কিছু সুকৃতি ও কীর্তি, তা-ই ঐতিহ্য। অর্থাৎ গর্ব করার বিষয়ই ঐতিহ্য, লজ্জার, গ্লানির, পরাজয়ের, অপকর্ম-অপরাধের ঘটনাগুলো ঐতিহ্য নয়। পূর্বের কৃতি-কীর্তির চেয়ে বড়ো কৃতি-কীর্তি-সৃষ্টিতে অসমর্থ পরপ্রজন্মের উদ্যমহীন অলস অযোগ্য অবক্ষয়গ্রস্ত, আবিষ্কারে উদ্ভাবনে নির্মাণে সৃষ্টিতে উৎকর্ষ ও সৌকর্য আর স্বাচ্ছন্দ্য সাধনে অসমর্থরা স্ব স্ব নিঃস্বতার আর্তনাদ আস্ফালনে ঢাকার যে অপচেষ্টা করে, তারই নাম ঐতিহ্যপ্রীতি ও ঐতিহ্যগৌরব। কথায় বলে 'স্বনামা পুরুষ ধন্য। পিতৃনামাচ মধ্যম।' অযোগ্য সন্তানমাত্রই সুযোগ্য কৃতী পিতা-পিতামহের পরিচয়ে চলে। ঐতিহ্যপ্রীতির উৎস এ-ই। পিতৃপুরুষের চেয়ে বেশি কৃতী ও কীর্তিমান গুণে-মানে মাপে-মাত্রায়, সে সবসময়ে স্বনামেই সমাজে স্বপ্রতিষ্ঠ হয়। তার অন্য পরিচয়ের প্রয়োজন হয় না।

এ ভূমিকার প্রয়োজন হল আমাদের সাহিত্য সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলবার প্রয়োজনে। সুপ্রাচীনকাল থেকেই দেখা যাচ্ছে সব জাতি বা সম্প্রদায়ই স্ব স্ব শাস্ত্রিক, নৈতিক, সামাজিক, আচারিক ঐতিহ্য অবলম্বন করেই সাহিত্যসৃষ্টি করেছে। এ জন্যেই জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্যবাদীর সাহিত্য আলাদা। ব্রাহ্মণ্যবাদী বাল্মীকির ও জৈন রামায়ণের প্রতিপাদ্য বিষয় ভিন্ন। আবার কালিক ব্যবধানজাত রুচি-সংস্কৃতির পার্থক্যের দরুন কৃত্তিবাসী রামায়ণেরও বাল্মীকি রামায়ণের কাহিনী ভিন্নতা পেয়েছে কিংবা বিদ্যাসাগরের সীতার বনবাস কাহিনী গ্রহণে বর্জনে পরিমার্জিত।

এ কারণেই মধ্যযুগ থেকে হিন্দু ও মুসলিম রচিত সাহিত্যের বিষয় পৃথক। স্ব স্ব শাস্ত্রিক, নৈতিক, সামাজিক, আচারিক নীতি-নিয়মানুগ মানুষ এবং ইহলোকে পরলোকে প্রসৃত জীবনাদর্শ ভিত্তিক। ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ সচেতন নীতিনিষ্ঠ কাব্য-নাটক প্রণেতা লোকশিক্ষার দিকে লক্ষ্য রেখেছিলেন। পাঠক-শ্রোতা যেন সজ্জন হয়, শাস্ত্রনিষ্ঠ হয়—এ-ই ছিল লক্ষ।

সেকালে জীবন-চেতনা ছিল ভিন্নরূপ। ইহজাগতিকতা শাস্ত্রে ও সমাজে বাহ্যত গুরুত্ব পেত না। পারত্রিকজীবনই পেত অসামান্য গুরুত্ব। কেননা অমর আত্মার তা-ই ছিল চিরন্তন নিবাস। এ জন্যেই সেকালের সাহিত্য ছিল দেশনা-ধর্মী। এ কারণেই কাব্যস্বাদনকে বলা হয়েছে 'ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর।'

মুসলিম-রচিত ফারসী-হিন্দি-উর্দু প্রণয়োপাখ্যান ছিল আশেক বা প্রেমিক জীবাত্মার মাসুক বা প্রেমাস্পদ পরমাত্মার, দয়িতের দয়িতার জন্যে প্রেমাকৃতির মানব-মানবীর প্রণয়ের বয়ানমূলক রূপক-সংকেতিক উপাখ্যান। বাঙলা অনুবাদে অবশ্য সে অধ্যাত্মপ্রেম বলতে গেলে বর্জিতই হয়েছে। কেননা যাঁদের আদেশে, প্রতিপোষণে ও আগ্রহে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রণয়োপাখ্যানগুলো বাঙলায় তর্জমা করা হয়েছে, তাঁরা নর-নারীর মর্ত্যজীবনের রোমাঞ্চকর প্রেমের কাহিনীই পড়ে-শুনে উপভোগে আগ্রহী ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আরব উপদ্বীপে সূফীমতবাদ আজো প্রবেশ পথ পায়নি, সেজন্যে সেখানে সূফী মতবাদ অনুপস্থিত। তাই-পীর-খানকা-দরগাহ সেখানে নেই। সূফীমতবাদ কার্যত ইরাক থেকেই ইরানে, মধ্য এশিয়ায় এবং আমাদের উপমহাদেশে বিকাশ-বিস্তার লাভ করে। তাই সূফীবাদে বৌদ্ধগুরুবাদ, বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদ আর বৌদ্ধ নির্বাণবাদের সঙ্গে বৌদ্ধ-হিন্দু তান্ত্রিক দেহাত্মবাদ ও দেহতত্ত্ব বিশেষ গুরুত্ব পায়। কায়াসাধনায় ও অধ্যাত্মসাধনায় বৌদ্ধ চতুষ্কায় ও হিন্দু ষড়পদ্ম দুটোই সমগুরুত্ব পেয়েছে গুরুভেদে। এ হচ্ছে গুরুবাদী সাধনা, শরীয়ত-তরিকত-হকিকত-মারফত এ চার সাধনস্তরের সিদ্ধির প্রথম রূপ ফানাফিল্লাহ—আল্লাহতে অহং চেতনার সমর্পণ এবং শেষরূপ হচ্ছে বাকাবিল্লাহ—আল্লাহতে বিলীন হয়ে সমুদ্রে বারিবিন্দুর মতো অভিন্ন হওয়া, অস্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য বিলোপ করা, এ হচ্ছে বৌদ্ধ নির্বাণের ও হিন্দুর ব্রহ্মে লীন হওয়ার সদৃশ্য চেতনা-প্রসূন।

কাজেই আমাদের মধ্যযুগের সাহিত্যমাত্রই ছিল ইহ-পরলোকে প্রসৃতজীবনে ধর্মচিন্তারই ফুল, ফল ও ফসল।

এমনকি মধ্যযুগের গানের বা গীতিকবিতারও ভাবসম্পদে ছিল পার্থক্য। চৈতন্য পূর্বকালে লৌকিক প্রণয়গীতি রচনায় মুসলিমরা রাম-সীতা, হর-গৌরী, রাধা-কৃষ্ণ, রূপক গ্রহণ করেনি। চৈতন্যোত্তর কালে প্রচ্ছন্নতান্ত্রিক বাউলেরা, বৈষ্ণবসহজিয়ারা এবং মুসলিম কবিরা বৈষ্ণব প্রভাবে রাধা-কৃষ্ণ রূপকে গান বেঁধেছেন বটে, তবে তত্ত্বে, তথ্যে ও লক্ষ্যে ছিল পার্থক্য। চর্যাগীতিও তো বৌদ্ধসাহিত্য—হিন্দুরও নয়, মুসলিমেরও নয়।

কিন্তু এ সত্ত্বেও সাম্রাজ্যবাদী মুঘলের আমলে দেশের অর্থ যখন তেরো নদীর ওপারে দিল্লীতে ও মধ্য এশিয়ায় পাচার হচ্ছিল, তখন কিন্তু রাঢ়-সুহ্মের ও দক্ষিণবঙ্গের একাংশের দুস্থ দরিদ্র নিঃস্ব নিরন্ন অজ্ঞ অসহায় মানুষ স্ব স্ব শাস্ত্রের অনুরাগে অনুগামিতায় ও আনুগত্যে আশুফল লাভে আস্থাহীন হয়ে নিয়তিরূপ সত্যকে শরণ করে। এ সত্যের কাল্পনিক প্রমূর্তরূপকে হিন্দুরা নারায়ণাংশরূপে এবং মুসলমানেরা পীররূপে স্বীকার করে নেয়। এ পীর-নারায়ণ 'সত্য' সতেরো শতকে বাঙলার এক বিস্তৃত অঞ্চলে নির্জিত মানুষের জাগতিক জীবনে বল-ভরসার অবলম্বন হন।

'হিন্দুর দেবতা হৈল মুসলমানের পীর
দুই কুলে সেবা লয় হৈয়া জাহির।

পীর-নারায়ণ সত্যও আত্মপরিচয় দিয়েছে :

মক্কার রহিম আমি অযোধ্যার রাম
কলিতে সম্প্রতি আমি সত্যনারায়ণ।

আর কবি কৃষ্ণরাম দাস 'পীর-নারায়ণ' সত্যকে তাঁর রায়মঙ্গলে নবী-কৃষ্ণের যুগলমূর্তি রূপে প্রত্যক্ষ করেছেন :

অর্ধেক মাথায় কালা। এক ভাগে চূড়া টানা
বনমালী ছিলিমিলি তাতে
ধবল অর্ধেক কায় অর্ধনীল মেঘ প্রায়
কোরান পুরাণ দুই হাতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পীর-নারায়ণ সত্যের চেলা দেবতারাও রয়েছে। দেবতারা যথাক্রমে হিন্দু ও মুসলিমের মধ্যে কালুরায়/কালুগাজী [কুমীর দেবতা] দক্ষিণের রায়/ বড়খাঁগাজী [বাঘের দেবতা] এমনি বনদেবী-বনবিবি, ওলাদেবী-ওলাবিবি, শীতলাদেবী-শীতলাবিবি প্রভৃতি। সেকালের হাটকেন্দ্রী জনপদে পণ্যবিনিময় নির্ভর আর্থিক জীবন ছিল প্রায় গতিহীন গতানুগতিক ও স্থিতিশীল। সে-অবস্থা চলতে থাকলে রাঢ়-বঙ্গের একটা বিস্তৃত অঞ্চলে জাতিভেদ ও সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্য ক্রমে বিলুপ্ত হয়ে হিন্দু-মুসলিমের শাস্ত্রিক নৈতিক সামাজিক বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণার ও আচার-আচরণের ভিন্নতা ক্রমে ঘুচেই যেত। তৈরি হত এক মিলন-ময়দান। পীর-নারায়ণ সত্য যে দু'শ' আড়াইশ' বছর ধরে বিপন্ন জনজীবনে বল-ভরসার অবলম্বন হয়েছিলেন, তার প্রমাণ 'সত্যনারায়ণ' পুঁথি রচয়িতার সংখ্যা প্রায় আশিজনের মতো। একই বিষয়ের এতো কবি বৈষ্ণবপদাবলী ছাড়া আর কোন শাখায় মেলে না। মিলিত সাধনার আরো একটা সাক্ষ্য রয়েছে। ঐতিহ্যবিস্মৃত তান্ত্রিক বৌদ্ধ অজ্ঞ-অনক্ষর জনগোষ্ঠী হিন্দু কিংবা মুসলিম সমাজআশ্রিত হয়ে নিজেদের তান্ত্রিকসাধনা বজায় রেখেছে আজো। তাই এদের মধ্যে আজো জাতিভেদ নেই, হিন্দু বাউলের মুসলিমশিষ্য, মুসলিম বাউলের হিন্দুশিষ্য এখনো মেলে। বস্তুত এ বাউল-দরবেশও সহজিয়াবৈষ্ণব একই পন্থার সাধক। গুরুবাদী বলেই এদের মধ্যে কিছু কিছু বাহ্য আচারিক পার্থক্য দেখা যায়। আর একবার পদচ্যুত অবাঙালী সিপাহিরা নগ্ন ফকির-সন্ন্যাসীরূপে ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য ভুলে সম্মিলিতভাবে ব্রিটিশ বাঙলায় জমিদার-মহাজন-বেণেদের ও ইংরেজদের লুট করার জন্যে দোহী ও ব্রতী হয়েছিল [১৭৬৩-৮৯]। পলাশীর যুদ্ধে সিরাজুদ্দৌলাহর পরাজয়ের ও দিল্লীর সম্রাটের কাছ থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানী প্রাপ্তির ফলে আমাদের দেশে যুগান্তর ঘটে। গ্রামীণ পণ্য বিনিময়ের আর্থিক জীবনে ঘটে বিপর্যয়। বর্ণে বিন্যস্ত সমাজে প্রাজন্মক্রমিক ঘরানা পেশাজীবিতায় নেমে আসে আকস্মিক বাধা ও আঘাত। পণ্য বাজার বাণিজ্য এল বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক লেন-দেনের আওতায়– অর্থগর্ব ব্রিটিশ বেণেদের দৌরাত্ম্যের ও নানা প্রত্যক্ষ পরোক্ষ ষড়যন্ত্রের ফলে ভেঙে গেল আমাদের নিস্তরঙ্গ গ্রামীণ জীবনের নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ ও প্রথা-পদ্ধতি। ঘরানা পেশা, কুটির শিল্প প্রতিযোগিতায়, প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ও সরকারী বিরূপতায় টিকতে পারল না। সর্বপ্রকার ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, বৃহৎ বৃত্তিজীবিতায় ক্রমে ঘটল বিপর্যয়।

শাহ-সামন্ত-সর্দার-মাতব্বর নিয়ন্ত্রিত সমাজ পালটে গেল। আগে যে-সব ধনী-মানী লোকের আশ্রয়ে প্রতিপোষণে আগ্রহে সাহিত্য-শিল্পাদিকলার চর্চা হত, এখন নতুন যুগে সে-সমাজ গেল ভেঙে। নগরে-বন্দরে যারা নতুন ধনী হল, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বদৌলত যারা নতুন যুগের হাওয়ায় ব্রিটিশ বেণেদের আদলে জীবনযাপনে উৎসুক, তারা নতুনের আদরে-কদরে অভ্যস্ত হচ্ছিল। এমনি বিপর্যয়ের ফলেই ঝড়ে নীড়ভাঙা নিরাশ্রয় পাখির মতো পুরোনো কলাকারেরা ভাত-কাপড় যোগাড়ের জন্যে এল বন্দর ও রাজধানী শহর কোলকাতায়। হিন্দু কবি উন্নাসিক ধনী সমাজের তাচ্ছিল্যে হল কবিতাওয়ালা নয়— কবিওয়ালা, আর শহুরে মুসলিম কবিরা হল হিন্দুস্তানী ও বাঙলার মিশ্রণে তৈরি নতুন ভাষা-শৈলীর দোভাষী শায়ের। ১৮৬০ সনের পর থেকে পুরোনো কালের বিদায় এবং নতুন যুগের প্রারম্ভকালের আলো-আঁধারির সাক্ষ্য হয়ে রইল খেউর চাপান-উতোর আর দোভাষী রীতিতে লেখা নিম্নমানের রচনাবলী। তবু এগুলোই প্রতীচ্যশিক্ষাপ্রাপ্তদের শিল্প-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহিত্য সৃষ্টির পূর্বাবধি রস-রুচির স্থূলতা সত্ত্বেও আমাদের অনক্ষর সাক্ষর সাধারণ মানুষের আমজনতার মানসচাহিদা ও রসপিপাসা মিটিয়েছে।

ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এদেশে কোলকাতা-মাদ্রাজ-বোম্বাই কেন্দ্রী শাসন-শোষণ শুরু করার দশবিশ বছরের মধ্যেই আজকের যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটিশ হস্তচ্যুত হল এবং ফরাসীবিপ্লব ঘটল। এবং গির্জার, রাজার, সামন্তের অসংযত, অসহিষ্ণু রক্তাক্ত বর্বরতাও আঠারো শতকেই কমতে থাকে। ব্যক্তিক মুক্তবুদ্ধির মননশীলতার ও মনীষার ফল হলেও রেনেসাঁসের প্রভাব ও শিক্ষিত শ্রেণীকে সংযত, সহিষ্ণু, বিবেকবান সজ্জন ও সুজন করে তুলছিল।

আমাদের দেশেও জন্মভূমি চেতনা যা জন্মভূমির প্রতি গাঢ়-গভীর হার্দিক আকর্ষণ ছিল। কিন্তু তার পরিসর ও পরিধি সম্ভবত গ্রামের সীমায় ছিল সীমিত। এবং পিতৃভূমি কিংবা মাতৃভূমি চেতনা ছিলই না। ভাষাকেও মাতৃভাষা বলা হত না, প্রাকৃতভাষা, লোকভাষা, লৌকিকভাষা, দেশীভাষা, গৌড়ীয়ভাষা নামে অভিহিত করা হত। প্রতীচ্য শিক্ষাগ্রহণের পূর্বে আমাদের মধ্যে স্বদেশ ও স্বজাতি চেতনাও ছিল না প্রতীচ্য তাৎপর্যে। আমাদের দেশে রামমোহন রায়ই বৈশ্বিক চেতনাঋদ্ধ, জিজ্ঞাসু, যুক্তিবাদী ও আন্তর্জাতিক সমাজ-সংস্কৃতি ও রাজনীতিসচেতন প্রথম ব্যক্তি। উনিশ শতকের উষাকাল থেকে ইংরেজী শিক্ষা দান ও গ্রহণ শুরু হয় কোলকাতায়। এর ফলেই শিক্ষিত বাঙালীর মনে স্বদেশপ্রীতির স্বজাতিবোধের উন্মেষ ঘটে। বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম মাতৃভূমি, মাতৃভাষা [এবং স্বাদেশিক চেতনায় মাতৃমূর্তিও কল্পনা করেন] তাঁর লেখার মাধ্যমে বাঙলায় দুটোই চালু করেন। স্বদেশ ও স্বজাতিচেতনাও তাঁর বন্দেমাতরম সঙ্গীতেই প্রথম সার্থক অভিব্যক্তি পায়। যেহেতু বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্য-কৈশোরে গোটা ভারত ব্রিটিশ কবলিত ছিল না, সেহেতু তাঁর স্বদেশ ও স্বজাতিচেতনা সীমিত ছিল প্রাক্তন মুঘল সুবাহ-ই-বাঙলায় তথা কোম্পানীর বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীতে অর্থাৎ বাঙলা-বিহার-উড়িশার বর্ণ-ধর্ম-ভাষা নির্বিশেষে সাতকোটি মানুষের মধ্যেই। বন্দেমাতরম সঙ্গীতে হিন্দুজাতীয়তাবোধ নেই। অবশ্য উনিশ শতকে প্রতীচ্যশিক্ষা প্রাপ্তরা একটা মানসিক দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগছিলেন। তার কারণও ছিল। য়ুরোপের অধিবাসীরা সবাই ছিলেন ধর্মে খ্রীস্টান, যদিও অন্যসব ধর্মাবলম্বীর মতো তাদের মধ্যেও ছিল ভিন্ন ভিন্ন মতবাদী সম্প্রদায় তথা Sect। এবং তাদের মধ্যেও ছিল টিউটনিক, স্লাব, গল প্রভৃতি গৌষ্ঠীক গৌত্রিক চেতনাও। কিন্তু সবকিছুকে উপেক্ষা করে দৈশিক ভাষিক জাতিচেতনা বশে য়ুরোপে 'একজাতি একরাষ্ট্র' নীতি অনুগ Mono-national রাষ্ট্র গড়ে উঠতে থাকে।

এখানে ভারতে জাত-ধর্ম-বর্ণ-ভাষা-নিবাসে কোন অভিন্নতা ছিল না। কাজেই ভারতে উনিশ শতকে হিন্দুজাতি, মুসলিমজাতি, জৈনজাতি, খ্রীস্টানজাতি প্রভৃতি ধর্মীয় জাতিচৈতন্য দ্রুত প্রসার লাভ করতে থাকে। ফলে বাঙলাদেশে হিন্দু শিক্ষিত হয়ে হিন্দু হল, মুসলিম শিক্ষিত হয়ে বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধে দেশকালহীন মুসলিম জাতি হয়ে উঠল।

ফলে হিন্দুর স্বদেশ ও স্বজাতিচেতনার অভিব্যক্তির বাহন হল বাঙলাভাষা। কিন্তু রচনার বিষয় হল তাঁদের শাস্ত্রিক, ঐতিহ্যিক, পৌরাণিক এবং প্রেরণার ও প্রবর্তনার উৎসও হল নতুন যুগের যোগ্য হিন্দুজাতি গড়ে তোলা। মুসলিমরাও মাটিলগ্ন জীবন বিস্মৃত হয়ে আওয়ারা হয়ে তাঁদের গৌরব-গর্বের ঐতিহ্য খুঁজে বেড়ালেন আরবে-ইরাকে-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইরানে ও মধ্য এশিয়ায়। এভাবে হিন্দুর ও মুসলিমের পৃথক পৃথক জাতীয় সাহিত্য গড়ে উঠল উনিশ শতকের শেষার্ধে ও বিশ শতকের প্রথমার্ধে। উনিশ-বিশ শতকে কংগ্রেসের দৈশিক তথা ব্রিটিশ ভারতীয় জাতীয়তা গড়ে তোলার প্রয়াস সত্ত্বেও প্রতীচ্যশিক্ষিতরা গোড়ার দিকে হিন্দু কিংবা মুসলিম হল। কেউ যেন বাঙালী রইল না চিন্তায় চেতনায়। কাজেই হিন্দু-মুসলিমে দ্বেষ-দ্বন্দ্বের বীজ উপ্ত হতে থাকে উনিশ শতকের তৃতীয়-চতুর্থপাদে। স্বাজাত্য-স্বাদেশিকতার সঙ্গে রাজনীতির সংযোগ ঘটার ফলে অর্থৎ ব্রিটিশ শাসকদের একান্ত প্রয়োজনে ভেদনীতির প্রয়োগ-সাফল্য লক্ষ্যে ব্রিটিশ ইতিহাস লেখকদের ইতিহাসে তুর্কী-মুঘল আমলে যে জোর করে হিন্দুদের মুসলিম করা হয়েছে, হিন্দুর মন্দির-মূর্তি ভাঙা হয়েছে, হিন্দু নারীকে হরণে-ধর্ষণে ও বিবাহে অপমানিত করা হয়েছে, হিন্দুর জান-মাল-গর্দান যে তুর্কী-মুঘল আমলে কখনো নিরুপদ্রব ও নিরাপদ ছিল না—এসব বিভীষিকাময় কল্পকাহিনীই ছিল বর্ণিত বিষয়। ফলে হিন্দুমনে তুর্কী-মুঘল শাসকের স্বধর্মী মুসলিমমাত্রেরই প্রতি ক্ষোভ-ক্রোধ-ঘৃণা-প্রতিহিংসাপরায়ণতা প্রজন্মক্রমে প্রবহমান রয়েছে।

অন্যদিকে বৌদ্ধ-হিন্দু নিম্নবর্ণের, নিম্নবর্গের ও নিম্নবিত্তের তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র পেশাজীবী অজ্ঞ অনক্ষর মুসলিম মনেও W.W.Hunter প্রমুখ ঐতিহাসিকরা জাগিয়ে দিলেন সুকৌশলে হিন্দুবিদ্বেষ! তুর্কী-মুঘল প্রশাসকদের ধনী-মানী শহুরে উর্দুভাষীরাই ছিল এদের রাজনীতিক নেতা। যদিও বৌদ্ধ-হিন্দুজ দেশী মুসলিমদের সঙ্গে এদের সম্পর্ক সম্বন্ধ ছিল না সামাজিক, ভাষিক, বৈবাহিক কোন ক্ষেত্রেই। ওদের ও ব্রিটিশের প্রচার-প্রচারণার ফলে দেশজ মুসলিমরাও জানল, বুঝল ও মানল যে তারা ছিল ছয়শ' বছর ধরে বাদশাহর জাত। কাজেই নিরক্ষরতা কিংবা দারিদ্র্য তাদের ছিলই না। কোম্পানী সরকারের কৃপা-করুণা-দয়া-দাক্ষিণ্যপ্রাপ্ত সরকারের সহযোগী হিন্দুরাই ডেপুটি মুন্সেফ উকিল ডাক্তার মোক্তার কেরানী হয়ে, ব্যবসায়ী ও মহাজন হয়ে মুসলিম সমাজকে প্রজন্মক্রমে করেছে নিঃস্ব নিরক্ষর নিরন্ন খাতক প্রজা, নিজেরা হয়েছে বিদ্যার বিত্তের শাসনের প্রশাসনের মালিক। এ মনোভাবের ফলেই বাঙালী নিরক্ষর মুসলিমরাও মুসলিম লীগের অনুরাগী, অনুগামী ও অনুগত হয়েছিল।

বাস্তবে দেশজ মুসলিমদের শিক্ষার ঐতিহ্য ছিল না নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মতোই। তাই লেখাপড়ায় তুচ্ছ পেশাজীবী সম্প্রদায়ের আগ্রহ ছিল না, ঘরানা পেশায় আবাল্য নিয়োজিত থাকত। আর প্রশাসক উর্দুভাষী মুসলিমদেরও যে ব্রিটিশ বিদ্বেষ ছিল না, তার প্রমাণ ১৭৮১ সনেই তারা কোলকাতায় মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার আবেদন জানায় সরকারকে। ১৮২৪ সনে মুর্শিদাবাদের নওয়াব নিজের ও দরবারের সদস্যদের সন্তানদের ইংরেজী শেখানোর জন্যে ইংরেজী শিক্ষার স্কুল স্থাপনের দাবি জানালেন এবং ওয়াহাবী নেতা সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী ছিলেন গোড়ার দিকে ব্রিটিশ মিত্র। তা ছাড়া ১৮৬০ সন থেকে অভিজাত উর্দুভাষী পরিবারের সন্তানেরা ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকেন, প্রমাণ মিলবে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডারে। নওয়াব আবদুল লতীফের জন্ম ১৮২৪ সনে। তিনি কোলকাতার উর্দুভাষী উকিলের সন্তান। কাজেই ব্রিটিশবিদ্বেষ বশে রাজ্যহারা মুসলিমরা ইংরেজী গ্রহণে অনীহ ছিল—এ চালু কথায় কোন সত্য নেই। পৃথক পৃথক জাতিচেতনা সাহিত্যক্ষেত্রে উনিশ ও বিশ শতকেও চালু ছিল, রয়েছে —এ-সত্য স্বীকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেই প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবন প্রয়াসই হবে যুগের দাবি মেটানোর আন্তরিক সদিচ্ছার পরিচায়ক।

উনিশ শতকের ও বিশ শতকের গীতিকবিতায় কোন কোন বিষয়ে ভাবগত অভিন্নতা লক্ষণীয় হলেও আখ্যান-উপাখ্যান বিষয়ক রচনায় ভিন্নতা আজ অবধি বিদ্যমান। গল্প উপন্যাস নাটকাদি তার প্রমাণ। এমনকি হিন্দু লেখকের হাতে সংস্কৃত শব্দগ্রহণ ও ফারসী শব্দ বর্জন যেমন লক্ষ করি, তেমনি মুসলিম লেখকের ফারসী-আরবী শব্দপ্রীতি এবং সংস্কৃত পরিহার প্রয়াসও দৃষ্টি এড়ায় না। ফলে সমস্ত বুর্জোয়া মনের লেখকদের ভাষা আপাতদৃষ্টিতে অভিন্ন হলেও তাঁদের রচিত গল্প-উপন্যাস-নাটক-কবিতায় শাস্ত্রিক, নৈতিক, আচারিক, আদর্শিক ও দার্শনিক চেতনার যে-পরিব্যক্তরূপ মেলে, তাতে তাঁদেরই আশৈশবলব্ধ ও লালিত বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণাই প্রকট হয়ে ওঠে।

শ্রেণীশোষণে ও শ্রেণীদ্বন্দ্বে বিশ্বাসী কম্যুনিস্টরা শ্রেণীসংগ্রামে ও সমাজপরিবর্তনে শোষণ-পীড়ন মুক্তিতে আস্থাবান। কম্যুনিস্টরা লেক্যুলার সাহিত্য রচনা করেছেন শোষিত বঞ্চিত প্রতারিত মানবমুক্তির লক্ষ্যে। কিন্তু আস্তিক হিন্দু-মুসলিম কেউ তা প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করেনি। তাছাড়া তাঁদের রচনাকে প্রচার-প্রচারণা সাহিত্য বলে নিন্দা রটিয়াছে অন্যরা। বরং রাজনীতিকদের মধ্যে মহাসভা কিংবা মুসলিম লীগ পন্থীদের কাছে জাতীয়সাহিত্য রূপে সাম্প্রদায়িকতা দুই সাহিত্যেই আদর কদর পেয়েছে বেশি। 'শিল্পের জন্যে শিল্প' নীতি একালে অস্বীকৃত। সৌন্দর্যসৃষ্টিই-আনন্দদানই এখন সাহিত্যের আদর্শ-উদ্দেশ্য বলে কেউ মেনে নেবে না। জনগণের মুক্তি-সংগ্রামের সহায়ক গণসাহিত্যও সবার পছন্দ নয়। রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদে আস্থাহীন ছিলেন, মানবতার আদর্শবিরুদ্ধ বলে। কিন্তু তাঁরও ছিল ঐতিহ্যে আস্থা ও প্রীতি। একালে বিজ্ঞানীর-আবিষ্কার-উদ্ভাবন-নির্মাণের এবং যন্ত্রের, প্রযুক্তির ও প্রকৌশলের দ্রুত উৎকর্ষের ফলে মানুষের প্রাত্যহিক জীবন যন্ত্রনির্ভর ও যান্ত্রিক হয়ে পড়েছে। তাই পুরোনো বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা বর্জন করতেই হচ্ছে, লঙ্ঘন করতে হচ্ছে শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ। শিক্ষার প্রসার না হওয়ায় কেবল নিতান্ত সাক্ষরতায় সমাজের মানুষের মন-বুদ্ধির মুক্তি ও যুক্তি-বিবেকের আনুগত্য সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে সংক্রমিত হতে পারছে না। তাই আমাদের সমস্যা রয়েই গেছে।

যদিও রামমোহন-বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্র-বিবেকানন্দের সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথের কালে উনিশ শতকেই বাঙলাভাষা-সাহিত্য উৎকর্ষ লাভ করেছিল। এ শতকে শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, অন্নদাশঙ্কর রায়, গোপাল হালদার, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেশ সেনগুপ্ত, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ থেকে একালের সমরেশ বসু-শীর্ষেন্দু-সুনীল-মুস্তফা সিরাজ প্রমুখ অসংখ্য নাম উচ্চারণ করতে হয় গল্প-উপন্যাস শাখায়। গিরিশঘোষ, অমৃতলাল, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদ প্রসাদ, সচীন সেনগুপ্ত, বিজন ভট্টাচার্য, বিধায়ক ভট্টাচার্য, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন, উৎপল দত্ত প্রমুখ অনেকের অবদান রয়েছে নাট্যসাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে। আর ত্রিশের কবিদের মধ্যে নজরুল, জসীমউদ্দিন, জীবনানন্দ, সুধীনদত্ত, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী, সে-সঙ্গে প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুকান্ত, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শঙ্খঘোষ, নীরেন্দ্র চক্রবর্তী প্রমুখ অনেক অনেক কবির অবদানে কাব্য সাহিত্য পেয়েছে বৈচিত্র্য ও ঔজ্জ্বল্য। আর সবার মাথার উপর মধ্যাহ্ন মার্তণ্ডের প্রভা ও প্রভাব নিয়ে রবীন্দ্রনাথ গীতিনাট্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নৃত্যনাট্য অবধি সাহিত্যের সর্বশাখায় অনন্য, অসামান্য, অসাধারণ ও অনতিক্রম্য রূপে বিরাজ করছেন।

আমাদের বাঙলাদেশেও একালে আহসান হাবীব, ফররুখ আহমদ, আল মাহমুদ, শামসুর রাহমান, শহীদ কাদরী, রফিক আজাদ, মহাদেব সাহা, নির্মলেন্দু গুণ, হেলাল হাফিজ প্রমুখ শতাধিক কবি নিয়মিত কবিতা লেখেন। উপন্যাস লেখেন, শওকত ওসমান, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ [মৃত], আবুরুশদ, রশীদ করিম, শওকত আলী, ইমদাদুল হক মিলন, মাহমুদুল হক, হুমায়ুন আহমেদ, হাসান আজিজুল হক, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, সেলিনা হোসেন, রিজিয়া রহমান প্রমুখ। এঁদের অনেকেই এদিকে খ্যাতিমান ও জনপ্রিয় গল্পলেখক ও ঔপন্যাসিক।

এঁদের মধ্যে রয়েছেন শোষিত বঞ্চিত প্রতারিত গণমানবকে শোষণমুক্ত করায় দায়বদ্ধতা স্বীকার করেন তেমন কবি, ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার। একালের গ্রুপ থিয়েটারের জন্যে যাঁরা মঞ্চনাটক ও মুক্তাঙ্গন নাটক লেখেন তাঁদের নামও এখানে অবশ্য উচ্চার্য। মমতাজউদ্দীন আহমদ, আবদুল্লাহ আল মামুন, সৈয়দ শামসুল হক, মামুনুর রশিদ, সেলিম আল দীন প্রমুখ প্রখ্যাত।

মননচর্চায় বদরউদ্দীন উমর, আবদুল হক, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আবুল কাসেম ফজলুল হক প্রমুখ। নির্বিশেষ বাঙালী গৌরব কেবল রবীন্দ্র নজরুল নন, অন্য ক্ষেত্রে আমাদের গৌরব-গর্বের ব্যক্তিত্ব রয়েছেন জগদীশ বসু, মেঘনাদ সাহা, প্রফুল্লরায়, উস্তাদ আলাউদ্দীন, উদয়শঙ্কর, রবিশঙ্কর, সত্যজিৎ রায় এবং দর্শন ইতিহাস-বিজ্ঞান ছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রে বাঙালীর কৃতি-কীর্তির গৌরব আমরা করতে পারি।

কিন্তু এই আউল-বাউল-চৈতন্যদেবের, রবীন্দ্রনাথের, রামকৃষ্ণের দেশে, মহাত্মা গান্ধীর, জওহরলাল নেহেরুর, খাঁজা মঈনউদ্দীন চিস্তির দেশে, মোজাফফর আহমদ, ডাঙ্গে, এম. এন. রায়ের ভারতোপমহাদেশে শেষাবধি সব তত্ত্বকে ছাপিয়ে, হার মানিয়ে সব মহৎ ও আপ্তবাণীকে ভুলিয়ে ষড়দর্শনের, উপনিষদের, মহাবীরের, গৌতমবুদ্ধের সর্বজীবে প্রেমের ও কৃপার, সহিষ্ণুতার ও সহাবস্থানের তত্ত্ব তুচ্ছ মেনে 'হিন্দ-হিন্দু-হিন্দি' তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে। মুসলিমদের মধ্যেও স্বদেশে স্বকালে প্রয়োজন ও উপযোগ নিরপেক্ষ উম্মাহ-চেতনাই প্রবল হয়ে উঠছে। এরই নাম মৌলবাদ। শুধু এ উপমহাদেশে নয়, আজ পৃথিবীর সভ্যতম য়ুরোপে, ধনীতম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, কালো বর্বর মানুষের আফ্রিকায়, নবী-অবতারের ও সর্বপ্রকার অধ্যাত্মতত্ত্বের ও আসমানীশিক্ষার এশিয়ার পশ্চিমে-পূর্বে-উত্তরে-দক্ষিণে সর্বত্র আজ Race-Religion, Region ও Language- এর পার্থক্য জাত গৌত্রিক, শাস্ত্রিক, আঞ্চলিক ও ভাষিক দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-সংঘাত রক্তক্ষরা প্রাণহরা রূপ নিয়ে গোটা পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে লঘু-গুরুভাবে মাটি রক্তভেজা করে রাখছে। অথচ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গৌত্রিক, শাস্ত্রিক, ভাষিক বা আঞ্চলিক দ্বেষ-দ্বন্দ্বের কথা উচ্চারণও করা যায় না বলে দাঙ্গা ছিল না। আজকের বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীর এবং প্রযুক্তিবিদের ও প্রযুক্তির প্রসাদে যন্ত্রের উৎকর্ষে তার-বেতারের বিচিত্র সৌকর্যে সমুদ্রের তলদেশ অরণ্য-পর্বত ও নভলোক আজ আর অনধিগম্য নেই।

তাই গোটা দুনিয়া আজ একটি জনপদতুল্য ক্ষুদ্র পরিসরের মতো সুগম ও সুপরিচিত। এর ফলে আমাদের বাঙালীরাও আজ পৃথিবীর সর্বত্র মুখ্যত জীবিকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রয়োজনে ছড়িয়ে স্থায়ী ও অস্থায়ীভাবে বাস করছে। তারা আজো মাতৃভাষার লেখ্যরূপের বন্ধন স্বীকার করে বলেই তারা আমাদের জ্ঞাতি, আত্মীয় ও স্বজন এবং সেভাবেই আমাদের সঙ্গে তাদের সংযোগ রক্ষিত রয়েছে বলেই তারা আমাদের পরিচিত। এ পরিচয় চাক্ষুষ নয়, হার্দিক।

অতএব, এ যন্ত্রযুগে ও যন্ত্রজগতে বিজ্ঞানে ও বাণিজ্যে পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলোকে টিকে থাকার গরজেই নিজেদের সম ও সহ স্বার্থেই সংযম, পরমত-পরকর্ম-পরআচরণ সহিষ্ণুতায় ও আন্তর্জাতিক সৌজন্যে সামবায়িক নীতি ভিত্তিক বনজ খনিজ কৃষি উৎপাদিত ও নির্মিত পণ্য বিনিময়ে বাণিজ্যে লগ্নিপুঁজি ও শিল্পপুঁজি বিনিয়োগে সহযোগিতায় সহাবস্থানে অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হচ্ছে। ইইসি; নাফতা, ন্যাটো, মাস্‌সখীট, আশিয়ান, সার্ক, গ্যাট প্রভৃতি সহযোগিতায় সহাবস্থানের আগ্রহ প্রসূন মাত্র।

এসব হচ্ছে যুগান্তলক্ষণ। নতুন যুগে আমাদের মন-মনন, নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ, প্রথা-পদ্ধতি বদলাতেই হবে। আমাদের হতে হবে আন্তর্জাতিক। আমাদের চিন্তা-চেতনাও হবে বৈশ্বিক, কারণ এ যুগ হবে সহযোগিতার, সহাবস্থানের। তাই জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-নিবাস নির্বিশেষে মানুষকে কেবল নিবর্ণ মানুষ হিসেবেই গ্রহণ-বরণ করতে হবে। আমাদের মধ্যে গৌত্রিক, ভাষিক, জাতিক, সাংস্কৃতিক, দৈশিক প্রভৃতি সংকীর্ণ চেতনার স্থলে Rationalism, Liberalism ও Secience and Technology প্রভৃতির উন্মেষ ঘটাতে হবে সচেতন সযত্ন প্রয়াসে। যাতে আমাদের সাহিত্য-শিল্প-দর্শন-বিজ্ঞান-সংস্কৃতি বিষয়ক চিন্তা-চেতনা-কর্ম যেন পৃথিবীব্যাপী মানুষের সর্বজনীন মানবসম্পদ হয়। উদারতা, যুক্তিবাদিতা, বিজ্ঞানের তত্ত্বে, তথ্যে ও সত্যে আস্থা আর বিবেকী বিবেচনাই হবে আমাদের মনোজীবনের আদর্শ-উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। কেননা আমাদের বাঙালীরা এখন বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের নাগরিকও। আর বিজ্ঞান ও বাণিজ্যই আমাদের স্বদেশবাসীদেরও করেছে বিশ্বলগ্ন ও আন্তর্জাতিকতাসম্পৃক্ত। কাজেই সাহিত্যের পাঠক এখন স্বধর্মের স্বসমাজের মধ্যে নিবদ্ধ নেই। অতএব, আগের মতো কেবল হিন্দুর জন্যে, কেবল মুসলিমের জন্যে, কেবল সমাজবাদীর কিংবা পুঁজিবাদীর জন্যে ও স্বার্থে কোন সাহিত্য রচিত হতে পারবে না। এখন সাহিত্য হবে একাধারে ও যুগপৎ মানুষের প্রয়োজনের, বিনোদনের, আনন্দের, বেদনার ও গাঢ়-গভীর অনুভবের ও উপলব্ধির অবলম্বন এবং ফুল, ফল ও ফসল। আর সাহিত্য হচ্ছে যা আছে, ঘটছে তার যেমন চিত্র, তেমনি তা চাওয়া-পাওয়ার আকাঙ্ক্ষারও অভিব্যক্তি এবং দৈশিক কালিক মানবিক সামাজিক রাষ্ট্রিক কল্যাণচেতনা জাগানোর প্রচার-প্রচারণাও। এক কথায় 'মানুষ' ও মানবতাই হবে সাহিত্য-শিল্প-দর্শনের বিষয়। আমরা ইহুদী, হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান, মুসলিম রূপে তথা শাস্ত্রবিশ্বাসী রূপেই জীবনের পূর্ণতা খুঁজব না, মনুষ্যত্বের বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনে নির্বিশেষ মানুষ হবার সাধনা করব। কোন 'ism'- এর অনুরাগী, অনুসারী ও অনুগত থাকা যদি নিতান্তই আবশ্যিক মনে হয়, তা হলে সে 'ism'- হিউম্যানিজম হওয়াই বাঞ্ছনীয়, কেননা শ্রেষ্ঠ 'ism'- হচ্ছে হিউম্যানিজম— যা মানুষকে ভালোবাসার অন্য নাম।

[রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৯৪ সনের মে মাসে বনফুল বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতার একটি অংশ।]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একজন অকংগ্রেসীর চোখে মহাত্মা গান্ধী

বিশ শতকের উপমহাদেশের দুইজন সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হচ্ছেন মহাত্মা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিচিত্র চেতনার ও মনীষার এমন অসামান্য ও অনন্য ব্যক্তিত্ব আর কারুর মধ্যে বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আর দেখা যায়নি। এতেই বোঝা যায় অসামান্য শক্তির ও গুণের মানুষ দেশে দেশে অঞ্চলে অঞ্চলে এমন কি প্রতি শতকেও আবির্ভূত হন না। কয়লার খনিতে যেমন ক্বচিৎ হীরক খণ্ড মেলে। রবীন্দ্রনাথ শিল্প-সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক কালের ভারতবর্ষের সাহিত্যাদি কলা-জগতে অনুপম ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব এবং এশিয়ায় আফ্রিকায় অস্ট্রেলিয়ায় নিউজিল্যান্ডে এতোবড় মনীষী শিল্পী আজ অবধি আবির্ভূত হননি।

মহাত্মা গান্ধীও রাজনীতিক হয়েও সন্ত এবং সন্ত হয়েও রাজনীতিক। তাঁর সূক্ষ্মবুদ্ধির, প্রজ্ঞার, ধৈর্য-অধ্যবসায়ের, সঙ্কল্পে অবিচলতার, সহিষ্ণুতার, সংযমের ও সৌজন্যের নিরুপমতা তাঁকে তাঁর সমকালের পৃথিবীর রাজনীতিকদের মধ্যে অনন্যতায় শুধু বিশিষ্ট নয়, একক করে রেখেছিল।

যেহেতু রবীন্দ্রনাথ বা গান্ধী রক্তমাংসের মানুষ ছিলেন, সেহেতু তাঁদের ভাব-চিন্তা কর্ম-আচরণেও নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি-ভুল অবশ্যই ছিল। কিন্তু তাঁদের কৃতির ও কীর্তির তুলনায় সেগুলো চাঁদ-সূর্যের দেহের দাগের মতোই নিতান্ত নগণ্য ও উপেক্ষণীয়। যেমন স্বাধীনতার জন্যে যখন গান্ধী ভারতীয় জাতীয়তাবাদে উৎসাহ যোগাচ্ছেন, তখন রবীন্দ্রনাথ চাইছিলেন সুশাসন, স্বশাসন নয় তথা স্বাধীনতা নয়। জাতীয়তাই যখন আমাদের প্রেরণার প্রণোদনার কর্মে প্রবর্তনার উৎস, তখন রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবিরোধী প্রচারক। গান্ধীও অতীতমুখী ও আবেগপ্রবণ অজ্ঞ ও স্বল্পশিক্ষিত মুসলিমদের দলে টানার জন্যে খিলাফত আন্দোলন সমর্থন করেছিলেন, তাতে অসহযোগ আন্দোলনে মুসলিম সহযোগিতা মিললেও ১৯২৬ সনের কোলকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা রোধ করা যায়নি। সম্প্রীতি শত্রুতায় পরিণতি পেল। গান্ধীর প্রথম জীবনেই মানবসত্তার মূল্য ও মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতনতা এবং শোষিত-বঞ্চিত-লাঞ্ছিত মানবতার মুক্তি লক্ষ্যে সংগ্রামের সঙ্কল্প জাগে। অভীক এ যুবক ব্যারিস্টার দক্ষিণ আফ্রিকার নোটালে প্রভুদের চোখে নিতান্ত প্রাণীমাত্র দাসাধম শ্রমিকদের হয়ে পীড়নের ও বঞ্চনার প্রতিকারে, প্রতিবাদে ও প্রতিরোধে প্রায় এককভাবে সাহস ও সঙ্কল্প সম্বল করে মুখর ও সক্রিয় হয়ে উঠেন। বিদেশে বিভূঁইয়ে পদে পদে অপমানিত, নির্যাতিত বৈষয়িক জীবনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েও সঙ্কল্পচ্যুত ও ব্রতভ্রষ্ট না হওয়ার দুর্লভ শক্তি ও সাহস তাঁকে সেদিন মনুষ্যত্বে ও নেতৃত্বে অতুল্য করে তুলেছিল।

১৯১৫ সনে কংগ্রেসের কাণ্ডারী হয়েই তিনি ব্রিটিশ বিরোধিতা বৃদ্ধির এবং স্বাধীনতার আন্দোলন জোরালো করার লক্ষ্যে দৈশিক তথা ভারতীয় জাতীয়তা প্রচারে নিষ্ঠ প্রয়াস চালাচ্ছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসীরা জাতীয় বীরপূজার ছলে জনতাকে স্বাধীনতা-সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে যখন মুঘলবিরোধী দ্রোহী স্বাধীনতা-সংগ্রামী হিসাবে সদুদ্দেশ্যেই রাণাপ্রতাপ, শিবাজী, গুরু গোবিন্দ, রনজিৎ সিংহ প্রমুখকে স্মরণ করছিলেন, তখন মুঘলের জ্ঞাতিত্বের ও স্বধর্মীর গৌরবগর্বী মুসলিমরা মনস্তাত্ত্বিক কারণেই কংগ্রেসের প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু স্বীকার করতেই হবে যে ভারতীয় মুসলিমদের বাদ দিয়ে, বিরূপ করে বা বঞ্চিত করে শুধু হিন্দুর স্বার্থেই গান্ধী ভারতের স্বাধীনতা কল্পনাও করেননি কখনো শেষদিনেও তিনি মুহম্মদ আলি জিন্নাহকে রাষ্ট্রক্ষমতা দিয়ে তুষ্ট রেখে অখণ্ড ভারত রক্ষায় প্রয়াসী হয়েছিলেন। আর একবার মহাত্মা গান্ধী অত্যন্ত সূক্ষ্মবুদ্ধির ও দূরদর্শিতার পরিচয় নয় শুধু, বর্ণ হিন্দুদের বিপন্ন রাজনীতিক অস্তিত্বকে চিরকালের জন্যে বিপন্মুক্ত করেছিলেন গোলটেবিল বৈঠকে রামজে ম্যাকডোনাল্ড যখন ডক্টর আম্বেদকরের দাবি অনুসারে মুসলিমদের মতো ছ্যুৎ-অচ্ছুৎ শূদ্রদের জন্যেও স্বতন্ত্র নির্বাচন ও চাকরির হার অনুমোদনের প্রস্তাব করেন, তখনই গান্ধীজী প্রতিবাদে ও প্রতিরোধে আমরণ অনশনের হুমকি দেন এবং পরের দিন স্বপ্নে অনশনে ঈশ্বর আদিষ্ট হয়েছেন বলে বৈঠকে ঘোষণা দেন। ফলে অচ্ছুতদেরও ব্রাহ্মণ্যবাদী বর্ণহিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত করে রেখে বর্ণহিন্দুরা আজো ক্ষমতার গদী দখলে রেখেছে। দুনিয়ার অন্যত্রও দাস, ক্রীতদাস ও ভূমিদাস প্রথা চালু ছিল, কিন্তু তা ছিল পার্থিব তথা মর্ত্য জীবন-জীবিকা শাসন-শোষণ-বঞ্চনা-প্রতারণা সম্পৃক্ত। বর্ণে বিন্যস্ত ব্রাহ্মণ্য সমাজ গড়ে উঠেছে ঐশ অপৌরুষেয় অভিপ্রায়ে ও নির্দেশে তথা ইহ-পরলোকে প্রসৃত জীবন নিয়ন্ত্রক শাস্ত্রানুসারে। এ জন্যেই আস্তিক শূদ্ররা মর্ত্যজীবনে পেশায় চাকরিতে স্বাধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠ হওয়ার দাবিতে মুখর হলেও শাস্ত্রানুগ বলেই ব্রাহ্মণের তথা সৎশূদ্র অবধি উচ্চবর্ণের হিন্দুর সামাজিক শ্রেষ্ঠত্ব ও শাস্ত্রিক আধিপত্য অস্বীকার করতে শক্তি ও সাহস পায় না, শৌত্রে অনাস্থাই কেবল সে-শক্তি, সে-সাহস যোগাতে পারে। বর্ণহিন্দুরা মহাত্মা গান্ধীকে এ দানে আজো ধন্য, কৃতার্থ ও রাষ্ট্রের কর্ণধার।

মহাত্মা অচ্ছুৎদের প্রতি আন্তরিকভাবেই ছিলেন সহনুভূতিশীল। কৃপা-করুণা-দয়া-দাক্ষিণ্যের অভাব ছিল না তাদের প্রতি; কিন্তু তাঁর মনের গভীরে স্থিত বুর্জোয়া আভিজাত্য-চেতনা বশে তিনি তাদের 'হরিজন' আখ্যা দিয়ে প্রকারান্তরে তারা যে পুরো মানুষ নয় বর্ণহিন্দুদের মতো, অর্ধমানুষ বা মনুষ্যপ্রায় এমন অবমাননাকর ব্যাখ্যার সুযোগ তাঁর অজান্তেই রেখে গেছেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবসুর লেখায় দেখেছি যে ডক্টর আম্বেদকরের স্ত্রীও 'হরিজন' পরিচিতি পছন্দ করেননি। এ পার্থক্য 'Folk' ও Gentleman-এর চেয়েও মাত্রায় বেশি ও অবজ্ঞায় গুরু।

অহিংসনীতি আমাদের মহাবীরের ও গৌতমবুদ্ধের কথা বাদ দিলে একালের য়ুরোপীয় দার্শনিকের মনন-মনীষা প্রসূন বলে স্বীকার করতেই হবে। যিশু, ড্যানিয়েল; সক্রেটিস, টলস্টয়, মার্কিন দার্শনিক হেনরি ডেভিড থোরো (১৮১৭-৬২) অরবিন্দ ঘোষের প্রবন্ধ [বন্দেমাতরমে প্রকাশিত] আইরিশ নেতা পার্নেল, হাঙ্গেরীর ফ্রিডরিশ লিস্ট ও ফ্রানসিস ডিক [১৮০৩-৭৬] প্রমুখ থেকেই বিশেষ করে আয়ারল্যান্ডের অত্যাচারী ব্রিটিশ প্রশাসক 'বয়কট' থেকেই গান্ধী নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের, অসহযোগের ও সত্যাগ্রহের প্রেরণা পেয়েছিলেন। কিন্তু বাস্তবে সার্থকভাবে রাজনীতিক লক্ষ্যে পৌঁছার উপায় ও মাধ্যম হিসেবে সার্বক্ষণিক প্রয়োগ গোটা পৃথিবীতে মহাত্মা গান্ধীর এক বিস্ময়কর ফলপ্রসূ অতুল্য অবদান। চৌরিচোরা হাঙ্গামার তথা সহিংস সংঘর্ষের পরিণাম তিনি সহজেই অনুভব-উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি জানতেন, বুঝতেন ও মানতেন যে মানুষ স্বাভাবিকভাবে ও সাধারণভাবে ভীরু এবং এ মানুষ নিজের জন্যে ও পরিবারের স্বার্থে বাঁচতে চায়। লাভে লোভে ও স্বার্থেই সে কৃচিৎ কখনো শক্তি ও সাহস সঞ্চয় ও প্রয়োগ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে। অতএব বিপদসঙ্কুল ও প্রাণের ঝুঁকিবহুল স্বাধীনতা সংগ্রামে সমর্থক, সহযোগী সক্রিয়কর্মী পাওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার। তিনি জ্ঞান অভিজ্ঞতা যোগে সন্ত্রাসী রাজনীতিক দলের সদস্য সংখ্যার স্বল্পতার কারণ বুঝতে পেরেছিলেন। কিশোর-তরুণ বয়স অতিক্রান্ত হলে রক্তক্ষরা প্রাণহরা বিপ্লবীদলে সক্রিয়কর্মী মেলে না তা-ও তাঁর জানা ছিল। স্বদেশের ও বিদেশের বিপ্লবীদলগুলোর সঙ্কট, সমস্যা ও ব্যর্থতা তাঁর অজ্ঞাত ছিল না। অহিংসনীতিতে প্রাণ হারানোর ভয় ছিল না। জেলেও তেমন সহ্যাতীত অবস্থা ও অবস্থান ঘটত না। কাজেই তিনি গোটা ভারতে সহজেই লক্ষ লক্ষ অহিংসনীতিতে আস্থাবান সদস্য ও সমর্থক পেয়েছিলেন শিক্ষিতদের মধ্যে। আমাদের বাল্যে-কৈশোরে আমরা তুলা-তকলি হাতে খাদি-খন্দর পরা, বিয়ে না-করা অসংখ্য কংগ্রেসকর্মী দেখেছি হাটে-ঘাটে-বাটে।

কাজেই 'অহিংসনীতি' পৃথিবীর রাজনীতিতে গান্ধীর অতি সূক্ষ্ম-তীক্ষ্নবুদ্ধির ও অনন্য দূরদর্শিতার সাক্ষ্য ও প্রমাণ। তবে ফ্যাসীবাদী শক্তির দানবিক সাফল্যের কালে তাঁর 'ভারতছাড়' দাবি ঘোষণার ও কংগ্রেসকর্মীদের ধ্বংসাত্মক সহিংস আন্দোলন [তাতে তাঁর সম্মতি-সমর্থন ছিল কিনা জানি না] আপাত দৃষ্টিতে স্ববিরোধিতার ও নীতি-বৈপরীত্যের নিদর্শনরূপে প্রতিভাত হয়।

রবীন্দ্রনাথের মতো গান্ধীজী গ্রামোন্নয়ন ভিত্তিক রাষ্ট্রনীতির প্রবক্তা ছিলেন। জওহরলাল নেহেরু ছিলেন বিজ্ঞান-প্রযুক্তি প্রয়োগে আধুনিক প্রতীচ্য আদলে আর্থ-বাণিজ্যিক উন্নয়ন পন্থী। খনিজ, কৃষিজ, উৎপাদিত ও নির্মিত পণ্যে দেশী-বিদেশী বাজার দখলই এ যুগের রাষ্ট্রিক অর্থনীতির মূল লক্ষ্য। তাই গান্ধী, রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পিত, প্রস্তাবিত ও প্রবর্তিত নীতি গ্রাহ্য হয়নি।

জিন্নাহও ক্রিপসমিশনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে এবং ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব [ত্রিবর্গে বিভক্ত কিন্তু অভিন্ন কেন্দ্রাভিগ] গ্রহণ করে উপমহাদেশকে অখণ্ড রাখতে চেয়েছিলেন, তাঁর দ্বিজাতিতত্ত্বও তিনি পরিহার করেছিলেন লর্ড মাউন্টব্যাটেনের চাপে এবং শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ও ফিরোজ খান নুনের অখণ্ড বাঙলা ও অখণ্ড পঞ্জাব রাখার প্রস্তাবেও সম্মতি দিয়েছিলেন। এ প্রস্তাবে নাকি বরং গান্ধীরই সম্মতি ছিল না। অবশ্য মানতেই ও বলতেই হবে যে গান্ধী-জিন্নাহ কেউই ভারত বিভাগে উৎসাহী ছিলেন না। গান্ধী তো বলেই ছিলেন Partition of India is a sin, it will burn pakistan, it will burn India. আজ পাকিস্তান দ্বিখণ্ডিত, এবং বাকি পাকিস্তানও দ্বেষ-দ্বন্দ্বের, সংঘর্ষ-সংঘাতের আগুনে পুড়ছে, বিখণ্ডিত হবার আশঙ্কাও দূর হয়নি। তেমনি কাশ্মীর, পূর্বপঞ্জাব, আসামের সাতরাজ্য, ঝাড়খণ্ড, দাক্ষিণাত্য, উত্তরখণ্ড, অচ্ছুৎ সমাজ প্রভৃতিও ভারতের সর্বত্র দ্বেষ-দ্বন্দ্বের-সংঘর্ষের-সংঘাতের, গেরিলাযুদ্ধের রক্তক্ষরা প্রাণহরা আর শাসনে-প্রশাসনে অর্থে বিত্তে বেসাতে দৃশ্য ও অদৃশ্য আগুন জ্বালিয়ে রেখেছে। ত্রিবর্গীয় ফেডারেশনে বা কনফেডারেশনে প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা, এমনকি বিরোধ-বিবাদও থাকত, কিন্তু রক্তঝরা প্রাণহরা লড়াই-দাঙ্গা-সংঘর্ষ-সংঘাত থাকত না গৌত্রিক, আঞ্চলিক, ভাষিক ও শাস্ত্রিক মতবাদী সম্প্রদায়ের মধ্যে, যেমন ছিল না সোভিয়েত রাশিয়ায়, যেমন নেই আজকের চীনেও।

ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে লাভ-লোভ-স্বার্থ প্রভাবে সততা ও ন্যায়নিষ্ঠা না থাকলেও আস্তিক মানুষ পরিবার ও সমাজ থেকে আশৈশব শ্রুত, লব্ধ ও প্রাপ্ত বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণার ও শাস্ত্রিক বিধি-নিষেধের আনুগত্য বশে ভয়-বল-ভরসা চালিত জীবনে কখনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঞ্ছিত মাত্রায় উদার, সংযত ও সহিষ্ণু হতে পারে না বরং শাস্ত্রনিষ্ঠ গোঁড়া রক্ষণশীলরা বা অর্থোডক্সরা স্বাতন্ত্র্যসচেতন ও অসহিষ্ণু হয়। ফলে রাজনীতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে সম্প্রীতি থাকে না বরং রাজনীতিক স্বার্থে বিচ্ছিন্নতার ব্যবধান সৃষ্টির প্রয়াসই বাড়ে। রেডিয়োর, টিভির, ক্যাসেটের ও সাক্ষরতার প্রসারে বরং গাঁয়ের সমাজেও সক্রিয় সাম্প্রদায়িক চেতনা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মহাত্মা গান্ধী কেবল জম্বুদ্বীপের নয়, ভারতবর্ষ নামের বর্তমান উপমহাদেশেরও নয়, গোটা পৃথিবীতেই বিশ শতকের একজন অনন্য মতের, পথের, বিচিত্র নীতি-নিয়ম-পদ্ধতিমানা শ্রেষ্ঠ মানুষ, অতি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। কংগ্রেস-প্রধান ভারতের মুকুটবিহীন সম্রাট। সমাজতন্ত্রী না হয়েও তিনি উপমহাদেশের সর্বজন শ্রদ্ধেয় স্বীকৃত একজন অসামান্য-অসাধারণ মানুষ মনুষ্যত্বে, সত্য সন্ধিৎসায়, বিচক্ষণতায়, চারিত্রিক দার্ঢ্যে ও মুক্তি-সংগ্রামের অবিচল সঙ্কল্পে। গান্ধী জেলে থাকলে ভারতে কোন রাজনীতিক কর্মতৎপরতা বা বিতর্ক থাকত না, আমরা কৈশোরে যৌবনে দেখেছি। এতেই এঁর ব্যক্তিত্বের, অসাধারণত্বের ও প্রভাবের প্রমাণ মেলে। এই 'Half Naked Faqir' কেবল ভারতের গৌরবগর্ব নন, মানবপ্রজাতির মধ্যেও কালগত ইতিহাসে একজন শ্রেষ্ঠপুরুষ। আর তাঁর উঁচুমানের নৈতিক চেতনা ছিল প্রাবাদিক এবং তিনি ছিলেন একজন নিখাদ নিখুঁত মানববাদী আবার বলি গীতাভক্ত গান্ধী ও ব্রহ্মবাদী রবীন্দ্রনাথ বিশ শতকের উপমহাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব। যদিও উভয়েই ছিলেন সামন্ত-বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতীক, প্রতিম, প্রতিভূ ও প্রতিনিধি।

AMARBOI.COM

মনুষ্যত্বের উন্মেষে–বিকাশে রবীন্দ্রসাহিত্যের বিকল্প নেই

[বাঙলাদেশের বিশিষ্ট চিন্তাবিদ পণ্ডিত-দ্রোহী ড. আহমদ শরীফের সঙ্গে বিদ্যাসাগর মহিলা কলেজের অধ্যাপিকা ড. প্রথমা রায়মণ্ডলের সম্পর্ক পিতা-পুত্রীর। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিতর্কিত বিষয় নিয়ে দু'জনের মধ্যে সম্প্রতি কোলকাতায় যে আলাপচারিতা হয়, তা থেকে নতুন দৃষ্টিকোণের নিরিখে রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে যেমন সুবিধে হবে তেমনি রবীন্দ্রচর্চা সংক্রান্ত নানা প্রশ্নেরও সমাধান ঘটবে বলে আশা করি। প্রথমা রায়মণ্ডলের গৃহীত এই নির্মোহ সাক্ষাৎকারটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় এ সংকলনে মুদ্রিত হলো।— সম্পাদক : 'বাতায়নিকের পত্র' কলিকাতা। মুখবন্ধ ও সাক্ষাৎকার ড. প্রথমা রায়মণ্ডল।]

বাঙলাদেশের সম্প্রতিকালের শ্রেষ্ঠ মনীষী, মুক্তবুদ্ধির ও নির্মোহ দৃষ্টির বিশিষ্ট চিন্তাবিদ প্রফেসর আহমদ শরীফ রবীন্দ্র মূল্যায়নের প্রশ্নে উভয়বঙ্গে এক বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। তাঁর কথাবার্তা, অকাট্য প্রমাণনির্ভর যুক্তিপ্রবণতা পাঠক-মনে আলোড়ন তোলে, ভাবতে শেখায় এবং প্রথাবদ্ধ বিশ্বাসে আঘাত হানে। 'রবীন্দ্রনাথ'[১], 'নজরুল', 'বঙ্কিমচন্দ্র', কিংবা 'বাঙলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামীকরণ', 'রাষ্ট্রধর্মে ইসলামের প্রবর্তন', 'মৌলবাদ' ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাঁর নিজস্ব মতামত বিগত তিনদশক ধরে উভয় বাঙলার বুদ্ধিজীবী মহলে বিতর্কের ঝড় তুলেছে। বিশেষত তাঁর রবীন্দ্র-মূল্যায়ন নিয়ে দুই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বঙ্গের অন্ধ-রবীন্দ্রভক্তরা বা স্তাবকেরা তাঁকে নাস্তানাবুদ করেছেন, যে-মানুষটি কিনা নিভৃত জীবনে এবং তাঁর সাহিত্যকর্মের উপমা-প্রয়োগে রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করেন সবচেয়ে বেশি। তাঁরা যুক্তি, তথ্য-প্রমাণের ধারে কাছে না গিয়ে ড. শরীফকে অকথ্য ভাষায় তিরস্কার করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে লেখা হয়েছে অজস্র আক্রমণাত্মক প্রবন্ধ[২], এমন কি দীর্ঘদেহী প্রবন্ধ[৩] পর্যন্ত কিন্তু এতসব সত্ত্বেও রবীন্দ্র-বিচারের প্রসঙ্গে তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত থেকে এতটুকু সরে আসেননি। তবে চাপান-উতোরের লড়াইয়ে না নেমে বরং পরম ধৈর্য ও সহনশীলতায় যথাসম্ভব নিস্পৃহ থাকতে চেষ্টা করেছেন। তবু পরিস্থিতির প্রবল চাপে কখনো কখনো দু'একটি প্রাতিষ্ঠানিকতা বিরোধী কাগজে[৪] তাঁকে প্রতিবাদী-জবাব দিতে হয়েছে; যদিও তাঁর সে জবাবী-ভাষণ সর্বত্রগামী হয়নি। ফলে মগজচর্চার বাজারে তাঁর সম্পর্কে একটি বিভ্রান্তিকর ধারণা রয়েই গেছে। এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়েই রবীন্দ্র-নজরুল ভক্তের দল রবীন্দ্রনাথ কিংবা নজরুল বিষয়ক কোন অনুষ্ঠানে বা সভা-সমিতিতে-সেমিনারে পারতপক্ষে তাঁকে আমন্ত্রণ জানান না। এমন কি ঢাকার বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত রবীন্দ্র-বিষয়ক কোনো সংকলন গ্রন্থে[৫] তাঁর লেখা চাওয়া হয় না এই ভয়ে যে, পাছে তিনি কোনো বেফাঁস কথা তাঁর প্রবন্ধে বলে ফেলেন। কিংবা তিনি আহূত হন না এই কারণে যে, তাঁর কথায় রবীন্দ্রভক্তদের এতদিনের সাজানো পূজোর আড়ালে রবীন্দ্র-বাণিজ্যের যদি ভরাডুবি হয়ে যায়!

রবীন্দ্র-মূল্যায়নের নিরিখে যাঁকে নিয়ে এত বিতর্ক, সেই আহমদ শরীফকেই প্রবন্ধ ও গবেষণাসাহিত্যে তাঁর পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি স্বরূপ কোলকাতারই রবীন্দ্র-নামাঙ্কিত রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় সাম্মানিক ডি. লিট ডিগ্রি দিয়ে সমাদৃত করেছেন। সেই পুরস্কার নিতেই তিনি সম্প্রতি এসেছিলেন কোলকাতায়; পক্ষাধিককাল অবস্থান করেছিলেন নারকেলডাঙ্গা আবাসনে সাংবাদিক চিত্ত মণ্ডলের বাসভবনে। বিগত তিন দশক ধরে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে তিনি যে-সব চিন্তা-ভাবনা করেছেন, সভা-সমিতিতে এ বিষয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কখনো নিন্দিত বা নন্দিত হয়েছেন, কিংবা ১৯৮৬ সালে রবীন্দ্রনাথকে 'মুক্ত ও নির্মোহ দৃষ্টিতে' বিচার করতে গিয়ে কি কারণে 'শতাব্দীর কলঙ্ক' অভিধায় বাঙলাদেশে চিহ্নিত হয়েছেন—কোলকাতায় তাঁর অবস্থানের সুবাদে এইসব বিষয় সম্বন্ধে তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য ও ধারণা জানার সুযোগ হয়েছিল আমাদের, যার মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও আনত শ্রদ্ধা, রক্তমাংসের মানুষ হিসেবে রবীন্দ্রনাথের দোষগুণ বিচার, রবীন্দ্র-আন্দোলনে তাঁর বিশিষ্ট ভূমিকা এবং রবীন্দ্র-বিতর্কে তাঁকে অকারণে জড়িয়ে ফেলার কারণ, ইত্যাদি বিষয়সমূহ পরিষ্কারভাবে প্রকাশ পায়। এক নিবিড় ঘরোয়া আলাপচারিতায় তিনি আমাদের মুখোমুখি হন; একে একে জবাব দেন তাঁর রবীন্দ্রভাবনা সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহলোদ্দীপক প্রশ্নসমূহের।

প্রথমা : রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তুমি কখনো কখনো কিছু বিতর্কিত এবং অপ্রচারিত কথা বলেছো। তাতে এখানকার কিছু বিদ্বান তোমার প্রতি ক্ষুব্ধ ও বিরূপ। আসলে কি ধরনের বিরূপ মন্তব্য তুমি করেছিলে? তোমার নিজের মুখ থেকেই আমরা তা শুনতে চাই।

আঃ শরীফ : আমার ধারণা, এই উপমহাদেশে একবার কালিদাস আর একালে রবীন্দ্রনাথ— এ দু'জনই যথার্থ চিরস্মরণীয় কবি। রবীন্দ্রনাথ আমাদের গৌরব-গর্বের অবলম্বন। পৃথিবীর নানাদেশে ও নানা ভাষার খুব বড় প্রতিভার সাহিত্যিক রয়েছেন কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্রনাথের মতো এমন বহুমাত্রিক শক্তিতে ঋদ্ধ লেখক পৃথিবীতে আর দেখা যায় না। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের সব শাখায়, এমন কি চিত্রশিল্পেও এবং বাণীঋদ্ধ সঙ্গীতে আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী, অনন্য-অসামান্য স্রষ্টা। আজ এ মুহূর্তেও গোটা দুনিয়ার বাঙলাভাষী মাত্রেই ঘরে-বাইরে, হাটে-বাজারে, বিদ্যালয়ে নানা প্রসঙ্গে নানা প্রয়োজনে বিশেষ করে গান ও কবিতা সম্পৃক্ত রবীন্দ্রনাথের নাম জাগ্রত মুহূর্তে যতবার উচ্চারণ করে বা শোনে ততবার কেউ তার উপাস্যের নামও প্রত্যাহিক জীবনে নেয় না বা শোনে না। রবীন্দ্রনাথ আমাদের চিন্তা-চেতনায়, আমাদের অস্তিত্বের অংশ হয়ে জড়িয়ে রয়েছেন। তাঁর কবিতা ও গান আমাদের আনন্দের দিনে আনন্দানুভূতি গভীর করে, বেদনার দিনে মানসিক যন্ত্রণা লাঘব করে, দুঃখে প্রবোধ দান করে সেই রবীন্দ্রনাথের নিন্দা কি আমি করতে পারি বাঙলাভাষার ও সাহিত্যের একজন শিক্ষক হয়ে?

প্রথমা : ১৯৮৬ সালে রবীন্দ্রনাথের ১২৫-তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে তুমি 'রবীন্দ্রোত্তর তৃতীয় প্রজন্মে রবীন্দ্র-মূল্যায়ন' শিরোনামে যে প্রবন্ধটি লিখেছিলে 'উত্তরাধিকার' [ঢাকার বাঙলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত] পত্রিকায়, তার প্রতিক্রিয়ায় ওখানকার এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় হৈ চৈ বাধিয়ে দিয়েছিলেন। এমনকি পশ্চিমবঙ্গের প্রবীণ খ্যাতনামা গবেষক-সমালোচক শ্রীগোপালচন্দ্র রায় তোমার ঐ প্রবন্ধে ব্যক্ত রবীন্দ্রবিরোধী মত-মন্তব্য, তত্ত্ব-তথ্য খণ্ডন করে একটি আস্ত গ্রন্থই[৬] লিখে ফেলেছিলেন। তুমি ঐ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে এমনসব অভিযোগ উত্থাপন করেছো, যা নাকি রবীন্দ্রপ্রেমীদের বিস্ময়ে বিমূঢ়, হতবাক, হতাশ ও ক্রুদ্ধ করেছিলো? ঐ প্রবন্ধে আসলে তুমি কি বলতে চেয়েছিলে?

আঃ শরীফ : হৈ চৈ কিছু হয়েছিল, এটা ঠিকই। তবে শোনো, রবীন্দ্রনাথকে (১) রক্তমাংসের বৈষয়িক মানুষ এবং (২) শিল্পী-মনীষী মানুষ—এই দুইভাবে বিভক্ত করে আমি দেশকালের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে এবং তাঁর সৃষ্টিকে দেখার ও বোঝার প্রয়োজন আছে বলে মনে করেছি। এবং রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর এতকাল পরেও তাঁকে দেবতার আসনে বসিয়ে অথবা কেবল 'গুরুদেব' কিংবা 'বিশ্বকবি' বলে শুধুই স্তব-স্তুতি করার তথা স্তাবকতা করার বিরোধী আমি। আমার সেদিন জিজ্ঞাসা ছিল—তিনি জমিদার হিসেবে কেমন ছিলেন? তাঁর সাহিত্যে পদ্মাপারের মানুষ যে বছর বছর পদ্মার ভাঙনে নিঃস্ব, নিরন্ন, বিপন্ন হয়েছিল তাদের কথা তেমনভাবে পাইনে কেন? তাঁর চোখে দেখা ঐ গণ-দুর্দশার চিত্র নেই কেন তাঁর সাহিত্যে? তিনি সত্তরোত্তর বয়সে কোলকাতায় কমিউনিস্টদের সংখ্যাবৃদ্ধিকালে আকস্মিকভাবে দশ/বারোটি কবিতায় খেটে-খাওয়া দুঃস্থ মানুষের, চাষী-মজুরদের কথা বলেছেন মাত্র। পরাধীন দেশের কবি হয়েও তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেরণা ও প্রণোদনাদানে ছিলেন বিরত। অবশ্য বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকালে উদ্দীপনা দানের জন্যে তিনি কিছু গান লিখেছিলেন আন্দোলনের শরিক হিসেবে ১৯০৫/৭ সালে।

রবীন্দ্রনাথ একজন অসামান্য সম্পদশালী, অসাধারণ কবি-মনীষী। বিস্মিত অভিভূত আবেগপ্রবণ ভক্ত বাঙালীর চোখে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তি-উত্তরকালে তিনি হয়ে উঠলেন মহাপুরুষ, দেবকল্প গুরু-গুরুদেব, কবিগুরু, ভক্তের চোখে দেবতা। রবীন্দ্রনাথের জন্মের একশ' পঁচিশ বছর এবং মৃত্যুর পঁয়তাল্লিশ বছর পরে আমাদের উদ্দেশ্য ছিল ভক্তির তুষারে আবৃত রক্তমাংসের মানুষ আবিষ্কার করা এবং ভক্তের বাষ্পাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে স্বচ্ছ করা, তাঁর অতুল্য কবিত্বের ও মনীষার উৎস সন্ধান করা, তাঁকে এবং তাঁর রচনাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিবিড়ভাবে জানবার-বুঝবার লক্ষ্যেই। কেননা তাঁকে নিন্দিত করে তাঁর মর্যাদা ও মহত্ত্ব নষ্ট করার মতো অসূয়া কিংবা স্পর্ধা আমাদের থাকতেই পারে না।

আমার ধারণা ছিল, এতকাল পরে রবীন্দ্রোত্তর তৃতীয় প্রজন্মে পাঠক-সমালোচক (১) ব্যক্তিমানুষ ও (২) শিল্পী-মনীষী মানুষ রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক মূল্যায়নের জন্যে এসব বিষয় আলোচ্য বলে বিবেচনা করবেন নির্মোহ দৃষ্টিতে। কিন্তু আমার সে ধারণা করুণভাবে ভুল প্রমাণিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এখনও ভক্তপাঠক ও তাঁর স্তাবকদের কাছে উপাস্য দেবতার মতোই স্তুতিযোগ্য এবং সর্বপ্রকার মানবিক ত্রুটিমুক্ত কেবল একজন শিল্পের ও মনীষার প্রতীক-প্রতিম ও প্রতিভূ হয়ে রয়েছেন। কাজেই আমি নিন্দার পাত্র হয়েছি। আমার কথাও হয়েছে তাঁদের ক্ষোভের কারণ।

প্রথমা : 'রবীন্দ্রোত্তর তৃতীয় প্রজন্মে রবীন্দ্র-মূল্যায়ন' প্রবন্ধটি ঢাকায় প্রকাশিত হওয়ার পর ড. হায়াত মামুদ-সহ বেশকিছু রবীন্দ্রপ্রেমী বুদ্ধিজীবী বিভিন্ন কাগজে তোমার প্রবন্ধের বিরোধিতা করে কলম ধরলে তখন তুমি নীরব ছিলে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের প্রবীণ গবেষক শ্রীগোপালচন্দ্র রায় যখন তোমার বক্তব্য খণ্ডন করে একটি আস্ত গ্রন্থ লিখে ফেলেন, তখন তুমি পশ্চিমবঙ্গেরই পাক্ষিক 'লেখক সমাবেশ'-এ জবাব দিতে তৎপর হয়েছিলে— কেন?

আঃ শরীফ : এ যুগে বিজ্ঞান ও যুক্তিমনস্ক মানুষ সচেষ্ট হলে কোন সত্যই আর অনাবিষ্কৃত থাকে না, কোন মিথ্যাই দীর্ঘস্থায়ী হয় না— 'মিছা কথা সিঁচাজল কতদিন রয়'! —এ বিশ্বাস বশে আমার লেখকজীবনে আমি কখনো আমার লেখার বিরুদ্ধে কোন বাদ-প্রতিবাদে যোগ দিইনি, লিখিতভাবে করিনি আত্মপক্ষ সমর্থন। একে আমি শ্রম ও সময় নষ্ট বলেই জানি। কিন্তু আজ জীবনের অস্তিমপর্বে কলম ধরেছি এ বিবেচনায় যে আমাদের দেশে লোকে অরি-মিত্র দেবতার, নবী-অবতারের, পীর-গুরুর ও মা-বাবার কোন দোষ-ত্রুটি উচ্চারণ পাপ বলেই মানে। হেন অপকর্ম কেউ করলে রুষ্ট-ক্ষুব্ধ সমাজের কিংবা ব্যক্তির হাতে পীড়ন-লাঞ্ছনা-পতিত-প্রায়শ্চিত্তরূপ শাস্তি তাঁকে পেতেই হয়। ভক্তের ধ্যানে ও ধারণায় রবীন্দ্রনাথও দেবকল্প গুরুদেব। আমি বাঙলাদেশে এ পাপে 'শতাব্দীর কলঙ্ক' অভিধায় নিন্দিত হয়েছি। রোষ-ক্ষোভ-নিন্দার তরঙ্গ পশ্চিমবঙ্গেও পৌঁছে গেছে। অন্যেরা কাগজে ক্ষোভ-নিন্দা-প্রতিবাদ প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হয়েছে। কিন্তু প্রখ্যাত প্রবীণ গবেষক-সমালোচক গোপালচন্দ্র রায় মহাশয় যখন রবীন্দ্রবিরোধী মত-মন্তব্য, তত্ত্ব-তথ্য খণ্ডনে এ বৃদ্ধ বয়সে অসামান্য উদ্যম ও অধ্যবসায় নিয়ে বহুশ্রমে নানা তথ্য সংগ্রহ করে একখানা আস্ত বই দ্রুত লিখে ও ছেপে বাজারে ছাড়েন, তখন এর গুরুত্ব আর অস্বীকার করতে পারিনে। কেননা এ বই প্রচার লাভ করলে তা আমার পক্ষে হবে মৌমাছির কিংবা ভীমরুলের চাকে ঢিল ছোঁড়ার মতো বিপজ্জনক কিছু। আজো ভক্তের চোখে রবীন্দ্র-নিন্দা আর 'দেব-নিন্দা' সমার্থক, তাই কিছু কথা লিখিতভাবে বলতেই হয়েছে। রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসায় সত্যসন্ধ গোপালচন্দ্র রায়ের প্রণোদনার উৎস ভক্তি ও বিশ্বাস, আর আমাদের সত্য সন্ধানের মূলে রয়েছে সন্দেহ ও জিজ্ঞাসা। কাজেই আমাদের মধ্যে রয়েছে প্রায় দুই মেরুর ব্যবধান। গোপাল রায় ভক্তদের ভক্তি-বিশ্বাসের দুর্গ অক্ষত রাখতে চেয়েছেন, আর আমরা দেখতে চেয়েছি দেবতাকে মানুষ-রূপে।

প্রথমা : কিন্তু আমি যদ্দুর জানি, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুব খানের সময়ে যখন রবীন্দ্র-বিরোধিতায় সক্রিয় ও সরব হয়ে উঠেছিল শাসকশ্রেণী ও তাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তল্পিবাহকেরা তখন তুমিই তো রবীন্দ্রনাথের পক্ষে দাঁড়িয়ে বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছো, কতগুলো প্রবন্ধও লিখেছিলে....। তাহলে বিরোধিতা কোন্ ক্ষেত্রে?

আঃ শরীফ : হ্যাঁ, তখন সদ্যপ্রতিষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দুরচিত সাহিত্যের ও সাহিত্যিকের প্রতি একটা বিরূপতা জাগে। এমনকি রবীন্দ্রনাথের প্রতিও ঐ বিরূপতা প্রচারে সেই সময়ে সরকার পর্যন্ত উদযোগী হয়। তখন লিখিতভাবে আমি সবচেয়ে বেশি রবীন্দ্র সমর্থনে প্রবন্ধ লিখে প্রতিবাদ করি। তখন পূর্ব বাঙলায় বঙ্কিমচন্দ্রের নাম উচ্চারণেও প্রায় সবাই অনীহ ছিলেন, সে-সময়ে আমিই এই মনীষীর সমর্থনে লেখনী ধারণ করি। এ সূত্রে এ-ও উল্লেখ করছি যে, কাজী নজরুল ইসলামের মন-মননের স্বরূপ এবং বিভিন্ন কবিতায় আদর্শগত অসঙ্গতির কথা আমিই পাকিস্তানে ও বাঙলাদেশে প্রথম লিখিতভাবে উল্লেখ করে নজরুলের যথার্থ মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তার দিকটি সবার নজরে আনার চেষ্টা করেছি; সে ক্ষেত্রেও আমি নিন্দিত হয়েছি ক্ষুব্ধজনের কাছে। এ মুহূর্তেও বাঙলাদেশে আমি রবীন্দ্রে-নজরুলে প্রত্যাশিত মাত্রায় শ্রদ্ধাভক্তিহীন বলে পরিচিত ও প্রচারিত। রবীন্দ্র-অনুষ্ঠানে আমি একজন ব্রাত্যজন। আমার আর ডাক পড়ে না। এইসব খবরই মুখে মুখে খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন মত-মন্তব্য ও সিদ্ধান্তরূপে স্বাভাবিক নিয়মেই তোমাদের কানে এসেছে।

প্রথমা : শুনেছি পাকিস্তান আমলে সৈয়দ আলী আহসান ও তাঁর অনুসারী ইসলামপন্থী তথা পাকিস্তানী তমদ্দুন ও সংস্কৃতিসেবীরা রবীন্দ্র-বিরোধিতায় ও রবীন্দ্র-বর্জনে ছিলেন সদা সচেষ্ট। পরবর্তীকালে স্বাধীন বাঙলাদেশে তাঁরা কি ভূমিকা নিয়েছিলেন?

আঃ শরীফ : সে এক মজার ব্যাপার। যুদ্ধে বিধ্বস্ত সবদেশে যেমনটি হয়, বাঙলাদেশেও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সেইসব রবীন্দ্রবিরোধী ও সরকার-ঘেঁষা সুবিধাবাদীরা তাঁদের মুখোশ রাতারাতি বদলে ফেলেছিলেন। পূর্ব পাকিস্তান আমলে রবীন্দ্রসাহিত্য বর্জনে অগ্রণী ও মুখর সৈয়দ আলী আহসন, আশরাফ সিদ্দিকী প্রভৃতি অনেকেই আবার স্বাধীন বাঙলাদেশে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রশস্তিমূলক 'কেতাব'ও রচনা করলেন। পাকিস্তান যুগে স্বতন্ত্রসংস্কৃতির ধারক-বাহক বলে আস্ফালন করতো যারা, স্বাতন্ত্র্যের ও সংস্কৃতির শত্রু রবীন্দ্রনাথের নাম শুনলেও যারা ক্ষেপে উঠতো, ১৯৭২ সনে তাদের মুখে শুনি 'রবীন্দ্রনাথ আমাদের স্বাধীনতা-স্পৃহায় ও স্বাধীনতা-সংগ্রামে প্রেরণার ও প্রণোদনার উৎস। বাঙলার হিন্দু-মুসলিমের অভিন্ন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি, দ্বিজাতিতত্ত্ব ভুল ও ভাঁওতামাত্র।' এমন কি 'দুর্গোৎসবও মুসলিম বাঙালীরও জাতীয় উৎসব', একথা টেলিভিশনেও একজন বুদ্ধিজীবী আবদুল গাফফার চৌধুরী জাতির উদ্দেশ্যে উচ্চারণও করলেন। ইতিহাসের কি মর্মান্তিক পরিহাস।

প্রথমা : ১৯৭১-এর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে বাঙলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর রবীন্দ্রনাথের নবমূল্যায়নের একটা জোয়ার সেখানে দেখা যায়। ঐ সময় রবীন্দ্রনাথের ইতিবাচক দিকটাই জনগণের কাছে তুলে ধরার প্রয়োজন ছিল না কি একজন দায়বদ্ধ বুদ্ধিজীবী হিসেবে?

আঃ শরীফ : ছিল। কিন্তু যখন রাষ্ট্রীয় মূল আদর্শ, ঘোষিত মতাদর্শ ও নীতিমালার [গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ] সঙ্গে সঙ্গতি না রেখে আবেগতাড়িত হয়ে বা অন্ধ ভক্তিবাদের নিরিখে রবীন্দ্র-মূল্যায়নের নামে রবীন্দ্রপূজার জোয়ার শুরু হয়, আমার আপত্তি ছিল তখন সেখানেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবে শোনো। সদ্য স্বাধীন বাঙলাদেশ রাষ্ট্র পরিচালনা করতে গিয়ে সরকার রাষ্ট্রীয় স্তম্ভরূপে সমাজতন্ত্রকে অঙ্গীকার করে নেয় এবং ঘোষণা করে। এবং সেই ঘোষিত স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাঙলাদেশে 'রবীন্দ্রনাথই আমাদের সংগ্রামের ও স্বাধীন রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার প্রেরণার উৎস'— বলে সর্বত্র প্রচারিত হতে থাকে। তখন, কেবল আমি প্রতিবাদে বলেছিলাম—আমাদের সমাজতান্ত্রিক প্রেরণার উৎস সুকান্ত, রবীন্দ্রনাথ নন। এজন্যে সুকান্ত আমাদের এখনকার পরিস্থিতিতে সম্পদ আর রবীন্দ্রনাথ আমাদের গৌরব-গর্বের ঐতিহ্য। কাজেই রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে আমাদের প্রেরণার উৎস হতে পারেন না, কারণ সমাজতন্ত্রে তাঁর আস্থা ছিল না এবং রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ভাববাদী সামন্ত-বেণে-বুর্জোয়া; ভূতে-ভগবানে ছিল তাঁর গভীর বিশ্বাস, প্রাচীন নিয়ম-নীতিতে ছিল তাঁর আস্থা ও আকর্ষণ। কাজেই রবীন্দ্রনাথ বিপ্লবী, সাম্যকামী বা সমাজবাদী হতেই পারেন না। রবীন্দ্রনাথ সুশাসন ও সুপোষণ চাইতেন, স্বশাসন ও স্বাধিকার তাঁর চেতনায় কখনো তেমন গুরুত্ব পায়নি। 'সুকান্ত আমাদের সম্পদ, রবীন্দ্রনাথ আমাদের ঐতিহ্য'—আমার এই উক্তি সেদিন সংবাদপত্রে তর্ক-বিতর্কের ঝড় তুলেছিল। সেদিনও আমি অধিকাংশের কাছে নিন্দিত হয়েছিলাম। কিন্তু আমি এখনও মনে করি রবীন্দ্রনাথ সমাজতন্ত্রী ছিলেন না, আর সুকান্ত ভট্টাচার্য সমাজ পরিবর্তনের জন্যেই লেখনী ধারণ করেছিলেন।

প্রথমা : তাহলেও রবীন্দ্র-প্রাসঙ্গিকতাকে তো আমরা গৌণ করে ভাবতে পারি না। আর একটি কথা, দেশের অধিকাংশ মানুষ যেখানে নিরক্ষর, কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ; কতটা ভালো, কতটা মন্দ তা বিচারের মতো চোখ তাঁদের এখনও তৈরি হয়নি। দেশের এই পরিস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথের নেতিবাচক দিকের চেয়ে তাঁর ইতিবাচক দিকগুলোই কি আমাদের বেশি করে জনগণের সামনে তুলে ধরা উচিত নয়?

আঃ শরীফ : অবশ্যই। তবু মাথায় রাখতে হবে—রবীন্দ্রনাথ একজন মানুষ, রক্তমাংসের দেহধারী দোষের-গুণের মানুষ। কাজেই তাঁকে মানুষ হিসেবেই বিচার করতে হবে। আমি এ মুহূর্তেও মনে করি, যাঁরা সমাজবাদী নন, সেইসব বাঙালীর মনে মনুষ্যত্বের উন্মেষ-বিকাশ ঘটানোর জন্যে রবীন্দ্র-সাহিত্যের চেয়ে বড় ও কেজো সম্পদ আজো বাঙালীর হাতে নেই। কাজেই রবীন্দ্র-সাহিত্য যে-কোন সাক্ষর-বাঙালীর অবশ্য পাঠ্য। তেমনি সমাজ পরিবর্তনে অনুপ্রাণিত হবার জন্যে, শোষিত-বঞ্চিত, নিঃস্ব-নিরন্ন গণমানবকে বঞ্চনা ও শোষণমুক্ত করার সংগ্রামে প্রণোদনা পাবার জন্যে নজরুল সাহিত্য আর বামপন্থী রচনা পাঠ আমি মানবতাবাদী বা সমাজবাদীদের জন্যে আবশ্যিক বলে মনে করি।

প্রথমা : তোমার বিরুদ্ধে আর একটা অভিযোগ। এরশাদের শাসনামলে বাঙলাদেশে সরকার যখন জাতীয় রবীন্দ্রোৎসবের আয়োজন করেন শিলাইদহে, তাতে তুমি নাকি ঐ স্থান নির্বাচনে বিরোধিতা করেছিলে?

আঃ শরীফ : আমি মনে করি রবীন্দ্রনাথ খাজনা আদায়ের জন্যেই শিলাইদহে, সাজাদপুরে ও পতিসরে বাস করতেন—কবিতা-গল্প-উপন্যাস ও গান লেখার জন্যে নয়। এই তিন স্থানকে 'রবিতীর্থ' করে তোলা, গভীর তাৎপর্যে পরোক্ষভাবে শোষিত প্রজার অবমাননা করা এবং শোষক জমিদারের পূজো করার নামান্তর হয়ে দাঁড়ায় বলে আমার মনে হয়েছিল। আমি তাই 'জাতীয় রবীন্দ্রোৎসব' অনুষ্ঠান ঢাকা শহরে করা বাঞ্ছনীয় বলে জানিয়েছিলাম। আমার এ উক্তিতেও আমাকে ভুল বুঝে অনেকে ক্ষুব্ধ হয়েছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার এসব ভাবনা বা মতামত তোমাদের গ্রাহ্য না-ও হতে পারে। তবু আমি যেভাবে ভেবেছি, ভেবে থাকি, সেভাবেই তোমাকে জানালাম। মানা না-মানা তোমাদের ব্যাপার।

প্রথমা : তোমার সঙ্গে এতক্ষণ কথা বলে বোঝা গেল তুমি মোটেই রবীন্দ্রবিরোধী নও। তুমি মূলত নির্মোহ ও মুক্তদৃষ্টির একজন রবীন্দ্রপ্রেমী। যাঁরা রবীন্দ্রনাথের অন্ধ স্তাবক এবং রবীন্দ্রপূজারী, তোমার ক্ষোভ দেখছি মূলত তাঁদেরই বিরুদ্ধে। তুমি বোধ হয়, রবীন্দ্রনাথকে দেখতে চাও দোষে-গুণে ভরা একজন রক্তমাংসের মানুষ হিসেবে। তোমার রবীন্দ্র-বিচারের লক্ষ্য এটাই তো?

আঃ শরীফ : ঠিকই ধরেছ। যে কোন ন্যায়নিষ্ঠ বিবেকবান সৎ মানুষের দীর্ঘ জীবনে অবস্থান ভেদে, অবস্থার চাপে জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে অনিচ্ছাতেও স্ববিরোধী হতেই হয় কখনো কখনো। কাজেই সৎ ও মহৎ মানুষের চিন্তায়-কর্মে-আচরণে কিছু স্ববিরোধিতা থাকেই। দীর্ঘজীবী রবীন্দ্রনাথের চিন্তায়-চেতনায়, কর্মে-আচরণে এমনি অসঙ্গতি ছিলই। সুদীর্ঘ জীবনের বাঁকে বাঁকে তাঁর অনুভব-উপলব্ধির, মন-মত-মননের বিকাশ-বিবর্তন, আবর্তন-পরিবর্তন, জ্ঞান-প্রজ্ঞা-যুক্তি-বুদ্ধির সঞ্চয় বৃদ্ধির ফলে—অবশ্যই তা ছিল স্বাভাবিক।

আমরা জানি, স্ববিরোধিতা, গণ-স্বার্থবিরোধিতা, ইংরেজপ্রীতি, স্বদেশের স্বাধীনতাভীতি প্রভৃতি নানা ত্রুটি তাঁর ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে প্রকট হলেও তিনি সুউচ্চ হিমালয়ের মহিমায় ও শারদ-পূর্ণিমার চাঁদের ঔজ্জ্বল্যে জনচিত্তে বিরাজ করবেন চিরকাল। ব্যক্তির নিঃসঙ্গ জীবনের আনন্দ-সহচর হয়ে থাকবে তাঁর রচিত সাহিত্যের অনেকখানি। আমাদের আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনে যা-ইবা রইল কোনো সম্পদ হয়ে। রবীন্দ্রনাথ আমাদের গৌরব, আমাদের অতুল ঐতিহ্য। অতএব জয়তু রবীন্দ্রনাথ।

AMARBOI.COM

টীকা-ভাষ্য :

১. **আহমদ শরীফের রবীন্দ্রনাথ সংক্রান্ত প্রবন্ধ সমূহ :**

(ক) অতীন্দ্রিয় লোকে রবীন্দ্রনাথ [সোনার বাংলা, ২০শে বৈশাখ ১৩৫৯। পরবর্তীকালে লেখকের 'বিচিত্র চিন্তা' শীর্ষক প্রবন্ধ সংকলন গ্রন্থে এটি সন্নিবেশিত হয়েছে]।

(খ) রবীন্দ্রনাথ [এটিও 'বিচিত্র চিন্তা' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে]।

(গ) রবীন্দ্র-মানসের স্বরূপ সন্ধানে [প্রাগুক্ত]।

(ঘ) সৌন্দর্যবুদ্ধি ও রবীন্দ্রমনীষা [প্রাগুক্ত]।

(ঙ) রবীন্দ্রসাহিত্য বিতর্ক [১০,৭.১৯৯২]।

(চ) ১৩৯০ সালে আমার চেতনায় রবীন্দ্রনাথ. (৮.৫.১৯৮৩) [এই প্রবন্ধটি লেখকের 'ইদানীং আমরা' (প্র. প্র. ৯ মে-১৯৮৬. মুক্তধারা. ঢাকা) গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে]।

(ছ) রবীন্দ্র-নজরুল উরস ও সরকার [৩.৫.১৯৯২]।

(জ) রবীন্দ্রোত্তর তৃতীয় প্রজন্মে রবীন্দ্র-মূল্যায়ন [উত্তরাধিকার, এপ্রিল-জুন সংখ্যা ১৯৮৩, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃঃ ১–১২। এই প্রবন্ধটিই বিতর্কের ঝড় তোলে। পরে এটি লেখকের 'ইদানীং আমরা' গ্রন্থে এবং আরো পরে মোস্তাফা মজিদ ও সমুদ্রগুপ্ত সম্পাদিত 'মুগ্ধ ও মুক্তদৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ' সংকলন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়]।

(ঝ) 'রবীন্দ্রনাথ' বিষয়ে একটি স্মৃতিচারণ [প্রাগুক্ত গ্রন্থে সংকলিত]।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২. আহমদ শরীফের '১৩৯০ সালে আমার চেতনায় রবীন্দ্রনাথ' এবং 'রবীন্দ্রোত্তর তৃতীয় প্রজন্মে রবীন্দ্র-মূল্যায়ন' শীর্ষক প্রবন্ধ দুটির বক্তব্য নিয়ে উভয় বাংলার পাঠকমহল বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠেন। তাঁকে 'শতাব্দীর কলঙ্ক' বলে চিহ্নিত করে ঢাকার 'উত্তরাধিকার' পত্রিকার জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৮৬, সংখ্যার 'ভিন্নমত' পর্যায়ে নিবন্ধ লেখেন ড হায়াৎ মামুদ।

৩. (ক) কোলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় শ্রীগোপালচন্দ্র রায়ের 'রবীন্দ্র বিতর্ক' শীর্ষক গ্রন্থ [পুস্তক বিপণি, প্র. প্র. সেপ্টেম্বর ১৯৮৭]। আহমদ শরীফের ২নং টীকায় উদ্ধৃত প্রবন্ধ দুটির বক্তব্য খণ্ডন করার জন্য গোপালচন্দ্র রায় তাঁর এই গ্রন্থের ১২০ পৃষ্ঠার মধ্যে ৯৪ পৃষ্ঠা ব্যয় করেছেন।

(খ) ঢাকা থেকে প্রকাশিত মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকায় (সপ্তম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ১৯৯২) আবদুল হালিম, আহমদ শরীফের প্রবন্ধের সমালোচনা করে ৫০ পৃষ্ঠার একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটির নাম : 'একটি রবীন্দ্র-মূল্যায়নের সমালোচনা প্রসঙ্গে।'।

৪. আহমদ শরীফ বাঙলাদেশের সমালোচকদের আক্রমণাত্মক বক্তব্যে নিস্পৃহ থেকেছেন। এমনকি কোলকাতার লেখক-সমালোচক প্রয়াত নারায়ণ চৌধুরী যখন আহমদ শরীফের 'রবীন্দ্রোত্তর তৃতীয় প্রজন্মে রবীন্দ্র-মূল্যায়ন', প্রবন্ধটির জের টেনে কোলকাতা কর্পোরেশন কর্তৃক প্রকাশিত 'পুরশ্রী' পত্রিকার এক সংখ্যায় কূটভাষিক মন্তব্য করেন, তখনো তিনি নীরব ছিলেন। কিন্তু গোপালচন্দ্র রায়ের 'রবীন্দ্র বিতর্ক' গ্রন্থটিই আহমদ শরীফের বক্তব্যের বিরোধিতা করে চটজলদি লিখিত ও প্রকাশিত হলো, কেবল তখনই তিনি কোলকাতার 'লেখক সমাবেশ' পত্রিকায় (বর্ষ ৮/সংখ্যা ৯, প্রথম পক্ষ, মার্চ ১৯৮৮) জবাবধর্মী একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন।

৫. বাঙলাদেশের বাংলা একাডেমী থেকে রবীন্দ্রনাথ সংক্রান্ত মোট ১৬টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো সাম্প্রতিক বাঙলাদেশের শ্রেষ্ঠ পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হওয়া সত্ত্বেও তাঁর কোন লেখা এঁরা ছাপেননি। উপরন্তু উত্তরাধিকার পত্রিকায় তাঁর ঐ বিতর্কিত প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার পর এঁরা আরো বেশি সচেতন হয়ে ওঠেন। এবং রবীন্দ্রনাথের ১২৫-তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আবুল হাসানাত কর্তৃক সম্পাদিত গ্রন্থে আহমদ শরীফের কোন প্রবন্ধ নেওয়া হয়নি। এমনকি ১৯৯২ সালে বাংলা একাডেমীতে যে রবীন্দ্র-বক্তৃতামালার আয়োজন করা হয়েছিল, তাতেও তিনি ছিলেন অপাংক্তেয়। 'রবীন্দ্রনাথ ১৯৯২' শীর্ষক ভাষণমালায় গ্রন্থিত অবয়বেও তিনি ছিলেন অনুপস্থিত। অথচ বাঙলাদেশের সংকটকালে রবীন্দ্র আন্দোলনে তিনি ছিলেন পুরোধা পুরুষ, নির্ভীক যোদ্ধা।

৬. রবীন্দ্রবিতর্ক [গোপলচন্দ্র রায়, পুস্তক বিপণি, কোলকাতা, প্র. প্র. ১৯৮৭]।

৭. মোট নয়টি। মৈত্রেয়ী দেবীর সংকলন গ্রন্থে কয়েকটি সংকলিত হয়েছে।

মানুষ বঙ্কিমচন্দ্র ও লেখক বঙ্কিমচন্দ্র

বঙ্কিমচন্দ্র উনিশ শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক রূপে আজো স্মরণীয় ও বিতর্কিত। তিনি হিন্দুত্বের সংস্করক কি সংস্কারক অর্থাৎ তিনি হিন্দুমানসের সংস্কার সাধন করেছিলেন কি হিন্দুত্বের নবসংস্করণ কর্তা ছিলেন, সাম্প্রদায়িক বা মুসলিমবিদ্বেষী ছিলেন, কি হিন্দুদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুনর্জাগরণ বা উজ্জীবনবাদী ছিলেন, ব্রিটিশ সরকারতোষক ছিলেন কি দেশজাতিপ্রেমী ছিলেন, এসব বিষয়ে এখনো তর্ক-বিতর্ক শেষ হয়নি। মতানৈক্য রয়েই গেছে। কাজেই বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্কিমসাহিত্য আজো অবশ্য আলোচ্য দেশের সাহিত্যিক, রাজনীতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আর্থিক, বাণিজ্যিক, রাষ্ট্রিক বিষয়ের সর্বপ্রকার ঐতিহাসিক আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর রচনাবলী অবশ্য স্মর্তব্য ও আলোচ্য।

গোটা উনিশ শতকে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন একজন অনন্য, অসামান্য, অসাধারণ ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব, রামমোহন রায়কে ও বিদ্যাসাগরকে স্মরণ রেখেও একথা বলা চলে। দেশ, জাতি, কাল ও মানুষ সম্বন্ধে নয় শুধু বইপত্র মাধ্যমে য়ুরোপীয় সাহিত্যিক, দার্শনিক, রাজনীতিক, আর্থ-বাণিজ্যিক, ঔপনিবেশিক ও বিজ্ঞান-প্রযুক্তি বিষয়ক চেতনা-চিন্তাও তার মনে-মর্মে ছিল। এক কথায় জগৎ ও জীবন, দেশ-কাল-জাতি-মানুষ সম্বন্ধে তার একটি সামগ্রিক, সামূহিক ও সামষ্টিক বোধ ছিল। তাতে অবশ্যই ব্যক্তিক সীমাবদ্ধতা ও চেতনার, চিন্তার ত্রুটি ও অপূর্ণতা ছিলই। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথা পাঠকের মনে পড়বে। কাজেই রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও আমাদের মত-মন্তব্য পরিব্যক্ত করা আবশ্যিক। রবীন্দ্রনাথের উনিশ শতকে উনচল্লিশ বছর সাত মাস বাইশ দিন ছিল যাপিত জীবন। বাল্যকাল থেকেই স্রষ্টা, কৈশোর থেকেই নিয়মিত লেখক। দেশে কালে অজ্ঞাত, অভাবিত ও অপরিচিত তাঁর ভাব-চিন্তা-অনুভব উপলব্ধি রচনশৈলী বুঝবার মতো লোক ছিল করগণ্য। ফলে তার গদ্য-পদ্য রচনায় পরিব্যক্ত। অনুভব-উপলব্ধির সূক্ষ্মতার, গাঢ়তার, উচ্চতার, গভীরতার ও ব্যাপকতার রূপ-স্বরূপ বোঝা ছিল পাঠকের পক্ষে অসাধ্য ও দুঃসাধ্য। ব্যতিক্রম ছিল সামান্যসংখ্যক পাঠক। এমনকি তাঁর গানের সমঝদারও ছিল দুর্লভ। এবং প্রবন্ধকার হিসেবে রবীন্দ্রনাথ উনিশ শতকে খ্যাত ছিলেন না। এ জন্যেই উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রই। আর বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর স্বল্পকাল আগে শিকাগো বক্তৃতাখ্যাত বিবেকানন্দ চমকপ্রদ ব্যক্তিত্ব রূপে প্রশংসিত হলেও জীবৎকালে একশ্রেণীর হিন্দুর চিন্তানিয়ন্ত্রক রূপে স্বপ্রতিষ্ঠিত হননি। এ কারণেই আমরা রবীন্দ্রনাথকে প্রবন্ধকার মনীষী হিসেবে এবং মৃত বিবেকানন্দকে বিশ শতকের বাঙালীর চিন্তানিয়ামক রূপে চিহ্নিত করতে চাই।

বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে আগেও সাত/আটটা প্রবন্ধ লিখেছি। আজো একটি সম্পূরক রূপে লিখছি। সেজন্যে এ আলোচনা অসংলগ্ন, বিচ্ছিন্ন এবং পরিপ্রেক্ষিতহীন বলে মনে হতে পারে। তবে আমার অন্য সব প্রবন্ধের আলোকে পাঠ করলে প্রাসঙ্গিকতা ও পারম্পর্য বোঝা কঠিন হবে না। এ লেখাটিও বিভিন্নজনের মতের, মন্তব্যের ও সিদ্ধান্তের বিরোধিতা বা প্রতিবাদমূলক। এ-ও জানি আমার সিদ্ধান্ত সবার গ্রাহ্য হবে না।

বঙ্কিমচন্দ্র বয়োবৃদ্ধির ও জ্ঞানে প্রজ্ঞায় ঋদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মত-মন-মননধারাও পরিবর্তন করেছিলেন। যৌবনের অনেক ধারণা ও সিদ্ধান্ত প্রৌঢ় বঙ্কিম বর্জন করেছিলেন, অর্জন করেছিলেন আস্তিক্য ও হিন্দুত্ব; অনুশীলন করেছিলেন হিন্দুর জাগরণ ও জাতীয়তাবোধের বিকাশ চিন্তার ও পন্থার। বঙ্কিমচন্দ্র স্বীকারও করেছিলেন যে তিনি জীবনে অনেক বিষয়েই মত-পথ-সিদ্ধান্ত বদলেছেন, 'আমার জীবনে আমি অনেক বিষয়ে মত পরিবর্তন করিয়াছি–কে না করে? এটি মানুষমাত্রেরই জীবনে প্রযোজ্য প্রযুক্ত খাঁটি কথাই।' ১৮৯২ সনে মৃত্যুর দু'বছর আগেও বলেছেন, 'মত পরিবর্তন বয়োবৃদ্ধি, অনুসন্ধানের বিস্তার ও ভাবনার ফল। যাঁহার কখনও মত পরিবর্তন হয় না, তিনি হয় অভ্রান্ত দৈবজ্ঞান বিশিষ্ট, নয় বুদ্ধিহীন ও জ্ঞানহীন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বঙ্কিমজীবনের ও সাহিত্যের ধারাবাহিক আলোচনায় ও বিশ্লেষণে তাঁর মত পথ আদর্শ লক্ষ্য বদলানোর তত্ত্ব, তথ্য ও সত্যই উদ্ঘাটিত হয় মাত্র। য়ূরোপীয় বিদ্যায় ও দর্শনে প্রভাবিত ও পুষ্ট মনের মগজের মননের নাস্তিক উদার মানবতাবাদী বঙ্কিমচন্দ্রের ক্রমে সংকীর্ণচিত্ত আস্তিক ও হিন্দুজাতীয়তাবাদী গোঁড়াহিন্দুরূপে জীবনাবসানের তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য প্রকটিত রয়েছে তাঁর প্রথম রচনা থেকে শেষ রচনা অবধি। উপন্যাসে, প্রবন্ধে কিংবা কমলাকান্তের বনামে রচিত আত্মগত চিন্তা-ভাবনায়। তা ছাড়া দীর্ঘজীবনে রচনায় ও উচ্চারিত ভাষণে নানা পারিবেশিক কারণে স্ববিরোধিতা ও বৈপরীত্য থাকেই। আমরা অন্য অনেক মহৎ লেখকের রচনায়ও তেমন ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণতা, অবৌদ্ধিক ও অযৌক্তিক ধারণা প্রত্যক্ষ করি। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য হচ্ছে নিরীশ্বর নাস্তিক, উদার মানববাদী বঙ্কিমচন্দ্রের ক্রমে ধর্মপ্রিয় স্বধর্মীপ্রিয় গেরুয়াপরা নিরামিষভোজী গোঁড়া ধার্মিক হিন্দু হওয়ার ইতিবৃত্তান্ত।

উনিশ শতকের প্রতিবেশে বঙ্কিমকে ও তাঁর সাহিত্যকে বিচার করতে হবে। জেমস মিলই প্রথম প্রাক তুর্কী-মুঘল যুগকে হিন্দুশাসনের স্বর্ণযুগ, তুর্কী-মুঘল আমলকে মুসলিম দুঃশাসনের, দুঃস্বপ্নের ও অত্যাচারের, হিন্দুর মন্দির ভাঙার ও ধর্মকাড়ার যুগ এবং খ্রীস্টান নয়, ব্রিটিশ শাসনকালকে সুশাসন ও নিরপেক্ষ সুবিচারের যুগ বলে প্রচার-প্রচারণা শুরু করেন। পরে এলিঅট-ডাওসন-স্মিৎ-এলপিনস্টোন প্রমুখ সবাই ভেদনীতির প্রয়োগে ব্রিটিশ শাসন-শোষণ দৃঢ়মূল ও দীর্ঘস্থায়ী করার লক্ষ্যে ইতিহাসকে বিকৃতির ও বানানো বৃত্তান্তের আধিক্যে ইতিকথায় পরিণতি দান করেন। ফলে হিন্দুমাত্রই দেশজ চাষী ও বৃত্তিজীবী মুসলিমদেরও তুর্কী-মুঘল শাসকের জ্ঞাতিরূপে গণ্য করে ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ, বিদ্বিষ্ট ও প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে ইংরেজ আমলে। আবার অন্যদিকে নিম্নবর্ণের, নিম্নবর্গের, নিম্নবিত্তের ও তুচ্ছ ক্ষুদ্র বৃত্তির হিন্দুবৌদ্ধজ মুসলিমরাও নিজেদের অজ্ঞান ও অনক্ষরতা-দুস্থতা-দরিদ্রতা-নিঃস্বতা-নিরন্নতার জন্যে ব্রিটিশ কৃপা-করুণা-দয়া-দাক্ষিণ্য-সাহায্য-সমর্থন প্রাপ্ত হিন্দুদেরই, জমিদার মহাজন চাকুরে বেণে প্রভৃতি শাসক ও শোষক ধনী-মানীদেরই দায়ী করে তাদের [ওই ভেদনীতিরূপ বিষবৃক্ষের ফল প্রভাবে] 'জানি দুশমন' রূপে ভাবতে থাকে ১৯৪৭ সনের সাড়ে সাত মাস অবধি। এ ভ্রান্তি কিংবা অভিভূতি আজো উপমহাদেশের হিন্দু-মুসলিম মনে সাধারণভাবে রয়েই গেছে। সে-কারণেই কোথাও সংখ্যালঘুর ও সংখ্যাগুরুর মধ্যে সহিষ্ণুতায়, আস্থায়, সম্প্রীতিতে, সৌজন্যে সহাবস্থান এ মুহূর্তেও সম্ভব হচ্ছে না। প্রতিহিংসার আগুন আগ্নেয়গিরির মতোই প্রায়ই ভারতের বিভিন্নস্থানে জিঘাংসার লাভা ছড়ায়।

অথচ ভূদেব মুখোপাধ্যায় [১৮২৭-৯৪] তখনই উপলব্ধি করেছিলেন যে 'অনেক ইংরেজ গ্রন্থকার, কখন স্পষ্টাক্ষরে, কখন ইঙ্গিতক্রমে, অনুক্ষণই বলিয়া থাকেন যে, মুসলমানেরা যখন দেশে রাজা ছিল, তখন হিন্দুদের প্রতি অকথ্য অত্যাচার করিয়া ছিল। ইংরাজ প্রবন্ধকারেরা এইরূপে হিন্দুদিগের মনোমধ্যে মুসলমানদিগের প্রতি একটি গূঢ় বিদ্বেষ বীজ বপন করিয়া দিতেছেন' [সামাজিক প্রবন্ধ]। বঙ্কিমচন্দ্রও অজ্ঞ অনক্ষর গ্রামীণ চাষী-মজুর মুসলিমদের মধ্যে বহরমপুরে [১৮৬৯ সনের ২১শে নভেম্বর থেকে ১৮৭৪ সনের ৩রা মে] ধর্মান্ধতা দেখেননি। অবশ্য উচ্চতর মুসলিম সমাজে ধর্মান্ধতা রয়েছে বলেই ছিল তাঁর ধারণা। এসময়ে গোটা বাঙলাদেশে হিন্দুরাই ছিল পাঁচ লক্ষে সংখ্যাগুরু [১৮৭১-এর আদমশুমারী]। এ জন্যে তখনকার নাস্তিক নিরীশ্বর উদার বঙ্কিমচন্দ্র বলতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেরেছিলেন এদেশ কেবল হিন্দুর নয়, মুসলমানেরও, তাঁর ভাষায় 'অতএব দেখা যাইতেছে যে, নিজ বাঙ্গালায় হিন্দু মুসলমান প্রায় সমান। মুসলমান অপেক্ষা পাঁচ লক্ষ মাত্র অধিক হিন্দু আছে। তবে হিন্দুদিগের প্রাধান্য এই যে মুসলমানেরা প্রায় কৃষক, এবং সামান্য শ্রেণীর লোক। ভদ্রলোক অধিকাংশই হিন্দু। কিন্তু তাই বলিয়া এই বঙ্গদেশকে কেবল হিন্দুর দেশ বলা যায় না। যেমন ইহা হিন্দুর দেশ, সেইরূপই ইহা মুসলমানের দেশ' [বঙ্গদেশের লোকসংখ্যা]। ব্রিটিশ লেখক রচিত বিকৃত ও বানানো তথ্যের ইতিহাসপাঠক সনাতন হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম যে বঙ্কিমচন্দ্রের তাঁর পক্ষে 'ভারত কলঙ্ক' লেখার সময়ে আবেগে উচ্ছ্বাসে অযৌক্তিক-অবৌদ্ধিক কিছু বলা স্বাভাবিক। তিনি যখন 'ভারত কলঙ্ক' প্রবন্ধে বলেন 'জাতির দুটো কর্তব্য—এক, ঐক্য [একপরামর্শী ও এক মতাবলম্বী হয়ে কর্তব্য করা]। দুই, অনেকস্থানে তাহাদের [ভিন্নজাতির বা সম্প্রদায়ের] মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল। যেখানে তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল, সেখানে তাহাদের মঙ্গল যাহাতে না হয় আমরা তাহাই করিব। ইহাতে পরজাতি-পীড়ন করিতে হয় করিব।' ..... পরজাতির অমঙ্গল সাধন করিয়া আত্মমঙ্গল সাধিতে হয় তাহাও করিব। জাতি প্রতিষ্ঠার এই দ্বিতীয় ভাগ তখন মনে হয় এটি বঙ্কিমচন্দ্রের বিবেকবিরোধী মন, মগজ ও মনন থেকে ফস্কে যাওয়া আবেগ চালিত উক্তিমাত্র। এছাড়া নানা প্রসঙ্গে ও বিভিন্ন সময়ে এরূপ অসঙ্গত মত-মন্তব্য-উক্তির টুকরো সবার রচনায় মেলে। এরূপ উক্তি বঙ্কিম চরিত্র বিরোধী। এ উক্তি যে তাঁর চিন্তা-ভাবনার প্রসূন নয়, তা আরো একবার বঙ্কিমচন্দ্র কেবল বাঙালী হিসেবেই ও অসাম্প্রদায়িক রূপেই মীর মশাররফ হোসেনের 'গোরাইব্রীজ বা গৌরী সেতু' পরিচিতি প্রসঙ্গে খোলাসা ভাষায় অন্তরের উপলব্ধির কথা মনের ও মর্মের কথা প্রকাশ করেছিলেন, 'বাঙ্গালা হিন্দু মুসলমানের দেশ, একা হিন্দুর দেশ নহে। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান [উর্দুভাষীও] এক্ষণে পৃথক পরস্পরের সহিত সহৃদয়তাশূন্য। বাঙ্গালার প্রকৃত উন্নতির জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় যে হিন্দু-মুসলমানে ঐক্য জন্মে। যতদিন উচ্চশ্রেণীর [বাস্তবে উর্দুভাষী] মুসলমানদিগের মধ্যে এমত গর্ব থাকিবে যে তাঁহারা ভিন্নদেশীয়, বাঙ্গালা তাঁহাদের ভাষা নহে। তাঁহারা বাঙ্গালা লিখিবেন না বা বাঙ্গালা শিখিবেন না, কেবল উর্দু-ফারসীর চালনা করিবেন, ততদিন সে ঐক্য জন্মিবে না। কেননা, জাতীয় ঐক্যের মূল ভাষার একতা।' [বঙ্গদর্শন, পৌষ ১২৮০ সাল]

২.

আমাদের তাই ধারণা বঙ্কিমচন্দ্র যখন 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধ লেখেন বহরমপুরে বসে, তখনো তিনি কেবলই নিরীশ্বর বাঙালী, তিনি কেবল 'মানুষ' বোঝেন, ধর্মীয় পরিচয়ে মানুষকে বিভক্ত করেন না। জনগণ কল্যাণ চেতনায় ও চিন্তায়। দুস্থ ভূমিহীন কৃষক সংখ্যা অধিক হওয়া সত্ত্বেও হাসিম শেখকে গুরুত্ব না দিয়ে পরাণমণ্ডলকে গুরুত্ব দেয়ার পেছনে বঙ্কিমচন্দ্রের একটা সদুদ্দেশ্য কাজ করেছে বলে আমাদের অনুমান। জমিদার, মহাজন বেণে ধনী চাকুরে মাত্রই যখন হিন্দু, সে-অবস্থায় হাসিম শেখের উপর জমিদারের শোষণ পীড়ন দরিদ্রচাষী মুসলিমের উপর হিন্দু জমিদারের পীড়ন বলে অপব্যাখ্যাত হওয়ার আশঙ্কা বঙ্কিমচন্দ্রের মনে জেগেছিল। বিশেষ করে তীতুমীরের সময়কার ও হাজী শরীয়তুল্লাহর ফরায়েজী আন্দোলন বঙ্কিমের যখন অজানা ছিল না। আর সরকারী চাকুরে বলেই নিঃস্ব নিরন্ন শোষিত-পীড়িত রায়তদের উপর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মতো ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা জগদ্দল পাথর চাপা দেয়া হয়েছে জেনে বুঝেই সব ত্রুটি ব্যাখ্যা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্লেষণ করেও চাকরি রক্ষার লক্ষ্যেই তিনি প্রজাদ্রোহিতারূপ সমাজবিপ্লব চাননি— একে তাঁর মনের কথা তথা বিবেকী সিদ্ধান্ত বলে আন্দাজ করা বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ প্রবন্ধের বর্ণিত ও প্রতিপাদ্য বিষয়ের সঙ্গে এর সঙ্গতি বা মিল নেই। একই কারণে ইনি জমিদার দর্পণেরও প্রচার চাননি তাঁর পত্রিকায় ও লেখায়। তাছাড়া ক্যাম্বেলের সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের সমর্থক ছিলেন। যাতে হিন্দু-মুসলিম কৃষক-মজুর ক্ষুদ্র ঘরানা পেশাজীবী ঘরে শিক্ষার ও সাক্ষরতার আলো প্রবেশ করে, সেই লক্ষ্যেই।

৩

বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন অতিমাত্রায় রোম্যান্টিক কল্পনাপ্রবণ এবং মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাবান। এজন্যে তাঁর সাহিত্যে ভিলেন নেই। ফলে যে উদ্দেশ্য লক্ষ্য বা সঙ্কল্প নিয়ে তিনি গ্রন্থরচনায় হাত দিতেন, মাঝপথে তা বিস্মৃত হয়ে যেতেন, ঘটনা ও চরিত্র তাঁকে দিশেহারা করে দিত, তার নিয়ন্ত্রণে থাকত না। ফলে লক্ষ্যে, গন্তব্যে বা পরিকল্পিত পরিণামে সুষ্ঠুভাবে পৌঁছানো যায়নি তাঁর কোন উপন্যাসেই। এ বিষয়ে আমরা অন্যত্র সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি [বঙ্কিম বীক্ষা : অন্য নিরিখে], যেমন হিন্দুজীবনের আদর্শানুসরণ মনুষ্যজীবনে অসম্ভবই প্রমাণিত হল মাত্র। সীমারাম কি হিন্দুগৌরব? তেমনি হিন্দুর বল-বীরত্বের চিত্রাঙ্গণের জন্যেই কেবল বাঙলার বাইরের থেকে রাজপুত রাজসিংহকে নায়ক করলেন, কিন্তু তিনবারে গ্রন্থের কলেবর যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি হিন্দুপৌরুষও লোপ পেয়ে প্রধান হয়ে উঠেছে— মবারক-দরিয়া-জেবুন্নিসা। আওরঙজেবের বাহিনীর পরাজয় হিন্দু দিয়ে সম্ভব হয়নি। হয়েছিল মবারকের শৌর্যে। এর চেয়েও বেশি লক্ষ্যভ্রষ্টতা দেখা যায় 'আনন্দমঠে'।

কোম্পানী নির্দেশে মুর্শিদাবাদের নওয়াবের, চৈৎসিংহের ও অযোধ্যার নওয়াবের বিলুপ্ত সেনাবাহিনীর লোকেরা আকস্মিকভাবে চাকরিচ্যুত হয়ে বেকার হয়ে পড়ে। সেকালেও ভেতো ও ভীত বাঙালীরা সৈন্য বাহিনীতে যোগ দিত না। তাই সিপাহিরা ছিল বিহারের ও উত্তর প্রদেশের। এ প্রাক্তন হিন্দু সিপাহিদের অনেকেই নাঙা (নগ্ন) সন্ন্যাসী রূপে এবং মুসলিম সিপাহিরা বুরহান ফকির [নগ্নফকির, নেংটিসার ফকির] নামে স্বভূম বিহারে উড়িশায় নয়, পরিবার পোষণের জন্যেই বাঙলাদেশের জমিদার, জায়গীরদার, আয়মাদার, মহাজন ও ব্যবসায়ীদের এবং ইংরেজ ব্যবসায়ীদেরও সম্পদ লুট করতে আসত, অন্তত বছরে লুটতরাজ চালাত [১৭৬৩-৮০ সন অবধি] সমকালীন ও পরবর্তীকালের বিভিন্নজনের ধারণায় এদের সংখ্যা ছিল পঞ্চাশ হাজার থেকে এক লক্ষ। নাটোরের রানী ভবানীর কাছে লিখিত মজনু শাহর চিঠিতে প্রকাশ এরা গণঅত্যাচারী ছিল না। গবর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস নাকি এদের বলতেন 'যাযাবর দস্যু'। এ প্রথমবার হিন্দু-মুসলিম সিপাহিরা ইংরেজদ্রোহী হয়। ভবানী পাঠক ও মজনু শাহ মিলিতভাবেই অভিযান চালাতেন।

বঙ্কিমচন্দ্র কি কারণে যে কেবল হিন্দু সন্ন্যাসীদেরই গ্রহণ করলেন আর ফকিরদের বাদ দিলেন তা অবশ্য প্রথমে বোঝার উপায় ছিল না। সম্ভবত মাতৃ ও বিষ্ণুমূর্তি পূজক সন্তানদের সঙ্গে অপৌত্তলিক ফকিরদের জড়ানো যেত না বলেই ফকিরেরা বাদ গেছে। কেননা, তিনি বঙ্গদর্শনের প্রথমদিকে প্রকাশিত কিস্তিতে 'ইংরেজ' বিরোধী ভূমিকায় নামিয়েছিলেন সন্ন্যাসীদের। সে অবস্থায় ফকিরই তো বেশি কেজো হত, কেননা রাজত্বটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল মুঘলের। অবশ্য পরে যখন ইংরেজদের স্থলে 'নেড়ে, যবন,' মারাই সন্ন্যাসীদের ব্রত হল এবং ইংরেজ মিত্র হল, তখন ফকিরদের বাদ দিতেই হত। কিন্তু প্রথমে বাদ দিলেন কেন? একি তাঁর নতুন হিন্দুয়ানীর বহিঃপ্রকাশ। আমাদের অনুমান মাতৃমূর্তি বন্দনা ও বিষ্ণুভক্তিই ছিল বাধা। তা ছাড়াও বঙ্কিমচন্দ্র এখানেও দিশেহারা, সন্তানেরা বলছে, যেমন শান্তি, ভবানন্দ প্রভৃতি ইংরেজ সেনানী টমাসকে বলছে ইংরেজ তাদের শত্রু নয়, তাদের শত্রু মুসলমান। কিন্তু কেন? বঙ্কিমচন্দ্র তা স্পষ্ট করতে পারেননি। একি মুসলিমরা শাসক হিসেবে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার যোগ্যতা হারিয়েছে বলে, নাকি নিতান্ত বিধর্মী অত্যাচারী শাসক বলে? তারপরে আবার এই সন্তানদেরও তিনি নিন্দিত আদর্শভ্রষ্ট, সঙ্কল্পচ্যুত করে ছেড়েছেন। তাছাড়া, অজ্ঞ জনগণকে মুসলিমদের অর্থ-সম্পদ লুণ্ঠনের লোভ দেখিয়ে বিষ্ণুভক্ত যোদ্ধা বানানোও তো অসততা, প্রতারণামাত্র। শুধু যে মুসলিম পাড়ায় হত্যা, লুণ্ঠন, গৃহদাহ করেছে, তা নয়, হিন্দুর অর্থ-সম্পদও লুণ্ঠন করেছে, বলেছে 'বল বন্দেমাতরম, নইলে মারিয়া ফেলিব। কেহ ময়দার দোকান লুটিয়া খায়, কেহ গোয়ালার বাড়ি গিয়া হাঁড়ি পাড়িয়া দধিতে চুমুক মারে, কেহ বলে, আমরা ব্রজগোপ আসিয়াছি, গোপিনী কই। সকলে বলিল, মুসলমান পরাভূত হইয়াছে, দেশ আবার হিন্দুর হইয়াছে' এসব কি বঙ্কিমচন্দ্রের মনের কথা হতে পারে? এসব গুণ্ডা হিন্দুর কথা ও কাজ। এসব অজ্ঞলোক দিয়ে মুসলিম হত্যা প্রভৃতি করানোর মধ্যে আদর্শের উদ্দেশ্যের আভাস মেলে না। যেমন যুদ্ধ জয়ের গর্বে বিজয় গৌরবে মত্ত 'গ্রামের লোকেরা মুসলমান দেখিলেই তাড়াইয়া মারিতে যায়। কেহ কেহ সেই রাত্রে দলবদ্ধ হইয়া মুসলমানদিগের পাড়ায় গিয়া তাহাদের ঘরে আগুন দিয়া সর্বস্ব লুটিয়া লইতে লাগিল, অনেক যবন 'নিহত' হইল।' একি হিন্দুর তারিফ না তাদের বর্বরতার নিন্দা? আবার 'অনেক মুসলমান দাড়ি ফেলিয়া গায়ে মৃত্তিকা মাখিয়া হরিনাম করিতে আরম্ভ করিল, জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে লাগিল মুই হেঁদু।' একি বিদ্রূপ না কি ইন্দিরা গান্ধী নিহত হওয়ার পরে দিল্লীতে শিখহত্যা শুরু হলে আত্মরক্ষার গরজে শিখের দাড়ি-চুল কামানোর মতো করুণ চিত্র। 'শূওরের খোঁয়ার, ঘাম বের হতেই পালায়, ইংরেজ দেখলেই ভয় পায়', প্রভৃতি কি ক্ষোভের প্রকাশ, না বিদ্রূপ, এ ঘৃণা কি স্বাধীনতা রক্ষায় অসামান্যের জন্যে, কিংবা সাম্প্রদায়িকতা? এ প্রশ্ন পাঠকের মনে বার বার জাগে। যদিও এ বঙ্কিমচন্দ্রই বলেছেন 'নিম্নবর্ণের লোকেরা ব্রাহ্মণ্য সমাজে অবজ্ঞেয় ছিল বলেই স্বেচ্ছায় ইসলাম বরণ করেছিল, ইংরেজরা দেশ দখল করল, রাজ্য বিস্তার করল, হিন্দুরা তাদের সাহায্য সহযোগিতা দিল, পাঠান আমলে বাঙালী স্বাধীন ছিল' এসব নানা উক্তি কি সাম্প্রদায়িকচেতনাদুষ্ট মানুষের পক্ষে সম্ভব?

আসলে বঙ্কিমচন্দ্র যে উদ্দেশ্যে, লক্ষ্যে ও অঙ্গীকারে 'আনন্দমঠ' লিখতে মনস্থ ও শুরু করেছিলেন, তাতে তিনি স্থির থাকতে পারেননি, মাঝ পথে দিশে হারিয়েছেন, নিজে ডুবেছেন, সন্তানদেরও ডুবিয়েছেন লক্ষ্যভ্রষ্ট ও চরিত্রভ্রষ্ট করে। শত্রু ইংরেজকে বানিয়েছেন মিত্র ও ত্রাণকর্তা। 'এখন হিন্দুরা অযোগ্য, প্রতীচ্যবিদ্যা, যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন করেই হিন্দুদের স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে, ইতোমধ্যে ইংরেজকে প্রভু, শিক্ষক ও আদর্শরূপে বরণ করে নেয়াই সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত হবে।' কাজেই 'বিসর্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়া গেল।' মুঘলকে বিতাড়িত করে ইংরেজকে রাজাসনে বসিয়ে তার দাসত্ব বরণকে যিনি হিন্দুর পক্ষে শ্রেয় বলে প্রচার করলেন, তিনিই হলেন বিপিনপাল, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ সব শিক্ষিত হিন্দুর স্বাধীনতার মন্ত্রের উদ্‌গাতারূপে মহান আধুনিক ঋষি। কিমাশ্চর্যম অতঃপরম। এ-ও বঙ্কিমচন্দ্রের চাকরি রাখার প্রয়াস প্রসূন কি-না জানি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪.

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধে রম্যরচনায় ধীরবুদ্ধির ও স্থিরবিশ্বাসের জ্ঞান-যুক্তি-বিবেকের পরিচয় দিয়েছেন প্রায় সর্বত্র। যদিও কোথাও কোথাও আবেগাক্রান্তও হয়েছেন। আমাদের মানতেই হবে যে বঙ্কিমচন্দ্র মানুষকে ভালোবাসতেন, রোহিনী, শৈবলিনী, কুন্দ, হীরা, ভবানন্দ, সীতারাম কেউ তাঁর অবজ্ঞার পাত্র-পাত্রী ছিল না। তিনি মৃণালিনী থেকে সীতারাম, আনন্দমঠ, বিষবৃক্ষ, রজনী, ইন্দিরা অবধি উপন্যাসে বাঙলাদেশেরই বিভিন্নকালের চিত্রাঙ্কন করেছেন, ব্যতিক্রম কেবল রাজসিংহ। 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতের সাতকোটি মানুষ হচ্ছে তাঁর সময়কার বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর জাত জন্ম বর্ণ ধর্ম ভাষা নিবাস যোগ্যতা পেশা নির্বিশেষে সব মানুষ। এ অভেদ জাতি বা মানুষ চেতনা তাঁর মধ্যে 'অনুশীলন ধর্মতত্ত্ব-গীতা' চর্চার পূর্বাবধি বজায় ছিল। হাঁপানি ও মধুমেহ রোগে জীর্ণ, পিতৃবর্জিত, নিহত কন্যার শোকগ্রস্ত, অপুত্রক অসহায় প্রৌঢ় বঙ্কিমের নৈরাশ্যের ও মৃত্যুচিন্তার দুর্বলতাই বঙ্কিমচন্দ্রকে শাস্ত্রচর্চায় উদ্বুদ্ধ করে। নিরীশ্বরকে ঈশ্বরাশ্রিত করে। মূলে হেস্টির বিদ্রূপই অপমানিত হিন্দু বঙ্কিমকে শাস্ত্রচর্চায় অনুপ্রাণিত করে। তবু বঙ্কিমচন্দ্র কখনো সাম্প্রদায়িক হননি। তিনি প্রৌঢ়বয়সে হিন্দু জাতীয়তাবাদী ও হিন্দুর পুনর্জাগরণবাদী এবং হিন্দুর জন্যে কালানুগ একটা যৌক্তিক বৌদ্ধিক Code of life তৈরির প্রয়াসী ছিলেন জীবনের শেষদিন অবধি। বঙ্গদর্শনে বঙ্কিম ছিলেন কেবলই মানুষ। প্রচারেও ছিলেন হিন্দুত্বপ্রবণ যুক্তিবাদী ও শ্রেয়সবাদী মানুষ। তারপরে হলেন কেবল হিন্দু, হিন্দুধর্মকে জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে জেনেও মানুষের প্রতি প্রীতিকে তখনো গুরুত্ব দিতেন। তুচ্ছ বলে মানতে পারেননি। অতএব বঙ্কিম শেষাবধি হিন্দুর পুনর্জাগরণবাদী হিন্দু ছিলেন, সাম্প্রদায়িক ছিলেন না। এ সময়ে পুনর্লিখিত পরিমার্জিত পরিবর্ধিত পরিশোধিত রাজসিংহ এ গ্রন্থেই তো-দরিয়া-জেবুন্নিসা কষিত কাঞ্চন হয়ে ওঠে। খণ্ডিতভাবে এখানে আওরঙ্গজেব-নির্মলকুমারীর সম্পর্কও স্মরণ করা যেতে পারে। তাই 'রাজসিংহ' বঙ্কিমচন্দ্রের অসাম্প্রদায়িক চেতনার সাক্ষ্য-প্রমাণ হয়েই রইল।

মানববাদী ও শোষণমুক্তির সংগ্রামী লেখক আসহাবউদ্দীন আহমদ

অধ্যাপক আসহাবউদ্দীন আহমদ ২৮ মে সন্ধ্যায় আশি বছর বয়সে [১৯১৪-৯৪] ভবলীলা সাঙ্গ করলেন। তিনি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপরসিক ছিলেন। নিজেই বলতেন 'কিছু কালের মধ্যে বয়স হবে আশি, এবং তারপরে বলব আসি।' তাঁর এ রসিকজনোচিত উক্তি প্রায় আক্ষরিক ও আকস্মিকভাবে তাঁর জীবনের বাস্তব ইতি ঘটাল। তিনি তাঁর জবানিতে আরো একটি সত্য কথা বলেছিলেন, তা হচ্ছে তাঁর ভাষায়, আমার সার্বক্ষণিক রাজনীতিক কর্মী হওয়া যেমন আকস্মিক, তেমনি সাহিত্যকর্মী [সাহিত্যিক] হওয়াটাও আকস্মিক। [উজানস্রোতের যাত্রী, পৃঃ ৪৯]

কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি দেহ-প্রাণ-মন-মনন-সংকল্প-অঙ্গীকার-দায়বদ্ধতা নিয়েই সাহিত্য রচনা যেমন করেছেন, তেমনি যুক্তফ্রন্টের সমর্থিত প্রার্থী হিসেবে সাংসদ হয়েই মোহাম্মদ তোহা দলের বামরাজনীতিতে দেহ-প্রাণ-মন-চেতনা-চিন্তা-কর্ম সবকিছু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাগতিকভাবে উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর গ্রেফতারে সহায়তা করার জন্যে অর্থাৎ তাঁকে ধরিয়ে দেবার জন্যে সরকার পাঁচহাজার টাকা পুরস্কারও ঘোষণা করেছিল। আইয়ুব খানের আমলে ও পরে প্রায় পনেরো বছর তাঁকে গাঁয়ে গাঁয়ে আত্মগোপন করে সর্বপ্রকার শারীরিক মানসিক আর্থিক ও খাদ্যিক কষ্টের ও কৃচ্ছ্রার দুর্ভোগে ভুগতে হয়েছে। তবু অন্য অনেকের মতো তিনি আদর্শচ্যুত বা সঙ্কল্পবিচ্যুত হননি। 'ধূসর উষর রাজপথে জনতার মাঝখানেই' থেকেছেন আমৃত্যু। সহকর্মী কমরেডদের চরিত্রে ও আচরণে বিরক্ত হয়ে তিনি দল ত্যাগ করেন বটে, কিন্তু দুস্থ দরিদ্র অজ্ঞ-অনক্ষর নিঃস্ব নিরন্ন শোষিত মানুষের সেবা-মৃত্যুর দিনেও করতে গিয়ে মন্ত্রীর বাড়ি লক্ষ্যে যাত্রার সময়ে ঢাকার রাস্তায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েই কয়েকঘণ্টার মধ্যে প্রাণ হারান। তিনি স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠায়, বঞ্চিতদের প্রাপ্য আদায়ের জন্যে সরকারের কাছে আবেদনে নিবেদনে তদবীরেও ব্যয় করেছেন জীবনের শেষদিন।

তিনি নিজেই বলেছেন, 'জনতা ১৯৫৪ সালে আমাকে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচন করে পুরস্কৃত করল। জনতা আমাকে লৌহকঠিন একাত্মতার বন্ধনে আবদ্ধ করল। সে-বন্ধন আমৃত্যু অটুট থাকবে। তাদের ভালোবাসা আমাকে শিখিয়েছে যে, জনতার ভালোবাসার চেয়ে বেশি শক্তিশালী টনিক দুনিয়াতে আজো আবিষ্কৃত হয়নি।' [উজানস্রোতে জীবনের ভেলা, পৃঃ ৯২]

তিনি শোষণমুক্তি ও সমাজ পরিবর্তন লক্ষ্যেই প্রায় ২৭ খানা বই মুদ্রিত আকারেই রেখে গেছেন, আরো লেখা সংকলিত হলে সম্ভবত আরো দু'তিনখানা বই হবে। তবু তিনি সবিনয় জানিয়াছেন যে, 'রীতিমত সাহিত্যিক বলতে যা বোঝায় আমি তা নই। খেয়ালের চাপে লিখি।' [আমার সাহিত্যজীবন পৃঃ ৫৮]। নিজের লেখার মূল্যায়ন করেছেন তিনি। ত্রুটি সম্বন্ধেও ছিলেন সচেতন। 'আমার লেখার বিভিন্ন ত্রুটির একটি হল আমার পান দোষ। পান [ধ্বনিসাম্য অর্থপার্থক্যমূলক শব্দ] ব্যবহারের প্রতি আমার অত্যধিক ঝোঁক রয়েছে। কিন্তু Pun-এর এই অত্যধিক ব্যবহার ক্লান্তিকর।' লেখার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য সম্বন্ধেও তিনি পস্টভাষায় বলেছেন 'আমার লেখার হাসিঠাট্টার ভেতর দিয়ে সামাজিক, অর্থনৈতিক বৈষম্য ও অবিচারকে তুলে ধরা হয়েছে জনপ্রিয় করা হয়েছে, প্রোপাগাণ্ডার আকারে নয়, সাহিত্যরূপে।' [আমার সাহিত্যজীবন, পৃঃ ৭৫] 'আমি আমার ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে শোষণমুক্ত সমাজ কায়েমের জন্য প্রেরণাসৃষ্টির উদ্দেশ্যেই লিখেছি। শোষণ জুলুমের বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টি অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মনোভাব সৃষ্টিই আমার লেখার উদ্দেশ্য।' [তদেব, পৃঃ ৫৭] তিনি বলতেন 'পুঁজিবাদের পূঁজ হচ্ছে শ্রেণীশোষণ।'

কাজেই তাঁর রাজনীতিক দায়বদ্ধতার উপাঙ্গ হিসেবেই তিনি লেখনী চালনা করেছেন এবং পাঠকের হৃদয়গ্রাহী করার জন্যে বক্তব্য বিষয়কে রসসিক্ত করেছেন, সাহিত্য পদে উন্নীত করার জন্যে সচেতন প্রয়াসী ছিলেন তিনি। তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধির পন্থা হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছিলেন ব্যঙ্গ বিদ্রূপাত্মক পদ্ধতি এবং Pun-এর বহুল প্রয়োগ। বঙ্গে হূল ও শূল দু-ই থাকে, আর Pun - বা যমকে থাকে হালকা কিন্তু ধ্বনি মাধুর্যের রস ও ভিন্নার্থের চমক। তাতে হূল ও শূল গা-সহা মন-সহা কান-সহা ও চোখ-সহা হয়। মনোজগতে বৌদ্ধিক ও যৌক্তিক বিপ্লব ঘটলেই কেবল সমাজক্ষেত্রে বিপ্লবী কর্মী সংগ্রামী কমরেড সহজে জোটে। অধ্যাপক আসহাবউদ্দীন এভাবেই কম্যুনিস্ট হিসেবে দু'ধারী তরওয়াল চালিয়েছেন ১৯৫২ থেকে ১৯৯৪ সনের ২৮শে মে অবধি। মৃত্যুকাল অবধি তিনি ছিলেন চট্টগ্রাম শহরে লেখক শিবিরের প্রধান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যাপক আসহাবউদ্দীন আহমদের [১৯১৪ সালের মার্চ–১৯৯৪ সালের ২৮ মে] রচিত বইগুলোর নাম এখানে মুদ্রিত রাখা ভবিষ্যতের পাঠকের জন্যে আবশ্যিক মনে করি। ১. বাদলের ধারা ঝরে ঝরঝর ২. ধার ৩. উদ্‌ধার ৪. সের এক আনা মাত্র ৫. জান ও মান ৬. পথ চলিতে ৭. বন্দে ভোটারম (ইংরেজী ভাষায়) ৮. আওয়ামী লীগের মীর জাফরী ঐতিহ্য ৯. হাতের পাঁচ আঙুল ১০. লেখক ও পাঠক ১১, দাড়ি সমাচার ১২. বিপ্লব বনাম অতিবিপ্লব ১৩. ভাতের বাংলা, কাপড়ের বাংলা ১৪. বাঁশ সমাচার ১৫. দ্বিস্পদ বনাম চতুস্পদ ১৬. আমার সাহিত্যজীবন ১৭. শিকল ভাঙার গান [প্রথম সংস্করণের নাম ইন্দিরা গান্ধীর বিচার চাই] ১৮. চিঠিপত্র ১৯. A Tale Told by An Idiot ২০. ঘুষ ২১. ফেলে আসা দিনগুলো ২২. উজানস্রোতে জীবনের ভেলা ২৩. দামশাসন দেশশাসন ২৪. ভূমিহীন কৃষক, কড়িহীন লেখক ২৫. সেরা রম্য রচনা ২৬. সংবর্ধনার উত্তরে ভাষণ 'উজানস্রোতের যাত্রী'।

এই বইগুলোর নামের মধ্যেও প্রতিফলিত হয়েছে আসহাবউদ্দিন আহমদের মনের, মেজাজের, আদর্শের, লক্ষ্যের, রুচির ও রসবোধের সাক্ষ্য ও প্রমাণ। এভাবেই তিনি তার রচনার মধ্যে তাঁর অনাবিল সারল্যের, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের, আদর্শনিষ্ঠার, লক্ষ্যচেতনার, শোষিত গণমানবদরদের অকৃত্রিম স্বাক্ষর রেখে গেলেন। এ জন্যেই চরিত্রবান নিষ্ঠ বামপন্থীদের মধ্যেও তিনি ছিলেন অনন্য। ঘরে-বাইরে, কথায়-কাজে, বুকে-মুখে তিনি ছিলেন অভিন্ন। তাঁর আর্থিক জীবন ছিল দারিদ্র্যদুষ্ট, তবু আফসোস ছিল না তার. ছিল না কোন সংকোচ-শরম-গ্লানির স্পর্শ, যদিও জন্ম হয়েছিল তার সাক্ষর-সচ্ছল সম্ভ্রান্ত ঘরে, তিনি যথার্থ অর্থেই ছিলেন, আক্ষরিকভাবে দেশের মানুষের সেবায়, সমাজ পরিবর্তনে উৎসর্গিত-প্রাণ পুরুষ।

তাঁর রচিত সাহিত্য পাঠককে যুগপৎ ও একাধারে দিয়েছে প্রেরণা ও আনন্দ। তার সেবা এবং বিপ্লবী ভাব-চিন্তা, কর্ম-আচরণ দলকে করেছে অনেকের কাছেই নির্ভরযোগ্য এবং আশা আশ্বাস ও আস্থা যুগিয়েছিল মার্কসবাদের ভাবী সাফল্য সম্বন্ধে। তাঁর কর্মস্থল চট্টগ্রামের অধিকাংশ এলাকায় তিনি ছিলেন দুস্থ-দরিদ্র নিঃস্ব নিরন্ন মজলুম জনতার বিপদকালের সহায় ও বন্ধু এবং বল-ভরসার পাত্র। সামাজিক মানুষ হিসেবেও তিনি ছিলেন লোকপ্রিয় সুজন ও সজ্জন। তিনি লেখার মাধ্যমে পাঠকের নজরে এনেছেন, ভাষণ বক্তৃতার মাধ্যমে শ্রোতার কানে দিয়েছেন যে প্রচলিত সমাজব্যবস্থা, শাস্ত্রিক নীতি আদর্শ এক অমানবিক অন্যায় জুলুম ব্যবস্থামাত্র দুর্বলের ও নিঃস্বের উপর। শোষণমুক্ত ন্যায় ও বিবেকসম্মত সমাজ গড়ে তোলাই কাম্য।

অধ্যাপক আসহাবউদ্দীন ছিলেন চট্টগ্রাম সরকারী কলেজে আমার ইংরেজী ভাষা-সাহিত্যের শিক্ষক এবং তাঁর সঙ্গে আমার দূরসম্পর্কের কুটুম্বিতাও ছিল। আবার পশ্চিমগাঁও নওয়াব ফয়েজুন্নিসা কলেজে ও ফেনী কলেজে আমি ছিলাম তাঁর সহকর্মী ও একঘরের বাসিন্দা। তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও সম্বন্ধ অর্ধশতাব্দীর। তিনি আমার স্ত্রীকে 'মা' বলেই জানতেন ও মানতেন। বয়সে বিশ/বাইশ বছরের কনিষ্ঠা হওয়া সত্ত্বেও 'মা' বলেই কদমবুসি করতেন সামাজিক নিয়মে অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে। তিনি ছিলেন আমাদের পরিবারের সদস্য ও পরিজন স্বরূপ। এ জন্যেই তাঁর সম্বন্ধে সামান্য যা কিছু বললাম সবই আক্ষরিকভাবে সত্য। লৌকিকতা বা সৌজন্য নয়। তাঁর ঘটনা ও সংগ্রামবহুল জীবন কাহিনী লিখতে হলে হাজার পৃষ্ঠার বই লেখার দরকার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~